পাইয়াছিলেন, তবে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন; পুনরায় তাহা পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া অন্য লোকেও চেষ্টা করিয়াছিল—তাহার ভিতর কাহারও চেষ্টা সফল হইয়াছিল—যে উপায়ে চেষ্টা করিয়া তিনি কাম হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিবার পর ক্রমে সেই সাধনা করিবার শাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। যোগ সাধনা বড়ই শক্ত; অতি অল্প লোকেই তাহা পারে। যোগসিদ্ধ লোকেরা একরূপ অদ্ভুত লোক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাঁহাদের অনুভূতি ও আমাদের অনুভূতি পৃথক হইতে পারে। কিন্তু কোনরূপ পূজা বা সাধনাবিহীন সংসারী—তাহার উপর অবিশ্বাসী—লেখকের বহু বৎসর পূর্ব্বে অসীম আনন্দদায়ক এইরূপ একত্বের বা অদ্বৈত অনুভূতি একদিন হঠাৎ হইয়াছিল। তৎকালে আমার কতিপয় বন্ধুর কাছে এই অতীব বিস্ময়কর অনুভূতির গল্প করি। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বেদান্তশাস্ত্রীর কাছেও গল্প করি এবং কেন ও কেমন করিয়া এইরূপ হইল জিজ্ঞাসা করি। ইহার বিবরণও আমি অল্পদিন পরেই ইংরাজীতে লিখিয়া রাখি। সম্প্রতি একদিন কথায় কথায় হীরেন্দ্রবাবু আমাকে সেই অনুভূতির বিবরণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন ও বলেন যে এই বিবরণ অতি মূল্যবান বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। তজ্জন্য ইহা প্রকাশ করিতেছি।

এই আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল ১৯০৬ সালের ১০ই নভেম্বর বেলা সাড়ে দশটার কিছুক্ষণ পরে। তখন আমার বয়স ৩৯ উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্থান আমার আপিস ঘর, ৫ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট। এখন ৫ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটে যেখানে নূতন চারিতলা বাড়ীটি আছে, তখন সেখানি একটি পুরাতন দোতলা বাড়ী ছিল। তাহাতে আমার আপিস ছিল দোতলায়—আমার ঘর ও বসিবার স্থানের সম্মুখে চার্চ্চ লেন। সম্মুখে উত্তরে জানালার ভিতর হইতে ছোট আদালতের বাড়ী দেখা যাইতেছিল। আমি চাপকান পেণ্টলুন পরিধান করিয়া একখানি ইংরাজী পুস্তকে আমেরিকার Healthy-mindedness Movement এর বিষয় পড়িতেছিলাম। বেয়ারা তামাক দিয়া গিয়াছে; কেদারায় পা তুলিয়া চেপঠালি খাইয়া বসিয়া পড়িতেছিলাম ও তামাক টানিতেছিলাম। আমার সামান্য সর্দ্দি করিয়াছিল ও সামান্য মাথা ভার ছিল। বইখানি পড়িতে পড়িতে টেবিলের উপর খোলাই রাখিয়া দিয়াছি। ওই পুস্তকের সেখানে মূল কথা লেখা আছে যে, আমরা ইচ্ছা করিলে রোগমুক্ত হইতে পারি। আমি পুস্তক রাখিয়া পুস্তক লিখিত বিষয়ে একরূপ অলসভাবে ভাবিতেছি; আমার মনে হইয়াছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়া যে বেদান্তের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে কর্ম্মকুশল আমেরিকাবাসীরা তাহা এইরূপ সাংসারিক কার্য্যের উপযোগী করিয়া লইতেছে। আমি ভাবিতেছিলাম—বটেই ত! যদি আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই হই, আমার ভিতর যদি তাঁহারই শক্তি নিহিত থাকে, তবে কেনই বা আমি ব্যাধি দৈন্য ইত্যাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হই? আমি ঢিলেভাবেই এইরূপ ভাবিতেছিলাম—ইংরাজিতে যাহাকে Reverie বলে কতকটা সেইভাবে। এমন সময়ে হঠাৎ আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল—সমস্ত শরীর—প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্লাবী অতুলানন্দলহরী বহিতে লাগিল। সে আনন্দের কোন তুলনাই হয় না। চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু আপনিই ঝরিতেছে। কাম উপভোগের—স্পর্শসুখের আনন্দকে কোটী কোটী গুণ বর্দ্ধিত করিয়া তাহার সহিত জ্ঞানের আনন্দ (intellectual pleasure) ও পরকে সুখী করিয়া তাহার সুখ বা আনন্দ দেখিয়া যে আনন্দ হয় তাহাও কোটীগুণ বর্দ্ধিত করিয়া একত্র করিলে কতকটা তাহার আভাষ পাওয়া যায়। প্রত্যেক রোমাগ্র পর্য্যন্ত—নখরাগ্র পর্য্যন্ত সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আশ্চর্য্য অনুভূতি হইতেছিল যে আমি সর্ব্বময়—সর্ব্বত্রই অনুপ্রবিষ্ট। দূরে যে ছোট আদালত বাড়ী আছে, তাহার ইষ্টকাদিরও ভিতর—ওই বাড়ীর ছাতে একটি কাক বসিয়াছিল তাহারও ভিতর—চার্চলেনস্থ সমাধিক্ষেত্রে একটি বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল তাহারও ভিতর—সমস্ত আকাশে—রৌদ্রকিরণে অনুপ্রবিষ্ট। তাহারা—সমুদায় সূর্য্য তারকা প্রভৃতি আমারই অন্তর্গত—আমি তাহাদের অপেক্ষা বহুগুণে বৃহত্তর। আগুনের উপর বায়ু কম্পমান হইয়া যেমনভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ আমার প্রত্যেক রোমকূপ হইতে আমি যেন বহির্গত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছি ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি, এইরূপ বোধ হইয়াছিল। আমার এখন স্মরণ হইতেছে (যদিও আমার সেই সময়ে লিখিত নোটে নাই,—কিন্তু আমার এই স্মৃতির কথা বিশ্বাসযোগ্য; কেন না, যেদিনকার স্মৃতি বিস্মৃত হওয়াই একরূপ অসম্ভব) যে প্রত্যেক রোমকূপের ঠিক

নিকটস্থলে আগুনের উপর কম্পমান বায়ুর মতন আমা হইতে বহির্গামী আমারই প্রবর্দ্ধিত অঙ্গও যেন দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এই অনুভূতির সঙ্গে আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছিলাম যে, পৃথিবী অমিশ্র আনন্দময় স্থান; এখানে মৃত্যু শোক ও দুঃখ কষ্ট ব্যাধি কিছুই নাই। কেহ মরে না—অন্য সকলই মনের বিকার। আমার ভিতর একটি প্রবল প্রেরণা আসিয়াছিল। সেই প্রেরণাটা এই যে, আমি এখনই রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব বাউলদিগের মতন নাচিয়া নাচিয়া দুই হাত তুলিয়া সকলকে বলি—"ওরে, তোরা কেন মিছে দুঃখ কষ্ট শোক ব্যাধি ভোগে ক্লিষ্ট মনে করিতেছিস! এ সব মিথ্যা। মৃত্যু নাই, জরা নাই—ব্যাধি, কষ্ট সব বাজে; তোরই মনের বিকার। একবার মনে জোর করিয়া ভাব—ও সব মিছে; এই সকলই তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে। ওরে তোরা ভুল বুঝে মিছামিছি এই সকল কষ্ট ভোগ করিতেছিস!" এই প্রেরণায় এত জোর হইতেছে যে, আমার নিজেকে সামলে রাখাই দায়। এইরূপ করিবার প্রেরণা হইতেছে বলিয়া আমার মনে হইল, আমি কি পাগল হইয়া যাইতেছি? কতকটা কোনরূপ পাগলামি করিয়া না বসি ও কতকটা তাহাদিগকে এই আশ্চর্য্য অনুভূতির কথা বলিবার জন্য, আমি আমার কতিপয় বন্ধু এটর্ণীকে ডাকিয়া আনিতে আমার বেয়ারাকে বলিলাম। হীরেন বাবুও তাহাদের ভিতর একজন। কিন্তু কেহই তখনও আপিসে আসিয়া উপস্থিত হন নাই। তাহার পর এ কথাও মনে উদয় হইল, হউক ইহা পাগলামি—হউক ইহা মস্তিষ্কের বিকার—এইরূপ আনন্দ উপভোগ যদি থাকে, লোকে আমাকে পাগলই বলুক আর যাহাই বলুক তাহাতে কি আসিয়া যায়? মনে হইল, এই আনন্দ উপভোগের প্রয়াসেই সাধু, সন্ন্যাসী, যোগীরা সংসারের সকল সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন ও সন্ন্যাসাশ্রমের সকল কষ্টই অক্লেশেই সহ্য করেন। আরও মনে হইল, এই সময়ে যদি আমি যে সকল ব্যাধিগ্রস্ত, যথা মাথার ব্যায়রাম, স্মরণ-শক্তির হ্রাস, চক্ষুরোগ (নিকট দৃষ্টি), দন্তরোগ, অজীর্ণ রোগের বিষয়ে চিন্তা করি, আমি এখনই এই সকল রোগ-বিমুক্ত হইতে পারি। যে যে অঙ্গের প্রতি আমার চিন্তা ধাবিত হইতে লাগিল, সেই সেই অঙ্গে একটা creeping sensation হইতে লাগিল,—মাথা ধরাটা চলিয়া গেল, কিন্তু অন্য কোন রোগে কোন উপকারই পাইলাম না। আমার বিচার-শক্তির কোনরূপ হ্রাস হয় নাই। তাহার পরেই মনে হইল—আচ্ছা আমি যদি সর্ব্বব্যাপ্ত—সকলেতেই অনুপ্রবিষ্ট আমি তো সকল জীবেদেরই;—অতএব সকল বস্তুরই অন্তরের জ্ঞান ও কথা আমার জানিতে পারা উচিত; দেখি তাহা জানিতে পারি কি না। বলিয়াই সেই বড় অশ্বত্থগাছের মনের কথা—এতকাল ধরিয়া সে কি কি দেখিল, কি বুঝিল, উহার প্রাণের কথা কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত মন নিবিষ্ট করিলাম। কিন্তু কিছুই পাইলাম না। আশ্চর্য্য হইলাম। মনে হইল, আমি যখন ইহার ভিতরে, ইহার প্রত্যেক অণুতে অনুপ্রবিষ্ট, তবুও কেন উহার অন্তরের কথা জানিতে পারিতেছি না? এই যে অনুভূতি ইহা কি ভ্রান্তি? নিজের দিকে চাহিয়া তাহাও তো বোধ হয় না! যদি কেহ আমাকে বলে, আমার হাত নাই, বা পা নাই, সে কথাও যেমন আমি বিশ্বাস করিতে পারি না—আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে উড়াইয়া দিতে পারি না—এই অপরোক্ষ অনুভূতিকেও তেমনই কোন প্রকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তাহার পর আমি ক্রমে ক্রমে ছোট আদালতের ছাতের আলিসার উপর যে কাকটিকে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইতেছিলাম, তাহার মনের কথা জানিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহা পারিলাম না। আমার বাড়ীতে আমার দাদা ও স্ত্রী ও অন্যান্য লোকেরা কে কি করিতেছে, জানিতে চেষ্টা পাইলাম; তাহাও কিছুই দেখিতে শুনিতে বা বুঝিতে পারিলাম না। কেন যে পারিলাম না, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। এই সময়েও আমার সেই অতুলানন্দের অনুভূতি চলিতেছে। এই ব্যর্থ চেষ্টার পর, এই দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি সব মিথ্যা এই তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য অন্তরে যে প্রেরণা হইতেছিল, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিলাম—আচ্ছা, যেন মৃত্যু নাই; তাহার জন্য শোক করা বৃথা; ব্যাধি যেন মনের জোর করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়; কিন্তু একজন যে আর একজনের উপর অত্যাচার করে, অশেষ প্রকার নির্য্যাতন করে, এও কি মিথ্যা? এই যে ইংরাজেরা আমাদের উপর নানারূপ অন্যায় ব্যবহার করে (এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের দিন মনে রাখিবেন), অত্যাচার করে, এও কি মিথ্যা? ইহার মানে কি? কেন এইরূপ অত্যাচার? আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অত্যাচারের কথাও যেমন মনে হইল, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার মধ্যে এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী অনুভূতি ছিল তাহা হইতে আমি অতি দ্রুতবেগে সঙ্কুচিত

হইতে লাগিলাম ; আকাশ সূর্য্য প্রভৃতি হইতে গুটাইয়া আনিতে লাগিলাম ; ছেলেদের রবারের বাঁশী যেমন ফুঁ দিয়া ফুলাইয়া ছিদ্রটি খুলিয়া দিলে যেরূপভাবে সঙ্কুচিত হয়, আমিও তেমনই ভাবে মেল ট্রেণের গতির সহস্রগুণে বর্দ্ধিত বেগে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। সঙ্কুচিত হওয়ারও একটা অনুভূতি হইতে লাগিল। আমি অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম—কেনই বা এই চিন্তা মনে উঠিবামাত্র আমি এইরূপ সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। কেনই বা আমার তাৎকালিক অনুভূত আনন্দ অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল! আপনা-আপনি মনে উদয় হইল, এই যে ইংরেজ-বিদ্বেষভাব মনের ভিতর উঠিয়াছে—যাহা অদ্বৈত জ্ঞানের বিরোধী ভাব, এই বিদ্বেষ-ভাব উঠিয়াছে বলিয়াই আমি আর এই আনন্দ উপভোগের উপযুক্ত রহিলাম না। তখন আমি নিজেকেই মনে মনে বলিলাম, আমি কি করিতে পারি? আমি ইচ্ছা করিয়া এই বিদ্বেষ তো করিতেছি না। আমার মনের এই সংশয় আছে,—আমি তো কোন রূপে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না—এই বলিয়া এক রূপ বিহ্বলভাবেই বসিয়া রহিলাম। ইতি মধ্যেই আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী ছিলাম, তাহা হইতে কমিয়া আসিয়া কেবলমাত্র ৫, ৭ হাত অর্দ্ধব্যাস (radius) পরিমিত বৃত্ত স্থান মাত্র ব্যাপ্ত আছি। আনন্দের আতিশয্যও অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তখন আমার অধিকৃত বৃত্ত স্থানের ভিতর হইতে, কে যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—"আচ্ছা, দেখ দিখিনি, এই যে প্রবলের দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, যাহার নিমিত্ত তোর মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কেবল তোর অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করাইবার নিমিত্তই—তোর অন্তরস্থ দোষ দেখাইবার নিমিত্তই। এই সকল মন্দ এখনকার এই আনন্দ উপভোগের পূর্ব্বাবস্থা মাত্র। এই সকল মন্দের দ্বারাই মানুষের মন ভগবান-অভিমুখী হয়। এই বলিলে কি তোর মনের সংশয় যায় না?" আমি এই কথাটির দ্বারা, আমার মনের সকল সংশয় যায় কি না তাহা দেখিতে চেষ্টা পাইলাম। এই ইংরাজ অধিকার আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনের জন্যই হইয়াছে—আমাদের ভিতরের পাপ মোচন করাইবার নিমিত্তই, তাহাদের এখানে আগমন—প্রবলের দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার কেবল দুর্ব্বলকে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করাইবার নিমিত্ত—তাহার সমকক্ষ হইবার চেষ্টা আনাইয়া দিবার নিমিত্তই—তাহার ভিতরের দোষও পাপের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবার নিমিত্তই—তাহা অপনোদন করাইবার চেষ্টা আনয়ন করাইবার নিমিত্তই বলিলে, দেখিলাম, এক রকম বেশ সমস্যা পূরণ হয়। ইহাতে তো বেশ নূতন রকমে সংশয় ভঞ্জন হইল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম ও তৎসঙ্গে আমার দ্বারা তৎকালে অনুভূত ব্যাপ্ত-স্থান কিছু—অর্থাৎ আর দশ বিশ হাত অর্দ্ধব্যাস পরিমিত স্থান অধিকার করিলাম মনে হইল। কিন্তু তাহার উত্তরে আপনা আপনিই মনে মনে বলিলাম, আমি একরূপ বিহ্বল অবস্থায় আছি; এখন তো আপনার কথায় কোন ভুল বা দোষ দেখিতে পাইতেছি না—মাথাটা আরও পরিষ্কার হইলে মিলাইয়া দেখিব। এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ কাটিল—কতক্ষণ তাহা বলিতে পারি না—তখন আমার সময় জ্ঞান ছিল না—ঘড়ি দেখিতেও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার দেহের বাহিরের আমি যেন ফিকে হইয়া উপে গেলাম—সঙ্কুচিত হইয়া পুনরায় দেহতে ফিরিয়া আসিলাম এই অনুভূতিটা হয় নাই। সর্ব্বসমেত অর্দ্ধঘণ্টা বা ৪৫ মিনিট এই অনুভূতিটি বোধ হয় ছিল। তাহার পর দীর্ঘ বিংশতি বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে—আর কখনও সে ভাব হয় নাই।

এই ঘটনার কথা দুই এক দিনের মধ্যেই হীরেন্দ্র বাবুকে বলি ও জিজ্ঞাসা করি এ কি ব্যাপার? তিনি আশ্চর্য্য হইলেন ও বলিলেন—"এ যে আনন্দময় কোষের আংশিক আবির্ভাব—আপনার কেমন করিয়া এরূপ হইল?" তিনি জানিতেন আমি কিরূপ অবিশ্বাসী, কিরূপ ধর্ম্ম-সাধনা-বিবর্জ্জিত। আমি বলিলাম "আমি কিছুই বিশ্বাস করি না বটে, কিন্তু আমার ভিতরে সত্য জানিবার ও বুঝিবার প্রবল ইচ্ছা আছে—বোধ হয় তজ্জন্যই হইয়া থাকিবে।" তিনি বলিলেন—"সে তো অনেকেরই আছে—তাহাদের হয় না কেন?"

আমি এই আশ্চর্য্য ঘটনা যথাসাধ্য অবিকল লিখিলাম। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে এই বিস্ময়কর অনুভূতি অন্য কাহাকেও বোঝান যায় না। যেমন জন্মান্ধকে আলোকের বর্ণ-বৈচিত্র্যের কথা বোঝান যায় না, তেমনই এই ক্ষুদ্র দেহধারী আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ততা ও অনুপ্রবেশ বোঝান সম্ভব হয় না। এই জ্ঞান যে আমার ভ্রম ধারণা illusion, hallucination বা স্বপ্ন এ কথা আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

এই অনুভূতি যে সত্য, তাহা আমাকে বিশ্বাস করাইবার ইহার একটা প্রবল শক্তি আছে, যাহা আমার সহজ জ্ঞানকে পরাজিত করে। অপরে যদি আমাকে এখন বলে, আমার হাত নাই,—আমি যে আমার হাত দেখিতেছি, উহা আমার ভ্রান্ত দৃষ্টি—তাহা যেমন আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারি না, তেমনই আমার এই অনুভূতিটা illusion এ কথাও আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহা যে সত্য তাহার ধারণা উড়াইয়া দিবার আমার ক্ষমতা নাই—চেষ্টা করিয়াও পারা যায় না। পাঠকবর্গকে, শ্রোতাদিগকে বোঝাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সেই বহু পুরান উপমা—সমুদ্র ও তরঙ্গ যেমন অভিন্ন নয় আমি ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড—সমস্ত স্থাবর জঙ্গম ও উদ্ভিদ তেমনই ভাবে অভিন্ন নয়।—ইহা অপেক্ষা বুঝাইবার উপযোগী উপমা আর খুঁজিয়া পাই না। বাষ্প জল বরফ যেমন এক—বাষ্প যদি জল ও বরফের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আমি যেন সেই বাষ্প—যেন সকল লোক ও পদার্থই বিভিন্ন আকারের ও আয়তনের বরফ হইয়া আমার উপরে ভাসিতেছিল। গঙ্গার জল যেমন পলতায় উঠাইয়া সকলের ঘরে ঘরে তাহাদের কলের ভিতর হইতে বাহির হয়—তাহারা প্রত্যেকে তাহাকে কল ও জল বলে, তেমনই সেই ব্রহ্মই সকলের ভিতর কাজ করিতেছে।

ইহার পর আমার আর একটি বক্তব্য এই যে, এইরূপ অনুভূতি ঈষৎ ভিন্ন ভিন্ন আকারে সকল দেশেই সকল কালেই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের ভিতরও হইয়াছে। যদি কেবল আমারই এইরূপ হইত, তাহা হইলে না হয় ইহা আমার মস্তিষ্কের বিকার বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু যখন দেখা যায় যে এই সকল নানা শ্রেণীর লোক—তাহারা কেহই পাগল নয়—বেশী ভাগ-ই মান্য লোক,—এইরূপ অনুভূতি তাহাদিগের জীবন ও মনের গতি প্রবল রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল—তাহারা সকলে-ই একবাক্যে বলিয়াছে যে এই অনুভূতিকে অবিশ্বাস করিবার তাহাদের ক্ষমতা-ই নাই, তখন ইহাকে মস্তিষ্কের বিকার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নয়। তৎসঙ্গের সেই অতুলানন্দ তাহার সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে। বরং ইহাকে আমাদের অন্তর্নিহিত এতাবৎ কাল ক্বচিৎ প্রকাশিত শক্তির বিকাশ বলাই বিধেয়। এই সম্বন্ধে বিলাতে কিছু কিছু গবেষণা হইয়াছে। এই রূপ অনুভূতির নামকরণ হইয়াছে Cosmic Consciousness। বিখ্যাত দার্শনিক William James সাহেব তাঁহার লিখিত Varieties of Religious Experience নামক Edinburgh Universityর Gifford Lectures, Evelyn Underhill লিখিত Mysticism এবং Dr. Bucke লিখিত Cosmic Consciousness পুস্তকে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে।

পারের যাত্রী

শ্রীকালিদাস লাহিড়ী

নাদিছে বজ্র গভীর আরাবে
　　নাদিছে মেঘ গভীর গর্জ্জনে,
খসিছে উল্কা ঝলসে বিজলী
　　স্বনিছে সমীর শন্ শন্ শনে।
বর্ষিছে বারি মুষল ধারায়
　　বর্ষিছে করকা অবিরল ধারে,
চূর্ণিছে শিলা চূর্ণিছে পাদপ
　　গর্জ্জিছে সিন্ধু ভীম হুঙ্কারে।
স্বরগে মরতে একাকার যেন
　　উঠেছে প্রবল প্রলয় ঢেউ,
ভীত সন্ত্রস্ত নিখিল বিশ্ব
　　আঁখি মুদে সবে চাহে না কেউ।
এ ভীম প্রলয়ে কে তুমি পথিক
　　ঝঞ্ঝাবাত ঠেলি চলেছ একা,
শত বজ্রাঘাত লইছ শিরে
　　মুখেতে মৃদুল হাসির রেখা।
চিনেছি তুমি পারের যাত্রী
　　তুমি হে প্রেমিক তুমিই দেবতা,
তব অস্থিখণ্ডে নির্ম্মিত বজ্র
　　অমরের করে বিজয়গাথা!

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

৩০

সত্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

দুর্ব্বল—হ্যাঁ, সত্যই দুর্ব্বল সে,—এতটুকু শক্তি তাহার নাই যে সে সত্য কথা বলে। একটা মিথ্যাকে ঢাকিবার জন্য সে রাশি রাশি মিথ্যা আনিয়া তাহার উপর চাপাইতেছে; অন্তরের আড়ালে যথার্থ সত্য লুটাপুটি খাইয়া কাঁদিতেছে। কি অসাধারণ শক্তি সেই মেয়েটীর! আপনার যথাসর্ব্বস্ব পরকে দিয়াও অটুটভাবে দাঁড়াইয়া সে যে সত্যপথের যাত্রী! তাহার কথা সত্য, তাহার কাজ সত্য, তাহার উদ্দেশ্য সত্য! এই সত্যকে একাগ্রচিত্তে ধরিয়া আছে বলিয়াই কিছু আসার আনন্দ বা সর্ব্বস্ব যাওয়ার দুঃখ তাহাকে তেমনভাবে নিপীড়িত করিতে পারে নাই।

সে নারী ভালবাসে তাহার সত্যসুন্দর স্বামীকে। যে স্বামী এক দিন সত্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সেই সত্য স্বামীকে সে নিজের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই মিথ্যাচারী স্বামীর মূর্ত্তি সে সহিতে পারিল না। সে তো ধরা দিলই না; স্পষ্ট আদেশ দিল—সত্য যেন আর সে ভিটায় না যায়। মিথ্যাচারী এ সত্যকে সে শ্রদ্ধা করিতে পারে না, ভালবাসিতে পারে না। তাহার সত্যসুন্দর স্বামী সেই বিদায়ের দিনে বাহির ছাড়িয়া তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; এ মিথ্যাবাদীর সংশ্রব তাই তাহার অসহ্য। তাহার গৃহস্থালী সে অন্তর রাজ্যে পাতাইয়া লইয়াছে। সেখানে সত্যের আদান প্রদান চলে। বাহিরে মিথ্যার সংসার পাতিবার সখ আর তাহার নাই।

কিন্তু একটা সহজ চেতনা সে এই কপটাচারীর অন্তরে জাগাইয়া দিয়াছে; স্পষ্টই তাহাকে জানাইয়াছে, সে কপটাচারী। মিথ্যা লইয়া আজও সে কারবার করিতেছে। সেই জন্যই সে ঘৃণিত। যেখানে সে বরাবর মিথ্যার মুখোস পরিয়া মিথ্যা অভিনয় দেখাইতেছে, সেখানে চলিতে পারে; কিন্তু যেখানে এক দিন সত্যের বিমল জ্যোতিঃ বিতরণ করিয়া গিয়াছে, সেখানে চলিতে পারে না। সত্য লক্ষ্য করিয়াছিল—কথা বলিতে বলিতে কতবার দেবীর মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল,—সন্ধ্যার তরল অন্ধকার সে ঘৃণাবিকৃত মুখখানার উপর আড়াল দিতে পারে নাই।

না, এ দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতেই হইবে! ইলার কাছে সব বলা দরকার। বুকের মধ্যে এ দারুণ ভার বহিয়া আর বেড়ানো যায় না। দুঃসহ যাতনায় হৃদয় যে ফাটিয়া যায়! একজন কাহাকেও চাই, যাহার কাছে হৃদয়ের এই সব কথাগুলি বলিয়া বুকটাকে একটু হালকা করা যায়।

কি উজ্জ্বল হাসিভরা ইলার মুখখানি! কতখানি নির্ভর

করে সে সত্যর উপর। সে যখন শুনিবে, তার চিরবিশ্বাসী স্বামী মিথ্যাবাদী, কপটাচারী; সে যখন শুনিবে, সত্যর ভালবাসা অপরের উচ্ছিষ্ট মাত্র, যথার্থই দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র, বিশুদ্ধ নহে, তখন—তখন তাহার মুখের নির্ম্মল সুন্দর হাসিটী পলকে লয় হইয়া যাইবে, দারুণ নিদাঘের তাপে তপ্ত গোলাপটীর মত তাহার তরুণ মুখখানি শুকাইয়া উঠিবে।

কিন্তু তবুও সত্যকে প্রকাশ করা চাই-ই। ইলার হাসি বিলুপ্ত হোক, হৃদয় তাহার শতধা হইয়া যাক,—যদি সে যথার্থই সত্যকে ভালবাসিয়া থাকে, সামলাইয়া উঠিতে পারিবে না কি? আর যদিই সে সত্যকে ক্ষমা না করিতে পারে, ঘৃণা করিয়া বহুদূরে সরিয়া যায়,—হাঁ, তাহাই চাই, সত্যর পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্তই তাই। সকলের স্নেহ হইতে বঞ্চিত, সকলের পরিত্যক্ত—ঘৃণিত,—উঃ।

সম্মুখ দিয়া ইলা চলিয়া যাইতেছিল, সত্য ডাকিল,—"ইলা, একটা কথা শুনে যাও।"

হাস্যমুখী ইলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমার তো কথা শোনানো আর ফুরায় না। আমার কি আজ দাঁড়াবার যো আছে যে দাঁড়িয়ে খানিক তোমার হাসির গল্প শুনব? বউদি আজ দেখতে আসবেন বাড়ীখানা কি রকম সাজিয়েছি, কি রকম আমরা দুজনে রয়েছি—"

সত্য তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিয়া পাশের চেয়ারে বসাইল, বলিল, "আচ্ছা, সে সব হবে এখন। বউদি আসবেন সন্ধ্যাবেলায়, এখনি তার কি। বস ইলা, সত্যি, বড় জরুরী কথা।"

ইলা নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া বসিয়া বলিল, "নাও বল, তোমার কথা যতক্ষণ না শুনব, ততক্ষণ আর তো কিছু হওয়ার যো নেই। বউদি এলেই বরের ঘরের মাসী আর কনের ঘরের পিসী হয়ে তাঁকে লাগাতে যেয়ো—তোমার একটা কথাও শুনিনে, তোমায় কড়া কথা বলি।"

অন্য দিন হইলে এই কথাটাই লইয়া দম্পতির মধ্যে হাস্যকর কৃত্রিম কলহ উপস্থিত হইত; কিন্তু আজ সত্য গম্ভীর মুখে চুপ করিয়াই রহিল। প্রত্যহ যে সব খুঁটিনাটি কথা-বার্ত্তা কাজকর্ম্মের মধ্যে প্রচুর হাস্যরস সংগ্রহ করিয়া নিজেও যত হাসিত ইলাকেও তত হাসাইত, আজ মনে হইতেছে সে সব মিথ্যা, সে শুধু অভিনয়ই করিয়াছে। আজ আঘাত-প্রাপ্ত মনটা একেবারেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। সে জানালা-পথে বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া আনমনাভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "জানো ইলা, আমি পরশু কোথা গিয়েছিলুম, ফিরতে রাত একটা বেজেছিল কেন?"

ইলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "কি করে জানব বল? আমি তো তোমার জান নই যে, কোথায় গেলে, কি করলে, কার কথা ভাবছ, এ সব জানতে পারব? তুমি কোন কথা বলও না, আমিও কোন কথা জানতে চাইনে, বাস, ফুরিয়ে গেল।"

সত্য খানিকক্ষণ নির্নিমেষে ইলার অনিন্দ্যসুন্দর, পবিত্র, সরল মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল। ইলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বাঃ, অমন করে মুখের পানে চেয়ে কি দেখছ বল দেখি? কি কথা তা বলা নেই, শুধু আমায় বসিয়ে রেখে হাঁ করে চেয়ে থাকা। দেখতে যেন আর পাই না, তাই এই কাজের দিনে সকল কাজের ক্ষতি করে,—না বাবু, আমায় ছেড়ে দাও, ছেলেমানুষি করতে গেলে আমার এখন চলবে না।"

সত্য তাহার হাতখানা টানিয়া ধরিল, "না, উঠ না, বস। আমি সেদিন দেশে আমাদের বাড়ী গিয়েছিলুম।"

"বাড়ী গিয়েছিলে? সে তো ভাল কথা, খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু জানিয়ে গেলে সত্যি যতটা আনন্দ পেতুম, না জানিয়ে যাওয়ায় ততটা আনন্দ পেলুম না। আমি কি তোমায় মানা করতুম, দেশে যেতে দিতুম না বলে মনে কর? তুমি তোমার কর্ত্তব্য মনে করে যা করবে তাতে বাধা দেব সে রকম স্ত্রী আমি নই। স্ত্রীরও কর্ত্তব্য আছে, স্বামীকে সে তাঁর কর্ত্তব্য পালনে তৎপর করবে, তাঁকে এগিয়ে দেবে, তাঁকে সব রকমে সাহায্য করবে। তুমি কি মনে করেছিলে, আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করতুম না?"

ইলার কোমল হাত দুখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া বিশুষ্কমুখে সত্য বলিয়া উঠিল, "আমি মহাপাপ করেছি ইলা, তোমায় আমি বড় প্রতারণা করেছি। উচ্চাশার মোহে তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, তাই কাউকে কোনও কথা বলতে পারি নি। আমার পাপের দহন আরম্ভ হয়েছে, জ্বালা আর বুকে পূরে রাখতে পারছি নে।"

ইলা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ভয় পাইল। হাত দুখানা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "কি প্রতারণা করেছ তুমি? যত দিন আমাদের বিয়ে হয়েছে,

তত দিন তোমার প্রতারণার একটা চিহ্নও তো আমাদের চোখে পড়ে নি !"

উন্মত্তের মত হাসিয়া সত্য বলিল, "বিশ্বাস করবে না, কিন্তু জানলে বিশ্বাস করতে হবে ইলা। আমায় ক্ষমা কোরো না ; কেন না, ক্ষমা পাওয়ার মত কাজ আমি করি নি। আমি বিবাহিত, আমার সে স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান : তার সঙ্গেই দেখা করতে আমি দেশে গিয়েছিলুম। তুমি সে বিয়ের কথা, সে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকার কথা গোপন করে তোমায় বিয়ে করেছি। এবার কি বুঝছ ইলা—তোমায় কতখানি প্রতারণা করেছি, নিশিদিন কতখানি করে মিথ্যার জের টানতে হচ্ছে ?"

ইলার মুখখানা শবের মত মলিন হইয়া গেল। খানিকক্ষণ সত্যর পানে ফেল ফেল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া সে সত্যর বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া দিয়া ক্ষুদ্র বালিকার মত হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সত্য নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার নিশ্চল হাত দুখানা চেয়ারের দুইধারে ঝুলিতেছিল। বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অভাগিনীর মত যে তরুণীটি কাঁদিতেছে, তাহাকে স্পর্শ করার অধিকার, সে যেন ওই কথাটী বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে মানস-চক্ষে দেখিতেছিল, কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে ; সমাজের সকলেই তাহাকে ঘৃণার চোখে দেখিতেছে ; কারণ, সে প্রতারক। ইলাও যেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া বহুদূরে চলিয়া গেল ; ইলার সান্নিধ্য সে আর জীবনে পাইবে না। এ সংসারে সব পাইয়া নিজেদের বুদ্ধির দোষে যাহারা আবার সব হারাইয়া ফেলে, সে যেন সেই লক্ষ্মীছাড়া সকলহারার দলে পড়িয়া গেল।

হাঁ, এই তাহার যোগ্য পুরস্কার। সংসারে কে বলে পাপ-পুণ্যের বিচার নাই ! ভগবানের চোখকে কে এড়াইতে পারে,—তাই পাপীর দণ্ড পুণ্যের জয় অনিবার্য্য।

হঠাৎ ইলা শান্তভাবে মাথা তুলিল। অশ্রুসিক্ত চোখে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমি সত্যি কথা বলছ ? এ মিথ্যে কথা নয় ? আমায় মিছে করে ক্ষেপাবার জন্যে—"

বাধা দিয়া তেমনি গম্ভীর মুখে সত্য বলিল, "তাই কি হতে পারে ইলা ? এত বড় একটা ব্যাপার নিয়ে খেলা করা মোটেই চলে না। আমি যা বলছি সবই সত্যি। এতদিন যা করেছি সব মিছে ; আজ যা বলছি এই সত্যি। এতদিন বুকের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলুম ; আর পারলুম না ; তাই প্রকাশ করে ফেললুম। তুমি এখনি বীথির কাছে যাও ইলা, সে—যা সত্যি তাই বলবে, তার কাছে সব শোনো গিয়ে।"

বিস্রস্ত বসন সংযত করিয়া চোখ মুখ ধুইয়া ফেলিয়া বিনা সাজসজ্জায় ইলা তখনই মোটরে গিয়া উঠিল।

বীথিদের বাড়ীতে বীথি তখন রন্ধনগৃহের বারাণ্ডায় একটা ছোট মোড়া পাতিয়া বসিয়া রাঁধুনীটিকে রন্ধন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিতেছিল। মায়া হাঁ করিয়া এই নূতন কর্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব দেখিতেছিলেন। এখানে আসিয়া বীথি আস্তে আস্তে সকল ভারই নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল ; আস্তে আস্তে এই গৃহবাসীদের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে সংযমের বাঁধন পরাইয়া বশ করিতেছিল। মায়া তাহার ফাঁদ বুঝিতে পারেন নাই ; মাতৃস্নেহে অন্ধ হইয়া ফাঁদে পা দিয়াই জড়াইয়া পড়িয়াছেন। আর এখন সে পা টানিয়া তোলা শক্ত। আর টানিয়া তুলিতেও যথার্থই তাঁহার তেমন ইচ্ছা ছিল না ; একপক্ষে তিনি বেশই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বীথির মধ্যে একটা সুন্দরতার বিকাশ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন ; নিজেকে তাহার হাতে তিনি সহজেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রনাথও খুসি হইয়াছিলেন বড় কম নয়। মায়ার নজরটা বড় উঁচু ধরণের ছিল। যত আয় হইত, তাহার বেশী ব্যয় করিতে পারিলে তিনি ছাড়িতেন না। আজ ডিনার পার্টি, কাল টি পার্টি, অমুকের ছেলের বিয়ে, অমুকের মেয়ের বিয়ে—এই এই জিনিস দরকার, এই সব খরচে দেনা যে বাড়িতে বাড়িতে অনেকই হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার হিসাব মায়া না রাখিলেও জিতেন্দ্রনাথ রাখিতেন। তাঁহার জিহ্বা আমূল শুকাইয়া উঠিত। বীথি একেবারেই এই অন্যায় খরচগুলি উঠাইতে পারে নাই ; আস্তে আস্তে কমাইতে কমাইতে এখন এই বেশী খরচগুলা অতি সংক্ষেপেই সারিয়া ফেলে। ইহাতে সমাজে নিন্দাও হয় না, মানও থাকে ; অথচ জিতেন্দ্রনাথও বাঁচিয়া যান। মায়া অবাক হইয়া দেখেন, তাঁহার কন্যা হইয়া বীথি এমন কর্ত্তৃত্ব শিখিল কেমন করিয়া। কেহই তো তাহার অবাধ্য হয় না ; এমন কি তিনিও আর সাহস করিয়া তাহাকে একটা কথা বলিতে পারেন না।

ঝড়ের মত ইলা সেখানে গিয়া পড়িল। তাহার আরক্ত মুখ, বিস্ফারিত জলভরা দুটি চোখ,—এ রকম

অসংযত ভাবে সে কখনই এ বাড়ীতে এমন অনাহূতের মত আসিয়া পড়ে নাই। মায়া অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। বীথি মোড়া ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "এ কি কাকি-মা, এই দুপুরে এমন করে এমন বেশে হঠাৎ তুমি এসেছ যে ?"

বীথির হাতখানি শক্তভাবে মুঠা করিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ইলা বলিল, "ঘরে একবার চল দেখি বীথি, তোমার কাছে আমার এখনি বিশেষ দরকার; আমার একটুও দাড়াবার অবকাশ নেই, চল।"

তাহার ভাব দেখিয়া বীথি কিছুই বুঝিতে পারিল না। ইলা তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে একটা কক্ষমধ্যে লইয়া গিয়া দরজাটা আগেই বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর বীথির দিকে ফিরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি বীথি! এ কি সত্যি না মিথ্যে, তা আমি কিন্তু বুঝতে পারছি নে। তোমার কাকা সত্যিই আগে বিয়ে করেছিলেন, সে স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান আছে ?"

বীথি তাহাকে নিজের বিছানাটায় বসাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "এখানে বসো আগে, আমি তার পর তোমায় সব কথা বলছি। তুমি যে কথা ভেবে যতটা অধৈর্য্য হচ্ছো, ততটা হবার কথা নয়। তুমি ভাবছ তোমার স্বামীর ওপর সে স্ত্রীও তার দাবী করবে, এই বিষয়টা নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটবে, সে ভয় অনর্থক। আমি সব কথা তোমায় বুঝিয়ে বললে, তুমি বুঝতে পারবে বলেই আশা করি।"

ইলা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বীথি দাসীকে এক গ্লাস জল আনিতে আদেশ করিল।

এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের সব জলটা পান করিয়া ফেলিয়া ইলা রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "কি বলবে বল।"

বীথি শান্তকণ্ঠে বলিল, "এ ব্যাপার নিয়ে তোমাদের কেলেঙ্কারী একটুও হবে না, সে কথা আমি তোমায় ঠিকই বলছি। আমার সে সাক্ষাৎ দেবীরূপিনী দেবী কাকীমাকে তুমি নিজের চোখে দেখতে পাও নি; দেখলে অন্তর দিয়ে তাঁর অন্তরের পরিচয় পেয়ে তুমিও ধন্য হয়ে যেতে। ইলা কাকি, ভারতবর্ষ সতীর দেশ, হিন্দুনারী ত্যাগের আদর্শ সে কথা জানো কি? হিন্দুনারী হাসতে হাসতে স্বামীর চিতার পাশে বিছানা পাতে, স্বামীর সুখের জন্যেই স্বামীকে ত্যাগ করেও বেঁচে থাকে। এ সেই দেশ—স্বামী মরে গেলেও যে দেশের মেয়েরা স্বামীর স্মৃতি মনে জাগিয়ে রেখে আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যায়। এ সেই দেশ—যে দেশে ধ্রুবের মায়ের মত রাজরাণী বনে গিয়ে বাস করে, সকল কষ্ট সহ্য করে,—যেন স্বামীকে উৎপীড়িত হতে না হয়। কাকি, তুমি চোখে দেখনি, পড়েছ মাত্র, আমি চোখে দেখেছি। আমি চোখে দেখেছি ভারতের বশিষ্ঠ—যিনি সব দেওয়ার পথে অসীম ধৈর্য্যকে বুকে নিয়ে চলেছেন, সময় সময় ক্ষণিকের জন্যে মায়ার আত্মবিস্মৃত হয়েও চমকে তখনি হৃদয়কে সংযত করেছেন। কাকি, আমি চোখে দেখেছি ভারতের আদিযুগের সেই তপোবন, আমি চোখে দেখেছি সীতার মত—সাবিত্রীর মত সতী নারী। আমি চোখে দেখেছি তার নিষ্কাম কর্ম্ম, তার অসীম ত্যাগশীলতা; তাই তোমায় অভয় দিচ্ছি তুমি ভয় পেয়ো না। সে তার স্বামীর জন্যেই স্বামীকে ত্যাগ করেছে, তার স্বামীকে তোমায় দান করেছে। তার স্বামী তার বাইরে এখন নেই, সে তার অন্তরে স্থান পেয়েছে। তোমার স্বামীর স্পর্শও এখন তার অসহ্য। তার আত্মসুখ বলে অনুভূতি আর নেই, নিজের অন্তরের দেবতার ধ্যানে সে আত্মহারা; বাইরের জগতের ডাকে সে আর সাড়া দেবে না। সে নিজেকে জগতের চোখে লীন করে ফেলেছে; সে প্রকাশ হবে না, কেউ তাকে প্রকাশ করতে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও কাকি, সে পরিচয় দেবে না সে কাকার স্ত্রী, সে কাছেও আসবে না। এমন মহান যে, এমন স্বার্থত্যাগ যার, তাকে তুমি ভয় করছ কেন ?"

ইলা একেবারে নিভিয়া গিয়াছিল; জড়িতকণ্ঠে বলিল, "তাঁর এমন করে সর্ব্বনাশ করা কেন ?—" অপরিচিতা সেই মেয়েটীর জন্য সত্যই তাহার কষ্ট হইতেছিল।

বীথি একটু হাসিয়া বলিল, "এ সংসারে মেয়েদের সুখ দুঃখের পানে চায় কে ইলাকাকি? তুমি যদি জোর করে নিতে পার তা হলে পাও, যদি জোর না করতে পার—আশ্রিতা লতাটীর মত জড়িয়ে থাক, সে তোমায় দু'পায় দলবেই।" খুব গোপনেই সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ইলার মুখে করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, "আহা, আগে যদি আমায় একটীবার জানাতে বীথি, আমি কখনই তাঁকে

তাঁর স্বামীকে হারানোর সুযোগ দিতুম না। যত অনিষ্টের মূল আমি।"

বীথি শান্তভাবে বলিল, "ও ধারণাটা করা একেবারেই ভুল কাকি; কারণ, কেউ কারও সুখ-দুঃখের হেতু হতে পারে না। ও কি, উঠলে যে,—এসো—কিছু খেয়ে যাও।"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে ইলা বলিল, "মাপ কর বীথি, আজ নয়, কাল এসে খাব। কাল আমি নিজেই এসে খেয়ে যাব, তোমায় নিমন্ত্রণ করতে হবে না। আজ অনেক কাজ আছে, এখনি যেতে হবে, এক মিনিট দেরী করবার সময় আমার নেই।" যেমন ঝড়ের বেগে সে আসিয়াছিল, তেমনি ঝড়ের বেগে সে ছুটিয়া গেল।

সত্য তখনও সেই চেয়ারখানায় তেমনিই আড়ষ্ট ভাবে পড়িয়া। তাহার মুখখানা বড় মলিন, চোখ দুইটী আরক্ত। অধীর ভাবে সে মাথায় হাত বুলাইতেছিল; এখন তাহার কর্ত্তব্য কি তাহাই সে ভাবিতেছিল।

দুপদাপ করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া ইলা তাহার পার্শ্বে নিজের পূর্ব্ব-অধিকৃত স্থানটীতে বসিল,—"রাগ করেছ আমার কথায়?"

একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া সত্য বলিল, "না, রাগ করবার শক্তি আমার কোথায় ইলা? আমি আমার বিয়ের আগে হতে এই ঝড়টারই প্রতীক্ষা করছিলুম। এমনি একটা দুর্য্যোগের ছবি আমার মনে অনেক আগে হতেই আঁকা আছে। আজ আমি ভাবছি—আমায় যে যেতে হবে! কোথায় যাব, ভাঙ্গা তার নিয়ে কোন্ হাটে গিয়ে বসব?"

রুখিয়া উঠিয়া ইলা বলিল, "কোথায় যাবে? আমায় যে বিয়ে করেছ তা বুঝি মনে নেই?"

মলিন হাসিয়া সত্য বলিল, "সে সম্বন্ধ যে যাচ্ছে ইলা।"

"কে বললে যাচ্ছে? এই যে আমি তোমার কাছেই রয়েছি," ইলা সত্যর বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিল, "যাবে কোথায়? যেখানে রয়েছ এইখানে—এই সম্মানের মধ্যেই তোমায় আজীবন কাটাতে হবে—আমার আদেশ।"

গভীর আবেগে সত্য তাহার মুখখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। একটা কথা বলিবার শক্তি তাহার তখন ছিল না।

ইলা ধীরে ধীরে মুখ তুলিল। ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার কোন দোষ নিই নি। কিন্তু একটা কথা আছে।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সত্য বলিল, "কি কথা ইলা?"

"আমি আসছে সপ্তাহে বীথিকে নিয়ে সেখানে দিদিকে দেখতে যাব। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে, যাবে তো?"

সত্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। ইলা সেখানে যাইবে! তাহার দেশে যাইবে! কাহাকে গিয়া সে দেখিবে? অভিভূত সত্য তাহার পানে শুধু তাকাইয়া রহিল।

ইলা একটু হাসিয়া বলিল, "চুপ করে থাকবার মত কথা নয় এটা। আচ্ছা, এক সপ্তাহ ধরে ভেবে নাও। আমি চললুম। আজ বউদি আসবে, সব ঠিক করে রাখি গিয়ে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখখানা দেখে ভাবটা বদলে নাও,—বউদি যেন একটুও মলিনভাব না দেখতে পায়, সাবধান। আমি এসব কথা আর কাউকেই জানাতে চাই নে, মনে রেখ।"

সে চলিয়া গেল।

৩১

দিন আর কাটে না যে।

অসহ্য যন্ত্রণায় দেবী ছটফট করিতেছিল। স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপর একটা মাদুর বিছানো, তাহার উপর একটা কাঁথা পাতিয়া সে পড়িয়া ছিল।

আজ দশ বার দিন তাহার অসুখ। সর্দ্দি বুকে বসিয়া গিয়াছে; বুকে পিঠে অসহ্য ব্যথা। সে বেশ বুঝিতেছিল তাহার ডবল নিউমোনিয়া হইয়াছে, সে আর বাঁচিবে না। এ সময়ে তারাও এখানে ছিলেন না। অসুখে পড়িলে তিনি দেবীকে দেখা শুনা করিতেন। কিছুদিন আগে তিনি কাশী চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথামত বাড়ীর একটী মেয়ে দেবীকে দেখাশুনা করিত, পথ্যাদি আনিয়া দিত—এই পর্য্যন্ত।

সব অন্ধকার! দেবীর চোখের সম্মুখে যেমন অন্ধকার, মনের মধ্যে তেমনি অন্ধকার! আকুলি বিকুলি চাহিয়া, আলো দেখিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া, শেষটায় দেবী আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "আর যে সয় না মা! আমায় ডেকে নাও তোমার কাছে, কেন আমায় এত যন্ত্রণা দিচ্ছ?"

আজ মনে পড়িতেছিল মায়ের অস্পষ্ট মূর্ত্তিখানা। কবে—কতকাল আগে সে তাহার মাকে দেখিয়াছিল, আজ সে কথা মনে নাই; কিন্তু আজও তাহার মনের স্মৃতিফলকে মায়ের অস্পষ্ট মূর্ত্তিখানা ছবির মতই মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠে। আজ বড় বেদনায় সান্ত্বনাদাত্রী, সর্ব্বসন্তাপহারিণী সেই মাকে ডাকিয়া অভাগিনীর মতই মুক্তকণ্ঠে সে কাঁদিতে লাগিল।

এ জীবনে সুখ তাহার মোটেই লাভ হয় নাই। তাহাকে ভালবাসিতে, স্নেহ করিতে যে যে ছিল, আজ তাহারা সকলেই অনন্তের পথে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কেহ নাই যে তাহার তৃষ্ণার্ত্ত মুখে একফোঁটা জল দেয়, কেহ নাই যে তাহার বিছানার পাশে বসিয়া স্নেহপূর্ণ হাতখানি তাহার ললাটে রাখে, দুইটা স্নেহের কথা বলে। উঃ, কি ভীষণ এই রোগশয্যা। দেবী ছট্‌ফট করিতেছিল।

বীথির কথা মনে জাগিয়া উঠিল। হায়, সে তাহাকে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে, সেও তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে; সে আবার আসিবে বলিয়া গিয়াছিল, কই,—আর তো ফিরিয়া আসিল না। নিঠুরা—; হাঁ, নিঠুরা বই কি! উহাদের সকলেরই মন পাষাণ অপেক্ষা কঠিন বস্তুর উপাদানে প্রস্তুত; কেন না, পাষাণও গলিয়া নির্ঝরের সৃষ্টি করে; কিন্তু ইহাদের মন গলে না। হায় রে মানুষ, তোমরা শুধু লইতেই জানো—কিছু দিতে জানো না। তোমরা অভাগিনী নারীর যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া গিয়াছ, তাহাকে দান করিয়া গিয়াছ শূন্যতা—সে শুধু আজীবন কাল হাহাকার করিবার জন্যই। মৃত্যু,—ওগো প্রিয়সখা, কোথায় তুমি? এসো বন্ধু, এসো, আর যে ভাবিতে পারা যায় না! মাথার মধ্যে সব যে গোলমাল হইয়া যায়! এসো বন্ধু, সকল ব্যথার, সকল ভাবনার অবসান করিয়া দিতে তুমি ছাড়া আর যে কেহ নাই। তোমার শীতল আলিঙ্গনে তপ্ত দেহখানা জুড়াইয়া দাও প্রিয়তম, শান্তিহীনার বক্ষে শান্তি দাও।

জ্ঞান হারাইয়া দেবী পড়িয়া রহিল।

হঠাৎ কখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল মানুষের কণ্ঠস্বরে। কে তাহার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়াছে, এ কাহার অশ্রু ঝরিয়া তাহার ললাটে পড়িতেছে? ওগো, কে—কে তুমি? এমন কোমল শান্তিময় হাত বুলাইতেছ তাহার তপ্ত বুকের উপর, বেদনা মিলাইয়া যাইতেছে, জ্বালা জুড়াইয়া যাইতেছে, ওগো,—কে—কে তুমি? কোন্ স্বর্গ হইতে এই জ্বালাময় ধরার বুকে নামিয়া আসিলে গো দেবী?

সে জোর করিয়া ঠেলিয়া উঠিতে গেল, হায় রে, সে যে সকল শক্তিই হারাইয়া ফেলিয়াছে।

"কাকি মা—"

"কে রে, কে তুই, কে ডাকলি আমায়? তোকে যেন চিনেছি—তবু যেন চিনতে পারছিনে। তোর স্বর আমার এই বুকের মাঝে কোথায় লুকিয়ে আছে, বুঝতে পারছি—তবু তো ধরতে পারছি নে। ওরে, কে ডাকলি আমায়, একবার নামটা বল, দেখি—হিসেব করে দেখি—মনে করে দেখি, তোকে চিনতে পারি কি না।"

"কাকি মা, আমি বীথি।"

বীথি এবার উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বড় শান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবী শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, "আঃ, তুমি বীথি! তুমি এসেছ মা! মরণ তা হলে এমনি চুপে চুপে এসে আমায় নিয়ে যেতে পারবে না, অন্ততঃ একজনও জানতে পারবে আমি চলে গেলুম। একটু আগে নিজেকে বড় অসহায়া ভাবছিলুম বীথি, এখন আর তা ভাবছি নে। আমার মৃত্যুশয্যা বড় রমণীয় হয়ে উঠেছে তোমার স্পর্শে, সত্যি এবার বড় শান্তিতেই আমি মরতে পারব। তোমার চোখের জল আমার কপালে ঝরে পড়ছে মা, জেনে গেলুম—আমার জন্যে কাঁদতে—আমার কথা ভাবতে তুমি আছ।"

অনেকগুলা কথা বলিয়া সে হাঁফাইতে লাগিল।

বীথি চোখ মুছিতে মুছিতে কান্নাভরা সুরে বলিল, "আমরা যে তোমায় নিয়ে যাব বলে এসেছিলুম কাকি মা।"

মৃত্যু-শয্যাশায়িনীর বিবর্ণ মুখে হাসির রেখা নিমেষের তরে ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল, "এ যে আমার চিরপ্রার্থিত তীর্থ মা, এ তীর্থ ছেড়ে এ দেহে আমার আর কি কোথাও যাওয়ার যো আছে? বিয়ে হয়ে এসে পর্য্যন্ত আজ তের বছরের মধ্যে একটা দিন আমি এ ভিটে ছেড়ে কোথাও যাই নি। তোমার কাকা চলে গেলে আমার দাদা আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে কতবার এসেছিলেন; আমার এক পা নড়বার ক্ষমতা হয়নি যে বীথি। জীবনে জ্ঞানে এ ভিটে

ছাড়িনি মা, অন্ধ মরণ এসে তার স্পর্শ দিয়ে আমায় ভিটে-ছাড়া করবে, তার আগে নড়ব না।"

আকুল কণ্ঠে বীথি বলিল, "তুমি যে মরবেই, এ কথা তোমায় কে বললে কাকি মা?"

দেবী উত্তর দিল, "বলছি আমি নিজে। কত আরাধনার পর আমার প্রিয়কে আজ কাছে পেয়েছি, আর কি ছাড়তে পারি মা? বড় ক্ষোভ রইল শুধু—"

উৎকণ্ঠিতা বীথি বলিল, "কি ক্ষোভ কাকি মা?"

"তাঁর সঙ্গে যাওয়ার বেলায় দেখা হল না। আমি যে বলে দিয়েছিলুম বীথি, চিরবিদায়ের সময় যেন দেখা পাই,—" তাহার মুদিত নেত্রকোণ বাহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

বীথি নিজের অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "কাকা তো এসেছেন কাকি মা।"

ব্যগ্রকণ্ঠে বীথি বলিল, "একটীবার দেখাও বীথি। অন্তর ছেড়ে আজ বাইরে তাঁকে দেখি। যাওয়ার বেলায় পায়ের ধুলো নিয়ে যাই। প্রার্থনা করে যাই—যদি পরজন্ম থাকে সে জন্মে যেন তাঁর উপযুক্তা স্ত্রী হয়ে জন্মাতে পারি, সে জন্মে তাঁর পাশে যেন আমারই আসন থাকে।"

বীথি কান্না চাপিতে চাপিতে বলিল, "কাকি মা, নতুন কাকিও এসেছেন।"

আবার একটু হাসি মুমূর্ষুর অধরে ফুটিয়া উঠিল, "আমায় একটু উঠিয়ে দাও বীথি, প্রাণভরে একবার সকলকে দেখে নেই, আমার এ জনমের সকল সাধ মিটে যাক। আর তো দেখতে পাব না মা, আর দেখতেও চাইব না।"

বীথি সন্তর্পণে তাহাকে তুলিয়া নিজের বুকের মাঝে ধরিয়া বসাইল। সত্য সম্মুখেই বসিয়া ছিল; নিজেকেই দেবীর এই অকাল-মৃত্যুর কারণ জানিয়া অনুতাপে তাহার বুকখানা শতধা হইয়া যাইতেছিল।

ক্ষীণ রুদ্ধ কণ্ঠে দেবী বলিল, "আঃ, এই যে তুমি এসেছ। ওগো, তুমি বড় দয়ালু, আমার শেষ কথাটী রেখেছ। আমি তোমায় শেষ একবার দেখব বলে কত ডাক যে দিয়েছি, তার ঠিক নেই; আমার সে ডাক কি তোমার মর্ম্মে পৌঁচেছে দেবতা আমার! দাও, তোমার পায়ের ধুলো জন্মের মত শেষবারটী আমার মাথায় দাও, আমার জীবন মরণের তীরে দাঁড়িয়ে সার্থকতা লাভ করুক, ধন্য হয়ে যাক। দাও, লজ্জা কি, ভয় কি। আজ আমি মরণের তীরে দাঁড়িয়ে,—একটী ঢেউ এলেই মিশিয়ে যাব, তারই প্রতীক্ষমানা। আজ তোমার আমার মধ্যে এতটুকু অন্তরায় নেই, আজ তোমায় আমায় মহামিলনের দিন, তোমার চরণে আজ আমি লীন হয়ে যাব। এসো, কাছে এসো, আমার পাশে বসো,—পায়ের ধুলো দাও।"

ইলা বিগলিত কণ্ঠে বলিল, "যাও, এগিয়ে যাও। উঃ, কি হৃদয়হীন তুমি, একটী অমূল্য জীবন ব্যর্থতার যাঁতায় পিষে এমন করেও পিষ্ট করলে!"

সত্য কম্পিতহস্তে পায়ের ধূলা দেবীর মাথায় দিল।

"ও কি, তুমি কাঁদছ কেন? না—কেঁদ না, আজ বড় আনন্দের দিন,—আজ আমি পৃথিবীর কাছ হতে বিদায় নিয়ে আনন্দলোকে আনন্দময়ের চরণতলে বিশ্রাম করতে যাচ্ছি। এ দিনে চোখের জল ফেল না, বিষণ্ণতা এন না, তোমরা হেসে আমার পথ আনন্দভরা করে দাও। কই দিদিমণি, তুমি কোথায়? একবার আমার সামনে এসো বোন, তোমায় দেখি।"

ইলা তাহার পায়ের কাছে মাথা নোয়াইতে গিয়া ক্ষুদ্র বালিকার মতই উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কম্পিত শীর্ণ হাতে তাহার হাতখানা টানিয়া কোলে তুলিবার চেষ্টা করিয়া দেবী বলিল, "ছিঃ, কেঁদ না বোন, তুমি অস্থির হয়ো না, তোমার স্বামীকে সান্ত্বনা দাও।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ইলা বলিয়া উঠিল, "দিদি, আমারই স্বামী, তোমার কেউ নয়?"

দেবী বীথির বুকের মধ্যে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আজ এতদিনকার দ্বিধা-সঙ্কোচের অবসান করে দিয়ে যাচ্ছি বোন। সংসারে আমারও স্বামী ছাড়া আর কেউ ছিল না—আজ এই মহাপ্রস্থান মুহূর্ত্তে আমার স্বামীকে আমি তোমার হাতেই দিয়ে গেলুম।"

চোখ অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল; হাত এত কাঁপিতেছিল যে, সে হাত স্থির রাখিতে পারিতেছিল না; তথাপি সে প্রাণপণে সত্যর হাতখানা চাপিয়া ধরিল। তাহার হাতের উপর ইলার হাতখানা রাখিয়া জড়িতকণ্ঠে সে বলিল, "আজ তোমাদের যথার্থ বিয়ে হয়ে গেল, তোমাদের যথার্থ মিলন হয়ে গেল। তোমাদের মাঝখানে আমি থাকব, আমার শক্তি তোমরা পাবে।"

মুখ ফিরাইয়া সে ডাকিল,—"বীথি"—

মূর্চ্ছার লক্ষণ দেখিয়া বীথি তাহাকে তাড়াতাড়ি শোয়াইয়া দিল।

হায়, সেই মূর্চ্ছাই তাহার শেষ মূর্চ্ছা। মূর্চ্ছার মধ্যে প্রাণটা সতীর পবিত্র দেহ ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে স্বর্গের পথে মহাপ্রস্থান করিল। সত্য নিষ্পলকে চাহিয়া দেখিতেছিল—তখনও সতীর মুখে সেই স্বর্গীয় মৃদু হাসির রেখা। বীথির চোখের জল ঝর ঝর করিয়া মৃতার ললাটের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"যাও মা সতীরাণী,যাও মা দেবীরাণী, মর্ত্ত্য তো তোমার মত মেয়ের জন্যে সৃজিত হয় নি, তুমি যে স্বর্গের ফুল মা। পৃথিবীতে এসে আজীবনই দুঃখই পেয়েছ, যাও মা, আনন্দধামে গিয়ে বিশ্রামলাভ কর গিয়ে।"

ইলা মৃতার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "যাওয়ার বেলায় আশীর্ব্বাদ করে যাও দিদিমণি, যেন তোমার মত হৃদয় আমি পেতে পারি, তোমার মত ত্যাগশীলা—সত্বশীলা হতে পারি, তোমার মত স্বামীকে ভালবাসতে—ভক্তি করতে পারি।"

স্বামীর হাত ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "তুমি বাইরে যাও। শঙ্কর লোকজন ডাকতে গেছে, তোমার এ সময়ে এখানে থাকতে হবে না।"

মুহ্যমান সত্য ছায়ার মতই উঠিল।

সমাপ্ত

শিকারী

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

অস্তিত্ব

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি-এ

(শেষার্দ্ধ)

হিন্দু মনীষিগণের মতে এই ব্রহ্ম বা চরম সত্তা সকল সীমা ও সঙ্কীর্ণতার বহির্ভূত। ইনি অজর, অমর, অক্ষয়; ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালে সমভাবে বর্ত্তমান; সমশক্তি-সম্পন্ন, সর্ব্বগুণ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী অনাদ্যন্ত মহাপুরুষ।

বেদব্যাস তাঁহার বেদান্ত-দর্শনে সূক্ষ্ম তত্ত্বের যে বিচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—"প্রথমে এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মাত্রই ছিলেন। তাঁহা হইতে প্রকৃতি উদ্ভূত হয়। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণে বিকশিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। প্রথম—মায়া, দ্বিতীয়—অবিদ্যা। মায়াশ্রিত চৈতন্য ঈশ্বর এবং অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্য জীব। এই অবিদ্যার পরপারে জীবের মুক্তাবস্থা। বেদান্তের মতে জগতের বাস্তব ও স্বরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। অবিদ্যার বশীভূত জীব রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় বিশ্বের অস্তিত্ব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে মাত্র, ইহাই প্রচারিত হইয়াছে। তাহা হইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধ-দর্শনের মতেও বাহ্য বস্তু মাত্রই অলীক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তবে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সকল বস্তুই ক্ষণিক এবং আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অবশ্য মহর্ষি কপিল তাঁহার সাংখ্য-দর্শনে যে মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত মতবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে, ঈশ্বর বলিয়া কোন কিছু আছে, তাহা আদৌ বিশ্বাস্য নহে। কারণ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মাত্র কাল্পনিক প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া বা দেওয়া অসম্ভব। পুরুষ নিত্য ও অকর্ত্তা। বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন পুরুষ। কারণ, পুরুষ যদি এক হইত, তাহা হইলে একের অবসানে সকলেরই অবসান বা একের বিকাশে সকলেরই সমভাব ও অবস্থার বিকাশ হইত।

"জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ-বিপর্য্যয়াচ্চৈব॥ ১৮॥"

(সাংখ্যকারিকা।)

বিশ্বজগৎ মিথ্যা বা মায়া নহে। ইহা বাস্তব অস্তিত্বযুক্ত পদার্থ এবং ইহার সহিত আমাদের জীবনের ও সুখ-দুঃখাদির সম্বন্ধ আছে।

মহর্ষি পতঞ্জলির পদার্থ নির্ণয়ও সাংখ্য-দর্শনেরই বিশেষ অনুরূপ। তবে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু কপিল, চার্ব্বাক প্রভৃতির মতে অস্তিত্ব বিচারের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, অনেক প্রশ্ন অবিচারিত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। কারণ, কর্ম্মের ফলাফল, পাপপুণ্যের বিচার ও তদনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার ইত্যাদি আমাদিগকে অবিশ্বাস করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে যদি পাপ-পুণ্যের কোন ভেদাভেদ না থাকে, তাহা হইলে আমাদের অনুষ্ঠানাদি মূল্যহীন এবং সুখ-দুঃখ স্বেচ্ছাকৃত বস্তু বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহাই যদি হয়, তবে আমরা ইচ্ছামত সুখী বা সুফলভোগী হইতে পারি না কেন? আমাদের জন্ম হইতেই প্রায় আংশিকভাবে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অবস্থা লইয়াই বা জন্মগ্রহণ করি কেন? জীবনের সুখ-দুঃখের উপর আমাদের কর্তৃত্ব স্বাধীন ভাবেই থাকা উচিত ছিল।

পাশ্চাত্য দর্শনে Ethics-এর অন্তর্গত যে "Reward and Punishment" theory উক্ত হইয়াছে, তাহার মতেও আমাদের কর্ম্ম ও পাপ-পুণ্যের উপর আধিপত্যকারী কোন শক্তি যে সর্ব্বদাই আমাদের কর্ম্মের উপর লক্ষ্য রাখিয়া জন্ম-জন্মান্তরের গতিবিধি নির্ণয় করিয়া দিতেছেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। বৈশেষিক মতেও এই "Reward and Punishment theory'র ন্যায়ই "ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারা সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়" ইহা স্বীকার করা হইয়াছিল। শৈব দর্শনেও ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, "জীবের কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বর ফল প্রদান করেন।" তবে শৈব-দর্শন, নকুলীশ পাশুপত দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন ও রসেশ্বর দর্শন ইত্যাদির মতে মহাদেবকেই জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

তাহাতে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; কারণ, তাহাতে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য বিষয়ে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। মহাদেব, ব্রহ্ম বা নারায়ণ—যে নামের উপরেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হউক না কেন, মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।

অধিকাংশ দার্শনিক মতেই এই ঈশ্বরের সম্পূর্ণতা (Perfectness) ও অসীম আধিপত্য স্বীকার করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন আসিতে পারে এই যে—উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ভিন্ন কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। প্রত্যেক কর্ম্মেরই উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বা Perfect ঈশ্বর—কিসের অভাব, কি উদ্দেশ্য এবং কোন প্রয়োজনীয়তার বশবর্ত্তী হইয়া এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ও তদ্বিকাশ রূপ ক্রীয়ায় রত আছেন ? তাঁহার এবম্বিধ ক্রীয়ার কোন মহান্ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনিও প্রয়োজনীয়তার গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ। প্রয়োজনীয়তার গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ হইলে তাঁহাকে আমরা সম্পূর্ণ বা Perfect বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

কিন্তু প্রকৃত বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, এবম্প্রকার ক্রীয়া বা বিকাশ তাঁহার কোন অভাব ও প্রয়োজনীয়তার প্রেরণায় সাধিত হইতেছে না। বরং এই সৃষ্টি ও বিকাশ-কর্ম্ম না থাকিলেই তাঁহার মধ্যে মহান্ শক্তির অভাব হইয়া তিনি অসম্পূর্ণ হইয়া পড়িতেন। সৃজন, পালন, লয় তাঁহার আত্ম-সম্পূর্ণতার অংশ ; তাঁহার সর্ব্বশক্তি-সম্পন্নতার প্রধান অঙ্গ। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশে সম্পূর্ণ অবয়ব গঠিত হইয়াছে, তেমনই পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাদির সাধন তাঁহার সর্ব্বশক্তি-সম্পন্নতা ও সম্পূর্ণতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহারই অসীমত্বের পরিপূর্ণতা সাধন করিতেছে। এগুলি কর্ম্মরূপে তাঁহার মধ্যে অবস্থান করে না। তিনিই কর্ত্তারূপে ইহাদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া আছেন। অর্থাৎ এগুলিও কর্ত্তাভাব। সর্ব্বস্বই তাঁহার মধ্যে অবস্থিত—তাঁহারই নিজস্ব ভাব। পাশ্চাত্য দার্শনিক Berkeley (বার্কেল) এবং Hegel (হেগেল)এর Subjective ও Objective Idealism গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলেও ঐরূপ সিদ্ধান্তের আভাষ আমরা তাহার মধ্যে পাই। তবে তাহা সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ।

পাশ্চাত্য দর্শনের প্রারম্ভ হইতেই 'বিশ্বের সৃষ্টি ও বিকাশ এবং তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ' একটী প্রধান সমস্যারূপে বর্ত্তমান ছিল ও আছে। প্রাথমিক গ্রীক্ দার্শনিকগণ বিশ্বের বিকাশ ও সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই (materialistic standpoint) জড় পদার্থ লইয়াই কারণ আবিষ্কারে মত্ত ছিলেন। কিন্তু কেহই কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। শেষে (Anaxigorus) আনাক্সিগোরাস্ আসিয়া গ্রীক্ দর্শনে একটু নূতনত্বের আলোক আনিয়া দিলেন ; তিনি বলিলেন—জড়পদার্থের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির কারণ থাকিতে পারে না। কোন 'nous or soul' বা আত্মা এই বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ। Socrates তাঁহার এই মত হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশেষ আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন—""He is the only sane man among these multitudes of insane." ঐ সময় হইতে তাঁহাদের মত জড় ও অজড় সম্বন্ধীয় দ্বিবিধ শাখায় বিস্তার লাভ করিল।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে বিশ্বের সৃষ্টি ও বিকাশ একটী প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। কারণ, আমাদের সকল জ্ঞানই বিশ্ব-জগতের গণ্ডী-মধ্যে আবদ্ধ। ইহার অন্তরালে যে সকল বস্তু নিহিত আছে, তাহাদের সকলই আমাদের সাধারণ জ্ঞানের অগোচর। তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানিতে হইলেও আমাদিগকে এই পার্থিব বস্তুর সাহায্য লইয়াই অধিক অগ্রসর হইতে হইবে। সুতরাং 'বিশ্ব-স্রষ্টার' বিষয় আলোচনা করিতে হইলে 'বিশ্বসৃষ্টির' সাহায্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কারণ, এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব অধিকতর পরিস্ফুট।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই বিশ্বের সৃষ্টি ও বিকাশ সম্বন্ধীয় আলোচনায় নানারূপ মত-যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্মুখীন বিশ্ব-জগতের সুসজ্জিত রূপ শাশ্বত, সৃষ্টিলব্ধ, না, ক্রমবিকাশ-লব্ধ ইহা নির্ণয় করা বড়ই দুঃসাধ্য। ইহা কোন ধীশক্তি-সম্পন্ন আত্মার স্বেচ্ছা-সাধিত, না, বিশ্বের প্রকৃতি বা স্বভাবগত বিকাশ। তাহার চরম সিদ্ধান্ত সার্ব্বজনীন ভাবে কোন দর্শনেই স্বীকৃত হয় নাই। বিশ্বের বিকাশ সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১। নির্দ্দিষ্ট সৃষ্টি। ২। ক্রমবিকাশ।

নির্দ্দিষ্ট, নিরূপিত বা আদিষ্ট সৃষ্টি বলিলে আমরা

সাধারণতঃ বুঝি যে, বিশ্বের অঙ্গীভূত বস্তু সকল তাহাদের স্বরূপ লইয়াই সৃষ্টির প্রারম্ভে জগদীশ্বর কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই মতানুসারে আদিতে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি স্বেচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "In the beginning God created the Heaven and the Earth. He said—"let there be light and there was light"; so also all other elements, creatures etc., were created by his will.—as stated in the Bible. অর্থাৎ এই মতবাদের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বিশ্ব তাহার সুসজ্জিত রূপ ক্রমবিকাশ দ্বারা লাভ করে নাই। ইহার মধ্যস্থিত বস্তু, জীব ও অন্যান্য উপকরণ সকল ভগবানের আদেশ অনুসারে এককালে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই সমর্থিত মতবাদ।

বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বস্থিত বস্তুর বিশ্লেষণ ও তৎসম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বা করেন, তাহাতে বিশ্বের "নির্দ্দিষ্ট সৃষ্টি"-বাদ আদৌ সন্তোষজনক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তাঁহাদিগের মতে, বিশ্বসৃষ্টি কোন ধীশক্তিসম্পন্ন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইলেও, ইহা নিরূপিত কোন সময়ে বর্ত্তমান সম্পূর্ণতা লইয়া সৃষ্ট হয় নাই। স্থান, কাল ও অবস্থা-ভেদে ইহা ক্রমে স্বভাবসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক মতানুসারে বিশ্বের ক্রম-বিকাশবাদই গ্রাহ্য সিদ্ধান্ত।

ক্রমবিকাশ-বাদেও সাধারণতঃ দুই প্রকার মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন—বিশ্ব স্বভাবগত নিয়মানুসারে কাল ও স্থানের অবস্থা মত বিকাশ লাভ করিয়া তাহার বর্ত্তমান পূর্ণতায় উপনীত হইয়াছে। তাহার অন্তরালে কোন আদেশকারী বা পরিচালক শক্তি নাই, এবং উক্ত বিকাশের হেতু স্বরূপ কোন উদ্দেশ্যও তাহার মধ্যে বর্ত্তমান নাই। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এবম্বিধ বিকাশ-মতবাদকে Mechanical বা Spontaneous Evolution বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—"The process of Evolution takes place automatically or spontaneously without being guided by a creative idea, thought or purpose."

অন্যান্য ক্রমবিকাশবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বের স্বভাবসিদ্ধ বিকাশ স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে, বিশ্বের এবম্বিকাশ কোন সৃজনকারী শক্তি বা ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধনের উপাদান রূপে বিকশিত ও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার অন্তরালে সর্ব্ব কর্ম্ম ও সাধনের নিয়ামকরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সেই পরম আত্মা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছেন। যে উদ্দেশ্য কোনরূপ অভাব ও অভিযোগের অনুবর্ত্তী না হইলেও তাঁহারই আত্ম-সম্পূর্ণতার অংশরূপে সাধিত হইতেছে। "Others suppose that the process of Evolution is guided by a thought, purpose, end or idea—that is, what we call evolution is simply the mode of operation of a creative Mind or God." ইহা বিশ্বের Teleological Evolution বা কোন ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য-পরিচালিত বিকাশ।

শেষোক্ত মতবাদ আবার দুইটী বিভিন্ন শাখায় বিস্তার লাভ করিল।

প্রথম—ঈশ্বর ও বিশ্বের পৃথক অস্তিত্ব। ইহার মতে, ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কালে প্রয়োজন-মত শক্তি ও উপাদানাদি সংযুক্ত করিয়া, বিশ্বকে স্বাধীন বিকাশের ক্ষমতা দান করিয়া স্বয়ং পরিদর্শকের ন্যায় তাহার ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র। তিনি ইহার বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনের গতিবিধি নির্ণয় ও পরিচালনায় রত নহেন। প্রারম্ভেই প্রয়োজনীয় শক্তি ও বিকাশের উপকরণাদি সংযোগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট-গতিবিধি-সমম্বিত আত্ম-নিয়ামক বস্তুরূপে বিশ্বকে গঠিত ও পরিচালিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা বিশ্ব ও ঈশ্বরের দ্বৈত-ভাব। তিনি বর্ত্তমান, কিন্তু পৃথক সত্তারূপে। "God who had been at first without the universe, created it at a particular point of time outside Himself, and having endowed it with all necessary forces left to itself."

দ্বিতীয়—বিশ্বের অন্তরস্থিত শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ঈশ্বর তাঁহারই ইচ্ছা ও ইঙ্গিত অনুসারে পরিচালিত করিয়া গতিবিধির নিয়ামক রূপে আপনার পরিপূর্ণতাই বিকাশের দ্বারা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন। বিশ্বের কোন পৃথক সত্তা নাই। তাঁহারই অস্তিত্বের বিকাশ

রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহারই উদ্দেশ্যের উপকরণরূপে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। "God is the self-realising Immanent Spirit of the World system and guides the course of Evolution from within." ইহা বিশ্ব ও ঈশ্বরের অদ্বৈত ভাব। ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্বের কোন পৃথক সত্তা নাই।

স্বভাবসিদ্ধ ক্রমবিকাশ

পূর্ব্বে যে স্বভাবসিদ্ধ ক্রমবিকাশ বা Mechanical Evolution এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের একটী প্রধান মতবাদ। পাশ্চাত্য দার্শনিক Tyndall (টিন্‌ড্যাল্), Huxley (হক্সলে), Spencer (স্পেন্‌সর) প্রভৃতি বলেন যে, বিশ্বের ক্রমবিকাশ কোন বুদ্ধিশালী চিৎশক্তির বা আত্মার দ্বারা পরিচালিত নহে। উহা বিশ্বের প্রকৃতিগত পরিপূর্ণতা-প্রাপ্তি বা বিকাশ। Herbert Spencer তাঁহার "Synthetic Philosophy"তে ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন কালেই বিশ্বের কোন বস্তু বা প্রাণী জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। সুদূর নীহারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে আত্মবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন দ্বারা বিশ্ব তাহার বর্ত্তমান পরিপূর্ণতায় উপনীত হইয়াছে। তিনি ইহার অন্তরস্থিত বা বহিঃস্থিত কোন নিয়ামক শক্তিই স্বীকার করেন না। কিন্তু, পৃথিবী জীব ও জড় পদার্থ উভয় বস্তুরই সমষ্টি। সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, জড় জগৎ ও প্রাণ সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। সুদূর নীহারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ব যদি স্বাধীন ও স্বভাবসিদ্ধ ভাবে তাহার বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যদি বিশ্বের অন্তরালেও কোন আত্মা বা শক্তি বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তর্গত জীবের জীবনী-শক্তি ও মানসিক বৃত্তির বিকাশ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কার্য্য বা ফলাফলের মধ্যে যাহা বর্ত্তমান আছে, কারণের মধ্যে তাহা অবশ্যই বর্ত্তমান থাকিবে। কার্য্য ও কারণ উভয়ের মধ্যে সমান বস্তু ও উপকরণ সমভাবে বর্ত্তমান না থাকিলে, তাহারা পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত হইতে পারে না। "Cause and Effect must be homogeneous. What is present in the effect must be present in the cause also." সুতরাং সমধর্ম্মসম্পন্ন না হইলে তাহাদিগকে পরস্পর কার্য্য ও কারণরূপে সম্বন্ধ-যুক্ত বলা যাইতে পারে না। জীবের মধ্যে যে আত্মা বা মানসিক শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহা জড়-জগতের মধ্যে বর্ত্তমান না থাকিলে, জড়-জগৎ হইতে প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং বিশ্ব-সৃষ্টির অভ্যন্তরে যে কোন চিৎশক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহা মানিয়া লইতে হয়।

ক) জড়-জগতের বিকাশ

বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্য ঋষি কনাদ কর্ত্তৃক তাঁহার বৈশেষিক দর্শনে প্রচারিত হইয়াছিল যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তু সূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা গঠিত। গ্রীক্ দার্শনিক Democritus (ডেমোক্রিটাস্) (খৃঃ পূর্ব্ব ৪২০) কনাদের পূর্ব্বোক্ত মতবাদের প্রতিধ্বনি স্বরূপ আবার সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক Dalton (ড্যাল্টন্) ১৮০৮ খৃঃ পুনরায় সেই মতবাদই 'Atomic Theory' বলিয়া প্রচার করিলেন। বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিকগণ এই মতবাদকে অসম্পূর্ণ জ্ঞান করিয়া 'Electrons or Ions' রূপ ঘূর্ণ্যমান বৈদ্যুতিক কণাসকলের সমষ্টি-গঠিত পরমাণু দ্বারা বিশ্বের গঠন সিদ্ধান্ত করিলেন। বর্ত্তমান ক্রমবিকাশে স্পেন্‌সর ও অন্যান্য সমর্থনকারী দার্শনিকগণ উক্ত মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ না করিয়া Laplace (ল্যাপ্‌লেস্)-প্রচারিত "Nebular hypothesis" বা নীহারিকাবাদ অবলম্বনে ক্ষুদ্র তারকা-কণাসমূহ বা বাষ্পস্তূপ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মতে তারকাকণাসমূহ বা বাষ্পস্তূপ তাহাদের অন্তরস্থিত গতির বলে চলিতে চলিতে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বৃহত্তর আয়তন লাভ করিয়াছে; এবং ক্রমে বর্ত্তুলাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সমষ্টি হইতে বিচ্যুত হইয়া যে সকল ক্ষুদ্র খণ্ড দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাই ক্রমে গ্রহ ও উপগ্রহে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীও তাহার অন্তর্বর্ত্তী। এইরূপ ক্রমোন্নতি দ্বারাই বিশ্ব তাহার মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি ও অন্যান্য শক্তিসম্পন্ন সুসজ্জিত বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পশ্চাতে কোন নিয়ামক বা রক্ষক আত্মা নাই।

(খ) জীবের বিকাশ

উল্লিখিত নিয়মানুসারে বিশ্ব ক্রমে জীবের বাসযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু উদ্ভূত হয়। ঐ জীবাণু স্থান ও অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ও আত্ম-বিভক্তি দ্বারা সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। Spontaneous generation বা abiogenesis মতবাদীগণ বলেন, উহা স্বভাবসিদ্ধ ভাবে Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়া জীবনীশক্তি-বিশিষ্ট কীটাণুতে পরিণত হয়। উহারাই ক্রমে পরিপুষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীব, জন্তু ও বৃক্ষাদিতে বিকশিত হইয়াছে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে উক্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। Tyndall, Pasteur, Lister ও অন্যান্য দার্শনিকগণ বলিয়াছেন—পূর্ব্বস্থিত জীবনের সাহায্য ভিন্ন কোন নব জীবনই উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা যে যে পদার্থ জীবাণুর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা পুনরায় মিশ্রিত করিলে প্রাণহীন জড় পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহাতে কোনরূপ জীবনীশক্তি থাকে না। সুতরাং (Omne vivum ex vivo) সমস্ত জীবনই যে পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন হইতে উৎপন্ন ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মহাত্মা Darwin এই সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য জীবের প্রাথমিক অবস্থার সৃষ্টি স্বভাব-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রাথমিক কতকগুলি কীটাণুতে জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন (The Creator "breathed the breath of life" into a few germs.)। অন্যান্য দার্শনিকগণ স্বভাবসিদ্ধ বিকাশই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু Darwinএর মতে ইহা কতক পরিমাণে অন্যরূপ। 'Origin of Species' সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে—"There is grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple beginnings, endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being evolved." তিনি বলিয়া গেলেন যে, ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট ঐ কয়েকটী জীবাণু আপনা আপনি বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন-সংগ্রাম করিয়া চলিল। যাহারা জীবন-সংগ্রামের অনুপযুক্ত তাহারা বিনষ্ট হইল, এবং যাহারা যোগ্য তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী গঠন করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিল (Every creature has to struggle against nature for existence, in which the strongest and the best fitted creatures survive and the weakest and least fitted perish—the Survival of the Fittest)। ক্ষুদ্রতম জলকীট হইতে আরম্ভ করিয়া এইরূপেই শ্রেষ্ঠতম জীব মানব পর্য্যন্ত গঠিত হইয়াছে। উহা বংশ-পরম্পরানুক্রমে ধারাবাহিক ভাবে প্রকটিত হইতেছে। Lamarck বলিলেন, তাহাদের এরূপ পরিবর্ত্তন ও বিকাশ অন্তরস্থিত ভাব লইয়া বা আপনা-আপনি সাধিত হয় না; উহা বহির্জগতের অবস্থা অনুসারে বিকশিত হয়। পরে Darwinও Lamarckএর মতবাদ সমর্থন করিলেন; এবং উভয়বিধ শক্তি দ্বারাই প্রকটন হইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে গেলে, স্বভাবসিদ্ধ ক্রমবিকাশ অনেকাংশেই Teleological বা পরিচালিত ক্রমবিকাশের অনুরূপ হইয়া পড়িল। নিরীশ্বর ভাবে এই মতবাদের সিদ্ধান্ত করিতে গেলে 'জীব-সৃষ্টি সমস্যা'র মীমাংসা হয় না। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়।

পরিচালিত ক্রমবিকাশ

পরিচালিত ক্রমবিকাশ বা Teleological Evolution সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, আমাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। কারণ, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর ও কর্ম্মের মধ্যে আমরা যে সুশৃঙ্খলা দেখিতে পাই, তাহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, ইহা কোন ধীশক্তিসম্পন্ন আত্মা বা মন দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। নির্ব্বাচন, সংযোজন ও ক্রমবৃদ্ধি প্রভৃতি দেখিয়া বেশ প্রতীয়মান হয় যে, ইহা কোন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেকের অবস্থা ভেদে

প্রয়োজনীয় বস্তু সকল নির্ব্বাচিত হইয়া এইরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে যে, তাহাকে কোন মতেই "সহসা সংঘটন" বলা যাইতে পারে না। পরিচালিত ক্রমবিকাশবাদ স্বীকার করিলে, জড় ও জীবন, জীবন ও মন এবং পাশব মন ও মানব মন ইত্যাদির মধ্যে যে সকল বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, সেগুলির সমস্যা হইতেও নির্ব্বিঘ্নে মুক্তি পাইতে পারি।

কোন পথভ্রষ্ট পথিক যদি নির্জ্জন বন মধ্যে আসিয়া সহসা সেথায় একটী ঘড়ি বা হারমোনিয়ম যন্ত্র দেখিতে পায়, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে ইহা অনুমান করিতে কোনই দ্বিধা আসে না যে,সেই নির্জ্জন বনে নিশ্চয় লোক-সমাগম হয় বা হইয়াছে। কারণ, ঘড়ি ও হারমোনিয়ম যন্ত্রের গঠন-প্রনালীর মধ্যে যে সুশৃঙ্খলা সে দেখিতে পায়, তাহা chance combination বা spontaneous variation দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও আয়তন-বিশিষ্ট যে সকল বিভিন্ন পদার্থের সন্নিবেশ হইয়াছে, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়মের দ্বারা হইয়াছে, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহার সৃষ্টি-কার্য্যে কোন বুদ্ধিবিশিষ্ট শক্তির সহায়তা আছে। তদ্রূপ বিশ্বের সুশৃঙ্খলা ও গঠন-পারিপাট্য দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহার অন্তরালে কোন বুদ্ধিমান আত্মা অন্ততঃ সৃষ্টি-কার্য্যের সহায়তায় নিযুক্ত আছেন। আমাদের চক্ষুঃ, কর্ণ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেরূপে গঠিত সেরূপ গঠন ঘটনাচক্রে সাধিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, চক্ষুঃ ও কর্ণের মধ্যে যে নৈপুণ্য বা সৃষ্টি-কৌশল আমরা দেখিতে পাই, তাহা সাধারন বোধ-শক্তির অগম্য। চক্ষুর মধ্যস্থিত retina, lens, cilliary muscles, cornea, pupil প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষুদ্র যন্ত্রটীর মধ্যে বিজ্ঞানের যে পরকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহা কল্পনাতীত। তাহার সম্বন্ধে বিশেষ বলা তো বাহুল্যমাত্র, শুধু চক্ষুস্থিত double convex lens হইতে retinaর উপর যে ছবি উল্টা হইয়া পড়ে, তাহা আমরা কিরূপে সহজভাবাপন্ন দেখি বা অনুভব করি, ইহাই অদ্যাবধি স্থিরভাবে মীমাংসিত হয় নাই। এইরূপে কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বিশ্বের অন্যান্য বস্তুর বিশেষ বিশ্লেষণ করিলে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারি যে, বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তরালে কোন বিরাট ধীশক্তি-সম্পন্ন পুরুষ নিরন্তর সৃষ্টি-কার্য্যে রত আছেন ও পরিচালনা দ্বারা সৃষ্টি ও বিকাশের চরম সহায়তা করিতেছেন।

সুতরাং বিশ্বের বিকাশ ও সৃষ্টি বিষয়ে আমরা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারি না। অসাধারণ নৈপুণ্য ও কৌশল দেখিলে তাঁহার বিরাট ভাব ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্নতা স্থির সত্য বলিয়াই অনুভূত হয়।

ধোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রামযাদু বাড়ীটি কায়েমি ভাবে লাভ ক'রেই, আরও অধিক লাভ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো। সে স্থির করলে শহরের বাইরে কোথাও অল্প ভাড়ায় একটা বাড়ী নিয়ে পরাণবাবুর দেওয়া বাড়ীটা বেশী টাকায় ভাড়া দিয়ে কিছু আয়ের উপায় ক'রে নেবে। কিন্তু তার চিন্তা হলো কোন্ ছলে সে এই বাড়ী ছেড়ে শহরের বাইরে যাবে; পরাণ-বাবু তাকে বাড়ী দান ক'রেছেন সপরিবারে বাস করবার জন্য; এখন যদি সে সেই বাড়ী ভাড়া দিয়ে অন্যত্র যেতে চায় তবে তিনি কি মনে করবেন? পরাণ-বাবুর কাছে চক্ষুলজ্জা রামযাদুকে একটু বিব্রত ক'রে তুল্‌লো। কিন্তু তার উর্ব্বর মস্তিষ্ক অল্প ক্ষণেই একটা ফিকির আবিষ্কার করলে—সে যদি পরাণ-বাবুকে বলে যে শহরের গোলমালের মধ্যে তার গবেষণা আর সাহিত্য রচনা যথোপযুক্ত রকমে হতে পারছে না, তা হলে তিনিই হয় তো শহরতলীর কোথাও তার বাসের সুবন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। কিন্তু অন্যত্র যাওয়ার জন্য কেবল এই ওজরটি তার যথেষ্ট মনে হলো না। সে আবার উন্মনা হয়ে বলবত্তর কোনো কারণ অনুসন্ধানে নিজের চিন্তা ও চিত্তকে নিযুক্ত করলে।

একদিন আপিস থেকে বাড়ী ফির্‌বার পথে সে দেখ্‌লে একটি ছোটো ছেলে কেঁদে কেঁদে পথে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ছোটো ছেলেটির উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আর ব্যাকুল ক্রন্দন দেখে রামযাদুর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো, সে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে স্নেহভরা কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার কি হয়েছে বাবা ?

ছোটো ছেলেটি কান্নার ফাঁকে ফাঁকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে যা বল্‌লে তা জোড়া-তাড়া দিয়ে রামযাদু এই বুঝ্‌তে পার্‌লে যে ছেলেটির মা গঙ্গাসাগরে তীর্থ কর্‌তে গিয়েছিলো, সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে ; তীর্থযাত্রী লোকেরা দয়া ক'রে তাকে কল্‌কাতায় ফিরিয়ে এনে পথে ছেড়ে দিয়ে বলেছে যাও ভিক্ষে ক'রে খাও। বালক ভিক্ষা কর্‌তেও জানে না, আর নিরাশ্রয় হয়ে লোকারণ্যে হারিয়ে গিয়েছে ব'লে ভয় পেয়ে কাঁদ্‌ছে। তাদের বাড়ী নিশ্চিন্তপুর, তারা সেখান থেকে অনেকখানি পথ হেঁটে রেলে উঠে কলকাতায় এসেছিলো ; এর বেশী খবর আর সে কিছু দিতে পার্‌লে না ; সেই নিশ্চিন্তপুর যে কোন্ জেলায় বা কোন্ থানা বা পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত তা সেই বালক জানে না। রামযাদু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে জান্‌লে—তার মা আর সে একখানা কুঁড়ে ঘরে থাক্‌তো, তার মা ধান ভান্‌তো, তাদের আর কেউ নেই ; তারা কি জাত সে তা জানে না।

রামযাদুর পরদুঃখকাতর চিত্ত বালকের কাহিনী শুনে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌লো, তার চোখ ছলছল কর্‌তে লাগ্‌লো, সে করুণার্দ্র স্বরে বল্‌লে—চলো বাবা তুমি আমার সঙ্গে ; কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখ্‌বো কেউ যদি তোমার আপনার লোক সাড়া দেয় তার কাছে পাঠিয়ে দেবো, নইলে……

—অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দেবেন।"—রোরুদ্যমান বালক ও রামযাদুকে ঘিরে যে জনতা জ'মেছিলো সেই জনতার মধ্যে থেকে একজন পরামর্শ দিলে।

রামযাদুর মনের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতন এই কথাটা ঝলক মেরে গেলো, তার মনের অনেকখানি স্থান এক মুহূর্ত্তে আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো ; রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—অনাথ-আশ্রম আমিই খুল্‌বো আর এই উপলক্ষ্য ক'রেই আমি শহর ছেড়ে বাইরে যেতে পার্‌বো।

রামযাদুর অশ্রুপূর্ণ চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো, সে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ছেলেটির হাত ধ'রে স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লে—এসো বাবা, আমার সঙ্গে এসো……

রামযাদু সন্ধ্যার পর পরাণ-বাবুর বাড়ীতে গেলো এবং কথায় কথায় অনাথ নিরাশ্রয় বালককে আশ্রয় দেওয়ার কথা জানিয়ে অবশেষে বল্‌লে—আমি যখন ছেলেটিকে বল্‌লাম যে চলো বাবা এখন আপাততঃ আমার বাড়ীতেই থাক্‌বে, তার পর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ ক'রে তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো, তখন কোথা থেকে এই আকাশ-ভাষণ ভেসে এলো—এই বালককে নিয়ে তুমি একটি অনাথ-আশ্রম খোলো ! আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম ; কে এ কথা বল্‌লে দেখ্‌বো মনে কর্‌লাম, কিন্তু স্থির কর্‌তে পার্‌লাম না সেই কথা কোন্ দিক্ থেকে উচ্চারিত হয়েছে ; মনে হতে লাগ্‌লো যেনো সমস্ত আকাশ ভ'রে চারিদিক্ থেকেই সেই কথার ধ্বনি ভেসে আস্‌ছে ; তখন আমার মনে হলো—এ দৈববাণী ! এই সম্ভাবনা মনে উদয় হবা মাত্র দেখ্‌লাম কারা পূজা কর্‌বে ব'লে অন্নপূর্ণার প্রতিমা কিনে নিয়ে আস্‌ছে—মাতা জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা ভিখারী শিবকে অন্ন দান কর্‌ছেন। আমার গায়ে রোমাঞ্চ হলো…এখনও ঐ কথা স্মরণ কর্‌তে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে…

পরাণ-বাবু ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে বল্‌লেন—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়া-রূপেন সংস্থিতা॥

সেই মহামায়া জগদম্বা দয়া রূপে আপনার হৃদয়ে নিত্য বসতি কর্‌ছেন ; আপনি দেবানুগৃহীত মহৎ ব্যক্তি এর পরিচয় আমি বার বার পেয়ে আস্‌ছি। শিবানীর যে দৈববাণী আপনি শুনেছেন সেই আদেশ আপনি পালন করুন, জগতের কল্যাণ-ব্রতে প্রবৃত্ত হলে আপনার কোনো অভাব হবে না।

রামযাদু পরাণ-বাবুর ভাবোচ্ছ্বাস শুনে সুযোগ পেয়ে বল্‌লে—তাই আমি মনে করেছি কল্‌কাতার বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে শহরের বাইরে একটা পুকুর-বাগান-ওয়ালা বাড়ী ভাড়া নেবো ; তাতে কিছু টাকা লাভ হবে, আর তাই দিয়ে এখনকার মতন অনাথ-আশ্রমের খরচ চ'লে যাবে ; আর পুকুরের মাছ আর বাগানের ফল-ফুলুরী তরী-তর্‌কারী পেলে অনাথদের ভরণ-পোষণেরও অনেকটা আনুকূল্য হবে।

পরাণ-বাবু রামযাদুর প্রস্তাব শুনে আনন্দিত হয়ে বল্‌লেন —সাধু সঙ্কল্প ! আপনি সেই রকম একটা বাড়ী খোঁজ

করুন, আমিও লোক লাগিয়ে খোঁজ করবো। সব ঠিক হয়ে যাবে মুখুজ্জে মশায়, আপনি কিছু ভাববেন না; মা অন্নপূর্ণা সব অভাব পূর্ণ ক'রে দেবেন।

রামযাদু বুঝতে পারলে যে পরাণ-বাবুর ঐ কথার অর্থ কি; তাই সে হাসিমুখে বললে—আপনি যখন আশ্বাস দিচ্ছেন তখন আর আমার ভাবনা কি? জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ!

*

* *

অতি শীঘ্রই কলিকাতার উপকণ্ঠ বলিগঞ্জে রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটেই একটি বাগান-পুষ্করিণী-সংলগ্ন দ্বিতল বাড়ী অল্প ভাড়ায় পাওয়া গেলো। রামযাদু কল্‌কাতার বাড়ী ভাড়া দিয়ে সেই নূতন ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করতে গেলো; এতে মাসে তার পঞ্চাশ টাকা আয় বৃদ্ধি হলো।

রামযাদু একখানা এনামেল-করা লোহার পাটায় বড়ো বড়ো অক্ষরে বাড়ীর নাম লেখালে অন্নপূর্ণা অনাথ-আশ্রম, এবং সেখানাকে সাইন-বোর্ডের মতন বাড়ীর সাম্‌নে লট্‌কে দিলে।

তার পর সে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে কেউ কোথাও কোনো অনাথ ছেলে-মেয়ের সন্ধান পেলে যেনো অনুগ্রহ ক'রে তার আশ্রমে পাঠিয়ে দেন।

রামযাদুর এই আত্মত্যাগমূলক পরোপকার-ব্রতের সংবাদ সত্বর সারা বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়লো; সংবাদপত্রে তার প্রশংসা বিঘোষিত হতে লাগ্‌লো।

আপিসের সাহেবেরা এই সংবাদ পাঠ ক'রে রামযাদুকে ডেকে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং রামযাদুর সৎ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করলেন। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন—আপনি সাধারণের কাছে অর্থ-সাহায্যের জন্যে একটা বিজ্ঞাপন দেন; আমরা আপিস থেকে সকলে কিছু কিছু দিয়ে চাঁদা আদায়ের সূত্রপাত ক'রে দেবো।

এই কথা ব'লে বড়ো সাহেব বললেন—আমাদের আপিস আপনার আশ্রমকে হাজার টাকা দেবে, আর আমি নিজে দেবো পাঁচ শো টাকা।

ছোটো সাহেব বললেন—আমি দেবো আড়াই শো টাকা।

পরাণ-বাবু সেখানে উৎফুল্ল-মুখে ব'সে সাহেবদের কথা শুনছিলেন; তিনিও বললেন—আমি দেবো দু শো টাকা; আর থাকোহরি দেবে পঞ্চাশ টাকা।

রামযাদুর মুখ অপ্রত্যাশিত লাভে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—একেবারে থোক দু হাজার টাকা হাতে হাতে লাভ! এর টানে আবার কতো হাজার এসে পড়বে তার নির্ণয় কে করবে?

রামযাদু সাহেবদের বিনীত ধন্যবাদ জানিয়ে বললে—সে তার মুনিবদের সাহায্য ও পরামর্শ বরাবর পাবার আশাতেই এই দুরূহ ব্রত গ্রহণ করেছে।

রামযাদু ও পরাণ-বাবু সাহেবদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে পরাণ-বাবু হাসিমুখে রামযাদুকে বললেন—আমার এই চাঁদাটা প্রথম কিস্তি; ছোটো সাহেবের চেয়ে আমি তো বেশী দিতে পারি না, তাই ঐ অল্প পরিমাণই বলতে হলো……

রামযাদুও খুশীতে হেসে বললে—তা আমি জানি… আপনার ভরসাতেই তো আমার এতোবড়ো কাজে হাত দিতে সাহস হয়েছে।

পরাণ-বাবু আপিসের সকলকে ডেকে সাহেবদের চাঁদা দেওয়ার কথা বললেন এবং সকলকে যথেচ্ছা দান করতে সাহেবদের অনুরোধ জানালেন।

সাহেবদের অনুরোধ পরাণ-বাবুর মুখে ব্যক্ত ও সমর্থিত হওয়ার মানেই হুকুম। সকলে বিনা বাক্য ব্যয়ে চাঁদার তালিকায় নিজেদের দেয় অর্থের অঙ্কপাত করতে লাগলো। দেখতে দেখতে আপিস থেকে আরও সহস্রাধিক টাকা উঠে গেলো।

এই চাঁদা আদায়ের তালিকা সমেত সাহায্যের আবেদন যখন কাগজে কাগজে বাহির হলো তখন চারিদিক্ থেকে অনাথ বালক-বালিকা ও অজস্র অর্থ অন্ন বস্ত্র আম্‌দানী হতে লাগলো।

রামযাদু দেখলে এ এক মন্দ ব্যবসায় নয়। অনাথদের দৌলতে তার নিজের ছেলেদেরও জামা কাপড় কিন্‌তে হয় না; বদান্য দাতারা অনাথদের খাদ্য-সামগ্রী উপহার দিলে সেই ভোজ থেকে তারাও বঞ্চিত হয় না; রামযাদুর বাড়ীতে নূতন কম্বল বিছানা চাদর এতো জ'মে যায় যে সে তাও মাঝে মাঝে বেচে ফেলে বেশ দু পয়সা আয় ক'রে নেয়। তাই এখন তার মুখে অনাথদের অপার দুঃখ ও তা মোচনের জন্য

প্রার্থনা ছাড়া আর অন্য কথা বড়ো একটা শোনা যায় না। এতে অনাথদের সুবিধা যতো হোক না হোক তার নিজের সুবিধা বিলক্ষণ হচ্ছিলো। তবে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত কোনো কোনো লোক অপ্রকাশ্যে তাকে 'অর্ফ্যান্ নি গ্রেট্' ব'লে বিদ্রূপ করতেও ত্রুটি কর্‌তো না। রামযাদু সে-সব বিদ্রূপ শুনেও শোনে না।

রামযাদুর হাতে অনাথ-আশ্রমের আকর্ষণে এতো টাকা এসে জ'ম্‌লো যে সে যে-বাড়ীটাতে অনাথ-আশ্রম ক'রেছিলো সেই বাড়ীটা কিনে ফেল্‌লে; কিন্তু অনাথ-আশ্রমের নামে নয়, নিজেরই নামে।

রামযাদুর এই পরোপকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য সকল সমাজে তার বিশেষ প্রতিষ্ঠা। গভর্মেণ্ট্ কর্ম্মচারীরা, আপিসের সাহেবেরা ও সাধারণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সকলেই তাকে বিশেষ খাতির করে। এক বৎসর পরেই সম্রাটের জন্মদিনে রামযাদু রায় বাহাদুর খেতাবে সম্মানিত হলো। রামযাদু এখন সকল সভা-সমিতিতে গণ্য মান্য অভ্যাগতের আসন সহজেই অধিকার ক'রে বসে।

একদিন সকাল বেলা রামযাদু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে পাড়ার সকলকে খবর দিয়ে বেড়াতে লাগলো, যে, কাল রাত্রে মা অন্নপূর্ণা আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন যে তিনি অষ্টধাতুর প্রতিমা রূপে আমার বাড়ীর পুষ্করিণীর ঈশান কোণে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁকে উদ্ধার ক'রে বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপনারা সকলে আসুন···যদি স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র না হয় তা হলে মায়ের আবির্ভাব স্বচক্ষে দেখ্‌বেন।

দেখতে দেখতে এই সংবাদ বহু দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে গেলো; কাতারে কাতারে লোক এসে রামযাদুর বাগানে মেলা জমিয়ে তুল্‌লে।

পুষ্করিণীর ঈশান কোণে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিয়ে রামযাদুকে অন্নপূর্ণার পূজা হোম পুরশ্চরণ করালে। তার পর বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় পূজা সাঙ্গ ক'রে রামযাদু প্রতিমা উদ্ধার কর্‌তে জলে নাম্‌লো। অনাথ বালক-বালিকারা কাঁসী ঘণ্টা শঙ্খ বাজিয়ে লোকের কানে তালা লাগিয়ে দিতে লাগলো। অন্নপূর্ণা পূজার উপলক্ষে ঢাক ঢোল কাঁসী বাজনাও আনানো হয়েছিলো, তার বাজনদারেরাও উন্মত্তের মতন ঢাক ঢোল কাঁসী পিটিয়ে পিটিয়ে যেনো ভেঙে ফেলবার উপক্রম করেছে।

রামযাদু ডুবের পর ডুব পাড়ছে; সে একবার ডুব দিচ্ছে, আর যতক্ষণ দম জলের তলে ডুবে থেকে মাটি হাৎড়ে হাৎড়ে জল ঘুলিয়ে ফেল্‌ছে, তার পর নিষ্ফল হয়ে উঠে করুণ কাতর স্বরে চীৎকার কর্‌ছে—মা! মা! করুণাময়ী! দয়া করো মা!······

রামযাদু এক-একবার উঠ্‌ছে আর তার চোখে মুখে নিরাশার ভাব ফুটে উঠ্‌ছে। সমবেত লোকেরা প্রত্যেক বারই আশা কর্‌ছে এইবার হয় তো দেবীর আবির্ভাব হবে। রামযাদু দু-দুবার ডুবেও যখন কিছু তুল্‌তে পার্‌লে না, তখন সবাই বলাবলি কর্‌তে লাগলো বার বার তিন বার! তিনবার না চেষ্টা করলে কি ত্র্যম্বক-গৃহিণী ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিনয়না মহামায়ার দর্শন মিল্‌বে? কিন্তু তৃতীয় বারেও যখন রামযাদু শূন্য হাতে উঠ্‌লো তখন সকলে বল্‌লে—পাঁচবারের বার পঞ্চানন-পত্নীর আবির্ভাব হতে পারে। পাঁচ বার ডুবেও যখন রামযাদু কিছু তুল্‌তে পার্‌লে না, তখন অর্দ্ধেক লোক হতাশ হয়ে পড়লো, সিকি ভাগ লোক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগলো—মা অন্নপূর্ণা ওঁকে স্বপ্ন দিয়েছেন! এমন কী সুকৃতি করেছেন উনি যে জগদম্বা যেচে ওঁর ঘরে আসবেন?···

কেউ কেউ বল্‌লে—কিছু বলা যায় না রে ভাই, লোকটার যে রকম পাতা চাপা কপাল, মায়ের কৃপা না হলে কি এতো অল্প দিনে এমন বাড়বাড়ন্ত হয়!

একজন বিজ্ঞ বল্‌লে—ষড়ানন-জননী ষষ্ঠ বারে নিশ্চয় উঠবেন।

রামযাদুর ষষ্ঠ ডুবও নিষ্ফল হলো।

তখন সকলের মনই হতাশ হয়ে গেলো। কিন্তু রামযাদু তার স্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—জগদম্বা, আমি ডুবে ডুবে ম'রে যাবো তাও স্বীকার, কিন্তু তোকে না নিয়ে আমি উঠ্‌বো না···স্বপ্নে যখন দেখা দিয়ে আদেশ করেছিস তখন তোকে ধরাও দিতে হবে পাষাণী!

রামযাদুর বক্তৃতায় বিশ্বাসী ভক্তদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো, কারো কারো চোখে জলও দেখা দিলো।

সাত বারের বার। রামযাদু মা মা ক'রে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ডুব মার্‌লে। অনেকক্ষণ জল নিস্তব্ধ অচঞ্চল হয়ে রইলো; সকলে নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে রামযাদুর উত্থানের অপেক্ষায় জলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রইলো। খানিক পরে জলের উপর ভুড়ভুড়ি উঠ্‌তে লাগলো, ক্রমে সেই ভুড়ভুড়ি কলসীতে

জল ভরার সময় কলসীর অভ্যন্তরের বাতাস নির্গমনের মতন জলের উপর ভড়াক ভড়াক শব্দ ক'রে উথলে উথলে উঠলো; তার পরই রামযাদু জল ছেড়ে কাৎলা মাছের আকাশ দেওয়ার মতন লাফিয়ে উঠলো এবং হাত উঁচু ক'রে তুলে মুখ বেয়ে জলধারা পতনের বাধা ঠেলে চীৎকার ক'রে উঠলো—পেয়েছি! পেয়েছি! মা ধরা দিয়েছেন! মা জগদম্বা করুণাময়ী!......

রামযাদুর কথা ঢাক ঢোল কাঁসী, কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ ও সহস্র কণ্ঠের মা মা শব্দের মহা কলরোলের মধ্যে ডুবে গেলো। সমস্ত জনতা যেনো উন্মত্ত হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে চীৎকার করতে লাগলো। রামযাদুও এক ছুটে জল থেকে ডাঙায় উঠে অন্নপূর্ণা-প্রতিমা দুই হাতে ধরে মাথায় রেখে ধেই ধেই ক'রে নাচতে সুরু ক'রে দিলে! সকল লোকে সবিস্ময়ে দেখলে একখানি ক্ষুদ্র সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি! সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতে আরম্ভ করলে!

রামযাদু যখন শ্রান্ত হয়ে হাঁপিয়ে পড়লো তখন সে নৃত্য থেকে নিবৃত্ত হয়ে চীৎকার ক'রে বললে—এই বার মা জগদম্বার প্রতিষ্ঠা অভিষেক পূজা হবে; তার পর বলি আর ভোগ হবে। যাঁরা দয়া ক'রে আমার সামান্য কুটীরে পদার্পণ ক'রেছেন তাঁরা সকলে রাত্রে এসে মায়ের প্রসাদ পেয়ে যাবেন, আমি সকলকে নিমন্ত্রণ করছি।

সকল লোকে রামযাদুর ভক্তির জোর ও কপালের জোর সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলো। কেবল দু চার জন কলেজের ছেলে অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললে—আগে থাকতে একটা প্রতিমা জলে ডুবিয়ে রেখে তুলতে আমরাও পারি। বেটার আগাগোড়া সব ভড়ং আর বুজরুগী!

রামযাদুর দেবী লাভের সংবাদ শীঘ্রই সারা কলকাতা-ময় ছড়িয়ে পড়লো। শত শত লোক গাড়ীতে মোটরে হেঁটে দেবী দর্শন করতে আসতে লাগলো। প্রণামী দক্ষিণা পড়তে পড়তে প্রতিমার সামনে টাকা আর মোহরের পাহাড় হয়ে উঠলো। ওঙ্কারমল জেঠিয়া এক গাড়ী ঘি ময়দা চিনি দেবীর ভোগের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে; রামভজ ঝুনঝুনওয়ালা এক গাড়ী অত্যুত্তম আতপ চাল পাঠিয়েছে। পাঁঠা তরী-তরকারী মাছ ডাল কোথা থেকে কে যে পাঠাচ্ছে তার আর হিসাবই রাখা গেলো না। শিউবখশ হালুওয়াই এক গাড়ী মিষ্টান্ন পাঠিয়েছে।

রামযাদু এই সব সামগ্রী সমাগত দেখেই পঞ্চাশ জন হালুইকর ব্রাহ্মণ আনিয়ে নিলে এবং বাগানের মধ্যে বড়ো বড়ো জোল কেটে পাচকদের ভোগ রাঁধতে লাগিয়ে দিলে। রাত আটটার মধ্যে ভোগ হয়ে গেলো এবং পাড়াপড়শী সকলে মিলে সাহায্য ক'রে হাজার হাজার লোককে পরিতোষ ক'রে আহার করিয়ে বিদায় দিতে লাগলো। রাত একটার পর সকলকে বিদায় দিয়ে রামযাদু একটু বিশ্রামের অবসর পেলে; তখন সে মুচকি হেসে সহধর্ম্মিণীকে বললে—যদি জোটে রোজ এমনি বিনি পয়সার ভোজ!

মনমোহিনী স্বামীর আহারের ঠাঁই করতে করতে বললে—আজ সমস্ত দিন তো পেটে অন্ন জুটলো না, এখন খেতে বোসো।

রামযাদু খেতে বসতে বসতে হেসে বললে, এক দিন উপোষ ক'রে চিরদিনের খোরাকের জোগাড় ক'রে নিলাম রে পাগলী!

স্বামীভক্তিতে মনমোহিনীর মন পূর্ণ হয়ে উঠলো।

এর পর দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতে হলেই রামযাদু বলে—"আমি তো কিছু জানি না, সে মা অন্নপূর্ণা জানেন!" দিতে হলে অন্নপূর্ণা কম দিতে বলেন এবং পেতে হলে অন্নপূর্ণা বেশী নিতে বলেন।

রামযাদুর কলকাতার বাড়ীর ভাড়াটে উঠে গেছে; আবার বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। একজন ভদ্রলোক সেই বাড়ীর ভাড়া ঠিক করতে এসে রামযাদুকে বললে—মশায়, আপনার বাড়ীটি···

রামযাদু অমনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—আমার বাড়ী নয়, মা অন্নদার বাড়ী···

ভদ্রলোক মনে মনে বললে—মা অন্নদা কেবল অন্নই দেন না, তিনি বাড়ী-দাও বটে!

তার পর সে প্রকাশ্যে বললে—তা যাঁরই বাড়ী হোক, ভাড়ার কথা-বার্ত্তা তো আপনার সঙ্গেই কইতে হবে? আমরা পাপী লোক, মা অন্নদার দেখা তো আমরা পাবো না যে তাঁর সঙ্গে কথা বলবো?

রামযাদু হেসে বিনয় প্রকাশ ক'রে বললে—হেঁ হেঁঃ হেঁ, আমি মায়ের সেবক হুকুম-বরদার মাত্র!

—তা যাই হোন, ঐ বাড়ীটির ভাড়া কতো?

—হেঁ হেঁঃ হেঁ, আজ্ঞে মা বলেছেন—একশো এক টাকা নিতে।

—আমি ঐ বাড়ীতে বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছর থাক্‌বো, যতো দিন না ম'রে যাচ্ছি ; স্থায়ী ভাড়াটের কাছে কিছু কম নেওয়া উচিত ; আমি আশি টাকা ক'রে দেবো…

—ভাড়ার কথা আমি তো কিছু জানি না, সে মা অন্নপূর্ণা জানেন। তিনি আমার মনে এই চিন্তা উদয় ক'রে দিয়েছিলেন যে এক শো এক টাকা হ'লেই আমার পূজা ভোগ বেশ সুশৃঙ্খলায় হবে ; তাই আমি সেই পরিমাণ ভাড়ার কথাই বল্‌লাম। তা আপনি যদি কিছু কম দিতে চান দিন, তাতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, মায়ের পূজা ভোগ একটু কম হবে।

রামযাদুর এ কথার পর সে ভদ্রলোক আর ভাড়া কম কর্‌বার কথা মুখেও আন্‌তে পার্‌লে না ; সে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বাস কর্‌বে, দেব-পূজার বিঘ্ন ঘটিয়ে সে দেবতার বিরাগ-ভাজন হ'তে যাবে এতো বড়ো সাহস তার নেই ; সে তাই তৎক্ষণাৎ বল্‌লে—না না, আমি মায়ের পূজার ত্রুটি ঘটাতে চাই না ; বাড়ীখানি আমাদের পছন্দ হয়েছে, আমরা মায়ের পূজার জন্য একশো এক টাকা ক'রেই মাসে মাসে দেবো।

রামযাদু নিজের স্থির-করা ভাড়াতেই একজন স্থায়ী ভাড়াটে পেয়ে খুশী হয়ে বল্‌লে—মায়ের বরে আপনার খুব বাড়-বাড়ন্ত হবে, ধূলোমুঠো ধর্‌লে সোনামুঠো হবে। আর একটি কথা আছে, মায়ের আর একটি আদেশ আছে, প্রত্যেক মাসের ভাড়া সেই মাসের পয়লা আগাম দিয়ে দিতে হবে, নইলে তাঁর ভোগ-পূজা চলা দুষ্কর হবে, আমি তো ছাঁ-পোষা মানুষ, সামান্য মাইনে পাই…

ভদ্রলোক বল্‌লে—সে আর বেশী কথা কি ? মাসের শেষে দেওয়াও যা আর মাসের গোড়ায় দেওয়াও তাই। আমি সঙ্গে টাকা এনেছি। এ মাসের টাকাটা দিয়ে যাচ্ছি। একটা রসিদ দেবেন কি ?

রামযাদু আরো খুশী হয়ে বল্‌লে—অবিশ্যি, রসিদ দেবো বৈ কি।

রামযাদু কাগজ কলম নিয়ে যখন বাড়ী ভাড়ার রসিদ লিখতে প্রবৃত্ত হলো, তখন সেই ভদ্রলোক পকেট থেকে মণি-ব্যাগ বাহির ক'রে ও তার ভিতর থেকে এক গোছা নোট বাহির ক'রে দশখানি নোট গুণে নিতে লাগ্‌লো। রামযাদু রসিদ লিখে দিলে—

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতা সহায়

কস্য রসিদপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—

আমার বলিয়া লোক-সমাজে পরিচিত রামরতন পালিত ষ্ট্রীটস্থ ১৭ বি নম্বর বাটী আমি মাতা অন্নপূর্ণা দেবীর সেবানুকূল্যের জন্য শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মাসিক এক শত এক (১০১৲) টাকা হারে ভাড়া দিয়া তাহার এপ্রেল মাসের ভাড়া অগ্রিম বুঝিয়া পাইয়া এই রসিদ লিখিয়া দিলাম। ইতি—

(ক্রমশঃ)

ম্যুনসেনের চিত্রশালা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

জার্ম্মানীর সকল সহরের মধ্যে আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে বাভেরিয়ার রাজধানী ম্যুনসেনকে। এ সহরকে আমরা মিউনিক বলেই জানি। জার্ম্মানীতে গিয়ে জানলুম, এর নাম হচ্ছে ম্যুনসেন (Munchen)। ইসর-নদীতীরে এই সুন্দর সহরটি শুধু তার শোভা-সৌন্দর্য্য দিয়ে নয়, তার চিত্রশালা, তার মিউজিয়াম ও বিশেষ করে তার অধিবাসীদের দিয়ে বিদেশী পথিকদের মন ভুলায়। ম্যুনসেন সহরটি বেশ উঁচু—১৭০৫ ফিট, তার দক্ষিণে কিছু দূরে পাহাড়ের সারি। শুধু শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলে নয়, আর্টের এক প্রধান কেন্দ্র বলে ম্যুনসেনের বিশেষ খ্যাতি। তা'ছাড়া ম্যুনসেনের বিয়ারের কথা ইয়োরোপের সবাইএর জানা। এই বিয়ারের গুণেই হোক বা পাহাড়ের হাওয়ার গুণেই হোক, ম্যুনসেন-বাসীদের gemutlich প্রকৃতি বিদেশীদের অন্তর জয় করে। Gemutlich কথাটার ঠিক ইংরাজী অনুবাদ হয় না। এ কথাটির মধ্যে অমায়িকতা, হাস্যরসিকতা, সহজে আলাপ করবার ভাব, জীবনকে সহজে আনন্দময়রূপে নেবার ভাব,

দেখে, সেই সহজ সরল বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখে রেখা ও রংএ তাদের অমর করে এঁকেছেন। ছবির আইডিয়ার মধ্যে নয়; কিন্তু ছবি আঁকার কায়দার মধ্যে, সততা ও নিপুণতার মধ্যেই লাইবেলের শ্রেষ্ঠত্ব! চাষাদের রঙীন সাজসজ্জা আঁকতে, কোন কৃষক-পত্নীর ব্লাউজের কুঞ্চনগুলি আঁকতে, কোন বৃদ্ধার মুখের রেখাগুলি আঁকতে, এরূপ খুঁটিনাটি বাস্তব জিনিষ আঁকতে লাইবেলের আনন্দ। বাস্তবতার অম্লান নিছক রূপ দিতে তিনি ওস্তাদ। এই চাষাদের সত্য রূপ যাহা তাই তিনি দিতে চেয়েছেন; তাদের ভাবের রঙে রঙীন বা আবেগের আঘাতে দীপ্ত ক্ষিপ্ত বা দুঃখের বেদনায় করুণ করেন নি। তাঁকে কৃষক-জীবনের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি-চিত্রকর বলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পোর্ট্রেট-চিত্রকর লেনবাকও (Franz von L nbach. ১৮৩৬-১৯০৪) বস্তুতন্ত্রবাদী শিল্পীরূপে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। তিনি একজন সামান্য রাজমিস্ত্রির ছেলে ছিলেন। মুনসেনের চিত্রশালা দেখে তাঁর ছবি আঁকবার ইচ্ছা হয়, মুনসেনেই তাঁর চিত্রঅঙ্কনবিদ্যা আরম্ভ হয়।

সাক্-গ্যালারিতে মেষ পালক বালক (Der Histen-knabe) বলে তাঁর যুবাবয়সের আঁকা যে সুন্দর ছবিটি আছে, তাতে তাঁর উগ্র বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতালীর রৌদ্রদীপ্ত আকাশের তলে অলসমধুর মধ্যাহ্নে একটি বালক ছোট ছোট কচি ফুলের মাঝখানে সবুজ ভেলভেটের মত উঁচু ঘাসের ওপর প্রজাপতি ও মক্ষিকা-গুঞ্জরণের মধ্যে দেহ এলিয়ে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে শুয়ে আছে। তার সহজ সরল শোবার ভঙ্গী, তার রৌদ্রদগ্ধ নগ্ন

বাসগৃহ ও শিল্পীর বোন (মেনত্সেল)

পা দুটিখানি, তার খোলা হাত দেখে মনে হয় যেন রক্ত-মাংসের সত্যিকার একটি বালক। লেনবাক একটি ইতালীয়ান বালক আঁকতে চেয়েছিলেন। তাদের রোদ-পোড়া খোলা হাত-পা ব্রাউন রংএর হওয়া চাই; কিন্তু সব জার্ম্মান বালকদের হাত-পা সাদা,—তিনি ঠিক মত মডেল খুঁজে পেলেন না। অবশেষে কয়েকজন জার্ম্মান বালককে নানা খাবার জিনিষ উপহার প্রভৃতি দিয়ে তাদের হাত পা রোজ রোদে রেখে রোদ-পোড়া করান। সেই সত্যিকার রোদ-পোড়া ব্রাউন রংএর

গ্রাম্য পলিটিসিয়ানগণ (লাইবল্)

হাত পা দেখে তিনি ছবি আঁকেন। তাঁর এই ছবিতে এই সহজ সরল নগ্ন বাস্তবতা ১৮৫৬ অব্দের জার্ম্মানীতে সকল প্রাচীন অঙ্কন-পদ্ধতি আচারগত ধারা ভেঙে সকলকে চমকিত আশ্চর্য্যান্বিত করে উগ্র সুন্দররূপে এল। এমন খোলা রোদে-পোড়া পা এর আগে কেউ আঁকেনি।
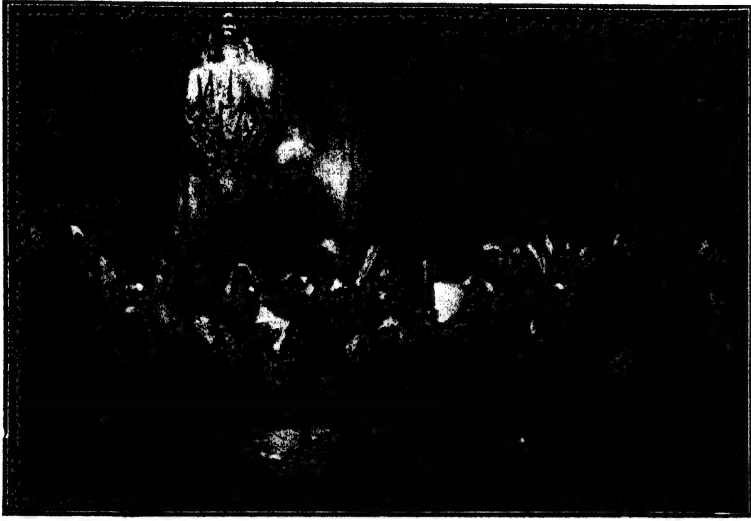
ফ্লুট কনসার্ট (মনত্সেল)

কিন্তু লেনবাকের পোর্ট্রেট-শিল্পের বাস্তবতা অন্য রকমের। তাহা বাহিরের সত্য নয়, অন্তরের সত্যকে প্রকাশিত করে। বিসমার্ক, মোল্টকে রিচার্ড ভাগনার ফাসলিত্স, গ্লাড্ষ্টোন, হেল্ম্হলত্স ইত্যাদি তাঁর সমসাময়িক ইয়োরোপের অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তিনি এঁকে গেছেন। তাঁর এই ছবিগুলি উনবিংশ শতাব্দীর বীরগণের মহান মূর্ত্তি রূপে, রংএর মহাকাব্য রূপে জেগে আছে। তিনি যাঁকে আঁকতে চেয়েছেন, তাঁকে মিষ্টি হাসি দিয়ে সুন্দর রং দিয়ে মধুর করতে চান্‌নি, তাঁর সহজ সরল প্রতিদিনের রূপকেও মূর্ত্তি দেন নি। তাঁর মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব, যে বিশেষত্ব, যে প্রতিভা, যে চিরন্তন রূপটি আছে, যা ইতিহাসে বেঁচে থাকবে সেই অন্তরের রূপটি, তিনি দৃঢ় শক্তিমান রেখায় সতেজ জীবন্ত রংএ এঁকেছেন। রং ও রেখার কোন ঐন্দ্রজালিক মায়াশক্তিতে তিনি অন্তরের পুরুষকে চিরন্তন রূপ দিয়েছেন।

লাইপজিগে লেনবাকের আঁকা বিসমার্কের একটি ছবি দেখেছি। ম্যুনসেনেও আর একটি ছবি দেখলুম। দুটি বিভিন্ন সময়ের বিসমার্কের বিভিন্ন বয়সের আঁকা। এই পরম শক্তিমান শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ এই "'man of blood and

চাষার ঘরে (লাইবল্)

iron"এর ছবি দেখলেই বোঝা যায়, লেনবাকের আঁকবার কায়দা। লাইপজিগের ছবিতে দেখা যায়, কি শক্তি ভাব,

তেজোময় পুরুষের মূর্ত্তি, যেন একটা অটল মহান পর্ব্বতচূড়া, যেন একটা শক্তির dynamo—মধ্যাহ্ন-গগনের প্রখর সূর্য্যের মত। প্রশস্ত শক্তিমান কপোল; তার তলে প্রতিভাদীপ্ত দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে। তার দৃষ্টি অন্তর ভেদ করে আসে, শূন্য মাথা যেমন দৃঢ়তাব্যঞ্জক, দাঁড়াবার ভঙ্গী তেম্নি ইচ্ছাশক্তি ও তেজে ভরা। ম্যুনসেনের ছবিটি বিসমার্কের শেষ জীবনের। জার্ম্মান সাম্রাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ মহান গৌরবে বসে'—যেন পৃথিবীর বাস্তবতা হতে দূরে কোন গৌরবময় রাজ্যে; অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের স্বপ্নভরা উজ্জ্বল চোখ দু'টি, টুপিঢাকা মাথা রহস্যময়, সমস্ত ছবিটি অস্তগামী সূর্য্যের দীপ্তি ও করুণ ভাবে ভরা। সমস্ত দেহ যেন অন্ধকারে মিশে গেছে, শুধু রেখাঙ্কিত তেজোময় বৃদ্ধ মুখ নির্ব্বাণোন্মুখ শিখার মত জল্‌জল্ করছে।

এই বস্তুতন্ত্রবাদী শিল্পীদের জগৎ থেকে ব্যকলীনের (Arnold Bocklin, ১৮২৭-১৯০১) চিত্রজগতে এলে মনে হয়, প্রকৃতির কল্পনার জগতে রংএর রূপকথাপুরীতে এলুম। ব্যকলীন, ফয়ারবাক, হান্স মারেস বাস্তবতার দ্বারা প্রতিক্রিয়া আনলেন, এঁরা কল্পনার আদর্শবাদের (idealism) শিল্পী।

বিসমার্ক (লেনবাক)
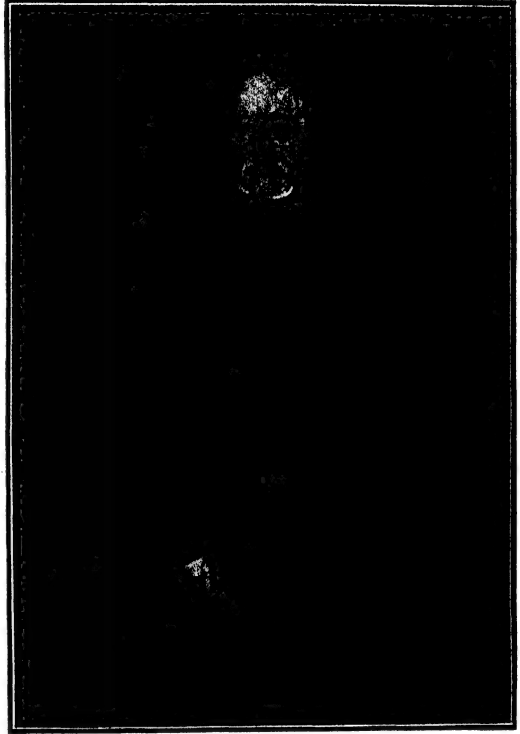
ব্যকলীনের জন্ম হয় সুইজারল্যণ্ডে বাজেলে (Basel)। ডুসেলডরফে তাঁর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা হয়। তারপর তিনি ব্রাসেল্‌স, পারি, রোম, ম্যুনসেন ইত্যাদি নানা স্থানে প্রাচীন চিত্রকরদের ছবি দেখে এবং ছবি এঁকে বেড়ান। কিন্তু তাঁর ছবির পরিকল্পনা ও ছবি আঁকার ভঙ্গী সম্পূর্ণ অভিনব; কোন প্রাচীন চিত্রকরের ধরণ তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর আর্ট সম্বন্ধে বলেছেন, কেউ অপরের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারে না; প্রত্যেককে নিজের আর্ট সৃষ্টি করতে হবে। এ কথা তাঁর সম্বন্ধে খুবই সত্য। বাস্তবিক আর্টের ইতিহাসে তাঁর কোন পূর্ব্বপুরুষ বা শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিকল্পনা ও অঙ্কন-রীতি তাঁর নিজের সৃষ্টি করা।

না

তরঙ্গে লীলা (ব্যকলীন)

প্রাকৃতিক দৃশ্যের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলেই তাঁর খ্যাতি। এই শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপদক্ষের (landscape painter) মধ্যে একটি সুন্দর বিবর্ত্তন-ধারা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম বয়সের প্রকৃতির শোভার ছবিগুলিতে দেখি, দৃশ্যের ভাবটি ছবির মূর্ত্তিগুলির মধ্যেও ফুটে উঠেছে; কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যই প্রধান স্থান জুড়ে আছে, এ দৃশ্য কিন্তু প্রতিদিনকার চোখে দেখা দৃশ্য। তারপর প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য তাঁর ছবিতে বিকাশ লাভ করল—"the harmonious blending of figures with landscape" এই প্রকৃতির রূপ ও ভাবের সঙ্গে মানুষের রূপ ও ভাবকে এক সুরে জড়িয়ে ছবি আঁকাতে তিনি ওস্তাদ হলেন। কিন্তু এখানে প্রকৃতির রূপ একটা রূপকের মত; শিল্পীর মনের কোন ভাব—বেদনা, আশা, আনন্দ, আইডিয়া মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনের বাস্তবতাকে নয়, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যালোককে আঁকাই আর্টের উদ্দেশ্য হল। নীলাকাশের উদারতা, সবুজ মাঠের বিপুলতা, নীল-সাগরের অসীমতার মধ্যে রংএর ইন্দ্রজালে অন্তরের কোন আনন্দ বা উদাসতাকে আত্মার কোন বেদনা বা উচ্ছ্বাসকে কোন অজানা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যজগতে মূর্ত্তিমতী করাই শিল্পীর সাধনা হল।

সমুদ্রতীরে ভিলা (বাকলীন)

প্রকৃতিকে কত রূপে কত ভাবেই বাকলীন এঁকেছেন; এ বাস্তব প্রকৃতি কিন্তু তাঁর সঙ্গে শিল্পীর মনের স্বপ্ন-জড়িত হয়ে রূপকথালোকের মত যেন কোন্ সুদূরের অপূর্ব্ব জগৎ হয়ে উঠেছে। কোন ছবিতে গ্রীষ্মের সুন্দর দিন; সুনির্ম্মল নীলাকাশে রোদ ফেটে পড়ছে; কাচের মত চকচকে জলে তার ছায়া পড়েছে; ফল-ভরা সবুজ মাঠ রোদে ঝলমল করছে। তার মধ্যে প্রকৃতির শিশুর মত নগ্ন নরনারীরা খেলা করছে। সমস্ত ছবি ভরে আলোর আনন্দের উচ্ছ্বাস। কোন ছবিতে বসন্তের আগমনী গান বাজছে, সবুজ মাঠে রঙীন
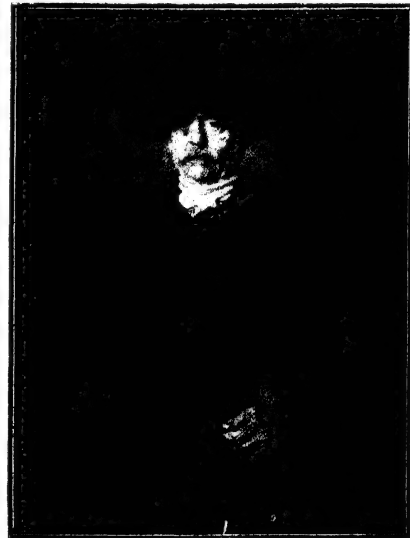
প্রিন্স. বিসমার্ক (লেনবাক)

ফুলগুলি আগুনের শিখার মত জ্বলছে; তাদের মধ্যে নগ্ন শিশুর দল হাস্য খেলায় মত্ত। আবার কোন ছবিতে প্রকৃতি গম্ভীরা বিষাদিনী। কোন ছবিতে উন্মত্তা প্রকৃতি;

মেষ-পালক বালক (লেনবাক)

ঝড়ে তার কালো সিপ্রেস-গাছের এলোচুল উড়ে যাচ্ছে; বন-গহ্বর বাতাসের হাহাকারে ভরে উঠেছে; কালো পাহাড়ের পাথর-দলের সঙ্গে শুভ্র সমুদ্রতরঙ্গ-দলের দ্বন্দ্ব চলেছে; আকাশ-বাতাস ক্ষুব্ধ গর্জ্জনে আকুল। এম্নি, কখনও মধুর, কখনও করুণ, কখনও রুদ্র, কখনও গম্ভীর; অন্তরের সকল রসভাবকে (mood) ব্যাকলীন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মূর্ত্তিমতী করেছেন। এ সৌন্দর্য্য যেন কোন বাস্তব প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নয়; কেন না, তাঁর প্রকৃতি-চিত্র তাঁর অন্তরের সৃষ্টি। শিল্পীর অন্তরের স্মৃতি-ভাণ্ডারে বাস্তব প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্যমণিগুলি জমা হয়েছে, তাই থেকে চয়ন করে সাজিয়ে তাঁর সৌন্দর্য্যলোকের সৃষ্টি। এখানে উনবিংশ শতাব্দীর কোন সমস্যা নাই; বাস্তব জীবনের কোন দ্বন্দ্ব নাই। এ যেন কোন নিত্যকালের অক্ষয় সৌন্দর্য্যলোক,—রূপকার তাঁর চিত্তের প্রকৃতির একটি ধ্যানকে রং ও রূপে পরিপূর্ণ করেছেন। শুধু ছবির পরিকল্পনায় নয়, তার রং-এর সমাবেশেও বাকলীনের ছবিগুলি মায়াময়। তাঁর আকাশের নীল অতি গভীর সুনির্ম্মল নীল; তাঁর আলোর উচ্ছলতা অগ্নির

দরিদ্র কবি (স্পিটভেগ)

দীপ্তির মত ; তাঁর মাটির সবুজ অতি গভীর নিবিড় সবুজ ; তাঁর বনের গাছের ছায়ার অন্ধকার ঘন কালো অন্ধকার ; তাঁর অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগ রক্তের টকটকে রাঙার মত। তাঁর রং প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকেই নেওয়া। সে রং তাঁর মনের রংএর সঙ্গে মিশে আরও গভীর, আরও নিবিড়, আরও দীপ্ত, আরও স্বচ্ছ, আরও প্রাণময় হয়ে উঠেছে। তাঁর ছবি যেন রংএর সঙ্গীত,—ঘন কালো হতে রক্তের রাঙা, জলজলে নীল সব এক আনন্দময় গম্ভীর ছন্দে মিশেছে।

সাক গ্যালারিতে 'সমুদ্রতীরে ভিলা' (Villa am Meer বলে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ ছবি আছে। ইতালীর সমুদ্র-তীরে লম্বা সিপ্রেস-গাছ-বেষ্টিত একটি বাড়ীর ছবি। কিন্তু ছবিটি একটি উদাস মনোভাবের রূপ। সমুদ্রের ঢেউগুলি করুণ ক্লান্ত সুরে তীরের ওপর ভেঙে পড়ছে ; কালো লম্বা গাছগুলি বাতাসে দুলছে ; অতি মৃদু দীর্ঘশ্বাসের মত কাঁপছে। তার মধ্যে হাহাকার গর্জ্জন নেই ; শুধু উদাস হতাশ্বাস। বাড়ীর পাশে সমুদ্রের তীরে একটি নারী উদাসিনী প্রকৃতির মত দাঁড়িয়ে। তার কালো কাপড়ও বাতাসে মৃদু দুলছে। সমস্ত ছবিভরে যেমন বাতাসের এই মৃদু গতি রয়েছে, তেম্নি একটা মহান গাম্ভীর্য্য রয়েছে ; তেম্নি উদার আকাশের আলোভরা উদাসতা রয়েছে। সেই উদাস সুরের রেখার ছন্দে প্রকৃতি ও নারীমূর্ত্তি এক সঙ্গে বাঁধা। ইতালী ব্যকলীনের বড় প্রিয়। তার কত শোভা তিনি এঁকেছেন। কিন্তু এ হাস্যদীপ্ত উজ্জ্বল আলোময় ইতালীর সমুদ্রতীর নয় ; এ লাতিন ইয়োরোপকে উত্তর ইয়োরোপের সন্তানের চোখে দেখা। ইতালীর উচ্ছল সহজ আনন্দের ওপর গম্ভীর উদাস ছায়া জড়িত হয়ে গেছে। ওই যে নারীটি উদাসচোখে ঢেউয়ের আসা-যাওয়া দেখছে, সে যেন অনন্ত কালের পদধ্বনি শুনছে।

গ্রীষ্মের দিন (ব্যকলীন)

ব্যকলীন প্রকৃতির নানা রূপ এঁকেই থামেন নি। তিনি প্রকৃতিকে প্রাণময়ী রূপে অনুভব করেছেন। যে ছবিগুলিতে তিনি প্রকৃতিকে শুধু স্বভাবের সৌন্দর্য্যরূপে দেখেন নি, প্রকৃতিকে মানব-মানবী-মূর্ত্তি-বিবর্জ্জিত করে' প্রাচীন গ্রীকদের রহস্যময়, সৌন্দর্য্যময় দৃষ্টিতে দেখে নানা উপদেবতা উপদেবীপূর্ণ, নানা কাল্পনিক জীবজন্তুপূর্ণ করে দেখে এঁকেছেন, সেই ছবিগুলি তাঁর শিল্পী-প্রতিভার চরম বিকাশ। প্রাচীন গ্রীকেরা প্রকৃতির প্রতি অংশ সজীব প্রাণময়ী দেখত ; বনের মধ্যে প্যানের (Pan) বাঁশি শুনতে পেত ; প্রতি বৃক্ষের আড়ালে ড্রায়াডের আবছায়ায় চমকে উঠত ; ঝর্ণার জল-ধারায় সুন্দরী কোন নাইয়াডের মূর্ত্তি দেখে অবাক্ হত ; জ্যোৎস্না-রাতে সাগরের জলে নিম্ফদের শুভ্রদেহের ঝিকিমিকি দেখত, ঝড়ের অন্ধকারে সমুদ্র গর্জ্জনে ট্রিটনের শিঙাধ্বনি শুনত—এম্নি গিরি বন বৃক্ষ নদী ঝোপ ঝর্ণা জলস্থল সমুদ্র সব প্রকৃতি কোন দেবতা বা উপদেবতা বা উপদেবীর বা সুন্দরী nymphদের আবাসভূমি লীলাক্ষেত্ররূপে দেখত। প্রাচীন গ্রীকদের প্রকৃতির প্রতি এই দৃষ্টি, জলেস্থলে অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী সৃষ্টি করবার শক্তি, এই myth তৈরী করবার অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভা ব্যকলীনের ছিল। তাই তিনি প্রতি বৃক্ষ, প্রতি ফুল, প্রতি পাথর, প্রতি সমুদ্র-ঢেউকে বাস্তবরূপে আঁকেন নি ; প্রতি বস্তু গ্রীক উপকথার কোন উপদেবদেবীতে অথবা আপন মনশ্চক্ষে কোন কাল্পনিক রহস্যময় জীবজন্তুতে মূর্ত্তিলাভ করে সজীব হয়ে উঠেছে। এই শিল্পী-কবির চোখে দেখা প্রকৃতির ছবিগুলি অপূর্ব্ব সুন্দর। সে যেন প্রকৃতির আদিকালের ও নিত্যকালের ছবি।

ম্যনসেনের নূতন পিনাকোটেকে ব্যকলীনের 'তরঙ্গে লীলা' (In spicl de Wellen) বলে একটি প্রসিদ্ধ ছবি আছে। সমুদ্রে ঢেউএর খেলা দেখতে দেখতে কবি-শিল্পীর দৃষ্টির সম্মুখে যেন নিমেষের জন্য কোন অপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। রৌদ্রে ঝলমল ঢেউগুলি সরে গিয়ে মৎস্য-নারীদের সুন্দর দেহ দেখা গেল, তাদের ঘিরে প্রণয়মত্ত ট্রিটনেরা, ভীম কদাচার সামুদ্রিক জন্তুরা মৎস্যনারীদের সঙ্গে ট্রিটনদের যে লুকোচুরি খেলা প্রণয়লীলা জলতলে চলছিল, সহসা তারি একটু সুন্দর দৃশ্য ঢেউএর ঝিকিমিকিতে ভেসে উঠল। আর এক ঢেউএর দোলায় মিলিয়ে যাবে। ছবিটিতে রংএর সমাবেশ ও সামঞ্জস্য বড় সুন্দর। সমুদ্রের গায় নীল, ঢেউএর ফেনার উজ্জ্বল সাদা, মৎস্যনারীদের জল-ধোওয়া দেহের কাঁচাসোণার রং, ট্রিটনের পাকা ধানের মত গায় হলদে রং, অদ্ভুত জন্তুটির ঝড়ের মেঘের মত কালো রং ; আর চারিদিকে আলো ও জলের উজ্জ্বল মিলনের ঝিকিমিকি।

সাক্ গ্যালারিতে 'ট্রিটন ও নেরেইড' (Triton and Nereide) বলে, আর একটি সুন্দর ছবি আছে। সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, সমুদ্রের ক্ষুব্ধ তরঙ্গদলের মধ্যে একটি পর্ব্বত-শিলায় একটি ট্রিটন বসে, তার বৃহৎ শঙ্খধ্বনি করে, অপর সকল সামুদ্রিক জীবজন্তুদের বলছে, ঝড় আসছে। তার পাশে এক বারুণীকন্যা নগ্ন দেহ এলিয়ে শুয়ে কোমল হাত দিয়ে একটি রঙীন সাপকে আদর করছে। জল-সর্পের নানা রংএ চিত্রিত লম্বা দেহ পাহাড় বেয়ে জলে নেমে গেছে। সমস্ত ছবিটি ভরে প্রকৃতির উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের মত রংএর মত্ত উচ্ছ্বাস আছে। ট্রিটনের লোমশ কালো দেহ ঝঞ্ঝার আকাশের পটে একটা ঘন কালো ছায়ার মত (silhoutte) ; তার পাশে বারুণীকন্যার শুভ্রদেহ ক্ষুব্ধ তরঙ্গগুলির শুভ্র ফেন-পুঞ্জের মধ্যে যেন সমুদ্রের সাদা ফেনা জমাট করিয়া গড়া, তার পাশে বিচিত্র রংএর লম্বা সাপটি যেন সমুদ্রতলের মণিমুক্তার স্বপ্ন। বাস্তব লোকের সকল দ্বন্দ্ব-সমস্যা সকল কদর্য্যতা হতে বহুদূরে কল্পনার আনন্দলোকের, প্রকৃতির চিরকালের সৌন্দর্য্যপুরীতে, ব্যকলীন তার এই ছবিগুলিতে আমাদের নিয়ে গেছেন।

দুষ্ট গ্রহ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(১)

রাত্রি তখন নয়টা। অভ্যাসমত ময়দানে হাওয়া খাইয়া রমেন বাড়ী ফিরিতেছিল।

পথের ধারে একটা আঁধার কোণে বসিয়া ছিল ছোট একটি মেয়ে, বছর দশ বারো বয়স হইবে। মেয়েটির কাছে আসিয়া রমেনের তার উপরে নজর পড়িল। তার রকম দেখিয়া রমেনের সন্দেহ হইল। একটু পরীক্ষা করিয়া সে দেখিল বালিকা মূর্চ্ছিতা।

রমেন সাধারণ গৃহস্থ। রোজ দশটা পাঁচটা আফিস করে, সংসার দেখে, স্ত্রী ছেলেমেয়ে লইয়া বাস করে ; তার দিনের পর দিন কাটিয়া যায় এক অবিচিত্র ম্যাটমেটে সাদা ভাবে। কোন অস্বাভাবিক উত্তেজনা বা রোমান্স বা ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইবার কোনও বেয়াড়া খেয়াল তার মনের কোণেও সাড়া দেয় না।

কিন্তু আজ একটা নূতন রকম সাড়া সে হঠাৎ অনুভব করিল। আশে পাশে চাহিয়া দেখিল। ভবানীপুরের সেই জনবিরল পল্লী তখন হয় নিদ্রিত, না হয় বন্ধ দুয়ারের ভিতর অপ্রকাশ ভাবে জাগ্রত। লোক দেখা গেল না।

মেয়েটিকে অমনি অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে সে পারিল না। কিন্তু কি যে করিবে সে একা মানুষ, কোথায় ইহার বাপমার খোঁজ করিবে, তাহাও ভাবিয়া পাইল না। ছাই একটা পাহারাওয়ালাও যদি কোথাও থাকিত !

একখানা খালি ট্যাক্সি হঠাৎ মোড় ফিরিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। রমেন ট্যাক্সি ডাকিয়া মেয়েটিকে

উঠাইয়া, নিকটে একটা ছোট ডাক্তারখানায় লইয়া গেল।

ডাক্তারের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় মেয়েটি যখন সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন সে ভয়ানক ভয় পাইয়া বলিল, "এ কোথায় আমাকে এনেছেন আপনারা? আমি বাড়ী যাব।"

রমেন বলিল, "কোথায় তোমার বাড়ী, চল পৌঁছে দিয়ে আসি।"

মেয়েটি ঠিকানা বলিল। রমেন আর একখানা ট্যাক্সি করিয়া যেখানে সে মেয়েটিকে প্রথম দেখিয়াছিল সেইখানে ফিরিয়া গেল।

পথে মেয়েটি বলিল, "মা আমাকে বড্ড বকবেন। না জানি কত দেরী হ'য়ে গেছে।"

রমেন তাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে কয়েকটা প্রশ্ন করিল। তাহার উত্তরে সে জানিল যে রাতে হঠাৎ তেলের প্রয়োজন হওয়ায় তার মা তাকে পয়সা দিয়া মুদীর দোকানে পাঠাইয়াছিলেন তেল আনিতে। তখনই সে শরীরটা খারাপ বোধ করিতেছিল—পথে কিছুদূর গিয়াই তার মাথা হঠাৎ ঘুরিয়া উঠিল—তার পর আর সে কিছু জানে না।

রমেন বলিল, "এত রাত্রে তুমি কেন গেলে, কোনও ঝি চাকর না পাঠিয়ে।"

মেয়েটি একটু ঈষৎ বিব্রতভাবে হাসিয়া বলিল, "তা' আমি কত যাই।"

"ভারী অন্যায় তোমার মার। ঝি চাকর না পাঠিয়ে ছোট মেয়েকে রাত্তিরে এমনি পাঠান ভারী অন্যায়।"

মেয়েটি একবার করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া একটু পরে বলিল, "কেন এতে দোষ কি? আজ না হয় একটু শরীর খারাপ হ'য়েছিল—নইলে এমন তো আমি রোজ করি।"

রমেন বলিল, "চল তোমার বাবাকে আজ ব'লে আসি, যাতে আর তুমি এমন না যাও,—এ ভারী অন্যায়।"

মেয়েটি একটু থামিয়া বলিল, "বাবা তো থাকেন না এখানে।"

"তবে তোমার দাদাম'শায় কি মামা কি খুড়ো যে থাকেন"—

"আর কেউ থাকেন না, শুধু মা আর আমি।"

কথাটায় রমেনের হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। সে সহজভাবে ধরিয়াই লইয়াছিল যে, মেয়েটির বাপ, না হয় কোনও পুরুষ অভিভাবক আছেই। যেই সে আবিষ্কার করিল যে পুরুষ অভিভাবক এর কেউ নাই, তখন মেয়েটির উপর চট্ করিয়া কেমন একটা মায়া হইল। সে বলিল, "আহা! তাই তোমার এ অবস্থা। মেয়েছেলের বুদ্ধি। আচ্ছা, তোমার মাকে শুনিয়ে আমি সাবধান ক'রে দিয়ে আসবো।"

হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া মেয়েটি করুণভাবে বলিল, "দেখুন, মাকে এ সব কথা কিছু বলবেন না।"

"ব'লতে হ'বে বই কি? নইলে কবে কি হ'য়ে প'ড়বে কিছু ঠিকানা আছে?"

"না, দেখুন, এসব শুনলে মার বড় কষ্ট হ'বে। তিনি তো ইচ্ছা ক'রে আমাকে পাঠান না, আমিই জোর ক'রে আসি।"

"কেন বল দেখি তোমার এ বেয়াড়া খেয়াল?"

"দেখুন, মার শরীর ভাল নয়, সারাদিন খেটে খেটে এমন ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ী ফেরেন যে নড়তে পারেন না। তবু সুধু এই মুদীর দোকান ছাড়া আর কোথাও যেতে হ'লে নিজেই ছুটে যান, আমাকে যেতে দেন না। সুধু এই মুদীর দোকানে আমি জোর ক'রে আসি। নইলে মা যে ম'রে যাবে।"

বালিকার চক্ষু ভিজিয়া উঠিল।

রমেন শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। সে বালিকার পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি ও পরিষ্কার কাপড় দেখিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল যে সে ভদ্রলোকের মেয়ে—এবং কোনওরূপ বিচার বিতর্ক না করিয়া সে স্থির করিয়াছিল যে সে রমেনেরই মত একটা গৃহস্থ পরিবারের লোক। ক্রমে তার ধারণা এক এক করিয়া বদলাইতেছিল; কিন্তু এ কথায় তাহাকে স্তম্ভিত করিল। সুধু মা আর মেয়ে থাকে—মা বাহিরে খাটিতে যায়! তবে নিশ্চয়ই ভদ্রকন্যা এ নয়!

আর একটু পরে সে আবিষ্কার করিল যে নেলী—মেয়েটির নাম নেলী—স্কুলে পড়ে এবং তার মা কোনও পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখায়। এবং সর্ব্বশেষে শুনিল যে তাদের ঝি চাকর কিছুই নাই, রাখিবার শক্তি নাই। নিজেদের দারিদ্র্যের কথাটা নেলী যথাসম্ভব চাপিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই।

গলির মুখে ট্যাক্সি বিদায় করিয়া রমেন দেখিল নেলী

গলির ভিতর খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি তার সঙ্গ ধরিতেই নেলী বলিল, "আপনার আর আসতে হ'বে না, আমি এখন যেতে পারবো।"

বলিয়াই কিন্তু সে টলিয়া পড়িল। এতটা পথ তাড়াতাড়ি আসিতেই তার মাথাটা আবার ঘুরিয়া উঠিয়াছিল। রমেন তাহাকে ধরিয়া ফেলিলে নেলী একটু সামলাইয়া উঠিল। তার পর রমেন তাকে কোলে করিয়া তার নির্দ্দেশমত বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল।

ডাক্তার রমেনকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ার কারণ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; কিন্তু মেয়েটি অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং বোধ হয় যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তার এ দুর্ব্বলতা ও মূর্চ্ছা হইয়াছে। তিনি তাকে ঔষধ দিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, বাড়ী পৌঁছাইয়াই যেন তাকে একটু ব্রাণ্ডি সহযোগে গরম দুধ খাইতে দেওয়া হয়।

যে বাড়ীর দুয়ারের কাছে রমেন নেলীর নির্দ্দেশমত আসিয়া থামিল, সে বাড়ীটা প্রকাণ্ড—লোকে গিজগিজ করিতেছে, এবং যথোচিত নোংরা। এত বড় বাড়ী ও লোকজন দেখিয়া দূর হইতে তার মেয়েটির কথিত বিবরণে একটু সন্দেহ হইয়াছিল; কিন্তু খোলা দুয়ারের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতেই সে দেখিতে পাইল যে, সন্দেহের কোনও হেতু নাই। বাড়ীটি প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু এ বাড়ী সুধু নেলীদের নয়। অনেকগুলি স্বতন্ত্র ভাড়াটিয়া এ বাড়ীতে থাকে, প্রত্যেকে একটি কি দুটি ঘর লইয়া বাস করে। তাদের ভিতর নানা জাতির নানা শ্রেণীর লোক আছে। এ বাড়ীটা একটা অপেক্ষাকৃত উন্নত রকমের বস্তি।

একতলায় সদর দরজার কাছেই একটা ঘর নেলীদের। দরজা ভেজান ছিল, নেলী ডাকিতেই দুয়ার খুলিয়া দিল একটি নারী, যাকে দেখিয়া রমেনের মনে একটু চমক লাগিয়া গেল।

নেলীর মা করুণার চেহারা দেখিয়া মনে হয় না যে নেলী তার মেয়ে। বড় জোর বিশ বছরের মেয়েটি—ছোট্ট খাট্ট; রঙ ময়লা, পাতলা ছিপ ছিপে এবং খুব রোগা। তার মুখের ভিতর একটা ক্লিষ্ট ক্লান্ত পীড়িত ভাব ছিল, আর চোখ দুটি তার ছিল বড় করুণ।

নেলীকে এক অপরিচিত পুরুষের কোলে দেখিয়া করুণা হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। নেলীর জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া খোঁজাখুঁজি করিয়া এইমাত্র সে ফিরিয়া আসিয়া অসহায় হইয়া কাঁদিতেছিল। নেলীকে দেখিয়া তাই তার মুখ হঠাৎ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে ব্যস্ত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল।

রমেন বলিল, "আপনার মেয়ে পথে মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছিল, ওকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়েছিলাম," বলিয়া রমেন ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর অগ্রসর হইয়া এক ধারের এক জীর্ণ তক্তপোষের উপর বিছানায় নেলিকে শোয়াইয়া দিল।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া করুণা তার অনুসরণ করিয়া নেলির পাশে আসিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িল। তখন রমেন বলিল, "ডাক্তার ব'লেছেন ব্যস্ত হ'বার বিশেষ কোনও কারণ নেই; কিন্তু ওকে এখনি এই ওষুধ আর ব্রাণ্ডি দিয়ে একটু গরম দুধ খাইয়ে দিতে ব'লেছেন।"

"গরম দুধ!" হঠাৎ একটু আবেগের সহিত কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই করুণা আপনাকে সামলাইয়া লইল।

সে উঠিয়া রমেনের হাত হইতে ঔষধের শিশি দুইটা লইয়া বলিল, "আপনি আমার বড় উপকার ক'রেছেন—কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি না। এখন রাত অনেক হ'য়েছে, আপনাকে আর কষ্ট দেব না, আপনি আসুন, নমস্কার।"

যাইতে রমেনের পা সরিল না, কিন্তু এমন স্পষ্ট বিদায়ের পর তার দাঁড়াইবারও কোনও উপায় রহিল না। সে অতি ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল—একবার বলিল, "কিন্তু গরম দুধটা এক্ষুনি দিন।"

করুণার মুখের উপর দিয়া এ কথাটায় যে একটা অব্যক্ত বেদনার ছায়া চলিয়া গেল তাহা রমেনের চোখে পড়িল। কিন্তু তার অর্থ টা ভাল করিয়া বুঝিবার আগেই তার পশ্চাতে ঘরের দুয়ার বন্ধ হইয়া গেল। দরজা বন্ধ করিবার আগে করুণা আবার অত্যন্ত বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া তাকে আবার ধন্যবাদ জানাইয়াছিল; কিন্তু দরজাটা উত্তরের অবসর না দিয়াই দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়াছিল।

পথে চলিতে চলিতে রমেন এ আশ্চর্য্য রমণী ও তার আশ্চর্য্য ব্যবহারের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। করুণার ঘরখানি বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার। কিন্তু তার

চারিদিকেই অভাব ও দারিদ্র্যের নিদারুণ ছায়া রমেন লক্ষ্য করিয়াছিল। ওই একখানা তক্তপোষ ছাড়া আসবাবের মধ্যে সেখানে ছিল শুধু একটি ছোট মোড়া, একটা কেরোসিন গ্যাসের ষ্টোভ, সামান্য কিছু বাসনপত্র ও একটা মাঝারী গোছের তোরঙ্গ। রমেনের মনে হইল, ইহাই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব; আর তাহা মা ও মেয়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া তার মোটেই মনে হইল না।

কিন্তু করুণার ব্যবহার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র, তার ভিতর দারিদ্র্যের সহিত সংশ্লিষ্ট দীনতার কোনও সংস্রবই নাই। বরং রমেনকে অমন করিয়া বিদায় করার ভিতর যেন একটু অদরিদ্র-সুলভ রূঢ়তাই দেখা গেল। এ ব্যবহারে রমেন প্রথমে বেশ একটু আহত বোধ করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তার খেয়াল হইল, যে, এত রাত্রিতে—তখন রাত্রি এগারটা অতীত হইয়াছে—করুণার মত যুবতী একজন নিঃসম্পর্ক পুরুষকে ঘরের ভিতর রাখিয়া লোকের চক্ষে গ্লানি অর্জ্জন করিতে কিছুতেই পারে না। তখন তার করুণার উপর শ্রদ্ধা হইল।

একটা ময়রার দোকানের পাশ দিয়া রমেন যাইতেছিল। ময়রার বেচা-কেনা তখন শেষ হইয়াছে, কিন্তু তার কারিগরেরা তখন পরের দিনের জন্য খাবার তৈয়ার করিতেছে, একটা প্রকাণ্ড কড়াইয়ে করিয়া একজন দুধ জ্বাল দিতেছে।

দুধটা রমেন বড় ভালবাসে, তাই গরম দুধের গন্ধটা তার পেটের ক্ষুধা ও রসনার লোভ সমান উদ্রেক করিল। সে একটু জোরে বাড়ীর দিকে চলিল—সেখানে তার জন্য দুধ ভাত প্রতীক্ষা করিতেছে। তার মনে হইল দুধ জিনিষটা কি চমৎকার খাদ্য। অথচ এই দুধ কলিকাতায় দুর্লভ। সেদিন সে কাগজে পড়িতেছিল যে ভাল দুধের অভাবে কলিকাতার শিশুরা ভাল বাড়িয়া উঠিতে পারে না এবং অনেক গরীবের ছেলেপিলে দুর্ম্মূল্য দুধ না খাইতে পাইয়াই অকালে মারা যায়। চড়াৎ করিয়া তখন তার মাথার ভিতর আঘাত করিল এই সন্দেহ যে হয় তো নেলী তাদের একজন! হয় তো কেন নিশ্চয়! রমেন থমকিয়া দাঁড়াইল।

রমেন চিরকাল দুধে-ভাতে মানুষ হইয়াছে। যাদের সঙ্গে তার মেলামেশা তারা সবাই দুধ রাখে ও খায়। সুতরাং তার মনে গৃহস্থালীর সঙ্গে দুধের নিত্য সম্বন্ধ ছিল। কাজেই যখন সে করুণাকে নেলীর জন্য দুধের কথা বলিতেছিল তখন তার মনের ধার দিয়াও এ কথা আসে নাই যে করুণার ঘরে দুধ নাও থাকিতে পারে। কিন্তু এখন তার মনে হইল যে দুধ তার ঘরে নিশ্চয়ই নাই—এবং হয় তো দুধ কিনিবার পয়সাও তার এখন নাই। এখন সে বুঝিল যে গরম দুধের কথায় করুণার মুখের উপর অমন কালির রেখা কেন পড়িয়াছিল।

রমেন ফিরিয়া ময়রার দোকানে গেল। প্রথমে একটু দুধ সে চাখিয়া দেখিল—ভাল বলিয়াই মনে হইল। তার পর সে আধ সের গরম দুধ কিনিয়া একটা ভাঁড়ে করিয়া লইয়া ফিরিয়া গেল করুণার বাড়ী।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তার সঙ্কোচ বোধ হইল। কি জানি কেন দুধ লইয়া করুণার কাছে যাইতে তার সাহস হইল না। বাড়ীটার সম্মুখে রাস্তার উপর খাটিয়া বিছাইয়া এক ছোকরা শুইয়াছিল, বোধ হয় এই বাড়ীরই কোনও বাসিন্দা। রমেন তাকে গিয়া বলিল, "ওই ঘরে যে মেয়েলোকটি থাকে তাকে জান?"

সে লোকটা বলিল, "কে, মেমসাহেব?"

"আরে না মেমসাহেব নয়, বাঙ্গালীর মেয়ে—একটা মেয়ে আছে—তার—নেলী।"

"হাঁ, হাঁ, ওকেই হামরা মেম সাহেব বোলে। সে জানে!"

"তুমি এই দুধের ভাঁড়টা নিয়ে তাঁকে দাওগে, আর ব'লো কি ডাক্তার বাবু পাঠিয়ে দিয়েছে। বুঝলে?"

লোকটা উঠিল। দুধের ভাঁড় লইয়া যখন সে গেল তখন বাহিরে একটু আড়াল হইয়া রমেন দেখিতে লাগিল। সে দেখিল দুয়ার খুলিয়া করুণা লোকটার সঙ্গে কথা কহিতেছে। দুধের ভাঁড়টা লইবার তার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া শেষে সে ভাঁড়টা লইল।

তখন রমেন অনেকটা সুস্থ চিত্তে বাড়ী ফিরিল।

(ক্রমশঃ)

ভ্রাম্যমানের জল্পনা

(ইংরাজী হ্রদ প্রদেশ)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বহুদিন থেকে সাধ ছিল যে ইংরাজ কবিদের প্রিয় বিখ্যাত হ্রদপ্রদেশ (Lake district) একবার দেখ্‌তে যাব। কিন্তু ছয়-সাত বৎসর আগে বিলাতে যখন প্রথম আসি, তখন হঠাৎ একটা বিষম ইংরাজ-বিরাগ আমাদের সকলকারই অসহযোগপন্থী মনকে আশ্রয় ক'রে ব'সেছিল। ফলে আমরা প্রতি ছুটিতেই ছুটতাম "কন্টিনেণ্ট" দেখ্‌তে।

কাজটা যে কিছু মন্দ করতাম তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বল্‌তে চাই কেবল এই কথাটি মাত্র যে মানুষের সব চেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে আগে কোনও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরা। এ বিশ্বাস নানা অবস্থায় নানা-রকম হ'তে পারে। কোন্ সময়ে এ বিশ্বাস যে কি রূপ ধারণ করবে সেটা নির্ভর করে অনেকগুলি জটিল কারণের সমষ্টির উপর। আজ ইংরাজ ভারত শাসন না ক'রে সুইস জাতি আমাদের উপর প্রভুত্ব করলে সম্ভবতঃ ইংরাজী হ্রদগুলি আমাদের চোখে সুইস হ্রদের চেয়ে সুন্দর ব'লেই ঠেক্‌ত, ও তখন আমরা নানা যুক্তিবলে প্রতিপন্ন

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ফার-কুঞ্জ

করতে চেষ্টা করতাম যে ইংরাজী হ্রদের তুলনায় সুইস হ্রদ হীনপ্রভ হ'তে বাধ্য।

সে-যুগের ইংরাজের সব-কিছুরই প্রতি বিরাগটা আমাদের মনে খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাই ব'লে এ মনোভাবটি প্রশস্য ছিল না।

এই কয় বৎসরের অতিপাতেই এ কথাটা আজ স্পষ্টতর ভাবে প্রতিভাত হয়—বোধহয় অনেকেরই চোখে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় উইলিয়াম জেম্‌সের কথা যে আমরা খুব কম স্থলেই যুক্তির ভিত্তির উপর বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকি।

অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর উদয়ালোকের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের মনে যে দুর্জ্জয় বিরাগ জমে উঠেছে, সেই বিদ্বেষই আমাদের শিখিয়েছে ইংলণ্ডের সব-কিছুকেই হীন প্রতিপন্ন করতে। এ বিদ্বেষের রঙটি একটু বেশি মসীবর্ণ হ'য়ে উঠেছে আরও একটা কারণে—যাকে

বলা যায় 'প্রতিক্রিয়ার মনস্তত্ত্ব' বা psychology of reaction.

অর্থাৎ এক সময়ে আমরা মনে করতাম যে সব-কিছুতে ইংরাজই আমাদের গুরু ও আমরা তাদের পোষ্যপুত্র। তখন "বিলিতি ধরণে হাসা ও ফরাসী ধরণে কাশা-"ই ছিল হিন্দু সভ্যতার চরম নিদর্শন। শুধু তাই নয় আমাদের সভ্যতা ও আচার ব্যবহারের কোনও সমর্থনই আমরা খুঁজে পেতাম না যদি আমাদের ইংরাজ গুরুকুলের তৈরি বোধোদয়ে ম্যাক্সমূলর প্রমুখ ধীমানদের অনুমতি না পেতাম। একে আজকাল বলা হয় দাস মনোভাব বা Slave psychology.

তার পরেই পেণ্ডুলামের দোলনের মতন আমাদের মনটি একেবারে অনুরাগের সীমা থেকে বিরাগ জলধির মধ্যে হাবুডুবু খেতে সুরু ক'রে দিল। আমরা বিলাতে এসেছিলাম এই বিরাগের মাত্রা যখন চরম সীমায় পৌঁছেছিল—তখন, অর্থাৎ অসহযোগের চরম মাত্রায়। তাই তখন ইংলণ্ড দেশের সবুজের মনোহারিণী শোভাও আমাদের চোখে ঠেকেছিল অনেকটা অন্তঃসারশূন্য মায়াবিনীর বঞ্চনাপূর্ণ হাসির মতন।

এবার য়ুরোপে এসে গল্‌স্‌ওয়ার্দির "ফরসাইথ সাগা" নামক বিরাট উপন্যাসটি পড়তে পড়তে এ কথা যেন আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি ক'রেছিলাম। কারণ, মনে হচ্ছিল, সাত আট বৎসর আগে কি কারণে এমন চমৎকার উপন্যাসটি পড়ি নি? এখনও আমাদের দেশে খুব কম সাহিত্য-রসিকই বোধ হয় খবর রাখেন গল্‌স্‌ওয়ার্দি একজন কত বড় শিল্পী। আমরা আজকাল মাতোয়ারা হ'য়ে উঠি হামসুন, বার্বুস, মার্গারিট, হাউপ্টমান, চেকভ প্রভৃতির নামে। কিন্তু বস্তুতঃ গল্‌স্‌ওয়ার্দি ও হার্ডি যে এঁদের চেয়ে ঢের বড় শিল্পী সে-খবর রাখি না (অবশ্য রোমাঁ রোলাঁ, গর্কি, ফ্রাঁস প্রভৃতি কয়েকজন সত্য শিল্পীর কথা আলাদা—কারণ তাঁরা চিরকালই নমস্য থাকবেন—কিন্তু আমরা তাঁদের সঙ্গে যে পূর্ব্বোক্ত লেখকদের এক নিঃশ্বাসে নাম করতাম তাইতেই কি প্রমাণ হয় না যে আমরা এঁদের গুণানুরাগী হ'য়ে উঠেছিলাম বিশেষ ক'রে ইংরাজ সাহিত্যকে একটু হীন প্রতিপন্ন করবার জন্যেই)।

এ কথা হয়ত কারুর কারুর কাছে একটু বেশি বাড়াবাড়ি মনে হ'তে পারে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে সম্ভবতঃ অনেকেই স্বীকার করবেন যে এ-অভিযোগের মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। নইলে গল্‌স্‌ওয়ার্দি ও হার্ডির নাম আমাদের দেশে এত কম শোনা যায় কেন—যেখানে বঙ্কের, মেটারলিঙ্ক, ব্রিয়ো প্রভৃতির নাম সাহিত্য-সমালোচকের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত? কেন আমরা আজ অবধি এঁদের গুণ গ্রহণ করতে অক্ষম হ'য়ে উঠেছিলাম?

তবে বড় শিল্পীর বিশ্বজনীনতার সাম্‌নে বিশ্বকে মাথা নীচু করতে হয়ই—কোনও না কোনও সময়ে। গল্‌স্‌ওয়ার্দি ও হার্ডি তাই আজকাল ভারতবর্ষেও প্রশংসা পেতে আরম্ভ করেছেন। সেদিন একটি মাসিকীতে গল্‌স্‌ওয়ার্দির নাট্য-প্রতিভার প্রশংসাবাদ দেখে মনটা খুসি হ'ল।

তব মনে হ'ল তাঁকে আমরা আজ অবধি তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেই নি। কেন না তাঁর সমস্ত জীবনে গল্‌স্‌ওয়ার্দি যদি আর কিছু না-ও লিখতেন তবে তাঁর "ফরসাইথ সাগা"র জন্যে যে তিনি স্থায়ী স্রষ্টাদের সঙ্গে জগতের বিশ্ব-ভারতীতে আসন পেতেন এ কথা স্বীকৃত হওয়া দরকার।

গল্‌স্‌ওয়ার্দিকে যে আমরা বাংলাদেশে এখনও ঠিকমত বুঝি নি, তার প্রমাণ আমরা অনেক সময়েই ওয়েল্‌সের সঙ্গে তাঁর এক নিঃশ্বাসে নাম করি। ওয়েল্‌স্ টাকা-আনা-পাই বুঝদার, নাম-পিপাসু adventurer; গল্‌স্‌ওয়ার্দি শিল্পী। ওয়েল্‌স্ এমন জিনিষ কখনও লেখেন না যার অর্থমূল্য নেই, গল্‌স্‌ওয়ার্দি যা বলবার প্রেরণা পান কেবল তাই লেখেন। এ বিষয়ে হার্ডি ছাড়া একমাত্র বার্ণার্ড শ গল্‌স্‌ওয়ার্দির সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য।

কয়েক বৎসর আগে Brothers Karanazov ও John Christopher প'ড়ে মনে আনন্দ হয়েছিল—মস্ত প্রতিভার স্বাদ পেয়ে। এবার ইংলণ্ডে এসে Forsyte Sagas নামক হাজার পাতার উপন্যাসখানি প'ড়ে অনেকটা সেই ধরণেরই নিবিড় আনন্দ পেয়েছিলাম। মনে হ'ল যে হাঁ একজন সত্য শিল্পী বটে! চরিত্র চিত্রণে তুলি ধরতে জানেন বটে! কটি রেখাপাত করলে একটি ছবি ফুটে ওঠে সে সম্বন্ধেও সংযমের প্রতি সচেতন বটে!

তাঁর Inns of Tranquility ব'লে একটি বইয়ে একটি ছোট নক্সা প'ড়ে আরও বেশি ক'রে বুঝতে পারলাম—কত বড় শিল্পী তিনি। লেখাগুলি ঝরঝরে, তরতরে—যেন খোদাই করা। একটা ছবি লেখায় ফোটানো যে কত

দুরূহ; মাত্রার মর্য্যাদা বজায় রাখা যে কত কঠিন; মানুষ যে কত কথা বল্‌তে চায় যা-বলার লোভ সংবরণ করার মধ্যেই সত্য কলাকারু বিরাজ করে;—এ বইখানিতে বর্ত্তমান মোটর গাড়ীর অভ্যুদয়ে একটি 'ক্যাব'-চালকের 'ক্যাব' চালিয়ে জীবনধারণ করার ট্রাজিডি-চিত্রণে যেন সেটা নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রেছিলাম। একজন ক্যাব-চালক গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দিকে গভীর রাত্রে তার বৃদ্ধ অশ্ব ও দুঃস্থ পরিবারের কাহিনী বল্‌ছিল—যেহেতু সে রাত্রে তিনি কোন মতেই একটি মোটরের দেখা না পেয়ে তার ক্যাব চ'ড়তে বাধ্য হ'য়েছিলেন। কি নিবিড় বেদনা, কি সহজ অনুভব-শক্তি ও সর্ব্বোপরি কি সংযম! Inns of Tranquility বইখানিতে বিশেষ ক'রে এই চিত্রটি আমাদের সাহিত্য-রসিকদের পড়তে আমি অনুরোধ করি। একটি ছোট্ট নক্সার মধ্যে যে কত বেদনার আনন্দ যথার্থ শিক্ষার তুলিতে ফুটে ওঠে, এ চিত্রটিতে তা বোঝা যায়।

এই সংযম, সমবেদনা ও প্রসাদগুণ বৃহৎ হ'য়ে জমাট হ'য়ে ফুটে উঠেছে কবির "ফরসাইথ সাগা" উপন্যাসটিতে। এখানে আমার একটি ইংরাজ বান্ধবী সেদিন বল্‌ছিলেন যে বইখানি বর্ত্তমান ইংরাজ সমাজের কি আশ্চর্য্য ব্যবচ্ছেদ!

কিন্তু "ফরসাইথ সাগা" একটা সত্যিকার বড় সৃষ্টি এই জন্যে যে, এর ইঙ্গিত ও আকুতি শুধু ব্যবচ্ছেদেই পর্য্যবসিত নয়। এটি একজন শিল্পীর আঁকা জীবন্ত ছবি। গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি নিজে তাঁর উপন্যাসটির ভূমিকায় লিখ্‌ছেন:—

"But this long tale is no scientific study of a period; it is rather an intimate incarnation of the disturbance that Beauty effects in the lives of men."

লেখক তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে আশ্চর্য্য রকম কৃতকার্য্য হ'য়েছেন। তাঁর গল্পের নায়িকা আইরিণের প্রধান ও একমাত্র সম্পদ—তার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য। আর কিছুই তার ছিল না। আমার পূর্ব্বোক্ত বান্ধবী বল্‌ছিলেন:—"It is curious she had nothing else—except that elusive charm···yet what havoc she wrought everywhere! And how subtly has this subtle charm been brought out!"

কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির বসিনে ও আইরিণের চরিত্র-চিত্রন আশ্চর্য্য, অনুপম, মর্ম্মস্পর্শী!

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য তিনি যে-ভাবে ও যে টেক্‌নিকের সাহায্যে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন ক'রেছেন। এ পদ্ধতিটি একটু অভিনব পদ্ধতি। নায়ক ও নায়িকা—বসিনে ও আইরিণ—
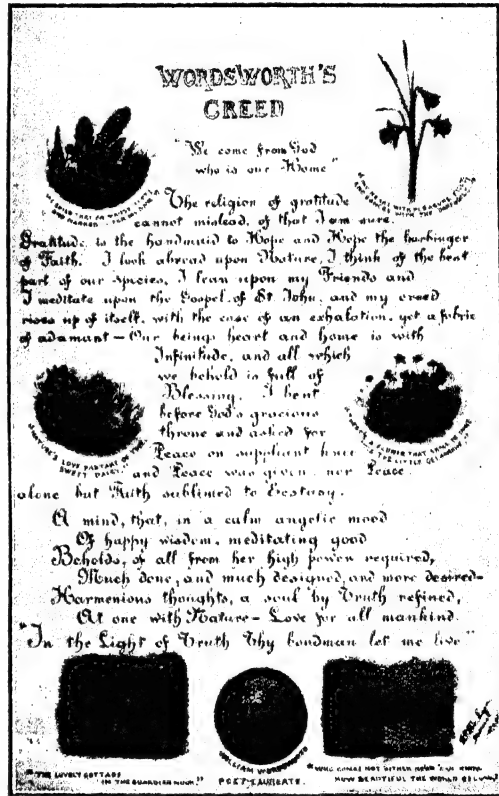
কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বাণী

প্রায় তখনও দেখা দেয় নি। তাদের ও বিশেষ ক'রে আইরিণ ফুটে উঠেছে শুধু অপরের চোখে, কথাবার্ত্তায় ও আলোচনায়। বইখানি পড়বার সময়ে মনে মনে মধ্যে মধ্যে অধীর হ'য়ে উঠতাম আইরিণ কবে নিজে প্রকাশ হবে। কিন্তু Forsyte saga-র প্রথম খণ্ড Man of Property-তে আইরিণ বরাবরই প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। অর্থাৎ মানুষ ত

আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে না—অথচ সে যেন আকাশে বাতাসে তার সুষমা বিকীরণ করছে। এ পদ্ধতিতে কোনও মূর্ত্তিকে সজীব ক'রে তোলা কত কঠিন তা প্রথমটা যেন উপলব্ধিই করা যায় না। কিন্তু Man of Property ও In Chancery ব'লে প্রথম দুটি খণ্ড পড়ার পর মনের কোণে যেন হঠাৎ পুলক জেগে ওঠে যে একটি কবির মানসী প্রতিমাকে পেলাম বটে—যাকে কবির তুলি নইলে ধরা-ছোঁওয়া যেতই না; মনে হয় যেন আইরিণ ইংরাজ সমাজের নানান্ লোকজনের মুখে মুখেই উড়ে চ'লেছে—পথ দিয়ে হেঁটে চলে নি। অথচ সে রক্তমাংসের প্রতিমা। ওয়াটসনের মুখে শার্লক হোম্‌স যেমন জীবন্ত, ফরসাইথদের নানা চরিত্রের মুখের আলোচনায় আইরিণ তেম্‌নিই জীবন্ত। তাই মনটা খুসি হ'য়ে গেয়ে ওঠে—হাঁ একটা ছবি ফুটে উঠেছে বটে! কিন্তু সেটা ফুটেছে স্পষ্ট তুলিতে নয়—অদৃশ্য রেখাপাতে। এই খানে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কবি তাঁর কথাকাব্যে একটা জিনিষ বিশেষ ক'রে দেখাতে চেয়েছেন। সেটা হচ্ছে এই যে (ভূমিকা) "Where sex attraction is utterly and definitely lacking in one partner to a union, no amount of pity, or reason, or duty, or what not, can overcome a repulsion implicit in Nature. Whether it ought to or not, is beside the point, because in fact it never does."

এরূপ বিবাহের গভীর ট্রাজিডি আজকের স্ত্রীস্বাধীনতার যুগে আমাদের চোখে বেশি ফুটে উঠেছে। গভীর হৃদয় দার্শনিক ও সংস্কারক সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই এরূপ বিবাহের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে যত্নবান্ হ'য়ে উঠেছেন। এজন্য শত শত উপন্যাস ও কাব্য লেখা হয়েছে।

কাজেই বক্তব্যের মধ্যে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির কোনও বৈশিষ্ট্যই নেই। তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বক্তব্যটি বলার বিচিত্র ঢঙের মধ্যে। এখানেই শিল্পীর কাজ। এ কথা অনেকেই ব'লেছে, অনেকেই ভেবেছে, অনেকেই দেখেছে—কিন্তু কেউ তাঁর মতন ক'রে বলে নি। গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি ব'লেছেন তাঁর নিজস্ব ঢঙে, বিশিষ্ট ভঙ্গীতে। এই ভঙ্গীটিতেই হ'চ্ছে তাঁর মহত্ত্ব। এত সুন্দর style খুব কমই দেখা যায়। মহামতি হাভেলক এলিস ব'লেছেন: "The great writer finds style as the mystic finds God, in his own soul. It is the final utterance of a sigh which none would utter before him and which all can, who follow." (Dance of Life…)

এই যে দীর্ঘনিঃশ্বাস কবি ফেলেছেন তার জন্যে তিনি কিন্তু সহজ পথের পথিক হ'তে চান নি। অর্থাৎ তিনি আইরিণের স্বামী সোম্‌স্‌কে অসচ্চরিত্র, নিষ্ঠুর, অভদ্র, কুৎসিত, কৃপণ—কিছুই করেন নি। কেবল একটা অনির্দ্দেশ্য সমবেদনার অভাব দেখিয়েছেন—একটা ধরা-ছোঁওয়া-যায়-না এমন সৌকুমার্য্যের অনস্তিত্ব। যদি সোম্‌স্‌কে মন্দ লোক করতেন তাহ'লে আইরিণের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করা ঢের সহজ হ'ত। কিন্তু সহজ হ'ত ব'লেই তার কৃতিত্ব অপিচ মাধুর্য্য ঢের কম হ'ত। কারণ তাতে ক'রে তিনি যা দেখাতে চাইছেন ঠিক্ সেইটেই দেখানো হ'ত না।

অথচ যেখানে স্বামী ভদ্র, সুখী, ধনী, কৃপণ নন, যুক্তিসহ—এককথায় সমাজের চল্‌তি আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি—সেখানে তাঁর সঙ্গ যে কি কারণে স্ত্রীর পক্ষে দুঃসহ হ'তে পারে, সেটা নির্দ্দেশ করা সহজ নয়। অথবা নির্দ্দেশ করলেও স্ত্রীর প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করা সুকঠিন। কবি নিজে এটা উপলব্ধি ক'রেছেন। তাই ভূমিকায় তিনি একটু পরিষ্কার ক'রে লিখেছেন যে, দাম্পত্য-প্রেম ফরমাশি চীজ নয় বা সব সময় সুবোধ্যও নয়। প্রেম বন্য ফুলেরই মতন—তা সে ঘরের টবেই বিকশিত হোক বা গিরি-উপত্যকায়ই ঝলমল করুক। আসলে সে মানুষের হৃদয়ের এমন অনেকগুলি উপাদানের উপরই নির্ভর করে যার উপর মানুষের কোনো হাত নেই। এককথায় প্রেম অবাধ্য পাগল হাওয়া—পোষা স্বর্ণ-চামর-হিল্লোল নয়।

এ অসাধ্য-সাধন যে তিনি করতে পেরেছেন সেটা পেরেছেন শুধু তিনি সত্য শিল্পী, আসলে দ্রষ্টা ব'লে; অর্থাৎ বিধাতা তাঁকে দেখবার দৃষ্টি ও প্রাণ দিয়ে অনুভব করার ক্ষমতা দিয়েছেন ব'লে। এই ক্ষমতার অপূর্ব্ব বিকাশেই ডষ্টয়েভস্কি নরহন্তা ও বারাঙ্গনাকে নায়ক নায়িকা ক'রেও ভাস্বর ক'রে তুলেছেন; এই ক্ষমতার বরে রবীন্দ্রনাথ সন্দীপকেও উপভোগ্য ক'রে তুলেছেন; এই ক্ষমতার পরশমণিতেই শরৎচন্দ্র কিরণময়ী ও চন্দ্রমুখীকেও উজ্জ্বল ক'রে ফোটাতে পেরেছেন।

স্বামীর চরিত্র সর্ব্বাংশে সমর্থনীয় হ'লেও যে স্ত্রীর জীবন দুর্ব্বহ হ'তে পারে সেটা গল্স্ওয়ার্দ্দি যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সেটা কেবল শ্রেষ্ঠ কলাবিদের পক্ষেই সম্ভব। অর্থাৎ সেটা সম্ভব কেবল সেই ভাগ্যবানের পক্ষে যাকে বিধাতা দিয়েছেন হৃদয় ও বীণাপাণি দিয়েছেন গান।

তিনি কি অপূর্ব্ব ভাবেই দেখিয়াছেন :—"An unhappy marriage ! No ill-treatment—only that indefinable malaise, that terrible blight which killed all sweetness under Heaven ; and so from day to day, from night to night, from week to week, from year to year—till death should end it !"

সিল্ভারহর্ন

সাধারণ লোকে মানুষের হৃদয়-জগতের ট্র্যাজিডিকে শোচনীয় মনে করে কেবল তখনই যখন তার মধ্যে নিষ্ঠুরতার কালো রঙ ও জগদ্দলন চাপ উৎপীড়িতের শ্বাসরোধ করে। কিন্তু কবি অশ্রুপাত করেন সূক্ষ্মতর অবিচারে। কারণ তাঁর হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সমবেদনার স্বত-উৎসারিত রসধারা, দৃশ্যতের অন্তরালে নিহিত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করবার দিব্যদৃষ্টি। "By digging in his own soul he becomes the discoverer of the soul of the family, of his nation, of the race of the heart, of humanity." (Dance of Life)

গল্স্ওয়ার্দ্দির সুবৃহৎ "ফরসাইথ সাগা"র প্রতি অধ্যায় তাঁর এই অন্তর্দ্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। আইরিণের প্রেমাস্পদ বসিনের অপঘাত-মৃত্যুর পর তার ঘরে পাওয়া গেল—আসবাবপত্র বাঁধা দেবার অনেকগুলি রসিদ। দুঃস্থ বসিনে প্রেমের জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে নিজের অতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও বাঁধা দিতে বাধ্য হ'য়েছিল। প্রেমের জন্যে সমাজের ও যোগাযোগের অত্যাচারে প্রতিভাবান্ যুবকেরও কি অবস্থা হ'য়েছিল সেটা ছোট্ট একটি বর্ণনায় গল্স্ওয়ার্দ্দি এমন ভাবে চিত্রিত ক'রেছেন যে মনটা অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে না উঠেই পারে না।

শুধু দুঃখের বেলাই যে কবির অন্তর্দ্দৃষ্টির পরিচয় মেলে তা নয়। জীবনের ছোট খাট সুন্দর অনুভূতির মধ্যেও তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। বসিনের বাগ্দত্তা জুনের বিবাহ-ভঙ্গের মনঃকষ্টের মধ্যেও স্বামী-পরিত্যক্ত একাকিনী আইরিণের সঙ্গে অশীতিপর বৃদ্ধ জন ফরসাইথের অপূর্ব্ব প্লেটোনিক প্রেম যেন একখানি ছবি। পরে জনের পুত্র জলিয়নের সঙ্গে সেই আইরিণেরই নবোদ্গত প্রেম যে-ভাবে ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠ্ল তার মধ্যে কোথাও

এতটুকু অত্যুক্তি নেই, এতটুকু উচ্ছ্বাস নেই। সহজ সরল সম্ভ্রম ও সংযম তুর্জনার প্রতি কথায় ওতপ্রোত। পরে জলিয়নের ও আইরিনের পুত্র জনের সঙ্গে সোমস ও তার দ্বিতীয়া ফরাসী পত্নী আনেতের কন্যা ফ্লারের তরুণ প্রেমের ছবিটিও তেমনিই উপভোগ্য। সব তাতেই কবি সুঠাম ভঙ্গীতে ঝরণার মতন চ'লে গেছেন—তাঁর এই সহজ সমবেদনার স্পর্শ বরে।

কেবল একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। সেটা এই যে প্রলোভনে বড় শিল্পীরও পতন হয়। গল্স্ওয়ার্দি ফরসাইথ সাগার প্রথম চার খণ্ড লেখার পর উপন্যাসটি শেষ করলে ভাল করতেন। সম্ভবতঃ বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগিবৃন্দের প্ররোচনায় তিনি সম্প্রতি White Monkey ও Silver Spoon ব'লে দুটি উপসংহার লিখেছিলেন। তাঁর এই শেষ উপন্যাস দুটি সাফল্য লাভ করে নি। ফরসাইথ সাগার মতন হাজারপৃষ্ঠাব্যাপী উপন্যাসের পরে আর উপসংহার লেখাটা অসমীচীন বলেই মনে হয়। একটা কাহিনীতে মনোযোগ চিরকাল বজায় রাখা যায় না। তাছাড়া সুন্দর রেশকে ত আর শুধু টান্লেই লম্বা করা যায় না! তাই মনে হয় তিনি শেষ দুখানি বই না লিখ্লেই ভাল করতেন।

তবে বস্তুতঃ শেষ দুখানি বইয়ের সঙ্গে এক নাম ছাড়া ফরসাইথ সাগার কোনও সত্য যোগসূত্র নেই। তবু দুঃখ হয় যে ভবিষ্যৎ যুগে ফরসাইথ সাগার প্রথম চার খণ্ডের সঙ্গে * শেষ দুইখণ্ড একত্রে গ্রথিত হবে। অথচ To Let এই উপন্যাসখানিতেই ফরসাইথ সাগার সমাপ্তিরেখা টানা উচিত ছিল।

তবে সে যাই হোক "ফরসাইথ সাগা" মোটের উপর ইংরাজী সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—হয়ত এ পর্যন্ত বিংশশতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজী উপন্যাস বললেও অত্যুক্তি হবে না। সমালোচনায় এ কলাকারুর কোনও সুষ্ঠু পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তাই আশা করি আমাদের রসজ্ঞ পাঠকপাঠিকা বইখানি পড়বেন। যদি আমার এ অত্যন্ত খাপছাড়া রকমের সাধুবাদে উদ্দীপ্ত হ'য়ে একজন পাঠকও বইখানি পড়েন তাহ'লেই আমি শ্রম সার্থক মনে করব। বস্তুতঃ সেই উদ্দেশ্যেই এতটা লেখা—সমালোচনার উদ্দেশ্যে নয়।

* Man of Property; In Charncey; Indian Summer of a Forsyte; To let.

চণ্ডুর আড্ডা

(রূপক)

এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ (ক্যাণ্টাব), বার-এট-ল

চণ্ডুখোরের দল তাদের আড্ডায় বসলো চণ্ডু খেতে। একজন তাদের মধ্যে ছিল, একটু হুঁসিয়ার। নেশার উপর ঝোঁকও তার তেমন ছিল না। আগে থাকতে এক ছিলিম চণ্ডু খাইয়ে তাকেই তারা প্রহরীর কাযে লাগিয়ে দিলে; আর দরজা জানালা বন্ধ করে নিজেরা মেতে গেল চণ্ডুর চর্চ্চায়। মিট্মিটে একটা সেজ জ্বলছিল। বাহিরে দিন কি রাত তা জানবার কোন উপায় ছিল না। এদিকে সকাল বেলায় সহর-কোতওয়ালের যে পথ দিয়ে যাবার কথা ছিল। তাই দলের হুঁসিয়ার লোকটিকেই তারা বাইরে বসিয়ে দিয়েছিল, সূর্য্য উঠ্লেই সে যেন খবর দেয়। সময় থাকতে তা'হলে সতর্ক হওয়া যাবে। মাল-মসলা আগে থেকেই সরিয়ে ফেলা হবে। কোতওয়াল বেটা কিছুই জানতে পারবে না। চণ্ডু-খোর হলেও তখনও তারা চণ্ডু খায়নি, কাজেই হুঁসিয়ার লোকের মতই সব বন্দোবস্ত করেছিল।

প্রহরী বাইরে বসে আকাশের তারা আর আঁধারের পাৎলা কালো চাদর দিয়ে মোড়া উঁচু উঁচু গাছগুলোর শোভা দেখতে লাগলো। প্রকৃতির প্রশান্ত গম্ভীর সৌন্দর্য্য তার মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করলে। চণ্ডুখোরের ঘৃণিত জীবনের উপর তার কেমন বিতৃষ্ণা জন্মাল। সে বসে বসে সঙ্কল্প করল, ভবিষ্যতে সে চণ্ডু খাওয়া ছেড়ে দেবে; আর সকাল হলে তার সঙ্গীদেরও এই জঘন্য নেশা ছাড়বার জন্য উপদেশ দেবে।

এই সব চিন্তায় সে মগ্ন, এমন সময় কাছের বাড়ি থেকে মোরগের তীব্র ডাক সে শুনতে পেলে—সেই ডাক, যে-ডাকে

হতভাগা। আমাদের বিরক্ত করিস্ নে।"

প্রহরী দেখলে, সঙ্গীদের মাথায় চণ্ডুর নেশা প্রচুর চড়েছে। খানিকক্ষণ চুপ করে সে ভাবতে লাগলো। কা-কা করে কাকেরা গাছ থেকে ডেকে উঠলো। পূবের আকাশ লজ্জিতা নববধূর মত সূর্য্যের আগমনে রক্তিম হয়ে উঠলো। সে বেচারা আর থাকতে পারলে না। ঠক্ ঠক্ করে আবার দরওয়াজায় ঘা দিতে লাগলো।

একান্ত বিরক্তির স্বরে ভিতর থেকে একজন বলে উঠলো, "কিরে, তোর হয়েছে কি? এত বিরক্ত করছিস্ কেন, বল্ দিকিন্? এক ছিলিম চণ্ডু পাঠিয়ে দেবো নাকি?"

ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে সে বললে, "কাক ডাকছে। সকাল হয়ে গেছে। সাবধান হও; সাবধান হও। এই সহর-কোতওয়াল এলো বলে।"

ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, "যা! যা! অত ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস্ নে! এখন সকালের কোথা কি! তুই ঘুমো একটু, জেগে-জেগে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"

সে প্রহরী নাচার হয়ে আবার চুপ করে বসে রইলো। পাখীরা তাদের সকালের গান আরম্ভ করলে। পূবের আকাশে সূর্য্য তাঁর সুন্দর উজ্জ্বল মুখ তুলে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের গৌরব-মহিমা দেখতে লাগলেন। প্রহরী বেচারা চুপ করে আর বসে থাকতে পারলে না। দুই হাতের মুঠো দিয়ে সজোরে দরওয়াজায় ঘা দিতে লাগলো। আড্ডার মধ্যে বিরক্তির মহা এক কলরব সুরু হলো।

পরুষকণ্ঠে একজন চণ্ডুখোর চীৎকার করে উঠলো, "কিরে, তুই যে আমাদের জ্বালিয়ে মারবি! কেন তুই আমাদের এত বিরক্ত করছিস, বল্ দেখি?"

দোর খুলে চণ্ডুখোরেরা তখন প্রহরী বেচারাকে ভিতরে নিয়ে এলো। তার পর তার হাত-পা বেঁধে তাকে এক কোণে ফেলে রাখলে, আর, দরওয়াজা বন্ধ করে, আবার চণ্ডু টানতে লাগলো। গল্পও চললো। প্রহরী বেচারা কোণ থেকে এক একবার চীৎকার করে উঠতে লাগলো, "চণ্ডু খাওয়া ছাড়, চণ্ডু খাওয়া ছাড়; ও নেশা আর কোরো না, ওতে মানুষের বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পায়।" তার সঙ্গীরা এক একবার আগুনের মত চোখ বার করে তার দিকে চাইতে লাগলো; আর তার পর আবার তাদের নেশায় মশগুল হতে লাগলো।

হঠাৎ একটা ছড়ির নির্ম্মম কঠোর ঠক-ঠকানিতে চণ্ডু-খোরদের সেই দুর্ব্বল ভঙ্গুর দরওয়াজা কেঁপে উঠলো। সেই অমঙ্গলের আওয়াজে চণ্ডুখোরদের মুখ চুণ হয়ে গেল। একজন ভীত কম্পিত কণ্ঠে, ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কে ও?" বাইরে থেকে আওয়াজ এলো "তোর বাবা! দরওয়াজা খুলে দে বলচি, না হলে লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলবো!" কারও দরওয়াজা খুলতে সাহস হলো না। চণ্ডুখোরেরা সব কোণ ঘেঁসে বসে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। 'ধুম' 'ধুম' করে মোটা জুতোর কয়েকটা লাথি দরওয়াজার উপর এসে পড়লো। মড় মড় করে খিলটা ভেঙ্গে খসে পড়লো, আর দুপাটি কপাট দুদিকে মচমচিয়ে হেলে পড়লো। ভীত চকিত চণ্ডুখোরেরা, তাদের অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখের ফাঁক দিয়ে দেখলে, সহর-কোতওয়ালের কালান্তক যমের মত মূর্ত্তি! এক পৈশাচিক হাসিতে ওষ্ঠাধর বিস্ফারিত করে, দরওয়াজার চৌকাঠের উপর সে দাঁড়িয়ে আছে!

কথা সুর ও স্বরলিপি ঃ— শ্রীসাহানা দেবী

মিশ্র জৌনপুরী ভৈরবী—কাহারবা

আমার মন কেন আজ উদাসী হায় !
তোমার কোন্ সুরেতে ডাক দিলে তায় ।
দরদী মোর ! থাকবে দূরে—
ডাক দিবে কি উধাও সুরে ?
পাগল হিয়া আগল ভেঙ্গে
ছুটল আজ এ কোন্ ইশারায় !
আমি চলেছি যে একলা ভবে ;
তুমি সন্ধানিতে আসবে কবে ?
বাসবে তুমি আমায় ভাল
তাই কি ব্যথায় জ্বালো আলো ?
বেদনা মোর তোমার প্রেমে
নাচবে তোমার প্রেম-আঙ্গিনায় !

—০—

II II { মা মা ! পা -াঃ র্সঃ ণর্সা | ণদা পা -া পদা | মপা
আ মায় ম - - - ন্ কে- ন - আ- -জ্

মজ্ঞরাঃ জ্ঞঃ সরা | মা -া মপা মা | পা -া -া -া | -া -া II }
উ - - - দা - - সী হা য় - - -

মা মা | পধণর্সা -া-া ণা | র্সা -া -া ণা |
তো মার্ কো ন্ রে - - তে

র্সরা জ্ঞাঃ র্ঃ র্সা | ণদা ণদা পা -া | দপা দা মা
ডা ক্ দি লে - তা - - - -

া -া | II II
- -

II { পা | ণা দা ণদা ণা | ণর্সা -া দণর্সঋজ্ঞা ঋজ্ঞঋসা |
দ র দী - - মোর্ থা - - - ক্ বে -
স্বে তু - - মি আ - মা - - - য়

জ্ঞঋা র্সা -া -া | -া সরা সরজ্ঞ: জ্ঞা | জ্ঞর্া
দূ - রে - - - ডা - - - ক্ দে বে -
ভা ল - - - তাই কি - - ব্য -

র্সণ -া -া | র্সরা রর্সা ণদা ণর্সা | র্সণা দণা দা
কি - - - উ - ধা - - - - - - - - ও
থা - য় জা লো - - - - - - -

দা | পা -া | }
সু রে -
আ লো -

{ [জ্ঞা | জ্ঞা]
া পা | পজ্ঞা র্া জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞরা র্সণা র্সরা জ্ঞা |
পা গল্ হি য়া আ গ - - - - - ল্

র্া র্সা -া -া | -া া } পমা -া | পধণর্সা -া পাঃ র্সঃ |
ভে ঙ্গে - - - ছু - ট্ ল - - - -

\+ ০ +
ণদা পা -া-া | দপমপা গমা পা ণদা | | পা া | II II
আজ্ এ - - কো - - - ন্ ই শা- রা য়

০ +
II সঋা ণ্সা | দ্া সা জ্ঞরা জ্ঞা | -া রজ্ঞাঃ ঋসাঃ | ঋমা
রা - নি- চ লে ছি - যে - - - - - এ ক্

\+ ০
জ্ঞরজ্ঞা ঋা সা | -া -া পা পা | দর্সা ণধণা দা পা |
লা - - ভ রে - - তু মি স ন্ ধা- - নি তে

\+ ০ +
পজ্ঞপা মা দা পমা | জ্ঞঋা সা -া -া | -া -া II
আ - স্ বে - - . ক - বে - - - -

০ + ০
পমা -া | পধণর্সা -া পাঃ র্সঃ | ণদা পা -া -া | পা
বে - - দ - - - - - না- মো র্ - তো

\+ ০
দপমপা মজ্ঞরজ্ঞা রসা | রমা পা পদা | দপা ণা
মা - - র প্রে - - মে- না৮ বে তো মার্ প্রে- ম্

\+
ণা ণদা | পা -া | II II
আ ঙ্গি না য়

কত পার্‌সেণ্ট

শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায়

বর্ষাকাল। কলিকাতার একটা মেসের ভাঙ্গা ঘরে কয়েকজনে মিলে বেশ জটলা পাকিয়েছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চায়ের নেশাটাও বেশ জমে উঠেছে। এমন সময়ে কোণ থেকে ব্রজগোপালের ভাব জেগে উঠ্‌লো। সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—(সুরে) জীবন ভরিয়া আমি

তোরে না ডাকিনু স্বামী

বৃথা দিন গেল হে কেটে—

এদিকে নগেন, মুখ থেকে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে বললে—রক্ষে কর বাজা—ঐ হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে এমন সন্ধ্যেটা আর ভয়াবহ করে তুলিস্ নে। বরং আমার পেয়ালাটা নে—এখনও অনেক চা আছে, খেয়ে মুখটা বন্ধ কর।

কেবলরাম চায়ের বাটিটাতে চুমুক দিতে দিতে বললে—হ্যাঁ—চা খেতো বটে আমার জ্যেঠতুতো ভাই।

সতীশ—কি রকম—কি রকম ?

কেবল—এই হাওড়া থেকে চুঁচুড়া পর্য্যন্ত যেতে সে একবার সাড়ে তের ডজন কাপ চা একেবারে—

নগেন—ক্যাবলা ! কত পারসেণ্ট রে ?

বলিয়া রাখি কেবলরামের অভ্যাস সব জিনিসই একটু বাড়িয়ে বলা—অন্ততঃ নগেনের তাই ধারণা।—তাই সে প্রত্যেক কথায় কেবলরামকে বলে "কত পারসেণ্ট ?" তার অর্থে বুঝতে হবে—কত পারসেণ্ট মিথ্যা কথা আছে তার মধ্যে।

কেবলরাম তার দিকে না তাকিয়ে গম্ভীরভাবে সতীশকে বল্লে—"অবশ্য আমার কথায় বিশ্বাস কর্ব্বে না এমন অর্ব্বাচীন অনেক আছে বটে; কিন্তু আমার জ্যেঠতুত ভাইএর যা চেহারা যদি দেখিস্ তো—

নগেন—মূর্চ্ছা যাব—নয় রে ক্যাবলা ?

সতীশ—খুব ষণ্ডা গুণ্ডা—না ?

কেবল—দেখেছিস্ তুই ? কি করে বুঝলি ?

সতীশ—তোর বর্ণনার ভূমিকায়—

কেবল—ওঃ—সে যখন একবার কাশীতে গিছল, একটা গলি দিয়ে সে যাচ্ছে, এমন সময় দুটো গুণ্ডা এসে তার দুটো হাত ধল্লে। সে অম্নি "চল্—চল্" বলে এমন করে হাত দুটো দিয়ে তাদের ঝাঁকানি দিলে, যে, তারা দশ হাত দূরে ছিট্‌কে পড়ল।

নগেন—মাইরি ক্যাবলা—এটাকে তোর বলতেই হবে কত পারসেণ্ট। তিন কাপ চা খাওয়াব তা'হলে নগদ গরম—গরম! কত পারসেণ্ট রে ?

ব্রজগোপালের একটা মহৎ দোষ আছে—সে যখন তখন Quotation আওড়ায়, বা গান গেয়ে ওঠে,—তা সে স্থান কাল পাত্রের উপযোগী হোক বা না হোক। এ জন্য অনেকবার সতীশের কাছে বকুনিও খেয়েছে, তবু শোধরায়নি। সে কোণ থেকে বলে উঠ্‌ল—

দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী—

সতীশ এক ধমক দিয়ে বল্লে—ব্যাজা আবার—ব্রজগোপাল সতীশকে একটু ভয় করেই চল্‌তো তার muscular চেহারার জন্য ও মিলিটারী মেজাজের জন্য···কখন বুঝি মেরে বসে। সে ভয়ে ভয়ে বল্লে—কি ?

সতীশ—"সাবধান" বলে সে কেবলরামকে বল্লে—"হ্যাঁরে ক্যাবলা তুই সেদিন এই গল্পটা যখন আমার কাছে বল্লি—

কেবল—গল্প ? কে বলে গল্প ? কোন্ অর্ব্বাচীন বলে গল্প ?

সতীশ—চটিস্ কেন ? আহা-বলি—

কেবল—চটব না ? যা সত্যি তাকে তোমরা গল্প বলে উড়িয়ে দিতে চাও ?

সতীশ—আচ্ছা-আচ্ছা শোন বলি। এই ইতিহাসটা সেদিন যখন তুই আমার কাছে বল্লি, তুই বলেছিলি একটা গুণ্ডা ধরেছিলো—আর আজ সেটা দুটো গুণ্ডা হয়ে গেল কেমন করে ?

নগেন—সুদে বেড়েছে বোধ হয়।

কেবলরাম—দুটোই তো ধরেছিলো—একটা ত ধরেনি; অবশ্য যদি বিশ্বাস না করো—কোরো না। যা সত্যি তা বলতে ভয় পাব কেন ?

ব্রজগোপাল—আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে—

সতীশ—ব্যাজা—আবার—

ব্রজ—ভাই ভুলে গিয়েছিলাম—তা ভাই চটিস্ কেন ? কেবলরামের কথায় তো চটিস্ না—

সতীশ এবার হেসে ফেললে। বললে—"সত্যি কি আর চটিরে ? তবে তোর ঐ অভ্যেসটা ছাড়াবার জন্য বলি। নৈলে শ্বশুরবাড়ী অমন কর্লে শালীরা কাণ ছিঁড়ে দেবে। হ্যাঁরে নগা—তোর রোমান্স কেমন চল্‌ছে রে ?

নগেন—রোমান্স ? বর্ষাকালে ? ক্ষেপেছিস্ ?

সতীশ—সেকিরে ? আষাঢ়স্য—

ব্রজগোপাল—পথে এসো বাবা—এবার তোমার বেলায় ?

সতীশ—হার মানলুম ব্যাজা—আচ্ছা নগা—এত যে প্রেম কচ্ছিস্—কই আমাদের তো কিছু বলিস্ নি ?

নগেন—প্রেম কি রকম ?

সতীশ—কি রকম দেখবে ? এই দেখ।—

বলে, সতীশ একটা খাতা বের করল।—নগেন সাশ্চর্য্যে দেখলে, এটা তারই কবিতার খাতা—যেটা কিছুদিন থেকে কোথাও সে খুঁজে পাচ্ছিল না। ভেবেছিলো বাড়ীতেই কোথাও ফেলে এসেছে। নগেন একটু বিস্মিত হয়েই বল্লে "কোথা থেকে পেলিরে ?"

সতীশ—বাবা চালাকী ? নাইবার ঘরে চাবি ফেলে গিছলে সেদিন মনে আছে ? তাই হতেই এই কাণ্ড। মায়ামৃগ হতে লঙ্কাকাণ্ড। বলি তোমার "লেখাটী" কে ? কবিতায় সর্ব্বত্রই যে তার নাম।

ব্রজ—There perhaps some beauty lies
The cynosure of neighbouring eyes.

কেবল—ব্যাজা—এই প্রথম দেখলাম যেখানে তোর quotation স্থানের উপযুক্ত হয়েছে। খাইয়ে দে ব্যাজা—খাইয়ে দে। বুঝলি ?

ব্রজ—থাক থাক—আর পিট চাপড়ে আদর কর্ত্তে হবে না। বাপ্—হাত নয় তো যেন লোহা—বউ এসে তোমায় ঝাঁটা মার্ব্বে। এখনও বলছি হাত নরম কর—উঃ পিটটা জালিয়ে দিলে যেন।

কেবল—তা পর নগা—ব্যাপার কি ?

সতীশ—"লেখা" কে রে ?

নগেন—নেহাৎই বলতে হবে ?

সকলে—হবে না ? চালাকী পেয়েছ ?

নগেন—তবে শোন। মধুপুরে আমাদের বাড়ীর কাছে ছিল সন্তোষবাবু ডাক্তারের বাড়ী। তাঁরই মেয়ে এই লেখা। আমার বোন অরুণা আর সে একই ক্লাসে পড়তো; আর তারা প্রায়ই এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাতায়াত কর্ত্ত।

কেবল—আর সঙ্গে সঙ্গে তোর প্রাণটা একেবারে উড়িয়ে নিয়ে—

নগেন—দূর বোকা—অত তাড়াতাড়ি প্রেম হয় ? প্রথম প্রথম আমি বেশ বিজ্ঞের মত এই বালিকাদের খেলা উপভোগ কর্ত্তুম। তাদের মাঝে মাঝে উৎসাহও দিতুম। কিছুদিন যায়—

ব্রজ—ওহো-হো-হো [সুরে] সখা সর সর সর—

কেবল—[ব্যঙ্গ করিয়া সুরে] তুমি থাম থাম থাম

নগেন—তারপর দু তিন দিন সে—

সতীশ—লজ্জা কেন ? নামটাই না হয় বল্লে।

নগেন—সে মানে 'লেখা' আসা বন্ধ করলে। ভাবলাম অরুণাকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সোজাসুজি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে যেন লজ্জা হ'ল। হয় তো অরুণা কি ভাববে।

ব্রজ—Here is the love—Here is the love [সুরে] পীরিতি বলিয়া—

সতীশ—ব্যাজা—

নগেন—অরুণাকে বললাম 'কিরে! একা একা ঘুরছিস্ কেন ? ভিতরে যা।'

অরুণা—মা বল্লেন বাইরে বেড়াতে—

আমি—কেন ? আজ সে কোথায় ?

অরুণা—চাকর ? তার তো জ্বর।

আমি—না না—ইয়ে আসেনি ?

অরুণা—কে ?

আমি—ইয়ে—কি যে ওর নাম ? তোর বন্ধু—যে রোজ আসে ?

অরুণা—"ও লেখা ?" বলে অরুণা আমার দিকে তাকাল। আমি ভাবলাম, যাঃ—বুঝেছে বোধ হয় আমার মতলব। বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে বললুম "হ্যাঁ—লেখা আসেনি ?" অরুণা বল্লে "না—তার অসুখ করেছে।"

সতীশ—অম্নি তোর বুকখানা কি হ'য়ে গেল নগা ?

ব্রজ—বল বল বল সবে—শত-বীণা-বেণু রবে···

সতীশ—আবার বাজে বকছিস্ ব্যাজা ? তারপর বল নগেন—

নগেন—আর ভাই বলিস্ কেন ? যা ভয় করেছিলুম তাই। ওপরে গেছি, দেখি—অরুণা মাকে বলছে, "মা, লেখার জ্বর হয়েছে—কাল দেখতে যাব। দাদাও আজ জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিল—লেখা আসে না কেন ? কি হয়েছে তার ? তুই তার কাছে যাস না কেন ? কত কি ?—" দেখলাম মা আমার দিকে তাকালেন,—আবার নিজের কাজে মন দিলেন। চোরের মন—আমার তখন যা অবস্থা।

কেবল—ন যযৌ, ন তস্থৌ—

ব্রজ—কোনখানে—কোন পরাণের মাঝখানে,

শত বসন্ত······

সতীশ—তোর পায়ে পড়ি ব্যাজা—হেঁড়ে গলাটা একটু ধামা চাপা দিয়ে রাখ।

নগেন—তারপর হঠাৎ একদিন ভোরবেলা উঠে আবিষ্কার কর্ল্লাম আমি তাকে ভালবেসেছি—আমার এ হৃদয়ের সিংহাসনে—

কেবল—দোহাই নগা—কবিত্ব করিসনি—সোজা বলে যা না বাবা—

নগেন—তারপর ক্রমশঃ লেখাদের বাড়ী যাওয়া সুরু কল্লুম—তার মাকে মাসীমা বলতে লাগলুম যেন কত-কালেরই না আত্মীয়। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে খুব খানিকটা বক্তৃতা দিলুম তাদের সামনে। সন্তোষ বাবুর প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠলুম। শুধু তাই ? যে নগা বাড়ীর কোন কাজ করেনি, একটা পেরেক পুঁতে উপকার করেনি, সেই নগা তাদের বাজার পর্য্যন্ত করে দিয়েছে স্বেচ্ছায়—

সতীশ—সে কিরে? বাজার?—তুই?

কেবল—বাবা Love—Love

নগেন—শুধু বাজার? বাজারে মাছের দর হয়ত বার আনা; নিজের পকেট থেকে দু আনা দিয়ে দশ আনা সের মাছ বলে তাদের দিয়েছি। তারা কি প্রশংসাটাই না কর্ল্লে?—নগার মত বাজার কর্ত্তে? কেউ পারে না। তোমরা সবাই বার আনা দিয়ে মাছ কিনে ঠকে আস—আর দেখ দেখি নগা দশ আনায় কেমন মাছ এনেছে; একেই তো বলে ছেলে! যেমন লেখা পড়ায় তেমনই···" ইত্যাদি কত কি!

সতীশ—আর আমাদের বেলা বাবা হাত দিয়ে জল গলে না।

কেবল—স্থান, কাল, পাত্র থুড়ি পাত্রী তিনই চাইরে বাবা তিনই চাই।

নগেন—তারপর বিকালে লেখাকে তাদের বাড়ী গিয়ে বাজনা শেখাতে সুরু কল্লুম। সমস্ত ফুরসৎটুকু তাদের জন্যেই ঢেলে দিই। বাবা এদিকে বাড়ীতে ডাকাডাকি করে সারাদিন সাড়া পান না। ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে—সুতরাং পড়ার চাপ নেই। তবু বাবা বলেন "দুদণ্ড বাড়ীতে থাকতে তোমার হয় কি? সারাদিন আড্ডা, আড্ডা—বাবার উপরেই রাগ হয়—আচ্ছা আপদ—ছুটীতে একটু আমোদও কর্ত্তে পাব না।

কেবল—এ কি আর সে-সে আমোদ।

নগেন—আমি যে কোথায় যাই তা কিন্তু বাবা জান্তেন না। সেটা প্রকাশ হয়ে গেল একদিন।

সতীশ—হায়রে—

ব্রজ—(সুরে) আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার—

সতীশ—মনে মনে গা—ব্যাজা মনে মনে গা—তারপর নগা?

নগেন—একদিন দেখি লেখার মা লেখাকে নিয়ে আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছেন। মা তাঁদের সঙ্গে গল্প কর্চ্ছেন। মা কথায় কথায় বল্লেন—"কি বলব ভাই—অরুণাকে পড়াবার জন্য একটা ভাল মাষ্টার পাচ্ছি না। একটু গান বাজনা শেখাবারও লোক পাচ্ছি না। অথচ ঐ দুটী না জানা থাকলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যে কত শক্ত বুঝ্ছো তো ভাই? কি যে করবো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।—হাঁ ভাই, তোমার সন্ধানে এমন কোন লোক আছে যে অরুণাকে পড়াতে পারে? গান বাজনা শেখাতে পারে?

সতীশ—তার পর?

ব্রজ—হৃদয় আমার হারিয়ে গেছে···

সখিরে এ—এ—এ————

কেবল—বুঝেছি কি হবে। বল্‌তো নগা কি হ'ল?

নগেন—হবে আর কি? আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমার প্রশংসা করে মাকে কৃতার্থ কর্ব্বেন ভেবে মাসীমা বল্লেন—"কেন! তোমার ছেলে তো রয়েছে?"

সতীশ—গেরেছে!

কেবল—তোমার মা কি বল্লেন?

নগেন—বলবেন আর কি? বল্লেন "নগা? তবেই হয়েছে। বাড়ীর কুটোটুকু নেড়ে সে উপকার করে না ভাই। নিজের পড়ার ঘরটীতেই থাকে—খায়, দায়, পড়ে আর কলেজে যায়। তা ছাড়া সংসারের একটী কাজও তার দ্বারা হ'বার যো নেই। আমি কি ভাই বলিনি? কতবার বলেছি "ওরে নগা—অরুণাটাকে নিয়ে একটু পড়া না—বিকেলে ওকে একটু গান বাজনা শেখা না"—বলে "সময় নেই—" আমি বলে বলে হার মেনেছি। তুমিও যেমন? নগা গান শেখাবে। তবেই হয়েছে।"

কেবল—ঠিক যা ভেবেছিলাম—

সতীশ—বাবা, মাসীর মেয়েকে পড়াতে পার, আর নিজের বোনকে পড়াতে তোমার ফুরসৎ মেলে না—

ব্রজ—সে যে আমার কাশী—

কালীপদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি—

নগেন—কপাল সেদিন থেকেই ভাঙ্গতে সুরু হ'ল। মাসীমা বল্লেন "সে কি? নগেন তোমার তো তেমন ছেলে নয়! সে কেমন রোজ আমাদের বাড়ী যায়। ঘরের ছেলেটীর মত সব কাজ যেন সে যেচে কর্ত্তে ছোটে। কি সুন্দর বাজার করে ভাই! কর্ত্তা পর্য্যন্ত অমন বাজার কর্ত্তে পারেন না। উনি পর্য্যন্ত ঠকে আসেন। একদিন মাছ নিয়ে এলেন বার আনা সের। তার পর দিন তোমার ছেলে গেল। সে দশ আনায় এনে দিলে ভাই। কি সুন্দর মাছ। সেই থেকে রোজ ও আমাদের বাজার করে ভাই। আমি বরং বলি "তুমি পরের বাছা কেন রোজ বাজার যাবে

বাবা—চাকরকে দাও—তা সে বলে "কেন? বাড়ীর বাজার নিজে করি আর আপনাদের বাজার কর্ত্তে পার্ব্ব না?" কি সুন্দর ছেলে ভাই। তা ছাড়া লেখাকে ওই তো মানুষ কর্‌লে। রোজ নিয়মমত সকাল সন্ধ্যায় পড়ায়। কেমন নিজের কাছে এনে আদর করে হারমোনিয়ম শেখায়। এ ক'দিনে লেখা কি সুন্দরই শিখেছে। আমি তাই মাঝে মাঝে ওঁকে বলি অমন একটী ছেলে যদি আমাদের থাকতো। না ভাই তুমি তোমার নগেনের নিন্দে ক'রো না। খাসা ছেলে—সুন্দর ছেলে—কেমন চট্‌পটে—একটু গর্ব্ব নেই, কিছু নেই। রত্ন ভাই রত্ন। আমার সাম্নে তুমি ওর নিন্দে কর্ত্তে পাবে না।

সতীশ—তার পর? তার পর?

কেবল—তার পর আর কি? স্বরূপ বিস্তার করে—

ব্রজ—ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি—বনস্পতিনাং—

সতীশ—থাক্ থাক্—আর অং বং কর্ত্তে হবে না—তা'পর নগা—

নগেন—আর নগা! মা তো শুনেই অবাক্। অবশ্য বাইরে কিছু আর প্রকাশ করলেন না। আর আমিও বেচারা—

কেবল—আহা—বেচারী বলে বেচারী—একেবারে বে-চা-রী—

নগেন—ঠাট্টা কর্চ্ছ? কর; কিন্তু আমার অবস্থাটা যদি বুঝতে—

সতীশ—আমি বুঝেছি নগা—এই ক্যাবলা, ব্যাজা—চুপ করে থাক—

নগেন—আমি বেচারী তথনও কিছুই জানি না—কি ব্যাপার হয়ে গেছে। যাহোক্ মাসীমারা জলযোগ ইত্যাদি সম্পন্ন করে—

কেবল—সঙ্গে সঙ্গে তোমার শ্রাদ্ধেরও আয়োজন করে এবং—

ব্রজ— Blow blow thou winter wind.
Thou art not so unkind,
Like man's ingratitude.

দোহাই সতীশ—বলিস্‌নে কিছু—আমার emotionটা কিছুতেই রুখতে পার্‌ল্‌ম না ভাই। আর একটু সময় দে—শেষ করে দিই, নইলে—

সতীশ—মনে মনে emotion প্রকাশ কর ব্যাজা—নইলে জানিস্?

ব্রজ—দোহাই সতীশ—নগা emotion চেপে দিলুম—বলে যা ভাই।

নগেন—তার পর মাসীমারা তো চলে গেলেন। সেদিন রাত্রে খেতে বসেছি। মা, বাবা সব রয়েছেন—আমিও তো আছিই। মা বল্লেন "সারাদিন কোথায় থাকিস্ রে?"

আমি—এই বন্ধুদের বাড়ী।

সতীশ—তার পর?

নগেন—মা বল্লেন "বিকেলে কোথা যাস্?"

আমি—খেলতে।

মা—কই—আগে তো যেতিস্ না।

আমি—মাঝে মাঝে যেতুম।

মা—আর কোথাও যাস না?

আমি—বল্লুম তো মাঝে মাঝে বন্ধুদের বাড়ী যাই।

মা—শুনলুম তুই নাকি লেখাকে রোজ বাজনা শেখাতে যাস?

বুকটা ধড়াস্ করে উঠ্‌ল, বল্লুম—হাঁ, মাঝে মাঝে যাই। ওঁরাই বড় অনুরোধ করেন তাই যাই।" মা বল্লেন "আর যেও না—অত বড় মেয়েকে বাজনা শেখান ভাল দেখায় না। তাতে নানা লোকে নানা কথা বলতে পারে।" এত অল্পে কেটে যাবে ভাবিনি। মুখটী নীচু করে কোন রকমে খেয়ে উঠলুম। সে বিষয়ে কিছুদিন আর কথাবার্ত্তা হ'ল না।

সতীশ—যবনিকা পতন না কি?

কেবল—এরই মধ্যে? নগা, শীগ্‌গির যবনিকা ওঠা বল্‌ছি—

ব্রজ—লেখারা জান্তো না এ বিষয়ে?

নগেন—তাঁরা আর জানবেন কেমন করে? যাহোক আমি তবু লুকিয়ে চুরিয়ে যেতে লাগলুম।

কেবল—প্রেমের টান বড় টান।

ব্রজ—নগা তো নগা—এক একটা সাম্রাজ্যই ভেসে যায়—এই দেখ না গ্রীস—চিতোর—

সতীশ—থাক থাক—তোর আর ঐতিহাসিক তত্ত্ব আওড়াতে হ'বে না—নগা বল।

নগেন—একদিন বেড়িয়ে—

কেবল—তাদের বাড়ী থেকে?

সতীশ—আবার বকছিস্ ?

কেবল—কোথা থেকে রে ?

নগেন—লেখাদের বাড়ী থেকেই।

কেবল—বল্লাম—

সতীশ—যে নে খুব পণ্ডিত তুই। থাম—

নগেন—তাদের বাড়ী থেকে ফিরেছি···বাবা বল্লেন "নগা এই মনি অর্ডারটা করে দিয়ে আয় তো শীগ্‌গির করে—"

আমি—কাকে টাকা পাঠাচ্ছেন ?

বাবা—কলকাতায়—বিশুর ছেলের ভাত।

আমি—বিশুদার ছেলে হয়েছে নাকি ? কবে হ'ল ? কই শুনিনি তো ?

বাবা একটু শ্লেষের সঙ্গেই বল্লেন "তা বাড়ীর খবর রাখবে কেন ? পরের খবর তো খুব রাখো !"

কেবল—বুঝলে হে। পর মানে লেখার বাবা।

সতীশ—হ্যাঁরে ক্যাবলা তুই কি ব্যাজার pos'টা নিলি নাকি ?

নগেন—সেদিন তো এই পর্য্যন্ত। একদিন সকালে আমাদের এক আত্মীয় এসে মাকে আর অরুণাকে নিয়ে দুপুর বেলায় গিরিডি চলে গেলেন। লেখারা তা জান্তো না। বাবা ছিলেন—ওপরে ঘুমুচ্ছিলেন। আমিও কি একটা কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলাম—এমন সময় লেখা এসে হাজির তাদের চাকরের সঙ্গে। অরুণার সঙ্গেই তার কাজ ছিল। নীচে কাউকে না দেখে সে আর উপরে গেল না। ভাবলে অরুণা হয়তো এখুনি আসবে। ততক্ষণ সে হারমোনিয়মটা নিয়ে বাজাতে লাগল। আর চাকর তাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী চলে গেল। লেখা যখন বাজাচ্ছে আমি এসে পৌঁছুলুম। নীচে একা লেখাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। বললুম "এখানে কি মনে করে ?"

সে বল্লে "অরুণা কোথায় ?"

আমি—গিরিডি গেছে।

লেখা—কবে আসবে ?

আমি—বোধ হয় কাল।

আরও গোটাকতক কথা কয়ে সে গৎ বাজাতে সুরু কর্ল্লে। কেন না তার চাকর তখনও আসেনি। গৎটার এক জায়গায় সে কিছুতেই ঠিক আনতে পারছিল না। আমায় বল্লে—"এ জায়গাটায় একটু দেখিয়ে দিন না।" আমি তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি এমন সময় বাবা নীচেয় এসে হাজির হলেন।—তিনি ভেবেছিলেন বোধ হয় আমিই বাজাচ্ছি। কিন্তু কেবল আমাদের দুজনকে দেখে যেন থমকে গেলেন। পরে গম্ভীরভাবে বল্লেন "নগা—কি হচ্ছে ?"—আমি বল্লাম ভয়ে ভয়েই "এই বাজনাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।—" বাবা শুধু গম্ভীর ভাবে বললেন "হুঁ"·········

আমাদের চাকরকে দিয়ে লেখাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন —তার সামনে আমায় কিছু বল্লেন না।—পরে আমাকে গম্ভীর ভাবে বল্লেন "ও এখানে এ সময়ে এসেছিল কেন ? তুমি আসতে বলেছিলে ?" আমি তাঁকে সব বল্লুম। বোধ হয় বিশ্বাস কর্ল্লেন না। বল্লেন "তোমার result কবে বেরুবে ?"

আমি—১৫।১৬ দিনের মধ্যেই বোধ হয়।

বাবা—যদি পাশ না কর্ত্তে পার ভাল হ'য়ে, তোমায় বিতিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দেবো মনে থাকে যেন পাজী, শূয়ার···লেখাপড়া নেই, খালি আড্ডা—খালি আড্ডা। বাড়ীতে একটা উপকার পাবার যো নেই······" ইত্যাদি ইত্যাদি বলে তিনি উপরে চলে গেলেন—আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।—

সতীশ—হায় রে—জাতও গেল, পেটও ভরল না।

ব্রজ—কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ—

কেবল—হ্যাঁরে সে তোকে ভালবাসতো ?

সতীশ—চিঠি পত্র দিয়েছিলো ?

নগেন—হ্যাঁরে দিয়েছিল একটা।

সকলে—দেখা তো ? আছে ?

নগেন—থাকবে না বাবা—সে আমার রক্ষা কবচের মত, হৃদয়ের নিভৃত কোণের—

সতীশ—কবিত্ব করিসনে নগা, সোজাসুজি চিঠিটা বার করে দেখা দেখি।

নগেন গিয়ে তার ট্রাঙ্কের একটা নিভৃত কোণ থেকে একটা খাম বার করলে। তার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট চিঠি টেনে বার করে' একবার সতৃষ্ণ নয়নে সেটিকে দেখলে। পরে ধীরে ধীরে সেটা সতীশের হাতে দিলে। সকলে সেটা দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়লো। কেবলরাম সেটাকে নিয়ে বেশ করে নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগলো। তার

চোথ দুটো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে "নগা। এটা সে তোকে নিজে লিখেছে ?"

নগেন—হ্যাঁ।

কেবল—তোকে এত ভালবাসতো ? লিখেছে "তোমার সঙ্গে যদি বিবাহ না হয় আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব" সত্যি তোকে সে এত ভালবাসতো ?

নগেন—সে ভালবাসা—ওঃ মনে পড়লে এখনও—ওঃ—সেদিন যখন তাদের বাড়ী যাই সে তাড়াতাড়ি এই চিঠিখানা লিখে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিল। দেখছিস্ না তাই কি রকম মুড়ে গিয়েছে। আর সে তাড়াতাড়ি একটা খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে লিখেছিল তা বোধ হয় তোরা এই rongh margin টার দিকে তাকালেই বুঝতে পার্বি।

কেবলরাম একমনে শুনে যাচ্ছিল, পরে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে একটা rough খাতা নিয়ে এল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখা গেল একটা জায়গায় যেন কাগজ ছেঁড়া হয়েছে। নগেনের সেই চিঠিটা রাখতেই দুটো বেশ মিলে গেল। কেবলরাম নগেনের দিকে একবার তাকিয়ে মুচকে হেসে বল্‌লে "এই চিঠি আমিই লিখেছিলাম একজন স্ত্রীলোকের প্রেম পত্র বলে তোমাদের ওপরে চালাবার জন্যে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা করিনি। এটা আমার বাঁ হাতের লেখা। আমি এটাকে মুড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলাম। এই সেদিনের কথা। তার draft পর্য্যন্ত আমার খাতায় রয়েছে। এই দ্যাখ—" সকলে ঝুঁকে দেখ্‌লে সত্যই তার খস্‌ড়া রয়েছে একটা পাতায়। নগেন যেন ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছিল। সে বাইরে যেতে যাবে এমন সময় কেবলরাম তার হাত ধরে বসিয়ে বল্লে—"কি গো প্রেমিক ঠাকুর—এবার তোমার কত পারসেণ্ট ?"

নগেনের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লো।

শুদ্ধি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

তুমিই মৃতেরে পুন জিয়াইয়া নূতন জীবন দিলে।
সমাজের চির ত্যজ্যপুত্রে স্নেহে ডেকে কোলে নিলে।
ভ্রান্ত ভুখারী লাঞ্ছিতে তুমি দিলে কি প্রসাদ মিঠে,
ভিটে-ছাড়াদিগে ডেকে ফিরে দিলে সাতপুরুষের ভিটে !
ধরমে করমে নামে হয়েছিল যে জন অপরিচিত,
অমৃতপুত্র বিস্মৃত হয়ে হলাহলে ছিল প্রীত,
সব অধিকার ফিরে দিলে তার একি এ করুণা আহা,
লক্ষ বুকের যাজ্ঞিক গাহে ওঁ শুদ্ধ্যৈঃ স্বাহা !

২

পঙ্কের শত প্রলেপ উঠায়ে স্নিগ্ধ করিলে হৃদি,
আবর্জ্জনার রাশি সরাইয়া বাহির করিলে নিধি।
পলাণ্ডু-পেষা শিলা হয়ে হায় পড়ে ছিল শালগ্রাম,
তাহারে তুমিই উদ্ধার করি দিলে যে প্রকৃত নাম।
হাটের মাঝারে বিকাইতেছিল কোথায় কপিলা গাভী,
তুমিই তাহারে স্মরাইয়া দিলে দেবীত্বে তাঁর দাবী।
হা-ঘ'রে হইয়া ছিল যে বালক তারে দিলে ধ্রুবলোক,
জননি, তোমার বন্দনা গাহি পুণ্য আমার শ্লোক।

৩

'কদলীপতনে' কোথা মীননাথ রাজসুখে আছে ভুলে
মৃদু মৃদঙ্গে সে বিরাট স্মৃতি প্রাণে দাও তার তুলে।
বাদসাহী ভোগ ক্ষমতার মোহে ডুবে আছে দিবা-যামি,
নকর 'সাকড়ে' গড়ে দাও তুমি সনাতন গোস্বামী।
নব হরিদাস বিজাতির ঘরে আছে কিবা কাজ লয়ে,
সাধুত্বে তাঁর কত বড় দাবী একবার দাও কয়ে।
আত্মভোলা ও নব কবীরের নাশ তুমি মোহ মায়া,
লক্ষ বুকের যাজ্ঞিক গাহে ওঁ শুদ্ধ্যৈঃ স্বাহা।

গয়লার মেয়ে

(বিহার-চিত্র)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল

(এক)

মৌজা ময়নার গোপপ্রধান রাম খেলাওন থিরহরের জীবনগতি একটু বিচিত্র রকমের ছিল বলিয়া কেবল নহে, তাহার অর্থ ও ততোধিক দৈহিক সামর্থ্যের জন্যই বোধ হয়, পঁচিশ বছর বয়সেই, ও-অঞ্চলের সে একজন 'মান্ জন্' বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। শলা-পরামর্শ দিতে, কানুন বাত্লাইতে, পঞ্চায়তি করিয়া বিবাদ মিটাইতে, মামলা-মকদ্দমার পৈরবি করিতে,—আবার পাঁচজনের বিপদে আপদে অগ্রণী হইতেও সে অদ্বিতীয় ছিল।

বছর কয়েক পূর্ব্বে কৌশলে বাটোয়ারা দায়ের করিয়া জ্ঞাতিজন হইতে পৃথক হওয়ার পরই সহসা তাহার মুরুব্বির পরলোক হইলে, সংসারে বেবা মাতা ভিন্ন আর কেহ রহিল না। তথাপি ওরূপ সমারোহের সহিত শ্রাদ্ধের ভোজ কেহ দিতে পারে নাই গ্রামশুদ্ধ লোক তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল।

প্রথামতে বিবাহ তাহার শৈশবেই হইয়াছিল, কিন্তু হোস-হাবাসের (জ্ঞানসঞ্চার) পূর্ব্বেই পত্নীবিয়োগ হওয়ায় শুভদৃষ্টির সুযোগ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার আদেশক্রমে এবং তৎপরেও মাতার কষ্টলাঘব হেতু বার তিনেক 'সাগাই' করার পরেও সে যখন একক রহিয়া গেল, অতঃপর কেহ বিবাহের প্রস্তাব আনিলে সে হাসিয়া যাহা বলিত তাহার মর্ম্ম এইরূপ—সাধি করিলে স্ত্রী মরিবে, সাগাই করিলে তবু সে পলাইয়া বাঁচিবে; কিন্তু তাহার পক্ষে উভয় ক্ষেত্রেই যখন ফল অনুরূপ, তখন ও-পথ ত্যাগ করাই শ্রেয়!

শ্রাবণের লঘুগতি মেঘের ফাঁকে, পশ্চিমাকাশ স্বর্ণাভায় প্লাবিত করিয়া অস্তিম সূর্য্যদেব বাগ্মতী নদীর পারে হাসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। নকুনি গ্রামের নির্ধন মাহ্তোর মকদ্দমায় পৈরবি করিয়া সহর হইতে ফিরিবার পথে নদী পার হইয়া আসিয়া গোটাদুই রদ্ (বমি) হইয়া রামখেলাওন একটা পাকড়্ গাছের তলায় বসিয়া পড়িল! আর পাওভর জমিনের ফয়সলা (ব্যবধান), কিন্তু হাতে পায়ে ঝুনঝুনি লাগিয়া সে অবসন্ন ভাবে হাতের গেঁঠারিটা ফেলিয়া তাহার উপর মাথা গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

দিনের আলো ধীরে ধীরে নিভিয়া গিয়া পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকের ম্লান প্রভায় চারিদিক যেন কিসের আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

"খেলাওনজি!—খেলাওনজি!" পূর্ণ-কলসের গুরুভারে বঙ্কিম গ্রীবায় চম্পাকলি কম্পিতস্বরে ডাকিল—'খেলাওনজি!' তথাপি অচেতনের দেহে স্পন্দনের সূচনা না দেখিয়া চম্পা ক্ষিপ্রহস্তে কলসি নামাইয়া রাখিয়া পীড়িতের পিঠে হাত দিল। দেহের তাপে আশ্বস্ত হইয়া সে মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আবার ডাকিল—'খেলাওনজি!'

এবার খেলাওন মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়া অস্ফুটে কহিল—'কলি!' তাহার পরই অনর্গল বমি করিতে লাগিল। দুইহাতে দুর্গন্ধ উদ্গার ধুইয়া মুছিয়া, মুখে চ'খে জল দিয়া, চম্পা আঁচল দিয়া বাতাস করিতে, ক্ষণকাল পরে রোগী চোখ মেলিয়া চাহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল "কলি! আজ হামারা জান্ তু বাঁচায়া!"

চম্পা একটুখানি হাসিয়া বলিল—"জান্ তো বোধ হয় এখনকার মত বেঁচেছে, কিন্তু এবার উঠে দাঁড়াবে কি? ঐ যে মন্নুদের ঘরে আলো জ্বলছে, অতদূর হেঁটে যেতে পারবে?"

রামখেলাওন অক্ষমতা সূচক মাথা নাড়িয়া, পাশ ফিরিয়া শুইয়া আবার চোখ বুজিল।

তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে চম্পা তখন বলিল—"তবে তুমি একটু চুপ করে পড়ে থাক, আমি চট্ করে মন্নুদের ঘরে সম্বাদ দিই। তারা কেউ গিয়ে মিশির-জিকে ডেকে আনুক,—এর পর দেরী করলে যদি বোথার

বেশী হয়ে পড়ে!" উঠিবার উপক্রম করিতেই থপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া রামখেলাওন চোখ বুজিয়াই বলিল—"তুমিই আমার নিশির, তুমিই আমার ডাগ্‌দার! আর একটু আমার কাছে বোসো কলি!"

(দুই)

রূপলাল রাউতের তিনপুত্র ও এক কন্যার মধ্যে এখন কেবল চম্পাকলিই বর্ত্তমান। অবশ্য চাচেরা ভাইএর দুই সন্তান তাহারই সঙ্গে এখনও খানাপিনা, কার-কারবার সর্ব্বতোভাবেই ইজমাল্। সম্পত্তির মধ্যে তিনবিঘা পাঁচকাঠা জমিন্, তিনটা ভঁইস, একজোড়া বলদ এবং একটি সবৎসা কইলি গাই।

গত বৎসর চম্পার মায়ের শ্রাদ্ধে ইহার মধ্যে পনের কাঠা জমিন, আড়াই শত টাকায় রামখেলাওনের নিকট সুদভরণা (দখলী বন্ধকী) দিতে হইয়াছে। তাহাছাড়া পূর্ব্বোক্ত মহাজনের নিকট বহিখাতায় প্রায় শতখানেক দেনাও দাঁড়াইয়াছে। রূপলালের জীর্ণ, সংস্কারহীন গোটাচারেক কুসের ঘরের প্রায় একরশি ব্যবধানে রামখেলাওনের বিস্তৃত পাকা দালান হাবেলি এবং কলমবাগ্ শোভা পাইতেছে।

বছর আঠার বয়স হইলেও বাচ্চু নিজেকে বুদ্ধিতে কাহারও নিকট খাটো মনে করিত না। অর্দ্ধভুক্ত মড়ুয়ার রোটি-হাতে আঙ্গনায় বসিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া সে বলিল—"আচ্ছা দিদি এবার আমাদের উত্তরবারি ক্ষেতে খেলাওনজি মকাই বাও করিল কেন?"

চম্পা ওসারার উপর জাঁতা ঘোরাইয়া 'রহড়' ডাল প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিল। সেই ভাবেই উত্তর দিল—"ও জমিন্ ভরণা দেওয়া হয়েছে জানিস্ না?" অবশিষ্ট রুটিটা মুখে পুরিয়া দিয়া বাচ্চু বলিল "বা-রে! কবে ভরণা দেওয়া হ'ল—কত জব্‌দমন্ আমি কিছুই জানতে পারলাম না!"

বেলা আট্‌টা বাজিয়া গিয়াছে, তখনও রসুই ঘরের দিকেও যাওয়া হয় নাই; তাই চম্পা নিরুত্তরে হাতের কাম শেষ করিতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ইহার জবাব দিল মিছরিয়া—"তুই ভাবছিস কেন রে বাচ্চু, 'বাও' করলে কি হবে, ও মকাই কাট্‌বো কিন্তু আমরা!"

আয়তনেত্র তাহার মুখের উপর তুলিয়া চম্পা শুধু ভর্ৎসনাস্বরে ডাকিল—"ভাইয়া!" খুরপি হাতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে যাইতে মিছরিয়া বলিয়া গেল—"তুই ত ওজর করিবিই, খেলাওনজি কি না!"

দীপ্ত নয়নে সেইদিকে নির্ব্বাকে তাকাইয়া চম্পার সমস্ত মুখ-খানা নিমেষে লাল হইয়া উঠিয়া ক্রমে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল!

বাচ্চু উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজ মনেই যেন বলিল "মিছরি ভাই তো কামাইনি করতে গেল, আমি তবে ভঁইস চরাতে যাই!"

প্রস্তরমূর্ত্তির মত চম্পা নিশ্চল হইয়া সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। দিদির গতিক সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া বাচ্চু বিনা বাক্যব্যয়ে গোয়ালের দিকে চলিল।

মাসছয়েক হইতে লগ্‌বার (পক্ষাঘাতে) উত্থানশক্তি-রহিত রূপলাল ঘরের ভিতর খাটিয়ায় নিমীলিতনেত্রে পড়িয়া সকল কথাই শুনিতেছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কম্পিতস্বরে ডাক দিল—'চম্পি!'

নিমেষে চমক ভাঙ্গিয়া চম্পা উঠিয়া দাঁড়াইল—"বাবুজি!" তাহার পর ছুটিয়া গিয়া খাটিয়ার নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পিতার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিল। দক্ষিণ হস্ত চম্পার মাথার উপর বুলাইতে বুলাইতে রূপলাল আর্দ্রকণ্ঠে বলিল "বেটি হামারা! কেঁও তু শ্বশুরার না যায়েগি!"

খাটিয়ার বাজুতে মাথা রাখিয়া চম্পা দুর্দ্দমনীয় অশ্রুর বেগ সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল! রূপলাল যেন এই মর্ম্মন্তুদ বেদনার ভার লাঘব করিবার প্রয়াসে তাহার পৃষ্ঠে মৃদু মৃদু চাপড় দিতে লাগিল।

কেন যে স্বামীসুখে জলাঞ্জলি দিয়া এই চার বছরকাল চম্পা কত মর্ম্মযাতনা উদ্বেগ নিরাশা দমন করিয়া হাসিমুখে পিতৃগৃহে বাস করিতেছে, স্নেহশীল পিতাকে তাহার প্রকৃত কারণ সে একদিনের জন্যও জানিতে দেয় নাই। নানাপ্রকার মিথ্যার আশ্রয় লইয়া সে পিতার চক্ষে ধূলি দিয়া, পানাসক্ত লম্পট দামাদের হস্তে আদরিণী কন্যার নিত্যলাঞ্ছনার ও শেষ পরিণতির কাহিনী কোনমতেই গোচর হইতে দেয় নাই; কিন্তু আজ বুঝি মিছরিয়ার শাণিত বিদ্রূপ সকল ধৈর্য্যের বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়!

"ও দিদি, মঙ্গ্‌লার বাছা হয়েছে দেখ্‌বি আয়।" বাচ্চুর চিৎকারে পিতাপুত্রির স্নেহালিঙ্গন ছিন্ন হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া চম্পা বলিল—"কখন হ'ল রে?

সকাল থেকে ত আর. ও-দিকে যেতে পারিনি—চল্ চল্ দেখি।”

তিন

প্রায় মাসতিনেক পরে রামখেলাওনের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে গোপগণের এক বিরাট পঞ্চায়তি হইতেছিল। চতুঃসীমানার পাঁচ সাতটা মৌজা হইতে অন্যূন চারি শত লোকের সমাগমে কিছুক্ষণ তর্ক ও বাক্‌বিতণ্ডার পর খদ্দর-পরিহিত গান্ধিটুপি-শোভিত রামখেলাওন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—“ভাই সব. আজ আমরা যে কারণে এখানে একেট্‌ঠা হয়েছি, তা আর দোবারা করে বল্‌তে আমি চাই না। মহাত্মাজীর আদেশ বোধ হয় আপনারা সকলেই শুনে থাক্‌বেন; কিন্তু তাঁহার পহেলা বাত্ যে আপনারা অনেকেই খেয়াল করেন না তা আপনাদের দিকে নজর করেই বোঝা যাচ্ছে! বড়ই আপষোশের কথা যে দেশী সূতের খদ্দর পরা যে কোন তক্‌লিফের কায নয়, অথচ তাতে দেশের ধন দেশেই থাকতে পারে. এই সিধা জিনিষটা আপনারা আজও মালুম কর্ত্তে পার্চ্ছেন না। তার পর ছোটা জাতের সঙ্গে ছুয়া-ছুতের সংস্কার ভুল্‌তে চেষ্টা করা—”

এই সময় একজন প্রৌঢ় উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ছোটা জাত মানে কি ধানুক কুর্ম্মি কেউট না দুসাধ ডোম চামার তাক্,—সেটা আমরা জান্‌তে চাই!”

দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহাকে বসিবার ইঙ্গিত করিয়া রামখেলাওন বলিল—“সব কাযেতেই হড়্‌বড়ি করার জন্য অনেক সময় আমরা সব গোলমাল করে বসি। ছোটা জাত মানে কি, তা বুঝিয়ে বলবার কোন দরকার আমি দেখ্‌ছিনা। এখন কথা হচ্ছে যে, আজ যদি অনেকেরই ধানুক কুর্ম্মি কেওটের সঙ্গে খানাপিনায় কোনও ওজর না হয় তবে দুচার দশ বরষ পরে—

বাধা দিয়া দু তিনজন চিৎকার করিয়া উঠিল—“ধানুক কুর্ম্মির সাথে খানাপিনা! বখুরি হোতেই পারে না!!”

দুই হস্ত আন্দোলিত করিয়া রামখেলাওন ততোধিক চিৎকার করিয়া বলিল—“আসল বাৎ-এ আসবার কবল এ রকম গোলমাল করা মুনাসিব নয়। আগে আমার কথা শেষ হোক, তারপর আপনারা সকলেই যার যা ‘রায়’ তা জাহির করবেন। এই যে বাগমতী নদীর বাঁধ এখান থেকে একমাইলও নয়, তার কথা বোধ হয় আপনারা ভুলে যান্ নি। এ বছর না হয় বরসাত্ এখনও তেমন জোর হয় নি; কিন্তু বেশী হলেই আমাদের জমির কি দুর্দ্দশা হয় তা'ত সাল-ব-সাল দেখে আস্‌ছেন; অথচ ঐ বাঁধ মেরামত কর্ব্বার চেষ্টা জমিদারের একদম নেই! কিন্তু এক কিস্তের মাল্‌গুজারি বাকি পড়লেই পেয়াদা-পাটবারির তাগাদার চোটে হায়রাণ হয়ে উঠ্‌তে হয়। তার ওপর এবার শুনছি মালিক ইজাফার (খাজনা বৃদ্ধি) নালিশ সুরু করে দিয়েছেন! দাহার (বন্যা) এসে সব জমিন ফসিল সমেত ডুবিয়ে দিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করে চলে যায়, আর তা'র পরই আমরা দেখ্‌তে পাই সেই সব পয়দাবারের জন্য দশগুণো করে বাটাই ভাউলির নালিশ দায়ের হয়ে গেছে! এর উপায় কি আপনারা একবারও ভেবে দেখেছেন? এর একমাত্র উপায় হচ্ছে—এস আমরা ছোটাবড়া সব জাত এক হয়ে এই শুখ্‌খির বছরেই দফা চাল্লিশ দায়ের করে দিয়ে সব ভাউলি কে নগদি করে নিই! এতে যাতে আমরা একেট্‌ঠা হতে পারি—মালিকের দিকে কেউ যাতে মিলে যেতে না পারে, সেই চেষ্টা আমাদের আগে করতে হবে। তারপর হাকিমকে সবজমিনে এনে বাঁধের অবস্থাটা একবার দেখিয়ে দিতে পার্লে, আয়েন্দার জন্যে, সবদিনের জন্যে, আমাদের এ দুর্দ্দশা আর থাক্‌বে না। কিন্তু ভাই সব! আগেই বলেছি যে এতে সকলে একজোট্ না হ'লে কিছুতেই চল্‌বেনা,—তখন কে দুসাদ, কে চামার, কে ধানুক, কে কুর্ম্মি, সে খেয়াল রাখ্‌তে গেলে কোনকালেই আমাদের কোন কায হাসিল হবে না।”

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রামখেলাওন আসন গ্রহণ করিলে তিন মিনিট ধরিয়া হাততালি চলিতে লাগিল। বিজয়দৃপ্তনেত্রে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে এমন সময় একজন কানের কাছে আসিয়া বলিল—‘তোমার ভরণাবালা জমিনের মকাই, মিছরিয়া জন্ লাগিয়ে কাটছে!’

চার

অনেক সময় মানুষ ভাবে এক, কিন্তু ঘটে ঠিক তার বিপরীত। রূপলালের মেয়েকে ঘরে আনিয়া তাহাদের দুঃখদৈন্য মোচন করিবার ইচ্ছা যখন বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় রামখেলাওন দাঙ্গা করিয়া মিছরিয়ার হাত ভাঙ্গিয়া মাথা ফাটাইবার হেতু

হইয়া বসিল। কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল তাহা সে নিজেই ভাবিয়া নির্ণয় করিতে পারে নাই।

সকাল হইতে চম্পা কেবল ঘর-বাহির করিতেছিল। সপ্তাহকাল হাঁসপাতাল-বাসের পর আজ মিছরিয়ার বাটী ফিরিবার কথা ছিল। ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ পথ গরুর গাড়িতে আসিতে হইবে—তাহাতে আর কতই বা—চারঘণ্টা সময় লাগিবে; কিন্তু বেলা দশটা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যখন গো-যানের চিহ্ন দেখা গেল না তখন জল আনিবার ছলে চম্পা একটা কলসি কাঁখে লইয়া নদীর ধারে প্রতীক্ষা করিতে চলিল।

এই দুর্ঘটনার পরই মিছরিয়ার স্ত্রী সুগীয়া তাহার বড় ভাই নিরম্বুর সহিত নবজাত পুত্র লইয়া আসিয়াছিল। আজ ভোর হইতেই সে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল; রূপলাল উৎকর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তাহাদের গাড়ি দেখা যাইতেছে কি না।

মকাই ক্ষেতের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরিয়া চম্পা নিজমনে দ্রুতপদে চলিয়াছিল। একটা বাঁক ফিরিতেই একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সামনে দেখিল—খেলাওন! ক্ষণকাল মূকের ন্যায় উভয়ে নির্ব্বাক থাকার পর দৃঢ়স্বরে চম্পা কহিল—'রাস্তা ছাড় খেলাওন!'

বিন্দুমাত্রও না সরিয়া খেলাওন বলিল "তোমার কাছেই যাব মনে কচ্ছিলাম কলি"—বাধা দিয়া চম্পা কহিল "লজ্জা করে না তোমার, বেহায়া! খুনী!!"

মৃদু হাসিয়া খেলাওন বলিল "বেহায়া না হ'লে এর পরেও তোমাদের কাছে মুখ দেখাতে চাই! তবে খুনী আমি নই, তা ত তুমি ভাল করেই জান কলি। কিন্তু থাক্ ও-সব কথা—তোমার বাপ্‌কে বোলো আমি তসফিয়া (মিটমাট্) করতে চাই—আপোষের মধ্যে লড়াই ঝগড়া না থাকাই ভাল—। মকর্দ্দমা উঠিয়ে নিলে আমি পঞ্চাশ টাকা—"

বাধা দিয়া চম্পা বলিল—"টাকা দেখাতে এসেছ আমাকে? বেইমান!" তাহার দুই চক্ষু যেন হিংস্রের মত জ্বলিয়া উঠিল!

ধাঁ করিয়া মাথার পাগড়িটা খুলিয়া ফেলিয়া খেলাওন বলিল—"বেইমান তুমি না আমি? সরম লাগে না তোমার, যে আমায় বেমারি হালতে পেয়ে, গেঁঠারি থেকে ভয়ঙ্কর দস্তাবেজ চুরি করে, ভাইকে দিয়ে মকাই লুট করিয়েছ! খুব করেছি আমি!—ঐখানে যে মিছরিয়ার কবর হয়নি তার অনেক কিস্মতের জোর!"—বলিয়া পাশ কাটাইয়া দুই একপদ গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"কিন্তু এই বলে যাচ্ছি আমি—এমন একদিন আস্‌বে যেদিন তুমি নিজের হাতে ঐ দস্তাবেজ আমায় ফেরাতে যাবে,—নইলে জান্‌বো যে আমি—" নিজেকে একটা অকথ্য গালি দিয়া সে দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কয়েক মিনিট হতচেতনের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া চম্পার জ্ঞান হইল বাচ্চুর গলার স্বরে। সে চিৎকার করিয়া কাহাকে যেন কি বলিতেছিল।

রাস্তাপথ ভুলিয়া ক্ষেতের ভিতর দিয়াই গাছ মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া চম্পা অবশেষে গাড়ির নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁফাইতে জিজ্ঞাসা করিল "ভাইয়া আয়া?"

বলদের ল্যাজে একটা পাক দিয়া ছইয়ের ভিতর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বাচ্চু কহিল—"ঐ ত' শুতল হ্যায়!"

শূন্য কলসিটা বাচ্চুর হাতে তুলিয়া দিয়া চম্পা বলিল—"তোরা ধীরে ধীরে আয়, যেন ভাইয়ার চোট্ না লাগে—আমি ততক্ষণ দৌড়ে গিয়ে বাবুজিকে খবর দিই।"

ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর মিছরিয়া এক ঘটি গরম দুধ পান করিয়া কিছু সুস্থ বোধ করিলে, তাহার নিকট একে একে সকল কথা জানিয়া লইয়া চম্পা অবশেষে কহিল—"তাহলে মকদ্দমা দায়ের হয়েছে?"

বিস্ময়ের স্বরে মিছরিয়া বলিল—"হবে না? দারোগাজি বলেছেন খেলাওনের কম্‌সে-কম্ তিন মাহিনা জেল নিশ্চয় হবে।" তারপর একটু থামিয়া সে বলিল—"আর ও-জমিন্ তো আমাদের দখলে—ভরণা ত' আপোষ হয়ে গেছে।"

চম্পা শুধু বলিল—"এই জন্যই কি সেদিন বাচ্চুকে বল্‌ছিলে যে ও-মকাই কাট্‌বো আমরা?"

আহত দক্ষিণ হস্ত তুলিবার চেষ্টা করিয়া মিছরিয়া উত্তর করিল—"দস্তাবেজ চাও ত আমি দেখাতে পারি" বলিয়া গৃহকোণে কাঠের সিন্দুকের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল।

মৃদুস্বরে চম্পা বলিল—"এর ভেতরে কোন ফরেবি, বেইমানি নেই ত ভাইয়া?"

"দেখ্‌তে চাও?" বলিয়া মিছরিয়া উঠিবার উপক্রম

করিতেই চম্পা বলিয়া উঠিল—"না, না, থাক্—তুমি শোও। আমি যাই, দেখি তোমার পথ্যের কতদূর কি হোল। সুগিয়াকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—" বলিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পাঁচ

কা'ল মকর্দ্দমার দিন। কিন্তু কি করিয়া সে ব্যয় বহন হইবে এই সমস্যা দুইদিন হইতে সকল কাযে-কর্ম্মে কাঁটার মত চম্পার বুকের মধ্যে খোঁচা দিয়া তাহাকে আজ একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

একমাত্র অবশিষ্ট অবলম্বন ছিল তাহার মাতার খানকয়েক রূপার অলঙ্কার! হৃতসর্ব্বস্বার শেষ সন্তানের মত তাহা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চম্পা চঞ্চল চরণে ক্ষিপ্তের মত অপরাহ্ণে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল!

সম্ভবতঃ চেষ্টা করিলে বাচ্চু সহরে নোকৃরি পাইবে—সুস্থ হইলে মিছরিয়া বাঙ্গলায় গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলে হয় ত ছয় মাসেই দেনা শোধ হইতে পারে, এইরূপ প্রবোধ-বাণীতে বিক্ষুব্ধ মনকে সান্ত্বনা দিয়া সে কয়েকটী বাল্যবন্ধু, দূর আত্মীয় ও পরিচিতের দ্বারে দ্বারে ফিরিল।

একবাক্যে সকলেই উপদেশ দেয়—তোমার যে মহাজন আছে তাহার কাছেই যাওয়া উচিত। দুই কুড়ি টাকা দিয়া ঐ তিনটিমাত্র জেবর যে তাহারা রাখিতে না পারিত এমন নহে, আর তাহা না আনিলেও বা কি ক্ষতি ছিল—কেননা মানুষের কথাই সব, কিন্তু নগদ টাকা ঘরে মজুদ থাকিলে ত? তাহার উপর এই সময়েই জন্মজুরের বিয়া-বাওয়ের খরচা লাগিয়াই আছে।

ধিক্কারে, অপমানে চম্পার সমস্ত দেহমন অজানিত গ্লানি ও বেদনায় তিক্ত বিবশ হইয়া উঠিল। তথাপি সে বারবার প্রতিজ্ঞা করিল,—শত লাঞ্ছনায় দগ্ধ হইলেও সেই হৃদয়হীন শয়তান রামখেলাওনের কৃপাভিক্ষা প্রাণান্তে করিবে না!

অতর্কিতে বেলের একটা বড় গোছের কাঁটা পায়ে ফুটিয়া গিয়া চম্পার গতিরোধ করিল। যন্ত্রণায় অস্ফুট চিৎকার করিয়া সে বসিয়া পড়িয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া আঁচলে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বাষ্পভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় তাহার অন্তর-নিরুদ্ধ সঞ্চিত বেদনারাশি নিমিষে দুই চক্ষের ধারা বাহিয়া উচ্ছ্বসিত বেগে বাহির হইয়া আসিল!

কতক্ষণ পরে পায়ের বেদনায় অস্থির হইয়া চম্পা বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল তাহারই সন্নিকটে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাঁটা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে খেলাওন!

সম্মুখে বিষধর সর্প দেখিলে মানুষ যেমন আতঙ্কে পলায়ন-তৎপর হয়, চম্পা তেমনি ত্রস্তভাবে উঠিবার চেষ্টা করিতেই খেলাওন দৃঢ়ভাবে পদদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"একটুখানি সবুর করে যাও—এটা বার করে ফেলি!"

সজোরে মাথা নাড়িয়া চম্পা বলিল, "না তোমার আর মেহেরবাণী করে কায নেই—যা করেছ সেই যথেষ্ট!"

একটা তীক্ষ্ণধার ছুরিকার অগ্রভাগ দিয়া খেলাওন ততক্ষণে নিবিষ্ট মনে কাঁটার চারিপাশের মাংস চাঁচিতেছিল। মুখ না তুলিয়াই বলিল—"তোমার টাকার এত জরুরত্ কলি, অন্য কোথাও না গিয়ে আগে আমায় জানালেই ত পারতে,—আমি ত এখনও মরিনি!"

চম্পা ভাবিল যে বলে "আমার চক্ষে তুমি মরিয়া জাহান্নমে গিয়াছ"; কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

কাঁটা বাহির করিয়া ফেলিয়া খেলাওন নিজের গামছা ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থান বাঁধিতে উদ্যত হইলে বাধা দিয়া চম্পা বলিল, 'থাক্ থাক্'—

সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া খেলাওন যেন নিজমনে কহিতে লাগিল—"পঞ্চাশ ষাট যা চাও আমি তোমায় আজই দিতে পারি, অম্নি না চাও আমার বহিতে সহি করেও নিতে পার! তোমার মায়ের জেবর নিয়ে বেরিয়েছ শুনে অবধি আমি চারিদিকে তোমায় খুঁজে বেড়িয়েছি!" তারপর নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া গাঢ়স্বরে কহিল "তোমার মা যে আমায় নিজের ছেলের চেয়েও কিছু কম পেয়ার করতেন না—তা তো আমি ভুলতে পারিনে কলি!"

শেষের কথা কয়টিতে চম্পার চখে জল আসিতে চাহিল! মুখ ফিরাইয়া কষ্টে সে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খেলাওন আবার আরম্ভ করিল "কাল মকদ্দমার তারিখ, তার খরচা আছে, তাছাড়া মিছরিয়ার জন্য ডাগদার—"

তড়িৎ বেগে উঠিয়া চম্পা কহিল "এসব জেয়্বারি কার জন্য শুনি?"

মাথাটা ঈষৎ হেলাইয়া খেলাওন উত্তর দিল, "সেই জন্যেই ত নিজে তার সাজা আমি নিতে চাই। তুমি যদি এ টাকা না নাও—"

চম্পার চোখ দুটা চকিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—"টাকা দিয়ে আমায় ভোলাতে পার্ব্বে না খেলাওন! তেমন মায়ের বেটি আমি নই! দোরে দোরে ভিক্ষে মেগে খাব তবু তোমার কাছে যদি হাত পাতি ত সে হাত যেন আমার গলে খসে পড়ে" বলিয়াই সে হন্ হন্ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

রাগের মাথায় খানিক পথ আসার পর তাহার বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল—ঐ যা! গহনার পুঁটলি!

বিবর্ণমুখে চম্পা দাঁড়াইয়া পড়িল। তার পর সেই পথে ফিরিবার উপক্রম করিতেই সে দেখিতে পাইল অদূরে খেলাওন আসিতেছে।

নিকটে আসিয়া তাহার হাতে পুঁটলিটা দিতে দিতে সহাস্য মুখে খেলাওন বলিল—"এই নাও ধর। একবার খুলে দেখে নেওয়া ভাল, কে জানে যদি ইতিমধ্যে দস্তাবেজের শোধ তুলে থাকি!"

লজ্জায় চম্পার সমস্ত মুখ চোখ লাল হইয়া যেন আগুণ ছুটিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সে ত্বরিত পদে গৃহে ফিরিয়া চলিল।

ছয়

বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া নীরসু তখন নিমীলিতনেত্রে বড় তামাকের কলিকাটিতে শেষ দম দিতেছিল। চম্পাকে ফিরিতে দেখিয়া তাহা পশ্চাতে উপুড় করিয়া রাখিয়া সে গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল—"খরচার বন্দোবস্ত হোল?"

একটু শ্লেষের সহিত চম্পা বলিল "বন্দোবস্ত কোন রকম করে হবেই নিশ্চয়।" নেশার ঝোঁকে অযথা গরম হইয়া নীরসু হাঁকিয়া বলিল "কথা শোন! আবার কখন হবে? বিহান যে তারিখ, সে খেয়াল নেই?"

একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া তাহার আপাদ মস্তক ঘৃণাভরে নিরীক্ষণ করিয়া চম্পা শুধু কহিল "মকদ্দমা আমি চালাব না —খুসি!" বলিয়া ঝড়ের মত ভিতরে চলিয়া গেল।

গহনাটা তাহার বিছানার মধ্যে তাড়াতাড়ি লুকাইয়া রাখিয়া চম্পা পিতার কাছে গিয়া বসিল।

ক্ষীণ দীপালোকে রূপলাল তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"কোথাও টাকা পেলি না চম্পি?"

চট করিয়া চম্পা উত্তর করিল "হাঁ পেয়েছি বই কি!" তারপর নিম্নস্বরে বলিল—"টাকাকড়ির কথা কি চিৎকার করে চেঁচিয়ে বলা ভাল? তুমিই ত কতবার আমায় মানা করেছ। ওর যেমন বুদ্ধি—"

স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রূপলাল চোখ বুজিল—"তুই যদি আমার বেটা হতিস মাঈ!" বৃদ্ধের চখের কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু জমিয়া উঠিতেই চম্পা সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিয়া গাঢ়স্বরে বলিল "তাই ত আমি তোমায় ফেলে কোথাও যেতে চাইনে বাবু হামারা!"

গভীর রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে চম্পা নিজের শয্যার নিকটে যাইতেই মনে পড়িয়া গেল গহনাটা সিন্দুকে তোলা হয় নাই।

নিস্তব্ধ নিশীথে নিরালা পাইয়া একে একে দুর্ভাবনার রাশি তাহাকে প্রেতের মত ঘিরিয়া ফেলিল। সন্ধ্যার পরেই মিছরিয়ার আজ কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। তাহার জন্য সহর হইতে ডাক্তার আনিবার কথা নীরসুকে কয়দিন হইতে বলা হইতেছে; কিন্তু সে বাহাদুরী করিয়া নিজে কি সব লতাপাতা বাটিয়া লাগাইতেছে—হয়ত বা তাহাতেই বাড়িয়া গিয়া আজ আবার জ্বর আসিল! রূপলালের ক্ষুধামান্দ্য এতই হইয়াছে যে সে আর সমস্ত দিনে প্রায় কিছুই খাইতে চায় না—জোর করিয়া খাওয়াইলে তুলিয়া ফেলে। এতে সে ক্রমেই দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। এইসব দুর্ভাবনার উপর কাল ভোর হইতে না হইতেই বাচ্চুকে লইয়া নীরসু মকদ্দমার জন্য সহরে যাইবে—সে সময় তাহাকে টাকা দিতেই হইবে।

চিন্তার জাল ছিন্ন করিবার আয়াসে বিছানার মধ্য হইতে পুঁটলিটা একটানে বাহির করিয়া চম্পা মনে মনে বলিল—"দূর হোক ছাই, এটা ত আগে তুলে রাখি!"

কাঠের সিন্দুক সন্তর্পণে খুলিয়া তাহা যথাস্থানে রাখিতে গিয়াই চম্পা কৌতূহলী হইয়া ভাবিল—'দেখি ত এটা খুলে, সব ঠিক আছে ত?'

পুঁটুলির বন্ধন খুলিয়া ফেলিতে উপরেই সাদা কি একটা কাগজের মত দেখিতে পাইয়া চম্পা তাড়াতাড়ি আলোর নিকট আসিয়া একে একে তুলিয়া দেখিল—নোট। ছয়খানি দশটাকার নোট!

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়া সে অভিভূতের ন্যায় বসিয়া রহিল। দুই চোখ ফাটিয়া অশ্রুর বন্যা অবাধে তাহার দুইগণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সাত

সবডিভিসনের দোয়েম ডেপুটি সাহেবের এজলাসে মকর্দ্দমার শুনানি আরম্ভ হইল। সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে এজেহার করিল বাচ্চু এবং দুইটি মাত্র জন—আকলু ও তোখন্। কারণ ঘটনাস্থলে দর্শকের অভাব না থাকিলেও শোনা গেল যে অন্য সকলকে খেলাওন অর্থ-দ্বারা বশীভূত করিয়াছে।

নীরস্থ অবশ্য মকদ্দমার পৈরবির ভার লইয়া আসিয়াছিল। দারোগা সাহেবকে সে জানাইল যে রাত্রে হঠাৎ মিছরিয়ার "জাড়া-বোখার" হওয়াতে সে নিজে আসিতে পারে নাই—তারিখ বাড়িলে সেদিন সে নিশ্চয় আসিবে।

অতঃপর দশদিনের তারিখ বাড়িল।

দিন-দুই পরেও যখন মিছরিয়ার রোগের কোন উপশম হইল না তখন হালে পানি না পাইয়া অগত্যা নীরস্থ সহর হইতে সরকারি ডাক্তার আনিতে গেল। পরদিন বৈকালে যখন মোটরে করিয়া ডাক্তার বাবু আসিলেন তখন মিছরিয়া বিকারের ঝোঁকে উঠিয়া বসিয়াছে। হাতের ঘড়িটার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মিছরিয়ার নাড়ি মিনিট খানেক পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে মাথায় লাঠিটা মারিয়াছিল আর কেই বা হাতে চোট্ দিয়াছিল। আরক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মিছরিয়া কহিল "আব্ রি শালা আবে!"

ডাক্তার গম্ভীর স্বরে তাঁহার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিলেন। মিছরিয়া ডান হাতের উপর মাথাটা রাখিয়া কহিল "ঠক্কন,—ঠক্কন—লুটকা বেটা ঠক্কন!" তারপর আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িল। ইহার পর ক্রমেই যেন সে বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং আর কোন প্রশ্নের উত্তর ভাল করিয়া দিল না।

ডাক্তার বাবু সযত্নে কি সব নোট করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ঠক্কন কোথায় থাকে। সমাগত সকলেই পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে বাচ্চু আগাইয়া কহিল ঐ নামের কোন লোককে তাহারা জানে না। ডাক্তার আবার কি লিখিয়া লইলেন। ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তিনি মোটরে ফিরিয়া গিয়া বসিতেই বাড়িতে কান্নার রোল উঠিল। আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ডাক্তার বাবু শোফারকে আদেশ করিলেন "জল্‌দি ষ্টার্ট করো।"

অতঃপর মকদ্দমা বিধিমতে দায়রায় সোপর্দ্দ হইল।

* * * *

সেদিন সহর হইতে এই বার্ত্তা বহন করিয়া উৎফুল্লচিত্তে পথে ঘাটে তাহা ঘোষণা করিতে করিতে নীরস্থ বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া চম্পাকে দেখিতে পাইয়া সহাস্যবদনে কহিল "আজকের সম্বাদটি বোলবোনা—বড় জব্বর খবর আছে—আগে কি খাওয়াবে বল?"

মিছরিয়ার মৃত্যুর পর হইতেই এই প্রসঙ্গের এত আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এবং খেলাওনের ফাঁসি বা দ্বীপান্তর এমনই অকাট্য, তাহা নীরস্থ এরূপ বিজ্ঞের মত দৃষ্টান্ত সহ সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছে, যে, তাহার মুখভঙ্গী দেখিয়া চম্পার লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে আজিকার জব্বর খবরটা কি!

রোয়াকের উপর বসিয়া বাঁশের খুঁটিতে মাথা ঠেস দিয়া চম্পা পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা ভাবিতেছিল। মিছরিয়ার মৃত্যুর জন্য নীরস্থকে সে বিশেষভাবে দায়ী না করিয়া পারিতেছিল না। কারণ, যেদিন সে চম্পার হাত হইতে মিছরিয়ার মাথার ক্ষত ধোয়াইবার কাযটা তর্ক করিয়া কাড়িয়া লয় সেই রাত্রেই তাহার জ্বর আসে। তাহার পরেও অযথা দুইদিন জেদ করিয়া নীরস্থ নিজে হাকিমী করিয়া জড়ি বুটি লতাপাতা বাঁটিয়া লাগাইয়া ক্রমে রোগটা বাড়াইয়া তোলে। অবশেষে ডাক্তার আনিতে গিয়াও সহরে একদিন অহেতুক বিলম্ব করে। অর্থ সে দুইহাতে খরচ করিয়া বেড়াইতেছে, আর তাহা ঘটিবাটি বাঁধা দিয়া জোগাইতে হইয়াছে চম্পাকে। ইহার উপর সময়ে অসময়ে তফ্ রি তামাসা করিয়া চম্পার গা' ঘেঁসিয়া বেড়াইবার চেষ্টা তাহার অনুক্ষণ আছে।

বাঁশের খুঁটিটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চম্পা উত্তর করিল—"বাবুজি বল্‌ছিলেন যে আপনি সুগিয়া বেঠকে নিয়ে দিনকতকের জন্য নিজের গাঁয়ে চলে যান—ওর মা'র কাছে গেলে তবু ও কতকটা শোক বরদাস্ত করতে পারবে!"

হতবুদ্ধির মত ক্ষণকাল চাহিয়া নীরস্থ কহিল—"কিন্তু মামলা মকদ্দমা—শল্লামুসাবিদা—দেখ্ ভাল্?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া চম্পা বলিল—"পয়সা ফেল্‌লে তা'র লোকের অভাব হবে না—দেখ্ ভাল্ আমিই কর্‌তে পারব।"

মাথা চুলকাইয়া নীরস্থ বলিল—"কিন্তু আপনার লোক যেরকম—আমি যেমন—"

বাধা দিয়া চম্পা বলিল—"আমায় বেশী বকিও না। আমার মন ভাল নেই।" বলিয়া সে পিতার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

নীরসু তখন ধীরে ধীরে সুগিয়ার নিকট গিয়া বলিল—"তোর কি মত বহিন?"

আপাদমস্তক আবৃত করিয়া সুগিয়া শুইয়া ছিল। ফোঁস করিয়া উঠিয়া, মুখের কাপড় না খুলিয়াই বলিল—"এতে আবার মত কি? কাল ফজিরেই চল—আর একদিনও এখানে নয়!"

পরদিন প্রত্যূষে জিনিসপত্র একটা গরুর গাড়িতে চাপাইয়া, অন্য গাড়িতে সুগিয়াকে চড়াইয়া দিয়া নীরসু দূর হইতে হাঁকিয়া বলিল—"তবে আমরা চল্লাম। বিপদে আপদে সম্বাদ পেলে না আস্‌বো যে এমন নয়, কিন্তু বহিনকে আর এ মুখো হতে দেব না—আগ্‌লা মাহিনাতেই তা'র দোসর ঘর করে দেব।"

তাহারা খানিকটা পথ যাইতেই কোথা হইতে সবেগে ছুটিয়া আসিয়া চম্পা গাড়ির পিছনের পর্দ্দা তুলিয়া সুগিয়ার কোল হইতে শিশুটিকে ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ চুমু খাইতে লাগিল!

দূর হইতে নীরসু ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, ব্যস্তভাবে সেইদিকে অগ্রসর হইতেছে, শিশুকে যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া, সুগিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চম্পা বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল—"কিছু মনে করিস্ না বউ!—ভাইয়া আমার মাথা খারাপ করে দিয়ে গেছে!"

তারপর দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে চম্পা ছুটিয়া ফিরিয়া গিয়া রূপলালের খাটিয়ায় মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বৃদ্ধ কয়েকবার গলা পরিষ্কার করিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন স্বর ফুটিল না।

আট

বয়সে প্রবীণ হইলেও চম্পাকলির মাতুল মনোগ মাহ্‌তোর উদ্যম ও কার্য্যতৎপরতা এখনও যুবার মতই ছিল। চম্পার শ্বশুরালয় বেলারি হইতে তাহার মকান দেড় মাইলের পথ এবং তাহারই উদ্যোগে এই বিবাহ হয়, সেজন্য ইহার শেষ পরিণামের বৃত্তান্ত সে সকলই জ্ঞাত ছিল। তের বছর বয়সে চম্পার সিঁদুর মুছিয়া, হাতের চুড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার স্বামী কৃপাল তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে সে সোজা মাতুলালয়ে আসিয়া আশ্রয় লয়।

প্রকৃত ব্যাপার যাহাতে রূপলাল জানিতে না পারে সেজন্য চম্পাকে সাজাইয়া গোছাইয়া মনোগ তাহাকে বাটী পৌছাইয়া দিবার সময় বার বার এ সকল কথা গোপন করিতে উপদেশ দেয় এবং তাহার স্বামীগৃহে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা শীঘ্রই হইবে এই আশ্বাস দেয়। তার পর এই পাঁচ বছরের চেষ্টাতেও যখন কৃপালের মতের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না, তখন অনেক অনুসন্ধান করিয়া অন্যত্র একটি সুযোগ্য পাত্র মনোনীত করিয়া মনোগ ময়নায় উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিল।

হাইকোর্ট পর্য্যন্ত কতবার মামলা লড়িয়া যে চুল পাকাইয়াছে, এ ব্যাপার তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। সুতরাং রূপলালের নিকট আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা একে একে শুনিয়া লইয়া সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল যে যদিও বা খেলাওনের মুক্তির কোন পথ ছিল, তাহার আগমনে তাহাও রুদ্ধ হইয়া গেল।

বিচক্ষণ তত্ত্বাবধানের ফলে 'কমজোর' মকদ্দমায় ডিক্রি পাওয়া কষ্টকর নয়, পরন্তু দস্তর মাফিক পৈরবির অভাবে 'জোরগর' মকদ্দমাও হারিতে হয়—বিশেষ করিয়া ত' ফৌজদারী! স্বয়ং এ সব দেখা শুনা না করিলে কি কার্য্যোদ্ধার হয়? ইদানিং দুই তিন বছর আদালত-ঘর করিবার সুযোগ না ঘটায় তাহাকে গাঁঠিয়া বাতে ধরিবার উপক্রম করিয়াছে—আর এ ত ঘরের কায! নবীন উৎসাহে তাহার পর দিনই সে বাচ্চুকে লইয়া মকদ্দমার তদ্বির করিতে সহরে যাইবে স্থির করিয়া ফেলিল।

আহারাদির পর চম্পাকে একান্তে ডাকিয়া মনোগ কহিল—"তোর সেজন্যে কিছু ভাবনা নেই চম্পি—আমি সে কথা কি ভুলে আছি ভেবেছিস?···সব ঠিক করে তবে এসেছি, পরে জান্‌তে পারবি।"

মাথা নিচু করিয়া বসিয়া চম্পা নিরুত্তরে পায়ের নখ খুঁটিতেছিল। গলা আর একটু খাটো করিয়া মনোগ বলিতে লাগিল—"এখন অত কথা তোর বাপের কাছে ভাঙ্গবার দরকার নেই—বেচারা একে নিজেই বেহালত হয়ে পড়েছে···তোকে যেন বেলারিতে নিয়ে যাচ্ছি বলে যাব···

তারপর কায হয়ে গেলে আসল কথা দরকার হয়ত' পরে বলা যাবে।"

নিকটে একটু সরিয়া আসিয়া মনোগ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল "এবার কিন্তু ডুবছর ধরে নজর রেখে তবে বর ঠিক করেছি—আর কি গল্‌তি হতে দিই? সত্যি বল্‌ছি ছেলেটি আমার বড় মনগর হয়েছে!"

সুদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে চম্পা ক্রমেই অধীর হইয়া শেষে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া বসাইয়া মনোগ বলিল—"এত লাজ তোর কিসের রে পাগ্‌লি? আমার কাছে সরমাবার কি আছে?"

বাস্তবিক মনোগ নিজের মেয়ের মতই চম্পাকে ভাল-বাসিত। তথাপি চম্পার জড়তার অবধি নাই দেখিয়া মনোগ বলিল—"আচ্ছা থাক্ ও কথা—এখন খেলাওনের ভরণা দস্তাবেজটা দে' ত। তো'দের কা'রো খেয়াল নেই যে দখল কব্‌জার ওটা কতবড় সাবুদ্! তোর জমিনের ওপর চড়াও হয়ে তোর ভাইকে জখম খুন করে গিয়ে যদি সে রেহাই পায় ত ফজুল আমি মাম্‌লা লড়ে চুল পাকিইছি।··· দেখি সে দস্তাবেজ!···হাঁরে উস্নুলিটা কোন্ তারিখের? খেলাওনের হাতের বকলন থাস্ তো?"

কোন কথার উত্তর না দিয়া এবার চম্পা উঠিয়া গেল এবং তাহার পর একখানি দলিল আনিয়া মনোগের হাতে দিল।

পিরানের পকেটে হাত দিতে দিতে মনোগ বলিল—"এই দেখ্—চশমাটা আন্‌তে ভুলেছি! আমি কি জানি তোদের এখানে এত সব হাঙ্গামা বেধেছে। আমি এসেছিলাম চম্পি-মাইকে নিয়ে যেতে। যা, যা, দেখ্‌তো তোর বাবার চশমাটা যদি পা'স।"

কিছুক্ষণ পরে চম্পা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে চশমা পাওয়া গেল না। ততক্ষণে মনোগ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দলিলটাকে প্রায় দুই হাত ব্যবধানে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছিল। অবশেষে চম্পার হাতে তাহা তুলিয়া দিয়া বলিল—"আচ্ছা তুই-ই দেখে বল্ না!"

এই সর্ব্বনেশে দলিলই যে ভাইয়ার অপমৃত্যুর কারণ, সিন্দুকে সযত্ন-রক্ষিত কাগজপত্রের মধ্য হইতে ইহা বাছিয়া বাহির করিবার সময় চম্পার সে কথা স্মরণ হইয়া তীব্র বেদনায় বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। কোনও মতে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সে তাহা বাহির করিয়া আনিয়া দিয়াছিল। এখন মাতুলের আদেশে নিরুপায় হইয়া সে ওষ্ঠদ্বয় সম্বদ্ধ করিয়া মনো-ভাব দমন করিতে করিতে দলিলের স্থান-বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিল। বিস্মিতনেত্রে মনোগ বলিল—"কই বল্‌লিনে যে?" রুদ্ধকণ্ঠে চম্পা কহিল "উস্নুলি নেই।" "নেই কি রে? তুই কি পড়তেও ভুলেছিস?" বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মনোগ কাগজটা তুলিয়া লইয়া তাহাকে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

নয়

আকাশ ভাঙ্গিয়া শ্রাবণের ধারা সেদিন যেন ধরিত্রীকে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে। সপ্তাহ অতীত হইল মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মনোগ বা খেলাওন সহর হইতে ফিরে নাই। বাচ্চু আসিয়া অবধি কোন্ সাক্ষী জেরায় কি বলিয়াছে, তাহাতে খেলাওনের বিরুদ্ধে প্রমাণের কোনও সন্দেহ নাই উকিল তাহা কিরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন, এই সকল কথা চম্পার নিকট বিশদ ভাবে কতবার বলিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। মানসিক উত্তেজনার জন্যই বোধ হয় রোগ-বৃদ্ধি হইয়া রূপলালের কথা কেমন জড়াইয়া গিয়াছে; এবং পাঁচদিন হইতে চলিল সে যেন আচ্ছন্ন ভাবে কাটাইতেছে। জ্ঞান হইলে যাহা বলিতে চেষ্টা করে তাহাও পরিষ্কার বোঝা যায় না,—কেবল মকদ্দমা, খেলাওন, মিছরিয়া এই সব লইয়া কি যেন বলে।

দুই দিন হইতে সহরের এক ডাক্তার রূপলালকে দেখিয়া যাইতেছেন ও ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছেন। তাঁহাকে ফি দিতে গেলে তিনি বলেন তাহা পূর্ব্বেই পাইয়াছেন; অথচ কে তাঁহাকে পাঠায় তাহার নাম জানেন না।

বাচ্চু বলে মাম্‌না হলে এত বুদ্ধি কার; কিন্তু চম্পার তাহাতে সন্দেহ হয়। এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে জানিলে মনোগ নিশ্চয় নিজে আসিয়া পড়িত, তাছাড়া এত টাকা তাহার হাতে কোথায়? কিন্তু এ অবস্থায় সংবাদ দিবার জন্য সহরে বাচ্চুকে পাঠাইতে ভরসা হয় না।

পিতার শয্যাপার্শ্বে সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়া চম্পা দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল রূপলাল স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। চম্পা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কেমন আছ বাবুজি?" রূপলাল উত্তর দিবার কোন চেষ্টা

না করিয়া ধীরে ধীরে ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইল যে তাহার বাক্‌শক্তি সে সম্পূর্ণ হারাইয়াছে!

এমন সময় তীরের মত বেগে ঘরে ঢুকিয়া বাচ্চু বলিল—"খেলাওনজির ফাঁসির হুকুম হয়েছে!" সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া রূপলালের মুখ নিমেষে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—তাহার পর ক্রমে সে যেন ঘুমাইয়া পড়িল!

কতক্ষণ চম্পা সেই ভাবে বসিয়া ছিল জানে না, চকিতে সব কথা মনে পড়িয়া সে অস্ফুটে বলিল—"বাচ্চু এক লোটা জল নিয়ে আয়।"

আধঘণ্টা শুশ্রূষার পর রূপলাল চোখ চাহিয়া কথা কহিবার মত করিল; কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াসে বিকৃত অর্থহীন স্বর বাহির হইয়া তাহার ঠোঁট-দুটা কেবল কাঁপিতে লাগিল।

আঁচল দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া চম্পা বলিল—"বাচ্চু ভুল শুনেছে বাবু—তুমি কিছু ভেবো না, খেলাওনজি ফিরে আসবে।" রূপলালের নিষ্প্রভ চক্ষু-দুটি নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া কাহাকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

চম্পা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"মামকে খুঁজছো বাবু? কদিন যে ঝপ্‌সি পানি নেমেছে, তিনি সহর থেকে এখনও আসতে পারেননি।" তারপর বাচ্চুর দিকে ফিরিয়া বলিল—"তুই এখানে একটু বস্‌তো,—আমি চট্ করে দুধটা দুয়ে নিয়ে আসি।"

চম্পা চলিয়া গেলে রূপলাল চোখের ইসারায় বাচ্চুকে একই কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বাচ্চু বলিল—"ঠিক খবর তো জানিনে—কত লোক কত কথা বলছে, আজই কিন্তু রায় শোনাবার দিন।"

"তুই সব জানিস্" বলিয়া চম্পা একটা বাটিতে গরম দুধ লইয়া প্রবেশ করিয়া কহিল "ছেলেমানুষের কথা, শোন কেন বাবুজি? আমার মন বলছে—"

চট্ করিয়া কথাটা মাঝপথে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"তুই যা না বাচ্চু। কত কায পড়ে রয়েছে! মঙ্গলার জাব্ দিয়েছিস্?"

"ছেলেমানুষ আর ছেলেমানুষ! ভারি ত উনি আমার চেয়ে বড়,—তিনমাসের!...যা শুনি তাই বলি, আবার কি বলব?" নিজমনে এই সব বকিতে বকিতে বাচ্চু বাহির হইয়া গেল।

চামচে করিয়া সন্তর্পণে খাওয়ান সত্ত্বেও অতি সামান্য দুধ গলাধঃকরণ করিতে রূপলাল শ্রান্ত ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

পিতা ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার পাশে চম্পা নিজে কতক্ষণ ঘুমাইয়াছে জানে না, হঠাৎ কাহার মৃদুস্পর্শে সে নিদ্রাভঙ্গে মোহাবিষ্টের মত খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল—তাহার পর ডাকিল—"বাবুজি!"

চমকাইয়া রূপলাল চোখ খুলিয়া দেখিল—প্রফুল্ল মুখে খাটিয়ার অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া খেলাওন!

রূপলাল কয়েকবার চোখ চাহিল, আবার বুজিল, আবার চাহিয়া দেখিল। চক্ষুর উপর সে যেন বিশ্বাস হারাইয়াছিল!

খেলাওন বলিল—"আমি বেকসুর খালাস পেয়েছি বাবা!" নিকটে আসিতে ইঙ্গিত পাইয়া খেলাওন খাটিয়ার পাশে বসিয়া পড়িল।

চম্পার দক্ষিণহস্ত ধীরে ধীরে তুলিয়া আনিয়া রূপলাল নিজের বক্ষের উপর স্থাপন করিল। তাহার পর আবার শক্তিসঞ্চয় করিয়া খেলাওনের ডান হাতখানি টানিয়া আনিয়া চম্পার হাতের উপর ক্ষীণশক্তিতে চাপিয়া ধরিল! মনোভাব প্রকাশ করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় অপলক দৃষ্টিতে খেলাওনের মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধের চক্ষে যেন শ্রাবণের ধারা নামিয়া আসিল! মস্তক নত করিয়া খেলাওন বলিল "তাই হবে চাচা!" রূপলাল তখন চম্পার লাজারুণ মুখের প্রতি জিজ্ঞাসু মুখে তাকাইয়া রহিল।

ইতিমধ্যে মনোগ কখন ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল কেহ লক্ষ্য করে নাই।

তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সে বলিল "চম্পির হয়ে আমি কথা দিচ্ছি রূপলাল, এ কায সম্পূর্ণ করে তবে আমি ঘরে ফিরবো। ভুলে যেও না ভাই, ও যে আমারও মেয়ে!"

স্মিতহাস্যে অশ্রুসিক্ত পাণ্ডুর আনন উদ্ভাসিত করিয়া রূপলাল পরম নিশ্চিন্ত ভাবে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল!

সময়ের সদ্ব্যবহার

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

আজ সন্ধ্যায় আপনাদের সুমুখে কিছু বলতে দাঁড়িয়ে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ছে কবি Cowperএর সেই সর্ব্বজনবিদিত ছোট কবিতাটি—"Time and Tide wait for none." প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত "রহস্য সন্দর্ভ" নামক পত্রিকায় এই সুন্দর সারগর্ভ কবিতাটির একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—

> নদী আর কালগতি একই সমান,
> অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।
>
> * * * *
>
> সর্ব্ব অংশে একরূপ যদিও উভয়,
> চিন্তারত চিত্তে কিন্তু ভেদজ্ঞান হয়;
> বিকলে না বহে নদী—যথা নদীভরা
> নানাশস্য শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা।
> কিন্তু কাল সদাস্মক্ষেত্রের শোভাকর,
> উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।

বাস্তবিক উপেক্ষিত হ'লে কালও মানুষকে ভয়ানক উপেক্ষা করে, তার জীবনকে ঘোর মরুভূমির ব্যর্থতায় ডুবিয়ে দেয়। আমাদের মহিলা-কবিও লিখেছেন,—

> একে একে একে হায়, দিনগুলি চলে যায়
> কালের প্রবাহ 'পরে প্রবাহ গড়ায়,
> আর দিন চলে যায়।

মানুষের জীবনে যে সময় একবার চ'লে যায় তা আর ফিরে আসে না। কথাটি অতি প্রাচীন কিন্তু ততোধিক মূল্যবান। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—মানবজাতির প্রতি বিধাতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান কি?—আমি তখনই উত্তর দিয়ে থাকি,—মহামূল্য সময়। সময়ের সদ্ব্যয় বা অপব্যয়ের উপরই মানব-জীবনের সার্থকতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। Lord Morley তাঁর Study of Literature নামক পুস্তকে সময়ের কিরূপ সদ্ব্যবহার করা যায় সে কথা বলেছেন। ইংলণ্ডে সামান্য কেরাণী ও শ্রমজীবিগণ পর্য্যন্ত সময়ের মূল্য বুঝেন; এক মিনিটও হেলায় নষ্ট করেন না। কিন্তু আমরা কাজ না করার কৈফিয়ৎ দিই—সময়ের অভাব, অথচ গল্পগুজব আড্ডা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই। বাস্তবিকই বড় লজ্জার কথা। যাঁরা কেরাণী, সকালবেলা আহারাদি ক'রেই যাঁদের উদরান্নের জন্য দৌড়াতে হয়, তাঁরাও প্রতিদিন আধ ঘণ্টা ক'রে পাঠ করলে ৩৬৫ দিনে অনেক বই প'ড়ে শেষ করতে পারেন। কিন্তু পড়তে হবে নিয়মিতরূপে, অর্থাৎ প্রতিদিন কর্ত্তব্যবোধে সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রে। ধারাবাহিকরূপে কাজ করা চাই। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে পাথরও ক্ষয় হয়। অধ্যয়ন আমার কাছে সাধনার মত—ধ্যান-ধারণার সমতুল্য। ঠাকুর-ঘরে যখন কেউ উপাসনা-নিরত থাকেন, তখন পাছে ধ্যানভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কেউ তাঁকে বাধা দিতে যায় না। সেইরূপ কেউ অধ্যয়ন বা চিন্তানিরত থাকলে, তাঁকে কোনমতে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়। বাধা দিলে কত ক্ষতি হতে পারে আমরা তার ধারণাই করতে পারি না। একটি উদাহরণ দি,—কবি কোলরিজের (Coleridge) Kubla Khan or Vision in a Dream নামক বিখ্যাত কবিতা রচনার কথা। শারীরিক অসুস্থতা-বশত কবির একটু মরফিয়া সেবন অভ্যাস ছিল। একদিন মরফিয়া সেবন ক'রে আরাম-কেদারায় ৩ ঘণ্টা যাপনের পর নিদ্রিতাবস্থায় কবির মননশক্তি ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠল, (মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এ কথা স্বীকার করেন)—তিনি স্বপ্নে "কুবলা খাঁ" কবিতার ৩০০।৪০০ ছত্র রচনা করলেন। নিদ্রার পূর্ব্বে তিনি চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র কুবলা খাঁ সম্বন্ধে কিছু পড়ছিলেন বটে। যাহোক, নিদ্রাভঙ্গের পরই কাগজ কলম দোয়াত নিয়ে কবিতাটি লিখতে আরম্ভ করলেন। ৫৪ লাইন লিখেছেন এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে কোন লোক তাঁকে কথাবার্ত্তায় এক ঘণ্টা ব্যস্ত রেখে দিলে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, এই প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হ'য়ে কবির চিন্তাধারার সূত্র হারিয়ে গেল, আর তার ফলে সেই অত্যুৎকৃষ্ট

কবিতা মাত্র ৫৪ লাইন লিখিত হ'য়ে অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ হ'য়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনের নিভৃত নিবাসে 'গীতাঞ্জলি' রচনা করতেন তখন তাঁর ধ্যানভঙ্গ করলে কি অবস্থা হ'ত! সুদূর য়ুরোপ থেকে দর্শনাকাঙ্ক্ষী এসে তাঁকে কার্ড পাঠিয়ে সাক্ষাৎ করে,—অন্যথা পাছে তাঁর কল্পনার স্বচ্ছন্দগতি বাধা প্রাপ্ত হয়। এ দেশে এই সব কথা বলবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে। কেহ প্রাতঃকালে আপন ঘরে অধ্যয়ন-নিরত আছেন, এমন সময় কোন শিক্ষিত লোক—সম্ভবত বন্ধু এসে হাজির,—বললেন "মশায় পড়ছেন না কি?" আরে মশায়, বই খুলে বসে পড়ছি না ত পায়খানায় গেছি না কি? চেয়ার টেনে বসে আরম্ভ করলেন—"খপর কি? ছেলেপুলে কেমন? মেয়ে সেয়ানা হচ্ছে বিবাহের কি করছেন?" ব্যস্, পড়াশুনোর ইতি হ'য়ে গেল। অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হল। বাস্তবিক আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই—"উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর"।

ইংরেজ কিন্তু সময়ের মূল্য বোঝেন; তাঁরা বোঝেন "Work while you work, play while you play"—কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা। এর ব্যতিক্রম হ'লেই আমরা কোন কাজে অগ্রসর হতে পারি না। বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত এমার্সন বলেন—"At times the whole world seems to be in conspiracy to importune you with emphatic trifles. Friend, child, sickness, fear, want, charity, all knock at once at thy closet door and say, —'Come out unto us'. অধ্যয়ন ও মননের সময় পরিচিতগণের প্রত্যেকেই একবার দরজায় ধাক্কা দেবে। তাই আরও বিরক্ত হ'য়ে আর একস্থানে তিনি বলছেন—

'O father, O mother, O wife, O brother, O friend, I have lived with you after appearances hitherto. Henceforward I am the truth's. Be it known unto you that henceforward I obey no law less than the external law I will have no covenants but proximities. I shall endeavour to nourish my parents, to support my family, to be the chaste husband of one wife,—but these relations I must fill after a new and unprecedented way.' সবই হতে রাজী আছি, কিন্তু দয়া করে আমাকে একা থাকতে দিন। বাস্তবিক এই মহামনীষিগণ গভীর চিন্তার ফলে যে ভাবরত্ন আহরণ করেন, কাব্যে অথবা প্রবন্ধে গেঁথে দেবার সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাঁদের চিন্তাধারা বিপর্য্যস্ত ক'রে দিলে যে কি সমূহ ক্ষতি হয়, সে বোধ অনেক লোকেরই একবারে নেই।

ইংরেজ দার্শনিক কারলাইল ছিলেন এমার্সনের বন্ধু। তাঁর জীবন-কাহিনী এক অদ্ভুত ব্যাপার। কারলাইল দরিদ্র কৃষক-সন্তান। তাঁর পিতা রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। পরে বৃদ্ধবয়সে কিছু অনুর্ব্বর জমি সংগ্রহ ক'রে চাষ করতেন। আর্থিক অবস্থা একেবারে অসচ্ছল। বৃদ্ধ পিতামাতা—৬।৭টি ভাইভগ্নী, অজস্র প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ হত। ছেলেদের মধ্যে কারলাইল ছিলেন মেধাবী; তাই সকলে মিলে চেষ্টা ক'রে তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। সেখানে কিছুদিন একনিষ্ঠ অধ্যয়নের পর কারলাইল দেখলেন, এক প্রফেসর লেসলি ছাড়া আর এমন কেউ নেই যার পদতলে ব'সে তিনি শিক্ষালাভ করতে পারেন। তাই বিরক্ত হ'য়ে কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু এডিনবরা সহর থেকে দূরে গেলেন না। পয়সা অভাবে নিকটে ডামফ্রিসশায়ারে এক ক্ষুদ্র কৃষক-কুটীরে বাস ক'রে সঙ্গতিপন্ন প্রতিবেশীর নিকট থেকে বই ধার ক'রে অধ্যয়ন-তৃষা মেটাতে লাগলেন। কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত ক্লাসে ক্লাসে দৌড়াদৌড়ি নেই,—শুধু নীরব সাধনার বলে, নিজ চেষ্টায়, সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কারলাইল অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁর জীবন-চরিত-লেখক বলেছেন—

'There was, perhaps, no one of his age in Scotland or England who knew so much and had seen so little. He had read enormously—history, poetry, philosophy; the whole range of modern literature—French, German, and English—was more familiar to him, perhaps, than to any man living of his own age.'

জার্ম্মান সাহিত্য ও দর্শনে কারলাইল কি অসাধারণ ব্যুৎপন্ন

ছিলেন তৎপ্রণীত Sartor Resartus পাঠে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চরিত-লেখক Henry Froude বলেছেন—তাঁর মত সাহিত্যজ্ঞান কদাচিৎ কোথাও দেখা যায় কি না সন্দেহ। বাঙ্গলা দেশে যেমন লোকে বিদ্যার প্রসারের জন্য গ্রাম থেকে কলকাতা যায়, কারলাইল সেইরূপ প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণের জন্য লণ্ডন যাত্রা করলেন। সেখানে এক বন্ধু-পরিবারে অতিথি হলেন। কিন্তু দু'দিন পরেই বন্ধুকে বললেন "বন্ধু, এখানে চলবে না,—লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে, বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে এত সময়ক্ষেপ ক'রে আমার চলবে না। শীঘ্র একটা বাসা ঠিক ক'রে দাও, আমি বাড়ী ছেড়ে বাঁচি। কি ভয়ঙ্কর! গুড্‌মর্ণিং, কেমন আছেন, খাসা দিনটা আজকের, চা আর একটু ঢালব কি? এই সব ভদ্রআনার মার-প্যাঁচের জ্বালায় যে দিনরাতে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম; এখন এমন জায়গায় নিয়ে চল যেখানে কেউ বিরক্ত করবে না।" এইরূপে চিত্তবিক্ষেপের সকল কারণ হ'তে দূরে থেকে, সময়ের সমুচিত সদ্ব্যবহার ক'রে, কারলাইল শুধু ইংরেজী নয়, জর্ম্মান্, ফরাসী, ইটালিয়ান্, স্প্যানিস্ প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িকগণের মধ্যে তাঁর তুল্য প্রগাঢ় পণ্ডিত কেহ ছিলেন ব'লে আমার জানা নেই।

একজন ইংরেজ যখন পাঠাগারে অবস্থান করে, তখন সেথায় কেউ প্রবেশ করে না। এমন কি স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বামীর ঘরে দরজায় আঘাত দিয়ে—"আমি আসতে পারি কি?" অনুমতি নিয়ে তবে ঘরে প্রবেশ করে এবং এক কি দেড় মিনিটে দরকারী কাজ শেষ করে মাপ চেয়ে পালায়। আর আমাদের অবস্থা কি? সেই ত কথায় আছে—একে—দুয়ে—তিনে হট্টগোল। পামারষ্টোন (Palmerstone) বলেন "Dirt is matter in the wrong place" বাস্তবিক সব জিনিসেরই একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান কাল আছে, যেথান থেকে ভ্রষ্ট হ'লে তার আর শোভা থাকে না। বৈঠকখানায় বসবার সময় কেউ রান্নাঘরে যায় না; সেইরূপ গল্পেরও একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে এবং থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের ছাত্রাবাসে ছাত্রেরা কি করেন?—"ওহে ভাই শুনেছ? কাউন্সিলে কে গেল? কে কত ভোট পেলে? কার কত পাওয়া উচিত ছিল?" এই সব আলোচনা ও উত্তেজনায় ব্যস্ সময় কাবার। এক খবরের কাগজেই একটা সকাল কেটে গেল। তা ছাড়া ফুটবল খেলা প্রভৃতির আলোচনা নিয়ে আরও কত সময়ের অপব্যয় হয়, কে তার হিসাব রাখে? খবরের কাগজ প'ড় না এ কথা কখনও বলি না। আমি নিজে অনেক খবরের কাগজ পড়ি—আমার মত খবরের কাগজের কীট কমই আছে। কিন্তু কাগজ নিরূপিত সময়ে অবসর-মত পাঠ করি। যখন গভীর ভাবাত্মক বিষয় অধ্যয়ন করবার সময়, তখন খবরের কাগজ স্পর্শও করি না। সব জিনিসেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, এ কথা তোমরা কখনও ভুলে যেও না।

আত্মচেষ্টায় মানুষ কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারে, তার আর একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে হেনরি টমাস কোলব্রুক। তাঁর সম্বন্ধে দু একটা কথা বলছি। কোলব্রুক হচ্ছেন "Digest of Hindu and Mahammedan Law" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" হবার ১০ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে কোম্পানীর কেরাণী হ'য়ে তিনি এদেশে আসেন। সে সময়ে বিলাতী সমাজের অবস্থা ও নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত দুষ্ট ছিল। মদ, জুয়া ও অন্যপ্রকার দুর্নীতির প্রভাব কোলব্রুক সম্ভবত এড়াতে পারেন নি। তথাপি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করে তিনি অশেষ শাস্ত্রবিৎ হ'য়েছিলেন—বিশেষত সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। ম্যাক্সমুলর বলেছেন, তিনি যে কেবল ক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন তা নয়, তিনি সুদক্ষ ব্যবহারাজীব এবং সুপটু অর্থসচিবও ছিলেন। যুরোপখণ্ডে সংস্কৃত ভাষানুশীলনের তিনিই প্রবর্ত্তক। ১৮০০ সালে তিনি "Condition of Peasantry in Bengal"—বাংলাদেশে কৃষকের অবস্থা নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। বৈশেষিক দর্শন তিনিই প্রথম ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। বরাহমিহির ও আর্য্যভট্ট থেকে হিন্দু পাটীগণিত ও বীজগণিত অনুবাদ ক'রে তিনিই প্রথম যুরোপকে দেখান যে, গ্রীকদের পূর্ব্বে হিন্দুরা এ সকল বিজ্ঞানের চর্চ্চা করত—হিন্দুরাই অঙ্কশাস্ত্রে দশমিক প্রথার আবিষ্কারক। হিন্দুদের জ্ঞান প্রথম আরবেরা ও আরবদের নিকট থেকে যুরোপ শিক্ষা করেছিল। কোলব্রুক আবার জ্যোতির্বিদ্যারও অনুশীলন করেছিলেন। অবসর নিয়ে যুরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করে তিনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি

প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং নিজে উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রবন্ধাদি প্রেরণ ক'রে তাকে পুষ্ট করেছিলেন। কণাদের পরমাণুবাদ (শঙ্করের অনুবর্ত্তী মায়াবাদীরা আবার ঠাট্টা ক'রে বলেন কণাদ বা কণভুক—জড়ের অস্তিত্বই নেই, তার আবার পরমাণু!) তিনিই অনুবাদ ক'রে য়ুরোপে প্রচার করেন। সেই অনুবাদের প্রথম অধ্যায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার "History of Hindu Chemistry" নামক পুস্তকে অবিকল উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছি। জীবনের সব কয়টি দিনের সদ্ব্যবহার না করলে কোলব্রুক একাধারে এত গুণের গুণী হ'তে পারতেন না। Elphinstone, James Princep, Horace Hayman Wilson প্রভৃতি বড় শাসনকর্ত্তা বা এক এক ডিপার্টমেন্টের কর্ত্তা ছিলেন—পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এঁদেরও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকালকার সিভিলিয়ানরা এঁদের "ডেস্ক ওয়ার্কের" থোড়-বড়িখাড়া, আর খাড়াবড়ি-থোড় করতেই কর্ম্মশেষ। পঞ্চায়েৎ থেকে চৌকিদার, ততঃ দারোগা, তারপর ডেপুটি, তদূর্দ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট, এই চক্রের মধ্যেই এঁরা পাক খাচ্ছেন। কাজেই কোন অনুসন্ধানের ফলও তদনুরূপ হচ্ছে। যেমন খুলনা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দিলেন—গাছে ফল প্রচুর, দুধ চাইলেই মেলে, আর মাছ ধরে খেলেই হ'ল। লোকে তোফা সুখে আছে—দুর্ভিক্ষ কোথায়? এঁরা হচ্ছেন লেফাফা-দুরস্ত, অন্য কিছুরই ধার ধারেন না। Elphinstone সাহেবের নাম আপনারা শুনেছেন। তিনি বোম্বাইপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; এদিকে ঐতিহাসিক গবেষণাও যথেষ্ট ক'রেছেন। তাঁর প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও এম্-এ পরীক্ষায় পাঠ্য পুস্তক। Malcolm সাহেব পারস্যদেশে ইংরেজের রাজদূত ছিলেন। সেই সুযোগে পারস্যদেশ সম্বন্ধে নানা তথ্য অনুসন্ধান ক'রে তিনি সেই দেশের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করলেন যা ঐ দেশ সম্বন্ধে আজও নির্ভরযোগ্য আদর্শ মৌলিক পুস্তক। এঁদের জীবনের কৃতিত্ব ও সফলতার পশ্চাতে রয়েছে সময়ের মূল্যজ্ঞান ও সদ্ব্যবহার. এ কথা কেহ ভুলে যেন না যাই।

এখন কেউ অভিযোগ ক'রে বলতে পারেন—"ইংরেজ ইংরেজ; বাঙালী বাঙালী। ইংরেজ যা ক'রেছে, প্রতিকূল ঘটনাচক্রের মধ্যে বাঙালীর দ্বারা তা কি ক'রে সম্ভব হবে?" আচ্ছা বেশ কথা। আমাদের দেশের লোকেরই দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। রাজা রামমোহন রায় ১৮ বৎসর বয়সে বাঁকীপুরে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ক'রে যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তা পার্শী ভাষায় লিখিত এবং তার মুখবন্ধের ভাষা আরবী। যখন তিনি অসীম সাহসে ভর ক'রে প্রচলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর পিতা তাঁকে আপন ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কিম্বদন্তী এই যে রামমোহন তার পর হিমালয় পার হ'য়ে তিব্বত দেশে উপস্থিত হ'য়ে লামাদের নিকট পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জ্ঞান কত গভীর ছিল, তা এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, তিনিই নব্য ভারতে প্রথম বেদান্তের বাণী প্রচার করেন। নবদ্বীপ ভাটপাড়ায় তখন স্মৃতি শাস্ত্রেরই সম্মান ছিল, বেদ উপনিষদের সেরূপ চর্চ্চা ছিল না। ঈশ, কেন, কঠ, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদ তিনি প্রথমে এদেশে বাঙলা ভাষায় এবং পরে বিলাতে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। মাঝ বয়সে রংপুরে ডিগবী সাহেবের সেরেস্তাদার হ'য়ে তাঁরই কাছে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন। ইংরেজী ভাষায় তিনি যেরূপ পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন, সেরূপ পাণ্ডিত্য এখনকার ভারতবাসীর মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। লর্ড আমহার্ষ্টের সংস্কৃত কলেজ স্থাপন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের প্রতিবাদ ক'রে তিনি তাঁকে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। তিনি বলেন দেশে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে; আমরা এখন চাই রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা প্রভৃতি। প্রতিবাদপত্র তিনি বিশপ বিভারের হাতে দেন। বিভার বলেছেন—"এমন ইংরেজী কোন এশিয়াবাসীর নিকট পাই নি।" সুতরাং ইংরেজ পারে, আর দেশের লোকে পারে না এ কথাই নয়। আসল কথা সর্ব্বপ্রকার সফলতার মূলেই অক্লান্ত চেষ্টা।

বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রেরই যুগ ছিল। বঙ্কিম যে কি অপরিশোধ্য ঋণে দেশকে আবদ্ধ ক'রে গেছেন তা বলাই বাহুল্য। তিনি ডেপুটী ছিলেন; কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে আপন কর্ত্তব্যে কখনও অবহেলা করেছেন, এ অভিযোগ কেহ কখনও করে নি। অবসর নিয়ে শেষজীবনে সীতারাম, আনন্দমঠ প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছিলেন বটে, কিন্তু কর্ম্মজীবনে তাঁর একদিকে ছিল শ্রমসাধ্য রাজকার্য্য, অন্যদিকে ততোধিক শ্রমসাধ্য সাহিত্যসৃষ্টি। এই দুইএর কোনটির প্রতিই কোন দিন তিনি আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নি। আপত্তি

উঠ্‌তে পারে—বঙ্কিমের ছিল ঈশ্বরদত্ত শক্তি, যেন ধ্যানে বসে লিখতেন। সুতরাং তিনি যা ক'রেছেন সাধারণে তা কি ক'রে করবে? বেশ কথা। আমি তাঁর অনন্যসাধারণ ও অনবদ্য সাহিত্য-সৃষ্টির কথা বলছি না; সাধারণের যা অনুকরণীয় তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ শ্রমশীলতা। বই লেখা ছাড়া তাঁকে বঙ্গদর্শন সম্পাদন করতে হ'ত। এই সম্পাদন কার্য্যের জন্য তাঁকে সাহিত্যচর্চ্চা ও রাজকার্য্যের পরেও সময় করতে হ'ত। কি বিপুল সে চেষ্টা! বঙ্গদর্শন বাঙলা দেশে এক নবযুগ আনয়ন করেছিল। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, সমালোচনা, ঐতিহাসিক গবেষণা, সামাজিক সমস্যার বিচার, বিজ্ঞানরহস্যের পরিচয় প্রভৃতি নানা রসসম্ভারে পুষ্ট হ'য়ে বঙ্গদর্শনের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হ'য়েছিল। বাস্তবিক বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে বাঙালীর চিত্ত নিত্য নূতন দিকে সাড়া দিয়েছিল। এই পত্রিকা সম্পাদনের জন্য নানা প্রবন্ধপাঠ ও নির্ব্বাচন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং করতেন। এর জন্য কত দায়িত্ব ছিল এবং কত সময়ই যে তাঁকে ব্যয় করতে হ'ত, তা একবার ভেবে দেখা উচিত। আমাদের তখন ১০।১২ বৎসর বয়স। সাহিত্য-রসবোধ তখনও জন্মায় নি। তবু উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকতাম—বঙ্গদর্শন আবার কখন বাহির হবে। বিষবৃক্ষের দোবে, চোবে, তেওয়ারী, তাদের বংশদণ্ড, সেই লালচাঁদ সিং নাচে তিড়িং মিড়িং, ডালরুটির যম কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম, এই সব তখন বেশ লাগতো। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলই বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ পুস্তক; তাদের স্থান সর্ব্বোচ্চে। তখন থেকেই বঙ্কিম-প্রতিভার পূর্ণ উন্মেষ হইয়াছিল। যাঁরা অসংখ্য কাজের মধ্যে গুরু পরিশ্রম ক'রে জাতি-গঠনের মালমশলা যুগিয়ে গেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত দেখেও কি আমরা আমাদের শ্রমবিমুখতার কৈফিয়ৎস্বরূপ বলতে থাকব—"আ মশায় পারিনে, অফিসের কাজ, কখন সময় পাই?"

আচ্ছা, রমেশ দত্ত মহাশয়ের কথা ধরা যাক্। তিনি সুরেন বাবু ও বিহারী গুপ্তের সঙ্গে সিভিলিয়ান হ'য়ে বিলাত থেকে দেশে ফিরলেন। তারপর বঙ্কিমের পরামর্শে তাঁরই পদানুসরণে কত বাঙ্গালা উপন্যাস লিখলেন। বঙ্কিম ও রমেশ, রবিবাবু বা শরৎবাবু ঔপন্যাসিক হিসাবে কে বড় আমি তার হিসাব করব না, সে সাধ্য আমার নেই। আমার কথা এই—তখন বঙ্কিমের পরই রমেশ! রমেশচন্দ্র সাহিত্যসেবী; কিন্তু শাসনকর্ত্তা হিসাবে তাঁর প্রতিভা কা'রও চেয়ে কোনদিকে কম ছিল না। কিন্তু তিনি কমিশনর হ'য়েই খতম্ হ'লেন। রাজকার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন, বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা-মূলক সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন, নানা গবেষণা করে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে বেদের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, রামায়ণ, মহাভারতের ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। আশ্চর্য্য শ্রমশীলতা! ফার্লো নিয়ে বিলাত গিয়ে ১৮১৩ খৃঃ হ'তে ১৮৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের সনদ (charter) সম্বন্ধীয় সাক্ষ্যের খাতাপত্র পার্লিমেণ্টের দপ্তর থেকে অনুসন্ধান করে, পাঠ করে, আলোচনা করে তিনি Economic History of India এবং India under Victorian age নামক অপূর্ব্ব ও অমূল্য গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন ক'রেছিলেন। বৈদেশিক রাজশক্তি ও বণিকের চক্রান্তে ভারতের শিল্পবাণিজ্য কি প্রকারে ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে ভারতবাসী দারিদ্র্যের নিম্নতম স্তরে নেমে যায়, অধঃপতনের সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাস রমেশচন্দ্রের এই সকল পুস্তক পাঠ করলে জানতে পারা যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পরে কমিশনরের কার্য্য ক'রেও তিনি কত সাহিত্য, কত ইতিহাস রচনা করে গেছেন, তা ভাবলেও আশ্চর্য্য হ'তে হয়। এঁদের দৃষ্টান্ত শ্রমবিমুখকে প্রতিনিয়ত লজ্জা দিক!

অতএব দেখা গেল আমাদের দেশের লোক পারে না, এ কথা একবারেই খাটে না। মহামূল্য সময় একবার গেলে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। এই যে হাজার হাজার B. A. ও M. A. বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বাহির হচ্ছেন, এতে আমরা বাস্তবিকই কি উন্নতির পথে বেশী অগ্রসর হচ্ছি? তা যদি হয় তবে ডিগ্রীধারীদের বুদ্ধির বন্ধ্যাদশা ঘুচে যাচ্ছে না কেন? আমি ত আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দকাল দেশের ছেলেদের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে আছি। শ্রীমানেরা আমার ত নাতি, আর মালক্ষ্মীরা সব দিদিমণি। বল ত সব বুকে হাত দিয়ে, কি ক'রে সময় কাটে? কলেজ ক্লাসে ত ছুটির অন্ত নেই; M. A., M. Sc. ক্লাস বৎসরে ৫ মাস হয় বাকী ৭ মাস ছুটি। এই যে মহামূল্য সময়,—এর যথার্থ সদ্ব্যবহার করলে দেশের ছাত্রেরা আজ জীবনের নানাক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে পারতো। ভবানীপুরে একজন সম্ভ্রান্ত নামজাদা ভদ্রলোক বড় দুঃখেই বলেছিলেন, ফুটবল দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ১৯০৪ সালে

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে যখন দ্বিতীয়বার বিলাত যাই, তখন পোর্টসৈদে একজন সঙ্গী জুটে। লোকটী বেশ আমুদে ও রসিক। তিনি বলেছিলেন "আচ্ছা, বল ত ফুটবল খেলার ধারে লোক জমায়েৎ হয় ত বিশ ত্রিশ হাজার, কিন্তু কসরৎ হয় কয়জনের?" ফুটবল খেলছে ত ২২ জন লোক। আর বত্রিশ হাজারে মিলে মোহন বাগান, ফাউল, গোলকিপার ইত্যাদি চীৎকারে সহর মাথায় করে মাথা খারাপ করবার দরকার কি বাপু! এ যেন পাহাড় থেকে টেলিস্কোপ নিয়ে যুদ্ধ দেখা, আর আরাম-চৌকিতে ব'সে অমুক জেনেরলের দোষে এইটি ঘটল ব'লে নিশ্চিন্ত আরামে মন্তব্য প্রকাশ করা। এত বড় মাঠ পড়ে আছে—আকাশের তলে বাতাসের মধ্যে গঙ্গাতীরে প্রকৃতির কোলে গা ঢেলে দাও; তা নয় ব্যর্থ উত্তেজনায় আপনাকে শুধু হাল্কা ক'রে ফেলচ। এত বড় খোলা মাঠ—যেন জনাকীর্ণ সহরের ফুসফুসের মত—এমন অদ্ভুত জিনিষ আর কোন সহরে নেই। তারই মাঝে আনন্দ আহরণ না করলে চলবে কেন? আমি ত গত ১৮ বৎসর নিয়মিতরূপে বেড়াই—কত আনন্দ! তোমরা স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের এ অমূল্য সময় নষ্ট কর কেন?

সকলেই তোমরা কারলাইল, কোলব্রুক অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র হ'বে এ কথা বলি না। তবু কাজ ত সবারই আছে। সংসারে আপন আপন ক্ষেত্রে সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কাজের কোথাও অন্ত নেই। আমি অনেক জায়গায় ভ্রমণ করি। অনেক স্থানে লোকে অনুগ্রহ ক'রে আমার গলায় বুনোফুলের মালা পরিয়ে দেয়। তার গন্ধে গা বমি করে। লক্ষ টাকার মালিকেরও এমন একটু বাগান নেই যেখানে দুটো গোলাপ, চামেলি ফুল ফুটতে পায়। অথচ আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে ত জমির অভাবই নেই। বিলাতে এককাঠা জমিতে গাছপালা তৈরী ক'রে মানুষ ফুটন্ত ফুলের মধ্যে প্রকৃতির হাসি ফুটিয়ে রাখে। আমি দেখেছি ৫০।৬০ বৎসর আগেও আমাদের দেশের লোকের এই সকল বিষয়ে সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল। এখন যেন সব সঙ্কুচিত হ'য়ে যাচ্ছে। এখনও যে কোন যুবক ইচ্ছা করলে নিজ হাতে কোদাল পেড়ে বাগান ক'রে তার মধ্যে দুটো গোলাপ, যুঁই, চামেলি ফুটিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু সময় কোথায়? শ্রীমানেরা রাত্রে ৮।১০ ঘণ্টা ঘুম দিয়ে সকাল বেলা উঠে এপাড়া ওপাড়ায় সমবয়সীদের সঙ্গে পরনিন্দা পরচর্চ্চার পালা গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে আসেন বেলা ১২টায়। আয়িমা দিদিমা রান্নাঘরে গোপালদের জন্যে ব'সে থাকেন—ভাত কড়-কড়; জ্ঞান নেই মেয়েগুলো ম'রে যায়। তার পর আহারাদি করে ঘুম একবারে ৩টা ৪টা পর্য্যন্ত। আর এবেলা ওবেলা কচেবার, কিস্তিমাৎ ত আছেই; গাছতলায় বসে তাস পিটে পিটে তেলা হ'য়ে যায়। ছিঃ! ছিঃ! নিশ্চেষ্টতার মধ্যে সফলতা কোথায়?

আত্মচেষ্টা ও সময়ের সদ্ব্যবহারের দ্বারা কি অসাধ্য সাধন করা যায়, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এডিনবরায় অবস্থান-কালে আমি ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী পাঠ করি। কি অদম্য পুরুষকার! দরিদ্রের সন্তান ফ্রাঙ্কলিন কম্পোজিটারের কাজ করতেন। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হ'য়ে শিক্ষা অর্জ্জন করবার উপায় ছিল না, কারণ অর্থাভাব। কিন্তু লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগ্রত হ'য়েছিল। তাই কেতাবওয়ালার সঙ্গে ভাব করে, ময়লা করব না, পাতা কাটব না, সকাল বেলা ফিরিয়ে দেব ইত্যাদি প্রকার প্রতিজ্ঞা করে তিনি পুস্তক ধার নিতেন। সকাল বেলা বই ফিরিয়ে দেবার জন্য সময়ে সময়ে সারা রাত্রি অধ্যয়ন করে পুস্তক শেষ করতেন। সঙ্গীরা সকলে মদ খেত; তিনি খেতেন না; রুটি ও জল ছিল তাঁর আহার; তাই ঠাট্টা করে সকলে তাঁকে জলচর জীব ব'লত। ইংরেজী সাহিত্য অধিগত করবার জন্যে তাঁর অজস্র চেষ্টা ছিল। Addison's Essays পাঠ ক'রে তিনি নিজ ভাষায় তার ভাবার্থ লিখতেন, তার পর মূল প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আপন ভ্রম সংশোধন করতেন। সেই ১৭৫০ সালের কথা, ফ্রাঙ্কলিনের বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রতি তীব্র অনুরাগ ছিল। তখন আজকালকার মত কথায় কথায় লেবরেটরীর সুবিধা ত ছিলই না, কোন নূতন তথ্য জানবার আবশ্যক হ'লে ইংলণ্ড থেকে পুস্তক আনিয়ে পাঠ করতে হ'ত। তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভা ঘুড়ি উড়াবার কালে ভিজা সূতার সহযোগে বিদ্যুতের স্পর্শ পেয়ে বিদ্যুৎ পরিচালক-দণ্ড (Lightning Conductor) আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়। এই দণ্ড এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। ফ্রাঙ্কলিনের সময়েই ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বিবাদ বাধে এবং আমেরিকার স্বাধীনতামূলক No taxation without representation আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে

আমেরিকার পক্ষে একদিকে প্রাতঃস্মরণীয় জর্জ্জ ওয়াশিংটন সেনাদলের অধিনায়ক, অন্য দিকে শক্তিমান্ ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ডে আমেরিকার রাজদূত ছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ডের বার্ক, চেদাম প্রভৃতি বড় বড় রাজনীতিবিদগণের সঙ্গে দেখা শোনা ক'রে একটা আপোষ মিটমাট করবার অনেক চেষ্টা ক'রেছিলেন। এদিকে আবার খুব বড় বৈজ্ঞানিক ব'লে চতুর্দ্দিকে খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তিনি বিজ্ঞান-সমিতি Royal Society প্রভৃতি হ'তে সম্মান ও অভিনন্দন লাভ ক'রেছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল বড় বড় পুস্তকে ফ্রাঙ্কলিনের কৃতিত্বের কথা নেই তা অসম্পূর্ণ। আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাসে ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই অসাধারণ কৃতী পুরুষের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল সময়ের সদ্ব্যবহার। প্রতিদিনের কার্য্য সম্পাদনের জন্য ফ্রাঙ্কলিন যেরূপ সময়ের বিভাগ (Routine) ক'রেছিলেন, তার অনুসরণ করলে সকলেই উপকৃত হ'তে পারে। রুটিনের মধ্যে সকল জিনিষই ছিল—প্রাতরুত্থান, আত্মচিন্তা, আত্ম-জিজ্ঞাসা, সৎপ্রতিজ্ঞা, অধ্যয়ন, কার্য্যের হিসাব, ব্যায়াম, ক্রীড়া, সঙ্গীত, কথাবার্ত্তা, শৃঙ্খলা প্রভৃতি। অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত এই আত্মশাসন-পদ্ধতি পালন ক'রে ফ্রাঙ্কলিন এত বড় হ'তে পেরেছিলেন।

বাস্তবিক সময় ঠিক ক'রে অগ্রসর হ'তে পারলে এমন কিছুই নেই যা মানুষ পারে না। আমাদের দেশের বড়লোকেরা সাধারণত এমন পাত্রমিত্র-কোটাল-পরিবৃত হ'য়ে থাকেন যে পাঁচ দিনেও একবার তাঁদের দেখা মেলে না। দুই বৎসর আগে লালা লজপত রায়ের সভাপতিত্বে যখন কলকাতায় হিন্দুসভার অধিবেশন স্থির হয়, তখন মাড়োয়ারী বন্ধুগণ এসে আমাকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হ'বার জন্য অনুরোধ করেন; কারণ বাঙলা দেশে অন্য প্রদেশের লোক ঐ পদ গ্রহণ করলে ভাল দেখায় না। সভার কার্য্য-ব্যপদেশে কোন জমিদার-বাটী গিয়ে শুনলাম জমিদারবাবু বেলা ১২টার সময় শয্যা ত্যাগ করেন! স্বদেশী কাজে কেউ এসে অনুরোধ করে বল্লেন অমুক জমিদার-বাটী চলুন, তাঁর সাহায্য পেলে কার্য্যোদ্ধার হবে। অমনি মোটর চড়ে তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখলুম শান্ত্রীর পাহারা। নিজের নাম ক'রে বাবুকে সেলাম দেবার কথা বলতে শান্ত্রী বলে উঠল বাবু বেলা ১।৷০ টার পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিবেন না। কি বাদসাহী আলস্য! আমি ত এই বয়সেও ভোর ৫টা বা তৎপূর্ব্বে গাত্রোত্থান করে থাকি; চিরকাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা-ত্যাগ ক'রে এসেছি; সূর্য্যোদয়ের পরও বিছানায় প'ড়ে থাকা আমার ধাতে সয় না। যাক্, আমাদের দেশের ধনীদের ত এই ব্যাপার! কিন্তু ইংরেজ লাট বা গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে চিঠি লিখে অনুরোধ করলে, তিনি যদি দেখা করা উচিত বিবেচনা করেন, তবে সময় স্থির ক'রে সংবাদ পাঠিয়ে দেন। তারপর ৫।৭।১০।২০ জন সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হ'লেও নির্দ্দিষ্ট সময় অনুযায়ী পর পর সকলের সঙ্গেই দেখা করেন। তাঁদের সব কাজের সময় বাঁধা। এ বিষয়ে তাঁরা আর আমরা,—তুলনা কর। কোন কাজের জন্য ইংরেজের কাছে যাও; সে ৫।৭ মিনিট চিন্তা ক'রে হাঁ বা না একটা জবাব দেবে। কিন্তু দেশের লোকের নিকট যাও; প্রথমতঃ ৫।৭ বারের চেষ্টায় দেখা মিলবে। তারপর তোমার প্রস্তাবে মনে মনে অসম্মত হ'লেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে মুখের উপর 'না' বলতে পারবে না। তারপর হয়ত আশা দিয়ে একমাস হাঁটিয়ে ঘুরিয়ে তোমায় হায়রাণ ক'রে—হার মানিয়ে ছেড়ে দেবে।

আমরা ত সময়ের মূল্য বুঝি না। তাই ওরা আমরা এত তফাৎ। ওরা দিনের বেলায় ভূতের মতো খাটে। কিন্তু অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টায় ওদের ব্যবসায়, অফিস সব বন্ধ। তখন কেউ মোটর চ'ড়ে হাওয়া খায়, কেউ বা ক্রিকেট টেনিস খেলে। কিন্তু আমাদের বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা—যত জায়গায় যত দোকান আছে সব রাত্রি ৯৷৷০।১০টা পর্য্যন্ত খোলা। এক একখানি ছোট ছোট ঘরে দোকান, ৫ মিনিট তার মধ্যে থাকলে বদ্ধ হাওয়ায় মাথা ধরে ওঠে। আমরা সকলে একমত হ'য়ে দোকান বন্ধের একটা সময় ঠিক ক'রে নিতে পারি না—সকলেরই ভয় পাছে খদ্দের ভাগে। এমনি ক'রেই আমরা শরীর মাটী করি। ইংরাজ কিন্তু ব্যবসাও জানে, স্বাস্থ্যও বুঝে। কিন্তু আমাদের এ কি সর্ব্বনাশ! আমরা সর্ব্বদা ব্যস্ত, আবার সর্ব্বদা অলস। কলকাতায় ইংরেজের ৩টা ঔষধের দোকান আছে। রোগীর সকল সময়েই ঔষধের দরকার হ'তে পারে। তাই ছুটি নিতে হ'লে, অমুক রবিবার অমুকের দোকান খোলা, এইভাবে পালা ক'রে ওরা কাজের ব্যবস্থা ক'রে নেয়। আমাদের পাশে পাশে সারি সারি দোকান। কিন্তু আমরা সকলে একমত হ'য়ে

সকলের পক্ষে সুবিধাকর এমন কোন বন্দোবস্ত করতে পারি না। সময় স্বাস্থ্য দুইএরই অপচয় ঘটে; তবু আমরা একটা আইন-কানুনের মধ্যে আসতে পারি না।

এইবার নিজ সম্বন্ধে ২।১ কথা বলি। বয়স ত প্রায় তিন কুড়ি দশ হ'ল; সময় এগিয়ে আসছে। আমি চিররুগ্ন। আলবার্ট স্কুলে তখন কেশবসেনের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনতাম। কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন স্কুলের কর্ত্তা। তিনি ইংরেজী পড়াতেন; তাঁর মত ইংরেজী ভাষার শিক্ষক আজও দুর্ল্লভ। আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম। হকারের দোকান থেকে লাটিন ও ফ্রেঞ্চ ভাষার বই কিনে পড়তাম। বঙ্গদর্শন আগাগোড়া পড়া যেত। সম্প্রতি গত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে আমি নানা কার্য্যোপলক্ষে প্রায় ৯০,০০০ মাইল ভ্রমণ ক'রেছি। ছাত্র-জীবনেই ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। রাসায়নিক হ'লেও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস চর্চ্চা করবার সময় আমি পাই। মহীশূরের দেওয়ান সেদিন অভিযোগ ক'রে বলছিলেন আমি নাকি বিজ্ঞান ত্যাগ ক'রে খদ্দর ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ—প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেছি। বিজ্ঞান ত্যাগ করব কেন? বারমাসে বৎসর। প্রতিমাসে ২।৪ দিন খদ্দর প্রচার করলেই সব ত্যাগ হ'য়ে গেল? সায়ান্স কলেজে স্যর রাসবিহারী ২১ লক্ষ এবং স্যর তারকনাথ ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে আমাদের হাতে কলেজ সঁপে দিয়ে গেছেন। আমরা হচ্ছি কলেজের ট্রাষ্টি। আমি কি দেশদ্রোহী যে, তাঁদের গচ্ছিত ধনের অবহেলায় অপব্যবহার করব? গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি দার্জ্জিলিঙ্ যাই না,—পূজাবকাশে কোথাও নড়ি না। এখন রেল-ওয়ের যুগ। দেশের দূরপ্রান্তেও ২।৩ দিন অবস্থান ক'রে সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসা যায়। সাধারণে বলেন, একে রুগ্ন শরীর, তার উপর এত পরিশ্রম কি ক'রে করি! প্রকৃত কথা এই যে সময় বেঁধে কাজ করলে অনেকেই অনেক কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে।

"চা-পান না বিষপান?"—বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে আমি ৪৫ বৎসরের চা-পান অভ্যাস একদিনে ছেড়েছি। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে কোন বিষয়ে অভিনিবেশ-শক্তি সওয়া ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার অধিক কেন্দ্রীভূত রাখা যায় না। উদরপূর্ত্তি ব্যাপারে যেমন চাট্‌নী অনেক সাহায্যকর, আত্মোন্নতিব্যাপারে সেইরূপ ছোটখাট নানা কাজের চাট্‌নী অনেক সাহায্য করে। তফাৎ এই—উদরপূর্ত্তিতে চাট্‌নীর সাহায্যে কতকগুলা অতিভোজন করা অনুচিত—আত্মোন্নতি সাধনে চাট্‌নী খুবই দরকার। কোন গভীর ভাবাত্মক বিষয় অধ্যয়ন করতে করতে ক্লান্তিবোধ হচ্ছে? আর ভাল লাগছে না? আচ্ছা, চাট্‌নী চালাও,—অর্থাৎ রুচিমত জমি কোপাও, বাগান কর, কিম্বা গান গাও, খবরের কাগজ পড়, চরকায় সুতা কাট।—এইরূপে বৈচিত্র্যের মধ্যে ক্লান্তি অপনোদন করে, তারপর আবার সেই গভীর বিষয়ের চর্চ্চা আরম্ভ কর। তা নয়, সমস্ত দিন তাস পাশা আড্ডায় কাটিয়ে মেস-ঘরে রাত্রি জেগে বই প'ড়ে নিজের তথা ঘরের আর ৩।৪ জনের ক্ষতি করা! কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের কথা! ছাত্রদের সম্বন্ধে আমাকে ঠকান যায় না। আমি ছাত্রদের জহুরী বা কামার, যাই বল। আমার কাছে ফাঁকি দেওয়া চলে না। শ্রীমানদের দৌড় আমি সবই জানি। জাপানের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়েছে ১৮৭০ খৃঃ হ'তে। আমাদের দেশে নবযুগের সূত্রপাত আর এক শতাব্দী পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের সময়ে। আজ জাপন উন্নতির উচ্চশিখায়,—আর আমরা কোথায়? চীনদেশে ৪৫ কোটি লোক, আমরা ৩২ কোটি। চীনারা গরীব, অন্তর্বিপ্লবে অবসন্ন। ধন্য, স্যন্ ইয়াট সেন! যাঁর একনিষ্ঠ সাধনার বলে চীনে রিপ্যবলিক প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। চীনাদের সুবিধা এই যে তাদের এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম্ম। আমাদের দেশে কিন্তু ভেদের অন্ত নেই;—হিন্দু মুসলমান, রাঢ়ী বরেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ,—শাখা প্রশাখা উপশাখা। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান এত কম যে এরূপ বিবাহ সংঘটিত হ'লে তা খবরের কাগজে ওঠে। আমাদের ছাত্রেরা ত এম্-এ, এম্-এসসি, বি-এ, বি-এসসি পাশ ক'রে শুধু চাকরীর উমেদারী ক'রে। চীনদেশে চীনা ছাত্রেরা দেশের জন্য কি ক'রেছে সে সংবাদ কে রাখে? মনস্বী Bertrand Russelএর নাম বোধ হয় সকলেই শুনেছ। গত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি সন্ধির দিকে ছিলেন ব'লে যুদ্ধকালে তাঁকে জেলের মধ্যে আটক রাখে। তাঁর Chinese Problem নামক পুস্তকে চীনের অভ্যুত্থানে চীনাছাত্রগণের কর্ম্মচেষ্টা বিবৃত হ'য়েছে। ভার্সেলের সন্ধিতে জাপান টোগোর প্রভাবে, কামানের সাহায্যে মান সম্ভ্রম বজায় রেখে সাণ্টুং লাভ করলে। কিন্তু সন্ধিতে চীনের স্থান হ'ল না; দুর্ব্বল চীনকে গ্রাহ্য ক'রে কে? এই অপ-

মাঝে এই বিমুগ্ধ সৌন্দর্য্যলীন মনোভাব সব চেয়ে বেশি করে ফুটে উঠেচে। তুমি যদি বিধিমত প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা বোঝাতে বল, সে আমি পারি নে। কোন সৌন্দর্য্যানুরাগ কোন দিন প্রমাণের বস্তু হতে পারে না। কোন্ লাইনের কোন্ বিশেষ কথাটির দ্বারা সে আপনাকে ব্যক্ত করেচে, বলা কঠিন। তত্রাচ এইটুকু অসংশয়ে বলতে পারি—লেখার অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত অপরিদৃশ্যভাবে এই সুরই জড়িত হয়ে রয়েচে এবং কেবল সেইটুকুই সমস্ত আলাপে, আলোচনায়, রহস্যালাপে কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিক উদ্‌ঘাটন করে দেখাবার প্রয়াসের মাঝে জড়িত হয়ে মাধুর্য্য বিকীর্ণ করেচে। মানুষ তার জীবনের গভীর অনুভূতি দিয়ে, তার নিবিড় প্রীতি দিয়ে অন্য হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে—আর কিছু দিয়েই নয়। তাঁর লেখার মাঝে এই অনুরাগসিক্ত শ্রদ্ধার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে।

তোমার বন্ধু যদি কেবলই সদুদ্দেশ্যের অভিপ্রায়ে শুধু লোককে জানাবার জন্যই প্রতিভার এবং হৃদয়ের পরিচয় দিতে বসতেন, সেই কি আমাদের এত আকর্ষণ করত? একটি অভিভূত আত্মবিস্মৃত মনোভাবের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য্যের প্রতি নিঃশব্দে সমর্থনশীল চিত্তের মধ্যবর্ত্তিতায় সেই পরিচয় আমাদের কাছে এমনি করে প্রকাশ পেয়েচে। এই ধরণের থা সবাই যে নিরতিশয় স্পষ্ট করে বুঝতে পারে তা আমি বলিনে,—জীবনের এই সব জিনিষ বড় অস্পষ্ট। যা অনুভবের বস্তু তাকে অনুভব ছাড়া আর কিছু দিয়েই বুঝবার উপায় নেই। এমন কি তুমি যদি বলে ওঠ—'এ আমি বুঝলুম না', তবু নীরব হয়েই আমাকে থাকতে হবে।* জীবন-প্রান্তে সৌন্দর্য্যের কাছে একান্ত সমর্পণের আনন্দ যাদের কম্পন তোলেনি, অপরের ভাষার মাঝে তার উদার ইঙ্গিত সে কেমন করে বুঝবে। তোমরা তাঁর চিন্তাশীলতা গভীর-চিত্ততা এ সমস্তরই প্রশংসা করতে পার; আমি কিন্তু তোমার বন্ধুর রচনা এবং লিখনভঙ্গীর মাঝে এই বস্তুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিই।

সমী কহিল, এ প্রসঙ্গে তার আর একটা দিককে তুমি বাদ দিতে বসেচ। বিদেশের এবং দেশের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে বসে সে শোনা কথা কিছু বলেনি, তার সহিত তাঁদের যে নিকট সান্নিধ্যের সুযোগলাভ ঘটেচে, সেই সাহচর্য্যের ইতিহাসটুকু তার চারিদিকের আবেষ্টনীর সহিত সে তুলে দিতে চেষ্টা করেচে। এবং এর মাঝে কথোপকথনেরই অংশই বেশি। তার নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁদের ব্যক্তিত্বকে সে লেশমাত্র খর্ব্ব করে নি এবং তার নিজের কথায় বলতে যেয়ে তাঁদের কথাকে এতটুকু বিকৃত করেনি। এই পরিচ্ছিন্ন শুভ্র মনের ভিতর দিয়ে সত্য পরিচয় যেমন উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েচে, এ যখনই ভাবি, তখন মনে হয়, হয় ত এই জিনিষট এমনি করে করার জন্যেও শক্তির প্রয়োজন। নিজের মতামত, নিজের চিন্তা এবং বুদ্ধি দিয়ে আসল পরিচয়কে সে বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন করেনি। মনে হয়, যেন দূর থেকে সে দেখাবার চেষ্টা করেচে—বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত সর্ব্বপ্রকার আবিলতার আবরণ থেকে বিমুক্ত করে কেবল পরিশুদ্ধ সত্য পরিচয় প্রকাশ করা কঠিন। আমার বিভেদ, আমার সিদ্ধান্ত, আমার আকর্ষণ, এ সমস্তকে অতিক্রান্ত করে সত্যের স্থান তুমি যা—আমার একান্ত সাধনার মধ্য দিয়ে সেইটুকুর মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করে দেখাতে পারি, আমাকে দিয়ে এবং আমার ভালোমন্দ বিচার দিয়ে তাকে ক্ষুণ্ণ করবার আকাঙ্ক্ষা নাই, এই সুদূর নির্লিপ্ততা এবং পরিবিচ্ছিন্নতার মূল্য কোন কারণেই যেন ভুলে না যাই।

দীপ্তি কহিল, তোমার বন্ধু যাঁদের পরিচয় দিতে বসেচেন, তাঁদের সবারি একটা বৃহৎ ব্যক্তিত্ব রয়েচে। সে ব্যক্তিত্বের আভাস পৃথিবী বিচিত্র আকারে বহুধা প্রতিভায় খণ্ডিত হয়ে পেয়েছে, তাই যদি বা তিনি সে ভার নিয়ে কোনখানে নিজের কথার মধ্য দিয়ে তাকে দুর্ব্বোধ্য করে থাকেন, তার দ্বারা তাঁদের ভুল বুঝবার আশঙ্কা নেই। কারণ একমাত্র তোমার বন্ধুর প্রকাশের ভিতর দিয়ে তাঁদের আভাস পাইনে, এ ছাড়াও আরও বিস্তৃত করে জগতে সে পরিচয় পেয়েচে।

সমী কহিল, কিন্তু বিপুল ব্যক্তিত্ব ব্যতীত, সাধারণ লোকের পরিচয় দিতে বসেও মধ্যবর্ত্তীর কাজ সে সর্ব্বত্র এমনি সুমধুর ভাবেই করেচে। সেদিন তার লেখা একটা উপন্যাস পড়েছিলুম,—শেষের দিকে তার একটি মুসলমান বন্ধুর কথা আছে। এ ঠিক চরিত্র-সৃষ্টি নয়, তার জের অন্য জিনিষ। একজনের ব্যক্তিত্বের যে প্রতিবিম্ব পড়েচে তাকে যথাসম্ভব স্পর্শলেশহীন করে প্রকাশ করা—মনে হয় যেন সত্যকার মানুষের সংস্পর্শে এসেচি। যে পরিচয় দিতে বসেচে এবং যার পরিচয় আমরা পাচ্চি, তার মধ্যবর্ত্তী বায়ুস্তর

স্বচ্ছ, নির্ম্মুক্ত। তাই সত্যকার স্বরূপটি প্রকাশ পেয়েচে, কোন কারণেই কৃত্রিম এবং বিকৃত হয়ে ওঠেনি। সেই উপন্যাসের শেষের দিকটি আমার ভাল লেগেচে। আরও একটি রুশ বন্ধুর কথা আছে। এই জিনিষের মাধুর্য্যই আমাকে সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করেচে। সমস্ত বিভিন্নতা, বিপরীত ভাব তার মধ্যে বর্ত্তমান রয়েচে, সব চরিত্রের প্রকাশকে তার অনিবার্য্য স্বাভাবিক গতিপথ ছেড়ে দেওয়া হয়েচে, লেখকের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ ছাপ তাদের মধ্যে জড়িত হয়ে নেই। তাদের কথা, এবং তাদের বিশেষত্ব, তাদের ধরণেই সে বলতে চেয়েচে। নিজের ভিতর দিয়ে রূপান্তর করে পরিচয় সে দিতে চায় নাই।

দীপ্তি কহিল, তুমি এ বস্তুকে চরিত্রসৃষ্টি নয় তার চেয়ে অন্য জিনিষ বলছ, অথচ এ দুটোর মাঝেই মিল রয়েচে। যাঁরা চরিত্র সৃষ্টিতে অপূর্ব্ব, তাঁরা হয় ত সর্ব্বত্র বাস্তবের উপর নির্ভর করেন না, তার সহিত তাঁদের শিল্পী চিত্তের কল্পনা নিজের স্থান করে নেয়। কিন্তু বিভিন্ন চরিত্রের সহিত কি তাঁদের ব্যক্তিত্ব বিমিশ্রিত হয়ে যায়? যায় না। তাদের প্রত্যেকের রেখা সুস্পষ্ট, সুবিভক্ত; কোন ব্যক্তিত্ব মাঝখান থেকে এসে তাদের সমাচ্ছন্ন এবং একাকার করে তোলেনি। বস্তুতঃ শিল্পীর সব চেয়ে শক্তি এইখানে; তিনি নিরবচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর সৃষ্টি করছেন; তথাপি তারই সহিত একান্তভাবে আবেষ্টিত হয়ে নেই। নিজের সুবিপুল ব্যক্তিত্ব তাঁরই রচিত সৃষ্টির উপর আনত হয়ে অন্ধকার করে নাই; যার যতটুকু সত্যকার ক্ষেত্র ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু আর্ট নয়, কোনখানেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। বস্তুর সহিত আমার যোগসূত্র রয়েছে, অথচ, তারই সঞ্চিত স্তূপে আবদ্ধ হয়ে নেই। সংসারের সর্ব্ব স্থান থেকে চিত্তকে প্রত্যাহার করে নিয়ে তার প্রতি নিবদ্ধ করেচি; কিন্তু তবু তার কাছ থেকে বিযুক্ত হয়ে রয়েচি। আমার আদর্শ বিচারনির্ণয়। পৃথিবীর ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, কোন কিছুর মধ্য দিয়েই তাকে বিকৃত করতে চাইনে। সে যা চিরদিন তাই, এই নিরাসক্ত নিরাবিষ্ট দৃষ্টির তলে সত্য ভাস্বর হয়ে ওঠে। এ ছাড়া তাকে পাবার উপায় নেই। তোমার বন্ধুর গভীর ব্যক্তিত্বের এবং প্রতিভার পরিচয় প্রচেষ্টায়, এই পরিবিচ্ছিন্ন ভাব, আমাকে স্পর্শ করেচে এবং তার রচনার মাঝে একেই আমি বড় করে দেখেছি।

তুমি

শ্রীচারুবালা দত্ত গুপ্তা

তুমি শান্তি আমার তাপিত পরাণে
শয়নে স্বপন সুখ।
তুমি হৃদয়-কুসুমে স্নিগ্ধ মধুর
অমিয় সুরভিটুক॥
তুমি মলয় আমার প্রখর নিদাঘে
মধুমাসে পিকবর।
তুমি তরুণ তপন প্রভাতে আমার
সন্ধ্যায় সুধাকর॥
তুমি জ্যোছনা আমার আঁধার হৃদয়ে
অন্ধের হাতে নড়ি।
তুমি নিরাশ জীবনে আশাটি আমার
অকূল পাথারে তরী॥
তুমি হৃদয়-সাগরে লহরী আমার
বিষাদের মাঝে হাসি।
তুমি সুপ্ত জীবনে বাঁশরী আমার।
নিয়ত জাগাও আসি'॥
তুমি ক্লান্ত হৃদয়ে আরাম আমার
প্রেমের মধুর স্মৃতি।
তুমি উদাস জীবন-প্রান্তরে মোর
অন্তর-ভরা গীতি॥

পিনাঙ্গের "কেক্‌লক্ সি" নামক বুদ্ধ-মন্দির

সিঙ্গাপুর মালয় উপদ্বীপ হইতে সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। বহু যুগ-পূর্ব্বে ইহা মালয়ের অংশই ছিল। সিঙ্গাপুর একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। পূর্ব্বযাত্রী সকল জাহাজই এই স্থানে দিয়া যায় এবং কয়লা বোঝাই করিয়া লয়। সিঙ্গাপুর এমন একটি স্থানে অবস্থিত, যাহার জন্য সিঙ্গাপুর পূর্ব্বদেশ এবং পশ্চিম দেশসমূহের বাণিজ্যের মিলন-স্থল হইয়া আছে। চীন, জাপান ইত্যাদি দেশে য়ুরোপ, মিশর, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সকল মহাদেশ এবং দেশের যত কিছু বাণিজ্যসম্ভার রপ্তানি হয়, তাহা সিঙ্গাপুর দিয়া হয়। এই কারণে সিঙ্গাপুরকে জগতের প্রধান প্রধান বাণিজ্য-বন্দরের মধ্যে অন্যতম বলা যাইতে পারে। অনেক জাহাজ পশ্চিমদেশসমূহ হইতে বাণিজ্য দ্রব্যাদি সিঙ্গাপুরে নামাইয়া দিয়া সিঙ্গাপুর হইতে চীন জাপান ইত্যাদি সুদূর পূর্ব্বদেশসমূহের বাণিজ্য দ্রব্যাদি পশ্চিম দেশ সমূহে বহন করিয়া লইয়া যায়।
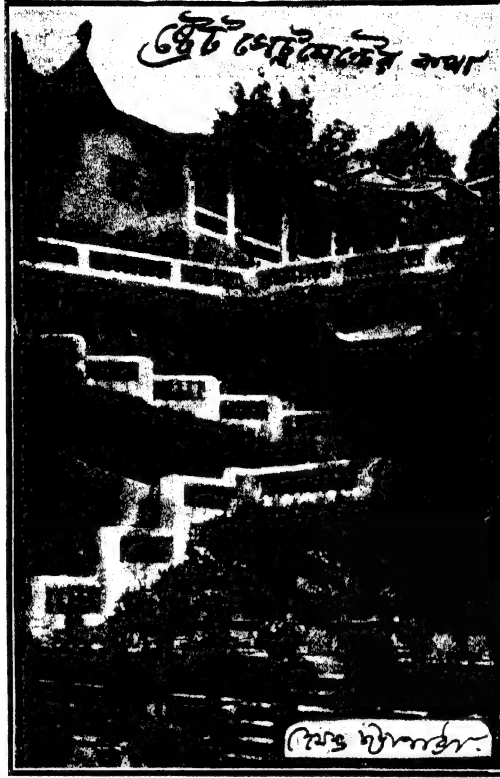
সিঙ্গাপুর হইতে ১২০ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে মালাক্কা অবস্থিত। এখান হইতে আরো ২৪০ মাইল উত্তরে পিনাঙ্গ দ্বীপ। এই দুইটি দ্বীপ এবং নিকটবর্ত্তী আরো দুই একটি উপদ্বীপ ও দ্বীপ সমষ্টি লইয়া ষ্ট্রেটস্ সেট্‌ল্‌মেণ্ট গঠিত হইয়াছে।

পিনাঙ্গ এবং সিঙ্গাপুর এই দুইটি দ্বীপ অত্যন্ত জন-বহুল। পিনাঙ্গও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। ষ্ট্রেটস্ সেট্‌ল্‌মেণ্টের মালাক্কা এবং ওয়েলেস্‌লি প্রদেশে বাণিজ্য অপেক্ষা চাষবাসই অধিকতর হইয়া থাকে। এই দুই স্থানে মালয়দের সংখ্যাই অন্যান্য জাতির অপেক্ষা বেশী।

সেট্‌ল্‌মেণ্টে প্রায় ৬৯ বিভিন্ন ভাষার চলন আছে। এই ৬৯ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন কারণে এইখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক মালয় ভাষাই ব্যবহার করে। হাজারকরা ৩৭১ জন লোক এই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। হাজার করা ২১৮ জন লোক বলে "Hok kieu" নামক চীনা চলতি ভাষা। শত-করা ২৩ জন বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে।

এই সেট্‌ল্‌মেণ্ট ইংরেজদের অধিকারে। এই উপনিবেশের অধিকাংশই চীনা। সেট্‌ল্‌মেণ্টে ইংরেজের সুশাসনে চীনারা ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে। সিঙ্গপুর ইত্যাদি স্থানের উন্নতির জন্য প্রধানতঃ চীনারাই দায়ী। এই স্থানের জলহাওয়া চীনাদের পক্ষে অনুকূল থাকায়, ইহারা এইখানে পাকাপাকি ভাবেই বসবাস করিবে বলিয়া মনে হয়।

সার্ টমাস্ ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড্ র‍্যাফ্‌লস্ (Sir Thomas Stamford Raffls) সিঙ্গাপুর সহরের পত্তন করেন। সহর এবং বন্দরে বাহিরের লোকজনের আসিয়া বসবাস করিবার পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। এই কারণে চারিপাশের দেশসমূহ হইতে—বিশেষতঃ চীন হইতে—লোকজন আসিয়া সিঙ্গাপুর, পিনাঙ্গ ইত্যাদি নানা স্থানে

বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। চীনারা সিঙ্গাপুরে বসবাস করিতে আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিল যে

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের বাণিজ্যের সঙ্গম-স্থল সিঙ্গাপুর বন্দর। যে সকল চীনা মজুর হইয়া দেশত্যাগ করিয়া এই স্থানে

সিঙ্গাপুরে মালাক্কা বেত রোদে শুকান হইতেছে। মালাক্কা বেত জগৎ বিখ্যাত

চালান হইবার পূর্ব্বে খোসা ছাড়াইয়া বেত পালিস ইত্যাদি

মালয় গানওয়ালী—ইহারা পথে পথে এবং লোকের দুয়ারে দুয়ারে একতারা বাজাইয়া গান গাহিয়া বেড়ায়

মালয় নারী এবং তাহার সন্তান

আসে—ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা তাহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই ধনী ব্যবসায়ী হইয়া পড়িল। ক্রমশ: দেশের প্রায়

সিঙ্গাপুরের মাদ্রাজী বাজনাওয়ালা এবং নর্ত্তকী

সকল বড় বড় কারবার চীনারাই একচেটিয়া করিয়া বসিল। মহাজনী কারবারও চীনাদের হাতে আসিল। সিঙ্গাপুর, মালাক্কা এবং পিনাঙ্গের দোকানদার, সরকারী আপিসের কর্ম্মচারী, কেরাণী, ব্যাঙ্কের এবং অন্যান্য বড় কারবারের কর্ম্মচারী প্রায় শতকরা ৮০ জন চীনা। চীনাদের সাধুতা, ধৈর্য্য এবং পরিশ্রম করিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা সকলের

সিঙ্গাপুরের রবার চাষের কাজে মালয় বালিকাদ্বয়

চীনা কুলী রবার গাছ হইতে রবার সংগ্রহ করিতেছে

মালয় বালিকা—ইহাদের কালো চোখ অতি সুন্দর
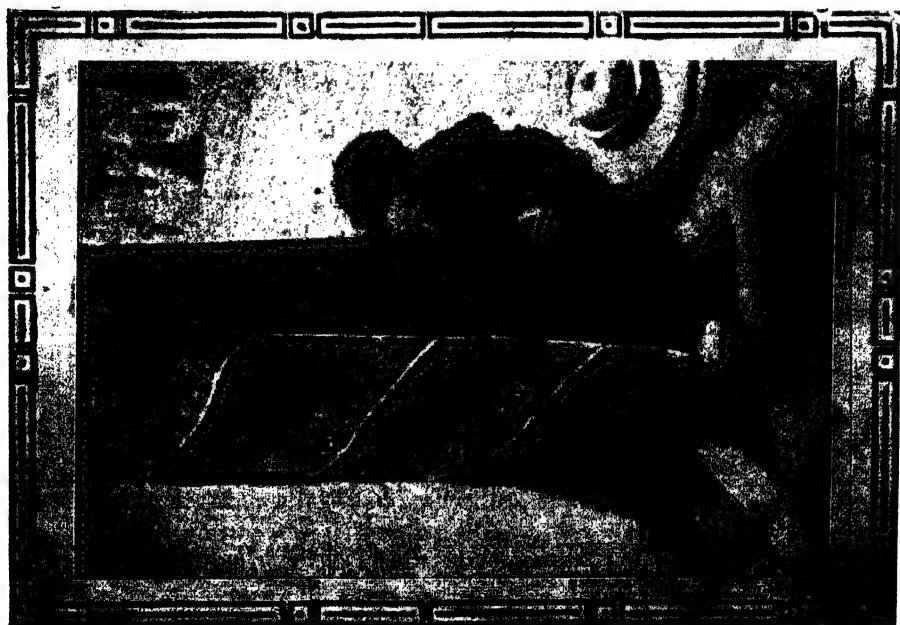
প্রশংসা পাইয়াছে। ছুতার-মিস্ত্রি এবং অন্যান্য সকল প্রকার কার্য্যই চীনারা সকল সময়ে করিতে প্রস্তুত। ইহাদের হাতে কাজ ছাড়িয়া দিয়া লোকে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। কারণ চীনারা যে কাজ হাতে লয়, সেই কাজ তাহারা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত করিয়া দিবেই। কাজ দিয়া তাহাদের পিছনে লোক লাগাইয়া তাগাদা করিতে হয় না।

মালয় নারী

ডকের কাজে সর্ব্বত্র চীনা শ্রমিকের ছড়াছড়ি। মাঝির কাজও চীনাদের প্রায় একচেটিয়া। মালির কাজ, রিক্স টানা, মাছধরা ইত্যাদি সকল কাজই চীনারা দখল করিয়া বসিয়াছে। সময় সময় মনে হয় সিঙ্গাপুর, মালাক্কা ইত্যাদি সহর এবং বন্দর বুঝি চীন দেশেরই অংশ বিশেষ।

সেট্‌লমেণ্টের বহু চীনা মাতৃভাষা ছাড়িয়া দিয়া মালয় ভাষা ব্যবহার করে। চীনাদের পরেই মালয়দের সংখ্যাধিক্য। মালয়রা চাষবাসের কাজই বেশীর ভাগ করিয়া থাকে। ইহারা মালাক্কা এবং ওয়েলেসলি প্রদেশেই বিশেষ ভাবে বাস করিয়া থাকে। মালয়রা সকল রকম চাষবাসের কাজ ছাড়া সামান্য পরিমাণে মৎস্যের ব্যবসাও করে। টাকার অভাব হইলে ইহারা ভদ্রজনোচিত অন্যান্য দু-একটি কাজও করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মালয়রা পরিশ্রম-কাতর। সামান্য আরামে জীবন ধারণ করিবার পক্ষে যতখানি পরিশ্রম করা একান্ত দরকার, তাহার বেশী পরিশ্রম ইহারা করিতে চায় না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য চীনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া মালয়রা হাসে। চীনাদের অগাধ ধন-সম্পত্তি দেখিয়াও ইহারা কোনো প্রকার হিংসা করে না। পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এত পরিশ্রমের দরকার নাই, ইহাই ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয়।

ভারতবাসীরা সংখ্যা হিসাবে মালয় দ্বীপে তৃতীয় স্থানীয়। পারসী বণিক এবং হিন্দু মহাজন সিঙ্গাপুর এবং পিনাঙ্গে খুব কম নয়—তবে চীনাদের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা বিশেষ কিছু নয়। ভারতবাসীরা বহু ভাষা বলে, বহু দেবদেবীর পূজা করে। চীনারা এই কারণে হিন্দুদের উপহাস করিয়া থাকে। ভারতবাসীরা বিশেষ ভাবে সরকারী আপিসের কাজকর্ম্ম, চাষ আবাদের মজুর, রাস্তামেরামতি কুলী, ধোপা, নাপিত ইত্যাদির কাজই করিয়া থাকে। সিঙ্গাপুর এবং পিনাঙ্গে ভারতবাসী দোকানদারও অনেক আছে। ইহাদের অবস্থাও খুব ভাল। ভারতবাসীর দোকান হইতে অন্য জাতির লোক অপেক্ষা ভারতবাসীরাই বেশী ক্রয় করিয়া থাকে।

দিনের বেলায় ভারতবাসীদের গ্রামগুলি দূর হইতে বেশ চেনা যায়। রাত্রির অন্ধকারেও ইহাদের চিনিবার বেশ সহজ উপায় আছে। বহু রাত্রি পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা ভীষণ ভাবে ঢাক এবং করতালি বাজাইয়া গান করিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। কিন্তু চীনাদের গানের আসরের কাছে ভারতবাসীদের গান-বাজনা হার মানে। চীনা যাত্রার তিন মাইলের মধ্যে কোনো অ-চীনার কাণ খুলিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব।

ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেল্‌মেণ্টে বহু রবারের আবাদ আছে। দুই

মালাকার নারিকেল বন

রবার-বৃক্ষের আবাদভূমি

একজন বাঙ্গালী রবারের চাষ করিতেছেন। রবারের চাষে ভারতবাসী শ্রমিক বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে বলিয়া প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বহু মজুর এই দেশে চালান হয়।

সেটেল্‌মেণ্টের ইউরেশিয়ানরা পর্ত্তুগীজ এবং ওলন্দাজদের বংশধর। বর্ত্তমানে ইংরেজ এবং মালয় নারীর মিলনের ফলে ইউরেশিয়ানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের দেশে ফিরিঙ্গিদের যে স্থান—সিঙ্গাপুর ইত্যাদি স্থানেও প্রায় তাই। ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্যান্য স্বাধীন কাজে তাহারা বড় একটা যায় না। সরকারী এবং মার্চ্চেণ্ট আপিসের কেরাণিগিরিই ইহাদের প্রধান বৃত্তি। সামাজিক

রবার আবাদে ভারতীয় কুলী

স্থানও ইহাদের বিশেষ ভাল নয়। ইহারা শ্বেতাঙ্গ সমাজে স্থান পায় না—দেশীয় সমাজেও তাহাই। ভারতীয় ফিরিঙ্গিদের অপেক্ষা এই স্থানের ফিরিঙ্গিরা দেখিতে সুন্দর এবং বলিষ্ঠ। চরিত্রের দিক হইতেও ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য স্থানের ফিরিঙ্গি অপেক্ষা সেটেল্‌মেণ্টের ফিরিঙ্গিরা উন্নত। ইহারা পরিশ্রমী এবং ধীর।

সেটেল্‌মেণ্টে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত কম হইলেও ইহাদের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দেশের শাসন-ব্যাপার, সামরিক বিভাগ, বড় বড় জাহাজ কোম্পানী, মিউনিসিপালিটি ইত্যাদি সকল কার্য্যই য়ুরোপীয়গণের হাতে। এই সকল কার্য্যে দেশীয় কোনো লোকের উপর কর্ত্তৃত্বভার নাই। শ্বেতাঙ্গরা এই দেশে অর্থোপার্জ্জনের জন্য আসে; কিন্তু যতদিন এখানে থাকে—কেবল অর্থোপার্জ্জনই করে না। আমোদ আহ্লাদ সময় পাইলেই করে।

সেটেল্‌মেণ্টে শ্বেতাঙ্গ রবার চাষীদের, অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং ব্যবসায়ীদের বহু ক্লাব আছে। দিনের কর্ম্ম শেষ করিয়া তাহারা নিজের নিজের ক্লাবে আসিয়া জমা হয় এবং নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়।

শ্বেতাঙ্গদের সুখ এবং সুবিধার জন্য সিঙ্গাপুর ইত্যাদি বন্দরের এবং সহরের সকল প্রকার আয়োজন অনেক সময় সরকার হইতেই করা হইয়া থাকে। কিন্তু দেশীয়দের জন্য এই সকল ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করে না। এই বিষয়ে দেশীয়দের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। রবার আবাদ-গুলিতে ভারতীয় মজুরদের অবস্থা খুব যে সুখের তাহা নয়। তবে দেশে যাহারা অনাহারে মরিত, এই সকল রবারের আবাদে তাহারা কাজ করিয়া দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় এবং অসুখ বিসুখ হইলে ডাক্তার বলিয়া একজন লোক অন্ততঃ তাহাদের দয়া করিয়া একবার দেখিয়া যাহোক কিছু একটা ঔষধ বলিয়া দেয়।

বর্ত্তমানে সিঙ্গাপুর ইংরেজদের নৌ-বহরের একটি প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে। ভারত মহাসাগরে ইংরেজের প্রাধান্য রক্ষাই ইহার উদ্দেশ্য।

খোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাণ-বাবুর মৃত্যুর বারো বৎসর পরে। রায় বাহাদুর রামযাদু নিরুপদ্রব প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে সমাজে ও আপিসে আধিপত্য কর্‌ছে। তার সংসারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘ'টেছে—তার মেয়েদের বিয়ে হয়ে তারা শ্বশুরবাড়ী চ'লে গেছে; তার ছেলে বনমালী কেবল মাত্র রামযাদুর ছেলে ব'লেই প্রত্যেক পরীক্ষায় খুব সম্মানিত উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে ক'রে এম-এ পাস করেছে, এখন সে সিংহলে মহেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছে। তার এই কর্ম্ম সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে রামযাদুরই প্রথমা পত্নীর পুত্র প্রিয়তোষ—সে ঐ মহেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ। রামযাদু শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে এবং তাদের জব্দ করবার জন্য সে পুনরায় মনমোহিনীকে বিবাহ করে। কিন্তু তারপর তার শ্বশুর বা স্ত্রী কেউ রামযাদুর কাছে অবনতি স্বীকার না করাতে রামযাদুও আর তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি; প্রিয়তোষ তার মাতামহের বাড়ীতে থেকেই মানুষ হয়েছে, কৃতবিদ্য হয়েছে, এবং রামযাদুর স্বার্থপরতার প্রভাব না পড়াতে তার চিত্ত উদার প্রশস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ হবার অবকাশ পেয়েছে। প্রিয়তোষের মাতামহের ও মাতার মৃত্যু হয়েছে; তথাপি রামযাদু তার কোনো খোঁজ খবর কখনো নেয় নি, এবং প্রিয়তোষও কেবল পিতার নাম জনশ্রুতিতে জানা ছাড়া পিতার কোনো পরিচয়ই পায় নি। রামযাদুও তার সম্বন্ধে এমন উদাসীন ছিলো যে কেউ জান্‌তোই না যে রামযাদুর অপর এক স্ত্রী ছিলো বা তার গর্ভজাত এক পুত্র কুত্রাপি বর্ত্তমান আছে। পুরা সিকি শতাব্দী পরে রামযাদুর পুত্রস্মৃতি সঞ্জীবিত ও পুত্রস্নেহ উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌লো হঠাৎ যেদিন সে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখ্‌লে সিংহলের মহেন্দ্র কলেজে ইতি-হাসের অধ্যাপক চাই এবং সেই পদপ্রার্থীদের আবেদন কর্‌তে হবে কলেজের অধ্যক্ষ প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। রামযাদু বনমালীকে ডেকে সেই বিজ্ঞাপনটি দেখিয়ে বল্‌লে—"বুনো, তুই দরখাস্ত কর্‌—আমি অন্য জোগাড় দেখ্‌বো।" বাবার জোগাড় যে কী রকম অমোঘ তার ধারণা বনমালীর বিলক্ষণই ছিলো; সে প্রফুল্ল অন্তরের উৎসাহের সঙ্গেই আবেদন কর্‌লে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রামযাদুরও একখানি বাৎসল্য রসসিক্ত পত্র প্রিয়তোষের নামে রওনা হয়ে গেলো। পিতার প্রথম পত্র পেয়ে প্রিয়তোষ এতো আনন্দিত হলো যে সে শূন্য অধ্যাপকের পদে বনমালীকেই নিযুক্ত কর্‌লে এবং মনে মনে তার আশা জেগে উঠ্‌লো যে হয় তো তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরিচয়ের সূত্র ধ'রে তার পিতৃপরিচয়ও একদিন ঘ'টে উঠ্‌বে; অন্ততঃ সে ভাইয়ের মুখে তাদের পিতার পরিচয় তো কিছুও জান্‌তে পার্‌বে। পিতৃপরিচয় না জানার লজ্জা ও ক্ষোভ প্রিয়তোষকে পীড়া দিতো; সেই পীড়া থেকে অব্যাহতি পাবার সম্ভাবনায় তার লোভ প্রবল হয়ে উঠ্‌লো। এই অবস্থায় বনমালীকে কাছে পেয়ে তাকে যত্ন কর্‌তে পার্‌বে ব'লে সে যেনো কৃতার্থ হয়ে উঠ্‌লো। এতোদিন পরে বনমালী সিংহলযাত্রার দিনে ট্রেনে উঠে ট্রেন ছাড়্‌বার দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ার পর বাবার মুখ থেকে যখন শুন্‌লে—প্রিয়তোষ তোমার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভাই—তখন সে আশ্চর্য্য হয়ে গেলো এবং পরক্ষণেই বুঝ্‌তে পার্‌লে কেনো অতো সহজে সে ঐ চাকরীটি পেয়ে গেছে। পিতার রহস্যজটিল জীবনের সম্বন্ধে তার কৌতুহল জেগে উঠ্‌লো কিন্তু আর কিছু জান্‌বার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিলে। বনমালী ক্ষীণ আশা নিয়ে চল্‌লো অচেনা দাদার কাছ থেকে তার পরিচয় হয় তো কিছু জান্‌তে পার্‌বে।

রামযাদুর পরিবারের লোক যেমন স্থানান্তরিত হয়ে ক'মে গেছে, তেমনি একজন লোক তাদের পরিবারভুক্ত হয়েছে,—সে কৃষ্ণকলি। কৃষ্ণকলির বয়স এখন উনিশ বছর হয়েছে, কিন্তু এখনো তার বিবাহ হয় নি; তার বিবাহ দেবার জন্যে রামযাদু বিশেষ কোনো চেষ্টাও করে নি। কৃষ্ণকলি অকস্মাৎ বাপ-মাকে হারিয়ে পরের আশ্রিত হয়ে এমন লজ্জায় সঙ্কুচিত ও ধীর শান্ত হয়ে প'ড়েছে যে সে যে বাড়ীতে আছে তা রাম-যাদুরা অনেক সময় অনুভবই করে না; তার উপর কৃষ্ণকলি একটু বড়ো হয়ে উঠে জ্ঞানলাভ কর্‌তেই আশ্রয়দাতার সংসারে যে রকম কাজ কর্‌তে নিজেকে নিযুক্ত ক'রে

দিয়েছিলো তাতে তাকে বিয়ে দিয়ে বাড়ী থেকে সরিয়ে ফেল্‌তেও রামযাদুর মন চাইছিলো না।

রামযাদুর অনাথ-আশ্রমের ছেলেমেয়েরা রামযাদুর গোরুর গোয়াল সাফ করে, জাব দেয়; বাগান নিড়ায়, ফল পাড়ে, তরী তরকারীর ক্ষেতে জল দেয়; গাড়ী ধোয়; ঘর ঝাঁট দেয়, ঝুল ঝাড়ে; এমন ক'রে তারা সবাই স্বাবলম্বন শেখে। এইসব দেখে কৃষ্ণকলিও তাদের সঙ্গে কাজ কর্‌তে যায়। কিন্তু মনমোহিনী বলে—আহা, তুমি কি ও-সব পারো? তোমার বাবার বাড়ীতে কতো গণ্ডা চাকর-দাসী খাট্‌তো! তুমি রেখে দাও, রেখে দাও……

মনমোহিনী আর রামযাদু কৃষ্ণকলিকে যেনো আহা দিয়ে ঘিরে রেখেছে—সে চল্‌তে শোনে আহা! ফির্‌তে শোনে আহা! এতে সে লজ্জার সঙ্কোচ কাটিয়ে এদের বাড়ীটাকে নিজের বাড়ী ক'রে নিতে কিছুতেই পার্‌ছিলো না; সে একটি সহজ স্থান এ পরিবারের মধ্যে ক'রে নিতে পার্‌ছিলো না; পরানুগ্রহের কুণ্ঠা ও পরগলগ্রহ হওয়ার অপ্রতিভ ভাব কৃষ্ণকলির দেহ মন ও আচরণকে জড়িয়ে তাকে ভারি নম্র ধীর স্নিগ্ধ ক'রে তুলেছিলো; তার এই মৃদুতা তার দেহের কুৎসিততাকে ঢেকে তাকে একটি মাধুর্য্য ও শ্রী দান করেছে। মনমোহিনী আর রামযাদু যতোই কৃষ্ণকলিকে কাজ কর্‌তে বারণ করে, ততোই সে অধিক লজ্জিত হয়ে অধিক কাজের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত ক'রে দেয়; অনেক সময় সে তার আশ্রয়দাতাদের লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করে। এতে তার কাজের নিপুণতা ক্ষিপ্রকারিতা এবং সৌন্দর্য্যবোধ অসামান্য রকমে বেড়ে চল্‌ছিলো। মনমোহিনী আর রামযাদু ঘুম থেকে ওঠবার আগেই কৃষ্ণকলি শয্যা ত্যাগ করে, এবং তৎপরতার সহিত সমস্ত গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন ক'রে রাখে। মনমোহিনী স্নান কর্‌তে গিয়েই দেখে তার কাপড় শেমিজ স্নানের ঘরের আল্‌নায় সাজানো আছে; রামযাদু ঘর থেকে বেরিয়ে অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসেই দেখে ঘরখানি সুশৃঙ্খলার শ্রী ধারণ ক'রে ধূলিলেশশূন্য হয়ে আছে; রামযাদু বাহির থেকে বেড়িয়ে এসে জুতো ছেড়ে রেখে যায়, ফিরে এসে আবার পায়ে দেবার সময় দেখে জুতো ধূলিমুক্ত হয়ে আয়নার মতন চকচক কর্‌ছে। রামযাদু স্নান ক'রে এসে দেখে তার পূজার জো প্রস্তুত; পূজা সেরে উঠে দেখে তার খাবার তার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে। রামযাদু আপিসে যাবার সময় এককৌটা পান নিয়ে যায়; আপিসের চাপ্‌কান গায়ে দিতে গিয়ে দেখে সদ্য সাজা সিক্ত পানের খিলি চুন আর পানের বোঁটা দিয়ে কৌটার উদর পরিপূর্ণ হয়ে আছে। মনমোহিনী আর রামযাদুর কিছু চেয়ে পেতে হয় না; এবং কামধেনুর মতন তাদের সকল কামনা কে যে অলক্ষ্যে পূরণ কর্‌ছে তা তারা বিলক্ষণ জানে।

একদিন রাত্রে খেতে ব'সে রামযাদু বল্‌লে—আজকে আমার কসের পোকা-খাওয়া দাঁতটা একটু কন্‌কন্‌ কর্‌ছে।

মনমোহিনী কোনো কথা বল্‌লে না।

রামযাদু খেয়ে উঠে আঁচাতে গিয়ে দেখ্‌লে তার ঘটীতে গরম জল রয়েছে।

মনমোহিনী কথায় আদর মাখিয়ে বলে—দেখ্‌ মা কলি, তুই আমাদের মাথা খেলি; তুই যদি কখনো পরের বাড়ী চ'লে যাস, তা হ'লে আমরা মা-ছোড় হবো; তখন আমাদের দুর্দ্দশার অন্ত থাকবে না।

কৃষ্ণকলি লজ্জায় সুখে অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

একদিন দুপুর বেলা কৃষ্ণকলি মনমোহিনীকে ঘুমিয়ে থাক্‌তে দেখে চুপিচুপি আলোর চিম্‌নিগুলো নিয়ে সাবানজল দিয়ে ধুতে বসেছে। সে আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে; একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। হঠাৎ সে তার পিছনে মনমোহিনীর কোমল কণ্ঠের আদরমাখা ভর্ৎসনা শুনে চম্‌কে উঠলো—তুমি চাকরদাসীগুলোকে একেবারে কুড়ে বানিয়ে দিলে। সব কাজ যদি তুমিই কর্‌বে তো ওরা কি শুধু ব'সে ব'সে মাইনে নিয়ে ভাতের কাঁড়ি গিল্‌বে!

কৃষ্ণকলি মনমোহিনীর অপ্রত্যাশিত আগমনে ও হঠাৎ পিছন থেকে তার কথা শুনে চম্‌কে উঠেছিলো এবং গোপন অপরাধ ধরা প'ড়ে গেছে এইরূপ ভাবে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়াতে সাবানে পিছল হাত থেকে একটা চিম্‌নি স্খলিত হয়ে শানের উপর প'ড়ে গেলো এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো।

কৃষ্ণকলি আরো অপ্রস্তত হয়ে তাড়াতাড়ি সেইসব ভাঙা কাঁচ কুড়াতে লাগলো।

মনমোহিনী ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—ভাঙা কাঁচে হাত দিয়ো না, হাত কেটে যাবে; রেখে দিয়ে উঠে এসো……ধীরাকে ডেকে দিচ্ছি কাঁচগুলো ঝাঁটিয়ে ফেলে দিক…

মনমোহিনীর নিষেধ শোনবার আগেই কৃষ্ণকলির আঙুল

কাঁচে কেটে গেলো। সে মনমোহিনীর আদেশ মান্ত ক'রে যখন উঠে দাঁড়ালো তখন তার আঙুল দিয়ে টস্‌টস্ ক'রে রক্ত পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি সেই হাত কাপড়ের তলায় লুকালে, কিন্তু মাটিতে পড়া রক্তের ফোঁটা মনমোহিনীর দৃষ্টিতে পড়লো।

মনমোহিনী ব'লে উঠলো—হাত কাটলে বুঝি? দেখি দেখি……

মনমোহিনী জোর ক'রে কৃষ্ণকলির হাত কাপড়ের তলা থেকে বা'র ক'রেই চেঁচিয়ে উঠলো—ওমা! কাঁচে-কাটা হাত লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা! চলো চলো টিংচার আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দি গে।

মনমোহিনী কৃষ্ণকলিকে হাত ধ'রে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আঙুলে টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিলে; এবং নিজের পরণের কাপড়ের আঁচল ছিঁড়ে কৃষ্ণকলির আঙুলে পটি বেঁধে দিলে।

কৃষ্ণকলি আঙুলের আঘাতের চেয়ে মনমোহিনীর মমতার আঘাতে বেশী অভিভূত হয়ে পড়লো; মনমোহিনীর পরণের কাপড়খানা যে জীর্ণ ছিন্ন পুরাতন ছিলো সেদিকে তার লক্ষ্যই গেলো না, তার কেবল মনে মনটা জুড়ে এই কথাই কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগলো যে কাকীমা নিজের পরণের কাপড় ছিঁড়ে আমার আঙুল বেঁধে দিলেন!

রামযাদুর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলির যত্ন সেবা করার ভারও কৃষ্ণকলি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। তারাও ছোড়দি ছাড়া আর কারো কাছে আবদার উপদ্রব করতে যায় না।

কৃষ্ণকলির অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি। রামযাদুর বাড়ীতে আসার পর সে লেখাপড়া করবার অবকাশ পায় নি; কিন্তু সে রামযাদুর ছেলেমেয়েদের পড়া শুনে আর অঙ্ক কষা দেখে পড়তে লিখতে শিখেছে; সে নিজে নিজে লুকিয়ে লুকিয়ে যে বই হাতের কাছে পায় বাছ বিচার না ক'রে পড়ে, এবং যা একবার পড়ে তা তার মনে মুদ্রিত হয়ে যায়। এই রকম ক'রে সে ইতিহাস ভূগোল স্বাস্থ্যরক্ষা বস্তুপরিচয় এবং বাংলা ইংরেজী সংস্কৃত ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ ক'রেছে সে রকম জ্ঞান এ বাড়ীতে আর কারো নেই; কিন্তু সে এই জ্ঞানও গোপন ক'রেই রাখে; তার সকল কাজেই লজ্জা ও সঙ্কোচ। রামযাদুর কাছে ভারতবর্ষের প্রায় সকল সাময়িক পত্রই অম্‌নি আসে; সেগুলি খোলবার সময়ও রামযাদুর হয় না; ডাক এলেই কৃষ্ণকলিই কাগজগুলির মোড়ক খুলে রামযাদুর টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখে; এবং রামযাদু আপিসে গেলে ও মনমোহিনী দিবানিদ্রায় অভিভূত হ'লে কৃষ্ণগুলি সেইসব কাগজ নিয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে বেশী প'ড়ে নেবার ইচ্ছায় আগ্রহে ও চেষ্টায় কৃষ্ণকলি দ্রুত পাঠের শক্তি অর্জ্জন করেছে। মাসিকপত্রের গল্প উপন্যাস থেকে আরম্ভ ক'রে ভূতত্ত্ব জীবতত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক কোনো প্রবন্ধই সে বাদ দেয় না। এবং কোন্ বছরের কোন্ কাগজের কোন্ সংখ্যায় কোন্ প্রবন্ধ বা গল্প আছে তা তার মনে থেকে যায়; সে যেনো জীবন্ত সূচীপত্র।

রামযাদু অতি পুরাতন কাগজে প্রকাশিত নানা লেখকের লেখা একই বিষয়ের কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র সংগ্রহ ক'রে সবগুলির তথ্য মিলিয়ে একটি একটি প্রবন্ধ লেখে, এবং তাতে তার বিদ্যা ও জ্ঞানের খ্যাতি চারিদিকে বিঘোষিত হ'তে থাকে। রামযাদু এই রকম একটা অরিজিন্যাল রিসার্চ্ বা মৌলিক গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলো; প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে সে প্রবন্ধ লিখবে এবং এ সম্বন্ধে প্রাচীন কোন্ মাসিক পত্রে কি প্রবন্ধ আছে তার সন্ধানে বিব্রত হয়ে উঠেছে; অথচ এই চুরিবিদ্যায় সে অপরের সাহায্যও নিতে পারে না, তা হ'লে তার চাতুরী ফাঁস হয়ে যাবে যে।

রামযাদুর স্মরণ হচ্ছে বৌদ্ধযুগে নারীর অবস্থা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ সে কোথায় পড়েছে; কিন্তু কোন্ কাগজের কোন্ বছরে তা সে মনে আন্‌তে পারছে না; সে যতো রাজ্যের কাগজ পেড়ে হাঁটকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠেছে।

এমন সময় সদাসঙ্কুচিতা ব্রীড়াবনতা স্বল্পভাষিণী কৃষ্ণকলি এসে সেখানে দাঁড়ালো। রামযাদুকে বিব্রত দেখেই কৃষ্ণকলির চোখে একটি কাতর প্রশ্নসূচক দৃষ্টি ফুটে উঠলো।

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে এসে দাঁড়াতে দেখেই তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বল্লে—তুমি তো আমার বিপত্তারিণী, এই লেখাপড়ার কাজেও যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর্‌তে পার্‌তে!

কৃষ্ণকলি নিজের অক্ষমতার লজ্জায় লজ্জাবতী-লতার মতো সঙ্কুচিত হয়ে গেলো; তার মনে হলো—"হায় হায় নির্ব্বুদ্ধি

আমি! আমি কেনো ভালো ক'রে লেখাপড়া শিখি নি?" তার একবারও মনে হলো না যে তার এই অজ্ঞানের জন্ম দায়ী রামযাদুই, সে তাকে লেখাপড়া শেখাতে নিতান্তই অবহেলা করেছে।

কৃষ্ণকলিকে লেখাপড়া না শেখানোর মধ্যেও রামযাদুর স্বার্থবুদ্ধি খেলা করেছে; লেখাপড়া শিখে চালাক চতুর হয়ে কৃষ্ণকলি পাছে রামযাদুর প্রবঞ্চনা ধ'রে ফেলে, তার পৈতৃক অধিকার দাবী করে, এই ভয়েই রামযাদু কৃষ্ণকলিকে লেখা-পড়া শেখানোর কোনো ব্যবস্থাই করে নি। আর এই ভয়েই সে কৃষ্ণকলির বিবাহ দেবারও চেষ্টা করছিলো না, পাছে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তার পিতৃধন পুনরুদ্ধারের জন্ম কোনো রকম চেষ্টা ক'রে রামযাদুর উদ্বেগ উৎপন্ন করে। এবং পাছে লোকে ঘুণাক্ষরেও বলে যে ওর বাপের টাকায় বড়োলোক হয়ে ওকে অবহেলা অনাদর করছে, এই ভয়েই রামযাদু ও মনমোহিনী দুজনে মিলে কৃষ্ণকলিকে সমাদর দিয়ে ঘিরে তাকে অভিভূত সম্মোহিত ক'রে রাখতে সতত সচেষ্ট।

কৃষ্ণকলি রামযাদুকে তার আশ্রয়দাতা উপকর্তা ব'লেই জানে; সে তো নিঃস্ব নিরাশ্রয়া অনাথ; সে তো রামযাদুর অনাথ-আশ্রমেই স্থান পেতে পারতো; কিন্তু রামযাদু যে তাকে নিজের পরিবারভুক্ত ক'রে রেখে তাকে কন্যার অধিক যত্ন করে এই কৃতজ্ঞতার বোঝার চাপে কৃষ্ণকলির মন নিতান্ত সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত লজ্জিত হয়ে থাকে। সে রামযাদুর মুখে স্নেহবিদ্ধ মৃদু ভর্ৎসনা শুনে অত্যন্ত অপ্রতিভ হলো, কিন্তু তার দুই চোখে ভ'রে উঠলো ব্যাকুল জিজ্ঞাসা যে তোমার কোথায় কি অসুবিধায় তোমার স্বচ্ছন্দতা আটকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে আমায় যদি বলো তো আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।

রামযাদু কৃষ্ণকলির দৃষ্টিতে প্রশ্নের ব্যাকুলতা দেখতে পেয়ে বললে—আমি প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু উপকরণ সংগ্রহ করতে চাচ্ছি ··

কৃষ্ণকলির ব্যাকুল মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠলো, সে লজ্জান্বিত মুখে রামযাদুর বইয়ের তাক থেকে ১৩২৭ সালের প্রবাসী ও ১৩২৯ সালের নব্যভারত এনে রামযাদুর সামনে রেখে দিলে এবং আবার বইয়ের শেল্‌ফের কাছে চ'লে গেলো। রামযাদু পরাণ-বাবুর প্রকাণ্ড লাইব্রেরী নিজের বাড়ীতে পাঠিয়ে এনেছিলো।

রামযাদু অবাক হয়ে একবার বই দুখানার দিকে ও একবার কৃষ্ণকলির দিকে দেখলে; তার পর বললে—এতে আছে?

কৃষ্ণকলি শেল্‌ফ থেকে Sir Ashutosh Mukherjee Silver Jubilee Commemoration Volume III, Dr Dwarknath Mitter's The Position of Women in Hindu Law, মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন পর্ব্ব, স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড এনে রামযাদুর সামনে রাখলে। রাম-যাদুর চোখে যে বিস্ময় ও প্রশংসা ফুটে উঠেছিলো তার আঘাতে কৃষ্ণকলির মাথা লজ্জাতে অবনত হয়ে পড়েছিলো; কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ প্রবন্ধে যে নারী সম্বন্ধে আলোচনা আছে তা সে ইচ্ছা সত্ত্বেও বই খুলে বাহির ক'রে দিতে পারলে না।

রামযাদু বললে—এইসব বইয়ে ঐ সম্বন্ধে লেখা আছে?

কৃষ্ণকলির লজ্জিত দৃষ্টি একবার রামযাদুর দিকে উঠেই আবার অবনত হয়ে পড়লো। সে মুখ নত ক'রে একটু মৃদু হাসলে।

রামযাদু বইগুলি খুলে তাদের সূচীর উপর চোখ বুলাতে বুলাতেই হেসে বললে—তুই আমার ঘরের শুধু লক্ষ্মীই নোস, সরস্বতীও! তোর দাম লাখ টাকা!

রামযাদু এই কথা যে কতো বড়ো সত্য, বা সত্যকেও খর্ব্ব করা তা বুঝতে না পেরে, কৃষ্ণকলি এই কথাকে স্নেহের অত্যুক্তি মনে করলে এবং অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে ধীর নিঃশব্দ পদে সে ঘর থেকে পলায়ন করলে। তার মনের মধ্যে কেবলই এই কথা গুঞ্জন করতে লাগলো—কাকাবাবু আর কাকীমা আমাকে কী ভালোই বাসেন! আমার মতন লক্ষ্মীছাড়াকে বলেন কিনা লক্ষ্মী, আর আমার দাম লাখ টাকা।

কৃষ্ণকলি যদি জানতো যে তার বাস্তবিক দাম রামযাদুর কাছে চার লাখের কাছাকাছি, এবং রামযাদু সত্যের অপলাপ ক'রে তার দাম কমিয়ে বলেছে, তা হ'লে তার মনের ভাব ঠিক এই রকম শ্রদ্ধান্বিত কৃতজ্ঞতায় ভ'রে থাকতো কি না তা বলা শক্ত।

কৃষ্ণকলি রামযাদুর লাইব্রেরী-ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রামযাদু আপন মনে অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠলো—এ কাল-পেঁচীটা তো দেখি কালসাপ! আমি যা লিখবো তাই হয়তো টের পাবে আমি কোথা থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে

লিখেছি! এ আবার এক অস্বস্তি হলো! ও যেনো হ'য়েছে আমার পক্ষে সাপের ছুঁচো গেলা··না পারি গিল্‌তে আর না পারি ওগ্‌লাতে··না পারি বাড়ীতে রাখ্‌তে, আর না পারি পরের বাড়ীতে পাঠাতে ···

কৃষ্ণকলি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দেখলে মনমোহিনী সদ্য ঘুম থেকে উঠে হাই তুল্‌ছে। কৃষ্ণকলি অমনি তাড়াতাড়ি ডাবর একঘটী জল আর গাম্‌ছা নিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো।

মনমোহিনী নিদ্রালস জড়িত চোখে কৃষ্ণকলির দিকে তাকিয়ে হেসে বল্‌লে,—তুই কি আমাকে ন'ড়ে বস্‌তে দিবি নে? ব'সে ব'সে থেকে দেখতো কী মোটাই হয়ে উঠ্‌ছি!

কৃষ্ণকলি স্মিতমুখে নীরবে মনমোহিনীর সাম্‌নে ডাবর পেতে দিলে এবং তার হাতে জল ঢেলে দেবার জন্য ঘটী ধ'রে নত হলো।

মনমোহিনী মুখ ধুয়ে গাম্‌ছা দিয়ে মুখ মুছতে লাগলো, কৃষ্ণকলি সেই অবসরে ডাবর আর ঘটী বাইরে রেখে এক ডিবে পান ও পিকদান এনে মনমোহিনীর সাম্‌নে রাখ্‌লে।

মনমোহিনীর মুখ মোছা শেষ হ'তেই কৃষ্ণকলি গাম্‌ছা নেবার জন্য হাত বাড়ালে। কিন্তু মনমোহিনী গাম্‌ছা কৃষ্ণকলির হাতে না দিয়ে মাটিতে রাখ্‌লে এবং দুটো পান একসঙ্গে মুখে পুর্‌তে পুর্‌তে শূন্যহীন ভরাট্‌ মুখবিবর থেকে অস্পষ্ট গম্ভীর শব্দ কণ্ঠে বাহির ক'রে বল্‌লে—গাম্‌ছা থাক, চুলের দড়ি নিয়ে আয়, চুল বেঁধে দি মাথাটা যে একেবারে ডোক্‌লা কাগের বাসা হয়ে রয়েছে···আজকে আমাদের পাশের বাড়ীর নতুন ভাড়াটে ঝিকিড়কোটার রাণী বেড়াতে আস্‌বে।

কৃষ্ণকলির কালো মুখ লজ্জায় বেগুনে হয়ে উঠলো। সে বিশেষ ক'রেই জানে সে কালো কুৎসিত; তাই সে নিজেকে লোকলোচন থেকে লুপ্ত গুপ্ত ক'রে রাখ্‌তে চায়, এমন কি সে কোনো দিন নিজে আয়নায় মুখ দেখে না। সে অতি সাধারণ সামান্য বেশে থাকে, পাছে বিশেষ বেশ-বিন্যাস দেখে কেউ ব'লে—আহা ঐ তো রূপের ছিরি! তার আবার অতো ভাবন কেনো!

মনমোহিনীর আদেশ শুনে কৃষ্ণকলি শঙ্কাসঙ্কোচে কাতর হয়ে বল্‌লে—খোকার জামাটা আধখানা সেলাই হয়ে আছে···

মনমোহিনী বল্‌লে—সে কাল হবে।. আজ বাইরের লোক আস্‌বে; এমন হয়ে কি থাকে? তারা দেখে কি বল্‌বে? ভাববে, আমরা তোকে অযত্ন করি।

এর পরে আর কৃষ্ণকলি আপত্তি কর্‌তে পার্‌লে না। কৃষ্ণকলির মনে হ'লো শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া যেমন নিজেকে সাজিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা ক'রে অধিকতর কুৎসিত ক'রে তুলেছিলো, তেমনি দুর্দ্দশা হয়তো তারও হবে; কিন্তু সে মরণাধিক লজ্জার আঘাত পেলেও এ কথা লোককে ভাব্‌বার অবসর দিতে পার্‌বে না যে সে এ বাড়ীতে অনাদরে আছে। কৃষ্ণকলি চুল বাঁধ্‌বার দড়ি নিয়ে এসে মনমোহিনীর সাম্‌নে বস্‌লো। লজ্জার সঙ্কোচে সে অত্যন্ত পীড়িত হ'লেও মনমোহিনীর প্রসাধন-আয়োজন নীরবে সহ্য কর্‌তে লাগ্‌লো।

কৃষ্ণকলির সুদীর্ঘ চুলের বিনুনী তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় একটি গৌরাঙ্গী সুন্দরী প্রৌঢ়া বিধবা ও একটি রূপসী কিশোরী বালিকা সেইখানে এসে উপস্থিত হলো।

তাদের আস্‌তে দেখেই মনমোহিনী কৃষ্ণকলির বিনুনী ছেড়ে দিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং মোটা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াবার বিলম্বিত সময়ের মধ্যে বল্‌লে—আসুন রাণীদিদি আসুন, আজ আমার কী সৌভাগ্যি, গরীবের দরজায় হাতীর পাড়া, আপনার পায়ের ধুলো যে আমার বাড়ীতে পড়্‌বে···

রাণী বল্‌লে—এসে অবধি অন্নপূর্ণা দর্শন কর্‌তে আস্‌বো মনে করি, হয়ে ওঠে না, আজ এলুম··

মনমোহিনী চীৎকার ক'রে ডাক্‌লে—লছিয়া, এই লছিয়া, শীগ্‌গির ক'রে কার্পেটখানা এনে এইখানে পেতে দে···

রাণী বাড়ীতে এসেছেন, এই সংবাদ বাড়ীময় ছড়িয়ে প'ড়েছিলো; চাকর দাসী ছেলেমেয়ে সবাই উৎসুক হয়ে রাণী দেখতে ছুটে এসেছিলো; মনমোহিনীর আদেশ শোন্‌বামাত্র একজন দাসী দৌড়ে গিয়ে কার্পেট এনে রাণীর সাম্‌নে বিছিয়ে দিলে।

কৃষ্ণকলির ইচ্ছা হচ্ছিলো সে ছুটে পালিয়ে গিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথাও লুকায়; কিন্তু অসমাপ্ত বেণী নিয়ে সে উঠে যেতেও লজ্জায় বাধা পাচ্ছিলো।

রাণী আসনে বস্‌তে বল্‌তে বল্‌লে—এ মেয়েটি? আপনার?

এই প্রশ্নের ধাক্কায় কৃষ্ণকলির মাথা তার কোলের দিকে ঝুঁকে পড়্‌লো।

মনমোহিনী কৃষ্ণকলির পিঠের কাছে ব'সে তার অসমাপ্ত বেণী হাতে তুলে নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—হ্যাঁ, আমার মেয়েই বটে, যদিও পেটে ধরি নি। এতোটুকু বেলা থেকে মানুষ ক'রে এতোবড়োটি করেছি। ওর বাপ-মা কেউ কোথাও নেই, আমরাই এখন ওর বাপ মা।

রাণী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনাদের অনাথ-আশ্রমে এসেছিলো বুঝি?

মনমোহিনী বল্‌লে—না, ও মস্ত বড়লোকের মেয়ে; কিন্তু বাপ এক পয়সাও রেখে যেতে পারে নি। এর বাপই ওঁর চাকরী ক'রে দিয়েছিলেন; আমাদের যা কিছু তা সব এর বাপ হতেই; তাই অমন বন্ধুর মেয়েকে তো আমরা ফেল্‌তে পারি নি ··

রাণী আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

মনমোহিনী বল্‌লে বিয়ে হয় নি এখনও। বাপ তো এক পয়সাও রেখে যেতে পারে নি; তা উনি খরচ ক'রে বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ভালো পাত্র তো পাওয়া যায় না, আর যার-তার হাতেও তো দেওয়া যায় না...

মনমোহিনীর কথার মধ্যে কিন্তুটার যে কি মানে তা কৃষ্ণকলি বেশ বুঝতে পার্‌লে; তার কুরূপের জন্যই যে ভালো পাত্র ভয় পেয়ে পালায় তা তো সে অনেক বার শুনেছে। লজ্জাতে তার মাথা কাটা যাচ্ছিলো; অথচ তার পালাবার পথ বন্ধ, মনমোহিনীর হাতে তার বেণী আটকে আছে; তার মনে হচ্ছিলো যে বল্গাবদ্ধ ঘোড়া এমনই ক'রেই চাবুকের আঘাত সহ্য করে।

মনমোহিনীর কথার উত্তরে রাণী বল্‌লে—আমার এই মেয়ের জন্যে একটি পাত্র খুঁজ্‌তেই আমার কল্‌কাতায় এসে থাকা। তা দিদি, তোমার কর্তাকে একটু বোলো না, যদি কোনো সৎপাত্রের সন্ধান দিতে পারেন। সৎচরিত্র আর লেখাপড়াজানা ছেলে হ'লেই হবে।

মনমোহিনী বল্‌লে—তা আমি ব'লে দেখ্‌বো···একটি খুব ভালো পাত্র আমাদের সন্ধানে আছে, তবে তার বাপ-মা তেমন বড়োলোক নয়, তাই বল্‌তে সাহস হয় না, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টার মতন সে যে হাসির কথা হবে।

রাণী হাসিমুখে বল্‌লে—সেটি তবে আপনারই ছেলে বেয়ান! আমার মেয়ের কি অমন ভাগ্য হবে যে এমন উঁচু ঘরে পড়্‌বে? আপনাদের নাম যশ যে বাংলা-জোড়া।

মনমোহিনী বল্‌লে—আপনি যখন বেয়ান ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন তখন বলি সেটি আমারই ছেলে বেয়ান। তা আমি ওঁকে আজই ব'লে ছেলেকে আস্‌তে তার করাবো।

রাণী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ছেলে কোথায় আছে?

মনমোহিনী বল্‌লে সে লঙ্কায় না সিলোনে কোথাকার কলেজের পফেচার,······

এতোক্ষণে কৃষ্ণকলি ছাড়া পেয়ে উঠে আস্তে আস্তে সেখান থেকে চ'লে গেলো। যাবার সময় দেখে গেলো কিশোরী মেয়েটির মুখ বিবাহের কথায় গোলাপ ফুলের আভায় সুন্দর দেখাচ্ছে।

রাণী রামযাদুর বাড়ীর ঐশ্বর্য্য, অন্নপূর্ণা ঠাকুর, আর অনাথ-আশ্রম দেখে চ'লে গেলো। যাবার সময় অনাথ-আশ্রমে পাঁচ শো টাকা এবং অন্নপূর্ণাকে প্রণামী একখানি গিনি।

রাণী চ'লে গেলে এই টাকাগুলি নিয়ে মনমোহিনী স্বামীসন্দর্শনে গেলো।

রামযাদু মমমোহিনীর হাতে টাকা দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ও টাকা কিসের?

মনমোহিনী বল্‌লে—এই পাশের বাড়ীতে ভাড়াটে কোথাকার যে রাণী এসেছে, সেই আজ বেড়াতে এসেছিলো; অন্নপূর্ণোকে গিনি দিয়ে পেন্নাম ক'রে গেছে, আর অনাথ-আশ্রমে পাঁচ শো টাকা দিয়েছে।

রামযাদু হেসে বল্‌লে—ভালোই হলো, আমাকে আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুল্‌তে হলো না, তুমি ব্রেস্‌লেট গড়াবে ব'লে টাকা চেয়েছিলে। ঐ টাকাটা তোমার কাছেই রেখে দাও।

মনমোহিনী খুশী হলো। কিন্তু গহনার সম্বন্ধে কোনো কথা না ব'লে বল্‌লে—আর দেখো, রাণীর একটি খাসা সুন্দরী ডাগর মেয়ে আছে; তার জন্যে পাত্র দেখ্‌তে বল্‌ছিলো। আমাদের বনমালীর যদি বিয়ে হ'য়ে না যেতো তা হ'লে রাণীর এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পার্‌লে ওর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমাদের হতো···

রামযাদু ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—দেশ থেকে কুলীনের বিয়ের ব্যবসা উঠে গেলো, এখন আর এ সম্বন্ধে ভেবে কি হবে বলো?

মনমোহিনী বল্‌লে—আমি রাণীকে প্রিয়তোষের কথা ব'লেছি; সে তো খুশী হয়ে আমার সঙ্গে বেয়ান সম্পর্ক পাতিয়ে গেছে; তা তুমি প্রিয়তোষকে আস্‌তে টেলিগ্রাম করো; তার সঙ্গে বিয়ে হ'লেও বিষয় সম্পত্তিটা আমাদেরই বংশের একজনের হবে।

রামযাদু লাফিয়ে উঠে আট ছেলের মা প্রৌঢ়া পত্নীর মুখচুম্বন ক'রে বল্‌লে—মনমোহিনী, কে বলে তোমার বুদ্ধি নেই? তুমি আমার সহধর্ম্মিণী প্রেয়সী!

মনমোহিনী খুশী হয়ে হাসি মুখে বল্‌লে—রাখো তোমার নেক্‌রা রাখো, বুড়ো বয়সে আর থিয়েটারী ঢং কর্‌তে হবে না। প্রিয়তোষকে আস্‌তে লেখো।

রামযাদু টেলিগ্রামের ফর্ম্ টেনে নিয়ে বল্‌লে—এখনই লিখ্‌ছি।

[ক্রমশঃ]

সর্ব্বস্বরূপে! সর্ব্বেশে! সর্ব্ব শক্তি-সমন্বিতে!

আর ঐ অক্ষররূপে তিনি কিছুতেই নাই এবং তাঁহাতেও কিছুই নাই।

(৯)

সমস্ত চণ্ডীগ্রন্থখানিই ভগবতীর স্তব। ইহাতে ৭০০ শ্লোক আছে। এইজন্য ইহাকে সপ্তশতী স্তব বলা হয়। হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থাদি দেবদেবীর স্তবস্তুতিতে পূর্ণ। এই সপ্তশতী স্তব সমস্ত স্তবের শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা জীবনে বহু দুঃখ পাইতেছেন এবং সান্ত্বনার জন্য যাঁহাদের দেবতা ভিন্ন অন্য লক্ষ্য নাই, তাঁহারা সকলেই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন।

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ

স্তবানামপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ।

সমস্ত চণ্ডীই স্তব হইলেও ইহাতে বিশেষভাবে চারিটী স্তব আছে। প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মার স্তব। চতুর্থ অধ্যায়ে মহিষাসুর বধের পর দেবগণের স্তব। পঞ্চম অধ্যায়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের উদ্দেশ্যে দেবগণের স্তব। একাদশ অধ্যায়ে শুম্ভ নিশুম্ভ বধের পর পুনরায় দেবতাদিগের স্তব।

এই চারটী স্তব চার বিভিন্ন-ভাবের; যদিও প্রথম ও তৃতীয়টার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। এই দুইটী স্তবেই দেবীকে সর্ব্ব-স্বরূপিনী-ভাবে ধ্যান করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম স্তবটী দেবতার ভূমি হইতে আর তৃতীয়টী মানুষের ভূমি হইতে ধারণা করিয়া উক্ত হইয়াছে।

প্রথমটীতে মানুষের জীবনের—মানুষের মন প্রাণের কোনো কথাই নাই। তৃতীয়টীতে সব কথাই মানুষের জীবনের ও মানব-চিত্তের। প্রথমটী philosophical বা cosmological, তৃতীয়টী psychological, এবং ইহা অত্যন্ত সঙ্গত। কারণ ব্রহ্মা যখন যোগনিদ্রার স্তব করিতেছেন তখন মানুষের সৃষ্টিই হয় নাই।

দ্বিতীয় স্তবটী বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই স্তবটী কবির কথা, ভাবের কথা, শান্ত-ভক্তির কথা। ছন্দটী যেমন গুরু-গম্ভীর তেমনি মন্দ-মধুর। চতুর্দ্দশ আক্ষরিক ছন্দ। ইহার নাম বসন্ত-তিলক। ইহাতে স্বর-বিন্যাস-ক্রম এই প্রকার: — —U—UUU—UU—U— —। 'গেয়ং বসন্ত তিলকং ত-ভ জা জঁ-গৌ-গঃ' এ ছন্দ গীতাতে নাই। চণ্ডীর শুধু এই এক অধ্যায়েই আছে। আর বসন্ত তিলকের একটী শ্লোক আছে একাদশ অধ্যায়ের স্তবের শেষে। ১১৩৪

ভাষার দিক্ হইতে এই চতুর্থ অধ্যায়ই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ভাষাকে দেবভাষাই বলিতে ইচ্ছা হয়। ভাব ও রসের প্রাচুর্য্যও এই অধ্যায়েই সমধিক। অর্থাৎ সবচেয়ে কবিত্বপূর্ণ এই অধ্যায়টী। ঋষি এখানে দেবীর অনুপম রূপরাশির কথা বারবার করিয়া বলিয়াছেন। সে রূপের বর্ণনায় যেন কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। দেবীর ভীষণতার কথা বলিতে গিয়াও যেন অজ্ঞাতসারে ঐ রূপের গরিমাই গান করিয়াছেন।

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল-

মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।

প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং

কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন॥ ৪।১৩

দেবগণ ভগবতীকে বলিতেছেন—ক্রুদ্ধ কৃতান্তের মুখের মত তোমার ভ্রুকুটী কুটিল বদন-মণ্ডল অতি ভয়ঙ্কর। ইহা সম্মুখে দেখিয়াও মহিষাসুর যে প্রাণে বাঁচিয়া রহিল ইহা আশ্চর্য্য।" কিন্তু এই যে ভীষণ বদন ইহার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—উদীয়মান শশাঙ্ক ছবির। দেবীর সৌন্দর্য্য যেন ঋষির হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাই দেবীর কৃতান্ত-করাল প্রকাশের মধ্যেও ঋষি নবোদিত-চন্দ্রমাচ্ছবির মাধুর্য্য দেখিতেছেন।

ঈষৎ-সহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-

বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্। ৪।১২

ইত্যাদি বর্ণনা একদিকে যেমন ঋষির মহামায়ার বিশ্ব-বিমোহন-রূপমুগ্ধতা প্রকাশ করিতেছে। অন্যদিকে তেমনি মধুর কোমল কান্ত এবং রস-সুললিত শব্দাবলীর সুনিপুণ বিন্যাসের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণও প্রদান করিতেছে।

তৃতীয় স্তবটীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মানুষের বুদ্ধি, অহং, মন, ইন্দ্রিয় সমস্ত চিত্তভাব, প্রকৃতি, বিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শজনিত প্রতীতি সমস্তই সত্ব রজ তম ও তাহাদের স্বকীয় ও বৃত্তি হইতে হইয়া থাকে। এই সত্ব রজ তমই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি। এই প্রকৃতি আবার মহামায়া হইতে। কাজেই এই স্তবটীতে দেবীকে সর্ব্বস্বরূপিনী বলিয়া ধারণা করিয়া ধ্যান করা হইয়াছে। আমাদের হৃদয় মন ব্যাপিয়া যে শুধু মহামায়ারই লীলা-খেলা, মনোরাজ্যে যত কিছু প্রকাশ—যত কিছু বিকাশ—সমস্তই যে প্রকৃতিরূপিনী মায়াপ্রণোদিত, এই তত্ত্বটী এই স্তবে ব্যক্ত হইয়াছে।

তার পর চতুর্থ স্তবটীর ভাবগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণী—দেবীর ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি—ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা প্রভৃতির ধ্যান-মূলক। দ্বিতীয় শ্রেণী—ত্রিতাপ-তাপিত, দুঃখ-জ্বালা-জর্জ্জরিত, আর্ত্ত মানবের শরণাপত্তি এবং করুণা ভিক্ষা। দেবীর মহিমা-কীর্ত্তন এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ। দেবতা-কৃত হইলেও এই স্তবটী অশেষ শোক-তাপ-দুঃখ যন্ত্রণার অভিভূত সহস্র বিপদাশঙ্কায় সন্ত্রাসিত সংসারী জীবের পক্ষ হইতে নিবেদিত।—অত্যন্ত humanistic.

(১০)

চণ্ডী গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম চরিত বা মধু-কৈটভ-বধ; মধ্যম-চরিত বা মহিষাসুর বধ; উত্তর-চরিত বা শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ। প্রথম চরিতে এক অধ্যায়; মধ্যম-চরিতে তিন অধ্যায়; উত্তর চরিতে নয় অধ্যায়। অর্থাৎ—১+১×৩+৩×৩=১+৩+৯=১৩ অধ্যায়। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—এক হইয়াও তিন এবং তিন হইয়াও ক্রম বিবর্ত্তনে বহু—এই খণ্ড ও অধ্যায় সংখ্যাগুলিতে কি সেই ত্রি-গুণ-ভাবের আভাস আছে?

প্রথম চরিতে দেবী নিজে যুদ্ধ করিলেন না। মধু ও কৈটভের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন বিষ্ণু। কিন্তু তিনি দৈত্যদ্বয়কে পরাজিত করিতে পারিলেন না। মহামায়া তাঁহার স্বাভাবিক মায়ার ছলনা প্রয়োগ করিলেন। দৈত্যদের হৃদয়ে দুর্ব্বুদ্ধি জাগাইয়া দিলেন। দৈত্যরা বিষ্ণুকে কহিল, 'তুমি ত আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে পারিলে না, সুতরাং যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া

আমাদের নিকট বর গ্রহণ কর'। বিষ্ণু সুযোগ পাইয়া কহিলেন—"আমাকে এই বর দাও, আমি যেন তোমাদিগকে এখনি বধ করিতে পারি।"

দৈত্যেরা নিজের কথায় নিজে ঠকিল। কিন্তু কথা রাখিল। মানুষ হইলে ইতস্ততঃ করিত। কিন্তু কথা রাখিয়াও বিষ্ণুকে তবু ঠকাইবার জন্য কহিল—'যেখানে জল নাই সেইখানে আমাদিগকে বধ কর।' জল ছাড়া স্থান ছিল না। তাহারা ভাবিল বিষ্ণু জব্দ হইবে। কিন্তু বিষ্ণু ঠকিবার পাত্র নহেন। নিজ জানুর উপর দৈত্যদ্বয়ের মস্তক রাখিয়া চক্রদ্বারা ছিন্ন করিলেন।

মধ্যম চরিতে মহিষাসুরের যুদ্ধ। এই খণ্ডের স্তবটীকে কাব্য হিসাবে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি। কিন্তু এই খণ্ডের তিনটী অধ্যায়ই চণ্ডী গ্রন্থের তেরটী অধ্যায়ের মধ্যে কাব্যাদর্শে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চমৎকার চিত্র-সৌন্দর্য্য, রসবৈচিত্র্য, ছন্দ ও শব্দের চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য হিসাবে এই তিনটী অধ্যায়ের সঙ্গে তুলনায় যোগ্য কেবল ৮ম অধ্যায়টী—যাহাতে রক্তবীজ বধ বর্ণিত হইয়াছে। নিখিল দেব দেহ-জাত চণ্ডিকার আবির্ভাব এক অপূর্ব্ব অতুলনীয় ব্যাপার। কিন্তু এই সব বিষয় যুক্তি-গত সমালোচনার গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ ইহা মানুষের প্রাকৃত-জ্ঞানাত্মক কল্পনা-প্রসূত নহে। ধ্যানযোগারূঢ় ঋষি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি-শক্তিলাভ করিয়া স্থূল প্রপঞ্চাতীত যে ভাগবতী-লীলা-নিবহ দর্শন করিয়াছেন তাহাই, অতি সহজ সরল সুন্দর ও সতেজ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া এই সব গ্রন্থের আলোচনা করা উচিত। ইহা প্রাকৃত রচনা নহে। মিল্টন্ যে শক্তিতে Paredise Lost লিখিয়াছেন, মাইকেল যে শক্তিতে মেঘনাদ বধ কল্পনা করিয়াছেন, চণ্ডীর ঋষির শক্তি সে সমস্ত হইতে অনেক উচ্চ উপাদানের। Shakespeare যে শক্তি-প্রভাব Hamlet, Othello লিখিয়াছেন সে শক্তি হইতেও ঋষির শক্তি অনেক শ্রেষ্ঠ। হোমর, ভার্জ্জিল, সেক্ষপীর, মিল্টন কেহই এই প্রাকৃত জগৎ অতিক্রম করিতে পারেন নাই—দান্তেও নয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকার ঋষিগণের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় এই স্থূল জগৎ অতিক্রম করিতে পারিত। তাঁহাদের দিব্য-দৃষ্টি ছিল, এ যুগেও বহুলোকে দিব্য-দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণ ও গোস্বামিগণের যুগও বহুকাল অতীত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বাবা গম্ভীরনাথ, ভোলাগিরি, বামা ক্ষেপা, শ্রীরাধারমণ-চরণদাস বাবাজী প্রভৃতি অবতার-কল্প মহাপুরুষগণ সকলেই, এই স্থূল জগতের অন্তরালে যে এক অসীম অনন্ত সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় জগৎ আছে, তাহা দর্শন করিয়াছেন এবং ইঁহারা ঐ জগতে ইচ্ছানুসারে প্রবেশও করিতে পারিতেন।

ইঁহারাও প্রচার করিয়া গিয়াছেন :—

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা।
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ
বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

যাহা হউক—চণ্ডীর আবির্ভাব বিবরটী অশেষ কাব্য-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। ইহাতে একদিকে যেমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, অন্যদিকে তেমনি বিশালতা ও বিচিত্রতা আছে। মিল্টন্ও এমন জিনিষ কল্পনা করিতে পারিলে গৌরব অনুভব করিতেন। মহিষাসুরের সৈন্য সজ্জা এক প্রকাণ্ড কাণ্ড। ধারণা করিতে কল্পনা অভিভূত হইয়া যায়। তারপর মহিষাসুরের যুদ্ধ। ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। দোর্দ্দণ্ড দানব-শক্তির সহিত আদ্যা-শক্তির প্রচণ্ড সংঘর্ষ। মহিষাসুর মুহূর্ত্তে সমগ্র পৃথিবী বিমর্দ্দিত ও বিধ্বস্ত করিবার শক্তি ধারণ করে। সেই মহিষাসুর ক্রোধোন্মত্ত হইয়া চণ্ডিকার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত। দুর্দ্দমনীয় বেগে অসুর ইতস্ততঃ ছুটিতেছে। শৃঙ্গের দ্বারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিতেছে। খুরের আঘাতে পৃথিবী তলে স্থানে স্থানে গভীর গর্ত্ত হইয়া যাইতেছে। তাহার সবেগ-ভ্রমণ-জনিত বাত্যাঘাতে ধরণী বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বিশাল লাঙ্গুলাহত সমুদ্র বারি আলোড়িত হইয়া চারিদিক প্লাবিত করিতেছে! সশৃঙ্গ মস্তক ঘনঘন আন্দোলিত হইয়া নভোমণ্ডল-সঞ্চরমান মেঘসমূহ খণ্ড খণ্ড ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। সঘন নিশ্বাস-পতনোত্থিত ঝঞ্ঝাবাতে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল উৎপাটিত হইয়া যাইতেছে। এইরূপে মহিষাসুর যুদ্ধ করিতেছে। এই যে বর্ণনা, ইহার কোথাও এতটুকু প্রয়াস নাই। সমস্তই শান্ত ও সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শব্দ-বিন্যাস সরল ও প্রাঞ্জল। যথা—

সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুর-ক্ষুণ্ণ-মহীতলঃ
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ।
বেগ ভ্রমণ বিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত
লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ।
ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ। ৩,২৫-২৭

মহিষাসুরের যুদ্ধে একটা বিরাট শক্তির উন্মত্ত তাণ্ডব-লীলা রহিয়াছে। Sublimityর এর চেয়ে বড় উদাহরণ পাওয়া সুকঠিন। মহিষাসুরের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে যে তাহার সৈন্য সজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ তাহাতে এমন দুই একটা উৎকট ব্যাপার আছে যাহা মহিষাসুরের নিজের যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর। যথা—

কবন্ধা যুযুধুর্দ্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্য-লয়াশ্রিতাঃ।
কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টি পাণয়ঃ
তিষ্ঠতিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ। ২,৬৩-৬৪

কতকগুলি অসুরের মস্তক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবু তাহারা ভয়ঙ্কর অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া উন্মত্তভাবে যুদ্ধ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তূর্য্যধ্বনির তালে তালে নৃত্য করিতেছে। কেহ কেহ দাঁড়া—দাঁড়া বলিয়া দেবীর প্রতি তাড়াইয়া যাইতেছে। মস্তক-বিহীন দানবের যুদ্ধ এবং তূর্য্যধ্বনির তাল-সংযোগে নৃত্য! ইহার চেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য সাহিত্যে বিরল!

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে। এইবার বক্তব্য সংক্ষেপ করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

(১১)

চণ্ডীতে যে মহা-সংগ্রামের বর্ণনা আছে তাহার এক পক্ষে মহামায়া অন্য পক্ষে অসুরবৃন্দ। এই মহাকাব্য যদি সাধারণ প্রতিভাবান্ কবির রচনা হইত, তবে ইহাতে অসুর-চরিত্র সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা থাকিত। তাহাদের অসুরত্ব জ্ঞাপক বিবিধ শব্দ বিন্যাস ইহাতে পাওয়া যাইত। কিন্তু চণ্ডীতে তাহার কিছুই নাই। দুষ্ট বা দুষ্টাত্মা কথাটার দুই একবার প্রয়োগ আছে মাত্র। ঋষি কোথাও অসুরদের প্রতি অসম্মান করেন নাই। নিন্দা-ব্যঞ্জক কোন কথাই বলেন নাই। দৈত্যেন্দ্র, দৈত্যরাজ, প্রভৃতি বলিয়াই শুম্ভাসুরের উল্লেখ করিয়াছেন—এবং রাজার যোগ্য শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া "নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতং"—এই ভাবের কথা যে প্রকৃত সহানুভূতি-সূচক তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

তার পর অসুরদের অনেক গুণও ঋষি প্রদর্শন করিয়াছেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের মধ্যে ভ্রাতৃ-ভাবটী মানবেরও আদর্শ। 'স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা' অতুলনীয় রূপ লাবণ্যবতী রমণীর কথা যখন চণ্ডমুণ্ড আসিয়া শুম্ভকে জ্ঞাপন করিল, তখন শুম্ভ এ কথা কহিল না যে—"আমিই সে রমণীকে চাই"। মানুষ হইলে অবশ্য তাহাই বলিত। কিন্তু শুম্ভ ভ্রাতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে নিজের মত দেখে। তাই দূতমুখে বলিয়া পাঠাইল—

মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি ! রত্নভূতাসি বৈ যতঃ। ৫।১১৩

'আমাকে বা আমার ছোট-ভাই নিশুম্ভকে ভজনা কর।" এতটা সৌহার্দ্দ সংসারে বিরল—বিশেষতঃ যেখানে নারী সম্পর্কীয় ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীতে দেখা যায়—এক এক জন অসুর অকাতরে অসঙ্কুচিত-চিত্তে প্রভুর জন্য প্রাণ দিতেছে। ঋষি অতি সুন্দররূপে এ সমস্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাহাদের যদি এত গুণ তবে তাহাদিগকে অসুর বলা হইবে কেন? হাঁ—তবু তাহারা যে অসুর—বাস্তবিক নিঃসন্দেহে অসুর, একটীও বাক্যব্যয় না করিয়াও ঋষি তাহা দেখাইয়াছেন।

অসুরেরা মহামায়াকে প্রথমে সামান্যা নারী বলিয়াই মনে করিল। ইহা অবশ্য স্বাভাবিক। নারী হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে চায়! ইন্দ্রাদি দেবগণ যাহাদের সম্মুখীন হইতে সাহস পায় না! স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল যাহাদের ভয়ে কম্পমান! তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ নারীর! নারীর পক্ষে বাতুলতা নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই সামান্যা রমণী এক দণ্ডে ধূম্রলোচন ও ধূম্রলোচনের নেতৃত্বাধীন সহস্র সহস্র অসুর বিনাশ করিলেন। দৈত্য-রাজ অবশ্য সংবাদ পাইল। সংবাদ পাইয়া শুধু ক্রোধ করিল। চণ্ড-মুণ্ডকে সেনাপতি করিয়া আরও শত সহস্রগুণ সৈন্য পাঠাইল—রমণীকে শাস্তি দিবার জন্য। একবারও কিন্তু ভাবিল না—একা স্ত্রীলোক কেমন করিয়া এত সৈন্য বধ করিল! এ কথা কাহারও মনে হইল না। চণ্ডমুণ্ড যুদ্ধে আসিল। দেবীর দেহ হইতে করাল-বদনা বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নর-মালা-বিভূষণা মহাকালী আবির্ভূতা হইয়া লক্ষ সৈন্য হস্তী অশ্ব রথ গ্রাস করিয়া চণ্ডমুণ্ডর শিরশ্ছেদন করিলেন, সংবাদ অবশ্য দৈত্যরাজের কাছে গেল। দৈত্যরাজের কি কিছু চৈতন্য হইল? কিছু না। দৈত্য-রাজ কি অন্য কেহ কোনো বিস্ময় প্রকাশ করিল না। কোনো প্রকার ভীতি-প্রদর্শন করিল না। দৈত্যেন্দ্র মহা সমারোহে রাজ্যের সমস্ত সৈন্য সমস্ত সেনানায়ককে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইতে আদেশ দিল। রক্ত-বীজ রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। এক রক্তবীজের রক্ত হইতে শত সহস্র রক্ত-বীজ জন্মিতে লাগিল। দেবীরা চারিদিক হইতে রক্তবীজের দেহে অস্ত্রাঘাত করেন, অজস্র রক্তপাত হয়, সহস্র সহস্র অবিকল রক্তবীজের মত অসুর জন্মে। দেবগণ দেখিলেন আর উপায় নাই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যায়! রক্ত মাটীতে পড়িলেই অসুর জন্মে। দেবী মহাকালীকে আদেশ করিলেন—"চামুণ্ডে! তুমি বদন বিস্তার করিয়া লোল-রসনা প্রসারিত কর। রক্তবীজের সমস্ত রক্ত পান কর দেখ, যেন এক বিন্দুও মাটীতে না পড়ে।" এই উপায়ে রক্তবীজের সংহার হইল। তবুও শুম্ভাসুরের জ্ঞান হইল না। তবুও একবার ভাবিল না এই রমণী কে? এ যাহা করিতেছে ইহা ত দেব মানব যক্ষ রক্ষ কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। কে এ রমণী? কে এ দেবী! এ কথা শুম্ভ নিশুম্ভ কেহই চিন্তা করিল না। যুদ্ধই করিতে লাগিল।

ইহারা যে অসুর তাহার প্রমাণ এইখানে। ইহারা শুধুই ক্রোধের বশীভূত। সম্পূর্ণরূপে বিচার-শক্তি বিরহিত। ইহাদের মানস-দৃষ্টি শুধু এক দিকে প্রেরিত। চারিদিক পর্য্যালোচনা করিবার শক্তি ইহাদের নাই। একা রমণী লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রবল-পরাক্রান্ত যুদ্ধ বিশারদ অসুর সৈন্য বিনাশ করিল—ইহা দেখিয়াও তাহাদের মনে কোন যুক্তি, বিচার চিন্তা, ভাবনার উদ্রেক হইল না। ইহাই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক অন্ধতা। ইহারা পরিপূর্ণ-রূপে সত্ত্বগুণবিবর্জ্জিত। ঋষি এ সব বিষয়ে কোনো কথাই বলেন নাই। কিন্তু তাহাদের যে কার্য্য ও স্বভাব দেখাইয়াছেন, তাহা হইতেই ইহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইহারা অসুর ইহা নিশ্চয়! কিন্তু মানুষের মধ্যে যে সব অসুর আছে, ইহারা তাহাদের মত অত কুৎসিত অত ঘৃণিত নয়! ইহারা বীর, ইহারা তেজস্বী, ইহারা স্থির-সংকল্প। ইহারা নির্ভীক, ইহাদের অন্তরে বাহিরে এক ভাব; ইহাদের চিত্তে ক্ষুদ্রতা নাই। কয়জন মানুষের এ সব গুণ আছে! এদিকে মানুষের ছলনা প্রবঞ্চনা স্বার্থ-পরতার ত ইয়ত্তাই নাই। মানুষ যেমন ক্ষুদ্র তেমনি নৃশংস, স্বার্থপর। পৃথিবীতে প্রতি দিন কতগুলি নর-হত্যা - কতগুলি নারী হত্যা—কতগুলি জীব হত্যা হয়? অসুর চরিত্র অপেক্ষা মানব-চরিত্র অনেক জঘন্য—অনেক কদর্য্য! কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রকৃত মানুষও আছে—দেবতাও আছে! তাই এ সৃষ্টি চলিতেছে! নতুবা দেবীকে ঘন ঘন অবতার গ্রহণ করিতে হইত।

এ প্রবন্ধ এইখানে শেষ করিলাম। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমার মতামতের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিলে কৃতজ্ঞ হইব। শাস্ত্রজ্ঞদিগের নিকট হইতে আমরা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির সমালোচনা শুনিতে ইচ্ছা করি। অজ্ঞ লোকের অনধিকার-চর্চ্চা দেখিয়া বিজ্ঞগণ যদি রাগ করিয়াও এ সব সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লেখেন তবে আমরা খুব আনন্দিত হইব।

জড়-জগতের জ্ঞান ব্যতীত পাশ্চাত্য জগৎ আমাদিগকে আর কোন জ্ঞান দিতে পারে না। অধ্যাত্ম-জগৎ সম্বন্ধে তাহারা যাহা কিছু বলে—সমস্তই কল্পনা ও অনুমান। তাহারা তত্ত্ব সকল দর্শন করিতে পারে না। তাহাদের সে সাধনা, সে তপস্যা নাই।

তত্ত্ব চিন্তায় যাহারা য়ুরোপে সব চেয়ে অগ্রগণ্য—সেই কাণ্ট হেগেল প্রভৃতি সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। অধ্যাত্ম ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সীমাহীন সমুদ্র সংস্কৃত শাস্ত্র। সেই জ্ঞানের প্রচুর প্রচার আবশ্যক। ভারতবর্ষের জাগরণের ও উত্থানের ইহাই সর্ব্ব প্রধান উপায়। যাঁহারা মনে করেন হিন্দু শাস্ত্র মানুষকে স্বপ্ন দেখা শিখায়—তাঁহারা ভ্রান্ত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনুষ্যত্ব লাভের যাহা উপায়, প্রণালী ও প্রেরণা তাহা হিন্দু শাস্ত্রে আছে। হিন্দু-শাস্ত্র একটী প্রকাণ্ড বিদ্যুতাধার যন্ত্র। ইহাতে বিশ্বোদ্ভাসী জ্ঞানের বৈদ্যুতিক আলোকও যেমন আছে—দুর্দ্দমনীয় প্রাণ-শক্তি-সঞ্চারকারিণী বৈদ্যুতিক শক্তিও তেমনি আছে। আমরা অন্ধ, ইহার সন্ধান জানি না।

চণ্ডী গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু সামান্য আলোচনা করিলাম, তাহা উচিত কি অনুচিত হইল—জানি না। এই গ্রন্থ দেবীর বিগ্রহস্বরূপ, ইহার সম্বন্ধে কোনো কথা বলিতে ভয় হয়। মহামায়া করুণাময়ী। আমার যদি কোনো অপরাধ হইয়া থাকে তবে ক্ষমা করিবেন—এই ভরসা।

জননীর পাদ পদ্মে আমার কোটি কোটি নমস্কার।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

রাজদ্রোহ ও আইন লঙ্ঘন

শ্রীবিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গবর্ণমেন্ট থাকার দরকার কি?

স্বেচ্ছাতন্ত্র থেকে জগতের সবচেয়ে সুশৃঙ্খল বন্দোবস্তের প্রজাতন্ত্রটী পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে তলে তলে এক মতলবের ফিকির চলচে—

"কেমন করে সাধারণের চেয়ে প্রবল একটা শক্তিকে এই মানুষেরই অবাধ স্বাধীনতার বুকের ওপর চাপিয়ে রেখে বসে থাকা যায়?"

—অথচ কি আশ্চর্য্য কথা!

এ পর্য্যন্ত যত রাজনৈতিক অভ্যুত্থান এই পৃথিবীতে হয়ে গেল, সমস্তেরই লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা লাভ। প্রজার চির সংগ্রামে মূল লক্ষ্যই হল—স্বাধীনতা। Freedom, the greatest of political goods.

তাই ত বলচি—এ ক্ষেত্রে হঠাৎ সিদ্ধান্তে শেষ কথা দাঁড়াতেই হবে যে, গবর্ণমেন্ট একটা কুসংস্কার। আইন আদালত মামলা মোকর্দ্দমা ওগুলো কদাচার। সৈন্য শান্তিরক্ষক পুলিশ মোতায়েন রাখা জঘন্য প্রথা। ওগুলোর বালাই যত শীঘ্র সম্ভব দেশ থেকে উঠে যাওয়াই মঙ্গল।

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় উষ্ণ মস্তিষ্ক হয়ে বাংলায় এ কথা লিখচি না। তাজা ইয়োরোপীয়ান ভাব সঙ্কলন করেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করেচি। আমার অধ্যাপক, বিখ্যাত ইংরাজি লেখক ব'রট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) মহোদয়। ইয়োরোপ রিপাবলিক্ প্রতিষ্ঠা করে রাজার মাথাই কাটুক, আর অভিজাত কুল সবংশেই ধ্বংস করুক, তার প্রজাতন্ত্রের মূর্ত্তি এখনো পূর্ণাবয়ব হয়ে ওঠেনি। সেই সব ইতিহাস বিখ্যাত বিপ্লব শান্ত হবার পরেও ক্রমে আরও মানসিক ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত অনেক হয়ে গেছে। তাদের ভাব-জগতে এখনও সেই জনশক্তি সেই মতই উন্মত্ত হয়ে স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! চীৎকার তুলে নৃত্য কর্চে!—এখনো সেখানে with uproar and overthrow প্রতিষ্ঠিত হচ্চে কমিউনিজম্-শুধু তাই নয়, আনার্কিজম। এখনো সেখানে সিংহাসন ভাঙ্গচে! নিয়ম বদলাচ্চে! বিধান উল্টোচ্চে! তারি একটুখানি রস আমি বাংলা পাঠকগণকে পরিবেশন কর্চি মাত্র। আর কিছুই নয়।

—সকলেরই জানা দরকার যে গবর্ণমেণ্টের মারফৎ যে শক্তিটা সাধারণের ওপর প্রযুক্ত হয়ে থাকে, তার বাহির হয়ে আসবার দুটো বিভিন্ন পথ আছে; একটা আইন আদালত ফৌজ পুলিশ সমেত সদর দরজায়; অর্থাৎ রাজকোষ স্কন্ধে পতিত হতভাগ্যের সাক্ষাৎ ভাবে গ্রেপ্তার বিচার—বিচারের অপেক্ষা না করেই আটক নির্ব্বাসন ইত্যাদি; অপর পথটা চোরা, তাতেও, আইন ফৌজ সমস্তের বল থাকে—কিন্তু, গৌণভাবে। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট সে পথ ধর্লে, আর্থিক ব্যবস্থাটা দেশের সমস্তই সেহেতু, গবর্ণমেণ্টের হাতে।—রাজশক্তির রোষ শনিগ্রস্ত ব্যক্তি, এমন কি সম্প্রদায় পর্য্যন্ত, সরকারী করুণার অভাবে economic pressureএর যাঁতাকলে পড়তে পারে। তার পর তার হাড় মাস পর্য্যন্ত গুঁড়ো করে ফেলা কিছুই নয়

Anarchism প্রথমোক্ত সদর দরজায় গিয়ে হানা দিয়ে বলে—থামো। Communism শেষোক্ত চোরা পথটাকে বুজিয়ে একেবারে প্রাচীরের গাঁথুনী তুলতে চায়। মোট এই দুইটী নব তন্ত্রের কলা কৌশল গত এক শতাব্দী ব্যাপী চেষ্টায় ইয়োরোপের জনসাধারণের হাতে তৈরী হয়ে উঠেচে, যাকে ব্যবহারযোগ্য করে নিয়ে সেখানকার জনশক্তি আজ আপনার মূর্ত্তিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে! আজ সেখানে সমাজ ধর্ম্ম রাষ্ট্র সমস্তেরই প্রতিভূ হয়ে দাঁড়াতে চায়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য নহে,—শূদ্র (proletariat)!

বোধ হয় আমাদের পক্ষেও তাদের মত এবং পথ সম্বন্ধে আলোচনা শূদ্রের বেদপাঠের মত প্রাণদণ্ডার্হ হবে না। কমিউনিজম্ এবং আনার্কিজমের জন্মদাতারা কেহই বর্ত্তমান বাংলার বোমাওয়ালার কিংবা ভারত সীমান্তের বলশেভিকের দলের মেম্বর ছিলেন না। কার্ল মার্কস, যিনি কমিউনিজমের চাঁই তিনি জাতিতে ইহুদী। জন্মিয়াছেন জার্ম্মাণীতে বটে; কিন্তু সেই ১৮.৮ খৃষ্টাব্দে। আনার্কিজমের প্রবর্ত্তক মাইকেল বাকুনিন রাশিয়ান হলেও তাঁরও জন্ম সেই ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ। দুইটা মতই আজ পর্য্যন্ত ফ্রান্স ইংলণ্ড আমেরিকায় পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত। বিশেষতঃ কমিউনিজমের মন্ত্রদ্রষ্টা মার্কস ও আঙ্গেলস্ কেহই গ্রেট ব্রিটেনের সীমায় এসে বাস কর্লেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত নন। তাঁরা

দুজনেই বরং জীবনের প্রথমে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সোশিয়ালিষ্ট দলভুক্ত বলে গণ্য হয়েছিলেন।

কেন ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা থেকেও সোশিয়ালিষ্ট মত বিস্তৃত, কেন বা সেথানে শ্রমশক্তি জাগ্রত ? কি জন্য বা অত্যাচারী এই অপবাদে রাজমুণ্ড উড়িয়ে যে অনবদ্য শাসনতন্ত্রটী সে দেশে প্রতিষ্ঠিত হলো, দেখতে দেখতে তারই অধীনস্থ নিঃসহায় দরিদ্র শ্রমজীবী তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান কর্ল—সে কেনর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাক্, তার চেয়ে অনুসন্ধান করে কি সে আবহাওয়া যার মধ্যে এমন জিনিষ গজিয়ে উঠতে পারে ? গবর্ণমেন্টের রাইফেল উদ্যত পাহারা ছিল, রাজপথে কামানের লটবহর ছিল, তাদের সমস্তকেই সন্ত্রস্ত করে রোজ আনলে তবে কুটীর-চুল্লি জ্বলে সেই মজুর কোন্ বুকের বলে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পেরেচে !—বিগত পঞ্চাশ ষাট বর্ষে নিজেদের একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ভাবে খাড়া করে কেমন করে তারাই একটা শক্তিতে পরিণত হল ?

একটু ইতিহাসের আলোচনা এসে পড়বে। ইতিহাসের সেই অধ্যায় উন্মুক্ত কর্ত্তে হবে–যাতে মধ্যযুগের ইয়োরোপে কেমন করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়ে সেই নৃপতি অভিজাতবর্গের রক্তে বিধৌত জাতীয়তার মন্দিরে জ্ঞান বিজ্ঞানময়ী বর্ত্তমান ইয়োরোপ গড়ে উঠল তাই লেখা আছে। অতীতের Feudal সভ্যতাকে গ্রাস করে একেবারে নূতন মূর্ত্তিতে জাতিকে গড়ে তুলতে সেদিন যেন ইয়োরোপের নূতন যুগ এসে হাজির হয়েছিল। সে যুগের বিদ্যামন্দিরে নব্য দর্শন-বিজ্ঞানের জন্ম। ধর্ম্মমন্দিরে যাজকের প্রভুত্ব গিয়ে যুক্তি ও নীতির প্রাদুর্ভাব। কর্ম্মশালায় প্রভূতবল যন্ত্রপাতি স্তূপীকৃত হয়ে ওঠা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিষ। তারই ভেতর ধরা পড়বে সেই মনোভাব, যার অভ্রংলিহ দুরাশা, প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে, বাকি সমস্ত জগৎটাকেই গ্রাস কর্ত্তে চায়। অবশিষ্ট বিশ্বজোড়া মনুষ্যজাতিকে নিরন্ন নির্বীর্য করে শ্বাসটুকু পর্য্যন্ত রুদ্ধ কর্ত্তে যায়।

কিন্তু আজ দেখা যাচ্চে সেই শক্তি যত বড়ই তৈরী দেখাক, তাহার উঠে দাঁড়াতে আসল বল যুগিয়েছিল সর্ব্ব নিম্নের সম্প্রদায়। অর্থাৎ যারা পরিশ্রমে ধরণীর ধন বাড়ায়—স্ফূর্ত্তিখেলার ফাঁকিবাজিতে নয়। যারা সন্তান সন্ততি দিয়ে রাষ্ট্রের রক্ষা করে—চাল চেলে আপন মাথাটা বাঁচিয়েও নয়। সেই proletariat. স্বাধীনতার মন্ত্রে গণশক্তি মাতিয়েই ইয়োরোপের বর্ত্তমান রাষ্ট্রতন্ত্র আপনাকে গড়ে নিয়ে তারপর যার কল্যাণেই আত্মনিয়োগ করুক, সেই গণ মনও কিন্তু নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ঘুমিয়ে না পড়ে সেই স্বাধীনতার ভাবে জেগেছিল। রক্তপাত দুর্ব্বহ কষ্ট স্বীকার তাদের যথেষ্টই কর্ত্তে হয়েচে—তবে দেশের বিপ্লবোত্তম কৃতকার্য্য। সুতরাং রাজা ও রাজানুগৃহীত অভিজাত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর সমাজ-জীবনের ওপর কি চমৎকার নব প্রভাত হয়, সেটা দেখবার আগ্রহ আজও পর্য্যন্ত তাদের বিলক্ষণ সজীব। বরং উন্নতির রশ্মি ইয়োরোপে আজ যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মুঠোর ভিতর আছে, যারা উন্নতিকে পেয়েছে বটে–এমন নিতান্ত রূপেই পেয়েছে যে উন্নতির ভূত প্রেতাবিষ্ট করে তুলেচে বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তারা অপর আর এক দিক দিয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে শূন্য হয়ে পড়েচে। তাদের সৌভাগ্য প্রভুত্বের সীমা নেই ; ঐশ্বর্য্যের উপমা নেই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কবে যে তাদের মাঝখান থেকে সরে পড়েচে, সেটা আর রাজশক্তি বণিক-শক্তির মিলিত গর্ব্বে মনীষীর প্রখরতায় ধাঁধাঁনিতে সম্প্রদায় হিসাবে তারা সম্যক বুঝে উঠতে পার্চে না। কিন্তু এই দরিদ্র সম্প্রদায় তাদের চেয়ে আজ প্রাণবন্ত। যেন ইয়োরোপে তারাই আজ মানুষের প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছে।

তারাই বজ্রস্বরে ধিক্কার ধ্বনি তুলেচে—you bourgeoisie !

তাদেরই চোখে আজ ধরা পড়েচে যে মনুষ্য-প্রকৃতির হীনতায় ঢেকে ইয়োরোপের স্বাধীনতা ভাবের অপব্যবহার বাস্তবেও ভয়াবহ exploitation হয়ে দাঁড়িয়েচে।

যে ভাবগঙ্গা প্রপাত-বেগে সেই ফিউডাল (feudal) প্রথাকে ভাসিয়েছিল bourgeoisie নূতন শাসক সম্প্রদায় তার সমস্ত প্রেরণাই হারিয়ে ফেলেচে। সেই তাদের progressiveness এখন একটা কিম্ভূতকিমাকার অত্যুক্তি !

সেই ফিউডাল যুগে রাজসেবাই ছিল কেবলমাত্র সমাজে ভদ্রভাবে মাথা তুলে দিনাতিপাত কর্ব্বার মত জীবিকা ; তাই জনসাধারণের মধ্যেও যার বিদ্যা আছে সে বিদ্যাবলে, যার বুদ্ধি আছে সে বুদ্ধিবলে, যার শৌর্য্য আছে সে আপনার বীরত্ব প্রদর্শনে এইভাবে কে কি উপায়ে রাজাকে পরিতুষ্ট করে প্রিয় অনুচর হয়ে উঠবে তারই চেষ্টায় পরস্পর প্রতিযোগিতা চলত। রাজাও আপনার প্রসন্নতার তারতম্যানুসারে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন ব্যক্তিদের যথাক্রমে উচ্চ পদস্থ রাজ-সম্মান বণ্টন করে আপনার সেবাধিকার দিয়ে সমাজে অভিজাত-শ্রেণীর ছত্রিশ জাতি পরিবৃত হয়ে বাস কর্ত্তেন। রাজসেবায় উৎসাহী মিত্রভাবাপন্ন বশীভূত জাতিগণ রাজপুত্রগণের ঠিক নিম্নবর্ত্তী থাকের সম্মান ও প্রভুত্ব—Dukedom পেতেন। তার পর পরে পরে—Marquise Earl Viscount Baron Knight প্রভৃতি করে রাজার সঙ্গে সম্পর্কের ধাপ্ নেমে চলত ; দেশমধ্যে তাহাই ছিল সামাজিক বর্ণাধিকার। এই অধিকারভ্রষ্ট ইতর প্রজাকে serf বলে পরিচিত হয়ে অভিজাতদিগের সম্পত্তি স্বরূপ তাঁহাদেরই আজ্ঞাধীন জীবন যাপন কর্ত্তে হত। এইভাবে ফিউডাল যুগে ইয়োরোপের সম্রাট ও নৃপতিগণের সভামণ্ডপ যোদ্ধার বর্ম্মের ঝঞ্ঝনা ও সুন্দরীর অলঙ্কার শিঞ্জিনীতেই মুখরিত হয়ে উঠেছিল। মানুষ মনোরাজ্যে chivalrous idea নিয়েই মেতেছিল—প্রাণের চেষ্টাও তখন দস্যু লুণ্ঠন শৌর্য্য প্রদর্শন ও সাধারণ serfদের ওপর প্রভুত্ব করাতেই ব্যস্ত হয়ে থাকত। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে সেথানে কবে কে জানে আস্তে আস্তে একটা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তৈরী হয়েও উঠেছিল। তারা serf নয় অভিজাতও নয়। অর্থাৎ একের মত নিষ্পেষিত কিংবা অপরের মত প্রশ্রয়প্রাপ্ত এই দুইটা ভাগ্যের কোনওটা বিধাতা তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করেন নি।

জগতের বিবর্ত্তনের সঙ্গে এরাই ফিউডাল যুগের ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠল। এদের প্রাণে জাগ্রত হল progressive ভাবময়ী নূতনের অদম্য প্রেরণা। যে মাথার ওপরকার অভিজাত দল আপনাদের প্রতি বাধ্যতা ও দাস্য ছাড়া নিম্নস্তরের মানুষের প্রাণে অপর কোনও ভাব

আশা আকাঙ্ক্ষা বা রুচি জাগতে পারে স্বপ্নেও কল্পনা কর্ত্তে পার্ত্ত না, তাদের, এরাও আপনাদের জীবনের ওপর দারুণ চাপ, আপনাদের অদৃষ্টদেবতার পায়ের অক্লায় শৃঙ্খল বলে অনুভব কর্ত্তে লাগল। সেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যে অভিজাত সম্প্রদায় যে অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রাণ মন দেহের ওপর দাবী কর্চে সেটা প্রকৃতির নিয়মের বাইরে। সেটা অত্যাচার। তারা যে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বলে দম্ভ কর্চে বাহুবলটাকে গৌরবের করে তুলেচে সেটা অসম্ভোচিত! যে প্রবৃত্তি তাদের অপর সম্প্রদায়ের শীর্ষে রাখতে পরের বিত্তকে অবাধে কেড়ে ক্ষমতাশালী হয় সেই প্রবৃত্তিটাই তাদের শ্রেষ্ঠ মৃত্যুযোগ্য অপরাধ। রাজভক্তি বলে তাদের মনে কিছু রইল না। এতদিন যারা সমানে প্রভুত্ব চালিয়ে এসেছে, তাদের প্রভাবের ওপর সম্মান বলতেও কিছু রইল না। আইনের মর্য্যাদাও তারা কিছু রাখলে না। রাজশক্তির বিসম্বাদী মতবাদে সুগঠিত পন্থা পদ্ধতি নির্ণয় করে তারা গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর্ল। তাতে প্রচণ্ডবেগে নাড়া পেয়ে ফিউডাল ধর্ম্ম উৎপাটিত হয়ে আটলাণ্টিক ও ভূমধ্য সাগরের জলে তলিয়ে গেল।

এই বিপ্লবপন্থীদের হাতেই বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতা রাজতন্ত্র সমস্তেরই জন্ম ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটেচে।

কিন্তু তাদের নিম্নস্তর যারা সেই বিপ্লবের পূর্ব্বে serf বলে পরিচিত ছিল তাদের সঙ্গে এদের তখন থেকেই কি সম্পর্ক এবং কি দেনাপাওনার হিসাবের জের চলেচে—তাই আলোচনা কর্ত্তে কর্ত্তে আমরা কথার স্রোতে এতদূরে ভেসে এসেছি সেটা ভুললে চলবে না। আর তারা এখন serf নয়। পরাধীনতার যুগে তাই ছিল বটে। স্বাধীনতার দিনে নয়। তারাও যে স্বাধীনতার পথ অনেকখানি তৈরী করেছিল। আজ স্বাধীন জীবনের পথে মানুষের মুক্তির অভিমুখে যাত্রায় তাদের পথের দাবীর পরিমাণ সামান্য নহে।

মানুষের মুক্তি বলতে এখন এই বোঝাবে—যে জীবনের বিকাশ ও ভোগের অধিকারে অব্যাহত সর্ত্ত। তাকেই দোবার জন্যে কল্পিত গবর্ণমেণ্টকে Democracy বলব।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাধীনতার মন্ত্র কাণে দিয়ে এদের যেদিন বিপ্লবের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেচে, সে দিন এরা শুনেছিল যে, অতঃপর যখন দেশে democracy প্রতিষ্ঠিত, তখন সকল মানুষই সমানে বাঁচবার ও বাড়বার অধিকার পাবে। কিন্তু বাস্তবে মধ্যযুগের serfdom উ'চিয়ে তারা অতিরিক্ত কি পেয়েচে?

তখন অত্যাচারে অত্যাচারে তাদের হাড়মাস কালি হয়েছিল; এখন দেখা যাচ্চে যে, বাহ্যতঃ তেমনি অত্যাচার বন্ধ হয়েচে বটে, কিন্তু এ কি! এমন বিপর্য্যয় জিনিষ কোথা থেকে এল? তখন ধর্ম্মের দোহাই ছিল, রাজসেবার বাধ্যতার কাছে মাথা বিক্রী ছিল; তারই অজুহাতে যেমন তাদের ওপর exploitation চলত—তেমনিই ত বজায় আছে। এখন সাদা চোখে চামড়া ঘুচিয়েই তা আরম্ভ হয়েচে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ত যায় নি! এই ত সেদিনের কথা, কিন্তু যন্ত্রপাতি কলকব্জা জোড়াতাড়া দিয়ে এ কি বিপর্য্যয় চাপ, বুকের ওপর চেপে বসল? যন্ত্র-রাক্ষসের ক্ষুধা মিটোতে জগতের হাটের বিপুল পণ্য যে শুধু চাই তা তো নয়? তাদের কণ্ঠে তৃষ্ণাও যে ভয়ঙ্কর প্রখর! ইয়োরোপ Democracy খাড়া করে এই লাভ কর্ল যে তার বিশ্বজোড়া ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কর্ম্মশালায় পণ্যপ্রসূ যন্ত্র দানবের তৃষ্ণা মিটোতে যে নিয়ত মানবরক্তের যোগান চাই, তাই দিতে বর্ত্তমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত bourgeoisie সম্প্রদায় দেশের দরিদ্র সম্প্রদায়কে চিরদারিদ্র্য শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে বাধ্য।

দেখা যাচ্চে যে ক্ষমতাবানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জিনিষটা যতদিন আছে ততদিন পর্য্যন্ত অক্ষমের প্রতি অত্যাচার দূর হবার নয়। তখন রাজার জীবন্ত কর যে ক্ষমতা বহন কর্ত্ত, এখন টাকার কল্পিত প্রভাব সেই ক্ষমতার শতগুণ ক্ষমতায় স্ফীত হয়ে উঠেছে। যে ধনী capitalist মূলধন জমিয়ে বর্ত্তমান উন্নত প্রথায় প্রতিষ্ঠিত কলকারখানার মালিক হয়ে দাঁড়াবে—শ্রমিক যাতে ক্রীতদাসের চাইতেও হীন অর্থাৎ পশুবৎ হয়ে তার পদলীন থাকে তারই ব্যবস্থা তাকে না কর্লে নয়। মানুষের অসাধ্য কষ্টে পরিশ্রমে অগ্নিতাপে বাষ্পস্নানে ঝল্‌সে সারাদিন মেসিন চালিয়ে খাটতে কিংবা মিল ফ্যাক্টরীর বস্তিতে মৌচাকের পরিশ্রমী মক্ষিকার মত জীবন যাপন কর্ত্তে কে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও আপনার ইচ্ছামত চলবার মত পথ থাকতে স্বেচ্ছায় সম্মত হয়ে থাকে? তাদের সম্মত করাবার জোর ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতা একের প্রতি অন্যের বলপ্রয়োগ অত্যাচার বলে ঘোষণা করেছে। জোর এখন কেউ কারোর ওপর কর্ত্তে পারে না। উপায় স্বরূপ তাই এমন ধারা বাজারের অবস্থা দাঁড় করান নিতান্ত প্রয়োজন যে ধনীর স্বার্থরক্ষা কর্ত্তে আপনার দুরবস্থায় প্রতাড়িতবৎ দরিদ্র শ্রেণী আপনিই যেন যন্ত্র-রাক্ষসকে রক্ত দিতে দলে দলে ছুটে আসতে থাকে।

তাই মধ্যযুগের সেই মনিবের অধিকার মধ্যে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবার স্থানে মালিকের কর্ম্মশালায় দাসত্বের সর্ত্তে তাদের আবদ্ধ করে রাখাটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েচে। প্রতিদিন প্রভাতেই ঐ শোনো কলে কারখানায় বিশ্বের আর একটা অন্য রকমের যুদ্ধক্ষেত্রের রণভেরী নিয়ত ধ্বনিত হচ্চে! ঐ দেখ দলে দলে মজুরের অভিযান। তারা সৈনিকের মতই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন বিভাগে মিস্ত্রির অধীনে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু এ জীবন সৈনিকের নয়। দাসের। এরা আইনতঃ স্বাধীন; কিন্তু অবস্থার দিক্ দিয়ে কেনা গোলামের অধম। ক্রীতদাসটাকে ততখানি নির্ম্মমভাবে খাটাতে মনিব ভয় পেত। এই হতভাগ্য মর্লে মনিবকে নূতন দাস ক্রয় কর্ত্তে আবার অর্থব্যয় কর্ত্তে হবে না। আপনিই তার স্থানে লোক হাজির হবে।

ক্ষমতা রাজার হাত থেকে টাকার হাতে পরিবর্ত্তিত হয়ে এই ত হয়েচে তাদের উপকার। রাজসেবক ইচ্ছা ও হৃদয়শক্তিসম্পন্ন মানুষ মূর্ত্তিতে চোখের সামনে দাঁড়িয়েই তাদের ভাগ্যের একটা বন্দোবস্ত কর্ত্ত। সে অত্যাচারই হোক উৎপীড়ন নিষ্ঠুরতা অপমান যাই হোক্—কর্ব্বার সময় তাদেরও প্রাণ থাকত আত্মা থাকত। পরের সুখ দুঃখ অনুভব কর্ব্বার বোধটাও একেবারে উবে যেত না। তার উপর তাদের সে ক্ষমতা—সেই অস্ত্রবল শুদ্ধ লৌহ কিংবা অগ্নির ফুৎকার নয়। তার

প্রভু ছিল শৌর্য্য, যেটাকে আপন আধারে পরিস্ফুট কর্ত্তে তাদের সাধনার প্রয়োজন হত। তারা একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল যার নাম—Nobility। অর্থের সেবক তেমন উন্নত প্রাণ ক্ষত্রিয় নয়। হীন সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া, তাদের ভব্যতা ভদ্রতা সৌজন্য সমাজে পঙ্কিলতার প্রবাহের মত এনে ঢেলে দিয়েচে—Snobbishness; তাদের অভ্যুত্থান মানুষের culture বস্তুকে কিছুই উপরে তোলবার সহায় হয় নি। তাদের কর্ম্মশালায় যেভাবে রক্তপাত হয়, তাতে পৃথিবী রঞ্জিত হন না। পাপের কালিমায় মসীলিপ্তা হয়ে ওঠেন। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে এমন নির্ম্মম অত্যাচারী সেখানে আত্মা নেই প্রাণ নেই; কেবল নিছক স্বার্থবুদ্ধি আর অত্যাচারের দম্ভ রাজত্ব কর্চে!

*　　*　　*　　*

সোশিয়ালিজম্ হতে আরম্ভ করে কমিউনিজম্ পর্য্যন্ত জন্মাবার কারণ এই আবহাওয়া। কার্লমার্কসের Doctrine সে হিসাবে ধর্ত্তে গেলে বুদ্ধ মহম্মদ খৃষ্টের মতই prophetic। বাস্তব জীবন সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্লেও তাঁর ঐকান্তিকতা আত্মনিবেদন সে জীবনকে বাস্তব-লোকের অনেক ওপরে নিয়ে গেছে। তিনি যেন proletariat সমষ্টিকে সঙ্ঘবদ্ধ অভ্যুত্থিত কর্ত্তেই তাদের মনের সমস্ত শিকল কাটতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি মনশ্চক্ষে দেখে দেখিয়ে গণিতের হিসাবের মতই মিলিয়ে জগতের কাছে একটা উত্তর রেখে গেলেন যে, যে নিয়মে রাজার প্রভুত্বের উচ্ছেদ হয়েচে—সেই নিয়মে অর্থসেবকের ও অর্থগৃধ্নুর একদিন প্রভুত্ব ঘুচবেই। সেই এক বিশ্বশক্তি এখানে নিশ্চেষ্ট নয়।

তাঁর মতেরও চেয়ে এগিয়ে কথা কয়ে গেছেন বাকুণিন। তিনি বোঝাতে চান যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের অধীনতায় মানুষের বাস্তবিক কোনও সুখ নেই। এখনও যদি সেই ক্ষমতার দানবীয় বৃত্তি জেগে রইল, মানুষ অল্পসংখ্যকের সুখ উন্নতি আরামের জন্য প্রভূততমের সমষ্টিকে বলিদান দিবার লোক স বরণ কর্ত্তে শিখল না, যদি গবর্ণমেণ্ট সেই অল্পসংখ্যককে আগলাবার, রক্ষা কর্বার শক্তিকেন্দ্র হয়ে রইল, তবে কাজ কি সে গবর্ণমেণ্টের। রাজশাসিত দেশের চেয়ে দেশের অরাজক অবস্থাই সহস্রগুণ শ্রেয়: এবং প্রত্যেক প্রজার কাম্য। মাইকেল বাকুণিন এই Theory প্রচারিত করে শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান রুষ বিপ্লবের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন যার অঙ্কুর হতে প্রত্যেক পরিণতিই শ্লাভজাতিকে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রে এখনো অনেক কিছু কর্ব্বার জন্য তৈরী করে তুলচে!

ভক্তের পরশ

(ভক্তমাল)

রায় শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর বি-এল্

রাত্রি আর নাহি বাকি　　ডাকিছে ভোরের পাখী,
　ভট্টজী দেখিলা চাহি' পথে—
সিঁধ কাটি' চোর তাঁ'র　　যত ছিল দ্রব্যভার
　বাহিরে নিয়াছে গৃহ হ'তে।
বিষম সে বোঝা ভারি　　শিরে না তুলিতে পারি
　ভাবে চোর—এ কি ঘোর দায়,
এত শ্রমে এত ক্লেশে　　চুরি করা ধন—শেষে
　পথে ফেলে যাবে কি সে, হায়!

দেখি তা'র দশা—আসি'　　পাশে তা'র—মৃদু হাসি'
　কহে ভট্ট "ভয় কিছু নাই,
জঞ্জাল যা ছিল ঘরে　　দিলে আজি দূর করে'—
　যেথা খুসি, নিয়ে যাও ভাই।"
ধরি' বোঝা হাতে হাতে　　তুলি' দিয়া তার মাথে,
　গেলা ভট্ট নাম গান—তরে।
ভক্তের পরশে চোর　　কি যেন আবেগে ভোর
　মুখে তার বচন না সরে।
সম্মুখে গৃহের পথ,　　কিছু দূর যন্ত্রবৎ
　চলি'—যেতে পারিল না আর।
ফিরিয়া আসিল ধীরে　　দ্রব্যভার বহি' শিরে
　ভট্টজীর দুয়ারে আবার।
দু'নয়নে বারি ধরে,　　ভট্টের চরণ' পরে
　লুটিয়া কাতর-কণ্ঠে কয়—
"মূঢ় আমি পাপমতি,　　কি হবে আমার গতি—
　হে ঠাকুর, দেহ পদাশ্রয়।"

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আনাতোল ফ্রাঁসের কথা

আনাতোল ফ্রাঁস আপনার শৈশবের কাহিনী তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "My Friend's Book" ও "Little Pierre"র মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বই দুখানিতে বর্ত্তমান যুগের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষার বিকাশের কাহিনী ছাড়া— শৈশবের একটী অভিনব ও সুন্দর কাব্যমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। মানুষের সাহিত্য ও কাহিনী বেশীর ভাগ আরম্ভ হয়—যখন মানুষ শৈশবের কল্প-লোক পার হইয়া যৌবনের রঙ্গ-লোকে প্রবেশ করে। কিন্তু শৈশবের অধিষ্ঠাতা শুভ্র-শুচি দেবতাও বিশ্ব-সাহিত্যিকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে তাঁহার অর্ঘ্য আদায় করিয়া লইয়াছেন। বিশ্ব-সাহিত্যের মন্দিরে তাঁহারা যদিও একটী অপরিসর স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন— কিন্তু উপাসকের দৃষ্টি যখনই তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে— সেই স্নিগ্ধ, পবিত্র অর্ঘ্য হইতে নয়ন ফিরাইয়া লইতে পারা কঠিন হয়। বিশ্ব-সাহিত্যের "শিশু-ভোলানাথ" মানুষের কল্পনার বিরাট রঙ্গ-মঞ্চে আপনার আসনে অপূর্ব্ব মহিমায় বসিয়া আছেন; "তিল তিল ও মিতিল"এর শৈশব-স্বপ্ন মানুষের মনকে তাহার কল্পনার স্বপ্ন-লোক হইতে সৃষ্টির জাগর-লোকের যবনিকার ওপারে আজও লইয়া চলিয়াছে; কিশোর "দেবব্রত" শ্রীকান্তের যৌবন-যাত্রার বিরাট কাহিনীর উপরেও প্রভাতী-তারার মত জ্বলিতেছে। আনাতোল ফ্রাঁসের সমস্ত বিদ্রূপ ও তীক্ষ্ণধার মনীষার মধ্যে Pierre Nozierreএর শৈশবের স্বর্গ-লোক এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ শুচিতায় বিরাজ করিতেছে।

আনাতোল ফ্রাঁসের এই শৈশব-কাহিনী তাঁহার জীবনের ও সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। আনাতোল ফ্রাঁসের সাহিত্যিক জীবনের মূল-রস হিসাবে রহিয়াছে, মনীষা অথবা বিজ্ঞান-বুদ্ধি। দীর্ঘ জীবন ধরিয়া আনাতোল ফ্রাঁস আপনার বিরাট জ্ঞান ও মনীষা লইয়া মানুষের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে এক তুমুল যুদ্ধ চালাইয়া আসিয়াছেন। এই বিরাট যুদ্ধে তাঁহার প্রধান অস্ত্র ছিল—সহজ বুদ্ধি, বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের নিষ্ঠুর হাসি,—কাব্যের ও কল্পনার ফুল-শর নয়।

কিন্তু তাঁহার জীবনের আরম্ভ হয় কল্পনার কাব্য-লোকে এবং জীবনের শেষ দিনে য়ুরোপের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Skeptic মনীষা কল্পনা-দেবীর গলাতেই জয়-মাল্য দিয়া যান। 'The Book of my Friend'এ তিনি বলিয়া যান, "Our world is full of pharmacists who fear the imagination and very mistaken they are. With all its falsehood, it is imagination which sows all beauty, all virtue in the world. Only through it we are great. Oh mothers! have no fear that it will destroy your children! On the contrary it will keep them from vulgar faults and facile mistakes." "আজ আমাদের পৃথিবী নানারকমের বৈদ্যতে ভরা—তারা সব কল্পনাকে ভয় করে। তারা ভ্রান্ত—পূরা মাত্রায় ভ্রান্ত। সমস্ত মিথ্যা সত্ত্বেও কল্পনাই চির-সত্য। সে-ই তো রূপের ও চরম সত্যের জননী। তারই প্রসাদে আমরা মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা করি। হে জননীরা, কোনও দিন ভাবিয়ো না যে তোমাদের সন্তানেরা কল্পনার মোহে বিনষ্ট হইবে; বরঞ্চ জগতের সমস্ত কুৎসিত ত্রুটী আর সহজ ভ্রান্তির হাত থেকে কল্পনাই তাহাদের বাঁচাইবে।

য়ুরোপের বিজ্ঞতম ব্যক্তি শেষ বয়সে বলিয়া গেলেন, "I would gladly give a whole library of philosophers rather than lose the fairy tale Peau d' Ane." 'Peau d' Ane' (গাধার চামড়া) নামক সামান্য রূপকথাটী হারানোর চেয়ে—আমি আনন্দে এক লাইব্রেরীভরা দার্শনিকদের হারাতে রাজী আছি।"

বিজয়া

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু

(মূল)

বিবাহ লইয়া তর্ক-বিতর্কে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বিভাস বলিল—"আচার্য্য শঙ্কর কি ব'লে গেছেন, জান বৌদি!"

তাহার বন্ধুপত্নী শান্তিলতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি ব'লে গেছেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর?"

এই শ্লেষের হাসি বিভাসকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিল, বলিল—"বলেছেন, নারী নরকের দ্বার।"

পতির এই আবাল্য বন্ধুটীর স্বভাব শান্তিলতা ভাল করিয়া জানিত বলিয়াই তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা বটে!"

কিন্তু লীনা শান্তির সহপাঠী এবং সখী; কথাটাকে ঠিক্ পরিহাস হিসাবে লইতে পারিল না। চোখের আগুণ কতকটা বিভাসের গায়ে ছিটাইয়া দিয়া বলিল—"কিন্তু মনে থাকে যেন, শঙ্কর যে এই উদার মত প্রচার ক'রেছিলেন, সেও এই নারীর বুকের স্তন্য পান ক'রে, নারীর স্নেহ-যত্ন-পালনে মানুষ হ'য়ে।"

উত্তেজনার বশে কথাটী বলিয়া ফেলিয়া বিভাস নিজেই একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল। যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বর বজায় রাখিয়া জবাব দিল—

"আপ্‌নি ভুল বুঝ্‌ছেন—শঙ্করের ও কথা বলার উদ্দেশ্য যে, নারী ভোগের জিনিষ নয়! মাতৃমূর্ত্তিই নারীর শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি।"

শান্তিলতা উচ্চহাস্য সহকারে বলিল—"ঠাকুরপো, টিকা ক'র্‌লে বটে, কিন্তু মল্লিনাথ এখানে ভ্রান্ত। মাতৃমূর্ত্তি নারীর শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি বটে, কিন্তু বিবাহ তার মূল।"

বিভাস মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল—"তা বটে!"

"তা হ'লে হার স্বীকার,—মাকে বলে পাঠাই—"

তর্কে হারিলে উষ্মাই মানুষের প্রথম আশ্রয়! বিভু একটু রাগিয়া বলিল—"ফেয়—তোমার বাড়ী থেকে এই চল্‌লুম, বৌদি।" বলিয়া আরক্ত মুখে ছাতা লইয়া বিভাস উঠিয়া পড়িল।

"এই ভরসন্ধ্যায় কোথা যাবে শুনি?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে শান্তিলতা উঠিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

বিভাস মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—"যেখানে দু'চোখ যায়।"

"কি, একেবারে বিবাগী, না আশ্রমে?"

"হুঁ!"

প্রকাণ্ড ঘর, হল বলাও চলে। তাহার এক কোণের একটী সোফা হইতে শশিশেখর ডাকিল—"বিভু!"

"হ্যাঁ দাদা, যাই।" বলিয়া বিভাসচন্দ্র শশিশেখরের কাছে গেল। সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে তখন কি একখানি পুস্তক চক্ষুর অতি সন্নিকটে আনিয়া শশিশেখর পড়িতেছিল। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া অভিমান-জড়িত স্বরে বিভাস বলিল—"তোমায় না ডাক্তার বারণ ক'রে গেছে শশীদা?"

ম্লান হাসির সহিত শশিশেখর পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল—"আরে না রে না। আর একটু বাকি আছে।"

"ও সব শুন্‌তে চাই না আমি। বই মুড়্‌বে কি না বল? না হ'লে এই পর্য্যন্ত।"

"ঠাকুরপোর মাঝামাঝি পথ নেই। একেবারে কাটান্-ছেঁড়ান্! ঢাল খাঁড়া ধরেই আছেন!"

"সে তোমাদের জন্য। ও তর্ক আর একদিন ক'রব। এখন, দাদা, বই মুড়্‌বে কি না বল?"

তাহার কণ্ঠে ও মুখে এমনি মধুর স্নেহের দাবী প্রকাশ পাইল, যাহা অতি স্নেহশীলা রমণীরও ঈর্ষার কারণ হইতে পারিত। শান্তি ও লীনা পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিল। একটী হাই তুলিয়া, পুস্তক রাখিয়া, উঠিয়া পড়িয়া শশিশেখর বলিল—

"চ' চ', আর বকাবকিতে কাজ নেই! তোকে একটা নূতন জিনিষ দেখিয়ে আনি চ'।" শ্লিপার পায় দিয়া শশী বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতে, বিভাস বলিল—

"এই ঠাণ্ডায় নাই বা বেরুলে!"

"আয় না!" বলিয়া শশিশেখর দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

"একটা মোটা জামাটামা গায়ে দিলে না। নিদেন এই চাদরটা গায় জড়িয়ে নাও।" বলিতে বলিতে বিভাস তাহার খদ্দরের মোটা চাদরখানি অতি যত্নে বন্ধুর কৃশ রোগ-মলিন অঙ্গে জড়াইয়া দিল।

তাহারা উভয়ে দরজার ভেল্‌ভেটের মোটা পর্দ্দাটী সরাইয়া বাহিরে যাইতেছিল, লীনা এতক্ষণে নিজেকে কতকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—

"কোথায় যাচ্ছেন, শশীবাবু?"

"ব'স, আস্‌ছি।" বলিয়া শশিশেখর বিভাসের কাঁধ ধরিয়া কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। শান্তির সহপাঠী ও সখী হইলেও বিভাসের সহিত লীনার পরিচয় বেশী দিনের নয়। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ শান্তির মুখের পানে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিল—

"বাবুটী কে, শান্তিদি'? তোমাদের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখ্‌ছি।"

শান্তিলতা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া বলিল—

"হাঁ, ইনি আমার সেই সতীন।"

"এঁর এখনও বে হ'য়নি বুঝি দিদি?"

"সে খোঁজে তোর দরকার কি রে পোড়ারমুখী?" শান্তি হাসিতে হাসিতে লীনার দিকে চাহিতেই দেখিল, তাহার প্রফুল্ল কপোলে লজ্জার রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার পর ধীরে ধীরে লীনার সম্মুখের টেবিল্‌টায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া শান্তি বলিল—

"আবার 'বুঝি' কি লো? দেখ্‌লি না বের নামে ও কি রকম জ্বলে উঠ্‌লো? মেয়েমানুষের ধারে ঘেঁসে না। কেবল কি জানি কেন আমাকে একটু ভক্তি ক'রে। মুখে বলে তুমি দেবী।"

লীনা জিজ্ঞাসা করিল—"এঁর কি বাপ্ মা নেই?"

শান্তি একটু বিষণ্ণ স্বরে উত্তর দিল—"থাক্‌বে না কেন?"

লীনা বলিল—"তবে?"

শান্তি বলিল—"তবে কি?"

লীনা লজ্জিত হইয়া বলিল—"তাই ব'ল্‌ছিলুম্ বে দেয় না কেন?"

শান্তি কহিল—"দেয় না কেন! কত সাধাসাধি কাঁদা-কাটি হ'য়ে গেছে! বলে বে দিলে বিষ খাবো। কোথায় আশ্রম আছে, সেইখানে যায়! তারাই ওর মাথা বিগ্‌ড়ে দিয়েছে।"

"দেবীর আদেশও শোনে না?"

"দেবী! স্বয়ং ভগবান এসে ব'ল্‌লে ওর মত ফেরাতে পারে না। কত পদ্মফুলের মত মেয়েকে দেখিয়েছি। ব'লে রাক্ষসী! রাক্ষসী! আমাকে মাপ কর বৌদি! কেন আমার নরকের দরজা খোল্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছ!"

লীনা মনে মনে বলিল—"পুরুষ মানুষের এত দম্ভ! এত তেজ! এত অহঙ্কার! রাক্ষসী! তাহার সমস্ত মন যেন নারী-বিদ্রোহী এই যুবকের বিরুদ্ধে রুখিয়া উঠিল। বলিল—"আচ্ছা, শান্তিদি, এই কাট্‌খোট্টা—"

"কে ব'ল্‌লে, কাট্‌খোট্টা! মন ওর ননীর চেয়েও নরম! বন্ধু ছাড়া সংসারে আর কিছুই জানে না। উনিও তাই"—বলিয়া শান্তি আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস গোপন করিল।

এমন সময় কলহাস্য করিতে করিতে দুই বন্ধু সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র ঘরটী একটী সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপের মধুর গন্ধে ভরিয়া গেল। বিভাসের হস্তে একটী প্রকাণ্ড সাদা গোলাপ। লীনা ফুলটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আপনাআপনি বলিয়া উঠিল—

"বাঃ, অসময়ে এমন গোলাপ ফুটেছে?"

"হুঁ,—তোমার সঙ্গে সন্ধি ক'র্‌তে এলুম বৌদি! শশীদা আমাকে এটী উপহার দিয়েছে।"

শান্তি মনে মনে বলিল, "আগে বিভু!"

কিন্তু মনের সে ভাব গোপন করিয়া বলিল—

"আমার জিনিষ আমায় দিয়ে সন্ধি! বেশ ত।"

বিভাস বলিল—"তোমার বাগানে ফুটেছে আর শশীদার যত্নে ফুটেছে ব'লে তোমার। কিন্তু দান ত' লোকে নিঃস্বত্ব হয়েই ক'রে। এ ফুল এখন আমার।"

"শুধু এই ফুলটা কেন—তোমারই তো সব" বলিতে বলিতে শান্তির অজ্ঞাতে তাহার কণ্ঠ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল।

শশিশেখর মৃদু হাসিয়া বলিল—"সব বটে! কিন্তু তোমার ওপর একটু দাবী ত আমারও আছে।"

শান্তি অন্যমনস্কভাবে বলিল—"দাবী! তা বটে।"

কিন্তু তাহার সেই ঔদাস্য ভাব শশীর দৃষ্টি এড়াইল না; বলিল—"কেন, কেন? দাবীর কথা ব'ল্‌তে তোমার গলা কাঁপ্‌লো কেন?"

শান্তি উত্তর করিল—"আমি একটু অন্যমনস্ক হ'য়েছিলুম।"

শশিশেখর বলিল—"কি ভাব্‌ছিলে?"

শান্তি বলিল—"তুমি আর ঠাকুরপো একবার আমাকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলে, মনে আছে? আমি সেই কথা ভাব্‌ছিলুম।"

"সে কথা কি ভাব্‌ছিলে?"

"যে জমিতে তারা বাজি দেখাচ্ছিল, তাতে একটা সাইন্ বোর্ডে লেখা ছিল UNCLAIMED LAND—কেউ দাবী করবার নেই। হঠাৎ আমার সেই কথাটা মনে এল।" বলিতে বলিতে শান্তির চক্ষু দিয়া দু'টা বড় বড় ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল।

শশিশেখর ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এ কি! এ কি! হিষ্টিরিয়া! মাঝে মাঝে শান্তির এমন হয়; এর ত' চিকিৎসা দরকার! বলিল—"বিভু, আমার চিকিৎসার জন্য তোরা ব্যস্ত হচ্ছিস্ কি! শান্তির চিকিৎসা আগে করা। এ তো পুরো হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ! ওর হাসি-কান্নার আমি কিছুই ঠিক্ পাই না।"

দিনান্তের ম্লান সূর্য্যকরের ন্যায় শান্তি একটু হাসিল। হায় রে, চিকিৎসা! তাহার স্বামীর হৃদয়ে যে তাহার জন্য এতটুকু স্থান নাই। সমস্তটাই এই বন্ধু জুড়িয়া আছে! ইহার চিকিৎসাই বা কি, আর প্রতিকারই বা কি! কিন্তু মর্ম্মভেদী ব্যথাকে প্রাণপণে দমন করিয়া শান্তি বিভুর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"ঠাকুরপো, ফুলটার চেয়ে তোমার দেবার ইচ্ছাটাই আমার কাছে বেশি প্রিয়। কিন্তু আমার ঙ্গে নূতন ক'রে সন্ধি কি? যার সঙ্গে বিরোধ, তার সঙ্গে ন্ধি কর।" বলিয়া ইঙ্গিতে লীনাকে দেখাইয়া দিল।

"তোমার আদেশ শিরোধার্য্য" বলিয়া বিভাস গোলাপটী নার হস্তে দিতে হঠাৎ উভয়েরই হাত কাঁপিয়া ফুলটী ভূমিতে ড়িয়া গেল। লীনা তৎক্ষণাৎ তাহা সযত্নে কুড়াইয়া লইয়া শশিশেখরের কাছে গিয়া বলিল—"শশীবাবু, আজ আপনার জন্মদিন। এ ফুল আপনার যোগ্য উপহার নয়। তবু—গঙ্গাজলেও ত' গঙ্গাপূজা হয়!"

শশিশেখর ফুলটী লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল—"বিলক্ষণ! এর চেয়ে আর যোগ্য উপহার কি!" লীনা হাসিয়া বলিল, "এর চেয়ে যোগ্য উপহার আমার কাছেই আছে। কিন্তু ফুলটার মত আপনি সেটাকেও আগে অধিকার ক'রে বসেছেন।" বলিয়া লীনা হাসিয়া শান্তিকে দেখাইয়া দিল।

শশিশেখর কহিল—"আজকের যোগ্য উপহার তোমার গান।"

বিভাস উৎসাহ সহকারে বলিল, "বাঃ বাঃ! আপনি সুধু বিদুষী নন, সঙ্গীতেও সুদক্ষ?"

শান্তি বলিল—"হ্যাঁ, ভাই! কলহের কর্কশ কণ্ঠ শুনেছ ত'? এখন শোন সেই কণ্ঠ কত সুধা বর্ষণ করে।"

লীনা হাসিয়া বলিল—"সুধা! সুধা ত' স্বর্গের জিনিষ। আর নারী—"

শান্তি হাসিয়া বলিল—"নরকের দ্বার?"

বিভাস বলিল, "আপনি এখনও সে কথা ভুল্‌তে পার্‌ছেন না! কি ক'র্‌লে আপনি আমায় মাপ ক'র্‌বেন বলুন।"

লীনা হাসিয়া বলিল—"শুনেছি আপনি খুব ভাল গাইতে পারেন। সেই গানেই সন্ধি!"

বিভাস বলিল—"বেশ, তাই হবে, কিন্তু নারীর স্থান সর্ব্বাগ্রে!"

"নরকের দ্বার হ'লেও?"

বিভু হাসিয়া বলিল—"নারীর গুণ স্বর্গের সামগ্রী! ভোগই নরকের দ্বার মুক্ত করে।"

লীনা যেন আজ শত্রু জয় করিবার জন্যই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত শক্তি একীভূত করিয়া গান ধরিল—"যদি আসে, তবে কেন যেতে চায়।" তাহার মধুর স্বর-লহরী দুলিয়া দুলিয়া যেন বাতাসে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। রসজ্ঞ বিভাস স্থির থাকিতে পারিল না। সে তাহার বেহালা নামাইয়া সুর বাঁধিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। সঙ্গীত-পটীয়সী লীনা সকলকে মোহাবিষ্ট করিয়া ফেলিল। এদিকে শশিশেখর গান শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক ভাবে সেই সুন্দর লোভনীয় গোলাপটী হইতে একটী একটী করিয়া পাপড়ী

ছিঁড়িতেছিল। গান যখন শেষ হইল, সকলে দেখিল, তাহার যুগল নয়ন হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে ; আর তাহার হস্তে শুধু ফুলের বৃন্তটী বিদ্যমান রহিয়াছে।

লীনা সর্ব্বাগ্রে কথা কহিল—"বাঃ, আমার উপহার বুঝি এমনি ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লেন ?"

"ওঃ, ওটা ছিঁড়ে ফেলেছি বুঝি! তা ফুলের আর পরিণাম কি হয়, ভাই ? হয় ঝ'রে পড়ে, নয় কেউ ছিঁড়ে ফেলে! কিন্তু আজ তুমি আমাকে যা দিলে তা—মুখে আর কি ব'ল্‌বো! তুমি গান ক'র্‌লে "যদি আসে, তবে কেন, যেতে চায়"—তোমার গান কিন্তু আমার কাছ থেকে আর যাবে না। যেতে চায় না। কিন্তু এই সন্ধ্যার আলোকটুকু কি এখুনি এখুনি মিলিয়ে যাবে ?"

লীনা হাসিয়া বলিল—"ও কি কথা শশীবাবু! আমি এখন থেকে রোজ বিকেলে এসে আপনাকে গান শোনাব। কেবল শোনাব নয়, শুন্‌ব। আপনার বন্ধুর গান আজ শোনা হ'ল না।"

লীনা গাড়ীতে উঠিবার সময় শান্তির কাণে কাণে বলিয়া গেল—"তোদের ঘাড়ের ভূত আমি নামাব।" লীনা ভাবিয়াছিল বিভাসকে দূরে সরাইলে শান্তি স্বামীর হৃদয়ে গৌরবে প্রতিষ্ঠিতা হইবে।

কাণ্ড

"তা হ'লে তো সর্ব্ব প্রথম নরকে যেতে হয়, আপনার এই হৃদয়ের বন্ধুটীকে।" সহাস্যে বলিতে বলিতে লীনা তাস দিতে লাগিল।

বিস্মিত হইয়া বিভাস জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

"শান্তিদির জন্যে। উনিই ত' ওঁর নরকের দ্বার মুক্ত ক'রে দিয়েছেন।" একবার বিভাসের আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া লীনা পুনরায় তাস দিতে লাগিল।

খেলা হইতেছিল, বিবিধরা গেম। এ খেলা এখন আর প্রায় কেউ খেলে না। তবে শশিশেখরের সকল ভাবই ছিল সেকালের মত, যেন অকালবৃদ্ধ।

বিভাস বলিল—"কিন্তু শঙ্কর ব'লেছেন"—

লীনা বলিল—"তা বলুন! তা হ'লে তো অনেক দেবতাকেও নরকস্থ হ'তে হয়।"

বিভাস বলিল—"কারণ ?"

"কারণ তাঁদের সকলেরই এক একটী স্ত্রী আছে! দেবতাদের মধ্যে যিনি দেবদেব মহাদেব, তিনি শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী হ'য়েও গৃহী। তাঁরও নরকের দরজা বেশ খোলা। তারপর বিষ্ণু, ষোলশো-আট নারী। নরকের দরজা তৈরি ক'রেছেন ষোলশো আট্‌টী।"

বিভাস তাসগুলা হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"আঃ, থামুন! আর দেবনিন্দা কর্‌বেন না—ওঁদের কথা আলাদা।"

লীনা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা বটে! দেবতার বেলায় লীলা খেলা।"

"আপনি জানেন, এঁদের যারা সঙ্গিনী, তাঁরা মাতৃত্বের আদর্শ। সব মাতৃমূর্ত্তি!"

এইবার লীনা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল—"মাতৃত্বের আদর্শ, মাতৃমূর্ত্তি! কথাগুলো শুনে শুনে হাড় জলে গেল। কেন মাতৃত্ব ছাড়া কি স্ত্রীলোকের আর কাজ নেই ?"

"কি কাজ, আপনার মুখেই শুনি ?"

"কেন আদর্শ রমণী ছিলেন (Florence Nightingale) ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। সেবাই নারীর পরম ধর্ম্ম। স্ত্রী পুরুষের সহধর্ম্মিণী, জীবন-সঙ্গিনী। পুরুষ কাজ ক'র্‌বে, নারী তাকে উৎসাহ দেবে। ক্লান্ত হ'লে সেবা ক'রে সুস্থ ক'র্‌বে। নারী না হ'লে মহৎ কাজের প্রেরণা, উত্তেজনা পুরুষ পাবে কোথা থেকে ? এ পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টি ক'রেছে কে ? নারী! রোগে শুশ্রূষা, শোকে সান্ত্বনা, হতাশায় উৎসাহ, নিষ্ফলতায় সহানুভূতি—নারী না দিলে পুরুষকে কে দেবে ? বন্ধু ? হ'তে পারে খুব উচ্চ ভাব ; কিন্তু তবু স্ত্রীর কাছে নয়। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এ সকল ভাবের উপর মধুর ভাব, বৈষ্ণব সাধকগণ ব'লেছেন। আপনারা মনে ক'রেন, অন্তঃপুর একটী প্রকাণ্ড আঁতুড়ঘর। তা নয় বিভাসবাবু!"

বিভাস বিস্মিত হইয়া লীনার মুখের পানে চাহিয়া ছিল। তাহার স্ফুরিত অধর, কপোলের আরক্ত-রাগ, বিশাল নীল নয়নদ্বয়ের উজ্জ্বল দীপ্তি বিভাসকে যেন মোহাবিষ্ট করিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে বলিল—"তা নয় ?"

লীনা হাসিয়া বলিল—"কখনই নয়।"

"তবে কি ?"

লীনা গম্ভীর হইয়া বলিল—"তবে কি? অন্তঃপুর বিশ্বপ্রেমের সূতিকাগার। এইখানেই বিশ্বপ্রেমের জন্ম, পুষ্টি, বিকাশ। নারীর শ্রেষ্ঠ দান সন্তান-রত্ন নয়। নারীর শ্রেষ্ঠ দান ভালবাসা, যার জন্য ভগবান রক্ত-মাংসের দেহ ধ'রে অবতীর্ণ হ'ন। আর একটা কথা মনে রাখবেন, এই দেশেই সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী জন্মেছেন।"

বিভাস হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"আমার মাপ কর লীনা। না—না, মাপ ক'রবেন।"

"সে কি বিভাসবাবু, আমি তো আপনার গুরুজন নই, গুরুমশায়ও নই।"

"তা না হন্, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রছি, আপনার কাছে আমি অনেক নূতন কথা শিখলুম।"

বৌদি হাসিয়া বলিলেন—"তা হ'লে ত গুরুমশায় ব'লে স্বীকার ক'র্‌ছ।"

"অসঙ্কোচে বৌদি!"

শশিশেখর ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"লীনা, আজ কি শুধুই তর্ক হ'বে? এ তো অনেক হ'ল! এইবার একটু গান হ'ক।"

লীনা বলিল—"যদি বিভাসবাবু করেন।"

"আমি! বেশ। কিন্তু আপনি আগে।"

"না, আপনি আগে।"

শান্তি হাসিয়া বলিল—"যাত্রায় থিয়েটারে কি দ্বৈতগান হয় না? তাই কেন হ'ক না?"

শান্তি হারমোনিয়ামে সুর দিতে লাগিল। লীনা ও বিভাস দ্বৈত-সঙ্গীত আরম্ভ করিল। গানের ভাব—উভয়ে উভয়কে প্রায়-নিবেদন করিতেছে। কল্পিত নায়ক, কল্পিত নায়িকা, কল্পিত প্রেম। কিন্তু সংসারে কে এক অদৃশ্য কৌতুকী আছে যে, সময় সময় কল্পনাকে সত্যে পরিণত করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

সেদিন নির্জ্জন শয়নকক্ষে, নিঃসঙ্গ শয্যায়, নিদ্রাহীন নয়নে বিভাস একখানি কল্পনার ছবি দেখিতে লাগিল; এবং নিঃসংশয়ে বুঝিল, সে মজিয়াছে। কিন্তু নিরুপায়! ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার বেগ সমান। সংযমের বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে, বন্যার বেগ সাম্‌লানো যায় না। বিভাস এই মোহিনী নারীমূর্ত্তির কাছে আত্মবিক্রয় করিল।

শান্তি শশিশেখরকে বলিল—"ঠাকুরপোর বিয়ে—।"

শশী ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া শান্তির মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"বিয়ে!"

শান্তি বুঝিল সহসা খবর দেওয়াটা ভাল হয় নাই; বলিল "উত্তেজিত হয়ো না।"

"না, না! আমার কিছুই হয় নি। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে শান্তি? কার সঙ্গে বিয়ে?"

"লীনার সঙ্গে।"

"সব ঠিক হ'য়ে গেছে?"

"হুঁ।"

"কে ব'ল্‌লে—লীনা?"

শান্তি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হ্যাঁ।"

শশিশেখর বিছানায় যেন অবসন্ন ভাবে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল—"কবে বিয়ে?"

"এখনও দিন স্থির হয় নি।"

শশীর মুখে যেন একটু হর্ষের আভাস দেখা দিল। বলিল "দিন স্থির হয় নি,—তা হ'লে দেরী আছে—কি বল শান্তি! —আমার অসুখ, আমি তো কিছু, এ সময় কি—সে—, এখনও কিছু হয় নি? কবে হবে?"

শান্তি বলিল—"শীঘ্রই হবে।"

শশিশেখর অনেকক্ষণ খোলা জানালা দিয়া বাহিরে আকাশ, উদ্যান দেখিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া, দিনের আলোটুকু গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে; দূরে উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে করুণ সুরে কি একটা পাখী ডাকিতেছে। শশী জিজ্ঞাসিল—"শান্তি! বিভাস সুখী হ'বে?"

শান্তি বলিল—"নিশ্চয়ই! লীনার মত মেয়েকে যে বে ক'রবে সেই সুখী হবে।"

শশী যেন মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয়—নিশ্চয়"—কিন্তু স্বরটা ধরা-ধরা। শশী বলিতে লাগিল—"কিন্তু শান্তি! আমি তো অসুখে প'ড়ে আছি। তুমি যেও, যা ক'রতে হয়—ক'র।"

শান্তি বলিল—"বাঃ, আমি তোমাকে ফেলে যাব কেমন ক'রে।"

"আমাকে ফেলে? তা হ'ক। শান্তি, যা হয় তা ভালর জন্যই হয়—কি বল?"

"নিশ্চয়ই।"

শশিশেখর তেমনি উদাসভাবে আকাশের পানে চাহিয়া

বলিতে লাগিল—"এ ভালই হ'ল। নইলে ওর বড় কষ্ট হ'ত। দিন কাট্‌তো কেমন ক'রে।—শান্তি! বিভু এই জন্যেই কি দু'দিন আসে নি?"

শান্তি বলিল—"বোধ হয় বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত আছে।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু শান্তি, সে আস্‌বে তো? আগে যেমন আস্‌তো? তেমন না হ'ক, এক একবারও তো আস্‌বে?"

শান্তি বলিল—"নিশ্চয়ই।"

একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শশিশেখর বলিল—"নিশ্চয়ই, সে কি আমাকে না দেখে থাক্‌তে পার্‌বে।"

ফুল

লীনা ও বিভাসের বিবাহ হইয়া গেল এক সর্ত্তে—উভয়ে চিরব্রহ্মচর্য্যব্রত লইয়া জীবন যাপন করিবে। কিন্তু লীনা আজ বায়স্কোপ্, কাল থিয়েটার, এমনি করিয়া স্বামীকে নিত্য ঘুরাইতেছে। নূতন মোহে বিভাস একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এমন কি তাহার বন্ধু-গৃহেরও আর সে আকর্ষণ নাই। কদাচিৎ কখন ঝড়ের মত আসে, ঝড়ের মত চলিয়া যায়। সদ্য-পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গ এমনি করিয়াই আকাশে বিচরণ করে।

তার পর লীনা বিভাসকে লইয়া রাঁচি চলিয়া গেল। বিভাস লজ্জায় সে কথা শশিশেখরকে জানাইতে পারিল না। কিন্তু শান্তির কিছুই অগোচর রহিল না। রাঁচি হইতে কিছুদিন পরে বিভাসের পত্র আসিল—'হঠাৎ কোন কারণে আমি এখানে এসেছি,—শীঘ্রই ফির্‌বো। বৌদি, দাদা কেমন? একছত্র লিখে জানিও। বিজয়া-দশমীর দিন নিশ্চয় তোমার ও দাদার পদধূলি মাথায় লইব।'

পত্রখানি পাঠ করিয়া শশিশেখর—উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে করিতে বলিল—"শান্তি, সে সুখে আছে, আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছে, তাতে বিঘ্ন ক'রে কাজ নেই। লিখে দাও—আমি ভাল আছি, একটু উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি।"

কিন্তু শশিশেখর মৃত্যুমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। দেহে দারুণ রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা, মনে বিভাসের জন্য নিরন্তর হাহাকার। নিরুপায় শান্তি দাঁতে দাঁতে চাপিয়া নিরশ্রু নয়নে স্বামীর যাতনা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দিনে দিনে সেই ভয়ঙ্কর দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। রুগ্ন শশিশেখর ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল—"শান্তি, একবারটী শোন।"

সেই ঘরেরই এক কোণে শান্তিলতা ষ্টোভে কি একটা মিষ্টান্ন পাক করিতেছিল, উত্তর দিল—"কি ব'লচ?"

"একবারটী জান্‌লাটা দিয়ে দেখ দিকি—বিভু এল কি না?"

শান্তি জানিত ইহা স্বামীর উদ্বেগ মাত্র। তথাপি তাহার মনস্তুষ্টির জন্য কড়া নামাইয়া, জানালা দিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল—"না, আজ কি সে আস্‌বে?"

"না শান্তি, তাকে তুমি চেন না। পৃথিবীটা যদি আজ উল্টেও যায়, তবুও বিভু আজ আস্‌বে, এ তুমি ঠিক জেন।"

কিছুক্ষণ পরে শশিশেখর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"শান্তি, তোমার সব হ'য়ে গেল?"

শান্তি ডিসে খাবারগুলি সাজাইতে সাজাইতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হ্যাঁ।"

"কৈ নিয়ে এস দিকিনি, কেমন হ'ল দেখি।" বলিয়া শশিশেখর পাস ফিরিয়া শুইল। শান্তি খাবারের ডিস্‌খানি আনিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিল। ডিস্‌টী দেখিতে দেখিতে শশিশেখর বলিল—"শান্তি, বিভুর সব চেয়ে প্রিয় জিনিষটাই কৈ দেখ্‌তে পাচ্ছি না তো?"

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ। তথাপি দৃঢ় বলে আপনাকে সংযত করিয়া শান্তি কহিল—"ডালের ব'র্‌ফি তো? হ্যাঁ, সেটা আগে তৈরি ক'রেছি। ঐ রেকাবখানা চাপা রয়েছে।" বলিয়া ডিস্ রাখিয়া রেকাবখানি আনিয়া স্বামীকে দেখাইল।

"বাঃ, শান্তি, আজ তুমি আমাকে যা খুসী ক'র্‌লে, তা আমি জীবনে ভুল্‌বো না।" শশিশেখরের এই কথায় শান্তির বুক ফাটিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। ভাবিল, তাহার স্বামীর হৃদয়ে তাহার স্থান কোথায়, কতটুকু! বিভাস-চন্দ্র এখনও তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া আছে।

আজ বিজয়া দশমী। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। রাজপথে বাদ্যোদ্যম, আলোকোৎসব। কিন্তু এ মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন কক্ষ? আকাশে একটী দু'টী করিয়া তারা ফুটিতেছে। দশমীর শশী উদিত হইয়াছে। কিন্তু শশিশেখরের হৃদয়-শশী?

অন্যান্যবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিভাস আসিয়া তাহার দাদাকে আলিঙ্গন করিয়া বৌদিকে প্রণাম করিয়া হাসিতে

হাসিতে বলিত—"বৌদি, চিরদিন যদি এমনি ক'রে কাটাতে পারি তো আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।" হায় রে নারীর মোহ! আজ সে বিভাস কোথায়? শশিশেখর সেই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে ডাকিল—"শান্তি!"

"এই যে আমি!"

শশিশেখর ভাবিতেছিল—"আমার জীবন খেয়া-ঘাটে আসিয়া লাগিতে ত' আর অল্পই বাকি; কিন্তু হায়, এই অনাদৃত প্রস্ফুটিত কুসুম কেমন করিয়া এই সংসারের তাপ সহ্য করিবে? কে ইহাকে দেখিবে! যাহার জন্য আমি এই পতিপ্রাণা রমণীকে দূরে রাখিয়াছি, সে ত আমার অন্তিম শয্যার পাশে নাই। কিন্তু অনিচ্ছার অনাদরে যাহার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছি, সে এখনও আমার মুখ চাহিয়া পলক ফেলিতেছে না—বুক বাঁধিয়া শমনের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছে। কি ভ্রান্তি! কিন্তু তথাপি তো মোহ কাটে না। শশী অতি মধুমাখা করুণ স্বরে ডাকিল—"শান্তি!"

শান্তি তাহার প্রেমপূর্ণ চক্ষু, সকরুণ সম্ভাষণ শুনিয়া বুঝিল, স্বামীর হৃদয়ে কি দ্বন্দ্ব চলিতেছে। বলিল—"কি ব'লছ?"

"কিছু না। কাছে এস, আরও কাছে। শান্তি!" শান্তির হাত ধরিয়া শশী যেন পরম তৃপ্তিতে ঘুমাইয়া পড়িল। এমনি করিয়া কিছুক্ষণ অঘোরে কাটিল। তারপর শশিশেখর সচকিত হইয়া চারিদিক চাহিতে চাহিতে জিজ্ঞাসিল—

"বিভু এখনও আসেনি? আস্‌বে—আস্‌বে। ঐ বুঝি এল!" এমনি প্রতি শব্দে শশী ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। শান্তি ভাবিতে লাগিল,—"ওঃ এখনও সেই বিভু! হায়, যদি বন্ধুই সব তবে——।"

"শান্তি, তার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখ। সে আস্‌বে, আস্‌বে। আমার মন ব'ল্‌ছে—।" হঠাৎ শশিশেখরের কণ্ঠ ঘড় ঘড় করিয়া উঠিল।

শান্তি চকিত হইয়া অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"ওগো, আমায় ফেলে কোথায় যাও।"

শশিশেখরের বিস্ফারিত চক্ষু ঘুরিতে ঘুরিতে শান্তির মুখের উপর স্থির হইল। সেই স্থির দৃষ্টির স্মৃতিই শান্তির জীবন-সম্বল।

দশমীর নিশি তখন অবসান-প্রায়। কুলায় দু'একটা পাখী গা-ঝাড়া দিতেছে। শান্তির নেত্র-নীরের ন্যায় পত্র-প্রান্ত হইতে মৃদু-মন্দ শিশির-পাত হইতেছে। যামিনীর অন্ধকার ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে। শশিশেখরের জীবনের অবসান হইয়াছে, কিন্তু সে নিস্তব্ধ কক্ষ হইতে শমনের ছায়া তখনও অপসৃত হয় নাই। এখনও যেন ছম্‌ছম্‌ করিতেছে।

এমন সময় শশিশেখরের বহির্দ্বারে ঘা পড়িল—"বৌদি"

শান্তি চকিত হইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। বিভাস বলিল—"আমি কালই এসেছি বৌদি। কিন্তু লীনা কিছুতেই ছাড়্‌লে না। থিয়েটারে টেনে নিয়ে গেল। দাদা কৈ?"

শান্তি ঘাড় নাড়িয়া উপর দেখাইয়া দিল।

দ্বারকার পথে

শ্রীনীলিমাপ্রভা দত্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বেলা ১টার সময় ট্রেন বম্বের বড় ষ্টেষন "ভিক্টোরিয়া টার-মিনাস" ষ্টেষনে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বেচারা আজ তিন দিন একভাবে, কত হাজার লোককে নিয়ে অবিশ্রাম গতিতে ছুটে এসেছে, এতক্ষণে বিশ্রাম কর্‌তে পেলে। ট্রেন থেকেই দেখা গেল, ঋ-বাবু ষ্টেষনে এসেছেন। তাঁকে দেখে আমাদের অনেকটা ভরসা হ'ল। একেবারে অজানা ও স্বজন-বর্জ্জিত দেশ, একটিও চেনা লোক না থাকলে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। ঋ-বাবু বড় ভদ্রলোক; সরল প্রকৃতির পুরুষ ও নিরীহ। আমাদের জন্য কত কষ্ট করে এই দুপুর রৌদ্রে ষ্টেষনে ছুটে এসেছেন। তিনি তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য

ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন; এবং তাঁর স্ত্রী আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করে বসে আছেন, তাও বল্লেন। আমরা কিন্তু তখন তাঁর বাড়ীতে যেতে পাল্লুম না। রাণীর অসুখ, একেবারে বাড়ীতে যাওয়াই ভাল; নইলে রুগী মানুষের বেশী কষ্ট হবে বলে' তাঁকে বল্লাম। তিনি আর জেদ করলেন না। দত্ত-সাহেব ও ছেলেদের সব খ-বাবু নিজের বাড়ীতে আহারাদির জন্য নিয়ে গেলেন। আমরা সকলে ও লগেজসমূহ ছয়খানা গরুর গাড়ী বোঝাই করে বাড়ী পৌঁছিলাম। দীর্ঘকাল ট্রেনে আসার জন্য সকলকারই শরীর ক্লান্তি বোধ কচ্ছে। আর আজ কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। আমাদের বাড়ীটি ছ' তলা। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বাড়ী। আমাদের সহিত বৃদ্ধা রমণীরা আছেন বলে' দোতালা আমাদের ভাড়া লওয়া হইয়াছে। চারটা শোবার ঘর; দুটা বাথরুম; তিনটা পাইখানা ও দালান, রান্নাঘর, ইত্যাদি বেস সুব্যবস্থা আছে। দোতালা হইতে সমুদ্র সামনেই দেখা যায় বটে, কিন্তু তেতালা চারতলার মত অত পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। তবুও আমরা সমুদ্র দেখ্‌তে পাচ্ছি ও সমুদ্রের হাওয়াও আস্‌ছে বেস! সামনেই জন-কোলাহল ও যানবাহন-পরিপূর্ণ রাস্তা, ঠিক যেন কলিকাতা নগরী। এখানে ট্রামের পরিবর্ত্তে সহরের ভিতর দিয়ে পাঁচ মিনিট অন্তর ট্রেন আস্‌ছে যাচ্ছে; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত বোম্বাই নগরী কোলাহলময়ী; গাড়ী, মোটর, সুন্দরী পার্শি রমণী ও ভাটিয়া রমণী ও পুরুষদের যাতায়াতের বিরাম নাই। আজ দুর্গাষষ্ঠী। আজকের মত আহারাদি করে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নেওয়া গেল।

৫ই অক্টোবর—

আজ শারদীয়া সপ্তমী পূজা। আমাদের বাঙ্গালা দেশে আজ কত আনন্দ! আনন্দময়ী মা এসেছেন। আবাল, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, সকলকার মুখে, একই আনন্দধ্বনি, 'পূজা', 'পূজা'! এতক্ষণ আমাদের সোনার বাংলায় ছোট ছেলে-মেয়ের দল, বেশভূষার পরিপাট্য করে মা আনন্দময়ীকে দর্শন করতে চলেছে। আর এখানে আজ, এতবড় বোম্বাই সহরে, পূজার নাম মাত্র নাই। যদি চ শুনিতেছি, এখানে পাঁচশত ঘর বাঙ্গালী-সন্তান বাস করিতেছেন, তবুও আজ তাঁহাদের প্রাণে কোনও সাড়া নাই, উৎসাহ নাই। সকলের যদি এ বিষয়ে ঐক্য থাকিত, তাহ'লে আজ এত বড় বোম্বাই নগরে কি মায়ের একটি মূর্ত্তিও দর্শন হ'ত না?

এখানে সমুদ্রের তীরে "মহালক্ষ্মী" বলে দেবী আছেন; তাঁরই এ কয়দিন পূজার উৎসব হয়; এবং ভদ্রনগুলী একত্র হন। আজ আমাদের বাড়ীর পুরুষদেরও সেখানে পূজা দেখিবার নিমন্ত্রণ আছে।

সকালেই বম্বের প্রসিদ্ধনামা ডাক্তার জুডা রাণীকে দেখ্‌তে এলেন। গত রাত্রে বাবা বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছেন! মানুষের প্রাণ ত!—বড়ই চঞ্চল হয়ে পড়া গেছে। ডাক্তার এসে বল্লেন, "কোনও উৎকণ্ঠার কারন নাই, সরল জ্বর। তবে পেট যাহাতে ঠিক থাকে, তার জন্যই ঔষধ দেওয়া। জ্বর আপনার দিন ঠিক লইবে, তাহাকে রোধ করিতে কেহই পারিবে না। কেবল, কোনও উপসর্গ যাহাতে না হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। আর পথ্যর মধ্যে ছানার জল, ঘোল, ফল এই সব ব্যবস্থা করলেন। এখানে মুসুম্বির নামে, কমলালেবুর মত আকারবিশিষ্ট সাদা রংয়ের এক রকম লেবু পাওয়া যায়; বড় সুস্বাদু ও মিষ্টি, পেটের পক্ষে উপকারদায়ক। সেই লেবু রাণীর জন্য আস্‌তে লাগল, আমরাও সেই লেবু প্রত্যহ খাইতেছি। এখানে ফল এবং তরি-তরকারী বড় মহার্ঘ্য, তরি-তরকারী শস্য মোটেই টাট্‌কা পাওয়া যায় না। এ দেশে ত জন্মায় না—অন্য দেশ হইতে চালান আসিলে তবে লোকে খাইতে পায়। এখানে সামুদ্রিক মৎস্য নানাবিধ; খেতেও সুস্বাদু; তবে মহার্ঘ্য। সামুদ্রিক মাছ কিন্তু পরিপাক করা কঠিন। নারিকেল অনেক বটে কিন্তু সস্তা নহে। এখানে প্রত্যেক দেব দেবীর কাছে নারিকেল দেওয়া হয়; এবং এখানে ঐ নারিকেল দেওয়াটা যেন প্রথা। এখানে ঘৃতের মিষ্টান্ন, ছানার বা ক্ষীরের মিষ্টান্ন, মোটেই ভাল পাওয়া যায় না; কেমন বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়। রাণীর জ্বর সেই রকমই; পেটও অল্প ফেঁপে থাকে। ডাক্তার জুডা ত বল্লেন, কোনও ভয় নাই; কিন্তু মন কিছুতেই যে স্থির হচ্ছে না! আবার মনে হতে লাগল যে, দ্বারকাপতি কি এমনিই করবেন যে, আমি সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট অগ্রাহ্য করে তাঁরই দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এত দূর দেশে ছুটে এসেছি, তিনি কি এমনি করে আমায় বিমুখ করবেন? ভালমন্দ নানারকম চিন্তা মনকে ঘিরে ফেল্লে। এখানে এলাম কোথায় বেড়াতে, না, একেবারে কোথাও যেতেই ভাল লাগ্‌ছে না।

অক্টোবর—

আজ দুর্গাপূজার মহাষ্টমী ও নবমী পূজা। এবারে পূজা বেলা ১১টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে ও দক্ষিণান্ত। এবারে আমাদের বাঙ্গালীদের দুদিন পূজা। হিন্দুদের আজ মহা পর্ব্বদিন। এখানে কিন্তু কোন লোকের মুখে দুর্গা নামও শুনিতে পাই না।

দুইখানা কেটিং গাড়ী আনিয়ে আমরা বম্বে সহর দেখতে বাহির হলাম। প্রথম আমরা বালার্ডপিয়ার বন্দরে গেলাম। যেখানে বিলাত-যাত্রীরা বিলাতী জাহাজে উঠে বিলাত-যাত্রা করেন, এ সেই সমুদ্র-বন্দর,—প্রকাণ্ড ঘাট-প্রধান উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। সমুদ্রের তীরেই দুইখানা কপিকল অনবরত সমুদ্রের মাটি কেটে কেটে তুলে ফেল্‌ছে; নইলে জাহাজের দাঁড়াবার অসুবিধা হয়। বেশ মজার দেখতে লাগ্‌ছে। ছোট ছোট নৌকা, গাধাবোট, জালিবোট ও বড় বড় জাহাজ দূরে সমুদ্রের উপর ভাস্‌ছে। কোনটা বা চল্‌ছে, কোনওটা বা অকূল সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য যাত্রা কর্‌ছে। জাহাজপূর্ণ লোক চলেছে। একখানা বোধ হয় আরব দেশে যাচ্ছে; একখানা বোধ হয় বিলাত যাচ্ছে। এই রকম অনেকগুলি জাহাজ ছেড়ে গেল। আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের শোভা দেখতে লাগলাম। এখানে সমুদ্র তরঙ্গময়ী নহে, বেশ শান্তভাবে ও গুরুগম্ভীর ভাব ধারণ করে নৃত্য করতে করতে ছুটে চলেছে। দেখলেই মনে হয় অতল জল। পুরীর সমুদ্রের ন্যায় এখানে ঢেউ নাই। বম্বের ভিতর যে সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে 'ব্যাক বে' বলে। ঢেউ বেশী না থাকাতে ইংরাজ সমুদ্রকে বাঁধিতে পারিয়াছে। সন্ধ্যায় আমরা আবার ঋ-বাবুর বাড়ী বেড়াতে গেলাম। ঋ-বাবু টেলিগ্রাফ অফিসের বড়বাবু। সেই পাঁচতলার উপর ঋ-বাবু থাকেন। টেলিগ্রাফ অফিসের উপরেই তাঁহাকে থাকিতে হয়। আমরা গিয়ে দেখি, ঋ-বাবুর স্ত্রী তাঁর ভগিনীর সহিত সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইতেছেন। আমরাও খানিকক্ষণ পরে তাঁহাদের সহিত বেড়াতে গেলাম। বাবুরা আমাদের নামিয়ে দিয়ে মালাবার-হিলে বেড়াতে গেলেন। আমরা সমুদ্রের ধারে বসে বম্বে নগরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম। রাত্রি হইয়াছে; চারিদিকে আলো জলিয়া উঠিয়াছে। বম্বে সহর ঠিক যেন সমুদ্রের বুকে তারার মালার মত বোধ হচ্ছে। যেন স দ্র- ন্দরী ইলেকট্রিক আলোর কণ্ঠহার পরিয়াছেন! খানিকক্ষণ পরে বাড়ী ফেরা গেল।

৭ই অক্টোবর—

ভোরে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে জ্বরভাব বোধ হল; গায়ে বেদনাও অনুভব করিলাম; এবং আরও দু-তিন জনের জ্বর হইয়াছে শুনিলাম। রাণীর অসুখের জন্য ত একেই সকলকার মন খারাপ, তাতে আবার আমাদেরও আরম্ভ হল; কদিন ভোগাবে, কে জানে! বম্বেতে শুনিতেছি, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই। আবার পেটের ব্যাধিও ধরিলে না কি শীঘ্র ছাড়িতে চায় না। ম্যালেরিয়ার ভয়ে কুইনাইনের বড়ি সকলেই টপাটপ্ গলাধঃকরণ করা গেল। ১০ই অক্টোবর আমাদের দ্বারকা যাইবার কথা। একদলের পূর্ব্বে যাওয়া হইবে; পরে সে দল ফিরে এলে আর একদলের যাওয়া হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। এদিকে আবার সকলকার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে কি করে যাওয়া হবে! তবে কি দ্বারকানাথের একেবারেই ইচ্ছা নয় যে আমরা তাঁহাকে দর্শন করি—এই রকম মনে হতে লাগল। আবার একটা মস্ত ভুল হইয়াছে,—আমরা দ্বারকানাথের (বিগ্রহের) জন্য যে সব অলঙ্কার তৈয়ারী করিয়াছিলাম, সে সব বাড়ীতেই ফেলিয়া আসিয়াছি। সেই সব গহনা পাঠাইবার জন্য বাড়ীতে 'তার' করা হইয়াছে, তাহার উত্তর এখনও আসে নাই। সে জন্যও আবার সকলকার মন খারাপ আছে।

৮ই অক্টোবর—

আজ সকলকারই শরীর সুস্থ বোধ হচ্ছে। রাণীর জ্বরের উত্তাপও কমেছে বটে; তবে একেবারে ছাড়ে নাই। জ্বর কমেছে দেখে মনটায় আনন্দ হ'ল। ডাক্তার জুডা আর আসেন নাই। প্রত্যহ অন্য চিকিৎসক দুইবেলা আসেন। তিনি বলেন, ভয়ের কারণ নাই, ১৪ দিনেই জ্বর ছেড়ে যাবে। আর একটা কথা মনে পড়ল, লিখতেও ইচ্ছা হ'ল—যেদিন ডাক্তার জুডা এসেছিলেন, সেদিন তিনি কুড়ি টাকা 'দর্শনি' নিয়ে বলেছিলেন, আমার মত বড় ডাক্তার বম্বে ব'লে, তোমরা সস্তাতে পেলে। নইলে কলিকাতা হ'লে আরও ডবল খরচ পড়িত। তাঁকে না কি আমরা খুব সস্তাতে পেয়েছি।

আজ বিজয়া-দশমী। হিন্দুদের আজ মহামিলনের দিন। সব রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, মান, অভিমান ভুলে গিয়ে

স্নেহালিঙ্গনে মিশে যাবে। মা দুর্গার আজ বিদায়ের দিন।

৯ই অক্টোবর—

সকালে উঠেই খবর লইতেছি, সকলে সুস্থ শরীরে আছে কি না। আগামী কল্য আমাদের দ্বারকা যাবার দিন। রাণীর সেই অবস্থা। এত দূর দূরান্তে ফেলে রেখে কি করে আমরা দ্বারকা যাইব তাই ভাবিতেছি। ট্রেন-পথে এখান থেকে তিন দিন সময় লাগে দ্বারকা পৌছিতে। গবাক্ষ-পথে দাঁড়িয়ে দেখছি, সামুদ্রিক মৎস্য ও কাঁকড়া সব ঝুড়ি ঝুড়ি বিক্রয় কর্‌তে যাচ্ছে। মাছ ও কাঁকড়াও বড় মহার্ঘ্য। কাঁকড়া সাতটি সাড়ে দশ আনায় কিনে নিয়ে এল।

দুপুরে বাবার দুইজন বন্ধু (পাটনার) বাবার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে এলেন। এখানে গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, মানুষের ঝনঝনানি ও ট্রেনের শব্দে কাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত নিস্তার নাই। আর পার্শি রমণীদের হাওয়া খাওয়া, এবং মস্তকে আবরণহীনা ভাটিয়া রমণীদের যাতায়াতেরও বিরাম নাই। বেলা তিনটা হইতে জানলায় দাঁড়াইয়া দেখ্‌ছি, অসংখ্য রমণী ও পুরুষের যেন মেলা লেগে গেছে। স্ত্রীলোকরা নানাবিধ শাড়ীতে সজ্জিত হয়ে সব সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পার্শি রমণী অপেক্ষা, ভাটিয়া রমণী বেশী সুন্দরী ও সুগঠনা। ভাটিয়া রমণীদের স্বামী বর্ত্তমানে না কি তাঁহাদের মস্তকে কাপড় দিতে নাই,—তাহা হইলে স্বামীর অমঙ্গল কামনা করা হয়। তাঁহাদের স্বামীরাই মস্তকের আবরণ। মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণও ঐরূপ মস্তকে কাপড় দেন না ও পুরুষদের মত পিছনে 'কোঁচা' দিয়া কাপড় পরেন। আমাদের কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না। আমার এক আত্মীয়া এই পার্শি রমণীগণকে দেখিয়া লিখিয়াছিলেন,

"একেলা বেড়ায় তারা নগর, নগরী,
নাহিক তাহার সাথে পুরুষ প্রহরী ॥

আমি কিন্তু সব স্ত্রীলোকদিগের সহিতই এক একটি পুরুষ সাথী দেখিতেছি। কাল আমরা দ্বারকা যাত্রা করিব। আজ একজন ব্রাহ্মণ দ্বারবানকে দ্বারকা পাঠান হইল। আমাদের সুবিধার জন্য একদিন পূর্ব্বেই একে পাঠান হইল। আমাদের জন্য ধরমশালা ইত্যাদি ঠিক করিয়া রাখিবে। আমাদের দ্বারকা যাইবার জন্য গুজরাট্ মেলে, সেকেণ্ড-ক্লাস কামরা দুইখানি রিজার্ভ হইয়া গেছে। দেখি এখন সেই জগৎ-পিতার কি ইচ্ছা। একে ত দত্তসাহেব আমার যাবার প্রথম থেকেই বিপক্ষে।

পুস্তক-পরিচয়

চাঁদসদাগর।—মন্মথ রায় প্রণীত, মূল্য একটাকা। মনসার ভাসানের কাহিনী বাঙ্গালা দেশে অপরিচিত নহে। এখনও উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গের নরনারী বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের করুণ কাহিনী ভাসান-'গানে শুনিয়া' অশ্রুবিসর্জ্জন করে, এখনও চাঁদসদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকরের কথা সগৌরবে দেশবাসী গান করে এখনও সতী-শিরোমণি বেহুলার অবদান বাঙ্গালাদেশে ভক্তিভরে গীত হয়। সুকবি সেই পরম পবিত্র কাহিনী এই দৃশ্যকাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমান্ মন্মথ রায় গতানুগতিকভাবে এই দৃশ্যকাব্য লেখেন নাই; তাঁহার একটা নিজস্ব ছন্দ-ভঙ্গী আছে; তিনি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এমন সুন্দরভাবে অগ্রসর করিয়াছেন যে, পাঠক ও দর্শক মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, শ্রীমান্ মন্মথ রায়ের চাঁদসদাগর বাঙ্গালা দৃশ্য-কাব্যক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। রঙ্গমঞ্চে এই চাঁদসদাগরের অভিনয়ও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে।

লগ্নফল।—জ্যোতিবাচস্পতি প্রণীত, মূল্য একটাকা। ইতঃপূর্ব্বে বাচস্পতি মহাশয় 'মাস-ফল' প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহার পরই এই 'লগ্নফল' বাহির হইয়াছে। যাঁহারা বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত পরিচিত, যাঁহারা তাঁহার জ্যোতিষগণনার কথা জানেন, তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, বাচস্পতি মহাশয় জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার ফল 'মাস-ফল' ও 'লগ্ন-ফল'। আমরা অনেকে নিজ নিজ ব্যাপারে মিলাইয়া দেখিয়াছি, তাঁহার ফল-গণনা ঠিক হইয়াছে। মাস-ফলের ন্যায় লগ্ন-ফলও বাঙ্গালাদেশে যথেষ্ট আদর লাভ করিবে।

আহুতি।—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্ প্রণীত, মূল্য একটাকা। শ্রীযুক্ত নরেশবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁহার কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক, তাঁহার অপরাপর রচনাবলি বাঙ্গালা-সাহিত্যে যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য, এ কথা কেহই

অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাই, আমরা নরেশবাবুর এই 'আহুতি'কে সাদরে বরণ করিতেছি। মাসিক-পত্রাদির পৃষ্ঠা হইতে এই সকল সন্দর্ভ উদ্ধার করিয়া তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া ভাল করিয়াছেন। তাঁহার রচনার লালিত্য, তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তাঁহার যুক্তিতর্ক প্রভৃতির একত্র সমাবেশে এই সংগ্রহ-পুস্তকখানি শুধু সুন্দর হয় নাই, চিন্তা করিবারও অবকাশ প্রদান করিয়াছে। এখানি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইতে পারে না ?

গিরিশচন্দ্র।—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ; মূল্য তিন টাকা। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম না জানেন এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বিরল। গিরিশচন্দ্র একাধারে নাট্যকার, নট, কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন-কথা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক। সে ঔৎসুক্য গিরিশচন্দ্রের ছায়ার ন্যায় সহচর অবিনাশবাবু মিটাইয়াছেন ; তাঁহার চেষ্টা যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে আমরা গিরিশচন্দ্রের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ জীবন-চরিত পাইয়াছি। অবিনাশবাবু এই উপলক্ষে গিরিশবাবুর সমস্ত নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন ; সে পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর। গিরিশবাবুর জীবন-কথা লিখিতে গেলেই বাঙ্গালা নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হয়, অবিনাশবাবু সে ইতিহাসও লিখিয়াছেন। জীবন-চরিত লিখিতে গেলে যে সত্যনিষ্ঠা ও সংযমের আবশ্যক, এ পুস্তকে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। গিরিশবাবুর বিভিন্ন অবস্থার আলোকচিত্র ও বঙ্গনাট্যশালার সংসৃষ্ট প্রায় সকলেরই আলোকচিত্র এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এমন সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ জীবন-চরিতের যে আদর হইবে, তাহা নিশ্চিত।

কুজ্ঝটিকা।—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই-টাকা। প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রবাবুর এই 'কুজ্ঝটিকা' উপন্যাসখানি তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ উকিলের নিকট হইতেই আমরা আশা করি। অন্য কোন কাঁচা লেখক হইলে এই উপন্যাসের আখ্যানভাগকে ডিটেক্‌টিভ কাহিনী করিয়া বসিতেন। সৌরীন্দ্রবাবু কিন্তু তাহা করেন নাই, ডিটেক্‌টিভ গল্পের উপাদান লইয়াই তিনি সুন্দর উপন্যাস লিখিয়াছেন। প্রত্যেক চরিত্রই সুন্দর ফুটিয়াছে ; মিসেস্ রায় হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কনেষ্টবল পর্য্যন্ত শিল্পীর তুলিকাপাতে জ্বলজ্বল করিতেছে।

সাধনা।—শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে প্রকাশিত, মূল্য একটাকা। এই 'সাধনা'য় দেবস্তোত্র, দেবীস্তোত্র, বেদ-উপনিষদ ভাগবত—গীতা ও চণ্ডী হইতে নির্ব্বাচিত অংশ, ধর্ম্মসঙ্গীত, জাতীয়-সঙ্গীত প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাই এই সুন্দর সংগ্রহ গ্রন্থের পরিচয়। ইহাকে ধর্ম্মসঙ্গীত ও স্তবমালা বলিলেই ঠিক হয়। এই 'সাধনা'র বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীশ্রীগৌরীমাতা প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সেবায় উৎসৃষ্ট হইবে ; সুতরাং সকলেরই এই 'সাধনা' এক একখানি ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরামচন্দ্র।—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দেড়টাকা। শ্রীযুক্ত অপরেশবাবু বাহাদুর পুরুষ ; তিনি সত্যসত্যই এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ গাহিয়াছেন। পাঁচ-অঙ্কব্যাপী নাটকের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমনের আয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া সীতাদেবীর লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাবলি সুদক্ষ শিল্পীর ন্যায় অপরেশবাবু অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহাকে এজন্য অনেক ঘটনা বাদ দিতে হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে শ্রীরামচরিত্রের আদ্যন্তের শৃঙ্খলের কোথাও চ্যুতি হয় নাই ;— ইহা কম নৈপুণ্যের কথা নহে ; অপরেশবাবু 'কর্ণার্জ্জুনে' ও 'শ্রীকৃষ্ণে' যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, 'শ্রীরামচন্দ্রে' তাহা অক্ষুণ্ণ আছে।

আমরা কি ও কে।—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুইটাকা। এখানি কয়েকটী লিপি-চিত্রের সংগ্রহ ; যিনি চিত্রকর, তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের উচ্চ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সংগ্রহ পুস্তকের কয়েকটী চিত্র পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সে সময় সকলেই বলিয়াছিলেন, রস-রচনায় এমন ওস্তাদ বাঙ্গালা-সাহিত্যে অতি কম। যে নয়টী চিত্র এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ; কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টীর পরিচয় দিব ? এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। সুতরাং পরিচয় পাঠক নিজেই পাইবেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, এই বইখানি বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, অত্যুজ্জ্বল রত্ন।

গুল-দাস্তা।—এস, ওয়াজেদ আলী প্রণীত, মূল্য একটাকা। ছোট ছোট আটটি গল্প দিয়া এই গুল-দাস্তা গ্রথিত হইয়াছে। লেখক আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ওয়াজেদ আলীসাহেব। ইঁহার অনেক লেখা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা পুলিশ কোর্টের বিচারকের কাজ করিয়াও অবসর সময়ে ইনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের চর্চ্চা করেন। ইনি অনেক সভাসমিতিতে বলিয়াছেন, বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। ইনি তাই বাঙ্গালা ভাষারই চর্চ্চা করেন ; গুল-দাস্তা তাহারই ফল। গল্পগুলি সবই সুন্দর, সবই সুলিখিত। গ্রন্থকার যদি একমাত্র 'রোস্তম-খাঁ' গল্পটী লিখিতেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করিতাম, এমন গল্প আমরা কমই পড়িয়াছি।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব।—শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম-এ প্রণীত, মূল্য ২৲ টাকা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের একজন খ্যাতনামা প্রচারক। তিনি সুধী, সুপণ্ডিত ; তত্ত্ববিদ্যায় তিনি একজন আচার্য্যস্থানীয়। তাঁহার ন্যায় মনীষাসম্পন্ন সুলেখকের লেখনী-নিঃসৃত এই চৈতন্য জীবনী আমরা পরম আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি। ভক্ত সাধক যে ভাবে লেখনী চালনা করেন, শ্রদ্ধেয় হেমবাবুও তাহাই করিয়াছেন, কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই ; সেইজন্যই এই পুস্তকখানি এমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। হেমবাবু যথার্থই বলিয়াছেন—"আমরা বিশ্বাস করি, এমন দিন আসিবে যখন সমগ্র জগতে ধর্ম্মপিপাসু ব্যাকুলাত্ম নরনারীগণ এই জীবনের মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন এবং শ্রদ্ধাভরে ইঁহার মহত্ত্ব স্বীকার করিবেন।" পুস্তকখানি বাঙ্গালাদেশের ভক্ত নরনারীর কণ্ঠভূষণ হওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ণিমাসুন্দরী।—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা। এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা সত্যসত্যই মুগ্ধ হইয়াছি ;—মুগ্ধ হইয়াছি ইহার ভাষার সৌন্দর্য্যে, ইহার বর্ণনাকৌশলের জন্য মুগ্ধ হইয়াছি ইহার ঘটনাসংস্থানের জন্য, ইহার সুন্দর চরিত্র চিত্রণে। এখনকার দিনে যে ভাবে উপন্যাস লিখিত হয়, পূর্ণিমাসুন্দরীতে তাহা নাই ; কিন্তু যে আদর্শ প্রদর্শনের জন্য নবীন প্রবীণ উভয় সম্প্রদায়ের লেখকগণ চেষ্টা করিতেছেন এই উপন্যাসলেখকও তাহার ত্রুটী করেন নাই ; হিন্দুধর্ম্মের অনুমত শাস্ত্রবিধি ও হিন্দুসমাজে প্রচলিত আচার-ব্যবহারবিধির সহিত মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক ও সনাতন সর্ব্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষা বা প্রেমবৃত্তির বিরোধই এই উপন্যাসের অবলম্ব।

চিত্ত চিতা।—শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর প্রণীত ; মূল্য ছয় আনা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরলোকগমনের পর সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীমান কালিদাস বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছিলেন সেইগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। কবির বিয়োগে কবির মর্ম্মোচ্ছ্বাস যে হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। চিত্তরঞ্জনের কথা অনেকেই বলিয়াছেন, ভাল করিয়াই বলিয়াছেন ; কবি কালিদাসও বলিয়াছেন, একেবারে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া বলিয়াছেন। ছোট হইলেও চিত্ত-চিতা পরম উপাদেয় হইয়াছে।

কৌমুদী।—৺মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ প্রণীত ; মূল্য চৌদ্দ আনা। সুসঙ্গের মহারাজ পরলোকগত কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে রাজর্ষি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই বিনয়ী মিষ্টভাষী ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের রাজা মহারাজাগণের মধ্যে তাঁহার তুল্য নিরহঙ্কার পণ্ডিত ব্যক্তি অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতশাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে তাঁহার যে আস্থা ছিল তাহা অতুলনীয়। তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন ; অনেক সাময়িক পত্রে বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীবিতকালে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে 'কৌমুদী' নামে প্রকাশিত হয়। এতদিন পরে তাঁহার সুযোগ্য, সুধী সুবিদ্বান পুত্র মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহোদয় স্বর্গীয় পিতৃদেবের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। প্রবন্ধ কয়টী পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় স্বর্গীয় মহারাজ কেমন পণ্ডিত ছিলেন, কেমন ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, কেমন উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যিক ছিলেন।

ডেপুটীর জীবন —শ্রীগিরিশচন্দ্র নাগ বি-এ প্রণীত ; মূল্য আড়াই টাকা। শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু দীর্ঘকাল ডেপুটীগিরি করিয়া এখন অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার জীবন-কথা বিবৃত করিয়াছেন। এ বিবরণ অতি সুন্দর হইয়াছে ; ডেপুটীদিগকে অনেক সময় উপরওয়ালাদের যে অত্যাচার অবিচার সহ্য করিতে হয়, গিরিশবাবু তাহা সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। পড়িলে অনেক রহস্য জানিতে পারা যায়।

রূপতৃষ্ণা।—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত ; মূল্য এক টাকা। সুলেখক খগেন্দ্রবাবুর অনেক ছোট গল্প ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। এই রূপতৃষ্ণা' তাঁহার প্রথম উপন্যাস ; কিন্তু প্রথম হইলেও ইহাতে কাঁচা হাতের কোন নিদর্শন নাই ; যেমন চরিত্র চিত্রণ, তেমনই রচনা-সৌষ্ঠব একেবারে পাকা হাতের লেখা। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি।

নেশার ঘোরে।—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম এ প্রণীত, মূল্য ১৷৵০। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রবাবু এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন ; আমরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে এই উপন্যাস ছাপিতে বলি। পাপের ছাপ, অন্যায় কার্য্যের প্রেরণা যে মানুষকে সহজে ছাড়িতে চায় না, এই উপন্যাসে তাহা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নীলমণির চিত্র অতি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে আগাগোড়া বেশ সামঞ্জস্য আছে।

ব্যায়ামে বাঙালী।—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ বি-এ প্রণীত, মূল্য এক টাকা। বাঙ্গালীর মধ্যে শক্তিসাধক কৃতি পুরুষের নিতান্ত অভাব নাই, তাঁহাদের কর্ম্মজীবনের সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্য লইয়াই এই পুস্তকখানি লিখিত। শক্তি সাধনা না করিলে বাঙ্গালীর আর কল্যাণ নাই ; এই কথা মনে করিয়াই সুলেখক অনিলবাবু এই পুস্তকে শ্যামাকান্ত, পরেশনাথ, ভীমভবানী গোবর, ফণীন্দ্রকৃষ্ণ, রাজেন, মহেন্দ্রনাথ, ননীলাল, বলাই প্রভৃতি ব্যায়াম-বীরের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা অনিলবাবুর এই প্রচেষ্টার সাধুবাদ করিতেছি। শ্যামাকান্ত ভীমভবানী, গোবর, রাজেন ঠাকুর প্রভৃতি বীরের প্রতিকৃতি দ্বারা এই ক্ষুদ্র পুস্তক সুশোভিত হইয়াছে। ঘরে ঘরে এই বইখানি থাকা প্রার্থনীয়।

পরিণাম।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম-এ প্রণীত ; মূল্য ১।০। উপন্যাসের আবরণে জাতিভেদ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা এই উপন্যাস প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। আজকালকার নবীন লেখকগণ যে ভাবে যে ভাষায় যে উদ্দেশ্যে উপন্যাস লিখিয়া থাকেন, এখানিতে তাহা নাই ইহা আগেকার ধরণে লিখিত। তাহা হইলেও উপন্যাসখানি অনেকের ভাল লাগিবে।

সুভদ্রা।—শ্রীবগলামোহন দাশ গুপ্ত বি-এল্ প্রণীত ; মূল্য আট আনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 'কবি নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে নারীচরিত্র' সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে একটী রৌপ্যপদক প্রদানের সংবাদ ঘোষণা করেন। শ্রীযুক্ত বগলামোহন বাবু এই 'সুভদ্রা' লিখিয়া সেই পদক প্রাপ্ত হন। নবীনবাবুর সুভদ্রা চরিত্রকে প্রবন্ধলেখক অতি সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বইখানির ভাষাও বিষয়োপযোগী হইয়াছে।

বুকের বালাই।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ প্রণীত ; মূল্য এক টাকা। এখানি দুর্গাচরণ সিরিজের তৃতীয় পুস্তক। ইহাতে কয়েকটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে ; কবিতাগুলি পূর্ব্বে নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতা কয়টী কষ্টকল্পিত নহে। লেখকের কবিত্ব শক্তির পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায় ; ঝুঁটা ভাব-প্রবণতা বা ন্যাকামী মোটেই নাই।

বিদায়ের গান।—শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু প্রণীত; মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা পুস্তক। প্রিয়া বিয়োগে অধীর লেখকের শোকোচ্ছ্বাস। কবিতাগুলি মামুলী ধরণের নহে, কবির বিশেষত্ব বেশ ধরিতে পারা যায়। বইখানির কাগজ, ছাপা, ছবি বেশ ঝক্‌ঝকে।

মহাত্মার অহিংস ধর্ম্ম।—শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র ধর্ম্মসারঙ্গ প্রণীত, মূল্য আটআনা। মহাত্মা গান্ধী যে অহিংসধর্ম্ম প্রচার করেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহারই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশবাবু বিশেষ নিপুণতার সহিত অহিংসধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুরেশবাবু বলিয়াছেন, গীতোক্ত ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলেই অহিংসাব্রত পালন করা হয়। ইহাই প্রকৃত কথা এবং এ কথা পরম নিষ্ঠার সহিত তিনি বিবৃত করিয়াছেন।

সাধনার গৃহে।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য আটআনা। লেখক নিজে সাধক। তিনি তাঁহার জীবনে সাধন পথে প্রবেশ করিয়া যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। ভক্ত সাধকের প্রাণের কথা, ইহার পরিচয় ভক্ত প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিবেন।

নীল-সবুজের প্রাণের দোলায়।—শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য দশ আনা। এই কবিতা পুস্তকের ভূমিকায় সুকবি শ্রীমান্ কালিদাস রায় বলিয়াছেন 'কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হইল যেন একখানি উপলকঙ্করময় মুক্ত পল্লীপ্রান্তরের উপর দিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে করিতে চলিয়াছি'—ইহাই এই কবিতা-পুস্তকের পরিচয়। কবির ভবিষ্যৎ সত্য সত্যই উজ্জ্বল; তাঁহার কবিতার মাধুর্য্য সত্যসত্যই প্রাণ স্পর্শ করে।

রঙের গোলাম।—শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত বি-এ প্রণীত; মূল্য একটাকা। এই ছোট বইখানিকে উপন্যাস বলিয়া পরিচয় দেওয়া ঠিক হইবে না, ইহা একখানি চিত্র, একখানি দৃশ্যপট। লেখক অতি সুন্দরভাবে এই চিত্রে তুলিকাপাত করিয়াছেন। যে করুণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বেশ ঝরঝরে। লেখকের বলিবার ভঙ্গীও সুন্দর।

মালা বদল।—শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী প্রণীত, মূল্য দুইটাকা দশ আনা। চিত্তরঞ্জন নামটাতেই কি যেন আছে। এক চিত্তরঞ্জন ত্যাগের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ছিলেন, আর এক চিত্তরঞ্জন আনন্দের অফুরন্ত উৎস। সেই উৎস হইতে যে আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই একটা ধারা এই মালা বদল। ইহার পরিচয় দেওয়া আমাদের কাজ নহে—চিত্তরঞ্জন নামই তার পরিচয়। এখানি হাসির, আনন্দের অনাবিল প্রবাহ। চিত্তরঞ্জন যে বহুরূপী, তাহা সকলেই জানেন। এই মালা-বদলে তাঁর বহু রূপ কথায় ও চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুঃখ কষ্টের দিনে চিত্তরঞ্জনের মালা বদল দেখিয়া সত্যই ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিয়া যাইতে হয়—এ বড় সাধারণ কথা নহে।

স্নেহের মূল্য।—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত, মূল্য দুইটাকা। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর নাম বাঙ্গালা কথা সাহিত্যক্ষেত্রে অতি পরিচিত; তাঁহার লেখনীর বিরাম নাই; তিনি অবিশ্রান্তভাবে গল্প ও উপন্যাস লিখিতেছেন, অথচ তাঁহার কোন লেখাই উপেক্ষা করিবার যো নাই; তাঁর সকল লেখাই সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী। এই স্নেহের মূল্যই তাহার অন্যতম প্রমাণ। তিনি যখন যাহা লেখেন, প্রাণ দিয়া লেখেন, তাই তাঁহার গল্প ও উপন্যাসগুলি প্রাণের নিভৃত কোণে পর্য্যন্ত পৌঁছায়। এই স্নেহের মূল্য উপন্যাসখানিতে তাঁহার অঙ্কিত মৃন্ময়ী, যশোদা ও তৃপ্তির চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে লেখিকার অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহস্থ ঘরের সুখ দুঃখের কথা তিনি অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেন। তাঁহার এই স্নেহের মূল্য যে তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় আদর লাভ করিবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহমাত্র নাই।

স্নেহলতা।—শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্ প্রণীত, মূল্য পাঁচসিকা। এই উপন্যাসখানির নাম দেখিয়া এবং ইহা সত্য ঘটনা-মূলক জানিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল, ইহা হয় ত কেরোসিনে দগ্ধা স্নেহলতারই জীবন কথা; কিন্তু বইখানি পড়িয়া দেখিলাম, এ সে স্নেহলতা নহে, আর একজন। সে স্নেহলতা কেরোসিনে পুড়িয়া অল্প সময়ের মধ্যে সকল জ্বালা জুড়াইয়াছিল, এ স্নেহলতা ধীরে ধীরে পুড়িয়া মরিয়াছে। সত্য ঘটনা যে কল্পনাকেও অতিক্রম করিয়া থাকে, এই সত্য-ঘটনামূলক উপন্যাসখানিই তাহার প্রমাণ। গ্রন্থকার প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া দিয়া এই কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাই ইহা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে।

ভ্রমণ-কাহিনী।—শ্রীশচীভূষণ মিত্র প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। গ্রন্থকার মাদ্রাজ, বোম্বাই, নাগপুর, পুণা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া যে সকল দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন, তাহাই সুললিত কবিতায় এই ভ্রমণ কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিতাগুলি সুন্দর এবং বর্ণনাও মনোহর; কবিতায় লিখিত হইলেও নানাস্থানের ইতিহাস ও কাহিনী বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ভোরের পাখী।—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্ প্রণীত; মূল্য ৸৹ আনা। এই বইখানিতে সুকবি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল রচিত ২৫টি গান আকার-মাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতিতে প্রদত্ত হইয়াছে। গানগুলি কবিত্বে ও সৌন্দর্য্যে মাখা; প্রত্যেক গান কবির অন্তর্লোকের প্রেমের রঙে রঞ্জিত, অকৃত্রিম ও সুন্দর। গানগুলির সুরও সুমিষ্ট ও গানের ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। সুরগুলির অধিকাংশই খাঁটি রাগরাগিণী-সম্বলিত হওয়ায় প্রাচীন রাগরাগিণীর মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। স্বরলিপি নিখুঁতভাবে করা হইয়াছে, সূক্ষ্ম সুরগুলি পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই। যেগুলি মিশ্রিত সুর করিয়াছেন, তাহারও সুর-সংযোগ সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকটির প্রারম্ভে স্বরলিপির তত্ত্ব সম্বন্ধে বেশ সহজভাবে বুঝানো হইয়াছে। বাংলা গান-শিক্ষার্থীগণ এই পুস্তকখানি পাইয়া আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। কয়েকটি গান বড়ই মিষ্ট লাগিল, "সুন্দর কেন ফুল," "বিমল প্রভাতে বিমল আলোকে," "নিশীথের তারারা সব" ইত্যাদি।

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত-সুধা।—শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী প্রণীত ; মূল্য ৩৲ টাকা। এই মনোজ্ঞ পুস্তকখানিতে বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর পুরাতন হিন্দি খ্যাল, টপ্পা, ঠুম্‌রী, ভজন, গজল প্রভৃতি গানের স্বরলিপি আকার-মাত্রিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। গিট্‌কারী, গমক ও মীড়যুক্ত নানাবিধ তান ও বাঁট প্রদত্ত হওয়ায় পুস্তকখানির উপকারিতা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। শক্ত ও সহজ গানের ইহাতে এরূপ সমাবেশ আছে যে ইহা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতবিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী, এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায়। গানগুলির নির্ব্বাচন বড়ই সুন্দর হইয়াছে—প্রায় সমস্ত রাগরাগিণীরই ২১১টি করিয়া গান দেওয়া হইয়াছে—পরিশেষে কয়েকটি বাংলা গানও আছে। স্বরলিপিগুলি আকার-মাত্রিক পদ্ধতিতে প্রদত্ত হওয়ায় আধুনিক কালের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বোধ হয়। প্রাচীন হিন্দি গানের স্বরলিপি পুস্তক বিশেষতঃ এরূপ নানাপ্রকার তান, বাঁটসহ খ্যাল, টপ্পা, ঠুম্‌রী গানের স্বরলিপি পুস্তক নাই বলিলেই হয়। সঙ্গীতাধ্যাপক সুশিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তা সঙ্গীতজ্ঞা শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রাচীন হিন্দুসঙ্গীতের রক্ষাকল্পে যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি দেশবাসীর অশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও প্রতিভা পুস্তকখানির ছত্রে ছত্রে বিরাজমান। সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই যে ইহা আদরের বস্তু হইবে সন্দেহ নাই। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

সন্তবাণী।—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ সঙ্কলিত, মূল্য ছয় আনা। কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদিগের বাণী বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ঈশ্বরবাবু প্রকৃতপক্ষেই অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন। এ সকল বাণী অমূল্য, অতুলনীয়, প্রত্যেকটী বীজমন্ত্রের ন্যায় গ্রহণীয় ও পালনীয়। এই সন্তবাণী অমৃতের প্রস্রবণ। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরবাবু এই বাণী সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

মুস্কিল-আসান।—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত ; মূল্য আট আনা। ছোট ছোট কয়েকটী বালক-পাঠ্য গল্প দিয়া শ্রীমান হীরেন্দ্র এই মুস্কিল-আসানের বাতি জ্বালিয়াছেন। গল্পগুলি অতি মনোরম এবং শিক্ষাপ্রদ, শ্রীমানের লিখিবার ভঙ্গীও অতি সুন্দর। প্রত্যেক গল্পটী তকতকে, ঝকঝকে ; ছবিগুলিও বেশ। প্রথম গল্প মুস্কিল-আসান চমৎকার। ছেলেমেয়েরা এখানি পড়িয়া ত আনন্দলাভ করিবেই, আমরা বুড়ারাও বেশ আমোদ পাইলাম। নবীন লেখককে আশীর্ব্বাদ করি, তিনি আরও এই রকম বই লিখুন।

তীর্থের পথে।—শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৪৲। এখানি ভ্রমণ কাহিনী। লেখক মহাশয় দক্ষিণাপথ ব্যতীত ভারতের প্রায় অধিকাংশ তীর্থই পর্য্যটন করিয়াছেন ; কেদার বদরীতে যান নাই। এই 'তীর্থের পথে' পুস্তকে সেই সকল স্থানের বিবরণ সুন্দর ও সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা তীর্থস্থানে গমন করিবেন, এই পুস্তক তাঁহাদের পথিপ্রদর্শকের (guide) কাজ করিবে। ত্রিবর্ণ ও একবর্ণের বহু চিত্রে পুস্তকখানি সুশোভিত। (ক) ও (খ) চিহ্নিত পরিশিষ্ট ভবিষ্যৎ ভ্রমণকারীদিগের অনেক তথ্য যোগাইবে। আমরা লাহিড়ী মহাশয়ের 'তীর্থের পথে' পড়িয়া প্রীত হইয়াছি ; তীর্থভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তিগণ এ বইখানির আদর না করিয়াই থাকিতে পারিবেন না।

দিল্লী-স্মৃতি

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

দিল্লী! তুমি মানবের রাষ্ট্র-ইতিহাসের মহাশ্মশান ; জাতির গৌরব-গরিমার ব্যথাভরা স্মৃতি ; অতীতের উত্থান,পতনের জ্বালাময়ী ইতিহাস ; তুমি অমর, অক্ষয়, অজেয়, কীর্ত্তিমান। তুমি প্রলয়ান্তকারী ধ্বংসের বুকে, যুগে-যুগে কত নব সৃষ্টি দেখিয়াছ। আবার সৃষ্টির বুকে কত যুগান্তকারী ধ্বংসের মহাপ্লাবন দেখিয়াছ। তুমি কবির কাব্য, ঐতিহাসিকের গবেষণার ব্রহ্মদণ্ড ; প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রাণময়ী, মনোময়ী রত্ন-ভাণ্ডার। তুমি হিন্দু-মুসলমানের মহামিলনের সন্ধিস্থল, আবার চিরবিচ্ছেদের মহাশ্মশানে চিতাচুল্লীর দগ্ধকাষ্ঠ। কত "দেশ দেশ নন্দিত করি" মোগল, পাঠান, তাতার, মহারাষ্ট্র, রাজপুত, জাঠা, তোমার বুকের উপর দিয়া বিজয় শকট চালাইয়া গিয়াছে। কত দম্ভ, অহঙ্কার, সতীত্বের তেজ, বীরত্বের আস্ফালন, তোমার ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে। কত বিরহিনীর দীর্ঘনিশ্বাস, কত নিরাশ-প্রেমিকের হা-হুতাশ, কত সৈনিকের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তোমার ঐ প্রস্তরীভূত সমাধিস্তূপের অন্তরের অন্তঃস্থলে জাগ্রত স্বপ্নের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। তুমি সাধনার সিদ্ধপীঠ ; তুমি গরিমার কীর্ত্তিমেখলা ; তুমি

দাম্ভিকের দর্পচূর্ণকারী মহাকাল। তোমায় কেহ বলে ডেল্‌হি, কেহ বলে হস্তিনাপুর, কেহ বলে ইন্দ্রপ্রস্থ,—কিন্তু আমি জানি তুমি নামহীন, ভাষাহীন, অন্তহীন, ছন্দহীন। দিল্লী! তোমায় যেদিন যমুনার বুকের উপর হইতে প্রথম দেখিলাম, তখন দগ্ধ দিনের সূর্য্য অস্তাচলে যাইতেছিল। আমার মনে হইল এম্নিভাবে কত হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহাসিক সূর্য্য, তোমার যমুনার বুকে যুগে-যুগে অস্ত গিয়াছে। সেই অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় যখন কীর্ত্তিমান শাহজাহান বাদশাহের গগনচুম্বী, রক্তকরোজ্জ্বল প্রস্তর-দুর্গ দেখিলাম, তখন প্রাণের ভিতর "রহিয়া রহিয়া কাহার পরাণ বীণা" যেন বাজিয়া উঠিল। মনে হইল, কোথায় সেই নীল-সলিলা যমুনা, "কোথায় সেই শাহানশাহ্‌ দিল্লীশ্বরোবা, জগদীশ্বরোবা" আর আজ কোথায় তাঁহার কীর্ত্তি! তুমি প্রাণময়ী, ভাষাময়ী, ভাবময়ী, কল্পনাময়ী বাস্তব সত্য। তোমায় সুধু স্থূল চ'ক্ষে দেখিলে চলিবে না, তোমায় কেবল কল্পনার স্পন্দনে অনুভব করিলে চলিবে না; তোমায় কেবল প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার ছন্দে বিচার করিলে চলিবে না; তোমায় কেবল ঐতিহাসিকের উপাদানের লৌহকটাহে দগ্ধ করিলে চলিবে না; তোমাকে কায়-মনোপ্রাণে, ভাবে, ভাষায়, বাক্যে, কাব্যে, সাহিত্যে, অলঙ্কারে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সত্যে, নিষ্ঠায়, ধর্ম্মে, কর্ম্মে মর্ম্মে-মর্ম্মে আজীবন ভরিয়া অনুভব করিতে হইবে। আমি সুধু তোমায় দু'দিনের তরে দেখিয়াছি; তোমায় সারাজনম ভরিয়া দেখিলেও সাধ মিটে না। এক একবার মনে হয় তুমি "জোয়ান-অব-আর্কের" মত, ক্যাথারিণ ডি-মেডিসির মত, অথবা সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার মত আপন গরবে আপনিই গরবিনী। আবার এক একবার মনে হয়, তুমি নেপোলিয়ন, কাইসার, বিস্‌মার্ক, কামাল, জগলুলের মত অতিমানব। তোমার আদিও নাই, তোমার অন্তও নাই। তুমি চিরধ্বংস, তুমি চিরসৃষ্টি।

যেদিন কুতব মিনারের উর্দ্ধতন স্তম্ভের উপর হইতে তোমায় দেখিলাম, সেদিন কেবলই দেখি চতুর্দ্দিকে ধ্বংসের স্তূপ, ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারের গরিমামণ্ডিত স্মৃতিরেখা; আর দূরে শীর্ণকায়া যমুনা, মধ্যাহ্ণ মার্ত্তণ্ডের তেজে, তপ্তমরুর বুকে স্নেহকরুণার নির্ঝরধারার ন্যায় গলিয়া পড়িতেছিল। মেঘমুক্ত, সূর্য্যকরোজ্জ্বল নীল-নভোমণ্ডলের নীচে কত দূর দূরান্তরে বিশাল বক্ষ এলাইয়া তুমি পড়িয়া আছ—বিরাট, মহান্‌, দিল্লী। কোন্‌ পুত্রহারা জননীর ন্যায়, পতিবিরহিনী, পতিপ্রাণা হিন্দু সতীর ন্যায়, তোমার আকাশে বাতাসে, একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ভাসিয়া আসিতেছিল। সে সুরে যেন কেবলই নাই, নাই. হায়, হায় রবের প্রতিধ্বনি ছিল। সে স্মৃতির মানসপটে কত প্রেম, স্নেহ, করুণার অমিয়ধারা কেবল বিষাদের অশ্রুজলে তোমার তপ্তমরুর বুকে শুকাইয়া যাইতেছিল। কবি তোমার রূপ বর্ণনা করিতে পারে না। ঐতিহাসিক তোমার অন্তরের ভাষা বোঝে না, তোমার পুঞ্জীভূত বেদনার জলন্ত ইতিহাসের সন তারিখের হিসাব নিকাশ জানে না। প্রত্নতাত্ত্বিকের এমন প্রাণ নাই, যাহা দিয়া সে তোমার প্রস্তর-বক্ষ হইতে মর্ম্মের করুণ কাহিনী উদ্‌ঘাটন করিতে পারে। তোমার প্রতি প্রস্তরে কথা বলে; প্রতি কবরের মধ্যে আমি ভাষার আভাস পাইয়াছি; প্রতি দুর্গ-প্রাকারে আমি অতীতের অগণিত অশ্বারোহীর পদশব্দ শুনিয়াছি; প্রতি "তোরণে" আমি শুনিয়াছি,—"মন্দ্রিত তব ভেরী"; প্রতি কক্ষে কক্ষে নীরবতার মধ্য হইতে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, রণ-দামামার গম্ভীর রোল, প্রবাসী বাঙ্গালীর বুকে কত "নাদির শা," "আহম্মদ-সাহ্‌-আবদালী," কত ভোন্‌স্‌লা, কত পদ্মিনী, কত আলাউদ্দিনের জীবন্ত মূর্ত্তির সন্ধান বলিয়া দিতেছিল। মর্ম্মরপ্রস্তর-মণ্ডিত বিশাল দরবার-কক্ষে দাঁড়াইয়া কত আমীর, ওম্‌রাহ্‌, কত জয়সিং, যশোবন্তসিং, কত বঙ্গ, বিহার, গুর্জ্জর, মাদ্রাজ, উৎকল, রাজপুতনার স্মৃতি-বিজড়িত আসমুদ্র হিমাচলের এক মহান চিত্র আমার মানসপটের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কত "বাদ্‌শা বেগম ঝম্‌ ঝমাঝম" হারেমের মধ্যে প্রবেশ করিলে আমার হৃদয় উৎকণ্ঠায় কাঁপিয়া উঠিল। যে স্নানাগার একদিন "নির্ম্মক্ষিক" ছিল, যে "খুস্‌রোজ," "নৌরোজ," একদিন পুরুষশূন্য ছিল, সেই সব স্থানে আজ দর্শকের মেলা বসিয়া গিয়াছে। সেই সব "মতিমহাল," আজ পাদুকার অপবিত্র ধূলি স্পর্শে মলিনতায়, পঙ্কিলতায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেছে। যে স্ফটিকস্বচ্ছ মর্ম্মরবেদীর উপর একদিন বিশ্ববিশ্রুত "ময়ুর-সিংহাসন" স্থাপিত ছিল, আজ সেখানে দূরাগত দর্শকের উষ্ণীষ রাখিবার স্থান হইয়াছে। ফিরিবার সময় একজন সঙ্গীন ঘাড়ে ইংরেজ সৈনিককে কোনও একটী দুর্গদরজা বন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা

করায় সে বলিল,—Babu, Delhi gate is closed for ever"।

দিল্লী! তোমায় দেখিতে দেখিতে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়; ভাবিতে ভাবিতে "নৃত্য পাগলছন্দে" আপনহারা হইয়া যাই। লিখিতে লিখিতে লেখনী শিথিল হইয়া আসে। তুমি কখনও বা স্নেহময়ী করুণারূপিণী জননী,—তোমার যুগ-যুগ-ধন্য সন্তানকে বক্ষে লইয়া আপন গরবে আপনিই গরবিনী হইয়া আছ; আবার কখনও বা করালিনীর খর্পর লইয়া ধ্বংসের সৃষ্টি করিতেছ, পদতলে কত "মহাকাল" লুটাইতেছে। তুমি "কখনও ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্য," কখনও বা স্নেহ-করুণার অমৃতভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়া হাসিয়া, গলিয়া, লুটাইয়া পড়িতেছ।

দিল্লী! তোমায় দেখিয়া নয়ন সফল করিয়াছি, জীবন ধন্য করিয়াছি। তুমি যুগ-মানবের মহাতীর্থ। তুমি জাতীয় জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঘুমন্ত জাতির বুকে জাগ্রত চেতনাময়ী মহাশক্তি। তুমি তোমার অগণিত শিলাস্তূপে, কত শিক্ষা, স্বাধীনতা, স্নেহ, করুণার নির্ঝরধারা লুকাইয়া রাখিয়াছ, কে বলিবে? দিল্লী! তুমি হিন্দুর হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ; তুমি মুসলমানের "দিল্লীকা লাড্ডু!" তুমি ইংরেজের "New Delhi" বা 'রাইসেনা।' তুমি চঞ্চলা কমলার ন্যায় কেবলই আপন মনে চলিয়াছ। তোমার ধ্বংস নাই। সর্ব্বধ্বংসী কাল, তোমার বুকে একদিকে ধ্বংস আর একদিকে সৃষ্টির উন্মেষ দেখিয়া অট্ট হাস্যে দিগন্ত প্রকম্পিত করিতেছে। আর আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী, সেই দিল্লী-তীর্থের "মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়াইয়া" জীবনকে ধন্য-জ্ঞান করিতেছি।

মধ্যাহ্নের মধ্যপ্রহরে "হস্তিনাপুর," ইন্দ্রপ্রস্থের বিশাল প্রান্তরে দাঁড়াইয়া ছিলাম। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ভগ্ন মন্দিরের মধ্য হইতে কি যেন এক অতীতের বিরহ-স্মৃতি ভাসিয়া আসিতেছিল। আমি কেবলই ভাবনার আবেশে আপন-ভোলা হইয়া দূর দূরান্তরে চলিয়াছিলাম। মাথার উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তাণ্ডবলীলা। আমার বহির্জগতের কোনও অনুভূতিই ছিল না। মাঝে-মাঝে সেই পুণ্য-মহাতীর্থের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইতেছিলাম। মাঝে-মাঝে, প্রাণের আবেগে ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারের বিশাল শিলাস্তম্ভকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেছিলাম। আমার যা'রা প্রবাসের প্রবাসী বন্ধু ছিল, তা'রা হয় ত আমাকে পাগল ভাবিয়া মোটরে যাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু, আমার তখন আহার নাই, নিদ্রা নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, শান্তি নাই, অশান্তি নাই,—কি যেন এক তন্ময়ভাবে বিভোর হইয়া দূর দূরান্তরে ছুটিয়াছিলাম। এই ত সেই পুণ্যভূমি, যেখানে একদিন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরবৃন্দের সমাবেশ হইয়াছিল। এই ত সেই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। এই ত সেই যুগ-মানবের ধ্বংস এবং সৃষ্টি, আদি এবং অন্তের, অনাদি, অনন্ত ইতিহাস। এই সেই কুরু-পাণ্ডবের হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, যেখানে ময়দানবের অপূর্ব্ব পুরী শোভা পাইত; যেখানে ভারতসম্রাট দুর্য্যোধন জলভ্রমে স্ফটিক-নির্ম্মিত-বাপী-তটে উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। এই সেই পুণ্যভূমি, যেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত বিদুরের পর্ণকুটীরে ক্ষুদকণা গ্রহণ করিয়া ভক্তের মান বাড়াইয়াছিলেন। এইখানেই তিনি কুরুপাণ্ডবের মহাসভায় যাজ্ঞসেনীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। এই সেই রাজ্য-ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার, হর্ষশোকান্বিত, দম্ভ-অহঙ্কারসংযুক্ত, কামরাগবলান্বিত ব্যথাভরা স্মৃতি। এ স্মৃতি যখনই মনের কোণে উদয় হয়, তখনই আপনা ভুলিয়া যাই। কত ঘটোৎকচ, হিড়িম্বা; কত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন; কত সপ্তরথী-বেষ্টিত বালক অভিমন্যু প্রভৃতি বীরবৃন্দের বীরত্বের নিদর্শন পাথরের বুকে জমাট অশ্রু হইয়া ফাটিয়া বাহির হইয়াছে। কত শকুনির অধর্ম্ম পাশার নিদর্শন, ধ্বংসের বুকে অট্ট অট্ট হাসি হাসিয়া মানবকে শিক্ষা দিতেছে। হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থে আছে কেবল ধূ ধূ বিশাল প্রান্তর, আর এক বিশাল শিলানির্ম্মিত বহুযোজনব্যাপী দুর্গ-প্রাকার। সে ত সুধু পাথর নয়,—সে যেন অতীত যুগের জীবন্ত মানবের অগণিত জাগ্রত প্রতিমূর্ত্তি,—কালের ইতিহাসে প্রাণের জমাট অক্ষরে তপ্ত অশ্রুর লেখা;—"হে অলক্ষ্য নিয়তি, হে সর্ব্বধ্বংসী কাল! হস্তিনাপুর আর ইন্দ্রপ্রস্থ তোমারই চক্রনেমির শেষ আবর্ত্ত।" তোমার বিশাল ধ্বংসের বুকে কত লীলারই যে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা স্বয়ং ভগবান লিখিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, আমরা ছার মানব তাহার কি বর্ণনা করিব? ছিল ত সবই; তোমার ঐশ্বর্য্য ছিল, গৌরব ছিল, তোমার শৌর্য্য, বীর্য্য, সাম্রাজ্য,—সবই ছিল,—কিন্তু, ধর্ম্মযুদ্ধে, অধর্ম্মের কি

খলাই দেখাইলে ভগবান! লীলাময়! তোমারই "সারথ্য-লীলার" শেষ নিদর্শন, আজ হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থের বিশাল প্রস্তরের বুকে, একটা তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস, একটা বুকফাটা ক্রন্দনের চীৎকার, প্রবাসীর হৃদয়ে কত স্মৃতি না জাগাইয়া দিতেছিল কে বলিবে?

হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়াইয়া সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরের ফটকে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানেই দিল্লীর শেষ বাদশাহ "শা'আলাম" বন্দী হইয়াছিলেন। এইখানেই মোগলের শেষ গরিমার সূর্য্যের অবসান হইয়াছিলেন। এই-খানেই পাশ্চাত্যের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছিল; প্রাচ্যের শেষ দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। মোগলের গৌরব, মোগলের কীর্ত্তিমেখলা, সমস্তই এক দূরাগত, নবাগত অতিথির পায়ে মাথা লুটাইয়া দিয়াছিল। ভাঙ্গা গড়া,—জগতের চিরন্তন নীতি। মোগল! তোমার "তাজ", তোমার ময়ুর-সিংহাসন, তোমার মতিমহাল, তোমার শিশমহাল, তোমার দিল্লী, লাহোর, ঢাকা সহর, তোমার গগনচুম্বী গম্বুজ, মীনার, বুরুজের উপর রক্ত-পতাকার অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত জলন্ত ছবি,—সবই আজও চক্ষের সম্মুখে রহিয়া রহিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। মোগল! তোমার "খুস্‌রোজ", নৌরোজ; তোমার বাদশাহী, তোমার আমীরি, তোমার মানসিং, জয়সিং, যশোবন্তসিং; তোমার তানসেন, টোডরমল্ল, দিলির খাঁ; তোমার সায়েস্তা খাঁ, তোমার আকবর, ঔরংজেব; তোমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাট্টা শিবাজী; তোমার "গোলকোণ্ডা" "বিজাপুর"; তোমার "আমখাস"; তোমার ফৈজি, আবুলফজল; তোমার রাজস্থান, হিন্দুস্থান;—তোমার যা কিছু গৌরবের, ঐশ্বর্য্যের ছিল,—সবই যে তোমার এই শেষ পরাজয়ের পবিত্র মন্দিরে আসিয়া আমার মানসপটে উদয় হইতেছে। এই সেই হুমায়ুন বাদশাহের শব-সমাধির পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত মহাশ্মশান, যেখানে ভারতের মোগলসূর্য্য, স্বাধীনতাসূর্য্য, জাতীয় সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল;—এই পবিত্র শবসমাধি-মন্দিরে বসিয়া আমার মনে হইতেছিল—কত দিনে আবার হিন্দু-মুসলমান তাহার "দিল্লী-স্মৃতি" বুকে করিয়া মানুষ হইবে।

হিন্দু, মুসলমান! দিল্লী যে তোমার কত শিক্ষার তাহা যদি আজও বুঝিয়া না থাক, তবে তোমার উত্থানের আশা সুদূর-পরাহত। যদি তুমি দিল্লীর গৌরব, দিল্লীর লজ্জা, দিল্লীর ঐশ্বর্য্য, দিল্লীর শৌর্য্য, দিল্লীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিক্ষা, তোমার প্রাণে, প্রাণে, মর্ম্মে, মর্ম্মে অনুভব করিতে পার, তবেই তোমার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে।—"কি যে ছিল, কি যে নাই",—যদি তাহা বুঝিতে পার, তবেই তোমার জীবন ধন্য হইবে, তোমার জাতীয় জীবন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। দিল্লীকে কেবল "দিল্লীকা লাড্ডু" ভাবিও না। এই "দিল্লীকা লাড্ডুর" লোভেই শতাব্দীর পর শতাব্দী, কত দেশ বিদেশের,—গজনী, ঘোর, দাস, খিলিজি, মোগল, পাঠান, তুর্কি, তাতার, আরব;—কত "মারাঠা", শিখ, কত রাজপুত, জাঠা, কত ইংরেজ, ফরাসী;—কত পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ; কত ওপারের "গোলন্দাজ"; এপারের "তীরন্দাজ";—কত ভাবে, কত ছাঁদে—এই ভারতে বাণিজ্যের পশরা সাজাইয়াছিল। আমি দিবা-স্বপ্নে চমকিয়া উঠিয়াছি,—মাঝে, মাঝে, কবরের মধ্য হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া কি কথা বলে। ভগ্ন মন্দিরের সহস্র ফাটলের মধ্য হইতে যেন কোন্ দেব-তার অভিসম্পাত বজ্র-নির্ঘোষে ভাসিয়া আসে—"মায় ভূঁখা হো।"

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

[১]

সকালে যখন রমাপদর ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। রাত্রে নিদ্রা যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া বিশুয়া তাহাকে জাগায় নাই; যৎসামান্য গৃহকর্ম্মের কিয়দংশ শেষ করিয়া সে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল।

অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের পর বিশ্রামান্তে যেমন সমস্ত শরীরে বেদনার একটা আড়ষ্ট ভাব লাগিয়া থাকে, রমাপদ তেমনি তাহার মনের মধ্যে একটা স্থূল ব্যথা বোধ করিতেছিল। খুব-যে টন্‌টন্ করিতেছিল তাহা নহে, কিন্তু দপদপ করিতেছিল। উদ্ভাসিত সূর্য্য-কিরণে সমস্ত ঘর, বাড়ি, অঙ্গন, প্রাঙ্গণ ভরিয়া ছিল; রমাপদ শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে উন্মুক্ত রকের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। এত রৌদ্র, এত আলো, এত অব্যাহত স্পষ্টতা,—তথাপি তাহার মনে হইল সম্মুখে যেন একটা ফিকা অন্ধকার তাল পাকাইতেছে। অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলে পাছে তাহার মধ্যে আবার একটা রক্ত-বিন্দুও আসিয়া যোগ দেয়, এই আশঙ্কায় সে অনাবশ্যক একটা হাঁক দিয়া বলিল, "বিশুয়া, চায়ের জল চড়া।"

বিশুয়া তাড়াতাড়ি ষ্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিল এবং ক্ষণকাল পরে হাতমুখ ধুইয়া রমাপদ ঘরে আসিয়া বসিলে তাহার সম্মুখে চা এবং জলখাবার আনিয়া ধরিল।

জলখাবারের বৃহৎ পাত্রটি বহুবিধ আহার্য্যে পূর্ণ,—লুচি তরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া টিকরি, গোপালভোগ, পান্তুয়া, খাজা পর্য্যন্ত কিছুই বাকি নাই।

আহার্য্যের আকার এবং প্রকার দেখিয়া রমাপদ ধমক দিয়া বলিল, "তোর বুদ্ধি-সুদ্ধিও কি তাদের সঙ্গে কাশী চ'লে গেছে যে, এই ফাঁসির জলখাবার আমাকে খেতে দিয়েচিস্? —জলখাবার এত কখনো কেউ খায়?"

নিজের বুদ্ধির প্রতি এই অকারণ দোষারোপে পুলকিত হইয়া উচ্ছ্বাসের সহিত বিশুয়া বলিল, "হামি কি জানে বাবু? ই বিলকুল মাজী সাজিয়ে রেখে গেছে। বোলেছিলো ফজীরে চায়ের সাথে বাবুর কাছে ধরিয়ে দিস্।"

রমাপদ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাই বটে! খাবারগুলি সাজাইয়া রাখিবার মধ্যে যে নিষ্ঠা এবং নিপুণতার পরিচয় রহিয়াছে, বিশুয়ার হস্ত হইতে তাহা বাহির হওয়া সম্ভবপর নহে। খাবারের পাত্রটা হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া সে বলিল, "এ-সব তুই নিয়ে খেগে যা। আমি শুধু চা খাবো।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশুয়া বলিল, "হামি কেতো খাবে বাবু? হানারভী তো মায়জী দিয়ে গেছে। বহুৎ খাবার আছে—চারদিনের মাফিক্।"

রমাপদ বলিল, "তা, ভালই ত। পথে দীন-দুঃখীর অভাব নেই,—তুই নিজের মতো রেখে তাদের বিলিয়ে দে,—তোর মাজীর পুণ্যি হবে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বিশুয়া বলিল, "আপনি খান বাবু,—বিশনাথজী দরশন কোরে মাজীর বহুৎ পুন্ হোবে।"

ভৃত্যের প্রগল্‌ভতায় যেন বিরক্ত হইয়াছে এই ভাবে ঈষৎ তাড়না দিয়া রমাপদ বলিল, "যা পালাঃ! বড়-বেশি ফাজিল হয়েচিস্ দেখ্‌চি!" মনে মনে বলিল, বাড়ির বিশনাথটিকে পরিত্যাগ ক'রে কাশীর বিশ্‌নাথজী দর্শন ক'রলে মাজীর কত পুণ্য হয় তা দেখা যাবে।

তাড়া খাইয়া বিশুয়া প্রস্থান করিল, কিন্তু খাবারের থালা লইয়া গেল না। মাত্র চায়ের পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া খাবার স্পর্শ পর্য্যন্ত না করিয়া রমাপদ উঠিয়া পড়িল। সামনের আল্‌নায় মিণ্টুর কয়েকটা আধময়লা জামা ও সরমার একখানা শাড়ি ঝুলিতেছিল; চোখে পড়িতেই রমাপদ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল, তাহার পর বিশুয়াকে ডাকিয়া সেগুলা সরাইয়া রাখিতে আদেশ করিল।

এ সকল হয়ত অভিমানেরই লক্ষণ ; কিন্তু মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত এই অভিমানের ভিতর একটা কঠোর সঙ্কল্প দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছিল ; বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। স্ত্রী-পুত্ররূপ নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া দারিদ্র্যকে পূর্ব্বের মত আর দুরারোগ্য বলিয়া মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল, মন লঘু এবং দেহ সচল হইয়াছে ; এখন সমস্ত বাধা বিঘ্ন অনায়াসে অতিক্রম করা যাইতে পারে।

ক্ষণকাল মনে মনে নিবিড়ভাবে একটা কিছু চিন্তা করিয়া রমাপদ সত্বর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল এবং নিরবসর চিন্তায় বিমগ্ন থাকিয়া দ্রুতপদে সুজাগঞ্জে উপনীত হইল।

বাজারের দোকানপাট তখন সমস্ত খুলিয়া গিয়াছিল। রমাপদ "ভাগলপুর সিল্কষ্টোরের" দোকানে গিয়া প্রবেশ করিল। দোকানের বাঙালী কর্ম্মচারীদ্বয় সবেমাত্র খাতাপত্র বাক্স খুলিয়া বসিয়াছেন ; একজন চাকর ঝাড়ন লইয়া আলমারিগুলির কাঁচ ও কাঠ পরিষ্কার করিতেছে ; গ্রাহক ক্রেতার ভিড় তখনো তেমন হয় নাই।

রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "তারাচরণ বাবু এখনো আসেন নি ?"

বাঙালী কর্ম্মচারী দুইটির আকৃতি এবং প্রকৃতি বিভিন্ন হইলেও নামের অর্থের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে ঐকান্তিক অভেদ ;—একজনের নাম ননী, অপরের নাম মাখন। মাখন বলিলেন, "পূজো-আহ্নিক সেরে তাঁর আস্‌তে একটু বিলম্ব হয়। বেলা সাড়ে-নটা দশটার সময় তিনি আস্‌বেন।"

ননী বলিলেন, "তারই বা এমন বিলম্ব কোথায় ? একটু বসুন না রমাপদ বাবু।"

"তাই বসি" বলিয়া রমাপদ উপবেশন করিল।

রাজপথ দিয়া ব্যবসায়ী ব্যাপারী ক্রেতা বিক্রেতার ভিড় চলিয়াছিল ; খাবার-বিক্রেতা ফিরিওয়ালা কাঠের বারকোষে নানাপ্রকার খাবার সাজাইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া মাথার উপর ছড়ি ঘুরাইয়া কাক-চিল তাড়াইতে তাড়াইতে হাঁকিয়া যাইতেছিল ; ঘন-কালো শ্মশ্রুমণ্ডিত গম্ভীর-মুখ একজন বলিষ্ঠ মুসলমান প্রকাণ্ড আলবোলায় বৃহৎ তাওয়া ধরাইয়া পথিকদিগকে তামাক খাওয়াইয়া বেড়াইতেছিল,—আধ পয়সায় আধ মিনিটে যতটা টানিয়া লওয়া যাইতে পারে আপত্তি নাই ; টম্‌টম্‌, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোটরকারের শব্দ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। এই কোলাহলময় গতিশীল জনতার দিকে চাহিয়া রমাপদ ব্যগ্রোৎকণ্ঠিত মুখে বসিয়া রহিল। চক্ষের সম্মুখে যাহা দেখিতেছিল তদ্বিষয়ে যে সে ব্যগ্র নয়, উৎকণ্ঠার কারণ যে তাহার মনের মধ্যেই নিহিত তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যাইতেছিল।

হিসাবের খাতা লিখিতে লিখিতে বার দুই রমাপদর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া মাখন বলিলেন, "আপনাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্চে রমাপদবাবু। খবর সব ভালো ত ?"

সব খবরই যে ভালো এ কথা বলিতে রমাপদর মুখে বাধিল ; মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "খবর তেমন কিছু মন্দ নয়।"

"তবে ?—অসুখ বিসুখ করেনি ত ?"

মাথা নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "না, অসুখ-বিসুখ নয়। কাল একটু রাত জাগ্‌তে হয়েছিল, তাই বোধ হয় আপনার অমন মনে হচ্চে।"

ননী সকৌতূহলে বলিলেন, "কাল রাত্রে সুজাগঞ্জে যাত্রা শুন্‌তে এসেছিলেন বুঝি ?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "না, যাত্রা নয়।" মনে মনে বলিল, যাত্রাই বটে,—একেবারে দিক্‌শূলের পালা !

তারাচরণের আসিতে বেশি বিলম্ব হইল না। পথে তাঁহাকে দেখা যাইতেই রমাপদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিকটে উপস্থিত হইল।

সহাস্যমুখে তারাচরণ বলিলেন, "কি রমাপদ, খবর কি ? ভালো আছ ত ?"

রমাপদ বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

"আচ্ছা একটু বোসো,—এখনি শুন্‌ছি।" বলিয়া তারাচরণ দোকানে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে দেওয়ালে টাঙানো গুরুদেবের চিত্র প্রণামের পর অন্যান্য সামান্য মাঙ্গলিক ক্রিয়া শেষ করিয়া অল্পক্ষণ খাতাপত্র দেখিলেন। তাহার পর রমাপদর পাশে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "কি তোমার কথা বল, শুনি।"

যে-কথা বলিবার উত্তেজনায় রমাপদ ভিতরে ভিতরে প্রজ্বলিত হইতেছিল কোনো প্রকার ভূমিকা না করিয়া অতি সংক্ষেপে সে তাহা ব্যক্ত করিল, বলিল, "আমি রাজি

আছি আপনার কারখানার সিল্ক নিয়ে বোম্বাই কিম্বা যে-কোনোখানে হোক যেতে।"

রমাপদর আরক্ত মুখ দেখিয়া এবং আগ্রহের স্বর শুনিয়া বিচক্ষণ তারাচরণ বুঝিলেন ইতিমধ্যে এমন নূতন কিছু ঘটিয়াছে, যাহাতে সেদিনের আপত্তি আজ আর নাই ; তবুও জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সংসার ?—বউমা ?"

রমাপদর আরক্ত মুখ আরক্ততর হইয়া উঠিল ; বলিল, "সে বাধা আর নেই।"

সবিস্ময়ে তারাচরণ বলিলেন, "আর নেই ?—তার মানে ?"

"তাদের ব্যবস্থা হয়েচে।"

"কি রকম ব্যবস্থা ?—পাকা ?"

"হাঁা পাকাই।"

"কত দিনের মতো ?"

"তার কোনো মেয়াদ নেই। যতদিন দরকার হয় ততদিনের মতো।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তারাচরণ বলিলেন, "বিদেশে গিয়ে বাড়ি ফিরে আসবার জন্যে ব্যস্ত হবে না ত ?" কোনো প্রকার বিস্ময় অথবা উচ্ছ্বাস না দেখাইয়া রমাপদ বলিল, "না।"

তারাচরণ জানিতেন, চেষ্টা করিয়া যে শক্তিকে প্রবুদ্ধ করা হইয়াছে তদপেক্ষা স্বতঃপ্রবুদ্ধ শক্তি প্রবলতর হয়। যাহা আপনিই জাগিয়াছে, অনর্থক তাহাকে আর খোঁচা মারিবার প্রয়োজন নাই বুঝিয়া তিনি বলিলেন, "গ্রীষ্মকালের আরম্ভে প্রতি বৎসরই আমার লোক যায়। তা বেশ, এবার তুমিই যাও। তোমার মত শিক্ষিত, মার্জ্জিত লোক গেলে ফল ভালো হবে ব'লেই প্রত্যাশা করা যায়। কবে রওনা হতে চাও ?"

উৎফুল্ল মুখে রমাপদ বলিল, "আজই।"

রমাপদর কথা শুনিয়া তারাচরণ মৃদু হাস্য করিলেন ; তাহার পর রমাপদর দিকে একটু ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কিছু মনে কোরোনা রমাপদ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বউমার সঙ্গে বচসা করোনি ত' ?"

আরক্ত-স্মিতমুখে রমাপদ বলিল, "না।"

"তারা তোমার ভাগলপুরের বাড়িতেই থাক্‌বেন ত ?"

"না, তাঁরা কাল রাত্রের গাড়িতে কাশী গিয়েছেন।"

"সেখানে বোধ হয় তাঁদের কোনো অসুবিধা হবে না ?"

"না, তা হবে না।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তারাচরণ বলিলেন, "আজ রওনা হওয়া সম্ভব হবে না। অনেক চিঠি-পত্র লিখে দিতে হবে, নমুনার থান বাচতে হবে, দর ফেল্‌তে হবে, তোমাকে সমস্ত ব্যাপারটি ভাল ক'রে বুঝে-সুঝে নিতে হবে। আজ খাওয়ার পরই তুমি দোকানে এসো, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঠিক ক'রে নিয়ে কাল বেলা তিনটের গাড়িতে রওনা হ'য়ো।"

রমাপদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি যত শীঘ্র সম্ভব আসচি। কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে যদি সমস্ত গুছিয়ে নেওয়া যায় তা হ'লে আজ রাত্রি এগারোটার গাড়িতে ত যেতে পারি ?"

টাইম টেবল্ মিলাইয়া দেখা গেল তাহাতে কোনো ফল নাই ; সে ট্রেনে যাইলে প্রায় কুড়ি ঘণ্টা বম্বে মেলের অপেক্ষায় মোগল সরাইয়ে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

"তুমি কি ঐ সময়ের মধ্যে কাশী গিয়ে একবার বউমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাও রমাপদ ?"

সজোরে মাথা নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "মোটেই না! তারা ত মাত্র কাল এখান থেকে গেছে—এর মধ্যে দেখা কেন ?"

"আচ্ছা, তা হ'লে, কালই যাওয়া স্থির। আজ থেকে তোমার মাসিক চল্লিশ টাকা মাহিনে হ'ল, তাছাড়া বিক্রীর উপর টাকায় তিন আনা কমিশন। রাহা-খরচ, খাই-খরচ অবশ্য স্বতন্ত্র পাবে। কেমন, রাজী ত ?"

রমাপদ বলিল, "রাজী নিশ্চয়ই। আমি ত এ কথা জেনেই এসেছি।"

"বেশ, তা হ'লে এ বিষয়েও ও-বেলা যা হয় একটা লেখাপড়া সেরে রাখতে হবে।" সঙ্কুচিত হইয়া রমাপদ বলিল, "আপনার সঙ্গে আবার লেখাপড়া কেন ?"

তারাচরণ সহাস্যমুখে বলিল, "আমার সঙ্গে তোমার লেখাপড়ার দরকার না থাক্‌লেও তোমার সঙ্গে আমার লেখাপড়ার দরকার থাক্‌তে পারে। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর ব'লেই যে আমি তোমাকে ঠিক তেম্‌নি বিশ্বাস করি—তার কি মানে আছে ?"

মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে রমাপদ বলিল "সে কথা ঠিক।"

তারাচরণ বলিলেন, "ব্যবসার ব্যবহারের সঙ্গে আত্মীয়তার ব্যবহারের জট পাকিয়োনা রমাপদ ; তাতে ব্যবসাও নষ্ট হবে, আত্মীয়তাও নষ্ট হবে।"

কোনো কথা না বলিয়া সহাস্যমুখে রমাপদ প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ

৺রায় রমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর

বিগত ১লা ডিসেম্বর আমাদের সোদরাধিক স্নেহভাজন, সুকবি, রমণীমোহন অকালে অকস্মাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বেও তিনি আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এবং সেই সঙ্গে যে কবিতা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই সংখ্যার 'ভারতবর্ষে'র অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটী ছাপা হইবার দিনও জানিতাম না যে তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার সেই শেষ পত্রে বড়দিনের অবকাশে আমাদিগকে তাঁহার দিল্লীর প্রবাস-ভবনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহার তিন দিন পরেই রমণীমোহন হঠাৎ পরলোকগত হইলেন। মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালেও তিনি যথারীতি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সাড়ে আটটার সময় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া নয়টার সময় স্নানাগারে প্রবেশ করেন। স্নানাগার হইতে বাহির হইবার বিলম্ব দেখিয়া ভৃত্যেরা দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে তিনি পড়িয়া আছেন, প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াই তাঁহার মৃত্যুর কারন। তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতার ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ছিলেন; তাহার পর দিল্লীতে ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেল হইয়া গমন করেন। রমণীমোহনের এই অকাল পরলোক গমনে আমরা বড়ই শোক পাইলাম। তাঁহার ন্যায় পরোপকারী বন্ধু, তাঁহার ন্যায় বিনয়ের অবতার আত্মীয় বিয়োগে আমাদের হৃদয়ে যে ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা বলিবার ভাষা নাই। তাঁহার লিখিত শেষ কবিতা আমরা পাইলাম—আর পাইব না। তাঁহার বিধবা পত্নী, তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব! ভগবান তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

৺রায় রমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর

সাময়িকী

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের সুরঞ্জিত চিত্রপটে সুশোভিত হইয়া পৌষের ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইল। মহারাজ ঠাকুর স্বর্গীয় হরকুমার ঠাকুরের পুত্র। ১২৩৭ সালের বৈশাখ মাসের অক্ষয়াতৃতীয়ার দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া হিন্দু কালেজে শিক্ষা শেষ করেন। তৎপরে তিনি গৃহে ইংরেজ শিক্ষকের নিকট ইংরেজী ও পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত এবং পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের নিকট বিষয়-কার্য্য শিক্ষা করেন। প্রসন্নকুমার স্বীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকেই বিষয়ের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া যান। এই উইল লইয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দীর্ঘকাল মামলা-মোকদ্দমা চলিয়াছিল। ফলে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন যাবজ্জীবন বিষয়ের অধিকারী নির্ণীত হন। রাজনীতিক্ষেত্রে মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের অসামান্য প্রভাব ছিল। প্রথমে তিনি বাঙ্গলার জমিদার-সভার (বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের) সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার এবং তৎপরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যরূপে প্রবেশ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজাবাহাদুর এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে মহারাজা উপাধি লাভ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সি-এস-আই, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কে-সি-এস-আই, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা বাহাদুর এবং পরবৎসর পুরুষানুক্রমিক মহারাজা উপাধি লাভ করেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বিধবাগণের সাহায্যার্থ এক লক্ষ, মেয়ো হাসপাতালে দশ হাজার এবং অন্যান্য দাতব্য কার্য্যে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সাহিত্যানুরাগ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এই বিদ্যোৎসাহী ধনবান জমিদারের অর্থানুকুল্যে ও উৎসাহে বঙ্গীয় নাট্যশালার উদ্বোধন ও পুষ্টিলাভ হইয়াছিল। ইনি স্বয়ং কয়েকখানি প্রহসন রচনা করিয়া এবং মাইকেল প্রমুখ সাহিত্যিকগণকে কাব্য-সাহিত্য ও নাট্য-সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করিয়া এবং স্বীয় উদ্যান-বাটিকায় ঐ সকল নাটক প্রহসনের অভিনয় করাইয়া তৎকালীন বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। রাজদ্বারেও ইঁহার প্রতিষ্ঠা অল্প ছিল না। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদকের পদ হইতে ক্রমে তিনি উহার সভাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবার তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। ইঁহার ঔরসজাত পুত্রসন্তান না থাকায় ইনি ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। প্রদ্যোৎকুমার মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কৌলিক মহারাজা উপাধি ভূষিত হইয়াছেন। আমরা পরলোকগত মহারাজা বাহাদুরের প্রতিকৃতি এই মাসের ভারতবর্ষের শিরোভূষণ করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম।

আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮এ ডিসেম্বর মীরাট নগরে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আচার্য্য সার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ সুরসিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য বিভাগের সভাপতির ভার গ্রহণ করিবেন। অতএব আশা হয়, প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্যিক আসরে রসের বান ডাকিবে। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র দর্শন বিভাগের সভাপতি পদে বৃত হইবেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইতিহাস ও অর্থনীতি বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন। এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন ধর লইবেন বিজ্ঞান বিভাগের ভার। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনের পথ প্রদর্শক হইলেও বৃহত্তর বঙ্গের প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানেরা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন অপেক্ষা কিছু দূর অধিক অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহারা দুইটী অতিরিক্ত বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছেন—ললিত-কলা বিভাগ ও সঙ্গীত বিভাগ। দিল্লীর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ

উকীল ও লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন যথাক্রমে এই দুই বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

—

বৃহত্তর বঙ্গের প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্র মহোদয়গণ স্বভাবতই উদার প্রকৃতির। বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা অবসর যাপন বা তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশ্যে বঙ্গের বাহিরে গমন করিয়া থাকেন, প্রবাসী বাঙ্গালী মহোদয়রা, অপরিচিত হইলেও, কেবল বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহাদের যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিয়া থাকেন। এ হেন সহৃদয় প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সাহিত্যিকগণকে সমাদরে অভ্যর্থিত করিবার জন্য যে প্রচুর আয়োজন করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ, যাহাকে বলে strong committee সেইরূপ একটী অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু ও ডাক্তার এস, হালদার সহঃ-সভাপতি হইয়াছেন। ডাক্তারে ডাক্তারে ধূম-পরিমাণ। সমিতির অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যেও দুই চারিজন ডাক্তার থাকা আশ্চর্য্য নয়।

—

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কেবল মামুলী ভাবে সাহিত্য-চর্চ্চা করা অর্থাৎ বিভিন্ন বিভাগে কয়েকটি করিয়া প্রবন্ধ পাঠ, আংশিক পাঠ এবং পঠিত বলিয়া গ্রহণ করাই তাঁহাদের এই সম্মিলনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বঙ্গের বাহিরে কার্য্য-ব্যপদেশে অবস্থিত বাঙ্গালীগণের প্রীতি-সম্মিলন সাধন, এবং মাতৃভূমি বাঙ্গালার সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীগণের ভাব ও ভাষার সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখাও এই সম্মিলনের মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। সুতরাং এ দিকেও প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনকে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর বলিতে হইবে। সম্মিলনের এই উদ্দেশ্যের সহিত শুধু আমাদের কেন, সমগ্র বঙ্গের বাঙ্গালী মাত্রেরই যে পূর্ণ সহানুভূতি আছে তাহা বলা বাহুল্য। অতএব আমরা এই সম্মিলনের সাফল্য এবং শ্রীবৃদ্ধি অন্তরের সহিত কামনা করি। এবং বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণকে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে যোগদান পূর্ব্বক তাহার সাফল্য বিধানে সহায়তা করিতে অনুরোধ করি। তবে একটা কথা। ডিসেম্বর মাসে মীরাটে শীতের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। অতএব প্রতিনিধি ও দর্শক মহোদয়গণ বিছানা ও মশারির সহিত যেন যথেষ্ট শীতবস্ত্রও সঙ্গে রাখেন। এবার সম্মিলন প্রতিনিধিগণের দেয় চাঁদার পরিমাণ পাঁচ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

—

বঙ্গদেশে নারী জাতির কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে যতগুলি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে "সরোজ-নলিনী স্মৃতি-সমিতি"র কার্য্য যে সুশৃঙ্খল ভাবে ক্রমোন্নতির পথে চলিতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অন্যান্য নারী প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষা আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূলে রহিয়াছে একটী প্রেম-প্রবণ হৃদয়। স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর স্বামী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস মহোদয়ের একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেম এই প্রতিষ্ঠানটির মূলে রস সেচন করিয়া তাহাকে কেবল সঞ্জীবিত রাখে নাই, তাহাকে ক্রম-বর্দ্ধমানও রাখিয়াছে। সরোজনলিনী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৯এ জানুয়ারী পরলোকে গমন করেন। ঐ বৎসরের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার স্মরণার্থ এই স্মৃতি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সমিতিকে কেন্দ্র করিয়া, দুই বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গলার বাইশটি জেলায় শতাধিক শাখা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক শাখা-সমিতিতে বহুসংখ্যক মহিলা যোগদান করিয়াছেন, এবং নারী জাতির উন্নতিমূলক নানা বিষয়ের আলোচনা, সামাজিক মহিলা সম্মিলন, শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চ্চা, নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কার্য্য, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি নারীজাতির পক্ষে হিতকর সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

—

কলিকাতার কেন্দ্রীয় সমিতির তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় মহিলাদিগের জন্য একটী অবৈতনিক শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে দর্জির কাজ, (সেলাই, কাট-ছাঁট), জরির কাজ, চিকনের কাজ, লেস, কার্পেট, রাফিয়ার বাক্স, বস্ত্র বয়ন, রেশমের সূতা প্রস্তুত, দড়ি, ফিতা বোনা ও

সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ সকলই ভাল কাজ; এবং এই সব শিল্প শিক্ষা করিলে কোন কোন মেয়ের কিছু না কিছু উপকার হইতেও পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা হইতেছে এই যে, এই সকল বা ইহাদের অধিকাংশ শিল্পকর্ম্মে বহু সংখ্যক পুরুষ নিযুক্ত রহিয়াছে; তাহার উপর, উচ্চ শিক্ষিত বেকার যুবক ছাত্র সম্প্রদায়ের অন্ন সংস্থানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এইরূপ শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইতোমধ্যেই এই ক্ষেত্রে এই সকল শিল্পোপজীবী লোকের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে, এবং আরও বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং মেয়েদেরও কেবল এই সকল শিক্ষা দিলে, কার্য্যক্ষেত্রে শিল্পীর সংখ্যাধিক্য ছাড়া আর বেশী কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প; এবং যাঁহারা এই ধরণের শিল্পকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদেরও আয়ের অনুপাত অনেক কমিয়া যাইবে। আমাদের স্নেহভাজন শ্রীবিশ্বকর্ম্মা নানারূপ শিল্পকর্ম্মের সন্ধান রাখিয়া থাকেন। তাহার কতক কতক পরিচয় তিনি তাঁহার "ইঙ্গিতে" ইতঃপূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছেন। মেয়েদের উপযোগী শিল্পের সন্ধানও যে তিনি রাখেন না, এমন মনে হয় না। সমিতি যদি এ বিষয়ে শ্রীবিশ্বকর্ম্মার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মেয়েদের শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইতে পারে বলিয়াই মনে হয়।

সে যাহা হউক, সমিতির প্রচেষ্টা সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য। মফঃস্বলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, তাহাদের স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, শিশুমঙ্গল সমিতি ও ধাত্রীশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, হাসপাতালসমূহে "মাতৃ-নিকেতন" (Maternity Ward) স্থাপনে সাহায্য করা প্রভৃতি নারী জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকর বিষয়ই সমিতির উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। আরও একটা বিশেষ আনন্দের কথা এই যে, বাঙ্গলা দেশে সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানসমূহ প্রায়ই খড়ের আগুনের মত একবার মাত্র দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই নিবিয়া যায়; অধিকাংশ স্থলেই তাহা কেবল কথাতেই থাকিয়া যায়—কাজে বড় একটা অগ্রসর হয় না। সরোজনলিনী দত্ত স্মৃতি-সমিতিকে এই কলঙ্ক-মুক্ত দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। তাঁহারা কেবল কথায় নিরস্ত না হইয়া যথার্থ কাজ করিতেছেন। ইহাই ত চাই।

বিগত ছয়-সাত বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীরা যাহার প্রত্যাশা করিতেছিলেন, এতদিনে তাহার ফল ফলিতে চলিল। স্থির ছিল যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নূতন রয়েল কমিশন বসাইয়া ভারত-শাসন আইন সংস্কার করা হইবে না। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের দুই বৎসর পূর্ব্বেই সে ব্যবস্থা রহিত করিয়া রয়েল কমিশন বসানো স্থির হইল। কোন্ কোন্ ভদ্র মহোদয়গণকে লইয়া কমিশন গঠিত হইবে, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী শাসন সংস্কার সংক্রান্ত রয়েল কমিশনের সভাপতি হইবেন দি রাইট অনারেবল স্যার জন সাইমন। আর ভাইকাউণ্ট বার্ণহাম, লর্ড ষ্ট্রাথকোনা, অনারেবল ই, কাডোগান, রাইট অনারেবল ষ্টীফেন ওয়াল্‌স্, কর্ণেল রাইট অনারেবল জর্জ্জ লেন ফক্স ও মেজর সি, আর, আটলী হইবেন কমিশনের সদস্য। ইঁহারা সকলেই বিলাতী পার্লামেণ্ট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। কমিশনে একজনও ভারতবাসী না থাকায়, বলা বাহুল্য, ভারতবাসীরা সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। গত কয়েক দিন ধরিয়া মাননীয় বড়লাট বাহাদুর জরুরী কারণের উল্লেখ করিয়া ভারতের সকল দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। এই জরুরী কারণটি যে কি তাহা তখন প্রকাশ পায় নাই, যাঁহারা আহূত হইয়া বড়লাট বাহাদুরের সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহার আভাষ মাত্র প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে অনেকে বিবেচনা করিতেছেন যে, এই কমিশনের কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বড়লাট বাহাদুর সকল দলের নেতাদের মনোভাব জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আলাপ করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, নির্দ্ধারিত সময়ের দুই বৎসর পূর্ব্বেই রয়েল কমিশন নিযুক্ত হইতে চলিল, ইহা দেশব্যাপী আন্দোলনের ফল, অথবা, বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার ব্যর্থ হওয়ার ফল, তাহা বুঝা গেল না। তবে মোটের উপর ইহা স্থির বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যাশিত ও অনাগত নূতন শাসন-সংস্কার আইন যেমনই হউক না কেন, সে পরের কথা; আপাততঃ রয়েল কমিশনের গঠন লইয়াই যে দেশব্যাপী একটা তুমুল আন্দোলন চলিবে, তাহার লক্ষণ ইহার মধ্যেই দেখা যাইতেছে। সে আন্দোলনের ফলে রয়েল কমিশনের গঠনের কোন তারতম্য হইবে কি না, তাহা এখন বলা না গেলেও, প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায়

নেতারা রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। বস্তুতঃ, আজ কাল রাজনীতি-ক্ষেত্রে যেরূপ বিশৃঙ্খলা চলিতেছে, নেতা নামধারী ব্যক্তি মাত্রেই যেরূপ স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে, ভারতবাসীকে ঠিক পথে পরিচালিত করা কঠিন—প্রায় অসাধ্য বুঝিয়াই সম্ভবতঃ মহাত্মাজী রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। উপযুক্ত নেতার অভাবে, শাসন-ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনের ন্যায় সঙ্গীন মুহূর্ত্তে, ভারতের রাজনীতিক তরণী বানচাল হইয়া পড়ে কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়।

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বালী দ্বীপ ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে সভাপতি এবং বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয়কে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া যে 'বৃহত্তর ভারত' সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ভারতের বাহিরে বহুকাল পূর্ব্বে যে সকল ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এবং তিব্বত চীন প্রভৃতি দেশে ভারতীয়গণ যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন করা। পরম শ্রদ্ধাস্পদ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও অনেকদিন হইতে এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; তাঁহার 'বিশ্ব-ভারতীর'ও ইহা একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। এতদিন নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে, যখন আর সকলে অবসর গ্রহণ করিয়া বসেন, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ যৌবনের শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সহযাত্রী শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু ও শ্রীযুক্ত কর মহাশয় যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহা হইতে বৃহত্তর ভারতের অনেক সংবাদ জানিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু সেখানে ত একটা শ্রাদ্ধ ব্যাপারে বাঙ্গালীর প্রথামত পৌরোহিত্য পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই অনুসন্ধানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বিশ্ব-বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হউক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

গত ২৭এ ও ২৮এ অক্টোবর তারিখে কলিকাতার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যালয়ে মিলন বৈঠকের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য কয়েকজন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই সমিতিতে গোহত্যা ও মস্‌জিদের সম্মুখে বাদ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—যেহেতু ভারতের কোন সম্প্রদায়েরই অপর সম্প্রদায়ের উপর ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাধ্য-বাধকতা বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অভিমত চাপানো উচিত নহে, কিন্তু সাধারণের শৃঙ্খলা ও নীতির অধীনে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম অবলম্বন ও ধর্ম্ম আচরণের অধিকার দিতে হইবে, সেই হেতু হিন্দুরা স্বাধীনভাবে মস্‌জিদের সম্মুথ দিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় মিছিল লইয়া যাইতে পারিবে এবং বাজনা বাজাইতে পারিবে; মস্‌জিদের সম্মুখে মিছিল থামান হইবে না বা কোনওরূপ বিশেষ আতিশয্য প্রদর্শন হইতে পারিবে না বা যে সকল মসজিদের উপাসকদিগের বিরক্তি, বিশেষ বিঘ্ন বা অসন্তোষের কারণ হইতে পারে বলিয়া গণ্য হইবে, সেই সকল মসজিদের সম্মুখে সঙ্গীত বা বাদ্য হইতে পারিবে না। মুসলমানগণ তাহাদিগেব অধিকার পরিচালনে স্বাধীন ভাবে যে কোন সহর বা গ্রামের যে কোন স্থানে গো-কোরবানী বা গো-জবাই করিতে পারিবে। তবে উহা কোন সাধারণ রাস্তার উপর বা কোনও মন্দিরের নিকট বা হিন্দুদিগের দৃষ্টির মধ্যে পড়ে এমন কোন প্রকাশ্য স্থানে হইতে পারিবে না। কোরবানী বা জবাইয়ের গরুগুলিকে মিছিল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না বা সাধারণের দর্শনীয় করিতে পারিবে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, গো-হত্যা সম্বন্ধে হিন্দুসম্প্রদায়ের বদ্ধমূল মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা থাকায়, তাঁহারা যেন এমন ভাবে গো-কোরবানী চালান, যাহাতে যে সকল স্থানে কোর্ব্বানী হইবে, সেই সকল সহর বা গ্রামের হিন্দুদিগের বিরক্তির কারণ না হয়। এই

প্রস্তাবদ্বয় কন্‌গ্রেসের কমিটিতে গৃহীত হইলেও ভারতীয় হিন্দু সভাসমূহ এই প্রস্তাবে মত দিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা গো-হত্যা বিষয়ক মীমাংসায় আপত্তি করিতেছেন। সুতরাং এ প্রস্তাব জনসাধারণ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন এবং ইহা কতদূর কার্য্যকর হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন হইতে কার্য্যকর্ত্রী শ্রীমতী লতিকা বসু নারী স্বাস্থ্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে প্রস্তাবনা প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম—

দুঃস্থ দরিদ্র নারীর চিকিৎসা এবং যে শিক্ষা পাইলে আমাদের দেশের নারীগণ তাহাদের দুঃখিনী ভগ্নীদের সেবা এবং শুশ্রূষা-কল্পে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন তাঁহাদের মধ্যে সেই শিক্ষার বিস্তার অতীব প্রয়োজনীয় জানিয়া দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে এই মুখ্য উদ্দেশ্যটি সফলতা লাভ করে তৎবিষয়ে যত্নবান হইয়া যে ভবনে দেশবন্ধু বাস করিতেন তথায় চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন নামক একটি অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এ সেবা-সদন নারীদিগের জন্য হাসপাতাল ভিন্ন আর কিছুই নয়। চিকিৎসার জন্য এখানে উচ্চ নীচ জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র শ্রেণীর মহিলারা আগমন করিতেছেন। দেশে অন্যান্য হাসপাতালও আছে ; কিন্তু নানা কারণ বশতঃ সেই সকল স্থানে চিকিৎসার জন্য নারীদিগকে পাঠাইতে অনেকেই অনিচ্ছুক। ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে আমাদের দেশে নারী ও শিশু-মৃত্যুর হার উত্তরোত্তর ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই আজ দেড় বৎসর হইল দেশবন্ধু স্মৃতি-রক্ষা ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ সেবা-সদন স্থাপন করিয়াছেন। তথায় রোগিণীগণ নিজের বাড়ীর মত যত্ন ও শুশ্রূষা পাইতেছেন। যেরূপ যত্ন ও আগ্রহের সহিত এই সেবা-সদনে মেয়েদের চিকিৎসা হইতেছে তাহাতে হাসপাতালে নারীজাতির চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে একটা কুসংস্কার ছিল তাহা দূরীভূত হইতেছে। তাই আজ বহু ভদ্র মহিলা চিকিৎসার জন্য সেবা-সদনে আগমন করিতেছেন। হাসপাতালে বহিঃ চিকিৎসা বিভাগে অনেক রোগিণী প্রতিদিন প্রাতঃকালে বহুদূর হইতে আসিয়া থাকেন ও বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হন।

সেবা-সদনের কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে বটে, কিন্তু অর্থাভাবে ইহার কার্য্যক্ষেত্র প্রসার লাভ করিতেছে না ; এবং অদূর-ভবিষ্যতে পারিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। বাংলার প্রতি গৃহে সেবা-সদনের যাহা আদর্শ সেই আদর্শের প্রতি প্রীতি ও সেবার আবেগ জাগাইয়া তুলিতে হইলে রোগীর চিকিৎসা ভিন্ন আরও কিছু করা দরকার। তাই ভারতের প্রতি গৃহই এই আদর্শে পরিচালিত। এই আদর্শকে প্রকৃষ্ট পন্থায় চালনা করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনই সেবা-সদনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কুসংস্কার এবং সুশিক্ষার অভাবই এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান অন্তরায়। সেবা-সদনের কর্ত্তৃপক্ষ তাই স্থির করিয়াছেন, সেবা-সদন সংলগ্ন এমন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যেখানে দেশের নারীগণ শুশ্রূষা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

বঙ্গদেশের সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য, শরীর-পালন-নীতি এবং রোগীর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে প্রথমতঃ, বাংলার বিবাহিতা নারীগণ এবং সন্তানের মাতাদিগকে স্বাস্থ্য বিষয়ে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে শুধু তাঁহাদের নয়, অপরাপর লোকেরও উপকার হয়। দ্বিতীয়তঃ, এমন একটি সুদক্ষ শুশ্রূষাকারিণীর দল গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহারা বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলাতে যাইয়া স্বাস্থ্য এবং সেবা সমিতির কার্য্যে সাহায্য করিতে পারিবেন ; এবং বঙ্গদেশের রমণীগণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান বিস্তার ও তাঁহাদের রোগের উপশম করিতে পারিবেন।

কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে

হাসপাতালে হাতে-কলমে শিক্ষা ভিন্ন স্কুলে চারিটি স্তরের শিক্ষা দেওয়া হইবে। সেবা ও শুশ্রূষাকারিণীর শিক্ষা উচ্চতর, এবং প্রাথমিক এবং সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক উচ্চতর এবং প্রাথমিক শিক্ষা। বলা বাহুল্য সমস্ত শিক্ষাই অবৈতনিক। শুশ্রূষা সম্বন্ধে উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষা :—এই শিক্ষা বিভাগে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে ইংরাজি এবং বাংলা এই উভয় ভাষাতেই জ্ঞান থাকা দরকার। এক বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষা প্রাপ্ত

হইলে ছাত্রীরা ইচ্ছা করিলে ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকলটির সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

শুশ্রূষা সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা

ইহার জন্য শুধু বাংলা ভাষায় জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট। এক বৎসর দুই মাসে শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। এই শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্রীরা শুশ্রূষাকারিণী এবং ধাত্রীর কার্য্যে পারদর্শিতার সার্টিফিকেট পাইবার জন্য ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটির অধীনে পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা

ইহার জন্য ইংরাজি ও বাংলা এই উভয় ভাষাতেই অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। ছয় মাসে শিক্ষা সমাপন হইবে। প্রাথমিক সাহায্য দান এবং প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। অবশ্য এই স্তরের শিক্ষা যাঁহারা সহর বা মফঃস্বলের সাধারণ স্বাস্থ্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহাদেরই প্রয়োজনীয়। শিক্ষা শেষ হইলে সেবা-সদনের কর্ত্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট দিবার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা

এই বিষয়ে শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় কিছু জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট। তিন মাসে শিক্ষা সম্পন্ন হইবে। উচ্চতর বিভাগে যে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে ইহাতেও সেই সেই বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা শেষ হইলে সার্টিফিকেট দিবার জন্য পরীক্ষা লওয়া হইবে।

দিবাভাগে শিক্ষার বন্দোবস্ত :—কলিকাতাবাসী ভদ্র মহিলা এবং মফঃস্বল হইতে আগত যে সকল ভদ্র মহিলা কলিকাতায় আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন তাঁহাদের শিক্ষার জন্য দিবাভাগে কয়েকটি ক্লাসের বন্দোবস্ত করা যাইবে। উহাতে সাধারণতঃ বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু যাঁহারা শুশ্রূষা ও ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী হইতে চান তাঁহাদের জন্য হাসপাতালে হাতে-কলমে শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। পরন্তু যে সকল ভদ্রমহিলা অল্প দিন মাত্র পড়িয়া প্রাথমিক সাহায্য দান, শুশ্রূষা ও পথ্যাদি সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে চাহেন তাঁহাদের শিক্ষার জন্যও বন্দোবস্তের ত্রুটি হইবে না।

স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদিগের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। সাধারণতঃ আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, গৃহ-পরিচর্য্যা, প্রাথমিক শুশ্রূষা এবং পথ্যাদির নিয়মাবলী ইত্যাদি স্বাস্থ্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোনরূপ শিক্ষা না পাইয়াই স্কুল বা কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইহার ফল অশুভকর। তাই সেবা-সদনের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্কুল এবং কলেজের ছাত্রীদিগের জন্য কতকগুলি ক্লাসের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে তাহারা শরীর পালন এবং শুশ্রূষা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। অবশ্য স্কুল এবং কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সুবিধাজনক সময়ে এই শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইবে।

যাতায়াতের ব্যবস্থা

উপযুক্ত সংখ্যক আবেদন পাইলে, ও স্কুলের ছাত্রীদিগের জন্য, যাতায়াতের বিশেষ বন্দোবস্ত করা যাইবে।

ছাত্রীদিগের থাকিবার আবাস বা হোষ্টেল :—যে সমস্ত ছাত্রী মফঃস্বল হইতে পড়িতে আসিবেন এবং যাঁহাদের কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পড়া অসম্ভব এরূপ শ্রেণীর ছাত্রীদিগের বাসস্থানের জন্য সেবা-সদনের ঠিক সম্মুখে একটি অট্টালিকা ক্রয় করা হইয়াছে। এখানে থাকা ও ধোপা খরচ ইত্যাদি বাবদ মোট প্রতি ছাত্রীকে মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে দিতে হইবে। বেতন :—একমাত্র হোষ্টেলে থাকিবার খরচ ভিন্ন ছাত্রীগণকে অন্য কোন খরচ বহন করিতে হইবে না। সমস্ত শিক্ষাই এখানে অবৈতনিক।

সামাজিক মেলামেশার ব্যবস্থা :—সেবা-সদনের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশ্বাস, পরস্পর মেলামেশার ভিতর দিয়া নারীশিক্ষার প্রসার কেবল সম্ভবপর নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। সেবা-সদনের কর্ত্তৃপক্ষের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মিলন ও মিশ্রণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে শিক্ষা বিস্তার সহজে সম্পন্ন হয়। তাই এই স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ এবং কলিকাতাবাসী ভদ্র মহিলারা যাহাতে পরস্পর আলাপ পরিচয় এবং মেলা মেশা করিতে পারেন তজ্জন্য বন্দোবস্ত করা হইবে।

বক্তৃতা এবং শিক্ষামণ্ডলী :—বিবাহিতা মহিলা এবং বালিকাদিগের জন্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নানাবিধ হিতকর বিষয়ে বক্তৃতার বন্দোবস্ত সেবা-সদন হইতে করা হইবে। সেবা-সদনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক নানা বিষয়ের আলোচনার জন্যও শিক্ষামণ্ডলী গঠন করা হইবে। তাহাতে ছাত্রীরা নানাবিধ হিতকর বিষয়ের আলোচনা করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন।

এই স্থানে যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল ইনি কলিকাতা শ্যামবাজার অঞ্চলের সুপরিচিত ব্যায়ামবীর শ্রীযুক্তকালীপদ দাস। বাল্যে ইঁহার শরীর ও স্বাস্থ্য সাধারণ বাঙ্গালী বালক অপেক্ষা কিছু ভাল ছিলনা। কিন্তু পরে কৈশোরের প্রারম্ভ হইতে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চ্চা দ্বারা ইনি শরীরের এতাদৃশ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। গত ২৫ বৎসর কাল তিনি নানারূপ ব্যায়াম ও জিম্‌নাষ্টিক প্রভৃতির অনুশীলন ও প্রচারে নিরত আছেন। বর্ত্তমানে ইহার বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। ইনি বাগবাজারের সুবিখ্যাত ওস্তাদ ৺রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং নিজেও স্থানীয় বালক ও যুবকগণের শিক্ষার নিমিত্ত কম্বুলিয়াটোলায় একটী আখড়া স্থাপন করিয়াছেন।
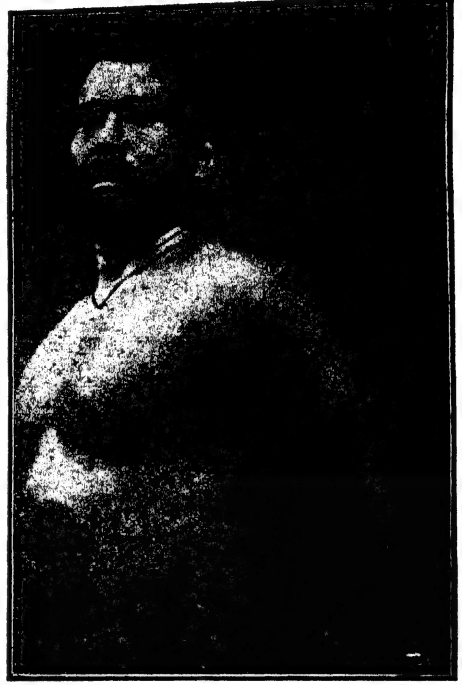
শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস

বিশ্বনাথের দান

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল, বি-এল্

বাবার চিঠি পেয়ে প্রাণটা যেমন একদিকে খুসী হ'য়ে উঠ্‌ল, অপরদিকে তেমনি স্বামীর কথা নিয়ে একটা ভাবনাতেও পড়ে' গেলুম।

আজ প্রায় বছরখানেক ধরে' শরীর আমার খুবই খারাপ হ'য়ে গেছে; ডাক্তাররা বল্‌চে, বুকের ভেতরটা নাকি আমার খুব দুর্ব্বল হ'য়ে যাচ্ছে। একসঙ্গে কিছু বেশীদিন ধরে' বাইরে থাক্‌তে পার্‌লে, তবেই আমার উপকার হবে।···মা ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে বাবা কাশী যাচ্ছেন; তাই লিখেচেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন।···

জন্মাবধি খাঁচায় আবদ্ধ পাখী, মুক্তির কল্পনায় প্রাণটা যে তার নেচে উঠ্‌বে, তার আর বিচিত্রতা কি? বিদেশে গিয়ে হাওয়া বদ্‌লে শরীর যে আমার সেরে যাবে, সে চিন্তাতে বিশেষ কোন আনন্দ পেলুম না। এ শরীরের ওপর মমতা আর বড় বেশী নেই।···গেলেই বা এ শরীর! মরবার জন্যে সত্যিই তো আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত! আমার আর পিছুটান কিসের? এতখানি—এই পঁচিশ বছর বয়স হ'ল—ভগবান্ এমন একটা কিছু দিলেন না, যাকে আশ্রয় করে' এই নারীজন্ম সার্থক করে' তুলি! একদিন—শুধু সে একটি দিনের জন্যেই—যাকে কোলে পেয়েছিলুম, সে শুধু 'মা'-হওয়ার দারুণ ব্যথাটাই জানিয়ে দিয়ে সরে' গেল, আর কিছু না!···ব্যর্থ এ জীবন;—এই ব্যর্থতার বেদনা যে আমার বুকের নীচে দিবারাত্রি কি দারুণ গুমোট্ করে' রয়েছে, সে কথা আর কে বুঝ্‌বে? কেউ বুঝ্‌বে না—এমন কি, স্বামীও না!

পুরুষ আর মেয়ে, তাদের মনের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ! এই নারীর জন্ম নিয়ে ঐ 'মা' নামে বঞ্চিত হওয়ার যে কি বিষম মর্ম্মবেদনা, সে কথা পুরুষ কি বুঝ্বে? সে শুধু পরিহাসের হাসি হাস্‌বে বৈ ত' নয়!

তাই এ বকের ব্যথা বুকেই চেপে থাকি; এ বেদনার উৎস ফল্গুর মত বয়ে' চলেছে দিবারাত্রি,—সাধ্যপক্ষে কারও কাছে তার সন্ধান দিই না!

···বাবার চিঠিতে তবু একঘেয়ে জীবনে একটা মধুর বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেয়ে হৃদয় আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। কাশী! আজ পর্য্যন্ত কত লোকের কাছে কাশীর কত গল্প শুনেচি, আর কেবল মনে হয়েচে, বাবা বিশ্বেশ্বর কি একদিন এ অভাগিনীকে দর্শন দেবেন না!······

স্বামী চিঠিখানা হাতে করে' এসে হাসিমুখে বল্লে, তাহ'লে নিতান্তই কাশী যাচ্চো?

প্রাণের আনন্দ আর চেপে রাখ্‌তে পারলুম না। হেসে ফেলে বললুম, বাবা বিশ্বনাথ যখন টেনেচেন, তখন আর 'না' বল্‌বার যো কি বল?

তিনি বল্লেন, এঃ, মনটাকেও যে দেখ্‌চি এরি মধ্যে কাশীবাসিনীর মত আধ্যাত্মিক করে' ফেলেচ?

সহাস্য কটাক্ষপাত করে' বললুম, না হবেই বা কেন! বয়স তো কম হ'ল না!

হ্যাঁ, একেবারে বুড়ী!—বলে' স্বামী হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের কাজে চলে' গেলেন।

···তা মিথ্যে কি! মনটা যে আমার বয়সের চেয়েও বুড়ো হ'য়ে গেছে, তা বেশ অনুভব করি।

মেঝের ওপর পানের বাটা টেনে নিয়ে বসেছি, এমন সময় 'দিদিমণি, আমায় ফেলে তুমি কাশী যাচ্চো বুঝি?' বল্‌তে-বল্‌তে সুভা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তার কথার ভঙ্গীতে আমি হেসে ফেলে বললুম, কেন রে?

—কেন আবার? তুমি চলে' যাবে, আর আমি বুঝি একা এখানে থাক্‌ব?

—কেন, থাক্‌বিনি কেন? আমি যে তোদের জামাইবাবুর সমস্ত ভার তোরই ওপর দিয়ে যাচ্ছি সুভা! আমি চলে' যাবো, তার ওপর তুই না দেখ্‌লে ওঁর খাওয়া-দাওয়ার যে বড্ড কষ্ট হবে, তাই!

সুভা আর-কিছু বল্‌তে না পেরে চুপ্ করে' রইল। আমি বললুম, তুই আছিস্ বলেই আমি বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পার্‌চি, নইলে কি আর যাওয়া হ'য়ে উঠ্‌তো!

সুভা ভাল-মন্দ কোন কথাই বল্লে না; মাথাটি হেঁট করে' দাঁড়িয়ে রইল। আর, জবাব দেবার মত তার কিছু ছিলও' না।···সংসারে 'আপনার' বল্‌তে এই মেয়েটির আর-কেউ নেই বল্লেও হয়; থাকার মধ্যে আছে শুধু ওর এক মাসিমা। আমার বাপের বাড়ীর গ্রামেই ওরও বাপের বাড়ী। অল্পবয়সে বিধবা হ'য়ে সে তার মাসিমার কাছেই থাক্‌ত। আমার শরীর ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে দেখে উনি যখন একজন স্বজাতির মেয়ের খোঁজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন, তখন মা ওকে রাজী করে' এখানে পাঠিয়ে দেন। এখানে আসার পর থেকেই ও যেন আমাদেরই একজন খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া হ'য়ে পড়েচে। স্বভাবটি ওর এম্‌নি মিষ্টি, এম্‌নি নম্র যে, একটিবারও আর ওকে পর বলে' ভাব্‌তে পারি না। আমায় যখন 'দিদিমণি' বলে' ডাকে, তখন মনে হয়, আমার কোন বোন্ ছিল না, এই আমার সত্যিকারের বোন্!

······বিদায়ের আগে স্বামীকেও ঐ কথা বললুম, সুভা রইল, আমার বিশ্বাস সে থাক্‌তে তোমার কোন কষ্ট হবে না!

স্বামী হেসে বল্লেন, এটা কি ছেলে-ভুলোনো হচ্ছে? আমরা অত সামান্য একটু-আধটু কষ্টতে ভেঙ্গে পড়িনে। তুমি এখন যে জন্যে যাচ্ছো, যদি তা সফল হয়, তোমার হারাণো স্বাস্থ্য ফিরে আসে, তবেই জান্‌ব, সব সার্থক, নইলে সবই বৃথা হবে!

আমি বললুম,—আমি কিন্তু সে কথা একেবারেই ভাব্‌চিনে।···যাক্ ও-সব কথা! তোমার যখন যা কষ্ট হবে, খাওয়া-দাওয়ার কোনো রকম অসুবিধে হচ্চে কিনা, সব কথা যেন আমায় খুলে লিখো। আমার মাথার দিব্যি রইল!

স্বামী হাস্‌লেন।—সুভার ওপর যখন অতখানি বিশ্বাস, তখন আর খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে কেন?

—না, তা হবে না জানি! তবু হাজার হ'লেও মন কি আমার বুঝ্‌বে গা?

২

হিন্দুর মহাতীর্থ—কাশীতে এসে পৌচেছি আজ এক সপ্তাহের ওপর হ'য়ে গেল। বাপ, মা, মণ্টু, আমি, আর আমাদের সঙ্গে এসেছেন, আমাদের পাড়ার বুড়ী-ঠান্‌দিদি।

কাশী-আসার নাম শুনে ঠান্‌দিদি নাছোড়বান্দা হ'য়ে এসে বাসার কাছে পড়েন ; কাজেই তাঁকে না এনে কোন উপায় ছিল না। ঠান্‌দিদি লোক ভাল ; ছেলেবেলা থেকেই আমাদের সকলকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। দুষ্টুমি বুদ্ধিতেও কিন্তু কম নন। আমাকে সেদিন বল্লেন,—হ্যাঁ ভাই নাত্‌নী ! নাত্‌জামাইকেও সঙ্গে নিয়ে আস্‌তে পার্‌লিনে ! একলাটি তোরও কষ্ট, তারও কষ্ট !

হেসে বললুম, নাও বাছা, তুমি আর রঙ্গ ক'রোনা। কষ্টটা আবার কিসের ?

—এঁ্যা, বলিস্ কিলো, কষ্ট আবার নয় ? আফিস্ থেকে এলে কে'ই বা তাড়াতাড়ি পাখাটা নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, মুখ-হাত ধুইয়ে কে-ই বা জলখাবারের কাঁশিখানা এগিয়ে দেয়, কে-ই বা নথ নাড়্‌তে-নাড়্‌তে এটা-সেটা গল্প করে' পেটটি ভরে' খাইয়ে দেয় লো ! কষ্ট আবার কি ! যেন কিছু জানেন না আর কি !

ঠান্‌দিদির কথার ভঙ্গীতে আমি জোরে হেসে উঠ্‌লুম। তা, এমন জান্‌লে তোমাকেই না হয় সেখানে 'একটিনে' দিয়ে আস্‌তুম।

ঠান্‌দিদি মুচ্‌কি হেসে হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লেন, আর ভাই, দুধের সাধ যদি ঘোলে মিট্‌ত, তাহলে আর ভাবনা কি ছিল ? আমাকে রেখে এসে আর কি লাভ হ'ত বল্ ? বরং যাকে রেখে এসেছিস্, তার দ্বারা অনেকটা অভাবই পূরণ হ'তে পার্‌বে।

—কি রকম ?

—কি রকম আবার ? মাইরি অন্ন, তোর কি ভাই একটু বুদ্ধি হ'ল না ? সেই একটা আঠারো উনিশ বছরের ছুঁড়ির হাতে কিনা কর্ত্তার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলে' এলি !

—যাও, কি যে তুমি বল ঠান্‌দি ! সুভা তেমন মেয়ে নয় !

—হ্যাঁ ; তবে ঘি আর আগুন একসঙ্গে এক জায়গাতে রেখে দিয়ে এলি, এটা পাকা গিন্নির মত কাজ হয়নি ! একে ঐ বয়স, তার ওপর ছুঁড়ী দেখতেও তো ছি-ছি নয় !

হঠাৎ এই হাল্কা রহস্যালাপের ধারা অত্যন্ত গাঢ় হয়ে উঠ্‌ল। আমার মুখের হাসিটুকু কে যেন জোর করে' হরণ করে' নিলে।

...ঠান্‌দিদি উঠে গেলে একলাটি বসে' বসে' কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল, তা, সত্যিই তো, সুভা দেখতে তো কুৎসিত নয় ! রং কালো হ'লেও তার মুখের কেমন একটা চমৎকার শ্রী আছে, চোখদুটী তার ভারি সুন্দর ! ...কৈ, সেখানে থাক্‌তে এ-রকমের সন্দেহ তো আমার মনে উঠ্‌তো না...না না, ঠান্‌দিদির যেমন ছেঁদো মন, সবতাই সন্দেহ ! সংসার এম্‌নিই বটে ! বয়স কম হ'লেই কি ঐ সব কুৎসিত সন্দেহ মনে পুষ্‌তে হবে ? তাহ'লে আর সংসারে বাঁচ্‌বো কি নিয়ে ?—আমি তো পারি নে !...আর সুভা ! তার বিরুদ্ধে এ-রকম কথা মনে আনাও খুব—খুব অন্যায় ! তার সেই সুন্দর চোখদুটীতে এমন একটা নির্দ্দোষ চাহনি সর্ব্বদা দীপ্ত হ'য়ে আছে, যা দেখ্‌লে সত্যিই প্রাণ জুড়িয়ে যায় !

...দূর্ হোক্ ছাই, আর একেবারেই ও-কথা ভাব্‌বো না। মাথা থেকে ঠান্‌দিদি কি যে বলে' মন খারাপ করে' দিয়ে গেল ! এবার কোনদিন এমন কথা বল্লে খুব দু'কথা শুনিয়ে দেব।

৩

আট নয় মাস কেটে গিয়েছে। ঠান্‌দিদি অনেকদিন হ'ল দেশে ফিরে গেছেন।...

বিদেশের এই দিনগুলো কাট্‌চেও মন্দ নয়। রোজ দশাশ্বমেধে গঙ্গাস্নান আর বিশ্বেশ্বর দর্শন ! প্রাণ যেন এক নতুন ছাঁচে গড়ে' উঠ্‌চে !

শরীরের উন্নতিও যে অনেকটা হ'য়েচে, তাও বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি। এখন রোজ অনেকটা রাস্তা পায়ে হেঁটে বেড়াতে পারি। তার জন্যে স্বামীর মনে যে কত আনন্দ, তা তাঁর চিঠির ভাষা থেকেই বুঝ্‌তে পারি।

আমার কিন্তু এতে সত্যিকারের আনন্দ একবিন্দু আসে না ! যে তৃষ্ণা আমার সারা অন্তরখানা শুকিয়ে তুল্‌চে, সেটা তো কৈ ভাল হ'ল না !...এখানে কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, তাদের তো কেউ আমার মত দুর্ভাগা নয় ! এমন করে' বঞ্চিত ত' তারা কেউ হয়নি ? বুকের বাছাকে যমের হাতে দিয়েও তবু তারা অন্ততঃ একটিকেও নিয়ে জীবনটাকে সার্থক কর্‌তে পেরেছ ! আমারই এ ব্যর্থ জীবন কেন ?

যাক্‌গে ও-সব কথা !...আচ্ছা, স্বামীর তো চিঠি পাই, কিন্তু সুভা আর আমায় চিঠি দেয় না কেন ? আমি পর পর তাকে ক'খানা চিঠি দিলুম, একখানিরও তো উত্তর পেলুম না ! স্বামীও তার কথা কিছু লেখেন না, শুধু লেখেন, আমরা ভাল আছি।...

এক-একবার মনে হয়, ফিরে যাই সেখানে! কিন্তু আবার ভাবি, কৈ, স্বামী তো কিছু লেখেন্‌নি আজও! এতদিন হ'য়ে গেল, তিনি নিজেও তো আস্‌তে পার্‌তেন একবার! মাঝে মাঝে সত্যিই সেই আগের মত অভিমান হয়, কিন্তু আবার আপনার মনেই হাসি আর ভাবি, অভিমানের আর বয়স নেই যে!……

একা ঘরে বসে' আছি, এমন সময় পাণ্ডাজী আর মা ঘরে ঢুক্‌লেন! পাণ্ডাজী বল্লেন, এই আশীর্ব্বাদী ফুল কাছে রাখো মায়ি, সব মনস্কামনা পূর্ণ হোবে।

ভক্তিভরে আশীর্ব্বাদী ফুলটুকু মাথায় স্পর্শ কর্‌লুম, কিন্তু মন বলে' উঠ্‌ল, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবার সময় যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে ঠাকুর, তা আর হবার নয়। এ ব্যর্থ জীবনের বোঝাটাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে সেই শেষের দিনটী পর্য্যন্ত!

মা পাণ্ডাজীকে বল্লেন, ওর একটি খোকা হ'য়ে নষ্ট হয়েচে বাবা, সে আজ সাত বচ্ছর। আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিশ্বনাথ ওর হারাণো নিধিটীকে আবার ওর কোলে ফিরিয়ে দেন।

—নিশ্চয় দেবেন মা, নিশ্চয় দেবেন!

পাণ্ডাজীর দৃঢ় আশ্বাসে প্রাণ যেন হঠাৎ সত্যই এক অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে ভরে' উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে দুটী চোখ জলে ভরে' এল। যাকে আজ সাত বৎসর হ'ল হারিয়েচি, আবার তাকে আমি ফিরে পাবো? তাও কি সম্ভব হ'তে পারে!…

৪

কাশী থেকে সাতটি দিনের বিদায় নিয়ে আমরা বিন্ধ্যাচলে মা বিন্ধ্যবাসিনীর দর্শনে গিয়েছিলুম। পুরাণো চাকর বুড়ো সুদর্শন-দাদা কাশীর বাড়ীর ভার নিয়ে সেখানে রইলো… সাতদিনের পর আমরা আবার কাশীতে ফিরে এলুম।

আমাদের দেখেই সুদর্শন দাদা যেন কেমন কাতরভাবে সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। বাবা বল্লেন, কি হ'য়েচে রে?

…সুদর্শন যা বল্লে, তা থেকে তার কাতরতার কারণ এইটুকু বোঝা গেল যে, আমরা যাবার দিন-দুই পরে কোথা থেকে একটি অনাথা মেয়ে এসে বাড়ীর দরজায় ধন্না দিয়ে পড়ে। সে বল্লে যে, গোটা একদিন সে এই কাশীর পথে-পথে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেমন ক'রেই হোক্, এই বাড়ীর নীচের তলায় একটুখানি জায়গা তাকে দিতে হবে। খাবার কথা জিজ্ঞেসা করায় সে বলল, খাবার তাকে দিতে হবে না, শুধু সে একটুখানি মাথাটা গুঁজে পড়ে থাক্‌তে চায়। মেয়েটা থর্ থর্ করে' কাঁপ্‌ছিল। বুড়ো সুদর্শন তার গায়ে হাত দিয়ে দেখে যে, গা তার তেতে আগুন হ'য়ে উঠেছে। মেয়েটার সে অবস্থায় সুদর্শন তাকে তাড়িয়ে দিতে না পেরে নীচের ঐ ঘরে জায়গা দিয়েছে……

মা বল্লেন, তা তো বেশ করেছ সুদর্শন, তাতে আর হয়েচে কি?

সুদর্শন কিন্তু মুখখানাকে অত্যন্ত কুণ্ঠিত করে' বল্লে,—না মা, শুধু তা নয়। আমি বুঝ্‌তে পারিনি যে, মেয়েটা গর্ভবতী ছিল, পরের দিন রাতেই তার একটি ছেলে হ'য়েচে।

মা বল্লেন, বলিস্ কিরে?

—হ্যাঁ মা। মেয়েটা সেই থেকে একরকম অজ্ঞান। ছেলে-টার কান্না দেখে আমি তার মুখে একটু দুধ দিয়ে দিয়ে—

আমি ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লুম,কোথায় সে আছে সুদর্শন দাদা?

—ঐ যে দিদি, ঐ ঘরে।

আমি তাড়াতাড়ি সাম্‌নের অন্ধকার ঘরে ঢুকে গেলুম। মা বক্‌তে লাগ্‌লেন; কিন্তু আমার মাথায় তখন কি যে খেয়াল চেপেছিল! কেবল এই কথাটা মনে হচ্ছিল, হা ভগবান্, যেখানে আদর করে' বুকে তুলে নেবার কেউ নেই, সেইখানেই তুমি এম্‌নি অযাচিতভাবে দাও, আর যে অভাগী একটা ছেলের জন্যে দিবারাত্রি হতাশার নিশ্বাস ফেল্‌ছে, তাকে এম্‌নি ক'রেই বঞ্চিত কর! এ বড় চমৎকার নিয়ম তোমার!……

মা বাবা উপরে উঠে গেলেন। আমি সুদর্শনকে একটা বাতি আন্‌তে বলে' সেই দুর্গন্ধময় অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম।…

সুদর্শন আলো নিয়ে প্রসূতির কাছে এল। আমি তার মুখের পানে চেয়েই শিউরে উঠ্‌লুম,—এ কি সর্ব্বনাশ! সুভা যে!…

সব ভুলে আমি একেবারে তার কাছে ব'সে পড়লুম। গায়ে ঠেলা দিলুম, হতভাগী একবার চেয়ে আবার চোখ মুদ্‌ল।

তাড়াতাড়ি সুদর্শনকে বললুম,—শীগ্‌গীর একজন ডাক্তার নিয়ে এসো, বাবা মাকে কিছু বল্‌তে হবে না,—শীগ্‌গীর!

সুদর্শন চলে' গেল। আমি সেইখানে পাথর হ'য়ে বসে' রইলুম।

৫

জগতের অনাদৃত একটি ক্ষুদ্র অতিথিকে নিজের কলঙ্কের চিহ্নস্বরূপ ফেলে রেখে সুভা চলে গেল—নিরুদ্দেশের দেশে। অনেক চেষ্টা করে' তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলুম, মাত্র ক'টা ঘণ্টার জন্যে। সে আমায় চিন্‌তে পার্‌লে; চোখ দিয়ে দর দর করে' তার জল গড়িয়ে পড়্‌ল; একে একে তার দুর্দ্দশার কাহিনী সব আমায় বলে সে ধীরে ধীরে চোখ মুদ্‌লে—পরম শান্তিতে!

সমস্ত কাহিনী—এই হতভাগ্যের প্রতি অঙ্গে যে গভীর কলঙ্ক-লিপি লেখা রয়েছে, তার কিছুই এখন আমার অজ্ঞাত নয়।…তার কলঙ্কের সঙ্গী যিনি, নিজের কলঙ্কের হাত এড়াবার আর কোন উপায় না দেখে তিনি সুভাকে এক বিধবা-আশ্রমে পাঠিয়ে দেন; সেখান থেকে তারা তাকে কাশীতে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু পূর্ণ গর্ভবতী, আর সম্পূর্ণ নিঃস্ব এবং নিঃসহায় দেখে তারা তাকে তাড়িয়ে দেয়।…হায় রে

পুরুষ!⋯আর সে নির্ম্মম পুরুষ—না, থাক্ সে কথা! সে কথা মনে আন্‌তে গেলেও আমার সর্ব্বশরীর যেন থান্ থান্ হ'য়ে ভেঙ্গে পড়ে!

হাঁ, সব শুনেছি আমি! মহাযাত্রার পূর্ব্বক্ষণে হতভাগী আমার কাণে রাশি-রাশি গরল ঢেলে দিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে পা-দুখানা ছুঁয়ে ক্ষমা চেয়ে গেল। ভগবান্ জানেন, অন্তরের সঙ্গে আমি তাকে ক্ষমা করেছি।⋯

মা ঘরে ঢুকে বল্লেন, হাঁরে, তুই কি পাগল হ'লি অনু? ওটাকে কোলে ক'রে বসে বসে সারাদিনটা এম্‌নি করে' কাঁদ্‌বি? নিজেদের লজ্জার কথা, ও আর কাউকে ত' বল্‌বার নয় মা! সংসারেরই ঐ গতিক!

চোখের জল মুছে ফেলে বল্লুম, কিন্তু সে যে এত নিঠুর হ'তে পারে মা, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। একথা আমি ম'নেও ভুল্‌তে পার্‌বো না যে, একটা নিরপরাধা মেয়ের মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী!

মা কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।⋯

৬

সুভার খোকাকে নিয়ে ফিরে এসেছি নিজের বাড়ীতে। স্বামী আফিস্ গিয়েছিলেন। আস্‌বার সময় হ'য়েছে দেখে আমি খোকার চোখে ভাল করে' কাজল দিয়ে একটি নূতন ফিরোজা রংয়ের জামা পরিয়ে দোল্‌নায় শুইয়ে দিয়ে দোল্ দিচ্ছি, আর সে তার কচি কচি হাত-পাগুলো ওপর পানে তুলে কি একটা জিনিষকে যেন ধর্‌বার চেষ্টা করছে, আর মাঝে মাঝে কারণে অ-কারণে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠছে।⋯

আজ এই দু'মাস ধরে' খোকাকে কোলে নিয়ে নিয়ে আমি সব কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করেছি।⋯হাঁ, সব ভুল্‌বো আমি। সুভাকে আমি ক্ষমা করেছি; আর স্বামী—তার সকল দোষ—সকল অন্যায়ও আমি মন থেকে মুছে ফেলে দোব। আমি যে এখন 'মা'; ঐ চিন্তার তৃপ্তিটুকুই যে এখন আমার অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত ক'রে ফেলেছে! সুভা তার জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে আমাকে 'মা' পদে অভিষিক্ত করে' গেছে। ঐ কথা যখনই মনে হয়, তখনই দু'ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু সেই হতভাগীর জন্যে আমার চোখের কোণে আপনা-আপনি জমা হ'য়ে ওঠে!—বড় জ্বলেছে—বড় পুড়েছে সে—ভগবান্ তাকে শান্তি দিন্!⋯

স্বামী ঘরে ঢুকেই চম্‌কে উঠ্‌লেন।—কখন্ এলে?⋯এ আবার কি?

—খোকা! দেখতে পাচ্ছ' না?

—খোকা?—

—হ্যাঁগা, বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন ক'রে এসো, ভাল ক'রে একদিন খাইয়ে দিতে হবে।

স্বামীর মুখখানা যেন একটু-আধটু করে' পাঙ্গাস হ'য়ে আস্‌ছিল।⋯হবারই কথা যে! খোকার মুখখানি এম্‌নি হ'য়েছে, যেন কেউ সুভার মুখের ছাঁচটুকু তুলে বসিয়ে রেখেছে!

—কোথায় পেলে একে?

আর লুকোচুরির প্রবৃত্তি হ'ল না। বল্লুম, কাশীতে। সুভা দিয়ে গেছে। তার কপালে সইল' না বলে' আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে।

স্বামী মাথা হেঁট ক'রে চলে' যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর হাত ধ'রে বল্লুম, যেওনা, শোন। জগৎ জান্‌বে, এ আমার ছেলে,—এ আমার বিশ্বনাথের দান। আর তুমি⋯ অনাথা সুভাকে সেই অবস্থায় নিরাশ্রয়ে বাড়ীর বার ক'রে দিয়ে যে অন্যায় তুমি করেছ, একে মানুষ করে' তার এককণা প্রায়শ্চিত্তও তোমায় কর্‌তে হবে। রাখ্‌বে কি আমার কথা?

অত্যন্ত অপরাধীর মত স্বামী বল্লেন, রাখ্‌বো।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত গল্প-পুস্তক "একা" —১॥০
শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "মগের মুলুক" —১॥০
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত উপন্যাস "অনাগত" —১॥০
শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গীতিনাট্য "লয়লী-মজনু" — ।০
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত "শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী" (প্রথম ভাগ) —৩॥০
শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ঋড়ের রাণী" —২৲
শ্রীহৃষীকেশ সেন প্রণীত "বেকার সমস্যা" —১॥০
মৌলভী মির্জ্জা সোলতান আহাম্মদ প্রণীত "নির্ব্বাসিতা হাজেরা" —১।০
ও "হজরত এব্রাহিম" —১।০
শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত "জারক" —২৲
শ্রীবিজয়গোপাল বক্সী প্রণীত "সেবিকা" —১॥০

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons
1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

হোলী

চিত্রাধিকারী—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(মধ্যভারত ছত্তরপুরাধিপতি মহারাজা স্যর বিশ্বনাথ সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই কর্ত্তৃক উপহৃত)

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS.

ফাল্গুন—১৩৩৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চদশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

বেদ মানিব কেন ?

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

বেদ মানিব কেন—এই কথাটী বুঝিতে হইলে বেদের কিঞ্চিৎ পরিচয়লাভ অগ্রে আবশ্যক, এজন্য সংক্ষেপে সেই বেদের পরিচয় এই—

বেদই আমাদের ধর্ম্মের মূল। বেদদ্বারাই আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদায় নির্ণীত হইয়া থাকে, ধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ে বেদই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

এই বেদমধ্যে কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—এইরূপ তিনটী বিভাগ আছে, আর এতদনুসারে আমাদের ধর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্মমার্গ, উপাসনামার্গ ও জ্ঞানমার্গ—এইরূপ তিনটী পথ হইয়াছে।

এই বেদ চারিখানি, যথা—ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ। ইহাদের মধ্যে ঋগ্‌বেদের ২১টী শাখা, যজুর্ব্বেদের ১০৯টী শাখা, সামবেদের সহস্র বা মতান্তরে ১৩টী শাখা এবং অথর্ব্ববেদের ৫০টী শাখা মহর্ষি ব্যাসের শিষ্যপ্রশিষ্য-গণের সময় প্রচলিত হয়।

ইহাদের প্রত্যেকের আবার দুইটী করিয়া ভাগ আছে ; যথা—একটী ভাগের নাম মন্ত্র বা সংহিতা এবং অপর ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে উক্ত মন্ত্র বা সংহিতা ভাগের অর্থ ও প্রয়োগপ্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য ব্রাহ্মণ ভাগকে সংহিতা বা মন্ত্র ভাগের ব্যাখ্যাবিশেষ বলা হয়। উভয়ই বেদপদবাচ্য, উভয়ই অনাদি, নিত্য, অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষ রচিত নহে, সুতরাং ভ্রমপ্রমাদাদি

শিশুকে মনুষ্যসম্বন্ধশূন্য করিয়া পালন করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাদের কোন মানবীয় ভাষার স্ফূর্তি হয় নাই। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।

এজন্য মানবীয় বর্ণাত্মক ভাষা না শিখিলে মানব তাহা স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারে না। হাসি-কান্না-রাগ-ভয়-প্রকাশক ধ্বন্যাত্মক ভাষা মানবের আপনাপনি বিকাশ পাইতে পারে বটে, কিন্তু বর্ণাত্মক ভাষা না শিক্ষা করিলে আপনাপনি বিকশিত হইতে পারে না।

একটা ভাষা শিক্ষা করিবার পর মানব সেই ভাষা বিকৃত করিয়া নূতন ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু একটা ভাষা না শিখিলে মানব তাহা করিতে পারে না।

যদি বলা যায়—মানবের বর্ণাত্মক ভাষা উচ্চারণে সামর্থ্য আছে, অপর প্রাণীর তাহা নাই, সুতরাং মনুষ্যে ইহা স্বভাববশেই বিকশিত হইবে?—কিন্তু এরূপ কল্পনাও করা যায় না। কারণ, মনুষ্যের এই সামর্থ্য থাকিলেও, উদ্বোধকের অভাবে, সংস্কার যেমন স্মৃতিতে পরিণত হয় না, তদ্রূপ শিক্ষারূপ উদ্বোধকের অভাবে তাহার বিকাশ হয় না। পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতেই শিশু প্রথমে ভাষা শিক্ষা করে। পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের ভাষাশ্রবণই এস্থলে উক্ত সামর্থ্যবিকাশের পক্ষে উদ্বোধক হইয়া থাকে। এই উদ্বোধকের অভাব হইলে মানবে ভাষার বিকাশ হয় না।

হওয়া ও রচিত হওয়া ত এক কথা নহে। বস্তুতঃ ঈশ্বরই আদি মানব ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া নিত্য অরচিত বেদ উচ্চারণ করিয়া আদিম মানব জাতিকে এই বেদদান করিয়াছেন—ইহাই বলা হয়। আর ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মানিলে তাঁহার পক্ষে মানবরূপ ধারণ অসম্ভবও নহে এবং যুক্তিবিরুদ্ধও নহে। বেদ মানবরূপী ঈশ্বরপ্রোক্ত, ঈশ্বররচিত নহে। মানব ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দ প্রথম উচ্চারিত হয় না বলিয়া বেদ মানবরচিত বলিবার কোন হেতুই নাই। বস্তুতঃ, বেদ ঈশ্বরপ্রোক্ত—এ কথা সেই বেদমধ্যেই আছে। সুতরাং বেদ মনুষ্যরচিত বলিবার কোন কারণ নাই।

যদি বলা হয় বেদমধ্যে বেদোৎপত্তির কথা থাকে কি করিয়া? বেদোৎপত্তির বর্ণনও কি বেদ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, সৃষ্টি অনাদি, এবং প্রতিকল্পেই ভগবান্ মানবকে এইরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন বলিয়া বেদে যেমন অপর সনাতন সত্যের কথা উক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সনাতন সত্য কথাটীও কথিত হইয়াছে। যেহেতু বেদের অংশবিশেষ মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

"ব্রহ্মা হ দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব,
সঃ অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ"

অর্থাৎ ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে প্রথম উৎপন্ন হন, তিনি তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে এই বেদ দিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

সুতরাং বেদমধ্যে বেদের কথা থাকে কি করিয়া—এ আপত্তি আর থাকিল না।

যদি বলা হয়, বেদমধ্যে যেমন বেদকে ব্রহ্মরূপী ঈশ্বরপ্রোক্ত বলা হইয়াছে, তদ্রূপ সেই বেদমধ্যে উক্ত বাক্যেই বেদের উৎপত্তির কথাও বলা হইয়াছে ; সুতরাং বেদ নিত্য হইবে। কিরূপে ? তাহার উত্তর এই যে, বেদমধ্যে বেদের উৎপত্তির কথা নাই, কিন্তু পুনরাবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে। কারণ, কেহই কখন নিজের উৎপত্তি দেখিতে, সুতরাং বর্ণন করিতে পারে না। উৎপত্তি ও পুনরাবির্ভাব এক কথা নহে। আর বেদের উৎপত্তির কথা যদি কোথাও থাকে, ইহা স্বীকারই করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বেদ ভিন্ন গ্রন্থেই থাকিবার কথা। রচিত বেদে বেদরচনার কথা আর "বেদ" হইতে পারে না। কিন্তু বেদমধ্যেই তাদৃশ কথা রহিয়াছে বলিয়া উহা বেদের আবির্ভাববিষয়ক সনাতন সত্যের বর্ণনা-বিশেষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অনাদি সৃষ্টির প্রতিকল্পেই ভগবান্ ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া আদিম মানবকে বেদদান করেন—বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষা দেন—এই সনাতন সত্যই উক্ত বেদোৎপত্তিবোধক বেদবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। বেদ ছিল না, উৎপন্ন হইল—একথা বলা উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। বেদের মধ্যে বেদাবির্ভাবের কথা থাকায় বেদের পুনরাবির্ভাবের কথনই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।

পক্ষান্তরে বেদমধ্যেই আছে "ব্রহ্মনিঃশ্বসিতং বেদঃ" অর্থাৎ বেদ ব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার কোন প্রযত্ন আবশ্যক হয় নাই। বাক্য-রচনায় যেরূপ প্রযত্নের আবশ্যক হয়, ইহাতে সেরূপ প্রযত্ন প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং ইহা ঈশ্বরের রচিতও নহে। যাহা নিঃশ্বাসের ন্যায় বহির্গত হয় তাহার রচনা সম্ভব হয় না।

তৎপরে আবার আছে—"বিরূপ ! নিত্যয়া বাচা" অর্থাৎ "হে বিরূপ ! বেদরূপ নিত্য বাক্যের দ্বারা স্তুতি কর" ইত্যাদি। এস্থলে বেদমধ্যেই বেদবাক্যকে নিত্যই বলা হইতেছে। সুতরাং বেদের উৎপত্তিবোধক উক্ত "ব্রহ্মা হ দেবানাং" বাক্য এবং বেদের নিত্যতাবোধক উক্ত "বিরূপ ! নিত্যয়া" বাক্য—এই আপাতবিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা করিলে ইহাই সিদ্ধ হইবে যে, বেদের উৎপত্তিবোধক উক্ত বাক্যটী বেদের পুনরাবির্ভাববোধক বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি বলা হয়—উক্ত আপাতবিরুদ্ধ বেদবাক্যদ্বয়ের এক-বাক্যতার অনুরোধে 'উৎপত্তির' অর্থ 'পুনরাবির্ভাব' না করিয়া 'নিত্যকে' আপেক্ষিক নিত্য অর্থাৎ অনিত্য বলিলে দোষ কি ? তাহার উত্তর এই যে, উৎপত্তিকে আবির্ভাব বলিয়া বুঝিলে উৎপত্তি ও আবির্ভাবের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, নিত্যকে অনিত্য বলিয়া বুঝিলে নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে না। উৎপত্তিটি পুনরাবির্ভাবের বিরোধী নহে, কিন্তু অনিত্যটি নিত্যের বিরোধীই হইয়া থাকে। সুতরাং উৎপত্তির সহিত পুনরাবির্ভাবের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, নিত্যের সহিত অনিত্যের সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় না। বুদ্ধি, আলোকরশ্মির ন্যায় সরল পথেই গমন করে, আর সরল পথই নিকট পথ। এ স্থলে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের গ্রহণই বুদ্ধির পক্ষে সরল পথে গমন। এজন্য উক্ত আপাতবিরুদ্ধ বেদবাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা করিতে হইলে উৎপত্তির অর্থ পুনরাবির্ভাব করাই শ্রেয়ঃ, নিত্যকে অনিত্য করা শ্রেয়ঃ হইতে পারে না। অতএব বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয় ইহা বেদদ্বারাই প্রমাণিত হইল।

তাহার পর বেদ যে নিত্য ও অপৌরুষেয়, তাহা যুক্তির দ্বারাও বুঝা যায়! কারণ, যে ব্রহ্মার রূপধারী ঈশ্বর বেদবক্তা, সেই ঈশ্বরকর্ত্তৃকও বেদের রচনাই সম্ভবপর হইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে রচনাই সম্ভবপর হয় না।

কারণ, বেদকে যদি ঈশ্বররচিত বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে—বেদ রচিত হইবার পূর্ব্বে ছিল কি না ? যদি "ছিল" বলা হয়, তবে আর রচনাই সম্ভবপর হয় না। কারণ, আমরা যাহা রচনা করি, তাহা রচনার পূর্ব্বে আমরা জানি না। রচনা করিবার ইচ্ছার পূর্ব্বে তাহা আমাদের মনে ভাসমান থাকে না।

আর যদি বেদ ঈশ্বরকর্ত্তৃক রচনার পূর্ব্বে "ছিল না" বলা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে, সেই বেদ ঈশ্বরকর্ত্তৃক রচনার পূর্ব্বে ঈশ্বর জানিতেন কি না ? যদি "ঈশ্বর জানিতেন" বলা হয়, তবে আর তাহার রচনা সম্ভবপর হয় না। আর যদি "ঈশ্বর জানিতেন না" বলা হয়, তবে ঈশ্বর আর সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞের পক্ষে আমাদের মত রচনা সম্ভবপর নহে। অতএব বেদ ঈশ্বরেরও রচিত নহে—ইহাই বলিতে হইবে। সুতরাং বেদ ঈশ্বরসম নিত্য, ঈশ্বর যেমন নিত্য বেদও তদ্রূপ নিত্য এবং অপৌরুষেয়।

যদি বলা হয়—বেদের ব্রাহ্মণভাগ, বেদের সংহিতা বা মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাবিশেষ বলিয়া ব্রাহ্মণভাগটী রচিত গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হউক ? আর তাহা হইলে বেদের অংশবিশেষ পৌরুষেয় ও অনিত্যই হইল। কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, অরচিত মন্ত্রভাগ যদি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই শিক্ষা দেন, তবে তাহার অর্থও তাঁহাকেই শিক্ষা দিতে হইবে। কারণ, যে মানব প্রথমে বর্ণাত্মক শব্দোচ্চারণরূপ ভাষাই শিক্ষা করিতেছে, সে মানব নিজে নিজে তাহার অর্থ আবিষ্কার করিবে কিরূপে ? ভাষা শিক্ষা করার অর্থই এই যে, শব্দের সহিত তাহার অর্থের অর্থাৎ বিষয়ের যে সম্বন্ধ তাহারই পরিচয়লাভ করা। অতএব ব্রাহ্মণভাগও কাহারও রচিত নহে। এমন কি ঈশ্বরেরও রচিত নহে। তাহাও মন্ত্রভাগের ন্যায় অরচিত অর্থাৎ অপৌরুষের নিত্য শব্দরাশি।

যদি বলা হয় মনুষ্যরচিত রামায়ণ মহাভারতাদিও রচনার পূর্ব্বে ঈশ্বর জানিতেন, সুতরাং তাহাদের রচনাই বা কি করিয়া সম্ভাবিত হয় ? তাহার উত্তর এই যে, বেদকে রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় নিত্য বলিয়া ত অরচিত বলা হইতেছে না! উহারা বাল্মীকি ও ব্যাসের রচিত গ্রন্থ। উহাদের রচনার পূর্ব্বে ব্যাস বাল্মীকির মনে উহারা ভাসমান ছিল না। ঈশ্বরে উহারা ভাসমান ছিল, আর তাহা ব্যাস ও বাল্মীকির রচিতরূপেই ভাসমান ছিল। উহারা যখনই আবির্ভূত হইবে, তখন ব্যাস ও বাল্মীকির বুদ্ধির মধ্য দিয়াই ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হইবে—এইভাবেই ঈশ্বরে ছিল। সুতরাং ব্যাস ও বাল্মীকিকর্ত্তৃক উহাদের রচনায় কোন বাধা ঘটিতে পারে না। আর তজ্জন্য বেদকে পৌরুষেয় ও অনিত্য বলিবার আবশ্যকতা নাই।

আর যদি বলা হয়—ঈশ্বর যদি নূতনই কিছু না করিতে পারেন, তবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা আর থাকিল কোথায় ? ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলে যদি তাঁহার নূতন রচনা অসম্ভব হয়, তবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হইল। ইহার উত্তর এই যে, এই অনন্ত জগৎ জীবাদৃষ্ট অনুসারে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত করাতে ঈশ্বরের অনন্তশক্তিমত্তা সুতরাং সর্ব্বশক্তিমত্তাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। জীবাদৃষ্ট অনুসারে সৃষ্টি না করিলে তাহাতে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষ ঘটিবে। আর জীবাদৃষ্ট অনুসারে সৃষ্টি করায় তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত যেমন হয় না, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রযুক্ত নূতন রচনা অসম্ভব হইলেও তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হয় না। বস্তুতঃ এরূপ আশঙ্কা করিলে বলিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর যখন নিজে নিজের বিনাশ করিতে পারেন না, তখন তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। কিন্তু তাহা ত বলা হয় না, অতএব সর্ব্বজ্ঞের রচনা সম্ভবপর হয় না, ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত।

যদি বলা যায়, ঈশ্বর যে বেদের বক্তা, সেই বেদ যখন প্রতিকল্পে ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হয়, তখন তাহা পূর্ব্বকল্পের মনুষ্যরচিত পূর্ব্বকল্পের শব্দরাশি হউক না কেন ? মনুষ্যের অরচিত শব্দরাশিই যে তিনি কল্পারম্ভে শিক্ষা দেন—ইহা স্বীকারের প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তর এই যে, মনুষ্যকে যখন বর্ণাত্মক শব্দরাশি শিক্ষাই করিতে হয়, শিক্ষা না করিলে যখন তাহা আপনা-আপনি বিকশিত হয় না, তখন অরচিত কতকগুলি শব্দরাশি না স্বীকার করিলে চলিবে কেন? মনুষ্যরচিত ভাষা স্বীকার করিতে গেলেই মনুষ্যের অরচিত ভাষা স্বীকার করা আবশ্যক হয়। নচেৎ মনুষ্য শিক্ষা করিবে কি ? শিক্ষাই ত তাহা হইলে সম্ভবপর হয় না।

যদি বলা হয়, বেদের মধ্যে যখন বক্তা শ্রোতা এবং তাহাদের সম্প্রদায়ের কথা রহিয়াছে, তখন বেদ কি করিয়া অরচিত নিত্য শব্দরাশি বলিয়া স্বীকার করা যায় ? তাহার উত্তর এই যে, তাহা হইলে এই বক্তা ও শ্রোতার সম্প্রদায়ের কথার মধ্যে, আজ পর্য্যন্ত যে সব বক্তা ও শ্রোতা হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সকলের স্থান হয় নাই কেন ? কেন তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইতেছে না ? বেদমধ্যে বক্তা ও শ্রোতার সম্প্রদায়ের কথা কিয়দ্দূরে আসিয়া থামিয়া গেল কেন ? যেখানে থামিয়া গিয়াছে, তাহার পরও ত সম্প্রদায় চলিয়াছিল। তাঁহাদের কথা পরিত্যক্ত হইল কেন ? এজন্য এই সব কথা বেদমধ্যে যাহা আছে, তাহা অর্থবাদ, অর্থাৎ তাহা বেদের প্রামাণ্যরূপ স্তুতি প্রভৃতির জন্য। মহামুনি ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র মধ্যেই ১৪১ সংখ্যক অধিকরণে আখ্যায়িকায় অর্থবাদত্ব নির্দ্দেশ করিয়া এই কথারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ সম্প্রদায়ের কথা যদি বেদাতিরিক্ত বলিয়া প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বেদ মনুষ্যরচিত—এ কথা একদিন সম্ভবপর হইত। কিন্তু ইহাও বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব বেদে বক্তা ও শ্রোতা প্রভৃতির বিষয় থাকিলেও বেদ অরচিত গ্রন্থ।

যদি বলা হয়, মহাভারতের অন্তর্গত গীতামধ্যে "শ্রীকৃষ্ণ

বলিলেন" এই বাক্যকেও গীতা বলা হয় ; এইরূপ বেদবক্তার কথাও "বেদ" বলা হইয়া থাকে, ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—এ কথা সঙ্গত হয় না। কারণ, গীতা মনুষ্যরচিত ইহা পূর্ব্বেই নিশ্চিত আছে। ইহা মহাভারতে উক্তই আছে। বেদে তাহার বিপরীত কথাই নিশ্চিত। বেদের কে রচয়িতা তাহা কোথাও উক্ত হয় নাই। আর এস্থলে মিথ্যা শঙ্কা করিয়া তাহাই নির্ণয় করা হইতেছে। অতএব গীতার দৃষ্টান্ত বেদানুরূপ হইল না। বিষম দৃষ্টান্ত হইলে সাধ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং এই আপত্তি অমূলক।

যদি বলা হয় বেদরচয়িতার পরিচয় আমাদের আজ জানা না থাকায় যদি বেদকে অরচিত বলিতে হয়, তবে লোকমুখে যেসব প্রচলিত গান গাথা বা গ্রাম্য কথাপ্রভৃতি শুনা যায়, তাহাদের রচনা-কর্ত্তার প্রসিদ্ধি না থাকায় তাহাও অরচিত বলিতে হয় ? তাহা হইলে বলিব—এ কথা অসঙ্গত। কারণ, উক্ত গানগাথা প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রোক্ত বলিয়া বা অরচিত বলিয়া ত প্রসিদ্ধি হয় নাই। উহাদের রচনাকর্ত্তার বিষয় কেবল জানা নাই—এই মাত্রই জানা আছে। ঈশ্বরপ্রোক্ত বা অরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আর রচনাকর্ত্তার বিষয় না জানা ত এক কথা নহে। বেদ কিন্তু ঈশ্বরপ্রোক্ত বা অরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে, বেদমধ্যেই এ কথা স্পষ্টভাবে উক্ত রহিয়াছে। অতএব গান ও গাথাপ্রভৃতির ন্যায় বেদ হইতে পারিল না। গানগাথার কর্ত্তৃত্ব সেই গানগাথার মধ্যে অনুক্ত এবং লোকমধ্যে বিস্মৃত, বেদের কর্ত্তৃত্বাভাবই বেদমধ্যে উক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ; তাহার কর্ত্তৃত্ব গানগাথার কর্ত্তৃত্বের ন্যায় বেদে অনুক্ত বা বিস্মৃত কর্ত্তৃত্ব নহে। অতএব গানগাথাপ্রভৃতির ন্যায় বেদেরও রচনাকর্ত্তা আছে বা ছিল—এ কথা বলা সঙ্গত হয় না। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় বিষমদৃষ্টান্ত দোষ হইল।

যদি বলা হয়—বেদ নিজের নিত্যত্ব বা অরচিতত্ব নিজে বলিলে তাহার প্রামাণ্য কিরূপে সিদ্ধ হবে ? তাহা হইলে দুষ্ট লোকের কথায় দুষ্টকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। চার্ব্বাকগণ বেদকে ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক রচিত বলিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। এ কথা মহাভারতে উক্ত হইতে দেখা যায়। অতএব বেদমধ্যে বেদ ঈশ্বরপ্রোক্ত অর্থাৎ অরচিত ভাষা বলিয়া কথিত হইলেও তাহার প্রামাণ্য নাই। এরূপ প্রামাণ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি কথনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, ভাষা যদি শিক্ষা না করিলে স্বতঃবিকশিত না হয়, সুতরাং প্রথমসম্ভূত মানবকে যদি ভাষা শিক্ষাই করিতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সময় ভাষা মানবের অজ্ঞাত ছিল, সে সময় যদি কেহ ভাষা শিক্ষা দেন, তাহা বর্ণনা করিবে কে ? এবং ভাষার অভাবে কি উপায়দ্বারাই বা তাহা বর্ণিত হইবে ?

আর ভাষা শিখিয়া কেহ পরে বর্ণনা করিলে তাহা আর বেদ হইতে পারে না। আর সে সময় অপর একজন ভাষাজ্ঞ না থাকিলে সে কথা ত আর বর্ণনা করাও সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সে সময় ত অপর কেহ ভাষাজ্ঞ আর নাই। কারণ, এই সময় প্রথম মানব প্রথম এই ভাষা শিক্ষাই করিতেছে।

আর এই প্রথম শিক্ষক যদি প্রথম মানবকে বলিতেন—"আমি তোমাদের জন্য এই বেদরূপ ভাষা সৃষ্টি করিলাম" তাহা হইলে বেদের রচনা সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলে বলিব, তিনি ইহা বলিবেন কিরূপে ? তাঁহাকে ভাষা শিখাইলে কে ? আর ভাষা পূর্ব্ব হইতে না থাকিলে তিনি ইহা বলিতেও পারেন না। আর ঈশ্বর মানবরূপ ধারণ করিয়া যদি এই প্রথম শিক্ষকের কার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ কথা বলিতেও পারেন না। কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার পক্ষে রচনা সম্ভবপরই নহে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এজন্য প্রতি সৃষ্টিতে প্রথম মানব যে ভাষা শিক্ষা করে, সে ভাষা যদি আত্মপরিচয় দেয়, তাহা হইলে তাহাকেই বলিতে হইবে যে, "আমি নিত্য অরচিত অনাদি ভাষা"। সে ভাষার পরিচয় সেই ভাষামধ্যেই থাকা আবশ্যক। তাহার পরিচয় কাহারও দ্বারা রচনা করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে না। ভাষাশিক্ষা আবশ্যক হইলেই অরচিত নিত্য ভাষা আবশ্যকই হয়। ঈশ্বরে এই অরচিত ভাষা এবং রচিত ভাষা—সকলই আছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালের, সকল ভাষাই আছে ; ঈশ্বরে নাই—এমন কিছুই নাই—হইতেও পারে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবহিতের জন্য যদি ঈশ্বরকে মানবরূপ ধারণ করিয়া প্রথম মানবকে ভাষা শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে তিনি সেই অরচিত নিত্য ভাষা বেদই শিক্ষা দিবেন। ইহাই ত সম্ভবপর, ইহাই ত সঙ্গত। যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে ভাষারচনা আবশ্যক হয় না, সম্ভবপরও হয় না। আর জীবহিতের জন্য সেই অরচিত

ভাষার প্রামাণ্যের পরিচয় ভাষার দ্বারা দিতে হইলে প্রথমে তাহা সেই অরচিত ভাষাই দিবে। যেহেতু জীবকে জ্ঞান দান করাই ভাষার উদ্দেশ্য, আর প্রামাণ্যবোধ না হইলে জীবের প্রবৃত্তিই হয় না। অতএব সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরপ্রোক্ত নিত্য অরচিত ভাষা যে বেদ, তাহার মধ্যেই তাহার প্রামাণ্য-জ্ঞাপনের জন্য তাহার নিত্যত্ব এবং অরচিতত্ব কথাও থাকা একান্ত আবশ্যক।

সেই ভাষাই বেদ। এই জন্য বেদমধ্যেই বেদের প্রামাণ্য এবং নিত্যত্বাদি ঘোষিত হইয়াছে। আর অন্য কোথাও অন্য কোন ভাষাতেও এভাবে নিজের নিত্যত্বাদি ঘোষিত হয় নাই। গানগাথাজাতীয় কথায় বা অন্য কোন ভাষায় কোথাও তাহা ঘোষিত হয় নাই। বস্তুতঃ, এই কারণেই বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলা হয়। এই কারণেই বেদের প্রামাণ্য অপর প্রমাণের অপেক্ষা করে না। ভাষারচনা মনুষ্যেই করে, কারণ সে সর্ব্বজ্ঞ নহে। সর্ব্বজ্ঞের দ্বারা রচনা সম্ভবপর নহে। অতএব কল্পারম্ভে প্রথম মানবকে যে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই শিক্ষা দেন বলিয়া, এবং সেই ভাষা মানব প্রথম শিক্ষা করে বলিয়া, তাহা অরচিত নিত্য ভাষাই হইবে। আর প্রামাণ্যবোধ ভিন্ন শিক্ষাতেও প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া সেই ভাষায় সেই ভাষার নিত্যত্ব ও প্রামাণ্য ঘোষিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং তাহাতে নিজের নিত্যতার কথা থাকিলে তাহা আর অপ্রমাণ বা অবিশ্বাস্য হইতে পারে না।

যদি বলা হয় বেদমধ্যে প্রত্যেক মন্ত্রে ঋষি ছন্দঃ ও দেবতা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই ঋষিই সেই বেদমন্ত্রের রচয়িতা, ইহাই ত সহজে মনে হইবার কথা। সাধারণতঃ গ্রন্থমধ্যে যেমন গ্রন্থকারের নাম থাকে, ইহা ত তাহাই মনে হয়। আর ঋষি শব্দের অর্থ—মন্ত্রদ্রষ্টা বা মন্ত্রশ্রোতা বা মন্ত্রলব্ধা বলা হয়। সুতরাং যে ঋষি যে সত্য উপলব্ধি করিয়া যে মন্ত্র রচনা করিয়াছেন, সেই মন্ত্রে সেই ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্তই ত স্বাভাবিক।

ইহার উত্তর এই যে, প্রত্যেক মন্ত্রে যে ঋষি ছন্দঃ ও দেবতা প্রভৃতির উল্লেখ, তাহাও বেদ, তাহাও বেদমন্ত্রের অঙ্গ, তাহা বেদবহির্ভূত নহে। সুতরাং প্রত্যেক মন্ত্রের প্রত্যেক ঋষি সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা বা রচয়িতা হইতে পারেন না।

তাহার পর ঋষি যদি মন্ত্রদ্রষ্টা হন, তবে দৃশ্যবস্তু—যেমন দর্শনক্রিয়ার পূর্ব্বে থাকে, তদ্রূপ সে মন্ত্রও পূর্ব্বে ছিল—ইহাই সিদ্ধ হয়। শ্রোতা হইলেও শ্রোতব্য মন্ত্রের অস্তিত্ব পূর্ব্বেই সিদ্ধ হয়। লব্ধা হইলেও তাহাই ঘটে।

আর ঋষি সত্য উপলব্ধি করিয়া সেই সত্য তিনি যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন সেই ভাষাই বেদ—ইহাও বলা যায় না। কারণ, সেই ঋষিকে সত্য উপলব্ধির সাধন উপদেশ করিল কে? সিদ্ধফলপ্রদ সাধন উপদেশ করিতে গেলে একজন সিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞকে অভ্রান্ত ভাষার দ্বারা তাহা উপদেশ করিতে হইবে। ভাষা যদি নিজে নিজে বিকশিত না হয়, তাহা যদি শিক্ষা করিয়াই লব্ধ হয়, তবে সেই ঋষি, উপলব্ধ সত্যকে অরচিত ভাষার দ্বারা প্রকাশিত করিবেন কিরূপে? ভাষা নিজে বিকশিত হয় না; সুতরাং তিনি ভাষা সৃষ্টি করিয়া উপলব্ধ সত্য প্রকাশ করিতে পারেন না; আর তজ্জন্য তাঁহার ভাষাই বেদ—এ কথা বলা যায় না। তাহা বেদের অনুবাদ মাত্রই হয়, বেদের ন্যায় তাহা কতকটা হয়—এই মাত্র তাহা ঠিক্ বেদ হয় না।

যদি বলা যায় লৌকিক ভাষা শিক্ষা করিবার পর সাধন-বলে সত্য অনুভব করিয়া শিক্ষিত ভাষার সাহায্যে যে স্বানুভব-লব্ধ সত্যের স্বরচিত ভাষার দ্বারা প্রকাশ হয়, সেই ভাষাই বেদ বলিতে দোষ কি? তাহার উত্তর এই যে, একটী বিষয় নানা শব্দের দ্বারা সমানভাবে বুঝান বা প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যেক শব্দের অর্থমধ্যে, বিষয় এক হইলেও, কিছু না কিছু ভেদ থাকে। কৃষ্ণ নীল পীত অসিত শ্যাম সকলই কৃষ্ণকে বুঝাইলেও কিছু বিশেষ বিশেষ অর্থও সেই সঙ্গে বুঝাইয়া থাকে—ইহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা কোন কিছু রচনা করেন, তাঁহারা যে প্রায়ই এক একটী শব্দের পরিবর্ত্তে অপর শব্দ বসান, তাহা এই কারণেই হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক সত্যকে অভ্রান্ত অসন্দিগ্ধ বা কেবল ভাবে প্রকাশিত করিতে গেলে নানারূপ বাক্য বা ভাষার দ্বারা তাহা করিতে পারা যায় না। নির্দ্দিষ্ট সত্যের যথার্থ প্রকাশক নির্দ্দিষ্ট ভাষাই আছে। নির্দ্দিষ্ট শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পদার্থই অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত হয়। অন্য শব্দদ্বারা তাহাকে প্রকাশিত করিলে তাহাতে কিছু অন্য অর্থ মিশ্রিত হয়। এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন কেহই অভ্রান্তভাবে শব্দদ্বারা কোন কোন কিছু প্রকাশ করিতে পারেন না, অর্থাৎ অভ্রান্ত ভাষা শিক্ষা দিতে পারেন না। এজন্য প্রথমে যিনি ভাষা শিক্ষা

দিবেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনি অরচিত নিত্য ভাষাই শিক্ষা দিবেন। পরে যে ভাষা মনুষ্যের মধ্য দিয়া রচিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, সে ভাষা তিনি ব্যবহার করিবেন কেন? সে ভাষা সেই সেই মানবই ব্যবহার করিবে। আর সেই অরচিত ভাষার মধ্যে, জীবের প্রবৃত্তির জন্য, সেই ভাষার প্রামাণ্য বা নিত্যত্বেরও পরিচয় থাকিতে বাধ্য। কারণ, প্রামাণ্যবুদ্ধি না থাকিলে জীবের প্রবৃত্তিই হয় না। ইহাই বেদ মধ্যে আছে, ইহা অন্য কুত্রাপি নাই। আর এই জন্যই বেদ নিত্য অরচিত ঈশ্বরপ্রোক্ত অভ্রান্ত অপৌরুষেয় স্বতঃ-প্রমাণ অর্থবদ্ধ শব্দরাশি বলা হয়। সাধনালব্ধ সত্যপ্রকাশক বিভিন্ন ভাষাকে বেদ বলা চলে না। তাহা বেদের ন্যায় কতকটা কার্য্যকারী হইলেও বেদবৎ পূর্ণ কার্য্যকারী হইতে পারে না।

যাঁহারা বলেন—ব্রহ্মজ্ঞের ভাষাই বেদ, তাঁহারা ঠিক্ কথা বলেন না। কারণ, তাঁহাদের মতেও দুইজন পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে কোন ভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের ভাষার মধ্যেও ভেদ থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম এক হইলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ একই হন। কারণ, বেদ মধ্যেই আছে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন। সুতরাং বেদের ভাষা একইরূপ হয়।

কেহ কেহ বলেন—বেদ শব্দরাশি নহে, কিন্তু সত্য জ্ঞান-রাশি, অথবা ঈশ্বরের যে নিত্য সত্যজ্ঞান, তাহাই বেদ। তাহা শব্দ নহে। শব্দের দ্বারা কখন কোন বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। ইক্ষুরস ও শর্করার যে মিষ্টতা শব্দদ্বারা সরস্বতীও তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। ইহা মহামতি বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন। আর মহাপুরুষের স্পর্শেও জ্ঞান হয়, শব্দের তখন আবশ্যকতাই হয় না। অতএব জ্ঞানের জন্য শব্দ নিষ্প্রয়োজন, আর সেই কারণে বেদ শব্দরাশি নহে, পরন্তু জ্ঞানরাশি।

ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞান যদি সাধারণভাবে দান করিতে হয়, তবে শব্দ ভিন্ন গতি নাই। ঈশ্বর যদি সৃষ্টির আরম্ভে জীবকে জ্ঞান দান করেন, তবে তাহা শব্দদ্বারাই হইবে। মহাপুরুষের স্পর্শে যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহা জ্ঞানের প্রতিবন্ধকক্ষয় মাত্র। তৎপরেও শব্দের আবশ্যক হয়, তাহা অনেক স্থলে মনে মনেই সেই মহাপুরুষই প্রদান করেন। স্বপ্নে মন্ত্রলাভ ইহার দৃষ্টান্ত। আর কোন দেশে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যক্তিরই ইহা হয়। এইরূপে উদিত জ্ঞানকেও যদি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে আবার সেই ভাষারই প্রয়োজন হইবে। আর সেই জ্ঞান যদি যথার্থভাবে প্রকাশ করিতে হয়, তবে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট শব্দেরই প্রয়োজন হইবে। সুতরাং যে জ্ঞানদান করিয়া ঈশ্বর জীবনিবহের কল্যাণ সাধন করিবেন, সে জ্ঞান দীয়মান জ্ঞান বলিয়া শব্দের দ্বারাই প্রকাশ্য হয়।

আর শব্দের দ্বারা একেবারে অপ্রকাশ্য বিষয়ই নাই, অর্থাৎ সকল জ্ঞানের প্রকাশক সাক্ষাৎভাবে শব্দ না হইলেও "প্রকাশ করা যায় না" বলিয়াও শব্দ তাহাকে ত প্রকাশ করিয়া থাকে। মহাপুরুষ ত আর লক্ষ লক্ষ বৎসর জীবিত থাকিবেন না যে, সংস্পর্শে সকলের প্রতিবন্ধক ক্ষয় করিয়া জ্ঞানের বিকাশ করিয়া দিবেন? জ্ঞানধারা চিরকাল প্রবাহিত রাখিতে হইলে শব্দেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। বাচস্পতি মিশ্র যাহা বলিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় অন্য। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকিলে শব্দ তাহা উৎপাদন করিতে পারে না। শব্দ অর্থের স্মারকবিশেষ। যাহার শর্করা ও মিষ্টতার ভেদের জ্ঞান আছে তাহার পক্ষে "ইক্ষুর মিষ্টতা" এই শব্দ ইক্ষুর মিষ্টতাকে বুঝাইতে পারিবে না কেন? অতএব শব্দপ্রকাশ্য যতটুকু যে বিষয়ের সম্ভব, তাহাই শব্দ প্রকাশ করিবে। ঈশ্বরের যাবতীয় জ্ঞান বা ভাষার দ্বারা অপ্রকাশ্য জ্ঞান, বেদদ্বারা প্রকাশিত না হইলেও বেদের ন্যূনতা প্রমাণিত হয় না। আর তজ্জন্য বেদকে শব্দরাশি না বলিয়া সত্যজ্ঞান রাশি বলা যায় না।

বস্তুতঃ একমাত্র নির্গুণ নির্ব্বিশেষে অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎ চিৎ ও আনন্দ পদের লক্ষ্য বলিয়া এবং বাচ্য নহে বলিয়া, অনির্ব্বচনীয় বলা হয়, আর সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া মায়াকে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। নচেৎ ঘট পট ও মঠাদি যাবৎ বস্তুই শব্দবাচ্য বলা হয়। বস্তুতঃ অনির্ব্বচনীয় শব্দটীও শব্দই বটে। অতএব ঈশ্বরের যাবতীয় জ্ঞান বা যথার্থ সত্যজ্ঞান শব্দ-প্রকাশ্য নহে বলিয়া, বেদ শব্দনিরপেক্ষ জ্ঞানরাশি বলিবার কোন আবশ্যতা নাই। যে জ্ঞানরাশি গ্রন্থের আকার ধারণ করে বা লিপিবদ্ধ হয়, তাহা শব্দরাশিই হয়, তাহা শব্দ-নিরপেক্ষ জ্ঞানরাশি হইতে পারে না। অতএব বেদ শব্দ-রাশিই বটে।

যদি বলা যায় তাহা হইলে মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঋষি নামের

উল্লেখের উদ্দেশ্য কি? রচয়িতার নাম উল্লেখ ভিন্ন ইহার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যে মন্ত্রের যে ঋষি সেই মন্ত্রের প্রয়োগাদি, সেই ঋষির মত হইতে পারিলে পূর্ণফলপ্রদ হইবে। বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের প্রয়োগাদিতে অনুষ্ঠাতার আদর্শ কিরূপ হইবে, তাহাই উপদেশ করিবার জন্য সেই মন্ত্রের সঙ্গে ঋষি বিশেষের উল্লেখ। এই ঋষিচরিত্র বেদমধ্যস্থ ইতিহাসপুরাণাদিতেই উক্ত হইয়াছে। ইহা কোন্ সময়ে কোন্ ঋষি কোন্ মন্ত্র লাভ করিয়াছেন বা রচনা করিয়াছেন, তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য উক্ত হয় নাই। বেদ কোন ঘটনা বিশেষের ইতিহাস নহে। বেদ সনাতন সত্যের প্রকাশক। উচ্চারণবিশেষ দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম শরীরে যেমন বিশেষ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ছন্দের উল্লেখ করা হয়,—ঋষির বর্ণনদ্বারাও তদ্রূপ অধিকারীর কথা বলা হয়।

যদি বলা যায়, বেদের মধ্যে যখন কাশী কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানের, গঙ্গা সিন্ধু প্রভৃতি নদীর, হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতের এবং বহু ঐতিহাসিক পুরুষের নাম প্রভৃতি রহিয়াছে, তখন ইহা কি করিয়া কোনও সময়ে মানবরচিত ভারতবর্ষের চিত্র না হইয়া নিত্য অপৌরুষের শব্দরাশি হইতে পারে?

ইহার উত্তর এই যে, বেদে বিধিনিষেধের স্তুতিনিন্দার জন্য যেমন আখ্যায়িকাসমূহ স্বীকার করা হয়, তদ্রূপ উক্ত নামগুলিও সেই আখ্যায়িকার অঙ্গবিশেষ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কুরুক্ষেত্রাদি নাম বেদোক্ত নামের অনুকরণে দেশবিশেষে পরে রক্ষিত হইয়াছে বলিতে কোন বাধা হয় না। দশরথের তিন স্ত্রীর চারি পুত্র শুনিয়া যদি কেহ নিজের তিন স্ত্রীর চারি পুত্রের নাম "রাম লক্ষ্মণাদি" রক্ষা করে, তাহা হইলে তাহা কি অসম্ভব বলিতে হইবে? অথবা রামায়ণের ঘটনা এই ব্যক্তিবিশেষের পর ঘটিয়াছে বলিতে হইবে? একই দেশের নদী ও পর্ব্বতাদির যেরূপ সংস্থান, সেইরূপ সংস্থান যখন অন্য দেশেও দেখা যায়, তখন বেদের কাশী কুরুক্ষেত্রাদির অনুকরণে ভারতের স্থানবিশেষের যদি নামকরণ করা হয়, তাহা হইলে কি তাহা অসম্ভব হইয়া উঠে? অথবা বেদ কাশী কুরুক্ষেত্র হইবার পর রচিত—বলিতে হইবে? অতএব এইরূপ দেশাদির নাম দেখিয়া বেদকে মনুষ্যরচিত বলা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। বেদ কোন দেশ কাল ও পাত্র বিশেষের ঘটনাবিশেষের পরিচায়ক নহে—ইহা সনাতন সত্যের প্রকাশক।

যদি বলা যায়, বেদমধ্যে অনেক অসম্ভব ও অসঙ্গত গল্পাদি আছে, জীবজন্তু জড় পদার্থ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, ইত্যাদি বহু অসম্ভব বিষয় আছে; এবং পরিশেষে পরস্পর-বিরুদ্ধ কথাই বহু আছে। আর তাহাদের বেদত্ব অর্থাৎ সার্থকত্বরক্ষার জন্য মীমাংসকগণ তাহাদিগকে অর্থবাদ বলিয়া গণ্য করিয়া স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, কিন্তু কোন বিধি নিষেধের প্রাশস্ত্য বা নিন্দাদিবিধানার্থ বলিয়া তাহাদের পরার্থে তাৎপর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। এখন এইরূপে যে তাৎপর্য্যনির্ণয় তাহা রচনাকর্ত্তা না থাকিলে কিরূপে সম্ভবপর হয়? বক্তার অভিপ্রায়ই ত তাৎপর্য্য। সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় বলা যায় কিরূপে? তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাক্যের তাৎপর্য্য থাকিলেই যে তাহা রচিত বলিতে হইবে—এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না। ভাষা শিক্ষাই করিতে হয়—ইহা যখন দেখা যাইতেছে, তখন অরচিত ভাষা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আর শব্দের সহিত তাহার অর্থের সম্বন্ধ যদি ঈশ্বরের জ্ঞাত হয়, সুতরাং তাহা যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের অন্বয়ও তদ্রূপ নিত্য হইবে। আর তাহা হইলে, সেই অন্বয়ের ঘটক যে তাৎপর্য্য তাহাও তদ্রূপ নিত্য হইবে। অতএব বাক্যের তাৎপর্য্য থাকায় যে বাক্যমাত্রেই রচিত বলিতে হইবে, তাহা সঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে।

যদি বলা যায়, বেদমধ্যে শাখাভেদে দেখা যায়—যথেষ্ট পাঠভেদ রহিয়াছে, ক্রিয়ামধ্যেও ব্যতিক্রম হইয়াছে। এইরূপ পাঠভেদ ও ক্রিয়াভেদ মনুষ্যকর্ত্তৃক রচনারই নিদর্শন। অতএব বেদের নিত্যতা ও স্বতঃপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। ইহার উত্তর এই যে, পাঠভেদ ও ক্রিয়াভেদবশতঃ বেদের নিত্যত্বের বা অপৌরুষেয়ত্বের অথবা স্বতঃপ্রামাণ্যের কোন ব্যাঘাত হয় না। বেদ আবির্ভাবের পর সম্প্রদায়-মধ্যে বিস্মৃতি ঘটিয়া একপ হইয়াছে—বলিলে কোন দোষ হয় না। আর ইহা যখন বেদব্যাসের ন্যায় অবতার পুরুষও মান্য করিয়াছেন, তখন আজ আমাদের মধ্যে সে আশঙ্কা বাহুল্যবিশেষ। আল্লোপনিষৎ, চৈতন্যোপনিষৎ, খৃষ্টোপনিষৎ এবং রামকৃষ্ণোপনিষৎ প্রভৃতি নূতন নূতন উপ-নিষৎ দেখিয়া আসল উপনিষদেও সংশয় জন্মান স্বাভাবিক বটে। এজন্য যে সকল উপনিষদের শাখা আছে, তাহাদের

প্রামাণ্যে কোন সংশয় হওয়া উচিত হয় না। আচার্য্যগণও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

যদি বলা যায়—যিনি প্রথমে মানবকে ভাষা শিক্ষা দিবেন, তিনি কেন অল্পজ্ঞই হউন না? তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? অনাদি সৃষ্টিতে অনাদি অল্পজ্ঞ যে জীব, পৃথিবীতে প্রথমোৎপন্ন হইয়াছিল সেই ব্যক্তিই অপর মানবকে শিক্ষা দিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ প্রথম শিক্ষক স্বীকারের প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তর এই যে, তবে না শিখিয়াই ভাষার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে! কিন্তু না শিখিয়া ত বর্ণাত্মক ভাষার স্ফূর্ত্তি হয় না। ইহা ত পরীক্ষাসিদ্ধ বিষয়। আর—অল্পজ্ঞ ব্যক্তি অল্প বিষয় জানিল কিরূপে? ভাষা ত নিজে নিজে স্ফূর্ত্তি পায় না! যে জানাইয়াছে সেও অল্পজ্ঞ হইলে তাহাকে জানাইল কে? এইরূপে দেখা যায়—অজ্ঞকে যে ব্যক্তি অল্পজ্ঞ করেন সে ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞই বলিতে হইবে। অল্পজ্ঞ অনাদি হইলে সর্ব্বজ্ঞও অনাদি হইবেন, অল্পজ্ঞ থাকিলেই সর্ব্বজ্ঞ থাকিবেন, "জ্ঞ" না স্বীকার করিলে অল্পজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ হয় না। আর "জ্ঞ" ও সর্ব্বজ্ঞ একই কথা হইয়া পড়ে। সীমাবদ্ধ কিছু করিতে গেলেই অসীম স্বীকার স্বাভাবিক হয়।

আর যদি বলা হয়, ঈশ্বর স্বীকার করিব কেন? সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ স্বীকারও নিষ্প্রয়োজন হয়? তাহা হইলে তাহার এক কথায় উত্তর এই যে, জীব ও জগৎ আছে বলিয়া যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে তাহাদের সমষ্টিও আছে—স্বীকার করিতে হইবে। ব্যষ্টি থাকিলেই সমষ্টি থাকিবে। বহু থাকিলেই এক থাকিবে। বহুর মধ্যে এক আছে বলিয়া সমগ্র বহুতে একত্ববুদ্ধিও স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, অবয়ব হইতে অবয়বী যেমন অতিরিক্ত, তদ্রূপ ব্যষ্টির যাহা সমষ্টি, তাহা অতিরিক্তই হয়—তাহাতে ব্যষ্টি হইতে অতিরিক্ত কিছু ধর্ম্ম থাকেই থাকে। সমষ্টি ব্যষ্টিনিষ্ঠ হইলেও সমষ্টিতে ব্যষ্টি হইতে অতিরিক্ত ধর্ম্ম থাকে। এই কারণে জীবের অল্পজ্ঞান ও অল্পশক্তি যেমন আছে, জীবসমষ্টি ঈশ্বরে তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বশক্তি অবশ্যই থাকিবে। ঈশ্বর স্বীকারে নানা যুক্তি আছে, তাহা প্রদর্শন করা এ স্থলে লক্ষ্য নহে।

এই ঈশ্বর ব্রহ্মার রূপে আদি মানবরূপ ধারণ করিয়া বেদদান করিয়াছেন, এই কারণেই বেদ কাহারও রচিত নহে, বেদ পৌরুষেয় নহে; বেদ নিত্য, বেদ ঈশ্বরসমান নিত্য। আর সেই বেদমধ্যেই বেদের নিত্যতাপ্রভৃতি জ্ঞাপিত হওয়ায় বেদ স্বতঃপ্রমাণ, বেদ অন্যপ্রমাণনিরপেক্ষ সত্য। যাহা অন্যপ্রমাণদ্বারা, বেদ না জানিয়াও জানা যায়, তাহা বেদ উপদেশ করে না। তাহা হইলে আর বেদের প্রামাণ্য থাকে না। বেদ তাহা হইলে অনুবাদ হইয়া যায়। যাহা বেদ উপদেশ করে, তাহা একমাত্র বেদ দ্বারাই জ্ঞেয়। অন্য প্রমাণ তাহার সহায়তা পর্য্যন্ত করিতে পারে। যেমন দেবতার কথা, বেদ হইতে জানিয়া সাধনবলে যখন তাঁহাদের দর্শনলাভ হয়, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সহায়তার জন্য আবশ্যক হয়—এইমাত্র। অসঙ্গ ব্রহ্ম বৈদিক-মাত্র জ্ঞেয়। স্বাধীনভাবে অনুমানাদি তাহা জানাইতে পারে না।

আর এই বেদ আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের মূল বলিয়া আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারাই প্রকৃত নিঃশ্রেয়সলাভ অবশ্যম্ভাবী। অল্পজ্ঞ মানবকল্পিত পথে প্রকৃত নিঃশ্রেয়স লাভ কখনই সম্ভবপর নহে। যাঁহারা সাধনবলে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মান্তর নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাঁহাদেরও মূল পরম্পরাসম্বন্ধে এই বেদ বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপথেও কতকটা শান্তিপ্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের যথার্থ নিঃশ্রেয়সলাভে ইচ্ছা, তাঁহাদের এই বেদ ভিন্ন গতি নাই।

ইহার কারণ, প্রকৃত নিঃশ্রেয়সমধ্যে কখন তারতম্য থাকিতে পারে না, উহা নির্ব্বিশেষ হইতে বাধ্য। উহা অদ্বৈততত্ত্বই হইয়া থাকে। দ্বৈততত্ত্ব তারতম্যরহিত হইতে পারে না, নিঃশ্রেয়স হইতে পারে না। কারণ, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তাহাই নিঃশ্রেয়স, সুতরাং যাহার স্থায়িত্ব, যাহার প্রকাশত্ব, এবং যাহার প্রিয়ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাই ত নিঃশ্রেয়স হইতেছে। আর সেই হেতু যাহা অদ্বৈত ও সৎ চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ, তাহাই নিঃশ্রেয়স। অন্য কিছু অল্পসৎ অল্পচিৎ ও অল্পানন্দ হইলে আর নিত্য হইল না। অল্প সতের নামই ত অনিত্য বা মিথ্যা। সুতরাং যাহা নিঃশ্রেয়স তাহা অদ্বৈতই হয়—তাহা নিত্যই হয়।

এই নিঃশ্রেয়সস্বরূপ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈততত্ত্ব একমাত্র বেদমধ্যেই আছে, অন্য কুত্রাপি নাই। অন্যত্র স্বীকার করিবার ইচ্ছা যদি হয়, তবে তাহা বেদের পরবর্ত্তী ও বেদের পরে প্রকাশিত বলিয়া তাহা বেদেরই ছায়াবিশেষ এবং তাহা পরম্পরাসম্বন্ধে বেদ হইতেই লব্ধ বলিতে

হইবে। আর বেদ যে আদিভাষা তাহা বেদই বলে, এবং ইহা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনভাষা, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। আর একই অর্থ একই শব্দে যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়, অন্যশব্দদ্বারা যথার্থভাবে তাহা প্রকাশিত হয় না, এজন্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরপ্রোক্ত অরচিত নিত্য স্বতঃপ্রমাণ বেদদ্বারাই যথার্থ নিঃশ্রেয়স লাভ হইবার কথা। অন্য ভাষার দ্বারা বা অন্য ব্যক্তির দ্বারা, অথবা বেদোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের দ্বারা সেই যথার্থ নিঃশ্রেয়স কখনই লভ্য হইতে পারে না। যথার্থ নিঃশ্রেয়সজ্ঞাপক ভাষা একটীই হইবে, তাহা অরচিত ভাষাই হইবে, তাহা ঈশ্বরের ভাষাই হইবে, আর তাহা বেদই হইবে। যিনি সাধনবলে সম্পূর্ণ ঈশ্বরত্ব লাভ করিবেন, তিনি ঈশ্বর ভিন্ন নহেন বলিয়া তাঁহার ভাষা বেদেরই ভাষা হয়, ঈশ্বরেরই ভাষা হয়। সুতরাং বেদোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মদ্বারা যথার্থ নিঃশ্রেয়সলাভ অসম্ভব।

আর এই কারণেই বেদ মানিতে হয়, বেদ না মানিলে আর গতি নাই। অন্য কথায়, যদি অসঙ্গ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপতালাভে ইচ্ছা হয় ত বেদ মানিতে হইবে। যদি ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হয় ত বেদ মানিতে হইবে। যদি যাহা অপেক্ষা ভাল আর নাই —এতাদৃশ নিঃশ্রেয়স মুক্তি লাভ করিতে বাসনা হয় ত বেদ মানিতে হইবে। অধিক কি যদি অলৌকিক উপায়ে অভ্যুদয় কামনা হয়,তাহা হইলেও বেদ মানিতে হইবে। লৌকিক উপায় যে সর্ব্বক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয় না, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যুক্তি তর্কে ও বিজ্ঞানে যে অসঙ্গ ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগত হয় না তাহা কাহার অজ্ঞাত? বস্তুতঃ এইরূপ নানা কারণে বেদ ভিন্ন গতি নাই, বেদ মানিতেই হয়।

ক্ষেত্রমণির বাণী

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

(১)

ফর্সা বুঝি হয়ে এল—ভাঙ্গ্‌ল ঘুমের ঘোর ;
ঘুমে বিভোর সবাই ঘরে—ধীরে খুলি দোর।
সুখে ঘুমা ; তোদের কথাই ভাবি অহর্নিশ।
ঐ যে বাসায় পাখা ঝেড়ে দোয়েল্ দিল শিস্।

যাচ্ছে ডুবে পূবের তারা—উষার আভা ফোটে ;
আমার মাজা বাসন সম চক্‌চকিয়ে ওঠে
নীল আকাশে ভাসে সোণার রেখার পরে রেখা।
ধূলা ঝেড়ে এই উঠানে দাঁড়িয়ে দেখি একা।

ধোয়া হাতে দোয়া দুধ কড়ায় থাকুক ঢাকা ;
উঠ্‌ল বুঝি বাছা আমার—কাকে করে কা-কা।
কাজের মত কাজে আমার কত যে হয় হেলা ;
কাজ সারি গো বাছা আমার এক্‌লা কর খেলা।

কাজের মাঝে কত কাজ, কত খুঁটি-নাটি ;
বল্ দাও মা জগদম্বা—খাটি, খাটি, খাটি।

(২)

কাঁখে তুলে কল্‌সী আমি জল্‌দি ছুটি ঘাটে ;
গায়ের ধূলা ধুয়ে আসি—সূর্য্য গেলেন পাটে।
খোঁপায় গুঁজে চাঁপার ফুল চাই গো তাহার পানে ;
সাঁঝের প্রদীপ জ্বালি ঘরে, প্রাণের প্রদীপ প্রাণে।

ঘুমিয়ে পড়ে বাছা আমার কোলের কাছে শুয়ে,
চেপে আসে চাঁদের স্বপন চোখের পাতা ছুঁয়ে।
কাজের পরে সাঁঝের ঘরে আমার বুকের বাসে—
বাসায়-ফেরা সুখের পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে আসে।

খেটে খেটে মাটী ঘেঁটে সোনা বানাই দিনে ;
সেই সোনাতে ঘরের কোণায় সুখকে আনি কিনে।
সুখের দানায় বুকের কোণায় প্রেমের মালা গাঁথি ;
খেটে খেটে সুখে আছে সুখে কাটে রাতি।

শান্তিরসের আঠা দিয়ে বুকের বাঁধন আঁটি ;
নিত্য যেন নূতন বলে ভোরে উঠে খাটি।

দুষ্টগ্রহ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(৩)

আফিস হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় রমেন ডাক্তারের কাছে গিয়া সে দিনের বৃত্তান্ত শুনিল। ডাক্তার বলিলেন, খুব ভাল শুশ্রূষা এবং যথেষ্ট খাদ্য না পাইলে মেয়েটির মারা যাইবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। নেলী খাইতে পায় নাই বলিয়াই তার এ অসুখ হইয়াছে। কাজেই তার মার পক্ষে এ রোগের উপযুক্ত ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব।

বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়া রমেনের মনটা ভয়ানক অস্থির হইয়া উঠিল। তার মনের এ দুর্ব্বলতার জন্য সে মনে মনে লজ্জিত হইল; কিন্তু এই ছোট্ট মেয়েটির কথা সে মন হইতে কিছুতেই সরাইতে পারিল না।

অস্থির চিত্তে সে ডাক্তারখানা হইতে উঠিল। আজ আর কিছুতেই সে ময়দানের দিকে পা ফিরাইতে পারিল না। সে বাজারে গিয়া কিছু আঙুর ও বেদানা কিনিয়া লইয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত নেলীদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

ভেজান দরজা আস্তে ঠেলিয়া রমেন বলিল, "আস্তে পারি?"

নেলী ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর করিল, "আসুন।"

করুণা তখন বাড়ী ছিল না। সে নেলীর জন্য দুধ কিনিতে গিয়াছিল।

রমেন নেলীর খাটের এক পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ মা?"

নেলী বলিল, সে অনেকটা ভাল আছে। সে জানাইল, তার মা একটু বাহিরে গিয়াছেন, শীঘ্র আসিবেন।

রমেন তার কাগজের পোঁটলা হইতে বেদানা ও আঙুর বাহির করিয়া নেলীর সামনে রাখিল।

নেলী লোলুপ দৃষ্টিতে সেগুলির দিকে চাহিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে বলিল, "এগুলো এনেছেন কেন আপনি?"

এ প্রশ্নে রমেন ভয়ানক লজ্জা বোধ করিল। নেলীর সম্বন্ধে দুর্ব্বলতার সে আগাগোড়াই আপনাকে আপনার কাছে লজ্জিত বোধ করিতেছিল; তাই ছোট্ট মেয়ের এই কথাটাতেই সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "তোমার অসুখ দেখে গেলাম; তার পর দেখলাম—তোমার মা একলা মেয়ে মানুষ, এ সব আনবার সুবিধা হবে না হয় তো, তাই নিয়ে এলাম।"

নেলী বলিল, "এ সবের যে অনেক দাম—"

"না, এমন বেশী কিছু নয়, সবশুদ্ধ দেড় টাকা।"

"দেড় টা-কা! অত পয়সা তো মার কাছে নেই।"

এ কথাটায় রমেন একটু আহত হইল। সে বলিল, "তোমার মা দাম দেবেন ব'লে তো আমি আনি নি এ—এ আমি তোমাকে খেতে দিচ্ছি।"

"আপনি কেন দেবেন আমাকে, আপনি তো আমার কেউ নন। তা ছাড়া মা এসব দেখলে কি ভাববেন জানি না।"

বলিতে বলিতে দুধের বাটী হাতে করিয়া করুণা আসিয়া প্রবেশ করিল।

করুণা রমেনকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। তার মনে একটা আতঙ্কের ভাব মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিল। তার পর সে স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত বলিল, "আপনি আবার কষ্ট ক'রে আসতে গেলেন কেন? নেলী এখন বেশ ভাল আছে।"

রমেন এই আশ্চর্য্য সম্ভাষণে অবাক্ হইয়া গেল। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা গেল, রমেনের এখানে আসা করুণার অভিপ্রেত নয়। অথচ এই অন্যায় মনোভাবের প্রতিবাদ করাও অসম্ভব; কেন না, করুণা তার কথাটা এমন ভদ্রতার আবরণে প্রকাশ করিয়াছে যে তাতে অসন্তুষ্ট হওয়া চলে না। রমেন একটু বিব্রত হইয়া বলিল, "হাঁ, তা শুনলাম—ডাক্তার বল্লেন—তা' আপনার মেয়ের জন্য দুটো আঙুর বেদানা নিয়ে এসেছিলাম।"

করুণার দৃষ্টি আঙুর ও বেদানার উপর পড়িল—সে অপ্রসন্ন মুখে সেদিকে চাহিল। তারপর কতকটা আত্ম-সংবরণ করিয়া সে বলিল, "মিছামিছি এতগুলো খরচ করবার আপনার কোনও দরকার ছিল না। তা এনেছেন বেশ, দয়া ক'রে আর কিছু আপনি দেবেন না। তা' হ'লে আমি বড় কুণ্ঠিত হব।"

এমন স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে এ কথাগুলি বলা হইল যে, এ সম্বন্ধে আর কোনও বিচার বা বিতর্কের অবসর রহিল না। রমেন এ কথার উত্তরে কি বলিতে পারে তাহাও খুঁজিয়া পাইল না।

করুণাও কথা কয়টা বলিয়া অন্তরে একটু ব্যথা অনুভব করিল। রমেনের মুখে যে ঘা-খাওয়া ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাতে করুণাকে পীড়িত করিল। সে কিছু না বলিয়া ষ্টোভটা জ্বালিতে গেল।

অনেকক্ষণ পর রমেন বলিল, "দেখুন, ডাক্তারবাবু বলছিলেন যে এখন প্রধান জিনিষ হ'চ্ছে একে ভাল পুষ্টিকর খাবার দেওয়া। তা' একে বোধ হয় বাজার থেকে দুধ কিনে খাওয়ানটা ঠিক নয়। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমার বাড়ীতে যে ডেয়ারী থেকে দুধ আসে, তাদের ব'লে দিতে পারি। তাদের দুধ খুব ভাল—রোজ তারা বাড়ীতে দিয়ে যাবে।"

করুণা একটু ভাবিয়া বলিল, "তা'—তারা দাম নেয় কত ক'রে?"

"দামও তাদের বেশী নয়, টাকায় তিন সের—দুধ চমৎকার, আর pasteurised কি না, নষ্ট হয় না।"

করুণা মনে মনে খানিকটা হিসাব করিয়া শেষে বলিল, "তা' বেশ তো, তাদের ঠিকানাটা দিয়ে যান আমাকে। আমি চিঠি লিখে দিলেই তো দেবে তারা।"

"তার দরকার কি, আমি তা'দের ব'লে দিলেই হবে। কাল সকাল থেকে তা' হ'লে সেই দুধই আসবে।"

"না না—আপনি কেন মিথ্যে কষ্ট ক'রতে যাবেন"—

হাসিয়া রমেন বলিল, "এ কষ্টটুকু আমার ক'রতে দিতে হ'বে মিসেস দাস! এতে তো আর পয়সা খরচ নেই।"

কথাটায় করুণা একটু খোঁচা খাইল। সে কিছু বলিল না। রমেন খুসী হইয়া গেল।

তারপর করুণা কিছুক্ষণ নড়া-চড়া করিয়া নেলীর খাবার তৈয়ার করিল। রমেন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

করুণা বড় অস্বস্তি বোধ করিল; কিন্তু উপকারী রমেনকে এতগুলো খোঁচা দিয়া আবার কেমন করিয়া তাকে বিদায় করিবে সে ভাবিয়া পাইল না। রমেনের উঠিবার বিশেষ গরজ দেখা গেল না। সে বসিয়া বসিয়া এই ঘরখানি, এই মা ও মেয়ে, ইহাদের কথাবার্ত্তা কার্য্য-কলাপ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। যতই সে দেখিল, ততই তার মন ইহাদের প্রতি করুণায় আকুল হইয়া উঠিল। এমন কি করুণার যে যে কথায় সে এতক্ষণ আহত বোধ করিতে-ছিল, সেইগুলিই তার চক্ষে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এত গরীব এরা, তবু পরের কাছে কোনও অনুগ্রহ লইতে ইহাদের এত লজ্জা!

শেষে করুণা বলিল, "আপনার বোধ হয় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে—আপনাকে আর বসিয়ে রাখবো না। নমস্কার।"

রমেন উঠিল, বলিল, "নমস্কার," বলিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। তার পর সে দুয়ারের সম্মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "দেখুন, দয়া ক'রে আমাকে ঠেলে এতটা তফাৎ ক'রে রাখবেন না। যে পর্য্যন্ত নেলী সম্পূর্ণ ভাল না হয়, সে পর্য্যন্ত আমার মাঝে মাঝে আসতে হ'বে।"

বলিয়াই সে উত্তরের অবসর না দিয়া চোঁ চোঁ করিয়া ছুটিল।

কথা কয়টা শুনিয়া করুণাও চট্‌ করিয়া জবাব দিতে পারিল না। রমেন যে ব্যথা পাইয়া গেল, এ কথা সে বুঝিতে পারিল। সেজন্য তার বড় কষ্ট হইল—কিন্তু এমনি আঘাত না করিয়া যে তার উপায় নাই!

রমেন চলিয়া গেলে করুণা ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। নীরবে কিছুক্ষণ অশ্রুত্যাগ করিয়া সে মনটাকে অনেকটা হাল্কা করিয়া ফিরিল।

রমেনের সেদিন ফিরিতে বেশী রাত্রি হয় নাই। কিন্তু করুণার সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয়ে তার মনটা ব্যথায় অত্যন্ত ভরিয়া ছিল; তাই সে বাড়ী ফিরিয়া গম্ভীর ও অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল।

কৃষ্ণভামিনী আসিয়া বলিল, "খাবার দেবে কি?"

রমেন শুনিতে পাইল না। কৃষ্ণভামিনীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তার পর সে আবার প্রশ্ন করিল।

রমেন যেন ঘুম হইতে উঠিয়া এইমাত্র তার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিল এমনি ভাবে বলিল, "দেখ"—বলিয়া চুপ করিল।

কৃষ্ণভামিনী কঠোরভাবে বলিল, "কি?"

অন্যমনস্ক ভাবে রমেন বলিল, "আচ্ছা আমাদের দুধ এখন রাখা হয় কত ক'রে রোজ?"

"চার সের—কেন?"

"আমি ভাবছিলাম এক সের কমিয়ে দিলে হয়।"

"কেন?"

একটু ভাবিয়া রমেন বলিল, "আমার আর দুধ খাওয়াটা ভাল নয়। ডাক্তার বলছিল আমার fat একটু অতিরিক্ত হ'য়ে যাচ্ছে।"

"তার মুণ্ডু হ'চ্ছে! বেটারা চোখগুলো কি খেয়ে ব'সে আছে নাকি?"

"না সত্যি, আমি ওজন নিয়ে দেখেছি—ওজন বড় বেশী হ'য়ে গেছে।"

"কি যে সব অলক্ষুণে কথা বল তার ঠিক নেই—ও-সব ব'লতে নেই।"

"যাক গে থাক, আমি কিন্তু আর দুধ খাব না ব'লে দিচ্ছি, এক সের দুধ কমিয়ে দিও—হাঁ আর শোন, কাল যখন দুধ দিতে আসবে তখন সে লোকটাকে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে বলো।"

"কেন বল দিকিন?"

"দরকার আছে—এই—তাদের সাহেবকে একটা চিঠি দিতে হ'বে।"

"কিসের জন্যে?"

রমেন মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পত্নীর জেরায় সে হিমসিম খাইয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার দরকার আছে। অত জেরা ক'রতে হয় তো ওকালতি কর গে যাও।"

কৃষ্ণভামিনী মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল, আর কোনও কথা হইল না।

(৪)

নেলীর অসুখটা ক্রমশঃ বেশীর দিকেই গেল। ক্রমে বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা বশতঃ এ বিকার হইয়াছে। চিন্তার বিষয় বটে—বিশেষ যত্নের সঙ্গে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার দরকার, কিন্তু ভড়কাইবার কোনও কারণ নাই। তিনি ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ঘরের বাহিরে বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া করুণার সঙ্গে ডাক্তারের কথা হইতেছিল। ডাক্তারের কথা শুনিয়া করুণার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেল।

সে বলিল, "ডাক্তার বাবু, এতে ভাল হ'বে তো?"

"কোনও ভয় নেই মা। ভাল হ'বে—এতে না হয়, পরে রক্ত দেওয়া যাবে। চিন্তা ক'রবেন না।"

"এখন রক্ত দেওয়া যায় না?"

"যায়—কিন্তু দেখা যাক না দুদিন।"

ডাক্তার যাইবার জন্য পা বাড়াইলেন। করুণা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আজকে আপনার ভিজিটটা দিতে পারছি না।" বলিতে সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল।

ডাক্তার বলিলেন, "সেজন্য কোনও চিন্তা নেই। ভিজিটের টাকা ওষুধের দাম পরে দেবেন যখন টাকা হাতে থাকে। এখন আপনার অনেক খরচ ক'রতে হ'বে। নমস্কার।" বলিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

করুণা অনেকক্ষণ সেখানে নীরবে দাঁড়াইয়া কাঁদিল। তার পর চক্ষু মুছিয়া ঘরে ঢুকিল।

এক ঘণ্টা পর রমেন আসিয়া প্রবেশ করিল। তিন দিন রমেন আসে নাই। সে পরের দিন গোয়ালাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং একখানা চিঠি দিয়াছিল যে, সাহেবকে চিঠি লিখিয়া সে করুণার নামে হিসাব খোলাইয়াছে—দুধের দামটা এখন দিতে হইবে না। বাস্তবিক রমেন নিজের বাড়ীর একসের দুধ কমাইয়া তার নিজের হিসাবেই এখানে দুধ জোগাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল।

আজ ডাক্তারের কাছে খবর শুনিয়া সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দ্বারে দেখিয়াই করুণা হঠাৎ শক্ত হইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া তার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "নেলীর অসুখ বড় বেশী হ'য়েছে।"

রমেন লক্ষ্য করিল যে করুণা তাকে ঘরে আসিয়া বসিতে তো আমন্ত্রণ করিলই না; বরং তার সামনে আসিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইল যে, তার ঘরের ভিতর প্রবেশই বন্ধ।

রমেন বলিল, "হাঁ তা শুনলাম ডাক্তারের কাছে, তাই একবার দেখতে এলাম।" বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

যখন রমেন অগ্রসর হইল, তখন আর নিতান্ত রূঢ়তা ছাড়া তাকে ফিরান যায় না দেখিয়া অগত্যা করুণা পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। রমেন নেলীর বিছানার পাশে গিয়া বসিতেই করুণা বাহির হইয়া সদর দরজার কাছে দাঁড়াইল।

চৌকাট ধরিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া করুণা ভাবিতে লাগিল, আর তার দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ এমনি দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে চক্ষু মুছিয়া গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকিল।

রমেন বসিয়া নেলীর শুশ্রূষা করিতেছিল, আর নেলী অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। তার অর্দ্ধেক কথা সঙ্গত, অর্দ্ধেক অসঙ্গত। তাকে রমেন নানারকম করিয়া বুঝাইয়া সুস্থির করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

করুণা দরজা খুলিয়া দেখিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

তার মনে হইল কি হতভাগিনী নেলী। আজ তার বাপ তো অমনি করিয়া তার পাশে বসিয়া সেবা করিতে পারিত; কিন্তু সে অদৃষ্ট অভাগিনীর নাই। তাই সে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল। সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে করুণার ব্যথা-নিবিড় দীর্ঘ-জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনার রাশি যেন নরকের অগ্নি উদ্গার করিয়া দিল।

করুণা মেয়ের কাছে গেল না। নিঃশব্দে একটা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া দূর হইতে রমেনের শুশ্রূষা দেখিতে লাগিল।

সেই বাড়ীর একটা পাঞ্জাবী ছেলে দুয়ার ঠেলিয়া ডাকিল, "মেম সাহেব।"

করুণা উত্তর দিলে সে জানাইল, একটা লোক একটা চিঠি লইয়া আসিয়াছে।

সে লোকটাও দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তার হাত হইতে চিঠি লইয় করুণা পড়িল। পড়িয়া সে বসিয়া পড়িল।

যে চিঠি আনিয়াছিল সে বলিল, "ইস্‌কো জবাব দে দিজিয়ে।

করুণা মৃতদেহের মত তার দেহটাকে কোনও মতে টানিয়া তুলিয়া কাগজ কলম লইয়া একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখিয়া দিল।

আর সে আপনাকে টানিয়া তুলিতে পারিল না। দেয়ালে শরীরটা এলাইয়া দিয়া সে সেই চিঠিখানা হাতে করিয়া একটা মোড়ায় বসিয়া পড়িল। তার মুখ তখন একদম সাদা ইয়া গিয়াছে; কেবল প্রবল শক্তিতে সে তার সংবিৎ রক্ষা করিয়াছে, রমেনের কাছে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার কুণ্ঠায়। রমেন না থাকিলে সে হয় তো মূর্চ্ছিত হইয়াই পড়িত।

রমেন তার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল। অনেকক্ষণ সে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিল; কেন না, তার বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, করুণা তার দুঃখ-কষ্টের কথা তার কাছে প্রকাশ হওয়া ইচ্ছা করে না। কিন্তু অদূরে ঐ ব্যথাতুর নারীর অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া দেখিয়া সে সহ্য করিতে পারিল না। নেলীর শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিয়া সে করুণার কাছে অগ্রসর হইয়া বলিল, "কি হ'য়েছে মিসেস দাস, আমি জানতে পারি কি?"

করুণা বলিল, "বিশেষ কিছুই নয়, মাথাটা সামান্য একটু ঘুরছে, এক্ষুনি ভাল হ'য়ে যাবে।—আপনি তাহ'লে যাচ্ছেন এখন?"

অনন্ত দৃঢ়তার সহিত রমেন বলিল, "না—আমি যাচ্ছি

না। আপনাকে এ অবস্থায় রেখে আমি যেতে পারি না। আপনার কি কষ্ট হ'চ্ছে আমাকে বলতে হবে।"

এ কথায় করুণা সম্পূর্ণ সামলাইয়া উঠিল। সেও উত্তেজিত ভাবে উত্তর করিল, "আপনি আমার উপকার ক'রেছেন ব'লেই আপনার অমন ভাবে আমাকে কথা বলবার অধিকার নেই।"

মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত রমেন দমিয়া গেল। সে নরম সুরে বলিল, "আমাকে মাপ ক'রবেন মিসেস দাস—আমার অপরাধ হ'য়েছে।" বলিয়া বিষণ্ণভাবে রমেন দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

দুয়ার খুলিয়া যখন রমেন বাহিরে পা বাড়াইল, তখন করুণা তাকে ডাকিয়া বলিল, "দাঁড়ান রমেন বাবু, যাবেন না।" তার পর তার কাছে আসিয়া সে বলিল, "আমার ভয়ানক অন্যায় হ'য়েছে, আমার উপর রাগ ক'রবেন না—আমার মাথার ঠিক নেই।"

রমেন বলিল, "না মিসেস দাস, আপনার উপর রাগ করি নি আমি। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না; আমাকে আপনি কোনও মতে আপনার একটুও কাজে লাগতে দেবেন না।"

করুণার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কেমন ক'রে দেব রমেন বাবু? কত উপকার নেব আপনার কাছে? আপনার কাছে আমার দেনার যে অন্ত নেই। দয়া ক'রে আর অনুগ্রহ আমাকে ক'রবেন না।"

"আপনি যদি ইচ্ছা না করেন তবে আমি কিছুই ক'রতে পারি না। কিন্তু দয়া ক'রে যদি এই কথাটা আমায় বলেন যে, চিঠিতে কি খবর পেয়ে আপনি এতটা বিচলিত হ'য়েছেন, তবে হয় তো এক ফোঁটা অনুগ্রহ না ক'রেও আমি আপনার কাজে লাগতে পারি।"

করুণা তখন হাত বাড়াইয়া চিঠিখানা রমেনকে দিয়া বলিল, "নিন, দেখুন চিঠি।"

রমেন চিঠিখানা পড়িল। চিঠি লিখিয়াছেন তিনি যাঁর মেয়েকে করুণা পড়াইত। তিনি লিখিয়াছেন—

"আপনি পাঁচ দিন আসেন নাই, এবং না আসিবার কোনও কারণও জানান নাই। বাধ্য হইয়া আমি অন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছি, আপনার আসিবার আর প্রয়োজন নাই। আপনার পাওনা ১৫৲ টাকার চেক এই সঙ্গে পাঠাইলাম।"

চিঠির সঙ্গে গাঁথা ছিল একখানা চেক। চিঠিখানা পড়িয়া রমেনের গা জ্বলিয়া উঠিল। লেখকের উপর এত ভয়ানক রাগ হইল যে দুই মিনিট সে কথা বলিতে পারিল না।

আল্‌পিন খুলিয়া চেকখানা বাহির করিয়া রমেন বলিল, "এই নিন চেকখানার পিঠে আপনি সই ক'রে দিন, আমি টাকাটা আপনাকে এক্ষুনি দিয়ে যাচ্ছি—চেক আমি ভাঙ্গিয়ে নেব।"

করুণা চেক সই করিতে গেল। রমেন তার ব্যাগ হইতে দুইখানা দশ টাকার নোট বাহির করিল। করুণা যখন চেক সহি করিয়া আনিল, তখন সে সেই দু'খানা নোট তার হাতে দিয়া বলিল, "পাঁচ টাকা ভাঙ্গান নেই—আপনি রাখুন এ এখন। এর পর যখন আমি আসি তখন নিয়ে যাব পাঁচ টাকা। আর দেখুন, এর জন্য আপনি বেশী বিচলিত হ'বেন না। আপনার এমন চাকরী ঢের জুটবে। এখন আপনি মেয়ের শুশ্রূষায় মন দিন। যে পর্য্যন্ত কাজ ক'রতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত আপনার খরচ চালাবার জন্য যা দরকার হয় আমার কাছে ধার নেবেন।"

করুণা নত মস্তকে ধীরে ধীরে সুধু বলিল, "ধার—ধার তো আমি কখনও করি না।"

অবাক্ হইয়া রমেন বলিল, "কেন?"

করুণা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ধার ক'রে শোধ দিতে পারবো কি না সেটা যখন একেবারেই অনিশ্চিত, তখন ধার করা এক রকম জুচ্চুরী।"

জোর করিয়া রমেন বলিল "না—তা নয়। আপনার ঐ সব উদ্ভট খেয়ালের সেবা ক'রতে গিয়ে আপনি মেয়েটার জীবন সঙ্কট ঘটাতে পারবেন না।"

বলিয়াই রমেন চলিয়া গেল। নোট দুইখানা হাতে লইয়া করুণা অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

রূপকথার রূপ

অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য এম-এ

আমাদের যুগটা হোল কাজের যুগ—বাজের স্থান এখানে বড়-একটা নেই। আমাদের মনোবৃত্তিগুলি এখন এই রকম বৈজ্ঞানিক ছাঁচে ঢালা হোয়ে গেছে যে, আমরা সমস্ত বিষয়েই খুব ভারি ও খুব দামী জিনিস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ কত্তে রাজি নই। সাহিত্য-চর্চ্চার মধ্যেও আজকাল এই ভাবটা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হোয়ে উঠ্চে। সমালোচনার ভিতর মাঝে মাঝে দেখা যাচ্চে যে, একটা স্বর্ণকার-বৃত্তি ভুয়ো বাস্তববাদের মুখোস প'রে নিক্তির ওজনে সাহিত্যকে যাচাই কোরে নিতে ব্যস্ত। এই রকম একটা হিসেবী বস্তুতন্ত্রের ভান সাহিত্য-চর্চ্চাকে একটু গুরুতর ব্যাপার কোরে তুলেচে; কেন না, সে চায় সাহিত্যের গুরুত্ব দেখতে—সে চায় সাহিত্যের মধ্যে অতিকায়কে উপলব্ধি করতে। ইয়োরোপে ও আমাদের দেশে এই যে Pseudo-Realismটা দেখতে পাওয়া যাচ্চে, এটার সঙ্গে, আমার মনে হয়, প্রকৃত বাস্তব-বাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। বোধ হয় এটা উপযোগিতাবাদের একটা শিষ্ট আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। তাই জন্যেই হয় ত দেখতে পাওয়া যাচ্চে যে, গত শতাব্দীর সুরু থেকে সমালোচনার মধ্যে যে একটা ভাব-প্রবণতা ছিল, সেটা আজকাল অনেকটা ঠাণ্ডা হোতে আরম্ভ হোয়েচে,ও সাহিত্য-বিচার তার আগের তারুণ্যটুকু ছাড়িয়ে এখন প্রৌঢ় গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ঈষৎ অবিশ্বাসের হাসি হেসে বেশ কেজো লোকের মত কলাচর্চ্চার মধ্যে 'থোড়ে'র সন্ধানে প্রবৃত্ত হোয়েচে। আমার মনে হয়, এ যুগটা যেন সমালোচনার দিক থেকে একটা re-action বা প্রতিক্রিয়ার যুগ। চর্চ্চার মধ্যে ভাবব্যঞ্জনা অথবা Romanticটা অনেকটা হ'টে গেছে বলে বোধ হোচ্চে। কাজেই এ-হেন কালে হঠাৎ একটা হেজি-পেজিকে সাহিত্য বলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করাটা একটা গোঁয়ারতুমি মাত্র। তাই খুব ভয়ে ভয়ে রূপকথাটাকে সাহিত্য বোলে ফেল্লুম।

এখুনি প্রশ্ন উঠ্বে "সাহিত্যের সংজ্ঞা কি?"—আর তার সঙ্গে বড় বড় কথা এসে প'ড়বে—মহান ভাব, মহতী চিন্তা, বিরাট অনুভূতি, প্রচুর আবেগ ইত্যাদির সংহত ও সুচারু প্রকাশ। এই সব বড় গণ্ডগোলের ব্যাপার; কেন না, এ সব যেমন সুশ্রাব্য, তেমনি অস্পষ্ট। আর তা ছাড়া এগুলির সত্বাই হোলো তুলনাসাপেক্ষ। এদের একটা absolute স্বয়ং-প্রকাশ নেই। আবার কোন্ আদর্শ-ভাবটি মানুষকে উন্নত করে, সে বিষয়েও দেশকালপাত্র-ভেদে হাজার মতভেদ থেকে যাবে। কাজেই সংজ্ঞা-নির্ণয়ের সময়ে যে সব কথায় যত কম মতভেদ আছে, সেইগুলিকে দিয়ে সাহিত্যকে দেখবার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত।

একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হোয়ে এসেচে—আর এ বিষয়ে সামান্য কিছু এদিক-ওদিক থাকলেও—অনেকেই এটা মেনে নিতে বড় একটা পীড়া অনুভব করেন না। কথাটা হোচ্চে এই যে, সব খাঁটী সাহিত্যের মধ্যেই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের একটা সঙ্গত অভিব্যক্তি আছে। মিল্টনের এ্যারিও-পেজিটিকা অথবা মিলের utilaterialismই হোক, আর শেলির Prometheus Unbound অথবা রবীন্দ্রনাথের 'পায়ে চলার পথ'ই হোক, প্রকৃত সাহিত্য হোলেই তার মধ্যে এ গুলি থাকবেই থাকবে। এখন এ গুলিকে একটু বিশদভাবে বোঝা যাক—আর এদের প্রকাশ সাহিত্যের মধ্যে বিশেষতঃ রূপকথা-সাহিত্যের মধ্যে, কেমন কোরে হোয়েচে, সেটা একটু বিচার করা যাক্।

এটা বেশ অনুভব করা যায় যে, ক্রিয়াশীল মন নানাভাবে আপনাকে প্রকাশ কোরে আপনার নানা রূপ দেখতে স্বতঃ প্রবৃত্ত। এইটেই হোল প্রতিভার আত্মপ্রকাশের প্রথম ও সহজ প্রেরণা। সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ হোচ্চে নিজেকে খণ্ডাকারে নিজের মধ্যে থেকে বাইরে এনে আপনার আপনার রূপ দেখবার একটা লীলা। সৃজনকারিণী প্রতিভা তাই অনন্ত লীলাময়ী—নিজের স্বরূপটাকে নানা ভাবে দেখে তাই তার আনন্দ। কখনও ন্যায় বিচারকে, কখনও অনুভূতিকে, আবার কখনও বা কামনাকে বাইরে এনে মন এদের স্বরূপটাকে নানা বেশে নানা শোভার মধ্যে দেখতে চায়। সেই জন্যেই অনেক রকমের ধারা গ্রহণ করে মনের বিভিন্ন বৃত্তি বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। এইগুলি

[হ]োলো literary form অথবা সাহিত্যের বাহ্যরূপ। [মহ]াকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, রচনা, সমালোচনা, উপন্যাস [ও] গল্প প্রত্যেকটাই সাহিত্যের একটা রূপ এবং প্রত্যেকেরই [এ]কটা সৌন্দর্য্য, বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এই রূপটা দেখতে হোলে [স]মস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখতে হবে, ও ভোগ কোর্‌তে হোলে সমস্ত [চে]তনা দিয়ে গ্রহণ কোর্‌তে হবে। কেন না সাহিত্যের রূপ [ক]খনও রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, ছাড়া দেখা যেতে পারে না। [আ]র ছাড়া সকলের চেয়ে বড় কথা হোচ্ছে যে, এই সাহিত্যের [রূ]প গ্রহণ পরিপূর্ণভাবে করতে হবে কল্পনা দিয়ে। ভিতরের [ও] বাইরের সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন সচেতন হোয়ে উঠ্‌লো, মনে [য]খন পুলক ধর্‌ল—দুটি চোখে যখন ঘোর ঘনিয়ে এল—[ত]খন কল্পনা ধীরে ধীরে তৃতীয় চক্ষুটি খুলে দিলে—আর [“]সাহিত্য তখন রসের তুলিতে আঁকা” একটা বিশিষ্ট রূপ ধ’রে [এ]কটি বিশেষ ঝঙ্কার নিয়ে, একটি বিশেষ সুবাস নিয়ে কেমন-[এ]ক-রকমের স্পর্শের মধ্যে আমাদের জিজ্ঞাসা কোল্লে—[“]আমায় চিন্তে পার?” মহাকাব্য আসে যোদ্ধার বেশে—বিশাল, দুর্জ্জয়, সুন্দর—সুমুখে জয়পতাকা, পিছনে ঝড়ের [গ]র্জ্জন—এক হাতে ধ্বংসের কৃপাণ—আর একহাতে শান্তির লিপি—চঞ্চল উত্তরীয় থেকে প্রাচীন যুগের দূরাগত সুবাস উড়্‌চে—বিপুল স্পর্শের মধ্যে আমাদের চেতনাকে নাড়া দিয়ে বলে—“আমি এসেছি আজ বিরাটের অভিযানে।”

নাটককে আবার দেখি নানা বেশে—মহামানবের হৃদি-রক্তে রাঙা তিলক তার ললাটে—জীবন পুঞ্জে পুঞ্জে তার দেহ-যষ্টিকে আবেষ্টন কোরেচে—কখনও হাসির হিল্লোলের মধ্যে প্রাণগ্রহণের গোপনচারিণী রাণীর কেবল্ আভাষটুকু দিয়ে চলেচে মাত্র—কখনও শুদ্ধ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ধ্বংসের মধ্যে যেন বিশ্বরূপ দর্শন কচ্চে—আবার কখনও বা মৃত্যু মাধুরীকে বরণ ক’চ্ছে যেন প্রাচীন প্রণয়গীতির সুরে—

“মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।”

গীতিকাব্য আসে কখনও চঞ্চলা কিশোরীর বেশে—লীলায়িত-তনু, চক্ষে ফাল্গুনী প্রভাতের সজীবতা—দেহে বাসন্তী উপবনের কুসুম-সম্ভার—চরণে চপল ছন্দের চারু মঞ্জীর—

পর্য্যাপ্ত পুষ্পাস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

আবার কখনও তাকে দেখি যেন বর্ষা রজনীর বীণা-বাদিনী বিরহিণী—ক্ষিতি-সৌরভে উতলা—শ্লথ-বসনা—মন্দ-মন্থর মন্দাক্রান্তা ছন্দভরা করুণ মল্লারের সুরবন্ধনে হিয়া-স্পন্দনটুকুকে ভাদর বর্ষণের সঙ্গে মিলিত কোরে গাইচে—

“ই ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর”

এই ভাবে কত শত রূপেই আমরা গীতি-কবিতাকে দেখতে পাই।

এখন আমরা রূপকথার রূপের বিষয় একটু বিশদ ভাবে আলোচনা কর্ব্ব।

আদিমকাল থেকেই মানুষের মধ্যে কথা আর উপকথা দুটোই একসঙ্গে চ’লে আসচে। বর্ব্বরদের মধ্যে কথার দরকার হোয়েচে বেশীর ভাগ কাজের জন্যে—সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্যে—ব্যবহারিক জীবনের ঘটনাগুলিকে একটি ধারাতে গেঁথে ফেলবার মানসে পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের জন্যে। কথার পালা শেষ হোলে আস্‌ত উপকথার পালা। গুহাতে আগুন জ্বল্‌চে—বাইরে অন্ধকার, বৃষ্টি, ঠাণ্ডা—পোড়া জানোয়ারের মাংস সবাই মিলে প্রায় শেষ কোরে এনেচে—আর আমাদের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ বলচে সেই কাঁটায় ভরা নীলবনের কথা—যে ভাল্লুকটা তাড়া কোরে এসেছিল তাকে কেমন কোরে পাথরের অস্ত্রের ঘায়ে মেরে ফেল্লে, তার কথা—সেই মেটো রংএর শান্ত-ভীষণ পাহাড়ে চিতিটার কথা। কিছু সত্যি—কিছু মিথ্যে—আদিম অহংকারের ফোড়ন দেওয়া একটা খিচুড়ী তৈরী হোলো—আর আমাদের তখনকার ঠাকুমাটী তার নগ্ন কাচ্চাবাচ্চাগুলিকে নিয়ে হাঁ কোরে তাকিয়ে শুনতে লাগলো। সে কি বিস্ময়—কি পুলক—কি চঞ্চলতা! এই হোলো তাদের প্রথম উপকথা; কাজের কথা ছাড়া আর কিছু—অকাজের কথা। এই কথা কথারই জন্যে—এতে শুধু আনন্দ আর বিস্ময়—আর শিহরণ। অর্থাৎ কথা এখানে কাজের বাইরে উথলে বেরিয়ে প্রয়োজনের কলস পরিপূর্ণ কোরে উপ্‌চে প’ড়ে নিজের বেগে নিজেকে সৃষ্টি কোরে চল্‌চে—আত্মচিন্তা কোর্‌ছে—আবার নিজেকে সুন্দর কোর্‌ছে। এইখানে কথা প্রাথমিক অবস্থার Artএর আকারে দেখা দিয়েচে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই কথা ক্রমশঃ ঘটনাবহুল হোয়ে উঠেচে ও জীবন শক্তিপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কল্পনার কারিগরীর ভিতর দিয়ে ধারাবাহিনী কাহিনীর রূপ নিয়েচে। মস্তিষ্কের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা আরও সচল ও বেগবতী হোয়ে উঠেচে ও

নূতন নূতন সত্যের অনুভূতির ভিতর দিয়ে কোনও একটা আইডিয়াকে রূপকের মুখস পরিয়ে মূর্ত্ত করে তোলবার চেষ্টা কোরেচে। এইখানে আবার কাহিনী অহেতুক আনন্দের গণ্ডীর ভেতর থেকে কতকটা বেরিয়ে এসে নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কাজে লেগে পড়েচে। ঈজিপ্সিয়ানদের ভৌতিক উপকথার মধ্যে—তাদের যে পারলৌকিক সত্য সম্বন্ধে কতকগুলি কাঁচা বিশ্বাস ছিল,—সে গুলির ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা হ'লেও তার মধ্যে নিছক উপন্যাসত্ব ও আজগুবী নিয়ে গল্প ব'লার তৃপ্তি যথেষ্ট ছিল। ফিনিশিয়ান্‌দের সমুদ্রের সব অসম্ভব গল্পের মধ্যে অদ্ভুত জগৎ ও ব্যবহারিক জগতের বিশেষ মেশামিশি ছিল। গ্রীকদের কথা পরে ব'লব। তবে হিব্রুদের কাহিনী-কল্পনার মধ্যে রূপকের প্রাচুর্য্য এত বেশী ছিল যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক সত্যকে Parableএর আকারে Old Testamentএর মধ্যে, সুন্দর গল্পের ভিতর দিয়ে হিব্রু মনীষীরা ব্যক্ত করেছেন। এবং এরই জের যিশুখ্রীষ্টের ভিতর দিয়ে New Testamentএও চ'লে এসেচে। হিব্রুদের জাতীয় প্রতিভার মধ্যে এরূপ একটা শক্তি, আবেগ ও সৃজন-চঞ্চলতা ছিল যে, তাদের একাগ্র ধর্ম্মবুদ্ধি প্রতিদিনের অনুভূত সত্যগুলিকে অনায়াসে গেঁথে ফেলে সমষ্টিবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে ফেলত; এবং তাদের সচল কল্পনা সজীব ধার্ম্মিকতার মধ্যে এই সাধারণ সত্যগুলিকে অবলম্বন ক'রে ধর্ম্মজীবনের অনুকূল রূপক-দেহী রূপকথা তৈরী করত।

কিন্তু এর অনেক আগে থেকেই গ্রীকরা তাদের উপকথার মধ্যে ধর্ম্মের, কাব্যের ও আর্টের একটী সুচারু সখ্য স্থাপন করেচে। গ্রীকদের প্রতিভার মধ্যে একটা অতি মনোরম জিনিস এই যে, তারা বড় বড় আইডিয়াকে নিয়ে যথেষ্ট খেলা করত বটে, কিন্তু আইডিয়ার বেলুনে চড়ে ওড়বার সময় তাদের ছোট্ট রাঙ্গা মাটীর গোলোকটীকে একেবারে দৃষ্টির বাইরে যেতে দিত না। জগৎটাকে "গম" ধাতুর অন্তর্গত গমনশীল ঝোড়ো হাওয়ার স্রোতে বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে শূন্য অনন্ত আকাশে হু হু করে বেড়ান গ্রীকদের কোষ্ঠীতে একেবারেই লেখেনি। তাই তাদের কল্পনা ঐহিক জগতের সব দিক থেকে মাধুরীটুকু নিঙড়ে নিয়ে আধ্যাত্মিক জগৎকে সুন্দর কোরে তুলেচে। সুন্দরের নেশায় মাতোয়ারা গ্রীক-প্রতিভা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে উর্দ্ধপাতিত ক'রে রূপকের মায়াপুরী তৈরী ক'রেছে; আর তার মধ্যে Zeus, Apollo, Mercury, Hera, Athene, Aphrodite প্রেমে প্রাণে চঞ্চলতায়, বর্ণে গন্ধে গানে—ভরপূর হোয়ে এই বর্ণবহুল Pagan আবহাওয়ার রূপের রংমহাল তৈরী ক'রেচে। Greeceএর পৌরাণিক গল্পের মধ্যে আর একটি জিনিস দেখা যায়। প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু সুন্দর তাই তারা রূপকের পুষ্পপাত্রে ঢেলে তাদের তৈরী করা সাধের দেব-দেবীগুলিকে অঞ্জলি দিয়েচে। সেইজন্যে গ্রীসে এত প্রকৃতি-রূপক—nature mythএর ছড়াছড়ি। এই অভিমুখে চল্‌তে চল্‌তে কল্পনা বিশ্বপ্রকৃতির ছোটখাট জিনিসগুলিকে ভোজবাজির আলোয় বেষ্টন কোরে তাদের সচল রূপ ফুটিয়ে তুলেচে—আর আদিম বন ও প্রাচীন নদী-পাহাড়গুলো হাজার হাজার কিন্নরী, বনদেবী আর জলদেবীতে প্রাণময় হোয়ে চিক্‌চিকিয়ে উঠেচে। কখনও শীর্ণা নদীটির নিরালা তটে Pau বোসে তার বেণুটী বাজাচ্চে—আর মনে হোচ্চে, যেন প্রাচীন দেওদার গাছের পাঁজরের ভিতরের আদিম বিরহের সুর ঝরে ঝরে পড়চে—যেন মঞ্জরিত সান্দ্র লতারা অভিসার-চঞ্চলা হোয়ে পাতার নূপুর ঝুম্ ঝুম্ কোরে বাজাচ্ছে—যেন পাহাড়ের বুকের ঝরণাগুলি অভিমান অবসানে আদর গুঞ্জন কোচ্ছে—Aegean সাগরের ওপার থেকে বর্ষার ঝর ঝর ক্রন্দন শোনা যায় না—এমনি আরো কত কি। কখনও আবার Ennaর আফিং ফুলের লালিমার মাঝে Prosperpine বসে আছে—মাথায় রাঙা পাপড়ির হেলাফেলা—হাতে poppy পাতার কাঁকন—দেহে আকাশ-রংএর ওড়না—চোখে পূর্ব্বরাগের বুঝি একটু আবেশ—আর পিছন থেকে তার অন্ধকারের রাজা আস্‌ছে—তার কালো বুকের মাঝে কালো মেঘের একটু খণ্ডপ্রলয় নিয়ে!!! তারপর কান্না আর মিলন। আবার—Echoর অতনু বেদনা Parnessus চূড়ো থেকে শিউরে শিউরে হাওয়ায় নেচে আস্‌চে—যেন একটা বুকফাটা আসমানি কান্না আকাশকে সুর-বিদ্ধ-চঞ্চল কোরে আধ-ফোটা বেদন-গুঞ্জনে বল্‌ছে—"আমার অন্তর যেমতি করিছে

তেমতি হউক সে—"

—আর নার্সিসাসের সুন্দর চোখদুটা করুণ হোতে করুণতর হোয়ে এলো—নদীর বুকে দুর্ল্লভ দুরাশার মত নিজের ছায়া

দেখে—আর ছায়ার বেদনে বেদনক্লিষ্ট হোয়ে তার গালের আভা শুকিয়ে গিয়ে সাদা ফুলের পাপড়ির মত হোয়ে গেল—রইল কেবল বুকের রাঙা কামনাটুকু—যেন নদীকূলের ব্যথায় নুয়ে পড়া নার্সিসাসের ফুলটি। গ্রীক পুরাণের গল্পের মধ্যে এ রকম লিরিক্ অনুভূতির প্রকাশ যে কত রকমে হোয়েচে তার আর অন্ত নেই।

গ্রীসে Æsopএর গল্পে ও ভারতে পঞ্চতন্ত্রে রূপকের মধ্য দিয়ে কতকগুলো অতি সাধারণ নীতিকথা জন্তুজানোয়ারদের মানুষভাবাপন্ন ক'রে তাদের সাহায্য নিয়ে ছেলেদের শেখবার উপযোগী কোরে প্রকাশ করা হোয়েচে। তবে পুরাণের বা কথাসরিৎসাগরের গল্পের ভিতর জানোয়ার, মানুষ, অতিমানুষ, দেবতা ও উপদেবতাদের অবলম্বন কোরে লৌকিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক কতকগুলো সত্যের মুখস্পরা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

রোমের legendএর মধ্যে বিশেষ কিছু মৌলিকত্ব নেই। গ্রীসের গল্পগুলিই বেশ বাড়িয়ে গুছিয়ে অথবা বাদসাদ দিয়ে নিজেদের কাল ও প্রয়োজন উপযোগী কোরে নিয়েচে। তবে প্রত্যক্ষবাদী রোমপ্রতিভা ব্যবহারিক অনুভূতির প্রাচুর্য্যের মধ্যে অত্যন্ত গদ্যময়। অনেক nature myth'ও তৈরী করেছে।

Scandanaviaর Valhalla যা খৃষ্টধর্ম্মের আগে পর্য্যন্ত Europeএর অনেক দেশে আধিপত্য বিস্তার কোরে এসেছে, তার চারদিকে অনেক সুন্দর সুন্দর রূপকথা পুঞ্জীভূত হোয়েচে এবং আঁধার-পাথারচারী দেবতা ও জীবগণের রহস্যের মধ্যে, মেঘের স্রোতে ওড়া আসমানি ঘোড়সোয়ারদের কৃষ্ণ ভীষণ ইঙ্গিতে, এবং জলদস্যু ভাল্লুক ও তিমির সমাবেশে নর্স্ পুরাণের গন্ধগুলির মধ্যে গোখরা সাপের চোখের মত একটি ভীষণ মনোহারিতা আছে।

Saracenদের প্রাগ্-ইস্‌লামিক্ Pantheon ও তার সংশ্লিষ্ট মানুষের রূপকথা ছেড়ে দিয়ে আরব্য রজনীর গল্পে এসে পড়্‌লে দেখা যায় যে, এখানে গল্প আজগুবির মধ্যেও পুরো উপন্যাসের আকারে ফুটে বেরিয়েচে। এর মধ্যে রূপকথার ভাগ যথেষ্ট আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু খাঁটি রূপকথার ছকে এদের ফেলা যায় না।

এখন আমরা নীতিধর্ম্মগন্ধহীন নিছক রূপকথা কোথায় তাই সেটি দেখ্‌বো। এই উপকথার একটি বহু প্রাচীন গুপ্ত আবাস আছে—সেটি কিন্তু সর্ব্বকাল ও সর্ব্বদেশব্যাপী—সেটি হোচ্চে ঠাকুরমার ঝুলি। আমরা এই প্রবন্ধে শুধু বাঙ্গালা দেশের রূপকথা নিয়েই আলোচনা কর্ব্ব।

মানুষের একটি সার্ব্বজনীন চিরন্তনী ঠাকুরমা আছেন, যাঁর প্রাণটি কোন এক প্রবীণ রসপরিপ্লুত স্নেহে এমন ভরপুর যে, নাতি-নাত্‌নীদের সম্পর্কে এসে তিনি একেবারে কলাবিদ্ হোয়ে ওঠেন। মধুর অপ্রয়োজনের অবসরটুকু তাই তাঁর ভ'রে ওঠে অদ্ভুতের মন্থন-কার্য্যে। তাঁর কল্পনা অভিজ্ঞতার টুক্‌রো কুড়িয়ে অপরূপকে রূপ দিয়ে অসম্ভবকে সুন্দর কোরে তোলে। অবাক্ কোরে দিয়ে নিছক আনন্দ দেওয়াতেই হোলো এই artistটির তৃপ্তি। অবশ্য তিনি যে একেবারে উদ্দেশ্যহীন তা নয়—গল্পের জাল বোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের চোখে ঘুমের জাল বোনারও কাজ তিনি কখনও কখনও করেন। তবে তাঁর art ঘুমপাড়ানর চেয়ে ঘুম তাড়ানর কাজটাই বেশী করে—সে কথা সকলেই মেনে নেবেন—অন্তত যাঁরা ছেলেবেলাকার কথা মনে রাখেন। ভূতকালের অন্তরের মাঝ থেকে অদ্ভুতকে আহরণ ক'রে তার চারিদিকে একটি অপরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি কোরে পুরাতনের মধ্যে নূতনের মোহন রূপ ফুটিয়ে তুলে শিশু-কল্পনাকে উগ্রবিস্ময়ে অভিভূত কর্‌তে ঠাকুরমায়ের কলা-চৈতন্যের মধ্যে একটি অব্যক্তিক আহ্বান আছে—এবং এইটিই প্রকৃত artistএর অহৈতুক আনন্দ। তবে অন্য artistদের মত এঁকে সাহিত্যের ভান বা pose কর্‌তে হয় না; কেন না, ইনি শিশুমতির সহজাত বিশ্বাসের সাম্‌নে অনায়াসে তাঁর কল্পনার তারাবাজি ওড়াতে পারেন। আর তাঁকে বিজ্ঞ ও পরিপক্ক শ্রোতার মনোরঞ্জন করবার জন্য, অবিশ্বাসের সাময়িক দমনকল্পে চীৎকার কোরে বক্তৃতা দিতে হয় না। তাই যখন ছেলেরা শীতের রাতে কম্বলের নীচে আঁধারের মাঝে রূপকথা শোনে, আর ঠাকুরমার মন-কল্পনার সৃজনাবেগে চঞ্চল হোয়ে ওঠে—তখন দেশকালহীন অনাদি অসম্ভবের সিন্ধুমণ্ডল থেকে ওঠে এক হাওয়ার জালে বোনা রূপকথার রূপরাজ্য—প্রাণে, ছন্দে, সুরে সচঞ্চল অতীতের অদেহী হাসিকান্নার আলপনায় লেখা—সুদূরের ধূপবাসে সুরভি—আদিম দুঃসাহসিকতার কলরবে মুখর।—আর তার সাথে সাথে কত কান্ত রাজদুলালের সঙ্কটসঙ্কুল প্রণয়াভিযান—কত সারারাত-জাগা বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমীর সঙ্কেত

কাকুতি—কত পক্ষীরাজ ঘোড়ার অভিনব দুধে-রংএর পাথার কারিগরী—কত অজগরের দুর্ল্লভ শিরোমণি—কত মায়াপুরীর সোনার খাটে ক্লান্ত রজনীগন্ধার মতো ঘুমন্ত রাজবালা—এমনি আরও কত কী—কল্পলোকের গোধূলি আলোর তুফানের মাঝে ভেসে ভেসে বেড়ায়। এই রূপকথার ধারাটি প্রাচীন জাতিগত সংসার সভ্যতা থেকে উৎসারিত হোয়ে দিদিমাদের ও মাদের প্রাণের মধ্য দিয়ে আবহমান কাল ব'য়ে চ'লেছে—ও মুখে মুখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে প'ড়ে সর্ব্বসাধারণের একটি আদরের ধন হোয়ে উঠেচে। লালবিহারী দের Tolk Talesএর আগে এই সব গল্প আর কখনও বাঙ্গলা দেশে ভাষায় লিখে প্রচারিত হোয়েচে বলে শোনা যায় না। তবে পুরানো ছাপা ব্রতকথাতে 'সুবচনী' 'বেহুলা' ইত্যাদির উপাখ্যান কিছু কিছু বেরিয়েছিল। কিন্তু এগুলি অন্য ধরণের কাহিনী। বাঙ্গলার ঠাকুরমার ঝুলির মধ্যে সাধারণতঃ দুরকম শ্রেণীর গল্প দেখা যায়:—(১) একরকম রাজপুত্র রাজকন্যা রাক্ষস রাক্ষসীর গল্প—(২) আর একরকম ছোট ছোট গ্রাম্য ঘটনা—লৌকিক, অলৌকিক মেশান—পথিক, ভূত, নাপিত, জন্তু ইত্যাদি নিয়ে। কিন্তু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের মধ্যেও romance জিনিসটা পুরোমাত্রায় আছে; এবং ঝরাপাতা যেমন গোধূলির আগুনের ছোয়া লেগে জ্বলে ওঠে, তেমনি সহজ গ্রাম্য কথিকাগুলি অভিনব কল্পনার মায়াস্পর্শে অপরূপের নবীনতায় অসাধারণ হোয়ে উঠেচে।

এই সব ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথার মধ্যে এমন সব মালমসলা আছে যা দিয়ে কলা-সাহিত্যের সনাতন রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়। কলা-সাহিত্যের প্রথম কাজ হোচ্চে রূপ নিয়ে—এবং (১) এই সকল কথায় যত রূপ আছে—এত রূপ বুঝি আর কিছুতেই নেই। সাত সমুদ্রের নীল ঢেউ আর তের নদীর রজত-রেখা—প্রবাল দ্বীপের রংএর লীলা—আর বিজন বনের কাজল ছায়া—তেপান্তরের মাঠে ঝড় উঠেচে কালো মেঘের চুড়ো মাথায় নিয়ে—আর সোণার বরণ রাজার ছেলে হীরের তাজ প'রে সাদা পক্ষীরাজের পিঠে—ছুটেচে যেন বিজলির রেখা—রাজকন্যার হাসিতে ঝরছে মাণিক আর কান্নাতে ঝরছে মুক্তো—মায়াপুরীর কক্ষে কক্ষে নীল পাথরের প্রদীপে লাল আলো জ্বলছে—কলাবিদ্‌কে সৃজন-চঞ্চল কর্ব্বার এর চেয়ে বেশী রূপ আর কোথায় পাওয়া যাবে? এ হেন রূপ-প্রাচুর্য্যকে এই বিপুল অপচয়ের মধ্যে থেকে উদ্ধার কোরে তা'কে একটি সহজ সঙ্গতি দিয়ে তার সুচারু ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ কোর্‌তে পাল্লে আর্টিষ্ট অতিকায় মনোহরকে একটি সুঠাম তনু দিতে পারেন।

(২) দ্বিতীয় কথা—রস। সাহিত্যে রসলীলার চরম স্ফূর্ত্তি তখনই হয়, যখন রস চিরন্তন সত্যকে অবলম্বন করে দাঁড়াতে পারে। রূপকথার সুয়োরাণীর সুখ আর দুয়োরাণীর দুঃখ বিশ্বময় ছড়ান আছে—আর দেশ কাল পাত্র ভেদে সকল মনুষ্যের মধ্যেই চিরযুগের সাহসিক রাজপুত্রটি ঘুমিয়ে আছে, যে একদিন অতনু-দুল্লভের আহ্বানে জেগে উঠে হিতবুদ্ধির বাধা লঙ্ঘন ক'রে দুর্জ্জয় দৈত্যের মায়াপাশ থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার কোরে আনবার জন্যে ময়ূরপঙ্খী কাঠের ডিঙ্গিতে কোরে নীল সাগরে পাড়ি দেবে। রাজপুত্রের [illegible] রাজ্য ছেড়ে যাবার জন্যেই জন্ম—এক রাজার রাজ্যে তার কোন দিনই লোভ নেই—সে চায় সাত রাজার ধন—এক মাণিক—সে চায় সোনার কৌটোর ভোমরা ভুমরি—[illegible] চায় দুর্জ্জয়-দুরাশার উৎকট আনন্দ। বর্ষা ঘন হোয়ে আসে —বাইরে আঁধার—সাগর উতল হোয়ে উঠলো বুঝি—আর ঝড়ের দোসর রাজার দুলাল কাশ-বনের মাঝ দিয়ে [illegible] বাজিয়ে চলে—

"কোথায় বিজন দৈত্যপুরী, কোথায় সে রাজবালা,
কণ্ঠে তাহার পরিয়ে দোবো আমার বরণ-মালা"

ইতিহাসে এই রাজপুত্র কখনও স্বরাজ সৃষ্টি করে, আবার কখনও বা গিলটীনে তার লীলা শেষ করে। ধর্ম্মসিদ্ধি সাধনায় সে কখনও সিদ্ধার্থ হোয়ে ওঠে, আবার কখনও crossএর উপর লট্‌কে প'ড়ে—কিন্তু জীবনে মরণে সে সেই রূপকথার রাজপুত্র।

বিশ্বের চিরন্তনী নারী—রূপকথার রাজবালা—সে রূপো কাটির ছোঁয়াতে ঘুমোয়—আবার সোনার কাটির ছোঁয়াতে জেগে ওঠে—বিস্ময় পুলকের মধ্যে যুগ যুগ ধরে' শুধু বলে—

"কে পরালে মালা"

সাহিত্যিক চিরমানবের এই সব সনাতন ভাব গ্রহণ ক'রে a-tএর পরিপূর্ণতার মধ্যে নব রূপকথা গড়ে তুলতে পারে। রূপকথার মধ্যে গন্ধ-বৈচিত্র্য আছে বটে, কিন্তু এই গন্ধ প্রচুর উগ্রতায় কলা-চৈতন্যকে অভিভূত করে না। অতীতের প্রেতলোকী অগুরু ক্ষীণ হোতে ক্ষীণতর হোয়ে আবার

আমাদের প্রাণে যখন ভিজে মাটির সুবাসভরা বনের মধ্যে, সাগর-বেলার লতাগুল্মের গন্ধে মদির বাতাসের ভিতর, অথবা প্রাচীন দেব-মন্দিরের নির্ম্মাল্যের সুবাসে আমরা কল্পনা-দেহ নিয়ে বিচরণ করি। এই সব গন্ধ-সম্ভারের সঙ্গে সাত ভাই চম্পার প্রাণের সৌরভ আর পারুল বোনের করুণ মাধুর্য্য মিশিয়ে নিয়ে Artist শিশুজগতের একটি নামগোত্রহীন সুবাস-বিন্দু সৃষ্টি কোরতে পারে—যার সঙ্গে হাজার আধুনিক ফুল পাতা এক হোয়ে artকে একটি গন্ধের গন্ধরাজ কোরে তুলতে পারে।

(৪) রূপকতার স্পর্শটি সোনার কাটি রূপোর কাটির ছোঁয়ার মতই অতনু। কখনও জাগায় বিপুল আবেগের মধ্যে—কখনও কাঁদায় সীমাহীন কারুণ্যের মধ্যে—আবার কখনও ঘুমপাড়ানী মাসিপিসির দেহহীন করস্পর্শে জ্ঞান-বৃদ্ধ মানুষটির বাহ্যচেতনা লুপ্ত কোরে দিয়ে তার অন্তরের সহজ শিশুটীকে ছুটিয়ে দেয়—দেয়াসা দিয়ে গড়া তন্দ্রার অপ্সর-লোকে। এই স্পর্শের মধ্যে কোনও অশান্ত শক্তি নেই—কোন ভূমিকম্পের ধাক্কা নেই—আছে কেবল একটি অতি সূক্ষ্ম প্রাণময় প্রীতিময় ঘর ছাড়বার স্নেহ-আহ্বান। Artএর মধ্যে শান্তসুন্দরকে নীরব মাধুরীমায় ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলবার উপকরণ এর চেয়ে বেশী আর কি হোতে পারে? তবে রূপকথার মধ্যে সকলের চেয়ে বস্তু হোলো তার রসময়ী প্রকৃতি। এই বিষয়ে রূপকথা গীতি-কবিতার সহচরী। ঠাকুরমার গল্প-কথার মধ্যেও একটি সুঠাম ভঙ্গী আছে—একটি নৃত্যচঞ্চল ছন্দ আছে—যার গতি এক শব্দ ঝঙ্কারের পৌনঃপৌনে—কল্পনার লিরিক্-আবেগ প্রকাশ করে। ছন্দ মানুষের প্রকৃতিগত! রক্তস্রোতে, বক্ষস্পন্দনে, অণুকোষের মধ্যে প্রাণপক্ষের চঞ্চলতায়—আদিম প্রাণজগতের একটি পুরাতন ছন্দ নিহিত আছে—যে ছন্দ সৃষ্টির আরম্ভ থেকে জড়জগতের বিপর্য্যয়ের মধ্যে শৃঙ্খলা এনেচে। এই ছন্দের বেগে মানুষের মন পরিপূর্ণ। সেই জন্যেই মন যখন ভাব-প্রাচুর্য্যে চঞ্চল হোয়ে ওঠে, অথবা যখন আনন্দ বা দুঃখের আতিশয্যে অশান্ত হোয়ে ওঠে, তখন আমাদের এই সহজাত ছন্দ চপল গতিতে শব্দ-ঝঙ্কারের মধ্যে প্রকাশিত হোয়ে পড়ে। গীতি-কবিতাতে এই ছন্দ অত্যন্ত personal অথবা ব্যক্তিগত চাঞ্চল্যে প্রকাশিত হয়—আর রূপকথার লিরিক উচ্ছ্বাসের এক প্রকাণ্ড ব্যাপকতার মধ্যে এইটি ধীরমন্থর গতিতে বাহ্য বস্তুর ভিতর বেজে ওঠে।

শিশু জীবন আমাদের চেয়ে অনেক বেশী শব্দঝঙ্কারময়; কেন না, তার মধ্যে শুধু গতি আর আবেগ। শিশুদের বেগবতী কল্পনার তাই শব্দে এত আনন্দ। সেই জন্যেই রূপকথার মধ্যে শব্দের দ্বিত্ব ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়ে একটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা সঙ্গীত-কাকলী শুনতে পাওয়া যায়। এই সঙ্গীত কখনও অনুপ্রাসের মধ্য দিয়ে, কখনও প্রতিহত গতির কলনাদের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও বা অপূর্ণমিলনের দোহাখণ্ডের সাহায্যে মুখর হোয়ে ওঠে।

"রাজার আগে লোক, পিছে লস্কর"—রাণীর "ওপরে 'কাঁটা নীচে কাঁটা"—'Fe faw fawn'—"বনের হরিণ বনে পালাল, আর গাছের পাখী গাছেই রইল"—"কত ধন কত ধান—কত মাণিক কত মুক্তো"—"হাউ মাউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ"—

"সাত ভাই চম্পা জাগরে
কেন বোন পারুল ডাকরে"—
"এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান"—

—এই রকম সব নানা রকম শ্রবণ-প্রীতিকর শব্দখণ্ডের মধ্যে একটি অকৃত্রিম সুর-বিন্যাস আছে। সেই জন্যে রূপকথার কাহিনী-ধারা উপল-ব্যথিত-গতি তটিনীর মত যখন প্রবাহিত হোতে থাকে, তখন তার তান-লয়ের একটি অশান্ত কল্লোল চঞ্চলমতি শিশুদের এক ক্রীড়াশীল কলরোলের মত আমাদের কানে বাজতে থাকে। Artist এই শব্দনিচয়কে সাহিত্যের উপযোগী কোরে গেঁথে ফেলতে পারলে একটি সুরসুন্দরী কাব্য-কথিকা সৃষ্টি কোরতে পারেন।

আমরা আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে রূপকথার এই কলা-রূপের একটি উদাহরণ দিয়ে আজকের মত এই প্রবন্ধ শেষকর্ব্ব।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'ঐন্দ্রজালিকের' প্রথম গল্পটি থেকে এক-টুকরো উঠিয়ে দিলাম—

"সেকালের ব্যাপার তখন গান ছিল কথা আর কথা ছিল গান।

"রাজকুমারীর দেহে যখন প্রথম ফাল্গুনের হাওয়া লাগল, তখন তার হৃদ্-সরোবরে এমন একটি কমল ফুটল, যার রং তুরাণ দেশের গোলাপের মত—আর সৌরভ নন্দন-

পারিজাতকেও হার মানায়। সেই সৌরভ রাজকুমারীর সারা দেহে সুরভি দিয়ে ঘিরে দিল। সেই সুরভির আভাসে রাজার বাগানের মৌমাছিরা যে গুঞ্জন তুল্লে তাতে ফুটল রাজকুমারীর প্রাণের গান—

মৌন কথায় বাসুক ভাল গোপনে
নেহারি যেন নেহারি তারে স্বপনে।

সেই গান রাজকুমারীর কণ্ঠে জুড়ে বস্‌ল।

রাজকুমারীর চোখের তারা বিদ্যুৎ-বুকে-করা আষাঢ়ের মেঘের মত হোয়ে উঠ্‌লো, গ্রীবায় মোহন ভঙ্গিমা জেগে উঠ্‌ল—গতি মন্থর হোয়ে উঠ্‌ল—আর সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীর কণ্ঠেও ঐ গুন্ গুন্ গুঞ্জনের গান বিরামহীন হোয়ে উঠ্‌ল—

মৌন কথায় বাসুক ভালো
গোপনে
নেহারি যেন নেহারি তারে
স্বপনে—

রাজা শুন্‌লেন, রাজমহিষী শুন্‌লেন, পুরমহিলারা শুন্‌ল—সবাই আশ্চর্য্য হোয়ে মনে মনে বল্‌লে—

হায় কি কথা হায় বাণী
জপিছে বালা অকারণ
রূপসীবালা ষোড়শীবালা
কহে এ কথা কি কারণ!

দেশ বিদেশে রটে গেল—বিরাট রাজকুমারী আর বিবাহযোগ্যা—ষোড়শী। কী তার রূপ—যেন তিলোত্তমা! পিঠ ছেয়ে কালো চুল, গণ্ড ছেয়ে ফুটন্ত গোলাপ—ঠোঁট ছেয়ে পাকা ডালিমের দানা—আর সারা দেহ ছেয়ে চুম্বকের আকর্ষণী-শক্তি। রাজা ভাবেন, রাজমহিষী ভাবেন, পুরনারীরা ভাবে—এমন কুমারীকে বিয়ে ক'র্ত্তে আস্‌বে, সে কোন্ রাজা, কোন্ মহীপতি—সে কোন্ সম্রাট্! আর রাজকুমারীর কণ্ঠে গান ওঠে—

মৌন কথায় বাসুক ভালো
গোপনে
নেহারি যেন নেহারি তারে
স্বপনে।—

রাজা শোনেন, রাজমহিষী শোনেন, পুরনারীরা শোনে—আর তারা মনে মনে ভাবে—

"হায় কি কথা হায় কি বাণী
জপিছে বালা অকারণ
রূপসী বালা ষোড়শী বালা
কহে এ কথা কি কারণ।"

—এইটুকু থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, লেখক প্রাচীন রূপকথার মাল-মসলা নিয়ে কলা-শিল্প-কৌশলের মধ্যে সাহিত্যরূপে রূপকথাকে প্রকাশ ক'রেছেন।

সবদেশের সাহিত্যেই রূপকথা কোন না কোন আকারে সাহিত্যের রূপে আত্মপ্রকাশ কোরেচে। ইংলণ্ডে Chevy chase ballads ও Jac and Jill গল্প থেকে Robin Hood, Arthur, Charlimagn প্রবাদের কাহিনী-চক্রের মধ্যে দিয়ে Malory ও Chaucer হাতে এসে ও Elizabethএর যুগে বেশীর ভাগ Spencerএর Faery Queen. ভিতর দিয়ে একেবারে Tennyson, Stevenson ও Morisএর মধ্যে পৌঁছে—তাদের পাঁচমিশুলি রূপকথা নানারূপ সাহিত্যের আকারে আত্মপ্রকাশ কোরেচে। আমাদের দেশে কঙ্কাবতী, ভারত উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কবিতা ও সুরেশবাবুর নবরূপকথা ও ঐন্দ্রজালিকের ভিতর রূপকথায় সাহিত্যিক রূপ দেখতে পাই।

কিন্তু এই নানা দেশের নানা রূপের মধ্যেও আমরা রূপকথার একটি মূর্ত্ত কান্তি দেখতে পাই। আমরা দেখি যেন বালকবেশী চিরদুলাল—একটি উপন্যাসের আদি-অন্তহীন সরল পথ বেয়ে—হাওয়ার বুকে মেঠোসুরের দীর্ঘ রেখাপাত কর্ত্তে কর্ত্তে—অজানার অভিমুখে এগিয়ে চলেচে—কানে ঝুমকো লতার কুণ্ডল—চরণে গঞ্জাফলের নূপুর—হাতে বাঁশের বেণু—আর চোখে নিরুদ্দেশ-যাত্রার অফুরন্ত দীপ্তি।—সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌চে মন্থর লীলায়—আর বুঝি দেখা যায় না—তবুও যেন কোন অরূপ আকাশ-প্রদীপের ক্ষীণ ইঙ্গিতে এগিয়ে চলেচে—কোন দুর্দ্দম অভিসার-লিপ্সায়—কোন মায়াপুরীর চির-বাসরাভিমুখে;—আর তার বেণুর আবেগ-কম্পিত মূর্চ্ছনাটি শুনে—আমাদের

"মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভাগিনী কঙ্কাবতীর ব্যথা,—
তার মাঝেতে মনে পড়ে ছেলে-বেলার গান,
বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর নদী এল বান।"

উত্তরায়ন

শ্রীঅনুরূপা দেবী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডাক্তার সেন লোকটী বয়সে যদিও খুব প্রাচীনত্বের দাবী করিতে এখন পর্যান্ত অধিকারী হইয়া উঠিতে পারেন নাই, তথাপি প্রবীণতার একটা বিশেষ অধিকার তাঁর রোগী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যেন তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। যে বয়সে অধিকাংশেই অজ্ঞ থাকে, তেমন বয়সেই তিনি বিজ্ঞ বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এটা তাঁর বড় কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এম্‌-বি পাশ হইয়া ডাক্তার সেন তাঁর কাকার সাহায্যে বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে লণ্ডনে কয়েক বৎসর থাকিয়া সেখানের ডিগ্রি বেশ সম্মানের সহিতই লাভ করিয়া বৎসর দুই সেখানে শিক্ষকতা করিয়া জার্ম্মাণীতে যান। হার্ট সম্বন্ধীয় বিখ্যাত অভিজ্ঞ জার্ম্মাণ চিকিৎসকের কাছে দুই বৎসর ঐ বিষয়ে অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় পূর্ব্বক ডাক্তার সেন বৎসর কতক হইল দেশে ফিরিয়াছেন। এখানে সহরতলীতে মুক্ত স্থানে একটী চিকিৎসালয় খুলিয়া তিনি তাঁর নূতন অভিজ্ঞতায় হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করিতেছিলেন। কয়েকটী বড়লোক রোগীকে আরোগ্য করায় নামটা হঠাৎ সভ্য-জগতে একটু বিশেষ ভাবেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সভ্য-জগতে বিশেষতঃ মেয়ে-মহলে এই রোগটী আমাদের দেশে অন্ততঃ আর সব রোগেরই মত বেশ ভাল করিয়া প্রসার হইতেছে। যাদের সামর্থ্য আছে, প্রতিবিধান-চেষ্টা কেন না করিবে? কষ্ট তো বড় কম নয়।

এর চিকিৎসার মধ্যে বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক কতকগুলি প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। রোগীর নিজের বাড়ীতে এ সমস্ত যথাযথ ভাবে ঠিক সুসম্পন্ন হয় না, এই জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত নার্সিং-হোমে থাকিয়া চিকিৎসিত হওয়াই সদুপায়। তবে সকলেই কিছু আর ধনী নয়, এবং ঘর-ছাড়া হইতেও সহজে সম্মত করাও যায় না; বিশেষতঃ খুব বেশি সাহেবীয়ানার মধ্যের লোক ছাড়া। তাই অনেক রোগীকে তাদের বাড়ীতে রাখিয়াই চিকিৎসা করিতে হয়। এবং ভালও যে তাদের কেহই হয় না, এমনও নয়। কিন্তু নার্সিং-হোমের রোগীরাই ডাক্তার সেনের নিজস্ব রোগী; এদের উপর তিনি তাঁর সমস্ত সময়ের অর্দ্ধেকটার বেশিই খরচ করিয়া থাকেন, ফলও বেশি ফলিতে দেখা যায়।

সরোজবন্ধু দুজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া তার বসিবার ঘরে নীচের তলায় নামিয়া আসিল। এই ঘরখানি বাড়ীর একটী প্রান্তভাগে এবং একেবারেই এ অংশটী তার নিজস্ব। ডাক্তারদের দুখানা চেয়ার সরাইয়া দিয়া সে নিজেও একখানা টানিয়া লইয়া তাঁদের বসিবার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাঁরা আসন গ্রহণ করিলে টেবিলের উপর হইতে নিজের লম্বাচৌড়া ঢাকাই-কাজ-করা সিগারেট-কেসটা টানিয়া আনিয়া তার ডালা তুলিয়া ধরিয়া স্মিতহাসে আরম্ভ করিল—

"Please ডক্টরস্!—"

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী একটা মোটা মাপের বর্ম্মা সিগার তুলিয়া লইয়া ডাক্তার সেনের দিকে চাহিলেন।

ডাক্তার সেন ঈষৎ হাসিয়া মাথা নাড়িলেন "ও-সব তো খাইনে জানেন,—বসুন মিঃ গুপ্ত!"

"এই যে—"বলিয়া সরোজ সিগার-কেশ বন্ধ করিয়া চট্ করিয়া বসিয়া পড়িল; তার রাইডিং কোটের পকেট হইতে একটা ছোট মাপের সিগারেট লইয়া সেটা ধরাইতে ধরাইতে ডাঃ সেনের দিকে চাহিয়া কিছু বিস্ময়ের সুরে কহিয়া উঠিল

"মাপ কর্ব্বেন ডাঃ সেন! অত বচ্ছর ইউরোপে থেকেও আপনি এ-সব কিছু খান না, এ যেন বিশ্বাস করতে পারা যায় না। সেখানেও কি খেতেন না? না ফিরে এসে হার্ট ট্রবলের ভয়ে ছেড়ে দিয়েছেন?"

সরোজবাবুর কথার মধ্যে ডাক্তারের উপর একটু সূক্ষ্ম খোঁচা দেওয়া ছিল। ডাক্তাররা ধূমপানকে হার্ট ট্রবলের

পক্ষে বিশেষ অনিষ্টজনক বলিয়া থাকেন এবং ইনি হার্ট ট্রবলেরই স্পেশালিষ্ট।

ডাক্তার মৃদু হাসিলেন, বলিলেন "না, আমি সেখানেও কোন দিন ও-সব কোন কিছু খেতুম না।"

"তাতে আপনার শীত বেশি লাগ্‌তো না? এতে আর যা হোক একটু গরম তো রাখে!"

ডাক্তার সেন হাসিয়া বলিলেন, "তা' কেমন করে বলবো? পরীক্ষা করে তো দেখিনি।"

"আশ্চর্য্য! আমি তো এ কথা ভাবতেই পারিনা। আচ্ছা 'স্মোক্‌' করলে যে হার্ট খারাপ হয় বলে, সে সম্বন্ধে আপনার মত কি? সত্যি কি কিছু হয়?"

ডাক্তার বলিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে তো সেই রকমই বলে। তবে সকলেরই যে হতে হবে এমন কোন লেখাপড়া অবশ্য করা নেই।"

সরোজ এ কথায় হাসিয়া ফেলিল, এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ, এটা ঠিকই বলেছেন। তাই যদি হবে, তা'হলে আমার হার্টকে এমন সাউণ্ড রেখে স্বর্ণর হার্টকে অ্যাটাক্‌ করতে গেল কেন? ও তো আর কখন স্মোক করেনি।"

ডাক্তার দুজনেই মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিলেন। তারপর সরোজকে আবার একটা বাজে কথার সূত্রপাত করিতে উদ্যত দেখিয়া ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী কিছু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া হঠাৎ একটু চড়া গলায় বলিয়া ফেলিলেন,—"আমাদের এইবার কাজের কথা কওয়া উচিত সরোজবাবু!"

"কাজের কথা? ও ইয়েস্‌! আচ্ছা, হ্যাঁ, বলুন তো ডক্টর সেন! আমার স্ত্রীকে আপনি কি রকম দেখ্‌লেন?"

ডাক্তার সেন এ ঘরে পদার্পণ করিয়া পর্য্যন্ত সমস্তক্ষণ ধরিয়াই ঘরখানার আগাগোড়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন; এমন কি এই ঘরের ও অন্য ঘরের মধ্যদ্বারের উপর ঝুলান পর্দ্দাখানা যতবারই বাতাসে দুলিয়া ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিতেছিল, তিনি কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়াও তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টিতে সে ঘরখানাকেও বেশ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে খুঁটিয়া দেখিতেছিলেন। সেটা একটা শোবার ঘর। ঘরের মেজের একখানা কার্পেট পাতা; মধ্যে একখানা বোম্বাই প্যাটার্ণের ছোট খাট। টর্কিস তোয়ালে ঢাকা একটা মাথার বালিস। তোয়ালের পাশ দিয়া তার ওয়াড়ের ঝালরগুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বাজারের কেনা জিনিস।

খাটের মাথার কাছে একটা টিপয়। তার উপরেও সাদা লংক্লথের ড্রনথ্রেডের হাল্‌কা কাজ-করা ঢাকন; হাতের কাজ নয়, লেড্‌লর দোকানে যেগুলি সর্ব্বদা বিক্রি হয় তাই। টিপয়ের উপর একটা ছোট কাঁচের কুঁজা; কুঁজাটী একটী এনামেলের গামলায় বসানো, খুব সম্ভব উহাতে জল ঠাণ্ডার জন্য বরফ দেওয়া হয়; একখানা ছোট তোয়ালে, একটা রূপার পানের ডিবে, একখানা অ্যাস-ট্রে, তাতে খানিকটা বাসি ছাই এখনও ভরা আছে।

পর্দ্দাখানা সরিয়া-নড়িয়া পাশের ঘরকে যতখানি দেখিতে দিল, তার মধ্যে ডাক্তার সেন ঐ ঘরে তাঁর বিপরীত জাতীয়ের গন্ধটুকু পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। ঐটী যে নারীবর্জ্জিত একমাত্র পুরুষেরই শয্যাগৃহ, ইহাতে কোনই সংশয় নাই। অথচ সে পুরুষ বিবাহিত, এবং পূর্ণযৌবন-সম্পন্ন, অটুট স্বাস্থ্য-সম্পদের অধিকারী।

পর্দ্দা সরিয়া আসিয়া ক্ষণকালের জন্য যথাস্থানেই স্থির হইল। বরঞ্চ সেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া বাতাসের দোলে পত পত শব্দ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গৃহান্তর-রহস্যের আবিষ্কার চেষ্টা পরিহার করিয়া ডাক্তার সেনও সরোজের মুখের দিকে চাহিলেন।

"আপনার স্ত্রীকে কেমন দেখলেম? কি বিষয়ে জান্‌তে চাইছেন?"

সরোজ তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ঈষৎ যেন অসচ্ছন্দ বোধ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিকে পরিহার করিয়া অন্যত্র চাহিয়া অসহিষ্ণু ভাবে উত্তর করিল—"সব বিষয়েই, তাঁর রোগ কি কঠিন?"

ডাক্তার কহিলেন—"কঠিন না হলে সারবেনা কেন? এঁরা তো আর যত্নের ত্রুটী করেননি।" এই বলিয়া ডাক্তার চাটার্জ্জীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

ডাক্তার উত্তর করিলেন—"তা ঠিক, সরোজের স্ত্রীকে সারিয়ে তোলবার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেচি এবং ওঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েচে, তাতে তা' না করেও পারিনে, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।"

সরোজ একটু ভীত হইয়া প্রশ্ন করিল, "রোগটা কি? থাইসিস্‌?"

ডাঃ সেন কহিলেন "একেবারেই না। থাইসিস্‌ আপনি কি থেকে মনে করলেন?"

সরোজ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল, যেন তার মন

হইতে তিন ভাগেরও বেশি ভয়-ভাবনা সেই মুহূর্ত্তেই বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সে স্বচ্ছন্দভাবে কহিল,—"তা হলে আর ভাবনা কি? থাইসিস্‌টা না হলেই হোলো! তা' ছাড়া ও-রোগটা বড্ডই—"

ডাঃ সেন একটু গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শ্লেষের সহিত কহিলেন, "থাইসিস কি একটা নরহন্তা? এ অপরাধে আর কি কেউই অপরাধী নয় সরোজবাবু? পৃথিবীতে যত মানুষ মরে, সবই কি থাইসিসে!"

সরোজ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কিছুক্ষণ জবাব দিতে পারিল না; তারপর আস্তে আস্তে বলিল, "তা নয়, তবে কিনা, ওটাতে আর আশা থাকে না, থাইসিসের রোগী যেন under sentence of death."

ডাঃ সেন গম্ভীরমুখে কহিলেন "এও তাই।"

ডাঃ চাটার্জ্জী উহাঁর মুখের দিকে চকিত চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন; সরোজ যেমন তেমনই স্থির হইয়া রহিল, কোন কথা বা ভাব তার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইল না। ডাঃ সেন নিজেই তাহার দিকে ক্ষণকাল তীক্ষ্ণনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। এতবড় দুঃসংবাদটাকে সে যে রকম শান্তভাবে গ্রহণ করিল, তাহাতে দর্শকের দুরকমই সংশয় ঘটিতে পারে;—এক অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদের বিহ্বলতা, আর দ্বিতীয় এ-ও মনে কিছু করা আশ্চর্য্য বা অসঙ্গত হয় না যে, এই রুগ্ন অপত্য-বিহীনা অশিক্ষিতা পত্নীতে তার শিক্ষিত, ধনী এবং সুস্থদেহ স্বামী হয় ত একান্তই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁর জীবন-মরণে আর বিশেষ কোন আগ্রহ তাঁর মধ্যে বর্ত্তমান নাই।

ডাঃ সেন হাইকোর্টের জজ যে মুখভাবে ও কণ্ঠস্বরে পূর্ব্ব-বিচারিত অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডকে পুনর্ঘোষণা করিয়া থাকেন, তেমনই স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া সেই স্বরেই কহিতে লাগিলেন, "এঁর জীবনের আশাও ঠিক তেমনই অনিশ্চিত। একটুখানি সামান্য উত্তেজনা বা অবসাদের মধ্যেই হয় ত সেই জীবনদীপ চির-নির্ব্বাপিত হয়ে যেতে পারে। তাঁর এখন আপনার উপরেই সমস্তটা নির্ভর করে আছে। খুব বেশী সাবধানে, যত্নে স্নেহে, সম্পূর্ণ স্বার্থ-ত্যাগ ও আত্মত্যাগ করে না চল্‌তে পারলে, কোন্ মুহূর্ত্তে যে কি ঘটে কিছুই বলতে পারা যায় না,—"

ডাঃ সেন আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন; তাঁহাকে বাধা দিয়াই সরোজ বলিয়া উঠিল—"আমি কি করবো বলুন?"

তার কণ্ঠে একটা উৎকণ্ঠিত বেদনা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিল, "আমায় যে ভাবে চল্‌তে আদেশ দেবেন, আমি তাই করতে রাজী আছি।"

ডাক্তার বলিলেন "আপাততঃ কিছুদিন আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখাশোনা করতে পারবেন না। রোগীর সমস্ত ভার আমার হাতে দিয়ে আপনি এবং আপনার মা একেবারে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হয়ে যাবেন, যেন উনি আপনাদের কেউ-ই নন। তারপর আমি যখন যে রকম বল্‌বো।"

"বেশ ত," বলিয়া সরোজ ভিতর হইতে একটা রুদ্ধ-শ্বাসকে অতি স্বচ্ছন্দভাবেই মুক্ত করিয়া দিল। পুনশ্চ কহিল, "তাই হবে।"

ডাক্তার কহিলেন, "সবচেয়ে ভাল হয়, যদি উনি আমার সেবা-সদনে যেতে রাজী হ'ন; কিন্তু তা' তিনি হবেন কি? অন্ততঃ একটী মাসের জন্যে। তা' যদি যান, আমি আপনাকে প্রমিস করছি যে একটী মাসের মধ্যে ওঁকে আমি সেখান থেকে সম্পূর্ণ ভাল করে ফেরৎ দেবো।"

ডাঃ চাটার্জ্জি ও সরোজ উভয়েই এবার সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ যদি সম্ভব হয়, তবে তো তিনি খুব খুসী হয়েই যাবেন।"

কিন্তু ডাক্তার সেন এঁদের সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হইতে পারিলেন না। তিনি কিছু সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন,—"আমার তা' মনে হয় না, তবে যদি—"

সরোজ কহিল, "সে আমি ম্যানেজ করে নিতে পারবো। সে ঠিক হয়ে যাবে।"

ডাক্তার শুধু ঈষৎ হাসিলেন। মুখে তিনি আর কিছুই বলিলেন না।

(ক্রমশঃ)

টানেলের কথা

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ গুহ এ-এম্-ই-ই (B. Tech)

বাংলাদেশের লোক আমরা—সমতলভূমিতে আমাদের বাড়ী ঘর। পাহাড়, পর্ব্বত ও টানেলের (পার্ব্বত্য সুড়ঙ্গের) সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত নহি। যে টানেলের ভিতর দিয়া রেলে চড়িয়া যাইতে আমাদের প্রাণ ভয়ে অভিভূত হয়, সে সুড়ঙ্গ তৈয়ার করা যে কিরূপ বিপজ্জনক ও কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়।

এক নম্বর shaft (বার্ডরী)

এ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় কোম্পানী সুড়ঙ্গ তৈয়ারীর কণ্ট্রাক্ট (চুক্তি) লয়েন নাই ; কিন্তু সুখের বিষয় যে, এই প্রথম একটী ভারতীয় কোম্পানী এই বিপজ্জনক ও কষ্টসাধ্য কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। Tata Construction Company. G. I. P. Ry, Bhoreghat Realignment contract লইয়াছেন। এই Realignment পুনা জেলার খাণ্ডালা নামক স্থানে অবস্থিত। Realignmentটী দুই মাইলের কিছু উপরে লম্বা হইবে। ইহার এক মাইল প্রায় টানেল ; এবং বাকীটা খুব বড় বড় cutting। এই Realignmentএ ৭০ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

বর্ত্তমানে বোম্বে হইতে পুনা যাইতে হইলে, ট্রেণ 'করজৎ' (Karjat) ষ্টেশনে আসিলে, দুইটী এঞ্জিন গাড়ীকে চালাইয়া উপরে উঠায়। এবং বোম্বে হইতে ৭০ মাইল দূরে একটী
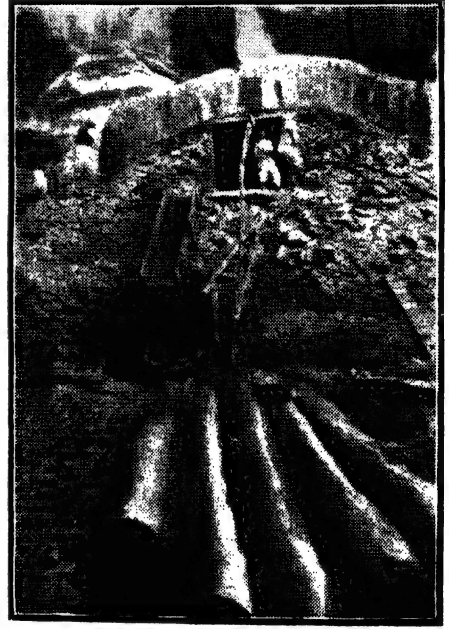
এক নম্বর টানেলের বোম্বের দিকে Timbering তুলিয়া ফেলিয়া Arching চলিতেছে

Reversing station আছে ; এই স্থান হইতে গাড়ীকে reverse করিয়া অর্থাৎ গাড়ীর পশ্চাৎভাগকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া গাড়ী চালাইয়া লওয়া হয়। Reversing stationএর প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর হইলেও রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ইহা তুলিয়া দিতে মনস্থ করিলেন ; কারণ, এইখানে জায়গা না

থাকায় প্রত্যেক মালগাড়ীকে করজৎ ষ্টেশন হইতে দুই তিন ভাগ করিয়া আনা হয়; এবং ইহাতে রেল কোম্পানীর যথেষ্ট অর্থহানি হয়। এই অর্থহানি লাঘব করিবার জন্য এবং পুরা গাড়ী বরাবর পুনা পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য এই Realignmentএর সৃষ্টি। এই Realignment তৈয়ার হইলে পর আর Reversing থাকিবে না।

Tata Construction কোম্পানী যে টা[নেল] দুইটী নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত আছেন, তাহার একটীর দৈর্ঘ্য ৩২০০ ফিট এবং আর একটীর দৈর্ঘ্য ১.৫৫ ফিট হইবে। টানেল দুইটী খুবই নিকটে, তাহাদের পরস্পরের ব্যবধান চারিশত হাত মাত্র হইবে। Sectional area হিসাবে পৃথিবীর Railway tunnelএর মধ্যে এই টানেলদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। Tata Construction কোম্পানী বড় টানেলটীকে এক নম্বর টানেল এবং ছোটটীকে দুই নম্বর টানেল এবং তাহাদের পুনার দিককে 'Poona Face' ও বোম্বের দিককে 'Bombay Face' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

টানেল কি করিয়া তৈয়ার করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কিছু

এক নম্বর টানেল বোম্বের দিকে Heading ও Timbering চলিতেছে

বলিব। প্রথমে জরীপ করিয়া টানেল যে রাস্তায় যাইবে তাহার একটা ঠিকানা করা হয়। তার পর সেই পাহাড় ছিদ্র করিয়া তাহার প্রস্তর পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় প্রস্তর মনোনীত হইলে পর টানেলের কাজ আরম্ভ করা হয়। প্রথমতঃ টানেলের faceএ অর্থাৎ যেখান হইতে টানেল সুরু হইবে সেখানে কয়েকটা ছিদ্র করিতে হয়; এবং সেই গর্ত্তের
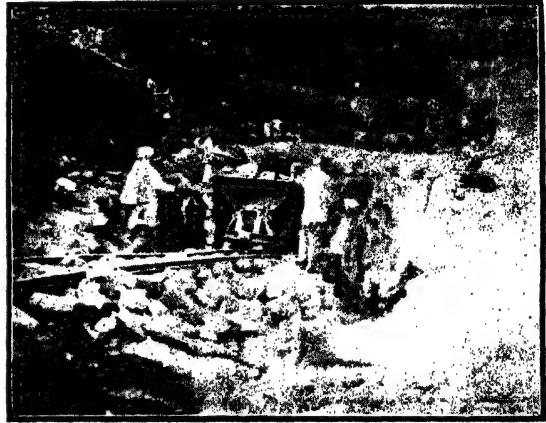
এক নম্বর টানেলের পুনার দিকে Heading চলিতেছে

ভিতর Gelegnite ও Detonator পূরিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ইহাতে আগুন লাগিবামাত্র সেখানকার পাহাড় প্রচণ্ড শব্দসহকারে ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়। Gelegnite ও Detonator * দিয়া পাহাড় ফাটানকে blasting কহে। প্রথমতঃ এইরূপ blasting করিয়া heading বা সুড়ঙ্গ পথ তৈয়ার করা হয়; এবং তার পর উহাকে বর্দ্ধিত করা হয়। কোন কোন স্থানে এই সুড়ঙ্গ-পথ উপরে ও নীচে দুইটী করিতে হয় এবং Bottom heading হইতে Top headingএ যাইবার জন্য 'shoot up' তৈয়ার করিতে হয়। কাজ খুব শীঘ্র করিতে হইলে এবং খুব বেশী জল (subsoil water) পাওয়া গেলে, এই Bottom heading লওয়া হয়। এই সমস্ত drilling compressed air, (ঘনীভূত বায়ু), Electric বা Hand drilling করিয়া করা হয়। এই ভাবে boring ও blasting করিয়া যাইতে হয়; এবং

* ইহা ভয়ানক দাহ্য, দিনামাইটের মত।

ধ্বংসাবশিষ্ট পাহাড়স্তূপকে trolley বোঝাই করিয়া বাহিরে লইয়া আসিতে হয়। অনেক সময় টানেলের heading করিয়া যাওয়া হয়; অর্থাৎ উপরের arching করিবার জন্য যতটুকু জায়গার প্রয়োজন, তাহাই blasting করিয়া যাওয়া হয়; এবং সমস্ত জায়গা পরিষ্কার করিয়া archingএর জন্য প্রস্তুত করা হয়। উপরের rock (পাথর) ভাল হইলে, অর্থাৎ মজবুত হইলে এবং তাহাতে loose (আল্‌গা পাথর) না থাকিলে, archingএর প্রয়োজন হয় না। Tata Construction কোম্পানী এখানে সমস্ত টানেলেই cement block দ্বারা arching করিয়া আসিতেছেন। Arching করিলে পর টানেল দেখিতে বড়ই সুন্দর হয়। কিছুদিন পর আবার নীচের rockকে Benching করিয়া bottom পাইতে হয় এবং তাহার উপরই Railway track বসে।

দুই নম্বর টানেল পুনার দিকে Archingএর পরের অবস্থা

এখানে ঘনীভূত বায়ু দ্বারা পাহাড়ে গর্ত্ত করা হইতেছে। Tata Construction কোম্পানীর একটী বৃহৎ Power House (বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কারখানা) আছে এবং তাহা খপোলির (Khopoli) Tata Hydro-Electric Supply Power Co হইতে power পায়। এখানকার power houseএ চারিটী বড় বড় Compressor Induction motor দ্বারা চালিত হইয়া compressed air সরবরাহ করিয়া থাকে। Compressed air দ্বারা jack hammer ও Leynar machine চলে এবং তাহাতে jumper লাগাইয়া গর্ত্ত করা হইয়াছে। গর্ত্ত করিবার সময় ভয়ানক জোরে শব্দ হয়। অনেক সময় অবস্থা অনুসারে তিন, চার, পাঁচ, ছয়, এমন কি দশ ফিট পর্য্যন্ত গর্ত্ত করা হইতেছে। গর্ত্ত ছোট হইলে jack hammer দ্বারা এবং বড় হইলে Leynar machine দ্বারা করা হয়। গর্ত্ত খনন হইয়া গেলে পর সেই সকল গর্ত্তগুলিতে explosive (Gelegnite, Detonator ও fuse wire) পুরিয়া এবং তার পর সেই গর্ত্তগুলিতে মাটীর ডেলা ঠাসিয়া ঠাসিয়া দিতে হয়, কেবল fuse wire বাহিরে থাকে। এইভাবে সমস্ত গর্ত্তগুলি charge করিতে হয়। তার পর সমস্ত লোক অনেক দূরে সরিয়া গেলে পর Blaster আসিয়া fuse wireএ অগ্নিসংযোগ করিয়া রে পলাইয়া যায়। অগ্নিসংযোগের মিনিট পাঁচেক পর হইতে ভীষণ শব্দে blast হইতে আরম্ভ হয় এবং চারিদিকে পাথর ছুটিতে থাকে। ইহা ছাড়া এখানে electric blastingও হয়। Electric blasting করিতে
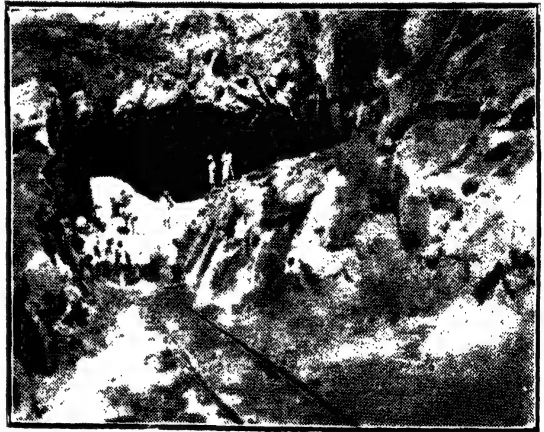
দুই নম্বর টানেলের পুনার দিকে Benching চলিতেছে

হইলে সমস্ত গর্ত্তের বিস্ফোরক গুলিকে তার দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দূরে Switch boardএ লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখান হইতে Switch টিপিলেই প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বিস্ফোরক গুলি একযোগে blast হয়। অগ্নিসংযোগ দ্বারা blasting করিলে পর পর একটী একটী শব্দ করিয়া blast হয়।

Blasting হইয়া গেলে পর সমস্ত ধ্বংসাবশিষ্ট পাহাড় স্তূপ trolley বোঝাই করিয়া বাহিরে লইয়া আসিতে হয় এবং এইভাবে কাজ চলিতেছে। Blasting করিবার পূর্ব্বে তাহার নিকটবর্ত্তী air pipe, water pipe ও light connection সমস্তই খুলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে হয়; নতুবা পাহাড়স্তূপ পড়িয়া ধ্বংস হইয়া যায়। অনেক সময় টানেলের দুই মুখ হইতে কাজ আরম্ভ করা হয় এবং মধ্য পথে দুইদল আসিয়া একত্র মিলিত হয়। আবার অনেক সময় heading ও bottomএর কাজ একযোগেই আরম্ভ হয় এবং পরে মাঝের পাহাড়কে উড়াইয়া দেওয়া হয়।
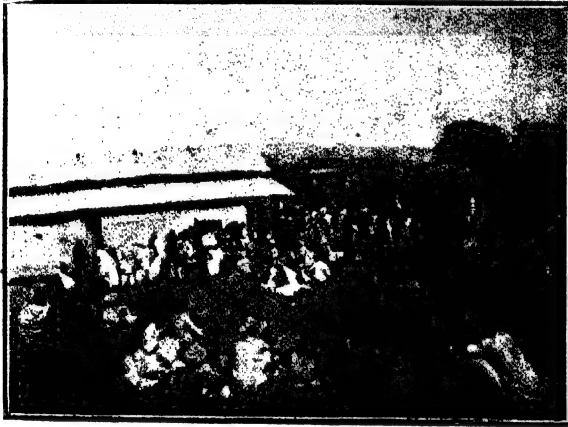
Tata Construction কোম্পানীর Payment day.

টানেলের ভিতর অন্ধকারের রাজত্ব, আলোর রেখা এখানে নাই। সমস্ত টানেলের ভিতর বৈদ্যুতিক আলো আছে। তাহা অন্ধকারের বুকে মিটমিট করিয়া জ্বলিতে থাকে। ইহা ছাড়া এখানে টানেলের ভিতর air pipe, water pipe ও trolley line আছে।

টানেলের আর একটী দরকারী জিনিষ হইল Shaft (বার্ডরী)। ইহা একটী বড় গর্ত্ত—পাহাড়ের উপর হইতে টানেলের bottom পর্য্যন্ত খনন করা হইয়া থাকে। এখানে বড় টানেলের ভিতর দুইটী shaft আছে। একটীকে এক নম্বর shaft ও অপরটীকে দুই নম্বর shaft কহিয়া থাকে। এক নম্বর shaftটী ১৩০ ফিট ও দুই নম্বর shaftটী ১০৬ ফিট গভীর। এই shaft দুইটীর ভিতর Lift আছে এবং তাহা air-engine দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। এই Lift দ্বারা লোক-চলাচল, মালমশলাদি সরবরাহ হইয়া থাকে; এবং নীচে হইতে ধ্বংসাবশিষ্ট পাহাড়-স্তূপ পরিপূর্ণ trolley সকল উপরে আনা হইয়া থাকে। এই shaft দুইটী নির্ম্মাণ করিতে এই কোম্পানীকে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। খানিক দূর খনন করিবার পর জল অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কাজ করা একেবারে অসম্ভব হইল। কিন্তু কোম্পানী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিপদ দূর করিয়া দিলেন।

Shaft দুইটী দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা 'pit of hell'। Shaftএর Lift দ্বারা লোকদের যখন টানেলের বুকে নামাইয়া দেওয়া হয়, তখন প্রাণে বেশ একটু ভীতির সঞ্চার হয়। আলোর রাজত্ব ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের রাজত্বে প্রবেশ করিতে হয়; এবং কতক্ষণ তাহার ভিতর দিয়া গিয়া আবার টানেলের ভিতর আলোর মুখ দেখা যায়।

বৃষ্টিপাত হইলে টানেলের ভিতর ভয়ানক জল জমিয়া যায়; এবং বৃষ্টিপাত ছাড়াও সর্ব্বদা shaftএর পাহাড় চুয়াইয়া জল পড়িয়া জমা হইতে থাকে। জল জমিলে পর কাজ করার ভয়ানক অসুবিধা এবং সেইজন্য সর্ব্বদা pump চালাইয়া জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। টাটা কনষ্ট্রাকশন্ কোম্পানী arching করিবার cement block পাহাড়ের উপর তৈয়ার করেন এবং তাহা Aerial Ropeএর সাহায্যে উপর হইতে নীচে লইয়া যাওয়া হয়।

Aerial Ropeএর প্রচলন খুব অল্প জায়গায়ই দেখা যায়। ইহা প্রস্তুত করিতে কোম্পানীর যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছে।

টানেলের ভিতর পাথরের স্তূপ, জল, অন্ধকারের রাজত্ব ও ধূমরাশি। টানেলের ভিতর ঢুকিলে প্রাণ যে কি রকম করে তাহা বলা মুস্কিল; কিন্তু আবার তখনই মনে হয়—ভয় কিসের। ইহা তো আমাদের গৌরবের বিষয়; এবং এই তো প্রথম আমাদের দেশের কোম্পানী ও দেশীয় management এই বিরাট টানেলের কাজ করিতেছেন। তখন হর্ষে ও

Shaftএর ভিতরের Lift

গৌরবে হৃদয় ভরিয়া যায়; আর মনে হয়—'এই তো আমরাও কাজের উপযুক্ত হইয়াছি।'

টানেলের ভিতর সাধারণতঃ misfire * হইয়া ও পাহাড়স্তূপ ধ্বসিয়া লোকের গুরুতর বিপদ ঘটায়। কিন্তু এই কোম্পানী এত সুন্দর ভাবে এই বিরাট কাজ পরিচালন করিয়া আসিতেছেন ও এত সতর্কতার সহিত blastingএর কাজ করিয়া আসিতেছেন যে, তাহাতে এই কাজের অনুপাতে দুর্ঘটনা খুব কমই হইতেছে।

টানেলের কাজ এত কঠিন যে, তাহা কল্পনারও অতীত। একজন বড় ইয়োরোপীয়ান এঞ্জিনিয়ার বলিয়াছেন যে নদীর উপরে সেতু নির্ম্মাণ করা অপেক্ষা টানেলের কাজ চতুর্গুণ কঠিন, কষ্টসাধ্য, বিপজ্জনক। Tata Construction Coকে এখানে কাজ করিতে যথেষ্ট বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; এবং তাঁহারা সমস্ত বিপদ হইতেই উদ্ধার পাইয়া গিয়াছেন। একবার কিন্তু এক বিপদে তাঁহারা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কারণ, সে রকমের বিপদ টানেলের ইতিহাসে কথনও ঘটে নাই। বিপদটী তাঁহাদের এই—এক নম্বর টানেলের বোম্বে face হইতে কাজ আরম্ভ করা হয়; কিন্তু কিছুদুর অগ্রসর হইবার পর পাহাড়-স্তূপ ধ্বসিয়া পড়িয়া সমস্ত রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় কাজ

দুই নম্বর টানেলের বোম্বের দিকে

করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল; কারণ, ইহাতে প্রাণহানি ও অর্থনাশ অনিবার্য্য। তখন এইরূপ অবস্থায় কি করা যাইবে তাহার চিন্তা হইতে লাগিল। তার পর রেলওয়ে হইতে বড় বড় এঞ্জিনিয়ার আসিলেন এবং এই কোম্পানীর Managing Director ও কয়েকজন বড় বড় এঞ্জিনিয়ারকে পরামর্শ করিবার জন্য আনিলেন। তাঁহারা সকলেই এক-

* Blastingএর সময় যদি কোন গর্ত্তের বিস্ফোরক burst না করে, তবে তাহাকে তুলিয়া ফেলিতে হয়। যদি ভুলক্রমে তাহা থাকিয়া যায় এবং তাহাতে আঘাত লাগে, তাহা হইলে তাহা burst করিয়া নিকটবর্ত্তী লোকের গুরুতর বিপদ ও প্রাণহানি ঘটায়।

বাক্যে বিচার করিলেন যে, এখানে টানেল হইতে পারে না ; এবং এখান হইতে ৫০০ ফিট পিছাইয়া দেওয়া হউক ; অর্থাৎ cutting করা হউক। এইভাবে কাজ করিলে কোম্পানীর যথেষ্ট লোকসান হইত। কোম্পানীকে এইরূপ লোকসান হইতে বাঁচাইবার জন্য এই কোম্পানীর General manager শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাহারও কোন পরামর্শ না

এক নম্বর ও দুই নম্বর টানেলের ভিতরের Open Cutting

শুনিয়া এক নূতন মতলব খাটাইলেন, যাহা পূর্ব্বে কখনও কোন টানেলের কাজে করা হয় নাই। টানেল face এর বাহিরে একটী খিলান গঠন করিয়া এবং সেখান হইতে খুব বড় একটী re enforced raft দ্বারা পাহাড় ধরিয়া পরে timber করিয়া গেলেন। তার পর গর্ত্ত করিয়া কাজ চলিতে লাগিল। তখন সকলেই বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ হইতে পারে না ; কিন্তু এই মতলব অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়াছে।

টাটা কনষ্ট্রাকশন্ কোম্পানী যেভাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাহা প্রশংসাযোগ্য। ইঁহারা যেভাবে Heading এর কাজ করিয়াছেন, অর্থাৎ দৈনিক দশ ফিট, ইহা ভারতবর্ষে অতুলনীয়। প্রথমে দুই নম্বর টানেলের কাজ আরম্ভ হয় ; এবং যদিও Headingএর কাজ খুবই কঠিন, তাহা হইলেও তিন মাসের মধ্যে Headingএর কাজ শেষ করা হয়। ইহার দুই দিক হইতে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল ; এবং যখন দুইদল আসিয়া মধ্যপথে একত্র হয়, তখন মাত্র এক ইঞ্চি বক্র হইয়াছিল। বক্র বেশী হইলে কোম্পানীর যথেষ্ট অর্থক্ষতি হইত এবং কাজও inefficient হইত। টানেলের ইতিহাসে এইরূপ কাজ পূর্ব্বে কখনও পাওয়া যায় নাই। এই জন্য এই কোম্পানীর এঞ্জিনিয়ারগণ ধন্যবাদের পাত্র। পূর্ব্বে Tunnel contractএর কোন সময়ের সীমা ছিল না ; কিন্তু টাটা কনষ্ট্রাক্শন্ কোম্পানীকে ২৫ মাসে এই কাজ শেষ করিতে হইবে এই চুক্তিতে contract দেওয়া হইয়াছে। এই কোম্পানী আশা করেন যে, এই বিরাট কাজ তাঁহারা ২৫ মাসের অনেক পূর্ব্বেই শেষ করিতে পারিবেন।

প্রায় হাজার পাঁচেক লোক দিবারাত্রি Tata Construc-

দুই নম্বর Shaft (বার্ডরী)

tion Coতে কাজ করে। এখানে সকল জাতীয় লোকই কাজে নিযুক্ত আছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ হইতে গুজরাট উপকূল পর্য্যন্ত কেহই এখানে প্রতিনিধি পাঠাইতে দ্বিধা করেন নাই। বিরাট দাড়ি গোঁফ ও পাগড়ীবিশিষ্ট সাতফুট লম্বা পাঞ্জাবী ভাইয়ারাও এখানে কাজ করিতেছেন, অতিবিশ্বস্ত

মস্তিষ্কবিহীন গুরখার দলও বাদ নাই, অতিনিরীহ বাঙ্গালী কয়েকজন—আমরাও কাজে নিযুক্ত আছি এবং কাবুলি-ওয়ালার মাসতুতো ভাই পাঠানেরাও বিরাটভাবে কাজ করিতেছেন। ইহা ছাড়া যে এখানে কতরকম জাতি ও কতরকমের ভাষা আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সকল দেখিয়া মনে হয় যে Tata Construction কোম্পানী এই জায়গাটীকে একটা ছোটখাট দুনিয়া বানাইয়াছেন। এখানে লোকজনদিগের থাকিবার জন্য বাসস্থান ও হাস-পাতাল ইত্যাদি করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং এই কোম্পানীর

মিষ্টার বি, পি, কাপাডিয়া Engineer, Tata Construction Co.

কৃপায় এই ক্ষুদ্র গ্রামে হাজার পাঁচেক লোক আসিয়া পড়ায় গ্রামের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। এ গ্রামের যে ভাষা কি এবং ভাব কি তাহার কিছুই ঠিক নাই—হরেক রকমের লোক, হরেক রকমের ভাষা, ভাব ও ভঙ্গী।

আমাদের বাঙ্গালীর অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, এই বিরাট Tunnel works এর যিনি হর্ত্তাকর্ত্তা অর্থাৎ মাটী-কাটা, পাথর খোঁড়া হইতে যাহা কিছু কাজ হইয়াছে এবং যত কিছু Engineering ও Managementএর কাজ আছে, তাহা সমস্তই আমাদের একজন বাঙ্গালী করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি সামান্য এঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করেন এবং আজ ভারতবর্ষের খুব কম এঞ্জিনীয়ারই আছেন যিনি তাঁহার নাম না জানেন। ইনি Tata Construction Coএর General manager এবং ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কাজ দেখিতে ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে এবং গবর্ণমেণ্ট হইতেও অনেক এঞ্জিনিয়ার আসিয়াছিলেন; এবং সকলেই একবাক্যে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—General Manager, Tata Construction Co.

কাজের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এমন কি আজকাল ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান এঞ্জিনিয়ার বলা যায়, সেই স্যার বিশেশ্বর আয়ারও ইঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্বরই মহীশূর গবর্ণমেণ্টের Tunnel worksএর Consulting Engineer নিযুক্ত হইবেন।

এই টানেলের কাজে অনেক ইয়োরোপীয়ান এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন বটে, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিসাবপত্র ও

ার্য্যপ্রণালীর ব্যবস্থা ইত্যাদি একটী পার্শী এঞ্জিনিয়ার Mr. B. P. Kapadiaএর হস্তে রাখিয়াছেন। Mr. Kapadia একজন তি বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ এঞ্জিনিয়ার এবং এইরূপ কার্য্যের কমাত্র উপযুক্ত লোক। এখানে একটী জিনিষ দেখিতে পাই , কোন বড় বিবেচ্য বিষয় উপস্থিত হইলে এই কোম্পানীর ড় বড় ইয়োরোপীয়ান এঞ্জিনিয়ার তিন চারি দিন চিন্তা রিয়া যখন কিছু উপায় বাহির করিতে পারেন না, তখন ন্তু ভারতীয় এঞ্জিনীয়ার অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মাংসা করিয়া দেন।

আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের এইরূপ নেলের কাজ ইয়োরোপীয়ান কোম্পানীরই কচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এতবড় টানেলের জ এই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় কোম্পানী রতীয় তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করিয়াছেন। জ পর্য্যন্ত অনেকেই আসিয়া এই নেলের কাজ দেখিয়া গিয়াছেন এবং কলেই একবাক্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এইরূপ কার্য্য-কুশলতা ভারতবর্ষীয়দের হা হওয়া আশাতীত।

সেদিন খবরের কাগজে পড়িলাম যে দ্রাজ দক্ষিণ মালাবার রেলের এজেণ্ট শয় রেলওয়ে কনফারেন্সএ মত প্রকাশ করিয়াছেন ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারেরা অযোগ্য, অকর্ম্মণ্য ইত্যাদি। এখানকার কাজ রেলওয়ে বোর্ডের High mmissioner ও ডাইরেক্টরেরা আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন সকলেই ভাল ধারণা লইয়া গিয়াছেন। এখন ভারতবর্ষের এইরূপ বড় কাজ খুব কমই চলিতেছে।

Tata Construction কোম্পানীর কাজ দেখিয়া রতবর্ষের সকলেরই আনন্দিত হওয়া ও গৌরব বোধ করা ত, কারণ ইহা আমাদের নিজেদের জিনিষ এবং ইহার ব্যবস্থা আমাদের দেশীয় লোকের হাতে রহিয়াছে। এ শ্রেণীর কাজের ভিতর টানেলের কাজই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ইহা যখন অবলীলাক্রমে ও অতি সুন্দররূপে একটী দেশীয় কোম্পানী করিতেছেন, তখন মনে হয় যে, আমাদের শুভদিন আসিয়াছে এবং আমরাও জগৎ-সভায় দাঁড়াইবার উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছি।

এখানে ২৪।২৫ জন বাঙ্গালী এই কোম্পানীতে কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। এখানকার Chief Electrical Engineer ও টানেলের General Foreman দুইজনই বাঙ্গালী। বাঙ্গালী যে কয়জন এখানে আছেন, তাঁহাদের সকলের ভিতর মিলমিশ ও আন্তরিকতা খুব বেশী—সবাই যেন ভাই ভাই। সুদূর বাংলা মায়ের শান্ত-স্নিগ্ধ কোল ছাড়িয়া আসিয়া এই বিদেশ বিভুঁইএ পাহাড়ের রাজত্বে যে এতগুলি বাঙ্গালী একত্র হইবেন তাহা কল্পনারও অতীত ছিল। বাঙ্গালীরা এখানে তাঁহাদের নিজেদের স্থান বজায় রাখিয়াছেন এবং তাঁহারা কোনমতেই বুঝিতে দেন না যে, তাঁহারা বাংলামায়ের কোল ছাড়িয়া ১৩০০ মাইল দূরে আছেন। এখানে বাঙ্গালীকে সকলেই একটু সমীহ করিয়া চলে; কারণ বাঙ্গালী যাঁহারা এখানে আছেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান।

দুই নম্বর টানেলের বোম্বের-দিকে Archingএর পূর্ব্বের অবস্থা
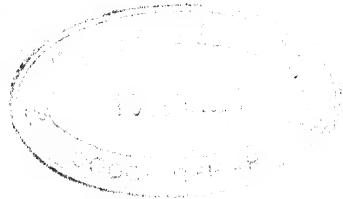
নারায়ণের পরিণীতা

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ঘটনাটা সম্পূর্ণ আকস্মিক। এমন যে হইবে, আমিও তা জানিতাম না, অথচ হইল এমনি-ই।

বিদেশে পড়িয়া ডাক্তারী করিতেছিলাম। হঠাৎ দেশে জমিজমা লইয়া একটা মামলা বেশ জটিল হইয়া ওঠায় বহুকাল পরে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলাম। ছেলে-বয়সের সাথী-সমবয়সীরা কেহ চিনিল না; আর যাহারা চিনিল, তাহারা সাহস করিয়া কথা বলিল না। বাড়ীতে বাবার এক পিসি ছাড়া আর কেহ ছিল না। বাড়ী-ঘর-দ্বার উৎসন্ন হইয়া গেল, গাঁয়ে বসিয়া কি ডাক্তারী হয় না বাবা,...ইত্যাদি অনেক উপদেশ দিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া তিনি আমায় আহ্বান করিয়া লইলেন।

মামলার দিন ক্রমশঃ পিছাইতেছিল। কর্ম্মস্থলে ফিরিবার উপায়ও খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। এমনি সময় একদিন ঠাকুমা বলিলেন, বাবা, তুই ত' ডাক্তার মানুষ, একটা কাজ যদি করিস্—

হাসিয়া বলিলাম, অবিশ্যি বিনা পয়সায়...?

ঠাকুমা বলিলেন, তাই বটে। আর পয়সা দেবার কথাও নয়,—একদিন তোরা কেউ কারো সঙ্গ ছাড়তে হ'লে কেঁদে-কেটে অস্থির করতিস্—

বলিলাম, এমন রুগীর নামটী গোপন রেখ না ঠাকুমা, শুনিয়ে দাও।

ঠাকুমা নাম শুনাইলেন, সবিতা—

নামের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা কবিত্ব কতখানি ছিল জানি না, তবু, অনেক দিনের ঘুমাইয়া-পড়া স্মৃতির বুকে যেন সজোরে একটা আঘাত লাগিল। বলিলাম, চলো, দেখে আসি...

ঠাকুমা বলিলেন, আমি আর এবেলা যাব না সতীশ, তুলসীতলা এখনো নিকোনো হয় নি। তুই একাই হয়ে আয়। বাড়ী মনে আছে ত?

কি জানি—বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

বাড়ী চিনিতে ভুল হইল না। এক সময়ে আবিষ্কা[র] করিলাম, আমার ছেলেবেলার সেই নোনা-ধরা, অতি জী[র্ণ] কোঠাটার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। বুকের ভিতর[টা] একবার দুলিয়া উঠিল; লজ্জাও বোধ করিলাম যথে[ষ্ট]। আমাদের দুরন্ত-শৈশবের সেই অতি-দুরন্ত সবিতা আ[জ] হয় ত—বধূ, এয়োস্ত্রী, গৃহিণী...

ভাঙ্গা পাঁচিল পার হইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলা[ম]। বাড়ীটার মতই সুপ্রাচীন, পাঁজরা-সার একটা গরু এক পা[শে] পড়িয়া ঝিমাইতেছে; তাহারই অদূরে শতছিদ্র ধান্যহীন ধা[নের] গোলাটা ঠিক সেই বার তের বৎসর পূর্ব্বের মতই দাঁড়া[ইয়া] আছে। এ ছাড়া উঠানে অন্য কিছু বা আর কাহা[রও] সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। ভাবিলাম, ফিরিয়া যাই। তখ[ন] মনে হইল, যাহার কাছে চলিয়াছি সে আর [illegible] নয়।

সিঁড়ি উঠিয়া ঘরে আসিয়া পড়িলাম।

একখানা ভাঙা তক্তপোষের উপর চাদর মুড়ি দিয়া এ[কটি] রোগক্ষীণা মেয়ে। পদশব্দে চোখ মেলিয়া বলিল, এসো।

স্বর এতটুকু কাঁপিল না, লজ্জা করিল না। [illegible] ভাবিলাম, আমাদের সেই হারানো শৈশব আজ বুঝি এত[দিন] পরে হঠাৎ কে ফিরাইয়া দিয়া গেল। ধীরে ধীরে বলিলা[ম], ঠাকুমার মুখে শুনলুম...তোর...

সবিতা বলিল, কিন্তু তাই শুনেই ত' ছুটে আসো[নি]; তোমায় তিনি পাঠিয়ে দিয়েচেন তবে এসেচো। নইলে ম[নে] পড়ত না।

অনুতপ্তের মত নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম; কারণ, সবি[তার] অভিযোগ কঠিন হইলেও অসত্য নয়। সবিতা ব[লিল], দুঃখ্য করো না সতীশ-দা,—মানুষের জীবনটাই এই। [illegible] কত আসে, কত যায়,—সব কি মানুষ মনে রাখে, [না] রাখতেই পারে!

হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর কেমন গাঢ় হইয়া গেল। চম[কিয়া] মুখের প্রতি চাহিতেই আমার বিস্ময়ের আর অন্ত র[হিল না]...

। সবিতার সমস্ত মুখ ব্যথায় কালো হইয়া গেছে। বিতা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ডাক্তারী করতে এসে বা হয়ে বসে রইলে যে! কি অসুখ—কিছু জিগ্‌গেস রলে না ত ?

ব্যস্ত হইয়া ষ্টেথিস্কোপ্‌টার জন্ত পকেটে হাত দিলাম। বিতা তেমনি হাসির ভঙ্গীতে কহিল, দরকার নেই। অসুখ ধু জর। ও-ত রোজই হয়। কিন্তু সে জন্যে ডাকি নি। ধু…

কথাটা শেষ হইল না। সবিতা নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া হল। খানিক পরে, অনেকটা আপন মনেই বলিল, মানুষ া! সে সব ভুলতে পারে!

অপরাধীর মত হেঁট হইয়া বসিয়া রহিলাম। তার পর ঃশব্দে এক সময় বিদায় লইয়া আসিলাম। সবিতার াহ্বানের প্রয়োজনটা ভাল বোঝা গেল না।

বাড়ী ফিরিয়াই ঠাকুমাকে প্রশ্ন করিলাম, সবিতা শ্বশুর-ড়ী যায় না কেন ঠাকুমা ?

প্রশ্ন শুনিয়া ঠাকুমা হতভম্বের মত আমার মুখের প্রতি হিয়া রহিলেন, কহিলেন, সে কি রে!

বলিলাম, সবিতার বিয়ে হয়েচে,—কিন্তু শ্বশুরবাড়ী খবর য় না কেন ?

ঠাকুমা বলিলেন, কপাল নেই তার মাথা ব্যথা। বিয়েই ল না আজো…

—সে কী! সবিতা এখনো কুমারী ?

ঠাকুমা বলিলেন, তা নয়; তবে মানুষের সঙ্গে বিয়ে ওর । নি। কুলীনের মেয়ে, ডান পা'টা বাঁকা—পাত্র মেলা সহজ নয়। এই সব দেখে শুনে গোবিন্দ গাঙ্গুলী নারাণ-লার হাতে মেয়ে সঁপে দিয়ে গেছে—

মনটা নিমেষে বিষাইয়া উঠিল। বলিলাম, নারায়ণ তোমাদের দেবতা না ঠাকুমা ?

হ্যাঁ—তা'ও আবার কি কথা!

বলিলাম, সেই দেবতা হ'লেন মানুষের স্বামী ? লোভ কম নয়!

ঠাকুমা বলিলেন, ক্ষ্যাপা ছেলে, স্বামীই যে মানুষের দেবতা।

ঠাকুমার কথার মধ্যে হয় ত ন্যায়-শাস্ত্রের কোনো সূত্র ছিল; কিন্তু ক্ষেপা ছেলের চিত্ত কিছুতেই সেটা পরিপাক করিতে পারিল না। মনে মনে বলিলাম, মানুষের উপর মানুষের এ কী অত্যাচার! রক্ত-মাংস, কামনা-বাসনার দেহ —এক পাথর-পিণ্ড লইয়া চিরটা জীবন কাটাইয়া দিবে? মানুষকে মানুষ এমনি করিয়াও ফাঁকি দেয়!

সন্ধ্যার মুখে আর একবার সবিতাদের বাড়ী গেলাম।

বনমালী সবিতার বড় ভাই। একতাড়া কাগজপত্র বগলে লইয়া সে কোথায় বাহির হইতেছিল; আমাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, এই যে!—আপনার কথাই হচ্ছিল। …বসুন—সন্ধ্যায় একটা ট্রেণ আসে, একবার ষ্টেশন হয়ে আসি।

বনমালী চলিয়া গেল।

সবিতার প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, দাদা এ'সময়ে ষ্টেশনে গেলেন যে ?

সবিতা ইহার উত্তরে বলিল, লেখা-পড়া শেখেনি—ডাক্তারও নয়। খবরের কাগজ বিক্রী করে পেট চালাতে হয়।

বুঝিলাম না—হঠাৎ ডাক্তারীর উপর তাহার এতখানি বিদ্বেষ জন্মিল কেন। নির্ব্বাক, নতমুখে বসিয়া রহিলাম। ঘরে বসিয়া আকাশের খানিকটা চোখে পড়িতেছিল। শীত-রাত্রির কুয়াসা ভেদ করিয়া চাঁদের ম্লান আলো ঝরিয়া পড়িতেছে—আজিকার প্রভাতে-দেখা সবিতার মুখের রহস্য-ময় হাসির মত!…উঠানের এক পাশে চাঁপার একটা গাছ; তাহারি শাখা-চ্যুত একটী ফুল মাটীতে ঝরিয়া পড়িল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলাম, ওই ফুলটীর ফোটা ও ঝরার মতই,—মানুষের হাসি-কান্নার, রাগ-বিরাগের রহস্য আজ পর্য্যন্ত অন্ধকারেই রহিয়া গেল!

কতক্ষণ এইভাবে বসিয়া ছিলাম মনে নাই; শুনিলাম, সবিতা বলিতেছে, বিদ্যে শিখে ডাক্তারই হয়েছিলে সতীশ-দা, মানুষের মান-অপমান কিসে যায় আসে তা এতটুকু শেখো নি।…শিখলে, এমন করে সন্ধ্যে বেলায় তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে না। কলঙ্কের ভয় তোমার না-ও থাকতে পারে, কিন্তু আমরা অসহায়—আমাদের মুখ চাইতে কেউ নেই…

ভাবিলাম বলি, সাধিয়া দেখা করিতে আসিও নাই, তোমার এই অহেতুক তিরস্কারে কোনও বিন্দুমাত্র প্রকাশ

করিব না। নিতান্ত নিরভিমানেই বিদায় লইয়া যাইব। তবে—এই অনাহূত আত্মীয়তা, অকারণ লাঞ্ছনা কোনোটারই হেতু নির্ণয় করা গেল না—এই যা!

ক্ষতি নাই; তোমার মান-অপমানের প্রতি এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া রাখিব।

পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

আজ প্রভাতেই আমার নীরস চিকিৎসা-শাস্ত্র রস-বর্ণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন সন্ধ্যার এই বিষণ্ণ-অন্ধকারে মনে হইল, সব ভুল! সব ভুল! পৃথিবী যেন সঙ্কীর্ণ হইয়া গেছে।

বাড়ী ফিরিতেই ঠাকুমা বলিলেন, গাঙ্গুলী-বাড়ী গিয়ে কাজ নেই সতীশ, পাড়ার মাথারা এসে শত কথা শুনিয়ে গেলেন।

—কি কথা ঠাকুমা?—জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুমা বলিলেন, জগদীশ ভাদুড়ী সাবিকে সেবার কাশী নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন—ছুঁড়ি গেল না; তাঁর রাগটাই সকলের বেশী। বলে গেলেন সোমত্ত মেয়ে—

উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর কঠিন হইয়া উঠিল; বলিলাম, তাকে ব'লো ঠাকুমা, সবাই জগদীশ নয়। সবিতাকে আমি বিয়ে করব।

বজ্রপাত হইলেও ঠাকুমা বোধ করি এর চেয়ে বিস্মিত হইতেন না! চোখে হাত ঢাকিয়া ঠাকুমা বলিলেন,······ তা'হলে আর ভাবনা কি ভাই! কিন্তু সে পথও অভাগীর বন্ধ। ও যে নারায়ণের পত্নী—

বলিলাম,······ছাই! স্বর্গে লক্ষ্মীর অভাব হয় নি ঠাকুমা, যে, উনি মর্ত্যের মানুষ নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে আসবেন! তুমি অনুমতি দাও, আমি ওকে বিয়ে করব,—

ঠাকুমা বলিলেন, যা' হ'বার নয়, তা নিয়ে জেদ করিস না সতীশ। গাঁয়ের সবাই একজোট হয়ে এ বিয়েতে বাধা দেবে। তা ছাড়া ওর নামে আরও অনেক কথা, অনেকবার······

চীৎকার করিয়া কহিলাম, মিথ্যে, ঠাকুমা, মিথ্যে। সবিতা সে মেয়ে নয়। তা হ'লে সে জগদীশের সঙ্গে কাশী যেতেও আপত্তি করত না।·· ও ওদেরি বিষ-উদ্গীরণ; আমি বিশ্বাস করি না। তুমি অনুমতি দাও!···বাপের অপরাধে কেন ও জীবনটাকে এমনি ভাবে নষ্ট করবে? ওর বাপ পারত—একটা পাথরের মূর্ত্তি বিয়ে করে চির-জীবন কাটিয়ে দিতে? কোনো পুরুষ পারে?

ঠাকুমা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, যা' খুসী করগে ভাই, আমায় কিছু বলিসনে। গাঁয়ে থাকতে হ'বে, সমাজ মানব না—এ' কোন্‌দিশি কথা? আমায় কাশী পাঠিয়ে দে' সতীশ!

ভাবিয়াছিলাম, ঠাকুমার আপত্তি হইবে না। তাঁহার শেষ কথাটায় স্পষ্ট বোঝা গেল, সবিতার প্রতি স্নেহ যে তাঁর কিছুমাত্র নাই এমন নয়; তবে গ্রামের অধিকাংশ বর্ষিয়সীদের মতই সমাজ-ভয়টা তাঁহার তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী!

ঠাকুমার কথার কোনো উত্তর দিলাম না। সোজা বাহির হইয়া পড়িলাম ষ্টেশনের পথে। বনমালী বাড়ী ফিরিতেছিল, দেখা হইয়া গেল।

বলিলাম, বনমালী-দা, সবিতাকে আমি বিয়ে করতে চাই, তোমার আপত্তি আছে?

বনমালী হৃষ্ট মনে কহিল, আপত্তি কিসের? এ যে স্বপ্নের কল্পনা সতীশ! বোনের বিয়ে দেব, সুখী করব—এ' সাধ কার না হয়। তবে, সমাজ মত দিলে হয়!

বলিলাম, সমাজে আমার প্রয়োজন নেই। শুধু তুমি মত দাও—

বনমালী কহিল, ভেবে দেখি। কাল খবর দেব। এত চট্‌পট্ কিছু বলা সম্ভব নয়।

পরদিন সকালে, মাঘের অনতি-তপ্ত রৌদ্র-ধারার প্রতি চাহিয়া কত-কিই ভাবিতেছিলাম!

জীবনের বারটা বৎসর উভয়ে একই সঙ্গে কাটাইয়াছিলাম; তার পর দীর্ঘ বারটা বৎসরেরই ব্যবচ্ছেদ! এক দিন ছুটীতে হয় ত খেলাঘর পাতিয়া বউ-বর সাজিয়াছিলাম; হয় ত সবিতা নিতান্ত ছেলেমানুষী মন লইয়া সেদিন আমার গলায় মালা দিয়া প্রণাম করিয়াছিল; কিন্তু আমি তার সবটুকুই ভুলিয়া ডাক্তার হইয়া বসিয়াছিলাম। তার পর নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সেদিন যখন তাহার সহিত দেখা হইয়া গেল, সবিতা সেদিন আমার অন্তরে অনেকখানি বিস্ময় জাগাইয়া তুলিল, অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া লইল। যেন, অণুর আড়ালে অনন্তের সহিত পরিচয় হইয়া গেল।

সবিতা যে এতকাল আমারই পথ চাহিয়া, আমারই

প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল—ইহাই বা কে ভাবিয়াছিল! তাহার কোনো আচরণই আজ আমার কাছে অস্পষ্ট নয়। প্রভাত হইতেই প্রত্যাশা করিতেছিলাম, কখন বনমালী সংবাদ দিতে আসিবে। কিন্তু বনমালী আসিল না ; আসিল একটী ছোট মেয়ে ছোট্ট একখানি চিঠি লইয়া। সে চিঠিও বনমালীর নয়, তার বোনের।—

সতীশ-দা,

তোমায় পাওয়া যে আমার কত বড় কামনার ফল তা হয় ত আমার পাষাণ-স্বামীটিও জানেন না। এককালে, কত সন্ধ্যা, কত দুপুর দুটীতে এক সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। তুমি ত' এতদিন সে সব ভুলেই ছিলে। কিন্তু আমি বুঝি ভুলি নি। প্রভাত-সন্ধ্যায় নারায়ণ-শিলাকে প্রণাম করতে গিয়ে তোমায় দেখেচি। মনকে কতবার বুঝিয়েচি, এ তোর ক্ষেপামী! সে কোথায়, আর আমি কোথায়! কিন্তু সেদিন দেখা হ'ল, তুমি এলে। অনেক কথাই সেদিন বলতে পারতুম, বলি নি। অনেক কাল রাত্রে দাদার মুখে শুনলুম⋯ ⋯কিন্তু তুমি কি আজও বড় হ'বে না সতীশ-দা? সমাজের পাষাণ ভিতে মাথা খুঁড়ে মরাই যে আমাদের জন্ম নেওয়ার একমাত্র সার্থকতা। দিন যে আমাদের এমনি করেই কাট্‌বে—বিধাতা পুরুষের ইচ্ছা! অমৃত-নদীর দুই তীরে দুই জনে বসে থাকব আমরা—স্পর্শ করতে পারবো না, কাছে আসবো না।

সমাজের ভয় আমিও বড় করি না। কিন্তু দাদাকে ত' ভুলতে পারি না সতীশ-দা। আমাদের এই বিবাহ দাদার সামাজিক অবস্থা কতদূর সঙ্কীর্ণ করে তুলবে—ভেবে দেখেচো? পৈতৃক ভিটে ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে স্বীকৃত হ'লেন না।

দুঃখ করো না সতীশ-দা,—পাওয়াটাই ত' সব চেয়ে বড় সুখ নয়! আমি চির-জীবন শুধু চেয়েই যাব তোমায়!

শুধু একটী অনুরোধ, রাখবে কি?

পারো ত' বিয়ে করো না।

আমি যেমন অবিবাহিত, অথচ, কুমারীও নয়, তুমিও তেমনি থেকো। সবিতা।

চিঠি শেষ করিয়া মেয়েটীকে আর দেখিতে পাইলাম না!

মামলা-মকদ্দমা পড়িয়া রহিল। সেই দিনই কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসিলাম।

* * * *

তার পর জীবনের উপর দিয়া ঝড়-ঝঞ্ঝার অনেকগুলি দিনই ত' বহিয়া গেল। যৌবনের রৌদ্র-দীপ্ত অঙ্গনে আজ গোধূলির ধূসর ছায়া নামিয়াছে। সবিতার সে দিনের অনুরোধ আজও আমার মনে আছে। কিন্তু তার সেই অনুরোধের গুরুত্ব হয় ত সে দিন সে বুঝে নাই! হয় ত নিতান্ত উচ্ছ্বাসের মুখেই সেটা লিখিয়া থাকিবে। তবু অবহেলা সেটাকে আজও করিতে পারি নাই। বোধ করি, মস্ত ভাবুকতা!

দেহ কতদিন বিদ্রোহ করিয়াছে, ও মিথ্যা, ও আতি-শয্য। মন তবু সম্মতি দিল না, একটী প্রভাত ও একটী সন্ধ্যার স্মৃতি বুকে আমার অক্ষয় হইয়া রহিয়া গেল। তুচ্ছ পরমাণু আমার কাছে অনন্তের মত মহান হইয়া উঠিল।

বিশ বৎসর সবিতাকে দেখি নাই, সংবাদও লই নাই। মাঝে মাঝে মনে হয় জানাইয়া দিই—আজো তার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে পারি নাই।

কিন্তু সেটা নিতান্ত বাহুল্য বোধেই জানানো হয় না।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মাথুর পদাবলী

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্‌-এ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুথি সংগ্রহে হাত দিয়াই গোড়ার দিকেই ফরিদপুর জেলার পালদহ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে দুই খানা পুথি উপহার পাইলাম। দুখানাই আধুনিক অল্প দামের একসারসাইজ বুকের মত; মধ্যে শেলাই করা। মনোরঞ্জন বাবু জানাইলেন, পুথি দুখানা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত পাঠকের সম্পত্তি ছিল। পাঠক, অর্থাৎ কথক—পূর্ব্ববঙ্গে কথককে পাঠক বলে। খুলিয়া দেখিলাম, কথকতার পুস্তকই বটে। এক এক বিষয় লইয়া এক একটি পালা রচিত হইয়াছে; এবং তাহাতে নানা অলঙ্কার যুক্ত করিয়া পালাগুলিকে বেশ জমকালো করিয়া তোলা হইয়াছে। স্থানে স্থানে উদ্ভট শ্লোক উদ্ধৃত আছে। স্থানে স্থানে কবিতায় বা গদ্যে দুই একটি খণ্ড বর্ণনা উদ্ধৃত আছে। নারদের আগমন সূচক একটু গদ্য বর্ণনার নমুনা দেখুন:—

আজানুলম্বিত মত্তগজ শাবক সুন্দর দণ্ড প্রকাণ্ড ভুজদণ্ড মণ্ডিত মকর প্রভাকর প্রাতঃকালোদিত রবিমণ্ডলালঙ্কৃত বদনার বন্দ সাঙ্গোপাঙ্গ ভুযাঙ্গ জটাজুট ঘটাছটাতে দিগদিগান্তকার শাসন পূর্ব্বক মালব মল্লার মঙ্গল মালশী আখাড়ি সাহিনী কানড়া কেদার ললিত পঠমঞ্জরি প্রভৃতি নানা রাগরাগিণীতে শ্রীকৃষ্ণ গুণোৎকীর্ত্তন পূর্ব্বক অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তৈলঙ্গ ছোলঙ্গ নেপাল বৈশ্য মাহেশ্বরী কাশী কাঞ্চী অবন্তি হস্তিনা কান্যকুব্জ প্রভৃতি নানা দিগ্দেশ অতিক্রমণ কৈর্যা নারদ গোস্বামী আগমন করিতেছেন॥!

বানান সংস্কৃতানুযায়ী করিয়া দিতে হইয়াছে। ইহার পরই প্রভাতে পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া গান করার এক ভয়ঙ্কর বর্ণনা আছে—তাহা হইতে পাঠকগণকে রেহাই দিলাম। পুথি দুইখানার অধিকাংশই একই হাতের লেখা, ছোট আকারের খানার ক্রমিক নম্বর ১৫, বড়খানার ক্রমিক নম্বর ১৬। একখানা পুথি আর একখানার নকল বলিলেই হয়। তবে বিভিন্ন জিনিসও কিছু কিছু আছে। কোন পুথিতেই পৃষ্ঠাঙ্ক নাই। ১৬ নম্বর পুথিখানার শেষ দিক হইতে গণিয়া ৪১ পৃষ্ঠায় একটি সমাপ্ত আছে ১২১৩। পুথি দুই খানা এই বৎসর লেখা হইয়াছিল ধরিলে, উহাদের বয়স বর্ত্তমান ১৩৩৪ সনে ১২১ বৎসর হইয়াছে।

উপরোদ্ধৃত ভয়ঙ্কর গদ্যের নমুনা ছাড়া অনেক রসাল পদ্য রচনা সংগ্রহও পুথি দুইখানিতে আছে। তাহাদের মধ্যে যদুনন্দনের অনেকগুলি পদ, গোবিন্দদাসের কয়েকটি পদ, সনাতন নামক এক কবির কতকগুলি পদ, লোচনদাসের নিমাই সন্ন্যাস ইত্যাদি পড়িয়া বেশ ভাল লাগে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য ঐ গুলি নহে; দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত মাথুর পালার ১৩টি পদ উভয় পুথিতেই আছে। ঐ পদগুলিই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং উহাদের আলোচনাই আরম্ভ করিব।

গত পূজার বন্ধে পুথির খোঁজে বরিশাল জেলার উত্তরাংশে ভ্রমণ করিতে করিতে বিখ্যাত চন্দ্রশ্রী বা চাঁদশী গ্রামের নিকটস্থ রামসিদ্ধি গ্রামে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র শীল কবিরাজের ঘরে এক স্তূপ পুথির মধ্য হইতে বাছিয়া চণ্ডীদাসের মাথুর পদাবলীর একখানা ১০ পাতার পুথি লইয়া আসি (ক্রমিক নং ১৫৮৯)। মিলাইয়া দেখা গেল, পূর্ব্ব-প্রাপ্ত পুথি দুখানিতে পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের যে পদাবলী পাইয়াছিলাম, রামসিদ্ধির পুথিতেও অবিকল সেই পদগুলি ধৃত হইয়াছে। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতেও এই পদগুলি দেওয়া আছে। তবে আমার প্রাপ্ত পুথির পদগুলির বিশেষত্ব এই যে ঠিক যে আকারে কীর্ত্তনীয়াগণ এই পদগুলি মধ্যে মধ্যে আখর বা কথা ও ধুয়া দিয়া গাহিত, সেই পদ-বহির্ভূত আখর ও ধুয়াগুলিও মৎপ্রাপ্ত পদগুলিতে দেওয়া আছে। নীলরতন বাবুর সংগ্রহ বীরভূমে, আর আমার সংগ্রহ ফরিদপুর, বরিশাল জেলায়। অথচ এই অতি দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে সংগৃহীত পদাবলীর পাঠে চমৎকার মিল আছে। আবার পাঠান্তরও এমন কতকগুলি পাওয়া যাইতেছে, যাহাতে বুঝা যায় যে, কীর্ত্তনীয়া-মহলে এই পদগুলির দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলন ছিল—বিভিন্ন গায়কের স্মরণশক্তি-ভ্রংশে এই পাঠান্তরগুলি দাঁড়াইয়াছে। আমার প্রাপ্ত তিনখানা পুথি মিলাইয়া আমি পদগুলির সম্পাদন করিলাম এবং আমার উদ্ধৃত পাঠ দিয়া, ফুটনোটে নীলরতন বাবুর পাঠ দিলাম। নীলরতন বাবুর পাঠের অনেক গুরুতর ত্রুটী আমার প্রাপ্ত পাঠ দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে। আবার আমার প্রাপ্ত পাঠেরও অনেকগুলি মারাত্মক ত্রুটী নীলরতন বাবুর পাঠ দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিয়াছে।

রাগ গড়া

সুবল কহেন কমল লোচন
কহ কহ এক বোল। ১
মধুপুর দূর যাইতে বলহ
ছাড়ি মায়া মোহ কোর॥ ২

কথা।

সুবল কান্দিয়া বলিতেছে হারে ভাই কানাই, সব রাখাল পরিত্যাগ

কর‍্যা ব্রজ পরিত্যাগ কর‍্যা মথুরাতে গমন কর‍্যাছিস্ এত দুঃখে জীব না হে। ধ্রু। অখন দাড়ায়ে মোর প্রাণের ভাই। সুবলের আর কেহ নাঞি।১ তাহা শুন্যা কৃষ্ণ কি বলিতেছেন তাহা শ্রবণ কর ভাই।

সুবলের কান্ধে কর বেয়াপিত (১)
অঙ্গে নব রস (২) আশে। ৩
বল বল ভাই মুখ পানে চাঞি
ঘুচাও সুচনা (৩) ক্লেশে। ৪
তোমার হিয়াতে সঙ্গত (৪) হৃদয়
তিলেক নাহিক ছাড়া।
হাসি রস মুখে বিদায় করহ
তোহে মোহে (৫) প্রেম বাড়া। ৬

কথা।

হায়ে সুবল ভাই আর দুঃখ ভাবিয় না আর কান্দিয় না। ধ্রু। আমি যথায় তথায় যাঞি। আছি য়ে তোমার ঠাঞি।

আর এক কথা বড় হয় (৬) ব্যথা
শুনহ সুবল ভাঞি। ৭
নবীন কিশোরী ও বর কামিনী
বরঙ্গ রমণী রাই। ৮
হায়ে ভাই দেখ দেখি হায়ে কুলের কামিনী রাই।
আমা বই কিছু জানে নাঞি। ধ্রু।
ভাল মন্দ কিছু তে হোঁ না জানয়
কেবল আমাতে প্রীত। (৭) ৯
গোপত বেকত কহিবারে নহে
তোমারে কহিয়ে হীত। (৮) ১০
হায়ে দেখ সে যে কুলবতী রামা আমা বিনে প্রাণে জীবে না।
মরম বেদনা তুমি সব জান
কহিব (৯) গোপত কথা। ১১
কি আর বাধব (১০) গতি অতি দূর (১১)
এই সে (১২) মরমে ব্যথা। ১২
কখন না জানে বিরহ বেদনা
আন বিরগতি (১৩) দূর। ১৩
এবে অগোচর গোচর না হয় (১)
যাইব মথুরা পুর। ১৪

কথা।

হায়ে সাধের কমলিনী আমার। ৭
সে যে দুঃখের বেদন জানে না।

১। আরোপিয়া। ২। আলিঙ্গন রস। ৩। শোচনা। ৪। সদয়। ৫। মোহ। ৬। শুন হয়ে। ৭। চিত। ৮। রীত। ৯। কহিল। ১০। কি হব রাধায়। ১১। গতি দূর এই ১২। সে মোর। ১৩। আনবি রহতি। ১৪। নয়

জানি বা যখন (১৫) বিরহ বেদন
মরমে পসিবে (১৬) যবে। ১৫
দশমী দশায় পাছে দরশায়
উঠয়ে (১৭) অন্তরে সন্তে। ৮।১৬
দুঃখে হবে দশ দশা প্রাণে জিতে নাহি আশা। ৯
কোন ছল রসে সিঞ্চিবেহ (১৮) শেষে
তুসিবে (১৯) আনহি ছলে। ১৭
মরমে বেদন কহিল কারণ
দীন চণ্ডীদাসে বলে ১।১৮

১। ১—বলিতেছেন। ৩—কচ্ছেন। উদ্ধৃত পাঠ ২য় পুথির।

২। ১—সদয়। ৩—সদত। উদ্ধৃত পাঠ ২য় পুথির।

৩। ২—৩, 'আমা বিনে জিবে নাঞি'।

৪। ১—২ পুথিতে বানান—কিষায়, ৩—কিয়ায়।

৫। মূলে 'দুর'।

৬। ১—বিরহতি। ২—৩, বি অতি।

৭। তিন পুথিতেই—'আমা'।

৮। ১—'উঠয় অন্তর সন্তে'।

৯। এই ধ্রুব কলিটি ২—৩ পুথিতে নাই।

পদগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝিবার চেষ্টা নীলরতন বাবু সর্ব্বদা করেন নাই। এ গুলি অনেক স্থলেই অবশ্য সহজবোধ্য; কিন্তু স্থানে স্থানে সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল অথবা দূর-দূরান্তের প্রচলনজনিত পাঠ-বিভ্রাটে, সঙ্গত অর্থ ধরা কঠিন হয়। যেমন প্রথম কলি দুইটিই দেখুন। সুবল কৃষ্ণকে একটি কথাও বলিতে সাধিতেছে। "যাইতে বলহ" কথার অর্থ যদি নীলরতন বাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে (চণ্ডীদাস—২৭৭ [পৃষ্ঠা]) "যাইবে বলিতেছ" ও ধরা যায় তবে—এই দুইটি কলির অর্থ দাঁড়ায় এই যে—হে কৃষ্ণ তুমি মায়া মোহের যোগ ছাড়িয়া দূর মধুপুরে যাইবে বলিতেছ—অন্ততঃ একটি কথাও বলিয়া যাও। কেমন যেন খাপছাড়া ও অরসাত্মক বাক্য।

তৃতীয় কলির মদ্ধৃত পাঠ "অঙ্গে নবরস আসে" অপেক্ষা নীলরতন বাবুর পাঠ "আলিঙ্গন-রস আশে"—ঢের বেশী সঙ্গততর।

চতুর্থ কলির "ঘুচাও সূচনা বা শোচনা ক্লেশে" স্পষ্টার্থ নহে। সূচনা=ভূমিকা ক্লেশ ঘুচাও? অনুশোচনা ক্লেশ ঘুচাও?

পঞ্চম কলিতে মদ্ধৃত "সঙ্গত" নীলরতন বাবুর "সদয়" হইতে সঙ্গততর।

১২শ কলিতে আমার পাঠ এবং নীলরতন বাবুর পাঠ, দুটারই অর্থ করা যায়। নীলরতন বাবুর পাঠের সঙ্গততর অর্থ হয়।

১৫শ কলির মদ্ধৃত পাঠই সঙ্গত, নীলরতন বাবুর পাঠ একেবারেই

১৫। কখন। ১৬। পশিল। ১৭। এ উঠে। ১৮। সে। ১৯। হাসিবে।

অসঙ্গত। অর্থ বোধ হয় এই যে কখনও বিরহবেদন কাহাকে বলে সে জানে না, অতিদুর গমনজনিত যে বিরহ তাহার কথা দূরেই থাক্।

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠান্তরগুলির আলোচনা করিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যাইবে।

রাগ ধানসী

একথা শুনিয়া গদ গদ হৈয়া
পড়িলা চরণ (২০) ধরি। ১
কোথা যাবে (২১) ভাই কানাই (২২) বলাই (২৩)
হিয়া (২৪) বিদারিয়া (২৫) মরি (২৬) ॥২
বলহ বচন বচন (২৭) সচন (২৮)
নিশ্চয় মথুরা যাবে। ৩
গোকুল আকুল আকুল (২৯) করিয়া (৩০)
সভার পরাণ নিবে ॥ ৪

কথা ॥

কৃষ্ণের নিঠুর কথা শুন্যা রাখাল সভে দুঃখে কাতর হৈয়া। ধ্রু। কানাইর রাঙ্গা চরণ ধরি। ভুমে যায় গড়াগড়ি। হারে ভাই নিশ্চয় সভাকে পরিত্যাগ কর্য্যা। ধ্রু। তুমি হবা দুর দেশি প্রাণে মার্য্যা সব ব্রজবাসী। তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলে। ধ্রু। কান্দিও না সুবল ভাই। বিদায় দে মথুরা যাঞি।

কহ কহ ভাই সুবল সাঙ্গাতি
বিদায় করহ মোরে। ৫
পড়িল অবনী মুরুছা খাইয়া
সব জন আখি (৩১) ঝোরে ॥৬
কান্দয়ে করুণে বিরস বদনে (৩২)
শ্রীমুখ পানেতে (৩৩) চাঞা।৭
ধুলায় ধুসর (৩৪) বালক সকল
বড়ই বেদনা পাঞা ॥ ৮
ধাইয়া দোহায় (৩৫) নীল পীতবাস (৩৬)
ধড়ার আচল ধরি। ৯
কোথা যাবে ভাই কানাই বলাই
হিয়া বিধরিয়া মরি ॥১০

কথা ॥

কানাইর নিঠুর কথা শুন্যা। ধ্রু। রাখাল [সবে] বলে মরি। ছাড়্যা জায় ব্রজের হরি। ব্রজের বালক বলে। ধ্রু। কে বাজাবে মোহন বেণু। কার সনে চরাব ধেনু।

উঠ উঠ ভাই সব সখাগণ
কান্দিয়া নাগর রায়। ১১
ধরণী লোটায় (৩৭) কান্দে উভরায় (৩৮)
দ্বিজ চণ্ডিদাসে গায় ॥২॥ ১২

১। "বলহ বচন····· নিবে" পর্য্যন্ত দুই চরণ ২—৩ পুথিতে নাই।

২। প্রথম পুথিতে—'সকল।'

৩। তিন পুথিতেই 'সাক্ষাতে'। মূলে বোধ হয় আমার ধৃত পাঠই ছিল

৪। ১—পুথিতে 'নিঠুর' কথাটি নাই। ২—৩ পুথিতে প্রথম ধ্রুব কলিটি নাই।

এই পদে ২য় কলিটিতে নীলরতন বাবুর পাঠ একেবারে ভিন্ন। পড়িয়া মনে হয় যে পাঠই মূল পাঠ হউক, অপর কীর্ত্তনীয়া তাহা ভুলিয়া গিয়া একটা সঙ্গত পাঠ যোজনা করিয়া দিয়াছে।

তৃতীয় কলিতে আমার উদ্ধৃত "বচন সচন" স্থলে নীলরতন বাবু ধরিয়াছেন "সচল সঘন" দুটাই প্রায় সমান অসঙ্গত। সচন=সত্য ধরিলে আমার পাঠ সঙ্গততর হয়।

নবম কলিতে আমার পাঠ সঙ্গততর, নীলরতন বাবুর পাঠে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পড়িলেই শুধু ছন্দ রক্ষা হয়।

দ্বাদশ কলিতে পাঠান্তরও কীর্ত্তনীয়ার-স্মৃতি-ভ্রংশজনিত বলিয়া মনে হয়।

রাগ জয়শ্রী।

সভার করেতে ধরিয়া রোহয়ে (৩৯)
রসিক নাগর কান। ১
উঠ উঠ বলি সঘনে কহেন
তোমরা আমার প্রাণ ॥ ২
১
এ বোল বলিতে নন্দের নন্দন
সকল বালক মিলি। ৩
(৪০) ভাইর করেতে কর আরোপিয়া (৪১)
সভে আলিঙ্গন করি ॥ ৪

কথা ॥ এই বল্যা সব রাখাল বলে হারে কানাই আমার।
ধ্রু ॥ একবার কর আলিঙ্গন দুঃখ কর নিবারণ ॥

কেহ লুটি ভুমে কেহই ভ্রমে
কেহত ধাওই দুরে। ৫
কেহ প্রেমরসে ভাইর অতিবাসে (৪২)
ঐ ন রাখিয়া ধরে। ৬

২০। ধরণী। ২১। নিদান করিয়া। ২২। হিয়া। ২৩। ব্যথা দিয়া। ২৪। যাবে। ২৫। সবে। ২৬। পরিহরি। ২৭। সচল। ২৮। সঘন। ২৯। করিয়া। ৩০। সকল। ৩১। হিয়া। ৩২। সব সখাগণে। ৩৩। বদন চেয়ে। ৩৪। ধরণী পড়িল। ৩৫। ধরিয়া শ্যাম। ৩৬। নীল বসন।

৩৭। প্রবোধ বচন। ৩৮। করিল তখন। ৩৯। ধরিয়া। ৪০। ভেয়ের। ৪১। পসারিয়া। ৪২। রহাইবা (?)

কেহ বলে ভাই কানাই বলাই
এবে সে নিঠুর ভোলা। ৭
গোকুল নগরে এতদিনে মোরে (৪৩)
শোকের সায়রে দিলা ॥ ৮

ধ্রু। নিঠুর হরি কানাই ভাঞি ডাকে হেন বান্ধব নাই।
আমরা নিবেদিনু শ্রীচরণে জীব না গোবিন্দবিনে।

কান্দিয়া বিকল আকুল সকল
শ্রীমুখ নিরখে সদা। ৯
চণ্ডিদাসে বলে পড়িয়া ভূতলে
সকলে হইল বাধা ॥ ৩ ॥ ১০

১। ১,—এ বল। ২—৩, এতেক।

ষষ্ঠ কলিতে নীলরতন বাবুর সন্দিগ্ধ ভ্রষ্ট পাঠ স্থলে আমার পুঁথিতে চমৎকার সঙ্গত পাঠ আছে। অন্যান্য পাঠান্তর বিচারযোগ্য নহে।

রাগ বড়ারি।

এত বলি যত বালক মণ্ডল
শ্রীমুখ পানেতে চাঞা। ১
কেহ বলে ভাই (৪৪) নিঠুর হইলা (৪৫)
বল্যা পড়ে মুরছিয়া ॥ ২ (৪৬)
ছল ছল বারি[১] চতুর মুরারী
(৪৭) উঠল রথের পরে। ৩
হেন কালি (৪৮) সব গোপিনী ধাওল
পাইয়া নিশ্চয় স্বরে[৩] ॥ ৪ (৪৯)

কথা॥ শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরে গমন করিছে এহাই শুন্যা সব ব্রজবধূ।

ধ্রু। গৃহ কাজ পায় ঠেলি। ধাঞাছে গোবিন্দ বলি॥

কথি যাবে ছাড়ি অবলা রমণী
মোদভা সঙ্গেতে নেহ। ৫
কিবা কুল ভয় (৫০) হেন মনে লয় (৫১)
এই সে কানন গেহ ॥ ৬ (৫২)

কথা॥ গোপী কান্দিয়া বলিয়াছেন[৪] হারে বন্ধুয়া।

ধ্রু। যদি যাও ব্রজ ছাড়ি। আমার নেও সঙ্গে করি॥

লেহ বাড়াইয়া নিদান করিয়া (৫৩)
স্ত্রীবধ পাতক (৫৪) সারা। ৭
মধুপুর দেশ (৫৫) চল হৃষিকেশ (৫৬)
এই সে তোমার ধারা ॥ ৮

৪৩। মেনে। ৪৪। কেহ কান্দে ভাই। ৪৫। ভাই ভাই বলি।
৬। পড়ে মূরছিত হয়ে। ৪৭। উঠব। ৪৮। বেলে। ৪৯। সরে (?)
০। কিবা আর সাধ। ৫১। সব হল বাদ। ৫২) এই সে কারণে গেহ।
৩। করিলে। ৫৪। পাতকী। ৫৫। দেশে। ৫৬। যাইবে ছাড়িয়া।

ধ্রু। হারে রসিক মুরলী ধারী।
তুমি বধ্যা যাও অবলা নারী॥

এত ছিল মনে লেহ কৈলা কেনে
অবলা রমণী সনে। ৯
কেহ আর দেখহ মথুরা গমন
দীন চণ্ডিদাস ভনে॥ ৪ ॥ ১০

১। ২—৩, 'কেহ বলে ভাই কানাই বলাই'।

২। ১—'বাণী'। ২,—'বাম্নী'। ৩,—বাসী। 'বারি'ই বোধ হয় সঙ্গত পাঠ। চোখে জল ছল ছল করিতেছে—কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানে না যাইয়া উপায় নাই।

৩। ২,—নিশ্চয়ে স্বরে। ৩,—নিশ্চয়েস্বরে। ১,—নিশ্চয় স্বরে। আমি নিশ্চয় স্বরে পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। অর্থ,—যখন এই স্বর=জনরব নিশ্চয়=সত্য বলিয়া জানা গেল।

৪। প্রথম পুঁথিতে এইটুকু নাই।

৫। ১,—'যাবে কি ছাড়িয়া'।

ষষ্ঠ কলিতে নীলরতন বাবুর পাঠ সঙ্গততর এবং কি রকমে পাঠ পরিবর্ত্তিত হয় অথচ ধ্বনি তখনও যথাসম্ভব ঠিক থাকে তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

রাগ কাফি।

রাধা বোলে শুন রসিক নাগর
আমার (৫৭) কোন বা গতি। ১
তুমি দয়ানিধি সব পরিহরি
রাখিয়া চলহ কথি ॥ ২
প্রেম বাড়াইলে অমিয়া সিঞ্চিলে
করিলা অনেক সুখ। ৩
কে জানে এমন তোমার ধরম
পরিণামে দিলে দুঃখ ॥ ৪

ধ্রু। ছাড়িয়া যাবার[১] ছিল মনে।
তবে প্রেম বাড়ালি কেনে॥

নাহি লব সাথ (৫৮) ওহে (৫৯) যদুনাথ
সঙ্গে না গোড়াঞা যাব (৬০)। ৫
এ দুঃখে এখনে (৬১) তোমার বিহনে
কেমন করিয়া রব ॥ ৬
শাশুড়ি তাপিনি ননদী পাপিনি
তাহা সে সকলি জান। ৭

৫৭। মোর সে। ৫৮। মোরে লেহ সাথ। ৫৯। শুন। ৬০। সাথ গড়ায়া যাব। ৬১। এবে সে।

তোমারি চরণে[২] এ দেহ সপ্যাছি

তাহে নিদারুণ কেন[৩] ॥ ৮

কথা ॥ হারে বন্ধু আমি তোদের সঙ্গে ধা্ঞা যাইতে নারিব। তুমি—

ধ্রু ॥ নিঠুর[৪] যাবা মধুপুরে।

কমন কর্যা রব ঘরে ॥

যে দুঃখের দুঃখী আমি।

সে দুঃখের বেথিত তুমি ॥ ৫

মাধব তোমাতে সপ্যাছি দেহ।

আমার নাই কেহ ॥ ৬

তোমা না দেখিলে তিলেক না জীব

মরিব তোমার গুণে। ৯

এমত পিরিতি নাহি দেখি কথি

দীন চণ্ডিদাসে ভনে ॥ ৫ ॥ ১০

১। ২—৩ পুথি হইতে গৃহীত। ১,—হারে শ্যাম তুমি ছাড়্যা যাও আগে। সুধা প্রেমে বান্ধ্যা মোরে ॥ ফেল্যা যাও হে ব্রজের পাথারে ॥

২। ১,—'দেহেতে'। ৩। ২—৩, 'নিকরুণ'।

৪। ১,—নিঠুর হঞা।

৫। এই ধ্রুব কলি দুইটি শুধু প্রথম পুথিতেই আছে।

৬। এই কলিটি শুধু ২—৩ পুথিতে আছে।

পাঠ বিকৃতির চমৎকার দৃষ্টান্ত ৫ম কলির নীলরতন বাবু ধৃত পাঠে আছে।

রাগ করুণ শ্রী।

১ (৬২) প্রাণনাথ বন্ধুয়া আদরে।

২ (৬৩) কে বা কি বা (৬৪) কহিবারে পারে ॥

৩ সেহ যদি হইব উদাস।

৪ ইহ দেহে তবে কিবা আশ ॥

৫ যদি তুমি কৈলা এমনি দশা।

৬ ছাড়িলাম জীবনের আশা ॥

৭ (৬৫) এত যদি ছিল তোর মনে।

৮ (৬৬) তবে প্রেম বাড়াইলে কেনে ॥২

৯ (৬৭) একে মরি গৃহ পরিবাদে।

১০ (৬৮) যথা তথা তোমার বিবাদে ॥

১১ (৬৯) মরিব গরল বিষ খাঞা।

১২ (৭০) কাজ নাহি এ তনু রাখিয়া ॥

ধ্রু ॥ আগে কৈলা কলঙ্কিনী।

এখন কৈলা কাঙ্গালিনী ॥

যদি, ছাড়্যা যাবি প্রাণ কাল।

জীয়ন হৈতে মরণ ভাল ॥

১৩ চণ্ডিদাসে কহে বিচারিয়া।

১৪ কাজ নাহি এ তনু রাখিয়া ॥ ৬ ॥

১। ১—'ছাড়িলাম' কথাটির পূর্ব্বে 'এতদিনে' আছে। ২—৩ পুথিতে এই দুই চরণকে ধ্রুব কলি করা হইয়াছে।

২। পূর্ব্বের পদটিতে এই দুইটি চরণই প্রায় অবিকল ভাবে ধ্রুব কলি রূপে ২—৩ পুথিতে গৃহীত হইয়াছে।

৩। ১,— 'এ দেহ ধরিয়া'।

১ মরিব যে তার নাহি দুঃখ।

২ সবে না দেখিব চান্দ মুখ ॥

৩ (৭১) এই শোক (৭২) তোমার বিরহে ॥

৪ (৭৩) এ দেহ কেমনে সুখে (৭৪) রহে ॥

৫ (৭৫) রাধা রাধা (৭৬) কে আর ডাকিব।

৬ (৭৭) শুনি ধনি সে সুখে বাঁচিব ॥ (৭৮)

৭ সহিল মোছিল দুঃখ জোর। ২

৮ পিঞ্জরের পাখী বৈরি মোর ॥

ধ্রু ॥ যদি ছাড়্যা যাবি গুণের শ্যাম।

কে শুনাবে বেণুর গান ॥

পাখী লবে কৃষ্ণ নাম।

কেমনে বাঁচিব প্রাণ ॥

৯ ঘন ঘন ডাকে এই নাম।

১০ কেবল বোেথিবে রাধা শ্যাম ॥

ধ্রু ॥ হারে শ্যাম ব্যথিত বিনে।

দুঃখ বলব কার স্থানে ॥ ৩

১১ না জানি সপিল দেহ তোর।

১২ এবে তুমি দিয়া যাবা কার ॥

১৩ (৭৯) ফেলাইলা সমুহ কণ্টকে।

১৪ (৮০) এ দুঃখ কহিব আর কাকে ॥

১৫ (৮১) নিদারুণ হত মাধাঞি।

১৬ (৮২) কাতরে শরণে আছে রাই ॥

১৭ (৮৩) দীন হীন চণ্ডিদাসে গায়।

১৮ (৮৪) কান্দি পহু ধরাণ না যায়। ৭ ॥

৬২। নী—১ ৬৩। নী—২ ৬৪। ইহা ৬৫। নী—৫ ৬৬। নী—৬ ৬৭। নী—৭ ৬৮। নী—৮ শাশুড়ী ননদী কৈল আধে। ৬৯। নী—৩ ৭০। নী—৪।

৭১। নী—৯ ৭২। তাহে ভেল ৭৩। নী—১০ ৭৪। কতেক সহয়ে তার দেহে। ৭৫। নী—১১ ৭৬। বলি ৭৭। নী—১২ ৭৮। সুখ পাইব। ৭৯। নী—১৩ বিধি বড়ি নিদারুণ ভেলি। ৮০। নী—১৪ মহা দুখ সায়রে পশারি। ৮১। নী—১৫ নিকরুণ মহত। ৮২। নী—১৬ শরণ পশিয়া ছিল। ৮৩। নী—১৭। ৮৪। নী—১৮ কান্দে।

১। ১,—"মরিবেন তার কিবা দুঃখ।"

২। সহিয়া গিয়াছে যে দুঃখ এবং প্রায় মুছিয়া গিয়াছে যে স্মৃতি তাহাই আবার বৈরি পিঞ্জরের পাখীর মুখে শ্যাম নাম শুনিয়া দ্বিগুণ শক্তি লইয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে।

৩। ২—৩—পুথিতে পরবর্ত্তী চারি ছত্রের পরে আছে।

নীলরতন বাবুর ৬২৩ নং একটি মাত্র পদের বস্তু এবং আমার ৬ ও ৭ নং পদের বস্তু এক। পদের পাঠ যে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়,—কতক কীর্ত্তনীয়ার গুণে এবং কতক লিপিকারের গুণে, এই তিনটি পদ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে সেই সম্বন্ধে চমৎকার শিক্ষা লাভ হয়।

আমার ৬ নং পদটিতে ১৪ ছত্র আছে, ৭ নং টিতে ১৮ ছত্র আছে, উভয়েই পৃথক ভনিতা আছে। প্রথম পদ হইতে উলট পালট করিয়া মাত্র ৮ ছত্র লইয়া এবং দ্বিতীয় পদটির মধ্যে মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া ভণিতা শুদ্ধ ১০ ছত্র গ্রহণ করিয়া নীলরতন বাবুর ৬২৩ নং পদ গঠিত।

আমার দুইটি পদে এবং নীলরতন বাবুর পদটিতে যে কয় ছত্রে মিল আছে তাহাতেও নানারূপ পাঠ-বৈষম্য আছে।

২য় পদের ১৫শ ছত্রে এবং নীলরতন বাবুর পদেরও ১৫শ ছত্রে—আমার পাঠ "নিদারুণ হত সাধাক্রি" এবং নীলরতন বাবুর পাঠ "নিদারুণ নহত মাধাই" পাঠ পরিবর্ত্তনের চমৎকার উদাহরণ, সম্ভবতঃ লিপিকারের কীর্ত্তি।

[এই প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।]

পুরাতনী

(৭)

ভারতে পোর্ত্তুগীজ স্মৃতি

শ্রীহরিহর শেঠ

পোর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি যে সকল পাশ্চাত্য জাতিরা এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের আগমনের আর কিছু নয়, কেবল এদেশ হইতে নিজ দেশে অর্থ ও পণ্য লইয়া গিয়া নিজ দেশকে সমৃদ্ধ করা। কিন্তু লইতে আসিলেও তাঁহারা আমাদের দিয়াছেনও অনেক কিছু; তন্মধ্যে পোর্ট্তুগীজদের দানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহারা কবে হুগলী তথা বাঙ্গালা হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজও তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের ভাষা, পোষাক, পরিচ্ছদ, রীতি, তাঁহাদের গির্জ্জা, এমন কি তাঁহাদের রক্ত পর্য্যন্ত এদেশে রহিয়া গিয়াছে।

পোর্ত্তুগীজরা এখানে যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহাদের ভাষাগত শব্দ এবং তাঁহাদের আনীত বৈদেশিক বিবিধ দ্রব্য-সম্ভারই প্রধান। যে যে দেশ হইতে উহা আসিয়াছে, উহাদের নাম সেই দেশের ভাষা বা কথা হইলেও, পোর্ত্তুগীজদের দ্বারাই সে সব নাম এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। তাঁহাদের এদেশে অবস্থিতিকালে তাঁহাদের ভাষা অনেকাংশে স্থানীয় ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল; এমন কি, পোর্ত্তুগীজ-শক্তি এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবার বহুদিন পর পর্য্যন্তও তাঁহাদের ভাষা অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতিদের সাধারণ কথোপকথনের ভাষার মধ্যেই ছিল। তাঁহাদের ভাষার অনেক কথা শুধু বাঙ্গালা নয়, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, আসামি, এমন কি, ইংরাজি ও এসিয়ার অন্যান্য দেশ-সমূহের ভাষা মধ্যেও স্থান পাইয়াছে।

পোর্ত্তুগীজদের প্রভাবে এদেশে অনেক ভৌগোলিক নামও প্রচলিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ইয়োরোপীয় জাতিগণ সে সকল নাম ব্যবহার করিলেও, এখন বাখরগঞ্জের ডমমাণিক্ দ্বীপ, চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বন্দর, ঢাকার ফিরিঙ্গি বাজার, হুগলীতে ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি কতিপয় স্থান ভিন্ন তাহা আর অন্যত্র তেমন প্রচলিত নাই। বর্ত্তমান স্থাপত্য-শিল্প মধ্যেও যে পোর্ত্তুগীজ প্রভাব রহিয়া গিয়াছে, ইহা ভারতের বহু স্থানে তাঁহাদের নির্ম্মিত ভজনালয় ও বাসভবনগুলি হইতেই জানিতে পারা যায়।

পোর্ত্তুগীজরা বহু ভাল ভাল ফল ও ফুলের গাছ অন্যত্র হইতে আনয়ন করিয়া ভারতকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সেই সকলের এবং যে সব পোর্ত্তুগীজ শব্দ এদেশে ভাষার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে, তাহার একটি তালিকা দিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

পোর্ত্তুগীজদের দ্বারা আনীত ফল ও ফুলের গাছ। সফেদা—ইহার আদি স্থানও আমেরিকা।

বাঁশকেওড়া, বিলাতী আনানস্—ইহার আদি স্থানও আমেরিকা।

হিজলি বা কাজু বাদাম—ইহা দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্রথম আইসে। চট্টগ্রাম ও ভারতের এবং লঙ্কার সমুদ্র-কূলবর্ত্তী জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

আনারস ইহা ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল হইতে বঙ্গদেশে আনীত হয়।

আতা ও নোনা—কানিংহামের মতে এই ফল দুইটি এদেশের; কিন্তু ওয়াট্ এবং হব্‌সন্ জব্‌সন্ বলিয়াছেন, ইহা পোর্ত্তুগীজদের দ্বারা এদেশে আইসে।

মাঠ কলাই বা চিনের বাদাম—আফরিকা ও আমেরিকা হইতে ইহা আনীত হয়।

শেয়ালকাঁটা।

বিলম্বি—সম্ভবতঃ মালাক্কা হইতে ভারতে আনীত হয়। ব্যাণ্ডেলের পোর্ত্তুগীজ গির্জ্জায় অনেকগুলি এই গাছ এখনও দেখা যায়।

কামরাঙ্গা।

লাল বা গাচ মরিচ, লাল লঙ্কা মরিচ—পারনামবুকো হইতে আনীত হয়।

পেঁপে।

মনসা।

কমলালেবু, নরেঙ্গি বা নারেঙ্গা—ইহার সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ইহা এদেশেরই গাছ। ইহা পূর্ব্ব হইতেই যদিও ভারতে থাকে, পোর্ত্তুগীজদের দ্বারাই বিশেষরূপে এদেশের সর্ব্বত্র ইহার বিস্তার হয়।

জামরুল—ইহা মালাক্কা হইতে ভারতে আনীত হয়।

নীলও পোর্ত্তুগীজদের দ্বারা আনীত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

রাঙ্গা আলু ও আলু (সাদা) আফরিকা বা ব্রেজিল হইতে আইসে এবং পোর্ত্তুগীজরাই সম্ভবতঃ এদেশে আনয়ন করেন।

বাগভেরেণ্ডা—কথিত আছে ইহাও পোর্ত্তুগীজদের দ্বারা আনীত হয়।

কৃষ্ণকলী—১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে ইহা পোর্ত্তুগীজদের দ্বারা আনীত হয়।

তামাক—১৫১৮অব্দ প্রথম ডেকানে আনীত হয় এবং আনুমাণিক ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান জেলালুদ্দিন আকবরের রাজত্বের শেষাংশ হইতে তামাকু সেবন এদেশে আরম্ভ হয়।

পেয়ারা—আমেরিকা হইতে আনীত।

কুচিলা—পোর্ত্তুগীজ জেসুট্ পাদ্রিদের দ্বারা ভারতে আনীত হয়।

গাঁদা ফুল।

ভুট্টা বা জনার—ইহাও উহাদের দ্বারাই আনীত।

পোর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে।

পোর্ত্তুগীজ কথা	বাঙ্গালা
Acabar	কাবার
Ananas	আনারস
Aia	আয়া
Armario	আলমারি
Bacia	বাসন
Biscoito	বিস্কুট
Baixel	বজরা
Botas	বোতাম
Cadeira	কেদারা
Cafe	কাফি
Canhao	কামান
Alcatrao	আলকাতারা
Alfinete	আলপিন
Anona	নোনা
Ata	আতা
Bafo	বাষ্প
Balde	বালতি
Botelha	বোতল
Catatua	কাকাতুয়া
Camisa	কামিজ
Cha	চা
Boia	বয়া
Chapa	ছাপ
Cocha	কোচ
Cauve	কপি
Deus	দেব
Festa	ফেস্তা
Forma	ফর্ম্মা
Grade	গরাদে
Igreja	গির্জ্জা
Janela	জানালা
Leilao	নিলাম
Padre	পাদ্রি
Pera	পেয়ারা
Pistola	পিস্তল
Quaresma	কর্জ্জ
Sabas	সাবান
Tobaco	তামাক
Toalha	তোয়ালে
Verdi	বেরদি
Viola	বেয়ালা
Chave	চাবি
Gompaso	কম্পাস
Cristao	খৃষ্টান
Fita	ফিতা
Funil	ফুনি[illegible]
Gudao	গুদাম
Ingles	ইংরাজ
Lanterna	লণ্ঠন
Limao	লেবু
Mesa	মেজ (টেবিল)
Papaia	পেঁপে
Peru (Turkey)	পেরু
Prego	পেরেক
Resto (Fund)	রেস্তো
Saia (Gown)	সায়া
Toca (To note down)	টোকা
Varanda	বারান্দা
Ispada	ইস্পাত
Verga	বরগা

পোর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে আসামি ভাষায় আসিয়াছে।

পোর্ত্তুগীজ কথা	আসামি কথা
Achar	আচার
Fita	ফিতা
Pato	পাতিহাঁস

ompasso	কম্পাস
have	চাবি

বাঙ্গালা ভাষাতেও এ সব কয়টি কথা আছে। পাতিহাঁস পোর্ত্তুগীজ খা হইতে আসিয়া থাকিতে পারে কিন্তু সংস্কৃত হংস হইতে আসাই ম্ভব। আসামি ভাষা মধ্যে আরও বহুসংখ্যক পোর্ত্তুগীজ কথা াওয়া যায়।

পোর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে উড়িয়া ভাষায় আসিয়াছে।

ার্ত্তুগীজ কথা	উড়িয়া কথা
amara	কামরা
alano	ফলনা
agu	সাগু
astul	মাস্তুল

পোর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে হিন্দুস্থানী ভাষায় আসিয়াছে।

ার্ত্তুগীজ কথা	হিন্দুস্থানী কথা
asta (enough)	বাস্
orma (mould)	ফর্ম্মা
Martelo	মার্ত্তুল্
Policia	পুলিশ্
Capitao	কাপতান্
Lampada	লম্প
Mestre	মিস্ত্রী
Prato (Plate)	পরাত্

বোধ হয় একমাত্র 'মার্ত্তুল' কথাটি ভিন্ন অন্য সকল কথাগুলিই বঙ্গভাষাভাষীর নিকট পরিচিত। মার্ত্তুল অর্থে হাতুড়ি বুঝায়।

যে গ্রন্থ হইতে উল্লিখিত তালিকা লিখিত হইল তাহাতে আরও অনেক কথা আছে। তালিকা ভারাক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। ইংরাজি ভাষা মধ্যে যে সব পোর্ত্তুগীজ কথা প্রবেশলাভ করিয়াছে, এই গ্রন্থে তাহারও একটি বিশদ তালিকা দেওয়া আছে। *

* History of the Portuguese in Bengal (by J. J. A. Campos) নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

প্রচ্ছন্ন

শ্রীরাধারাণী দত্ত

তুমি মোর চিত্তে আছ বসন্ত-বাতাস যথা
মর্ম্মে জাগে শীত—বনানীর,
জানে না অরণ্য তার বিটপী পল্লব লতা
কাঁপে কার স্পর্শে ঝির্ ঝির্!
জানে না অবোধ পুষ্প কে ভাঙাস তন্দ্রা তার
উষার অস্ফুট-লগ্ন কালে,
প্রভাত-রৌদ্রের করে জাগার আনন্দ ভার
কে ছোঁয়াল সুপ্তিমগ্ন ভালে!
নিবিড় আঁধার-ঘন মুদিত-কোরক মাঝে
গন্ধ যবে কেঁদেছিল তার,
একবিন্দু কৃপাকণা দেয় নাই রক্ষীরা যে
বন্ধ-আঁখি ফুল-বালিকার!
মৌনবাক্-বন্দিনীর নিঃশব্দ-ক্রন্দন-সুর
শুনেছিল কে পাতিয়া কাণ,
কোন্ মায়াবীর স্পর্শে দৃঢ়-কারাকক্ষ-পুর
টুটিয়া হইল খান্ খান্!
কমল-কুঁড়ির মর্ম্ম-নিলীন সৌরভ সম
মোর চিত্তে সত্তা জাগে তব,
নিবিড় গোপন তবু আভাসেই মনোরম,
সমাহিত, গভীর নীরব।
অরূপের রূপ-রেখা চিত্রিছ এ চিত্তপটে
হে নীরব! হে গোপনচারি!
সূর্য্যাস্ত-বরণচ্ছটা মনোতটিনীর তটে
স্তরে স্তরে বিভাসে সঞ্চারি'!
রক্ত-অশোকে'র গুচ্ছ আপনার করে বন্ধু!
উপহার দেছ যার হাতে,
মর্ম্মে যদি ঝরে রক্ত, তবু সে শোকের বিন্দু
পরিবেশিবে না তব পাতে!
এমনি গাহিব গান বাহিব তরণী সুখে
চাহিব না কোনও কিছু চাওয়া,
চলিয়াছি দিশাহীন নিরুদ্দেশ-অভিমুখে
পালে লাগিয়াছে পুবে-হাওয়া!
বনের মর্ম্মর-গানে অশ্রু-বিজড়িত সুর
শুনি ঘন বেদনা-করুণ
সবুজ পত্রের পুঞ্জ ক্রন্দনেই পরিপূর
নীল নভঃ ব্যথায় অরুণ!
চঞ্চল বসন্ত হাওয়া কাঁপে পুষ্পগন্ধ বহি'
তারও প্রাণে বিপুল শূন্যতা,
বিরহ-ব্যাকুল পিক্ কেঁদে ওঠে রহি' রহি'
ঝরে কণ্ঠে নিরাশ-ক্ষুণ্ণতা!
বিশ্বের বেদনা-বীণে আমার ব্যথার মীড়
মিলাইয়া করিয়াছি লীন,
দিবসের শ্রান্ত পাখী সাঁঝে কি লভিবে নীড়
সুশীতল, উত্তাপ-বিহীন?

খোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

থাকোহরির উন্মনস্কতা ও কৃষ্ণকলির উপর বিরাগ হয় তো পরাণ-বাবু ও মাতঙ্গিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, কিন্তু একদিন হঠাৎ অতি স্থূলাঙ্গী মাতঙ্গিনী হার্টফেল্ ক'রে মারা গেলেন। সমস্ত সংসার শোকাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। সকলে মনে কর্‌লে থাকোহরির বিষণ্ণতার কারণও কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আকস্মিক মৃত্যু।

পরাণ-বাবু পত্নীবিয়োগে বিহ্বল হয়ে পড়্‌লেন। তিনি কৃষ্ণকলিকে নিয়ে তেতালার ঘরে যে আশ্রয় নিয়েছেন, সেখান থেকে আর বাহির হন না। দলে দলে লোক আসে সমবেদনা দেখাতে। পরাণ-বাবু কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না, সকলে হতাশ ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে ফিরে চ'লে যায়। তাঁর কাছে একমাত্র যেতে পারে থাকোহরি; সেই তাঁকে সময়-মতো নাওয়ায় খাওয়ায়। কিন্তু কৃষ্ণকলিকে দেখ্‌লেই থাকোহরির গা শিউরে ওঠে, এবং থাকোহরির বিরাগ-ছন্ন মুখ দেখ্‌লে কৃষ্ণকলিও স্বস্তি অনুভব করে না। থাকোহরিও নিতান্ত কাজ না পড়্‌লে পরাণ-বাবুর কাছে ঘেঁষে না। থাকোহরি স্বেচ্ছায় যতোটুকু সময় তাঁর কাছে অতিবাহিত করে তার বেশী এক মিনিটও পরাণ-বাবু থাক্‌তে অনুরোধ করেন না। কেবল কৃষ্ণকলি চোখের আড়াল হ'লে তিনি ব্যাকুল ও চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাই কৃষ্ণকলিকে তার চিড়িয়াখানা সমেত সেই তেতালার বৃহৎ ঘরে পিতার শোকের বেষ্টনে বন্দিনী হ'তে হয়েছে।

আপিসের জরুরী কাগজপত্র যে-কোনো কর্ম্মচারী নিয়ে এসে থাকোহরিকে দেয়; থাকোহরি পরাণ-বাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে কোন্‌টা কিসের কাগজ বুঝিয়ে দিতে চাইলে তিনি বলেন—ও-সব আমি এখন দেখ্‌তে শুন্‌তে চাইনে; তুমি আর মুখুজ্জে মশায় দেখে শুনে যা হয় কোরো; কেবল আমাকে কি কর্‌তে হবে বলো···কেবল সই ক'রে দেওয়া ছাড়া আর আমি কিছু কর্‌তে পার্‌বো না।

থাকোহরি সই করিয়ে কাগজপত্র ফিরিয়ে নিয়ে যায়, নীরবে দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে।

রামযাদু যখন শুন্‌লে যে কর্ত্তা কাগজপত্র কিছু দেখেন না, অমনি সই ক'রে দেন, তখন সে থাকোহরিকে বল্‌লে—দেখো ভায়া, তোমার সাম্‌নে মস্ত প্রলোভনের পথ খোলা প'ড়ে রয়েছে, খুব সাবধান! কর্ত্তাকে দিয়ে এখন তুমি যা খুশী তা করিয়ে নিতে পারো, তিনি টেরও পাবেন না; কিন্তু সে প্রবৃত্তি মনের কোণেও ঠাঁই দিয়ো না। কৃষ্ণকলিকে তোমার পছন্দ হয় না, কিন্তু জীবনে ক'টা জিনিসই বা পছন্দসই হয়?

রামযাদুর উপদেশের বক্তৃতা শুনে থাকোহরি চুপ ক'রে থাকে, কিন্তু তার মন জ্বল্‌তে থাকে।

একদিন সকালে পরাণ-বাবু প্রাতঃকৃত্য সমাধা ক'রে প্রতীক্ষা কর্‌ছেন নিত্যকার মতন আজও থাকোহরি এসে তাঁর চা খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেলো, তবু থাকোহরির দেখা নেই; থাকোহরির প্রাত্যহিক নিয়মিত আগমন কয়েক দিনেই পরাণ-বাবুর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো, আজ তার ব্যতিক্রম হওয়াতে তাঁর পত্নীর মৃত্যু তাঁর জীবনে যে বিরাট্ অভাব সৃষ্টি ক'রে গেছে, সেইটা যেনো আজ অধিকতর উৎকট হয়ে তাঁর মনের সাম্‌নে এসে দেখা দিলো। তাঁর পত্নী দিনের পর দিন সমান ভাবে দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর নিয়মিত নিরলস সেবা ক'রে গেছেন; আর তাঁর অভাবের এই যোলো দিনের দিনই অপরে ক্লান্ত হয়ে পড়্‌লো! জীবনের তো এখনও হয় তো অনেকখানিই বাকী; চাওয়ার আগে পাওয়ার আনন্দ জীবন থেকে ঘুচে গেলো, এখন প্রত্যেক বস্তু চেয়ে চেয়ে তবে পেতে হবে। কিন্তু তাঁর নিজের জীবন তো পরমায়ুর অনেকখানি পথ অতিক্রম ক'রে এসেছে, কৃষ্ণকলির তো সবে যাত্রা শুরু! তার জীবনের অভাব মোচন কর্‌বে কে? পরাণ-বাবুর মনে এই প্রশ্ন উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরও উদয় হলো—কৃষ্ণকলির জীবনের অভাব মোচন কর্‌বে তাকে সব চেয়ে যে ভালোবাস্‌বে···তার স্বামী! কোষ্ঠীতে বলেছে কৃষ্ণকলি স্বামী-সোহাগিনী

সৌভাগ্যবতী হবে। পরাণ-বাবু নিদ্রিতা কন্যার ললাটে আপনার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন কর্‌লেন, ব্যথিত পিতৃ-অন্তরের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ যেনো তার মাথায় ঢেলে দিলেন; তাঁর দুচোখ দিয়ে সন্তাপের অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

কৃষ্ণকলি কপালে পিতার হস্তস্পর্শ পেয়ে ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলে হাস্‌তে গিয়েই দেখ্‌লে বাবার চোখে জল। তার আর হাসা হ'লো না, সে তাড়াতাড়ি উঠে দুই হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধর্‌লে। পরাণ-বাবু তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে হাস্‌তে চেষ্টা ক'রে বল্‌লেন—ঘুম ভাঙ্‌লো মা-জননীর? তোমার ছেলেরা যে খাবার জন্যে ছটফট কর্‌ছে, তোমার প্রসাদ পাবে ব'লে ব্যস্ত হয়েছে।

কৃষ্ণকলি স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে কাকাতুয়া আর খর্‌গোশের দিকে দেখ্‌লে।

পুরাতন ভৃত্য বোঁচা বড়ো একখানা আংটা-দেওয়া থালায় করে চা দুধ পাঁউরুটী জেলী সন্দেশ ইত্যাদি নিয়ে সেই ঘরে এসে প্রবেশ কর্‌লে।

বোঁচাকে দেখেই পরাণ-বাবু প্রশ্ন কর্‌লেন—হরি-বাবু কোথায় রে?

বোঁচা খাবারের থালা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে হাতের জিনিসের দিকেই দৃষ্টি রেখে বল্‌লে—তিনি তাঁর মাকে নিয়ে কাল রাত্রে বাড়ী গেছেন।

পরাণ-বাবু আশ্চর্য্য হয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—বাড়ী গেছে? কেনো?

বোঁচা এইবার পরাণ-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—তা তো জানি নে।

পরাণ-বাবু চিন্তিত ও দুঃখিত হয়ে চুপ ক'রে রইলেন; তাঁর মনের মধ্যে একটা টানা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়্‌লো—খাকোহরি বাড়ী গেলো, কিন্তু একবার আমাকে ব'লে গেলো না।

পরক্ষণেই তিনি সে চিন্তা মন থেকে সরিয়ে ফেল্‌লেন, তাঁর বিষণ্ণ হবার অবসর নেই, তিনি বিষণ্ণ হলে কৃষ্ণকলি বিষণ্ণ হয়, তিনি জোর ক'রে হেসে বল্‌লেন—এসো মা অন্নপূর্ণা, তোমার সন্তানদের প্রসাদ বিতরণ করো।

কৃষ্ণকলি খাট থেকে বাবার গলা ধরে ঝুলে নীচে নেমে প'ড়ে বল্‌লে—মাষ্টার মশায় বাড়ী চলে গেছে, বেশ হয়েছে বাবা। আমি ওকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি নে; আমি ওর সঙ্গে জন্মের মতন আড়ি ক'রে দিয়েছি!

পরাণ-বাবুর চিত্ত কন্যার কথা ভাবী স্বামীর প্রতি অনুরাগব্যঞ্জক অনুমান ক'রে সুখাবেশে পরিপ্লুত হয়ে উঠ্‌লো। তাঁর মনে হলো—গিন্নি যদি এদের দুজনের মিলনটা দেখে যেতে পার্‌তেন, তা হলে আমার আর এতো ক্ষোভ হতো না। এখন তো এক বৎসর বিয়ের প্রতিবন্ধক পড়্‌লো। আমি দেখে যেতে পার্‌লে হয়। আকৈশোরের জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীকে ছেড়ে কি আমিই বেশী দিন বাঁচ্‌বো?

তাঁর অবর্ত্তমানে কৃষ্ণকলিকে কে দেখ্‌বে শুন্‌বে এই চিন্তা পরাণ-বাবুর মনে উদ্গত হতে যাচ্ছিলো, এমন সময় কৃষ্ণকলি বল্‌লে—বাবা, তুমি চা ঢালো, আমি চট্‌ ক'রে মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি।

পরাণ-বাবু মায়ের যত্ন দিয়ে মেয়ের আহার্য্য প্রস্তুত কর্‌তে মনোনিবেশ কর্‌লেন।

একটু পরেই কৃষ্ণকলির চিড়িয়াখানার মধ্যে পরাণ-বাবুর সমস্ত চিন্তা হারিয়ে গেলো। পিতা কন্যার সঙ্গে তার খেলায় যোগ দিলেন।

বেলা দশটার সময় বোঁচা এসে খবর দিলে মুখুজ্জে মশায় কাগজপত্র সই করাতে এসেছেন।

কৃষ্ণকলি বল্‌লে—তুমি চট্‌ ক'রে কাজ সেরে নাও বাবা, আমি ততোক্ষণে নেয়ে আসি। নইলে তুমি নাইতে কলঘরে ঢুক্‌লে আমার নাইতে দেরী হয়ে যাবে।

কৃষ্ণকলি লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। রামযাদু একতাড়া কাগজপত্র হাতে ক'রে নিয়ে ঘরে এসে ঢুক্‌লো—তার মুখ অত্যন্ত ম্লান বিমর্ষ, কিন্তু ছোটো ছোটো চোখ দুটো ধারালো ছুরীর ফলার ডগার মতন ভারী বেশী উজ্জ্বল চক্‌চক্ কর্‌ছে।

রামযাদু ঘরে ঢুকেই বল্‌লে—খাকোহরি বাবাজী হঠাৎ বাড়ী চলে গেছেন; আমাকে চিঠি লিখে গেছেন আপিসের কাগজপত্র গুলো আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি সকাল-বেলাতেই এলাম······

পরাণ-বাবুর শোকার্ত্ত চিত্ত এখন একটুতেই অধিক ব্যথিত হয়; খাকোহরি বাড়ী যাওয়ার খবরটা রামযাদুকে

দিয়ে গেলো, কিন্তু তাঁকে দিয়ে যেতে পার্‌লে না, এতে পরাণ-বাবুর মন অভিমানের বেদনায় টনটন ক'রে উঠ্‌লো। তিনি থাকোহরির প্রসঙ্গ মাত্র উত্থাপন না ক'রে কাগজপত্রে সই ক'রে দেবার জন্য ফাউন্টেন-পেন খুলে নিলেন। রামযাদু প্রত্যেক কাগজের কেবল সই কর্‌বার জায়গাটা খুলে খুলে পরাণ-বাবুর সাম্‌নে ধর্‌তে লাগলো, আর পরাণ-বাবু কোন্ কাগজে কি আছে না দেখে-শুনেই সই ক'রে যেতে লাগলেন। রামযাদু কিন্তু মাঝে মাঝে পরাণ-বাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌ছিলো কোন্ চিঠি কাকে কোন্ কাজের জন্য লেখা হয়েছে। রামযাদু কতকগুলো চিঠিপত্র সই করিয়ে নিয়ে এক তাড়া কাগজের শেষ পৃষ্ঠাটা পরাণ-বাবুর সাম্‌নে খুলে ধর্‌লে; সেই সময় তার হাত দুখানা একটু কাঁপ্‌লো, চোখ দুটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো; কিন্তু পরাণ-বাবু সই ক'রে দিয়ে পরবর্ত্তী কাগজে সই কর্‌বার প্রতীক্ষায় কলম তুলে নিতেই রামযাদুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি ক্ষিপ্র হস্তে সেই কাগজগুলো সরিয়ে কতকগুলো বিল্ ইন্‌ভয়েস্ পরাণ-বাবুর সাম্‌নে ধ'রে দিলে, সেগুলো সই হ'লে রামযাদু আবার পূর্ব্বের ন্যায় একতাড়া কাগজের শেষ পৃষ্ঠাটা পরাণ-বাবুর সাম্‌নে ধর্‌লে; এবং পরাণ-বাবু সেটাতে না দেখে সই ক'রে দিলেন। তার পর রামযাদু কয়েকখানা চেক সই করিয়ে নিতে লাগলো; এবং পরাণ-বাবুর সই কর্‌বার অবসরে সে নিজের সাফাই স্বরূপ ব'লে যেতে লাগলো কোন চেকে কতো টাকা কোন পাওনাদারকে দেবার জন্য সে পরাণ-বাবুর স্বাক্ষর নিচ্ছে।

সমস্ত কাগজপত্রে পরাণ-বাবুর সই হয়ে যেতেই রামযাদু সমস্ত কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং বল্লে—এখন তবে আসি, আপিস যেতে হবে······

পরাণ-বাবু উদাস ভাবে বল্‌লেন—আচ্ছা।

রামযাদু ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়েই দুটি তাড়া ডেমি কাগজে লেখা দলিল কাগজপত্র থেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিয়ে ভাঁজ ক'রে নিজের কোটের ভিতরকার বুকপকেটে পুরে রাখ্‌লে। তার পর আবার পরাণ-বাবুর ঘরের দিকে ফিরে চল্‌লো।

রামযাদুকে প্রত্যাবৃত্ত হ'তে দেখে পরাণ-বাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে তাকালেন।

রামযাদু ঘরে প্রবেশ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো—থাকোহরি আমাকে একখানা চিঠি লিখে গেছে; সে চিঠিখানা আপনার দেখা দরকার। কিন্তু এখন আপনার মানসিক অবস্থা যে রকম্ তাতে মানসিক উদ্বেগ অশান্তি বৃদ্ধি হয় এমন বিষয় আপনার কাছে উপস্থিত করতেও ইচ্ছা হয় না, কষ্টও হয়।

পরাণ-বাবু কোনো উদ্বেগ প্রকাশ না ক'রে ধীর ভাবেই বল্‌লেন—হরির চিঠি কই? দেখি······

রামযাদু পকেট থেকে একখানা চিঠির মুখ-ছেঁড়া খাম বাহির ক'রে পরাণ-বাবুর হাতে দিলে।

পরাণ-বাবু খাম হাতে নিয়ে দেখলেন যে চিঠি ডাকে পাঠানো। তিনি খামের ভিতর থেকে চিঠি বাহির কর্‌তে কর্‌তে রামযাদুকে বল্‌লেন—বসুন।

রামযাদু মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—আজ্ঞে থাক্ আমাকে এখনই যেতে হবে······

পরাণ বাবু আর কিছু না ব'লে থাকোহরির চিঠি পড়তে লাগলেন—

শ্রীচরণকমলে

ভক্তি-কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ অসংখ্য প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন, মহাত্মন্, আপনার কাছে আমি অশেষ প্রকারে উপকৃত। আপনা হতেই আমার যতো কিছু উন্নতির সূত্রপাত, কর্ত্তার আশ্রয় পেয়ে আমি বর্ত্তে গিয়েছিলাম। কিন্তু কর্ত্তা আর গিন্নি-মা আমাকে অহেতুক স্নেহ করেন নি, তাঁদের স্বার্থবুদ্ধি তাঁদের স্নেহকে ক্ষুণ্ণ খর্ব্ব ক'রেছিলো,—তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের বিদিকিচ্ছি কুচ্ছিত মেয়েটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা কন্যাদায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে ও আমার জীবন-টাকে চির-অভিশপ্ত কর্‌তে। তাঁরা বুঝেছিলেন যে তাঁদের ছিরি-ছাঁদ-বিহীনা কন্যাকে অগাধ টাকার লোভেও কেউ সহজে বিবাহ কর্‌তে চাইবে না, লোভে প'ড়ে বিবাহ কর্‌লেও তার স্বামী কোনোদিন তাকে ভালো বাস্‌তে পার্‌বে না। তাই তাঁরা বাড়ীতে পোষা আমারই ঘাড়ে ঐ দুর্দ্দৈব চাপাতে সঙ্কল্প ক'রেছিলেন, মনে ক'রেছিলেন বহু দিনের একত্র বাসের ফলে তাঁদের কন্যার বীভৎস কুশ্রীতা আমার অভ্যাসের বশে সহ্য হয়ে যাবে এবং আমি কন্যার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভক্তিকে কন্যার প্রতি প্রীতিতে পরিণত ক'রে ফেল্‌বো, কিন্তু তাঁদের সেই উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়াতে

তাঁদের এই স্বার্থবুদ্ধির' চাণক্যনীতি আমার মনকে বিরূপ ও তিক্ত ক'রে তুলেছিলো ; আমার মনের কৃতজ্ঞতা বিরাগে পরিণত হয়েছিলো। আমি কোনো রকমে মনোভাব দমন ক'রে ছিলাম, কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে তা গোপন কর্‌তে পারি নি। আপনি বোধ হয় আমার মনের ভাব জান্‌তে পেরেই আমাকে বারম্বার বলেছেন কৃষ্ণকলি কালো কুৎসিত হ'লেও তাকে বিবাহ ক'রে ভালোবাসা আমার কর্ত্তব্য। তার পর বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী কটন-মিল আর মেডিকেল কলেজের চুরির মাম্‌লার কথা কাগজে প'ড়ে আমার মগজে যখন নানা রকম চিন্তা জোট পাকাচ্ছিলো তখনও আপনি আমাকে সে-রকম প্রবঞ্চনাময় ...রি কর্‌বার সঙ্কল্প থেকে বিরত থাক্‌বার জন্য বহু উপদেশ ও ...স্ত্রের দোহাই দিয়েছেন ; তাতে ফল হ'লো এই যে আমার ...দ্দেশ্য ও সঙ্কল্প যা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট ছিলো তা আপনার ...থায় আর উপদেশে সুস্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। আমি ...স্থির কর্‌লাম জীবনকে চির-অভিশাপ থেকে মুক্ত কর্‌বার এই ...সুযোগ ত্যাগ করা নৈব নৈব চ। আমি আমাদের আপিসের ...একখানা তুলার বিলের দরুণ ও লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকার ...একখানা চেক কর্ত্তার নামে ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে নিয়েছি ...এবং ইতিমধ্যে বিদেশে যাবার পাস্‌পোর্টও জোগাড় ক'রে ...নিয়েছি। আমি জন্মের মতন ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে ...চললাম ; বিদেশেই মনের মতন সুন্দরী একটিকে বিবাহ করে ...সেই দেশেই বাস কর্‌বো। কোথায় চল্‌লাম সেই কথাটি ...বল্‌বো না ; মাকেও আমার মৎলবের বিন্দুবিসর্গ জানাই নি, ...তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে গেলাম। আমি ...কর্ত্তার কাছে অনেক উপকার পেয়েছি ; তাঁর শোকের ...সময় তাঁকে হঠাৎ এই খবর দিতে পার্‌লাম না ; আপনিই ...অবসর বুঝে তাঁকে জানাবেন। তিনি তো আমাকে তাঁর ...সমস্ত সম্পত্তিই কন্যার সহিত দিতে প্রস্তুত ছিলেন ; আমি ...তাঁর কন্যাটিকে বাদ দিয়ে, তাঁর কাছেই রেখে মাত্র ...যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় নিয়ে স'রে পড়লাম। কর্ত্তা তো অজস্র ...দাতা ; তিনি মনে কর্‌বেন আমাকে টাকাটা দান ...ক'রেছেন ; স্পেকুলেশনে তো টাকা লোক্‌সান হয়, মনে ...করবেন জামাই-ধরা ব্যবসায়ে কিছু টাকা মারা পড়্‌লো। ...আর তাঁকে বল্‌বেন যে না দেখে শুনে কোনো কাগজ-...পত্রে যেনো আর সই না করেন। আমার শেষ প্রণাম কর্ত্তার ও আপনার চরণে জানিয়ে চিরবিদায় নিলাম।

চিরকৃতজ্ঞ থাকোহরি জানা।

পুনশ্চ—আমার বস্‌বার ঘরের দেরাজের ডান দিকের টানার মধ্যে আপিসের কতকগুলো কাগজপত্র আছে বা'র ক'রে যথাবিহিত ব্যবস্থা করবেন।—থাকোহরি।

পরাণ-বাবু পত্রখানি পড়া শেষ ক'রে মিনিট খানেক স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইলেন, তার পর আবার পড়তে আরম্ভ কর্‌লেন, তিনি যেনো আপনার দৃষ্টি ও বোধশক্তিকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিলেন না। দ্বিতীয় বার পত্রখানা পড়া শেষ ক'রেও তাঁর সন্দেহ হলো এ কি থাকোহরির লেখা? তিনি নিপুণ পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন যে ঐ হাতের লেখা কি থাকোহরির নিজের, না আর কারো জাল। তাঁর জীবনে তিনি উপকার কর্‌তে গিয়ে অনেক প্রবঞ্চিত হয়েছেন, অনেক অকৃতজ্ঞতার আঘাত খেয়েছেন, কিন্তু এতো বড়ো প্রবঞ্চনাময় অকৃতজ্ঞতা যেনো তাঁর ধারণার অতীত বলে মনে হচ্ছিলো।

পরাণ-বাবুকে নির্বাক্ স্তম্ভিত হয়ে ব'সে থাক্‌তে দেখে রামযাদু কথা বল্‌লে—পুলিসে খবর দিলে এখনও কোনো পোর্টে তাকে ধর্‌তে পারা যায়।

রামযাদুর কথার আঘাতে পরাণ-বাবুর চেতনা যেনো ফিরে এলো ; তিনি চম্‌কে উঠে বল্‌লেন—কাশীর জ্যোতিষী ঠিক গণনা ক'রে ব'লেছিলো থাকোহরির সঙ্গে কৃষ্ণকলির বিবাহ হবে না, তার চেয়ে সৎপাত্রের সঙ্গে হবে। যাক্, বাঁচলাম। টাকার লোভে বিয়ে ক'রে পরে যদি সে কৃষ্ণকলিকে অনাদর অবহেলা কর্‌তো তো সে বড়ো বিষম দুঃসহ ব্যাপার হতো ; সে এখন কেবল টাকাই নিয়েছে, কৃষ্ণকলির জীবনের সুখ তো হরণ করে নি। এর জন্যেই আমি তার উপরে সন্তুষ্ট। মুখুজ্জে মশায়, আপনি লোক-চরিত্রজ্ঞ ; আপনি আমাকে অনেক আগেই সাবধান ক'রেছিলেন ; কিন্তু আমি তখন আপনাকে অতিসাবধানী সন্দিগ্ধচরিত্র মনে করেছিলাম। সেজন্য আমিই দোষী ; থাকোহরির কোনো দোষ নেই।

রামযাদু অল্পক্ষণ অবাক্ হয়ে পরাণ-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বল্‌লে—থাকোহরির দোষ নেই! অতো-

গুলো টাকা আপনি তাকে অম্‌নি ছেড়ে দেবেন! পুলিসে খবর দিলে……

পরাণ-বাবু দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বল্‌লেন—আমি জীবনে সকলের ভালো কর্‌বার, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি কর্‌বারই চেষ্টা করেছি, কাউকে কোনো রকমে উৎপীড়ন কর্‌তে ইচ্ছাও করি নি; জীবনের এই শেষ অবস্থায় যাকে পুত্র-তুল্য স্নেহ ক'রেছি তার পীড়া ঘটাতে পার্‌বো না। যাক সে যেখানে খুশী, সুখে থাকুক।

রামযাদু পরাণ-বাবুর মহত্ত্বের অত্যুচ্চতার নাগাল ধর্‌তে না পেরে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে বল্‌লে—কিন্তু আপিসের এতো টাকা……!

পরাণ-বাবু মুহূর্ত্ত কাল চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন—এখন আপনি এ কথা কাউকে বল্‌বেন না; আমি টাকাটা দু-তিন দিনের মধ্যেই শোধ ক'রে দেবো; ব্যাঙ্কে আমার লাখ দুই টাকা জমা আছে; এই বাড়ীখানার দাম হাজার পঞ্চাশ হবে, আমি আজই দালাল লাগিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা কর্‌ছি, আপনিও একটু চেষ্টা দেখ্‌বেন, দশ পাঁচ হাজার কম হলেও ছেড়ে দেবো; বাঁশতলা গলির বাড়ীটারও দাম বিশ-পঁচিশ হাজার হবে……

রামযাদু আশ্চর্য্য হয়ে ব'লে উঠ্‌লো—তা হ'লে তো আপনার সর্ব্বস্বই গেলো! থাক্‌লো কি?

পরাণ-বাবু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লেন—থাক্‌লো মান, মুখুজ্জে মশায়, থাক্‌লো ইজ্জৎ।

পরাণ-বাবুর এই কথায় রামযাদুর মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হলো না, উল্টে উদয় হলো অবজ্ঞা—লোকটার বৈষয়িক বুদ্ধি যে এতো কাঁচা তা তার আগে জানা ছিলো না। রামযাদু বল্‌লে—কিন্তু পরের চুরির গুনাহ্‌গারী আপনি দিতে যাবেন কেনো? সাহেবদের ব'লে দিন না যে থাকোহরি চুরি ক'রে পালিয়েছে। তার পর তাদের প্রাণ যা চায় তারা করুকগে।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে থাকোহরিকে আমি নিযুক্ত ক'রে দায়িত্বের কাজ দিয়েছিলাম, আমি তার জামিন ছিলাম।

রামযাদু বল্‌লে,—কিন্তু জামানতনামা তো লেখাপড়া কিছু নেই?

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—মুখের কথাও কারো কাছে নেই।

রামযাদু অধিকতর আশ্চর্য্য হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লে—তবে?

পরাণ-বাবু ম্লান মুখে হেসে বল্‌লেন—তবে অ-বলা একটা বোঝাপড়া আছে যে আমার সকল কাজের জন্য আমি দায়ী।

রামযাদু পরাণ-বাবুর মহৎচরিত্রের ধাঁধায় প'ড়ে বল্‌লে—কিন্তু সর্ব্বস্ব খোয়ালে কৃষ্ণকলির জন্য কি থাক্‌বে?

পরাণ-বাবু ক্ষণকাল গম্ভীর হয়ে চিন্তা ক'রে বল্‌লেন—থাক্‌বে তার পিতার সত্য-রক্ষার সুকৃতি, আর আপনাদের দশ জনের আশীর্ব্বাদ। টাকা দিয়ে বর কেন্‌বার সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌লাম। ধনগর্ব্বে মনে ক'রেছিলাম সুখ-সৌভাগ্য প্রীতি-ভক্তিও বুঝি টাকাতেই কিন্‌তে পাওয়া যায়! সে ভুল থাকোহরি ভেঙে দিয়ে গেছে। সন্তান-বাৎসল্য অন্ধ; তাই আমাদের চোখে মেয়ের কুরূপ স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে নি; আজ থাকোহরি সে অন্ধতাও মোচন ক'রে দিয়েছে। মেয়েকে আমি লেখাপড়া শেখাবো, বয়স বেশী হলে বয়োধর্ম্মে সে যদি কাউকে ভালোবেসে তার ভালোবাসা আকর্ষণ কর্‌তে পারে, আর সেই ব্যক্তি যদি কুরূপের অন্তরালে সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়ে আমার মেয়েকে প্রার্থনা করে, তা হ'লে মেয়ের বিয়ে হবে, নয় তো মেয়ে আমরণ কুমারীই থাক্‌বে।……

রামযাদু এ কথার উত্তরে বল্‌বার কিছু খুঁজে না পেয়ে অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পরাণ-বাবু ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন—আচ্ছা, আপনি এখন আসুন মুখুজ্জে মশায়। আমার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত এখন দরকারী।

রামযাদু মুখ কাচুমাচু ক'রে ঘর থেকে বাহির হয়ে চল্‌লো। কিন্তু পরাণ-বাবুর দিকে পিছন ফির্‌তেই তার মুখ উজ্জ্বল ও দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো; ঘরের দরজা পার হয়েই তার মনে হলো—কেওটের পো এইবার কারে প'ড়েছেন! জলের দামে বাড়ী দুখানা বিকিয়ে যাবে। দেখি আমি যদি দাঁও মার্‌তে পারি। আমাকে যে দুখানা বাড়ী ওই দিয়েছে, সেই দুখানা বন্ধক রেখে টাকা তুলে অন্ততঃ একখানা বাড়ী কিনে ফেল্‌তে হবে……তা হলে মাছের তেলে মাছ-ভাজা হবে!

রামযাদু রাস্তায় বেরিয়েই একখানা ট্যাক্‌সি-গাড়ী ভাড়া ক'রে ছুটে চল্‌লো; তার সময় নেই, যথাসম্ভব সত্বর তা'র সব কাজ চুকিয়ে ফেল্‌তে হবে। (ক্রমশঃ)

শিল্প

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ইংরাজিতে Art নামে একটি শব্দ আছে, বাঙ্গলায় তাহাকে সাধারণতঃ শিল্প বলিয়া অনুবাদ করা হয়। শিল্প বলিতে অনেকে কারুকার্য্য-নৃত্যগীতবাদ্য প্রভৃতিই বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু Art কথাটি আরও ব্যাপক। কবিতা, উপন্যাস, নাটক এ সকলই Artএর অন্তর্গত। অতএব শিল্প ও কাব্য উভয়কে একত্র করিলে অনেকটা ইংরাজি Artএর সমতুল্য হয়। Artএর এক কথায় একটা বাঙ্গলা প্রতিশব্দ থাকা দরকার, এবং সচরাচর Art অর্থে শিল্প শব্দের ব্যবহার হয়, এজন্য আমরাও এইরূপ ব্যবহার করিব।

আজকাল পাশ্চাত্য জগতে শিল্প বা Artকে যেরূপ উচ্চ আসন দেওয়া হয়, আর কোনও বস্তুকে সেরূপ উচ্চ আসন দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে শিল্পই জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শিল্প-সৃষ্টি বিষয়ে যে জাতি যত বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছে, তাহার স্থান তত উচ্চে নির্দ্দেশ করা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আজকাল ধর্ম এবং দর্শন অপেক্ষাও শিল্পকে উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ধর্ম একটা সাম্প্রদায়িক ভাব, শিল্প অসাম্প্রদায়িক; অতএব ধর্ম অপেক্ষা শিল্প শ্রেষ্ঠ। দর্শনের তত্ত্ব পাশ্চাত্য-জগতে অল্পসংখ্যক চিন্তাশীল লোকের মধ্যেই আবদ্ধ। ইহা শিল্পের ন্যায় ব্যাপক নহে, শিল্পের ন্যায় ইহা মানবহৃদয়ের অন্তঃস্থলস্পর্শী নহে। শিল্প যেমন নিত্যনূতন সৃষ্টি করে, ধর্ম বা দর্শন সেরূপ করে না। পাশ্চাত্য জগতে শিল্পের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বিজ্ঞান; শিল্প ও বিজ্ঞান উভয়ের স্থানই ধর্ম ও দর্শনের উপরে। কিন্তু বিজ্ঞান অপেক্ষাও শিল্পের আদর অধিক বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য সুধী-সমাজ শিল্পের মধ্যে প্রতিভার যেরূপ সার্থক বিকাশ দেখেন, আর কিছুর মধ্যে সেরূপ দেখেন কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা শিল্পের এই উচ্চ দাবী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। করিবার কারণ এই যে, অন্য পাশ্চাত্য ভাবের সহিত এই শিল্পপূজা আজকাল আমাদের দেশে খুব প্রসার লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহা ভারতের চিরাগত ভাবের অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। ভারতে শিল্পের উপযুক্ত আদর বরাবর আছে। কিন্তু শিল্পকে কখনও ধর্ম ও দর্শনের উপরে স্থান দেওয়া হয় নাই। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম শেক্সপিয়র। নিউটনের স্থান তাঁহার কাছাকাছি। মিল্ ও হার্বাট স্পেন্সরের স্থান অনেক নীচে। ইংলণ্ডের ধর্ম-গগনে এমন কোন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি ইঁহাদের প্রায় সমতুল্য। কিন্তু ভারতে কালিদাস অপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যের স্থান ঊর্দ্ধে, বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্থান ঊর্দ্ধে।

যদিও শিল্প খুব পরিচিত বস্তু, তথাপি শিল্পের সংজ্ঞা (definition) কি তাহা বলা সহজ নহে। এ বিষয়ে মতভেদও অনেক। সাধারণ-প্রচলিত মত এই যে শিল্প অর্থে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। কিন্তু 'সৌন্দর্য্য কি' এ বিষয়ে সকলে একমত নহেন। এক দেশের লোক যে বস্তুকে সুন্দর বলে, অপর দেশের লোক তাহাকে সুন্দর বলে না;—হয় ত কুৎসিত বলে। একই দেশে এক ব্যক্তি যাহাকে সুন্দর বলে, অপর ব্যক্তি তাহাকে সুন্দর বলে না। "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"। চীনদেশে স্ত্রীলোকের পা খুব ছোট হইলে সুন্দর বলে, অন্যদেশে বলে না। সুসভ্য ইংরাজ মহিলার যে পরিচ্ছদ অতিশয় সুন্দর বলিয়া পাশ্চাত্যসমাজে আদৃত হয়, আমাদের দেশে তাহাই অনেকে একান্ত কুরুচির পরিচায়ক বলিবেন। গ্রীস দেশে সুদৃঢ় মাংসপেশীযুক্ত মনুষ্যমূর্ত্তি খুব সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইত, উৎকৃষ্ট শিল্পিগণ সেইরূপ মূর্ত্তি রচনা করিতে নিজেদের প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে অনেকে সেরূপ মূর্ত্তি তত সুন্দর বলেন না, কারণ ইহাতে স্থূলভাব বা পশুভাব বড় বেশী পরিস্ফুট। শিক্ষা, সংস্কার ও প্রবৃত্তির উপর সৌন্দর্য্যবোধ নির্ভর করে। অতএব এক বস্তু সকলের চক্ষেই সুন্দর বা কুৎসিত লাগিবে তাহা বলা যায় না।

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিকে শিল্পের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আর এক আপত্তি এই যে, সব সময় যে সুন্দর বস্তু অবলম্বন করিয়া শিল্প বিকশিত হয় তাহা নহে। অনেক সময় নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি মন্দ চরিত্র অঙ্কিত করিয়াও কবি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেন। হাস্যরস, বীভৎস-রস, রুদ্ররস এ সকল অবলম্বন করিয়া যে শিল্প রচিত হয় তাহার আখ্যানবস্তু সব সময় সুন্দর হয় না। অনেক সময় নিকৃষ্ট বস্তুর সাহচর্য্যে সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য অধিকতর স্পষ্ট হয় তাহা সত্য; কিন্তু সব সময়ে নিকৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি যে এই ভাবেই সার্থক হয় তাহা বলা যায় না। অনেক সময় শিল্পে নিকৃষ্ট বস্তু নিজেই সার্থক হয়।

শিল্পের সংজ্ঞার মধ্যে সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করিলে এই সকল গোল হয় বলিয়া টলষ্টয় অন্যরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। টলষ্টয় বলেন, একজন মানুষের অতীত অনুভূতি ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরের মনে সঞ্চারিত করার নাম শিল্প। কবি কাব্য রচনা করিয়া নিজের অনুভূতি অপরের মনে সঞ্চারিত করেন; চিত্রকর তুলিকার সাহায্যে রেখা এবং বর্ণবিন্যাস করিয়া নিজ মনোভাব সঞ্চারিত করেন; সঙ্গীতকার সুর-লয়ের সাহায্যে করেন; ভাস্কর প্রস্তর খুদিয়া করেন। যে শিল্পীর অনুভূতি যত প্রবল এবং যিনি যত স্পষ্টভাবে নিজের অনুভূতি অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে পারেন, তিনি তত উৎকৃষ্ট শিল্পী।

টলষ্টয়ের সংজ্ঞা অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইলেও ইহার কয়েকটি ত্রুটি আছে। ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে, বুদ্ধি বা কৌশলপ্রয়োগ যে শিল্পরচনায় আবশ্যক তাহা বলা হইল না। একব্যক্তি পত্র লিখিয়া নিজের অনুভূত সুখ বা দুঃখ অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে পারে, কিন্তু সেই পত্রে যদি বুদ্ধি বা কৌশলের কোনও পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে তাহা শিল্প হইবে না। অবশ্য পত্র-লিখন-প্রণালীর মধ্যেও শিল্প-কৌশল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা না থাকিলেও একের অনুভূতি অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া একজনের অনুভূতি অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়; কিন্তু সাধারণতঃ তাহার মধ্যে কোনও শিল্প থাকে না।

টলষ্টয়ের সংজ্ঞায় অপর একটি ত্রুটি এই যে, শিল্পী অনেক সময় যে ভাব নিজে অনুভব করেন নাই, তাহাও অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। উপন্যাস পাঠ করিবার সময় পাঠকের মনে পরবর্ত্তী ঘটনা জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মে। শিল্পী ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠকের মনে এইরূপ কৌতূহল জাগাইয়া শিল্পকৌশলের পরিচয় দেন। কিন্তু এই কৌতূহলের ভাব শিল্পী নিজে অনুভব করেন না, কারণ পরবর্ত্তী ঘটনা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। কোনও গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় পাঠক ঘটনাপ্রবাহ পড়িতে পড়িতে যেরূপ পরিণতি বা উপসংহার প্রত্যাশা করেন, হঠাৎ তাহার বিপরীত পরিণতি বা উপ-সংহার দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে পারে। এইভাবে বিস্ময়রসের সৃষ্টি করিয়া কবি নিজ শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দেন, কিন্তু নিজ অনুভূতির সঞ্চার করেন না, কারণ উপসংহার কি হইবে তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব শিল্পী যে সব সময় নিজ অনুভূত ভাবই সঞ্চার করেন, তাহা ঠিক নহে; কখনও কখনও নিজের অননুভূত ভাবও সঞ্চার করেন।

এই সকল কারণে শিল্পের একটী নূতন সংজ্ঞা খুঁজিতে হয়। বোধ হয় এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলে কোনও আপত্তি উঠিতে পারে না:—যে বস্তু কৌশলপূর্ব্বক রচনা করা হয় এবং যাহা অপরের চিত্ত বিচলিত করে,—তাহাই শিল্প। যিনি যত সহজে যত প্রবলভাবে অপরের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবেন, তিনি তত উৎকৃষ্ট শিল্পী। কৌশল এবং অপরের চিত্ত আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা এই দুইটি বস্তু শিল্পের প্রাণ। দুইটিই থাকা চাই,—নচেৎ শিল্প হয় না। প্রভূত কৌশলসহকারে একটী বস্তু রচনা করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা যদি মানবহৃদয় আকর্ষণ করিতে না পারে, তাহা হইলে শিল্প-হিসাবে তাহা ব্যর্থ। কলকারখানা প্রস্তুত করিতে অনেক কৌশলের প্রয়োজন; কিন্তু সে কৌশলের উদ্দেশ্য অর্থাগম,—মানব-হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য সে কৌশল প্রয়োগ করা হয় নাই; এজন্য কলকারখানাকে শিল্প কার্য্য বলা যায় না। অপর পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া মানব-হৃদয় আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সংবাদ-লেখক কৌশলের পরিচয় না দিলে তাহা শিল্প হয় না।

শিল্প মাত্রই যে ভাল জিনিষ হইবে ইহা বলা যায় না। কারণ মানবের চিত্ত কেবলমাত্র ভাল জিনিষের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। ভাল, খারাপ, এবং না-ভাল-না-খারাপ সকল রকম জিনিষই মানবের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে।

ক্ষমা, দয়া, স্বার্থত্যাগ, কঠিন কর্ত্তব্য পালন,—এ সকলই কৌশলের সহিত বিবৃত হইলে মানবের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে। এই সকল ভাব কল্যাণজনক। আবার ভোগ, ইন্দ্রিয়সুখ-লিপ্সা, প্রতিহিংসা, অহঙ্কার এ সকলও মানব-মন আকর্ষণ করিতে পারে। ইহারা অশুভ। কৌতূহল, নির্দোষ আমোদ এবং হাস্যপরিহাস ইহারাও মানব-হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে। ইহারা ভালও নহে, মন্দও নহে। ক্ষমতাবান্ শিল্পীর হাতে এই সকল ভাবগুলিই শিল্পের আখ্যান-বস্তু হইতে পারে। আখ্যান-বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে শিল্পও শুভ, অশুভ, এবং শুভাশুভত্ব-বর্জিত,—তিন প্রকারের-ই হইতে পারে। কিন্তু অনেকে এই সহজ কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করেন, শিল্পমাত্রই ভাল জিনিষ,—যাঁহারা শিল্প চর্চ্চা করেন, তাঁহারা সকলে একটা মহৎ ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। ইহার ফলে আজকাল শিল্পের জন্য—কাব্য, নাটক এবং চলচ্চিত্র-অভিনয়ের জন্য—প্রতি বৎসর কত কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়, কত লক্ষ লোক আজীবন প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। "...enormous buildings are erected, ...hundreds of thousands of workmen...spend their whole life in hard labour to satisfy the demands of art ...Hardly any other department of human activity, the military excepted, consumes so much energy as this ..... the very lives of men are sacrificed." [Tolstoy, *What is Art ?*]

"শিল্পের দাবী মিটাইবার জন্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হয়, লক্ষ লক্ষ লোক কঠোর পরিশ্রমে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে। শিল্পের জন্য মানবজাতি যে পরিমাণে শক্তি ব্যয় করে, যুদ্ধ ব্যতীত বোধ হয় আর কোনও উদ্দেশ্যে এত শক্তি ব্যয় হয় না। (এই উদ্দেশ্যে) মানবের জীবন পর্য্যন্ত বলি দেওয়া হয়।" [টলষ্টয় প্রণীত পুস্তক "শিল্প কাহাকে বলে ?"] বাস্তবিক এত অর্থ এবং এত পরিশ্রম সবই যে কোনও মহৎ কার্য্য সাধনে ব্যয়িত হয় তাহা নহে। শিল্প লোকের ভাল লাগে, তাই লোকে শিল্পের জন্য এত অর্থ ব্যয় করে। যাহা ভাল লাগে তাহার নাম "প্রেয়"। প্রেয় হইলেই সব সময় শ্রেয় হয় না।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তে ঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

(কঠোপনিষদ্)

"শ্রেয় এবং প্রেয় বিভিন্ন দ্রব্য। ইহারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানবকে বন্ধন করে। যে শ্রেয় গ্রহণ করে তাহার সাধু হয়। যে প্রেয় গ্রহণ করে সে অর্থলাভে বঞ্চিত হয়।" শিল্প "প্রেয়"র অন্তর্গত। তাহার উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন করা। এজন্য শাস্ত্রে কাব্যকে "কান্তাসম্মিত" বলা হইয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যগণ গ্রন্থ সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :—(১) কান্তাসম্মিত,—যেমন কাব্য নাটক (২) সুহৃৎসম্মিত,—দর্শন সমূহ ; এবং (৩) প্রভুসম্মিত,—বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ। কাব্য ও নাটকের উদ্দেশ্য কেবল মনোরঞ্জন করা, এজন্য তাহাকে কান্তাসম্মিত বলা হয়। বেদ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র মানবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রভুর ন্যায় আদেশ করিয়া থাকেন, যে কার্য্য করিতে বলেন তাহা করিবার কারণ সকল সময়ে দেখাইয়া দেন না,—এজন্য বেদ স্মৃতি ও পুরাণকে প্রভুসম্মিত বলা হয়। মানবের কি প্রকারে কল্যাণ সাধিত হইতে পারে দর্শনশাস্ত্রে তাহা নির্দ্দেশ করে, যুক্তি এবং তর্ক দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দেয়। এইভাবে দর্শন সুহৃদের ন্যায় আচরণ করে বলিয়া দর্শনকে সুহৃৎ-সম্মিত বলা হয়।

কাব্য বা শিল্প উৎকৃষ্ট হইলেই তাহা যে কল্যাণপ্রদ হইবে তাহার কোনও মানে নাই। যে শিল্প মানবহৃদয় যত প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিবে শিল্প হিসাবে সে তত উৎকৃষ্ট। কিন্তু তাহার আখ্যান-বস্তু কল্যাণপ্রদ হইতেও পারে, না হইতেও পারে। মানব-হৃদয়ে শুভ এবং অশুভ উভয় প্রকারেরই মনোবৃত্তি আছে। সৎশিল্প আমাদের শুভ মনোবৃত্তিগুলি জাগাইয়া দেয়, অসৎশিল্প অশুভ মনোবৃত্তিগুলি জাগাইয়া দেয়।

মানব-হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া শিল্প একটি শক্তিশালী বস্তু। যে জাতি এই শক্তির যেরূপ ব্যবহার করে, সে জাতি সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে। বিবেচনাপূর্ব্বক এই শক্তির ব্যবহার না করিলে অনেক সময় সুফল অপেক্ষা কুফল বেশী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে শিল্পের শক্তি এবং

তাহাকে নিয়মিত করিবার প্রয়োজনীয়তা সুদূর অতীত হইতে অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। কাব্য, কাহিনী, নাটক, কথকতা, নৃত্যগীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা,—সকল রকমের শিল্প ভারতবর্ষে ধর্মের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব বিস্তার করিয়া শিল্পের শক্তি সার্থক হইয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন প্রতিভাবান্ লোকের মধ্যে শিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, অপরদিকে সাধারণের মধ্যে সৎশিল্প প্রচার হওয়াতে তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতি হইয়াছে। রামায়ণ এবং মহাভারত কাব্য হিসাবে যেমন উৎকৃষ্ট, জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে এবং জাতির মধ্যে ধর্মভাব বিকশিত করিতে ইহারা সেইরূপ সমর্থ। এজন্য সমগ্র পৃথিবীতে এই দুই মহাকাব্যের তুলনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য জগতে ইলিয়ড এবং ওডিসিকে ইহাদের সহিত তুলনা করা হয়। কিন্তু ইলিয়ড এবং ওডিসি অপেক্ষা রামায়ণ এবং মহাভারতের স্থান অনেক উচ্চে। রামায়ণ এবং মহাভারত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া জনসাধারণের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইলিয়ড এবং ওডিসি তাহার শতাংশেরও একাংশ বিস্তার করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। ইলিয়ড এবং ওডিসির আদর কেবলমাত্র সংসারীদের নিকট; সংসার-বিরক্ত সাধুদের নিকট ইহাদের কোন আদর নাই। রামায়ণ এবং মহাভারতে ভগবানের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য গৃহস্থ সংসারীর পক্ষে ইহা যেরূপ আদরণীয়, সাধু মহাত্মগণের নিকট তাহা অপেক্ষাও বেশী আদরণীয়। সংসারে যতপ্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে, সকল রকম সম্বন্ধের আদর্শ রামায়ণ এবং মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভৃত্য, আদর্শ সখা, আদর্শ রাজা, আদর্শ ব্রহ্মচারী, সকল রকম আদর্শই আমাদের দুইটি মহাকাব্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে; এজন্য চরিত্র-গঠনের পক্ষে ইহাদের উপযোগিতা অসাধারণ। ইলিয়ড এবং ওডিসিতে এত রকম আদর্শ ত নাই-ই, যেগুলি আছে, সেগুলিও রামায়ণ এবং মহাভারতের আদর্শের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। রামায়ণ এবং মহাভারতের প্রভাব ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া সুদূর সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি উপনিবেশেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানের প্রাচীন মন্দির-গাত্রে আজিও তাহার অসংখ্য নিদর্শন বর্ত্তমান।

কেবল কাব্য নহে, হিন্দুর সকল রকমের শিল্প ধর্মের সহিত বিজড়িত। অথবা, হিন্দুর প্রতিভা সকল রকম শিল্পের সাহায্যে ধর্মভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ কাব্য যেমন ধর্মবিষয়ক, সেইরূপ হিন্দুর শ্রেষ্ঠ গীত, শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য, সকলই ধর্মবিষয়ক। যাত্রা, অভিনয়, কথকতা, চিত্র, সকলের মধ্যেই ধর্মভাব পরিস্ফুট। মৃত্তিকা দ্বারা সাধারণ কুম্ভকার নির্মিত দেবীমূর্ত্তির মুখশ্রীতে যে দিব্যভাব পরিস্ফুট হয়, শ্রেষ্ঠ ভাস্করের শিল্পেও তাহা দুর্লভ। বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণ এবং অলঙ্কারের সমাবেশে সে মূর্ত্তি পরম রমণীয় হয়, বহুবিধ পৌরাণিক চিত্রে তাহা সুশোভিত হয়, সানাইয়ের কমনীয় সুর ভক্তের হৃদয়ে নবীন ভাব জাগাইয়া দেয়, আগমনী এবং বিজয়ার সঙ্গীত তাহার হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তোলে। শিল্প যতরকমে মানব-মন আকর্ষণ করিতে পারে, হিন্দুর পূজা-পদ্ধতিতে সেই সকল রকম উপায় সুচারুরূপে প্রয়োগ করিয়া হিন্দুর মনকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করা হয়। যে সকল শিল্প অন্যান্য দেশে কেবল সুখসম্ভোগ এবং বিলাসকামনা চরিতার্থ করিবার উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, হিন্দুর প্রতিভা সেই সকল শিল্পের মধ্যে মানব মনকে বিষয়-সুখ হইতে ফিরাইয়া ভগবদভিমুখী করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে আশ্চর্য্যরূপে সফল হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা শিল্প সম্বন্ধে একটা সমস্যার কাছে আসিয়া পড়িয়াছি,—শিল্পের কোনও উদ্দেশ্য থাকা উচিত কি না। এ বিষয়ে এক পক্ষের মত এই যে, শিল্প রচনার কোন উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়, এবং যে শিল্প যত পরিমাণে উদ্দেশ্য-রহিত, তাহা তত শ্রেষ্ঠ এবং সম্প্রদায়-নির্বিশেষে তত অধিক লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। শিল্পীর উদ্দেশ্য হইবে একটি সুন্দর জিনিষ রচনা করা। সে জিনিষ কাহারও কোনও কাজে লাগিবে কি না, সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে না। এই ধরুন, সমাজে সৎশিক্ষা প্রচারের জন্য যদি কোন পুস্তক রচনা করা হয়, বা চিত্র অঙ্কিত করা হয়, তাহা হইলে যথার্থ শিল্প হিসাবে তাহার মূল্য কমিয়া যাইবে। কারণ যথার্থ শিল্পের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। তাহাকে যদি সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার ভার দেওয়া যায়, তাহা হইলে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে সে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে না। যে

প্রকারের বা যে পরিমাণ সৌন্দর্য্য সমাজকে শিক্ষা দিবার পক্ষে অনুকূল, সে পরিমাণ সৌন্দর্য্য তাহাতে থাকিতে পারে ; কিন্তু সৌন্দর্য্যের কোন অভিব্যক্তি যদি সমাজ-শিক্ষার অনুকূল না হয়, তাহা হইলে সে প্রকারের সৌন্দর্য্য উদ্দেশ্যমূলক শিল্পের মধ্যে স্থান পাইবে না। অপর পক্ষে যদি কোন সৌন্দর্য্যরহিত বস্তু সমাজ-শিক্ষার পক্ষে অনুকূল হয়, তাহা হইলে সেরূপ বস্তুও উদ্দেশ্যমূলক শিল্পের মধ্যে স্থান পাইয়া তাহার উৎকর্ষ হানি করিবে। সমাজকে শিক্ষা দিবার পক্ষে কিরূপ বস্তু অনুকূল, তাহা সমাজের বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। শিল্পকে যদি তাহার অনুগত হইয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে শিল্পের অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন ভাব সঙ্কুচিত হইবে। যথার্থ শিল্প কেবলমাত্র কোনও বিশেষ সমাজের পক্ষে উপযোগী নহে। যথার্থ শিল্প সকল সমাজের সকল লোকের পক্ষে সমান উপযোগী হইবে।

যাঁহাদের মত এইরূপ, তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে যেরূপ অসাম্প্রদায়িক এবং সার্বজনীন মনে করেন, তাহা যথার্থ নহে। মানবের রুচি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে ; এবং প্রবৃত্তি ও সংস্কারের ভেদে মানবের সৌন্দর্য্যবোধেরও প্রভেদ দেখা যায়। তাহার ফলে এক বস্তু কাহারও নিকট খুব সুন্দর মনে হয়, কাহারও বা তত সুন্দর বোধ হয় না, এমন কি কুৎসিতও বোধ হইতে পারে। অপর পক্ষে মানব-চরিত্র-গঠনের উপযোগী বস্তু সকলকে এই প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ যেরূপ সঙ্কীর্ণ এবং সাম্প্রদায়িক মনে করেন, বাস্তবিক ইহারা ততদুর সঙ্কীর্ণ এবং সাম্প্রদায়িক নহে। রামায়ণের দুই চারিটি ঘটনার আলোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। অনেক প্রলোভনের মধ্যেও সীতা যে তাঁহার পাতিব্রত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, এই কাহিনী চরিত্র-গঠনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কিন্তু ইহা যে কেবল হিন্দু পাঠকেরই উপযোগী এ কথা বলা যায় না। অন্য দেশের লোকও যদি ইহা পাঠ করে, তাহা হইলে উচ্চ আদর্শের প্রতি ভক্তিতে তাহার চিত্ত অবনত হইবে ; এবং তাহার অজ্ঞাতসারে, তাহার চিত্ত এই প্রকার সদ্‌গুণাবলী বিকশিত হইবার উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে প্রস্তুত হইবে। রামের পিতৃভক্তি, ভরতের কর্ত্তব্যপালন, হনুমানের প্রভুভক্তি,—এই সকল কাহিনী চরিত্র-গঠনের উপযোগী হইলেও অসাম্প্রদায়িক এবং সার্বজনীন।

যথার্থ শিল্পকে উদ্দেশ্যরহিত বলিয়া যে দাবী করা হয় তাহাও বিচারসহ নহে। মানুষ বুদ্ধিমান এবং বিচারশীল জীব ; সাধারণতঃ সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোন কাজ করে না। শিল্প-রচনাকে মানবের শ্রেষ্ঠ চেষ্টার মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। সেগুলি যে মানব উদ্দেশ্যহীন ভাবে রচনা করে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। সাধারণতঃ অনেকে বলেন, কোকিল যেরূপ স্বাভাবিক প্রেরণায় গীত গাহিয়া থাকে, কবিও সেইরূপ কবিতা রচনা করেন, তাঁহার কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু বিহঙ্গ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, কোকিলের গানও উদ্দেশ্যহীন নহে। চৈত্রের রজনীতে কোকিল যে সুমধুর কণ্ঠস্বরে গগন প্লাবিত করে, স্ত্রী-কোকিলকে আকর্ষণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক পক্ষে অধিকাংশ শিল্প-রচনার উদ্দেশ্য অপরের মনোরঞ্জন করা এবং তাহার দ্বারা প্রশংসা বা অর্থ উপার্জন করা। এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া যদি উৎকৃষ্ট শিল্প রচনা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে পাঠকের চরিত্র উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বা শিল্প রচনা করা সম্ভবপর হইবে না কেন? বাস্তবিক পক্ষে উভয় প্রকারের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট শিল্প রচিত হইতে পারে। যে শিল্পীর যেরূপ প্রবৃত্তি তিনি সেইরূপ শিল্প রচনা করেন। এবং যে জাতির মধ্যে যে প্রবৃত্তি প্রবল, সেই জাতির মধ্যে তদনুরূপ শিল্পের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

শিল্পের বহুসংখ্যক বিভাগ আছে, এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবন-যাপন করিবার প্রণালীও যে একটি শিল্প হইতে পারে, ইহা সকলে উপলব্ধি করেন না। নিজের জীবন-প্রণালীর দ্বারা নিজের অনুভূতি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়, এজন্য টলষ্টয়ের সংজ্ঞা অনুসারে জীবন-প্রণালীকে একটি শিল্প বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এক হিসাবে জীবন-প্রণালীকে শ্রেষ্ঠ শিল্প বলা যাইতে পারে ; কারণ, একজন নিজের জীবন-প্রণালী দ্বারা অপরের হৃদয়ে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, কাব্য রচনা করিয়া বা চিত্র অঙ্কিত করিয়া কিম্বা বক্তৃতা করিয়া সেরূপ পারেন না। ইংরাজিতে একটি বাক্য আছে Example is better than precept, অর্থাৎ উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত কার্য্যকরী। অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি কেবল শিশুদের মধ্যে যে প্রবল তাহা নহে, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যেও ইহা অত্যন্ত প্রবল। সাধারণ ব্যক্তিরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সাজসজ্জা

যেরূপ অনুকরণ করে, সেইরূপে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের চিন্তা-প্রণালীরও অনুসরণ করে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, অপর ব্যক্তিসকল সেইরূপ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ প্রমাণ করেন, অপর লোক তাহা অনুসরণ করে।"

জীবন-শিল্পের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা সাধু ভাব বা ধর্মভাব প্রচারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সংসারের সুখ এবং ঐশ্বর্য্য অনিত্য ; ইহাদের প্রতি আসক্ত হইলে পরিণামে কষ্ট ভোগ অপরিহার্য্য,—এ সকল কথা কাব্য-কাহিনী কিংবা উপদেশ দ্বারাও প্রতিপন্ন করা যায় তাহা সত্য ; কিন্তু একজন সাধুব্যক্তি নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপর এই সকল ভাব যেরূপ প্রগাঢ় ভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন, কাব্য বা কাহিনীর দ্বারা সেরূপ করা সম্ভব নহে। এই জন্য মহাত্মা গান্ধি একস্থলে বলিয়াছেন, Asceticism is the noblest Art of life অর্থাৎ, বৈরাগ্যই মহত্তম জীবন-শিল্প। যে রাজপদ লাভের জন্য সাধারণ লোকে লালায়িত হয়, যাহার জন্য অনেকে ভ্রাতৃহত্যা এমন কি পিতৃহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে, সেই রাজপদ অবহেলা করিয়া, বুদ্ধদেব দরিদ্রের বেশে একাকী রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এই কথা যে শুনিয়াছে, সেই অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও অনুভব করিয়াছে যে, রাজ ঐশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ বস্তু, জীবনে সত্যলাভই চরম পদার্থ। স্নেহশীলা বৃদ্ধা মাতা, প্রেমময়ী যুবতী পত্নী, দেশব্যাপী পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, ভক্তদের আন্তরিক পূজা,—এই সকল চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ভগবৎ-প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়াছিলেন, সেই করুণ কাহিনী যাহারা শুনিয়াছে তাহাদের হৃদয়ে এই তত্ত্ব প্রগাঢ় ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, জগতে ঈশ্বরলাভই শ্রেষ্ঠ সুখ। তাহার সহিত সংসারের সহস্র সুখের তুলনাই হয় না। বুদ্ধদেব এবং শ্রীচৈতন্যদেব যে মহান্ ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন-প্রণালীর দ্বারা সেই ভাব অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছেন। বুদ্ধদেব এবং চৈতন্যদেব যদি ঐ রূপে জীবন যাপন না করিয়া এই সকল উচ্চ ভাব অবলম্বন করিয়া কাব্য বা সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাঁহা হইলে ঐ সকল ভাব এত উৎকৃষ্ট ভাবে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইত না। এজন্য এই সকল মহাপুরুষদের জীবন-প্রণালী-রূপ শিল্পকে কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতি অপর সকল শিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হইবে। বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশু প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বন করিয়া অনেক কাব্য নাটক প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। এই সকল কাব্য প্রভৃতি রচয়িতার স্থান শিল্পী হিসাবে বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের উচ্চে দেওয়া যাইতে পারে না।

কেবল যে ধর্মপ্রচারকদের জীবনকে শিল্প বলা যায় এমন নহে। প্রায় সকল প্রকার মহৎ আচরণকে শিল্প বলা যাইতে পারে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত, হল্‌দিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে ঝালাপতি মান্নার কীর্ত্তি। সাধারণতঃ প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা, তাঁহার রাজচ্ছত্র কাড়িয়া লওয়া গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহীর ন্যায় আচরণ করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। মান্না এ সকলই করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রভু প্রতাপসিংহের রাজচ্ছত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া বিষম সঙ্কট হইতে প্রভুকে রক্ষা করা। তাই মান্নাকে রাজবিদ্রোহী বলা হয় না, প্রভুভক্তদের অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করা হয়। মান্নার কীর্ত্তিকাহিনী যে শুনিয়াছে, তাহারই হৃদয়ে প্রভুভক্তি এবং আত্মোৎসর্গের মহত্ত্ব দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মেবার রাজকুলের ধাত্রী পান্নার আচরণ এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত। মৃত প্রভুর শিশু পুত্রকে অপহরণ করা এবং নিজের পুত্রকে হত্যা করান, পান্না এই দুইটী গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিয়াও প্রভুপরায়ণতার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ধাত্রী পান্না এবং ঝালাপতি মান্না তাঁহাদের হৃদয়ে যে মহান্ কর্ত্তব্যবোধ অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আচরণ দ্বারা তাহা উৎকৃষ্ট ভাবে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এজন্য ইঁহাদের আচরণ উৎকৃষ্ট শিল্প বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, শিল্প কি তাহা অনেকে জানিলেও শিল্পের কিরূপ সংজ্ঞা দেওয়া উচিত এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। "শিল্প অর্থে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি" এরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলে অনেক আপত্তি হইতে পারে। এজন্য অপর দুইটি সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছি,—একের অতীত অনুভূতি অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার উপায়কে শিল্প

বলা যায় (Tolstoy) ; কিম্বা যে কার্য্য কৌশলপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া অপরের চিত্ত বিচলিত করা যায়, তাহাকে শিল্প বলা যাইতে পারে। শিল্পমাত্রই মহৎ বস্তু নহে ; শিল্প কল্যাণ-জনক হইতে পারে, না হইতেও পারে। পাশ্চাত্য জগতে একরকম নির্বিচারেই শিল্পের অত্যধিক আদর করা হয়, শিল্পের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম করা হয়। ভারতবর্ষে শিল্প অপেক্ষা ধর্ম্ম এবং দর্শনকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে ; পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় শিল্পের অত্যধিক আদর করা হয় নাই, কিন্তু শিল্পের উপযুক্ত আদর করা হইয়াছে। শিল্প একটী ক্ষমতাশালী বস্তু এবং সেই ক্ষমতা শুভপথে পরিচালিত করা উচিত, ইহা হিন্দুরা প্রাচীন কাল হইতে উপলব্ধি করিয়াছে। হিন্দুর প্রতিভা প্রায় সকল রকম শিল্পকে ধর্ম্মভাব এবং সাধুভাব প্রচার করিতে নিযুক্ত করিয়াছে ; এবং তাহার ফলে জনসাধারণের মনে এই সকল উচ্চভাব গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভারতে শিল্পকে ধর্ম্মের জন্য নিযুক্ত করিবার উৎকৃষ্ট ফল, রামায়ণ এবং মহাভারত। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, উৎকৃষ্ট শিল্প উদ্দেশ্য-রহিত হইয়া থাকে এবং হওয়া উচিত, এই কথা যথার্থ নহে। সাধারণতঃ লোকের মনোরঞ্জন করিয়া অর্থ ও যশোলাভের উদ্দেশ্যে শিল্প রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু চরিত্র উন্নত করিবার উদ্দেশ্যেও উৎকৃষ্ট এবং অসাম্প্রদায়িক শিল্প রচিত হইতে পারে। পরিশেষে আমরা দেখিয়াছি যে, মহৎ কার্য্যমাত্রকেই শিল্প বলা যায়। এইরূপ মহৎ কার্য্য দ্বারা একের অনুভূতি অপরের হৃদয়ে উৎকৃষ্ট ভাবে সঞ্চারিত করিতে পারা যায়। এ জন্য জীবনে মহৎ আচরণকে শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

অরূপ রতন

শ্রীহরিধন মিত্র

বেদনার ব্যর্থতার তীব্র জ্বালা মাঝে
যে হরষ, যে পুলক, যে আনন্দ রাজে,
সেই ভালো, সেই—সেই ভালো ;
বুক-ভাঙা নিরাশার হাহাকার তলে,
রিক্ততার যে গোপন মণি-দীপ জ্বলে,
সেই আলো, সেই—সেই আলো।
হরষের পুলকের আনন্দের কাছে—
কে না জানে চিরদিন চির সুখ আছে ;—
বেদনার ব্যর্থতার তীব্র জ্বালা হ'তে,
কেহ যদি আনন্দেরে খুঁজে পায় ল'তে,
সেই জানে প্রকৃত সন্ধান !
ধন্য তার প্রাণ।

আশার আলোক ল'য়ে, প্রদীপেরে ল'য়ে,
সকলেই আলোকেতে আছে মগ্ন হ'য়ে ;
সে-ত পারে সকলেই পেতে ;—
নিরাশার হাহাকার বুক পেতে ধ'রে,
কতজন আলোকেরে লভিয়াছে ওরে ?
কতজন পা'য়া যায় এতে ?
এতটুকু কুটীরেতে—যদি ঠাঁই পায়,
জগতেরে পূরিবারে সকলেই চায় ;
রিক্ত হ'য়ে নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বপথে নাবি,
ক-জনের র'য়ে গেল বড় বেশী দাবী ?—
তাই ভাবি,
তাই—তাই ভাবি !

নিখিল-প্রবাহ

প্যারাসুট-গাড়ী—

বিলাতে এক ভদ্রলোক তাঁহার শিশু পুত্রের ঠেলা-গাড়ীতে পালের মত করিয়া একটি প্যারাসুট লাগাইয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে ঠেলা-গাড়ী হাওয়ার জোরেই অনেক সময় চলিয়া যায়। দেখিতেও গাড়ীখানি বিচিত্র দর্শন হইয়াছে।

প্যারাসুটযুক্ত গাড়ী

মোটরওয়ালার ডাকবাক্স—

পথ চলিতে চলিতে মোটরকার-যাত্রীর ডাকবাক্সে চিঠি ফেলিবার দরকার হইলে তাহাকে পথে নামিয়া বাক্সে চিঠি ফেলিতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কালিফোর্নিয়া সহরের কেবল মোটরকারওয়ালাদের জন্য মোটরে বসিয়াই চিঠি ফেলিবার জন্য একপ্রকার অভিনব ডাকবাক্স তৈয়ার হইয়াছে। ছবিতে দেখুন—একজন মোটরকার-যাত্রী গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া ডাকবাক্সে চিঠি ফেলিয়া দিতেছেন।

মোটরযাত্রীর ডাকবাক্স

আলোকরশ্মি সাহায্যে টিপ পরীক্ষা—

বন্দুকের হাত সাফাই পরীক্ষা করিতে হইলে এতদিন গুলি ছুঁড়িয়া চাঁদমারি করিতে হইত। ইহা সহরের বাহিরে গিয়া অতি সাবধানতার সহিত করা দরকার। আগে

আলোক-বন্দুক

পাশের লোকজনদের বিপদও বড় কম নয়। তেমন তেমন লোকের হাতে বন্দুক পড়িলে দক্ষিণদিকের গুলি উত্তরে অতি সহজেই চলিয়া যায়। সম্প্রতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জে, ডাবলি,উ, ল্যামণ্ট নামক একজন সেনানী আলোক সাহায্যে চাঁদমারি করিবার একপ্রকার অতি অদ্ভুত বন্দুক আবিষ্কার করিয়াছেন। বন্দুক হইতে গুলি বাহির না হইয়া একটি আলোক-রশ্মি বাহির হইয়া চাঁদমারিতে গিয়া পড়ে। এই প্রকার চাঁদমারি ঘরের মধ্যে বসিয়াও করা যায়। ইহাতে ভয়ের কোনো কারণ নাই। কানাডাতে এই প্রকার চাঁদমারি সেনাদলে প্রবর্ত্তন করা যায় কি না তাহার পরীক্ষা চলিতেছে।

ঘুম পাড়ানো গাড়ী—

মায়ের কোলের দোলানিতে শিশু খুব শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়ে। এমন অনেক শিশু আছে, যাহারা মায়ের কোলের দোলানি না পাইলে ঘুমায় না। ছবিতে যে গাড়ীটি দেখিতেছেন, উহার স্প্রিংএর সহিত বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ আছে।

ঘুমপাড়ানী গাড়ী

শিশুকে গাড়ীতে শোয়াইয়া সুইচ টিপিয়া দিলেই গাড়ীটি আস্তে আস্তে কাঁপিতে থাকে; শিশুও চট্‌পট্ ঘুমাইয়া পড়ে। দুর্ব্বল এবং রুগ্না মাতাদের পক্ষে এই গাড়ী অতি প্রয়োজনীয় হইবে। অবশ্য কলিকাতার মত বড় সহর ছাড়া অনত্র ইহার ব্যবহার চলিবে না; কারণ, সকল সহরে তাড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায় না।

অতিকায় মৎস্য—

কাপ্তান ম্যাকডোনাল্ড মিসিসিপি নদীতে নৌকায় বসিয়া ছিপে মাছ ধরিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ছিপে ভীষণ টান পড়িলে তিনি মাছ উঠাইবার জন্য ছিপে টান দিলেন—কিন্তু ফলে তাঁহার নৌকাকেই মাছ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

অতিকায় মৎস্য

এইভাবে কয়েক মাইল ধরিয়া মাছ খেলাইয়া অবশেষে কাপ্তান সাহেব তাহাকে নৌকায় উঠাইতে সমর্থ হইলেন। মাছের আকার দেখিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির! মাছটির ওজন প্রায় ৫০০ পাউণ্ড এবং লম্বাও কাপ্তান সাহেবের অপেক্ষা হাতখানেক বেশী। ছিপে করিয়া এত বড় মৎস্য বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আর কেহ ধরে নাই।

বহুরূপী নৌকা—

জলে নৌকা, ঘরে আলমারি বা তোরঙ্গ এবং রাস্তায় ঠেলাগাড়ী—একই জিনিষ তিন স্থানে তিন প্রকারে কাজে
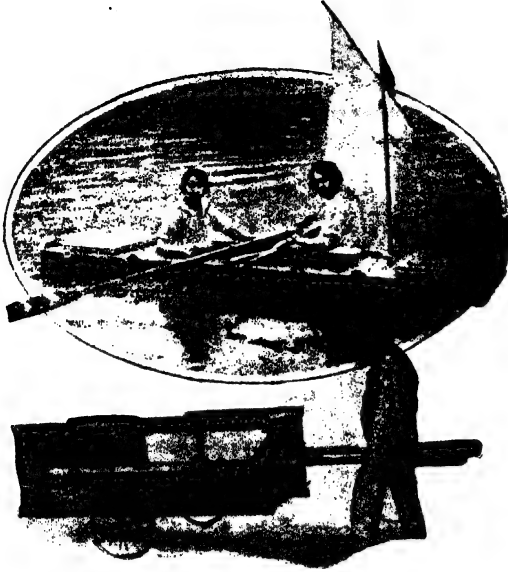
বহুরূপী নৌকা

লাগিবে, এইভাবে একজন ফরাসী মিস্ত্রি একটি নৌকা তৈয়ার করিয়াছেন। ছবিতে একই জিনিষকে নৌকা এবং ঠেলাগাড়ী রূপে দেখানো হইয়াছে।

গিরগিটির চিকিৎসা—

লণ্ডন-চিড়িয়াখানায় একটি আট হাত লম্বা গিরগিটি আছে। তাহার মুখে ঘা হওয়ায় তাহার চিকিৎসার দরকার

গিরগিটির চিকিৎসা

হয়। ডাক্তার ভয়ে তাহার কাছে যাইতে পারেন না। তখন গিরগিটির মুখে আড়াআড়ি ভাবে একটি কাঠ ভরিয়া দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া চিকিৎসা করা হয়।

জাহাজ, রেলগাড়ী ইত্যাদির মডেল নির্ম্মাণ

জে, ডাবলিউ, ওয়েব একটি তিমিমাছ-ধরা জাহাজের মডেল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জাহাজের

জাহাজের মডেল

হুবহু এত ছোট মডেল আর নাই। মডেলটি মাত্র পাঁচ ইঞ্চি লম্বা।

বার্ট লোয়ার নামক একজন বালক একটি মোটরকারের মডেল নির্ম্মাণ করিয়াছে। মোটরকারে ইলেক্‌ট্রিক লাইট, রবার টায়ার ও টিউব, হুড ইত্যাদি সবই আছে। ইহা

মোটরকারের মডেল

পেট্রোলের সাহায্যে চলে। গাড়ীখানির ওজন মাত্র সাড়ে চার পাউণ্ড, সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি উঁচু। মডেল মোটরকারটি হুবহু

চ্চো গাড়ী। ইহার দোষের মধ্যে একটি, আমার তোমার মত মানুষ বসিতে পারে না, তাহার স্থান নাই।

উইলিয়াম এল, ড্যানসি একটি মডেল রেলগাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন। ইহা রেল লাইনের উপর দিয়া বাড়ীর উঠানে

রেল গাড়ীর ম

চলে। ইঞ্জিনে কয়লা জল লাগে—কারণ ইঞ্জিন চালাইতে বাষ্পের দরকার হয়। রেলগাড়ীগুলিতে এক এক জন করিয়া বালক বা বালিকা বসিতে পারে।

পিপীলিকার জীবন—

ডাঃ হ্যান্স ইউয়ার্স নামক একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর সকল দেশের পিপীলিকাদের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া বহু নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই

পিপীলিকার নৃত্য—চলচ্চিত্রের ছবি

বৈজ্ঞানিক বলেন যে, পিপীলিকাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী খুব মনোযোগ দিয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এই সামান্য কীটের এত বুদ্ধি, এত কার্য্যকুশলতা—দেখিলেও বিশ্বাস করা শক্ত হয়। বুদ্ধিতে পিপীলিকার স্থান বোধ হয় ঠিক মানুষের পরেই।

ডাঃ ইউয়ার্স বলেন যে, পিপীলিকা খুব সম্ভবত বোলতার মত একপ্রকার পতঙ্গ হইতে প্রথম জন্মলাভ করে। কেবল পিপীলিকা নহে, প্রায় ৬০০০ রকমের পিপীলিকা জাতীয় নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ এই বোলতার মত জীব হইতে উদ্ভূত।

প:
স:
এ:
এব

কুকুরের কবর

যথাসময়ে করিয়া যাইতেছে। কাহারও সহিত কোনো গোলমাল নাই, কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নাই। মানুষের সংসারেও এমন শৃঙ্খলা অনেক সময় বিরল।
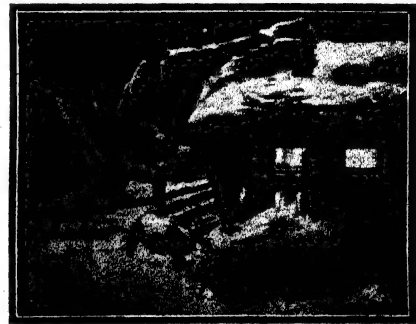
পিপীলিকার নৃত্য হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—দ্বারে ক্রুদ্ধা স্ত্রী দণ্ডায়মানা—চলচ্চিত্রের ছবি

যুদ্ধের সময় সৈনিক পিপীলিকারা একদল শত্রুর সম্মুখীন হয়, আর একদল গৃহরক্ষার কাজে থাকে। যে দল জয়লাভ করে, তাহারা বিপক্ষদলের বহু পিপীলিকাকে বন্দী করিয়া নিজ উপনিবেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিন্তু মজার কথা এই

যে, বন্দি পিপীলিকারা কালক্রমে যে উপনিবেশে আসে সেই উপনিবেশের পিপীলিকাদের সহিত একেবারে মিলিয়া যায়। দরকার হইলে তাহারাই আবার নিজের পূর্ব্ব আত্মীয়-দলের সহিত লড়াই করিতেও যায়।

আমেরিকার নিবিড় জঙ্গলে একপ্রকার পিপীলিকা আছে, তাহারা বাগান করে। বিশেষ একপ্রকার গাছের রস এই পিপীলিকারা খায়। সেই গাছের বীজ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের বাসার কাছে সারি সারি লাগাইয়া দেয়। গাছগুলি এমন সারিবদ্ধ ভাবে জন্মায় যে, তাহাদের মানুষের লাগানো বলিয়া ভ্রম হয়। এই পিপীলিকাদের গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতিতে অতি অদ্ভুত কৌশল দেখা যায়। প্রবল বন্যায় যখন বন জঙ্গল প্রায় সব কিছু ডুবিয়া যায়—তখন আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পিপীলিকাদের গৃহে বিন্দুমাত্র জল প্রবেশ করিতে পারে না।
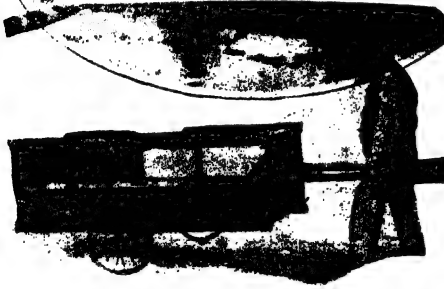
বহুরূপী নৌকা

পিপীলিকার শবযাত্রা—চলচ্চিত্রের ছবি

পিপীলিকার ঐক্যতান বাদন—চলচ্চিত্রের ছবি

এই সমস্ত পিপীলিকাদের জীবন-যাত্রা বায়স্কোপে দেখাই-বার জন্য জার্ম্মানীতে সম্প্রতি একটি ফিল্ম তোলা হইয়াছে। পিপীলিকাগুলি অবশ্য সত্যিকার নহে—মোমের। চলচ্চিত্রে পিপীলিকার জীবনযাত্রা যাহা দেখানো হইয়াছে—আসলে তাহা আরো বিস্ময়কর। চলচ্চিত্রে কেবলমাত্র নমুনা দেখানো হইয়াছে। আসলে দেখিতে হইলে কোনো বন-জঙ্গলে গিয়া একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যে-কেহ পিপী-লিকাদের জীবনযাত্রা দেখিতে পারেন। পিপীলিকার জীবন হইতে মানুষের শিক্ষা করিবারও বহু জিনিষ আছে।

আফ্রিকায় একপ্রকার পিপীলিকা আছে, তাহারা পাহাড় হইতে নামিবার সময় দল বাঁধিয়া নামে। নামিবার সময় তাহারা সকলে জট পাকাইয়া একটি প্রকাণ্ড ফুটবলের মত হয়। তারপর পাহাড়ের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে। গড়াইবার সময় কাহারো দেহে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে না। এই পিপীলিকার বল জলে পড়িলেও ভাসিতে থাকে। বলের ভিতর হইতে কোনো পিপীলিকার বাহিরে আসিবার দরকার হইলে তাহারো পথ আছে।

পিপীলিকা-উপনিবেশে রাত্রিকালীন নৃত্যাদির উৎসব—চলচ্চিত্রের ছবি

অভিনব করাত—

ইলেক্‌ট্রিকের তারের উপর অনেক সময় কাছাকাছি গাছের ডাল ইত্যাদি পড়িয়া তার নষ্ট করে, তার অপরিষ্কারও করে। ইলেক্‌ট্রিক্ তারের উপর উঠিয়া গাছের ডাল কাটাও অসম্ভব। কাছাকাছি গাছের ডালে বসিয়াও ডাল কাটা বিপজ্জনক। সম্প্রতি একপ্রকার দড়িটানা করাতের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহার সুবিধা এই যে, একটি বড় ডাণ্ডা দিয়া করাতটি গাছের ডালে লাগাইয়া দিয়া সংযুক্ত দড়ি টানিলেই ডাল কাটিয়া যাইবে। দড়ি ইলেকট্রিক তারে লাগিয়া গেলেও কোনো ভয় নাই।
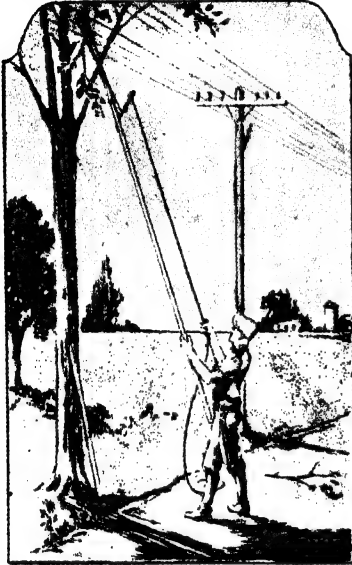
দড়ি—করাত

পশুর কবরস্থান—

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে পশুদের জন্য একটি কবরস্থান আছে। এই খানে পোষা কুকুর, বেড়াল, পাখী ইত্যাদির কবর দেওয়া হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই কবরস্থান প্রথম খোলা হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় কবরস্থানটি কুকুরের কবরে ভরিয়া গিয়াছে। যুদ্ধে যত কুকুর মারা গিয়াছে—তাহাদের অনেকেরই এই কবরস্থানে কবর দেওয়া হইয়াছে। ছবিতে একটি কুকুরের কবরের ছবি দেওয়া হইল।

কুকুরের কবর

জানালা তৈয়ারির কেরামতি—

আমেরিকার এক হোটেলওয়ালা হোটেলের একটি খাবার-ঘরের একটি জানালা অতি বিচিত্র ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জানালার ভিতর দিয়া যে দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি মনোরম। ঘরের এক কোণ হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একখানি ছবি টাঙ্গানো রহিয়াছে।
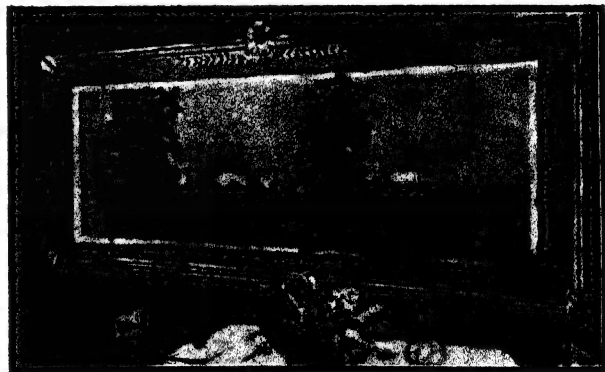
জানালা নির্ম্মাণের কেরামতি

আড়াই হাজার বছরের মন্দির—

দক্ষিণ মেক্সিকোর ইউকাটান জঙ্গলে সম্প্রতি একটি ২০০ ফিট উচ্চ মন্দির পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরটির গাত্রে নানা প্রকার চিত্রাদি খোদাই করা আছে। রঙ্গে আঁকা চিত্রাদিও আছে। মন্দির-গাত্রের লিপি উদ্ধারে জানা যায় যে মন্দিরটি প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটির উপরে কয়েকটি তিন ফিট চওড়া ঘর আছে। এই মন্দিরের নিকটে আরো বহু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

২৫০০ বছরের মন্দির

অদ্ভুত চাকাযুক্ত মোটরকার—

কম-চওড়া রাস্তায় বড় মোটর গাড়ী ঘুরাইতে হইলে অনেক সময় মোটর-চালককে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। গাড়ী ক্রমাগত সামনে পিছনে করিয়া ঘুরাইতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য একজন মিস্ত্রি মোটরকারের সামনের চাকা এমন ভাবে লাগাইয়াছে যে, চাকা দুইটি অদ্ভুত ভাবে বাঁকিয়া যায় (ছবি দেখুন)। ইহার ফলে গাড়ীর নিজের মাপের চওড়া রাস্তাতেও গাড়ী অতি সহজেই ঘোরা-ফেরা করিতে পারে। ছবি দেখিলে ব্যাপারটি বোঝা সহজ হইবে।
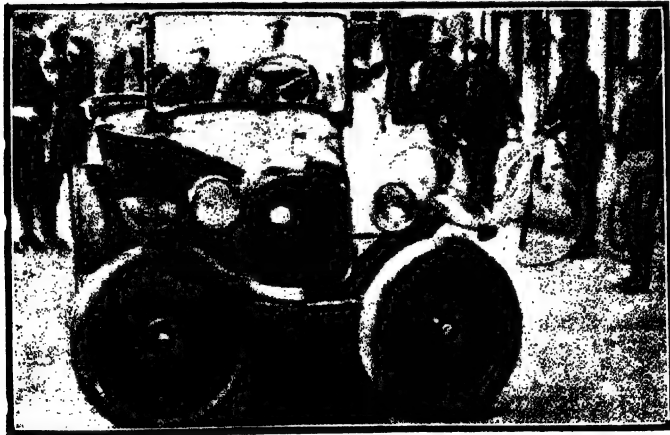
অদ্ভুত চাকাযুক্ত মোটরকার

মোটর-শ্লেজ—

রাশিয়াতে বরফের উপর লোকজন এবং মালপত্র লইয়া যাইবার জন্য একপ্রকার মোটর-শ্লেজ নির্ম্মিত হইতেছে। সাধারণ কুকুরটানা শ্লেজ যেখানে ঘণ্টায় ৪।৫ মাইল যাইতে পারে, এই মোটর শ্লেজ সেই স্থানে ঘণ্টায় অন্তত ২০।২৫ মাইল যাইবে বলিয়া মনে হয়।

মোটর-শ্লেজ

ভ্রাম্যমানের জল্পনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(বার্টরাণ্ড রাসেল)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৬-৬-২৭

রাসেল নিজে এসে দোর খুলে দিলেন ও নির্ম্মল হাসিতে তাঁর মুখখানি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সেই পরিচিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—অথচ কি-একটা কারুণ্যে তা মধুর ও অবনম্র !···

আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

চারধারে বই টই ছড়ানো।

আমি বল্‌লাম : "খুব ব্যস্ত এখন ?"

রাসেল বল্‌লেন : "হাঁ, এখানে আমি আসি ত ছুটি নিতে নয়—লণ্ডনে অনেক কাজ অসমাপ্ত থাকে সে সব সমাপ্ত করতে। তাই লণ্ডনে থাক্‌লে তোমাকে আমি বেশি সময় দিতে পারতাম। তবে আশা করি তুমি বুঝবে—"

আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম : "আপনাদের মতন লোকের সময়ে যদি একটুও হস্তক্ষেপ করি তাহ'লেও যে মনের মধ্যে বাধ-বাধ ঠেকে মিষ্টার রাসেল। আমাকে আপনি রোজ তিনচার ঘণ্টা সময় আপনার সঙ্গে গল্পালাপ করতে দিয়েছেন এটা কি আমার কম লাভ ? আমার এইতেই কুণ্ঠা হয়।"

রাসেল বল্‌লেন : "না না কুণ্ঠার কারণ নেই। আমি আরও একটু বেশি সময় বাইরের লোককে দিতে পারতাম হয়ত যদি আমার নানা লোককে চিঠি লিখ্‌তে না হ'ত।"

—"আপনি খুব চিঠি লেখেন বুঝি ?"

—"হাঁ। নানারকম চিঠি লিখ্‌তে হয়। জগতের নানা

দেশের নানা লোকের নানা প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে বড় চিঠিও নিতান্ত কম লিখতে হয় না।"

—"কতগুলি ক'রে চিঠি লিখতে হয় রোজ ?"

—"ঠিক্ নেই। তবে গড়পড়তা দিনে ছসাতখানি ক'রে বড় চিঠি লিখতে হয়। তাছাড়া সপ্তাহের একটা দিন আমি শুধু চিঠি লেখাতেই নিয়োগ করি। সেদিন ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানা চিঠি লিখি।"

—"এত চিঠি ? ক্লান্তবোধ করেন না ?"

—"ক্লান্ত বোধ করলেই বা উপায় কি! বাইরের দাবী দাওয়া ত রাখতেই হবে।"

—"একজন সেক্রেটারী রাখেন না কেন ? ওয়েল্স, শ প্রভৃতি—"

—"তাঁদের বইয়ের বিক্রয় কত। ওয়েসের এক একটি বইয়ের কাট্তি তিন লক্ষ, চার লক্ষ।"

—"আর আপনার ?"

রাসেল হেসে বল্লেন: "আমার বই ? আমার Educationএর উপর বইটি আজ অবধি সব চেয়ে বেশি বিক্রয় হ'য়েছে। কিন্তু ইংলণ্ডে সব শুদ্ধ ৩০০০।৪০০০ সংখ্যার বেশি বিক্রয় হয় নি। আমার সব বই জড়িয়ে যা আয় হয় তাতে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয় মাত্র।"

আমি একটু বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম: "কিন্তু, মিষ্টার রাসেল, য়ুরোপে আপনার অনুরাগী ও admirer এত বেশি—"

রাসেল বাধা দিয়ে তাঁর অত্যন্ত ব্যঙ্গের স্বরে বল্লেন: "yes, but their admiration does not come to seven and six" (রাসেলের বইয়ের দাম সাধারণতঃ সাত শিলিং ছ পেন্স।)

—"তাহ'লে আপনি যে ছেলেপিলেদের স্কুল করছেন তার অর্থ—"

—"সেই জন্যেই ত আমি আমেরিকায় যাচ্ছি—বক্তৃতাদি দিয়ে কিছু অর্থের চেষ্টায়।" *

—"আপনার Education বইখানিতে আপনি মিস্ ম্যাকমিলানের একটি স্কুলের খুব প্রশংসা ক'রেছিলেন না ?"

—"হাঁ।"

—"আপনার স্কুলটি কি অনেকটা সেই রকম আইডি দ্বারা চালিত হবে ?"

—"না, ঠিক্ নয়। কারণ যদিও সে স্কুলটি খুব ভা বটে, কিন্তু সেরকম স্কুলকে ঠিক্ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে ছেলেদের উপযোগী বলা চলে না। কেন না এরকম নার্সা স্কুল আসলে গরীব ছেলেপিলেদের—শ্রমিকদের জন্যেই তৈরি করা হ'য়েছে।"

—"আর—আপনার স্কুল ?"

—"আমার স্কুল তাদের জন্যে যারা সন্তানদের শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করতে পারে।"

—"আপনি কি মনে করেন যে স্কুলগুলিকে এভাবে আলাদা করা উচিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যে একরকম ও দরিদ্রের জন্যে অন্যরকম ?"

—"না, মনে করি না। কিন্তু কি জান ? প্রাথমিক স্কুল চালানো এত ব্যয়সাধ্য যে কেবল গভর্মেণ্টই এ ভার নিতে পারে। অন্ততঃ আমার মতন সামান্য অবস্থার লোকের পক্ষে তা অসম্ভব।"

—"কেন ? এরকম স্কুলের আয় থেকে কি তা চল্তে পারে না ?"

—"যদি গরীবদের জন্যে হয় তাহ'লে পারে না। কাজেই সিদ্ধান্ত হয় অনেকটা এই রকম যে, যদি ধনী না হও তা হ'লে স্কুল চালাতে হ'বে ধনীদেরই জন্যে।"

ব'লে রাসেল হাস্তে লাগ্লেন। নিজের ঠাট্টা তামাসা তিনি নিজে বড় কম উপভোগ করেন না।

হাসি থাম্লে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "তাই বুঝি আপনি আমেরিকায় টাকার চেষ্টায় যাচ্ছেন ?"

—"হাঁ। নইলে সেদেশে কি আমি কথনো সাধ ক'রে যেতে চাই!"

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লাম: "কিন্তু গভর্মেণ্টের সাহায্য নইলে কি দরিদ্রদের জন্যে একটা স্কুল চালানো সম্ভব নয় ? ধরুন যদি দুচারজন ধনীকে পাক্ড়াতে পারেন, যারা এরকম সৎকার্য্যে চাঁদা দিতে গররাজি নয়—তাহ'লে ?"

রাসেল সব্যঙ্গ হাস্যে বল্লেন: "কিন্তু ঐখানেই ত যত গোল। যদি তুমি ধনীদের কাছে হাত পাত্তে চাও তাহ'লে তাদের নানা রকম সর্ত্তে যে তোমাকে সায় দিতেই হবে।

* একজন আমেরিকা-ফেরত বন্ধুর মুখে শুন্লাম এই lecture-tour রাসেলের আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে, চার পাঁচমাসে তিনি আড়াইলক্ষ ডলার পেয়েছেন।

অর্থাৎ কি পদ্ধতিতে স্কুল চালানো হবে সে সম্বন্ধেও তারা অনধিকার-চর্চ্চা করবেই করবে। আর তারা যা চাইবে তার ফল যে কি হবে বুঝতেই পারছ।"

আমি সস্মিত সুরে জিজ্ঞাসা করলাম: "কিন্তু ফল যে সর্ব্বদা মন্দই হবে এমন কথা মনে করছেন কেন? তারা ভাল জিনিষও ত চাইতে পারে?"

রাসেল কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সুরে বল্লেন: "না, এ ভরসা তোমায় আমি দিতে পারি যে ধনীরা আর যা-ই চাক্ না কেন, ভাল জিনিষ চাইবে না।"

আমরা হেসে উঠ্লাম।

রাসেল বল্লেন: "তা ছাড়া ধনীরা আমাকে আপ্যায়িত করবার জন্যে তাদের টাকার ঝুলি ঝাড়বেই বা কেন বল— যখন আমি তাদের হৃদয়হীনতা ও পাশবিকতার সম্বন্ধে কখনো মধুময় সমালোচনা করি নি?"

আমরা আবার হেসে উঠ্লাম।

আমি বল্লাম: "ওয়েল্‌সের The Undying Five বইখানিতে তিনিও এই কথাই লিখেছেন। ব'লেছেন যে ধনীরা টাকা দিয়ে সাহায্য করতে এলে শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এত হস্তক্ষেপ করে যে কোনও সত্যিকার উন্নতি অত্যন্ত দুরূহ হ'য়ে ওঠেই। আপনি সে বইটা প'ড়েছেন বোধ হয়?"

রাসেল বল্লেন: "হাঁ। তিনি ঠিকই ব'লেছেন। তাহ'লেই দেখছ তাদের কাছ থেকে মৌখিক ছাড়া অন্য কোনো রকম সাহায্য আশা করা কি রকম বিড়ম্বনা হ'তে বাধ্য। কাজেই শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধন করতে হ'লে গভর্মেণ্টের প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেই তা সাধিত করা সম্ভব। এবং এটা সম্ভব হয়—কেবল লোকমতকে প্রবল ক'রে তুলে।"

আমি হেসে বল্লাম: "মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধে আপনার ভরসা ত খুব আশাপ্রদ মনে হচ্ছেনা মিষ্টার রাসেল। আপনার "চীনসমস্যা" বইখানিতেও আপনি এক স্থলে এম্‌নি কথাই লিখেছেন।"

রাসেল বল্লেন: "কি?"

আমি বল্লাম: "তাতে চীনদের মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধে ভরসা রাখার প্রসঙ্গে আপনি লিখেছেন যে they have a touching belief in the efficacy of moral force বা এমনিই কি একটা কথা ও আর একস্থলে লিখেছেন যে Human nature in the mass does as much good as it must and as much evil as it dares. (অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রকৃতির ধর্ম্মই এই যে সে যতটা পারে অপরের মন্দ করে ও কেবল ভাল করে যতটুকু না করলেই নয়।")

—"আমি ব'লেছিলাম Human nature in nations, না?"

—"না আপনি লিখেছেন human nature in the mass—অন্ততঃ আমার যতদূর মনে পড়ছে।"

রাসেল শুধু একটু হাসলেন।

আমি বল্লাম: "কিন্তু মানব-প্রকৃতির মূল প্রবণতাটি যদি ভালর দিকে ব'লে আপনি বিশ্বাসই না করেন তবে সামাজিক সংস্কার চাইলেই বা ফল কি, আর শিক্ষার ফলে মানুষকে উন্নত করার ভরসারই বা ভিত্তি কোথায় বলুন?"

রাসেল ধীর স্বরে বল্লেন: "কি জান? আমার মনে হয় যে মানব-প্রকৃতির মূল প্রবণতাটিকে আসলে ঠিক্ ভালও বলা চলে না মন্দও বলা চলে না। আসলে মানুষকে বাঁচবার জন্যে অহঙ্কারী ও স্বার্থপর হ'তেই হয়। ফলে তাকে কতকগুলি নীতির আশ্রয় নিতে হয় যে সব নীতির ফলে তার বাঁচার সম্ভাবনা বাড়ে। সমাজ বা শিক্ষার সংস্কার যদি এই কয়েকটা মোটা নীতির পরিপন্থী না হয় তাহ'লে লোকমতকে দিয়ে কতকটা কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এইমাত্র।"

আহারের ঘণ্টা পড়ল।

রাসেল আমার বামপাশে বস্লেন, তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে জন আমার দক্ষিণে, তাঁর স্ত্রী, মিসেস ডোরা রাসেল জনের পরে, তাঁর তিন বছরের মেয়ে কেট বস্‌ল আমার সাম্‌নে ও তার পাশে বস্লেন তাঁর শিশুদ্বয়ের গভর্ণেস— একটি তেইশ চব্বিশ বছরের সুশ্রী তন্বী ফরাসী কুমারী।

রাসেল সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় ক'রে দিলেন। যথারীতি কর-মর্দ্দনের পর জনকে বল্লেন: "মিষ্টার রায়— একজন ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক জনি।"

জন আমার দিকে যে ভাবে চাইল তার মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন বিশ্বাস বা স্বাগত-সম্ভাষণের কোনও লেশই যে ছিল না এ কথা জোর ক'রেই বলা যেতে পারে।

আমি তার অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করতে ব্যগ্র হ'য়ে বল্লাম: "ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে কিছু জান কি?"

জন্ তৎক্ষণাৎ বল্‌ল: "জানি বই কি। দেখ না আমার মাথায় কি-রকম একটি পালক জল্-জল্ করছে—রেড-ইণ্ডিয়ানরা—"

রাসেল্ বল্‌লেন: "তোমার একটু ভুল হচ্ছে জন। মাথায় পালক পরে যারা তারা হচ্ছে রেড ইণ্ডিয়ান। মিষ্টার রায় আস্‌ছেন সে দেশ থেকে নয়, তিনি আস্‌ছেন এশিয়া থেকে। যাদের মতন ক'রে তুমি পালক প'রেছ তারা থাকে আমেরিকায়। বুঝলে?"

জন সন্দিগ্ধ স্বরে আপত্তি জানাল: "কিন্তু রেড-ইণ্ডিয়ানরা কি কর্‌তে আমেরিকায় থাক্‌বে? তাদের ইণ্ডিয়ায় থাকা উচিত যে!"

আমাদের মধ্যে একটা হাসির সাড়া প'ড়ে গেল।

তার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে রাসেল হেসে বল্‌লেন: "তোমার আপত্তি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাপারটাকে একটু অন্য দিক্ থেকেও দেখা যেতে পারে যে। দেখ না কেন—মিষ্টার রায়কে ত ঠিক্ 'রেড' বলাও চলে না? তাহ'লে তিনি কেমন ক'রে রেড ইণ্ডিয়ান হ'তে পারেন?"

তর্ক-শাস্ত্রের নিয়মকানুনের প্রতি স্বচ্ছন্দ ঔদাসীন্য দেখিয়ে জন অম্লানবদনে বল্‌ল: "তাহ'লে আমি রেড-ইণ্ডিয়ান হব ব'লে দিচ্ছি কিন্তু। আমি আমার সেই ভীষণ কালো কোটটি প'রে ওঁকে খুন করব।"

ব'লে জনের মুখ গাম্ভীর্য্যসম্পদে ভারি হ'য়ে উঠ্‌ল।

রাসেল আমার দিকে চেয়ে সস্মিত স্বরে বল্‌লেন: "ছেলেপিলেদের ঠিক্ শান্তিপ্রিয় বলা চলে না রায় মহাশয়, চলে কি?"

আমি বল্‌লাম: "না; কিন্তু কেন তারা শান্তি চায় না, মাঝে মাঝে ভাবি।"

রাসেল বল্‌লেন: "কি জান? যুদ্ধ ও রক্তপাতের সংস্কার যে যুগ যুগ ধ'রে আমাদের রক্তে মজ্জায় মেশানো—"

আমি বল্‌লাম: "কিন্তু শিশুদের মনে ছেলেবেলা থেকে চেষ্টা করলে কি যুদ্ধের সংস্কারের পরিবর্তে শান্তির প্রতি অনুরাগ বপন ক'রে দেওয়া যাবে না?"

রাসেল চিন্তিত স্বরে বল্‌লেন: "সেটা ভারি কঠিন। কারণ প্রথমতঃ দেখ না, শান্তিবাণী প্রচারটা একটা নিতান্ত আধুনিক জিনিষ। তার ওপর এটা নানা দিক্ দিয়ে জটিল। কাজেই সরল শিশুর মন সহজে এ জটিলতায় সাড়া দিতে চায় না। অবশ্য তাই ব'লে মনে কোরো না যে আমি বল্‌তে চাচ্ছি যে এ বিষয়ে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। তবে সেটা দুএকদিনে হবার নয়—এই আমার বল্‌বার কথা।"

মিসেস্ রাসেল বল্‌লেন: "জন আগে এতটা মার-মার-কাট-কাট করত না মিষ্টার রায়। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের বাড়ীতে একটি বল্‌শেভিষ্ট্ বালক কিছুদিন ছিল।"

—"কে?"

—"রুষ দেশের Foreign Charge d'Affaire মিষ্টার রসেন গোল্‌ৎসের ছেলে। যে কদিন সে এখানে ছিল সে কদিন সে অবিশ্রান্ত শুধু রক্তপাতের মহিমা কীর্ত্তন ছাড়া আর বিশেষ কিছু করে নি।"

ব'লে মিসেস রাসেল হাসলেন।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম: "ও—তাই! এ ছেলেটিই বুঝি তা'হলে আপনাদের শান্তিপ্রিয়তার প্রচার কাজে বাধা দিয়েছে?"

রাসেল বল্‌লেন: "এখনকার মতন ত দিয়েইছে। তোমাকে বল্‌ছিলাম না যে যুদ্ধের প্রবৃত্তি আমাদের মজ্জাগত?"

—"কিন্তু বারণ করলেন না কেন?"

—"শিশুকে জোর ক'রে বারণ করলে অনেক সময় উল্‌টো উৎপত্তি হয়। ভয়ের বশে নিষিদ্ধ জিনিষটিকে সে চেপে রাখে, কিন্তু এ চাপার ফল কোনও না কোনো ছদ্মবেশে আরও বিষময় হ'য়ে, মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেই—কোথাও না কোথাও।"

—"মানে?"

—"নিষিদ্ধ ফল বেশি লোভনীয় হ'য়ে ওঠেই যে।"

হেসে বল্‌লাম: "তাহ'লে কি আপনি বল্‌তে চান এর কোনো প্রতীকারই নেই?"

—"এ রকম স্থলে অনেক সময়ে সবচেয়ে ভাল পন্থা বোধ হয় শিশুকে ছেড়ে দেওয়া। তাহ'লে কিছুদিন পরে এ রকম প্রবৃত্তিকে নিয়ে খানিক ফোঁস ফাঁস করে; কিন্তু উৎসাহ না পেলে শেষে তার বাষ্প নিঃশেষ হ'য়ে যায়।"

মিসেস রাসেল জন ও কেটকে নিয়ে বেড়াতে বাহির হলেন। রাসেল বল্‌লেন: "ডোরা, তোমরা এগিয়ে যাও,

আমি ও মিষ্টার রায় পরে সমুদ্রের ধারে গিয়ে তোমাদের ধরব।"

বাড়ীর বাইরে সমুদ্রের শীকরসম্পৃক্ত বায়ু ও গাছপাতার শিহরণ তখন গ্রীষ্মের রূপালি সূর্য্যকিরণের সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব্ব শোভার আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছিল।

রাসেল একটি পাইপ টান্‌তে টান্‌তে দ্রুত চল্‌ছিলেন। তাঁর দীন বেশ, সাধারণ জুতা ও মলিন কলার নেকটাই দেখে আশপাশের লোকেরা বোধ হয় তাঁকে গেঁয়ো কৃষকদেরই একজন মনে করছিল। সত্যিই তাঁর চেহারার সঙ্গে কর্ণওয়ালের কৃষকদের চেহারার সাদৃশ্য সেদিন আমার মনে বেশি ক'রেই উদয় হ'য়েছিল।

একথা সেকথায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "লণ্ডনে সেদিন 'আর্কস' খানাতল্লাসী ও তারপর ইংলণ্ডের সঙ্গে রুষদেশের রাজনীতিক সম্বন্ধ ছেদন সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?"

—"নিতান্ত পাগ্‌লামি ক'রেছে আমাদের জাত।"

—"সম্প্রতি রুষদের চীনদেশে বিপ্লবের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ আছে মনে হয় না কি?"

—"সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রেমের এতে এতই বিঘ্ন হ'য়েছে যে একটা যুদ্ধ বেজে উঠ্‌তই যদি ফ্রান্স বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে এতটা উদাসীন না হ'ত।"

—"তার মানে?"

—"ইংলণ্ড পোলাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধাবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে ও পোলাণ্ডকে খুব পিঠ-চাপড়ে বলছে—এগোও, এগোও। কিন্তু হ'লে হবে কি, মুস্কিল হচ্ছে—পোলাণ্ড ফ্রান্সকেই অনেকটা ইষ্টদেবী রূপে বরণ ক'রে ব'সে আছে। তাই ফ্রান্স ঠিক্ এখন একটা বড় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত নয় ব'লে ইংলণ্ডের সদিচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না।"

—"আপনার Prospects of Industrial Civilization বইখানিতে আপনি যে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছেন সেটা খুব সম্ভব মনে হয়।"

—"কি?"

—"যে এর পরের যুদ্ধ বাধ্‌বে দুটো মহাদেশের মধ্যে; একদিকে থাক্‌বে সমগ্র পাশ্চাত্য ও তার পৃষ্ঠপোষক হবে আমেরিকা ও অন্যদিকে থাক্‌বে সমগ্র প্রাচ্য ও তার পৃষ্ঠপোষক হবে রাশিয়া। অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ে রুষদের মতন পাশ্চাত্য জাতির চীনদের মতন প্রাচ্যজাতির দেশে বিপ্লবের যোগান-দেওয়া দেখে মনে হয় যে আপনার ভবিষ্যদ্বাণী শুধু যে সম্ভব তাই নয়—তা ফল্‌তে বেশি দেরিও হবে না বোধ হয়।"

—"খুব ঠিক্। কিন্তু শুধু চীনদেশ নয়, রুষদেশ ভারতবর্ষকেও সাহায্য করবে মনে হয়। অন্ততঃ বড় বড় জাতির মধ্যে কেবল রাশিয়ারই ভারতবর্ষকে সাহায্য করার কোনো স্বার্থ আছে।"

—"কেন?"

—"ইংলণ্ডকে ভাতে মারার জন্যে আর কি। বল্‌শেভিক ইম্পিরিয়ালিস্‌ম্ ও বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিস্‌মের মধ্যের সম্বন্ধটা যে আদায় কাঁচকলায় এ-কথা কে না জানে?"

—"বল্‌শেভিকদের প্রচেষ্টাকে কি ইম্পিরিয়ালিস্‌ম্ নাম দেওয়া ঠিক্ মিষ্টার রাসেল?"

—"কেন নয়?

—"বল্‌শেভিকদের এটা যদি ইম্পিরিয়ালিস্‌মই হয় তাহ'লেও এর পিছনে কি তাদের বড় বড় আদর্শ নেই দুচারটে?"

রাসেল ব্যঙ্গহাস্যের সঙ্গে বল্লেন: "বড় বড় আদর্শ কোন্ ইম্পিরিয়ালিস্‌মের নেই বল? তোমাদের দেশে খুব নিষ্ঠুর আচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কি এক নিশ্বাসে ইংরেজরা বড় বড় আদর্শ লম্বা গলা ক'রে প্রচার করে না বল্‌তে চাও?"

—"কিন্তু আপনি কি সত্যিই বল্‌তে চান যে রাশিয়ার বর্ত্তমান ইম্পিরিয়ালিস্‌মের সঙ্গে ইংলণ্ডের ইম্পিরিয়ালিস্‌মের কোনো প্রভেদ নেই?"

—"অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ রাশিয়ার সত্যিই একটা আদর্শ আছে মনে হয় আমার—তা সে আদর্শ ঠিক্ই হোক্ বা ভুলই হোক্। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের মতন অন্ততঃ অসরল তারা নয় মনে হয়।"

—"অবশ্য রুষদেশকে আমি প্রথমটায় একটু বেশি কাছ থেকে দেখে তার ওপর একটু অবিচার ক'রেছিলাম—"

"তাহ'লেই দেখুন। তাছাড়া রুষজাতি অদূর ভবিষ্যতে জগতের ইতিহাসকে খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করবেই ব'লে মনে করা যায় না কি? কম্যুনিস্‌ম্ সম্বন্ধে—"

"জগতের ভবিষ্যত রাশিয়া যে খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করবে

একথা মানি—বিশেষতঃ তাদের ঈশ্বরে অবিশ্বাস * ও চার্চ্চের ধাপ্পাবাজি ধ'রে ফেলা সম্বন্ধে। কিন্তু কম্যুনিসম্ যে সেখানে খুব সাফল্য লাভ করে নি একথা মানতেই হবে।"

—"এখন করে নি হ'তে পারে, কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে যে-সব ছেলেমেয়েদের এখন শিক্ষা দেবার ভার তারা নিয়েছে তারা গ'ড়ে উঠ্‌লে কম্যুনিস্‌মের আইডিয়াটা সফল হ'তে পারে? অন্ততঃ লেনিনের আইডিয়া ত ছিল তাই। নয় কি?"

রাসেল চিন্তিত সুরে বল্‌লেন: "সেটাও বলা কঠিন। কি জান? ছেলেমেয়েদের কোনও একটা নীতি খুব জোর ক'রে গিলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে প্রায়ই তারা পরে ঠিক্ উল্‌টো দিকে পরিণতি নেয়। দেখ না কেন খৃষ্টধর্ম্মের একটা প্রধান নীতি বিনয় ও অহিংসা, বটে ত? কিন্তু পাশ্চাত্যের বর্ত্তমান খৃষ্টিয়ান প্রভুদের সংস্করণ দেখলে কি তা মনে হয়? বর্ত্তমান খৃষ্টিয়ানদের সম্বন্ধে আমি Why I am not a Christian † ব'লে একটি লেকচারে একথা ব'লেছিলাম।" ব'লে একটু হাস্‌লেন।

হেসে বল্‌লাম: "পড়েছি সেটা।" ব'লে একটু থেমে বল্‌লাম: "কিন্তু তাহ'লে কি আপনি বল্‌তে চান যে নীতি প্রভৃতি মানুষের মনে চারিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে কোনও ফলই হবার সম্ভাবনা নেই? মানুষের মূল বিশ্বাস ও প্রত্যয়গুলি যদি সমাজের ওপর কোনও ছাপই না ফেলে তবে সমাজের সংস্কার হবে কেমন ক'রে?

—"মানুষের বিশ্বাস ও প্রত্যয়গুলির কোনটি যে কখনো সমাজে কোনও প্রভাব বিস্তার করে না এমন কথা ত আমি বলি নি। কোনো কোনো বিশ্বাস আছে যার ফল সমাজে ফলে। খৃষ্টিয়ানদের গুটীকয়েক সাক্রামেণ্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে ভুয়ো বিশ্বাসের ফলে পাশ্চাত্যে ডাইভোর্সের আইনের কড়াকড়ি প্রায় উন্মত্তের মতন বেড়েছে; শিশু জন্ম নিবারণের বৈজ্ঞানিক উপায় প্রভৃতি বর্জ্জন করাতেও এ বিশ্বাস অনেকটা কার্য্যকরী হ'য়েছে। কিন্তু খৃষ্টিয়ানদের শান্তিপ্রিয়তা ত খৃষ্টের কোনো নীতি বা বিশ্বাসেই বাড়েনি।"

—"তাহ'লে কি বল্‌তে চান আপনি?"

—"শুধু এই যে অন্ততঃ ধর্ম্ম বিষয়ে কেবল সেই সব বিশ্বাস আমাদের মনের ওপর ছাপ ফেলে যে-সব বিশ্বাস নিছক মন্দ।"

দুজনেই হেসে উঠ্‌লাম। (ক্রমশঃ)

---

* তাঁর Why I am not a Christian বইখানিতে রাসেল তাঁর নাস্তিকতাবাদের সমর্থনে বলছেন যে জগত থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ যে সিদ্ধান্ত সচরাচর ক'রে বসে তার পিছনে একটা মস্ত যুক্তি উহ্য থাকে; সেটা এই যে এ জগতের আশ্চর্য্য গঠন-পদ্ধতি (design) দেখে একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস আসেই। এ যুক্তির উত্তরে রাসেল বলছেন: "When you come to look into this argument from design, it is a most astonishing thing that people can believe that this world, with all the things that are in it, with all its defects, should be the best that omnipotence and omniscience has been able to produce in millions of years. I really cannot believe it. Do you think that, if you were granted omnipotence and omniscience and millions of years in which to perfect your world, you could produce nothing better than the Ku Klux Klan, the Fascisti and Mr. Winston Churchill?"

† তাঁর পূর্ব্বোক্ত লেকচারে রাসেল বলছেন: You will remember, that he (Christ) said, 'Resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also."...I have no doubt that the present Prime Minister, for instance, is a most sincere christian, but I should not advise any of you to go and smite him on one cheek. I think that you might find that he thought this text was intended in a figurative sense.

ধর্ম্মের কল

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপর্য্যুপরি ছয় ছয়টি পুত্রকে ২।৩ বৎসরের করিয়া যমের হাতে দিয়া অন্নপূর্ণাদেবী সত্য সত্যই পাগলের মত হইয়া পড়িলেন। অবিনাশবাবু জেলা কোর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল; বহু অর্থ, অগাধ সম্মান, বিশাল অট্টালিকা সব পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য পত্নীকে লইয়া তীর্থে ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বেড়াইবার জন্য বাহির হইলেন। উদ্দেশ্য, এতদ্বারা অন্নপূর্ণার নষ্ট স্বাস্থ্য ও ততোঽধিক বিধ্বস্ত মানসিক অবস্থা যদি ফিরে, তবু অপুত্রক থাকিয়াও সংসারে কিছু শান্তিতে বাস করিতে পারিবেন।

যাগ যজ্ঞ হোম স্বস্ত্যয়ন গ্রহশান্তি কবচ মাতুলী পুষ্প মানসিক বঙ্গদেশে ও বঙ্গের বাহিরে যত কিছু পুত্রের অকাল-মৃত্যু নিবারণের দৈব উপায় ইঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহার কোনটাও করিতে যখন বাকী রহিল না—তখন ডাক্তারী হাকিমী ইউনানী আয়ুর্ব্বেদীয় টোটকা বহুবিধ চিকিৎসার উৎপীড়নে প্রসূতিকে, অবিনাশবাবু ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। একটি পুত্র কামনায়, একটিমাত্র পুত্রের দীর্ঘজীবন জন্য অন্নপূর্ণা আপত্তি তো কিছু করিলেনই না, বরং যাহা কিছু বাদ পড়িল, সে গুলিকে পর্য্যন্ত পরীক্ষা করাইতেও স্বামীকে উঠিয়া পড়িয়া ধরিয়া বসিলেন। পুত্র-শোকাতুর নিতান্ত নিরীহ অবিনাশবাবুও দ্বিগুণ বেগে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু এত চেষ্টাতেও কোন সুফল ফলিল না—ষষ্ঠ পুত্রও, পূর্ব্বগত পাঁচজন অগ্রজের মতই ঠিক তিন বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করিল। পিতামাতা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, তবু এবার তাঁহারা একবারে দমিয়া গেলেন। তাবৎ চিকিৎসা-শাস্ত্রে ও দৈবে সমস্ত বিশ্বাস হারাইয়া অবিনাশ বাবু হতাশায় কঠোর হইলেন, আর অন্নপূর্ণাদেবী ছয় ছয় বার পুত্রশোকে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন।

ইঁহারা প্রথমেই আসিলেন কাশীতে। বাড়ী রহিল সরকারের জিম্মায়। কাশীতে বাঙ্গালীটোলায়, গঙ্গার ধার-পানে একখানি দোতলা মাঝারি বাড়ী ভাড়া করিয়া, অবিনাশ বাবু ও অন্নপূর্ণা নূতন করিয়া সংসার পাতিলেন। অন্নপূর্ণার মাথার সব সময়ে ঠিক থাকে না বলিয়া অবিনাশ বাবু সর্ব্বদাই স্ত্রীর কাছে কাছে থাকিতেন ও সান্ত্বনা-শান্তিদায়ক দুই চারিটি কথাবার্ত্তা কালে-ভদ্রে কহিতেন, বাকী ক্ষণ উভয়ে একরূপ নীরবেই থাকিতেন। অবিনাশ বাবু ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতেন, অন্নপূর্ণা শিবপূজাদি লইয়া কাল কাটাইতেন। সকাল সন্ধ্যা উভয়েই একত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুর দর্শন করা ছাড়া আর কোথাও তাঁহাদের যাওয়া আসা বা কাহারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় মেলামেশা একেবারেই ছিল না।

কাশী বঙ্গদেশের বাহিরে হইলেও, কাশীর বাঙ্গালী-টোলাটিকে বঙ্গের অধিবাসীদের একটি প্রদর্শনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কারণ, এখানে বাঙ্গালীর গুণী জ্ঞানী ধার্ম্মিক পণ্ডিত হইতে বাঙ্গালীর চোর ডাকাত নচ্ছার দাগী পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর মহাপুরুষই বিরাজ করেন। বাঙ্গালী প্রতিবাসীরা অবিনাশ বাবুদের সম্বন্ধে নানাবিধ কুৎসা রটনা করিলেন; কারণ ইঁহারা কোথাও যান্ না বা কাহাকে আমন্ত্রণও করেন না; কারো কথা শুনেনও না, কাহাকেও কোন কথা বলেনও না। নানা কাহিনী নানাভাবে বহুমুখে ফিরিতে লাগিল; অবিনাশ ও অন্নপূর্ণা উভয়েই শুনিলেন, কোনও প্রতিবাদ করিলেন না।

তীর্থ-মাহাত্ম্যেই হউক অথবা স্থান-পরিবর্ত্তনেই হউক, অন্নপূর্ণার শরীর বেশ সারিতে লাগিল, মনও অল্পে অল্পে প্রফুল্ল হইতে আরম্ভ হইল—অবিনাশ বাবু আঁধারে আলোক-রশ্মি দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। পুত্রশোকের এমন

সর্ব্বনাশা আগুনও কালের ধূলাপাতে নিভিতে লাগিল। এক বৎসরের মধ্যেই অন্নপূর্ণা, কাশীতে একটি কন্যা প্রসব করিলেন—আঁতুড়েই তুক্-তাক্ করা হইল; তাহার নাম হইল শিবানী।

শিবানী জন্মিবার ৪।৫ মাস পূর্ব্বে একটি অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। অবিনাশ বাবু কালভৈরব দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন; সন্ধ্যা হয় হয়; পথিমধ্যে একটা ছোট গলির ভিতর, আরও ছোট একটা একতলা বাড়ীর সম্মুখে বহু জনসমাগম দেখিয়া অবিনাশ বাবু কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইলেন। ভীড় ঠেলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৌরবর্ণ সুন্দর ৬।৭ বৎসরের একটি বালককে বহু পুলিশ কর্ম্মচারী ও স্থানীয় ভদ্রলোক মিলিয়া নানা প্রশ্নে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে; বালক কেবল কাঁদিতেছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া, কয়েকজন দর্শককে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, পুলিশের প্রশ্নমালা শুনিয়া—অবিনাশ বাবু প্রকৃত ব্যাপারের কতকটা যাহা আন্দাজ করিলেন তাহা এই—বালকের নাম শশাঙ্ক; তাহার নিবাস কলিকাতায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, পিতার নাম পশুপতি। এখানে সে তাহার মাতার সঙ্গে অল্পদিন হইল আসিয়াছিল; তাহার পাশের বাড়ীর কাকা তাহাদিগকে এখানে রাখিয়া গিয়াছিল; কাকার নাম সে অবগত নয়। তাহার পিতাকে সে কখনও দেখে নাই; তিনি জীবিত কি মৃত—অথবা কোথায় তাহা সে জানে না। অবিনাশ বাবু একজন বিশেষ পারদর্শী উকিল; রহস্য কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারীকে গিয়া নিজের নাম ধাম ও বর্ত্তমান ঠিকানা দিয়া বালকটিকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন—পুলিশ বাঁচিল; বালককে অবিনাশ বাবুর জিম্মায়, তাঁহার বাসা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। বালকের মা আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহার তদন্ত চলিতে লাগিল। ডাক্তার শব পরীক্ষা করিয়া জানাইলেন, মৃতার গর্ভে ৪।৫ মাস বয়স্ক একটি ভ্রূণ ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্গ ও আসাম কিম্বা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশেও যেমন হয়, যুক্তপ্রদেশের পুলিশও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিল না। অর্থাৎ বহু ঘোরাঘুরি, অকারণ অনেক নির্দ্দোষকে সন্দেহ ও লাঞ্ছিত করিয়া, সরকারের অনেক অর্থ অপব্যয় করাইয়া, কাশীর মহামান্য প্রবলপ্রতাপ পুলিশের দারোগা শেষ রিপোর্ট দিলেন, যে রমণী আত্মহত্যা ঠিকই করিয়াছিল—কিন্তু এই আত্মহত্যার ভিতরে যে রহস্য নিহিত আছে, তাহা উদ্ঘাটিত হইল না। তাহার দুইটি কারণ, এবং এই দুই কারণের মধ্যে একটির জন্যও পুলিশ দায়ী নহেন। কারণ দুইটি এই—প্রথম, ৬।৭ বৎসর বয়স্ক মৃতার বালক পুত্র আসামীকে সনাক্ত ও গ্রেফ্‌তার করিয়া পুলিশের হাতে পৌঁছাইয়া দিতে অক্ষম,—যদিও পুলিশ বালককে দিয়া চেষ্টার ক্রটি করে নাই; এবং দ্বিতীয় কারণ, মৃতা আত্মহত্যার পূর্ব্বে পুলিশকে কোনও রূপ সন্ধানসূলুক না দিয়া নিজের মনে গোপনে আফিম ভক্ষণ করিয়া পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বেমালুম মরিয়াছে; এবং উক্ত রমণী জীবিত থাকিতে পুলিশকে কোনও বিষয়ের কোন সংবাদই দিয়া যায় নাই। অতএব এই দুই কারণের জন্য অর্থাৎ সাধারণের সাহায্য না পাওয়ায় পুলিশের শত চেষ্টা সত্ত্বেও এ রহস্য উদ্ঘাটিত হইল না।

প্রায় দুই বৎসর কাল ধরিয়া পুলিশ বহু নির্দ্দোষ ভদ্র-সন্তানকে লাঞ্ছিত করিয়া, অবশেষে নিরস্ত হইল। অবিনাশ বাবুও দেশে ফিরিলেন। অন্নপূর্ণাদেবীর শোকাবেগ শিবানী যতটা নিবারণ করিয়াছিল, এই গোত্রহীন সুন্দর সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার শশাঙ্ক তদপেক্ষা অনেক বেশী করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অবিনাশ দেশে ফিরিয়া, ঘনঘন কলিকাতা যাতায়াত করিয়া, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া, কলিকাতা পুলিশের সাহায্য লইয়া, শশাঙ্কের প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অগত্যা শশাঙ্কও অবিনাশ বাবুর পুত্রহীন গৃহে ও অন্তরে পুত্রের শূন্য সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিল। যদিও কর্ত্তব্যের খাতিরে অবিনাশ বাবু শশাঙ্কের পিতৃ-পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দুইজনের কাহারও আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না যে শশাঙ্কের কোনও ঠিকানা হয়। হইলও তাই—শশাঙ্ক যে বেওয়ারিশ ছিল, সেই বেওয়ারিশই রহিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—"শশির আর পরিচয়ের দরকারই বা কি? বামুনের ছেলে ত বটে, এই যথেষ্ট।"

অবিনাশবাবুও ব্রাহ্মণ; গৃহিণীর কথায় সায় দিয়া উত্তর করিলেন—"তা বৈকি। এ ভগবানের দান—বাবা বিশ্বনাথ আমাদের কষ্ট দেখে, আমাদিকে দিয়েছেন।"

অন্নপূর্ণার শোকসাগর আলোড়িত হইয়া চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। অবিনাশবাবু উঠিয়া গেলেন।

এদিকে শশাঙ্ক দিন দিন শশিকলার মতই বাড়িতে লাগিল। ধনীর ঘরে পর্য্যাপ্ত বিলাসে এবং পুত্রহীনের গৃহে আনন্দদুলালরূপে, শশাঙ্ক অত্যল্পকালের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভায় সকলকে মোহিত করিয়া ফেলিল। অবিনাশবাবু নিজ পুত্রনির্ব্বিচারে শশাঙ্কের ঐহিক সমস্ত বিষয়ের সুবিধা হইবে ভাবিয়া, বালককে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু শশাঙ্ক সহরের ঐ দিক্‌টা একেবারেই মাড়াইত না। এই প্রথম অবিনাশ বাবুর সঙ্গে তাহার মতের অমিল হইল; অবিনাশবাবু শশাঙ্ককে বহুবার বলিয়াছেন, যেন দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে না মিশে ও মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করে; শশাঙ্ক সমস্ত স্কুলটাকেই দুষ্ট ছেলেদের আড্ডা ভাবিয়া, স্কুলটাই ত্যাগ করিয়াছিল এবং পড়াশুনার ফল অনিশ্চিত জানিয়া উক্ত কার্য্যে সে সময় নষ্ট করিতে রাজী হইল না।

অবিনাশ বাবু স্থানীয় হাইস্কুলের সেক্রেটারী। হেড্ মাষ্টার বাবু এম্-এ পাশ করিয়া, এই প্রথম চাকরীতে নামিয়াছেন; কাজেই ছেলেদিগকে লইয়া তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। ছেলেরা যাহাই ভাবুক, তাহাদের অভিভাবকেরা হেড্ মাষ্টারের কাজে বড় খুশী, যেহেতু ইনি প্রত্যেক ছাত্রের রীতিমত খোঁজখবর রাখিতেন এবং যাহাতে ছেলেরা ইতিহাস ভূগোল জ্যামিতি সব অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

কিন্তু এ হেন হেড্ মাষ্টারও শশাঙ্ক বাবাজীবনের কিছু করিতে পারিলেন না। বে-সরকারী হাইস্কুলের সেক্রেটারীর সাদরের পালিত পুত্রকে নেত্রাঘাত পর্য্যন্ত বড় জোর চলে; কিন্তু বেত্রাঘাত?......অসম্ভব। একদিন ইনি শেষোক্ত শাসন-প্রণালীতে শশাঙ্ককে রাহুমুক্ত করিতে গিয়াছিলেন; তাহাতে শশাঙ্ক প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উপর জ্যোৎস্না বৃষ্টি না করিয়া, লোষ্ট্রবৃষ্টি করিয়া শহরে বেশ একটা গোর-গোলের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। অল্প কয়েক দিন পরেই শোনা গেল, নূতন অভিজ্ঞ পারদর্শী হেড্ মাষ্টার আনিতেছেন—বর্ত্তমান ইনি শিক্ষাকার্য্যে মোটেই পটু ন'ন্। দুর্জ্জনেরা দুষ্কথা রটাইল, অবিনাশবাবু তাহা শুনিয়াও কাণে তুলিলেন না।

নূতন হেড্ মাষ্টার আসিলেন। কতক লোক বলিল, এই ঠিক্, বেশ ভারিক্কী—অভিজ্ঞ, এ না হলে কি একটা হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার মানায়? হেঁঃ। অন্য একদল বলিল, কি পছন্দ? এই সব বুড়ো সাবেকী গুরুমশাই দিয়ে যদি লেখাপড়া শেখানো চল্‌ত' তাহলে গবর্ণমেণ্ট কি, শিক্ষা-বিভাগের জন্য বছর বছর এত টাকা খরচ কর্‌ত, না এত কড়াক্কড়ি নিয়ম কর্‌ত? এ যুগের ছেলে পড়াতে, এই যুগেরই শিক্ষিত লোক চাই। এঃ—এমন হাইস্কুলটা এইবার যামিনী পণ্ডিতের পাঠশালা হয়ে পড়্‌ল ইত্যাদি—

দেখা গেল, হাইস্কুল, হাইস্কুলই রহিল এবং সাবেকী হেড্ মাষ্টারই পঁচিশ টাকা অধিক বেতনে নিযুক্ত হইয়া কায়েম হইলেন।

বুদ্ধিমান্ লোকেরা দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করে। এই নূতন শিক্ষক মহাশয় অযাচিতভাবে প্রত্যহ সন্ধ্যায় অবিনাশ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া শশাঙ্ক বাবাজীবনকে পাঠাভ্যাস করাইয়া যাইতেন। অবিনাশবাবু প্রথম প্রথম অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন; শেষে কিছু পারিশ্রমিক লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন;—কিন্তু শিক্ষক মহাশয়, অধ্যাপনা ও পরহিতার্থে এমনি কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, ভীষ্মের ন্যায় তিনি অটল, অবিচলিত ও অকম্পিত।

অন্নপূর্ণা দেবী ভুলিয়া গিয়াছেন, যে, শশাঙ্ক তাঁহার গর্ভে জন্মায় নাই। রাত্রে স্বামীকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে একদিন বলিলেন—"এ মাষ্টারটি বেশ, বড্ড ভাল—আমার শশিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, দেখেচ'? একে যেন আর তাড়িও না।"

অবিনাশবাবু কহিলেন—"নাঃ, তাড়াব' কেন? এ পড়ায়ও ভাল। যতই হোক্, বয়েস হয়েচে, অনেক স্কুল ঘুরেচে কি না?—জানে কি করে' পড়াতে' হয়! হেড মাষ্টারী কি আর একটা ছোঁড়া ফোঁড়াকে মানায়, না তা'রা পারে?—"

গৃহিণী প্রীত হইলেন। যথাসময়ে সতের বৎসর বয়সে শশাঙ্ক মাতৃকুলাশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশও হইল। হেড্ মাষ্টারের স্ত্রীকে অন্নপূর্ণা একজোড়া সোনার চুড়ী উপহার দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই সময় আর একটি মহা আশ্চর্য্য ব্যাপারে অন্নপূর্ণা অবিনাশবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এ ব্যাপার দেখিয়া ইঁহারা উভয়েই যুগপৎ বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং বিষয়টি যে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নয়, তাহাও ভাবিতে কৃপণতা করিলেন না। এই দশ বৎসরকালের মধ্যে, শশাঙ্কের আওতায় শিবানীর বয়স দশ বৎসরের হইয়াছে! এতদিন শিবানীকে কেহই বাড়িতে দেখে নাই—এখন শশাঙ্ক কলিকাতায় আই-এ পড়িতে গেলে, অন্নপূর্ণা আবিষ্কার করিলেন, যে, শিবানী দশ বৎসরে পড়িল।

অবিনাশবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তাই তো!"

অন্নপূর্ণা স্বামীর কর্ত্তব্যজ্ঞানটি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কহিলেন—"তা' হলে এখন থেকেই একটা ভাল পাত্রটাত্র দেখ্‌তে থাক'।"

অবিনাশবাবু, মক্কেলের পুরাতন দলিল ও বিপক্ষের আর্জ্জির জবাবের নকল দেখিতে দেখিতে, একবার মুখ তুলিয়া করুণ নয়নে নিবেদন করিলেন—"পাত্র তো দেখ্‌চি, কিন্তু বিপক্ষও তো পাত্রী দেখতে ছাড়্‌বে না। তখন?"

অন্ন। তা' তোমার মেয়ে এমন খারাপ কি? রংটাই একটু চাপা বৈ তো নয়?

অবি। শুধু রংটা চাপা হলে তো বুঝ্‌তাম্—নাকমুখও যে চাপা—গিন্নি; এ শোধ্‌রানো যায় কি করে'?

অন্ন। টাকায় সব শুধরে যাবে—

অবি। আগে যেত', আজকাল শুধু টাকাতেও হয় না।

অন্ন। কেন, ঐ তো অতুলবাবুর মেয়ের বিয়ে হলো সেদিন! সে মেয়ে কি আমাদের শিবুর চেয়ে সুন্দরী?

অবি। অতুল বাবুর বাড়ী যেতে হবে কেন—আমাদের বাড়ীতেই তো তার চেয়েও বড় নজির বর্ত্তমান্—

স্বামীর ঈদৃশ মন্তব্য শোনা অন্নপূর্ণার বহুদিনের অভ্যাস এবং তিনি যে পরম কুৎসিতা, এই সত্য কথাটি তিনি নিজে বুঝিতেন বলিয়া, অন্য কেহ ইহা বলিলে তাহার প্রতিবাদ বা তাহাতে কোনও রাগ বা অভিমান তিনি কখনও করিতেন না। ঐটুকু মহত্ত্ব তাঁহার চিরদিনই আছে। কিন্তু কন্যার সম্বন্ধে তাদৃশ ঔদার্য্য তিনি কখনই দেখাইতে পারিতেন না। একটু ঝাঁজের সহিত কহিলেন—"সে নজিরে আর ফল কি? তার বিয়ের ভাবনা তো আর মশায়কে ভাব্‌তে হয় নাই, বা এখনও হচ্ছে না। এখন, যার কথা বল্‌চি, তার কথা ভাব'। আর এ মেয়ে তার মায়ের চেয়ে অনেক ভাল।"

মেয়ে যেমনি হউক্, বাপ মা সুপাত্রই খোঁজে; অবিনাশবাবুও তার ব্যতিক্রম করিলেন না;—কিন্তু যাহারা মেয়ে দেখিয়া গেল, তাহারা আর কোনও উচ্চবাচ্য করিল না। যাহারা মেয়ে দেখে নাই, তাহারা অর্থের প্রলোভনে আসিল, কিন্তু কন্যা দেখিয়া অম্লানবদনে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মত পলাইয়া বাঁচিল। জনৈক পাত্রের মাতুল কন্যা দেখিতে আসিয়া স্পষ্টই বলিল—"অর্থ মনর্থং কথাটা খুবই সত্য। অর্থের জন্য এ কার্য্য কর্‌লে, ভাগ্‌নে আমার সত্যি সত্যিই অনর্থ কর্‌ত।" বক্তার ভাগ্‌নেটি চারবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করতঃ, এখন হাওড়া মাল গুদামে 'মার্কা বাবু'—বেতন ২৮ টাকা। উপুরি মাসিক টাকা পনের, দিন আটগণ্ডা পয়সার মা'র নাই।

পাত্র অনুসন্ধানে আরও দুই বৎসর গেল। শিবানীর বয়স হিসাবে দ্বাদশ হইলেও, দেখিতে প্রায় ১৫।১৬ বৎসরের যুবতীর মত হইল। শশাঙ্ক আই-এ পাশ করিয়া কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিল।

বলিতে ভুলিয়াছি, অবিনাশবাবু শশাঙ্ককে রায় উপাধি দিয়াছিলেন। গৃহিণী ধরিয়াছিলেন যে শশাঙ্ককেও ভাদুড়ী উপাধি দিয়া স্বগোত্র করিয়া লইতে; কিন্তু প্রবীণ উকীল স্বামী তাহাতে স্বীকৃত হন্ নাই। গৃহিণী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কেন? তাহাতে কর্ত্তা উত্তর দিয়াছিলেন—রায়কে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে ভাদুড়ী করা সোজা, কিন্তু একবার ভাদুড়ী হইলে, শশাঙ্ককে আর অন্য একটা কিছু করা বড় শক্ত হইবে। তা' ছাড়া রায় উপাধিটা রাঢ়ী, বারেন্দ্র উভয় সমাজেই যে কোনও জাতির উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ কিছুতেই বাধিবে না। কি জানি যদি তাহার পিতার সন্ধান কখনও পাওয়া যায়?

অন্নপূর্ণার হঠাৎ স্বামীর বহুকাল পূর্ব্বের সারগর্ভ এই কথাটি স্মরণ হইল; কহিলেন—"তবে, শশির সঙ্গেই শিবুর বিয়েটা দিয়ে দাও না কেন?"

পত্নীর কথায় অবিনাশবাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এ কি একটা কথা হ'ল, গন্নি? কুল গোত্র পরিচয় কিছুই

এর জানি না,—তা' ছাড়া এর জননীর রহস্যপূর্ণ আত্ম-হত্যার কথা জেনেও এ কথা তুমি কি করে বল্‌লে যে, একে মেয়ে দাও। ছিঃ—মেয়ের বিয়ে তো পালিয়ে যাচ্ছে না। বাঙ্গলা দেশে অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য সব জিনিষের দারুণ অভাব সত্য, কিন্তু পাত্রের অভাব হয়েচে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না! প্রাণ গেলেও, না।"

অন্ন। তুমি না কর্‌তে পার'—কিন্তু আমি যে বিশ্বাস কর্‌তে বাধ্য হচ্ছি। কৈ, এই তো দু'বছর ধরে' চেষ্টা চরিত্তির কর্‌চ' এত, কিছু কর্‌তে পার্‌লে?

অবি। না পারার কারণ রয়েচে না? আমরা তো দোজবরে' বর খুঁজি নাই। এইবার থেকে তাও খুঁজ্‌ব'—অথচ বয়স কম, প্রথম পক্ষের কোনও ছেলেপিলে কিছু নাই, এম্‌নি। দেখ' না, কত পাত্র পাওয়া যায়, এখনি!

অন্ন। বচন-সর্ব্বস্ব উকীল কি না? মুখে তো হঠ্‌বে না—কাজের বেলাতেই ঘণ্টা—

অবি। আরে, তোমার মোকদ্দমা যে বড্ড খারাপ, গিন্নি! ভাল উকীল তো দিয়েচ, টাকাও খরচ কর্‌বে—কিন্তু আসল জিনিষে যে পদার্থ নেই—

অন্ন। ও—এই উকীল তুমি? ভাল মকদ্দমা ছাড়া বুঝি জিত্‌তে পার' না?

অবি। তুমি মেয়ে মানুষ, তোমায় আর কি বল্‌ব, বল! বরের বাপকে বোঝান' যে কত কঠিন, তা' এতদিনে বুঝ্‌চি। আদালতে হাকিমদিকে বোঝাতে বল', এক্ষুণি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যা' বল্‌বে তাই।

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, তাঁহার স্বামী ওকালতী পাশ করা সত্ত্বেও একটি আসল জীব। তাঁহার উপর নির্ভর না করিয়া কন্যা শিবানীকে কিরূপে সৎপাত্রস্থ করা যায়, এই চিন্তাই তাঁহার দারুণ দুশ্চিন্তায় পরিণত হইল।

সময় যেমন কাটে, তেমনি কাটিতে লাগিল। শিবানী জনক জননীর স্নেহে ও আদরে আরও বড় ও বিপুল-দেহ হইতে লাগিল। কেনা শেমিজ ব্লাউস্ শিবানীর গায়ে ছোট হয়, এবং ফর্‌মাশ্ দিয়া তৈরি করাইতে গেলে সাধারণ মূল্য অপেক্ষা তিন গুণ দাম পড়ে দেখিয়া পিতা কন্যার দেহের পরিধি কিঞ্চিৎ কমাইবার জন্য অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলেন। অচিরাৎ তাহাতে কোনও সুফল ফলিল না দেখিয়া পিতামাতা উভয়েই কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরও দুই বৎসর গেল। শশাঙ্ক বি-এ পাশ করিল। দেহে বাতব্যাধির প্রকোপে অবিনাশবাবু শয্যাশায়ী হইলেন, অন্নপূর্ণা হৃদরোগে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তবু শিবানী চৌদ্দ বছরের হইল এবং দেহের পরিধি যেমন ছিল, তেমনি রহিল। যৌবনের প্রারম্ভে কিশোরীরা দেখিতে একটু শ্রীলাবণ্যসম্পন্ন হইয়া থাকেই সাধারণতঃ, কিন্তু শিবানীর ঠিক তার বিপরীত ঘটিল। অবিনাশবাবু সত্য সত্যই এইবার পাত্রানুসন্ধান বন্ধ করিলেন। গৃহিণীও ভাবিলেন, অদৃষ্টে যা' থাকে হবে। শিবানী নিজের বিপুল দেহভারে অবসন্ন কিন্তু বিবাহ বিষয়ে নির্ব্বিকার; শশাঙ্ক চুল ছাঁটা, টেরিকাটা, সিগারেট খাওয়া, একটু আধটু ড্রিঙ্ক করা, কাপড় জামা জুতার পারিপাট্য লইয়া—শিবানী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন; এমন কি একরকম নিশ্চিন্তই বলা যায়।

অন্নপূর্ণা হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন—"এখনো কি তোমার শশির সঙ্গে শিবুর বিয়েতে অমত আছে?"

অবিনাশ বাতের যন্ত্রণায় কাতরাইতে কাতরাইতে উত্তর দিলেন—"বড় বিশেষ নাই। মত বদ্‌লেচি। আমাদের আর কোনও ছেলেপিলে যখন নেই—তখন আর ভাবনা কি?"

অন্ন। আমি তো এই কথাই দু'বছর আগে বলেছিলাম।

অবি। হাঁ, তখন শুনি নাই—তা'হলে লোকে আমায় বল্‌ত স্ত্রৈণ। এখন তা'হলে আর ভাববার তেমন কিছু আছে কি? তবে বল্‌তে নাই, এমন বস্তা বোঝাই মোটার লরি, শশাঙ্ক পছন্দ কর্‌লে হয় আবার—

অন্ন। হেঁঃ, ওর আবার পছন্দ অপছন্দ কি? বর্ত্তে যাবে—আমাদের মেয়ে বিয়ে করে' ও জা'তে উঠ্‌বে!

অবি।—জাতে উঠবে কি জাঁতায় উঠবে, বলা কঠিন। যাই হোক, তবে বাবাজীকেই পাকড়াও কর'—

অন্ন। তুমি বল্‌লেই ভাল হয়, হাজার হোক্ তুমি পুরুষ মানুষ; তোমাদের কথার এক দাম, আর আমরা মেয়ে মানুষ, বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই—আমাদের কথার দাম এক—

অবি। আমি পুরুষ এবং তুমি স্ত্রী—এতে কোনও সন্দেহ নাই, সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবে, জানি; কিন্তু এই অনিশ্চিত প্রস্তাবটা না হয় তুমিই করলে। ক্ষতি কি? তোমার কথায় আমি বাহাস্ (বক্তৃতা) করতে পারি; সেইটেই ভাল হবে।

অন্ন। বেশ, তাই হবে।

যথাসময়ে অন্নপূর্ণা শশাঙ্ককে এই শক্তিশেল সন্ধান করিলেন। শশাঙ্ক অবাক্। সে যে কি বলিবে, বা কি তাহার বলা উচিত, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, মাথা-ঘোরা ভাল করিবার জন্য উঠিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া গিয়া একটু আশ্বস্ত হইল।

অবিনাশবাবুকে অন্নপূর্ণা শশাঙ্কের নীরব উত্তর যথাসময়ে জ্ঞাপন করিলেন। অবিনাশবাবু সত্যই প্রমাদ গণিলেন; অন্নপূর্ণার মনটাও শশাঙ্কের উপর আর তেমন খুশী রহিল না। শিবানী যাহাই হউক্, তাঁহার পেটের সন্তান তো?

অন্নপূর্ণা কাঁদ'-কাঁদ' ভাবে কহিলেন—"দেখ্‌লে, পরের ছেলে কা'কে বলে?"

অবিনাশবাবু মুখে দমিলেন না, কহিলেন—"সোজা আঙুলে কি ঘি পড়ে, গিন্নি? এত সহজে লোকের কন্যাদায় উদ্ধার হয় না। কথায় বলে, লক্ষ কথা নৈলে বিয়ে হয় না। আমার কাছে এর ব্রহ্মাস্ত্র আছে, দাঁড়াও না—কা'ল সকালেই দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রাত্রিটা কাটিল। প্রভাতে চা পানের পর অবিনাশ-বাবুর ঘরে শশাঙ্কের ডাক পড়িল। শশাঙ্ক খাঁচার বাঘের মত আসিয়া দাঁড়াইল, কারণটা সে একটু-আধটু আঁচ করিয়াই আসিয়াছিল।

অবিনাশবাবু ধীরে ধীরে কহিলেন—"তা' হলে, শশি, এখন কি করবে? ঠিক করেচ'?"

শশাঙ্ক বলিল—"আপনি যা' বলেন।"

অবিনাশ। আমি আর কি বলব? আমার এই অসুখ বিসুখে হাতের টাকা তো প্রায় সবই খরচ হয়ে গেল, এবং রোজই যাচ্ছে—উপায় তো বন্ধই দেখ্‌তে পাচ্ছ। যা' কিছু রইল'—ঐ জমিদারী। তা' ছাড়া, মেয়ের বিয়ে এ বছর আমায় দিতেই হবে. আর দেরী করা যায় না। আর এতেই মোটা খরচ। তারপর জামাই বাবাজী যদি বি-এ, এম্-এ পাশ করা হন্, তা'হলে তাঁকে একটা ডেপুটিগিরিতে ঢোকাতে হবে ত'—তাতেও একটা খরচ আছে। যদিও আমাদের অবর্ত্তমানে আমার যা' কিছু আছে, সবই মেয়ে জামাইয়ের তবুও আমি থাকতে থাকতে জামাইয়ের একটা হিল্লে তো কিছু করে দিয়ে যেতে হবে? বসে' বসে' খেলে আর এ ক'দিন? তাই ভাব্‌চি, তোমাকে এম্-এ পড়াতে তো আর আমি পার্‌ব না। তুমি বরং একটা চাকুরী-বাকুরী এরই মধ্যে কোথাও জুটিয়ে নাওগে; দেখ্‌চ' তো দিন সময়।

শশাঙ্কের মাথায় বজ্রাঘাত হইলেও, সে এর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হইত না। কারণ সে জানিত যে অবিনাশবাবু তাহাকেই পোষ্যপুত্র লইয়াছেন, এ সমস্তই তাহার। অন্তত-পক্ষে তাহার জন্য মোটামুট একটা সুব্যবস্থা ইনি নিশ্চয়ই করিয়া যাইবেন। কাজেই, এ বিষয়ে সে একবারে নিশ্চিন্তই ছিল।

অবিনাশ। কি ভাব্‌চ।

শশাঙ্ক। আজ্ঞে, ভাব্‌ব আর কি? তবে চাকুরী জোটা আজ কালকার দিনে যে বড় দুর্ঘট—

অবিনাশ। বাপু, আমি এ খেতো শরীর নিয়ে তোমার কি করব' বল'? দেখ্‌চ' তো, কাজকর্ম্ম সবই আমার আজ ছয়মাস থেকে বন্ধ, অথচ চিকিৎসার খরচটা কি রকম বেড়েচে?

শশাঙ্ক চক্ষে অন্ধকার দেখিল। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে আসিয়া চুপচাপ চিৎ হইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। অবিনাশ পত্নীকে বলিলেন—"কেমন?"

অন্নপূর্ণা ভারি খুশী, কহিলেন—"হাঁ তোমার বুদ্ধি আছে।"

অবি। একটি শিবানী প্রসব করেচ বলেই আছে, দুটি যদি করতে, তা'হলে আর থাক্‌ত' না।

অন্ন। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, শশি যদি রেগে চলে' যায়। তা' হলে এ-ও তো হাত-ছাড়া হল।

অবি। রাগলে অন্য অস্ত্র আছে। যদি চলে' যায়'—গেলই বা, বয়ে গেল। তবে যাবে না, এ নিশ্চিত জেনো।

অন্ন। কেন?

অবি। যে স্বচ্ছলতা ও বাবুগিরির উপর মানুষ হয়েচে, ওতে ওর কষ্ট-সহিষ্ণুতার একদম মাথা খাওয়া গেছে। দ্বিতীয়ত, বি-এ পাশ করিয়ে দিয়ে ওর পরকাল এখন ঝরঝরে

রে' দিয়েচি; চাকরী না' করে আর কিছু করতে পারবে না।

অন্ন। তার মানে?

অবি। তার মানে তুমি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না, গিন্নি—তুমি তো বি-এ পাশ কর নি? এইটেই আজকালকার লেখাপড়া শেখার মহিমা!

উকীলেরা যে শুধু অর্থই চেনে, তাহা নহে—মানুষও চেষ্টা করিলে চিনিতে পারে। অবিনাশবাবু শশাঙ্ককে ঠিক চিনিয়াছিলেন। শশাঙ্ক সেইদিনই সন্ধ্যায় অন্নপূর্ণাকে চুপিচুপি জানাইল যে শিবানীকে বিবাহ করিতে সে প্রস্তুত।

অবিনাশবাবু শুনিয়া খুব খানিক কাসিয়া কাসিয়া হাসিলেন—সে হাসির ঝড়ে অন্নপূর্ণার মনের মেঘ উড়িয়া গেল।

শুভদিনে শিবানী শশাঙ্কের স্কন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইল। অত্যল্প-কাল মধ্যেই অবিনাশবাবুও নিজ প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন। সমস্ত সম্পত্তি কন্যাকে দিয়া, জামাতাকে একটি ডেপুটি করিয়া দিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া উকীললোকে গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাড়ীতে সদ্য বিধবা রুগ্ন শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষার জন্য নব অর্জ্জিত পত্নীরত্নকে রাখিয়া শশাঙ্ক ডেপুটিগিরি করিতে ফরিদগঞ্জ আসিলেন। অন্নপূর্ণার রোগ না সারিয়া দিন-দিন বাড়িতে লাগিল; তাহার পর একদিন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। শিবানী তাহার বিপুল দেহ আস্ফালন করিয়া, বিকটতর কণ্ঠে বহু চীৎকার করিয়া কাঁদিল; কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে চুপ করিল; তারপর হাসিল। প্রায় দুই বৎসর গৃহে থাকিয়া অতিষ্ঠ হইল—স্বামীকে আসিতে লিখিল; স্বামী তার কোনও জবাব দিল না। সে নিজেই যাইতে চাহিল। তখন শশাঙ্ক বাধ্য হইয়া পত্র দিয়া জানাইল যে, তাহার গিয়া কাজ নাই, শীঘ্রই সে স্থানান্তরে বদ্‌লি হইবে—তৎপূর্ব্বে বাড়ী গিয়া তাহাকে লইয়া আসিবে। প্রস্তাবটি খুবই সমীচীন, কিন্তু সত্য নয়;—তথাপি শিবানী ইহা বিশ্বাস করিয়া যে স্বামির নিকট আগমন স্থগিত করিল, ইহাতেই শশাঙ্ক আশ্বস্ত হইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বাঙ্গালী-জীবনের পরমপদ তপস্যার ফল ডেপুটিপদ লাভ করিয়াও শশাঙ্কের মনে সুখ ছিল না; কারণ এই নবীন যৌবনে, এমন দেবদুর্ল্লভ ডেপুটি হইয়া, তাহার স্ত্রী হইল কিনা শিবানী? এ যে কলস পরিমাণ গো-দুগ্ধে গোমূত্রবিন্দু! অথচ, ইহাকে এড়াইবারও উপায় ছিল না। এড়াইতে গেলে শশাঙ্ক যে আজ কোথায় কি অবস্থায় থাকিত তাহা ভাবিতেও সে শিহরিয়া উঠে। বুদ্ধিমান্ দূরদর্শী শশাঙ্ক তাই শিবানীকে বিবাহ করিয়াছে—শিবানীর দেহ ও রূপ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নহে, তাহার পিতার অর্থ ও সম্পত্তি এবং ডেপুটিগিরির জন্য।

একটী মনোমত স্ত্রীর অভাবে শশাঙ্কের মনে যখন দিবানিশি আগুন জ্বলিতেছিল, তখন একটা অভাবনীয় ঘটনায় শশাঙ্কের জীবনস্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

ফরিদগঞ্জ একটি বড় মহকুমা। নূতন সিভিলিয়ান্ কিরণচন্দ্র সেন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট। শশাঙ্ক একজন ডেপুটি। বেলা দশটায় কাছারী আসিবামাত্রই স্থানীয় বড় মোক্তার শশাঙ্ককে এক নমস্কার করিয়া জানাইল যে, এখানকার একজন প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য যুবতী হিন্দু-বিধবার একখানা আবেদন আছে। তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা; আদালতে দাঁড়াইয়া এজাহার করিতে অনিচ্ছুক। হুজুর যদি তাঁহার খাস-কামরায় আর্জ্জি গ্রহণ করেন। হুজুর নূতন হাকিম, ব্যাপারটি স্ত্রীলোক-ঘটিত, বিশেষতঃ তিনি হিন্দু-বিধবা;—শশাঙ্ক কি না বলিতে পারে? মোক্তারের প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর। অবিলম্বে মহিলাটি হাকিমের খাস-কামরায় মোক্তারের সঙ্গে আসিয়া একটি ছোট্ট নমস্কার করিলেন। শশাঙ্ক সে মুখ হইতে শীঘ্র চোখ ফিরাইতে পারিল না। নিজেই একখানা চেয়ার দিয়া বসাইয়া সযত্নে এজাহার লিখিতে প্রবৃত্ত হইল।

এজাহারকারিণীর নাম শৈলবালা দেবী। তাঁহার স্বামীর সরিকগণ তাঁহার নিঃসহায় নিঃসন্তান অবস্থা দেখিয়া, ছলে বলে কৌশলে তাঁহার সম্পত্তি অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে নিয়ত তাঁহার প্রজা ও অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে চক্রান্ত করিতেছে; এজন্য তিনি আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় বিশ বৎসর। গত ছয় বৎসর কাল তিনি বিধবা।

হাকিম যতটা দেরী করা সম্ভব করিয়া এজাহার শেষ

করিলেন। শৈলবালা চলিয়া গেল। শশাঙ্কের উজ্জ্বল মুখখানা নির্ব্বাপিত লণ্ঠনের ন্যায় বিশ্রী হইয়া গেল। একবার সরজমিনে তদন্ত না করিলে ন্যায় বিচার অসম্ভব ভাবিয়া, বাদিনীকে ধর্ম্মাবতার জানাইলেন—বাদিনী যাইতে যাইতে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেল।

শৈলবালার রং ফিট্ গৌরবর্ণ না হইলেও বেশ ফর্শা; স্বাস্থ্যপূর্ণ শরীর; নাতিখর্ব্ব আকৃতি। পরিধানে শাদা লেস্পাড় শাড়ী, কাঁধের উপর হীরাবসান ব্রোচে আঁটা ও মাথার কাপড়খানি খোঁপার পাশে দামী পিনে আবদ্ধ। মুখখোলা; টিকলো নাক, ভাসা-ভাসা চোখ, নিটোল গাল—পাতলা ঠোঁট ধব্‌ধবে শাদা ছোট ছোট দাঁত। হাতে দুই গাছি সোনার তারের চুড়ি, দুই হাতের চারিটি আঙুলে চারিটি দামী পাথর বসান আংটি, পায়ে চাম্‌ড়াহীন ভেল্‌ভেটের নেপালী জুতা। শশাঙ্ক ভাবিল, যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মনের মত পোষাকটিও।

শশাঙ্ক বিচারক ভালই। দুই তিনদিন ধরিয়া কাছারীর পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সরজমিনে তদন্ত করিয়া শৈলবালা যাহা যাহা চাহিয়াছিল, হাকিম তাহার সব গুলিই মঞ্জুর করিয়া দিলেন। শৈলবালার বিপক্ষেরা মোকদ্দমায় তো টিট্ হইলই, অধিকন্তু তাহারা ও অন্যান্য বিপক্ষগণও হঠাৎ শৈলবালাকে রীতিমত ভয় ও ভক্তি করিতে আরম্ভ করিল। যেহেতু, শশাঙ্ককে কাছারীর পর প্রত্যহই শৈলর বাড়ীতে হাজিরা দিতে দেখা যাইতে লাগিল। যে শশাঙ্ক চা খাইত না, সে আজকাল একাসনে ৩।৪ পেয়ালা পর্য্যন্ত চা খায় ও জীবনে সর্ব্বপ্রথম পান খাইতে আরম্ভ করিয়া একবারে জর্দ্দাতেও শশাঙ্কর হাতে-খড়ি হইল।

শুধু এ মহকুমা কেন এ জেলাতেই শৈল খুব বিখ্যাত জমিদার ছিল। সে ধনী ছিল যেমন, তেমনি নানা সৎকার্য্যে দানে ধ্যানে পূজায় পার্ব্বণে ভিক্ষায় লোকজনকে খাওয়াইতে গরীব দুঃখকে সাহায্য করিতে সে ছিল মুক্তহস্ত! আবার নিজেও ছিল পরম বিলাসিনী বাহিরে, অন্তরে নিদারুণ কঠোর ব্রহ্মচারিণী। দিনান্তে বেলা তিনটার সময় হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিত, অথচ তাহার বেশভূষা হাসি তামাসা চটুলতা চপলতা দেখিয়া কার সাধ্য ধরে যে, এ বিধবা ব্রহ্মচারিণী;—বরং নূতন লোকে উল্টাই মনে করে। শৈল একা কলিকাতায় যায়; আদালতে যায়; মকদ্দমা বুঝাইয়া দেয়, উকীল মোক্তারদের সঙ্গে আইনের তর্ক করে; পরিচিত হোক অপরিচিত হোক্ সকলের সঙ্গেই অকুণ্ঠিত ভাবে আলা[প] করে। কাজেই শৈলকে না চেনে এমন লোক খুবই ক[ম] এবং তাহারই সম্বন্ধে সাধারণের ধারণাও নিতান্ত খারা[প] ছিল না। কিন্তু শশাঙ্কের এই অকস্মাৎ ঘনিষ্ঠতায় লোকে নানারূপ কানাঘুসা করিতে আরম্ভ করিল। উভয়েই শুনি[ল] কিন্তু কেহই কথাটা গায়ে মাখিল না। শশাঙ্ক আসে খায়-দায়, গল্প করে, রসিকতা করে, হাসে; শৈলও অভ্যর্থ[না] করে, খাওয়ায়, যত্ন করে, হাসিঠাট্টা করে—অদর্শনে অন্যমন[স্ক] থাকে।

লোকের মুখে হাত দেওয়া যায় কি? শেষে রটি[ল] শশাঙ্ক শৈলকে বিধবা-বিবাহ করিতেছে। কেহই অবিশ্বা[স] করিল না; কারণ সকলেই জানিত শশাঙ্ক অবিবাহিত এ[বং] শৈল না পারে এমন কাজ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পশুপতি লাহিড়ী শৈলর এষ্টেটের বহুদিনের কর্ম্মচারী। শৈলর শ্বশুরের আমলের লোক বলিয়া শৈল ইঁহাকে যেম[ন] সম্মান করিত, ইঁহার নিতান্ত নিরীহ সরল প্রকৃতি [ও] অসাধারণ সাধুতার জন্য তেমনি অত্যন্ত বিশ্বাস, শ্রদ্ধা [ও] চরিত্র সম্বন্ধে ভক্তি করিত। কাজেই পশুপতিকে শৈ[ল] একবার গোপনে শশাঙ্কর বাড়ীতে পাঠাইল, শশাঙ্কর অবস্থা বংশপরিচয় ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য। কার[ণ] ডেপুটি জাতীয় অদ্ভুত জীবগুলির উপর শৈলর মোটেই ভা[ল] ধারণা ছিল না। তাহার বিশ্বাস ইহারা না পারে এমন কা[জ] পৃথিবীতে নাই এবং দিবারাত্র চোর ডাকাত দাগী খুনে পুলি[শ] লইয়া কারবার করায়, ইহারা কতকটা সঙ্গগুণ লাভ করে। তবে সে যে ইহাদিগকে খাতির যত্ন করে, তাহার কার[ণ] লোকে যেমন কুইনীন্ খায়—জিনিষটা তিক্ত, কিন্তু জ[্বর] ছাড়াইতে যে মহৌষধি!

ফরিদগঞ্জ একটি বেশ বড় মহকুমা। সরকারী কর্ম্মচারী অনেকগুলিই বহু দিগ্‌দেশ হইতে চাকুরী করিতে এখানে আসিয়া নিরাপদে বসবাস করিতেছিলেন; শশাঙ্ক শৈলকে বিধবা বিবাহ করিতেছে এ গুজব তাঁহাদেরও কাণে উঠিল। কেহ বলিল—ছি ছি; কেহ বলিল—মন্দ কি? কেহ বলিল—এ কার্য্য করাই উচিত। সরকারী ডাক্তার বনেদী

পত্নীক, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, মাথায় বিরাট টাক—ব্রিজে তাহ হারে, চেঁচাইয়া ক্লাব মাথায় করিল। দ্বিতীয় মুন্সেফ বু রসিক লোক—অতি সৌখীন, পঞ্চাশোর্দ্ধেও কালাপেড়ে তি, আদ্দির পাঞ্জাবী, কল্কাপেড়ে চাদর ও পাম্‌শু ছাড়া রেন না, দুই হাতের চারি আঙ্গুলে চারিটি আংটি; তিনি রস টিপ্পনী কাটিলেন। পোষ্টমাষ্টার স্বল্পভাষী, তিনি লিলেন—শক্ত কোশ্চেন্, ডিফিকাল্টী। শশাঙ্ক নূতন পুটি, আগাগোড়া সাহেব—তিনি এ ক্লাবে আসেন না; ভিলিয়ান মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আসেন—কিন্তু শশাঙ্ক এ ঙ্গালী দলে মিশিতে পছন্দ করেন না, তবে চাঁদা নিয়মিত য়া থাকেন। শশাঙ্ক সৎসঙ্গ পাইয়াছে, ছাড়িবে কোন্ খে?

এমন সময় পশুপতি শশাঙ্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ করিয়া রিয়া শৈলকে বলিল, তাহার অনুমান অনেক পরিমাণে তা। শৈল জোরে হাসিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—কি রকম?"

পশুপতি বলিল—"শশাঙ্ক বাবু বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী উনি।"

শৈল বলিল—"দেখ্‌লেন্ বাবা, আমি জানি ঐ শ্রেণীর কে! এই জন্যেই তো ওদের নিয়ে এমন বাঁদর চাই। লোকে এতে আমার অনেক নিন্দে করে, কত থা কয়;—সব শুনি, কিছু বলি না—কারণ এটা আমার কটা মস্ত নেশায় দাঁড়িয়েচে। সংসারে থাকতে গেলে কটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে ত'? আমার কি আছে? মী পুত্র কন্যা যা নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে, তার মধ্যে মার কি আছে, বলুন? কাজেই আমি এই বাঁদর চাই—এ বড্ড ভাল লাগে আমার—ও কি, আপনি অমন বর্ণ কেন? আপনার চোখ ছল ছল করে কেন? হঠাৎ আপনি এমন মুষ্‌ড়ে পড়্‌লেন যে, বাবা?"

উচ্ছ্বসিত আবেগে পশুপতি কহিল—"মা, তোমাকে বল্‌ব বলেই ঠিক করেচি। শশাঙ্কর খোঁজে গিয়ে আমি আমার হারানো রত্নের সন্ধান পেয়েচি—" বৃদ্ধ আর বলিতে পারিল না, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শৈল বিস্মিত হইল, কিন্তু সমবেদনাতে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল; সবিনয়ে কহিল—"আপনি স্থির হোন্, বাবা, কি ব্যাপার আমায় সব খোলাশা করে' বলুন্।"

পশুপতি কহিল—"এ আমার লজ্জার কথা, আমার কলঙ্কের কথা—এ আমার সর্ব্বনাশের কথা, মা! এতদিন আত্মহত্যা করে ম'রে ছিলাম, আজ পুনর্জীবন পেলাম।—"

শৈল।—আপনাকে এতদিনের মধ্যে কখনও এমন অধীর তো দেখি নাই—

পশু। অধীর হয়েচি, মা। শোন'—এই শশাঙ্ক আমারই সেই হারানো ছেলে।

শৈল। শশাঙ্ক আপনার ছেলে?

পশু। হাঁ, আমারই ছেলে। প্রথম যেদিন দেখি, সেইদিনই আমি একে চিনেছিলাম; কিন্তু মুখ-ফুটে সাহস করে' কিছু বল্‌তে পারি নাই, পাছে লোকে আমায় পাগল বলে। ঐ যে ডা'ন গালে মস্ত গোল একটা জরুল্ আছে, ঐ দেখেই আমার গৃহিণী ছেলের নাম রেখেছিলেন শশাঙ্ক। চাঁদের মত মুখে কাল চিহ্ন—এটা চাঁদের শশ চিহ্নের মতই, গৃহিণী এই কল্পনা করেছিলেন। তারপর, আমি তোমার শ্বশুরের এষ্টেটে চাক্‌রী নিয়ে আসি, স্ত্রীকে আর খোকাকে আমার কলিকাতার বাড়ীতে একলা ফেলে। গরীবের ঘরের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, অনেকেরই লক্ষ্যস্থল হয়ে বহুদিন দুর্ব্বিষহ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা করেছিল। খোকা তখন ছ'বছরের। আমি বাড়ী গেলাম, সব শুন্‌লাম—শুনে স্থির কর্‌লাম কলিকাতার বাস উঠিয়ে দিয়ে এই ফরিদ-গঞ্জেই একটা কুঁড়ে ঘর উঠিয়ে বসবাস কর্‌ব। পত্নীকে তাই বলেও এলাম; এমন সময়ে পাশের বাড়ীর আমার ছদ্মবেশী এক দুর্ব্বৃত্ত বন্ধু, আমি মরণাপন্ন কাহিল বলে, সাধ্বীকে ঘরের বা'র ক'রে আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেবার ছুতোয়—তাকে কাশীতে নিয়ে গিয়ে—তার উপর অত্যাচার করে। লজ্জায় অপমানে সে সাধ্বী আত্মহত্যা করে—সে শয়তান গা-ঢাকা দেয়। শশাঙ্ক ঘটনাক্রমে সদাশয় দেবতুল্য মহানুভব অবিনাশ বাবুর হাতে পড়ে। পুলিশে অনেক খোঁজখবর করল, অবিনাশ বাবুও বহুদিন যাবৎ খবরের কাগজে শশাঙ্কর কোনও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজের জন্য বিজ্ঞাপন দেন;—আমি কতক কতক জানি, কিন্তু এ লজ্জা মাথা পেতে নিয়ে, লোক সমক্ষে দাঁড়াতে সাহসে কুলোলো না; তাই চেপে গিয়েছিলাম। আজ প্রায় ১৭।১৮ বৎসরের এ ঘটনা প্রায় ভুলেই গিয়েছি, কেবল শশাঙ্কর মুখখানাই মনে ছিল। এবার শশাঙ্কর

খোঁজ কর্‌তে কর্‌তে আমি আমার শশাঙ্ককেই খুঁজে বের করে' আন্‌লাম।—"

শৈল। তার পর সেই অবিনাশ বাবুই এঁকে পড়ান্‌টড়ান্‌ বুঝি?

পশু।—হাঁ, মা, অবিনাশ বাবুর অনেকগুলি ছেলে মারা যাওয়ায় তাঁর তখন ছেলেপিলে কিছু ছিল না বলেই শশাঙ্ককে তাঁরা নিজের ছেলের মতই মানুষ কর্‌তে লাগলেন। শশাঙ্ককে পাবার কয়েকমাস পরে অবিনাশ বাবুর একটি মেয়ে হয়। অবিনাশ বাবুরা তবু শশাঙ্ককেই বেশী ভাল বাস্‌তেন। একে বি-এ পাশ করিয়ে, ডেপুটিগিরি চাক্‌রী করে' দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি লেখাপড়া করে দিয়ে, সেই মেয়ের সঙ্গে এর বিয়ে দেন্‌। আজ বৎসর ৩।৪ হ'ল, তাঁরা কর্ত্তাগিন্নী দু'জনেই স্বর্গে গেছেন। ছেলে বৌমাকে একলা সেই জনমানবহীন রাজপুরীর মত মস্ত বাড়ীর ভিতর ফেলে' চাক্‌রী করে' বেড়াচ্ছেন, আর লোকের কাছে বলেন যে, তিনি অবিবাহিত।

শৈল। এর মানে?

পশু। এর মানে, সে মেয়েকে এর পছন্দ হয় না। মেয়ে মন্দ কি? রংটা ময়লা, মুখ চোখ এই সাধারণ—তবে কিছু মুটিয়ে গেছেন্‌—তা' বড়লোকের আদুরে মেয়ে—একটু মোটাই যদি হয়, তা'তে ক্ষতি কি?

শৈল। বটে? এত বড় নির্দ্দয় আপনার ছেলে, বাবা? এত বড় কৃতজ্ঞতার এই প্রতিদান? দারোয়ান্‌দের বলে' দিন্‌, আজ থেকে যেন তিনি আমার বাড়ীতে না ঢোকেন্‌। আপনি দুঃখ কর্‌বেন না বাবা, এ আপনার ছেলে বলে' বল্‌চি না—আমার ছেলেই যদি এমন হ'ত তার উপরও আমার এই হুকুম হ'ত আজ।

পশু। কিন্তু মা,—ছেলের যাতে সুমতি হয়, সে ভদ্র কন্যার কোনও কষ্ট না হয়, তার বিহিত তোমায় কর্‌তে হবে যে, লক্ষ্মী। এ কাজ তো তুমি ছাড়া এ শহরে কেউ কর্‌তে পার্‌বে না, মা? আমি যেমন আছি, তেমনিই থাক্‌ব'—আমি হাকিমের বাপ হ'তে চাই না, আমি আমার এই মেয়ের বাপ থেকেই যেন মরি—

শৈল। বাবা—আপনি এত মহৎ! আচ্ছা, আমি এর ব্যবস্থা কর্‌চি। পুত্রস্নেহে—(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) আচ্ছা আপনি গাড়ী যুৎতে বলে দিন। আপনিও একবার আমার সঙ্গে মিঃ সেনের বাংলায় চলুন্‌। তাঁর সঙ্গে একটা পরামর্শ করা ভাল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেন ও সেনজায়া শৈলর মুখে শশাঙ্কর সমস্ত ইতিহাস শুনিলেন এখন কি কর্ত্তব্য, অর্থাৎ কি উপায়ে শশাঙ্ককে নিজ প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত করাইয়া বিবাহিত পত্নীর সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত করাইয়া দেওয়া যায়, তাহার কোনও সদুপায় চা[?] করিয়া ঠাহর করিতে না পারিয়া, মিঃ সেন বলিলেন—"ব্যাপারটা বড় রূঢ়, মিসেস্‌ মৈত্র, এ নোংরা কাজে আমাদের হাত না দেওয়াই ভাল। শশাঙ্ক বাবু হয় ত এতে বড়ই মনঃকষ্ট পাবেন। ঐ যে তিনি অবিবাহিত বলে' নিজকে জাহির করেচেন, ঐ মিথ্যেটা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌লেই—তাঁর আনন্দ রাগে পরিণত হবে।"

সেন-পত্নী। বাঃ, তুমি তো আচ্ছা লোক! এ রকম একটা ভদ্রচোরের লাঞ্ছনাই শাস্তি—যদি সে ভবিষ্যতের জন্য শোধরায়। তা' হবে না, দিদি, একে রীতিমত শিক্ষা দিতে হবে। তুমিও যেমন, চোরের নামে নালিশ কর্‌তে ডাকাতের কাছে এসেচ?

সেন। আমি ডাকাত হলুম? বেশ—তবে তোমরা সব সাধু মনিষ্যি যা' ভাল বোঝ, কর।

সেন-পত্নী। তুমি হলে চোরের সর্দ্দার—আমরা একশ' বার সাধু এবং সাধ্বী। সে স্ত্রী বেচারার অবস্থাটা একবার ভাব দেখি?

সেন। পরস্ত্রী সম্বন্ধে ভাবনাটা কি সাধুজনদের মতে সঙ্গত, না সমীচীন?

সেন-পত্নী। খুব সাধু, এখন থাম। এস দিদি, আমরা একটা মৎলব বের করি গে।

* * * *

এবার ২৮ সেপ্টেম্বর পূজা। কাছারী বন্ধ হইতে মোটে সাত দিন বাকী। শৈলর বাড়ীতে ছোট-খাট একটি সান্ধ্য-পার্টি। স্থানীয় দুই চারিজন বাছাই-করা ভদ্রলোক ও বাকী সব স্থানীয় অফিসার ও তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েরা নিমন্ত্রিত। শৈল ও পশুপতি লাহিড়ী মহাশয় অভ্যাগতগণকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাদর করিয়া বসাইতেছেন; শশাঙ্কও যেন এই বাড়ীরই একজন, এমনি ভাবে পান সিগারেট প্রভৃতি

সরবরাহ করিতেছেন ও ব্যস্ত ভাবে অকারণ এদিক-ওদিক ঘুরিতেছেন, চাকর-বাকরদিগকে এটা নিয়ে আয়, সেটা নিয়ে আয়, বলিয়া হুকুম ফরমাশ্‌ করিতেছেন; ও সময়ে অসময়ে শৈলর সঙ্গে নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কহিয়া নিজের অহেতুক আত্মীয়তা প্রকাশে আত্মপ্রসন্ন ভাবে সর্ব্বত্র সব কাজ পরিদর্শন করিয়া ফিরিতেছেন।

মুন্সেফবাবু, স্থানীয় ভদ্র-সমাজের অর্দ্ধেকের দাদা ও অর্দ্ধেকের বেয়াই;—তাঁহার স্ত্রী, স্বামীর মতই সুরসিকা, শশাঙ্ককে ডাকিয়া কহিলেন—"ও ঠাকুরপো, আজ এই শুভসন্ধ্যায় আপনাদের প্রস্তাবনাটাও হয়ে যাক্ না?"

শশাঙ্ক আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেল। কহিল—"আমার তাতে আপত্তি কি? আপনাদের মত এমন সব বৌদিদি থাক্‌তে আমার আর ভাবনা কি?"

শশাঙ্ক কথাটা সরল ভাবে বলিলেও, সমবেত মহিলাগণ হো হো শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। শশাঙ্ক লজ্জিত-ভাবে স্থানত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া আসর জমাইতে চেষ্টা করিলেন।

যথাসময়ে আহারাদি শেষ হইল। আহারান্তে বিদায়ের পূর্ব্বে আবার, কাছাকাছি, স্ত্রী ও পুরুষদের দুইটি বৈঠক বসিল।

মুন্সেফবাবু সরসভাবে শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে ভায়ার আইবুড়ো নাম খণ্ডাবে, কবে আমরা আবার এমনি করে' আড্ডা জাঁকাব?"

শশাঙ্ক একটু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না।

মুন্সেফ-পত্নী, মুন্সেফবাবু ছাড়া, সকলের চেয়েই বয়সে বড়'—তিনি ঘরের মধ্য হইতে ডাকিলেন—"ও ঠাকুরপো, একবার এইখানে এসই না ছাই। বিয়ের বরটির মত অমন লজ্জা করে' করে' লুকিয়ে বেড়ালে চল্‌বে কেন?"

শশাঙ্ককে ঠেলিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া, হলঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া সকলে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল।

মুন্সেফ-পত্নী। ঠাকুরপো এইবার বিয়ে-থা' কর'—আর কতদিন এ-দুয়োর সে-দুয়োর করে' বেড়াবে!

শশাঙ্ক।—এ বেশ আছি, বৌদিদি।

মুন্সেফ-পত্নী।—তা' তো দেখ্‌ছি, কিন্তু বিয়ে তোমায় কর্‌তেই হবে। আমাদের এখানে একটি মেয়েও আছে, আজ শুভদিনে একবার তাকে দেখ্‌তে হবে, তোমায়, ভাই।

পাশের ঘর হইতে শিবানীকে লইয়া শৈলবালা হলে প্রবেশ করিয়া কহিল—"এঁকে চেনেন্‌, শশাঙ্কবাবু? এঁর সঙ্গে আপনার কোনও সম্বন্ধ আছে?"

শশাঙ্ক শৈলর কণ্ঠস্বরে লজ্জারক্ত মুখে যেমন সেদিকে চাহিল, অমনি শিবানীকে দেখিয়া সে মুখ ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গেল,—কোট প্যাণ্টুলন পরিয়াই সে সেইখানে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। উজ্জ্বল দীপালোকিত কক্ষে সুসজ্জিত রমণীগণের স্থানে শশাঙ্ক দেখিতে লাগিল সরিষাফুলের পর্য্যাপ্ত ফসল। মহিলাগণ কলকণ্ঠে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। মিসেস্ সেন জোরে শাঁখ বাজাইয়া দিলেন।

পঞ্চম দিনে শশাঙ্ক স্ত্রী ও পিতাকে লইয়া দেশে যাত্রা করিল। পূজার পর প্রথম গেজেটেই দেখা গেল শশাঙ্ক রায়, শশাঙ্ক লাহিড়ী নামে পরিচিত হইয়া শিলচরে বদ্‌লী হইয়াছে। ছয়মাস পরে শৈল পশুপতির পত্রে জানিল, তাঁহারা শিলচরেই আছেন, শীঘ্রই তিনি পৌত্র-মুখ সন্দর্শন করিবেন।

বিশ্ব-সাহিত্য

লেনিন ও ব্যক্তিত্ববাদ

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(২)

অতীত কালে যে সব মহাপুরুষ ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও জীবনধারার সঙ্গে লেনিনের জীবনের ধারা ঠিক মিলিবে না। লেনিনের জীবনীকে বুঝিতে হইলে আমাদের পূর্ব্ব অর্জ্জিত অনেক ধারণা বর্জ্জন করিতে হইবে। যেমন পুরানো অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক মনোভাব লইয়া বোলশেভিসিম্‌কে কিছুতেই বিচার করিতে পারা যায় না, সেই রকম লেনিনকে বুঝিতে

হইলে পুরানো মাপের অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। লেনিন কেন, এই বিংশ শতাব্দীতে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পুরানো মনোভাবের মাপ দিয়া তাঁহাদের মাপিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; কেন না তাঁহাদের জীবনই যে পুরাতনের পূর্ণচ্ছেদের পরিচায়ক।

লেনিনের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক কোনও চিহ্ন তাঁহার দেহের মধ্যে ছিল না বলিলেই হয়। জগতের প্রায় সমস্ত মহাপুরুষদের অঙ্গে তাঁহাদের পরিচয়ের কোনও না কোন সুস্পষ্ট ছাপ থাকে। কিন্তু লেনিনের দেহের কোনখানে কোনও বিশিষ্টতা ছিল না। অতি সামান্য পোষাক—রুষদেশের যে কোনও সাধারণ লোকের চেহারায় লেনিনের অপেক্ষা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট পতাকায়, নানা ছবিতে, প্লাকার্ডে, ব্যাজে, নানা জিনিষে লেনিনের ছবি দেখা যায়। পৃথিবীর উপর লেনিন দাঁড়াইয়া; তাঁহাকে ঘিরিয়া অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্মান্ নব-সূর্য্য উঠিতেছে—কিন্তু নব-সূর্য্যের প্রখর আলোক যে মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে কোনও চিহ্ন নাই—সূর্য্যদীপ্তির কোনও রেখা নাই। তাঁহার সঙ্গীরা, এমন কি যে সমস্ত চিত্রকর বা ভাস্কর তাঁহার ছবি আঁকিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে এত বিশেষত্বহীন চেহারা মহাপুরুষদের মধ্যে বিরল—রুষদের মধ্যেও বিরল।

চেহারার মধ্যে কোনও বিশেষত্ব ত ছিলই না—তাহা ছাড়া তাঁহার হাবভাব বা ব্যবহারেও লোককে প্রথম-সাক্ষাতে আকৃষ্ট করিবার মত কিছুই ছিল না। বক্তা হিসাবে তাঁহার প্রতিবন্ধক ছিল যথেষ্ট। বক্তা হিসাবে ট্রট্স্কী রুষিয়ায় অদ্বিতীয়,—তাঁহার কণ্ঠস্বর, ভাষার আকর্ষণী-শক্তি, বক্তৃতার ভঙ্গিমা সমস্তই লেনিন হইতে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। লেনিনের কণ্ঠস্বর চাপা ও ঈষৎ জড়ান ছিল; ভাষায় কোনও রকম অলঙ্কার নাই—গতিবিধির মধ্যে বক্তার হাবভাব তো নাই-ই। কিন্তু তবুও লেনিন যখন বক্তৃতা দিতেন তখন পাথরের মত জনতা নিস্তব্ধ হইয়া থাকিত। ট্রট্স্কী তাঁহার লেনিনের জীবনীতে লেনিন ও মার্কসের মধ্যে তুলনা প্রসঙ্গে লেনিনের এই দিকটার কথা তুলিয়া বলিয়াছেন, "মার্কসের ভাষা ও লিখন-পদ্ধতির মধ্যে একটা বিরাট ওজস্বিতা ছিল—কখনও কথাগুলি তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কোথাও ক্রোধে বিষাক্ত হইয়াছে, কোথাও বা ব্যঙ্গে ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। মার্কস তাঁহার ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বগামী সমস্ত রাজনৈতিক লেখকদের লেখার সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য-রসটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু লেনিনের ভাষা ও তাঁহার বলার ভঙ্গী ছিল একেবারে বর্ণহীন, সাদামাঠা, শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকুই তাহাতে থাকিত; এবং তাঁহার চরিত্রের মত তাঁহার ভাষাও ছিল রুক্ষ তাপসের মত (ascetic)। আর একজন লেনিনের এই ভাষার বিষয়ে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, লেনিনের এই ভাষার একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, সর্ব্বদাই তিনি সর্ব্ব-সাধারণের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করিতেন—তাহাতে ভাষার ঐশ্বর্য্যহানি হইত—কিন্তু সহজেই প্রয়োজন-সিদ্ধ হইত।

লেনিন যে নিজে শাদাসিধে ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং সমস্ত অলঙ্কারকে সযত্নে দূরে রাখিতেন, শুধু তাহাই নহে; তিনি অন্য কাহারও মধ্যে ভাষার জাঁকজমক ও সূক্ষ্মতা বা আলঙ্কারিকতা দেখিলে রাগিয়া যাইতেন। কর্ম্মীদের মধ্যে তিনি আলঙ্কারিক ভাষাকে বুদ্ধির দুর্ব্বলতা এবং কর্ম্মশক্তির অভাব বলিয়া বিবেচনা করিতেন। লেনিন তাঁহার বক্তৃতায় এবং লেখায় অতি সযত্নে সাহিত্যের বাষ্পটুকুও প্রবেশ করিতে দেন নাই। "কবিত্ব" কোন মতেই তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। জীবনের সমস্ত দিক দিয়া তিনি একেবারে আপনাকে কম্যুনিষ্ট আদর্শের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন; এবং যাহা কিছু সেই আদর্শের প্রয়োজনের অন্তর্গত না হইত, তাহাকে বর্জ্জন করিতে লেনিনের কোনই সঙ্কোচ ছিল না।

লেনিনের লেখার বা তাঁহার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোককে বোঝান। সেইজন্য তিনি অত্যন্ত ছোট ছোট শব্দ ব্যবহার করিতেন; এবং তাঁহার রচনা-পদ্ধতির ইহাই বিশেষত্ব। ছোট ছোট শব্দ—কোনও অলঙ্কার নাই—শুধু যুক্তির আবেদন। এক সময়ে লেনিনের জীবদ্দশাতেই সমস্ত রুষ খবরের কাগজ-ওয়ালাদের সভা হয়। সেখানে লেনিন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যে কথা বলেন, সে কথা আমাদের দেশের অনেক খবরের কাগজওয়ালারা যদি শোনেন তো বাংলাদেশের পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সত্যই দেশের বিশেষ কাজ করিতে পারে। "যেখানে কুড়িটী ছোট লাইনে বক্তব্য শেষ হইয়া যায়, তাহার স্থলে ফেনাইয়া, নানা পথ ঘুরিয়া, দুইশত

লাইন লিখিবার কি প্রয়োজন ? সংবাদপত্রের ভাষা হইবে সহজ—সোজা। সংবাদিকের রচনা-ভঙ্গী হইবে একেবারে তারের খবরের মত সংক্ষিপ্ত। সংবাদ পাঠকের মন চায় তথ্য। "Less political hair-splitting! Fewer intelligent dissertations! Get nearer life!" রাজনৈতিক বাদানুবাদের চুল-চেরা তর্ক-বিতর্ক কমাও! আপনার বুদ্ধির পরিচায়ক নিছক তত্ত্ব আলোচনা রহিত হোক্! সত্য জীবনের আরও কাছে এগিয়ে এস!" এই তিনটী মহামূল্য উক্তি আমাদের দেশের প্রত্যেক সংবাদপত্র-সেবীর টেবিলের সম্মুখে—যেখানে পাথরের উপর, "Time is money" লেখা থাকে—সেখানে লিখিয়া রাখা দরকার।

লেনিনের এই প্রয়োজনীয়তা-বাদের মধ্যে তাঁহার জীবনের বিরাট প্রতিষ্ঠার মূল নিহিত রহিয়াছে। লেনিন যে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে—একটা মৃত জাতিকে পিছনে লইয়া—তাহার সমস্ত রক্তসঞ্চারী অন্ধতা আর অজ্ঞতাকে লইয়া—মানব কল্পনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসম্ভব মূর্ত্তি—এই বহুমানবশাসিত বিরাট পৃথিবীব্যাপী এক রাজত্বের ভিত্তি-স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল—তাঁহার সেই সব ছোট ছোট সাদাসিধে প্রয়োজনের কথা। যে ব্যক্তির মনে world-stateএর পরিকল্পনা ছিল—তাঁহার অপেক্ষা আদর্শবাদী, এমন কি romantic, বোধ হয় সমসাময়িক পৃথিবীতে আর কেহই নাই। কিন্তু আদর্শবাদী লেনিনের কাছে হাতের কাছের সামান্য কাজটুকু, হয়ত একজন সামান্য চাষীর সঙ্গে দেখা করা, পৃথিবীর পরিকল্পনার চেয়ে ঢের বড় ছিল। আমরা ভাবের আবেগে আদর্শকে এতখানি বড় করিয়া দেখি, এবং তাহাকে লইয়াই সারাদিন মনে ও মস্তিষ্কে এত খেলা করি, যে, যখন সেই বিরাট ভাব-সৌন্দর্য্যময় আদর্শকে কাজে রূপ দিতে যাইয়া ভাব-সৌন্দর্য্যহীন, নিতান্ত সামান্য সামান্য কাজগুলি প্রথমেই ছাঁকিয়া ধরে, তখন আদর্শের বিরাটত্বের মোহে সেগুলি আমাদের নগণ্য বোধ হয়। সে কাজগুলি আদর্শের পরিপূর্ণ রূপ হইতে এত দূরে যে, সেগুলির মধ্যে আমাদের মন আর বসে না। আদর্শ মস্তিষ্কে ও খবরের কাগজেই থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের সমস্ত আন্দোলনের ব্যর্থতার মূলে কি ইহাই নাই ? গ্রামকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—সপ্তগ্রামের নদী-সৈকতে সপ্তডিঙ্গা, ময়ূরপঙ্খী আবার লাগিবে—নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে এই আদর্শের আলোচনা চলিল। নানা রূপকে ও অলঙ্কারে আদর্শটী সুন্দর ও মহীয়ান্ হইয়া উঠিল। সপ্তডিঙ্গা, সপ্তগ্রাম, অতীত-গৌরব, গোলায়-ভরা ধান, দ্বারে-বাঁধা-হাতী, মাটীর ক্ষেতে সোণার শীষ, শ্যামলিমার ধাত্রী, জীবনের পুণ্য তপোবন—সবই হইল সুন্দর। কিন্তু যখন এই সুন্দরকে রূপ দিতে হইল, তখন আসিল—কচুবন, শ্যাওলা-ভরা পুকুর, কচুরীপানা, মশা, এঁটেলমাটীর পথ, হাতে-কোদাল-ধরা, লোকের বাড়ী যাওয়া, অনুরোধ করা, সহ্য করা—নিতান্ত অসুন্দর জিনিষ ও কাজ। তাই সপ্তগ্রাম আর এঁটেলমাটীর পথের যে ব্যবধান সে ব্যবধান আমাদের দেশে রহিয়াই গেল।

জগতের কর্ম্মীদের নিকট লেনিনের এই সব চেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয়—প্রত্যেক মানুষের—তা সে জীবনের যে বিভাগেই থাকুক্ না কেন—Utopia is always adjusted exclusively to the nearest momentary interests. একেবারে হাতের কাছের নগণ্যতম কাজটুকু সর্ব্বপ্রথমে করার মধ্যে মানব-মনের সব চেয়ে বড় আদর্শের পরিপূরণের বীজ রহিয়াছে।

লেনিনের মাথায় যখনই কোনও প্রেরণা বা ভাব আসিত, একান্ত কঠোরতায়, কোনও ভাববিলাসিতার চিহ্ন না রাখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ভাবকে কাজে রূপ দিবার জন্য লাগিতেন—তা সে কাজ যতই বিড়ম্বনার হ'ক না কেন। লেনিনের জীবনের মূলে রহিয়াছে ভাব ও কর্ম্মের এই একান্ত সমন্বয়।

আজীবন কর্ম্মের মধ্যে আপনার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে নিমগ্ন করিয়া রাখার দরুণ লেনিনের আশ্চর্য্য ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ক্ষমতা ছিল—যাহার সঙ্গে প্রত্যেক রুষ-নেতার একবার না একবার সংঘর্ষ লাগিয়াছে ; কিন্তু পরে যখনই লেনিনের উক্তিই সফল হইতে দেখা যাইত, তাঁহারা প্রত্যেকেই লেনিনের এই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সম্মুখে আপনাদের যুক্তিকেও বিসর্জ্জন দিতেন। ট্রট্স্কী ও লেনিনের নানা ঐতিহাসিক বিবাদের মধ্যে এই অন্তর্দৃষ্টির সহিত সংঘর্ষের ব্যাপারই রহিয়াছে। ঐতিহাসিক Pokrovski বলিতেছেন, "I frequently had occasion to differ from him on practical questions, but I came off badly every time ; when this experience had been repeated about seven times, I ceased

to dispute and submitted to Lenin, even if logic told me that one should act otherwise"—"আসল কাজের ব্যাপারে আমার প্রায়ই লেনিনের সহিত মতান্তর ঘটিত ; কিন্তু প্রত্যেকবার দেখিতাম আমারই ধারণা ভুল হইয়াছে। বারবার সাতবার এই রকম হওয়ার পর, আমি লেনিনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম—এমন কি যুক্তিরও বিরুদ্ধে।" ট্রট্স্কী ও লেনিনে প্রায়ই এই মতান্তর ঘটিত ; এবং ট্রট্স্কীর অবস্থা Pokrovskির অপেক্ষা বেশী ভাল ছিল না।

লেনিনের জীবনের আর একটী মস্ত বড় জিনিষ যে, সমস্ত রুষিয়ার ভাগ্যবিধাতা হইয়া তিনি পথের সাধারণ মানুষের নিকট হইতে একদম সরিয়া আসেন নাই। তিনি ছিন্নবাস, নিরন্ন, আশ্রয়হীন প্রত্যেক রুষবাসীকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিতে আমরণ অবসর দিয়াছিলেন যে, ক্রেমলিনের রাজপ্রাসাদে সামান্য কাষ্ঠাসনে উপাধিহীন, অলঙ্কারহীন, তাহাদেরই মত একান্ত একজন তাহাদেরই জন্য জীবনের সমস্ত ভোগবিলাস বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়া আছে। লেনিন প্রত্যেক দিন সাধারণ লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার একটা সময় ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন ; খুব প্রয়োজনীয় রাজ-কার্য্যের মধ্যেও তিনি সামান্য একজন চাষীর সামান্য আবেদন শুনিতেন ও তাহা, তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন হইলে, দূর করিতে কখনও বিরত হইতেন না। এমনি করিয়া সমস্ত রুষ জাতির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লেনিন আপনার আসন করিয়া লন।

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের চারিদিকে ছিল, এক একান্ত অনাড়ম্বরময় তাপসিকতা। গর্কী লিখিতেছেন—It is difficult to draw his portrait, he was simple, like all he said. His heroism lacked almost all external glitter. It was the modest, ascetic zeal, not seldom seen in Russia, of a revolutionaty who openly believes in the possibility of justice on earth, the heroism of a man, who for the sake of his heavy task, renounced all worldly joys." "লেনিনের ছবি আঁকা বড় শক্ত ; কারণ তাঁহার সমস্ত কথার মত তাঁহার সমস্ত জীবন ছিল একান্ত অলঙ্কারহীনতায় সরল। তাঁহার বীরত্বের চারিদিকে কোনও বাহিরের জৌলুস ছিল না। তাহা ছিল একান্ত আত্ম-গোপনকারী তাপসের তপস্যা। লেনিন সত্য-সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে পৃথিবীতে বিচারের আসন চির-প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। এবং সেইজন্য এই ব্যক্তি আপনার স্কন্ধে এত গুরুভার লইয়াছিলেন যে জীবনে জগতের সামান্য আনন্দ ও বিলাসের একটীও তন্ত্রী বাজাইয়া গেলেন না। রুষিয়ায় এ অনাড়ম্বর বীরত্ব দুর্ল্লভ।" সমস্ত পৃথিবীতেই কি ইহা দুর্লভ নয়?

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রার কথা তাঁহার জীবদ্দশায় বাহিরের কেহ জানিত না। রুষিয়ার বিপ্লবের পর রুষিয়ার নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় যখন ওয়েল্‌স বলেন যে, তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন যে কবর হইতে মৃত-মানুষের মাংস লইয়া মানুষ টানাটানি করিতেছে, তখন য়ুরোপের নানা দেশে লেনিনকে লইয়া নানা ব্যঙ্গ-চিত্র বাহির হইত। লেনিন বসিয়া আহার করিতেছেন—টেবিল পরিপূর্ণ—দূরে শীর্ণকায় প্রেতমূর্ত্তির মত রুষিয়ার নিরন্ন জনসাধারণ দাঁড়াইয়া। লেনিন হাড়গুলি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া তাহাও আবার আপনার কুকুরকে দিতেছেন। কিন্তু সেই সময় লেনিন সমস্ত দিনে দুইখানি মাত্র পাঁউরুটী খাইয়া থাকিতেন। অবশ্য রাজনৈতিক প্রচারের মিথ্যাবাদ আজ য়ুরোপীয় জাতির অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন—তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশ বা আস্থা স্থাপন মূর্খতা মাত্র।

বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক H. G. Wells লেনিনকে "Dreamer of Electrification" বলিয়াছেন। ওয়েল্‌সের এই কথার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। লেনিন চাহিয়াছিলেন রুষিয়ার সমস্ত গ্রামকে ভাঙ্গিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে আমেরিকার নগর করিয়া তুলিবেন। বিজ্ঞানকে বা কল-কব্জাকে সহায় করিয়া জীবনকে এক অভিনব গতি দিতে হইবে। এবং জীবনকে পরিপূর্ণ করিতে হইলে "mechanization of life" জীবনের যন্ত্র-রূপের সৃষ্টি করিতে হইবে। জীবনের এই যন্ত্ররূপ বিগত যুগের জীবনের ভাব-রূপকে ধ্বংস করিয়া এক নূতন শক্তিশালী ও কর্ম্মময় মানুষের জগৎ গড়িয়া তুলিবে। ইহা বোলশেভিসিম্ অথবা ব্যক্তিত্বহীন সমূহবাদের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। Materialistic Conception of Historyর মন্ত্রদীক্ষিতেরা যন্ত্রকে এত বড় করিয়া দেখিয়াছে, যে, যন্ত্রেরই ভাবরূপ বা রূপক নিত্য তাহাদের মাথায় ঘুরিতেছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব সমূহ-বাদের দেহের অন্তর্ভুক্ত একটা ক্রু মাত্র। বোলশেভিক রুষিয়ার শিল্প ও চিত্র-প্রদর্শনের ছবি দেখিলাম! আমাদের

দেশে ভারতীয় চিত্রকলাকে যাঁহারা রহস্যময় বলিয়া ব্যঙ্গ করেন, তাঁহারা এই সমস্ত বিচিত্র চিত্র দেখিয়া ব্যঙ্গ করিতে ভুলিয়া যাইবেন! বিভিন্ন যন্ত্রের নানা অংশ লইয়া এক একটী যন্ত্রের প্রতিকৃতি! ইহাই হইল ছবি। রঙ্গালয়ে, সাহিত্যে ও কাব্যে জীবনের এই যন্ত্র-রূপের সমস্ত প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষের ভাবের ও রসের সমস্ত মন্দিরে আজ রুষিয়ার গতির যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছে—মানুষের ভাবের ও রসের দেবতাকে পরিপূর্ণ মাত্রায় অস্বীকার করিয়া Madame Jarintzovএর কথায় বলিতে হয়—Russia is a land of extremes—রুষিয়া চরমতার লীলা-ক্ষেত্র। রুষিয়ায় যাহা ঘটে, তাহা চরম ভাবেই ঘটে। জীবনের যন্ত্র-রূপ তাই সেখানে জীবনের কোনও নিভৃত অংশকে বেদখল রাখিতে চায় না।

"Mechanisation of life"-দর্শনের প্রধান প্রচারকের নাম Gostev। মানুষের সমস্ত গতিবিধি, তাহার কর্ম্ম-পদ্ধতি, চিন্তার ধারা যন্ত্রের সাহায্যে বাঁধিয়া ফেলিবার সাধনায় "Institute of the Scientific Organization of Work and the Machinasation of Man"এর প্রতিষ্ঠা তিনি করিয়াছেন। এখানে অসংখ্য রুষ যুবক ও যুবতী গবেষণায় নিযুক্ত আছে;—মানুষের মস্তিষ্কের কর্ম্মশক্তি কতখানি, কোন্ কোন্ অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে কি পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়, বিশেষ বিশেষ চিন্তার ধারায় মানুষের অভ্যন্তরে কি কি স্নায়বিক স্পন্দন ঘটে, কি নিয়মে অঙ্গ-সঞ্চালন করিলে শক্তিক্ষয় কম ও কার্য্যশক্তি বেশী হয়, এমন কি কবিতা লেখার প্রক্রিয়াও তাঁহারা যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করিবেন; কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস, কবিতার উৎস হৃদয় নয়—স্নায়ু। স্নায়ুর বিশেষ বিশেষ স্পন্দনে বিশেষ বিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইত্যাদি।

জীবনের যন্ত্র-রূপে বোলশেভিক রুষিয়া একান্ত বিশ্বাসী। Americaর যন্ত্র-রূপ আজ রুষিয়াকে পাইয়া বসিয়াছে। এমন কি আমেরিকার যন্ত্র-রূপ বোলশেভিক কবিতারও আদর্শ-বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান রুষিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি Maiakovski আমেরিকার সিকাগো শহরকে উদ্দেশ করিয়া আমেরিকার মধ্যে পরিপূর্ণ যন্ত্র-রূপের আদর্শকে বন্দনা করিয়াছেন। বন্দনার পরিভাষাও যন্ত্রশালার ছাপ-মারা।

রুষ কবিতায় ও রঙ্গালয়ে জীবনের এই যন্ত্র-রূপের ভয়াবহ ছাপ পড়িয়াছে। কাব্য-লক্ষ্মীর পায়ের নীচে আর শ্বেত-মরাল নাই—হাতে তাঁর নাই বীণা; তাঁহার পায়ের তলায় এখন চাকা, হাতে টাইপ রাইটারের চাবি। বোলশেভিক রুষিয়ার কবিরা বিশ্বাস করেন যে, যেমন উপায়ে আজ হারমোনিয়াম বাজান শিক্ষা দেওয়া হয়, যেমন উপায়ে স্কুলে চিত্রাঙ্কন শেখান হয়, ঠিক সেই রকম ভাবেই কবিতা বা কাব্য লেখা মানুষকে শেখান যাইতে পারে। কি উপায়ে ইহা সম্ভব, তাহার অনুসন্ধানের জন্য বিদ্যাগার স্থাপিত হইয়াছে। ক্রুইসভ্ বর্ত্তমান রুষিয়ার একজন বিখ্যাত কবি। ইনি কবিতার নাম দিয়াছেন—"Synthetic word-chemistry."—"সৃষ্টি-মূলক শব্দ-রসায়ন"। সমগ্র রুষিয়ার সমস্ত রূপকলাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—জীবনের এই যন্ত্র-রূপ। কিন্তু ইহার কাহিনী স্বতন্ত্র।

লেনিনও এই যন্ত্র-রূপের মন্ত্র প্রচার করিয়া যান। বোলশেভিক উত্থানের প্রারম্ভেই সেই দুর্ভিক্ষ, দুর্দ্দিন ও রক্ত-আহবের মধ্যেও আদর্শবাদী লেনিনের মনের সম্মুখে ভাসিতেছিল—ইলেক্‌ট্রিসিটি-মণ্ডিত রুষিয়ার ভবিষ্যৎ গ্রামগুলি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে গ্রামগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। কৃষি-কার্য্য ইলেক্‌ট্রিসিটি দ্বারা পরিচালিত করিতে হইবে। সমগ্র রুষিয়াকে বিজ্ঞানের দিক দিয়া জগতের উপরে তুলিতে হইবে।

রুষিয়ার আভ্যন্তরিক ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিলে বলা যায়, লেনিন পিটার দি গ্রেটের অসমাপ্ত কর্ম্মকে সমাপ্ত করিয়া দিয়া গেলেন। পিটার আসিয়া দেখিলেন একান্ত তুষারের বন্দীশালায় রুষিয়া আপনাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরের বৃহত্তর জগতের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। আপনার একান্ত-বাস লইয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে রুষিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে এক নিদারুণ অপঘাত মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে। পিটার চাহিয়াছিলেন তাহার তুষারের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া য়ুরোপের আত্মার সঙ্গে রুষিয়ার মিলন ঘটাইতে। সেই অসমাপ্ত আদর্শ আজ লেনিন সমাপ্ত করিলেন—য়ুরোপের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে, জগতের জীবনের ধারার সঙ্গে আত্ম-নির্ব্বাসিত রুষিয়ার জীবনের ধারা এমন ভাবে মিশাইয়া দিয়া গেলেন যে, হয় ত সে সম্বন্ধ চির-অবিচ্ছেদ্য। রুষিয়ার ইতিহাসে ও মানবতার ইতিহাসে এই রকম বড় ঘটকালি খুব কমই দেখা যায়।

স্বামী-স্ত্রী।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

তেজগাঁওয়ে বদলি হইবার সময় তরুণী পত্নী সুরমাকে ফণী সঙ্গে লইয়া চলিল। জঙ্গুলে দেশ। জঙ্গলের মধ্যে ছোট বাঙ্‌লা। আসিবার দুদিন পরে সুরমাকে ফণী কহিল,—তোমার ভারী কষ্ট হবে,—একলাটি, এই বনের মধ্যে…নয়?

সুরমা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—সীতাদেবী যে এর চেয়েও ঢের ভারী জঙ্গলে ছিলেন, মশায়! সে জঙ্গলে বাঙ্‌লোও ছিল না,…তাতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল কি! তিনি রাজার মেয়ে, রাজার বৌ…

ফণী কহিল,—তাঁর সঙ্গে রামচন্দ্র ছিলেন যে…

সুরমা স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া সোহাগে গলিয়া গিয়া জবাব দিল,—আমার রামচন্দ্রও তো সঙ্গে আছেন,—তবে—? আমারি বা কষ্ট কেন হবে?

ফণী সাদরে পত্নীর অধরে চুম্বন করিয়া কহিল,—কিন্তু তোমার রামচন্দ্র যে এখানে চুপ করে থাক্‌তে পাচ্ছেন না! জরিপের কাজে সরকারী হুকুমে সারা জেলার বন-বাদাড় ঢুঁড়ে যে তাঁকে সব মেপেজুপে বেড়াতে হবে…কালই একবার বেরুতে হচ্ছে হাত-নাগাদ!

আসন্ন বিরহের করুণ ছবি চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল; অমনি সুরমার দুই চোখ বাষ্পার্দ্র হইয়া আসিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের পানে চাহিল।

ফণী কহিল,—তোমার হার্ম্মোনিয়ম রইলো, স্বরলিপির বই রইলো..আমার কথা ভেবে তুমি বিরহের গান গেয়ে নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলি কাটিয়ে দিতে পারবে না, সুরো? ভয় কিছু নেই। মথুরা থাকবে, পুরোনো চাকর। তাছাড়া ঠাকুর, দাইঝী লছমনিয়া—আর আমার রিভলভার· বলিয়া সে থামিল; একটু পরে হাসিয়া কহিল—আরো ভরসার কথা এই যে, এ বন পঞ্চবটী নয়, স্বর্ণমৃগ আর রাবণের ভয়ও কাজেই—

সুরমা স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—থামো। কি রসিকতাই যে শিখেচো,—মরি!

ফণী এ-কালের ছেলে। গৃহে পর্দ্দা-প্রথা চলিলেও সে তাকে আমোল দিতে নারাজ। সুরমা ম্যাট্রিক অবধি পড়িয়াছে। বাঙালী-ঘরের ঘোমটা-দেওয়া বৌ সাজিতেও যেমন সে কাতর নয়, তেমনি পায়ে জুতা আঁটিয়া অকুতোভয়ে বাহিরে বেড়াইতেও তৎপর। জড়োসড়ো ভাব তার কোথাও নাই। তার তরুণ বয়স, আর বিকশিত রূপশ্রীতে এমন একটি অবাধ স্বচ্ছন্দ-লীলা যে পথিক তাকে পথে দেখিলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে,—গৃহে সে মূর্ত্তি অপরূপ ছবি গড়িয়া তোলে!…

বৈকালের দিকে ফণী মহা উৎসাহে এক অতিথি আনিয়া হাজির করিল। সুরমাকে ডাকিয়া পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিল—আমার সহপাঠী বন্ধু, বন্ধু…এখানকার পাথরের কোয়ারিতে এঞ্জিনিয়ার। থাকে প্রায় চার মাইল দূরে এমনি এক নির্জ্জন বাঙ্‌লায়· হঠাৎ পথে দেখা। এঞ্জিনিয়ার হলে কি হয়, সুরের ব্যাপারে এমন ওস্তাদ যে, সুরলোককে এনে মর্ত্ত্য-লোকে বসিয়ে দিতে পারে! আমাদের কত পার্টিতে…

বন্ধু সবিনয়ে সুরমাকে অভিবাদন করিল। সুরমা কহিল,—আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন,…

ফণী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিয়া কহিল—তাহলে ওঁর আপাততঃ আসা চলে না…

স্বামীর উচ্চ হাস্যধ্বনিতে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া সুরমা তার মুখের পানে চাহিল।

ফণী কহিল,—ইনি এখনো বিবাহ করবার অবসর পান্‌নি, সুরো, কাজেই স্ত্রী কোথায় পাবেন যে…

সুরমার কপোলের রক্তিম আভা তখনো মিলাইয়া যায়

নাই। ফণী কহিল,—যাক, ভালোই হলো…আমার অনুপস্থিতিতে তোমার এই লক্ষ্মণ ত্যাওরটি তোমার তদ্বির করবেন, পঞ্চবটি বনে…আমিও নিশ্চিন্ত হলুম। স্বর্ণমৃগকে সাবধান, মোদ্দা! যাক্, এখন চায়ে অতিথির অভ্যর্থনা সুরু হোক্…

চা আসিল,—তারপর নানা গল্প। বন্ধু বেশ গুছাইয়া গল্প বলিতে পারে। তার এই ত্রিশ বৎসর বয়সে সে বহু দেশ ঘুরিয়াছে, বহু অজানাকে বন্ধু করিয়াছে, বহু পরকে আপন করিয়াছে। কোথায় ওদিকে সেই সুদূর মাদ্রাজ, বোম্বাই, এদিকে কাশ্মীর—চাকরি সে বহু স্থানে করিয়াছে। অনেকের সঙ্গে মিশিয়াছে, অনেক দেখিয়াছে, ভালো চাকরি ছাড়িয়া দিতেও মনে নিমেষের দ্বিধা জাগে নাই। এখন এই তেজগাঁওয়ের পাথরের খনিতে আসিয়া জুটিয়াছে। যেখানে গিয়াছে, একদম্ 'বড়া সাহেব'—কাহারও তাঁবে ছোট চাকরির সে কেয়ার করে না!

সুরমা অবাক হইয়া বন্ধুর গল্প শুনিতেছিল। এ লোকটির অন্তরের মধ্যে একটা দুর্ম্মদ অস্থির ঝড় বহিতেছে যেন সারাক্ষণ! গল্প শুনিতে শুনিতে তার কেবলি মনে পড়িতেছিল, রবি-কবির সেই কয় ছত্র…

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন,—
চরণ-তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন ..

এ একেবারে বাঙালীর বাঁধা-ধরা রুটীনের বহির্ভূত খানিকটা মত্ত হাওয়া…কেমন একটা বিশেষত্ব আছে, নূতনত্ব আছে এর কাজে!

ফণী কহিল,—একটা গান শুনিয়ে দাও তো হে তোমার বৌদিকে…ইনিও সুর-সাধনা করে থাকেন। তবে মুস্কিল হয়েছে এই যে আপাততঃ এ বনে উৎসাহের লেশমাত্র পাবেন না…আমি তো চাকরির দড়ি ধরে ছুটোছুটি করে বেড়াবো ..

বন্ধু উঠিল এবং নিমেষ-পরেই সুরের ধারা বর্ষণ করিয়া সুরমার মুগ্ধ চিত্তকে আরো মুগ্ধ, বিহ্বল করিয়া তুলিল।

গাহিবার পর বন্ধু বলিল—এবারে বৌদির একখানি গান……

এ কথায় সুরমার কর্ণমূলে আরক্ত আভা ফুটিল, দুই চোখে লজ্জার আবেশ নিবিড় হইয়া নামিল! মুখ আর তুলিয়া থাকা যায় না! কে যেন জোর করিয়া তার মাথাটাকে নোয়াইয়া ধরিয়াছে! অধরের কোণে লজ্জার মৃদু হাসি……

তবু গাহিতে হইল। গুণের এই যে আপনাকে প্রকাশের বাসনা,…খ্যাতি আদায় করিবার এই যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, মানুষের মনকে এ যে কোন্ আদিম যুগ হইতে সর্ব্বক্ষণ এদিকটায় উদ্যত রাখিয়া আসিতেছে……

সুরমাকে গাহিতে হইল। বন্ধু নির্ব্বাক মুগ্ধ চিত্তে গান শুনিতে লাগিল।……

গান থামিলে বন্ধু কহিল—বাঃ, খাসা! এমন গান আমি কখনো শুনিনি…সুরে এমন তন্ময়তা, প্রকাশের এমন সহজ ভঙ্গী…গান ঢের গাইতে শুনেচি ফণী,…ও, রাজপুতনার বিখ্যাত হীরাবাঈয়ের গানও শুনেচি—কিন্তু এ…বৌদির কণ্ঠে সাতটা সুর এমন অবলীলায় লীলায়িত হয়ে উঠেচে…এর তুলনা চলে বুঝি, শুধু পাখীর গানের সঙ্গে…আমার নমস্কার নিন্ বৌদি……

জয়ের উল্লাসে সুরমার চিত্ত তখন ভরপুর! সলজ্জ হাসি-ভরা অধর-পুট…চোখে লজ্জার ললিত-কোমল শ্রী সে বন্ধুর পানে চাহিল। বন্ধু তার পানেই চাহিয়াছিল, —চোখে চোখ মিলিবামাত্র সুরমা চোখ নামাইল।……

২

ছোট্ট বাঙলা। সুরমা একা…তরুণ মন স্বামীর সঙ্গ পাইবার জন্য একান্ত অধীর, আকুল। কোথায় স্বামী? সময় আর তার কাটিতে চায় না! একটা টেব্‌ল্ হার্ম্মোনিয়ম, দু'খানা পুরানো স্বরলিপির বই, খান-পঁচিশ বাঙলা নভেল, —তা'ও কতকালের পুরানো, মলাট খসিয়া গিয়াছে, পাতাগুলায় কালির দাগ। আর এই দাসী-চাকরের দল। এ বয়সে মন এ-সবের মধ্যে বসিতে কি চায়!

গান? কিন্তু কার জন্য সে গাহিবে! এমনি?—তা সে গায়; কিন্তু দুটার পর তিনটা গান গাহিতে আর রুচি হয় না! হার্ম্মোনিয়ম বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া পড়ে। বাঙলোর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়…সামনে একটা বড় ঝাউগাছ, তার ওদিকে ক'টা ঐ খেজুরগাছ, একটা শিশুগাছ, ছোট ছোট কতকগুলা চারা…একটা পাখী ঐ উড়িতেছে…পথ বাঁকিয়া গিয়াছে—সে পথে মাঝে

মাঝে লোকও চলিতেছে···ও পথ কোথায় গিয়া যে শেষ হইয়াছে··ঐ পথেই ফণী গিয়াছে, তার চাকরির কাজে! ···ও-পথের পরে সব তার অজানা! দীর্ঘশ্বাসে সুরমার মন ভরিয়া ভারী হইয়া ওঠে!

নিত্য এমন হয়। এমনি ভাবে পথের পানে সে তাকাইয়া থাকে—শূন্য উদাস মনে। ওদিকে কোথা দিয়া কখন যে দিনের আলো নিবিয়া আসে, অন্ধকার নামিয়া পড়ে···সহসা চেতনা পাইয়া সুরমা আসিয়া ঘরে বসিয়া ঐ পুরানো বহিগুলারই একখানা টানিয়া পাতা উল্টায়। মন সে বহির পাতায় এক তিল তিষ্ঠাইতে পারে না! সে শুধু বাহিরে ছুটিতে চায়···কোথায়? কোথায়···?

সেদিনও সে তেমনি দাঁড়াইয়াছিল · হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বঙ্কু আসিয়া হাজির। বঙ্কু ডাকিল—বৌদি···

শিহরিয়া সুরমা মুখ তুলিল,—বঙ্কু ঠাকুরপো!

মৃদু হাসিয়া সে কহিল—আসুন···

বঙ্কু ঘোড়া হইতে নামিয়া বারান্দার রেলিঙে লাগামটা জড়াইয়া কহিল—ফণী কোথায়? ফণী······?

সুরমা কহিল—তিনি তো নেই। মফঃস্বলে গেছেন।

বঙ্কু কহিল—কখন ফিরবে?

সুরমা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—তিনিই জানেন।

বঙ্কু বিস্মিত হইল, কহিল—সে কি, আপনি একলা?

সুরমা কোনো জবাব দিল না, মুখ নামাইল। একটা নিশ্বাস · অতি কষ্টে সে তাহা রোধ করিল। বুকের মধ্যটা সে নিশ্বাসের বেগে দুলিয়া উঠিল।

বঙ্কু কহিল,—তাহলে আমি · ···

সুরমা কহিল,—বসুন, চা খান্—চা খেয়ে যাবেন'খন!

বঙ্কু সুরমার পানে চাহিল,···তার ভিতরকার পুরুষ জাগিয়া শুধু দেখিল, এক নারী · তার চিত্তের চির-রহস্যে ঘেরা নারী, তরুণী নারী—এইটুকু মাত্র!···এর বেশী আর কোনো কথা মনে জাগিল না। সে কহিল—বেশ! চা-ই পান করা যাক্!······

বারান্দায় কখানা বেতের চেয়ার ছিল—তারি একখানায় সে বসিয়া পড়িল। সুরমা ডাকিল,—মথুরা ··

মথুরা আসিল। সুরমা কহিল—চা···এক পেয়ালা ··

বঙ্কু কহিল—সে কি···আপনি খাবেন না?

সুরমা কহিল—আমার তো সন্ধ্যাবেলায় চা খাওয়ার অভ্যাস নেই!

বঙ্কু কহিল—তাহলে থাক্.. আমার জন্য শুধু ··

সুরমা কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও খাবো। বলিয়া সে মথুরার পানে চাহিল। মথুরা একদৃষ্টে তার পানেই চাহিয়া ছিল। সে তো দৃষ্টি নয়, যেন তীরের ফলা! সুরমা কহিল,—দু' পেয়ালাই তৈরী করিস্···

মথুরা নির্ব্বাক ভঙ্গীতে চলিয়া গেল।

বঙ্কু কহিল—একলাটি সময় কাটাচ্ছেন কি করে···? এই নির্জ্জন বনবাসে······?

সুরমার কি মনে হইল, হাসিয়া সে কহিল—আপনিও তো একলা ··

হাসি নয়, যেন বিদ্যুৎ! বঙ্কুর সমস্ত প্রাণটায় আলো ছিটাইয়া বিজলী ছুটিয়া গেল। বঙ্কু কহিল—আমার কাজ আছে···

সুরমা অপ্রতিভ হইল। মনও সঙ্কোচে সারা হইয়া গেল,—সত্যই তো, দুম্ করিয়া এ প্রশ্ন সে করিল কি ভাবিয়া! সে কহিল—আমারো সংসার আছে তো! মেয়েমানুষ কি কাজ ছাড়া থাকে কখনো? বলুন,···না, কাজের তার কামাই আছে?···

বঙ্কু আবার সুরমার পানে চাহিল। কি দেখিল, সেই জানে! এ'বার কি বলিতে গিয়া সুরমা সে দৃষ্টির স্পর্শে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, তার কণ্ঠে স্বর ফুটিল না! দৃষ্টিটা কেমন ভালো ঠেকিল না। চিরদিন পর্দ্দার মধ্যেই বাস করিয়া আসিয়াছে ·· একটা সংস্কার—সংস্কারের ক্রিয়া সামান্য নয়! ···

বঙ্কু কহিল,—খাসা গাইতে পারেন কিন্তু—আপনি · আমার সে গানের লোভ এমন প্রচণ্ড জাগে · কিন্তু উপায় নেই। কাজের অন্ত নেই...অর্থাৎ এই পাথরের ঢিপি-ঢাপা কেটে ভালো পাথর তুলতে হবে···ভাবুন তো। পাথর ভাঙ্গার মজুরী যাকে করতে হয়, তার কি সুরের চাষ পোষায়?

বঙ্কু থামিল। খ্যাতির কথায় সুরমার সঙ্কোচ-কুণ্ঠা যেন একটু হঠিল। সে কহিল—শেখবার ইচ্ছে খুব আছে; কিন্তু এ বনবাসে শিখি কি করে···কার কাছেই বা শিখি! উনি কত বলেন···

বঙ্কু কহিল—বেশ তো, আমার যেটুকু বিদ্যা আছে

—যদি অনুমতি করেন,…গুরুগিরি নয়, মানে, বন্ধুর প্রীতিমাত্র……

সুরমা সলজ্জভাবে কহিল—বেশ, উনি ফিরুন…

বন্ধু আবার চুপ করিল। আলাপের মধ্যে অনুপস্থিত জীবটির উপস্থিতি মুহূর্ত্তে যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল! বাধা!… চা আসিল; সুরমা পেয়ালায় ভরিয়া আগাইয়া দিল। হাসিয়া বন্ধু কহিল—Ladies first.

সুরমা হাসিল, হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, এ পেয়ালা আমার থাক। আপনি চিনি বেশী খান?

বন্ধু কহিল—বেয়ারার উপরেই নির্ভর করে আসচি চিরদিন…চিনির ওজন কখনো ঠিক থাকে তাতে?

সুরমা আবার হাসিল, কহিল,—আচ্ছা। দু' পেয়ালা চিনি দিলুম,—দেখুন তো · যদি আরো দরকার হয়…

বন্ধু কহিল—চায়ের নেশা লাগিয়ে দিচ্ছেন, অতিরিক্ত মিষ্টতায় তাকে ভরিয়ে তুলে…লোভে পড়ে দু'বার তিনবার আসতে হবে, দেখচি!

সুরমার সর্ব্ব দেহ তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে শিহরিয়া উঠিল। নিজেকে তখনি সে ভর্ৎসনা করিল,—তুচ্ছ এক পেয়ালা চা, তার জন্যও…কি ভীরু সে—এমন ছোট মন!

৩

চায়ে বন্ধুর সত্যই নেশা লাগিয়া গেল। ঠিক যে চা.. তা বলা চলে না। চা তো এতকাল বন্ধুর বয়ই তৈরী করিয়া আসিতেছে। সে চায়ে খুঁৎ বন্ধু কোনোদিনই পায় নাই। এখন সে চা ভালো লাগে না। চায়ের পেয়ালার সঙ্গে সঙ্গে এই যে তরুণীর হাসির বিদ্যুৎ, কথায় এই সুরের আলাপ…তার মোহ অনেকখানি! কাজেই ভোরে উঠিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া এই ক' মাইল আসিয়া চা খাইতে হয়। চায়ের সঙ্গে এমন একটা আবেশ তার সারা মনকে ঘিরিয়া বসে—কত কথা হয়, কত গল্প, কত হাসি…গানও!

কি করিয়াই যে আগে তার সময় কাটিত! নিঃসঙ্গ নীরস জীবনে সুরের রস এখন একেবারে উথলিয়া বহিতেছে!

সুরমারই বা কাজ কি! এটা-সেটা গুছাইতেছে, একটা টেবিল তিনবার ঝাড়িতেছে, এ-চেয়ারখানা নাড়িয়া একবার ওদিকে রাখিতেছে, আবার পরক্ষণে সেটাকে এদিকে টানিয়া আনিতেছে। সেলাই, বোনা, নয়তো চিঠি লেখা,…সেদিন সে পশম লইয়া কার্ডিগান জ্যাকেট তৈরী করিতেছিল। বন্ধু আসিয়া কহিল,—বৌদির গুণের দেখচি সীমা নেই…ফণী কত ভাগ্য করেছিল…! লজ্জায় সুরমার কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল।

বন্ধু কহিল—আপনার হাতের পরশ নিবিড় হয়ে ফণীর অঙ্গে লেগে থাকবে…চমৎকার এ আইডিয়া! সুরমার আরো লজ্জা হইল—সে মুখ নামাইয়া কাঠি লইয়া জামা বুনিতে লাগিল, কোন কথা কহিল না।

বন্ধু কহিল—আমাকেও একটি জামা তৈরী করে দিতে হবে বৌদি—আমি পশম আনিয়ে দেবো…

সুরমা কহিল—পশম আনিয়ে দিতে হবে না—ঢের আছে। এঁরটা হয়ে যাক, দেবো তৈরী করে। একটা মাপ দেবেন,—হাতের, ছাতির…

বন্ধু কহিল—সে আমি কি করে মাপ দেবো! আপনি বরং…

সুরমা কহিল—আচ্ছা…

সুরমা বুনিতে লাগিল। বন্ধু উঠিল, উঠিয়া হার্ম্মোনিয়মের সামনে গিয়া বাজাইতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিল,—

'প্রচুর তপন-তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘ পথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে
খোলো খোলো খোলো দ্বার।…
… … …
বুকে বাজে আশাহীনা
ক্ষীণ-মর্ম্মর বীণা,
জানিনা কে আছে কিনা, সাড়া তো পাই না তার।'…

সুরমার কাণে আসিয়া সুরগুলা আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। সে এক-মনে জামা বুনিতে লাগিল। বন্ধু আবার গান ধরিল,—

'জাগরণে যায় বিভাবরী;
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি
মরি মরি!
যার লাগি ফিরি একা একা,
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,
তারি বাঁশী ওগো তারি বাঁশী
তারি বাঁশী বাজে হিয়া ভরি
মরি মরি।'

এ সুর আসিয়া সুরমার প্রাণটাকে তীরের মত বিঁধিল! এ তারি মনের কথা···! চোখের সামনে কোন্ অজানা পথে ফণী চলিয়াছে···সুরমার ব্যাকুল দুই নয়নের দৃষ্টি তারি পিছনে···ফণী তা দেখিতেও পায় না! কি করিয়া তাকে এমন নিঃসঙ্গ একলা ফেলিয়া এমন করিয়া আছে···? ওগো, আমার দিন যে আর এখানে কাটিতে চায় না! এই নির্জ্জন বন-তলে—যার লাগি ফিরি একা একা, আঁখি পিপাসিত, নাহি দেখা···বুক যে সত্যই ফাটিয়া যায়! সুরমা হাতের কাজ ফেলিয়া মুগ্ধ চিত্তে গান শুনিতে লাগিল। তার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। সেদিকে তার খেয়ালও নাই। বন্ধু গাহিতেছিল···

এই হিয়া ভরা বেদনাতে
বারি ছলছল আঁখিপাতে
ছায়া দোলে, তারি ছায়া দোলে ··
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি···

সুরমার চোখের সামনে সব আলো নিবিয়া গেল। অশ্রু-ভরা চোখের সামনে ছায়া, কেবলি ছায়া · দীর্ঘ ছায়া, পাখীর ডানার মত···হঠাৎ তার চেতনা ফিরিল, বন্ধু বলিতেছিল,—এ কি বৌদি, দু' চোখে জল যে···এ্যাঁ···

সুরমা অপ্রতিভ হইয়া কহিল—না। আঁচলে সে চোখ মুছিল, মুছিয়া হাসিল।

বন্ধু তার হাত ধরিয়া কহিল—না, কান্না-টান্না নয়...

সুরমা সবলে বন্ধুর হাত ছিনাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—চা আনি···

বন্ধু কহিল—চা থাক্ ··চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক···

সুরমার কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। সঙ্গ নয়, গল্প নয়,—কিছু নয়! একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেই যা কিছু আরাম!

বন্ধু কহিল,—উঠে পড়ুন,···ভাবচেন কি! আজ এখন আমার কাজেরো কোনো তাড়া নেই...

সুরমা না বলিতে পারিল না। স্বামীর বন্ধু...অতিথি! সে উঠিল।

ফটকের কাছে মথুরা আসিয়া কহিল,—সঙ্গে যাবো?

সুরমা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বন্ধু কহিল—কেন? কোনো দরকার নেই—তুই বাপু বাড়ী চৌকি দে···

মথুরা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরমাকে সঙ্গে লইয়া বন্ধু বাহির হইয়া গেল। মথুরা স্থির দৃষ্টিতে তাদের পানে চাহিয়া রহিল,—ঝোপের ওধারে তারা দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হইলে মথুরা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের কাজে ফিরিয়া আসিল।

৩

সুরমার অস্বস্তির সীমা ছিল না। রাগও ধরিতেছিল। ফণীর চিঠি আসিয়াছে। ফণী লিখিয়াছে,—আরো এক-হপ্তা বোধ হয় ফিরতে পারবো না। একলা তোমার কষ্ট হচ্ছে, না? কিন্তু এবার তত কষ্ট হওয়া উচিত হবে না। একজন সঙ্গী দিয়ে এসেচি···আশা করি, বন্ধু প্রায়ই যায়। তোমরা দুজনে এ'র মধ্যে দেশটার কোথায় কি আছে, ঘুরে আবিষ্কার করে রাখো। আমি গেলে দেখিয়ো। সঙ্গীত-চর্চ্চা চলছে তো? খবর্দ্দার, বন্ধ দিয়ো না। বন্ধুকে পাকড়ে যতখানি পারো, সুর তার কাছ থেকে আদায় করে নাও। লোকটা সুরের ভাণ্ডারী। আমায় খুব গাল দিচ্ছ, বোধ হয়। কিন্তু ওগো মানিনী, আমার মনে প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি বিরাজ করছো!

ছোট্ট চিঠি! কে চায়! সঙ্গীত-চর্চ্চা করো···হারে পুরুষ, এ সঙ্গীত-চর্চ্চা কি তার নিজের সখের জন্য...? তাছাড়া তোমার বন্ধু যত সুরের কারবারই করুক, পুরুষ মানুষ, তাকে যখন-তখন গানের ফরমাশ করিতে তার বুঝি লজ্জা করে না? কি যে বলো! এবার এমন কড়া চিঠি লিখিব···না, তা কেন, চিঠি লিখিবই না···দেখি, তোমার চাকরির মায়া বড়, না,...

সুরমা আর ভাবিতে পারিল না—বেদনাতুর মন ঐ পথ ধরিয়া আবার কোন্ অজানা গৃহের দ্বারে ছুটিয়া চলিল··· কিন্তু অজানার মাঝে কোনো হদিশই মেলে না যে!···

পূর্ণিমা। সন্ধ্যা না হইতেই মস্ত চাঁদ আকাশে আসিয়া দেখা দিল। সে যেন ঐ বড় গাছটার আড়ালে লুকাইয়া সুরমাকেই লক্ষ্য করিতেছিল!···সুরমার মন উতলা হইয়া উঠিল। সুরমা হার্ম্মোনিয়মের পাশে বসিয়া গান ধরিল;—

এমন চাঁদিনী, মধুর যামিনী···
সে যদি গো শুধু আসিত ··

সহসা বন্ধু আসিয়া উপস্থিত। সুরমা তাড়াতাড়ি গান থামাইয়া উঠিয়া পড়িল।

বন্ধু কহিল,—অন্যায় করেচি। না এসে লুকিয়ে থাকলে সুরলোকের বার্ত্তা পেতুম···! সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

সুরমা কহিল—চা আনাই···

বন্ধু কহিল—আঃ, কেবলি চা, চা, চা আমি কি এমনি চায়ের নেশায় মশ্‌গুল? না, সেইজন্যেই আসি···?

সুরমা কোনো কথা না কহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

বন্ধু কহিল—এমন চাঁদের উদয় দেখে মনটা কাতর হয়েছে, . না বৌদি?

কথাটা যেন চাবুকের মত ..সুরমার ভারী লজ্জা হইল!

বন্ধু কহিল—ফণীটা কি গাড়োল! গাড়োল বলি কেন! এ রীতিমত নিষ্ঠুরতা! পয়সার নীচ গোলামি! এমন রাত্রিটা কি কতকগুলো বর্ব্বর ধাঙড়ের সঙ্গে কাটাবার জন্য তৈরী হয়েছিল! তা ভাবনা কি, বৌদি? চলুন, আমরা দুজনে আজকের এই জ্যোৎস্নায় সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বেড়াই···

মথুরা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, কহিল—চা আনবো?

বন্ধু আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, হতভাগা, বেয়াদব!

সুরমা কহিল—চা থাক্···

মথুরা একটা ঝাড়ন লইয়া টেবিল চেয়ার ঝাড়পোঁছ করিতে লাগিল। বন্ধু বিরক্ত হইল। সে বসিল, বসিয়া বলিল—চা ফরমাশ করুন, বৌদি

সুরমা কহিল—আমি নিজেই যাচ্ছি ..

বন্ধু কহিল—ঐ জন্যেই তো চায়ে অরুচি ধরে! আপনাকে কষ্ট করতে হয় যদি তো থাক্ চা···

সুরমা কহিল—মথুরা, চা .

মথুরা একবার দুজনের দিকে চাহিল—কঠিন দৃষ্টি! তারপর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সুরমা তার সেলাইয়ের কাজ পাড়িল। সে একটা টাই বুনিতেছিল। বন্ধু কহিল—ফণীর জন্যে, বুঝি?

সুরমা জবাব দিল না। বন্ধু একটা নিশ্বাস ফেলিল; তারপর কহিল—আমি আপনাকে উল আনিয়ে দেবো বৌদি। দয়া করে একটা বুনে দেবেন আমার জন্যও··· আপনার প্রীতি গলায় নিয়ে দেশে দেশে ফিরবো ··

সুরমা শিহরিয়া উঠিল। এ কথার অর্থ···? সে একটু ত্রস্তভাবেই বন্ধুর পানে চাহিল। বন্ধু হাসিয়া কহিল—মানে, আপনাদের স্নেহ আমার মস্ত সম্পদ যে এ নিরালা বনবাসে···

সুরমা কহিল—উল এনে দিতে হবে না। এঁরটা হোক্, হলে আপনাকেও নয় একটা টাই বুনে দেবো ··

বন্ধু কহিল—ধন্যবাদ বৌদি···

সুরমা কহিল—আপনি বিনয়-প্রকাশটা একটু কম করবেন, · সে হাসিল।

বন্ধুর মনে হইল, ও হাসি কোন্ অমরার দ্বার যে খুলিয়া দিল, · সেখানে শুধুই আলো, গান, হাসি আর আনন্দ! বেচারা, বেচারা সে ··হতভাগা···! তার জন্য টাই মিলিবে ···কিন্তু আগে ফণীরটা তৈরী হোক্, তারপর···! ফণী... lucky dog!

সুরমা টাই বুনিতেছিল। গাছ-পালার পাতা দোলাইয়া বাতাস বহিতেছিল,—গাছের পাতার আড়ালে চাঁদের উঁকি-ঝুঁকি······

বন্ধু নিবিষ্ট মনে সুরমার পানে চাহিয়া ছিল। তার কর্ম্ম-রত দুই বাহু···নিটোল সুগোল হাত দুখানি···বাতাসের দোলা পাইয়া ললাটের উপর চূর্ণ কুন্তলের উদাস খেলা, চোখে সলাজ চাহনি-ভঙ্গী · বন্ধুর মন এ-সবের মধ্যে কি মাধুরীর স্বাদ পাইয়া যে তন্ময় বিভোর···চোখ তার ফিরে না ...কণ্ঠ নীরব! ··

এ চোখের দৃষ্টি সুরমার অলক্ষ্যে তার দেহে-মনে একটা অস্বস্তির শিহরণ হানিতেছিল! কি এ দায়—মুক্তিও তো নাই! ··

কাহারও মুখে কোনো কথা নাই। এমনি করিয়া বহুক্ষণ কাটিল। চায়ের পেয়ালা আসিল,—পেয়ালা ফুরাইল। মথুরা একধারে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা কখন্ রাত্রিকে আসর ছাড়িয়া সরিয়া গিয়াছে!···বাহিরে চাঁদের জ্যোৎস্নায় যেন বান ডাকিয়াছে! ..আলোর ছড়াছড়ি ··

বন্ধু কথা কহিল, বুক তার দুলিয়া উঠিল। সে বলিল—চলুন, একটু ঘুরে আসা যাক ..

সুরমা কহিল—রাত হয়ে গেছে যে ··

বন্ধু কহিল—তাতে কি! In such a night as this···

সুরমা বাধা দিয়া কহিল—না, না, এত রাত্রে···

বন্ধু কহিল,—তাহলে আপনি একটু গান গাইবেন, চলুন···

সুরমা কহিল—সময় নেই…এখনি কাজের ডাক পড়বে…

বন্ধু বিরক্ত হইয়া কহিল—আঃ, কেবলি কাজ, কাজ, কাজ…

সুরমা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—আপনি গান গান না…আমি শুনি…

বন্ধু কহিল—আচ্ছা, সেই কাজই করা যাবে। আজ পূর্ণিমার মান রাখবো গানে!…আমার একটু কাজ আছে, সেরে নি…তার পরে আসবো'খন…

সুরমা কহিল—আসবেন।—কথাটা বলিয়া সে তখনি জিভ্ কাটিল!

সুরমার স্বরে উৎসাহের একটা আবেগ ছিল। বন্ধু তাহা লক্ষ্য করিয়া খুশী হইল। সে কহিল—আসবো…তবে রাত প্রায় এগারোটা হবে…

—এ—গা—রোটা! সুরমা কহিল—তবেই হয়েচে! আমি তখন গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে থাকবো। জানেন না তো, আমি কি-রকম ঘুম-কাতুরে…উনি কত রাগ করেন!

আবার উনি! ফণীর ছায়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইল! বন্ধু বিরক্ত হইল! সে কহিল,—না, না, না—আজকের এ রাত্রি ঘুমের জন্য নয়…

সুরমার মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল—তবে…?

বন্ধু কহিল—গান, গল্প,—বুঝলেন তার কথার স্বর আপনা হইতেই মৃদু হইয়া উঠিল। সে কহিল—বেশ, ঘুমিয়েই যদি পড়েন, তবু দরজা খুলে রাখবেন,—আমি গান গেয়ে ঘুম ভাঙ্গাবো'খন…সেই গান ও নলিনী, খোলো না আঁখি, ঘুম এখনো ভাঙ্গিল না কি ..

এ সব কি কথা, আবার!…সুরমা কথা কহিল না, শিহরিয়া কি সে ভাবিতেছিল ..

বন্ধু কহিল—এই রাত্রে গানের আসর খুব জাগিয়ে দেওয়া যাবে। তাহলে দরজা খুলে রাখবেন তো… ?

সুরমা কহিল—আমার দায় পড়েছে…শেষে চোর-টোর আসুক…বাবারে, তাহলে ভয়েই মরে যাবো…

বন্ধু কহিল—না বৌদি,…সে সরিয়া সুরমার হাত ধরিল …সুরমা হাত ছাড়াইয়া লইল ..

বন্ধু কহিল—তাছাড়া আপনাকে আমার কতকগুলো কথা বলবো…প্রাণের দারুণ বেদনার কথা…কেউ জানে না ..

সুরমার বুকখানা কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল।

বন্ধু বলিল,—অনুমতি দিন…

সুরমা কহিল—না,—রাত এগারোটায় আসতে হবে না…

বন্ধু কহিল—কেন…? বন্ধুর চোখ দুইটায় কিসের আগুন জ্বলিতেছিল! কি এক গূঢ় অভিসন্ধি তার মাথায় খেলিতেছিল…

বন্ধু আবার কথা কহিল—আপনি দরদী…আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে। আর তা শোনার যোগ্য সময় আজকের এই রাত্রি। আমি আসচি…আমায় আসতেই হবে…এখন উঠলুম তবে…

মথুরা চাকরটা তার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—যেন এক কঠিন পাথরের মূর্ত্তি!—বন্ধুর দৃষ্টি তার সে দৃষ্টির সঙ্গে মিশিল—মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র…সে তা গ্রাহ্যও করিল না।

সুরমা কহিল—আপনি আসবেন না…এলে দেখা হবে না…

বন্ধু সুরমার পানে চাহিল…চোখে মিনতির রাশি! সুরমা কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াইল না; পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

বন্ধু একবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল, তার পর চুপ করিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া কি ভাবিল—তারপরে টলিতে টলিতে বাঙলোর বাহিরে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম খুলিল। লাগাম ধরিয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল—ঘোড়া মুখ ফিরাইয়া চলিল।…

সুরমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। পূর্ণিমার ঐ জ্যোৎস্না নিমেষে ঝাপসা কালো হইয়া উঠিয়াছে! সে ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিল, আসিয়া দেখিল, ঐ যে ঘোড়া, ঝাউ গাছটার সামনে…সে ডাকিল,—মথুরা…

মথুরা আগাইয়া আসিল। সুরমা কহিল—দৌড়ে যা, বাবুকে বলগে যা, আসবেন এগারোটার সময়। দরজা খোলা থাকবে।

মথুরা এমন একটা দৃষ্টিতে সুরমার পানে চাহিল…সুরমা সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল না—বলিল,—যা শীগ্‌গির ..

মথুরা বিনা-বাক্যব্যয়ে ঘোড়ার পিছনে ছুটিল…সুরমা সেই দিকে চাহিয়া…ঐ যে মথুরা…ঘোড়া থামিল। মথুরা

বলিল। বন্ধু ফিরিয়া চাহিল,…সুরমার সঙ্গে দৃষ্টি মিলিল। বন্ধু হাসিল…সে হাসিতে সুরমার বুকের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল…নিজেকে কোনো-মতে টানিয়া আনিয়া শয্যার উপর সে লুটাইয়া দিল—দুই চোখে তার ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল…উপায় নাই, উপায় নাই!…দারুণ নিরুপায়েই তাকে আজ এত বড়…

ফণীর উপর তার রাগ ধরিল…তোমারই জন্য আজ এত বড় অপমান মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছে…

মথুরা আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল—বাবু আসবেন, বললেন।

কথাটা কাণে আসিয়া লাগিল…খুব দূরে বাজ পড়িলে, সে আওয়াজ যেমন কাণে আসিয়া লাগে, তেমনি যেন…

চোখ মুছিয়া সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। মথুরার ন্যুব্জ দেহ তখন ঘর হইতে সরিয়া যাইতেছে!…

৪

বাঙলোর ভিতরটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন; বাহিরে জ্যোৎস্নার রাশি! বদ্ধ ঘরের দ্বার খোলা। সেই ঘরের মধ্য দিয়াই সুরমার শয়ন-কক্ষে যাইতে হয়। বাহিরে গাছপালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার লুকোচুরি খেলা চলিয়াছে!…আলো-ছায়ার যেন ঝালর দুলিতেছে!

সুরমা নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়া…তার বুকের মধ্যে কে যেন ভারী মুগুর মারিতেছে…বুক বুঝি ফাটিয়া যাইবে! প্রচণ্ড চাঞ্চল্যে সে সারা হইয়া যাইতেছে!……

বাঙলোর পুরানো ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গিয়াছে……

ওদিককার বড় রাস্তার উপর একটা ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার নাল সহসা খুলিয়া গেল। ঘোড়া চলিতে চায় না। সাহেবী পোষাক-পরা আরোহীকে কাকুতি জানাইয়া গাড়োয়ান কহিল, ঘোড়া তার আর নড়ে না! আরোহী কহিল,—বেশ, এখান থেকে কতটুকুনই বা…তোর ভাড়া নে, আমি হেঁটে যাবো—জ্যোৎস্না আছে। বলিয়া আরোহী নামিয়া পড়িল; সঙ্গে একটা হোল্ড-অল্ মাত্র। সেটা হাতে লইয়া গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া সে বাড়ীর পথে চলিল।

আরোহী ফণী।

তার মুখে হাসি! ভাবিল, বেশ হইবে! সুরমা আশাও করে নাই!…অঘোরে ঘুমাইতেছে! একেবারে একটি চুম্বনে তার ঘুম ভাঙ্গাইবে, আর সে…হঠাৎ কাজ শেষ হইয়া গেছে—বাড়ীর জন্য মনটা বড় অধীর। তাই সে ট্রেণ পাইয়া গৃহে ফিরিতেছে। ইচ্ছা করিয়াই কোনো খবর দেয় নাই! দিবার সময়ও ছিল না। আর একবার খবর না দিয়া এমনি রাত্রে সে ফিরিয়াছিল… আনন্দ যা মিলিয়াছিল, তার স্মৃতি এখনো তাকে উন্মাদ করিয়া তোলে!

বেচারী একা ঐ বনের মধ্যে থাকে…কার সঙ্গেই বা কথা কহিবে…এই বয়সে…! এবার তবু বন্ধু আছে—নহিলে ফণী কি বোঝে না, তাকে কাছে না পাইয়া সুরমার কি কষ্টে দিন কাটে!…কিন্তু উপায় যে নাই! থাকিলে সে সুরমাকে সঙ্গে লইয়াই ফিরিত তো!… …

ঐ বাঙলো দেখা যায়। জ্যোৎস্নার চাদর মুড়ি দিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া আছে…ওই বাঙলো—উহার মধ্যে তার প্রাণের যত হাসি, যত আনন্দ…বুক তার ফুলিয়া উঠিল… অধীর উন্মাদনায়…

হোল্ড-অলটা বারান্দায় ফেলিয়া সে দেখে, ড্রয়িং-রুমের দ্বার খোলা। বাঃ, চমৎকার…কাহাকেও ডাকিয়া তুলিতে হইবে না…! নিঃশব্দে খোলা দ্বার দিয়া সে ড্রয়িং রুমে ঢুকিল।

…কঠিন হস্তে গলা কে চাপিয়া ধরিল! আচম্কা এ আক্রমণে ফণীর কথা কহিবার শক্তি উবিয়া গেল…যে প্রবল শক্তি তার গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল, সে অমনি-ভাবেই তাকে টানিয়া বাহিরের বারান্দায় আনিল; প্রবলভাবে ঝাঁকানি দিয়া কহিল—শয়তান্…

মথুরা…! ফণী চমকিয়া কহিল—করিস কি মথুরা… আমি চোর নই রে!

এঁ্যা! ঠিক—মনিবই! মথুরা চমকিয়া উঠিল।

আপনি…? মথুরা ফণীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল, পর মুহূর্ত্তে চাপা গলায় কহিল,—এই নিন্ আপনার বন্দুক…

কোমর হইতে তারি রিভলভারটা টানিয়া ফণীর হাতে দিয়া মথুরা কহিল,—এই নিন্… দরকার আছে। ভারী বিপদ…

ফণী চমকিয়া উঠিল। বিপদ! সে কহিল,—তোর বহু-মা—

মথুরা কহিল,—বহু-মাই·· ঐ সাহেব বন্ধু···বঙ্কু বাবু··· রাত এগারোটায় আসবে আমি তাই চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম—যেমন আসবে, অমনি···আমার সহ্য হয় না, বাবু···

মথুরার স্বরে কি ঝাঁজ! তার সর্ব্বশরীর রাগে কাঁপিতেছে!···

ফণী শিহরিয়া উঠিল! মথুরা এ বলে কি.. তার বন্ধু বঙ্কু···আর সুরমা···পায়ের তলায় মাটীটা দুলিতেছিল!

মথুরা কহিল,—চুপ.··নিজের চোখে দেখতে পাবেন··· বাবু···মথুরা বেশ কাঁপিতেছে ..

কিন্তু না—মথুরার এ স্পর্দ্ধার সীমা নাই!—ফণী কহিল—চুপ্ কর্। তুই শয়তান্···

মথুরা কহিল—আমায় ছুটী দিন··আপনার ঘর, আপনার ইজ্জৎ···আমি চৌকি দিয়েছি···কিন্তু আর পারি না ..

—আচ্ছা, তুই যা...বলিয়া ফণী দারুণ ঘৃণায় মথুরাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিল। ধাক্কা খাইয়া মথুরা একদিকে সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাহিরে জ্যোৎস্নার রাশি...আকাশ যেন এত জ্যোৎস্না আর ধরিয়া রাখিতে পারে না! অজস্র দানে পৃথিবীকে ভরিয়া তুলিয়াছে!···চকিতে ওই শুভ্র অমল জ্যোৎস্নার রাশিতে কে কালি ঢালিয়া দিল···চারিদিক গাঢ় কালো কালিতে ভরা···

ফণী বসিয়া পড়িল···তার সোনার স্বপ্ন···প্রাণের যা-কিছু আরাম···এমনি ভাবে খোয়া যাইতে বসিয়াছে! এত-বড় দুনিয়ায় সে কি লইয়া থাকিবে!······সমস্ত পৃথিবীটা দুলিতে দুলিতে কোন্ রসাতলে যেন নামিয়া চলিয়াছে! ফণীর মাথা ঘুরিতেছিল। সে জাগিয়া আছে, না, একটা ভীষণ তীব্র দুঃস্বপ্ন ···?

দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ!···সে চাহিয়া দেখিল···অস্পষ্ট রেখার মত অগ্রসর হইয়া এই দিকেই আসিতেছে। স্বপ্ন নয়! রিভলভারটা সে হাতের মুঠিতে ভরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,··· তাই, দ্বার খোলা বটে! এত-বড় শয়তানীও সম্ভব···মন প্রাণপণে হাঁকিতে লাগিল, না, না, না···কিন্তু ঐ ঘোড়ার পায়ের শব্দ..! ফণীর মনে হইল, এই বন্দুকের গুলিতে দুনিয়াটাকে ছিঁড়িয়া ফাঁসাইয়া সে চূর্ণ করিয়া দেয়!···

খোলা দ্বার দিয়া ড্রয়িং রুমের মধ্যে ঢুকিয়া এক কোণে সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চারিধার নিশুতি। কোনো সাড়াশব্দ নাই...বহুদূরে কোন্ পাড়ায় একটা কুকুর শুধু বিশ্রী রব তুলিতেছিল···দুনিয়ার এই শয়তানী দেখিয়া কুকুরটা বিরক্ত বুঝি হইয়া উঠিয়াছে! নহিলে এমন চীৎকার তুলিবে কেন?

বাঙলোর বারান্দায় একটা খস্ খস্ শব্দ···অতি সতর্ক কার মৃদু গতি! ফণীর অন্তরাত্মা গর্জ্জিয়া উঠিল,—শয়তান্! ·· হাত নিশ্‌পিশ করিয়া উঠিল। জোর করিয়া পিস্তলটা পকেটে ফেলিয়া সে দুই হাত বুকের উপর মুঠি ভরিয়া চাপিয়া ধরিল।

ঐ যে দ্বারে মানুষের ছায়া!—চোর, ডাকাত, শয়তান···

কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ফণী দেখিল,.. বঙ্কুর মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি ড্রয়িং-রুম পার হইয়া সতর্ক গতিতে...ঐ যে সুরমার ঘরে চলিয়াছে! একবার মনে হইল, এ কি আবার দুঃস্বপ্ন দেখা চলিয়াছে, না, সত্যই তার চোখের সামনে এত বড় প্রলয়ের ব্যাপার ঘটিতেছে··? তার স্ত্রী সুরমা...তার জীবনের ধ্রুব-তারা—তার সর্ব্বস্ব সুরমা··এ চোর তার সর্ব্বস্ব এমন করিয়া লুটিয়া লইয়া যাইবে? বুকের মধ্যটা দুপ্ দুপ্ করিতেছিল···তবু সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল··আরো কি হয়...এর পর? এর পর?···কতদূর ঘটিতে পারে·· দেখা যাক!·দুই চোখ যেন খসিয়া না পড়ে, ভগবান হুঁশিয়ার!···

পাশের ঘরে পায়ের শব্দ···ঐ···আলো জ্বলিল। ঐ না কে কথা কহিতেছে?···হাঁ···বঙ্কুর স্বর···বঙ্কু ডাকিল— সুরমা...সু···সু···

ধড়মড়িয়া কে উঠিয়া বসিল, না? ও··সুরমা! ভগবান, ভগবান, তোমার বাজ কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ···! নিষ্ঠুর, তুমিও এ শয়তানী দেখিয়া চুপ করিয়া আছো! বেশ···বাঃ!

বুকটাকে চাপিয়া ধরিয়া ফণী উৎকর্ণ হইয়া রহিল··· সুরমা, না? হাঁ, ও স্বর সে ভালো করিয়াই জানে! শয়নে-স্বপনে ও স্বর তার বুকের মধ্যে কি গুঞ্জন তুলিয়া, কি প্রীতি ফুটাইয়াই না ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সারাক্ষণ ·

সুরমা বলিল—এসেচেন আপনি.. আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম···

তারপর সব চুপ! ··বন্ধু কহিল,—এসেছি আমি··তুমি দোর খুলে রেখেছিলে···কম্পিত স্বর!

সুরমা কহিল—হ্যাঁ, বলুন, কি চান···

বন্ধু কহিল—কি চাই··! তারপর কোন কথা নয়—আবার চুপ! আবার বন্ধু কহিল—চলো সুরমা, এমন রাত্রি...তোমার এই বয়স···এ বয়সে একলা এ নির্জ্জন ঘরে পড়ে থাকা সম্ভব নয় তো · সাজে না! আমার সঙ্গে চলো · চলো, · দুনিয়া খুব বড় ..এত বড় দুনিয়ার এক কোণে দু'জনে আমরা এক অপূর্ব্ব মায়া-লোকের সৃষ্টি করে সেখানে থাকবো···এসো আমার সঙ্গে ..

অসহ্য! এইবার ..! ফণী পকেটে হাত পুরিয়া পিস্তলটা বাহির করিল...তারপর সতর্ক গতিতে এক পা অগ্রসর হইল ·

সুরমা কহিল—আপনার এই কথা তো ? এই কথা বলতে চেয়েছিলেন আমাকে···? সুরমার স্বর কাঁপিতেছিল। ফণী গতি থামাইয়া দুই কাণ খাড়া করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। বুক তার এমন দোলে দুলিতেছিল!

সুরমা আবার তেমনি কম্পিত কণ্ঠে কহিল—আমারো একটা কথা আছে··আগে শুনুন ··

বন্ধু কহিল—বলো · কিন্তু ওই জ্যোৎস্নার আলোয় বেরিয়ে এসে বললে হতো না · ?

সুরমা কহিল—না, এইখানেই বল্‌তে চাই

বন্ধু কহিল—বেশ, বলো ··

আর এক পা আগাইয়া আসিয়া ফণী কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল। সুরমা কহিল—আমায় স্বামী আছেন ··সে স্বামী আমার সর্ব্বস্ব তাঁকে আমার প্রাণের চেয়েও আমি ভালোবাসি ··

ফণীর প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল! আঃ! যে-প্রাণ এতক্ষণ জ্বলিয়া পুড়িয়া বেদনায় খাক্ হইতেছিল, সে প্রাণে এ কথা যেন অমৃতের প্রলেপ সিঞ্চন করিল!···আঃ···আঃ ··!

সুরমা বলিল—তিনি আপনার বন্ধু ··আপনাকে তিনি ভার দিয়ে গেছেন আমায় আগলাবার ··তাঁর বন্ধু বলেই অসঙ্কোচে তাঁর মান রাখতে আপনার সামনে এগিয়েচি। গান গেয়েচি, আপনার সঙ্গে মিশেচি, কথা কয়েচি। আপনার অভ্যর্থনায় কোনো ত্রুটি ঘটতে দিইনি ··যত দূরেই তিনি এখন থাকুন, আমার মন তাঁরি কাছে, সেইখানেই আছে··· নিঃসঙ্গ হয়েও সর্ব্বক্ষণ আমি তাঁর সঙ্গ-সুখে বিভোর হয়ে আছি ..তাঁর স্মৃতি অহরহ রক্ষা-কবচের মত আমায় সমস্ত দুর্ভাবনা ভয় বিপদ থেকে রক্ষা করচে...আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি আপনার এ স্পর্দ্ধা দেখে···ছি···! চোরের মত আপনি এসেচেন আমার কাছে এই নিরালা রাত্রে আপনার ভালোবাসা জানাতে! ভালোবাসার কি অভাব আছে আমার?···কিসের লোভই বা দেখাচ্ছেন! আপনার ও কি ভালোবাসা! স্বামীর ভালোবাসা যে পেয়েছে, ভালোবাসা কি, তা সে জানে···মাতালের নেশায় তাকে ভোলাবেন ··? এ কি নীচ জঘন্য স্পর্দ্ধা আপনার···

অসহ্য আনন্দে ফণীর মনে হইল, সে বুঝি এবার পাগল হইয়া যাইবে!···এ কথা নিজের কাণে শুনিয়া সে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না ··ছুটিয়া সুরমার ঘরে ঢুকিবে? কৃতজ্ঞতায় তার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া ডাকিবে, সুরমা,···সু···সু···সু···

কিন্তু না,···এখন নয়···ওই শয়তানটা এখনো দাঁড়াইয়া আছে! হাতে এই পিস্তল! রাগের বশে শেষে যদি সে···একটা অগ্নিকুণ্ড নিমেষে তার চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! মনকে সে বলিল, ..না··

তেমনি কাঠ হইয়াই সে সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের ঘরে আর কোনো রব নাই!···বহুক্ষণ ··!

তারপর ছায়ার মত একটা মূর্ত্তি ঘর হইতে ঐ বাহির হইয়া গেল···বারান্দায় সে-মূর্ত্তি · তারপর ঐ ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া চলিয়াছে···

ফণীর পা টলিতেছিল ··সে নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল···সে-মূর্ত্তি কখন যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! ফণীর কোনো চেতনা নাই!···

চেতনা ফিরিলে পিস্তলটা সোফায় ফেলিয়া ফণী ঘরে গিয়া ঢুকিল। খোলা জানালা দিয়া একরাশ জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানায় পড়িয়াছে ··সে আলোয় ফণী দেখে, বিছানার উপর সুরমা লুটাইয়া পড়িয়া আছে!...কাঁদিতেছে!···

ফণী তাকে টানিয়া একেবারে বুকে তুলিয়া লইল···

সুরমা শিহরিয়া উঠিল।

ফণী ডাকিল,—সু···

সুরমা দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া দেখে,···ফণী···স্বপ্ন নয়···না...

চকিতে একটু-আগেকার সমস্ত ব্যাপার তার মনে জাগিল। সঙ্কোচে সে সরিয়া যাইতেছিল ··

ফণী কহিল—কেমন খপর না দিয়ে এসেচি,···খুব সহজ স্বর!

সুরমা ম্লান চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ফণীর পানে চাহিল··· ফণী যেন কত দূরে সরিয়া গিয়াছে···!

ফণী তার অধরে চুম্বন বর্ষণ করিয়া কহিল,—এখনো ঘুম ভাঙ্গলো না! বা রে, আমি ক্ষিদেয় জ্বলে যাচ্ছি যে · এখনি খেতে দাও, নাহলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বো···

সুরমা কহিল,—একটা কথা বলবো · আগে শোনো ··

বাধা দিয়া ফণী কহিল,—কোনো কথা নয়! আগে খেতে দাও···নাহলে কথা শোনবার বা কথা বলবার শক্তি আমার একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে! বুঝলে···

সুরমা স্বামীর পানে চাহিল—কি সরল, নির্ভরতার দৃষ্টি ও দুই চোখে···কি নিরাপদ আশ্রয় এই দুই বাহুর তলে··· সে স্বামীর বাহু-বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া কহিল,—ছাড়ো। ষ্টোভ জ্বালি···ষ্টোভ জ্বেলে লুচি ভেজে দি · এখনি হয়ে যাবে···

ফণী আবার সুরমার অধরে চুম্বন করিল, কহিল,—এইতো শীতলং পানীয়ং হয়ে গেলো · তুমি লুচি ভাজো, আমি ততক্ষণে বেশভূষা পরিত্যাগ করি·········

সুরমা দ্রুত চলিয়া গেল। ফণী তার পানে চাহিয়া, ·· একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে মনে মনে কহিল, না, এ সম্বন্ধে কোনো কথা নয়! ওগো প্রেয়সী, ও বুকে অসীম অগাধ প্রেম আছে বলেই পুরুষ-স্বামী এই পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গেরও কামনা করে না কোনো দিন! তোমার হৃদয়ের দ্বারে স্বর্গের ইন্দ্রও যে আতিথ্য নেবার জন্য আসতে পারে না, এ কথা ভালো করে জানি বলেই না—

চিন্তায় বাধা পড়িল। সুরমা আসিয়া ভর্ৎসনা করিয়া কহিল,—এখনো দাঁড়িয়ে! নাও, মুখ-হাত ধোও—তারপর দেশবিদেশের যত গল্প শোনাতে হবে। আজ আর ঘুমোতে দিচ্ছিনে, মশায়। যাও, যাও গো শীগ্‌গির ··

ফণীর মনটা খুশী হইল! মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেকার সে কালো মেঘ সুরমার মন হইতে সরিয়া গিয়াছে! আবার সেই চির-পরিচিত হাসি-সুর সুরমার মুখে ফুটিয়াছে,—আঃ! সে তাড়াতাড়ি বেশ-পরিবর্ত্তনে অগ্রসর হইল।

সুরমা কহিল,—দাঁড়াও, আমি জুতোর ফিতেটা খুলে দি···

ফণী পা আর সরাইয়া লইতে পারিল না।······

দ্বিচক্রে "ক্যাল্‌কাটা হুইলার্স্‌"

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুস্তোফী

১৯২৬ সালের ২৯শে অক্টোবর আমরা সাইকেলে বারাণসী ভ্রমণ সাঙ্গ করার পর সকলে ঠিক করে রেখেছিলুন যে, ১৯২৭ সালে কোথাও বেরুতে হবে। সেই কথামত আমরা এবার ঠিক করলুম পুরী ও চিল্‌কা হ্রদের দিকে বেড়াতে যাব। পুরী যাবার সোজা রাস্তা জগন্নাথ রোড দিয়ে প্রথমে যাবার ঠিক করলুম। এ রাস্তা কোলকাতা থেকে পুরী পর্য্যন্ত ৩১২ মাইল। কিন্তু এবারের প্রচণ্ড বন্যায় এই রাস্তার অবস্থা নিতান্ত খারাপ হয়ে যাওয়ায়, আমরা কোলকাতা থেকে বরাকর, পুরুলিয়া, রাঁচী, চাঁইবাসা, টাটানগর, কিয়ণঝড়, রাজ্য, কটক, ভুবনেশ্বর ও চিল্‌কা হ্রদ দেখে ৺পুরীধামে পাড়ী দেবার উদ্যোগ করলুম।

১লা অক্টোবর—

বেলা দেড়টার সময় আমাদের ক্লাবে (Calcutta Wheelers) সকলে মিলিত হয়ে মুজাপুর ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা হোটেলাভিমুখে রওনা হলুম। এখানে আমাদের বিদায়-সম্ভাষণের জন্যে অনেক গণ্যমান্য লোক এসেছিলেন এবং এই সভায় Lt. Col. H. W. Stovold, O.B.E., R.E সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। পরম পূজনীয় সুবিখ্যাত পরিব্রাজক জলধর দাদা মহাশয়ের সুন্দর বক্তৃতাতে আমাদের সাহস দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

বেলা ৩-১০ মিনিটের সময় আমরা সাতজন:—দেবেন্দ্র মুস্তোফী (Captain), মণীন্দ্র মুস্তোফী (Quarter-

এম, গুঁই   এম, মুস্তফি   রায় জলধর সেন বাহাদুর   এল, দত্ত   এ, বোস   ডি, মুস্তফি (কাপ্তেন)
জে, দত্ত   আর, দত্ত   এল-টি, কোল এইচ, ডব্লিউ, ষ্টৌভড, ও, বি, ই, ; আর, ই,
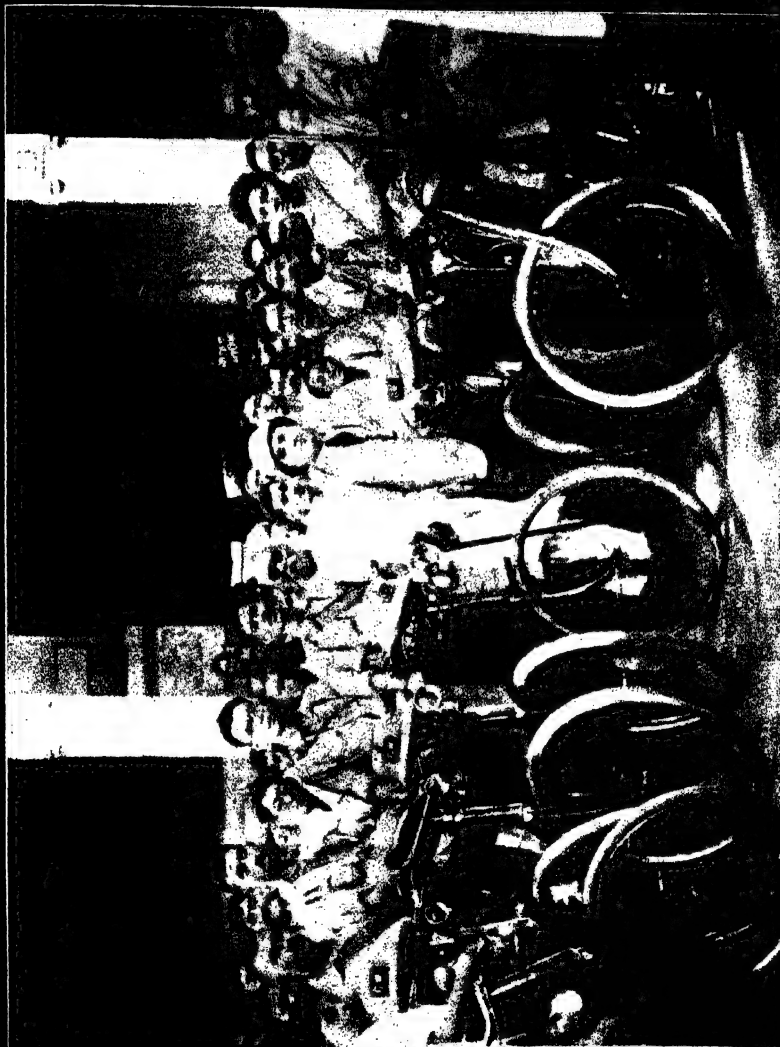
Master), জহরলাল দত্ত (Reporter), মণিলাল গুঁই (Bugler ও Photographer), রাধারমণ দত্ত (Master-Mechanic), অজিতকুমার বসু (Corporal) ও লক্ষ্মী-

আরামে সাঁতার কাটা

নারায়ণ দত্ত (Asstt. Reporter)—চিল্কা ও পুরীর উদ্দেশে যাত্রা করলুম। আমাদের সুবিধের জন্যে এই সকল পদে সকলকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি ছিল : Water Bottle, Haversack (এর মধ্যে নানান্ দরকারী জিনিষ ছিল), Guard's Whistle ("অসময়ের বাঁশী", অর্থাৎ বিপদের সময় এই বাঁশী বাজালেই—যে যেখানে থাকবে, তার সাহায্যার্থে আস্‌তে বাধ্য হবে), দরকারী কাপড় জামা, কম্বল, দস্তানা, লুংগী ইত্যাদি ভাল করে "প্যাক্" করে Carrierএ বাঁধা ছিল। পরণে খাকী "সার্ট" ও "হাফ্‌প্যাণ্ট", কোমরে সাদা বেল্ট্ ও বড় ছুরী, পায়ে খাকী পশমের মোজা ও ব্রাউন্ "অক্সফোর্ড" জুতো, এবং মাথায় আমাদের ক্লাবের Badge আঁটা খাকী "পোলো হ্যাট্।" এ ছাড়া Buglerএর কাছে Bugle, Photographerএর কাছে "ক্যামেরা" ও Corporalএর কাছে বন্দুক ও "ব্যাণ্ডোলিয়ার্"। সাইকেল মেরামতের জিনিষ প্রায় সকলেরই কাছে কিছু না কিছু ছিল, তবে বেশীর ভাগটা Master-Mechanicএর কাছে থাকৃত। এক একটী সাইকেলের ওজন প্রায় পঁয়ত্রিশ সেরে দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঁ—আর একটী কথা বল্‌তে ভুলেছি! আমাদের একটী Haversack এ "বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের" দান করা ঔষধাদি ছিল ও তাতে Red crossএর চিহ্ন আঁকা ছিল। Quarter-Masterএর জিম্মায় সেটা দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে আমরা একটী "লাইন" হয়ে যেতুম; সকলের আগে Bugler, তারপরে Reporter, Asstt. Reporter, Quarter-Master, Master-Mechanic, Corporal এবং সব শেষে Captain।

আমাদের সঙ্গে অনেকেই শ্রীরামপুর, চন্দননগর পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। চন্দননগরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাড়ীতে আজকের রাতটা বেশ স্ফূর্ত্তিতে কাটিয়ে দিয়ে পরদিন ভোর ৬টায় যাত্রা আরম্ভ কর্‌লুম্।

২রা অক্টোবর—

সমস্ত দিন সাইকেল চালানোর পর রাত সাড়ে সাতটায় গোলসীতে শ্রীযুক্ত বলরাম গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিলুম। গোল্‌সী কোলকাতা থেকে ৮৭ মাইল।

৩রা অক্টোবর—

গোলসী থেকে বিদায় নিয়ে ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে দেখি চারিদিকে ভীষণ কোয়াশায় ভর্ত্তি। আমাদের

শাঁকটুরিয়া

...gler মণি আগে আগে যাচ্ছিল, সে হঠাৎ Bugle ...জিয়ে দিলে। হঠাৎ Bugle বাজাবার কারণ বুঝতে না ...বে সামনে তাকাতেই দেখি, একখানা গরুর গাড়ী কুয়াসা ...দ করে রাস্তা ছেড়ে নালার ভেতরে গিয়ে পড়ল। ...র গাড়ীগুলো এমনভাবে রাস্তা জুড়ে চলে যে ...তটুকু জায়গা রাখে না। ক্রমশঃ আমরা যখন ...পানাগড় ছেড়ে দুর্গাপুর জঙ্গলে প্রবেশ করলুম, তখন বেলা প্রায় এগারটা। জঙ্গল গভীর; কিন্তু দিনের বেলায় সে রকম বোঝা যায় না। এ জঙ্গলে নাকি বুনো শূয়রের উপদ্রব খুব বেশী। বাঘও মাঝে মাঝে দেখা যায়। মোটে চার মাইল জঙ্গল—খুব সহজেই পেরিয়ে গেলুম।

বেলা চারটে; আমরা জমিদার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ণনাতীত অতিথি-সেবায় আনন্দিত হয়ে আবার যাত্রা করলুম।

এইরূপে ১৩০ মাইলের কাছাকাছি এসে প্রবল চা পানের ইচ্ছা হওয়াতে সকলে গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। তখন রাত হয়ে এসেছে। অজিত চা তৈরী করবার জন্যে শুকনো ডালপাতা খুঁজে না পেয়ে সাইকেলের দুটো কারবাইডের আলোর দু-পাশে পাথর দিয়ে উনুন তৈরী করে ফেললে ও তার ওপর "এলুমিনিয়ামের" হাঁড়িটা চাপিয়ে দিলে। Folding Primus Stoveটা আনতে ভুল হওয়ায় আমরা অনেক জায়গায় মুস্কিলে পড়েছিলুম কিন্তু

পাখীগুলোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাঙ্গ করলুম

আজ এই এক ঘণ্টা ধরে জল গরম হওয়ায় আমাদের বিশ্রামটা বেশ ভালরকমই হয়ে গেল। আমরা আজ কুল্টি পর্য্যন্ত যাব ভেবেছিলুম; কিন্তু একজন বন্ধুর হাঁটুতে বেদনা হওয়াতে আর যাওয়া হোল না। এখন রাত নটা। কিছুদূর আসতেই ডানদিকে আলো দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে

দামোদরের খেয়া পার

দেখি একটী বড় "বাংলো"। আমরা যেতেই একটী সাহেব বাংলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। সাহেব আমাদের ভ্রমণকাহিনী শুনে ভারি খুসি হয়ে আজকের রাতটা তাঁর বাংলোয় কাটাবার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। এই জায়গার নাম "সাতগাঁও" ও এই সাহেব "সাতগাঁও কোলীয়ারীর" প্রোপ্রাইটার—মিঃ কার্টার।

৪ঠা অক্টোবর—

সাতগাঁও থেকে জলযোগ করে বেরুতে আটটা বাজল ও যখন আসানসোল পার হয়ে কুল্টিতে রায় বাহাদুর ডাক্তার এ, রায়, চীফ মেডিক্যাল অফিসার, মহাশয়ের বাড়ীতে পৌছলুম তখন সাড়ে এগারটা। ডাক্তার বাবু তখন কুল্টিতে ছিলেন না, তিনি না থাকায়ও আমরা যে রকম আদর যত্ন পেয়েছি, তা বলা যায় না। ঠিক সাড়ে চারটের সময় পুরুলিয়ার দিকে রওনা হলুম। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড আমাদের বড়ই একঘেয়ে লাগছিল; কারণ গত বছর এই পথেই Beneras গেছলুম। যখন বরাকরে (১৪৮ মাইল) এসে পৌছলুম, তখন দেখি, আমাদের বাঁদিক দিয়ে পুরুলিয়া যাবার রাস্তা গেছে। এবার আমরা নূতন উদ্যমে নূতন রাস্তায় এসে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডকে বিদায় দিলুম। বরাকর থেকে পুরুলিয়া মোট ছেচল্লিশ মাইল।

কিছুদূর এসেই একটী গ্রাম পেলুম। রাস্তার ধারেই বাজার। বাজারে পাঁউরুটি কেন্‌বার জন্যে একটী দোকানের ধারে নাম্‌তেই, আমাদের চারিপাশে এত লোক জড় হয়ে গেল যে, রুটির দোকান পর্য্যন্ত পৌছান দায় হয়ে উঠ্‌ল। এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন—তাঁর নাম শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাখাল বাবুর সহিত আলাপ হয়ে গেল। তাঁর কাছ থেকে রাস্তা সম্বন্ধে অনেক কিছু খোঁজখবর পাওয়া গেল। রাখালবাবু ইত্যাদি সহ একটী "ফটো" নেওয়া হোল। গ্রামটীর নাম শাকটুরিয়া। শাকটুরিয়াকে পেছুনে রেখে ছ-মাইল আস্‌তেই দামোদর নদীর ধারে এসে পড়্‌লুম। এ স্থানের দৃশ্য অতি চমৎকার। বরাকর নদী দামোদরে মিশেছে। সাম্‌নে ও দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। সূর্য্যদেব শান্ত মূর্ত্তিতে অস্তাচলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নদীতে পুল না থাকায়, আমরা নৌকায় গিয়ে উঠ্‌লুম। মাঝিও নৌকার কোল ভর্ত্তী করে পরপারে পাড়ি দিলে। বৈকালের ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় আমাদের মন নেচে উঠ্‌ল; কাপ্তেন দেবেন মুস্তোফী গান ধর্‌লেন,—"সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা,

তরণী বেয়ে চল নাহি বেলা ॥"

আমিও না থাক্‌তে পেরে কাঠের বাঁশীটা নিয়ে সুর মিলিয়ে বাজাতে লাগ্‌লুম। আমাদের গান বাজনার আসরটা বেশ জমে উঠেছিল, এমন সময় Bugler মণি Bugleএ ফুঁ দিয়ে এমন জোরে এক Fall In বাজিয়ে দিলে যে, তার চড়্‌চড়ানি আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নরম সুরের আসরটা যেন একেবারে আছড়ে ভেঙ্গে দামোদরের অতল জলে তলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌লুম আমরা পারে এসে পড়েছি। যাহোক সভা ভঙ্গ করে তীরে নামবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এই নদী পেরুতে ঠিক পনের মিনিট লাগ্‌ল। নৌকায় বেশ আরামে এসে নেমে দেখি—দারুণ বালির চড়া। বালিতে সাইকেল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে কতবার ধুপধাপ করে সব পড়্‌তে পড়্‌তে রাস্তায় এসে পড়লুম। এখন দামোদরের ওপারে বর্দ্ধমান জেলা পেরিয়ে এপারে মানভূম জেলায় এসে হাজির হলুম। কিন্তু কিছুদূর আস্‌তেই রাত হয়ে গেল। গাড়ীর আলোগুলো জেলে নিলুম। ডান পাশে প্রকাণ্ড এক পাহাড় ও ছোটখাটো জঙ্গল। বেশ যাচ্ছিলুম, হঠাৎ আকাশে কয়েকখণ্ড মেঘ দেখা গেল। আমরাও মেঘ দেখে বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝতে পেরে বেপরোয়া হয়ে পাগলের মত ছুটে চল্‌লুম। ক্রমে ক্রমে সমস্ত আকাশটা মেঘে ভর্ত্তি হয়ে তারাগুলিকে একেবারে ঢেকে ফেল্লে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গতিও দ্বিগুণ বেগে বেড়ে উঠ্‌ল। কিন্তু হায়! কিছুদূর যেতে না যেতেই ঝড় বৃষ্টি তুমুল সংগ্রামে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন। বিদ্যুতের জোর আলো এক একবার চোখগুলিকে ঝল্‌সে দিয়ে কানা করে দিচ্ছে। বজ্রের কড়্‌কড়ানি শব্দ চারিদিকের পাহাড়ের ওপর হুমড়ে পড়ে এই দুনিয়াটাকে এক একবার চম্‌কে দিচ্ছে। এইভাবে কোন আস্তানা না পেয়ে, যত জোরে পারি ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে অন্ধকার ভেদ করে এগুতে লাগলুম। এই অবস্থায় কত মাইল যে এসেছি মনে নেই, এমন সময়, আমাদের করুণ বাঁশীর স্বর সকলকে থামাতে বাধ্য কর্‌লে। থাম্‌তেই, যে বাঁশী দিয়েছিলে, সে এগিয়ে এসে বল্‌লে, "ঐ দেখ দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কোন বাড়ী আছে; চল দেখা যাক্।" ঐ আলো লক্ষ্য করে কাছে গিয়ে দেখি একটী "বাংলো।" একবার ডাক্‌তেই একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করাতে জানা গেল—এ গ্রামের নাম রঘুনাথপুর। ইনি এখানকার Sub Registrar ও এঁর নাম শ্রীযুক্ত শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ আর আমাদের পুরুলিয়ায় যাওয়া হোল না। শরৎ বাবুর নিকট কিছু জলযোগ করে সেখানকার Inspection Bunglowতে রাত কাটান হোল।

৫ই অক্টোবর—

সকালে উঠে দেখি, চারিদিক মেঘে ভর্ত্তি ও বেশ বৃষ্টিও পড়্‌ছে। তখন বেলা আট্‌টা বেজে গেছে ও বৃষ্টি থেমেছে; কিন্তু আকাশের অবস্থা সুবিধাজনক নয়। এই রকম সময় আমরা রঘুনাথপুর ছেড়ে রেখে পুরুলিয়ার দিকে রওনা হলুম। কিছুদূর আস্‌তেই, মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক 'বাদ্‌লা' হাঁস উড়ে যাচ্ছে দেখে, Corporal অজিত লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লে না, বাঁশী দিয়ে আমাদের থাম্‌তে বাধ্য করালে। অজিতের একটা গুলিতে তিন তিনটে হাঁসের ভবলীলা সাঙ্গ হোল। একটী গিয়ে গাছে আট্‌কাল। অজিত তাড়াতাড়ি বন্দুকটা আমাদের কাছে দিয়ে গাছের ওপর থেকে সেটা নামিয়ে নিয়ে এল। সাইকেলে পাখীগুলো বেঁধে নিয়ে যাত্রা সুরু। আবার কিছুদূর আস্‌তেই কিছু জংলী

য়রাকে একটী জলা জায়গায় বস্‌তে দেখে, শিকারের শায় তাদেরও মারা হোল। এই ভাবে যেতে যেতে কটী খাবারের দোকান দেখে ক্ষিদেয় অস্থির হয়ে মে পড়্‌লুম। দোকানে তৈরী জিনিষ কিছুই নেই। ন আমাদের কথামত পুরি বানাতে আরম্ভ কর্‌লে ও আমরা তার দোকানের সাম্‌নেই পাখীগুলোর ন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাঙ্গ কর্‌লুম।

দোকান থেকে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বেরুতে ন্টা দুই লাগ্‌ল। কিছুদুর যেতেই আবার প্রবল বেগে 'বারিপতন' ও আমরাও কোনরূপে একটা রেলওয়ে ষ্টেসন দেখ্‌তে পেয়ে, সেখানে গিয়ে উঠ্‌লুম।

জংলীরা খুসী হয়ে আমাদের আশ্রয় দিলে

পুরুলিয়ার পথে জংলীর নাচ, পুরুলিয়াকে বিদায়

ষ্টেসনের নাম "কুষ্টনার"। টিকিট ঘরের কাছে ভিজে "ঢোল" হয়ে একটী বেঞ্চির ওপর বসে রবিবাবুর "আজি শ্রাবণ ঘন

গহন মোহে" গান ধরেছি। অজিত একটা টুলের ওপর বসে গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁশী ধরেছে, এমন সময়ে বিজলী- দেবী তাঁর উৎকট আলোয় চারিদিক ঝল্‌সে দিয়ে কড়্‌কড়ানি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অজিত মহাশয়কে টুলের ওপর থেকে সজোরে মাটীতে ফেলে দিলে। কি ভীষণ! এই অবস্থা দেখে আমাদের বড়ই ভয় হোল; কিন্তু সে তখুনিই টল্‌তে টল্‌তে উঠে বস্‌ল। তার পা থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছে—দাঁড়াবার শক্তি নেই। প্রায় আধঘণ্টা বাদে একটু গরম চা পেটে পড়্‌তেই সে বেশ একটু চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। ব্যাপারটা পরে বোঝা গেল যে, অজিত যেখানে বসে দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়েছিল, ঠিক সেইখান দিয়ে Lightning Arrester-এর তার মাটীর ভেতর ঢুকেছে ও তারে ভাল রকম Insulation না থাকায় বেচারার অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল।

বৃষ্টি কমে আস্‌তে কুষ্টনার ছেড়ে আবার যাত্রা সুরু করলুম। কিন্তু কি জ্বালা! আবার সেই একঘেয়ে বৃষ্টি প্রচণ্ড বেগে আমাদের আক্রমণ করলেন। উপায় না দেখে সামনেই এক "জংলীর"

কুটীরে ঢুকে পড়্লুম। আমাদের সদলবলে কুটীরে ঢুকতে দেখে সে বড় চম্‌কে উঠ্‌ল; কিন্তু তাদের কাছে আমাদের দুরবস্থার কথা বল্‌তেই, খুসী হয়ে তারা আমাদের আশ্রয় দিলে। তাদের অতিথিসেবা দেখে বাস্তবিক আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তাড়াতাড়ি আমাদের বিশ্রামের জন্যে দাবার ওপর চাটাই পেতে দিলে ও একধামা "মুড়ী" ভেলী গুড় সমেত নিয়ে এসে হাজির কর্‌লে। আমরাও বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের এই আতিথেয়তা গ্রহণ করে কিছু বখ্‌সিস্ দিলুম। প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পর বৃষ্টি থাম্‌ল ও আমরাও এদের নিয়ে একটা "ফটো" তুলে পুরুলিয়ায় (১৯৪ মাইল) এসে শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, এম-এল-সি মহোদয়ের বাড়ীতে অতিথি হলুম। তখন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা।

"গড়জয়পুর"—মন্দিরের বাহিরে উঠানে

বৃষ্টির জন্যে গত কাল পুরুলিয়া পৌঁছুতে না পারায় আজ ভেবেছিলুম—এখানে কিছু বিশ্রাম করে রাঁচির পথে যতখানি যাওয়া যায় যাব। কিন্তু নীলকণ্ঠবাবুর বাড়ীতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই আবার বৃষ্টি আরম্ভ হোল। আজ নবমী—ভেবেছিলুম আমাদের বুঝি মাঠে মাঠে কাট্‌বে; কিন্তু নীলকণ্ঠ বাবুর বাড়ীতে যে রকম আদর যত্নে রাজার হালে কেটে গেল তা' বলাই বাহুল্য মাত্র।

৬ই অক্টোবর—

আজ বিজয়া। সকালে উঠে দেখি—আকাশ মেঘে ভর্ত্তি। ঘুম থেকে উঠ্‌তে একটু দেরী হয়ে গেছল, সেইজন্যে তাড়াতাড়ি কিছু গোলযোগ—না না, গোলযোগ নয়, জলযোগ করা গেল। অবশ্য আমাদের মত ক্ষীণ-ক্ষুধার দলের এরকম ভদ্রলোকের অতিথি হওয়া মানে এক রকম গোলযোগই বটে। যাহোক, অনেকের কাছে এটা গোলযোগ, গোলযোগ কেন মহাগোলযোগ; কিন্তু আমাদের নীলকণ্ঠবাবুর কাছে এটা মহাযোগ। বেলা আট্‌টার সময় পুরুলিয়াকে বিদায় দিয়ে রাঁচীর পথে যাবার সময় নীলকণ্ঠবাবু বলেছিলেন, "কখন যদি কোন "সাইকেল ভ্রমণকারী এই পথে আসেন, তাহলে আমার এখানে পাঠিয়ে দেবেন।" বাস্তবিক এইরূপ কথা আমরা আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও বল্‌তে শুনি নি।

পুরুলিয়া থেকে রাঁচী ৭৬ মাইল। দুর্গাপুর জঙ্গল থেকে উঁচু নীচু রাস্তা পেয়ে আস্‌ছি; কিন্তু এই রাঁচীর পথে উঁচুর দিক্‌টাই বেশী। এখানে পুরুলিয়া ছেড়ে কয়েক মাইল আস্‌তেই চারিদিক থেকে পাহাড়ের সার যেন আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে পরামর্শ করে পিষে ফেলবার জন্যে ধীরে ধীরে এগুতে সুরু কর্‌লে ও আকাশের মেঘগুলি মাঝে মাঝে এক সঙ্গে জমাট বেঁধে দিনের আলোটাকে ঘন অন্ধকারে পরিণত করে ঝমাঝম্ শব্দে বৃষ্টি দিয়ে আমাদের একচোট খুব ভিজিয়ে আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে, যেন তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এই অবস্থায় প্রায় ১৬ মাইল অতিক্রম করে যখন আমরা "গড়জয়পুরে"র গড় দেখবার জন্যে শ্রীযুক্ত তিলকরাম তান্তি ওভারসিয়ার মহাশয়ের অতিথি হলুম তখন বেলা দশটা। তিলকরাম বাবুর বাড়ীতে জুতোমোজা খুলে ও সাইকেল রেখে গড়জয়পুরের রাজার গড় দেখ্‌বার জন্য বেরিয়ে পড়লুম। এই গড়ের ভেতর জুতো পোরে প্রবেশ নিষেধ। তিনশ' বছর আগে রাণী বিদ্যাধরী এই গড় নির্ম্মাণ করেন। গড়টি প্রকাণ্ড, পাথরের তৈরী ও নানারূপ বিচিত্র চিত্রে ভর্ত্তি। এখন এই গড়ের অবস্থা দেখ্‌লে সত্যই বড় দুঃখ হয়। কোন কোন অংশ মেরামতের অভাবে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। রাণী বিদ্যাধরীর আমলে এ রাজ্য স্বাধীন ছিল। রাজা ভিক্ষাম্বর সিংহ এখানকার শেষ রাজা ছিলেন। তিনি আশী

ছর বয়সে মারা যান। এই রাজার দুই রাণীর ভেতর খন ছোটরাণী চন্দ্রাবলী জীবিত আছেন ও তাঁর একমাত্র য়ের সহিত সিংভূম জেলার সারাইকিলার রাজ-শের মহেশ্বর সিংহের পুত্র শ্রীযুক্ত বিদ্যাসুন্দর সিংহ দবের বিবাহ হয়। এখন এখানকার জমিদারী মাতা বিদ্যাসুন্দর সিংহ দেব দেখাশোনা করেন। ড়ে এসে বিদ্যাসুন্দর মহাশয়ের সহিত দেখা করে গড় দখবার ইচ্ছা করি। তিনি আমাদের অদ্ভুত ভ্রমণ কাহিনী শুনে নিজে সঙ্গে করে গড়ের প্রত্যেক অংশ ভাল করে দেখিয়ে দেন ও তাঁর সঙ্গে গড়ের ভেতর টী ফটো তোলা হয়; একটী মুরলীধর ঠাকুরের ন্দিরে ও একটী মন্দিরের বাহিরে—উঠানে। গড় দেখা শেষ হলে, রাণীবাঁধ নামে একটী বড় দীঘিতে একচোট প্রাণভরে সাঁতার কেটে ওভারসিয়ার তিলকরাম বাবুর বাড়ীতে হাজির হয়ে দেখি তিনিও আমাদের জন্যে নানারূপ আয়োজন করেছেন। তখন বেলা সাড়ে চারটে। এমন সময়—দেখি, দমাদম্ দমাদম্ দদম্ দদম্ করে—এ বছরের মত সকলকে কাঁদিয়ে মা দুর্গা ছেলে পুলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছেন। আমরা তাড়াতাড়ি মাকে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে একটী ফটো নিয়ে নিলুম। এখানেই আমরা বিজয়ার কোলাকুলি সাঙ্গ করে বেলা পাঁচটার সময় রাঁচীর পথে রওনা হলুম।

যখন দিনের আলো ক্রমশই পাহাড়গুলোর ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল, তখন আমরা "ঝালদা" (২২২ মাইল) এসে পৌঁছলুম। আজ আমাদের "তুলিন" পর্য্যন্ত যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখানকার একজন পশ্চিমদেশীয় হিন্দু লাক্ষা-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শিব-শঙ্কর লালা মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁর বাড়ীতে রাতটা খুব আমোদে কাটিয়ে পরদিন বেলা দশটার সময় আবার যাত্রা সুরু করলুম।

"গড়জয়পুর"—মুরলীধর ঠাকুরের মন্দির
"গড়জয়পুর"—মা দুর্গা ছেলেপুলে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছেন

খেলার পুতুল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৩)

ফুলি ঝী মন্দার ঘরের বন্ধ দরজায় ধীরে ধীরে ঘা' দিয়ে ডাকলে—বড়'মা !

দুম্ করে দরজার খিল খুলে মন্দা বাইরে এসে ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে—ধাক্কা মেরে দরজা ভেঙে ফেলবার উপক্রম করিছিস্ যে! কী—হ'য়েছে কী ? এমন কী জরুরী কাজ শুনি যে দু'দণ্ড সবুর সইছে না ?

মন্দা যখন ক'নে বউটি হ'য়ে এ বাড়ীতে আসে, ফুলি ঝী তখন থেকেই মন্দার কাছে কাজ ক'রছে। ফুলির মা'ও এখানকার পুরানো দাসী ছিল। মন্দার রকম-সকম ফুলির প্রায় অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। তাই, সে তার বড়'মার এই রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখে একটুও ভয় পেলে না ; বরং একটু চড়া গলাতেই ব'ললে—সবুর করেই ত' ছিলুম এতক্ষণ ; কিন্তু সূর্য্যি যে এদিকে পাটে ব'সতে চ'ললেন! বলি, নাওয়া খাওয়া কি বাড়ীশুদ্ধ লোকের আজকে বন্ধ থাকবে বলতে চাও ?

মন্দা বললে—কে তোদের নাইতে খেতে মানা ক'রেছে ? যা'না—সব খাওয়া-দাওয়া সেরে নি'গে না! আমার আজ শরীরটা ভাল নেই ; আমি কিছু খাবো না।

ফুলি একটু অর্থ-পূর্ণ হেসে বললে—যাক্! তোমার সম্বন্ধে না হয় নিশ্চিন্ত হলুম বড়'মা, কিন্তু বাবুরও কি তোমার অসুখের ছোঁয়াচ লেগেছে ? তিনিও যে এতখানি বেলা পর্য্যন্ত—না করলেন স্নান—না এলেন খেতে !

মন্দা চম্‌কে উঠে বললে—ক'টা বেজেছে বল্ তো ?

—দালানের বড় ঘড়ীটায় দেখলুম, দু'টো কাঠিই দু'দাগে এসে দাঁড়িয়েছে !

মন্দা বুঝতে পারলে, বেলা তখন দু'টো বেজে দশ মিনিট হয়েছে। গলার স্বর একেবারে নীচু করে সে জিজ্ঞাসা ক'রলে—উনি কি করছেন রে ফুলি ?

—কি আর ক'রবেন ? বাইরের বৈঠকখানায় চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুণছেন !

মন্দা একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। কাতর ভাবে বললে—হ্যাঁ রে, তোরা এতোগুলো লোকজন এ বাড়ীতে আছিস, কেউ তাঁকে ডেকে এনে সকাল সকাল দু'টি নাইয়ে খাইয়ে দিতে পারিস নি ?

ফুলি বললে—তিনি যার ডাকের অপেক্ষায় আছেন—সে লোক দরজা খুলে ঘর থেকে না বেরুলে—আমাদের ডাকতে যাওয়া শুধু বকুনি খেয়ে আসা বই ত নয়! তাই অনর্থক বাবুকে আর বিরক্ত না ক'রে তোমার দরজাতেই এসে হত্যে দিয়ে পড়লুম !

—তোর বড্ড মুখ হয়েছে দেখ্‌ছি !—এই বলে' মন্দা আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে বৈঠকখানা বাড়ীর দিকে এগিয়ে চ'ললো। ফুলিও পিছু নিলে। খানিকটা গিয়ে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে মন্দা ফুলিকে বললে—তুই শীগ্‌গির যা, আগে দেখে আয় সে ঘরে বাইরের কোনও লোকজন আছে কি না ?

ফুলি বললে—একটি প্রাণীও কেউ নেই মা, আমি এইমাত্র উঁকি মেরে দেখে এসেছি। এতখানি বেলা পর্য্যন্ত কার দায় পড়েছে বলো যে, না-খেয়ে-দেয়ে আমাদের বাবুর কাছে এসে বসে থাক্‌বে ?

—স্নানের ঘরে ওঁর গরম জলটা দেওয়া হয়েছে কি জানিস্ ?

—ওমা, সে তিনবার দেওয়া হ'ল, তিনবার জুড়িয়ে গেল ! বামুনঠাকুর আবার জল চাপিয়েছে !

—ওঁর স্নানের কাপড়, তেল, গামছা, সাবান, এসব গোকুল গুছিয়ে নিয়ে গেছে ত ?

—সে সব ঠিক সময়েই সে নিয়ে গেছে ; কাপড় ছাড়বার

ঘরে সকালেই তো তুমি সে সব গুছিয়ে রেখেছিলে মা। গোকুল এসে চাইতেই আমি তাকে বার ক'রে দিয়েছি।

—তা' পোড়ারমুখো বাবুকে স্নান করায় নি কেন এখনও?

—নাও কথা! বাবু না স্নান ক'রলে সে বেচারী কি করবে? চাকর বই ত নয়!

—আমাকে ডাকলে না কেন?

—কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে মা! তুমি যে-রকম রেগে গিয়ে দরজায় খিল দিয়েছিলে—আমারই এতক্ষণ ডাক্‌তে ভরসা হচ্ছিল না!

—আচ্ছা, যা—ঠাকুরকে ওঁর তরকারি-টরকারিগুলো গরম ক'রতে বল্‌গে' যা। আর খাবার ঘরে ঠাঁই করে দি'গে।

ফুলি চলে গেল। মন্দা দ্রুতপদে বার-বাড়ীর দিকে চল্‌ল। কিন্তু বৈঠকখানা ঘরের পাশের বারান্দায় পৌঁছে তার পা' দুটো আর এগোতে চাইলে না। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করবার পর, আস্তে-আস্তে—একপা-একপা ক'রে মন্দা শেষে বৈঠকখানার দরজার সামনে এসে—মুহূর্ত্তকাল দ্বিধার পর—হঠাৎ ভিতরে ঢুকে পড়ল!

সত্যেনও পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে শুয়ে ছিল। মন্দার প্রবেশ সে জানতে পারে নি। মন্দা কাছে গিয়ে হাত ধরতেই সে চম্‌কে উঠ্‌ল! মন্দাকে দেখে তার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল! মন্দার মতো অভিমানিনী নারী যে এমন যেচে সন্ধি ক'রতে আসবে—এটা সত্যেন কল্পনাও ক'রে নি। সে ভাবছিল যে মানভঞ্জনের পালাটা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মতো এবারও বোধ হয় তাকেই গিয়ে অভিনয় ক'রতে হবে। কিন্তু এই অভিনয় তার আর ভাল লাগছিল না! স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য স্মরণ করে সে তার বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ কয়েক বৎসর নিজের উপর অনেক উপদ্রবই করে এসেছে। এইবার কিন্তু দেহে মনে একটা ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ হচ্ছিল।

মন্দা সত্যেনের হাতটি ধ'রে ঈষৎ আকর্ষণ করে বললে—উঠে এসো, আর বেলা কোর না, অসুখ করবে।

সত্যেন সুবোধ বালকের মতো উঠে প'ড়ে বললে—সুখের অভাবই যদি অসুখ ব'লে মেনে নেওয়া যায়, তাহ'লে—নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নানাহার ক'রলেই কি সেটা এড়িয়ে চলা যাবে মন্দা?

—সে ঝগড়া পরে করা যাবে,—আগে নেয়ে খেয়ে নেবে চলো।

—চলো, কিন্তু—

—এখন ও 'কিন্তু' থাক্। যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি, ঘাট হয়েছে—মাপ চাচ্ছি। আমি তোমাকে সুখী ক'রতে পারি নি, জানি; তা'বলে বার-বার সে কথা তুলে আর আমাকে লজ্জা দিয়ো না। এসো—বাড়ীর ভিতরে এসো।

সত্যেন মন্দার সঙ্গে যেতে যেতে ব'ললে—ও অপরাধটা যে শুধু তোমার একারই নয়—এ কথাটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমিও তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি!

মন্দা একটু ম্লান হেসে বললে—তোমার বড্ড গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করা স্বভাব! আমি কি তাই বললুম? কথার মানে অমন ক'রে উল্টে নিলে আর উপায় কি বলো? কিন্তু, আমি তোমাকে আর যে দোষই দিই না কেন, ও-কথা কোনও দিনই ব'লতে পারবো না! আমাকে সুখী করবার জন্য তোমার অহরহ প্রাণপণ চেষ্টা তো আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি নি! কিন্তু কাঙালের দোষ কি জানো—সে যত পায় তত চায়! আমার হয়েছে তাই! আমাকে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করে তুমি আমার সৌভাগ্য সর্ব্বরকমে উথ্‌লে দিয়েছো; তবু আমি তোমার লুকোনো মনটিকেও দখল করবার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারছি নি!

সত্যেন একটু ইতস্ততঃ করে বললে—এ কিন্তু তোমার অকারণ ক্ষোভ! তোমার কাছে তো আমার কিছুই গোপন নেই মন্দা!

মন্দা সম্মতি-সূচক ঘাড় নেড়ে বললে—সে কথা খুবই ঠিক!—এ যে কত বড় নিদারুণ সত্য, সে বোধ হয় তুমিও জানো না! আর, জানো না যে—সেই জন্যেই—তোমার ওই লুকোনো মনের খবরটুকুও আমার কাছে আজ অপ্রকাশ নেই!

নিতান্ত অসহায়ের মতো কাতরভাবে সত্যেন বললে—একটা অমূলক সন্দেহকে নিরন্তর অন্তরে স্থান দিয়ে মিথ্যে নিজের কষ্টের সৃষ্টি কোর না মন্দা।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মন্দা বললে—মানুষ যে অনেক সময়ে নিজের মন নিজেই বুঝতে পারে না—এ কথাটা দেখছি তাহ'লে নেহাৎ বাজে নয়!

গামছা, কাপড় আর তেলের বাটী হাতে ভৃত্য গোকুলচন্দ্র এগিয়ে আসছে দেখে মন্দা বললে—চট্ করে একটু মাথায় জল দিয়ে চলে এসো, এই অবেলায় আর বেশী নেয়ো না। আমি তোমার ভাত বাড়্‌তে বলিগে'।

মন্দা রান্নাবাড়ীর দিকে চলে গেল। সত্যেন স্নান করে এসে যখন চিরুণী নিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল, মন্দা এসে তোয়ালে ব্রূশ এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁগা, ঠাকুরঝীকে নিয়ে সরকার মশাই আর বিদ্যাপৎ ফিরবে কখন বল্‌তে পারো?

—সকাল সকাল যদি তারা বেরুতে পারে, তাহ'লে সন্ধ্যের আগেই এসে পৌঁছবে।

—আমিও তাই আন্দাজ করে ঠাকুরঝীর জন্যে কিছু ফলমূল, যৎসামান্য মিষ্টি, আর একটু দুধ বন্দোবস্ত করে রেখেছি। নিরামিষ হেঁসেলটাও ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে রাখিয়েছি। আর বামুন-মাকে খবর পাঠিয়েছি, কাল থেকে এসে যেন ঠাকুরঝীর আতপচালের রান্নাটা সকালে রোজ রেঁধে দিয়ে যান্।

—বাঃ! এর মধ্যে এত কাণ্ড ক'রে ফেলেছো? একেই বলে সু-গৃহিণী!

—যাও, যাও, তোমাকে আর ঠাট্টা ক'রতে হবে না! তবে হ্যাঁ, এ কথা ঠিক্ যে—তুমি যা ব'ললে তা' আমি সত্যিই হ'য়ে উঠতে পারবো, যদি—মাসখানেক সুহাসদি'কে এখানে আটকে রেখে—তাঁর সাগরেত বনে যেতে পারি!

সত্যেন হেসে উঠে বললে—বাঃ! তুমি সুহাসকে এ পর্য্যন্ত চক্ষেও কখনও দেখ নি, অথচ—সে যে গৃহিণীপণায় একেবারে ওস্তাদ—এ খবরটুকু কেমন ক'রে সংগ্রহ করলে?

মন্দা তার ডাগর দুই চোখে একটু দুষ্টুমির দৃষ্টি হেনে বললে—কেন,—তার দাদাটি যে একেবারে বোনের গুণের ট্যাঁট্রা পিটিয়ে বেড়ান। আমি তাঁরই শ্রীমুখ থেকেই তো সে কথা অনেকবার শুনেছি!

—আমি ত' আমার বোনের সম্বন্ধে স্নেহাতিশয্য বশতঃ অনেক কথাই বাড়িয়ে ব'লতে পারি!

—তা হোক্, তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি নি!

—তবে কেন সকালে অত ঝগড়া ক'রলে?

—আমার যে কুঁদুলে স্বভাব! বাড়ীতে একটা জা' নেই, একটা ননদও নেই; সুতরাং তুমি ছাড়া আর কার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রবো বল তো?

—এইবার তো ননদ আসছে, মনের সাধ মিটিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া কোরো। কিন্তু দোহাই তোমার! আমাকে যেন দলে টেনো না!

—তুমি যে বললে তোমার বোনটি নেহাৎ ভালমানুষ! কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে না! তাই তো ঠাকুরঝীর উপর আমার রাগ!

—বেশ তো, তুমি না-হয় তাকে গৃহিণীপণা শিক্ষার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তোমার কোন্দল-কলা বা কলহ-বিদ্যা কিছু শিক্ষা দিও! আমিও না হয় তোমার সেই ক্লাশে ভর্ত্তি হবো!

—উহুঁ, তোমাদের মতো বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে মেয়েকে আমি একসঙ্গে এক ক্লাশে প'ড়তে দেবো না। তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে!

—কেন?

—সে পরে বুঝিয়ে দেবো, এখন তুমি আর দেরী কোরো না, চট্ করে এসো—আমি তোমার ভাত বাড়্‌তে বলিগে—

মন্দা ব্যস্ত হ'য়ে চলে গেল।

সত্যেন যখন খেতে এসে বসলো—তখন তিনটে বাজে! মন্দা সামনে বসে খাওয়ার তদ্বির করতে করতে বললে—আচ্ছা, ঠাকুরঝীকে কেমন দেখতে বলো না! লক্ষ্মীটি!

—এই তো আজই সে এসে পড়বে। হাতে-পাঁজি—মঙ্গলবার—একেবারে চাক্ষুষ দেখ্‌তে পাবে!

—সে তো আমার চোখে আমি দেখ্‌বো; কিন্তু তোমার চোখে তাকে কেমন দেখ্‌তে আমি শুন্‌তে চাই!

—সে শুনে তো কোনও লাভ নেই মন্দা, কারণ সুহাস সম্বন্ধে আমার মতামত তোমার কাছে নিতান্ত পক্ষপাত দুষ্ট ব'লেই মনে হবে!

—তা হোক, তবু তুমি বলো!

—সত্যি কথা বলতে হ'লে—সুহাসকে সুন্দরী ব'লতেই হবে।

—সে তো অনেকবার শুনেছি গো! কিন্তু কী রকম সুন্দরী সে?—আচ্ছা, আমার চেয়েও কি সে দেখতে ভাল? আমার চেয়েও রূপসী?

—রূপসী আর সুন্দরী এই দু'য়ের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে মন্দা!···সুহাস রূপসী কি না জানি না, কিন্তু তার চেয়ে সুন্দরী আমি আর দেখি নি!

মন্দার মুখখানি 'আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার মতো অন্ধকার হ'য়ে গেল।

—দাঁড়াও, তোমার দুধে আমসত্ব দিতে ভুলে গেছি—নিয়ে আসি—বলে মন্দা সেখান থেকে উঠে গেল।

ইতিমধ্যে ভৃত্য গোকুল এসে সত্যেনের কাছে দু'খানা চিঠি রেখে দিয়ে বললে—বিদাপৎ আর সরকার মশাই এইমাত্র ফিরে এসেছে, কিন্তু দিদিমণি আসেন নি। তিনি এই চিঠি দিয়েছেন।

সত্যেন চম্‌কে উঠ্‌ল। ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন এলো না রে গোকুল? অসুখ বিসুখ করে নি ত? —বিদাপৎ কি বললে? সরকার মশাই তাকে কেমন দেখে এলেন? কিছু বললেন?—

—আজ্ঞে, সরকার মশাই ব'লছিলেন দিদিমণি তাঁদের খুব আদর যত্ন ক'রে খাইয়েছেন; কিন্তু তাঁর সে চেহারা না কি আর নেই, বড় রোগা হ'য়ে গেছেন!—

ইতিমধ্যে সত্যেন বাম হাতেই কোনও রকমে সুহাসের দেবরের লেখা পত্রখানি খুলে ফেলে পড়ে দেখলে—বিশেষ অসুস্থ বলে তারা আজ সুহাসকে পাঠাতে পারলে না।

সত্যেনের আর খাওয়া হ'ল না। সে উঠে পড়ে আচমন ক'রে বাইরে যেতে যেতে গোকুলকে বললে—ওরে, সুহাসের যে বড় অসুখ! তোর দু'চাকার গাড়ীখানা নিয়ে একবার সময় মতো গিয়ে তাকে দেখে আসতে পারিস? নইলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো না। সরকার মশাই, আর বিদাপৎকে শীগ্‌গির বৈঠকখানা ঘরে আমার কাছে আসতে বল্।

গোকুল বললে—অনেক দিন দিদিকে দেখি নি।—হুকুম করেন তো আজই একবার ছুটে গিয়ে তাঁকে একটা গড় ক'রে আসি। এই ত' মোটে পাঁচ সাত ক্রোশ তফাতে আছেন!

—তুই তবে সরকার মশাই আর বিদাপতের সঙ্গে গেলি নে কেন? তুই গেলে বোধ হয় তাকে আনতে পারতিস্।

—আমার যাবার খুব ঝোঁক হ'য়েছিল; কিন্তু, আমি গেলে যে এদিকে আপনার নানা অসুবিধে হবে, এই ভেবে আর যাই নি! এই তো অসুখ শুনে আজ আর আপনার খাওয়াই হ'ল না বাবু!

—আচ্ছা, তুই ওদের পাঠিয়ে দিগেযা'। তোকে যেতে হবে কি না আমি প'রে বলবো।

মন্দা ফিরে এসে যখন দেখলে যে অর্দ্ধ-সমাপ্ত আহার ফেলে রেখে স্বামী তার উঠে চলে গেছে, সে তখন সত্যেনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল! ফুলিকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—হ্যাঁ রে, ইনি আজ কিছু খেলেন না কেন ব'ল্ তো? সবই যে পাতে পড়ে রয়েছে দেখছি!

ফুলি বললে—কে জানে বাপু! তোমার উপর রাগ ক'রে বোধ হয়! তুমি কেবলই ওঁর সঙ্গে খুনসুটি করবে—ওঁরা বেটাছেলে, পুরুষ মানুষ, সবদিন কি আর মেজাজের ঠিক থাকে? আমাদের বাবু নেহাৎ ভালমানুষ; তাই তোমার নিত্যি মুখঝাম্‌টা সহ্য করেন!

—আচ্ছা, অসুখ বিসুখ কিছু করে নি তো?

—শত্তুরের অসুখ করুক! আজ পর্য্যন্ত আমাদের বাবুর তো একটি দিনের তরেও শরীর খারাপ শুনি নি।

—তবে বোধ হয় অবেলায় পিত্তি পড়ে গেছে ব'লে আর মুখে কিছু ভাল লাগে নি; তাই হয়ত' খান নি, দুটি ভাত দাঁতে কেটেই উঠে পড়েছেন।

—তা হ'তে পারে। আহা তা হবে না? বেলা কি আর আছে? আরও খানিকটা দোরে খিল দিয়ে পড়ে থাকলে এবেলা আর ভাতে-হাতেও করতেন না বোধ হয়।

—তোর জন্যেই ত' এইটে হ'ল! তুই একটু দিন থাকৃতে আমায় ডাকলি নি কেন পোড়ারমুখী!

—ঘাট হ'য়েছে মা, আমারই সব দোষ না হয় স্বীকার ক'রে নিচ্ছি! এখন তুমি কিছু মুখে দেবে কি না বলো?

—বলিছি না, আমি আজ কিছু খাবো না।

—আহা, সে ঝগড়া তো মিটে গেছে গো! এখন দু'মুঠো খাও তো খেয়ে নাও, সন্ধ্যে হ'তে আর দেরী নেই।

একটা বড় কলকেয় তাওয়া দিয়ে তামাক সেজে ফুঁ দিতে দিতে গোকুল এল বাবুর পানের ডিবেটা নিয়ে যেতে।

মন্দা জিজ্ঞাসা ক'রলে—গোকুল! বাবু কি করছে রে?

—সরকার মশাই আর বিদাপৎকে ডেকে দিদিমণির সব খবরাখবর জিজ্ঞাসা ক'রছেন।

—তারা এর মধ্যে ফিরে এসেছে না কি?

—হ্যাঁ, দিদিমণি আসেন নি কি না, তাই তারা সেখানে খাওয়াদাওয়া সেরেই এ-বেলাই ফিরেছে।

—তারা কি ব'লছে—কেন, তোদের দিদিমণি এলেন না কেন?

—কি জানি মা, দিদিমণি বাবুকে একখানা মস্ত চিঠি দিয়েছেন, তাইতেই সব লেখা আছে। শুনছিলুম, তাঁর শরীরটা ভাল নেই তাই আসতে পারেন নি।

—সে চিঠি বুঝি খাবার সময়ই তাকে এনে দিয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—ওঃ! তাই বটে।

পানের ডিবে নিয়ে কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে গোকুল চলে গেল।

ফুলি ব'ললে—আমি তাহলে তোমার ভাত দিতে বলিগে—বাবুর পাতেই খাবে তো? না আজ আবার আলাদা ঠাঁই ক'রে দিতে হবে?

মন্দা মনে মনে ব'ললে—একজন আর একজনের পাতে উড়ে এসে জুড়ে বসলে দু'জনের কারুরই পেট ভরেনা! কিন্তু তা হোক্‌, পাতটার দখল তবু কিছুতেই ছাড়া হবে না! প্রকাশ্যে বললে—না, আর আলাদা ঠাঁই করতে হবে না। এই পাতেই দু'মুঠো দিয়ে যেতে বল্‌।

ফুলি চলে গেল। মন্দা সুহাসের চিঠির কথা ভাবতে লাগল! কী এমন চিঠি লিখেছে সে যে, ইনি পড়ে আর খেতে পারলেন না কিছু? আধপেটা খেয়ে উঠে পড়লেন! সে চিঠি তো আমায় দেখতেই হবে!

কোনও রকমে চারটি ভাত নাকে-মুখে গুঁজে মন্দা উঠে পড়ে খবর নিলে, বাবু বৈঠকখানায় কি ক'রছেন। শুনলে বাবু বৈঠকখানায় নেই, লাইব্রেরী ঘরে বসে চিঠি লিখ্‌ছেন।

মন্দা সিধে লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে হাজির হ'ল।

সত্যেন মন্দাকে দেখে একটু বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—এ কি, তুমি যে এখানে এলে এমন সময়?

—কেন, আসতে নেই কি?

—আসতে নেই, এমন কথা ব'লতে পারি নি, তবে আস না কখনও, তাই দেখে একটু আশ্চর্য্য হচ্ছি। বিশেষতঃ বার-বাড়ীর এ অংশটা এখনও অন্তঃপুরচারিণীদের পক্ষে অগম্য স্থান বলেই বিবেচিত হ'য়ে থাকে কি না?

—অন্তঃপুরে যখন আগুন লাগে তখন আর বিবেচনা করবার অবসর থাকে না যে! অসঙ্কোচে বারবাড়ীতে এসে দাঁড়াতে হয়!

অন্তঃপুরে আগুন লেগেছে শুনে সত্যেন শশব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—

—সে কি! আগুন লেগেছে! কোথায়? কেমন ক'রে লাগ্‌ল?

ঈষৎ মৃদু হাস্য ক'রে মন্দা বললে—সেই সন্ধানেই ত' এসেছি! অত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই, বোসো। অন্তঃপুরের ভালমন্দর দায়িত্ব যখন আমার—তখন সে সম্বন্ধে তোমার দুশ্চিন্তার আবশ্যক কি? এখন আমাকে একটা কথা ব'লবে কি?

সত্যেন ধীরে ধীরে আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়ে বললে—কি ব'লতে হবে বলো।

—ঠাকুরঝী আমাদের এত বড় অপমান ক'রলেন কেন?

—ছিঃ মন্দা, ও কথা স্বপ্নেও কখন মনের কোণে স্থান দিও না। সে অসুস্থ বলে আসতে পারে নি, এই দেখো তার দেবরের চিঠি—

মন্দা সে চিঠিখানা পলকের মধ্যে প'ড়ে ফেলে—"এতো বাঁধা গৎ দেখছি!"—বলে' টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে প্রশ্ন ক'রলে—তবে যে শুনলুম, ঠাকুরঝী নিজে তোমাকে চিঠিতে তাঁর না যাবার সব বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন!

সত্যেন মনে মনে এই আশঙ্কাই ক'রছিল! মন্দা যদি সুহাসের চিঠি দেখতে চায় তা'হলেই বিপদ! একেই সে তাদের ভাই বোনের সম্বন্ধের উপর সন্দিহান! তার উপর পত্রের ভাব ও অর্থ যদি সে ঠিক হৃদয়ঙ্গম ক'রতে না পারে—তা'হলে তার মনের অশান্তি আরও দ্বিগুণ বেড়ে যাবে! সুহাসের কোনও পত্রই তাই সত্যেন মন্দাকে এ পর্য্যন্ত দেখায় নি। আজকের এ চিঠিখানাও সে তাকে দেখাবে না স্থির করেছিল! এ চিঠি দেখে ঈর্ষান্বিতা হ'য়ে মন্দা নিশ্চয়ই সুহাস সম্বন্ধে অমর্য্যাদাসূচক কতকগুলো রূঢ় কথা বলতে পারে। মুখরা মন্দার পক্ষে সেটা হয়ত কিছুই না; কিন্তু সত্যেনের পক্ষে নিজেরই স্ত্রীর মুখে সুহাসের সে অপমান নীরবে সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে পড়বে!

সত্যেন বললে—কই না। কে ব'ললে তোমাকে সুহাস চিঠি লিখেছে? তার যে অসুখ! লিখবে কি করে?—

—গোকুল বলছিল—সে না কি সরকার মশায়ের কাছ থেকে শুনেছে যে, দিদিমণি নিজে বাবুকে পত্র দিয়েছেন!

—ভুল বলেছে! সেটা দিদিমণির পত্র নয়, তার দেবরের ঐ পত্র!

—তা হ'তে পারে! কিন্তু তোমার এতটা বাড়াবাড়ি

করা ভাল হয় নি। খাওয়াটা শেষ ক'রে উঠলেই আমি খুশী হতুম! অসুখ বিসুখ কি বোনেদের হ'তে নেই? তাই বলে' ভা'য়েরা যে অনাহারে থাকে এমন ত' কখন শুনি নি? তা'ছাড়া তুমি এখানে উপোস করলেই সেখানে ঠাকুরঝীর অসুখ যে সেরে যাবে—কোনও ডাক্তার কবিরাজই বোধ হয় এটা বলেন না!

মন্দা এ কথাগুলো পরিহাসের ছলে বললেও এর অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ সূচী সত্যেনকে বেশ একটু পীড়া দিচ্ছিল। সে কিন্তু এ খোঁচাটুকু এখনও সহজভাবে নেবার চেষ্টা করে হাসতে হাসতে বললে—তুমি বুঝি তাই মনে করেছো? কি মুস্কিল! অবেলায় ক্ষিধে ছিল না ব'লে আমি উঠে পড়লুম! খেতে কিছু ইচ্ছেই ছিল না, শুধু তুমি পাছে রাগ করো বলে নামমাত্র একবার পাতে বসেছিলুম!

মন্দা বললে—ও! তবু ভাল, যে আমার অনুরাগ এতদিন যেখানে অমর্য্যাদা পেয়ে এসেছে, আমার রাগের সেখানে একটু খাতির আছে! কিন্তু এই অসম্ভব কথাটা কি তুমি সত্যিই আমাকে বিশ্বাস ক'রতে বলো না কি?

সত্যেন এ কথার কি উত্তর দেবে কিছু ভেবে পেলে না! তার মনে হ'ল—সত্যই ত, মন্দার অনুরাগ তার অন্তরে এ পর্যন্ত কোনও রংই ত' ধরাতে পারে নি! একটু ইতস্ততঃ করে সে বললে—তোমার অনুরাগ বা বিরাগের চেয়ে রাগটার সঙ্গেই যে আমি বেশী পরিচিত মন্দা!

—তাই বুঝি আমার সেই একমাত্র পরিচয়টুকুকে তুমি সর্বদা সাবধানে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করো? পাছে সেই সূত্রও আমার সঙ্গে তোমার একটা ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে পড়ে—না?

সত্যেন এবার অতিরিক্ত গম্ভীরভাবে ব'ললে—তাই কি? না আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতাটুকু দীর্ঘকাল একত্রবাসের সুযোগে গড়ে উঠেছে সেটুকু ভেঙে না যায় এই ভয়ে? ভাল ক'রে কথাটা ভেবে দেখেছো কি?

সত্যেনের এ কথাগুলো শুনে মন্দার যেন চমক্ হ'লো! ভাবলে—তাই ত! বিবাহের সামাজিক বন্ধনটুকু ছাড়া তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আর তো এমন কোনও কিছুরই বন্ধন নেই, যার দাবীতে সে এই লোকটির উপর এতখানি জোর-জুলুম চালাতে পারে! সে তার স্বামীকে কায়মনে ভালবেসেছে বটে, কিন্তু সে ভালবাসা তো তিনি গ্রহণ করেন নি! সুতরাং সে উপেক্ষিত প্রেমের মূল্য কি? তার শক্তিই বা কোথা? স্বামীর কোনও সন্তান গর্ভে ধারণ করবার সৌভাগ্য হয় নি তার আজও! তবে—কী নিয়ে—কিসের গর্ব্বে সে এই শান্ত, সংযত, দৃঢ়চিত্ত লোকটিকে ভয় দেখিয়ে তার অনুগত ক'রে রাখতে পারে? মন্দা তার অসহায় অবস্থাটা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরে অন্তরের মধ্যে শিউরে উঠ্‌লো! নতনম্রকণ্ঠে সে শুধু বললে—আমার অপরাধ হ'য়েছে। ক্ষমা করো।

মন্দার মুখের অবস্থা ও তার কথা বলার ভাব-ভঙ্গী দেখে সত্যেন হেসে ফেললে! বললে—এ আবার কি সুরু করলে মন্দা? এত রকমও তুমি জানো! মাঝে মাঝে তোমার এই ভাব-পরিবর্ত্তনের বিচিত্র লীলা দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে যাই! ভাবি—তখন কি ভাবি জানো?—

—কি করে জানবো? তোমার ভাবনার অংশ তো আজও পর্য্যন্ত কখনও চেয়েও পাই নি!

—চেয়ে কি সব জিনিস পাওয়া যায় মন্দা? অ[illegible] বা যায়,—তার কি কোনও মর্য্যাদা থা[illegible] যোগ্যতার দ্বারা মানুষ যা অর্জ্জন ক'রতে পারে[illegible] যথার্থ সম্পদ! চাওয়া জিনিস আর ধার-করা [illegible] হেয়—সমানই তুচ্ছ!

—তুমি ঠিক কথাই বলেছো! আমি অত্যন্ত[illegible] তাই আমার অযোগ্যতা তুমি বার বার আমা[illegible] করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আমি সে কথা ভুলে যাই, মনে [illegible] পারি নি!

সত্যেন অপ্রতিভ হ'য়ে বললে—ছিঃ, কথার ছল ধরে আবার অভিমান সুরু করলে? 'যোগ্যতা' বলাটা না হয় আমার ভুলই হয়েছে—আমার বলা উচিত ছিল 'নিজের শক্তির দ্বারা'—

বাধা দিয়ে মন্দা বললে—কেন তুমি অকারণ কুণ্ঠিত হ'চ্ছ! আচ্ছা, আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা আমি বুঝতে পারি, এতটুকু বুদ্ধিও কি আমার নেই মনে করো?

—কিন্তু তুমি তো অযোগ্য নও মন্দা!

—থাক্ ও-কথা। কারণ ওটা প্রমাণ-সাপেক্ষ!—হ্যাঁ, তুমি যে একটু আগে—সেই—কি ভাবো—বলছিলে—কই সেটা তো শোনালে না?

—নাঃ! থাক্। সে কথা শুনে আর এখন তোমার কোনও লাভ নেই!

মন্দার মুখখানি একেবারে ছা'য়ের মতো পাংশু হ'য়ে গেল! সে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নতমুখে ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

সত্যেন তার মুখভাব লক্ষ্য করেছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে এগিয়ে গিয়ে সাদরে মন্দার কটিবেষ্টন ক'রে তাকে কাছে টেনে নিয়ে এসে বললে—আহা, শোনো শোনো—রাগ কবো কেন?—ব'লছি তোমায় সে কথাটা—

মন্দা ভারী গলায় বললে—কিন্তু শুনে ত' আমার কোনও লাভ নেই!

মৃদু হেসে সত্যেন বললে—আচ্ছা গো আচ্ছা! ক্ষতিও কিচ্ছু নেই! কিন্তু দুষ্টুমী রাখো—বলি শোনো—দেখো, তোমার কথা যখনই ভাবি—

—ভাবো না কি?

—অমন করলে কিন্তু বলা হবে না!

চ্ছা, বলো।

—ভাবি, আমার মনে হয়, জীবনের তরুণ উষায় মি তোমাকে পেতুম!—তাহলে—

লা কি হ'তো?

লে হয়ত আমরা সুখী হ'তে পারতুম।

—কিসে বুঝলে?

—তোমাকে মাঝে মাঝে আমার খুব ভাল লাগে!

—দেখো, তুমি আমার গা ছুঁয়ে আছো মনে থাকে যেন! মিছে কথা বললে আমার অকল্যাণ হবে কিন্তু—

—আমি সত্যি বল্‌ছি মন্দা!

—কিন্তু তোমার জীবনের তরুণ উষা অস্ত যাবার পরে তো আমি এখানে আসি নি! উষার অরুণ-রাগ যে এখনও তোমার মনের আকাশখানিকে রাঙিয়ে রেখেছে দেখতে পাচ্ছি!

—কিন্তু মন্দা—তার আগেই যে—ঝড় হ'য়ে গেছে রজনীগন্ধার বনে! তুমি যখন এলে তখন যে সেখানে আর আমি নেই!

—আর কি তোমাকে সেখানে ফিরিয়ে আনতে পারা যায় না?

—যদি কেউ কখন পারে মন্দা তবে সে কেবল তুমিই পারবে, শুধু এইটুকু বলতে পারি!

মন্দা গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে সত্যেনকে প্রণাম ক'রে বললে—আশীর্ব্বাদ ক'রো যেন আমি আমার স্বামীকে ফিরে পাই!

(ক্রমশঃ)

প্রাতে ও রাতে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস (প্রোবেশনার)

নিত্য প্রাতে নয়নপাতে লাগে নতুন আলো
নিত্য আমি নতুন বাসি ভালো।
ওগো আমার আজকে প্রাতে প্রথম দেখা ফুল
এই জনমের শতেক ভুলের শতেকতম ভুল;
তোমায় ভালোবাসি আমি সত্য ভালোবাসা
একটি দিনের একটু ভালোবাসা।

ওগো আমার নতুন দিনের নতুন মনোরমা,
কেমনে বলি তুমিই প্রিয়তমা!
এই কাননের লক্ষকোটির সকল ক'টি ফুল
আমার দু'টি মুগ্ধ চোখে প্রত্যেকে অতুল।
সবারে ভালোবাসি আমি সত্য ভালোবাসা
ভাগ করে নিই সবার কাঁদা-হাসা।

প্রিয়ে, তোমায় বৃন্ত হতে ছিন্ন করে পাওয়া
এমন তরো নয় তো আমার চাওয়া।
আমার চাওয়া নয়ন মেলে সূর্য্য যেমন চায়
রাঙিয়ে দিয়ে পাকিয়ে দিয়ে রিক্ত ফিরে যায়।
তেমনি ভালোবাসি আমি সত্য ভালোবাসা
কাহারো তরে নাই নিরাশা আশা।

নিত্য রাতে নয়নপাতে মিলিয়ে আসে আলো
চিরন্তনে তখন বাসি ভালো।
সে আসে মোর তন্দ্রা ছেয়ে স্বপ্নদেশিনী,
সেই কি এসেছিল দিনে ছদ্মবেশিনী?
তারই পায়ে সঁপি আমার সত্য ভালোবাসা
নিত্য নব সব দুরাশা আশা।

দক্ষিণে

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

কাঞ্চিভরম্

(৩)

মহাবলিপুর থেকে বিদায় নিয়ে আমরা Buckingham Canal এসে নৌকোয় চড়ে বসলুম। আঠার মাইল ঝট্‌কার ঝাঁকুনি, তার ওপরে পাহাড়ে ওঠা-নামা ইত্যাদিতে শরীর অবসন্ন হোয়ে পড়েছিল। পূর্ব্বগগনে সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকু তখনো একেবারে মিলিয়ে যায়-নি। রৌদ্রতপ্ত অঙ্গে সন্ধ্যার শীতল বাতাস লেগে প্রকৃতিও তখন ঝিমিয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় অতীতের সেই স্থির, মূক ও সর্ব্বসহ সাক্ষীগুলিকে দেখতে-দেখতে আমাদের মনও যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। মনে হোতে লাগল, কি পাপে আমরা এই শিল্প হারিয়ে ফেলেছি। কোথায় গেল আমাদের সে ভক্তি, যার অনুপ্রেরণায় তারা এই দুঃসাধ্য ব্রত অবলীলায় উদ্‌যাপন করেছিল। খাল পার হোতে হোতেই আকাশ থেকে সূর্য্যাস্তের লালিমাটুকু নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেল। দূরে রাস্তার ধারে একটা গাছের নীচে আমাদের ঝট্‌কাখানা দেখা যাচ্ছিল। গাইডদের বিদায় দিয়ে রাস্তায় পড়ামাত্র অকস্মাৎ সেই শান্ত প্রকৃতির বুকে সুরের হিল্লোল প্রবাহিত হোলো। একটু এগিয়ে এসে দেখি, পথের দু-ধারে দু-সারি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে গান সুরু করেছে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে গান শোনা গেল। সে কি সঙ্গীত, সে ভাষার অর্থ কি, তা কিছুই বোধগম্য হোলো না। জীবনে অনেক ছোট-বড় গায়কের গান শোনবার অবসর হয়েছে; কিন্তু সে সঙ্গীতের অনেকখানিই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাকালে সেই অবোধ্য ভাষায় শিশুদের কণ্ঠ যে সঙ্গীতের লহরী তুলেছিল, তা চিরদিন মনে থাকবে। তাদের বক্‌শিস্ দিয়ে আবার ঝট্‌কায় সোয়ারী হওয়া গেল।

আসবার সময় গন্তব্যস্থানের দূরত্ব, সময়ের মাপ প্রভৃতি সবই অনিশ্চিত ছিল। তার ওপরে দেখবার আগ্রহও ছিল অপার। এই সব উত্তেজনায় পথকষ্টের কথা মনেই ওঠে-নি। কিন্তু ফেরবার সময় জেনে-শুনে হাড়িকাঠে মাথা গলানোর মত ঝট্‌কায় মাথা গলানো হোলো। সবার মুখে তখন এক কথা—কটার মধ্যে পৌছতে পারা যাবে?

পক্ষীতীর্থের মন্দির
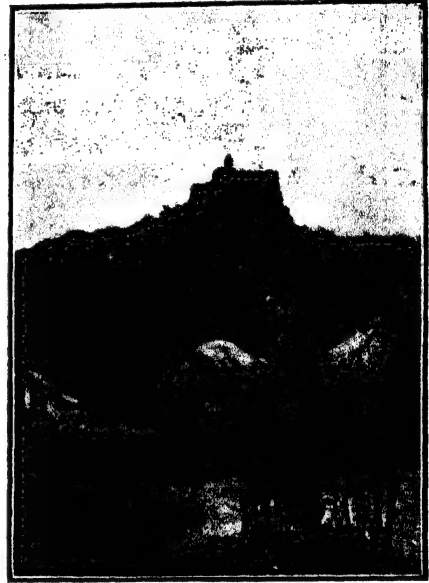
আসবার সময় হোটেলওয়ালা বলে দিয়েছিল যে, সাড়ে নটা অবধি আমাদের জন্য দরজা খোলা রাখা হবে। তার পরে এলে আর খাবার পাওয়া যাবে না।

ঝটকাওয়ালাকে বলে দেওয়া হোলো—যেমন কোরে

পার সাড়ে নটার আগে হোটেলের দরজায় পৌঁছে দিতে হবে।

ঝট্কাওয়ালা নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে কি বোঝাতে চাইলে, বুঝলুম না। ঝট্কা চল্‌তে সুরু হোলো।

সেদিন ছিল শুক্লা একাদশী। একটু পরেই আকাশে চাঁদ উঠ্‌ল। জ্যোৎস্নায় ধরণী এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করলে। দু-পাশে দীর্ঘ নারিকেল-তরুশ্রেণী। তাদেরই দীর্ঘতর ছায়া পথের ওপরে বিস্তৃত হোয়ে অপূর্ব্ব আলো ও ছায়ার জাল রচিত হয়েছে। তারই ভেতর দিয়ে আমাদের ঝট্কা ধেয়ে চলেছে। মনে হোতে লাগ্‌ল, আমরা যেন

পুরোহিত পাখীদের খাওয়াচ্ছেন

স্বপ্ন পারাবারের খেয়া পার হোতে গিয়ে স্বপ্নের গোলক-ধাঁধায় পড়েছি। রহস্যময়ী প্রকৃতির সেই অপূর্ব্ব শোভা দেখতে-দেখতে আমাদের ক্ষুধার্ত্ত অবসন্ন দেহ ও একান্ত ঝিমিয়ে পড়া মন দিব্য চাঙ্গা হোয়ে উঠ্‌ল। পরামর্শ কোরে স্থির হোলো যা থাকে কপালে, আজ রাত্রেই তিরুকালিকুণ্ড্রম্ দেখে যেতে হবে।

তিরুকালিকুণ্ড্রম্ মন্দির মহাবলিপুরের ঠিক মাঝপথেই পড়ে, একটু ঘুরে যেতে হয় মাত্র। এই মন্দিরের পাশেই পাহাড়ের ওপরে পক্ষীতীর্থ। পরামর্শ স্থির হওয়ামাত্র ঝট্কাওয়ালাকে বলা হোলো—তিরুকালিকুণ্ড্রম চল।

আমাদের হুকুম শুনে সে ব্যক্তি এতক্ষণ বাদে কথা বল্লে। কথা বুঝতে পারলুম না বটে কিন্তু তার বক্তব্যের মর্ম্মটা হৃদয়ঙ্গম করতে দেরী হোলো না। বোঝা গেল যে, সে ব্যক্তি আপত্তি জানাচ্ছে। কিন্তু তার আপত্তি গ্রাহ্য হোলো না। বল্লুম—তিরুকালিকুণ্ড্রম চল। এবার সে আর আপত্তি না জানিয়ে সেই পথেই গাড়ী চালিয়ে দিলে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক চলবার পর দূরে পাহাড়ের ওপরে আলো দেখা গেল। যাবার সময় পাহাড়ের ওপরে পক্ষী-তীর্থের মন্দিরের পাশ দিয়েই যাওয়া হয়েছিল। এ আলো দেখেই বুঝতে পারা গেল, সেই মন্দিরের আলো। দেওয়ালীর সময় যেমন কোরে চারিদিকে প্রদীপ দিয়ে বাড়ী সাজান হয়, মন্দিরের গায়ের চতুর্দ্দিকে তেমনি সারি দিয়ে বিজলীর আলো দেওয়া হয়েছে। দূর থেকে পাহাড়ের ওপরে সেই আলোকমালা দেখে ছেলেবেলার রহস্যপুরীর কথা মনে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, এই পক্ষীতীর্থ সত্যিই একটি রহস্যপুরী।

কিছুক্ষণ পরেই ঝট্কা পক্ষীতীর্থ পাহাড়ের পাদমূলে এসে থাম্‌ল। পাহাড়ের নীচ থেকে একেবারে মন্দির অবধি বাঁধান সিঁড়ি। ওপরে উঠতে প্রায় ছশো সিঁড়ি ভাঙতে হয়। মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ হচ্ছেন দেবী ত্রিপুরা-সুন্দরী। কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্রই এই তীর্থ পক্ষীতীর্থ নামেই খ্যাত। দেবীর নামে রোজ এখানে দুটি পাখীকে খাওয়ান হয়। এখানকার লোকে বলে যে, প্রায় পাঁচশো বছর ধরে এই নিয়ম চলে আস্‌ছে। মন্দিরের পুরোহিত পাখীদের খাবার জন্য খাবার এনে এক জায়গায় রেখে দেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর পাখী দুটি দূর থেকে উড়ে এসে সেই খাবার খেয়ে আবার উড়ে চলে যায়। যাত্রীরা ইচ্ছা করলে নিজের নামে সংকল্প কোরেই খাবার দিতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খাবার খেতে দুটি পাখীর বেশী কখনো আসে না। কেউ কেউ বলেন যে পাঁচশো বছর ধরে সেই একজোড়া পাখীই আস্‌ছে। কেউ বা বলেন, সে জোড়া মারা গেছে, এ জোড়া অন্য পাখী। কথাটা প্রথমে আমরা বিশ্বাস করি-নি।

মাদ্রাজে দু-একজন লোকের মুখে এই পক্ষীতীর্থের রহস্য শুনেছিলুম। তাঁদের মধ্যে একজন লোক বল্লেন যে, তিনি এই দৃশ্য অন্ততঃ তিনবার দেখেছেন। পরে ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের মুখেও শুনলুম যে, এ কথা সত্য। তিনি নিজে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর 'দক্ষিণাপথে' নামক ভ্রমণ-পুস্তকে এ সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি।

"প্রায় আধ ঘণ্টা বসে থাকার পর একজন লোক এসে একখানি কাঠের পিঁড়ি, যেখানে পক্ষী এসে আহার করবে, সেইখানে রেখে গেল এবং একটা ঢাকা পাত্রে খাদ্যও রেখে গেল। শেষে দেখলাম সেগুলি মিষ্ট পোলাও বা ঘি-ভাত। একটু পরেই পুষ্ট দেহ, মুণ্ডিত মস্তক পুরোহিত এলেন। তিনি বোধ হয় পূর্ব্বেই মন্দিরের মধ্যে আমাদের কথা শুনেছিলেন। তিনি এসেই আমাকে ডাকলেন এবং আমার নামে সঙ্কল্প কোরে, আজ পক্ষীকে আহ্বান করবেন বল্লেন। আমার নাম, গোত্র প্রভৃতি উচ্চারণ কোরে আমার দ্বারা সংকল্প করালেন। সুতরাং তিনটী টাকা দক্ষিণা দিতে হোলো। তার পর আমি নেমে এসে নীচে বৃক্ষতলে বসলুম। যাত্রীও অনেক এসেছিল। পুরোহিত সকলকেই উপবেশন করতে বললেন, কেহই দাঁড়িয়ে থাকল না।

এক নম্বর নাথ-মন্দিরের পাথরের থাম

"তখন পুরোহিত দাঁড়িয়ে উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম চারিদিকে মুখ কোরে যোড়হস্তে পক্ষীকে আহ্বান করে সেই পিঁড়ির উপর উপবেশন করলেন এবং জপ করতে আরম্ভ করলেন। মধ্যে মধ্যে আকাশপথে চেয়েও দেখতে লাগলেন। আমাদের দৃষ্টিও আকাশের দিকে ছিল। পাখী আসবার সময় দেখে পুরোহিত মহাশয় আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর আসনের পাশে বসালেন। আমার দেখবার সুবিধা আরও বেশী হোলো।

"কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, দূর সমুদ্রের দিক থেকে কি যেন একটা আস্‌ছে। তখনও সেটা যে পাখী তা বুঝতে পারা গেল না। সেদিকে পাহাড় বা অরণ্য কিছুই নাই—সুধু মাঠ। একটু পরেই দেখলাম, সেই দূরদৃষ্ট বস্তুটি একটি পাখী। পাখীটি উড়ে এসে পুরোহিতের অনতিদূরেই বস্‌ল। সে যে মন্দির বা পাশের জঙ্গল থেকে আসে নাই, তা আমরা বিশেষ সতর্ক দৃষ্টিতেই দেখেছিলাম। পাখীটী এসে বসেই থাকল, নড়ল না। তখন দূর পশ্চিম দিক থেকে আর একটি পাখী আস্‌ছে দেখা গেল। সেটীও এসে পূর্ব্বটীর পার্শ্বে বস্‌ল। পুরোহিত তখন দুইটী বাটীতে খাদ্য পরিবেশন করে দিলেন। পাখী দুইটী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আহার করতে লাগল। তারা একবার পুরোহিতের সম্মুখে এল। পুরোহিত মধ্যে মধ্যে হাতে
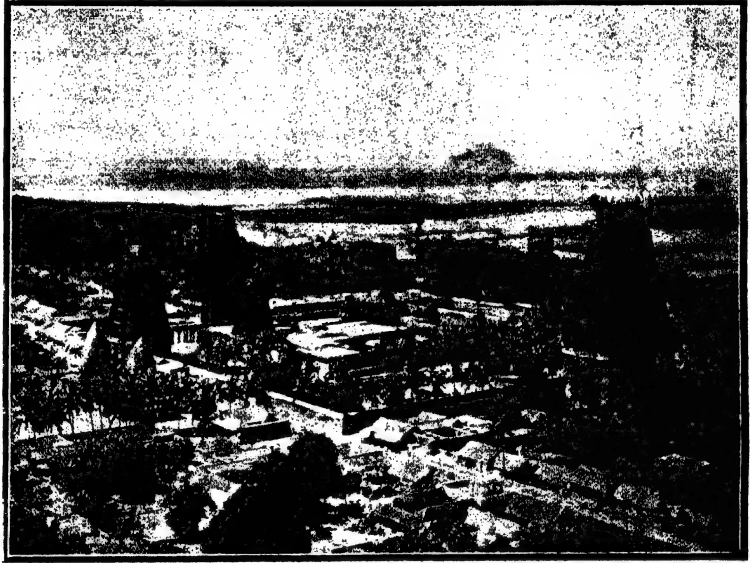
করে তাদের মুখে খাদ্য তুলে দিতে লাগলেন। পাখী দুইটী শ্বেতকায় শকুনি, বাচ্ছা নয়, বয়স বেশী হয়েছে। সাধারণ শকুনি হইতেও আকারে বড়।

"পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যেই আহার শেষ হোয়ে গেল। পক্ষী দুইটী দূর সমুদ্রের দিকে চলে গেল। পুরোহিত বললেন, ইঁহারা দুইজন দেবতা, অগস্ত্য মুনির সন্তান। একজন রামেশ্বরে থাকেন আর একজন গঙ্গোত্রীতে থাকেন, এখানে কোন সময়ে এসে পার্শ্বস্থ কুণ্ডে স্নান করেন, তাহা কেহ বলতে পারে না। তার পর এই সময় এসে আহার করে যান। কোন কোন দিন নাকি পুরোহিতকে অনেকক্ষণ বসে জপ করতে হয়। পাখীর আসতে বিলম্ব হয়।"

এই পাখী আসার ব্যাপারটাকে অনেকে অনেক রকমে ব্যাখ্যা করেন। কেউ কেউ বলেন যে, পাখী দুটিকে আফিং খাইয়ে আফিংখোর কোরে তোলা হয়েছে। মৌতাতের সময় হোলেই ঠিক তারা এসে হাজির হয়। কিন্তু নিত্য ঐ রকমের পোলাওয়ের ভোগ জুটলে অনেক পাখীই আফিংখোর হোতে রাজী আছে, তাদের ঠেকানো হয় কি কোরে? ব্যাপারটা চালাকীই হোক আর ম্যাজিকই হোক—বেশ বড় রকমের ম্যাজিক এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

তিরুকালি কুণ্ড্রম মন্দির

পক্ষীতীর্থ পাহাড়ের নীচেই তিরুকালি-কুণ্ড্রম শিবের মন্দির। মন্দিরটী বিশেষ বড় নয়, তবে গোপুরম্‌গুলি বেশ উঁচু বলে মনে হোলো। আমরা যখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলুম তখন ঢাক আর ঘণ্টা পিটে আরতি চলেছে। মন্দিরের মধ্যে বৃহৎ দীপাধার-গুলিতে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলছে। মন্দিরের বিগ্রহ হচ্ছেন শিবলিঙ্গ। ছোট্ট কাল রংয়ের বিগ্রহটী। পুরোহিতেরা বল্লেন যে, এ শিবলিঙ্গ পাথরের নয়, বালি দিয়ে তৈরি। সেইজন্য জলের পরিবর্ত্তে এঁকে সুগন্ধ তৈল দিয়ে স্নান করান হয়। মন্দিরের মধ্যে পাণ্ডার কোনো অত্যাচার নাই। দু-পয়সা দিয়ে এক টুকরো কর্পূর কিনে দেবতার সম্মুখে জ্বালিয়ে দিলেই পুরোহিতরা খুশী।

এইখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার ঝট্‌কায় আরোহণ করা গেল। তার পরে আরও দেড়ঘণ্টা পরে আমরা চিংলিপুটে এসে উপস্থিত হলুম। রাস্তা তখন জনমানব-শূন্য। দু-একটা কুকুর ঝট্‌কার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজে অত্যন্ত বিরক্ত হোয়ে পথের পাশ থেকে ধমক দিতে লাগ্‌ল। ঝট্‌কা একেবারে হোটেলের দরজায় গিয়ে থাম্‌ল। নেমে দেখি হোটেলের দরজা বন্ধ! সারাদিন কবিত্ব পান করার পর মহাপ্রাণী তখন কিঞ্চিৎ পার্থিব আহার্য্যের আশায় উন্মুখ, এমন সময়ে হোটেলের দরজা বন্ধ! এখন উপায়! খাবারের দোকান খোলা আছে কি না খোঁজ নেওয়া গেল, কিন্তু সব বন্ধ। শেষকালে মরিয়া হোয়ে আমরা হোটেলের দরজা ঠেঙাতে লাগলুম। কিন্তু কোনো

সাড়া শব্দ নেই। আর একবার শেষ চেষ্টা করা গেল। এবার ভেতর থেকে কে যেন—কণ্ড, মণ্ড, দণ্ড বলে উঠ্‌ল। আহা হা হা! তামিল ভাষার মধ্যে যে এত মধু আছে এ তো জানতুম না। আবার দরজা ধাক্কা! কিছুক্ষণ পরে একটি লোক চোখ রগ্‌ড়াতে-রগ্‌ড়াতে বেরিয়ে এল। এই লোকটাকে আমরা সকালবেলা দেখেছিলুম। সে বেরিয়ে আসতেই তাকে বল্লুম—সকালে আমাদের খাবার রাখবার কথা বলে গিয়েছিলুম—খেতে দাও।

লোকটার চোখ থেকে ঘুমের ঘোর তখনো কাটে-নি। বেশ করে ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ছুটিয়ে আবার বলা গেল—আমাদের খেতে দাও।

এবার সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ফেল্লে। লণ্ঠনের আলোতে দেখলুম, তখন সবে দশটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে মাত্র। হোটেলের লোকটী ইতিমধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে হাঁক দিলে—মাইসোর!
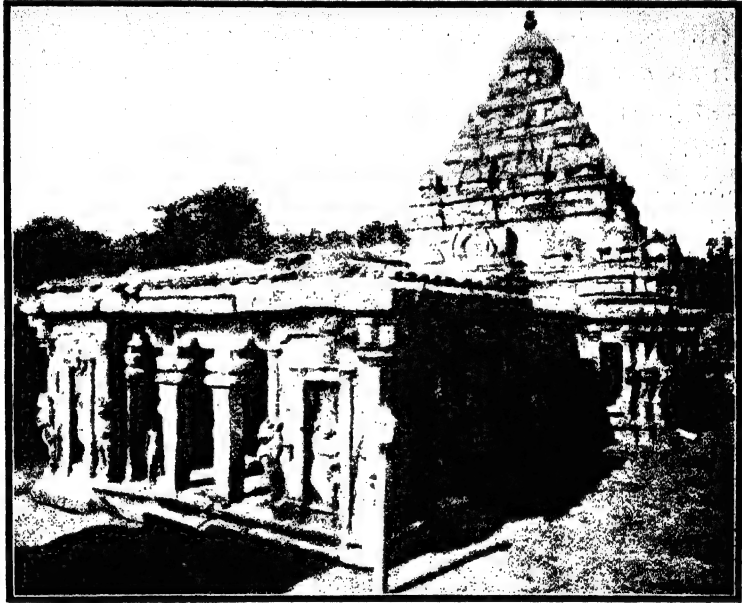
কৈলাসনাথ-মন্দির

সকাল বেলা যে ব্রাহ্মণটী আমাদের পরিবেশন করেছিল তার নিবাস মহিশূরে। সেইজন্য তাকে সেখানে সবাই মাইসোর বলে ডাকে। লোকটীর ডাক শুনেই বুঝে নিলুম যে, মাইসোর না এলে অদৃষ্টে আজ আর কিছু নেই। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে চারিজনে মিলে চীৎকার সুরু করা গেল—মাইসোর—ওহে মাইসোর—কোথা আছ দেখা দাও। কিন্তু আমাদের সেই আর্ত্তস্বর মাইসোরের কানে পৌঁছল না। ইতিমধ্যে সেই লোকটা চারিদিক খুঁজে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—মাইসোর নাটক দেখতে গিয়েছে!

সর্ব্বনাশ! এখানেও নাটক! সাধে কি আর বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, থিয়েটার দেশের সর্ব্বনাশ করছে। গুরুজনদের অনুশাসন অবজ্ঞা কোরে থিয়েটারের স্বপক্ষে অনেক গান গেয়েছি বলে অনুতাপ হোতে লাগ্‌ল। কিন্তু অনুতাপের অশ্রু ক্ষুধার অগ্নিতে তখুনি বাষ্প হোয়ে উড়ে গেল। লোকটীকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা, তুমি আমাদের খেতে দিতে পার না?

সে বল্লে—তা পারব না কেন? তবে মাইসোর যেমন Language জানে আমি তো তেমন জানি না।

হরি হরি! এতক্ষণ তা হোলে রসিকতা হচ্ছিল! আমরা তাকে তাড়া দিয়ে বল্লুম—চল চল—এখুনি খেতে দাও। আমরা Languageটুকু বাদ দিয়েই খাব।

আমাদের কথা শুনে লোকটি উৎসাহিত হোয়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরের ভেতরে সকালবেলাকার সে পরিচ্ছন্নতা আর নেই। ভিজে ঘর, তা থেকে বিশ্রী ভ্যাপ্‌সা গন্ধ বেরুচ্ছে। তার মধ্যে নাক টিপে কোনো রকমে খেতে বসা গেল। খেতে বসে দেখা গেল যে, শুধু Language নয় আরও অনেক জিনিষই বাদ পড়েছে।

সকালে আমাদের খেতে দিয়েছিল ভাত, ডাল, ঘি, বর্ব্বটির চচ্চড়ি, নুনের জল, লঙ্কার জল, তেঁতুলের জল ও দইয়ের জল। কিন্তু এ বেলা তা থেকে ডাল আর বর্ব্বটির চচ্চড়িটা বাদ পড়েছে। ঘি-ও খাবার উপায় নেই, কারণ ভাতের temperature তখন প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, এ প্রদেশের লোকেরা সন্ধ্যে হোতে না হোতেই খেয়ে নেয়। আর এবেলা ওবেলার চাইতে Light food খায়।

সেই দুর্গন্ধের মধ্যে বসে ঐ Light food খেয়ে আত্মা যা পরিতৃপ্ত হোলো সে কথায় আর কাজ নেই। খাওয়া শেষ কোরে যথারীতি দণ্ড দিয়ে ছত্রমে ফিরে এলাম। তারপরে ঘরের দাওয়ায় বিছানা পেতে শুতে না শুতেই নিদ্রা।

একটি ঘুমেই রাত কাবার হোয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় পরের দিনটাও কাবার হোয়ে যেত; কিন্তু ধর্ম্মশালার সেই বৃদ্ধা আমাদের জাগিয়ে দিলে। সকাল বেলা চায়ের সন্ধান করা গেল। কিন্তু হোটেল থেকে লোক ফিরে এসে বল্লে—সকাল বেলা চা পাওয়া যাবে না। সকাল বেলা যা পাওয়া যায় সে জিনিষটীর নাম 'গাবি' অর্থাৎ কফি। যস্মিন্ দেশে যদাচার মনে কোরে কাফিই খাওয়া গেল। এই কফিকে যদি কেউ কফি মনে কোরে খান তা হোলে অত্যন্ত নিরাশ হবেন। এটি না কফি না চা। অথচ দুটি জিনিষের মাঝামাঝিও একটা কিছু নয়। দক্ষিণের কোন্ একটা ষ্টেশনে ঠিক মনে নেই, অত্যন্ত চা'র তৃষ্ণা পাওয়ায় চায়ের সন্ধান করছিলুম; এমন সময় একটা লোক 'গাবি গাবি' কোরে চীৎকার করছে দেখে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—চা আছে? সে বল্লে—আছে। লোকটীর কাছে একটি মাত্র পাত্র ছিল। আমি মনে করলুম চা হয়ত অন্য কোথাও আছে সেখান থেকে এনে দেবে। তা না কোরে সে ব্যক্তি সেই পাত্র থেকেই খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে দিলে। চুমুক দিতেই বুঝতে পারা গেল যে, সে জিনিষটী চা নয়। বোঝা গেল, এই উষ্ণ তরল পদার্থটী অধিকারী-ভেদে কখনো চা কখনো গাবিতে পরিণত হয়।

যা হোক 'গাবি' নামক অদ্ভুত পানীয়ের দ্বারা চায়ের তৃষ্ণা নিবারণ কোরে স্নানের ব্যবস্থায় মন দিতে হোলো। কথা ছিল যে, সেইদিনই সকালে কাঞ্জিভরম গিয়ে সমস্তদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যের সময়ে চিংলিপুটে ফিরে এসে রাত্রি এগারোটার সময় চিদাম্বরমে যাত্রা করা হবে। ধর্ম্মশালার সেই বৃদ্ধা ও তার কিশোরী কন্যার কৃপায় আমরা সাড়ে আটটার মধ্যেই স্নানপর্ব্ব শেষ কোরে নিলুম। তাড়াতাড়ি হোটেলে গিয়ে দেখি যে, তাদের তখনো রান্না হয়-নি। কিঞ্চিৎ জলযোগ কোরে ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। গাড়ী তৈরিই ছিল, আমরা একটা খালি কামরা অধিকার কোরে বসলুম।

চিংলিপুট থেকে কাঞ্জিভরমের দূরত্ব প্রায় পঁচিশ মাইল। বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েক ছুটে ট্রেণখানা কাঞ্জিভরমে এসে পৌঁছল। কাঞ্জিভরমের পুরাতন নাম কাঞ্চি। বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে হোলেও এ নাম বাঙালীর কাছে অপরিচিত নয়। ভারতের সপ্ততীর্থের মধ্যে কাঞ্চী অন্যতম।

কাঞ্চী শহরটী লম্বায় প্রায় পাঁচ ছয় মাইল হবে। এর মধ্যে আবার দুটি ভাগ আছে, একটির নাম শিবকাঞ্চী, এখানে শিবের মন্দির আছে। অপরটীর নাম বিষ্ণুকাঞ্চী, এখানে বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। শহরটী ছোট্ট হোলেও রাস্তাগুলি খুব চওড়া, যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই নারকোল গাছ। পরিষ্কার নির্জ্জন রাস্তার ধারে ছোট ছোট একতলা বাড়ী, মধ্যে-মধ্যে এক-আধটা দোতলা বাড়ী। চতুর্দ্দিকে দরিদ্রের কুটীর; আর তারি মাঝে বিরাট প্রাসাদ সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—এমন অসামঞ্জস্যতা এখানে চোখে পড়ে-নি। এখানে ধনী থাকতে পারে; কিন্তু দেখে শুনে মনে হয় যে, ধনীদের চক্ষুলজ্জাটা এখনো যায়-নি।

কাঞ্চীর ইতিহাস অতি বিচিত্র। চালুক্যবংশীয় রাজা পুলিকেশী এখানকার চোল রাজাকে পরাজিত কোরে ৪৮৯ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীতে একবার লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় করেন। একাদশ শতাব্দীতে এই স্থানই ছিল পল্লবী রাজাদের আড্ডা। আবার চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কাঞ্জীভরম টোণ্ডাইমণ্ডলমের রাজধানী ছিল। বিজয়নগরের পতনের পর কাঞ্জিভরম গোলকুণ্ডার রাজাদের হাতে যায়। পরে মুসলমানদের অধীন এবং আর্কট প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পরে ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ এই স্থান ফরাসীদের হাত থেকে কেড়ে নেয়। সেই বৎসরেই কাঞ্চী ক্লাইভের হাত থেকে দেশীয়দের হাতে ফিরে আসে। কিন্তু ১৭৫২ অব্দে ক্লাইভ আবার কেড়ে নেয়। ১৭৫৭ অব্দে ফরাসীরা একবার এখানকার মন্দির আক্রমণ করে। কিন্তু কিছু করতে না পেরে শহরে

আগুন ধরিয়ে দিয়ে যায়। ১৭৫৮ অব্দে ফরাসীদের ভয়ে এখান থেকে ইংরেজ সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে কাঞ্জিভরম ফরাসীদের হাতে যায়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলি ফরাসীদের পরাজিত কোরে কাঞ্জিভরম লুটপাট করে।

এ সব তো গেল এ যুগের হাঙ্গামা। পুরাতন যুগেও কাঞ্জিভরমের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ওয়াং চোয়াং ভারতবর্ষের বিবরণে কাঞ্চীর কথা উল্লেখ কোরে গেছেন। তিনি বলেন যে, বুদ্ধদেব নিজে এখানে প্রচার কার্য্যে এসেছিলেন এবং এখানকার বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। তিনি আরও বলেছেন যে কাঞ্চি ধর্ম্মপালের জন্মস্থান এবং অশোক এখানে অনেকগুলি স্তূপ নির্ম্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এত পুরোনো হোলেও বর্ত্তমান কাঞ্জিভরম দেখে একেবারে এ যুগের শহর বলে মনে হয়।

গাড়োয়ান আমাদের প্রথমে শিবকাঞ্চীতে নিয়ে গেল। গাড়ী থেকে নেমে প্রথমেই চোখে পড়ে গগনভেদী গোপুরম্। গোপুরম্ ইঁটের তৈরি, তার ওপরে বালির কাজ। ভিত থেকে আরম্ভ কোরে একেবারে চুড়ো অবধি সম্ভব ও অসম্ভব যত রকমের জীব কল্পনা করা যেতে পারে তারই নমুনা। অবিশ্যি এ সবই বালির তৈরি। গোপুরম্ দেখলেই মনে হয়—হ্যাঁ, বিরাট একটা কিছু। দক্ষিণের তামিল ভাষাটি যেমন দুর্ব্বোধ্য, তাদের গোপুরম্ জিনিষটাও প্রায় সেই রকমেরই। এর মধ্যে বিস্ময়কর মানসিক ও কায়িক অধ্যাবসায় আছে বটে, কিন্তু অসংযমের এতখানি পরিচয় মহান ও উচ্চশ্রেণীর রূপ বলে পরিচিত ভারতীয় আর কোনো রূপ নিদর্শনের মধ্যে আছে কি না জানি না। হোতে পারে এর প্রত্যেকটি জিনিষের মধ্যে গূঢ় অর্থ ও ধর্মতত্ত্ব নিহিত আছে। কিন্তু সে গূঢ় তত্ত্বকে রূপ দেবার চেষ্টা এখানে নিষ্ফল হয়েছে।

এই বিরাট গোপুরমটীর ভেতর দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। গোপুরমটী বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব তৈরি কোরে দিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড দরজায় হায়দার আলির কামানের গোলার দাগ এখনো দগ দগ্ করছে। গোপুরম্ পেরিয়ে একটুখানি গিয়েই আসল মন্দির। মন্দিরে ঢুকে প্রথমে একটা প্রায়-অন্ধকার বড় ঘর। তার পরে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ঘর ততই ছোট হোতে থাকে; আর অন্ধকার বাড়ে। এই রকমে ব্রহ্মদেশের সেই বড় কৌটোর মধ্যে ছোট কৌটো তার মধ্যে তার চেয়ে ছোট কৌটোর মতন—শেষকালে একটি অতি ছোট ঘর, অর্থাৎ আট হাত দীর্ঘ ও চার হাত প্রস্থ ঘরে থাকেন, একাম্বর নামক শিব—অতি ক্ষুদ্র একটি শিবলিঙ্গ। যে ঘরে বিগ্রহ আছেন তার ওপরে একটু উঁচু চুড়োর মতন। সেটা পাথরের আর তাতে কারুকার্য্যও বিস্তর।

আমরা যখন মন্দিরে পৌঁছলুম, ঠাকুর তখন স্নান করছিলেন। একজন পাণ্ডা আমাদের দেখে বল্লেন যে, ভক্ত লোক এত দূর দেশ থেকে এসেছ যখন, তখন ঠাকুর স্নানই করুন আর যাই করুন, চল তোমাদের দর্শন করিয়ে আনি। ঠাকুর-দর্শনের পর আমরা বোধ হয় সর্ব্বসমেত আনা-চারেক প্রণামী দিয়েছিলুম। কিন্তু দক্ষিণের মন্দিরগুলির বিশেষত্ব এই যে, সেখানে পাণ্ডার অত্যাচার বলে কোনো জিনিষ নেই। দেবতা যে সময় দরজা বন্ধ কোরে বিশ্রাম করছেন, সে সময় দেবদর্শন কোরে দেবতার বাহনদের দক্ষিণায় তুষ্ট না কোরে কেবলমাত্র প্রণাম ঠুকে দেবতাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করলে অন্য হিন্দুমন্দিরে প্রহার লাভের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। আমার মনে আছে ছেলেবেলায় কাশীতে পাণ্ডারা আমার কাছ থেকে জোর কোরে আদায় কোরে প্রণামীর ছলে সর্ব্বস্ব এক রকম কেড়ে নিয়েছিল। তারপরে একদিন পথের মাঝে আর এক পাণ্ডা আমায় গ্রেপ্তার কোরে বল্লে—পূজো দেবে চল। আমি বল্লুম—তিনবার পূজো দিয়েছি। সে বল্লে—কুছ্ পরোয়া নেই, চল তোমায় দর্শন করিয়ে আনি। আমি তো কিছুতেই যাব না। সে ব্যক্তি এক রকম জোর কোরে আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে বিশ্বনাথজী দর্শন করিয়ে দিলে। তারপরের ব্যাপারটা সঙ্গীন! আমার হাতে কিছুই নেই, সেও ছাড়বে না। শেষকালে পকেটে এক প্যাকেট সিগারেট ছিল তাই কেড়ে নিয়েই সেবারের মত আমায় ছেড়ে দিলে। অবিশ্যি আমার প্রতি এই জুলুম করার জন্য পাণ্ডা মহাশয়কে ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হয়েছিল। এখন যদিও কাশীর পাণ্ডাদের ব্যবহার অনেক পরিমাণে সংশোধিত হয়েছে, তবুও এ কথা জোর কোরে বলা যেতে পারে যে, দক্ষিণের মন্দিরের পাণ্ডারা অন্যান্য তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের চেয়ে অনেক ভদ্র এবং অনেক বেশী সভ্য। মোট কথা, পাণ্ডা বল্লে কিছু

আছে কি না, তাই অনেক সময়ে সেখানে বুঝতে পারা যায় না।

যে ঘরে শিব থাকেন তার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণের জায়গা। এই পরিক্রমাটী অতি সুন্দর। এক দিকে সারি-সারি কাল পাথরের থাম। এই থামগুলির কারুকার্য্যও অতীব বিচিত্র। বড় বড় প্রমাণ মাপের ঘোড়া ভীষণভাবে মুখ ব্যাদান কোরে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পিঠের ওপরে আবার সওয়ার। থামগুলি সব একই রকমের। এই থামগুলির কারুকার্য্য দর্শকের মনে বিস্ময়ই জাগিয়ে তোলে; কিন্তু রূপ দর্শনের ক্ষুধা মেটে না। শিবের মন্দিরে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার এই বিরাট আস্তাবল তৈরি করবার কি সার্থকতা, তা বুঝতে পারলুম না। হয় ত কোনো গূঢ় তত্ত্ব আছে।

প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে প্রায় পনেরো দিন ধরে এখানে বিরাট উৎসব হয়। এই ইতিহাসটী বিরহ মিলনের একটি মধুর কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। শিব একদিন মসগুল হোয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছেন। তাঁর নৃত্যের ছন্দে বিশ্বে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় চলেছে। আপন মনে তিনি নেচে চলেছেন, এমন সময় পার্ব্বতী লীলাচ্ছলে পেছন থেকে এসে তাঁর দুই চোখ চেপে ধরলেন। শিবের চোখে আড়াল পড়্‌ল—ফলে সারা ব্রহ্মাণ্ড তিমিরাবৃত। এই রকম গুরুতর কাজে যখন ব্যস্ত, সে সময়ে পার্ব্বতীর এই পরিহাসে তিনি চটেই আগুন। ক্রোধে অন্ধ হোয়ে তিনি পার্ব্বতীকে বল্লেন—অমন স্ত্রীর আর মুখ দর্শন করব না।

রাগের মাথায় স্ত্রীকে এই কথা বলে ফেলেই ভোলানাথ বুঝতে পারলেন যে, কাজটা বড় গর্হিত হয়ে পড়্‌ল। তিনি পার্ব্বতীকে ডেকে বল্লেন—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ছ-মাস এই কাম্বনদী পুষ্করিণীতে বসে তপস্যা কর।

পার্ব্বতী স্বামীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য কোরে পুষ্করিণীতে বসে তপস্যা আরম্ভ করলেন। তারপরে ছ-মাস বাদে শিব এসে আবার পার্ব্বতীকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

একাম্বরনাথ মন্দিরের মধ্যেই প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে। দক্ষিণের সকল মন্দিরেই এই রকম বড় সরোবর দেখতে পাওয়া যায়। এই পুষ্করিণীগুলির সাধারণ নাম টেপ্পাকুলম্। প্রতি মন্দিরের টেপ্পাকুলমের বিশেষ-বিশেষ নাম আছে।

একাম্বরনাথের মন্দিরের মধ্যেই পার্ব্বতীর মন্দির আছে। এর পাশেই একটা ঘরে হর-পার্ব্বতীর বাসর-গৃহ। উৎসবের দশম দিবসে শিব ও পার্ব্বতীকে এইখানে একসঙ্গে রাখা হয়।

একাম্বরনাথ ছাড়া এখানে কৈলাসনাথ শিব আছেন। এ মন্দিরটী আদি দ্রাবিড় ধাঁচে তৈরি। অনেকে বলেন যে, এটি মহাবলিপুরমের সপ্তমন্দিরের সমসাময়িক। মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি লিপি আছে। এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার কোরে জানা গেছে যে, চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক পহ্লবরাজ উগ্রদণ্ড—লোকাদিত্যের পুত্র রাজসিংহ অথবা নরসিংহ বিষ্ণু এই মন্দিরটী প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজসিংহ এখানে রাজত্ব করতেন।

শিবকাঞ্চি থেকে আড়াই মাইল দূরে বিষ্ণুকাঞ্চি। এইখানেই বিখ্যাত বরদারাজস্বামী বিষ্ণুমন্দির। মন্দিরটী রামানুজী (বিশুদ্ধাদ্বৈত) সম্প্রদায়ের। প্রবেশদ্বারের ওপরেই সাততলা গোপুরম্। কিন্তু একাম্বরনাথের বড় গোপুরমের চেয়ে এ গোপুরমের অবস্থা অনেক খারাপ এবং ছোট। গোপুরম পেরিয়েই বড় প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের বাঁ দিকে একশত স্তম্ভওয়ালা পাথরের ঘর। স্তম্ভগুলি একাম্বর-নাথ মন্দিরের স্তম্ভগুলির মতই কারুকার্য্য-শোভিত—তেজীয়ান ঘোড়া দু পায়ে দাঁড়িয়ে, তার ওপরে সওয়ার। এই ঘরের উত্তর দিকে টেপ্পাকুলম্। ঘরের সম্মুখের দিকের ছাতের দুই কোণ থেকে দুটি পাথরের শিকল ঝোলান। একখানি পাথর কেটে এই শিকল তৈরি হয়েছে। পাথরের এ রকম শিকল অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শত স্তম্ভওয়ালা ঘরের পরেই আসল মন্দিরে ঢোকবার দরজা। আমরা যখন মন্দির দর্শন করতে গেলুম, তখন বেলা প্রায় একটা। দ্বিপ্রহরে ঠাকুর বিশ্রাম করেন তাই মন্দিরের দরজা তখন বন্ধ। ভেতরে ঢোকবার আর কোনো উপায় নেই দেখে নিরাশ হোয়ে ফেরবার উপক্রম করছি, এমন সময় একটি ছোট্ট ছেলে, কপালে তার আধুনিক বৈষ্ণবী তিলক (দক্ষিণে সনাতনী ও আধুনিক দু-রকম বৈষ্ণবী তিলকের প্রচলন আছে)—সে এগিয়ে এসে ইংরেজীতে আমাদের সম্ভাষণ কোরে বল্লে—আপনাদের কোনো ভয় নেই, আসুন আমার সঙ্গে, আমি মন্দিরের সব দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে সে মন্দিরে প্রবেশ করবার বড় কবাটের কাছে গিয়ে মাঝখানের কাটা দরজাটা খুলে বল্লে—চলে আসুন। আমরাও

ভেতরে ঢুকে পড়লুম। তার পরে সে আমাদের নিয়ে এধার-ওধার চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বরদারাজস্বামী বিষ্ণুমন্দিরটী বেশ বড় মন্দির; কিন্তু এত বেশী উঁচু নীচু এবড়ো খেবড়ো যে, মনে হয় প্রথমে এটি একটি ছোট মন্দির ছিল পরে অবস্থার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে আস্তে আস্তে বাড়ান হয়েছে। ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো না। ঠাকুর-ঘরের দরজায় প্রকাণ্ড তালা লাগান। পুরোহিতদের অনেক অনুরোধ করা গেল; কিন্তু তারা কিছুতেই খুল্লে না। ঠাকুরের যদি দয়া হয়, এই ভরসায় তালা ধরে অনেক নাড়ানাড়ি করলুম। তালা নাড়ার যে রকম বহর চলেছিল, তাতে হয় ত বিনা চাবিতেই খুলে গিয়ে ঠাকুরের লীলা ও আমাদের ভক্তির শক্তি প্রকাশ হোয়ে পড়্ত; কিন্তু আমরা যে ঘোর শাক্ত, অন্তর্যামী ঠাকুর বোধ হয় সে কথা জানতে পেরে সে লোভ সম্বরণ করলেন। যাক্! বিষ্ণুর মন্দিরে গিয়ে তাঁর দেখা পাই নি, তাতে কোনো ক্ষোভ নেই, কারণ লক্ষ্মীদেবীর দর্শন লাভ ঘটেছিল। আর এ জন্মে অধীনের প্রতি তাঁর ব্যবহারটা মোটেই যে লক্ষ্মী মেয়ের মতন হয় নি, সেজন্য চল্‌তি ভাষায় তাঁকে গুটিকয়েক মন্তব্য শুনিয়ে দিয়ে এসেছি।

কাঞ্জিভরমের এই বিষ্ণুমন্দিরের ইতিহাসের কথা এখানে আর তুল্‌ব না। সে কথা তুলতে গেলেই রাজা-বাজড়া, যুদ্ধ, বিগ্রহ, রক্তপাত, গুলি, বারুদ ইত্যাদির কথাই এসে পড়ে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, মন্দিরের প্রত্যেক পাথরটীর পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে, আসলে মন্দিরটী যে ভাব নিয়ে তৈরি হয়েছিল, সেটা অনেকখানি খাটো হোয়ে যায়। এ দেশের সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা কর—কোন্ শিল্পীরা এই মন্দির তৈরি করেছিল? উত্তর পাওয়া যাবে—বিশ্বকর্ম্মা! ব্যস! এর মধ্যে অবোধ্য আর কিছুই নেই। বিশ্বকর্ম্মার বাড়ী কোথায়, কার ছেলে সে, কত খৃষ্টাব্দে সে জন্মগ্রহণ করেছিল—এ সব প্রশ্ন আর আসতেই পারে না। বাস্তবিক, যশের আকাঙ্ক্ষা দেবতার পায়ে এমন কোরে যে শিল্পীরা নিবেদন করতে পারে, তারা বৈষয়িক বুদ্ধি-বিবেচনায় ছোট হোতে পারে; কিন্তু সত্যিকারের শিল্পীর মন যে তাদের ছিল সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

এই বিষ্ণুমন্দিরের যে ইতিহাস ভারতবর্ষের আপামর সাধারণ হিন্দুকে একবার বল্লেই বুঝতে পারবে সে ইতিহাস হচ্ছে এই—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সেই সনাতন ঝগড়া—কে বড়? কিছুতেই মীমাংসা হয় না। শেষকালে দুজনে মিলে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত। ব্রহ্মা অনেক ভেবে চিন্তে বিচার কোরে সত্য কথাই প্রকাশ করলেন—লক্ষ্মীই বড়। সরস্বতী এই কথা শুনে রেগে ব্রহ্মার কাছ থেকে চলে গেলেন; এবং কি কোরে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন তার সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। সুযোগ মিলতেও দেরী হোলো না। একবার ব্রহ্মা কাঞ্চিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন। প্রশ্ন হোতে পারে যে, এত জায়গা থাকতে কাঞ্চিতে অশ্বমেধ কেন? তার উত্তর এই যে, অর্থনীতি জিনিষটী ব্রহ্মা বিশদরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। কাঞ্চিতে একটি অশ্ব বলি দিলে সহস্র অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে যে স্থানে বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান, যজ্ঞভূমি ঠিক সেই স্থানেই নির্ব্বাচিত হয়েছিল। যজ্ঞের আয়োজন সব ঠিক, এমন সময় সরস্বতী দেখলেন, প্রতিশোধ নেবার এই উপযুক্ত অবসর। তিনি তখন নদীরূপে যজ্ঞ ভাসিয়ে দেবার সংকল্প কোরে অগ্রসর হোতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে ব্রহ্মার চক্ষুস্থির! যজ্ঞ পণ্ড হয়। তিনি তাড়াতাড়ি বিষ্ণুকে গিয়ে ধরলেন—ভায়া বাঁচাও। অনেক চিন্তার পর বিষ্ণু এক মতলব ঠাওরালেন। তিনি একেবারে উলঙ্গ হোয়ে নদী যে পথে অগ্রসর হচ্ছে সে পথে গিয়ে পড়ে রইলেন। সরস্বতী অগ্রসর হোতে হোতে সম্মুখে নগ্ন পুরুষ মূর্ত্তি দেখে লজ্জায় ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। ব্রহ্মার যজ্ঞ নিরাপদে সমাধা হোলো। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা বিষ্ণুকে আর ছাড়লে না। সেই থেকে তাঁকে এই স্থানেই অবস্থান করতে হচ্ছে। বরদারাজস্বামী ছাড়া শহরের আর একদিকে আর একটি বিষ্ণুমন্দির আছে। এখানকার দেবতা একেবারে নগ্ন। শহরের আর একদিকে কামাক্ষী দেবীর মন্দির। শহর থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে তিরু-পরাট্টিকুণ্ড্রম গ্রামে একটি জৈন মন্দির আছে, এটি দেখবার জিনিষ। এই গ্রামে একটি প্রকাণ্ড মসজিদ আছে। এখান থেকে দেড় মাইল দূরে বিখ্যাত পাল্লালুর গ্রাম। এইখানে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলির সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যের সংঘাত হয়। ভারতবাসীর সঙ্গে বল পরীক্ষায় ব্রিটিশ সৈন্যের এমন পরাজয় ভারতে আর হয়-নি। এইখানে ব্রিটিশ দলে মৃত সৈন্যদের স্মরণে একটি স্তম্ভ খাড়া করা হয়েছে।

কাঞ্চিভরমে দেখাশুনা শেষ কোরে সন্ধ্যার সময় আমরা ট্রেনে কোরে আবার চিংলিপুটে ফিরে এলুম। (ক্রমশঃ)

পথের কাহিনী

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বাক্স, বিছানা বাঁধাছাদা কালই শেষ হইয়াছিল ; তবুও আজ ভোর হইতে না হইতে ছোটখাট আল্‌গা জিনিষ-পত্রগুলি আর একবার নতুন করিয়া বাঁধিবার ধূম পড়িল। টিফিন্ ক্যারিয়ারটা যেন আবার ভুলে থাকিয়া না যায়,—পথে পড়িবার জন্ম যে কয়খানা ইংরাজী নভেল লওয়া হইল, তাহা যেন আবার অই ভারী ট্রাঙ্ক্‌টার ভিতর ভর্ত্তি না হয়,—হাত বাক্সের মধ্যে আইয়োডিনের শিশিটা যেন আবার হোমিও-প্যাথিক্ ঔষধের শিশিগুলির সাথে জড়াজড়ি হইয়া না থাকে,—মার দোক্তার কৌটাটা যেন আবার দিদিমার পানের ডিবার মধ্যে গিয়া আত্মগোপন না করে, ইত্যাদি তদারক শেষ হওয়ার পর যখন গাড়িতে গিয়া উঠিলাম, তখন বেলা সাতটা।

বাড়ী আমাদের পাড়াগাঁয়ে। পড়াশুনা উপলক্ষ করিয়া আমরা নাতনীর দল সহরে দাদামণির কোলে সেই যে একটা সুখনীড়ের আবিষ্কার করিয়াছিলাম, আজ পর্য্যন্ত তাহা অটুটই রহিয়া গিয়াছে—কোন ভূমিকম্পেই তাহার একটা সামান্ত খড়ও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। আমরা যখন প্রথম এখানে আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হই, সে আজ কত বৎসর আগের কথা। তারপর সুখ-দুঃখ মিশাইয়া কতদিনই না কাটিয়া গিয়াছে।

দিন কয়েক হইল আমাদের ইন্‌টারমিডিয়েট্ পরীক্ষা শেষ হইয়াছে ; তাই মেজদা আমাদের দুই বোন্‌কে নিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে মাও আসিয়াছেন দাদামশায় ও দিদি-মণিদের একবার দেখিবার জন্ত।

আমাদের যাওয়ার পথটা একটু বিদ্‌ঘুটে রকমের—রেলে ষ্টীমারে যাইতে হইলে সেই সাতরাজ্য ঘুরিয়া মরিতে হয়! তাই খানিকটা পথ যাইতে হইবে ঘোড়ার গাড়ীতে, বাকীটা আবার পাল্কীর নাগরদোলা খাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। মাঝখানটায় একবার নৌকায়ও পা দিতে হয়, সে অবশ্য পাঁচ সাত মিনিট—শুধু একটা খেয়া পার হওয়া!

পথের অসুবিধা সে যতই হউক্, বাঙ্গালীর কোন ছেলে-মেয়েই তার জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারে না ; বরং সেখানকার কথা উঠিলেই তার মর্ম্মের নাড়ীতে টান পড়ে। তাই এত অসুবিধার সম্ভাবনায়ও আমাদের যাওয়ার আনন্দ এক তিল ক্ষুণ্ণ হইল না।—মা, দাদা ও আমরা দুই বোনে গিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম।

গাড়ীর পথটা আঁকা বাঁকা কাঁচা পথ। তাহার উপর এখানে সেখানে ভাঙিয়া যাওয়ায় পথের বন্ধুরতা শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে আধঘণ্টার রাস্তা যাইতে দেড়ঘণ্টা লাগিল। শুধু তাই নয়—রবার টায়ারের গাড়ীখানা যে কতবার প্রায় উল্টাইয়া যাইতে যাইতে আবার সোজা হইয়া চলিতে লাগিল, তাহার সঠিক হিসাব রাখিতে গেলে প্রায় তিন সংখ্যায় কাছাকাছি গিয়া দাঁড়াইত। এ অভিজ্ঞতা আমাদের নতুন নয়—যতবার বাড়ী গিয়াছি, ততবারই এ ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। তবে এও ঠিক্, সারা পথটাই আর একঘেয়ে খারাপ লাগে নাই। চুপ্‌চাপ বসিয়া কোমর ব্যথা করা বা শ্রীহীন মাঠের দিকে বিরক্তভাবে চাহিয়া থাকার চেয়ে মাঝে মাঝে দুই একটা ঠোক্কর খাওয়া বা দুই একবার লাফাইয়া ওঠা—এ আর মন্দ কি! মাও প্রথমটা মুখ বুজিয়াই সব সহ্য করিতেছিলেন। কিন্তু রাস্তার বেয়াদবির সঙ্গে পাল্লা দিয়া ঘোড়া ও গাড়ির বেয়াদবিও যখন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল, তখন তিনি সারাটা পথ একবার গাড়োয়ানকে ধমকাইয়া, একেবার লোকেল্ বোর্ডের কর্ত্তাদের সপিণ্ডি-করণের ব্যবস্থা করিয়া, কখন বা অশ্বযুগলের বুদ্ধি হীনতার উপর দোষারোপ করিয়া মনে মনে হয় ত বা সান্ত্বনা লাভ করিতে লাগিলেন। যাক্, জগতে নাকি সকল জিনিষেরই একটা শেষ আছে, তাই আমাদের এই দুঃসহ সুখপূর্ণ গাড়ি চড়ার পর্ব্বও শেষ হইল!

পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত ছিল, বাড়ী হইতে পাল্‌কি বেহারা ও মজুর আসিয়া থাকিবে ; কিন্তু আসিয়া দেখি, কোথায় বা লোকজন! কাজেই অপেক্ষা করিতে হইল,—একটু বেশীক্ষণই এবং প্রথম দিক দিয়া বেশ একটু বিরক্তভাবেই! দাদা পুরুষমানুষ—গাড়ি থামিতেই তড়াক্ করিয়া নামিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন! আমরা গাড়ির ভিতর

বসিয়াই এদিকে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অতি সাধারণ আবেষ্টনীর মধ্যেই অসাধারণ একটা কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

কয়েকটা বড় বড় আমগাছের ঘন ছায়ায় যে যায়গাটায় গাড়ি রাখা হইয়াছিল, তাহার কাছেই ছিল একটা মাঝি বাড়ী—রং বেরংয়ের পাতা-বাহারে ঘেরা ছোট্ট একটি বাড়ী। চারি ভিটায় সুন্দর ছোট ছোট চারিখানা খড়ের ঘর; মাঝখানে ছোট্ট একটুখানি গোময়-লিপ্ত প্রাঙ্গণ! এক কোণে একখানা একচালা—একেবারে বেড়া ছাড়া! বেড়ার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। এতটুকু ঘর, ইহার মধ্যেই ঠাসাঠাসি করিয়া গোটা দুই তিন মাটির উনুন আগুণে পুড়িয়া পুড়িয়া গৈরিক হইয়া গিয়াছে। এক পাশে রাশিকৃত শুক্‌না পাতা—পাড়াগাঁয়ের সাধারণ সুলভ জ্বালানি কাঠ! বর্ষার দিন ছাড়া বছরের বাকী কয় মাস এখানেই সব রান্না-বান্না হয়। শুক্‌না পাতা একবার পোড়ান হয়; আবার নূতন সংগ্রহ শূন্য স্থান পূর্ণ করে।

সেদিন সেখানে সধবা বিধবা কুমারী নানা বয়সী পাঁচ-সাতজন মেয়ে কলরবের সহিত মুড়ি ভাজিতেছিল। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে গরম মুড়ি মুঠা মুঠা মুখে পুরিয়া সে কলরবের মাত্রা শতগুণ বাড়াইয়া তুলিতেছিল।

আমাদের গাড়ী থামিতেই সব কয় জোড়া চোখের সম্মিলিত দৃষ্টি আমাদের উপর আসিয়া পড়িল; এবং হঠাৎ সেই বিপুল কোলাহল থামিয়া গিয়া মৃদুগুঞ্জনধ্বনি উঠিতেই বুঝিলাম, আমরাই তাহাদের অস্ফুট আলোচনার বিষয়-বস্তু। তাহার প্রমাণ পাইতেও বেশী বিলম্ব হইল না। যে দুই একটা কথা মাঝে মাঝে আমাদের কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল, তাহার সহিত, আমাদের দিকে তাহাদের মুহুর্মুহু চঞ্চল দৃষ্টিনিক্ষেপ—নিঃসন্দেহ আমাদের অনুমানকে সত্য করিয়া তুলিল। আমরাও তাহাদের সেই সসঙ্কোচ চাহনি এবং মৃদু আলাপনের সহিত আমাদের উর্ব্বর কল্পনা যোগ করিয়া আমাদের সম্বন্ধে তাহারা কি ভাবিতে পারে তাহারই একটা খস্‌ড়া খাড়া করিতেছিলাম, এমন সময় তাহাদের মধ্যে ছোট্ট একটা মেয়ে বেশ জোরে জোরেই বলিয়া উঠিল—"অ পিসি অই ত্যাখ্, এই মেয়েগুলা এত বড় বড় তবু 'তেনাদের' হাতে শাঁখা নাই, কপালেও সিন্দুর নাই।"

গাড়ির জানালার ভিতর দিয়া আমাদের দুই বোনের হাতই বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। কয়েকগাছি করিয়া সোনার চুড়ি ছাড়া সত্যই আমাদের হাতে আর কিছুই ছিল না।

মেয়েটির পিসির চোখ দুটির অনুসরণ করিয়া সব কয়জোড়া চোখই আবার নতুন করিয়া আমাদের হাতের উপর পড়িল। তাহাদের চোখ দেখিয়া মনে হইল, যেন তাহারা এমন আশ্চর্য্য জিনিষ আর কোনও দিনই দেখে নাই।

না দেখিবার কথাও বটে। আট বছর শেষ হইতে না হইতেই যাহাদের শ্বশুরঘর করিতে হয়, বারো তেরো বছরেই যাহাদের মা হইতে হয়, এবং ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সে যাহাদের বিধবা হইয়া কোলের 'কাচ্চাবাচ্চা' মানুষ করিবার জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া একাজ সেকাজ করিয়া খাওয়া পরার সংস্থান করিতে হয়, আমাদের মত অত বড় মেয়েদের এ অবস্থায় দেখাটা তাহাদের একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের খোরাক বটে!

নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বোধ হয় তাহারা আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না; তাই একটু বেশী বয়সের একটি বিধবা ধীরে ধীরে আমাদের গাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্ খান্‌টায় যাবা ঠাকরুণ তোমরা?"

গন্তব্য স্থানের নামটা শুনিয়া তাহার মুখের উপর দিয়া যেন একটা আনন্দের জ্যোতিঃ খেলিয়া গেল। ধীরে ধীরে বলিল—"আমার বোন্‌ঝির 'বিয়া'ও তোমাদের 'গেরামেই' হইয়াছে! মা-মরা মেয়ে! কত খুঁজিয়া পাতিয়া তবে 'ছিদামের' হাতে তুলিয়া দিয়াছি! আহা! তারা সুখে থাকুক, আমার মাথার চুলের সমান তাদের 'পেরমাই' হোক্।"

একটু থামিয়া আবার বলিল—তাহার বোন্‌ঝির শীঘ্রই প্রসব-সম্ভাবনা। ভালোয় ভালোয় দুই আলাদা হইয়া গেলেই রক্ষা! বলিতে বলিতে তাহার মুখে দুশ্চিন্তার একটা করুণ ছবি ফুটিয়া উঠিল।

আমাদের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আবার বলিতে লাগিল—"ছিদাম মাঝিকে ত তোমরা চিন ঠাকরুণ! তার বাড়ীর লোকজন ত 'হামেসাই' তোমাদের বাড়ীতে যায় আসে। একদিন যদি তাকে খবরটা জানাও, আমার কথা বল—একটা চিঠিতে যেন একটু সংবাদ দেয়!" তাহার কণ্ঠস্বরে যেন জগতের সমস্ত মিনতি এবং করুণ

চোখ দুটিতে যেন শত উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

কে কোন্ ছিদাম মাঝি!—তাহার বাড়ীর ছেলে-পিলেদের চেনা দূরের কথা, তাহাকেই ভাল করিয়া চিনিতাম না। কিন্তু তবু মা-হারা বোন্‌ঝির এই বিধবা মাসীর উদ্বেগ-মলিন মুখের উপর নিরাশার কালিমা ঢালিয়া দিতে কিছুতেই মন সরিতেছিল না। তাই বলিলাম—"তোমার কোন ভয় নাই। সময়মত সুখবরই পাইবে।"

নিছক মিথ্যা কথায় তাহাকে ভুলাইয়া মনে হয় ত একটা কাঁটার খচ্‌খচ্ বোধ করিতেছিলাম, কিন্তু আমার এই সামান্য উত্তরে তাহার মুখের সেই উদ্বেগের মেঘ দূরীভূত হইয়া পরম আশ্বাসের যে শান্ত দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে আমার এই ফাঁকির গ্লানি একেবারে নিঃশেষে দূর হইয়া গেল।

এবার সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাপের বাড়ীতে খাও বুঝি মা তোমরা?" পাড়াগাঁয়ে এমন ধরণের প্রশ্নের অন্তরালে যে নারী-জীবনের কোন্ অধ্যায়ের পরিচয় লুকানো থাকে তাহা জানিতাম; তবু সেদিক দিয়া একেবারে চুপ করিয়া গেলাম; শুধু বলিলাম—হাঁ।

এতক্ষণ আলাপ পরিচয়ে হয় ত তাহার সেই সঙ্কোচের ভাবটা দূর হইয়া গিয়াছিল, তাই জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের হাতে যে শাঁখা দেখি না, কপালেও ত সিঁদুর দেখি না!"

তাহার এই প্রশ্নে আমার মুখের উপর শুধু একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলাম, "আমাদের এখনো বিয়ে হয়নি কি না তাই!"

খুনী আসামীর অপরাধের স্বপক্ষে সমস্ত প্রমাণ পাওয়ার পর আদালত-গৃহে সকলেই যখন তাহার ফাঁসির হুকুমের অপেক্ষা করিয়া থাকে, তখন জজ্ সাহেব তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া রায় দিলে সকলের মুখেই যেমন একটা অপ্রত্যাশিত বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, তদপেক্ষাও বোধ হয় বেশী বিস্মিত হইল এই বিধবাটি, যখন শুনিল আমাদের বিবাহ হয় নাই।

কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র! ধীরে ধীরে তাহার মুখের উপর দিয়া একটা ভাব-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বিস্ময়ের স্থানে ফুটিয়া উঠিল বেদনার এক প্রগাঢ় নিবিড় ছায়া।

বুঝিলাম তাহার মনে একটা ব্যথা আছে, আজ আমাদের উপস্থিতিতে তাহা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাহার হৃদয় ক্ষতের এই রক্তনিঃসরণ! আগ্রহ আর দমন করিয়া রাখিতে পারিলাম না—তাহাকে জিজ্ঞাসাও করিলাম।

আষাঢ়ের নবঘনের মত তাহার চোখ মুখের উপর গোপন ব্যথার পুঞ্জীভূত কালিমা ঘনাইয়া আসিল। তাহার পর বেদনার অশ্রু মাখিয়া সে যাহা বলিয়া গেল, তাহার সার মর্ম্ম এই—

তাহার যখন কপাল পোড়ে তখন 'মান্‌কে' তাহার কোলে, 'পাঁচি' পেটে। সে আজ কত বছর আগেকার কথা! তাহার পর এই দীর্ঘজীবনে কত ঝড়ই না তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

স্বামী থাকিতেই তাহারা ভাইএ ভাইএ ভিন্ন হইয়াছিল। স্বামী মারা যাওয়ার পর দেওরই হইল অভিভাবক। সে ত নিজের ঘর-সংসার লইয়া ব্যস্ত; তাই বৌঠানের দিকে নজর দিবার ফুরসুৎ তাহার কমই মিলিত। তবু আপদে বিপদে পড়িলে এই দেওরই তাহাকে সাহায্য করিত। 'মান্‌কে' বা 'পাঁচির' অসুখ বিসুখ করিলে দুই 'কোশ' পথ হাঁটিয়া কবিরাজ ডাকিয়া আনিত; ঘটিটা বাটীটা বন্ধক দিয়া যেখানে আট আনা মিলিত, সেখানে বার আনা দিতেও ইতস্ততঃ করিত না।

স্বামীও এমন কিছুই রাখিয়া যায় নাই, যাহাতে তাহাদের মোটা ভাতের একটা সংস্থান হয়। একলা মেয়ে মানুষ, কোলের শিশু দুইটীর দুইটা মোটা ভাত জোটাইতে তাহার প্রাণান্ত হইত। এবাড়ী সেবাড়ী মুড়ি ভাজিয়া, ধান ভানিয়া কিছু রোজগার হইত। অবসর মত সুতুলি পাকাইয়া এই দেওরের হাত দিয়াই সোমবারে বিক্রয় করাইত। এই দেওরই তাহার তৈয়ারি চালুনির খরিদ্দার জোটাইয়া দিত। তাই দেওরও যখন তখন বলিত—এই শর্ম্মা না থাকিলে বৌঠান্···হা···হা···হা। বাকিটা তাহার হাসির মধ্যেই ডুবিয়া যাইত, কিন্তু ইঙ্গিতটা পরিষ্কার বুঝা যাইত।

এম্‌নি করিয়াই দিন কাটিতেছিল—ইহার মধ্যে দুধের শিশু পাঁচি ন'বছরে পড়িল। দেওরের মেয়ে 'হেমি'রও আট ছাড়াইয়া গেল। তাহাদের বিয়ে এখন না দিলেই নয়। দেওর পুরুষ মানুষ, জন খাটিয়া তবু মেয়ের বিবাহের জন্য দুই চারিটা টাকা রাখিয়াছে,—হাঁটিয়া হাঁটিয়া পাত্র জোটাইতে পারে। কিন্তু একলা বিধবা সে—তাহার নিত্যকার খরচই চলে না,—পাত্র জুটিলেই বা টাকা জুটিবে কোথা হইতে? মান্‌কেটা যদি তখন 'লায়েক' থাকিত, তাহা হইলেও একটা কিনারা হইত।

কিন্তু অপেক্ষাও আর করা চলে না। তা' ছাড়া পাঁচির

বিয়ে না হইলে ত আর হেমির বিয়েও হইতে পারে না। তাই গাঁয়ের মোড়লরা যখন তখন তার দেওরকে অপমান করিত, আর দুই এক মাসের মধ্যে বিবাহ দিতে না পারিলে একঘরে করিবে বলিয়া শাসাইত। দেওরও বাড়ী ফিরিয়া যে ভাষায় এসব বর্ণনা করিত, এবং উপসংহারে একটা ফোঁড়ন দিয়া দিত, তাহা দেওরের মুখ হইতে বাহির হইলেও বৌঠানের কাণে মোটেই সুধা বর্ষণ করিত না।

তাহারই বা দোষ কি! পাঁচির জন্যই ত হেমির বিবাহও আট্‌কা পড়িয়া রহিল। তাই উপায়হীনা বিধবা শুধু চোখের জল ফেলিত, আর একটা উপায়ের জন্য মনে মনে ঠাকুরকে ডাকিত। ঠাকুরের আসন বুঝি বা সে ডাকে টলিল, তাই উপায় একটা হইলও। কিন্তু মায়ের অন্তর্যামী জানিলেন নিরুপায়ের সে কি উপায়!—বৈশাখ শেষ হইবার আগেই ঐই গাঁয়ের ক্যাব্‌লার বাবার সঙ্গে পাঁচির বিবাহ হইয়া গেল।—ক্যাব্‌লার মা তাহারই কিছু দিন আগে এ দিক্‌কার পথ পরিষ্কার করিতে চোখ বুজিয়াছিল। দুধের শিশু পাঁচি বুড়া সোয়ামীর ঘর করিতে চলিল। জামাই পাইয়া পাঁচির মা'ও যেমন খুসী হইল না, তিন ছেলের বাপ সোয়ামী পাইয়া পাঁচিরও মন উঠিল না। কিন্তু কি করা! কথায় বলে, জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনের উপর কাহারও হাত নাই। জন্ম জন্মান্তরের বাঁধনে যে যেখানে আট্‌কা, ফুল ফুটিলে তাহার কাছেই তাহাকে যাইতে হইবে।—এতে কি আর একটু এদিক ওদিক করার যো আছে, না মানুষের হাত আছে! এই ভাবিয়াই মনকে সান্ত্বনা দিতে হইল।···

বছর তিনেক পর খবর আসিল, পাঁচির কোলে একটী নাতি আসিবে। একটী নাদুস নুদুস কালো ছেলের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় মায়ে ঝিয়ে বিগত গ্লানি সবই ভুলিয়া গেল। পাঁচি ভাবিল—তাহার কোল জুড়িয়া থাকিবে সাত রাজার ধন এক মাণিক। দুষ্ট শিশু সময়ে অসময়ে কত আব্দার ধরিবে, মায়ের চুল ছিঁড়িয়া দিবে, কাণ ধরিয়া টানিবে—আবার সঙ্গে সঙ্গে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া তাহার কোলে লুটাইয়া পড়িবে। ক্ষুধা পাইলে বাছা যখন মুখ কালো করিয়া কাঁদিতে থাকিবে, তখন সেই কুলুঙ্গিতে তোলা এনামেলের বাটীতে দুধ বার্লি ঢালিয়া ছোট ঝিনুকটা দিয়া চক্‌চক্ করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। অবাধ্য ছেলে নড়িয়া চড়িয়া উঠিবে, ঝিনুক নড়িয়া গিয়া তাহার দুই কস গড়াইয়া দুধ পড়িয়া যাইবে,—মেলায়-কেনা লাল রংএর গামছাখানায় সযত্নে তাহার মুখ মুছাইয়া দিবে।

দিদি ভাবিল, তাহার 'দাদুকে' কোলে লইয়া সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইবে। পাঁচি যখন রান্নাবান্না লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, তখন 'দাদু' কাঁদিয়া উঠিলে, তাহাকে কোলে লইয়া কত আদর করিয়া ঠাণ্ডা করিবে, রং বেরংএর খেল্‌না দিয়া ভুলাইয়া রাখিবে। দুষ্টু দাদু কথা কহিতে শিখিলে তাহাকে বুড়ি বুড়ি করিয়া ক্ষেপাইবে!

হায় রে মানুষের মন! হায় রে তাহার কল্পনা! তাহাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন কি নিষ্ঠুরভাবেই না ভাঙিয়া গেল। তাহারা ভাবিল এক, হইল আর। বিধাতা বড় অসময়ে বাদ সাধিলেন। ন'মাসেই একটী মরা ছেলের জন্ম দিয়া পাঁচিও সেই যে চোখ বুজিল, সে চোখ আর খুলিল না!

জামাই চার টাকা ভিজিট্ দিয়া 'কেষ্ট' ডাক্তারকে আনিল, লাল কালো নানা রংএর শিশি শিশি কত অষুধ খাওয়াইল, কিন্তু কোন ফলই হইল না। খাওয়ার-সময় ডাক্তার জামাইকে উল্টা ধম্‌কাইয়া গেল।—এতটুকু মেয়ের উপর এ অসময়ে এমন ছেলের বোঝা চাপাইয়া দিবার জন্য কত তিরস্কার করিল! এই অল্প বয়সেই মা হওয়াই নাকি তাহার মৃত্যুর কারণ, ইহাও জানাইয়া গেল। আমাকেও বা কত গাল মন্দ করিয়া গেল!—এই কচি মেয়েকে এ বুড়োর কাছে বলি দিবার কোন্ দরকার ছিল!·· কি দরকার ছিল, আমিই বা কি বলিয়া বুঝাইব! ··

ঠাকুরের দয়ায় আজকাল মান্‌কে অসুরের মত শরীর খাটাইয়া যাহোক্ দু-পয়সা রোজগার করিতেছে! পাঁচিকে ত আজকাল কত ভাল জামাইর হাতেই দেওয়া যাইত! কিন্তু কোথায় পাঁচী!—সেই নয় বছরেই ত তাহাকে খুন করা হইয়াছে! বিধবার বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিয়া ব্যথার ভারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল!···

বুঝিলাম কোন্‌খানটায় তাহার কাঁটা ফুটিতেছে!···

* * *

কতক্ষণ পরেই লোকজন সহ পাল্‌কী বেহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা বাড়ী রওনা হইলাম। কিন্তু সারাটা পথ শুধু মায়ের প্রাণের মেয়ে-হারানোর ব্যথাটাই খচ্‌খচ্ করিয়া বাজিতে লাগিল।

পনর দিন

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

দিল্লী

পনর দিনের দশ দিন ত পথে, কাশীতে, আর মিরটে কাটিয়ে দেওয়া গেল। অবশিষ্ট পাঁচ দিনের খবর দিলেই আমার পনর দিনের কথা শেষ হয়।

২৮শে ডিসেম্বর বিকেল বেলা যখন মিরটের সাহিত্য-সম্মেলনের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে, অর্থাৎ যখন অন্যান্য শাখার পক্ষীবৃন্দ যথাস্থানে প্রস্থান করেছেন, সুধু সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত কেদার ভায়া একরাশ প্রবন্ধ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্চেন এবং লেখকগণের বহু পরিশ্রমের ফল প্রবন্ধগুলিকে কবন্ধ ক'রে কোন রকমে 'ফাইল ক্লিয়ার' করতে ব্যস্ত, সেই সময় আমাকে সভা থেকে বিদায় নিতে হোলো। তখন প্রায় অপরাহ্ণ সাড়ে চারটা; ছটায় আমাকে দিল্লীগামী গাড়ী ধরতে হবে। তার আগে, প্রবাস-ভবনে গিয়ে, চার দিনের জন্য যাঁদের সঙ্গে গৃহস্থালী করেছিলাম, তাঁদের কাছে বিদায় নিতে হবে এবং তার পর আবু লেন থেকে তিন মাইল দূরে মিরট সিটি ষ্টেসনে গিয়ে গাড়ী ধরতে হবে। তারই জন্য তাড়াতাড়ি।

শ্রীযুক্ত কেদার ভায়া বল্লেন, তাঁর শাখার সমস্ত প্রবন্ধ শেষ হ'তে ছটা বেজে যাবে; তাঁর শরীরও অসুস্থ। তাই তিনি সে রাতটা মিরটেই বিশ্রাম করে' পরের দিন যে কোন গাড়ীতে কাশী যাবেন; সুতরাং সেখানেই তাঁর কাছে বিদায় নিতে হোলো।

মিরটে ছিলাম ত চা'র দিন; কিন্তু এরই মধ্যে অনেকের সঙ্গে এমন একটা আত্মীয়তা করে ফেলেছিলাম যে, বিদায়-উপলক্ষে অনেকেরই চক্ষু সজল হয়ে এলো। ওখানকার প্রধান উকিল শ্রীমান ইন্দুভূষণ ও তাঁর ভাইয়েরা, বল্‌তে গেলে, আমার কাছে এক রকম প্রতিশ্রুতিই আদায় করে নিলেন যে, আমাকে পূজার সময় তাঁদের ওখানে আবার যেতে হবে। এই সকল স্নেহের বাঁধন কাটতে এত বিলম্ব হ'য়ে গেল যে, আমরা যখন ষ্টেসনে পৌছিলাম, তখন গাড়ী আস্‌তে পাঁচ মিনিট বাকী।

ষ্টেসনে দেখি, শ্রীযুক্ত কেদার ভায়া ও তাঁর সঙ্গী শ্রীমান সুরেশচন্দ্র ব'সে আছেন। আমাদের দেখেই কেদার ভায়া বল্‌লেন "না দাদা, থাকা হোলো না। পাঁচটাতেই আমার কাজ শেষ হোয়ে গেল। আশ্রমে গিয়ে দেখি, প্রায় সকলেই গমনোন্মুখ। তাই, রাতটা কাটাতে আর ইচ্ছে হোলো না।" যাক্, আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে মনে বিশেষ আনন্দ বোধ হোলো।

সঙ্গী আমার অনেক। তবে কেদার বাবু প্রমুখ সাত আট জনের সঙ্গে গাজিয়াবাদেই ছাড়াছাড়ি হবে; কারণ, তাঁরা কেউ যাবেন কাশী, কেউ যাবেন এলাহাবাদ, কেউ যাবেন কানপুর। তাঁদের সবাইকে গাজিয়াবাদে গাড়ী বদল করতে হবে। আর আমরা খাস দিল্লী যাত্রী ছয়-সাতজন ঐ গাড়ীতেই দিল্লী যাব, আমাদের আর বদল করতে হবে না।

সবাই জড়াজড়ি ক'রে এক গাড়ীতেই উঠে পড়লাম। গাড়ী ছেড়ে দিলে, আমি আমার বহু দিনের সাহিত্যিক বন্ধু দিল্লী-প্রবাসী শ্রীমান যামিনীকান্ত সোম ভায়াকে বল্লাম যে, গাজিয়াবাদে গাড়ী পৌছিলেই একজনকে কষ্ট স্বীকার করে' আমার জন্য গাজিয়াবাদ থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত একখানি টিকিট কিনে এনে দিতে হবে। আমার কথা শুনেই চিত্র-শিল্পী শ্রীমান রণদাচরণ উকিল বল্‌লেন "আপনাকে তার জন্য ভাবতে হবে না। মিরট থেকেই দিল্লী পর্য্যন্ত আপনার টিকিট কেনা হয়েছে।" আমি বল্লাম "আমার যে রিটার্ণ টিকিট আছে, তাতে আমি গাজিয়াবাদ পর্য্যন্ত যেতে পারি যে!" রণদা উত্তর করলেন "গাজিয়াবাদে দশ মিনিট গাড়ী দাঁড়াবে; সেই সময়ের মধ্যে স্বর্গের সিঁড়ি

ওঠা-নামা করে অপর প্ল্যাটফরমে গিয়ে টিকিট কিনে নিয়ে আসা বড় সোজা ব্যাপার নয়। তারই জন্য মিরট থেকেই টিকিট নিয়েছি—কয়েক গণ্ডা পয়সা বৈ ত নয়!" শ্রীমান্ যথেষ্ট উপার্জ্জন করেন, কাজেই বার গণ্ডা পয়সা বাজে খরচ করতে তাঁর একটুও দ্বিধা বোধ হোলো না।

গাড়ী কয়েক মিনিট পরেই গাজিয়াবাদ পৌঁছিল। কেদার বাবুদের দল নেমে পড়লেন। তখন সাতটাও বাজে নাই। শুন্‌লাম, তাঁরা সাড়ে নটায় গাড়ী পাবেন। আমরা দশ মিনিট পরেই দিল্লীর পথে যাব। কিন্তু টাইম টেবলে না। কিন্তু গাড়ী ছাড়তে যত বিলম্ব হতে লাগল, ততই তাঁরা অধীর হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলেন। শেষে শ্রীমান্ যামিনী বল্‌লেন "ষ্টেসনে অনেক ভদ্রলোক আপনার অভ্যর্থনার জন্য আস্‌বেন কথা আছে। তার পর ষ্টেসন থেকেই তাঁরা আপনাকে একেবারে হিন্দু কলেজে নিয়ে যাবেন। সেখানে একটা গানের মজলিস্ সাড়ে সাতটায় বস্‌বার ব্যবস্থা হ'য়েছে; অনেক ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সকলের সঙ্গে আপনার দেখা-সাক্ষাতের আয়োজন করা হয়েছে। সবই যে পণ্ড হবার মত হোলো।" আমি
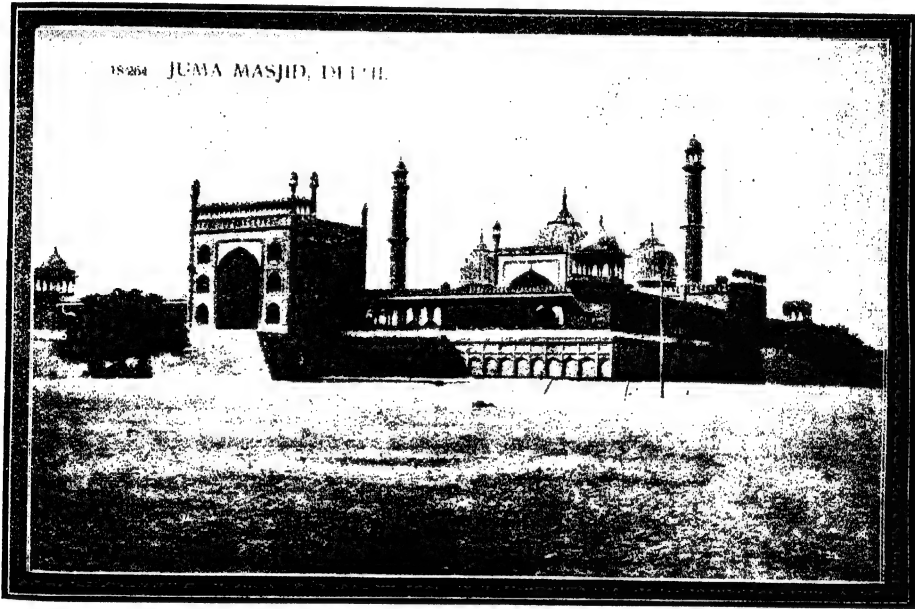
জুমা মস্‌জিদ—দিল্লী

দশ মিনিট অপেক্ষা করবার কথা লেখা থাক্‌লে কি হয়—আমাদের গাড়ী গাজিয়াবাদ আর ছাড়তে চায় না। আমার সঙ্গীরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লেন। শিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল ভায়া বল্‌লেন "সওয়া সাতটায় এ গাড়ীর দিল্লী পৌঁছিবার কথা। সেই অনুসারে সেখানে নানা ব্যবস্থা ঠিক্ হয়েছে। এখানেই যে সওয়া সাতটা হ'য়ে গেল। তাই ত!" আমি তাঁদের এত উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারলাম না। তাঁরাও কথাটা প্রথমে ভাঙ্গলেন বল্‌লাম "আপনাদের এ সব বাড়াবাড়ি দেখে ভগবানই গাড়ীখানিকে এখানে আট্‌কে ফেলেছেন। আমাকে এমন করে লজ্জিত করবেন জান্‌লে আমি দিল্লীতে আস্‌তে স্বীকারই করতাম না। যাক্, ট্রেণ-'লেট' হয়ে আমাকে বাঁচিয়েছে।"

সওয়া সাতটায় আমাদের গাড়ী দিল্লী পৌঁছিবার কথা—তিনি যথেষ্ট বিলম্ব করে আমাদের ষ্টেসনে নামিয়ে দিলেন সাড়ে আটটার সময়। ষ্টেসনে তখন কেহই উপস্থিত নাই। মনে করলাম, বাঁচা গেল!

তাড়াতাড়ি ষ্টেসনের বাইরে এসেই দেখা গেল, যাঁরা ষ্টেসনে এসেছিলেন, তাঁরা নিরাশ হয়ে চলে গিয়েছেন এবং তাঁদেরই একখানি মোটর অনিশ্চিতের উদ্দেশে ষ্টেসনে রেখে গেছেন। আমরা তখন সেই গাড়ীতে উঠে প্রথমে সারদা বাবুর বাসার দ্বারে উপস্থিত হলাম। আমাদের সঙ্গে লাহোর কলেজের দুইজন অধ্যাপক এসেছিলেন। তাঁরা সেই রাত্রির জন্য সারদা বাবুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করবেন। সারদা বাবুর বাড়ীতে তাঁদের নামিয়ে দিয়ে সারদা বাবু বল্‌লেন যে, সোফেয়ারের উপর আদেশ আছে যে, যত রাত্রিই হোক, আমরা এলেই আমাদিগকে হিন্দু কলেজে নিয়ে যেতে হবে।

তখন সারদা বাবু, যামিনী বাবু ও আমাকে নিয়ে মোটর হিন্দু কলেজের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। সেখানে যেতেই কলেজের প্রিন্সিপাল সুরেন্দ্রবাবু ও আরও কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদিগকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে হলের মধ্যে বসালেন। তখনও গান চল্‌ছিল। সুরেন্দ্রবাবু যখন শুনলেন যে, আমাদের গাড়ী গাজিয়াবাদে অযথা ঘণ্টাখানেক বিলম্ব করেছে, তখন তিনি বল্‌লেন "গাড়ী লেট হয়েছে, তা ত আমরা বুঝতে পারিনি। সওয়া সাতটায় একটা গাড়ী যে ষ্টেসনে এসেছিল। আমরা অনেকে ষ্টেসনে ছিলাম। সেই গাড়ীতে আপনাদের না দেখে মনে করলাম, আপনারা হয় ত মিরটে গাড়ী ধরতে পারেন নাই। তাই, আমরা নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। সেটা যে মিরটের গাড়ী নয়, তা আমরা বুঝতে পারি নাই।" আমি বল্লাম "সে ভালই হয়েছে, আমি একটা বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। আপনাদের কষ্ট করে এই শীতের মধ্যে ষ্টেসনে যাবার যে কি দরকার হয়েছিল, তা ত আমি বুঝতে পারছিনে। যাক্ সে কথা, এখন গান শোনা যাক্।"

ফিরোজ শা স্তম্ভ

গায়ক একটী বাঙ্গালী যুবক। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু। তাঁর বাড়ী কলিকাতার বাগবাজারে। তাঁকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সুরেন্দ্র বাবুই তাঁর পরিচয় আমার কাছে দিলেন। যুবকটী শুধু সুগায়ক নয়, তাঁর ক্ষমতা আশ্চর্য্য। তিনি যে কীর্ত্তনটী গাইলেন, তার

মধ্যে চার পাঁচবার স্বর পরিবর্ত্তন করলেন। এমন চমৎকার স্বর-পরিবর্ত্তন আমি অতি কমই শুনেছি। তিনি যেমন গাইয়ে, তেমনি বাজিয়ে। সকলেই তাঁর গানের যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। গানের মজলিশ যখন ভাঙ্গলো তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। সুরেন্দ্র বাবু তখন অন্যান্য ভদ্রলোক ও ওস্তাদ অতুলবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তখন সুরেন্দ্রবাবু বল্‌লেন "আপনার কষ্ট এখনও শেষ হয় নাই। এই রাত এগারটায় আপনাকে দু'মাইল দূরে যেতে হবে।" এই শীতের রাত্রিতে দুই মাইল যেতে হবে। আমি বল্‌লাম "কি ব্যাপার বলুন ত?" সুরেন্দ্রবাবু বল্‌লেন

তখন আর কি করি! সেই শীতের মধ্যে রাত এগারটায় যামিনী বাবুকে সঙ্গে নিয়ে অক্ষয় বাবুর বাড়ীতে গেলাম। আমাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে, পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ নয়টার মধ্যে আস্‌বেন ব'লে যামিনী বাবু তাঁর বাড়ীতে চ'লে গেলেন। ভদ্রলোকের কি কর্ম্মভোগ! পাঁচ দিন পূর্ব্বে মিরটে সম্মেলনে গিয়েছিলেন, আর আজ রাত প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে থেকে এখন দুই মাইলের উপর দূরে তাঁর গৃহে গমন করলেন। এই রকম অকৃত্রিম বন্ধু লাভই আমার জীবনের পরম সুখ।

আমি মনে করেছিলাম এত রাত্রিতে ভদ্রলোকের
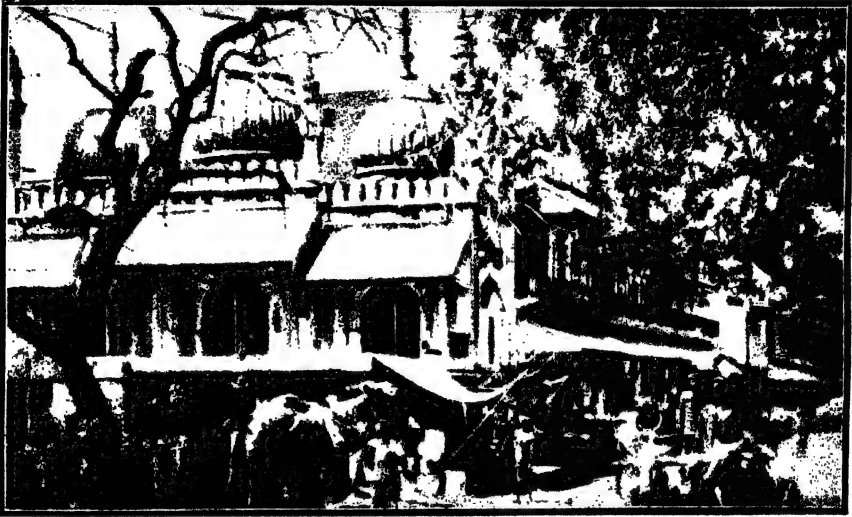
খুনা মস্‌জিদ

"এখানকার বহুদিনের অধিবাসী সর্ব্বপ্রধান উকিল অক্ষয় বসু মহাশয়ের বাড়ীতে আপনার বাসের ব্যবস্থা হয়েছে। তিনিও ষ্টেসনে গিয়েছিলেন, তার পর এখানেও এসেছিলেন। বুড়া মানুষ, বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না। বিশেষ তাঁর বাড়ীর সকলে পথের দিকে চেয়ে আছেন। সেই জন্য তিনি বাড়ী গিয়েছেন। তাঁর গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। যতক্ষণ আপনি না যাবেন, তিনি সপরিবারে বসে থাকবেন। আপনার জিনিসপত্রও সব সেখানে চ'লে গিয়েছে। আপনি আর বিলম্ব করবেন না। আমি কা'ল সকালে অক্ষয় বাবুর বাড়ী গিয়ে এখানকার প্রোগ্রাম্ ঠিক করব।"

বাড়ীতে গিয়ে হয় ত ডাকাডাকি করতে হবে; কিন্তু, আমি দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম যে, বৃদ্ধ অক্ষয় বাবু, তাঁর বড় ভাই চিরকুমার শান্ত বাবু, অক্ষয়বাবুর ছেলেমেয়েরা, এমন কি পাঁচ বছরের মেয়েটী পর্য্যন্ত তখনও আমার জন্য জেগে ব'সে আছেন। আমি উপস্থিত হ'তেই অক্ষয় বাবু এসে আমাকে একেবারে আলিঙ্গন-বদ্ধ করলেন—যেন আমি তাঁর কতকালের পরিচিত পরমাত্মীয়। তিনি আর আমাকে কোন কথা বল্‌তে দিলেন না। তাঁর বড় ভাই শান্ত বাবু এসে অভিবাদন করলেন। ছেলেমেয়েরা প্রণাম করল। অক্ষয় বাবু বল্‌লেন "এখন আর কথাবার্ত্তা

নয়, বাথরুমে সব ঠিক আছে ; হাত-মুখ ধুয়ে এসে আহার করুন ; কা'ল সকালে কথাবার্ত্তা হবে। ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত এখনও শুতে যায় নাই, আপনার প্রতীক্ষায় ব'সে রয়েছে।”

আমি আর কি করি, সামান্য দুই-একটা কথা বলেই রাত দুপুরে সান্ধ্য-কৃত্য শেষ করতে গেলাম। অর্থাৎ, কে একজন নাকি বলেছিল “দেখুন, প্রাতঃস্নান আমি রোজই করি, তা বেলা বারোটাই বাজুক আর একটাই বাজুক।” এও তাই হোলো।

অধিবাসী। তাঁর পিতামহ ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এখানে আসেন। সেই থেকেই তাঁদের পরিবার দিল্লী-প্রবাসী—এখন একরকম অধিবাসী। অক্ষয়বাবুর বড় ভাই শ্রীযুক্ত শান্তচন্দ্র বসু মহাশয় চিরকুমার। তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, উর্দ্দু, ফার্সী সাহিত্য নিয়েই যোগীর মত সুদীর্ঘ জীবন কাটাচ্ছেন। অক্ষয়বাবুর এখন তিনটী ছেলে, আর তিনটী মেয়ে বর্ত্তমান। বড় ছেলেটী এখান থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাশ করে বিলাতে গিয়েছেন ; সেখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন। আর সবাই এখানে। তিনি বল্লেন, বিধাতার কি বিধান,
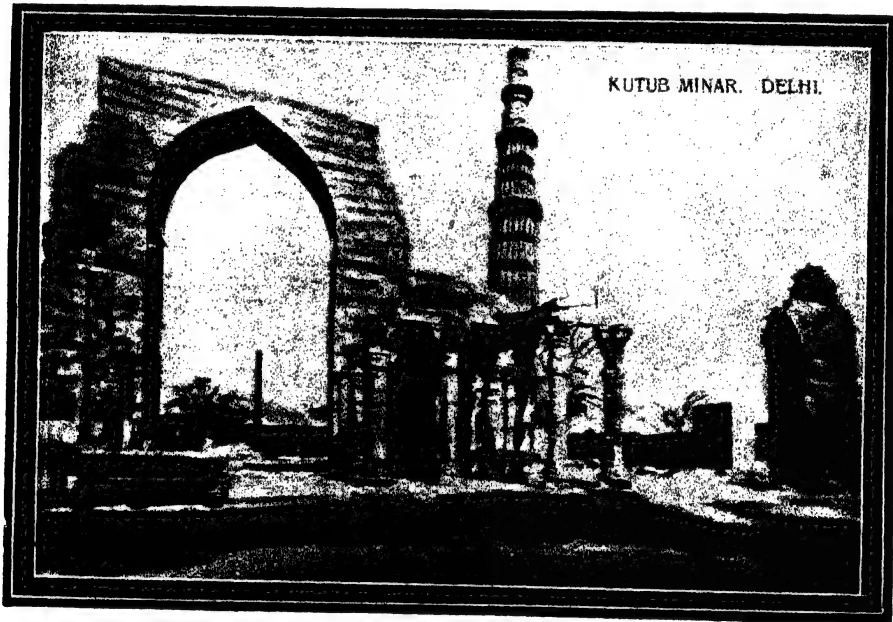
কুতব মিনার

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখি, আহার প্রস্তুত। আমার ত চক্ষুস্থির!—এই রাত দুপুরে রাজভোগের সম্মুখে উপবেশন। অক্ষয়বাবু আমার ইতস্ততঃ ভাব দেখে বল্লেন “আর দেরী নয়, ব'সে যান। আমার বাড়ীতে মেয়েরাই রান্না করেন।” সুতরাং, তাঁর গৃহিনীর সযত্ন-প্রস্তুত দ্রব্যাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য খাদ্য-দ্রব্যের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করা গেল। সেই সময় অক্ষয়বাবু যা বল্লেন, তার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, তাঁরা এখানকার অতি পুরাতন বাঙ্গালী

তাঁর একটীর পর একটী সন্তান মূক ও বধির হয়। দ্বিতীয় পুত্রকে দেখিয়ে বল্লেন যে, সেটী মূক ও বধির। তৃতীয় যেটী, সে মারা গিয়েছে। তার পরের মেয়েটী মূক ও বধির। এখন যে ছয়টী বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে একটী ছেলে ও একটী মেয়ে মূক ও বধির। যে মেয়েটী আমার খাদ্য পরিবেশন করছিল, সেইটী মূক ও বধির ; বয়স ষোল সতর বৎসর ; দেখ্‌তে পরমা সুন্দরী। অক্ষয় বাবু বল্লেন “এই মেয়েটী গৃহস্থালীর সব কাজ করে ; ভাল রাঁধতে পারে। আর এমন

সেবাপরায়ণা যে, দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।” আমিও তা বুঝতে পারলাম। সে আমার সম্মুখে ব'সে হাত-মুখ নেড়ে, এ-জিনিস ও-জিনিস দেখিয়ে দিয়ে আমায় আহারের জন্য জিদ্ করতে লাগল।

কোন রকমে আহার শেষ করেই একটী কক্ষে গিয়ে দেখি, শয্যা প্রস্তুত। সেই বোবা মেয়েটী এসে আমাকে শুইয়ে দিয়ে দু-খানি লেপ চাপা দিল। আমি ইলেক্‌ট্রিক আলোটা নিবিয়ে দেবার জন্য ইঙ্গিত করতে মেয়েটী হাত নেড়ে যা বল্‌ল, তাতে বোঝা গেল যে, নূতন স্থান, আলো

লাহোরী গেট

জ্বালা থাক্; যদি বাহিরে যেতে হয়, তা হ'লে অন্ধকারে অসুবিধা হবে। কি সুন্দর মেয়েটী, আর কি তার পরিচর্য্যার আগ্রহ। যাক্, ভারি আনন্দ বোধ হোলো। আমি মনে করেছিলাম, দিল্লীর সর্ব্বপ্রধান উকিল, সুতরাং বড় মানুষের বাড়ী,—আমাকে হয় ত কেমন জড়সড় হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু, এই সামান্য এক ঘণ্টায় দেখ্‌লাম, তাতে বুঝতে পারলাম, বড়মানুষ ও অর্থশালী হ'লে কি হয়, প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম থাক্‌লে কি হয়, অক্ষয় বাবুর গৃহে প্রকৃত লক্ষ্মীর আবাস। যে বড়মানুষের গৃহিণী দশটা চাকর-দাসী থাকতেও নিজে প্রতিদিন রান্না করে স্বামী-পুত্রের সুমুখে ভাতের থালা দেন,—যে বড়মানুষের আদরিণী কন্যারা নিজে রাঁধেন, পরিবেশন করেন, গৃহস্থালীর সব কাজ করেন,—সে যে লক্ষ্মীরই নিকেতন, তা কি আর বল্‌তে হবে। এ হেন অন্নপূর্ণার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে, অক্ষয় বাবু শান্ত বাবুর মত গৃহস্বামীর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে আমি সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করলাম।

পরদিন ২৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা আটটা বাজতে-না-বাজতেই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক বোধ হয় রাত্রিতে ভাল ক'রে ঘুমাতেও পারেন নাই। এইখানে তাঁর একটু পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করছি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ ক'রে শিক্ষিত ও অর্থশালী যুবকদের প্রধান আরাধ্য সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাতে গিয়েছিলেন। লেখার পরীক্ষা তাঁর ভালই হয়েছিল; কিন্তু ঘোড়ায় চড়ারও পরীক্ষা দিতে হয়।

তিনি সেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে গিয়ে একদিন ঘোড়া থেকে পড়ে ডান-পা খানি ভাঙ্গেন। ভাঙ্গা পা ত জোড়া লাগলই না, পা-খানির খানিকটা কেটে ফেল্‌তে হোলো। সুতরাং হাকিম হওয়া আর তাঁর অদৃষ্টে হোলো না। তিনি তার পর অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এম-এ উপাধি লাভ ক'রে এদেশে এসে দিল্লী হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হন। এখন সেই কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ হয়েছেন। হাকিম না হ'তে পেরে তিনি হয় ত খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন; কিন্তু, আমি ত বল্‌তে পারি, হাকিম হ'লে তিনি যা করতে পারতেন, তার থেকে অনেক বেশী এবং অধিক গৌরবের কাজ তিনি করছেন। দিল্লীর অধিবাসী ও প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সর্ব্ব-প্রকার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের যাঁহারা অগ্রণী, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। সকলেই তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। হাকিম হ'লে আমরা হয় ত ভয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে দূর থেকে তাঁকে সেলাম করতাম; কিন্তু এখন অধ্যাপক সেনকে আমরা বুকে টেনে নিচ্ছি। কোনটা ভাল—আই-সি-এস্, না সর্ব্বজন-প্রিয় অধ্যাপক?

যাক্ সে কথা। সুরেন্দ্রবাবু এসেই বল্‌লেন "আজকের প্রোগ্রাম ঠিক করে এসেছি। কা'ল যা করতে হবে তারও একটা কথা ঠিক হয়েছে। আজ বারোটার সময় আপনাকে আমরা রাইসিনাতে নূতন দিল্লী দেখাব। সেখান থেকে কুতবে যাব। তাতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। কা'ল সন্ধ্যা ছটার সময় এখানকার 'বেঙ্গলী ক্লাবে' আপনাকে একটা বক্তৃতা করতে হবে। আজই তার নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি করা হবে।" আমি বল্‌লাম "আজ যে ব্যবস্থা করেছেন, তা বেশ হয়েছে। কিন্তু, আমি দেখছি আপনি সিবিলিয়ান না হ'য়ে দেশের পরম উপকার করেছেন। আপনি আসামীর কথা না শুনেই

দিওয়ানী আম

ফাঁসীর হুকুম দিতেন নিশ্চয়।" সুরেন্দ্রবাবু হাসতে লাগলেন। গৃহস্বামী অক্ষয়বাবু বল্‌লেন—"এ হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল-আদালত নেই—এ Settled fact—অনড় ব্যবস্থা।" অত বড় উকিলের মন্তব্যের উপর আর জেরা চলে না। আমি বলিলাম "তথাস্তু! আপনারা যখন আমাকে হাস্যাস্পদ না করে ছাড়বেন না, তখন বাক্যব্যয় বৃথা।" সুরেন্দ্র বাবু আর বিলম্ব না ক'রে চ'লে গেলেন।

দশটার পরই যামিনী বাবু এলেন। আমিও এগারটার পরই স্নানাহার শেষ করে প্রস্তুত হয়ে ব'সে থাকলাম।

বারটা বাজবার অব্যবহিত পরেই দুইখানি মোটর এসে উপস্থিত হোলো—এলেন একেবারে ছয় মূর্ত্তি। এঁদের পরিচয় দিতে হচ্চে। সুরেন্দ্রবাবুর পরিচয় ত পূর্ব্বেই দিয়েছি। অবশিষ্ট পাঁচজনের মধ্যে একজনের নাম শ্রীমান্ দীপক সেন। ইনি দিল্লীর খ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের পুত্র। দ্বিতীয়, শ্রীমান্ করুণাশঙ্কর রায়। ইনি লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্লির বাঙ্গালা দেশের স্বরাজী প্রতিনিধি, দেশনায়ক শ্রীযুক্ত কুমুদশঙ্কর রায় মহাশয়ের পুত্র। তৃতীয়, শ্রীমান্ ধৃতীন্দ্রনাথ সেন। ইনি জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী

পুরানো কেল্লা

পরলোকগত সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়ের পৌত্র এবং জয়পুর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী পরলোকগত অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র। ইনি এখন জয়পুর রাজ্যের একাউন্টেণ্ট জেনারেল। চতুর্থ, শ্রীমান রাসবিহারী সেন। ইনি দিল্লীর প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার পরলোকগত হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র। ইনি পিতার ন্যায়ই পরোপকারী, মহাপ্রাণ এবং সকল সৎকার্য্যে উৎসাহী। পঞ্চম, বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার শ্রীমান্ হরিপ্রসন্ন সেন। ইনি পরলোকগত সংসার চন্দ্র সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। আর পূর্ব্বেই এসে ব'সে আছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার বন্ধুবর শ্রীমান্ যামিনীকান্ত সোম মহাশয়।

এর পরই যাত্রারম্ভ। একখানি মোটরে সুরেন্দ্র বাবু, যামিনী বাবু ও আমি আরোহী হ'লাম। সোফেয়ার নিয়ে আমরা চারজন। অপর গাড়ীতে পাঁচজন গেলেন, চালক হলেন ডাক্তার হরিপ্রসন্ন। এমন সব সহযাত্রীর সম্মেলন বিশেষ সৌভাগ্যের ফলই বল্‌তে হবে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ী দরিয়াগঞ্জে একেবারে সদর রাস্তার উপর। এই বাড়ীর অনতিদূরে একশত গজের পরই বাদশাহী আমলের সুপ্রসিদ্ধ দিল্লী গেট ও নগর-বেষ্টনী উচ্চ প্রাচীর এখনও বিদ্যমান। আমাদের দুইখানি মোটর একসঙ্গেই ছাড়ল; কিন্তু দিল্লী গেট পার হ'তে না হ'তেই অপর মোটরখানি আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলে গেল। আমাদের মোটরখানি অধ্যাপক সুরেন্দ্রবাবুর; সুতরাং তাহার গতিও অধ্যাপকের গতির মতই ধীর। অপরখানি ডাক্তারের গাড়ী, চালকও

ডাক্তার নিজে ; সুতরাং তার গতিও দ্রুত। তাঁদের গাড়ী দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম ক'রে গেল। দিল্লী গেট পার হ'য়ে একটু গেলেই ডাইনের দিকে জেলখানা। জেলখানা যে দেখ্‌বার মত, তা নয়; কিন্তু কয়েকদিন পূর্ব্বেই এই জেলের প্রাঙ্গণে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজির হত্যাকারী আবদুল রসিদের ফাঁসী হয়েছিল; এবং এই রাস্তার উপরই প্রায় পঞ্চাশহাজার মুসলমান একত্র হ'য়ে যে কাণ্ড করেছিল, সেই কথা মনে হয়েই আমরা জেলের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করলাম। যামিনীবাবু বল্লেন, অক্ষয় বাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়েই সেই বিপুল জনসঙ্ঘ চীৎকার করতে করতে জুম্মা মস্‌জিদে রসিদের মৃতদেহ নিয়ে গিয়েছিল। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা ভয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তার পর যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, সে কথা এত শীঘ্র কেউ ভুল্‌তে পারেন নাই। এই জন্যই আমি সভয়ে সেই জেলখানার দিকে চেয়েছিলাম।

জেলখানা অতিক্রম করে একটু গিয়েই বিশাল প্রান্তর। এইস্থান থেকেই নূতন দিল্লীর পত্তন আরম্ভ হয়েছে। এই প্রান্তরের মধ্য দিয়েই বড় বড় অনেকগুলি রাস্তা বের হয়ে প্রান্তরটিকে শতধা বিভক্ত করে ফেলেছে। দূরে দূরে দুইচারি খানি নূতন বাড়ী তৈরী হচ্চে। রাস্তার দুই পার্শ্বে সারি সারি ইলেক্‌ট্রিক আলোর স্তম্ভ আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে সুধু প্রান্তর—আমাদের সেই পুরাকালের কুরুক্ষেত্রের শ্মশান-ভূমি।

নূতন সহর এখান থেকে আরম্ভ হ'লেও আসল ইংরেজ-বাদশাহের দিল্লী কিন্তু প্রায় তিন মাইল দূরে। সরকার বাহাদুর নিশ্চয়ই স্থির করেছেন যে, রাইসিনা থেকে আরম্ভ করে এই পুরাতন দিল্লীর সীমা পর্য্যন্ত নূতন দিল্লী বিস্তৃত হবে। আমার কিন্তু এ সম্ভাবনায় বিশেষ সন্দেহ আছে; এবং দিল্লীর অনেকেই সেই রকম সন্দেহ পোষণ করে আসছেন। গবর্ণমেণ্টের হাতে গৌরীসেনের ভাণ্ডার আছে; সুতরাং তাঁরা বহু অট্টালিকা, অগণ্য রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করে নয়া দিল্লীকে ইন্দ্রপুরীতে পরিণত করতে পারেন; এবং তার চেষ্টাও হচ্চে। কিন্তু এই যোজন-ব্যাপী প্রান্তরে যে কেউ ঘর বেঁধে গৃহস্থালী পাতবেন, তা ত মনে হয় না। সরকারী আফিস সব রাইসিনাতে বস্‌বে; কর্ম্মচারীদের অসংখ্য বাসস্থান তৈরী হয়েছে, আরও হবে; অনেক রাজা রাজড়া 'নামকা ওয়াস্তে' এই প্রান্তরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করবেন; দু চারজন এখনই করেছেন ও করছেন। এ সবই হবে, কিন্তু এই বিশাল বিস্তৃত প্রান্তরে কিছুই জমাট বাঁধবে না, এ কথা বেশ বুঝতে পারা যায়। আর ইতিহাসও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। টোগলকবংশীয় সম্রাটগণ দিল্লী থেকে বারো মাইল দূরে বসিয়েছিলেন টোগলকাবাদ। আদিলশাহী বংশ তার থেকেও কিছু দূরে বসিয়েছিলেন আদিলাবাদ। দেখে ত এলাম তাদের ভগ্নস্তূপ; বড় বড় দুর্গের প্রাকার অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে; আর তার ভিতরে বাঘ-ভালুকের আবাসস্থান হয়েছে। কিন্তু পুরাতন দিল্লী যেমন ছিল, তেমনই আছে; বরঞ্চ তার শ্রী আরও বেড়েছে। ও সব হচ্চে বাদশাহী খেয়াল—স্বর্ণপ্রসূ ভারতের ধনরাশি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। সে খেলা পাঠানেরাও করেছেন, মোগলেরাও করেছেন; আর এখন দিল্লীর শাহানশাহ বাদশাহ ইংরেজও করছেন। এমন না করলে যে এ দেশে বাদশাহী সম্মান, দিল্লীর ইজ্জত রক্ষা হয় না। এই ইজ্জত রক্ষাই অভিব্যক্ত হয়েছে রাইসিনাতে নয়া দিল্লী প্রতিষ্ঠায়। এ একেবারে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের বাদশাহী!

ও-কথা আপাততঃ ধামা চাপা থাকুক,—আমরা প্রান্তরের বুক-চেরা সুপ্রশস্ত রাজপথ দিয়ে রাইসিনার দিকে ক্রমেই অগ্রসর হচ্চি। এখনও তেমনি—এখানে-সেখানে দুচারখানি বাড়ী তৈরী হয়েছে, কতক বা হচ্চে। আর তাদের চারিদিক ঘিরে রয়েছে সেই অবাধ মাঠ—দেখ্‌লে মনে হয় এরা সব একঘরে।

প্রায় মাইল-খানেক ঐ সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে, গিয়ে পড়্‌লাম একটা সরল সুদীর্ঘ রাজপথে। সম্মুখে চেয়ে দেখ্‌লাম, পথের যেন শেষ নেই। আর, এ পথটীও পরম সুন্দর। কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান রাজপথ চৌরঙ্গীর মত চারটে পথ পাশাপাশি রাখলেও বিস্তৃতিতে এ পথের সমান হয় না। অর্থাৎ, এইখান থেকেই আসল রাজধানী আরম্ভ হয়েছে। দুপাশে সারি সারি সুদৃশ্য অট্টালিকা; প্রত্যেক গৃহ-সংলগ্ন বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। সেখানে বাগান তৈরী হচ্চে। বুঝলাম, এখানকার জমির দর দশ-বারো হাজার টাকা কাঠা নয়। আর তাই যদি হোতো, তাতেই বা কি,—গৌরী সেনের অক্ষয় ভাণ্ডার আছে!

দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর বাড়ীগুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে

অগ্রসর হচ্চি, এমন সময় সহযাত্রী যামিনীবাবু বাঁয়ের দিকের একটা প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী দেখিয়ে বল্লেন "এইটে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড আফিস।" হাঁ, বাড়ী বটে। সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়ল, কলিকাতার ঐ রেকর্ড আফিসের কথা। আরে রামচন্দ্র, কলিকাতায় যখন রাজধানী ছিল, তখন একটা প্রকাণ্ড বদ্‌খত বাড়ীর এক কোণে এই পুরাতন বহুমূল্য সরকারী দলিলাদি ও কাগজপত্র বোঝাই করা ছিল। সে বাড়ীও যেমন গুদামের মত, আফিসও তেমনি অন্ধকার কোণে কোন রকমে আত্মরক্ষা ক'রে আস্‌ছিল। আর দেখ দেখি রেকর্ড আফিসের বাড়ী—একেবারে ইন্দ্রপুরী। এই ত চাই! অনেক কাগজপত্র এখানে আনা হয়েছে, এখনও কলিকাতার সেই গুদামে আরও কিছু আছে। সেগুলিও শীঘ্রই এখানে এসে উপস্থিত হবে, এবং এই নির্জ্জন গৃহে তাদের চির-সমাধি হবে; কারণ, এখানে এই এতদূরে কেউ আসবে না সেই সকল কাগজপত্র ঘেঁটে পুরাতন ইতিহাসের 'মালমস্‌লা' খুঁজে বা'র করবার জন্য! কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ সব নিরুপদ্রবে এখানে বস্তাবন্দী হয়ে থাকবে।

ডাইনে বাঁয়ে যে সব অট্টালিকা দেখ্‌ছি, সেগুলি দেব-নিকেতন। বড় বড় আমীর ওমরাহগণের বাসের জন্য সরকার বাহাদুর এই সব বাড়ী তৈরী করেছেন। শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষেরা এখানে খোস মেজাজে, বহাল তবিয়তে বাস করছেন। একটা বাড়ী দেখিয়ে যামিনী বাবু বল্লেন 'এইটাতে সার বি, এন, মিত্র থাকেন; আর ঐটাতে মিঃ এস, আর, দাস থাকেন।' তা ত বটেই! তাঁরা বাঙ্গালী হ'লেও যে সরকারী আমীর; ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, এখানে তাঁদের স্থান দিতেই হবে।

এখনও এখানে বেশ জাঁকিয়ে হাটবাজার বসে নাই। তার বিশেষ দরকারও এদিকটায় নেই; কারণ অদূরেই বড় বড় সাহেবী হোটেল নির্ম্মিত হোয়েচে; বড় বড় সাহেবী দোকান বসেছে। হোটেল-গুলিতে অনেক ভদ্রলোক থাকতে পারেন, অনেক রাজা-মহারাজারও স্থান হোতে পারে। নানা স্থান থেকে যে সব কাউন্সিলের মেম্বর আসেন, তাঁদের অনেকেই এই সকল হোটেলে বাস করেন, কেহ কেহ বা পুরাতন দিল্লীতেও থাকেন।

আমাদের মোটর একেবারে সেক্রেটেরিয়েটের অর্থাৎ বড় দপ্তরখানার সম্মুখে গিয়ে থাম্‌লো। আমাদের আগে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সেখানে আমাদের জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করেই দপ্তরখানা দেখতে গিয়েছেন। সঙ্গী সুরেন্দ্রবাবু বল্লেন, তিনি আর ভিতরে যাবেন না, যামিনাবাবুই আমার সঙ্গী হবেন; তিনি আমাদের অপেক্ষায় মোটরে বসে থাক্‌বেন।

হাঁ, প্রাসাদ বটে! এমন না হোলে বড়লাটের—দিল্লীর বাদশাহের দপ্তরখানা মানাবে কেন? সাধে কি কলি-কাতাকে বাতিল ক'রে এখানে রাজধানী স্থাপন করা হয়েছে। কলিকাতায় যখন রাজধানী ছিল, তখন যে সব বাড়ীতে দপ্তরখানা ছিল, এর তুলনায় সেগুলি গোয়াল-ঘর বল্লেই হয়। একে দপ্তরখানা বল্লে অপমান করা হয়—এ সুবিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদ। বড়লাটের দপ্তরখানার দুইটা বাড়ী, বল্‌তে গেলে, ছোটখাট দুখানি গ্রাম জুড়ে বসে আছে। আর আকাশ-পথে মাথা তুলে, চূড়া গম্বুজ উঁচু ক'রে নক্ষত্রলোক স্পর্শ করবার স্পর্দ্ধা করছে। আমাদের কলিকাতার লালদীঘির ধারের বাঙ্গালা লাটের দপ্তরখানার মত দশ-পনরটাকে এনে এই দপ্তরখানার গর্ভে নিশ্চিহ্নভাবে লুকিয়ে রাখা যায়। এমন প্রকাণ্ড-কায় দুইটা বাড়ীতেও না কি সব আফিসের হাত-পা মেলে বস্‌বার স্থান হচ্চে না; তাই, কয়েকটা দপ্তর এখনও পুরাতন দিল্লীতে রয়েছে; শীঘ্রই তাদের জন্য কুটীর নির্ম্মিত হবে। যামিনীবাবু এই নয়া দিল্লীতেই পব্‌লিক ওয়ার্কশ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন; সুতরাং এখানকার অনেক পদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সহিত তাঁর পরিচয় আছে। শুনলাম, এখন বড়দিন উপলক্ষে ছুটী থাক্‌লেও, কতকগুলি আফিসের কর্ম্মচারীদের হাজিরা দিতে হচ্চে—পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী, কেরাণীর আবার বড়দিন! যারা বড়, তাদেরই বড়দিন; আর যারা বড় দীন, তাদের সব দিনই ছোটদিন। তাই, আমরা দপ্তর-খানাগুলো খোলা দেখতে পেয়েছিলাম।

প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে গিয়েই দেখ্‌লাম একটা প্রাঙ্গণ। যামিনীবাবু বল্‌লেন, এ বাড়ীতে এমন অনেক প্রাঙ্গণ আছে। আর সেই সব প্রাঙ্গণ বেষ্টন করে চক-মিলানো চার-পাঁচতলা ঘর। এই একের নম্বর দপ্তরখানায় অসংখ্য আফিস। আমরা বৈদ্যুতিক অধিরোহণীতে চড়ে দ্বিতলে গেলাম। সেখানে ছয় সাত মহল দেখে, আবার লিফ্‌টে চ'ড়ে তে-মহলায় গেলাম। সেখানেও অমনি। এত আফিসের নাম কি মনে থাকে? অধিকাংশ আফিসেই দেখ্‌লাম, দুচারজন

দিশী কেরাণী কাজ করছেন। দ্বিতল, ত্রিতল, চৌতল—সেই একই দৃশ্য—সুধু খাতা, ফাইল, দোয়াত কলম, উর্দীপরা চাপরাসি, আর টাই-কলার-কোট-পরিহিত কেরাণীর দল। এই যে এত বড় প্রাসাদের পাঁচ-সাতটা মহল দেখলাম, প্রত্যেক মহলে নিম্নতল থেকে সর্ব্বোচ্চ তল পর্য্যন্ত ঘুরলাম, তিন-চারশ আফিস-ঘর দেখলাম, এর মধ্যে কোনটাতেই একখানি শ্বেত-বদন দেখ্‌বার সৌভাগ্য হোলো না। সাহেবেরা যে সবাই বড়দিন করছেন; তাঁরা কি এ সময় আফিস করতে পারেন।

সর্ব্বোচ্চ তল দেখা হোলে যামিনীবাবু বল্লেন "দাদা, আর কেন? ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এইবার নামা যাক্; আরও অনেক দেখ্‌বার আছে।" আমি বল্লাম "ছাতে যাওয়াটা আর বাকী থাকে কেন?" যামিনীবাবু বল্লেন "সিঁড়ি ভাঙ্গতে হবে যে, লিফ্‌ট নেই।" "এই ত কথা" ব'লে আমি ছাতে যাবার সিঁড়িতে পা দিলাম। যামিনীবাবু কি করেন, অগত্যা আমার অনুগমন করতে বাধ্য হলেন। সিঁড়িও বড় কম নয়,—অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গে একেবারে ছাতে উঠে একটা প্রকাণ্ড গম্বুজের ছায়ায় বসা গেল। সেখান থেকে একেবারে চারিদিকের সমস্ত দেখা যেতে লাগ্‌ল। পশ্চাতেই দুইয়ের নম্বর সেক্রেটেরিয়েট। যামিনীবাবু বল্লেন, সেটীও ঠিক এইটীর মত—একটু ছোট-বড় নয়—একই নক্‌সায় তৈরী, আর তাতেও এই একই দৃশ্য। খানিকটা দূরে অসংখ্য ছোট ছোট নূতন বাড়ী দেখ্‌লাম। এত উচ্চ থেকে সেগুলি খেলা-ঘর ব'লে মনে হোতে লাগ্‌ল। সেইটে হচ্চে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের সহর—একেবারে গায়ে-গায়ে বসতি। কম হোলেও চার পাঁচশ বাড়ী ব'লে মনে হোলো। শুন্‌লাম, সেখানে যথারীতি বাজার বসে, চা'ল-ডালের দোকান হয়েছে। বহুদূরে কুতব মিনারের উচ্চ চূড়া দেখা গেল। অপর দিকে পুরাতন দিল্লী, আর একদিকে ইন্দ্রপ্রস্থ। পুরাতন কেল্লা—এখনকার কেল্লা অর্থাৎ মোগল আমলের কেল্লা কিন্তু দিল্লী সিটীতে, রেল ষ্টেসনের কাছে। শুন্‌লাম, এই নয়া দিল্লীর কল্যাণে এ যাবৎ দশ-বারো কোটী টাকা লেগে গিয়েছে। এখনও যা বাকী আছে তা শেষ করতে বহু অর্থের প্রয়োজন; অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা কুড়ি কোটী টাকা এর পেছনে না লাগিয়ে স্বর্গে স্বধামে যাচ্ছেন না। এ আর এত বেশী কি? সেকালের দিল্লীর বাদশাহদের খেয়াল মিটাবার জন্য এমন অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছিল। তার তুলনায় বর্ত্তমান বাদশাহদের এ কুড়ি কোটী আর এমন কি—এ দুকুড়ি দশটাকা মাত্র। আমরা অম্লানবদনে যখন দশবারো কোটী দিয়েছি, তখন না হয় কাঁথা কাপড় বেচে আর দশকোটীও দেব—ব্যস্!

এইবার দপ্তরখানা ত্যাগ। সিঁড়ি কয়েকটি নেমে লিফ্‌টে আরোহণ আর আধ মিনিটের মধ্যে ভূমি দাখিল। দুইয়ের নম্বর দপ্তরখানা যখন এইটারই যমজ সহোদর, তখন আর সেখানে গিয়ে কাজ নেই—এই একটা দেখেই বহুত খুস্ হওয়া গেছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে দেখ্‌তে গেলাম কাউন্সিল-ভবন। এটী সেক্রেটেরিয়েটের কাছে। বাড়ীটি গোলাকার—কমলালেবুর মত উত্তর-দক্ষিণে চাপা নহে—সম্পূর্ণ গোল। উচ্চ খিলানের উপর চারিদিকে টানা বারান্দাওয়ালা প্রকাণ্ড ভবন। প্রবেশদ্বারের কাছে গিয়ে দেখি দুয়ার বন্ধ; তাহার সম্মুখে একজন প্রহরী দণ্ডায়মান। আমরা অগ্রসর হতেই প্রহরী দেওয়াল-সংলগ্ন একখানি নোটীসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পড়ে দেখ্‌লাম যে, বাড়ীর অভ্যন্তর-ভাগ মেরামত হচ্চে; তাই প্রবেশ নিষেধ। তবে প্রধান এঞ্জিনিয়ারের নিকট থেকে অনুমতি-পত্র নিয়ে এলে ভিতরে যাওয়া যায়। প্রধান এঞ্জিনিয়ার বড়দিনের ছুটীতে গিয়েছেন; সুতরাং প্রবেশপত্র কোথায় পাব? আমার আশ্চর্য্য বোধ হোলো যে, এই কয়েকমাস আগে এই বাড়ীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়েছে; দুই একবার মাত্র কাউন্সিলের অধিবেশন হয়েছে—আর এরই মধ্যে সংস্কারের প্রয়োজন হোলো। সুরেন্দ্রবাবু বল্লেন, বিস্ময়ের কোন কারণ নেই, হালের বিলাতী বিশ্বকর্ম্মাদের ইহাই বিশেষত্ব। যাক্, কাউন্সিল হাউস্‌কে বাহির থেকে সেলাম ক'রেই বিদায় গ্রহণ করতে হোলো। আহা, আশী লক্ষ টাকার বাড়ীর ভিতরটা দেখা হোলো না!

তখন আর কালবিলম্ব না করে লাট-সাহেবের বাড়ী দেখ্‌তে গেলাম। বাড়ী এখনও তৈরী শেষ হয় নাই; লাট-সাহেব এখনও পুরাতন দিল্লীর সিবিল লাইনে সার্কিট-হাউসে বাস করেছেন। যে ভাবে কাজ চল্‌ছে, আর যে বিপুল আয়োজন, তাতে বর্ত্তমান বড় লাট বাহাদুরকে আর এ গৃহ-প্রবেশ করতে হবে না—তার আগেই তিনি

দেশে ফিরে যাবেন। লাট-সাহেবের প্রাসাদের সিংহদ্বার এখনও তৈরী হয় নাই—সবে বনিয়াদ হয়েছে। এ সিংহদ্বার তৈরীর সমস্ত ব্যয়ভার জয়পুরের মহারাজা বহন করবেন শুনলাম। আর এ সিংহদ্বার যেমন-তেমন হবে না; এর দুপাশে যে দুটো স্তম্ভ নির্ম্মিত হবে, তা-না কি দূরবর্ত্তী কুতব মিনারের সঙ্গে পাল্লা দেবে। লাট-প্রাসাদে গিয়ে দেখি, অনেক লোকজন মিস্ত্রী মজুর কাজ করছে। যামিনীবাবু এই প্রাসাদটি ভাল ক'রে দেখবার জন্য একটী ঐ দেশী ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এলেন। ইনি যামিনী-বাবুর বন্ধু এবং এই প্রাসাদ-নির্ম্মাণের একজন সুপারিন্টেন্-ডেণ্ট। তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমে দ্বিতলের মধ্যে একটা স্থানে নিয়ে গেলেন। সেইটী হবে দরবার-গৃহ। প্রকাণ্ড হল; এখনও উপরটা খোলা; কারণ, এই এতবড় হলের মস্তক আচ্ছাদিত করা হবে একটা বিশাল গম্বুজ দিয়ে। সেটী এখনও তৈরী হয় নাই। তার পর তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে দেখালেন, এইটী হবে সকালবেলা চা-খাবার ঘর, এইটী হবে সকালে বস্‌বার ঘর, এইটী হবে দ্বিপ্রহরে আরাম-বিশ্রামের ঘর, এইটী হবে নাচঘর, এইটী হবে প্রকাণ্ড ভোজের হল, এইটী লাট-মহিষীর পোষাকঘর, এইটী তাঁর শয়ন-কক্ষ। এমনি ক'রে প্রায় কুড়ি-বাইশটা কক্ষ দেখালেন,—স্নানের ঘর, পাইখানা প্রভৃতিও বাদ গেল না। তারপর আর একটা মহলে নিয়ে গিয়ে অনুচর পার্শ্বচরদের বৃহৎ ব্যাপার দেখালে; চাকরবাকরেরা নিম্নতলে থাক্‌বে। হাতিশালা, ঘোড়াশালা, মোটরশালা তৈরী হ'তে এখনও বাকী; দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড বাগান তৈরী হবে, তার আয়োজন হচ্চে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই গরিবখানার জন্য কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে? তিনি বল্লেন, দুই কোটী টাকা। তার মধ্যে 'এক ক্রোড় আশী লাখ খরচ হো-চুকা, আভি ত বহুত কাম বাকী হ্যায়।" অর্থাৎ দুই কোটী টাকাতেও কুলাবে না; হয় ত আরও পঁচিশ ত্রিশ লাখ লাগ্‌বে। আমি বল্‌লাম "বাবুজি, যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন! পাঁচ ক্রোর রূপেয়া ভি ইয়ে প্যালেস কি লিয়ে দেউঙ্গা।" ভদ্রলোক হাস্‌তে লাগ্‌লেন। আর না—রাইসিনা দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি; এখন এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি।

নীচে এসে দেখি, আমাদের অপর গাড়ীর সঙ্গীরা এসে জুটেছেন। ইচ্ছা ছিল যে, দেশীয় ভদ্রলোকদের জন্য অদূরে যে সহর বসানো হয়েছে, সেটা দেখে আসি; কিন্তু সঙ্গীরা বল্‌লেন, দেরী হয়ে যাবে—এখনও কুতব দেখা বাকী, পথও অনেকখানি। সুতরাং সে অভিপ্রায় ত্যাগ করতে হোলো। রাইসিনার সুপ্রশস্ত পথ দিয়ে আমাদের দুইখানি মোটর একসঙ্গে কুতবের দিকে দৌড়িল।

রাস্তায় যেতে যেতে ভাবছিলাম, এই যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাজধানীর পত্তন হয়েছে, একে কি জনপূর্ণ মহানগরীতে পরিণত করবার কোন উপায়ই নেই? হঠাৎ দিল্লীর ইতিহাসের একটা ঘটনা মনে পড়ল। তখন পাঠান টোগলক বংশ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। পিতৃহন্তা জুনা খাঁ তখন মহম্মদ টোগলক নাম ধারণ করে দিল্লীর সম্রাট হয়েছেন। তাঁর মত খেয়ালী সম্রাট বোধ হয় আর কেউ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন নাই। তাঁর একবার খেয়াল হোল যে, দিল্লীতে রাজধানী রাখা হবে না—রাজধানী দেবগড়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি হুকুম দিলেন, দিল্লীর অধিবাসী সবাইকে দেবগড়ে যেতে হবে; যে যাবে না, তার কঠোর দণ্ড হবে। প্রাণের ভয়ে তখন দিল্লীর অধিবাসীরা নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করে দেবগড়ে চ'লে গেল। সত্য মিথ্যা জানিনে, গল্প শুন্‌তে পাওয়া যায় যে, দিল্লীর সব লোক চ'লে গিয়েছিল, ছিল মাত্র এক দরিদ্র বৃদ্ধ অন্ধ। কথাটা সম্রাটের কর্ণগোচর হ'লে তিনি সেই অন্ধকে জোর ক'রে নিয়ে আসবার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন। অন্ধকে লোকেরা টেনে আন্‌তে আন্‌তে পথের মধ্যেই তার দেবলোক-প্রাপ্তি হোলো, তার মৃতদেহ দেবগড়ে গেল। সে দিন কুতবে যেতে যেতে এই কথাটাই আমার মনে হয়েছিল। কেন সেই পুরাতন ইতিহাসের কথা হঠাৎ মনে হোলো, তার কোন কারণ নির্দ্দেশ করতে পারব না।

ও-সব বাজে কথা এখন থাকুক, অপরাহ্ণ প্রায় চারটার সময় আমরা কুতবে উপস্থিত হ'লাম। সেই সময় একজন প্রস্তাব করলেন যে, কুতবের কাছে যাওয়ার পূর্ব্বে উদর দেবকে কিঞ্চিৎ শান্ত করা প্রয়োজন। তখন আমরা, কুতবের বাইরেই যে ভোজনালয় (Restaurant) ছিল, সেখানে গেলাম; সুরেন্দ্রবাবু খানসামা বাবুর্চ্চিদের ডেকে খানার অর্ডার দিলেন। দশ মিনিটের মধ্যেই নানারকম সুখাদ্য এসে উপস্থিত হোলো। আমি ও-রসে বঞ্চিত; আমি দুই

পেয়ালা চা পান করেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই-ই নিবৃত্ত করলাম। সঙ্গীদের ভোজন-পর্ব্ব শেষ হ'তে প্রায় আধঘণ্টা গেল। তার পর কুতব দেখতে যাওয়া গেল। কুতবমিনার, রাজা চন্দ্র সেন (কোন্ চন্দ্র সেন তা জানিনে) প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত লৌহদণ্ড, ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুর পরিচয় আর দিতে হবে না; অনেকে অনেকবার অনেক রকম করে তার পরিচয় দিয়েছেন। বহুদিন পূর্ব্বে যখন কুতবে গিয়েছিলাম, তখন ঐ স্থানটা এমন পরিচ্ছন্ন ছিল না, এমন সুন্দর বাগান ও পথও তখন হয় নাই। লর্ড কার্জ্জনই এ সব করে গিয়েছেন। এবার আমাদের যাওয়ার কয়েকদিন আগে একজন সাহেব কুতবের সর্ব্বোচ্চ বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। আমরা কুতবের দিকে চেয়ে সেই আত্মহত্যার দৃশ্যই যেন সম্মুখে দেখতে পেলাম। কুতবের বাইরে সামান্য একটু দূরে একটা দেবীর মন্দির আছে। আমি আর যামিনীবাবু নগদ এক-আনি প্রণামী দিয়ে এবং দেবীকে প্রণাম করে, যেখানে আমাদের মোটর ছিল, সেখানে এলাম। আর সকলেই সেখানে জমায়েৎ হয়ে আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আমরা তাড়াতাড়ি কুতব ত্যাগ করলাম। দরিয়াগঞ্জে আমাদের বাসায় যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত হয়েছে। আমাদের বাসাতে ব'সেই সুরেন্দ্রবাবু পরদিনের ভ্রমণ ও কার্য্য-বিবরণ স্থির করে ফেললেন। এই স্থির হোলো যে, পরদিন ঠিক এগারটার সময় তিনি আর যামিনীবাবু আস্‌বেন এবং আমাকে নিয়ে এগার-বার মাইল দূরে টোগলকাবাদ ও আদিলাবাদ যাবেন। সেখান থেকে ফিরবার পথে ওকলা 'এনিকট' দেখে ইন্দ্রপ্রস্থে যেতে হবে। সেখান থেকে ঠিক সাড়ে তিনটায় বাসায় ফিরতে হবে। সেখানে আমাকে রেখে সুরেন্দ্রবাবু ও যামিনী বাবু সুরেন্দ্রবাবুর বাসায় যাবেন। এদিকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমাকে হাতমুখ ধুয়ে প্রস্তুত হতে হবে। চারটা বাজবার দশমিনিট থাকতে সুরেন্দ্রবাবুর মোটর আমাকে নিতে আস্‌বে। চারটার সময় আমাকে সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে জলযোগে আসীন হ'তে হবে। বিলম্ব হ'লে চল্‌বে না; কারণ সুরেন্দ্রবাবু আমাকে উপলক্ষ করে আরও কয়েকজন বাঙ্গালী বন্ধুকে এই জলযোগে যোগ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁরা ঠিক চারটায় আস্‌বেন। সেখানে জলযোগ শেষ ক'রে বেঙ্গলী ক্লবে যেতে হবে; সেখানে সন্ধ্যা ছটার সময় আমাকে বক্তৃতা করতে হবে। তারপর ছুটী। সুতরাং পরদিন শুক্রবার একেবারে ঘড়ি ধ'রে চলাফেরা করতে হবে। এই ব্যবস্থা ঠিক করে সুরেন্দ্রবাবু ও তাঁর সঙ্গীরা চ'লে গেলেন; আমি তখন অক্ষয়বাবুর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দের হাট বসালাম। তারপর রাত দশটায় রাজভোগ গ্রহণ করে বিশ্রাম।

পরদিন ৩০শে ডিসেম্বর শুক্রবার প্রাতঃকালে উঠেই অক্ষয়বাবু বল্লেন "আজ সেন সাহেব সাড়ে দশটার মধ্যেই এসে পড়বেন, এগারটা পর্য্যন্তও অপেক্ষা করতে হবে না। আপনাকে দশটার সময়ই প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। বাড়ীর মধ্যেও সে কথা ব'লে দিয়েছি।"

সত্যই তাই হোলো। আমার প্রস্তুত হওয়ার আগেই সেন সাহেব এসে উপস্থিত। তখন তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ ক'রে যাত্রা করা গেল। সেন সাহেব বা যামিনী বাবু কেহই ইতঃপূর্ব্বে টোগলকাবাদ বা আদিলাবাদে যান নাই, মোটরচালকও সে পথ চেনে না। সুতরাং যেখানে দুই কি তিন রাস্তার সঙ্গমস্থল, সেখানেই গাড়ী থামিয়ে পথচল্‌তি লোক বা পথিপার্শ্বস্থ কোন বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে আমাদের অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। পথের মধ্যে একটা বার-তেরো বছরের ঐ দেশী গরিবের ছেলেকে গাড়ীতে তুলে নেওয়া গেল। সে বলেছিল, তার ঐ অঞ্চলেই বাড়ী, সে সব চেনে। পথ ভুল না হলে ধ্বংসস্তূপ দেখেই আমরা টোগলকাবাদ চিনে নিতে পারতাম। দিল্লী থেকে টোগলকাবাদ এগার মাইল দূরে; আদিলাবাদ সেখান থেকে আরও এক মাইল।

বালকটীর নির্দ্দেশ অনুসারে যেখানে গিয়ে আমাদের মোটর থামল, সেখানে রাস্তার বামপার্শ্বে একটা পাথর দিয়ে বাঁধানো সেতু। বোধ হোলো পূর্ব্বে এখানে পরিখা ছিল; তাই এই সেতু তৈরী করতে হয়েছিল। রাস্তার ডানদিকেই দুর্গের ভগ্ন প্রাচীর। আমরা প্রথমে সেই সেতু পার হয়ে অল্প কয়েকটা সিঁড়ি উঠেই একটা দুয়ারের সম্মুখে গেলাম। সেই দুয়ার অতিক্রম করে চারিদিকে দেওয়াল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহবেষ্টিত একটা চত্বরে উপস্থিত হলাম। এই চত্বরের মাঝখানে মহম্মদ টোগলক ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সমাধি-মন্দির। এইটাই এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

সমাধি-মন্দিরটি বেশ উঁচু; তাহার মধ্যে সম্রাট ও সম্রাট-মহিষীর কবর শ্বেত-প্রস্তরাচ্ছাদিত। এত কাল চ'লে গিয়েছে, রাস্তার ওপারের দুর্গ ও সম্রাটদিগের বাসভবন ভগ্ন স্তূপে পরিণত হয়েছে, জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে, একখানি অট্টালিকাও দাঁড়িয়ে নেই; কিন্তু এপাশের এই সমাধি-মন্দিরটি কাল-বিজয়ী হয়ে দণ্ডায়মান আছে। তার একখানি পাথরও স্থানচ্যুত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই—যেমন ছিল, তেমনিই আছে। আমরা একটা ছোট-খাট সিঁড়ি দিয়ে এই সমাধি-মন্দিরের বেষ্টনী-দেওয়ালের উপর গেলাম। সেখান থেকে এক মাইল দূরে আদিলাবাদের ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে পাওয়া গেল। সঙ্গী ছেলেটী বল্‌ল, ওখানে যেতে হলে মাঠ দিয়ে যেতে হবে, মোটর চল্‌বার পথ নেই; এবং আদিলাবাদে একটা অট্টালিকাও দাঁড়িয়ে নেই;—এখান থেকে যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে, সেখানে গিয়েও তার বেশী কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না। সুতরাং দূর থেকে আদিলাবাদকে অভিবাদন করে আমরা রাস্তায় এলাম। সঙ্গের ছেলেটি বল্‌ল, দুর্গে উঠ্‌বার ভাল পথ নেই, ভাঙ্গাচোরা পাথরের উপর দিয়ে যেতে হবে; একটু উঠ্‌লেই জঙ্গল আর কাঁটাবন। তার মধ্যে বাঘ ও সাপের আড্ডা; ও-দিকে আর গিয়ে কাজ নেই। আমার বড়ই আগ্রহ হোলো ঐ প্রস্তর-স্তূপের অন্তরালে কি আছে, একবার দেখে আসি। যামিনী বাবু বল্লেন "দেখ্‌ছেন ত, প্রাচীর কত উঁচু; তার পর কাঁটা-বন ভেঙ্গে পাথরের উপর দিয়ে উঠ্‌তে হবে; সাপ বাঘও আছে। আপনি বুড়া মানুষ, এত উঁচুতে উঠ্‌তেই পারবেন না; পথের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।" তাঁর কথা শুনে আমার জিদ্‌ যেন বেড়ে গেল। আমি বল্লাম "আপনারা দুজনেই মোটরে বসে থাকুন; আমি একটু দেখে আসি।" যামিনীবাবু আর কি করেন; আমার সঙ্গী হ'লেন। সেই ছেলেটীকে অগ্রবর্ত্তী করে, কাঁটাবন ভেঙ্গে, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর দিয়ে মহা উল্লাসে সে চড়াই উঠ্‌তে লাগলাম। খানিকটা উঠে একটা সুড়ঙ্গ দেখ্‌তে পেলাম। সঙ্গের ছেলেটি বল্‌ল, এই সুড়ঙ্গ মাটীর নীচে দিয়ে আদিলাবাদ পর্য্যন্ত গিয়েছে; আর এর মধ্যে এখন বড় বড় সাপের আড্ডা। সুতরাং সে সুড়ঙ্গ-পথে বিদ্যার সন্ধানে যেতে সাহসে কুলাইল না। আবার জঙ্গল ও পাথররাশি অতিক্রম করে একেবারে সেই দুর্গের ধ্বংসস্তূপের উপরে উঠে গেলাম। যামিনীবাবু কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেখানে একখণ্ড পাথরের উপর মিনিট-দশেক বিশ্রাম করেই নামা সুরু করলাম। ওঠাতেই কষ্ট আছে, কিন্তু নেমে আসা ততোধিক কষ্টকর ও বিপজ্জনক—একটু পা হড়কালেই একেবারে কোথায় যে গিয়ে পড়তে হবে, তার ঠিকানা নেই। খুব সন্তর্পণে নীচে এসে ছেলেটীকে কিছু পয়সা দিয়ে আমরা টোগলকাবাদ ত্যাগ করলাম। ফিরবার পথে কিছুদূর আসবার পরই দক্ষিণে ওক্‌লা এনিকটের পথ। আমরা সেই পথ দিয়ে একেবারে 'এনিকটে' পৌঁছিলাম। এই এনিকট দিয়েই আগ্রা ক্যানেলের জল যোগানো হয়। যমুনা নদীকে বেঁধে ফেলে তার জলরাশিকে এই এনিকটে প্রবেশ করানো হয়েছে। যখন খালে জলের প্রয়োজন হয় না, তখন যমুনাকে বইতে দেওয়া হয় এবং আর একটা প্রণালী কেটে যমুনাকে প্রবাহিত করা হয়েছে। যমুনার এই দশা দেখে আমার সেই সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ গানটী মনে হোলো,—

যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী!
ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে বিকাতো নীলকান্তমণি।

সে যমুনাও নেই, সে নীলকান্তমণিও নেই, কিন্তু এই ওকলা এনিকটে যমুনার তীরে এখনও রূপের হাট বসে; দিল্লীর সকল শ্রেণীর ভদ্রলোকেরাই সপরিবারে ছুটীর দিন এখানে বন-ভোজন করতে আসেন। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিনও বড়দিনের ছুটী। তাই, দেখ্‌লাম, এনিকটের দুই পার্শ্বে যমুনাতীরে বৃক্ষরাজির ছায়াতলে অনেকে বনভোজন আরম্ভ করেছেন। মহিলাদের অবাধ বিচরণে, বালকবালিকা-দিগের কলহাস্যে, বাবুদের হারমোনিয়ামের ঝঙ্কারে যমুনা-তীর মুখর হয়েছে—সত্যসত্যই রূপের হাট বসে গিয়েছে; তবে নীলকান্তমণির বেচাকেনা হচ্ছিল কি না, তা আমরা তিনটী গণ্য মানুষ কি করে বলব। স্থানটী অতি সুন্দর! সেন সাহেব বল্লেন, তাঁরা অনেক সময় এখানে এসে বন ভোজন করেন, বাড়ীর মেয়েরা দিল্লীর বদ্ধগৃহ থেকে মুক্তি লাভ করে এখানে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যমুনার লহরীলীলা বেশীক্ষণ উপভোগ করবার উপায় ছিল না—তখন দুইটা বেজেছে। পথে ইন্দ্রপ্রস্থ আছেন, সেখানে যেতে হবে।

গাড়ী ছুটিয়ে একেবারে ইন্দ্রপ্রস্থের দুর্গদ্বারে আসা

গেল। তার পর দুর্গদ্বার পার হয়ে প্রথমেই সের শাহের প্রকাণ্ড ভবন দেখ্‌তে গেলাম। এতকাল চলে গিয়েছে—এখনও এ প্রাসাদ একেবারে নূতন রয়েছে। তার পরই, যে পুস্তকালয়ের অপ্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বাদশাহ হুমায়ুন পা-পিছলে প'ড়ে যান এবং সেই আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়, সেই ছোট বাড়ীটায় গেলাম। এই সিঁড়ি দিয়ে উপরের ঘরেও গেলাম। আমাদের কিন্তু পদস্খলন হয় নি। তারপরই অনতিদূরে কুন্তীদেবীর মন্দির দেখ্‌তে গেলাম। মন্দিরটী ছোট, কুন্তীদেবী আরও ছোট। পঞ্চ-পাণ্ডবের মাতা এখন দিল্লীর কোন্‌ এক বেণিয়ার প্রদত্ত দশ বারটী টাকায় ছোলা ও বাতাসা ভোগ খেয়ে এখনও রয়েছেন। ইন্দ্রপ্রস্থের বিবরণ অনেকেই জানেন, সে স্থান অনেকেই দেখেছেন; তাই আর সে সব কথার উল্লেখ করলাম না। তিনটে বেজে গিয়েছে দেখে আমরা ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করে বাসায় ফিরে এলাম। ঠিক চারটের সময় পূর্ব্ব ব্যবস্থামত সুরেন্দ্র বাবু বা সেন সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। সেখানে যা'-যোগ হোলো, তাকে জলযোগ কিছুতেই বলা যায় না;—যে জলযোগে এক ঘণ্টার অধিক সময় লেগেছিল, তাকে পূর্ণযোগ বল্‌লেও সব কথা বলা হয় না। এই বিরাট ভোজের পর ছটার সময় বেঙ্গলী ক্লবে যা বক্তৃতা করেছিলাম, তার উল্লেখ না করাই ভাল। আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র বসু বি-এ, এলএল-বি মহাশয় তাঁর গৃহের অতিথির মান রাখবার জন্য ধন্যবাদ প্রদান উপলক্ষে যা' বলেছিলেন, তাতে তাঁর বন্ধু-প্রীতি-অন্ধতারই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এইখানেই সেদিনের কার্য্য শেষ।

পরদিন ৩১শে জানুয়ারী শনিবার, ইংরাজী বৎসরের শেষ দিনে রাত্রি নয়টার গাড়ীতে আমাকে দিল্লী ত্যাগ করতে হবে। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। সেই বৃষ্টির মধ্যে বন্ধুবর চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের বাসায় চা-সম্মেলনে যেতে হোলো। চা এবং নানাবিধ মিষ্টান্নের (দিল্লীকা লাড্ডু কিন্তু কোথাও পাই নাই) যথাতিরিক্ত সদ্ব্যবহার করে প্রায় এগারটার সময় বাসায় এলাম। তখনও বৃষ্টি হচ্চে।

বিকেলে বৃষ্টি ছেড়ে গেল; সেন সাহেবও এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে সিবিল লাইন দেখ্‌তে গেলাম। কয়েক বৎসর আগে যখন রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে এসেছিল, তখন এই সিবিল লাইনেই অনেক বাড়ীঘর তৈরী হয়েছিল। সেই সব বাড়ীতেই বড়লাট বাহাদুরের অফিসাদি বসেছিল। যেটাকে সার্কিট হাউস বলে, যাতে এখনও বড়লাট বাহাদুর বাস করছেন, তাকেও অনেক পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করা হয়েছিল। এও এক বিরাট ব্যাপার। এ স্থানটী অতি সুন্দর। এখানে অনেক বড়লোক, সাহেবসুবার বাস। বড় বড় হোটেল, প্রকাণ্ড পণ্যশালা এই সিবিল লাইনকে এখনও সুশোভিত করে আছে। সেক্রেটেরিয়েটের জন্য যে বড় অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়েছিল, তাতে এখনও গুটিকয়েক দপ্তরখানা আছে; সেগুলি শীঘ্রই নয়াদিল্লীতে যাবে। যে প্রকাণ্ড হলে কাউন্সিলের অধিবেশন হোতো, সেটা এখন দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট গৃহ হয়েছে। এই সিবিল লাইনে এখনও এত স্থান প'ড়ে আছে যে, গবর্ণমেণ্ট রাইসিনায় না গিয়ে এখানেই সুবিস্তৃত রাজধানী স্থাপন করতে পারতেন। খরচও অনেক কম হোতো, দেখ্‌তেও সুন্দর হোতো। কিন্তু, সে কথা কে শোনে? কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম! রাইসিনার সঙ্গে তুলনায় দিল্লীর সিবিল লাইন যে সর্ব্বাংশে রাজধানী বসাবার উপযুক্ত স্থান, এ কথা আমি কেন, যিনি এদিকটা দেখেছেন, তিনিই স্বীকার করবেন।

সিবিল লাইন দেখা শেষ ক'রে 'পিপল পার্কে' গেলাম। এখানেই এবার ভারতীয় শিল্প-সমিতির প্রদর্শনী হবে; তারই আয়োজন হচ্চে। এই সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষেরা আমাদের জন্য 'কিঞ্চিৎ' চায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে এই 'কিঞ্চিতে'র পালা শেষ করে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে এলাম। তারপর রাত্রি আটটার সময় দিল্লীর বাঙ্গালী বন্ধুগণ আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হোলেন। তখন গৃহস্বামীদ্বয়কে অভিবাদন, ছেলেমেয়েদের আশীর্ব্বাদ ক'রে সবাই মিলে ষ্টেসনে এলাম। তারপর বন্ধুগণকে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বিদায় দিয়ে রাত্রি নয়টায় দিল্লী ত্যাগ করলাম। ১লা জানুয়ারীটা রেলেই কেটে গেল। পরদিন ২রা জানুয়ারী প্রাতঃকালে হাবড়া দাখিল। তারপর—সেই শিক, সেই দাঁড়,—আর সেই অভ্যস্ত ঘানিগাছ!

চাই বেঙ্গল-ফার্ম্মাকোপিয়া

(Pharmacopœia Bengaliensis)

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্

"ফার্ম্মাকোপিয়া" কি ?

অনেকেই "ফার্ম্মাকোপিয়া ব্রিটানিকা"র নাম শুনিয়া থাকিবেন, এবং অনেকেই ঔষধ ক্রয়কালীন, শিশির গায়ে, ঔষধের নামের পাশে বা তলায়, "P. B." অথবা "B. P." এই সঙ্কেতটিও দেখিয়া থাকিবেন। "P. B" এই সঙ্কেতটির অর্থ "ফার্ম্মাকোপিয়া ব্রিটানিকা" এবং "B. P"র অর্থ "ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া"। উভয় সঙ্কেতই তুল্যার্থজ্ঞাপক। এক্ষণে, ফার্ম্মাকোপিয়া কি, তাহাই জিজ্ঞাস্য। রাজত্ব চালাইতে হইলে, সকল জিনিষেরই মান বা মাপকাঠি নিরিখ করিয়া দিতে হয়, নতুবা ভেজাল অবশ্যম্ভাবী। এই যে রূপার টাকা হইতে দুয়ানি পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়, প্রত্যেকটিতে কত রূপা কত তামা থাকিবে, তাহার নিরিখ বাঁধা আছে। প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য "সের-বাট্‌খারার"ও নিরিখ বাঁধা আছে ;—সরকারের ঘরে যে বাটখারা আছে, সকল বাটখারারই তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সমান হওয়া চাই। সেই রকম, যে পুস্তকে কোন্ কোন্ ঔষধে কি কি মশলা কতখানি করিয়া থাকিবে, এমন নির্দ্দেশ থাকে, তাহাকেই "ফার্ম্মাকোপিয়া" বলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, "চ্যবনপ্রাশের" বা "মকরধ্বজের" কথা ধরা যাউক। ঐ দুটি ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময়ে, কোন্‌টিতে কতখানি কি মশলা থাকিবে, কতদিন ধরিয়া জ্বাল দিতে হইবে, কি হইলে নামাইতে হইবে, ইত্যাকার আদেশ যে পুঁথিতে আছে, সেই "ভৈষজ্য"-গ্রন্থকেই ইংরাজীতে ফার্ম্মাকোপিয়া বলা যায়। তাহা হইলেই, যতটা ভূখণ্ড ইংরাজের খাস দখলে আছে, সেখানে প্রচলিত "ডাক্তারি" বা "বিলাতি" ঔষধ বলিলেই বুঝিতে হইবে, উক্ত "ফার্ম্মাকোপিয়া ব্রিটানিয়া"-সম্মত ঔষধ। যেমন ইংরাজের রাজত্বে ব্রিটিশ্ ফার্ম্মাকোপিয়া প্রচলিত, তেমনি ফরাসী রাজত্বে "ফ্রেঞ্চ কোডেক্স্" প্রচলিত, মার্কিণ যুক্তরাজ্যে মার্কিণ-ফার্ম্মাকোপিয়া প্রচলিত ; এই ভাবে, প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই, তত্তৎ দেশোপযোগী ফার্ম্মাকোপিয়া প্রচলিত আছে। ফার্ম্মাকোপিয়াতে সুধু ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী, মাত্রা, প্রভৃতি বর্ণিত থাকে ; "মেটিরিয়া-মেডিকাতে" উহাও থাকে এবং তৎসঙ্গে ঔষধের গুণ ও ক্রিয়া এবং প্রয়োগ-বিধান বর্ণিত থাকে।

ফার্ম্মাকোপিয়া কি করিয়া প্রস্তুত হয় ?

নির্দ্দিষ্টকাল (৫ বৎসর) বাদে গবর্ণর পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট কাল বাদে, ফার্ম্মাকোপিয়ার অদল-বদল হয়। এই অদল-বদলের মূলে কি ? বহুদর্শিতা। অর্থাৎ, দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে যে ফার্ম্মাকোপিয়া রচিত হইয়াছে—গত দশ-বারো বৎসর ধরিয়া, তদ্বর্ণিত ঔষধের ব্যবহার করিয়া যে-যে দোষ-গুণ পাওয়া যায়, সেই অনুসারে ফার্ম্মাকোপিয়ার পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সময়ের মধ্যে, যে-যে অপর ঔষধ ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া যায়, সেগুলি ক্রমশঃ ফার্ম্মাকোপিয়াতে স্থান পায়। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটির হাতে এই কাযের ভার থাকে।

ফার্ম্মাকোপিয়া থাকায় লাভ কি ?

স্বদেশে ফার্ম্মাকোপিয়া প্রচলিত থাকিলে, সে দেশে কত রকমে ধনবৃদ্ধি হয়, তাহার কতকটা আভাষ নিম্নবর্ণিত তালিকা হইতে পাইবেন। আর আমাদের মত পরাধীন দেশ হইতে ঐ সমস্ত ধন বিদেশে চলিয়া যায়। এ দেশে বঙ্গীয় ফার্ম্মাকোপিয়া প্রচলিত হইলে,—

(১) গাছ-গাছড়ার চাষ-আবাদ করিতে হইবে।

(২) খনিজ পদার্থকে খনি হইতে উত্তোলন করিয়া শোধন করিতে হয়।

(৩) জৈব পদার্থগুলিকে সংগ্রহ ও শোধন করিতে হইবে।

(৪) চাষ-আবাদ করা, শোধন করা, স্থানান্তরিত

করা—প্রভৃতি কার্য্যে কত রকম যান-বাহন ও যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয়। সেই সকল প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে আবার কত লোকের প্রয়োজন হইবে।

(৫) ল্যাবরেটারিতে ঔষধ প্রস্তুত হইবে।

(৬) কারখানায়—শিশি-বোতল, অপরাপর আধার, অস্ত্র-শস্ত্র, ছিপি, মোড়ক, লেবেল প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে।

(৭) খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতাদের নিকটে পৌঁছাইবার জন্য কত রকম যান, কত মুটে, কত প্যাকিংএর লোক প্রয়োজন হইবে।

উপরি উক্ত তালিকা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, এ দেশে ফার্ম্মাকোপিয়া থাকিলে, বেকার-সমস্যার কত সুন্দর সমাধান হইত, এবং এ দেশে ফার্ম্মাকোপিয়া না থাকায়, বিলাতের বেকার-সমস্যার কি ভাবে সমাধান হইতেছে! এতদ্ব্যতীত, এ দেশে ফার্ম্মাকোপিয়া না থাকায়, দেশীয় ভৈষজ্যসম্পদ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, দেশীয় চিকিৎসাপ্রণালীর লোপ ঘটিতেছে এবং তৎসঙ্গে ঔষধাদির সম্বন্ধে আমরা একেবারেই পর-মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি—আমরা ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইতেছি! যুদ্ধের সময়ে, যে কুইনিন পূর্ব্বে ৮৸৹ টাকায় পাউণ্ড পাইয়াছি, তাহাকেই ৪৮৲ টাকায় পাউণ্ড ক্রয় করিতে হইয়াছে—তাহা ছাড়া, যুদ্ধের সময়ে কত ঔষধই পাই নাই!

ভারতবর্ষে ফার্ম্মাকোপিয়া হওয়া সম্ভব কি?

এই প্রশ্নের উত্তর—খুবই সম্ভব। তবে হয় না কেন? এই কেন'র উত্তর—ইংরাজবণিক্‌দিগের স্বার্থে ঘা পড়িবে বলিয়া! যে ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার দৌলতে বিলাতে কোটি কোটি টাকা প্রত্যেক বৎসরে যায়, সেই ফার্ম্মাকোপিয়া উঠিয়া গেলে, ইংলণ্ডে অনেক ঘরেই হাহাকার উঠিবে—এই জন্য ইংরাজ স্বেচ্ছায় আমাদের জন্য ভারতীয় ফার্ম্মাকোপিয়া প্রচলন করিবে না এবং স্বার্থান্বেষী, তথাকথিত নেতার দল, ইংরাজ প্রভুকে চটাইবার ভয়ে, উক্ত কার্য্যে হাত দিতে পারিবে না। অন্য পরে কা কথা, স্যর সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রীত্বকালে তাঁহাকে, এবং মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর মন্ত্রীত্বকালে তাঁহাকেও—উভয়কেই এই বিষয়ে অন্ততঃ গোড়াপত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম—উভয়েই আমার কথার উত্তরও দেন নাই! তাঁহাদিগকে যে পত্র দিয়াছিলাম, আমার স্বদেশবাসীর জ্ঞাতার্থ ও হিতার্থ, তাহার মর্ম্মার্থ নিবেদন করিতেছি।

আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—অনুসন্ধান-কমিটি গঠন করা।

এদেশে এখন উৎকৃষ্ট অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক, উৎকৃষ্ট রাসায়নিক, উৎকৃষ্ট কবিরাজ ও হাকিমের অভাব নাই। সমগ্র ভারতব্যাপী আন্দোলন না করিয়া, প্রথমতঃ, বঙ্গদেশে যদি এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়, এবং বঙ্গদেশে উহার সাফল্য আশানুরূপ হয়, তবে অন্যান্য প্রদেশে, এবং ক্রমশঃ, ভারতবর্ষব্যাপী কার্য্যারম্ভ করা অসম্ভব নয়। এই জন্য বলিতেছিলাম যে, যদি কাউন্সিলে এই মর্ম্মে একটি আইন পাস করা হয় যে, "অন্ততঃ বঙ্গদেশে, বঙ্গের উপযোগী ফার্ম্মাকোপিয়া প্রস্তুত করিয়া, নির্দ্দিষ্টকাল পরে, মাত্র উহারই ব্যবহার আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন," তবে, তখন আবশ্যক কার্য্যকরী কমিটি প্রভৃতি গঠন করা যাইতে পারিবে। কমিটি গঠন করিবার উদ্দেশ্যে কি-কি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম। এই কমিটিতে সমান-সংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী সভ্য থাকিয়া একযোগে কায করিবেন। কমিটিকে নিম্নোক্ত মূল বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, যথা:—

(১) বঙ্গদেশে-জাত কি-কি গাছ-গাছড়া বা খনিজ ভেষজ পাওয়া যায়, তাহার তালিকা প্রস্তুত করা। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে একটি "ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়া" ভূমিষ্ঠ হইয়াই সূতিকা-গৃহে মারা পড়ে। সেই পুস্তক, ডাইমক ও ওয়ার্ডেনের পুস্তক, কোরির পুস্তক, কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্তের পুস্তক, বহুসংখ্যক কবিরাজী ও হাকিমী পুঁথি ইত্যাদি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাওয়া যায়। সুধু একবার বসিয়া, বাছিয়া, ছাঁটিয়া লইলেই স্বল্পকালের মধ্যে বঙ্গীয়-ফার্ম্মাকোপিয়ার প্রথম কাঠাম খাড়া করা সুসম্পন্ন হইতে পারে।

(২) বঙ্গদেশে যে সব গাছ-গাছড়া জন্মে না, বঙ্গের বাহিরে কোথায় তাহাদিগের চাষ-আবাদ করা যায়, তাহার সঠিক সন্ধান করা প্রয়োজন। এবং সন্ধানান্তে, ঠিকা দিয়া, অথবা সরকারের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে, সেই সেই গাছ-গাছড়ার চাষ-আবাদ করিতে কত কাল ও অর্থব্যয় হইবে, তাহার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা চাই। আপাততঃ, কয়েক বৎসর, বিদেশ হইতে ইহাদিগকে আমদানি করিলে, কার্য্য চলিতে পারে; কিন্তু, যাহাতে এই দেশে ঐ গাছ-গাছড়া জন্মে, এবং ভবিষ্যতে উহাদিগের জন্য বিদেশের মুখ তাকাইতে না হয়, তাহার পাকা বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। একমাত্র এই কার্য্যে এ দেশের বেকার-সমস্যা অনেকটা হাল্কা হইয়া আসিবে।

(৩) গবর্ণমেণ্টের পুলিশের ফাঁড়ি এবং সাব্-আ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের ক্ষুদ্রতম চিকিৎসালয় বঙ্গের নিবিড়তম প্রদেশেও বহুল সংখ্যায় ও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত আছে। ইহাদিগের মারফৎ, দেশী গাছ-গাছড়ার আদম-সুমার (সেন্সাস্) ও টোটকা-সংগ্রহ—উভয় কার্য্যই সুলভে ও সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইতে পারিবে। সামান্য পারিতোষিকের লোভ দেখাইলে, অথবা সরকারী বাৎসরিক-রিপোর্টে সুখ্যাতি করিলেই, অথবা, রায়-সাহেবী খেতাবের লোভ দেখাইলেই এই খাতে ব্যয়ও কিছু লাগিবে না।

(৪) সরকারী ও বেসরকারী বহুসংখ্যক রাসায়নিক পরীক্ষাগার এদেশে আছে। আবশ্যক হইলে, আপনিই আরো উক্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান জন্মাইবে। এই সকল পরীক্ষাগারে, দেশ-জাত ভেষজের বীর্য্য নির্দ্ধারণ প্রভৃতি কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মানুগ কি ভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক।

তথ্য-সংগ্রহরূপ এই প্রাথমিক কার্য্যে কিছু কাল-হরণ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কাল-হরণ অনিবার্য্য। যদি এই কার্য্যের জন্য দুইটি বৎসর নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যায়, তবে কিছু অন্যায় হয় না। এই কার্য্যে ব্যয়ও আছে। সে ব্যয় অকুণ্ঠিত ভাবে মঞ্জুর করিতে হইবে।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ-কমিটি গঠন।

সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হইলে, কি ভাবে কার্য্য করা যাইতে পারে ইতি-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য, দ্বিতীয় কমিটি গঠন করিতে হইবে। সেই কমিটি মুখ্যতঃ এই এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া কার্য্যাভিমুখে অগ্রসর হইবেন।—

(১) বর্ত্তমান আইনের কি কি পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে, আনুষঙ্গিক অপরাপর যে কোনও আইন-ঘটিত ব্যাপার আলোচিত হউক না কেন, সে সম্বন্ধে আইন-অনভিজ্ঞ আমার কথা বলিবার অধিকার নাই; তবে, যে "মেডিকাল-অ্যাক্ট" অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারগণ ও এতদ্দেশীয় শাস্ত্রানুসারে চিকিৎসকগণের মধ্যে গভীর ও দীর্ঘ ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে, সে আইন পরিবর্ত্তিত বা বাতিল হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেন, ৺রাজেন্দ্রনাথ সেন, ও মহা-মহোপাধ্যায় শ্যামাদাস হইলেন "un-qualified" অর্থাৎ, হেতুড়ে, আর সেদিনকার অর্ব্বাচীন M.B. "পূরা qualified" এ কথা যে আইনে বলে, সে আইনকে নীরবে মানিয়া চলিবার দিন গিয়াছে।

(২) ফার্ম্মাকোপিয়া-রচনা করিবার জন্য কমিটি গঠন করার জন্য নূতন আইন পাশ করান চাই।

(৩) ভেষজ-উপাদান সংগ্রহ করা, চাষ-আবাদ করা, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করা, ইত্যাদি ইত্যাদি কি ভাবে, কত ব্যয়ে, কোন্ উপায়ে করা উচিত, এই সব গুলি একত্রে নিরূপণ করিবার জন্য অপর একটি কমিটি গঠন করা কর্ত্তব্য।

(৪) বর্ত্তমানকালে, যে সকল বিদেশীয় কোম্পানী এদেশে ঔষধাদি সরবরাহ করিতেছে, তাহাদিগের সঙ্গে একটা আপোষ-নিষ্পত্তি করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা চাই। বিদেশী-কোম্পানীকে "১০।১২ বৎসরের জন্য নোটিশ" দিয়া জাল গুটাইতে বলা যাইতে পারে, অথবা এদেশে মূলধন সংগ্রহ করিয়া এদেশে কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। এইখানেই বণিক-জাতির আঁতে ঘা পড়িবে, আর তাহারা নানা উপায়ে ভিতর হইতে কলকাঠি নাড়িতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু চিরকাল শোষণ-নীতি আর কোনও দেশে চলিবে না। অথচ এই ভয়েতেই স্যর সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রীত্ব কালে কোনও কায হইয়া উঠে নাই এবং এই জন্যই শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশও তুষ্ণিম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। আমি কিন্তু ছাড়িব না। স্যর সুরেন্দ্রনাথ আমার কথায় টলেন নাই, মিঃ ব্যোমকেশও আমাকে ব্যোম-তত্ত্বে ফেলিয়া দিয়াছেন—কিন্তু তাহা হইলেও, আমার আশা আছে যে, স্যর প্রভাসচন্দ্র আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন এবং "বড়-বাপের ব্যাটা," ইহা প্রতিপন্ন করিবেন। এই "ম্যাও" একদিন-না-একদিন কাহাকেও ধরিতেই হইবে; এবং আশা করি এই ম্যাও ধরিবার মত মনুষ্যত্ব তাঁহার আছে। এই সকল ব্যাপারেও ২।৩ বৎসর কাটিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

তৃতীয় কর্ত্তব্য—চরম-ফার্ম্মাকোপিয়া কমিটি গঠন করা।

এইরূপ ধাপে ধাপে কায করিতে কত মন্ত্রী ও কত লাট-বেলাট যাইবেন-আসিবেন বলা যায় না, এবং এই বিভীষণের দেশে, কত ভেদনীতি মাথা তুলিবে তাহা সেই চক্রীই জানেন—কিন্তু এই কার্য্যের সূচনা একদিন-না-একদিন করিতেই হইবে। প্রত্যেক জেলায় ডাক্তারি স্কুল বসিতেছে,

প্রত্যেক গ্রামে টেক্‌নিক্যাল ও কেমিক্যাল স্কুল কালে বসিবে এবং তখন ত্বরিতপদে এই সমস্তই করিতে হইবে। বিগত যুদ্ধের সময়ে ঔষধ ও যন্ত্রাদি লইয়া কি কষ্টই না গিয়াছে। ভারতবর্ষ কি চিরকালই এ বিষয়েও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে?

কাযেই কমিটি গঠিত হইবেই—আজ না হউক কাল। সেই কমিটি গঠিত হইলেই আমার একটা স্বপ্ন কার্য্যে পর্য্যবসিত হইল বলিয়া বুঝিব;—আমার মন বলিতেছে—

এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন—
আসিবে সেদিন আসিবে !!!

[Letter to Sir Surendranath Dated 26th July 1921 and Scheme submitted to Mr. B. Chakravarty on 17th February 1927].

মৃত্যু-সুধা

(হাকিম আজমল খাঁর তিরোভাবে।)

গোলাম মোস্তফা, বি-এ, বি-টি

কোন্ হাকিমের হুকুম পেয়ে হায়গো 'হাকিম' অবেলায়
এমন ক'রে বিদায় নিলে রুগ্ন রেখেই ভারত-মা'য়?
বিকার-মোহে কাম্‌ড়ে দেহ করছে যে নিজ রক্ত পান
তার বুকেতেই হান্‌লে নিঠুর বিষ-মাখানো ব্যথার বাণ!

হঠাৎ তোমায় এমন ক'রে ক'র্‌ল কে সে গেরেফ্‌তার,
আইন-কানুন ভাঙলে তুমি কোথায় কবে কোন্ রাজার?
'অন্তরীণের' চেয়েও এ যে ভীষণ সাজা—নির্ব্বাসন,
অপরাধ এ? অথবা এ জালিম রাজার উৎপীড়ন?

অপরাধই!—ভীষণ কসুর!—এই অপরাধ হয় না মাফ,
এই অভাগা দেশের সেবায় প্রাণ দেওয়া—সে ভীষণ পাপ!
'হাকিম' তুমি, টিপ্‌বে নাড়ী, দাওয়াই দেবে রুগ্নদের,
টিপ্‌তে কেন আসলে নাড়ী ভাগ্যহীনা এই দেশের?

এই ত তোমার রোগের গোড়া—হাকিম হ'য়েও বুঝলে না?
এই বিমারের নিদান-কথা শাস্ত্রে কিছুই খুঁজ্‌লে না?
'দাশ' হ'ল যেই দেশেরি দাস—অম্‌নি দেখ মর্‌ল' সে,
কেউ র'ল না এই ভারতে—এই অপরাধ কর্‌ল যে!

আকাশ হ'তে আল্লা যেদিন ক'র্‌ল জারি এ ফর্‌মান—
কেউ থেক না অধীন হ'য়ে, হও গো স্বাধীন—মুক্ত-প্রাণ,
দিকে দিকে জাগল সাড়া, ভর্‌ল' গানে ভূমণ্ডল,
আমরা শুধুই ঘুমের ঘোরে রইনু পড়ে অচঞ্চল!

আলোর দূতী ব্যর্থ হ'য়ে ফির্‌ল যখন গগন গা'য়,
মুক্তি-বাণী শুন্‌ল না কেউ, পড়ল' বাঁধা শিকল পা'য়!
আল্লা রেগে কসম খেয়ে ক'র্‌ল তখন কঠোর পণ—
এদের সেবায় লাগবে যারা—তাদের সাজা ঠিক মরণ!

ভাগ্য-বিধির এই যে আইন, ভাঙলে কেন হাকিম সাব্!
জেনে শুনেই কর্‌লে এ পাপ! দেখলে রঙিন কোন্ খোয়াব;
কর্‌তে যদি ফেরেববাজী, দেখতে যদি নিজের সুখ,
বাঁচ্‌তে তুমি অনেক দিনই—ছিল নাকি এ জ্ঞানটুক্!

রুগ্ন-ভারত—হাকিম তুমি—দিলেই যখন আপন প্রাণ,
মৃত্যু এ নয়, দিয়েই গেলে ইউনানী কোন্ দাওয়াই দান!
দেশের নাড়ীর গতিক খারাব, মৃত্যু-সুধাই চাই কি তার?
পান ক'রালে সেই সুধা কি কণ্ঠ ভরি' ভারত-মা'র?

মর, মর, সেবক যারা—এম্‌নি ক'রেই শহীদ হও,
দেশ-জননীর সব অভিশাপ সন্তানেরাই সওগো সও!
মৃত্যু এ নয়—পরীক্ষা এ—পাশ কর এই পরীক্ষায়,
গল্‌বে আবার খোদার হৃদয়, মুক্তি দেবে ভারত-মা'য়!

কাঁদছ কেন ভারতবাসী হিন্দু এবং মুসলমান?
মুক্তি-রতন কিনবে যদি—করবে না তার মূল্য দান?
মৃত্যু-তোরণ-দ্বার ছাড়া আর মুক্তি-জয়ের পথ যে নাই,
এ পথ দিয়েই চল্‌তে হ'বে, দুঃখ করা ব্যর্থ তাই!

মর্‌ছে যারা এমন ক'রে দেশ-বিদেশে সেবক দল
তাদের ত কেউ হারায়নি ভাই, মরণ তাদের নয় বিফল,
মরণ দিয়েই জাতির দেহে ক'র্‌ছে তারা জীবন দান,
ম'রেই তারা রইল বেঁচে—অমর হ'ল তাদের প্রাণ!

গড়ব মোরা নূতন ক'রে স্বাধীন-ভারত-'তাজমহল',
কে হ'বে তার ভিত্তি-মূলের শক্ত পাথর থির্ অটল!
'মিনার' যারা চায় হ'তে হো'ক্—গড়ল যারা ভিত্তি-মূল,
গর্ব্ব তাদের সবার 'পরে—নাইক ধরায় তাদের তুল!

শেষ প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৯)

অজিত যখন বাড়ী ফিরিল তখন গভীর রাত্রি। পথ নীরব, দোকান-পাট বন্ধ,—কোথাও মানুষের চিহ্ন মাত্র নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল তাহা দমের অভাবে আটটা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে। এখন হয়ত একটা, না-হয়ত দুইটা,—ঠিক যে কত কোন আন্দাজ করিতে পারিল না। আশু-বাবুর গৃহে এতক্ষণ যে একটা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার ব্যাপার চলিতেছে তাহা নিশ্চিত ; শোওয়ার কথা দূরে থাক্, হয়ত খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। ফিরিয়া সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সত্য ঘটনা বলা যায় না। কেন যায় না সে তর্ক নিষ্ফল, কিন্তু যায় না। বরঞ্চ, মিথ্যা বলা যায়। কিন্তু, মিথ্যা বলার অভ্যাস তাহার ছিলনা, না হইলে মোটরে একাকী বাহির হইয়া বিলম্বের কারণ উদ্ভাবন করিতে ভাবিতে হয়না।

গেট খোলা ছিল। দরওয়ান সেলাম করিয়া জানাইল যে সোফার নাই, সে তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। গাড়ী আস্তাবলে রাখিয়া অজিত আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেই দেখিল তিনি তখনও শুইতে যান নাই, অসুস্থ দেহ লইয়াও একাকী অপেক্ষা করিয়া আছেন। উদ্বেগে সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এই যে! আমি বার বার বল্‌চি কি একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে। কতবার তোমাকে বলেচি, পথে-ঘাটে কখনো একলা বার হতে নেই। বুড়োর কথা খাট্‌লো ত? শিক্ষে হোল ত?

অজিত সলজ্জে একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনাদের এতখানি ভাবিয়ে তোল্‌বার জন্যে আমি অতিশয় দুঃখিত।

দুঃখ কাল কোরো। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দ্যাখো দুটো বাজে। দুটি খেয়ে এখন শোওগে। কাল শুন্‌বো সব কথা। মধু! মধু!—সে ব্যাটাও কি গেল নাকি তোমাকে খুঁজ্‌তে?

অজিত বলিল, দেখুন ত আপনাদের অন্যায়। এত বড় সহরে কোথায় সে আমাকে পথে পথে খুঁজবে?

আশুবাবু বলিলেন, তুমি ত বল্‌লে অন্যায়। কিন্তু আমাদের যা' হচ্ছিল তা' আমরাই জানি। এগারোটার সময় শিবনাথের গান-বাজনা বন্ধ হয়েছে, তখন থেকে,—মণিই বা গ্যালো কোথায়? তাকেও ত তখন থেকে দেখ্‌চিনে।

অজিত কহিল, বোধ হয় শুয়েছেন।

শোবে কি হে? এখনো যে তার খাওয়াও হয়নি। বলিয়াই তাঁহার হঠাৎ একটা কথা মনে হইতেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, আস্তাবলে কোচম্যানকে দেখ্‌লে?

অজিত কহিল, কই না।

তবেই হয়েছে। এই বলিয়া আশুবাবু দুশ্চিন্তার আর একবার সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, যা ভেবেচি তাই। গাড়ীটা নিয়ে সেও দেখ্‌চি খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে। দ্যাখো দিকি অন্যায়। পাছে বারণ করি, এই ভয়ে একটা কথাও বলেনি। চুপি চুপি চলে গেছে। কখন্ ফিরবে কে জানে। আজ রাতটা তা হ'লে জেগেই কাট্‌লো।

আমি দেখ্‌চি গাড়ীটা আছে কি না। এই বলিয়া অজিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আস্তাবলে গিয়া দেখিল গাড়ী মজুত এবং ঘোড়া মাঝে মাঝে পা ঠুকিয়া হৃষ্টচিত্তে ঘাস খাইতেছে। তাহার একটা দুশ্চিন্তা কাটিল। নিচের বারান্দার উত্তর প্রান্তে কয়েকটা বিলাতী ঝাউ ও পাম গাছ বহু অযত্ন মাথায় করিয়াও কোনমতে টিকিয়াছিল, তাহারই উপরে মনোরমার শয়নকক্ষ। তখনও ঘরে আলো জ্বলিতেছে কি না জানিবার জন্য অজিত সেই দিক দিয়া ঘুরিয়া আশুবাবুর কাছে যাইতেছিল, ঝোপের মধ্যে হইতে মানুষের গলা তাহার কানে গেল। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ। কথা বলিতেছিল কি একটা গানের সুর লইয়া। দোষের কিছুই নয়,—তাহার জন্য ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলের প্রয়োজন ছিলনা। ক্ষণকালের জন্য অজিতের দুই পা অসাড় হইয়া রহিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যই। আলোচনা চলিতেই

লাগিল ; সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। উভয়ের কেহ জানিতেও পারিলনা তাহাদের এই নিশীথ বিশ্রম্ভালাপের কেহ সাক্ষী রহিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর পেলে ?

অজিত কহিল, গাড়ী-ঘোড়া আস্তাবলেই আছে। মণি বাইরে যাননি।

বাঁচালে বাবা। এই বলিয়া আশুবাবু নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, রাত অনেক হ'ল, সে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে। আজ আর দেখ্‌চি মেয়েটার খাওয়া হ'লনা। যাও বাবা, তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়োগে।

অজিত বলিল, এত রাত্রে আমি আর খাবোনা, আপনি শুতে যান্।

যাই। কিন্তু কিছুই খাবেনা ? একটু কিছু মুখে দিয়ে—

না, কিছুই না। আপনি আর বিলম্ব করবেননা। শুতে যান।

এই বলিয়া সেই রুগ্ন মানুষটিকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়া অজিত নিজের ঘরে আসিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত সুরের আলোচনা শেষ হইলে পিতার খবর লইতে এদিকে একবার মনোরমা আসিবেই আসিবে।

মণি আসিল, কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। প্রথমে সে পিতার বসিবার ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। মধু বোধ হয় নিকটেই কোথাও সজাগ ছিল ; মনিবের ডাকে সাড়া দেয় নাই বটে, কিন্তু তিনি উঠিয়া গেলে আলো নিবাইয়া দিয়াছিল। মনোরমা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল অজিত তাহার ঘরে খোলা জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারো ঘরে আলো ছিল না, কিন্তু উপরের গাড়ী-বারান্দার ক্ষীণ রশ্মিরেখা তাহার জানালায় গিয়া পড়িয়াছিল।

কে ?

আমি অজিত।

বাঃ ! কখন্ এলে ? বাবা বোধ হয় শুতে গেছেন। এই বলিয়া সে যেন একটু চুপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অসমাপ্ত কথায় বেগ তাহাকে থামিতে দিলনা। বলিতে লাগিল, ছাখো তো তোমার অন্যায়। বাড়ীশুদ্ধ লোক ভেবে সারা,—নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছিল। তাই তো বাবা বার বার বারণ করেন একলা যেতে।

এই সকল প্রশ্ন ও মন্তব্যের অজিত একটারও জবাব দিলনা।

মনোরমা কহিল, কিন্তু তিনি কখনই ঘুমুতে পারেননি। নিশ্চয় জেগে আছেন। তাঁকে একটা খবর দিইগে।

অজিত কহিল, দরকার নেই। তিনি আমাকে দেখেই তবে শুতে গেছেন।

দেখেই শুতে গেছেন ? তবে আমাকে একটা খবর দিলেনা কেন ?

তিনি মনে করেছিলেন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো।

ঘুমিয়ে পোড়ব কি রকম ? এখনো ত আমার খাওয়া হয়নি পর্য্যন্ত।

তাহলে খেয়ে শোওগে। রাত আর নেই।

তুমি খাবেনা ?

না। এই বলিয়া অজিত জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বাঃ ! বেশ তো কথা ! ইহার অধিক কথা তাহার মুখে যোগাইলনা। ভিতর হইতে আর জবাব আসিলনা। বাহিরে একাকী মনোরমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পীড়াপীড়ি করিয়া, রাগ করিয়া নিজের জিদ্ বজায় রাখিতে তাহার জোড়া নাই,—এখন কিসে যেন তাহার মুখ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিল। অজিত রাত্রি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে, বাড়ীশুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তার অবধি নাই,—এতবড় অপরাধ করিয়াও সে-ই তাহাকে অপমানের একশেষ করিল, কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদের ভাষাও তাহার মুখে আসিলনা। এবং শুধু কেবল জিহ্বাই নির্ব্বাক নয়, সমস্ত দেহটাই যেন কিছুক্ষণের মত অবশ হইয়া রহিল। জানালায় কেহ ফিরিয়া আসিলনা, সে রহিল কি গেল এটুকু জানারও কেহ প্রয়োজন বোধ করিলনা। গভীর নিশীথে এম্‌নি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনোরমা বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সকালেই বেহারার মুখে আশুবাবু খবর পাইলেন কাল অজিত কিম্বা মনোরমা কেহই আহার করে নাই। চা খাইতে বসিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল তোমার নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু একটা এ্যাক্সিডেণ্ট ঘটেছিল, মা ?

অজিত বলিল, না।

তবে নিশ্চয় হঠাৎ তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল।

না, তেল যথেষ্ট ছিল।

তবে এত দেরি হল যে?

অজিত শুধু কহিল, এম্‌নিই।

মনোরমা নিজে চা খায়না। সে পিতাকে চা তৈরি করিয়া দিয়া একবাটি চা ও খাবারের থালাটা অজিতের দিকে বাড়াইয়া দিল, কিন্তু প্রশ্নও করিলনা, মুখ তুলিয়াও চাহিলনা। উভয়ের এই ভাবান্তর পিতা লক্ষ্য করিলেন। আহার শেষ করিয়া অজিত স্নান করিতে গেলে তিনি কন্যাকে নিরালায় পাইয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, না মা, এটা ভালো নয়। অজিতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠই হোক্, তবুও এ বাড়ীতে তিনি অতিথি। অতিথির যোগ্য মর্য্যাদা তাঁকে দেওয়া চাই।

মনোরমা কহিল, চাইনে এ কথা তো আমি বলিনি বাবা।

না না, বলোনি সত্যি, কিন্তু আমাদের আচরণে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ পাওয়াও অপরাধ।

মনোরমা বলিল, তা' মানি। কিন্তু আমার আচরণে অপরাধ হয়েছে এ তুমি কার কাছে শুন্‌লে বাবা?

আশুবাবু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলেননা। তিনি শোনেননি কিছুই, জানেননা কিছুই, সমস্তই তাঁহার অনুমান মাত্র। তথাপি মন তাঁহার প্রসন্ন হইলনা। কারণ, এমন করিয়া তর্ক করা যায়, কিন্তু উৎকণ্ঠিত পিতৃ-চিত্তকে নিঃশঙ্ক করা যায়না। খানিক পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, অত রাত্রে অজিত আর খেতে চাইলেননা, আমিও শুতে গেলাম;—তুমি তো আগেই শুয়ে পড়েছিলে,—কি জানি, কোথায় হয়ত আমাদের একটা অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে। ওঁর মনটা আজ তেমন ভালো নেই।

মনোরমা বলিল, কেউ যদি সারা রাত পথে পথে কাটাতে চায় আমাদেরও কি তার জন্যে ঘরের মধ্যে জেগে ব'সে কাটাতে হবে বাবা? এই কি অতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য?

আশুবাবু হাসিলেন। নিজেকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন, গৃহস্থ মানে যদি এই বেতো রুগীটি হয় মা, তাহলে তাঁর কর্ত্তব্য আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়া। নইলে ঢের বড় সম্মানিত অতিথি বাত-ব্যাধির প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। কিন্তু সে অর্থে যদি অন্য কাউকে বোঝায় তো তাঁর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করবার আমি কেউ নয়। আজ অনেকদিনের একটা ঘটনা মনে পোড়্‌ল মণি। তোমার মা তখন বেঁচে। গুপ্তিপাড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরতে পারলামনা। শুধু একটা রাত নয়, একজন তাই নিয়ে গোটা তিনটে রাত্রি জানলায় বসে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর কর্ত্তব্য কে নির্দ্দেশ ক'রে-ছিলেন তখন জিজ্ঞেসা করা হয়নি, কিন্তু আর একদিন দেখা হলে যে এ কথা ভুল্‌বোনা তা' ঠিক জানি। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য মুখ ফিরাইয়া কন্যার দৃষ্টিপথ হইতে নিজের চোখ দুটিকে আড়াল করিয়া লইলেন।

এ কাহিনী নূতন নয়। গল্পচ্ছলে এ ঘটনা বহুবার মেয়ের কাছে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এ আর পুরাতন হয় না। যখনই মনে পড়ে, তখনই নূতন হইয়া দেখা দেয়।

ঝি আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। মনোরমা উঠিয়া পড়িয়া কহিল, বাবা, তুমি একটু বোসো, আমি রান্নার জোগাড়টা করে দিয়ে আসি। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আলোচনাটা যে আর বেশি দূর গড়াইবার সময় পাইল না, ইহাতে সে তখনকার মত ভারি একটা স্বস্তি বোধ করিল।

দিনের মধ্যে আশুবাবু কয়েকবার অজিতের খোঁজ করিয়া একবার জানিলেন সে বই পড়িতেছে, একবার খবর পাইলেন সে নিজের ঘরে বসিয়া চিঠি-পত্র লিখিতেছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে সে প্রায় কথাই কহিলনা, এবং খাওয়া শেষ হইতেই উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য দিনের তুলনায় তাহা যেমন রূঢ়, তেম্‌নি বিস্ময়কর।

আশুবাবুর ক্ষোভের পরিসীমা নাই, কহিলেন, ব্যাপার কি মণি?

মনোরমা আজ বরাবরই পিতার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে-ছিল, এখনও বিশেষ কোনদিকে না চাহিয়াই কহিল, জানিনে তো বাবা।

তিনি ক্ষণকাল নিজের মনে চিন্তা করিয়া যেন নিজেকেই বলিতে লাগিলেন, তার ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি তো জেগেই ছিলাম। খেতেও বোল্‌লাম, কিন্তু অনেক রাত্রি হয়েছে বলে সে নিজেই খেলেনা। তোমার শুয়ে পড়াটা হয়ত ঠিক হয়নি, কিন্তু এতে এমন কি অন্যায় আছে আমি

তো ভেবে পাইনে। এই তুচ্ছ কারণটাকে সে এত জোরে মনে নেবে এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি আছে?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ভিতরের লজ্জাটা দমন করিয়া বলিলেন, কথাটা তাকে তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

মনোরমা জবাব দিল, জিজ্ঞেসা করবার কি আছে বাবা?

জিজ্ঞাসা করিবার অনেক আছে, কিন্তু করাও কঠিন,—বিশেষতঃ, মণির পক্ষে। ইহা তিনি জানিতেন। তথাপি কহিলেন, সে যে রাগ করে আছে এ তো খুব স্পষ্ট। বোধ হয় সে ভেবেচে তুমি তাকে উপেক্ষা করো। এ রকম অন্যায় ধারণা তো তার মনে রাখা যেতে পারে না।

মনোরমা বলিল, আমার সম্বন্ধে ধারণা যদি তিনি অন্যায় করে থাকেন সে তাঁর দোষ। একজনের দোষ সংশোধনের গরজটা কি আর একজনকে গায়ে পোড়ে নিতে হবে বাবা?

পিতা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেননা। মেয়েকে তিনি যেভাবে মানুষ করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে তাহার আত্ম-সম্মানে আঘাত পড়ে এমন কোন আদেশই করিতে পারেননা। সে উঠিয়া গেলে এই কথাটাই নিজের মধ্যে অবিশ্রাম তোলাপাড়া করিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। এরূপ কলহ ঘটিয়াই থাকে, এবং এ ভ্রম ক্ষণিক মাত্র, এমন একটা কথা তিনি বহুবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়াও এতটুকু জোর পাইলেননা। অজিতকে তিনি জানিতেন। শুধু কেবল সে সকল দিক দিয়া সুশিক্ষিতই নয়, তাহার মধ্যে এমন একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচার-বুদ্ধি ও চরিত্রের সত্যপরতা তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আজিকার এই অহেতুক বিরাগের তুচ্ছতার সহিত তাহার কোনমতেই সামঞ্জস্য হয়না। সকলের অপরিসীম উদ্বেগের হেতু হইয়াও সে লজ্জাবোধের পরিবর্ত্তে রাগ করিয়া রহিল এমন অসম্ভব যে কি করিয়া তাহাতে সম্ভবপর হইল মীমাংসা করা দুঃসাধ্য।

বিকালের দিকে একখানা টাঙ্গা গাড়ী গেটের মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া আশুবাবু খবর লইয়া জানিলেন গাড়ী আসিয়াছে অজিতের জন্য। অজিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে তিনি কষ্টে একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, টাঙ্গা কি হবে অজিত?

একবার বেড়াতে বার হবো।

কেন, মোটর কি হ'লো? আবার বিগড়েচে নাকি?

না। কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে তো।

যদি হয়ও, তার জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ী আছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, বাবা অজিত, আমাকে সত্যি বোলো। মোটর নিয়ে কোন কথা উঠেচে?

অজিত কহিল, আমি বিশেষ কিছুই জানিনে। তবে, আজও আপনাদের গান-বাজনার আয়োজন আছে। তাঁদের আনতে, বাড়ী পৌঁছে দিতে মোটরের আবশ্যকই বেশি। ঘোড়ার গাড়ীতে ঠিক হয়ে উঠবেনা।

সকাল হইতে নানারূপ দুশ্চিন্তায় কথাটা আশুবাবু ভুলিয়াই ছিলেন। এখন মনে পড়িল, কাল সভাভঙ্গের পরে আজিকার জন্যও তাঁহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল, এবং, সন্ধ্যার পরেই মজলিশ্ বসিবে। একটা খাওয়ানোর কল্পনাও যে মনোরমার ছিল, এই সঙ্গে এ কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু মনে মনে একটু হাসিলেন। কারণ, কথাটা তাঁহারই যখন মনে নাই, এবং মনে পড়িয়াও ভাল লাগিতেছেনা, তখন মেয়ের কাছে যে আজ ইহা কতদূর অরুচিকর হইয়াছে তাহা অনুমান করা সহজ। বলিলেনও তাহাই। কহিলেন, আজ ও সব হবেনা অজিত।

অজিত কহিল, কেন?

কেন? মণিকেই একবার জিজ্ঞেসা কোরে দেখোনা অজিত। এই বলিয়া তিনি বেহারাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করিয়া কন্যাকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তুমি রাগ কোরে আছো বাবা, গান-বাজনা শুনবে কে? মণি? আচ্ছা, সে সব কাল হবে, এখন যাও তুমি মোটর নিয়ে একটু ঘুরে এসোগে। কিন্তু বেশি দেরি করতে পাবে না। আর তোমার একলা যাওয়া চলবেনা তা' বলে দিচ্চি। ড্রাইভার ব্যাটা যে কুড়ে হয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটা সুকঠিন সমস্যার অকস্মাৎ অভাবনীয় সুমীমাংসা করিয়া ফেলিয়া উচ্ছল আনন্দে আরাম-কেদারায় চিৎ হইয়া পড়িয়া ফোঁস্ করিয়া গভীর পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তুমি যাবে টাঙ্গা ভাড়া কোরে বেড়াতে? ছি!

মনোরমা ঘরে পা দিয়া অজিতকে দেখিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সাড়া পাইয়া আশুবাবু সোজা হইয়া বসিলেন,

সকৌতুক স্নিগ্ধহাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলি আজকের কথাটা মনে আছে তো মা? না একদম্ ভুলে বসে আছো?

কি বাবা?

আজ যে সকলের নেমতন্ন? তোমাদের গানের পালা শেষ হলে তাঁদের যে আজ খাওয়াবে,—বলি, মনে আছে তো?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া কহিল, আছে বই কি। মোটর পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁদের আন্‌তে।

মোটর পাঠিয়েছো আন্‌তে? কিন্তু খাওয়া-দাওয়া?

মণি কহিল, সমস্ত ঠিক আছে বাবা, ত্রুটি হবেনা।

আচ্ছা, বলিয়া তিনি পুনরায় চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের পরে কে যেন কালি লেপিয়া দিল।

মনোরমা চলিয়া গেল। অজিতও বাহির হইয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, অজিত, মেয়ের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার লজ্জা করে। কিন্তু ওর মা বেঁচে নেই,—তিনি থাক্‌লে আমাকে এ কথা বল্‌তে হোতোনা।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু বলিলেন, ওর পরে তুমি কেন রাগ করে আছো এ তিনিই তোমার কাছ থেকে বার কোরে নিতেন,—কিন্তু তিনি তো নেই,—আমাকে কি তা' বলা যায়না?

তাঁহার কণ্ঠস্বর এম্‌নি সকরুণ যে ক্লেশ বোধ হয়। তথাপি অজিত নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ওর সঙ্গে কি তোমার কোন কথাবার্ত্তা হয়নি?

অজিত কহিল, হয়েছিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, হয়েছিল? কখন্ হল? মণি হঠাৎ যে কাল ঘুমিয়ে পড়েছিল এ কি তোমাকে সে বলেছিল?

অজিত কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বোধ হয় কি জবাব দিবে ইহাই ভাবিয়া লইল, তারপরে ধীরে ধীরে কহিল, অতরাত্রি পর্য্যন্ত নিরর্থক জেগে থাকা সহজও নয়, হয়ত স্বাভাবিকও নয়। ঘুমুলে অন্যায় হোতোনা, কিন্তু তিনি ঘুমোন্‌নি। আপনি শুতে যাবার অনেক পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তারপরে?

তারপরে আর কোন কথা আপনাকে বোলবনা। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। দ্বারের বাহির হইতে বলিয়া গেল, হয়ত কাল পর্শু আমি এখান থেকে যেতে পারি।

আশুবাবু কিছুই বুঝিলেন না, শুধু বুঝিলেন কি একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেছে।

অজিতকে লইয়া টাঙ্গা বাহির হইয়া গেল সে তিনি শুনিতে পাইলেন। মিনিট কয়েক পরে প্রচুর কোলাহল করিয়া অভ্যাগতদের লইয়া মোটর ফিরিয়া আসিল সেও তাঁহার কাণে গেল। কিন্তু তিনি নড়িলেননা, সেইখানেই কাঠের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। বৈঠক বসিলে বেহারা গিয়া সম্বাদ দিল বাবুর শরীর ভাল নয়, তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন।

সেদিন গান জমিলনা, খাওয়ার উৎসাহ ম্লান হইয়া গেল,—সকলেরই বারবার করিয়া মনে হইতে লাগিল বাড়ীর একজন ভ্রমণের ছলে বাহির হইয়া গেছেন, এবং আর একজন তাঁহার বিপুল দেহ ও প্রসন্ন স্নিগ্ধহাস্য লইয়া সভার যে স্থানটি উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন আজ সেখানটা অন্ধকার হইয়া আছে।

(১০)

এদিকে অজিতের গাড়ী আসিয়া কমলের বাটীর সম্মুখে থামিল। কমল পথের ধারের সঙ্কীর্ণ বারান্দায় উপরে দাঁড়াইয়া ছিল, চোখো-চোখি হইতেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। গাড়ীটাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিল, ওটা বিদেয় করে দিন। সুমুখে দাঁড়িয়ে কেবল ফেরবার তাড়া দেবে,—সে হবেনা।

সিঁড়িটার মুখেই পুনরায় উভয়ের দেখা হইল। অজিত কহিল, বিদেয় করে তো দিলেন, কিন্তু ফেরবার সময় আর একটা পাওয়া যাবে ত?

কমল বলিল, না। কতটুকুই বা পথ, হেঁটে যাবেন।

হেঁটে যাবো?

কমল হাসিয়া কহিল, ভয় করবে নাকি? আমি নিজে গিয়ে আপনাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো।

আসুন। এই বলিয়া সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া রান্না-ঘরে আসিয়া বসিবার জন্য কল্যকার সেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া কহিল, চেয়ে দেখুন সারাদিন ধরে আমি কত রান্না রেঁধেচি। আপনি না এলে রাগ কোরে আমি সমস্ত মুচিদের ডেকে দিয়ে দিতাম।

অজিত হাসিয়া বলিল, আপনার রাগ তো কম নয়। কিন্তু তাতে এর চেয়ে খাবারগুলোর ঢের বেশি সদ্ব্যয় হোতো।

এ কথার মানে? এই বলিয়া কমল ক্ষণকাল অজিতের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিজেই কহিল, অর্থাৎ আপনার অভাব নেই,—হয়ত অধিকাংশই ফেলা যাবে,—কিন্তু তাদের অত্যন্ত অভাব। সুতরাং তাদের খাওয়ানোই খাবারের যথার্থ সদ্ব্যয়, এই না?

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এই। এ ছাড়া আর কি!

এ ছাড়া আর কিছু নয়? এই বলিয়া কমল পুনরায় তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ হোলো সাধু লোকদের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার, পুণ্যাত্মাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধির যুক্তি। পুণ্যের খাতায় তারা সদ্ব্যয়ের হিসেবটাকেই চেনে; বহুদিনের সংস্কার তাদের একেই সার্থক সত্য বলে ভাবতে শিখিয়েছে। অথচ, বোঝেনা যে ঐটেই হোলো আসলে ভুয়ো। আনন্দের সুধাপাত্র যে অপব্যয়ের ঐশ্বর্য্যেই বারম্বার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ কথা তারা জান্‌বে কোথা থেকে?

অজিত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ভালো, তাই যদি হয়, মানুষের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ভেতরে কি আনন্দ নেই?

কমল কহিল, না, নেই। কর্ত্তব্যের মধ্যে যে আনন্দ সে দুঃখেরই নামান্তর। তাকে বুদ্ধির শাসন দিয়ে জোর করে মান্‌তে হয়। সেই তো বন্ধন। তাই যদি হোতো, এই যে শিবনাথের আসনে এনে আপনাকে বসিয়েছি ভালবাসার এই অপব্যয়ের মধ্যে আমি আনন্দ পেতাম কোথায়? এই যে সারাদিন অভুক্ত থেকে কত কি বসে বসে রেঁধেচি—আপনি এসে খাবেন ব'লে, এত বড় অকর্ত্তব্যের ভেতরে আমি তৃপ্তি পেতাম কোন্ খানে? অজিত বাবু, আজ আমার সকল কথা আপনি বুঝবেননা, বোঝবার চেষ্টা করেও লাভ নেই, কিন্তু এতখানি উল্টো কথার অর্থ যদি কখনো আপনা থেকেই উপলব্ধ হয়, সেদিন কিন্তু আমাকে স্মরণ করবেন। কিন্তু এখন থাক্, আপনি খেতে বসুন। এই বলিয়া সে পাত্র ভরিয়া বহুবিধ ভোজ্যবস্তু তাহার সম্মুখে রাখিল।

অজিত বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এ ঠিক যে আপনার শেষ কথাগুলোর অর্থ আমি ভেবে পেলামনা, কিন্তু তবুও মনে হচ্চে যেন একেবারে অবোধ্য নয়। বুঝিয়ে দিলে হয়ত বুঝতেও পারি।

কমল কহিল, কে বুঝিয়ে দেবে অজিত বাবু, আমি? আমার দরকার? এই বলিয়া সে হাসিয়া বাকি পাত্রগুলা অগ্রসর করিয়া দিল।

অজিত আহারে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় জানেননা যে কাল আমার খাওয়া হয়নি।

কমল কহিল, জানিনে বটে, কিন্তু আমার ভয় ছিল অত রাতে ফিরে গিয়ে হয়ত আপনি খাবেননা। তাই হয়েছে। আমার দোষেই কাল কষ্ট পেলেন।

কিন্তু আজ সুদ শুদ্ধ আদায় হচ্চে। কথাটা বলিয়াই তাহার স্মরণ হইল কমল এখনও অভুক্ত। মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু আমি একেবারে জন্তুর মত স্বার্থপর। সারাদিন আপনি খান্‌নি, অথচ, সেদিকে আমার হুস নেই, দিব্যি খেতে বসে গেছি।

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, এ যে আমার নিজের খাওয়ার চেয়ে বড়। তাই তো তাড়াতাড়ি আপনাকে বসিয়ে দিয়েছি অজিত বাবু। এই বলিয়া সে একটু থামিয়া কহিল, আর এ সব মাছ-মাংসের কাণ্ড। আমি তো খাইনে।

কিন্তু কি খাবেন আপনি?

ঐ যে। এই বলিয়া সে দূরে এনামেলের বাটিতে ঢাকা একটা বস্তু হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওর মধ্যে আমার চাল ডাল আর আলু সেদ্ধ হয়ে আছে। ঐ আমার রাজভোগ।

এ বিষয়ে অজিতের কৌতূহল নিবৃত্তি হইলনা, কিন্তু তাহার সঙ্কোচে বাধিল। পাছে সে দারিদ্র্যের উল্লেখ করে, এই আশঙ্কায় সে অন্য কথা পাড়িল, কহিল, আপনাকে দেখে প্রথম থেকেই আমার কি যে বিস্ময় লেগেছিল তা বল্‌তে পারিনে।

কমল হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, সে তো আমার রূপ। কিন্তু সেও হার মেনেছে অক্ষয় বাবুর কাছে। তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি।

অজিত লজ্জা পাইয়াও হাসিল, কহিল, বোধ হয় না। তিনি গোলকুণ্ডার মানিক। তাঁর গায়ে আঁচড় পড়েনা। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় লেগেছিল আপনার কথা শুনে। হঠাৎ

যেন ধৈর্য্য থাকেনা,—রাগ হয়। মনে হয় কোন সত্যকেই যেন আপনি আমল দিতে চান্‌না।—হাত বাড়িয়ে পথ আগ্‌লানোই যেন আপনার স্বভাব।

কমল হয়ত ক্ষুণ্ণ হইল। ধীরে ধীরে বলিল, তা হবে। কিন্তু আমার চেয়েও বড় বিস্ময় সেখানে ছিল,—সে আর একটা দিক। যেমন বিপুল দেহ, তেম্‌নি বিরাট শান্তি। ধৈর্য্যের যেন হিমগিরি। উত্তাপের বাষ্পও সেখানে পৌঁছয় না। ইচ্ছে হয়, আমি যদি তাঁর মেয়ে হোতাম।

কথাটি অজিতের অত্যন্ত ভাল লাগিল। আশুবাবুকে সে অন্তরের মধ্যে দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। তথাপি কহিল, আপনাদের উভয়ের এমন বিপরীত প্রকৃতি মিল্‌তো কি কোরে?

কমল বলিল, তা জানিনে। আমার ইচ্ছের কথাই শুধু বোল্‌লাম। মণির মত আমিও যদি তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মাতাম! এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমার নিজের বাবাও বড় কম লোক ছিলেননা। তিনিও এম্‌নি ধীর, এম্‌নি শান্ত মানুষটি ছিলেন।

কমল দাসীর কন্যা, ছোট জাতের মেয়ে, সকলের কাছে অজিত এই কথাই শুনিয়াছিল। এখন কমলের নিজের মুখে তাহার পিতার গুণের উল্লেখে তাহার জন্মরহস্য জানিবার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে তাহার ব্যথার স্থানে অতর্কিতে আঘাত করিয়া বসে এই ভয়ে সে কোন প্রশ্নই করিতে পারিলনা। কিন্তু মনটি তাহার ভিতরে ভিতরে স্নেহে ও করুণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

খাওয়া শেষ হইল। তাহাকে উঠিতে বলায় অজিত অস্বীকার করিয়া বলিল, আগে আপনার খাওয়া শেষ হোক। তার পরে।

কেন কষ্ট পাবেন অজিতবাবু, উঠুন। বরঞ্চ মুখ ধুয়ে এসে বসুন, আমি খাচ্চি।

না, সে হবেনা। আপনি না খেলে আমি আসন ছেড়ে একপাও উঠ্‌বোনা।

বেশ মানুষ ত! এই বলিয়া কমল হাসিয়া আহার্য্যদ্রব্যের ঢাকা খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। কমল লেশমাত্র অত্যুক্তি করে নাই। চাল-ডাল ও আলু-সিদ্ধই বটে। শুকাইয়া প্রায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দিন সে কি খায়, না খায়, সে জানেনা। কিন্তু আজ এত প্রকার পর্য্যাপ্ত আয়োজনের মাঝেও এই স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-নিগ্রহে তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। কাল শুনিয়াছিল দিনান্তে সে একটিবার মাত্র খায়, এবং আজ দেখিতে পাইল তাহা এই। সুতরাং, যুক্তি ও তর্কের ছলনায় কমল মুখে যাহাই কেন না বলুক, বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে তাহার এই কঠোর আত্ম-সংযম অজিতের অভিভূত মুগ্ধ চক্ষে মাধুর্য্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হইয়া উঠিল। এবং বঞ্চনায়, অসম্মানে ও অনাদরে যে কেহ ইহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ও ঘৃণার যেন আর অবধি রহিলনা। কমলের খাওয়ার প্রতি দেখিতে দেখিতে এই ভাবটাকে সে আর কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিলনা। অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, নিজেদের বড় মনে কোরে যারা অপমানে আপনাকে দূরে রাখতে চায়, যারা অকারণে গ্লানি কোরে বেড়ায় তারা কিন্তু আপনার পাদস্পর্শেরও যোগ্য নয়। সংসারে দেবীর আসন যদি কারও থাকে সে আপনার।

কমল অকৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কেন তা' জানিনে, কিন্তু এ আমি শপথ কোরে বল্‌তে পারি।

কমলের বিস্ময়ের ভাব কাটিলনা, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

অজিত বলিল, যদি ক্ষমা করেন তো একটা প্রশ্ন করি।

কি প্রশ্ন?

পাপিষ্ঠ শিবনাথের কাছে এই অপমান ও বঞ্চনা পাবার পরেই কি এই কৃচ্ছ্র অবলম্বন করেছেন?

কমল কহিল, না। আমার প্রথম স্বামী মরবার পর থেকেই আমি এম্‌নি খাই। এতে আমার কষ্ট হয়না।

অজিতের মুখের উপর কে যেন কালী ঢালিয়া দিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আর একবার বিবাহ হয়েছিল না কি?

কমল কহিল, হাঁ। তিনি একজন আসামিয়া ক্রীশ্চান। তাঁর মৃত্যুর পরেই আমার বাবা মারা গেলেন হঠাৎ ঘোড়া থেকে পোড়ে। তখন শিবনাথের এক খুড়ো ছিলেন বাগানের হেড ক্লার্ক। তাঁর স্ত্রী ছিলনা, মাকে তিনি আশ্রয়

দিলেন। আমিও তাঁর সংসারে এলাম। এই রকম নানা দুঃখে কষ্টে পোড়ে এক বেলা খাওয়াই অভ্যেস হয়ে গেল। কৃচ্ছ্র-সাধনা আর কি, বরঞ্চ শরীর মন দুই-ই ভালই থাকে।

অজিত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনারা শুনেছি জাতে তাঁতি।

কমল কহিল, লোকে তাই বলে। কিন্তু মা বল্‌তেন তাঁর বাবা ছিলেন আপনাদের জাতেরই একজন কবিরাজ। অর্থাৎ আমার সত্যিকার মাতামহ তাঁতি নয় বৈদ্য। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, তা' তিনি যে-ই হোন্, এখন রাগ করাও বৃথা আপ্‌শোষ করাও বৃথা।

অজিত কহিল, সে ঠিক।

কমল বলিল, মা'র রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিলনা। বিয়ের পরে কি একটা দুর্নাম রটায় তাঁর স্বামী তাঁকে নিয়ে আসামের চা বাগানে পালিয়ে যান। কিন্তু বাঁচলেননা— কয়েক মাসেই জ্বরে মারা গেলেন। বছর তিনেক পরে আমার জন্ম হ'ল বাগানের বড় সাহেবের ঘরে।

তাহার বংশ ও জন্মগ্রহণের বিবরণ শুনিয়া অজিতের মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বের স্নেহ ও শ্রদ্ধা-বিস্ফারিত হৃদয় বিতৃষ্ণা ও সঙ্কোচে বিন্দুবৎ হইয়া গেল। তাহার সব চেয়ে বাজিল এই কথাটা যে, নিজের ও জননীর এতবড় একটা লজ্জাকর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে ইহার লজ্জার লেশমাত্র নাই। অনায়াসে বলিল মায়ের রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিলনা। যে অপরাধে একজন মাটির সহিত মিশিয়া যাইত, সে ইহার কাছে রুচির বিকার মাত্র! তার বেশি নয়।

কমল বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার বাপ ছিলেন সাধু লোক। চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, সততায়,—এমন মানুষ আমি কম দেখেচি অজিতবাবু। জীবনের উনিশটা বছর আমি তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছিলাম।

অজিতের একবার সন্দেহ হইল এ হয়ত উপহাস করিতেছে। কিন্তু উপহাসচ্ছলেও যে এমন গর্হিত বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে তাহাকে সম্ভ্রমে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেও তাহার বাধিল। কহিল, এ সব কি তুমি সত্যি বোল্‌চ?

কমল বোধ হয় খেয়াল করিলনা। কিন্তু একটু আশ্চর্য্য হইয়াই জবাব দিল, আমি তো কখনই মিথ্যে বলিনে অজিতবাবু। পিতার স্মৃতি পলকের জন্য তাহার মুখের পরে একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি ফেলিয়া গেল। কহিল, এ জীবনে কখনো কোন কারণেই যেন মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা বাক্যের আশ্রয় না নিই, বাবা এই শিক্ষাই আমাকে বারবার দিয়ে গেছেন।

অজিত তথাপি যেন বিশ্বাস করিতে পারিলনা। বলিল, তুমি ইংরেজের কাছে যদি মানুষ, তোমার ইংরিজি জানাটাও ত অন্ততঃ উচিত।

প্রত্যুত্তরে, কমল শুধু একটুখানি মুচকিয়া হাসিল। বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে, চলুন, ও ঘরে যাই।

না, এখন আমি উঠ্‌বো।

বস্‌বেন না? আজ এত শীঘ্র চলে যাবেন!

হাঁ, আজ আর আমার সময় হবে না।

এতক্ষণ পরে কমল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের অত্যন্ত কঠোরতা লক্ষ্য করিল। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা।

ইহার পরে যে কি বলিবে অজিত সহসা খুঁজিয়া পাইল না। শেষে কহিল, তুমি কি এখন আগ্রাতেই থাক্‌বে?

কেন?

ধরো শিবনাথ বাবু যদি আর না-ই আসেন। তাঁর পরে তো তোমার জোর নেই।

কমল কহিল, না। একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের ওখানে তো তিনি রোজ যান, গোপনে একটু জেনে নিয়ে কি আমাকে জানাতে পারবেন না?

তাতে কি হবে?

কমল কহিল, কি আর হবে। বাড়ী-ভাড়াটা এ মাসের দেওয়াই আছে, আমি তা'হলে কালই চলে যেতে পারি।

কোথায় যাবে?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, তোমার হাতে বোধ করি টাকা নেই?

কমল এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

অজিত নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আস্‌বার সময় তোমার জন্যে কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিলাম। নেবে?

না।

না কেন? আমি নিশ্চয়ই জানি তোমার হাতে কিছু নেই। যাও বা ছিল, আজ আমারই জন্যে তা' নিঃশেষ

করেছো। কিন্তু উত্তর না পাইয়া সে পুনশ্চ কহিল, প্রয়োজনে বন্ধুর কাছে কি কেউ নেয়না?

কমল কহিল, কিন্তু বন্ধু ত আপনি নয়।

না-ই হোলাম। কিন্তু অ-বন্ধুর কাছেও ত লোকে ঋণ নেয়? আবার শোধ দেয়। তুমি তাই কেন নাওনা?

কমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে বলেচি আমি কখনোই মিথ্যে বলিনে।

কথা মৃদু, কিন্তু তীরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ। অজিত বুঝিল ইহার আর অন্যথা নাই। চাহিয়া দেখিল প্রথম দিনে তাহার গায়ে সামান্য অলঙ্কার যাহা কিছু ছিল আজ তাহাও নাই। সম্ভবতঃ, বাড়ী-ভাড়া ও এই কয়দিনের খরচ চালাইতে তাহা শেষ হইয়াছে। সহসা বেদনার ভারে তাহার মনের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যাওয়াই কি স্থির?

কমল কহিল, ত ছাড়া উপায় কি আছে?

উপায় কি আছে সে জানেনা। এবং জানে না বলিয়াই তাহার বুকের মধ্যে সূচ বিঁধিতে লাগিল। তথাপি সে শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, জগতে কি কেউ নেই যাঁর কাছে এ সময়েও কিছু সাহায্য নিতে পারো?

কমল একটুখানি ভাবিয়া বলিল, আছেন। মেয়ের মত তাঁর কাছে গিয়েই শুধু হাত পেতে নিতে পারি। কিন্তু আপনার যে রাত হয়ে যাচ্চে। সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দেব কি?

অজিত ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, আমি একাই যেতে পারবো।

তা'হলে আসুন। নমস্কার। এই বলিয়া কমল তাহার শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অজিত মিনিট দুই সেইখানে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ

পরলোকগত ডালচাঁদ সিংঘী

কলিকাতার জৈন সমাজের একজন খ্যাতনামা ধনী, দানশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁহার নাম ডালচাঁদ সিংঘী। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা রাজপুতানা হইতে আসিয়া আজিমগঞ্জের স্থায়ী অধিবাসী হন। পরলোকগত সিংঘী মহাশয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে কলিকাতায় আসিয়া সামান্যভাবে পাটের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অতুলনীয় অধ্যবসায়, সততা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার বলে তিনি এই ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং 'হরিসিং নেহালচাঁদ' নামক তাঁহার ফারমের সুযশঃ এখন দেশবিস্তৃত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিষয়কর্ম্মের সম্পূর্ণ ভার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিং মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়া যোগ-সাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হন; শান্তিপুরের একজন নিষ্ঠাবান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ইঁহার যোগ-গুরু ছিলেন। ইনি শেষ বয়সে যোগসাধনায় বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার দানের সীমা ছিল না; যেমন অতুল ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনই মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন; কলিকাতার চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত নানা স্থানে হাসপাতাল প্রভৃতি নির্ম্মাণে ইনি বহু অর্থ দিয়াছিলেন। ইঁহার এই সকল শুভ-অনুষ্ঠানে দানের পরিমাণ বার লক্ষ টাকার উপর। ভগবান এই দানশীল, যোগসিদ্ধ মহাত্মার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।
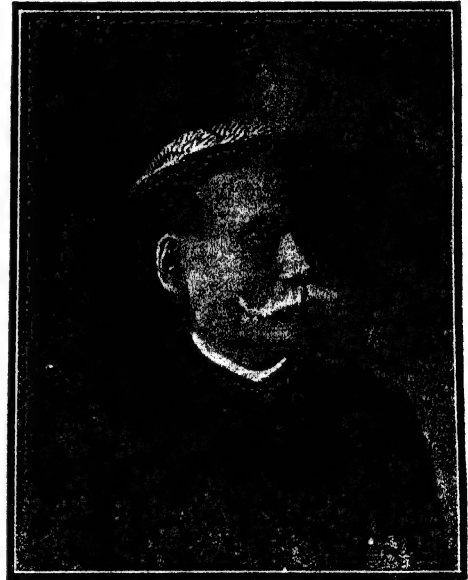
ডালচাঁদ সিংঘী

৺পশুপতিনাথ শাস্ত্রী

আমরা শোকসন্তপ্ত-চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার, হাইকোর্টের উকিল ডাক্তার পশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম-এ, পি এইচ্-ডি মহাশয় বিগত ২১শে মাঘ শনিবার রাত্রি আড়াইটার সময় তাঁহার বাগবাজারের ভবনে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৪৫ বর্ষ পূর্ণ না হইতেই তিনি পরলোকে চলিয়া গেলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা, সংস্কৃত, জর্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, লাটিন ও ইংরাজী প্রভৃতি বহুভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বিদেশী পণ্ডিত সমাজেও তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। এমন সুপণ্ডিত সুধী ব্যক্তির অকাল-বিয়োগে আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনগণের হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

প্রচ্ছদপট-পরিচয়

এ মাসের প্রচ্ছদপটে যে মহাত্মার চিত্র প্রকাশিত হইল, তিনি স্বনামধন্য পরলোকগত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ইনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বারাকপুরের নিকটবর্ত্তী মণিরামপুরে নিজ পৈত্রিক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। পরে দশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আগমন করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেই সময় হইতে ইনি তালতলা অঞ্চলে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে তথায় তাঁহার নামে একটী রাস্তার নামকরণ করা হইয়াছে দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ লক্ষিত হয়। হিন্দুকলেজে অল্পদিন বিদ্যাভ্যাস করিবার পরই সতীর্থগণের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল অধ্যয়নের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। পঠদ্দশাতেই উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পিতৃ-আদেশে তিনি নিমক মহলে চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তখন সল্ট বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন স্বনামখ্যাত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। একদা কথোপকথন প্রসঙ্গে দুর্গাচরণ তাঁহার নিকট স্বীয় অধ্যয়নস্পৃহা জ্ঞাপন করিলে দ্বারকানাথ দুর্গাচরণের পিতাকে পুত্রের পুনরায় অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলেন। র্গাচরণ দ্বিতীয়বার হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু দুই এক বৎসরের অধিক পড়া আর চলিল না। বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও দুর্গাচরণের অধ্যয়নস্পৃহা কমিল না। তিনি গৃহে বসিয়াই নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২১ বৎসর বয়সে দুর্গাচরণ হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার অল্প দিন পরেই হেয়ার সাহেবের অনুমতিক্রমে তিনি প্রত্যহ দুই ঘণ্টাকাল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ পাইয়া বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া তিনি চিকিৎসকের অন্বেষণে বাহির হন, কিন্তু চিকিৎসক লইয়া ফিরিবার পূর্ব্বেই স্ত্রী প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে দুর্গাচরণ মনে বড় আঘাত পান, এবং সেই জন্যই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় তাঁহার আগ্রহ জন্মে। কিছুদিন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পর উভয় কার্য্য একসঙ্গে সম্পাদন করার অসুবিধা দেখিয়া তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নেই সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিলেন, এবং পাঁচ বৎসর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ডাক্তার হইয়া বাহির হইলেন। এই সময়ে বহুবাজারের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ভদ্রলোকের সাংঘাতিক পীড়ায় চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া দুর্গাচরণ যে ব্যবস্থা করিলেন, সেই ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া নবাগত ডাক্তার জ্যাকসন দুর্গাচরণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। নীলকমল বাবু দুর্গাচরণের চিকিৎসা নৈপুণ্যে আরোগ্য লাভ করায় দুর্গাচরণের খ্যাতি-প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়। দুর্গাচরণের চিকিৎসার খ্যাতি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী মনে করিত। যে বাড়ীতে তিনি চিকিৎসার্থ আহূত হইতেন, সেই বাড়ীর লোকেরা রোগীর জীবনরক্ষার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইত। চিকিৎসা ব্যবসায়ে অর্থ-লাভে তাঁহার তাদৃশ আগ্রহ ছিল না। দরিদ্র রোগিগণের নিকট হইতে তিনি প্রায়ই অর্থ গ্রহণ করিতেন না। তথাপি কেবল ধনীদিগের প্রদত্ত দর্শনী হইতেই তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত। পরলোকগত স্বনামধন্য সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তার দুর্গাচরণের মধ্যম পুত্র। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী দুর্গাচরণ নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হন। ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। দুর্গাচরণ স্বয়ং যেমন চিকিৎসা-বিদ্যায় চিকিৎসক-সমাজে অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি বিশ্ববিখ্যাত পুত্রের পিতা বলিয়াও তিনি অশেষ যশের অধিকারী হইয়াছেন। আমরা এ হেন মহ'পুরুষের প্রতিকৃতি প্রকাশের সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলাম

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[৩]

সন্ধ্যার পর কিউল ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দুইজন কুলী ডাকিয়া দ্রব্যাদি লইয়া রমাপদ প্ল্যাট্‌ফর্মে নামিয়া পড়িল। সহযাত্রী ভদ্রলোকটির নাম মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গয়ায় কোনো কার্য্য সারিয়া পরদিন ঝরিয়া যাইবেন।

নমস্কার করিয়া রমাপদ বলিল, "আচ্ছা, আমি তাহলে আসি, বাঁড়ুয্যে মশায়।"

মুরলীধর প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "আসুন। এতক্ষণ আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে সময়টা ভারী আনন্দে কাট্‌ল। এবার কিছুক্ষণ চল্‌বে নিঝ্‌ঝুমের পালা।"

রমাপদ বলিল, "আপনার উপকারের কথা আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে।"

মুরলীধর হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মনকে এরকম বাজে মাল দিয়ে বোঝাই করবেন না—ভাল জিনিষের জন্যে জায়গা রাখবেন।"

মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "না, না, বাজে মাল না;—ভাল জিনিষই।" প্রথমে মুরলীধরের প্রতি তাহার মন বিমুখ হইলেও কিছু কাল আলাপের পরই সে মুরলীধরের অমায়িকতা ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বলিল, "আবার কখনো আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে কি না কে জানে।"

সহাস্যমুখে মুরলীধর বলিলেন, "ভগবানের ইচ্ছা থাক্‌লে হবে।" তাহার পর ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, "সুবিধামত কোনো সময়ে মালপত্র নিয়ে ঝরিয়ায় আস্‌বেন,—কিছু বিক্রী করিয়ে দোবোই। লোকসান হবে না, মোটের মাথায় কিছু লাভ থাক্‌বে ব'লেই মনে হয়।"

রমাপদর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিল, "বিক্রী না হ'লেও মোটের মাথায় লাভ থাক্‌বে। আমি নিশ্চয় যাব।"

"আসবেন।" নিঃশব্দ প্রশান্ত হাস্যে মুরলীধরের মুখ ভরিয়া উঠিল।

দিল্লী-একস্‌প্রেস্‌ আসিতে বিলম্ব ছিলনা,—কুলিরা তাগাদা করিল। পুনরায় মুরলীধরকে নমস্কার করিয়া রমাপদ দ্রব্যাদিসহ সেই প্ল্যাট্‌ফর্মেরই অপরপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। যেদিক হইতে গাড়ি আসিবে রমাপদ চাহিয়া দেখিল সেদিকের আকাশের খানিকটা অংশ অগণ্য লাল সবুজ আলোকে ভরিয়া রহিয়াছে আতসবাজির কদমফুলের মতো। তাহারই মধ্যে দুই একটি সবুজ আলোক-বিন্দুর আহ্বানে অনতিবিলম্বে উন্মত্ত বেগে দিল্লী একস্‌প্রেস্‌ প্ল্যাট্‌ফর্মে আসিয়া দাঁড়াইল।

সমস্ত গাড়িতে অতিশয় ভীড়,—দূরগামী গাড়ি হইতে যে দুই চারজন যাত্রী নামিল তাহার দশগুণ যাত্রী উঠিবার ঠেলাঠেলি লাগিয়া গেল। ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের একটি ছোট কামরা অধিকার করিয়া একটি বাঙালী পরিবার যাইতেছিলেন, সেই গাড়িতে ভিড় অপেক্ষাকৃত কিছু কম ছিল। কুলির মাথায় জিনিষ দিয়া বার দুই তিন অন্যান্য কামরার সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া রমাপদ সেই কামরাটির সম্মুখে দাঁড়াইল, কিন্তু জানালার ধারে দুইজন স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন বলিয়া উঠিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

স্ত্রীলোকদ্বয়ের মধ্যে একজন জানালা দিয়া রমাপদর বিপন্ন অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন; ভিতর দিকে মুখ ফিরাইয়া কাহাকেও সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "ওগো, শুনছ? একটি বাঙালী ভদ্রলোক গাড়িতে জায়গা পাচ্ছেন না। ডেকে নাও।"

এ কথা রমাপদ শুনিতে পাইল, এবং তদুত্তরে অপর ব্যক্তি যে উত্তর দিল তাহা যে তাহার পক্ষে উল্লাসজনক নহে তাহাও বুঝিতে পারিল। তখন বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া অন্য কোথাও আশ্রয়ের চেষ্টায় সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

দেখিতে পাইয়া স্ত্রীলোকটি জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া রমাপদকে বলিলেন, "আপনি এই গাড়িতেই উঠুন। এ গাড়ি আমাদের রিজার্ভ নয়।"

করুণ-নেত্রে যুগপৎ কাতরতা এবং কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া রমাপদ বলিল, "তা না হোক্‌, আপনাদের অসুবিধে হবে।"

"কিছু অসুবিধে হবে না; আপনি আসুন।"

অগত্যা দরজা খুলিয়া রমাপদ প্রবেশ করিল, এবং প্রবেশ

করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে সে দেখিতে উৎসুক হইল সে ব্যক্তিকে যে তাহার উঠিবার প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিল। দেখিল অপর পার্শ্বের বেঞ্চে শয়ন করিয়া কৃশকায় এক ব্যক্তি অর্দ্ধোত্থিত হইয়া অপলক চক্ষে তাহার প্রতি অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। কোটরগত অত ক্ষুদ্র চক্ষুদুটির মধ্যে এত তীব্র দীপ্তি থাকিতে পারে দেখিয়া রমাপদর মনে বিস্ময় এবং উৎকণ্ঠা একই পরিমাণে উৎপন্ন হইল। সঙ্কুচিতভাবে সে বলিল, "এ গাড়িতে উঠে আপনাদের বড়ই অসুবিধা ঘটালাম।"

দৃষ্টি যেমন তীব্র ঠিক তেমনি তীক্ষ্ণ স্বরে সে ব্যক্তি বলিল, "সে জন্যে আমাদের কি করতে বলেন ?"

অপ্রতিভ হইয়া রমাপদ বলিল, "আপনাদের কিছুই করতে বলছিনে—আমিই আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।"

"চাচ্ছেন না কি ? বাঁচা গেল!" বলিয়া ধপ্ করিয়া সে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। পর মুহূর্ত্তেই পুনরায় অর্দ্ধোত্থিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "আপনারা ক' জন আছেন ?"

উত্তরে সন্তুষ্ট করা যাইতে পারিবে সেই ভরসায় ঈষৎ উৎফুল্লমুখে রমাপদ বলিল, "আর কেউ নেই—আমি একা।"

"একাতেই বড় বড় এই তিনটে ট্রঙ্ক ?—একা না হ'লে আর ক'টা আনতেন ?"

অঙ্ক কষিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া নিরুপায় বিমূঢ়তায় রমাপদ রমণী দুটির প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিল, প্রথমোক্তা রমণীটিও প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে অগ্নি বর্ষণ করিতেছেন,—তাহা যে তাঁহারই আত্মীয় পুরুষটির বিসদৃশ আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ তদ্বিষয়ে রমাপদর সন্দেহ রহিল না। পার্শ্বোপবিষ্টা তরুণীটির মুখ কিন্তু রুদ্ধ-গভীর সুমিষ্ট হাস্যে ভরিয়া গিয়াছিল ;—দেখিয়া রমাপদ মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! বুঝিল, ব্যাপারটার মধ্যে কেবলমাত্র উৎকণ্ঠারই নয়,—কৌতুকেরও একটা দিক আছে। তখন তাহার মনের মধ্যে বিরক্তি, বিস্ময় এবং ক্রোধের যে একটা মিশ্র ভাব আসিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহাকে সহজে অপসৃত করিয়া সে নিজের দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিতে মনোযোগী হইল।

বঙ্কের উপর অথবা বেঞ্চির নীচে ট্রঙ্কগুলি রাখিবার স্থান ছিল না, সে জন্য রমাপদ ষ্টেসনের যেদিকে গাড়ি লাগিবে না সেদিকের দরজার নিকট একটির উপর অপরটি করিয়া তিনটি ট্রঙ্ক রাখাইল।

"এবার নিজে ওর উপর চ'ড়ে বস্‌বেন না কি ?"

অবরুদ্ধ হাস্যকে আর নিঃশব্দতার সীমার মধ্যে আটকাইয়া রাখা গেল না, তরুণীর ওষ্ঠাধর অতিক্রম করিয়া তাহার অস্ফুট মৃদু ধ্বনি রমাপদর শ্রুতিগোচর হইল। রৌদ্রের পার্শ্বে ছায়ার মত অপর রমণীর ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখেও নিঃশব্দ-নিরুদ্ধ হাস্য আসিয়া উপস্থিত হইল—তিনটি ট্রঙ্কের উপরে সেই সু-উচ্চ আসনে চড়িয়া বসিবার প্রস্তাবের মধ্যে এমনই একটা কৌতুকের ব্যঞ্জনা ছিল।

রমাপদও হাসিয়া ফেলিল ;—বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা ক'রে দেখুন, ও-রকম অমনুষ্যোচিত কোনো আচরণই আমি করব না।"

রমাপদর উত্তর শুনিয়া রমণী দুইজন ঈষৎ উচ্চ রবে হাসিয়া উঠিলেন।

"দেখা যাক্।" বলিয়া সেই ব্যক্তি ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল।

কুলিদের পাওনা এবং পুরস্কারের দাবী মিটাইয়া রমাপদ ফিরিয়া দেখিল সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে কখন অলক্ষিতে রমণী দুইটি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের ধারের সমস্ত বেঞ্চিটা তাহার জন্য ছাড়িয়া দিয়া মাঝখানের বেঞ্চিতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। সে বেঞ্চিতে চার পাঁচ বছরের একটি বালক ঘুমাইতেছিল—তাহার পদতলে মাত্র ঋজু হইয়া বসিবার মতো উভয়ের স্থান হইয়াছে।

করজোড়ে বিনীত স্বরে রমণীদের উদ্দেশে রমাপদ বলিল, "আশ্রিতকে অপরাধী করবেন না। আপনারা যেমন ছিলেন এসে বসুন। আমি আমার বসবার স্থান করে নিচ্ছি।"

"কোথায় শুনি ?"

অর্দ্ধোত্থিত অগ্নি-নেত্র ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রমাপদ বলিল, "ধরুন, আমিইত খোকার পাশে বস্‌তে পারি"

"একেবারে আমাদের মাঝখানে ? ও-পাশে উঁরা, আর এ-পাশে আমি ?"

তরুণীটি রমাপদর দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "মা বলছেন, আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না—আমাদের কোনো কষ্ট হচ্চে না—আপনি বসুন।"

"মাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু বসতেই যে হবে তার কি মানে আছে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি আমার পথটুকু কাটিয়ে দিতে পারব।" বলিয়া রমাপদ দরজার সম্মুখে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন কিউল নদীর পুলের উপর দিয়া গাড়ী সশব্দে চলিয়াছিল।

অস্ফুট বাক্য এবং চলাফেরার শব্দে রমাপদ বুঝিতে পারিতেছিল পিছন দিকে একটা নূতন কোনো ব্যবস্থা হইয়াছে। ক্ষণকাল পরে সে যখন শুনিল "এবার আপনি বসুন।" তখন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মাঝের বেঞ্চি হইতে নিদ্রিত বালকটিকে তুলিয়া পাশের বেঞ্চিতে শোয়ানো হইয়েছে—এবং বাকি অর্দ্ধেক তাহারই উদ্দেশে খালি রহিয়াছে। মাঝের সমস্ত বেঞ্চখানি স্ত্রীলোকদের অধিকারে আসিয়াছে।

আর আপত্তি করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া রমাপদ বেঞ্চির উপর বসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দ্রুত-ধাবমান বাহিরের তিমিরাচ্ছন্ন তরু-পল্লবের দিকে চাহিয়া রহিল।

"বাবা, এবার আপনাকে খাবার দোবো?"

"রোসো! আগে একটু ঠাণ্ডা হই! জঠরাগ্নি ত' মাথায় চড়েছে!"

"অনর্থক।"

রমাপদ বুঝিল শেষোক্ত বাক্যটি কটুভাষী ব্যক্তির স্ত্রীর ভর্ৎসনা। মনে মনে সে একটু হাসিল,—ভাবিল, লোকে যা বলে ঠিক তাই,—এ সংসারটি একটি চিড়িয়াখানা! কত রকমের লোকই আছে! গয়ার ট্রেনে যাইতেছেন মুরলীধর বাবু, মুখে মিষ্ট কথার মুরলী লাগিয়াই আছে। আর এ ট্রেনে চলিয়াছেন মুদ্গরধর বাবু, হাতে মুগুর ঘুরিতেছেই! অথচ সঙ্গে এ দুটি মাতা-কন্যা,—ঠিক যেন মরুভূমি ভেদ করিয়া মন্দাকিনী ধারা! আশ্চর্য্য! এত সান্নিধ্যেও উভয় পক্ষের মধ্যে একটু সামঞ্জস্য হইল না!

কিছুক্ষণ অবিশ্রান্ত ছুটিয়া গাড়ি মোকামা জংশনে আসিয়া দাঁড়াইল। এখানে পঁচিশ মিনিট গাড়ি দাঁড়াইবে—রমাপদ তাড়াতাড়ি নাবিয়া পড়িয়া প্ল্যাট্‌ফর্মে পায়চারী করিতে লাগিল। তবু ত' কিছুক্ষণ দূরে থাকিয়া সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলা যাইবে!

পঁচিশ মিনিটের অবসানে গার্ড হুইসিল্ দিলে রমাপদ গাড়ির উপর উঠিয়া দেখিল তাহার বসিবার স্থানের একাংশ জুড়িয়া এক রেকাব খাবার ও এক গ্লাস জল। খাবার প্রচুর—লুচি, তরকারী, আচার, পাঁপর, নানাবিধ মিষ্টান্ন, ছাড়ানো কমলা লেবু—কিছুরই অভাব ছিল না।

রমাপদ খাবারের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "এ কি খোকার জন্যে।"

কানে আসিল অস্ফুট স্বরে, "বুড়ো খোকার জন্যে।"

কান লাল হইয়া উঠিল। একবার ভাবিল পাত্র শুদ্ধ খাবারগুলা গাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দেয়,—কিন্তু সে-রকম কিছু করিবার আগেই শুনিতে পাইল তরুণীটি কাতর কণ্ঠে বলিতেছে, "আপনারই জন্যে মা একটু খাবার দিয়েছেন—না খেলে তিনি ভারী দুঃখিত হবেন!"

এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "আচ্ছা।" তাহার পর হাত ধুইয়া ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ চিত্তে বসিয়া বসিয়া নিঃশেষে সমস্ত খাবারটি আহার করিয়া গ্লাসের জলে রেকাবটি ধুইয়া রাখিয়া দিল। ঘুমে চোখ ভারী হইয়া আসিয়াছিল—কখন যে সে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কিছুই বুঝিতে পারে নাই;—কোলাহলে যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তখন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ি মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছে। তাড়াতাড়ি কুলি ডাকিয়া রমাপদ নামিয়া পড়িল।

প্ল্যাট্‌ফর্ম হইতে সে যুক্ত করে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনার যত্ন ও দয়ার কথা চিরদিন মনে থাক্‌বে।"

রমণীটি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তা থাকুক্ আর নাই থাকুক, আর অন্য কিছু যেন মনে না থাকে।"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "আচ্ছা, তাই চেষ্টা করব। তবে মনে যদি নিতান্তই থাকে ত' নারকোলের শাঁসকে নিয়ে নারকোলের খোলা যেমন থাকে তেমনিই থাক্‌বে।"

ও-পাশের বেঞ্চি হইতে শোনা গেল, "যাবার সময়ে দোরটা বন্ধ ক'রে গেলে ভাল হয়।"

মৃদুস্মিত মুখে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া আর একবার রমণীকে প্রণাম করিয়া রমাপদ প্রস্থান করিল।

বম্বে মেল আসিতে প্রায় সাড়ে চারঘণ্টা বিলম্ব ছিল, রমাপদ দ্রব্যাদি লইয়া প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর একটা বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। মনে পড়িল মাত্র আট-দশ মাইল দূরে তাহার স্ত্রী ও পুত্র অবস্থান করিতেছে। ইচ্ছা করিলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তথায় সে উপস্থিত হইতে পারে। মনটা একবার

সবেগে দুলিয়া উঠিল। কিন্তু তখনি মনের ভিতরে চারিদিক হইতে যত কিছু কঠোরতা আহরণ করিয়া সে একান্তমনে বলিতে লাগিল, না, না, যত তোমাদের নিকটে যাব, তত তোমাদের কাছ থেকে দূর হব! তোমাদের ছাড়া ভিন্ন তোমাদের পাবার আর অন্য কোনো উপায় নেই! যত নিকট তত দূর, যত দূর তত নিকট!

প্রত্যূষে বম্বে মেল উপস্থিত হইলে রমাপদ কোনো প্রকারে তাহাতে চড়িয়া বসিল। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে সে উন্মুখ হইয়া কাশীর অভিমুখে চাহিয়া রহিল—ট্রেনের শব্দ তখন পুনরায় সুর ধরিয়াছিল, চলিলাম, চলিলাম, চলিলাম, চলিলাম!

(ক্রমশঃ)

মৌন সঙ্গী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

একটি নারিকেলের শাখা বাতায়নের ফাঁকে
কি জানি কোন্ কাজল পরায় ক্লান্ত নয়নটাকে!
চারিধারে জীবন-কারার পাষাণ-গাঁথা ঘর,—
তারি মাঝে এই নয়নের ঐটুকু নিভর।

একটি নারিকেলের শাখা, তার বেশী সে নয়,
ক্ষণে ক্ষণে বুলায় মনে এ কোন্ পরিচয়।
মৌন দিনের সঙ্গী আমার, মৌন রাতের সাথী—
বুকের বোঝা চায় সে নিতে স্নিগ্ধ আঁচল পাতি;
চৈত্রে তাহার সবুজ সাড়ীর শ্যামল শোভা দোলে,
আষাঢ়ে নীল চিকণ চিকুর কালো মেঘের কোলে;
শ্রাবণে তার সিক্ত নয়ন কোন্ কাঁদনে ভিজে'
মর্ম্মরিয়া কাণের কাছে কইতে আসে কি যে!
দিনে রাতে সহস্রবার ব্যাকুল বাহুডোরে
পরশখানি কেঁপে কেঁপে জানাতে চায় মোরে!

কোথাও যদি যাই সে সরে' প্রয়োজনের মাঝে,
ধুলাভরা এ ধরণীর ক্লান্তি-কঠিন কাজে,
সন্ধ্যাবেলায় যেমনি ফিরি, অম্নি দেখি চেয়ে—
ব্যথাটি তার পড়ছে ঝরে' সহস্রদল বেয়ে!
পুঞ্জীভূত দিনের দাহ, গ্লানির আবর্জনা
দরদভরা কোমল করে করে সে মার্জ্জনা;
স্নিগ্ধ শীতল বাতাসটি তার বুলিয়ে চোখে মুখে
অস্থিরতার ইঙ্গিতে সে বাঁধবে যেন বুকে!

একটি নারিকেলের শাখা, তার বেশী সে নয়,
শিয়রে মোর দুলায় তাহার অনন্ত বিস্ময়।
চেয়ে চেয়ে চিকণ আভায় পিছলে পড়ে আঁখি—
মনের মাঝে দোলটি শুধু নিত্য ধরে' রাখি।

সাহিত্য সংবাদ

নবপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত অজ্ঞেয়বাদ"—১৲
শ্রীমৃগেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত "মুক্তি-পথ"—২৲
শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণরায় প্রণীত "তরুণ-বাঙালী"—১৷৹
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার প্রণীত "ডাক্তারের মুষ্টিযোগ" ৸৹ ও 'যমালয়ের ফেরত"—৸৹
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত "নীহারিকা"—১৲
শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ প্রণীত "নারী-মঙ্গল"—৸৹
শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ প্রণীত "পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী রামানন্দ"—২৲
শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক 'আরবি হুর্'—১৲

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত সচিত্র সাহারা প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য দেড়টাকা। উক্ত গ্রন্থকারের আর একখানি পুস্তক 'কৃষ্ণকান্তের উইলের আলোচনা'ও প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য আট আনা।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
Of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA

চৈত্র—১৩৩৪

দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চদশ বর্ষ	চতুর্থ সংখ্যা

রাস ও দীপালী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি

কোন্ দিন বা কোন্ তিথিতে কি করিতে হইবে, কি কৃত্য, তাহা আমাদের পাঁজিতে লেখা থাকে। সকলের পক্ষে সকল কৃত্য নয়, সকলে সকল কৃত্য করেন না। কিন্তু হিন্দুমাত্রেরই কতকগুলি কৃত্য আছে। সেগুলি সাধারণ। যেমন মহালয়ার দিন শ্রাদ্ধ, দীপালী অমাবস্যায় দীপদান। একটা প্রশ্ন স্বতঃ মনে আসে, কেন সে দিনে সে কৃত্য, কেনই বা সে কৃত্য সেরূপ। কার্য ত দেখিতেছি, হেতু কি? স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ বলেন, এই দিন ইহা করিবে। কিন্তু অন্য দিন না করিয়া কেন সেই দিন, এবং কেনই বা সেই কৃত্য, তাহার উত্তর দেন না। এই কেন-র উত্তর নানা জনের বুদ্ধিতে নানা আকার ধরে। কিন্তু কেন-র কেন খুজিতে খুজিতে শেষে বলিতে হয়, জানি না; অতীত কালে, দূর অতীত কালে, কি ঘটিয়াছিল, তখনকার লোকে কি ভাবিতেন, কে জানে।

তথাপি কৌতূহল থাকিয়া যায়, সদুত্তর পাইবার ইচ্ছা হয়। সদুত্তরও সেটা, যেটায় কৃত্যের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান, এবং তদনুরূপ অন্য কৃত্য বুঝিতে পারা যায়। প্রদেশে প্রদেশে কৃত্যের তিথির এবং কদাচিৎ আকারের ভেদ আছে। এখানে দীপালী অমাবস্যার ও রাস পূর্ণিমার কৃত্য আলোচনা করিতে যাইতেছি।

পাঠকের স্মরণ নিমিত্ত এখানে আলোচ্য পক্ষান্ত পর্বগুলি, এবং আবশ্যক নক্ষত্রের নাম দেওয়া যাইতেছে।

১। মহালয়া অমাবস্যা। মহালয়া পার্বণ শ্রাদ্ধ। পর দিন নবরাত্রি আরম্ভ।

২। আশ্বিন পূর্ণিমা। কোজাগরী, কৌমুদী পূর্ণিমা। প্রদোষে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। রাত্রি জাগরণ, অক্ষক্রীড়া।

৩। দীপালী অমাবস্যা। দীপান্বিতা পার্বণ শ্রাদ্ধ। প্রদোষে উল্কাদান, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা, অলক্ষ্মীপূজা। পূর্বদিন নরক বা ভূত চতুর্দশী। পরদিন দ্যূত প্রতিপৎ. প্রদোষে বলিদৈত্য পূজা।

৪। কার্তিক পূর্ণিমা। কৌমুদী ও রাসপূর্ণিমা। কার্তিকী মন্বন্তরা। উত্তর ভারতে ত্রিপুরোৎসব, দীপদান। পূর্বদিন বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী।

৫। অমাবস্যা। ওড়িষ্যার দীপাবলী অমাবস্যা।

নক্ষত্র। ১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৪ রোহিণী, ৫ মৃগশিরা, ১০ মঘা, ১১।১২ ফল্গুণী, ১৬ বিশাখা, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৯ মূলা। যে নক্ষত্রে এক বিষুব হয়, তাহার চতুর্দশ নক্ষত্রে অন্য বিষুব, সপ্তমে ও একবিংশে দুই অয়ন।

পরে দেখা যাইবে, দীপালী ও রাস, দুই-ই নববর্ষে প্রবেশ কালে হইত, দুই-ই নববর্ষের উৎসব। এখনকার নববর্ষ নয়; প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের পিতামহগণ দীপালী অমাবস্যার পরদিন হইতে নূতন বৎসর ধরিতেন, আমরা সে রাত্রে গৃহদ্বার দীপের আলী কি-না পঙ্‌ক্তি দ্বারা শোভিত করিয়া পূর্বস্মৃতি অদ্যাপি রক্ষা করিতেছি। এই অমাবস্যার পরবর্তী পূর্ণিমা, রাস-পূর্ণিমা। মণ্ডলাকারে নৃত্যের নাম রাস। নর-নারীর একত্র মণ্ডলাকালে নৃত্য সাঁওতালদিগের মধ্যে আছে, তাহারা এই প্রকার নৃত্যকে 'কারাম্' বলে। বোধ হয় পূর্বকালে এই প্রকার নৃত্য গোপ-গোপীগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এক সময়ে রাস পূর্ণিমায় বর্ষ শেষ ও বর্ষ আরম্ভ হইত, রাত্রি দ্বিপ্রহরে রাসোৎসবের কাল। এই দিনের বর্ষ-প্রবেশ, দীপালীতে বর্ষ-প্রবেশ অপেক্ষা প্রাচান।

দীপালী অমাবস্যার কৃত্য

দীপালী শব্দের অপভ্রংশে দিআলী নাম। দিআলী হয় অমাবস্যা তিথিতে, এবং অমাবস্যা মাত্রেই শ্রাদ্ধের দিন। সুতরাং দিআলী দিনে শ্রাদ্ধ, নূতন কিছু নয়। শ্রাদ্ধের সময় দীপ দিতে হয়, এই শ্রাদ্ধের সময়ও দিতে হয়। এই হেতু মনে হইতে পারে, দীপালী, শ্রাদ্ধের অঙ্গ। কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যেক অমাবস্যা দীপান্বিতা হইত। তা ছাড়া, শ্রাদ্ধ হয় দিবাভাগে, দীপালী হয় প্রদোষে। বস্তুতঃ পূর্বদিন চতুর্দশী তিথিতে শ্রাদ্ধ বিহিত। এই চতুর্দশীর নাম ভূত চতুর্দশী, কিন্তু প্রায়ই অমাবস্যায় গিয়া পড়ে। প্রদোষে প্রথমে লক্ষ্মীপূজা। এই লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী। এই পূজার পর উল্কাদান, তার পর দীপালী। উল্কা কি-না আগুন-নুড়া; পাট-কাটি, শণ-কাটি, শর-কাটি প্রভৃতির ধারণযোগ্য প্রজ্বলিত অগ্নি। চলিত ভাষায় বলে ইঁজল-পিঁজল, হয়ত সংস্কৃত ইন্ধন-পিঞ্জ। নিশ্চয়ই কাহাকেও দগ্ধ করা হয়। কেহ বলেন, মৃত্যুর পর যাহার দেহ দাহ করা হয় নাই, তাহার দাহের নিমিত্তে উল্কা, কেহ বলেন ভূতপ্রেত অপসারণের নিমিত্তে, কেহ বলেন অলক্ষ্মীকে দাহ করিবার নিমিত্তে। কেহ কেহ অলক্ষ্মীর পূজাও করে। কিন্তু বোধ হয় এই পূজা আধুনিক। কারণ যাহাকে ঝাঁটা মারিয়া কুলার বাতাস দিয়া বহিষ্কৃত করা হয়, তাহার পূজা কে করিতে চাহিবে? দীপবৃক্ষ সর্বত্র দিতে হইবে। দেবালয়ে ও মঠে, বাসগৃহে ও গো-গৃহে, চত্বরে ও চতুষ্পথে, শ্মশানে ও বৃক্ষমূলে, এমন কি গিরি ও গুহায়, সর্বত্র। কৃষকেরা মাঠে অগ্নি-ক্রীড়া করে। এই সব দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন স্বাস্থ্য-ও শস্য-হানিকর কীট-পতঙ্গের ধ্বংস সাধন, উল্কা ও দীপালীর উদ্দেশ্য। কার্তিক মাস জর-জ্বালার সময়; আগুন জ্বালিলে হাওয়া পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু দীপালী ত নূতন নয়। পূর্বকালের কার্তিক মাসে যে ঋতু ছিল, এখন সে ঋতু নাই, পূর্বকালের ঋতু এখন ভাদ্র মাসে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই ব্যাখ্যা লাগিতেছে না। বিশেষতঃ পুরাণে ইহাও আছে, এই দিন নূতন বস্ত্র পরিধান, গন্ধমাল্য ধারণ, ক্রয়-বিক্রয় স্থান বস্ত্র ও পুষ্পমাল্য দ্বারা সুশোভন, কুটুম্ব ও বান্ধব সহ উত্তম ভোজন এবং অন্ন দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্তকে তৃপ্ত করিতে হইবে। এই দিনের রাত্রির নাম সুখ-রাত্রি। অতএব পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের সহিত এই উৎসবের সম্বন্ধ নাই। দুই কৃত্য পৃথক, উভয়ের হেতু এক বলিয়া এক দিনে বস্তুতঃ দুই তিথিতে সম্পন্ন হয়। দীপালীর পর দিন প্রত্যূষে পাশা খেলিতে হয়; এই হেতু এই দিনের নাম দ্যূতপ্রতিপৎ। দ্যূত দ্বারা ভাগ্যনির্ণয়, এই কৃত্যের উদ্দেশ্য। এই দিন যাহার সুখে যায়, সম্বৎসর তাহার ভালয় কাটে। এই দিন আর এক কৃত্য আছে, বলীদৈত্য পূজা। বলী শব্দের সামান্য অর্থ বলবান্; কিন্তু এখানে অর্থ মহিষ বা বৃষ বোধ হয়। বলীদৈত্য, মহিষাসুর। দীপালীর পূর্বদিন নরক বা ভূত চতুর্দশী। এই দিন সন্ধ্যার পর লোকে চৌদ্দটি দীপ দিয়া থাকে। বোধ হয় চৌদ্দপুরুষের উদ্দেশে চৌদ্দটি দীপ।

এই তিন দিনের কৃত্য নূতন প্রবর্তিত নয়। এককালে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহার প্রমাণ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে পাওয়া যায়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু

অমাবস্যার দিন ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দান করিয়া শ্রাদ্ধকর্ম সমাপন করেন, অধিকাংশ তাহাও করেন না। কিন্তু দীপালী অমাবস্যার পূর্ব অমাবস্যায়, মহালয়া অমাবস্যায়, শ্রাদ্ধ করেন; নিম্ন শ্রেণী সে দিন কিছুই করে না। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রাচীন স্মৃতি অদ্যাপি বদ্ধমূল হইয়া আছে, উচ্চ শ্রেণী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, তাহা পরে দেখা যাইবে। ওড়িষ্যায় দেখিয়াছি সেখানে দীপালী অমাবস্যা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে একটা বড় পরব, তাহাদের "বরগড়া"; এখানে বাঁকুড়ায় দেখিতেছি বাউরীদের মধ্যে "বড় পরব", চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ। প্রাতে পুরাতন পাকের হাঁড়ী ফেলিয়া দিয়া ঘর-দুয়ার নিকাইয়া গৃহিণী স্নান-শুচি হইয়া নূতন বস্ত্র পরিয়া নূতন হাঁড়ীতে প্রচুর অন্ন পায়স ও যথাসাধ্য ব্যঞ্জন পাক করিয়া মার্জিত গৃহে স্থাপন করে, এবং দীপ জ্বালিয়া পিতৃপুরুষের নামে অন্ন ব্যঞ্জন উৎসর্গ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসে। এই রূপে শ্রাদ্ধকর্ম নিষ্পন্ন হয়, পরে পরিজনবর্গ সে অন্ন ভোজন করে। সকলে নূতন বস্ত্র পরে, এবং অর্থ থাকিলে জামাতা প্রভৃতিকে দিয়া তাহাদের আদর করে। প্রদোষে দীপালী ত আছেই। আশ্চর্য এই, সাঁওতালেরাও, যাহাদের ঠাকুর দেবতা ও পরব আমাদের মতন নয়, তাহারাও এই রূপ শ্রাদ্ধ করে, বলে "ভাগুান্", নূতন কাপড় পরে, দিবাভাগ আহ্লাদে কাটায়, প্রদোষে দীপ দিয়া সাঁওতালনারী দল বাঁধিয়া নৃত্যগীত করিয়া বেড়ায়, পুরুষেরা পরের দ্রব্য ফলমূলাদি লুণ্ঠন করিতে বাহির হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্য এক স্থানে রাখে, পরদিন প্রাতে সকলে ভাগ করিয়া লইয়া দ্যূত প্রতিপৎকে বীর প্রতিপৎ করে। বস্তুতঃ বীর প্রতিপৎ নামও আছে। ভাগ্যলক্ষ্মী বীরের বশীভূত, কাপুরুষের নয়। আরও আশ্চর্য, দীপালীর পূর্বদিন আর এক উৎসব করে, "সহরায়", বাঙ্গালায় অর্থ বন্ধন। বড় বড় বৃষ বা মহিষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করে। অতএব দেখা যাইতেছে, ইহারাই বলী-প্রতিপৎ ও বীর-প্রতিপৎ দুই নামই সার্থক করিতেছে, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কোন্ অতীত কালে ইহারা হিন্দুদের উৎসবে যোগ দিয়াছিল, অদ্যাপি তাহা ভুলিতে পারে নাই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই রূপ কৃত্য থাকিবার কথা।

দেখা যাইতেছে, দীপালী অমাবস্যা যে-সে অমাবস্যা নয়, বৎসরে ১২টা অমাবস্যার মধ্যে ইহার বিশেষ আছে। এই বিশেষের হেতু কি, এবং ইহার উৎপত্তিই বা কবে?

মাস বৎসর অয়ণ চলন

সূর্যের প্রকাশ দ্বারা দিবা ভাগ হইতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা এক দিবা হইতে অন্য দিবা পৃথক্ করিতে পারা যায় না। এই হেতু পূর্বকালে রাত্রি দ্বারা দিন গণা হইত, চন্দ্র দেখিয়া চান্দ্রদিন গণনার রীতি হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র সহজে বুঝিতে পারা যায়, বলা হইত পূর্ণিমার পর এত রাত্রি গত। আমরা বাঙ্গালা দেশে সূর্যের দিন ও মাস গণিয়া লোক-ব্যবহার করি, কিন্তু ভারতের অধিকাংশ স্থানে পূর্বকালের রীতি চলিয়া আসিতেছে, লোক-ব্যবহারেও চান্দ্র দিন বা তিথি এবং চান্দ্রমাস বা 'মাস' চলিতেছে। 'মাস' শব্দের মূলে 'মাস্' কি-না চন্দ্র, এবং পূর্ণিমার এক নাম পৌর্ণমাসী আছে, অর্থাৎ যে তিথিতে মাস্ পূর্ণ হয়। আমরাও প্রাচীন রীতি ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারি নাই; যখন বলি আজ মাসের ১০ই, তখন বলি মাসের দশমী (তিথি)। পনর তিথিতে এক পক্ষ, দুই পক্ষের মধ্যস্থলে পর্ব, কি-না সন্ধিস্থান। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দুই পর্ব। অর্দ্ধরাত্রে পর্বসন্ধি।

চন্দ্রের পথ আকাশে যেন বাঁধা আছে, এ তারা সে তারার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোনও এক তারার নিকট হইতে গিয়া সে তারায় ফিরিয়া আসিতে চন্দ্রের ২৮ রাত্রি লাগে, চন্দ্র যেন এক এক রাত্রি এক এক তারার সহিত বাস করেন। কবি দেখিলেন, তারাগুলি কন্যা, চন্দ্রের সহিত তাহাদের বিবাহ দিলেন, চন্দ্র তারা-পতি হইলেন। যে তারার নিকটে চন্দ্র পূর্ণ হন, সে তারার নামে পূর্ণিমার নাম হইল। কৃত্তিকা তারার নিকটে কৃত্তিকা-সম্বন্ধী অর্থাৎ কার্তিকী পৌর্ণমাসী, বিশাখার নিকটে বৈশাখী পূর্ণিমা, ইত্যাদি। অক্লেশে তারা চিনিবার অভিপ্রায়ে নিকটবর্ত্তী তারা লইয়া এক এক রূপ কল্পিত ও নক্ষত্র নাম প্রচলিত হইয়াছিল।

কিন্তু প্রত্যেক নক্ষত্রের নিকটেই পূর্ণিমা হইতে পারে। কোন্ নক্ষত্রে পূর্ণিমাকে 'মাসের' শেষ বা আরম্ভ ধরা যাইবে? চন্দ্রের ন্যায় সূর্যও নক্ষত্রের পাশ দিয়া গমন করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ছয় মাস দক্ষিণ হইতে উত্তরে, ছয় মাস উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করিয়া

দুই অয়নে এক বৎসর পূর্ণ করিতেছেন। বৎসরের চারিটি দিনে বিশেষ আছে; উত্তরায়ণ দিনে দীর্ঘতম রাত্রি, দক্ষিণায়ণ দিনে দীর্ঘতম দিবা, এবং মধ্যে দুই বিষুব দিন সমরাত্রি-দিবা। এই চারির যে-কোনও দিন বৎসর আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। যে দিন বৎসর আরম্ভ, সে দিন মাসেরও আরম্ভ ধরিতে হইবে। ঋগ্‌বেদে আছে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৎসর আরম্ভ হইত। চারিটি বিশেষ দিনের মধ্যে এই পূর্ণিমা রবির উত্তরায়ণ দিনে হইত, অপর তিন দিনে হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ফাল্গুন মাস; ইহার তিনমাস পূর্বে মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণিমায় অর্থাৎ মার্গশীর্ষ মাসে শরৎ বিষুব হইত। মার্গশীষ মাস হায়ণ কি না বৎসরের অগ্র; এই হেতু ইহার অপর নাম অগ্রহায়ণ চলিত হইয়াছিল। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও এই কথা বলিয়াছেন।

বারটি নক্ষত্রের নামে বারটি মাসের নাম স্থির হইয়া গেলে বার মাসের বার আদিত্য বা সূর্যের নাম হইয়াছিল। সুতরাং মাস বলি, আর আদিত্য বলি, বৎসরের একই কাল বুঝাইত। আদিত্যগুলি অ-দিতি অ-খণ্ড রবিপথের সন্তান। কিন্তু বারটি আদিত্যে বারটি পূর্ণিমা বা 'চাঁদ' হইয়া ১১।১২টি তিথি অধিক হয়। ত্রিশ আদিত্যে প্রায় এক 'মাস' অধিক দাঁড়ায়। ঋগ্‌বেদে দেখি ঋষিগণ এই অধিক মাস ত্যাগ করিতেন, বার আদিত্যের সহিত বার মাসের ঐক্য রাখিবার চমৎকার উপায় উদ্‌ভাবন করিয়াছেন। এই হেতু কার্তিক মাসে অদ্যাপি কৃত্তিকা নক্ষত্রে, অগ্রহায়ণ মাসে অদ্যাপি মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইতেছে। এই যে সন্ধ্যার পর অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ব আকাশে কাল-পুরুষ নক্ষত্র দেখিতেছি, সে যে ভারতের কত কাল দেখিয়া আসিতেছে, কখনও পিশাচী চণ্ডালী, কখনও অসুর দৈত্য, কখনও মৃগ মেষ মহিষ, কখনও বামন বলী ইত্যাদি রূপ ধরিয়া কত রাজ্যের কত উত্থান পতন দেখিয়াছে, সে সব স্মরণ হইলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কবি কামচারী মেঘকে বিরহবার্তার দূত করিয়াছিলেন। এই নক্ষত্র মায়াবী, দেশ বিদেশে নানা উপাখ্যানে স্বীয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

বৎসরের ঋতুভাগ, কোন্ মাসে শীত কোন্ মাসে বর্ষা, কোন্ মাসে শস্য বুনিতে হইবে, কোন্ মাসে শস্য পাকিয়া উঠিবে, ইত্যাদি না জানিলে প্রাণরক্ষা দুষ্কর। বেদের ঋষিগণ এই অভিপ্রায়ে আকাশে নক্ষত্র দেখিতেন, চন্দ্র সূর্যকে লাঙ্গলের এক জোয়ালে বাঁধা বৃষের ন্যায় চালাইবার নিমিত্তে "অধিক" মাসকে মল মাস করিয়াছিলেন। কিন্তু মাস দূরে রাখিয়া ঋতু পিছাইতে লাগিল, দুই সহস্র বৎসরে এক মাস, এক চাঁদ, অগ্রে গিয়া পড়িল। প্রাচীনেরা দেখিলেন যে যে নক্ষত্রে অয়ণ ও বিষুব পূর্বকালে হইত, এই রূপ শ্রুতি বা স্মৃতি ছিল, এখন আর সে নক্ষত্রে ঘটে না। এ কি ব্যাপার? যে-টা ঋত, সেটা অনৃত হইয়া পড়িতেছে! অকালে যজ্ঞকর্ম ও কৃষিকর্ম করাও চলে না। এই দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, বেদের ব্রাহ্মণে ও তাহার ছায়া-সরূপ পুরাণে নানা অলৌকিক উপাখ্যানে এই আশ্চর্য ব্যাপার লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আদিত্যগননা ছাড়িলেন, ঋতু ধরিয়া বৎসরকে মধু মাধব ইত্যাদি নামে দ্বাদশ ভাগ করিলেন। এখন মাস ও আদিত্য যাহাই হউক, মধু ও মাধব মাসে বসন্ত। এই রূপ, অন্যান্য ঋতু।

খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বর্ষে অগ্রহায়ণ মাস আরম্ভ

অয়ণের পশ্চাৎ চলন হেতু প্রাচীন ঋষিগণ চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যে তাঁহারা তারায় তারায় অয়ণ বাঁধিয়াছিলেন, তাই আমরা তাঁহাদের কাল নির্দেশ করিতে পারিতেছি, নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি বেদে খ্রীষ্টের অন্ততঃ ৪০০০ বৎসর পূর্বের কথা আছে। কারণ মৃগশিরায় পূর্ণিমা হইত শরৎ ঋতুতে, অগ্রহায়ণ বৎসরের প্রথম মাস ছিল, ফাল্গুন পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইত। লোকমান্য টিলক এই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া অন্য প্রমাণ আছে, আরও পূর্বের কথাও আছে। ঋগ্‌বেদে শরৎ অর্থে বৎসর বুঝাইত, অদ্যাপি সে অর্থ সংস্কৃতে আছে। মিত্র. এই মাসের আদিত্য। আমাদের বালিকারা ইতু পূজায় সে নাম স্মরণ করিতেছে।

সহস্র বৎসর অতীত হইল, বিষুব মৃগশিরা ছাড়িয়া পশ্চিমে রোহিণীতে আসিল। পূর্বে ২৮ নক্ষত্রের মধ্যে অভিজিৎ নামে এক নক্ষত্র ছিল। এই সময়ে এই নক্ষত্র পরিত্যক্ত হইল, ২৭ নক্ষত্র হইল, মধ্যে রোহিণী চন্দ্রের প্রেয়সী হইলেন। কিন্তু মাস তখনও মার্গশীষ। ছয় মাস পরে জ্যৈষ্ঠ কি-না অগ্রজ মাস। (মাস চিত্র দেখুন)।

রাস পূর্ণিমা

আর এক সহস্র বৎসর কালসাগরে মিলাইয়া গেল, অয়নে এক মাসের অন্তর ঘটিল। এত অধিক অন্তর, উপেক্ষার বিষয় নহে। কালজ্ঞরা দেখিলেন, কৃত্তিকা ও বিশাখায় বিষুব, মঘায় উত্তরায়ণ। কৃত্তিকায় পূর্ণিমা কার্তিক মাস বৎসরের প্রথম মাস হইল, অপরের নিকট বিশাখায় কালে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়, অতএব কৌমুদী। মধ্যরাত্রে রাস; সে সময় নব মাস ও নববর্ষ প্রবেশ। সূর্য বিশাখায়। বিশাখা তারার এক প্রাচীন নাম রাধা। রাধা নামের অর্থ লক্ষ্মী। নববর্ষে কে না সৌভাগ্য কামনা করে? বিশাখার রাধা নাম তত চলিত ছিল না, অগ্রহায়ণ নামটিও চলিত ছিল না, এই দুই নাম গুণবাচী ছিল। কিন্তু বেদের কালে যখন নক্ষত্রের নাম হইয়াছিল, তখন রাধা নামও হইয়াছিল। নতুবা
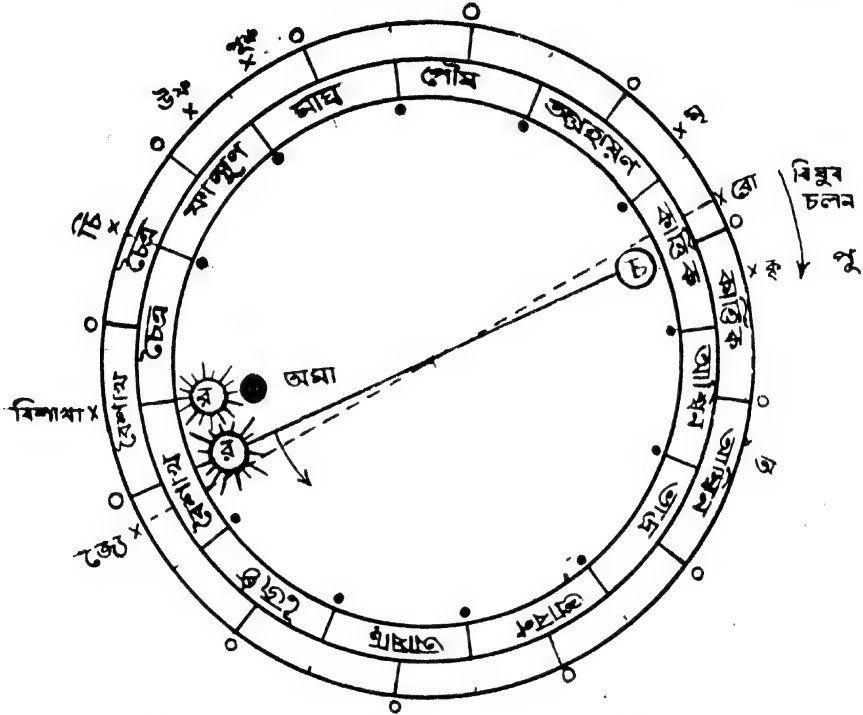
মাস চিত্র। ভিতরের বৃত্তে সিদ্ধান্তের অমান্তমাস। বাহিরের বৃত্তে কল্পিত পূর্ণিমান্তমাস।
তারা ×। অমাবস্যা •। পূর্ণিমা ০।

পূর্ণিমা বৈশাখ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ হইল। কৃত্তিকায় বসন্ত বিষুব, বিশাখায় শরৎ বিষুব; কৃত্তিকায় পূর্ণিমা হইলে সূর্যকে বিশাখায় থাকিতে হইবে। আমরা এখনও বলি, বৎসরের প্রথম মাস, বৈশাখ। বহু-কাল পর্যন্ত কার্তিকাদি মাস গণনা ছিল, এবং আমাদের পাঁজিতে কার্তিকাদি বর্ষ এখনও লিখিত হইতেছে। মিথিলার লক্ষ্মণাব্দ কার্তিক হইতে গণা হইত। কার্তিক পূর্ণিমাই রাস পূর্ণিমা, এই রাধার অর্থাৎ বিশাখার পরের তারার নাম অনু-রাধা হইত না। বিশাখার পরে অনুরাধার উদয় হয়, অনুরাধা বিশাখার অনুগমন করে। বিশাখা-নক্ষত্র দুইটি তারা; এই দুই তারা দেখিয়া বিশাখা চেনা সোজা, রাধা নামে চিনিতে পারা যায় না। ইহাও কারণ হইতে পারে। সে যাহা হউক কার্তিক পূর্ণিমা রাত্রে সূর্য বিশাখার সহিত মিলিত হন। বৈশাখ মাসের ঋতুনাম মাধব; রাধা ও মাধবের মিলন হয়।

দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে উপেন্দ্র আছেন। উপেন্দ্র ও কৃষ্ণ একই। যে দিকে দেখি, সে দিকেই রাধা-কৃষ্ণ আকাশে অগ্রবর্ত্তী হইয়া মণ্ডলাকারে রাসলীলা করেন। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ; তিনি রাসলীলায় নাই। তিনি অদিতির অংশ দেবকীর পুত্র নহেন, তিনি অদিতির অংশ রোহিণীর পুত্র, রোহিণীপুত্রকে পূর্বে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সাহিত্যে বিশাখার আর এক নাম ললিতা পাই। সে যাহা হউক, যাঁহারা পুরাণ-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সহিত নানাকালে সম্পন্ন সূর্য-লীলা অনুধ্যান করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন শ্রীকৃষ্ণলীলা সূর্য-লীলার প্রতিবিম্ব। জ্যৈষ্ঠমাসের আদিত্যের নাম ইন্দ্র, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের অধিপতি ইন্দ্র ; গোপেরা জ্যৈষ্ঠমাসে ইন্দ্রপূজা করিত। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজা রহিত করিয়া দিলেন (কারণ তখন জ্যৈষ্ঠ মাস আর জ্যেষ্ঠ ছিল না), এবং নিজে উপেন্দ্র নামে খ্যাত হইলেন। যে ফাল্গুনী নক্ষত্রদ্বয় যুগল তরুর ন্যায় দেখায়, সে যমলার্জুন ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ; তখন রোহিণীও অতীত, তিনি শকটাকার রোহিণী নক্ষত্র উলটাইয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্ম দেখিয়া গোপালগণ আশ্চর্য হইয়াছেন, "দিব্যঞ্চ কর্ম ভবতঃ কিমেতৎ তাত কথ্যতাম্।"—"আপনার কর্ম "দিব্য", হে তাত, এ সকল কি? আপনার এ কি বাল-ক্রীড়া, অথচ নিন্দিত গোপকুলে জন্ম!" (বিষ্ণু-পুরাণ)। শ্রীকৃষ্ণ গোপালগণকে জানিতে দেন নাই, তিনি কে, এবং কেনই বা গো-পাল। সে কথা, বেদের ঋষিরা জানিতেন। পুরাণকার বিলক্ষণ জানিতেন, তাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে লিখিলেন, "মহাত্মা বিষ্ণুরূপ সূর্য (অচ্যুতভানু) আবির্ভূত হইলেন।" এই রূপ, নানাস্থানে বলিয়াছেন, কিন্তু কবিত্বের এমনই শক্তি, শ্রোতা বুঝিল উপমা। "শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে" বঙ্কিমবাবু আকাশের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই ; করিলে তাঁহার কর্ম সুচারু সম্পন্ন হইত। তিনি বিশাখা-তারার নাম রাধা পাইয়াও রূপকটি ত্যাগ করিয়াছেন। আশ্চর্যের কথা এই, যে রাধা নাম বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত পুরাণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিংবা রূপকভেদের শঙ্কায় সুপ্ত রাখিয়াছিলেন, সে প্রাচীন নাম এবং রাধিকার প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী পরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্মৃতি অবশ্য ছিল, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তাহার উদ্ধার করিয়া অন্যরূপে প্রকাশ করেন। পূর্ণিমারাত্রে চন্দ্র ও সূর্য বিপরীত দিকে থাকে, সূর্য বিশাখায় ; সুতরাং চন্দ্র বা আলী সখিসহ চন্দ্রাবলী ও বিশাখা পরস্পর প্রতিকূলই বটে। শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট মহিষী ব্যতীত ষোড়শ সহস্র এক শত সঙ্গী ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন, নরক নামক এক অসুর সে সব কন্যা অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ সে অসুরকে বধ করিয়া যত কন্যা তত রূপ ধরিয়া একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে বিবাহ করেন, এবং "বিশ্বরূপ" ধরিয়া তাহাদের গৃহে প্রতিরাত্রে বাস করিতে লাগিলেন (৫।৩১)। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন, তাহারা "বৈদিক্য অপ্সরোগণ" অষ্টাবক্র মুনির বরে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিল (৫।৩৮)। অর্থাৎ বেদে অপ্সরা ও সূর্যের যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। সংখ্যাটি ১৬১০০ কেন, ইহারও হেতু থাকিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ লীলা আকাশের সূর্য-লীলার প্রতিবিম্ব বলার এমন তাৎপর্য নয় যে, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন না, তিনি মনঃকল্পিত। তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কাল জানা ছিল না, তাঁহার সময়ে বর্তমান মহাভারত বা পুরাণ রচিত হয় নাই। বহুকাল পরে যখন প্রণীত হইল, তখন তিনি বিষ্ণুর অংশাবতার। ভানুচরিত্র তাঁহাতে আরোপ করিয়া ভক্তেরা নভোমণ্ডলে তাঁহারই লীলা দেখিতে লাগিলেন।*

এ সব কাহিনী থাক। কার্তিক পূর্ণিমার কৃত্য অনুসরণ করি। খ্রীঃ পূঃ তিন সহস্র হইতে দুই সহস্র বৎসরের কথা হইতেছে। এতকাল যে রাসোৎসব চলিয়া আসিতেছে, তাহা নহে। নববর্ষে বিষুবদিনে যজ্ঞ করা হইত, এবং যজ্ঞ যাহাই হউক এক মহোৎসব। পরবর্তী কালে পুরাতন স্মৃতি রাসের আকার পাইয়াছিল। বৎসরান্তে পিতৃগণের নাম স্মরণ বিহিত ছিল। শ্রাদ্ধে দীপদানও বিহিত।

---

* বিষ্ণুপুরাণের দেশ ও কাল পুরাণেই লিখিত আছে (২।৮)। যথা, সে দেশে উত্তরায়ণ দিনে দিবা ১২, এবং রাত্রি ১৮ মুহূর্ত্ত হয়। অর্থাৎ ১০ ঘণ্টা ও ১৪ ঘণ্টা। অতএব অক্ষাংশ ৩০, যেমন দিল্লীর উত্তর পাঞ্জাব। পুরাণে উল্লিখিত বৃক্ষবিচার দ্বারা মনে হয়, দিল্লীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। কাল সম্বন্ধে পাই, সে সময়ে কৃত্তিকার প্রথমপাদে বিষুব ছিল। এখানে কৃত্তিকা. অংশ-কলাবিভক্ত কৃত্তিকা নক্ষত্র। বিষুব প্রথম পাদে ছিল, খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ হইতে দশম শতাব্দে। আদি বিষ্ণুপুরাণ এই সময়ে রচিত। বোধ হয় বর্ত্তমান মহাভারতের অধিকাংশ খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল।

এখন শ্রাদ্ধ করা হয় না, কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দীপ দেওয়া হইয়া থাকে। বঙ্গেও পূর্ণিমার পূর্বরাত্রি বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে ৩×১০৮টি দীপ দিতে দেখা যায়। বোধ হয় প্রতিদিনের একটি করিয়া ৩×১২০টি দীপের স্থলে ভ্রমে ৩×১০৮টি হইয়াছে।

দীপালী অমাবস্যা

উপরে দেখা গিয়াছে, পূর্বে অগ্রহায়ণ মাস প্রথম মাস ছিল, এখন কার্তিক প্রথম মাস হইল। সুতরাং এক বৎসর এগার মাসে পূর্ণ ধরিতে হইয়াছিল। কোন্ বৎসর এবং কি রূপে এক মাস কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু দেখিতেছি সে-কালের কালজ্ঞেরা মাসের আরম্ভ পূর্ণিমার পরিবর্তে অমাবস্যায় করিয়াছিলেন। ফলে নূতন কার্তিকমাসের পূর্ণিমা, মাসের প্রায় মাঝে গিয়া পড়িল; যেটা কার্তিক অমাবস্যা ছিল, সেটা আশ্বিন অমাবস্যা হইল (মাসচিত্র দেখুন)। কেহ এই পরিবর্তন মানিল, কেহ মানিল না। এখনও অনেকে মানে, অনেকে মানে না, মুখ্য ও গৌণ চান্দ্রমাস কালগণনায় এক বিসম্বাদ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা নূতন মাস ধরিলেন, তাঁহাদের নববর্ষ রাসপূর্ণিমার পূর্ব অমাবস্যায়, আশ্বিন অমাবস্যায়, গিয়া পড়িল, নববর্ষের যাবতীয় কৃত্য সে তিথিতে বিহিত হইল। পর্বন্ শব্দের বিশেষার্থ অমাবস্যা হইল, পার্বন্ শ্রাদ্ধ এই তিথিতে কর্তব্য হইল। তাহারই স্মৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু পালন করিয়া আসিতেছে।

এই রাত্রি নব-রাত্রি, সুখ-রাত্রি। আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু দুশ্চিন্তাও আসে, কি জানি গতবর্ষের অলক্ষ্মীই বা আসে। তাই সেই অনাগতকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাতেও শঙ্কা যায় না, আবার কখন্ ফিরিয়া আসে। কুলার বাতাস দিয়া আগুন জ্বালিয়া তাহাতে তাহাকে পোড়াইয়া মারা হয়। অলক্ষ্মীর রূপ কল্পনাও হইয়াছে। বঙ্গদেশের অলক্ষ্মী তেল-কুচ্-কুচ্যা কৃষ্ণবর্ণা নারী, পরণে কাল কাপড়, লোহার গহনা, হাতে ঝাঁটা ও কুলা, গাধায় চড়িয়া বেড়ায়, ক্রোধনা ও কলহপ্রিয়া। ধ্যানমন্ত্রে নাই, নারী বৃদ্ধা, কি যুবতী। বুড়ীই হইবে, সেই ডাইনী বুড়ী, হয়ত ডোমের মেয়ে; সেই পূতনা রাক্ষসী সে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইবার ছলে মারিয়া ফেলিতে আসিয়াছিল, আয়ুর্বেদের পূতনা নামক এবং গৃহিণীর পেঁচো নামক বাল-রোগ; যে বুড়ীকে দোল-পূর্ণিমার পূর্বরাত্রে চাঁচর খেলায় অশ্লীল গালি দিয়া তাড়াইয়া পোড়াইয়া মারা হয় এবং যে অগ্রহায়ণ মাসে পূর্বাকাশে বিকটাকারে কালপুরুষ রূপে দেখা দেয়। রাক্ষসীর মায়ার অন্ত নাই, কখন্ সে কি আকার ধরিয়া আসে কে জানে। কখনও মহিষের বা বৃষভের আকার ধরে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে সে অসুর বধ করিয়াছিলেন, আর আজও সাঁওতালেরা তাহাকে পরাজিত করিতেছে। মানব সমাজের পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হইতে কত যুগ লাগে?

কোজাগরা পূর্ণিমা

এইরূপে দুই সহস্র বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পাঁজিতে আবার এক মাসের অন্তর ঘটিল। যাহারা কার্তিক পূর্ণিমায়, রাস পূর্ণিমায় নববর্ষোৎসব করিত, তাহারা আশ্বিন পূর্ণিমায়, কোজাগরী পূর্ণিমায়, শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা করিয়া নববর্ষে সৌভাগ্য কামনা করিল। পুরাণ বলিতেছেন, যিনি মহালক্ষ্মী তিনি রাধা, এবং তারার আদ্য। এই পূর্ণিমাও কৌমুদী, কিন্তু রাধা তারা চক্ষুগোচর হয় না, রাসও হয় না। আছে স্মৃতি, রাত্রি জাগরণ আছে, ভাগ্যপরীক্ষার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়াও আছে। এই রাত্রে কেন যে নারিকেল চিপিটক খাইতে হইবে, তাহার প্রমাণ পাই না। হয়ত নারিকেল ভঙ্গ দ্যূতক্রীড়া বিশেষ, বাহুবল পরীক্ষা।

মহালয়া অমাবস্যা

যাঁহারা অমান্ত মাস গণিতেন, তাঁহাদের বর্ষারম্ভ কোজাগরীর পূর্ব অমাবস্যায়। এটি ভাদ্র অমাবস্যা, মহালয়া অমাবস্যা নামে খ্যাত। মহালয়া নাম কেন হইল, তাহার শাস্ত্রীয় অর্থ জানি না। অন্য দিন পিতৃগণের শ্রাদ্ধ হউক না হউক, বৎসরের শেষ দিন শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে। অনেকে জানেন না, এই অমাবস্যাও দীপান্বিতা। কিন্তু জ্যোতিষীরা পূর্বাবধি শরৎ বিষুবে বর্ষারম্ভ অগ্রাহ্য করিতেছিলেন, চৈত্র শুক্ল প্রতিপৎ হইতে নূতন দিন গণিতে লাগিলেন, শরৎ বিষুবের প্রাপ্য দীপালীও লুপ্ত হইল। কিন্তু যে বিধি একবার চলে, সেটা চলিতেই থাকে, মহালয়ার পরদিন হইতে নব রাত্রি কি-না নূতন রাত্রি, নূতন দিন আরম্ভ হইল। লোকে নবরাত্রি ব্রত করিল। নয় দিনে, নবমী তিথিতে এই ব্রত শেষ হয় বলিয়া নবরাত্রি, কেহ কেহ

এই অর্থ করেন। কিন্তু, বলেন না, কেন আশ্বিন শুক্লপক্ষে করিতে হইবে, এবং কেনই বা নয় দিনে সমাপ্ত হইবে। মহালয়া অমাবস্যা, ভাদ্রমাসের অমাবস্যা। ছয়মাস পরে ফাল্গুন অমাবস্যায় বর্ষের আর এক শেষ। বঙ্গদেশে আমরা সৌরমাস ও দিন গণনা করি, এবং চৈত্র সংক্রান্তি দিনে আমাদের বর্ষ শেষ হয়। সে দিন উৎসব আছে, পরদিন ১লা বৈশাখ ক্রয়বিক্রয়স্থানে উৎসব হয়। কিন্তু সৌরমাস ধরিলেও প্রাচীন স্মৃতি জড়াইয়া আছে। আমরা বলি চৈত্রসংক্রান্তি, অর্থাৎ ফাল্গুন অন্তে চৈত্র মাসে প্রবেশ। এটা চান্দ্রমাসে। সৌরমাস বুঝিলে বলিতে হয়, বৈশাখসংক্রান্তি।

শারদ দুর্গোৎসব

হঠাৎ মনে হইতে পারে, শারদীয়া দুর্গাপূজা নববর্ষের উৎসব। কিন্তু তাহা হইলে এই পূজা মহালয়ার পরদিন হইত, সাতদিন পরে হইত না। তথাপি নববর্ষ আরম্ভ দেখিয়া এই সময়ে (এবং চৈত্রমাসে) দুর্গাপূজা কল্পিত হইয়া থাকিবে। অনেকে এই পূজার অনেক ব্যাখ্যা, অনেক ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু কেন সপ্তমী তিথিতে মহিষাসুরমর্দিনী অভয় দান করিতে আসেন, সিংহপৃষ্ঠে আসেন, তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারা যায় না। যদি ইতিহাসে বা পুরাণে লেখে, অমুক প্রসিদ্ধ রাজা এই পূজা প্রথম করিয়াছিলেন, এবং তদবধি ইহা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেটা ব্যাখ্যার মধ্যে গণ্য নয়। তিনি কেন করিলেন, বর্তমান দুর্গাপ্রতিমা কল্পনা করিলেন, এই তিথিতে পূজা করিলেন, না জানিলে ইতিহাস নাম ইতিকথায় দাঁড়ায়। আমার মনে হয়, বঙ্গদেশের দুর্গাপূজা ত্রি-শক্তির পূজা। যখন ভবানী আসেন, তখন ভবও না আসিয়া পারেন না। যখন লক্ষ্মী ও সরস্বতী আসেন, তখন বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকেও আসিতে হইবে। পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি থাকিতেই পারে না। কার্তিকেয় ও বিষ্ণুর ঐক্যের যুক্তি আছে, কিন্তু গণেশ ও ব্রহ্মার পাই না। তথাপি বোধ হয় কার্তিকেয় ও গণেশ, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার স্থানীয় হইয়াছেন। কলা-বধূ যে ত্রি-কলা, ত্রি-শক্তি তাহা পুরাণে আছে। কিন্তু কলা-বধূর নাম যে কেন নব-পত্রিকা এবং নব-পত্রিকা যে কেন নয়টী গাছের পাতা, তাহার রহস্য সহজে আবিষ্কৃত হইবে না। একথা ঠিক, শরৎ বিষুব কালে ব্রীহিধান্য (বর্তমান আশু ধান্য) ছেদনের সময়, এবং পূর্বকালে এই ধান্যের নবান্ন-কৃত্য ছিল। এখনও মহারাষ্ট্রদেশে সে কৃত্য করা হইতেছে। বসন্ত বিষুবে যব পাকিবার কাল, চৈত্রসংক্রান্তিদিনে যব শক্তু ভোজনও বিহিত হইয়াছে, কিন্তু ধান্য-ছেদন ও নবান্ন উৎসব দুর্গোৎসবের অঙ্গ নয়। এক হইলে মহারাষ্ট্রদেশে দুর্গোৎসব থাকিত, সেখানে নবমী তিথিতে সরস্বতীর পূজা করা হয়। পঞ্জাবেও হয়, এবং সরস্বতী পূজার পৌরাণিক প্রমাণও আছে। দশমী বিজয়ার পর শবরোৎসব, অশ্লীল গীত ও জল কাদা লইয়া ক্রীড়া। শবর জাতি এই ক্রীড়া করিত বলিয়া দুর্গোৎসব শাবরোৎসব নয়। শবর জাতি এই দিন কেন এই অশ্লীল ক্রীড়াকৌতুক করিত, তাহার ব্যাখ্যা চাই। তাহারা যে পৌরাণিক হিন্দুর কাছে এই উৎসব শেখে নাই, তাহার প্রমাণ চাই। কিন্তু আশ্চর্য, হোলি-খেলায়, বিশেষতঃ চাচর খেলায়, এইরূপ শবরোৎসব এখনও হইতেছে। এক পূজা বা কৃত্য ধরিয়া বহুকালের নানা স্মৃতি জড়াইয়া গেলে কার্য-কারণ-বিচার দুরূহ হইয়া উঠে। দুর্গা পূজায় এইরূপ হইয়াছে, কাকতালীয় ন্যায়ে কত কালের কত স্মৃতি কৃত্য যুক্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি, আশ্বিন ও চৈত্র শুক্ল সপ্তমী হইতে মনে হয়, উৎসবের মূল জ্যোতিষীর পাঁজিতে খুঁজিতে হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ দিন এক এক কৃত্য দ্বারা জনসাধারণকে জানাইয়া দিতেন, বোধ হয় ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ (শক ৪৬০) চৈত্র শুক্ল সপ্তমীতে বাসন্তী দেবীর প্রথম পূজা হইয়াছিল। সে পূজা আশ্বিনে আনাতে অকালবোধন হইয়াছে। আশ্বিনে ষষ্ঠাদিকল্প বহু পূর্বে (খ্রীঃ পূঃ ১২শ শতাব্দে) হইয়া গিয়াছিল, সে কল্প ধরিয়া দুর্গাপূজা হইতেছে।*

---

* এই পাঁজির পুথী হারাইয়া গিয়াছে। বোম্বাইর শ্রীযুত কেতকর মহাশয় কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছেন। (১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের "ভারতবর্ষ" দেখুন)। আমার বিশ্বাস, ২৪৭ বৎসর ১ মাসে যুগচক্র বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং হয়ত কোনও কোনও প্রাচীন জ্যোতিষীর গৃহে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। এই লুপ্ত রত্ন উদ্ধারের আশায় প্রবাসী ও ভারতবর্ষে পাঠকের নিকট নিবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু সন্ধান পাই নাই। আবার করিতেছি, ২৪৭ বৎসর ১ মাস এই চক্রের (cycle) অনুসন্ধান করিবেন। ষষ্ঠ্যাদিকল্প (epoch) এই চক্রের।

এখন এই কাহিনী শেষ করি। "দোল যাত্রার উৎপত্তি" ন্ধে (১৩৩২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ২য় ্যায়) দেখিয়াছি, ছয়হাজার বৎসর পূর্বের স্মৃতি াতে জড়াইয়া আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহার অনুবৃত্তি। দুই প্রবন্ধ এক সঙ্গে পড়িলে পাঠক দেখিবেন যে ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতখণ্ডে প্রবাহিত ছিল, তাহা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইলেও কালে কালে নব নব রসযোগে নানা ছন্দে আমাদিগকে অদ্যাপি জীবন দান করিতেছে। কত কালের কত কথা কতরূপ পুরাণে ও ধর্মকৃত্যে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় যেন আমরা আমাদের পূর্বপিতামহগণের সহিত আলাপ করিতেছি। আমাদের তুল্য ভাগ্যবান্ নপ্তা কে আছে?

দৃষ্টি স্মৃতি

শ্রীনিরুপমা দেবী

আমার এ ধ্যানলোকে তুমি শুধু আছ দৃষ্টি হয়ে,
অনন্তের ছায়াখানি লয়ে;
ছোঁয়া নয়, পাওয়া নয়, শুধু দুটি আঁখি দিয়ে চাওয়া;
াখি বাতায়ন পথে নিরুদ্দেশ অভিসারে বাহিরিয়া যাওয়া!
অসহ্য পুলক ভরা ও যে ব্যাকুলতা,
ভাষাহীন প্রলাপের অর্থহারা কথা,
ও যে গুপ্ত আশা,
ও যে সর্ব্বজীবনের বিমথিত সুপ্ত ভালবাসা!
দৃষ্টি নয় ও যে বাণী,
যৌবন বসন্ত জাগা উন্মাদনাখানি
তুমি কি তুলেছ ধরে মোর ওষ্ঠপুটে?
তোমারই কি প্রাণখানি উঠিয়াছে ফুটে
নয়নের কূলে কূলে দৃষ্টিরূপ ধরি?
নিভৃত ও অন্তরের গানখানি গিয়াছে কি মরি
ঐ আঁখিতলে?
সুরটুকু ঢেলেছে কি দৃষ্টি সুধাজলে?
এ কি প্রেম, এই কি সোহাগ?
এ কি স্নিগ্ধ চুম্বনের লাজরক্তরাগ
এ আমার আঁখিপুটে? এ কি মুগ্ধ মন?
নীরবে একান্তে এ কি আত্মনিবেদন?
এ কি ঐ আকাশের বাঁশী
ধরণীর কাণে কাণে ঘুরে ঘুরে কহে যে আশ্বাসি
তাপিত নিদাঘ শেষে বরষার বাণী?
মলয়ের মাদকতা? বসন্তের ফুলভার আনি
দিয়ে যায় প্রকৃতির হাতে?
এ কি মোর জীবনের অধ্যায়ের পাতে
পুণ্য দুটি শ্লোক?
জীবনের স্তিমিত আলোক
প্রশান্ত গগন
মরণের আরতির নামিছে লগন
আমার জীবন শেষে এই বেদীমূলে
তুমি কি অঞ্জলি ভরি ধরিয়াছ তুলে
শান্ত অচঞ্চল
দুটি নয়নের তব ও দুটি উৎপল?

দুষ্টগ্রহ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(৫)

ইহার পর রমেন এক সপ্তাহ নেলীকে দেখিতে গেল না।

তার দুইটা কারণ ছিল। প্রথমে রমেন ভাবিল যে যে টাকা সে করুণাকে দিয়া আসিয়াছে তাহা খরচ না হইয়া গেলে করুণার তাকে পাঁচটাকা ফিরাইয়া দিবার সম্ভাবনা আছে; পরে রমেন আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে কৃষ্ণভামিনী তার গতিবিধি সম্বন্ধে একটা গুরুতর সন্দেহ পোষণ করে, এবং ইহা লইয়া একটা গণ্ডগোল হওয়া অসম্ভব নয়।

কৃষ্ণভামিনীর প্রথম সন্দেহ হইবার পর সে তার স্বামীর গতিবিধি, তার মুখের ভাবভঙ্গী প্রভৃতির উপর অতিশয় খর দৃষ্টি রাখিত—এবং স্বামীর মণিব্যাগটির ভিতর অনেক গোপন অনুসন্ধান করিত। এ অনুসন্ধানের ফলে সে আবিষ্কার করিল যে সন্ধ্যাবেলায় রমেন বাহিরে গেলে প্রায়ই দুই চার টাকা কমিয়া যাইত; অথচ রমেন সেই সান্ধ্য ভ্রমণের যে বিবরণ দিত তাতে সে টাকাগুলি খরচ হইবার কোনও সঙ্গত কারণই পাওয়া যাইত না। এদিকে রমেনের অন্যমনস্কতা এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে গোপন করিবার চেষ্টা এবং নিদারুণ বিরক্তি এতটা সুস্পষ্ট যে তাতে কৃষ্ণভামিনীর সন্দেহটা আর কেবল সন্দেহ রহিল না। সন্দেহটা পাকাপাকি করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইবে এ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত কৃষ্ণভামিনী করিয়া উঠিতে পারিল না। গুপ্তচর নিযুক্ত করিতে তার ইচ্ছাও হইল না, সাহসও হইল না। চিঠি পত্রের উপর খর দৃষ্টি রাখিয়াও কোনও ফল হইল না। এই জন্য সে যখন ভারী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় একদিন কৃষ্ণভামিনী গয়লার কাছে শুনিল যে, "ওবাড়ীতে" যে দুধ দেওয়া হয়, "ওবাড়ীর" মা তার পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছেন।

কৃষ্ণভামিনী খুব চাপা লোক। সে এ কথাটায় সন্ধানের একটা সূত্র পাইয়া খুব উল্লসিত হইয়াও উঠিল না, কোনও ব্যগ্রতাও দেখাইল না। সে কেবল প্রশান্তভাবে বলিল, "কোন্ বাড়ী?"

গয়লা ঠিকানা বলিল—ঠিকানাটা কৃষ্ণভামিনী মনের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলিল। তার পর সে বলিল, "ও—সেই বাড়ী! হাঁ তা, সে বাড়ীতে এখন কে কে আছে রে?"

গয়লা বলিল, "সুধু মা আছে—আর একটা মেয়ে আছে তার অসুখ। আর কেউ এখন নেই।"

"কোন্ মা রে? সেই ঢেঙা ফরসা বুড়ী?"

"না মা, এ কালো, রোগা—ছেলে মানুষ আপনার মেয়ের বয়সী হ'বে।"

"ও বুঝেছি" বলিয়া কৃষ্ণভামিনী এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিল।

বলা বাহুল্য গয়লার মনে কোনও সন্দেহও ছিল না, ছল কপটও ছিল না। রমেন তাকে বলিয়াছিল তার এক

আত্মীয়ার বাড়ীতে দুধ দিতে হইবে—সেও সরলভাবে জানিয়াছিল যে করুণা ইঁহাদের আত্মীয়। সেই জন্যই সে এমন অসঙ্কোচে তার কথা কৃষ্ণভামিনীকে বলিয়াছিল। কৃষ্ণভামিনীও তাকে অত্যন্ত নিপুণ ভাবে জেরা করিয়াছিল, তার মনের ভাব কিছুই প্রকাশ পায় নাই। রমেন মিথ্যা বলে নাই—উকীল হইলে কৃষ্ণভামিনী কৃতিত্ব দেখাইতে পারিত। সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় যখন রমেন ফিরিয়া আসিল তখন তার মণিব্যাগের গোপন খানাতল্লাসে কৃষ্ণভামিনী দেখিল যে আজ দশটাকার দুখানা নোট গিয়াছে। সে আরও আবিষ্কার করিল করুণার চেকখানা। কৃষ্ণভামিনী ইংরাজী চলনসই রকম জানিত—করুণার নাম সে অনায়াসে পড়িল।

ইহার পর আর তার কিছু জানিতে বাকী রহিল না। অবশিষ্ট যাহা জানিবার তাহা সে মন হইতে জোগাইল। সে সম্বন্ধে কোনও সাক্ষ্য বা প্রমাণ গ্রহণ তার কাছে অনাবশ্যক বোধ হইল। করুণা দাস নামে একটি কালো ছোট মেয়ে যার ঠিকানা পর্য্যন্ত কৃষ্ণভামিনী জানে, সে রমেনের রক্ষিতা—তার ওখানে রমেন রোজ একসের করিয়া দুধ জোগায়; আর রোজ সন্ধ্যা বেলায় দুই চার হইতে দশ বিশ টাকা খরচ করিয়া আসে, তার চেক ভাঙ্গাইবার জন্য লইয়া আসে। যে প্রমাণের উপর কৃষ্ণভামিনী এ সিদ্ধান্ত স্থির করিল, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণে কোনও পতিব্রতা নারী কোনও দিন তাঁর স্বামীকে সন্দেহ করেন নাই। ইহা অপেক্ষা শতাংশে নিকৃষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যে কেহ কেহ বিষ পান ও অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করিয়াছেন তাহা কে না জানে?

অবস্থাটা সম্যক আয়ত্ত করিয়া কৃষ্ণভামিনী এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে ব্যস্ত হইল। সে ছেলেমানুষ নয় যে একটা হঠকারিতা করিয়া বসিবে। বাড়ীতে তার ষোল বছরের ছেলে চৌদ্দ বছরের মেয়ে আছে—তাদের সামনে একটা কেলেঙ্কারী সে করিতে পারে না। অথচ স্বামীকে একটা শিক্ষা দেওয়াও প্রয়োজন। অতএব প্রশ্ন হইল কঃ পন্থা।

পরদিন বৈকালে যখন রমেন বেড়াইতে যায় তখন কৃষ্ণভামিনী শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে আজ?"

রমেন বলিল, "কেন, ময়দানে।"

শান্তভাবে কৃষ্ণভামিনী বলিল, "করুণার কাছে যাবে না?"

রমেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। আজ তার মনে হইল কৃষ্ণভামিনী সি, আই, ডির সব কর্ম্মচারীকে হার মানায়। সে বুঝিল যে এই নারীর কাছে করুণার ব্যাপারটা গোপন করিয়া সে কাজ ভাল করে নাই। এখন উপায় কি?

উপায় চিন্তা করিবার অবসর তার তখন হইল না। সে তাড়াতাড়ি একটা ছোট্ট "না" বলিয়া চোঁ চাঁ ছুট দিল।

কৃষ্ণভামিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল।

ইহার পর দুই দিন ধরিয়া রমেন উপায় চিন্তা করিয়া ঠিক করিল, করুণার সব কথা খোলসা করিয়া কৃষ্ণভামিনীর কাছে বলিয়া ফেলাই ভাল।

সেই জন্য সেদিন রাত্রে সে সমস্ত কথা যথাযথভাবে কৃষ্ণভামিনীকে জানাইল এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ করিল যে, করুণা অতি আশ্চর্য্য মেয়ে—তার গুণের সীমা নাই। কৃষ্ণভামিনী যে কায়মনোবাক্যে সব কথা অবিশ্বাস করিল, সে বলাই বাহুল্য; কেন না ইহা তো সোজা কথা যে, এই কথাই যদি সত্য হইবে, তবে রমেন প্রথম দিনই এ সব কথা তার স্ত্রীকে জানাইত, এবং তার সঙ্গেই এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিত। যেদিন কৃষ্ণভামিনী তার স্বামীর কাছে করুণার নামটা পর্য্যন্ত বলিয়া ফেলিল, সেদিনও রমেন এ কথা বলিতে পারিত—আর ধরা পড়িয়া সে অতটা বেকুব বনিয়া যাইত না! এমনি বহু যুক্তি কৃষ্ণভামিনীর মনে উদয় হইল।

রমেনের দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে কৃষ্ণভামিনী ধরিল সুধু তার মুখে করুণার প্রশংসাটুকু। এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসার হেতু যে কি, তা কি কোনও স্ত্রী না বুঝিয়া থাকিতে পারে?

সমস্ত কথা শুনিয়া কৃষ্ণভামিনী গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি খুব সুন্দরী? আমার চেয়ে সুন্দরী?"

প্রশ্নের ধরণে রমেন ঘাবড়াইয়া উত্তর করিল, "সুন্দরী তাকে বলা যায় না, রঙ তার কালো; কিন্তু তার চেহারাটার ভিতর খুব কমনীয়তা—খুব লাবণ্য আছে—তার চোখ দুটোর ভাব ভারি করুণ।"

"বুঝেছি, তবে তার বয়সটাই তার প্রধান গুণ।" বলিয়া কৃষ্ণভামিনী পাশ ফিরিয়া শুইল।

রমেন বুঝিল তার সত্য কথা বলাটা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে। এখন মনে হইল এ সব কথা এখন না বলিলেই ছিল ভাল। কিন্তু উপস্থিত সঙ্কটে উপায় যে কি তার সম্বন্ধে সে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

খানিক বাদে কৃষ্ণভামিনী বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। স্বামীর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "বলি এই বুড়োবয়সে ও সব বাঁদরামো ক'রতে লজ্জা হয় না। ষোল বছরের ছেলের সামনে এ সব ক'রতে ঘেন্না হয় না! মরণ আর কি?"

আবার কাপড় চোপড় গুছাইয়া সে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল।

চিৎ হইয়া শুইয়া রমেন কড়িকাঠের গঠন বৈচিত্র্য পরীক্ষা করিতে লাগিল। সেখান হইতে তার বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের কোনও উপায় না দেখিয়া শেষে সেও পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

ইহার পর রমেন করুণার কাছে যাওয়া আসা কাজেই বন্ধ করিল। কিন্তু রোজ দুবেলা ডাক্তারের কাছে গিয়া খবরাখবর করিত। মোটের উপর খবর আশাপ্রদ দেখিয়া সে অনেকটা সুস্থ থাকিত।

(৬)

ডাক্তার বলিলেন, রক্ত inject করিলেই ভাল হয়।

করুণা বলিল, "আমার রক্ত দিলে হ'বে?"

"তা কেন হ'বে না? রক্ত সম্পর্ক যার সঙ্গে আছে এমন কেউ হ'লেই হয়। কিন্তু আপনার শরীরে—কোনও ব্যারাম নেই তো?—আপনার চেহারাটা খুব সুস্থ ব'লে মনে হয় না।"

কথাটায় করুণা একটু থমকিয়া গেল। সে একটু থামিয়া বলিল, "না অসুখ বিসুখ আমার কিছু নেই—কিন্তু"—

ডাক্তার কিন্তুটুকু শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু করুণা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। তার পর সে বলিল, "আচ্ছা রক্তের সম্পর্ক না থাকলে তার রক্ত দেওয়া চলে না?"

"চলে—কিন্তু সম্পর্ক থাকলেই সব চেয়ে ভাল হয়।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া করুণা বলিল, "তা হ'লে আমার রক্তই দিন।"

ডাক্তারের একটু সন্দেহ হইল। তিনি একটু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "দেখুন, কথাটা আমার ডাক্তার হিসাবে বলা নিতান্তই দরকার তাই বলছি। আপনি কিছু মনে ক'রবেন না। আপনার যদি কোনও ব্যারাম সত্যি সত্যি থেকে থাকে,—সেটা কোন রকম লজ্জা বা কুণ্ঠা থেকে গোপন ক'রলে এতে মেয়ের গুরুতর অনিষ্ট হ'তে পারে।—আপনি ভাল ক'রে ভেবে দেখুন।"

করুণার মুখ এ কথায় লাল হইয়া উঠিল। ডাক্তারের কথার ইঙ্গিতটা সে বুঝিতে পারিল, তাই সে লজ্জায় ঘৃণায় লাল হইয়া গেল। যথাসম্ভব আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল, "সে জন্য আপনি ভাববেন না। আমার কোনও ব্যারাম আছে ব'লে আমি জানি না। তবু আপনি বরঞ্চ আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখুন, আমার অজানা যদি কোনও ব্যারাম থাকে।"

ডাক্তার বলিলেন, "মাপ ক'রবেন, কথাটা জিজ্ঞাসা করা আমার বোধ হয় ধৃষ্টতা। কিন্তু কোনও ব্যারাম যদি না থাকে আপনার তবে আপনি নিজের রক্ত দিতে সঙ্কোচ বোধ ক'রছিলেন কেন?"

করুণার মুখে ভয় ও উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "দেখুন,—কথাটা হ'চ্ছে এই যে নেলী আমার পেটের মেয়ে নয়।—দয়া ক'রে এ কথাটা প্রকাশ ক'রবেন না।"

কথাটা শুনিয়া ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন "তবে"—

"সে অনেক কথা—আপনার শোনবার যোগ্য নয়। যা' হ'ক আপনি আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখুন।"

ডাক্তার বেশী কিছু পরীক্ষা করিলেন না। করুণাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ও তার হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিলেন।

পরীক্ষান্তে তিনি বলিলেন, "আপনার নিজেরই যে anaemia রয়েছে, আপনার রক্ত দেওয়া সঙ্গত হ'বে না। যে রক্তটা দেওয়া হ'বে সেটা যত পুষ্টিবহুল হয় ততই ভাল।"

করুণা হতাশ হইয়া পড়িল। সে বলিল, "তবে তো কোনও উপায় নেই—আর কে একে রক্ত দেবে?"

ডাক্তার বলিলেন, "কিছু টাকা দিতে পারলে বোধ হয় লোক পাওয়া অসম্ভব নয়।"

হাত পা ছাড়িয়া দিয়া করুণা এলাইয়া পড়িল। টাকা সে পাইবে কোথায়?

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। করুণা পিছু হইতে ডাকিয়া বলিল, "দেখুন—একটা লোক জোগাড়"—

ডাক্তার মুখ ফিরাইলেন।

করুণা বলিল, "না থাক",—

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। করুণা নেলীর বিছানার পাশে বসিয়া নেলীকে বাতাস করিতে লাগিল।

তার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল দুঃখে। সামান্য কিছু টাকা হইলে নেলীর জীবন রক্ষা হয়—কিন্তু কোথায় পাইবে সে টাকা?—সমস্ত জীবন—তার সারাজীবনের দুঃখ ও ব্যথার ইতিহাস আজ সে মনের মধ্যে ওলট পালট করিতে লাগিল। সে-জীবনে কোথাও একটি দিনের তরে এক ফোঁটা আলোকপাত হইয়াছে বলিয়া তার মনে হইল না। আজ তার যে দুঃখ সে সেই সমস্ত জীবনের পুঞ্জীভূত সকল ব্যথার উপর ব্যথা—সে আর সহিতে পারে না।

সেদিন বৈকালে পিয়ন আসিয়া তাকে একখানা চিঠি দিল। চিঠিপত্র সে বড় পায় না; তার কাছে কে চিঠি লিখিবে?—তাই কৌতূহলের সহিত সে পত্রখানি খুলিল। পত্র পড়িয়া তার মন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পত্র লিখিয়াছে রমেন, আর সে পত্রের ভিতর ভরিয়া দিয়াছে পঁচিশ টাকার নোট।

রমেন লিখিয়াছে, "ডাক্তারের কাছে শুনিলাম আপনার টাকার দরকার। পঁচিশটা টাকা পাঠাইলাম। ইহা ঋণ স্বরূপে গ্রহণ করিলে সুখী হইব।"

প্রথমেই তার মনে হইল, এখন ডাক্তারের কাছে ছুটিয়া গিয়া সে রক্ত দিবার বন্দোবস্ত করে। অসহ্য আবেগের সহিত সে জুতা ও কাপড় পরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

প্রস্তুত হইয়া সে বসিয়া পড়িল। দারুণ সন্দেহ ও দ্বিধায় তার মন অস্থির হইল। তার অন্তরাত্মা তাকে বলিতেছিল, এ টাকা লইও না, তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। তাই সে থমকিয়া গেল।

রমেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতে তার সমস্ত ইতিহাস সে মনে মনে আলোচনা করিয়া গেল। রমেনকে সে চেনে না, জানে না। সে মাঝে মাঝে আসিয়া তার উপকার করিয়া যায় এইটুকু তার সঙ্গে সম্পর্ক। কিন্তু সেই উপকারটুকু সে করে বলিয়াই তার পক্ষে নেলীর চিকিৎসা করা সম্ভব হইতেছে। প্রত্যক্ষভাবে উপকার করিয়াই সে সন্তুষ্ট নয়, সে ডাক্তারের কাছে নিয়মিত তার সংবাদ লয়। ডাক্তার যে তাঁর ভিজিট ও ঔষধের দাম বাকী রাখিয়া একাগ্রভাবে চিকিৎসা করিতেছেন, গয়লা যে দাম বাকী রাখিয়া তাকে দুধ জোগাইতেছে, দুটো পুষ্টিকর খাদ্য যে সে নেলীকে দিতে পারিতেছে সবই রমেনের দয়ায়।

কিন্তু কেন? রমেন এই অপরিচিত নারীকে এত দয়া করিতেছে কেন?

নিদারুণ সন্দেহে তার মন অন্ধকার হইয়া উঠিল।

জীবনে কোনওদিন কারও কাছে সে দয়া পায় নাই—পাইয়াছে লাঞ্ছনা। স্বামীর কাছে সে যে অত্যাচার উৎপীড়ন পাইয়াছে, তাহা মনে করিতে তার অন্তর শিহরিয়া উঠিল। যাদের যাদের বাড়ী চাকরী করিয়া সে এতদিন কষ্টে ঠাট বজায় করিয়া আসিয়াছে, তাদের কাছে সে ভদ্রতা পাইয়াছে, লাঞ্ছনাও পাইয়াছে। আর সাধারণতঃ পুরুষদের কাছে সে বহুবার কুৎসিত রকমের লাঞ্ছনা ও অপমান লাভ করিয়াছে। বড় কষ্টে বড় দুঃখে তার দিন কাটিয়াছে, বহুকষ্টে তার নিজের সম্মান ও মর্য্যাদা সে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এতদিনের ভিতর কোনও দিনই পুরুষের কাছে সে নিঃস্বার্থ করুণা বা অহেতুক অনুগ্রহের পরিচয় পায় নাই। তাই তার বিষাক্ত অন্তর এ জিনিষ দুটির অস্তিত্বই স্বীকার করিতে শিক্ষা পায় নাই।

রমেন যে আজ তার উপর এই অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ চাপাইতেছে, তার ঋণের ভার এত বাড়াইতেছে যে জীবনে কোনও দিনই সে তাহা পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারিবে না—এটা যে একান্ত অহেতুক তাহা তার মনে হইল না। তার রূপ নাই, কিন্তু যৌবন এখনও অটুট—আর সে একেবারে অসহায় নিঃসম্বল। তার এই কথাটাই মনে হইল যে, রমেন তার প্রতি এত যে করুণা দেখাইতেছে সে, শুধু এই যৌবনটুকুর লোভে।

এতদিন সে কষ্ট পাইয়াছে, কিন্তু প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া অনাহারে থাকিয়াও সে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে, কারও কাছে তার নত হইতে হয় নাই। কারও কাছে এক পয়সা ধার পর্য্যন্ত সে কোনও দিন চায় নাই। সামান্য তার শিক্ষা, স্কুলের ফার্ষ্ট ক্লাশ পর্য্যন্ত সে পড়িয়াছে, আর সামান্য কিছু সেলাই ও গান বাজনা সে জানে। সেই সম্বল লইয়া সামান্য সামান্য চাকরী করিয়া এতদিন সে চালাইয়াছে। কষ্ট পাইয়াছে, কিন্তু কারও কাছে কোনও ঋণ বা অনুগ্রহের বন্ধন তার স্বীকার করিতে হয় নাই। কিন্তু আজ আর তা' চলে না। নেলীর জন্য তার এ হীনতা

স্বীকার করিতে হইয়াছে—রমেনের কাছে অনুগ্রহ লইতে হইয়াছে। বার বার সে চেষ্টা করিয়াছে এ অনুগ্রহের দান প্রত্যাখ্যান করিতে, প্রতিবারেই নিদারুণ প্রয়োজন তাকে বাধ্য করিয়াছে—জীবনের স্থির প্রতিজ্ঞা হইতে সে স্খলিত হইয়াছে।

পঁচিশটি টাকা হাতে লইয়া তার মনে হইল যে, এই রমেনের শেষ দান নয়। নেলীকে বাঁচাইতে হইলে আরও অনেক টাকার দরকার হইবে; আর রমেনের কাছে ধার লওয়া ছাড়া সে টাকা সংগ্রহ করিবার তার অন্য উপায় কিছুই নাই। রমেনের কাছে চাহিলেই সে টাকা পাইবে—না চাহিতেই পাইবে; কিন্তু এমনি করিয়া যদি সে রমেনের ঋণ আরও বাড়াইয়া ফেলে, তবে এমন একদিন আসিবে যখন রমেন তার প্রতিদান চাহিবে। টাকা সে চাহিবে না, চাহিলেও টাকা করুণা কোনও দিনই দিতে পারিবে না। কিন্তু যে অমূল্য সম্পদ সে চাহিবে, অবশেষে তাই দিয়া কি করুণার ঋণ মোচন করিতে হইবে?

এ কথা ভাবিতে করুণার সমস্ত অন্তর তিক্ত হইয়া উঠিল। রমেনের চিঠি ও টাকা একটা খামের ভিতর ছিল। সে তাহা কুলুঙ্গীর উপর রাখিয়া দিল। জুতাটা খুলিয়া ফেলিল। আবার নেলীর বিছানার পাশে গিয়া বসিল।

নেলী ঘুমাইতেছিল; তার শীর্ণ পাণ্ডু মুখের দিকে চাহিয়া করুণার বুক হইতে ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না বাহির হইতেছিল। করুণা সে কান্না চাপিতে পারিল না। তার দুই চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

একটা কথা তার মনে হইল, নেলীকে হাঁসপাতালে দিলে কেমন হয়। কথাটা আগেও তার মনে হইয়াছিল—কিন্তু এই নিদারুণ ব্যাধির মধ্যে তাকে বুক হইতে ছিনাইয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবার কথা ভাবিতে তার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিত। তাই সে সে কথা মনে আসিতে দিত না। কিন্তু আজ ভাবিয়া স্থির করিল হাঁসপাতালে পাঠান ছাড়া আর তার গতি নাই। এখন পর্য্যন্ত তার যে ঋণ হইয়াছে, তাহা শোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু আর বাড়িলে সে পারিবে না।

সে মন স্থির করিয়া উঠিল। পাশের ঘরের পাঞ্জাবীদের একটা মেয়েকে ডাকিয়া সে নেলীর কাছে বসাইল। তার পর সে জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তারকে হাঁসপাতালের কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "তা পাঠালে হয়, সেখানে চিকিৎসা ভালই হ'বে। তবে খাবারটা আপনিই পাঠাবেন; হাঁসপাতালের খাওয়াটা ভাল হয় না।"

কিন্তু ডাক্তার বাবু কয়েকটা হাঁসপাতালে খোঁজ করিয়া পরের দিন জানাইলেন যে, কোনও ভাল জায়গায় "বেড" খালি পাওয়া গেল না। সপ্তাহখানেকের পূর্ব্বে নেলীকে হাঁসপাতালে দেওয়ার সুবিধা হইবে না।

এ কথায় করুণার হতাশ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু যেন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। হাঁসপাতালে পাঠাইবার প্রস্তাব সে করিয়াছিল আপনার হৃৎপিণ্ড দু'হাতে চাপিয়া, কেবলমাত্র নেলীর মঙ্গলের দিকে চাহিয়া। যদি ব্যবস্থা হইত, তবে করুণার বুকটা ছিঁড়িয়া তাকে পাঠাইতে হইত। তাই তার চেষ্টা সত্ত্বেও যখন হাঁসপাতালে পাঠান গেল না, তখন সে যেন বাঁচিয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন, "একটা মেয়ে আমি ঠিক ক'রেছি। বলেন তো আজই তাকে এনে রক্ত দিয়ে দিতে পারি।"

করুণা কথা বলিতে পারিল না, মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। এ কথা তার মুখে সরিল না, এ যে তার আত্মহত্যার আয়োজন, তার সকল সম্মান ও প্রতিষ্ঠার কবর খোঁড়া;—তার এক ফোঁটাও সন্দেহ ছিল না, যে রমেনের এই পঁচিশটি টাকা খরচ করিতে স্বীকার করিয়া সে তার ভবিষ্যৎ নিঃশেষে বিক্রয় করিয়া ফেলিল।

* * * *

একটি খৃষ্টান মেয়েকে আনিয়া ডাক্তার নেলীকে রক্ত inject করিয়া গেলেন।

টাকা গুনিয়া দিয়া করুণা হাত পা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষাবিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র-অবলম্বনে)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; প্রথম, হিন্দু-সাহিত্যের অনুশীলন; দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রম-প্রচলন। বাঙলা-সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবের আমদানি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষার সুবিধার জন্য ১৮২৭, মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজি ক্লাস খোলা হয়, কিন্তু ইহা আট বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৪২, অক্টোবর মাসে শিক্ষা-পরিষদের চেষ্টায় এই বিভাগ পুনস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাসাগর এই ইংরেজি বিভাগের শিক্ষা-প্রণালীর ভিতরের গলদ বেশ বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি ইহাকে ফলপ্রসূ করিতে সচেষ্ট হইলেন।

বাঙলায় ভাল শিক্ষক হইতে হইলে এবং নব সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের পক্ষে সংস্কৃত ও ইংরেজি, এই দুই ভাষাতেই যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হওয়া দরকার—ইহাই বিদ্যাসাগরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই অভিপ্রায়ে তিনি ১৮৫৩, জুলাই মাসে শিক্ষা-পরিষদকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন।* ইংরেজি বিভাগ সুদৃঢ় ও পুনর্গঠিত করা যে নিতান্ত আবশ্যক, আর তাহা করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন, এবং বিলাতের ডিরেক্টরদের ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১নং পত্র অনুসারে সে অর্থ যে প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের অনুষ্ঠানগুলি এখনও পাইতে পারে, পত্রে তিনি সে দাবী করিতে ছাড়িলেন না। সংস্কৃত শিখিবার জন্য ক্রমাগত ছেলে আসিতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে কলেজে স্থান দিতে হইলে অবিলম্বে একটি অতিরিক্ত সংস্কৃত ক্লাস খোলা দরকার। ইহার জন্য অন্ততঃ ৩০ টাকা বেতনের একজন সুদক্ষ শিক্ষক রাখিতে হইবে। ইংরেজি বিভাগ ভাল করিয়া চালাইতে হইলে পাঁচজন শিক্ষকের প্রয়োজন। এই পাঁচজনের বেতন মাসে ৩৬০ টাকা লাগিবে। তন্মধ্যে এখন তিনজন শিক্ষক ও সংস্কৃত-গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপককে মাসিক ২৮২ টাকা দিতে হয়। অতএব যে টাকাটা প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্র-সমূহের জন্য খরচ করিবার কথা, সেই টাকা হইতে আর ৭৮ টাকা দিলেই এখন চলিতে পারে। অবশ্য সংস্কৃত বিভাগের একজন নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকের জন্য আর ৩০ টাকা লাগিবে। তাহা হইলে মাসিক মোট ১০৮, অর্থাৎ বার্ষিক ১২৯৬ টাকা, অধিক খরচা হইবে। ডিরেক্টরদের পত্রের অঙ্গীকার ধরিয়া এবং অঙ্কের হিসাব করিয়া এই সুদীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করিলেন, বার্ষিক ২৪,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের জন্য ব্যয় করা যাইতে পারে। সরকার সংস্কৃত কলেজের ১৮৪০ সালের খরচা বাবদ ১৭,৬৯৪ টাকা মঞ্জুর করেন। সেই অবধি বোধ হয় এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে, সংস্কৃত কলেজ উহার অতিরিক্ত আর একটি পয়সাও সরকারের নিকট হইতে দাবী করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাত্র ঐটুকুই দেয় নয়। কাজেই বর্ত্তমানে বার্ষিক আরও ১২৯৬ টাকা দিলেও সরকারের বাস্তবিক অধিক ব্যয় হইবে না।

ইংরেজি ও সংস্কৃত—উভয় ভাষার এইরূপ মিলিত শিক্ষার উপকার উপলব্ধি করিয়া শিক্ষা-পরিষদ সরকারের সম্মতিক্রমে এই অধিক অর্থব্যয় মঞ্জুর করিলেন। বিদ্যাসাগরের যুক্তিপূর্ণ প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ১৮৫৩, নভেম্বর মাসে ইংরেজি বিভাগে একটি অধিকতর বিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বিত হইল। পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী হইলেন—ইংরেজির অধ্যাপক ও শ্রীনাথ দাস হইলেন গণিতের অধ্যাপক। পূর্ব্বে সংস্কৃতে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা

* Vidyasagar to the Council of Education, dated 16 July 1853.—*Education Con.* 22 Sept. 1853. No. 44.

চলিত—ভাস্করাচার্য্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' ছাত্রদিগকে পড়িতে হইত। বিদ্যাসাগর ইহা উঠাইয়া দিয়া অতঃপর ইংরেজিতেই গণিতের শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলেন। এখন হইতে ইংরেজি অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়-সমূহের অন্তর্গত করা হইল।

বিদ্যাসাগর যখন এই-সব সংস্কারে ব্রতী, সেই সময় শিক্ষা-পরিষদ কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ—বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ জে-আর-ব্যালাণ্টাইনকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিবার জন্য আহ্বান করিতে চাহিলেন। পরিষদ এই সম্পর্কে সরকারকে লিখিলেন :—

"বর্ত্তমান সুযোগ্য উদ্যোগী অধ্যক্ষের নিয়োগ অবধি সংস্কৃত কলেজে বহুবিধ গুরুতর সংস্কারের প্রবর্ত্তন হইয়াছে,—সরকার ইহা অবগত আছেন। ফল ইহাতে ভালই হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এখনকার তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টির এক অতিপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বর্ত্তমানে যে-সব পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য যাহা সঙ্কল্পিত আছে, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত-পণ্ডিতের মত জানিবার জন্য শিক্ষা-পরিষদ বিশেষ ইচ্ছুক।"*

শিক্ষা-পরিষদের নিমন্ত্রণে ডাঃ ব্যালাণ্টাইন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন (১৮৫৩, জুলাই-আগষ্ট)। পরিদর্শনান্তে একটি রিপোর্ট পরিষদে পেশ করিলেন :—

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথা শুনিয়া এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ-সম্পর্কে তৎপ্রদত্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, এই সুধী অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে আমার সে ধারণা দৃঢ়তর হইল,—এই আলাপে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিলাম।"

কলেজের পঠন-ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয়ে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিবার পর তিনি কাশী ও কলিকাতা—এই উভয় সংস্কৃত কলেজের অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বারাণসীতে বাধ্যতামূলক ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা যে সম্প্রতি অসমীচীন, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তারপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নূতন কতকগুলি পুস্তক প্রবর্ত্তন ও ছাত্রদের ভাবগ্রহণ করিবার শক্তি সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিদ্যাসাগরের পরবর্ত্তী রিপোর্ট হইতে জানা যাইবে। নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ডাঃ ব্যালাণ্টাইন তাঁহার রিপোর্ট শেষ করিয়াছেন :—

"ভারতীয় পাণ্ডিত্য ও ইংরেজি বিজ্ঞানের মধ্যে যে প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা ঘুচাইবার জন্যই আমি এই-সকল কথার অবতারণা করিয়াছি।...কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি এই উভয়বিধ পাঠ্যই পড়িতে হয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উভয় ভাষার শাস্ত্রের কোথায় মিল, কোথায় অমিল—তাহা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ছাত্রদের অবধারণ যে সন্তোষজনক নয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং সেইজন্যই কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া অতিরিক্ত আরও যে যে গ্রন্থের প্রচলন প্রয়োজন, তাহার প্রস্তাব করিয়াছি... ।"

শিক্ষা-পরিষদ ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন (২৯ আগষ্ট, ১৮৫৩)। বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের বর্ণিত প্রণালীর সমর্থন করিতে না পারিয়া পরিষদের নিকট নিম্নলিখিত উত্তর প্রেরণ করিলেন :—

"বিদ্যালয়ে যে-সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের মত গুণী লোকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

"ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। মিলের লজিকের যে সংক্ষিপ্ত-সার তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে তাহাই তিনি প্রবর্ত্তিত করিতে চান। বর্ত্তমান অবস্থায়, আমার মতে, সংস্কৃত কলেজে মিলের গ্রন্থ পড়ানো একান্ত প্রয়োজন। মিলের পুস্তকের মূল্য অধিক ;—ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্ত-সারের প্রচলন-প্রস্তাবের প্রধান কারণ ইহাই মনে হয়। আমাদের ছাত্রদের প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহ একটু বেশি দাম দিয়াও কিনিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে ; কাজেই মূল্যাধিক্যের জন্য এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচলন হইতে বিরত থাকিবার কারণ নাই। ডাঃ ব্যালাণ্টাইন বলেন,

* F. J. Mouat, Secy. to the Council of Education, to Cecil Beadon, Secy. to the Government of Bengal, dated 21 May 1853.—General Dept. Con. 16 June 1853, No. 43.

তাঁহার সংক্ষিপ্ত সার মিলের লজিকের মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু মিল নিজে তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, আর্চবিশপ হয়েটলির তর্কশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থই তাঁহার লজিকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপক্রমণিকা। অতএব এ-বিষয়ে বিবেচনার ভার শিক্ষা-পরিষদের উপর রহিল। ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য-দর্শনের তিনখানি পাঠ্যপুস্তক প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। 'বেদান্তসার' পূর্ব্ব হইতেই পাঠ্যরূপে সংস্কৃত কলেজে গৃহীত; ইহার ইংরেজি অনুবাদ পড়ানো যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত ন্যায়-সম্বন্ধীয় 'তর্ক সংগ্রহ' এবং সাংখ্য-সম্পর্কিত 'তত্ত্বসমাস' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ। আমাদের পাঠ্যসূচিতে উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তকের নির্দ্দেশ আছে। বিশপ বার্কলীর Inquiry সম্বন্ধে আমার মত এই যে, পাঠ্যপুস্তকরূপে ইহার প্রবর্ত্তনে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক। কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়াইয়া উপায় নাই। সে-সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই-দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিষ। সংস্কৃতে যখন এগুলি শিখাইতেই হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজিতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার। বার্কলীর Inquiry বেদান্ত বা সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে; ইউরোপেও এখন আর ইহা খাঁটি দর্শন বলিয়া বিবেচিত হয় না, কাজেই ইহাতে কোনক্রমেই সে কাজ চলিবে না। তা ছাড়া হিন্দু শিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শনের মত একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের মতের অনুরূপ, তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক—বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। এ অবস্থায় বিশপ বার্কলীর গ্রন্থ পাঠ্য-পুস্তকরূপে প্রচলন করিতে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত একমত নহি।

"সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় প্রকারের পাঠ-পদ্ধতিই যে ভাল, একথা ডাঃ ব্যালাণ্টাইন স্বীকার করিয়াছেন। অথচ উভয়বিধ পাঠের ফলে 'সত্য দ্বিবিধ'—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জন্মিতে পারে, এ ভয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—'এ ভয় অলীক নয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত অথচ ইংরেজিতেও অভিজ্ঞ আমি এমন-সব ব্রাহ্মণকে জানি যাঁহারা পাশ্চাত্য লজিক ও সংস্কৃত ন্যায়,—এই উভয় শাস্ত্রের মত ঠিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু উভয়ের মূল তত্ত্বের ঐক্য সম্বন্ধে কোন ধারণা তাঁহাদের নাই এবং সেজন্য এক ভাষায় অন্যটির চিন্তাপদ্ধতি প্রকাশ করিতে অক্ষম।' আমার বিশ্বাস, যে-লোক সংস্কৃত ও ইংরেজি—এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মত পাঠ করিয়াছে—বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যে যথার্থরূপে ধারণা করিয়াছে, তাহার কাছে সত্য—সত্যই। 'সত্য দুই রকমের' এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হইবে। যেখানে দুইটি সত্যের মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেখানে সেই ঐক্য যদি কোন বুদ্ধিমান ছাত্র বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সেরূপ ঘটনা সত্যই অদ্ভুত বলিতে হইবে। ধরা যাক, ইংরেজি ও সংস্কৃত—উভয় ভাষাতেই ছাত্রেরা লজিক, অথবা দর্শন বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগ অধ্যয়ন করিল। এখন যদি তাহারা বলে, 'লজিকের পাশ্চাত্য থিয়োরিও সত্য, হিন্দু থিয়োরিও সত্য', অথচ যদি তাহারা উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান না পায়, এবং না পাইয়া এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় তাহারা বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, না হয়, যে ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই ভাষায় তাহাদের জ্ঞান অল্প। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু-দর্শনে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা ইংরেজিতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা যায় না; তাহার কারণ সে-সব অংশের মধ্যে পদার্থ কিছু নাই।

"ডাঃ ব্যালাণ্টাইন আরও বলেন,—'বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজের গঠন-পদ্ধতি এবং ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ভাষার শিক্ষার রীতি হইতেই বুঝা যায়, এমন একদল লোক গড়িয়া তোলা দরকার, যাহারা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে, এবং উভয় দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিভাষী ব্যাখ্যাতার কার্য্য করিয়া উভয়ের মধ্যে যেখানে দৃশ্যতঃ অনৈক্য, সেইখানে সত্যকার মিল দেখাইয়া দিয়া অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করিবে;—হিন্দুর

দার্শনিক আলোচনা যে-সকল প্রাথমিক সত্যে পৌঁছিয়াছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবে।' দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত অন্যমত। আমার মনে হয় না আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাইতে পারিব। যদি বা ধরিয়া লওয়া যায় ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয় উন্নতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তথ্য-সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব। কোন নূতন তত্ব, এমন কি তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে, তাহারই পরিবর্দ্ধিত স্বরূপ—যদি তাহাদের গোচরে আনা যায়, তবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। আরব-সেনাপতি অমরু আলেকজেন্দ্রিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্থা কি করা যাইতে পারে, তখন খালিফ উত্তর দিলেন, 'গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরাণের মতের অনুযায়ী, না-হয় বিরুদ্ধ; যদি অনুরূপ হয় ত এক কোরাণ থাকিলেই যথেষ্ট; আর যদি বিরুদ্ধ-মত হয় ত গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর। অতএব ওগুলি ধ্বংস কর।' আমার বলিতে লজ্জা হয়—ভারতীয় পণ্ডিতগণের গোঁড়ামি ঐ আরব-খালিফের গোঁড়ামির চেয়ে কিছু কম নয়। তাহাদের বিশ্বাস, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব শাস্ত্র-সমূহ অভ্রান্ত। আলাপ অথবা আলোচনার সময় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নূতন সত্যের কথা অবতারণা করিলে, তাহারা হাসি-ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেয়। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে—বিশেষতঃ কলিকাতা ও তাহার আশপাশে—পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; শাস্ত্রে যাহার অঙ্কুর আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনিলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখানো দূরে থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয় এবং 'আমাদেরই জয়' এই ভাব ফুটিয়া উঠে। এই-সব বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করাইবার কোন আশা আছে, এমন আমার বোধ হয় না। যে প্রদেশের পণ্ডিতদের দেখিয়া ডাঃ ব্যালাণ্টাইন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এই-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার মত খাটাইলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

"বাঙলার কথা স্বতন্ত্র। 'দুইস্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত' এবং 'জোর করিয়া সামঞ্জস্য-বিধান বিজ্ঞের কার্য্য নহে'—তাঁহার এই মন্তব্য-গুলি খুবই সমীচীন। ভারতবর্ষের এই অংশের স্থানীয় অবস্থার দরুণ শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে আমাদের বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আমি সযত্নে এখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাহাতে আমার মনে হইয়াছে, দেশীয় পণ্ডিতদের কোনকিছুতে হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত নয়। তাঁহাদের মনস্তুষ্টি-সম্পাদনের প্রয়োজন নাই, কেননা আমরা তাঁহাদের কোনরূপ সাহায্য চাই না। আজ ইঁহাদের সম্মানও লুপ্তপ্রায়, কাজেই এই দলকে ভয় করিবার কারণ দেখি না। ইঁহাদের কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। এদলের পূর্ব্ব-আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার আর বড় সম্ভাবনা নাই। বাঙলা দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। দেখা যাইতেছে, বাঙলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টি না করিয়াও আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাঙলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এই-সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিতে পারে এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি,—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরণের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সঙ্কল্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা কলেজের পাঠ শেষ করিয়া এই ধরণের লোক হইয়া গড়িয়া উঠিবে—এমন আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ আশা অলীক নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যে বাঙলা ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে—ইহাতে কোন

সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইংরেজি বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যেও যে তাহারা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ ও তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহে জ্ঞানলাভ করিবে—তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুখের বিষয়, সম্প্রতি তাহাদের চিন্তাধারায় এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে মনে হয়, অতঃপর প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্রই দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে। এখানকার সংস্কৃত কলেজের কাছে কি আশা করা যাইতে পারে, তাহার নমুনাস্বরূপ রিপোর্টের সঙ্গে গতবর্ষের একটি বাঙলা প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ পাঠাইলাম। প্রবন্ধটির লেখক—দর্শন বিভাগের ছাত্র রামকমল শর্ম্মা। রামকমল এই বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, কলেজের পাঠ শেষ করিতে তাহার এখনও তিন বৎসর বাকি, এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সে এখনও বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই।"

এই পত্র-বিনিময় হইতে হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, অথচ আনুষঙ্গিক শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি মোটেই ছিল না। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী এবং অসাধারণ কাজের লোক। পাশ্চাত্য জ্ঞান-আহরণের পক্ষে প্রাচীন শাস্ত্রের উপর অন্ধভক্তিই যে প্রধান অন্তরায়,—ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। ভারতবাসীর মন পাশ্চাত্য-জ্ঞানমণ্ডিত হইয়া উঠে,—ইহাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক অভিলাষ। সেইজন্য সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি বিভাগের উন্নতির তিনি এত পক্ষপাতী ছিলেন। দুঃখের বিষয়, ব্যাবহারিক দিক দিয়া দেখিতে গিয়া বিদ্যাসাগর ভারতীয় দর্শনের মধ্যে কোন উত্তম বস্তু খুঁজিয়া পান নাই। শিক্ষা-পরিষদে প্রেরিত পত্রে তাই তিনি বলিয়াছেন,—"কতকগুলি কারণে (যাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন) সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য না পড়াইয়া উপায় নাই। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই।" গোড়ায় যখন এদেশে ইংরেজি-শিক্ষার প্রচলন সুরু হয়, তখন একদল গোঁড়া পণ্ডিত ইহার অত্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য,—যাহা কিছু দরকারী, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদের বাক্যের মধ্যেই তাহা পাওয়া যায়, ইংরেজি-শিক্ষা যে শুধু অপ্রয়োজনীয় তাহা নহে, ইংরেজি-শিক্ষা সমস্ত সমাজ-শৃঙ্খলার বিরোধী। ইহার প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই সুরু হইল। সংস্কার-প্রয়াসী একদল হিন্দু একেবারে বিপরীত পথে চলিলেন; তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, হিন্দুশাস্ত্রে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও বিদ্যাসাগরের ঝোঁক ছিল এই নূতন দলের দিকে। সুবিধার দিক দিয়া তিনি হিন্দু-দর্শনের দোহাই দিলেও ইহাতে তাঁহার নিজের বিশ্বাস মোটেই ছিল না। রামমোহন রায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দর্শনের উভয় দিকই ভাল বুঝিতেন; বিদ্যাসাগরের মধ্যে রামমোহনের সেই দৃষ্টির উদারতার অভাব ছিল। নব্য ইউরোপীয়ের মত বিদ্যাসাগরের দৃষ্টির পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ। যাহা কিছু সমস্তই তিনি কাজের দিক দিয়া করিতেন এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে 'জন্ বুলের' জিদ ও অদম্য উৎসাহই দেখাইতেন।

শিক্ষা-পরিষদ সব দিক বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩):—

"ডাঃ ব্যালান্টাইন সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও উন্নতির সম্বন্ধে এমন অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া শিক্ষা-পরিষদ আনন্দিত।......পরিষদ চান যে, অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালান্টাইনের সংক্ষিপ্ত-সার ও অন্যান্য গ্রন্থ অবাধে ব্যবহার করেন। তাঁহার নিজের ও তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকদের বক্তৃতান্তর্গত বিষয়-সমূহের অর্থ বুঝাইবার ও উদাহরণ দিবার জন্য এগুলি অত্যন্ত কাজে লাগিবে। ডাঃ ব্যালান্টাইনের গ্রন্থের সহিত পরিচয়ে এই-সব বিষয়ের শিক্ষার্থীগণ যথেষ্ট উপকৃত হইবে। তাঁহার বিদ্যালয়ের উন্নতির সম্বন্ধে অধ্যক্ষ যেন ডাঃ ব্যালান্টাইনের সহিত সর্ব্বদা পত্র-ব্যবহার করেন। কাশী ও কলিকাতা—এই দুইটি প্রধান বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রমিক উন্নতি সম্বন্ধে অবাধে মতের বিনিময় করেন—ইহাও শিক্ষা-পরিষদের ইচ্ছা।"

সংস্কৃত কলেজ নূতন করিয়া গড়িবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় শিক্ষা-পরিষদের এই আদেশ তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। তিনি কার্য্যে অন্যের হস্তক্ষেপ সহিতে পারিতেন না এবং যাহা ঠিক বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইতে এক চুলও নড়িতেন না। ৫ই অক্টোবর, ১৮৫৩, শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডাঃময়েটকে লিখিত এই আধা-সরকারী চিঠিখানি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে:—

"ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট-সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের আদেশ স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম; সেই আদেশগুলি হুবহু প্রতিপালন করিতে গেলে, পরিষদের অনুমতিক্রমে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজে প্রবর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইবে। ফলে কলেজে আমার অবস্থা কতকটা অপ্রীতিকর, এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়াও ক্ষতিকর হইবে।

"কলেজ-বন্ধের ও বাড়ি যাইবার তাড়াতাড়িতে আমি এবিষয়ে সরকারী চিঠি লিখিতে পারিলাম না। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি আমার মনে আসিয়াছে; কলিকাতা-ত্যাগের পূর্ব্বে তাহা আমি জানাইয়া যাইতে চাই।

"যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমি অনুমোদন করিতে পারি না তাহাই গ্রহণ করিতে, অথবা আমার সমপদস্থ একজন অধ্যক্ষের সহিত বিদ্যালয়ের উন্নতির সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মর্য্যাদাহানির যে কথা আছে, এমন একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই ব্যক্তিগত কথা সম্প্রতি আমি মিশাইতে চাহি না; এই-সব সর্ত্তে কাজ করিতে কোন শিক্ষিত ইংরেজই রাজি হইত না। ব্যক্তিগত আপত্তি ছাড়িয়া, প্রকৃত বিষয়ে অবতীর্ণ হইতেছি।

"মনে হয়, ডাঃ ব্যালাণ্টাইন এই ভাবিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাব-অনুসারে কার্য্য না হইলে ইংরেজি-সংস্কৃতের ছাত্রেরা 'দুইরূপ সত্যের' অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িবে। তাঁহার কাশীর পণ্ডিত-বন্ধুগণের মনোবৃত্তির সম্বন্ধে আমি কোন প্রশ্ন তুলিব না। কিন্তু একথা আমি জানি, এবং জোর করিয়া বলিতে পারি, বঙ্গদেশে এমন একজনও বুদ্ধিমান লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যিনি সংস্কৃত ও ইংরেজিতে শিক্ষিত হইয়া মনে করেন, 'সত্য দুই প্রকার।'

"বাঙলায় যথার্থ অধিকারী করিবার জন্য যদি আমি সংস্কৃত শিখাইতে পাই, তারপর ইংরেজির ভিতর দিয়া ছাত্রদের মনে যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারি, এবং আমার কার্য্যে যদি শিক্ষা-পরিষদের সাহায্য ও উৎসাহ পাই,—তাহা হইলে এবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন একদল যুবক তৈয়ারী করিয়া দিব, যাহারা নিজ রচনা ও পড়াইবার গুণে আপনাদের ইংরেজি অথবা দেশীয় যে-কোন কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অপেক্ষা ভালরূপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিবে। আমার এই একান্ত অভিলাষ—এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করিবার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে। ডাঃ ব্যালাণ্টাইন-কৃত সংক্ষিপ্তসার ও গ্রন্থের যেগুলি আমি অনুমোদন করিতে পারি—যেমন Novum Organum-এর সুন্দর ইংরেজি সংস্করণ—তাহা আনন্দসহকারে সত্বর বিদ্যালয়ে চালাইব। কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন, মূল্য, অথবা আমি যেখানকার অধ্যক্ষ সেই বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ও অবস্থার সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়াই যদি আমাকে তাঁহার গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—'আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।' এইরূপ ব্যবস্থা আমার প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির বাধা জন্মাইবে, এবং শিক্ষা-পরিষদের কর্ম্মচারী হিসাবে আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান সত্বেও যে দায়িত্ব আমি তীক্ষ্ণভাবে বোধ করি, তাহা একেবারে নষ্ট না হোক—ক্ষীণ হইয়া আসিবে।

"আশা করি, ব্যস্তভাবে লিখিত আমার বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত-গুলি শিক্ষা-পরিষদ সদয়ভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাব কতকটা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবেন,—যাহাতে সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্দেশিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক না হইয়া পড়ে।

"যদি দরকার হয়, কলেজের অবকাশের পর আমি এই বিষয়ে সরকারী—সুতরাং অধিকতর কেতাদুরস্ত—পত্র লিখিব।" *

এই পত্রখানিতে সুফল ফলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবস্থিত শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী যে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। এই সাফল্যের একটি প্রধান কারণ,—নিজের তাঁবে ঠিক ধরণের লোক বাছিয়া লইবার ক্ষমতা বিদ্যাসাগরের ছিল।

রাজকর্ম্মচারীরা বিদ্যাসাগরকে সম্মান করিয়া চলিতেন। শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যে তাঁহারা পণ্ডিতের পরামর্শ গ্রহণ

---

* ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ-সম্পর্কীয় রিপোর্ট ও বিদ্যাসাগরের পত্র দুইখানি বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের দপ্তরখানা হইতে গৃহীত।

করিতেন। সিভিলিয়ানদিগকে প্রাচ্যভাষা শিখাইবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ভাঙিয়া, ১৮৫৪ জানুয়ারী মাসে বোর্ড অফ একজামিনার্স গঠিত হইলে, বিদ্যাসাগরকে বোর্ডের একজন কর্ম্মী-সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সদস্য ও বাঙলার প্রথম ছোটলাট ফ্রেডারিক্ হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁহারই আদেশ অনুসারে পরিষদ বারাসতের নিকটবর্ত্তী বামুণমুড়া বঙ্গ-বিদ্যালয় প্রদর্শন করিতে বিদ্যাসাগরকে পাঠাইয়াছিলেন (জুলাই ১৮৫৪)। *

রমেশচন্দ্র দত্তের ভাষায় বলিতে হয়,—"এই উৎসাহী যুবক শিক্ষা-ব্যবস্থাপকের যশ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। বাঙলার শ্রেষ্ঠ ও শিক্ষিত জমিদারবর্গ তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিকরা তাঁহাদের নূতন সহযোগীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতিকামী ইংরেজবর্গ একজন সহকর্ম্মী পাইলেন।… সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া বিদ্যাসাগর শুধুই যে বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন, এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ লাভ করিয়াছিলেন তাহাই নয়,—ভারতীয় চিন্তার বাহিরের শক্তিপ্রদ ভাবধারাও তিনি অনায়াসে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে ইতস্তত করেন নাই। সবল স্বাস্থ্যের সহিত সতেজ হৃদয় পাইয়া তিনি সংস্কারের জন্য অবিশ্রান্ত সচেষ্ট ছিলেন।"

কিন্তু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারই শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের শেষ ও প্রধান কার্য্য নহে।

* বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট,—Education Con 14 Sept. 1854, No. 152 দ্রষ্টব্য।

উত্তরায়ন

শ্রীঅনুরূপা দেবী

৩

ঐ ঘটনার বছর কতক আগের কথা।—

গুরু গুরু গুরু গুরু মেঘের ডমরু ঘোর রোলে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। মহারুদ্রের ঘনজটাজাল সমস্ত আকাশময় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। দূরে ও নিকটে চারিদিকে ধূসর পর্ব্বতের বিরাট বিপুল মূর্ত্তি মেঘ-কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্টতর। উহারই মধ্যে মধ্যে কোথাও শ্বেত, কৃষ্ণ ও পাংশুবর্ণ মেঘের পুঞ্জ তাদের সজল মূর্ত্তি লইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া আছে। মাথার উপর ঘন দেবদারুর বন মেঘের কোলে যেন শত শত পেখম ছড়ানো ময়ূরের মতই দেখাইতেছে। বাঁকাচোরা এলোমেলো ভাবে, চকচকে নেপালী কুকরীর মতই বিদ্যুতের দীপ্ত শিখা ক্ষণে ক্ষণে সেই ক্রমনিবিড় নিকষ কালো মেঘের মধ্য হইতে চকিতে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল।

মুসুরি পাহাড়ের ক্যামেল্‌স্ ব্যাক রোড রাস্তার কিছু নীচে একটী অনতিবৃহৎ কাঠের দোতলা বাড়ীর একতলার বৈঠক-খানায় একটী আন্দাজ বছর চৌদ্দ পনেরো বয়সের বাঙ্গালীর মেয়ে একটা ছোট টেবিল হার্ম্মোনিয়মের সামনে বসিয়া বাজনা বাজাইয়া গাহিতেছিল,

"এস হে এস সজল ঘন, বাদল বরিষণে"

এস হে, এস, বলিয়া 'বাদল-বরিষণ'কে ঠিক এই সময়েই যে আহ্বান করিয়া ডাকিয়া আনার এই মেয়েটীর তেমন কিছু দরকার পড়িয়াছিল, তা কিন্তু নয়। বরঞ্চ তার সামনের জানলা দিয়া মেঘ-বিচ্ছুরিত দিগন্তের দিকে চোখ পড়িতেই তার বুকের ভিতরটায় বেশ একটী অস্বস্তির ধাক্কা আসিয়া ঢেউ তুলিয়া যাইতেছিল। এই সমীপাগত-প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেঘ-ঝঞ্ঝার মাঝখানে সে তার সারাদিনের অনুপস্থিত বাপের কথাই ভাবিতেছিল। প্রত্যুষেই তিনি আজ পাহাড় হইতে নামিয়া রাজপুর এবং রাজপুর হইতে মোটরে দেরাদুন গিয়াছেন, সন্ধ্যার পরে তাঁর ফেরার কথা। এই সময়ে তিনি রাজপুরের রাস্তায় কি পাহাড়ের চড়াই-পথে যেখানেই থাকুন, কষ্টভোগ অনিবার্য্যই! তাই মনে করিয়া মেয়েটী বারে বারেই চকিত হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতে-ছিল, আবার তখনই চোখ ফিরাইয়া লইয়া নিজেকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবার জন্যই বোধ করি ঐ গানটাই—যেটার ভাবার্থ তার মনের ভাষার সঙ্গে এই মুহূর্ত্তে একেবারেই খাপ খায় না,

অত্যন্ত অন্যমনস্কতার দরুণই মনের মধ্যে তার অর্থ পরিগ্রহ মাত্র না করিয়াই—শুধু সময়োচিততার খাতিরে পড়িয়া সেইটীকেই গাহিতে আরম্ভ করিল।

চিড়বনের মধ্যে বার্চ্চ বরাশ আন্দোলিত করিয়া বায়ুর মর্ম্মর এইবার তার সরোষ হুঙ্কারে প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। অপরাহ্নের সূর্য্য পাহাড়ের অন্তরালে পূর্ব্বেই লুকাইয়াছিলেন। এখন মেঘ-জটাজূটের আড়ালে দিবসান্তের শেষ আলোটুকু ঢাকা পড়িয়া শ্যামলস্নিগ্ধ মেঘালোকিতা প্রকৃতি গভীর অন্ধকারের নিকষে ঢাকা পড়িয়া আসিল।

কালবৈশাখীর ভীম ঝটিকা অট্টহাস্যে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

মেয়েটীর ঘরের মধ্যে বাহিরের অন্ধকার নিবিড়তর হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সাদা কালো 'রীড'গুলা সে অন্ধকারে মিশিয়া একই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। মেয়েটী বারেক গান বন্ধ করিয়া, সেই বর্দ্ধমান বাতাসের শব্দে ভরা অন্ধকারের দিকে ব্যাকুল হইয়া চাহিয়া থাকিয়া, তার পর আবার আস্তে আস্তে বাজনার 'কর্ড' দিয়া মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিল "এসহে এস হৃদয় হরা, এসহে আঁখি শীতল করা"...

রৌদ্রদগ্ধ দিবসান্তের সারা দীর্ঘদিনের তপস্যার ফল স্বরূপে তার সমস্ত তাপদাহ জুড়াইয়া সকল গ্লানি ধোয়াইয়া দিয়া প্রবলবেগে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। মেয়েটী বাজনা ছাড়িয়া উঠিয়া দরজার সামনে ছুটিয়া আসিল,—ঘোড়ার পায়ের শব্দ সে এত ঝড়-জলের শব্দের মধ্য হইতেও শুনিতে পাইয়াছিল।

"বাবা!"

"আরতি!"

বৈদ্যুতিক আলোকোচ্ছ্বাসে ঘর ভরিয়া উঠিল। "ওরে মঞ্জু, বাবা এয়েচেন রে! ওরে শীগ্‌গির করে ছোটুসিংকে চায়ের জল চড়িয়ে দিতে বল। মামিমা, ও মামিমা! বাবা বড্ড ভিজে এয়েচেন, তুমি খাবারগুলো শীগগির গরম করতে দাও। উঃ কি রকম ভিজেচ তুমি? আর এই ঝড়ে জলে কোন মানুষে কক্ষণো এমন পাহাড়ে রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ে ওঠে? ঘোড়াটা যদি ভড়কিয়ে গিয়ে ছুটতো? এত বড় হ'লে, কিছু ভেবে-চিন্তে কাজ করতে পারো না। ভারি অন্যায় কিন্তু এ-সব!"

অতুলবিহারী তাঁর আর্দ্র বেশভূষা পরিত্যাগ ঐ মেয়েরই সাহায্যে করিতে করিতে কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা রে! খুব দোষ হয়ে গ্যাছে। এবারকার মতন থেমে যা' তো! এর পরে আর যদি কোন দিন এ রকম করি, তখন খুব করে বকিস্, কেমন?"

মেয়ে বাপের গা হইতে তাঁর ভিজা কোট খুলিয়া লইয়া অপ্রসন্নমুখে সেটার হাত দুইটা ধরিয়া একটা চেয়ারের পিঠে ঝুলাইয়া দিবার জন্য লইয়া যাইতে যাইতে এই কথা শুনিয়াই ঝঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিল, "তা বই কি! হ্যাঁ! তুমি কি না একটুও কিছু মনে রাখো! এই সেদিন টিহিরীর পথে চড়াই উঠবার সময় বল্লে না যে, আর রৌদ্রের সময় পাহাড় হাঁটবে না! আজ আবার এই ঝড়-বৃষ্টিতে ঘোড়ায় চড়ে এলে!—"

এক পায়ের ভিজা বুট খুলিয়া ফেলিয়াই অতুলবিহারীর মনে পড়িয়া গিয়াছিল যে, অপর পায়েরটা শুদ্ধ খুলিয়া ফেলিলে এখনই তাঁহাকে তাঁর শাসনকর্ত্রী মেয়েটীর কাছে ভর্ৎসনার পাত্র হইয়া পড়িতে হইবে। অগত্যা অসুবিধা যতই হোক না কেন, তিনি আর নিজের অপরাধের মাত্রা বাড়াইয়া ফেলিতে ভরসা করিলেন না। সেই এক পায়ে ভিজা জুতা পরিয়াই সং সাজিয়া থাকিয়া মাত্র সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "সে ত রোদ, আর এ ত জল! দুটো তো আর এক নয়! তুমি তো আর আমায় এর আগে কোন দিন বলে দাও নি যে জলের সময় ঘোড়ায় চড়তে পাবো না! যদি বল্‌তে, তাহলে রাগ করতে পারতে।"

আরতি যতই রাগ করুক, বাপের এই কথায় না হাসিয়া সে থাকিতে পারিল না। তথাপি পাছে হাসিয়া ফেলিয়া অপরাধীর অপরাধের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই মুখ নামাইয়া হাসি লুকাইতে চেষ্টা করিয়া এবং যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে "এবার থেকে তোমায় আমি তাহলে একটা রুটিন বেঁধে দিয়ে, সেগুলো লিখে না দিলে দেখছি হবে না।" এই বলিতে বলিতে বাপের পায়ের তলায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া তাঁর জুতার ফিতা খুলিতে মন দিল।

"না, সত্যি বাবা! লক্ষ্মীটি! আর কক্ষনো এমন করো না। কি হ'তো বল দেখি! উঃ এই ঝড়-জলে ঘোড়াটা যদি ভড়্‌কাতো! আর ওই বিদ্যুতের চমকানি আর মেঘের ডাক! তুমি কোন দিন না কোন দিন, কি যে বিপদ ঘটিয়ে বসবে!"

"না রে মা না, কিছু হবে না, তুই যেমন আমায় তোর খোকা মনে করিস্, সত্যি তো আর তোর বাবা তা' নয়।"

"হ্যাঁ, তা নয় বই কি! ঠাকুমা তোমায় এম্‌নি আদর দিয়ে মানুষ করেচে, যে, তুমি এখনও সেই ছোটবেলার মতন যত অগোছালো, ততই অসাবধানী রয়ে গেছ। ঠাকুমাকে যদি আমি একবারের জন্যেও হাতে পেতুম!"—

"তাহলে কি করতিস্, মারতিস্?"

"সে তখন দেখাতুম!"

"কে দোর ঠেলচে না! হয়ত, কোন বিপন্ন লোক—"

"উহুঁঃ, ও বাতাস। ওই বলে তুমি কিন্তু কথা ফেরাতে পাচ্চো না, তা বলে দিলুম। এবার যেদিন—"

"না রে বাতাস নয়, মানুষ। ঐ যে ডাকচে! রোস, দেখি কে হয় ত আশ্রয় চাইচে।—"

"হ্যাঁঃ, বাবার যেমন কথা! এই বৃষ্টিতে বিপন্ন হবার জন্যে কেউ না কি আবার পথে বেরোয়।"

বাস্তবিকই তাই। একটী বিপন্ন পথিক আশ্রয়প্রার্থী হইয়াই আসিয়াছিল। যেমন ভিজিতে হয় লোকটী তেম্‌নই ভিজিয়াছে। পরিধানে ইহারও সাহেবী বেশ। হ্যাটটার হ্যাট্-জন্ম ঘুচিয়া গিয়া পুনশ্চ সোলা-জন্মেই প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। আর সব জিনিষের দুরবস্থা যতই যা হোক, ভবিষ্যতে পুনঃসংস্কৃত হইবার তবু একটা ভরসা আছে,—এর আর সেটা নাই।

আরতি ইহাকে তার বাপের আদেশমত তাঁহারই একটা ধুতী পিরাণ গেঞ্জির সেট পাট ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া দিল। কিন্তু তার বাপের পরা জিনিষগুলি যে একজন যে-সে অন্য লোককে পরিতে দিতে হইতেছে, ইহাতে সে বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তার পর মনে মনে এই স্থির করিয়া তার মনটাকে সে ঈষৎ প্রসন্ন করিতে পারিল যে, না হয় এগুলা আর বাবাকে পরিতে দিবে না। এই সিদ্ধান্তানুযায়ী সে এই জিনিষগুলাকে যথাসাধ্য পুরাতন দেখিয়া বাছিয়া আনিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তার এই অতি-সাবধানতার দরুণ যেটুকু দেরি হইয়া গিয়াছিল, তাহার জন্য তাহাকে এ ঘরে ফিরিয়াই একটু অনুতপ্ত হইতে হইল। লোকটী শীতে কাঁপিতেছিল।

"অরু মা! একজোড়া মোজা, আর একটা ফ্ল্যানেল সার্ট চাই যে। আর একটা মোটা দেখে র‍্যাগ।—"

আরতি বাপের হুকুম যদিও নিঃশব্দে এবং ত্বরিতেই পালন করিল, তথাপি তার মনে হইল, সার্ট ও র‍্যাগ এত্রুটে যাহোক, গরম পশমী মোজা দুটার আর কোন গতি করা চলিবে না। ঐ যার তার পায়ে পরা মোজা তো আর বাপকে পরিতে দেওয়া চলে না।

গরম চা দু পেয়ালা এবং তার সঙ্গে গরম গরম ঘরে-ভাজা কচুরি খানকতক উদরস্থ করিয়া আগন্তুক লোকটী প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে আরতির অনেক ছোট ভাই মঞ্জু এঘরে আসিয়া বাপের কোলটি দখল করিয়া লইয়া তাঁহার চায়ের পেয়ালায় ভাগ বসাইয়াছিল, এবং এই অপরাধের জন্য তার দিদির কাছে তিরস্কৃতও হইয়াছিল।

"মঞ্জু! যতই তোমায় খাওয়াই না কেন, বাবার থেকে ভাগ না বসালে তোমার যেন চলেই না, না? তুমি ভারি দুষ্টু হচ্চো!"

"টুমি ভাড়ি ডুষ্টু হট্টো।" বলিয়া মঞ্জু তার এই দিদিরই হাতের সুখসেব্য নধর দেহখানি বাপের কোলে এলাইয়া দিয়া তাঁহার গলাটা জড়াইয়া ধরিল,—দিদির কাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া একটু চুপিচুপি বলিল,—

"ডিডি বড্ড ডুষ্টু হট্টে, না, বাবা? মনডু ডক্ষী, না বাবা?"—

"হাঁা তা বই কি! মঞ্জু আবার লক্ষ্মী! একটুও না।" বলিয়া আরতি আসিয়া তার অত্যন্ত আদরের ছোট্ট ভাইটীর নরম ফুলের মতন গাল দুটি টিপিয়া দিয়া তাহাকে বাপের কোল হইতে টানিয়া লইল ও নিজের বুকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রগাঢ় স্নেহে চুম্বন করিল।

আগন্তুক এই মেয়েটীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিল। তার সরল ভ্রূদুটী ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বোধ করি বা অতবড় মেয়ের এতখানি বালিকাত্ব তার কাছে কিছু অসঙ্গত ও অনাবশ্যক ঠেকিয়া থাকিবে।

ছোট্ট মঞ্জু কিন্তু দিদির এই আদরে একেবারে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। তার সুন্দর মুখখানি ও উজ্জ্বল চোখ দুটী আনন্দে চকমক করিয়া উঠিল। "ডিডি! আমাড় ডিডি বড্ড ডক্ষী না বাবা?"

অতুলবিহারী ছেলের এই প্রশ্নে তাঁর এই দুইটী প্রাণাধিক স্নেহাধারের প্রতি যুগপৎ স্নেহ-গভীর দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দ-গাঢ় স্বরে উত্তর করিলেন,—

"তোমার দিদি আমার মা লক্ষ্মী, আর তুমি আমার সোনা।"

আগন্তুকের অধরে একটী ফোঁটা সূক্ষ্ম কৌতুক-হাস্য ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু কণ্ঠ হইতে তার একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস স্বতঃই উঠিয়া আসিল। হয়ত এমন নিবিড় প্রগাঢ় পিতৃস্নেহ সে কোন দিনই অনুভব করিতে পারে নাই।

সে রাত্রের সেই অজানা পথিকটী ইদানীং আর এ বাড়ীতে কাহারও কাছে অচেনা নাই। সলিলকুমার গুপ্ত সম্প্রতিমাত্র দেরাদুন হইতে মুসুরি পাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছে। পথঘাট এবং হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রকৃতির সঙ্গে তখনও তার ভালরূপে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সংঘটিত হইতে পারে নাই, এমনই সময়েই হঠাৎ-আসা ওই ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া বেচারী দিক্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। 'মলে' কয়েকটা বাজার করিয়া ক্যামেল্‌স্ ব্যাক রোডে একটু বেড়াইয়া সূর্য্যাস্ত দেখার পর বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঘটিয়া গেল উল্টা। এই মুক্ত স্থানের সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় একটা দেখিবার বস্তু হইলেও, সেদিন সে সৌভাগ্য এই নূতন আগন্তুকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। তাহাকে প্রথমে প্রচণ্ড ঝড়ে ও পরে প্রবল বৃষ্টিতে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হইতে হইল।

তা'হোক, এর শেষ ফলটা বড় মন্দ হয় নাই! কথায় বলে 'সব ভাল যার শেষ ভাল'। সলিলেরও এই সলিলার্দ্র শীতার্ত্ততার যে শেষ পরিণামটী ঘটিয়া গেল, তাহাতে তার আর সোলা হ্যাটের দুঃখ বা জলে ভেজার কষ্ট মনে রহিল না। গরম কাপড়ে মুড়িয়া গরম খাবারে তৃপ্ত করিয়া, উত্তপ্ত সহানুভূতি ও সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহারে প্রীতি দিয়া অতুলবাবু তাহাকে একেবারে একরাত্রেই নিজের ঘরের লোকটী তৈরি করিয়া ফেলিলেন।

রাত্রি অনেক হইয়াছিল। ঝড় জলের সেরাত্রে আর থামিবার মতলব ছিল না। একজন যদিই বা তার অশান্তপনা একটুখানি কমায় তো আর একজন যেন কাউন্সিলের বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধপক্ষের বক্তার মত হাত পা নাড়িয়া চীৎকার ছাড়িয়া উঠে। অগত্যাই সলিলকুমারকে বাধ্য হইয়াই সেরাত্রে অচেনা পরিবারের মধ্যেই আশ্রিত থাকিতে হইল! রাত্রের আহারে অতুলবাবু তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়াই বসিয়া থাকেন। সেদিন এই অজানা পথিককে তাদের সঙ্গে বসিতে হওয়ায় আরতি একটুখানি যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে একটুখানি ইতস্ততঃও করিল; কিন্তু শেষটায় তার মনের মধ্যের দ্বিধা সঙ্কোচটা কাটিয়া গেল সলিলকুমারেরই কুণ্ঠাবিহীন আত্মীয়তায়। সে বোধ করি উহার ঐ চলচ্চিত্ততা লক্ষ্য করিয়া সহজ সরলতায় তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল ও বলিল,—

"আমায় না হয় আলাদা করে খেতে দিন না? এতে হয় ত আপনার পক্ষে একটু অসুবিধা বোধ হচ্চে।"

শুনিয়া অতুলবাবু একান্ত বিস্ময়েরই সুরে কহিয়া উঠিলেন, "অসুবিধে বোধ হচ্চে! কার? আরতির? না না, কে বল্লে? কিছু অসুবিধে হয় নি তো। হয়েছে রে?"

অগত্যাই আরতি তার বাপের কাণ্ডজ্ঞানের প্রতি ঈষৎ অসন্তোষ বোধ করিয়াও তাঁর এবং নিজের দুজনকারই মান রাখিতে মৃদু হাসিয়া—"না অসুবিধে আর কি।" বলিয়া তাঁদের মধ্যেই নিজের আসনকে স্বীকার করিয়া লইল।

সারারাতের মাতামাতির পর পাগল প্রকৃতি ভোরের বেলায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিয়াছিল। প্রবল জলস্রোতে ধুইয়া গিয়া পর্ব্বত-গাত্রের ধূসরতা যেন সুকোমল নীলিমায় ঘন মণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। উন্নতশীর্ষ দেবদারুর দল স্নিগ্ধ শ্যামলতায় যেন ঝলমল করিয়া উঠিতেছিল। বরাশগাছগুলার পাতার ও লালফুলের থোকায় আজিকার এই সদ্য জলধৌত সুপ্রসন্ন প্রকৃতির অভিনন্দন যেন ভালই সাজিয়াছিল!

অতুলবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়া সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়িয়া গেল, তাঁরা গত রাত্রের অতিথিকে। একটুখানি ব্যস্তভাবে প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া নিচে নামিয়া আসিতেছেন, আরতি আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল,—"বাবা!"

"কি রে?" বলিয়া অতুলবাবু মুখ ফিরাইলেন। অবশ্য যাওয়া বন্ধ রাখিয়া,—

"চা-টা খেয়ে গেলেই হতো না?"

অতুলবাবু বলিলেন "সলিল রয়েচে যে, একসঙ্গেই দুজনে খাব। দেখি গে সে উঠেছে কি না।" এই বলিয়া তিনি পুনশ্চ গমনোদ্যত হইলেন।

আরতি বলিল "অত ব্যস্ত হচ্চো কেন? শোনই না বলি! ঐ উনি আছেন বলেই ত তোমায় আলাদা করে চা' খেতে বলচি, না হলে আর বলচি কেন? তুমি তো জানো যে তোমার বাইরের লোকের সামনে ভাল খাওয়া হয় না।"

"কে বল্লে? উহুঁঃ তা কেন হবে না? আর সলিল,

ও এম্‌নিই কি বাইরের লোক! ও থাকলে খাবার ব্যাঘাত কেন হবে? তোর যেমন ভাবনা!"

আরতি বাপের কথায় হাসিয়া ফেলিল। "এর মধ্যে উনি বুঝি তোমার ঘরের লোক হয়ে গ্যাছেন? বাবা তুমি যাকে দেখো তাকেই ঘরের লোক খুব শীগ্‌গির তৈরি করে নিতে পারো কিন্তু! একেই বলে 'বসুধৈব কুটুম্বকং' না?"

অতুলবাবু মেয়ের কথায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া বলিলেন, "উহুঁঃ, তা কেন? তবে কি না ছেলেটীকে আমার ভালই লেগেচে, খাসা ছেলে! তার উপর স্বজাতি!"

আরতি এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া "তোমার আবার কাকেই বা কবে ভাল না লাগে বাবা?" এইটুকু বলিয়া এবার তার বিপন্ন বাপকে সে মুক্তি প্রদান করিল।

সলিলকুমারেরও ইতিমধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। সে তখন যাত্রার জন্য উৎসুক হইয়া তার আতিথ্যকারীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। শুনিয়া অতুলবাবু কহিলেন,—"সে হয় না। সে কি কখন হয় বাপু! আগে চা-টা খাও, ভাল করে আলাপ-টালাপ হোক, তার পর দুজনে তখন বেড়াতে বেড়াতে তোমার বাসায় যাওয়া যাবেখ'ন। তোমার বাসাটা কোথায়?"

সলিল বলিল, "ল্যাণ্ডোর বাজারের খুব কাছেই। ঐ যে খুব বড় একটা পিতলের সাইনবোর্ড আঁটা দোকান আছে, তারই সাম্‌নের ছোট্ট বাড়ীখানায় আপাততঃ এসে উঠেছি।"

অতুলবাবু ইহা শুনিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "সে ত কাছেই। কিন্তু ও-জায়গাটা তো তেমন ভাল নয়! বাসাটী বেশ পছন্দমতন হয়েচে ত?"

সলিল কহিল "আজ্ঞে না, ওটা তো আমার বাসা নয়, ও আমার একটী আত্মীয়ের বাড়ী। তাঁরা এখন দেরাদুনে রয়েছেন, বাড়ীটা খালি পাওয়া গেল, তাই এসে উঠেছিলুম। বাসা একটা দেখে শুনে নিতে হবে।"

এই খবরটায় অতুলবাবুকে হঠাৎ অত্যন্ত খুসী করিয়া তুলিল। তিনি সোৎসাহে ও সাহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন,—

"তাই না কি! তা হলে ত ভালই হয়েচে! আমাদের পাশের এই 'থরন্ ভিলা'য় এলেই তো হয়? খাসা বাড়ী! যেন ছবিখানি! ভিতরটাও ভাল। একদিন আরতির খেয়ালে পড়ে ওকে নিয়ে ওর মধ্যে বেড়াতে গেছলুম যে! তারও তো খুব পছন্দ হয়েছিল। এই তারই মুখে শুন্‌তে পাবে—আরতি! শুনে যা' তো মা!"

"কি বাবা!" বলিয়া আরতি একটু পরেই ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "চা তৈরি হয়েচে, এইখানেই কি আন্‌তে বলব?"

অতুলবাবু কহিলেন "উহুঁঃ, তা কেন? ঐ বারান্দাতেই যাওয়া যাক্ না। ওখান থেকে সূর্য্যোদয়টাও অতি চমৎকার দেখা যায়! আপনি তো এই নতুন এসেচেন, দেখেন নি বোধ হয় এখনও? উত্তরটা সমস্ত খোলা কি না, পাহাড়ের রেঞ্জগুলো যেন ঢেউ তুলে তুলে বয়ে যাচ্চে! খুব দূরে বরফ রেঞ্জের উপর রোদের আভায় মধ্যে মধ্যে যেন শান দেওয়া ইস্পাতের ছুরী কি বিদ্যুতের মতন একটা চোখ-ঝলসানো দীপ্তি স্ফুরিত হয়ে উঠচে! দেখলে মন যেন কোথায় তলিয়ে যায়!"

কি জন্য মেয়েকে ডাকা হইয়াছিল, সে কথা বাপের আর মনে ছিল না, মেয়েরও উহা বাপকে স্মরণ করাইয়া দিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইল না! সে জানিত যে তার বাপ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্ব্বদাই একটা অছিলা লইয়া তাকে ডাকাডাকি করিতে ভালই বাসেন। (ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মাথুর পদাবলী

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাগ করুণ শ্রী

১

প্রাণনাথ, একবার চাহি কহ কথা।
সে সুখ পাশর এবে তবে মথুরাতে১ যাবে
রমণী মরমে দিয়া ব্যথা ॥
এমনি করিবা তুমি সপনে জানিতো২ আমি
তবে কি করিতো নব লেহা।
তাপের ৩ তাপিনী যত তাহা বা ৪ কহিব কত
কুবচনে ভাজে ৫ এই দেহা ॥

কথা। কান্দিয়া রাধা বলে, হারে

ধ্রু। নবীন প্রেমে নটবর।
দুঃখে কৈল জরজর ॥ ২

ধ্রু। শুন শুন ব্রজনাথ।
ভাল মন্দ তোমা হাত ॥

এতেক কহিল ৬ বাণী শুন ওহে যদুমণি
সকল গোচর রাঙ্গা পায়।
এবে নিদারুণ কেনে বধিয়া রমণীগণে
কি সুখে মথুরাপুরে জায় ৭ ॥
বিরলে তুলিয়া ৮ ঘর দেখা শুনা নিরন্তর
শীতল চামরে দিব বা।

৩

কুসুম শয়ন সেজে বিচিত্র পালঙ্ক মাঝে ৯
আরোপিয়া রাখি রাঙ্গা পা ১০ ॥

কথা। হে শ্যামসুন্দর, ভাবিয়াছিলাম বিরল ঘরে কুঞ্জকুটিরে—

ধ্রু॥ কুসুম সেজে বসাইব।

৪

পল্লবে বাতাস দিব ॥

আর ভাবিয়াছিনু পুষ্পশয্যা রচিয়া কুসুমে সাজাইয়া পদ্মদল বিছাইয়া—

ধ্রু। তোমায় রূপসী হইব রূপে।
রাঙ্গা চরণ লব বুকে ॥

কর্পূর তাম্বুল সাজে ১১ শ্রীমুখ মণ্ডল মাঝে ১২
আনন্দে ভাসিব কুতূহলে ১৩।

৫

শ্রম নিবারণ হব এ চুয়া চন্দন দিব
সদা থাকি আনন্দ হিলোলে ১৪ ॥

কথা ॥

ভাবিয়াছিলাম, হে শ্যামসুন্দর—

ধ্রু ॥ সরসি৬ তোমার মুখে।
তাম্বুল জোগাব সুখে ॥৭

হারে বন্ধু—

ধ্রু ॥ এহ সুখ পরিহরি।
ছাড়্যা যাও হে বংশীধারী ॥

এ সুখ সম্পদ ছাড়ি কোথারে যাইবা এড়ি
তোমা বিনা আন গতি নাক্রি ১৫ ॥
চণ্ডীদাস কহে তায় শুন নাথ যদুরায়
আমরা জুড়াব ১৬ কোন ঠাক্রি ॥ ৮ ॥

১। ১—৩, চাহিয়া।
২। ২—৩, একটি অতিরিক্ত ধ্রুবকলি ইহার পরে আছে,—
যত সুখে আছি আমি।
সে সকল জান তুমি ॥
৩। ১,—সাজে।
৪। ২—৩, চামরের।
৫। ১, হবে—দিবে।
৬। রসযুক্ত, সুখী।
৭। ২,—৩ করে নব পাণের খিলি।
দিব চান্দবদনে তুলি ॥

১

রাগ বড়ারি

শুন ধনি রাই কহি তুয়া ঠাক্রি
না কর বিষাদ পানা।

১। তুঁহ মধুপুর। ২। নাহিক জানি। ৩। তাপেতে। ৪। না। ৫। ভাজা। ৬। অনেক কহিলে। ৭। যাও। ৮। তু নিয়া। ৯। সাজে। ১০। জাতি জাতি দিব ছুটি।

১১। দিব। ১২। বাটা ভরি পান নিব। ১৩। দিব তুলি শ্রীমুখ মণ্ডলে। ১৪। চরণ পাখলি কুতূহলে। ১৫। রহ রহ প্রাণের কানাই। ১৬। দাঁড়াব।

তোমার হৃদয় আছিয়ে সদায় ১৭
তাহা সে আছয়ে ১৮ জানা ॥
তুমি রসময়ী তোমারে সে কই ১৯
শুনহ আমার বাণী।
পরবশ হৈয়া যাইতে হইল
পুন সে আসিব ধনি ॥

কথা।—
হাগো রাধে আর কান্দিয় না ॥
ধ্রু। আমি যথায় তথায় থাক্রি।
আছিয়ে তোমারি ঠাক্রি ॥
হাগো রাধে—
চক্ষু মুদি দেখ তুমি।
অন্তরে দুলিব আমি ॥
কান্দিও না রাই কমলিনী।
আরবার আসিব আমি ॥
রথের উপর যখন বৈঠল
রসিক নাগর হরি ২০।
অঙ্গুলি তুলিয়া দেখায় ঠারিয়া ২১
বসিয়া কহেন ঠারি ২২ ॥
হেনেক২ সময় সারথি তুরিত
চালায় সুরস ২৩ রথ।
সব গোপীগণ হইয়া বিমন
সবে আগুলয় ২৪ পথ ॥
দুবাহু পশারি নবীন কিশোরী
পড়ল রথের তলে।
যাহু যাহু দেখি রাধারে বধিয়া
সকল গোপীনি বলে ॥

কথা।
যদি কৃষ্ণ অঙ্গুলি তুলিয়া বলিছেন,
ধ্রু। রথ চালাও হারে রথি।
কান্দিয়া আকুল ব্রজগোপী ॥৩
বলে শ্যাম দেখ দেখি, আমরা
আগলি রহিলাম পথ।
কেমনে চালাবে রথ ॥৪
আমরা, রৈলাম রথের চাকা ধরি।
যারে নিঠুর প্রাণে মারি ॥৫
পড়ল রথের চাকার সমুখে
অবলা অথলা রামা।
বধ করি যাহ এসব গোপীনি
জানিমু তোমার প্রেমা ॥
চণ্ডিদাস দেখি রাধার হুতাশ
বিরহ বেদন চিত।
শ্যাম পাশে যাঞা কর যোড় করি
বুঝাইছে কিছু নীত ২৫। ৯ ॥

১। ২—৩, রাগ গড়া।
২। ১,—হেনক।
৩। ২—৩, পুঁথিতে এই ধ্রুব কলিটি নাই।
৪। ২, ৩— যেখানে চলিবে রথ।
আগরিল সেই পথ ॥
৫। ১,— যাও হে পরাণে মারি।

রাগ বড়ারি

কেহ কোথা রহে কানুর বিরহে
ধুলায় ধুসর তনু।
গোকুল ছাড়িয়া অনাথ করিয়া
কোথায়ে যাইবা কানু ॥
কে আর করিবে দয়া মোহ অতি
কারে সে করিব মান।
আর না শুনব শ্রবণ ভরিয়া ২৬
মধুর বাঁশীর ১ গান ॥ ২৭
ধ্রু। ছাড়্যা যাবে বনের প্রাণ।
কে শুনাবে বাঁশীর গান ॥ ২
ইহাই বলিতে বরজ রমণী
পড়ল কতই ঠামে।
উচ্চস্বর করি কান্দে বর ২৮ নারী
করিয়া নাথের ২৯ নামে ॥

কোন গোপী—
ধ্রু। ধুলায় লুটাঞা পড়ে।
শ্যাম গুণ গাঞা ফিরে ॥৩
কেহ রথ ধরি ৩০ ধরিয়া রোহয় ৩১
কেহ কারে নাহি দেখি।
কেহ কারে ৩২ পানে চাহিয়া বদনে
লোরে না দেখয় ৩৩ আঁখি ॥
ধ্রু। গোপী, রথের চাকা ধরে করে।
শ্যাম দুঃখে নয়ন ঝোরে ॥

১৭। সদয়। ১৮। আছিয়ে। ১৯। তোরে কিছু কই। ২০। যামী। ২১। রাগিয়া। ২২। বসি এক হেন থাক্রি। ২৩। সুন্দর। ২৪। আগুলিল। ২৫। কোন রীত। ২৬। পুরিয়া। ২৭। তান। ২৮। ব্রজ। ২৯। যাহার। ৩০। হাতে। ৩১। রহয়। ৩২। কার। ৩৩। দেখয়ে।

ধরণী উপরে চিত্রের পুতলি

সুতলি বরজ ধনি ৩৪।

নাহিক নিশ্বাস নাহি কোন ভাষ

কপালে দুকর হানি ॥

ধ্রু ॥ প্যারী ধরণী লোটাঞা কান্দে।

গুণের শ্যাম বলিয়া কান্দে ॥ ৪

৫

কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ পসারিয়া ৩৫

পড়ল ঐছন গতি।

কোথা না পড়ল অভরণ তার

তাহা সে জানে রীতি ॥

কেহবা যমুনা কিনারে পড়ল,

যেথানে ৩৬ চলিবে রথ।

যাইয়া সেখানে ৩৭ যত গোপনারী

আগলি রহয়ে ৩৮ পথ ॥

ধ্রু ॥ গোপী দুটি হাত দিয়া মাথে।

বস্যা কান্দে রাজপথে ॥

কেহ কার মুখে বারি ঢালি দেই—

চেতনা নাহিক হয়।

ঊর্দ্ধবাহু করি ধুলায় পড়িয়া

৬

৩৯ দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ১০ ॥

১। ২, ৩,—মোহন মুরলী।

২। ২, ৩,—॥ কথা। প্যারী—কান্দিয়া বলিয়াছে, হায়ে শ্যাম. তোমা বিনে—

"কি করিবে বাঁশীর গান।

কে জুড়াবে তাপিত প্রাণ ॥

ছাড়িয়া যাবি গুণের শ্যাম।

কে শুনাবে বাঁশীর গান ॥"

৩। ২, ৩, পুথিতে পরবর্ত্তী ধ্রুব কলিটি এইখানে আছে এবং এ স্থানের ধ্রুব কলিটি নাই।

৪। ২,—৩, পুথিতে নাই।

৫। ২, ৩,—"পরসিয়া"।

৬। এই চারি ছত্র ২,—৩, পুথিতে নাই কাজেই পদ শেষ ও ভণিতাও নাই।

রাগ শ্রী।

কেহ বলে ভাল মোরা যাব চল

মথুরানগর পানে। ৪০

কিবা কুল ভয় হেন মনে লয়

ধরিয়া রাখিব কাণে ॥ ৪২

কেহ বলে— ১

ধ্রু ॥ চল যাই শ্যামের সাথে।

আমরা যাই মথুরাতে ॥

আর নৈলে—

জাতি কুল পায়ে ঠেলি।

বান্ধ্যা রাখি বনমালি ॥

যাহার লাগিয়া এত পরমাদ

অন্য সে লোকে ৪৪ হাসি।

কেহ গোপনারী বসনেতে ধরি

কাড়িয়া লইব বাঁশী ॥

প্রেম বাড়াইয়া নিদান করিয়া

মথুরা সাজল এবে।

এত কেবা সহে অবলা পরাণে

কেমন তাহারি ভাবে ॥

ধ্রু ॥ আমরা বটি অবলা।

নিদয় হৈলি নিঠুর কালা ॥

কুলশীল পাশ ঘুচাইলে ৪৫ এবে

শুনগ মরম সখি।

বাচিতে সংশয় এবে সে হইল

বড় পরমাদ দেখি ॥

কেহ বলে আর রাখিতে নারিনু ৪৬

এ হেন পরাণ পতি।

২

এখনি কি করোঁ দেহ না রাখিব ৪৭

শুনহ আমার রীতি ॥

কেহ বলে—

ধ্রু ॥ গুণের পিয়া ছাড়্যা যায়।

প্রাণে জীতে হবে দায় ॥

যমুনার জলে এখনি মরিব

৩

কি সুখে পরাণ রাখোঁ

হয় নহে আসি হেদে গো বয়সি ৪৮

তিলেক দাড়াঞা দেখ ॥

ধ্রু ॥ আইস, সভার হাতে ধরাধরি।

পাথারে ডুবিয়া মরি ॥

চণ্ডীদাসে কহে ভাবিতে গণিতে

এখনি মরণ হবে।

৩৪। বরজ রমণী ধনী। ৩৫। পরশিয়া। ৩৬। উঠিল। ৩৭। সেখানে রহল। ৩৮। রহল। ৩৯। চণ্ডীদাস তহি রহে। ৪০। পুনু।

৪২। কানু। ৪৪। হল সে লোকের। ৪৫। ঘুচাইল। ৪৬। নারল। ৪৭। কর এ দেহ রাখহ। ৪৮ দেখগে রহসি।

সবার মরণ   দেখি[4] নব ঘন
তবে সে মথুরা যাবে ॥ ১১ ॥

১। ১ম পুথিতে "যাই" নাই।

২। মূলে চন্দ্রবিন্দু নাই।

৩। ঐ

৪। ১—২ "দেখিব সঘন"। গৃহীত পাঠটি তিন নম্বর পুথির এবং ঢের ভাল। সাধারণতঃ, ২ ও ৩নং পুথির পাঠ এক রকম—এই পুথির মধ্যে ২নং এর পাঠই বিশুদ্ধতর এবং ৩নং ২নং এরই অনুলিপি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আদর্শ ১নং পুথিতো ফেলই, ২নং পুথিও ফেল্। এই চমৎকার পাঠান্তরটি ৩নং হইতেই মিলিল।

১

রাগ ?

এত শুনি ৪৯ বিনোদিনী রাই।
পুন রহে রথ পানে চাঞি ॥ ৫০
অচেতন চেতন না হয়।
শ্যাম পানে নয়ন থাপয় ॥ ৫১
ক্ষণে আঁখি মুদি রহে রাই
পুন রহে রথ ৫২ পানে চাঞি ॥
যেন চান্দ সে মুখ ৫৩ বয়ান।

২

ভেল যেন অধিক মৈলান ॥ ৫৪
হুতাশ হইয়া চন্দ্রমুখী।
সদা শ্যাম রূপখানি লখি ॥ ৫৫
সোনার পুতলি যেন লুটে।

৪

অবনী উপরে যেন উঠে।
বয়ানে নাহিক কিছু ভাষ।

৫

চরণে লোটায়ে চণ্ডিদাস। ১২ ॥

১। তিন পুথির কোন খানাতেই রাগের উল্লেখ নাই। পূর্ব্ব পদ হইতে ছন্দ ভিন্ন,—৭নং পদটির মত। উহার রাগ করুণ শ্রী। এই পদটি বোধ হয় ঐ রাগেই গেয়।

২। "চন্দ্রের মত সেই বদনখানি নিরতিশয় মলিন হইয়া গেল"—এই বোধ হয় অর্থ।

৩। "সদা শ্যাম মুখানি নিরখি",— ২—৩ পুথি।

৪। যেন সোনার পুতলি, একবার উঠিতেছে, আবার অবনীর উপর লোটাইয়া পড়িতেছে।

রাগ পঠ মঞ্জরী

হেদেবে রমণ   রমণী মোহন
বধিয়া যাইবা তুমি।
তবে সে অঙ্গের   বসন ছাড়িয়া ৫৬
পড়িয়া রহিল আমি ॥
কোন গোপী বলে   শুনহ নাগর ৫৭
দেখহ বদন চাঞি।

১

অবনী পড়িয়া   বহিছে গড়িয়া ৫৮
তোমার কিশোরী রাই ॥

ধ্রু। চাঞা দেখ তোর সাধের প্যারী।

২

ধূলায় যাএ গড়াগড়ি ॥
চাহ রাই পানে   কমল নয়নে

৩

বয়ান তোষহ বোল।

৪

একবার চাহ   অঙ্গে কর দেহ ৫৯

৫

তিলেকে হইবে ৬০ ভোর ॥

ধ্রু। হারে বন্ধুরা—
একবার চাঞা কহ মিঠা কথা।

৬

জুড়াও হে অন্তরের ব্যথা ॥

কথা।—

৭   ৭

দেখ তোমার দুঃখে রাজ পথে তোমার প্যারী অমনি তোমার
ধ্রু ॥ কমল মুখ পানে চায়।
দেখ, দুঃখানলে পোড়া যায় ॥
দেখ তোমার পানে চায়।

৮

নয়ন জলে ভাস্যা যায় ॥
রমণী মোহন   লোরে ঢুনয়ন ৬১
গলায় প্রেমের ধারা।
কটাক্ষ ইঙ্গিতে   চাহি সেই ভিতে
পড়িয়া রহল সারা ॥

৯

ধ্রু ॥ তবে শ্যাম চাঞা দেখি।
ঝর ঝর ঝরে আঁখি ॥
পড়্যা কান্দে ব্রজের চন্দ্রমুখী ॥

৪৯। বলি। ৫০। ক্ষেণে ক্ষেণ ধরণী লোটাই। ৫১। থাপায়। ৫২। রাই। পথ। ৫৩। মুখের। ৫৪। মেলান। ৫৫। দেখি। ৫৬। ছাড়িব অঙ্গের বসন। ৫৭। রহিব। ৫৮। গড়ায়ে। রহিছে পড়িয়া। ৫৯। কর মেনে লহ। ৬০। হইল। ৬১। ছলে সে নয়ন।

এক গোপীগণ দেখিল তখন
চেতন করায় রাধা।
না হয় চেতন হঞা আগেয়ান
সে তনু হঞাছে আধা ॥
ধ্রু॥ এক গোপী বলে উঠ প্যারী।
একবার, দেখ্যা লও হে বংশীধারী ॥
প্রাণ হৈছে অগেয়ান।
কান্দ্যা বলে কোথায় শ্যাম ॥
চণ্ডীদাসে দেখি বড়ই বেখিত
রাধার দশমী দশা।
বল দেখি মনে শুনব সঘনে ৬২
জীবনে নাহিক আশা ॥ ৬৩
ধ্রু ॥ প্যারী ছাড়িয়া গোবিন্দের আশা
১০
হৈয়াছে দশমী দশা ॥ ১০ ॥
১১
ইতি ভবন মাথুর ॥

১। তিন পুথিতেই—"রহিছে"।

২। ১নং পুথিঃ—চাঞা দেখ তোদের প্যারী।
এই ব্রজে ধুলায় দোসর গড়াগড়ি ॥

৩। বয়ানের বোলে তোষহ।

৪। ১নং পুথিঃ :—"অঙ্গ করে দাহ"। ২,৩—"অঙ্গ করে দাহ।" উদ্ধৃত পাঠেই ভাল অর্থ হয়।

৫। ১,—"তিলেক"।

৬। ১,—"যুড়া হে তাপিত গা"।

৭। ১নং পুথিতে "তোদের"। ২—৩এ ভাষা কিছু ভিন্ন, কিন্তু এই স্থানে "তোমার"ই আছে।

৮। এই দুই ছত্র ১নং পুথিতে নাই।

৯। তিন পুথিতেই "দেখে"।

১০। এই ধ্রুব কলিটি ১নং পুথিতে নাই।

১১। সমাপ্তিসূচক নামটি ১নং পুথিতে নাই। "উজ্জ্বল নীলমণি" প্রভৃতিতে মাথুর বিরহের (১) ভাবী (২) ভবন্ ও (৩) ভূত এই তিনটি ভেদ বলা হইয়াছে। এইখানে বর্ত্তমান সময়েই বিরহ ঘটিতেছে বলিয়া এই পদগুলি ভবন (ন্) বিরহ বলিয়া কথিত হইয়াছে।" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় কৃত ব্যাখ্যা। "বল দেখি মনে"—ইত্যাদি চরণের অর্থও স্পষ্ট নহে।

নীলরতন বাবুর সংস্করণে ইহার পরেও আরও ১৪টি পদে মাথুর পালা সমাপ্ত হইয়াছে।

আমার প্রাপ্ত শালদহের পুথি দুখানা ১২১৩ সনের বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরের। রামসিদ্ধির পুথিখানা ভাল কাগজে খুব সুন্দর করিয়া লেখা, শালদহের পুথি অপেক্ষা প্রাচীনতর বোধ হয় উহার বয়স ১৫০ বৎসর ধরিলে অসঙ্গত হইবে না। নীলরতন বাবু যে পুথি হইতে এই পদাবলি গুলির উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে সম্ভবতঃ তারিখ নাই। অনুমানিক বয়সও তিনি উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু আমার প্রাপ্ত পুথিগুলি দিয়াই বলা যায় যে শওয়াশত দেড়শত বৎসর আগে এই পদগুলি কীর্ত্তনীয়া মহলে বিশেষ পরিচিত ছিল, বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত, বীরভূম হইতে ফরিদপুর পর্য্যন্ত, অজয়তীর হইতে মেঘনাদতীর পর্য্যন্ত অহরহ গীত হইত।

এই সর্ব্বদা-গীত পদগুলিতেও দেশান্তর ভেদে কীর্ত্তনীয়া ভেদে পাঠান্তর দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেগুলি পদের মূল রূপটিকে বদলায় নাই; অথবা এমন করিয়া বদলায় নাই যে চেনা যায় না। পদগুলিতে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতা আছে, শুধু চণ্ডীদাস ভনিতা আছে এবং দীন চণ্ডীদাস ভনিতাও আছে। এই পদগুলির রচয়িতা যে একই সেই বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই।

বস্তুতঃ, ভনিতায়, বিশেষতঃ কীর্ত্তনীয়ার উপজীব্য এবং কীর্ত্তনীয়াগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা ব্যবহৃত পদাবলির ভনিতায় কবির নামের আগে দ্বিজ, বা দীন বা অন্য কিছু বসান কীর্ত্তনীয়ারই কীর্ত্তি বলিয়া আমার মনে হয়। ইহা দেখিয়া পদের আসল নকল ঠিক করিতে চেষ্টা করা আমার বিবেচনায় বিফল প্রয়াস। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন বসু সম্প্রতি তাঁহার দুইটি প্রবন্ধে এই চেষ্টা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে দীন চণ্ডীদাস দ্বিজ চণ্ডীদাসে পরিণত হইয়াছেন এবং তিনি বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতায় খাটি চণ্ডীদাস হইতে ভিন্ন। নানা কাব্য হইতে কবিগণের ভনিতা দিবার রীতি লক্ষ্য করিয়া তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে প্রত্যেক কবিরই ভনিতা দিবার একটা বিশিষ্ট রীতি ছিল। খাটি চণ্ডীদাসও বাসুলীর দোহাই দিতেন এবং বড়ু বলিয়া ভনিতা দিতেন। বাস্তবিক আদিতে হয়ত তাহাই ছিল; কিন্তু কীর্ত্তনীয়াগণের প্রসাদে চণ্ডীদাসের এই বিশেষত্ব সম্ভবতঃ শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—বিশেষতঃ অপ্রচলিত বড়ু শব্দটা সমানার্থক পরিচিত "দ্বিজ" শব্দে পরিণত হইতে বেশী সময় লাগে নাই।

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত পদগুলি খাটি চণ্ডীদাসের নহে বলিয়া স্বীকার করিলে চণ্ডীদাসের কতখানি যায় মনীন্দ্র বাবু ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? 'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'—নামক আরম্ভের পদটিই এবং এইরূপ খাটি চণ্ডীদাসত্বে মণ্ডিত অনেক পদই বাদ যায়।

সম্প্রতি চণ্ডীদাসের পদাবলির একখানি পুথি পাইয়াছি, (নং R—॥8—85) পত্র সংখ্যা ৫—১৫, ২৩—২৮ এবং পদসংখ্যা ১২—৭১, ১১২—১২৭। উহার ৬৭ নং পদ—"—পীরিতি আনল ছুইলে মরণ শুনলো কুলের বধূ।" ভনিতায় আছে—"পরশ পাথরে ঠেকিয়া রহিলা বড়ু দ্বিজ চণ্ডীদাস।" এই পদটি নীলরতন বাবুর সংস্করণের ৩৫১ নং পদ (১৫৫ পৃঃ)। তথায় "কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে" এরূপ ভনিতা আছে। দেখা গেল আমার প্রাপ্ত পুথিতে লেখক বড়ু ও দ্বিজ একত্র ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই। মনীন্দ্র বাবুর মতে দীন দ্বিজ হইয়াছে

৬২। মেনে হেন নবঘনে। ৬৩। বিষম দেখিয়ে দিশা।

আমার কিন্তু বোধ হয় চৈতন্যপর যুগের গায়কগণ তৎকালীন রীত্যনুসারে অপরিহার্য্য বৈষ্ণবোচিত বিনয় বশতঃ "দ্বিজ"কে "দীন" রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, চণ্ডীদাসের সহিত আমাদের পরিচয়ের আরম্ভ চণ্ডীদাসের সার সংগ্রহগুলি দিয়া হইয়াছে। অর্থাৎ পদকল্পতরু ইত্যাদি সংগ্রহ গ্রন্থে চণ্ডীদাসের যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদগুলি গৃহীত হইয়াছে, তাহাই পৃথক করিয়া ছাপিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলির যে সংস্করণ হয় সেই ঘনীভূত শর্করাপিণ্ড আমাদের জিহ্বার স্বাদ গ্রহণ ক্ষমতা এমন বিকৃত করিয়া দিয়াছে যে, এখন গুড় বা চিনি জিহ্বায় ঠেকিলেই আমাদের সন্দেহ জাগে—এইগুলি একই কারখানার তৈয়ারী নহে। এ যেন চয়নিকা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লাভ করিয়া সন্ধ্যা সঙ্গীত বা প্রভাত সঙ্গীত এমন কি গীতাঞ্জলি নৈবেদ্যকেও জাল বলিয়া সাব্যস্ত করা! অজস্র কাব্যরস সম্ভারে পরিপূর্ণ একজন কবি জীবনে অজস্র কাব্য ও কবিতাই রচনা করিয়া যান, ভাবের প্রগাঢ়তায় এবং কাব্যের উৎকর্ষে তাহাদের মধ্যে যেগুলি অনন্ত বিরহ অনন্ত মিলন অনন্ত বেদনা ধ্বনিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়, সেগুলিই সংগ্রহকারগণ সাদরে নিজেদের সংগ্রহে স্থান দিয়া থাকেন। এইগুলি পড়িয়া একটা অন্যায্য রকম উচ্চ ধারণা কবি সম্বন্ধে গড়িয়া তুলিয়া সেই ধারণাকে মাপকাটি করিলে আমাদের পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা।

আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে চাহি, চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই, কেহ এই পর্য্যন্ত এমন প্রমাণ দিতে পারেন নাই। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কবিত্বের অপকর্ষ উৎকর্ষ বিচার করিয়া ভনিতার প্রকার ভেদ লক্ষ্য করিয়া যে সকল প্রমাণ খাড়া করা হইয়াছে, তাহাদের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আর নরোত্তমের চণ্ডীদাস নামে একজন শিষ্য ছিলেন এবং তিনি মণ্ডিত সর্ব্বগুণে এবং পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ কাজেই তিনি কবি এবং আমাদের Suspected আসামী দ্বিতীয় চণ্ডীদাস, ইত্যাকার সন্দেহ এবং প্রমাণ 'গরজোত্থিত' মাত্র—প্রকৃত ভিত্তি কিছুই নাই।

বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন আবিষ্কৃত করিয়া একটা বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণও এমন সব কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন যে আত্মারাম সরকারের ভেল্কির কথা মনে পড়িয়া যায়। একজন মনীষী উহাতে কবিত্বের লেশমাত্রও দেখিতে পান নাই, উহা ঝুমুর মাত্র। কিন্তু সতীশবাবু উহাতে মহাকবির পরিচয় পাইয়াছেন। আমাদেরও শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন পড়িবার সময় বার বার মনে হইয়াছে যে, বিদ্যাপতি জয়দেব যদি কবি হইয়া থাকেন, উচ্ছিষ্ট রস সৃষ্টিই যদি কবির লক্ষণ হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের চণ্ডীদাস একজন প্রবল শক্তিশালী কবি। উহাতে আধ্যাত্মিকতার আভাস খুব কমই আছে, বিরহ-ব্যথায় চিরনবীন অনন্ত সঙ্গীত শেষ দিক দিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল মাত্র। কিন্তু উহার মূল সুরটি গাঢ় আদিরসের তাজা রক্তমাংসের আশা আকাঙ্ক্ষার অতি সতেজ সরল সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। বিদ্যাপতিতেও ইহা আছে, জয়দেবেও ইহা আছে—আর আছে চৈতন্যদেব বিরচিত গোপাল চরিত্র নামক অপূর্ব্ব কাব্যে।* যাঁহারা আদিরসের এই আশ্চর্য্য স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখিয়া লজ্জিত হইতে চাহেন, তাঁহারা হইতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশেই কামশাস্ত্রও অবশ্য-পঠনীয় বিষয়ের অন্তর্গত ছিল† এবং মানবজীবনের সর্ব্বদেশে সর্ব্ব কালে অনুভূত এই সর্ব্বব্যাপী প্রচণ্ড প্রবল রসের কাব্যাভিব্যক্তি বালক-পাঠ্য না হইতে পারে, প্রাপ্ত-বয়স্কের ইহাতে ভয়াবহ কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের ভাষার অক্ষুণ্ণ প্রাচীনত্বে আবার সতীশবাবুর মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরও এক বিভ্রম জন্মাইয়াছে। তিনি মত দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন খাটি চণ্ডীদাসের হইলে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পদাবলিগুলি চণ্ডীদাসের হইতে পারে না, সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালের শ্রেষ্ঠ পদাবলিকারগণ এই পদগুলি রচনা করিয়া (চণ্ডীদাসের উপর কৃপা পরবশ হইয়া?) চণ্ডীদাসের (গৌরব রক্ষার্থ?) নামে চালাইয়া গিয়াছেন। সতীশবাবু এ ক্ষেত্রে ধরিয়া লইতেছেন, চণ্ডীদাসের মত prolific কবি একখানি মাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তন লিখিয়াই কবিজীবন সমাপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মুস্কিল এই যে, কৃষ্ণ কীর্ত্তনের পরবর্ত্তী ধারা পাওয়া গিয়াছে কেবলমাত্র একটি পদে, এবং প্রচলিত পদাবলির পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ মোটেই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অনুসন্ধানের কি এখনই শেষ হইয়া গিয়াছে? দলবদ্ধ সদুদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধানের তো আরম্ভও হয় নাই! আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুথি সংগ্রহে হাত দিয়া চণ্ডীদাসের ১১।২০ খানা ক্ষুদ্র বৃহৎ পুথি পাইয়াছি। মনীন্দ্রবাবুর "দীন চণ্ডীদাস" প্রবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এই রকম চণ্ডীদাসের অনেক পুথি জমিবার কথা জানা গেল। ভবিষ্যতে আরও কত হয় ত পাওয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের পদের অপ্রচলনের কারণ অনেকের নিকটই রহস্যময় বোধ হইয়াছে। ব্যাপারটা বুঝা কিছু শক্তই বটে। তবে আমার মনে হয়—চৈতন্য-পর যুগে বৈষ্ণবসমাজের বিশুদ্ধি রক্ষা প্রয়াসে খাটি এবং প্রতিপত্তিশালী বৈষ্ণবসমাজে আদিরসের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল—এই puritan ভাবের উৎপত্তিই আদিরসাত্মক পদের অপ্রচলনের কারণ। কীর্ত্তনীয়াগণের হাতে বাদ পড়িলে দেখিতে দেখিতে সে পদ অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের তাজা আদিরস এইরূপেই অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। অথচ চণ্ডীদাসের অশ্রুসিক্ত পদগুলি, তাজা আদিরস বর্জ্জিত পদগুলি কীর্ত্তনীয়াগণ সর্ব্বদা গাহিত বলিয়া চলিত রহিয়া গিয়াছে এবং পদকল্পতরু ইত্যাদি সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

---

* এই পুথি মোহিনীমোহন লাহিড়ী বিদ্যালঙ্কার নামক জনৈক লোক নিজের রচিত বলিয়া চালাইয়া দিয়া শ্রীরাধা প্রেমামৃত নাম দিয়া বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে ইহার এক অশুদ্ধ সংস্করণ ছাপাইয়া দিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য চুরীর এমন অদ্ভুত দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা গিয়াছে। নিত্যানন্দ বংশধর শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী ও আমি এই গ্রন্থের প্রায় ১৫ খানা পুথি মিলাইয়া এক সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছি, শীঘ্রই ছাপা হইবে।

† অধুনা ইংরাজী চিকিৎসা-বিষয়ক সাহিত্যেও কামশাস্ত্রকে অবশ্য-পঠনীয় বিষয় করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।—ভাঃ সম্পাদক।

চণ্ডীদাসের আদি রচনার ভাষায় যুগে যুগে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। কিন্তু ভাষার পরিবর্ত্তন দেখিয়া চণ্ডীদাসত্বে এত সন্দিহান হইলে চলিবে কেন? যে পদটি চণ্ডীদাসের পদের ভাষার আদি রূপ এবং আধুনিক রূপের মধ্যে সেতু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার অনুধাবন করিলেই পরিবর্ত্তনের স্বরূপ বুঝা যাইবে :—(কৃষ্ণকীর্ত্তন—৩৩৪ পৃষ্ঠা এবং নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস—১০১ পৃঃ)।

দেখিলোঁ প্রথম নিশি সপন সুন তোঁ বসি
সব কথা কহি আরোঁ তোহ্মারে হে।
প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে॥

—

বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥

—

লেপিআঁ তনু চন্দনে বলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাত্র মধুরে।
অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী সুমধুরে॥

—

চাহিল মোরে সুরতী না দিলেঁ সো আনুমতী
দেখিলোঁ সে দুঅজ পহরে।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে॥

তিসজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞি'র কোলে বসি
নেহানিলোঁ তাহার বদনে।
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।

—

ঈসত বদন করি মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে।
ঈষৎ হাসন সরি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে।

—

চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর তৈল রতিরস আশে।
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।

দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আমার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিঁদে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

—

এই পরিবর্ত্তন এতই স্বাভাবিক যে এই একটি মাত্র পদেরই প্রাচীন ও আধুনিক রূপ প্রাপ্তিতে আধুনিক পদগুলি সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহের নিরসন হওয়া উচিত ছিল। বুঝা উচিত ছিল যে, অপূর্ব্ব কবিত্ব মণ্ডিত চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত যে সমস্ত পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা চণ্ডীদাসেরই রচনা। এই পদটির রূপ আধুনিকীকৃত হওয়াতে যেমন তাহার কাটানটির বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অন্য পদগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ এক চণ্ডীদাস কবিত্ব খ্যাতি উপার্জ্জন করিয়া বঙ্গবাসীগণকে কবিত্ব-সুধায় মত্ত করিয়া পরলোকে গমন করিলে পর, আর একজন চণ্ডীদাস (যথা তথাকথিত দীন চণ্ডীদাস) আবির্ভূত হইয়া অসংখ্য পদাবলি রচনা করিয়া প্রায় সমান খ্যাতি অর্জ্জন করিল, কীর্ত্তনীয়াগণ ফরিদপুর হইতে বীরভূম পর্য্যন্ত সারা বঙ্গদেশ তাহার পদাবলি গাহিয়া বেড়াইল, আর বৈষ্ণব সমাজে তাহার পরিচায়ক কোন স্মৃতিই বজায় রহিল না, এই কথা যেমন অসম্ভব তেমনি অবিশ্বাস্য। নরোত্তম শিষ্য চণ্ডীদাসকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লইলেও বলিতে হয় যে চণ্ডীদাস নামের দুর্ভিক্ষ যে বঙ্গদেশে কখনও হইয়াছিল এমন কথা তো কেহ কখনও বলে না। চণ্ডীদাস নাম হইলেই সে কবি হইবে? নরোত্তম শিষ্য চণ্ডীদাস যদি কবিই হইবেন, তবে নরোত্তম বিলাসের লেখক এই চণ্ডীদাসের পাষণ্ডীখণ্ডনে দক্ষতা, সর্ব্বগুণশালিতা, দীনে দয়া ইত্যাদির পরিচয় দিলেন, আর তিনি যে সর্ব্ববঙ্গ-গীত সঙ্গীত-কবি ছিলেন এমন কথাটাই তিনি ভুলিয়া গেলেন?

তবে প্রাচীন হইতে আধুনিকে পরিবর্ত্তনে সময়ে সময়ে যে অর্থ ও ধ্বনি বেশ বদলাইয়াছে, তাহারও আভাস যেন পাইতেছি। উদাহরণ স্বরূপ মহাপ্রভুর আস্বাদিত সেই বিখ্যাত পদটিই ধরুন—

হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু প্রেমবিষে মোর তনুমন জারে॥
রাত্রিদিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাও।
যাহা গেলে কানু পাও তাহা উড়ি যাও॥

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই পদটি নাকি "এক টুকরা জীর্ণ কাগজে" আরও ছয়টি ছত্র সমন্বিত সম্পূর্ণ আকারে পাইয়াছেন (ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩১, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব এত অধিক যে ঐ জীর্ণ কাগজখানার ফটোগ্রাফ সহকারে এই আবিষ্কারটি ঘোষিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, অনুরূপ ধ্বনি ও অর্থের একটি পদ পদাবলি সাহিত্যে বিখ্যাত এবং চণ্ডীদাসের পদের সমস্ত সংগ্রহেই স্থান পাইয়াছে। যথা :—

ধূর্জটী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শুয়াম মালাইয়া

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS.

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পীরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥ ইত্যাদি—

পদকল্পতরু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত সতীশবাবুর সম্পাদিত সংস্করণ ২য় খণ্ড ১৬৮ পৃঃ।

নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস—১৫৬ পৃঃ।

রমণীমল্লিক—ঐ ২য় সংস্করণ—১৬৮ পৃঃ।

সম্ভবতঃ ২য়টি ১মটির পরিবর্ত্তিত রূপ নহে; কিন্তু ধ্বনি ও অর্থে সামঞ্জস্য দেখিয়া সন্দেহ যে একেবারে না হয় এমন নহে। যদি ২য়টি ১মটির পরিবর্ত্তিত রূপই হইয়া থাকে, তবে সময় সময় পরিবর্ত্তন অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল বলিতে হইবে।

চণ্ডীদাসের নামে কি কিছুমাত্র ভেজাল চলে নাই? সম্ভবতঃ কিছু কিছু চলিয়াছে, কিন্তু সে সমস্ত পদই উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রয়োজনের অনুরোধে যেমন রূপ সনাতন ইত্যাদি মহামহোপাধ্যায়গণের নামেও জাল গ্রন্থ চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, চণ্ডীদাসের নামেও সে-রকম হওয়া সম্ভব। চণ্ডীদাসের কবিত্ব-খ্যাতি বজায় রাখিবার জন্য বড় বড় কবিগণ তাঁহার নামে পদ রচনা করিয়া চালাইয়াছেন—অথবা ক্ষুদ্রতর কবিগণ স্বরচিত কবিতা সুপ্রচলিত করিবার জন্য তাহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতা জুড়িয়া দিয়াছেন এই উভয় অনুমানই অশ্রদ্ধেয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চণ্ডীদাসের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক পুথি জমিয়াছে। অদ্যাবধি প্রকাশিত চণ্ডীদাসের সমস্ত পদাবলি অবলম্বন করিয়া এবং এই পুথিগুলির সাহায্যে অধুনা চণ্ডীদাসের একটি সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত করা সম্ভব। এই তিন প্রতিষ্ঠানের মনীষিগণের সমবেত চেষ্টায় যদি এই বৃহৎ জাতীয় ব্যাপারটি কল্পিত ও সুসম্পাদিত হইয়া উঠে তবে বাঙ্গালীজাতির মুখোজ্জ্বল হইবে। *

ভারতীয় চিত্রশিল্প

শ্রীসত্যভূষণ সেন

আজকাল ভারতীয় শিল্প তথা ভারতীয় চিত্রশিল্প লইয়া যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা সকলেরই লক্ষ্যের বিষয়। আমাদের দেশে ধর্ম্মে-কর্ম্মে সমাজে সাহিত্যে যে একটা নূতন ভাব, একটা নবজীবনের সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বর্ত্তমান কালে দেশের এই পুনরভ্যুত্থান ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। যাহাদের কৃতিত্বে ভারতীয় শিল্পের এই পুনরভ্যুত্থান সংঘটিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়।

শুধু ভারতবর্ষে নয়—ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুত্থানের বিষয় পাশ্চাত্য দেশেও আলোচিত হইতেছে। ইয়োরোপের নানা শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতীয় চিত্রশিল্প প্রদর্শিত হইতেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশের শিল্পীগণ ভারতীয় চিত্রশিল্প পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সে সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। রুষদেশে পর্য্যন্ত ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। ইয়োরোপের অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ভারতীয় চিত্রশিল্পের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

পণ্ডিত লোক বা বিশেষজ্ঞদের নিকট শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইলেও, ইয়োরোপের জনসাধারণ ভারতীয় চিত্রশিল্পকে কিরূপ ভাবে দেখেন, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে আশা আছে যে, ঠিক বর্ত্তমানে না হইলেও, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের আদর্শ ও চিন্তার প্রভাবে একদিন ইয়োরোপের সর্ব্বসাধারণের নিকটও ভারতীয় চিত্রশিল্পের আদর সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিবে।

যেমন ইয়োরোপে তেমনই আমাদের দেশেও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এবং সর্ব্বসাধারণ জনগণ এই দুই পক্ষই আছে। যাহারা চিত্রশিল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা বিশেষভাবে অভিজ্ঞ তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের মত অনভিজ্ঞদেরও একটা দিক আছে, তাহাদেরও একটা মতামত আছে। কারণ, দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় হইলেও, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, দেশের পোনের আনা লোকই চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আমাদের মতই অনভিজ্ঞ। অপর পক্ষে, আমরা অনভিজ্ঞ হইলেও, দেশে যে সব চিত্রশিল্প রচিত হয়, তাহা যে আমাদের জন্য মোটেই নয়, এমন কথাও বলা চলে না। দেশের সাহিত্যসেবীগণ যে সব সাহিত্যসৃষ্টি করেন, তাহা শুধু জনকয়েক সাহিত্যিককে উদ্দেশ করিয়া রচিত হয় না, সর্ব্বসাধারণের জন্যই তাহা নিবেদিত হইয়া থাকে। বরং জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্য-রসবোধ জাগ্রত করা সাহিত্য-রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। তেমনই শিল্পরচনাও শুধু জনকয়েক বিশেষজ্ঞের জন্য সৃষ্ট না হইয়া সর্ব্বসাধারণের জন্যও নিবেদিত হইয়া থাকে; এবং সাহিত্যের ন্যায় শিল্পরচনারও অন্যতম উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে শিল্প-রসবোধ জাগ্রত করা।

সাহিত্য বা শিল্পরচনা সর্ব্বসাধারণের জন্য নিবেদিত হইলেও, সকলের রসবোধ সমান নয়। রসজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞগণ সাহিত্য বা শিল্পরচনা যে দৃষ্টিতে দেখেন, জনসাধারণ সে দৃষ্টি কোথায় পাইবেন? আমাদের দেশের শিল্পরসজ্ঞ প্রধান ব্যক্তিগণ ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুত্থানকল্পে যে বিশিষ্ট আদর্শ-প্রণালী অনুসরণ করিয়া যে ভাবের সন্ধানে ধাবিত হইতেছেন, আমরা তাহার নাগাল পাইতেছি না। অনেক স্থলে তাঁহাদের আদর্শ-প্রণালী আমাদের নিকট একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মূর্ত্তি শাস্ত্রসঙ্গতরূপে গড়িতে হইলে মূর্ত্তির আকার কতটা এবং মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহই বা কোন্ অনুপাতে গড়িতে হয়। শাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়াই তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, মূর্ত্তি বা চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, কণ্ঠ, অংস, হস্ত, পদ এবং অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আদর্শ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন করিয়া গড়িতে হইলে কোন্ আদর্শ অনুসরণ

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চণ্ডীদাসের পদাবলির সুবৃহৎ-সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন এবং এই পদাবলি সম্পাদন-কার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে।—ভারতবর্ষ সম্পাদক

করিতে হইবে—ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থের সহিত উহাদের সাদৃশ্য দেখাইয়া এক একটা আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই সকল উপমা আমাদের দেশের কাব্যে সাহিত্যে চরম আদর্শ (Classic) স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে. যেমন কালিদাসের মেঘদূতে আছে—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ
শ্রোণীভারালসগমনা স্তোক নম্রাস্তনাভ্যাম্
যা তত্র স্যাৎ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

আমাদের সাধারণ কথাবার্ত্তায় কমলনয়ন, পদ্মপলাশলোচন, কুরঙ্গনয়ন, পদ্মহস্ত, করকমল, শ্রীচরণকমলেষু ইত্যাদি বাক্যসমূহেও সেই-সব উপমারই অসংখ্য প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই সব উপমায় শুধু যে আকৃতিগত সাদৃশ্য এমন নয়, অনেক স্থলে প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও অতি আশ্চর্য্যরূপে পরিস্ফুট রহিয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলে হয়ত কথাটা আর একটু সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে চক্ষু বিশেষভাবে সৌন্দর্য্যের আধার; আবার আমাদের মনের বিচিত্র ভাব প্রকাশের ক্ষমতায়ও চক্ষুর সহিত কাহারও তুলনাই হয় না। সেইজন্য চক্ষুর উপমাবৈচিত্র্যও অসংখ্য: যেমন স্থির ধীর শান্তভাব প্রকাশক কমল-নয়ন, পদ্মপলাশ-লোচন, কমল-লোচন, পদ্মআঁখি; চঞ্চল-ভাব প্রকাশে—চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা, কুরঙ্গনয়ন মাত্র নয়—খঞ্জন এবং সফরীর সহিত পর্য্যন্ত চক্ষুর তুলনা দেওয়া হইয়াছে। কণ্ঠের আদর্শ কম্বুকণ্ঠম্। কণ্ঠে তিনটি ভাঁজ পড়িলে ঠিক শঙ্খের গোড়ার দিকের তিনটি ভাঁজের মত দেখিতে হয়; আবার ধ্বনির আশ্রয়স্থল বলিয়া উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও অতি চমৎকার। উরুর উপমা—কদলীকাণ্ডম্; এখানেও শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্য নয়, উভয়ের ভারবহনোপযোগিতাও দ্রষ্টব্য। স্কন্ধদেশ হইতে বাহু পর্য্যন্ত উপমা হস্তীশুণ্ডম; কটিদেশের উপমা সিংহকটি; ময়ূর-মুখের আকৃতি কুক্কুটাণ্ডবৎ ইত্যাদি। অবনীন্দ্রনাথ এই সব শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজে অতিসুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া সৌন্দর্য্যের আদর্শ এবং উপমাগুলি এমন পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাহা অতি চমৎকার হইয়াছে। এই সব আদর্শ এবং উপমার মধ্যে কোনপ্রকার হেঁয়ালি বা অস্পষ্টতা তো নাই-ই; বরং চিত্রসহযোগে ব্যাখ্যার গুণে বিষয়টা এতই স্পষ্ট হইয়াছে যে, একবার দেখিলে আর ভুলিবার কথা নয়। পক্ষান্তরে, এই সকল আদর্শ এবং উপমাগুলি দেখিলে যে কোন ব্যক্তি বা যে কোন জাতি শাস্ত্রকারগণের শিল্পরসবোধ এবং তাহাদের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া পারিবেন না।

অবনীন্দ্রনাথ এই সকল ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এগুলি হইল শিল্পকলার আদর্শ; কিন্তু আদর্শ বলিয়াই যে আদর্শের দাসত্ব করিতে হইবে, এমন কথা নয়। সত্যকার শিল্পে নিয়মের বন্ধন দস্তুরের সঙ্কীর্ণতা না থাকাই শ্রেয়। কিন্তু এই যে নিয়মের বন্ধন হইতে মুক্তি, এই মুক্তির সীমাটা কোথায় তাহা আমরা ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। আজকাল যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, তাহার মধ্যে এক শ্রেণীর চিত্র দেখিয়া মনে হয় যে, শিল্পী যেন এই মুক্তির সীমা হইতেও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। চিত্রিত ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন কোনটা হয় ত ঠিক শাস্ত্রসঙ্গতই হইল; কিন্তু কোনটা আবার এমনভাবে চিত্রিত যে, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত তো নয়ই, লোকসঙ্গত বা প্রকৃতিসঙ্গতও হয় না; আমাদের নিকট তো অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। শিল্পীরা বলেন যে, এসব অসঙ্গতি-দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। চিত্রে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই লক্ষ্যের বিষয়—চিত্রখানার উদ্দেশ্যই তাহাই। আমরা কিন্তু এই সব চিত্রের মধ্যে এমন কোন ভাবের সন্ধান পাই না, যাহা সকল প্রকার দেহাবয়বের অসঙ্গতি-দোষকে অতিক্রম করিয়া চিত্রে ফুটিয়া রহিয়াছে। হয় ত কোন ভাবের উদ্দেশ পাই না বলিয়াই ঐ-সব অসঙ্গতি-দোষ আমাদের চক্ষে অত বড় হইয়া দেখা দেয়।

দুই একজন মধ্যম শ্রেণীর চিত্রশিল্পীর এরূপ মতামত হইলে স্বতন্ত্র কথা ছিল। কিন্তু দেখিতেছি যে, স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথও এই মতের পরিপোষক। তিনি বলেন যে, রূপকে অতিক্রম করিয়া যে ভাবের প্রাধান্য, তাহাই হইতেছে ভারতীয় শিল্পের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, রূপকে অতিক্রম করিতে গিয়া যদি রূপকে দলিয়া পিষিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়াও দেওয়া হয় তাহাতেও তাঁহার আপত্তি নাই। অর্থাৎ তাঁহার মতে যদি ভাবের প্রাধান্য থাকে, তবে চিত্রে প্রাণীদেহের আকৃতি বা গঠনে প্রকৃতির সহিত অসামঞ্জস্য থাকিলে, অথবা পরিপ্রেক্ষণের (perspective) অসঙ্গতি-দোষ থাকিলেও, তাহাতে চিত্রের উৎকৃষ্টতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। তিনি এক স্থলে বলিতেছেন—"সত্য শিল্পে নিয়মের বন্ধন, দস্তুরের সঙ্কীর্ণতা না থাকাই যে শ্রেয় এ কথা কি রাস্কিন, কি হাভেল, কি আর কেহ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কেবল আমরাই হায় রে perspective, হায় রে anatomy, কোথায় reality করিয়া মরিতেছি।" আর এক স্থলে বলিতেছেন "জাপানী শিল্পীও তুলির দুই টানে মুহূর্ত্ত মধ্যে যখন অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মান মরালশ্রেণী আঁকিয়া ফেলিল, তখন মেঘলোকে রাজহংসগণের আনন্দকাকলী ও অপ্রতিহত গতিবেগের একটা যে ধারণা তাহার মনে ছিল, সেইটুকু প্রকাশ করিয়াই সে শান্ত রহিল। হাঁসটা ঠিক ডাক্তারি মতে anatomical হাঁস হইল কি না, দেখিবার ইচ্ছাও রাখিল না।"

"তেমনি ভারতবর্ষের শিল্পীও যখন যেটি গড়িল, যথা শাস্ত্র ধ্যান ধরিয়া নিজের মানস-প্রতিমা রূপেই গড়িল। ব্রহ্মার চার মুখ, বিষ্ণুর চার হস্ত দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না; শাস্ত্রোক্ত ধ্যানটুকু ধরিয়া সে যথাসাধ্য ব্রহ্ম জ্যোতিঃ কিংবা বিষ্ণু তেজের এক একটা অপার্থিব প্রতিমা খাড়া করিয়া তুলিল। মানুষ মডেলের অপেক্ষাই রাখিল না।"

আমরা এখানে শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি বা চিত্র সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। আলোচনার সুবিধার জন্য সেগুলিকে এক ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলিয়া রাখিয়া আমরা কেবল লৌকিক জগতের চিত্র-শিল্পের কথাই ধরিয়া লইতেছি। লৌকিক জগতের চিত্রশিল্প অর্থ—আমাদের মত প্রাকৃতিক মানবের সুখ দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য ইত্যাদি লইয়া যে সকল চিত্র গঠিত। এই সকল চিত্র সম্বন্ধে আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, চিত্রে anatomyকে

লঙ্ঘন করিবার দরুণ লোকের আকৃতি যদি অলৌকিক হইয়া ওঠে, অথবা perspectiveকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য পার্থিব চিত্র যদি অপার্থিব হইয়া ওঠে, তাহাতে চিত্রের উৎকৃষ্টতা সামান্য মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় কি না। যেমন চিত্রে তেমনই কাব্যেও প্রধান আদর্শ হইতেছে ভাবের শ্রেষ্ঠতা। কিন্তু কাব্যে যদি ছন্দের পতন হয়, অথবা ব্যবহৃত বাক্য সমূহের ঝঙ্কার আশানুরূপ না হয়, তবে উচ্চ ভাবের ব্যঞ্জনা থাকিলেও কাব্যের মূল্য ঐ ঐ কারণেই হ্রাস পাইতে বাধ্য। চিত্রে যদি তদনুরূপ না হয়, অর্থাৎ যদি anatomy এবং perspectiveকে লঙ্ঘন করিয়াও কোন চিত্র আদর্শ অনুরূপ মূল্য পায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, চিত্রে anatomy এবং perspective-এর কোন মূল্য নাই, অথবা স্থল-বিশেষে চিত্রের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া anatomy এবং perspectiveএর আদর্শ বজায় রাখা যায় না। তাহা হইলে মোটের উপর কথাটা দাঁড়ায় এইরূপ যে, কোন কোন স্থলে চিত্রের আদর্শ সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিতে হইলে anatomy এবং perspectiveএর অশুদ্ধতা সম্পাদন অবশ্যম্ভাবী।

এখন আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যে কোনও ক্ষেত্রে চিত্রে আদর্শ সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিবার জন্য anatomy এবং perspectiveএর অশুদ্ধতাটাই প্রয়োজনীয় হইতে পারে কি করিয়া। এই কথাটা আমাদের নিকট একেবারেই নূতন বলিয়া মনে হয়। কারণ চিত্রের আদর্শই হইবে রূপের মধ্য দিয়া ভাবের প্রকাশ। ভাবটাই মুখ্য, রূপটা গৌণ স্বীকার করি ; কিন্তু তাই বলিয়া রূপকে তো বাদ দিলে বা অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না ; কারণ রূপকে ভিত্তি করিয়াই চিত্র ; নতুবা চিত্রের কোন অর্থই থাকে না। অবশ্য যদি কোন চিত্রে আমরা দেখি যে, ভাবের চেয়ে রূপের প্রাধান্য বেশী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে সে চিত্রকে আমরা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া গণ্য করিব না ; কারণ, চিত্রশিল্পের একটা মোটা কথা এই যে, চিত্রের যে ভাব বা যে বস্তু প্রধান বা মুখ্য বিষয়, কোন গৌণ বিষয় যেন তাহার উপর প্রাধান্য লাভ না করে। তাই চিত্রে যখন রূপের উপরে ভাবের স্থান, তখন ভাবের চেয়ে রূপের প্রাধান্য হইলে, আমরা সেই চিত্রকে কলা হিসাবে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য। আলোচ্য শ্রেণীর কোন কোন চিত্রে এই anatomy এবং perspectiveএর অসঙ্গতি, যাহা শিল্পীগণ সামান্য বলিয়া ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করেন না, তাহাদের সেই সামান্য ক্রটিই আমাদের নিকট অসামান্য হইয়া দেখা দেয়। আমরা তো ভাবের কোন সন্ধানই পাই না ; বরং ভাবের চেয়ে রূপের অসামঞ্জস্যটাই আমাদের নিকট বড় হইয়া দেখা দেয়। অতএব মোটের উপর ব্যাপারটা আমাদের নিকট একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পক্ষান্তরে আমরা দেখি গ্রীক শিল্পীগণের ভাস্কর্য্য—বেশ সুন্দর সুগঠিত মূর্ত্তি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব সুবিন্যস্ত ও সুসমঞ্জস—symmetrical। দৈহিক বিষয়ে symmetry বা কলা হিসাবেও কোন প্রকার দুর্ব্বলতা তাহাদের মধ্যে নাই। ইটালীয় শিল্পীদের চিত্রেও তাই। ইটালী দেশ যেমন রোম সাম্রাজ্যের জন্য বিখ্যাত, এই দেশের চিত্রশিল্পের প্রসিদ্ধিও তদ্রূপ অবিসংবাদিত,—র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, টিসিয়ান প্রভৃতির নাম জগদ্বিখ্যাত। র‍্যাফেল বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের চিত্র-শিল্পীগণের মুকুটমণি স্বরূপ। এই র‍্যাফেল গ্রীসদেশের পাঠশালায় চিত্র আঁকিয়াছেন, প্ল্যাটো অ্যারিষ্টটলের চিত্র গড়িয়াছেন, মাতৃমূর্ত্তির অতুলনীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়া চিত্রশিল্পের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, আবার খৃষ্টীয় জগতের সাত্ত্বিক ভাবের চিত্রও কত আঁকিয়াছেন ; কিন্তু কখনও এমন শুনি নাই যে চিত্রে ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চিত্রের রূপকে ক্ষুণ্ণ করিতে হইয়াছে। বরং, গ্রীক ভাস্কর্য্যে এবং ইটালীয় চিত্রশিল্পে আমরা দেখি—মানবদেহের যেন চরম উৎকর্ষ, সুন্দর সুগঠিত দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ প্রাকৃতিকভাবে সুসঙ্গত বেশ তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তি ; অথচ কমনীয়তার অভাব নাই। রূপ হিসাবে এই সব মূর্ত্তি যেমনই আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, ভাব-সম্পদেও ইহারা দীনহীন কাঙ্গাল নয় ; ফিডিয়াসের ভাস্কর্য্য বহু শতাব্দীর কষ্টিপাথরে আজও অমর হইয়া রহিয়াছে, আর র‍্যাফেলকে তো চিত্রশিল্পের মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিলেও চলে।

যেমন পাশ্চাত্য শিল্পে তেমনই আমাদের দেশেও তাহার ব্যতিক্রম দেখি না। যে অজন্তা আজও আমাদের অতীত শিল্প গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে, সেই অজন্তা গুহার চিত্রাবলীতেও আমরা দৈহিক-আদর্শ-সঙ্গত প্রাকৃতিক মূর্ত্তিই দেখিতে পাই। সেই সব প্রাচীন শিল্পীগণও কোন স্থলে ভাবের সম্পদ-শিখরে পৌঁছিবার অভিপ্রায়ে anatomy অথবা perspectiveএর দাবীকে লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া জানি না। তবে আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে এক শ্রেণী কোন্ আদর্শ ধরিয়া চলিতেছেন জানি না ; অথবা তাঁহারা নিজেরাই একটা আদর্শ স্থাপন করিতেছেন কি না তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।

এইখানে আর একটা কথা আসিতেছে। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখিতেছি যে, ভারতীয় শিল্পের মুখপাত্রস্বরূপ অবনীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, শিল্পের মধ্যে ভাব সম্পদই মুখ্য পদার্থ। রূপের দিক হইতে সেই মূর্ত্তির মধ্যে প্রাকৃতিক অসঙ্গতি থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। আবার এই অবনীন্দ্রনাথই কলিকাতা গোলদীঘির ধারে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শীর্ণ দুর্ব্বল মূর্ত্তি দেখিয়া শিল্পকলা হিসাবেই তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন। তিনি বলেন "ভারত শিল্পের কাছে আমরা যদি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তি চাহিতাম, তবে সে আমাদের গোল-দীঘির ধারে ইতালীয় শিল্পশাস্ত্রানুসারে গঠিত জরাজীর্ণ কুঞ্চিত মুখশ্রী ওই ক্ষীণবল বৃদ্ধ মূর্ত্তিটি দিতে চেষ্টা করিত না ; কিন্তু সাগরের ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর, জ্ঞান-জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল তাঁহার তেজোময় অমর মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তিতে তিনি আমাদের মনে আছেন সেই মানস-মূর্ত্তি দিবার চেষ্টা পাইত।" তাহা হইলে কথাটা দাঁড়ায় এইরূপ যে, ভারতীয় শিল্পী কাল্পনিক মূর্ত্তি চিত্রিত করিবার সময় প্রাকৃতিক হিসাবে অসঙ্গত অর্থাৎ anatomy-বিরুদ্ধ মূর্ত্তি লইয়াও আদর্শ শিল্প গড়িতে পারেন ; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তি গড়িবার সময় তাঁহার প্রাকৃত মূর্ত্তি জরাজীর্ণ ক্ষীণবল ও কুঞ্চিত মুখশ্রী ছিল বলিয়াই সেই মূর্ত্তিতে প্রশান্ত গম্ভীর জ্ঞান-জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল তেজোময় ভাব ফুটাইতে পারেন না—যদিও প্রকৃত বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর জ্ঞান-জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল তেজোময় ভাব লইয়া

প্রাকৃতিক হিসাবে জরাজীর্ণ কুঞ্চিত মুখশ্রী ওই ক্ষীণবল বৃদ্ধ মূর্ত্তিতেই বিদ্যমান ছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের শিল্প বলে, বিদ্যাসাগরের জরাজীর্ণ ক্ষণভঙ্গুর মাটির দেহের ছাঁচ লইয়া কি লাভ ;—এই লও আমি তোমাকে সেই মুক্ত আত্মার অজরমূর্ত্তি দিতেছি—যে মূর্ত্তিতে তিনি দেবলোকে বাস করিতেছেন এবং যে মূর্ত্তিতে তিনি আমাদের মানসলোকে বিরাজ করিতে চাহেন।"

এখানে আবার আর একটা সমস্যা। অবনীন্দ্রনাথ বলেন—"বোধ হয়, চোখে আমরা নিখিল পদার্থের মায়াচ্ছন্ন ছদ্ম মূর্ত্তিটি দেখি, আর মনে সত্য মূর্ত্তিটা দেখি। শাস্ত্রেও তো বলে সত্যটা চোখে দেখা যায় না, মনে ধরা দেয়।" যাহারা পরবর্ত্তী যুগে ইতিহাস পড়িয়া বিদ্যাসাগরকে চিনিবেন, তাঁহাদের নিকট এরূপ মানসমূর্ত্তি এক হিসাবে সত্য হইতে পারে বটে ; কিন্তু যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন, অথবা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ মানসমূর্ত্তিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন কি? প্রাকৃতিক ব্যক্তির চিত্র বা মূর্ত্তি শিল্প বিচারের পক্ষে প্রাকৃতিক সত্যও বিচারের একটা মানদণ্ড নয় কি?

আমাদের পক্ষ হইতে দুই একটা সমস্যা উপস্থাপিত করিলাম মাত্র। এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হইলে সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিল্পরসবোধ জাগ্রত করিবার পক্ষেও এরূপ আলোচনা অত্যাবশ্যক। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা এই দিকে মনোযোগী হইলে দেশের পক্ষে কল্যাণের কথা।

আজকাল আমাদের দেশে—যেমন সকল দেশেই—মাসিক পত্রিকার যোগে অনেক বিষয়ের আলাপ আলোচনা হয়। পন্থাটা খুবই ভাল—বিশেষতঃ আমাদের দেশে। কারণ আমাদের দেশে একখানা বই লিখিয়া ছাপিলে তাহার প্রচার দুই এক হাজারের মধ্যেই প্রায় শেষ হয় ; মাসিক পত্রিকা কোন কোনটা দশ বারো হাজার পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যায়। দশ হাজার সংখ্যা বিক্রয় হইলে বোধ হয় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার লোকের নিকট উহার প্রচার হয়। কাজেই আমাদের দেশে একখানা বই লিখিয়া কোন বিষয় আলোচনা করা অপেক্ষা কোন মাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিলে তাহার মূল্য অনেক বেশী। আজকাল মাসিক পত্রিকায় অনেক বিষয়ের আলোচনা হয় ; কিন্তু শিল্প সম্বন্ধে প্রায় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ চিত্র-শিল্প না হইলে মাসিক বা সাময়িক পত্রিকা চলেও না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, চিত্রশিল্পের চাহিদা আছে যথেষ্ট, অথচ সাময়িক পত্রিকার পাঠকদের মধ্যে শিল্পের সমজদার লোক অতি অল্পসংখ্যক। যাঁহারা মফঃস্বলে থাকেন, তাঁহাদের চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত কয়েকখানা চিত্র পর্য্যন্তই। কিন্তু শিল্প সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা না থাকাতে অনেকেই চিত্র সমূহের প্রকৃত বিচারের একটা আদর্শ পান না—অনেকস্থলে চিত্রের প্রকৃত রসবোধও হয় না। আমাদের মনে হয় মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রত্যেক চিত্রের জন্য পরের মাসের কাগজে একটা চিত্র-পরিচয় দেওয়া উচিত এবং যেমন কোন কোন পত্রিকায় অপরাপর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে আলোচনা থাকে, তেমনই মাসিক-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত চিত্র-সমূহ সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং তুলনামূলক সমালোচনার ব্যবস্থা করা দরকার। এরূপ ব্যবস্থায় দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিল্প-রসবোধ জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ বিষয়ে শিল্পরসজ্ঞদেরই দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অন্যথায় আর তাঁহারা যে সকল চিত্র পাঠাইয়া মাসিক পত্রিকার শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন, অনেক স্থলেই তাহা হইয়া পড়িতেছে—অরসিকেষু রহস্য নিবেদনম্।*

নদীয়া গোষ্ঠবিহারের ইতিহাস ও ধ্বংসাবশেষ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নবাব-দেওয়ান মুরশিদকুলী খাঁর অত্যাচারের রুদ্রদণ্ড যে সকল বঙ্গীয় ভূস্বামী ও রাজবংশের বিলোপ সাধন করিয়াছিল, তন্মধ্যে এক সীতারাম ভিন্ন রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণ, নদীয়া দেবগ্রামের দেবপাল, সমুদ্র-গড়ের "শূদ্রমণি" রঘুদেব প্রভৃতির শোচনীয় দুর্দ্দশার ইতিহাস এক কথায় দেশবাসী জনসাধারণের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। নদীয়া গোষ্ঠবিহারের নিদারুণ পরিণতির ইতিহাস রাজা উদয়নারায়ণের উচ্ছেদ (১) এবং বর্ত্তমান নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও, এই সকল বিবরণের মধ্যে যথাযথ ভাবে উল্লিখিত হয় নাই ; এমন কি, গোষ্ঠবিহার রাজভবন ও পরিখা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ, এবং জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত কাহিনী ও ছড়া প্রভৃতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও "নদীয়া কাহিনী"-প্রণেতাও একেবারেই উহাদের আমল দেন নাই।

গোষ্ঠবিহার নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অধীন। চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসন হইতে দশ মাইল পূর্ব্বে চিত্রা ওরফে মহেশ্বরী নদীর তীরে গোষ্ঠ-বিহার গ্রাম অবস্থিত। বর্ত্তমানে ইহাকে তেঘরি গোষ্ঠবিহার নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। স্বর্গগত দার্শনিক পণ্ডিত ও বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিবাস গ্রাম অনন্তপুর গোষ্ঠবিহার হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। গোষ্ঠবিহারের বিস্তৃত ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বহুদিন যাবৎ নানা স্থান ঘুরিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস "যোগরাণী" ইহার ঐতিহাসিক Back ground লইয়া বাহির হয়।

জনগণের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী ও ছড়া সুরেন্দ্রমোহনের উপন্যাসের ঘটনাবলীর সারাংশ এবং অন্যান্য প্রামাণ্য বিবরণাদির সমীকরণ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, যে সময় নবাব মুরশিদকুলী খাঁ বাকী রাজস্বের দায়ে কৃষ্ণনগরাধিপতি রামজীবন ও অন্যান্য বঙ্গীয় ভূস্বামীগণকে

---

* চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিবার সময় মূল চিত্রটির পরিমাপ কত তাহাও বিজ্ঞাপিত করা উচিত।

(১) রাজা উদয়নারায়ণের উচ্ছেদ Calcutta Review 1873

মুরশিদাবাদে আটক করেন. ঐ সময়ে গোষ্ঠবিহারের রাজাকেও আটক করা হয়। এই ভূস্বামীগণের প্রতি তখন বেত্রাঘাত ও "বৈকুণ্ঠবাস" প্রভৃতি দণ্ড ভোগের বিধান ছিল। বর্ত্তমানে মুরশিদাবাদে যেস্থানে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কেল্লা নির্ম্মিত হইয়াছে, উহারই দক্ষিণ তোরণ-দ্বারের সম্মুখে—"বৈকুণ্ঠ" (২) নির্ম্মিত হইয়াছিল বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে একটী গর্ত্তে মল, কর্দ্দম ও কৃমি কীট পরিপূর্ণ কোমর পরিমিত জল ছিল। হতভাগ্য ভূস্বামীগণকে ইহার মধ্যে নগ্নগাত্রে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইত। হিন্দুদিগকে উপহাস করিবার জন্য এই স্থানের নাম "বৈকুণ্ঠ" রাখা হইয়াছিল। তদীয় পুত্র গোবিন্দরাম (গন্দ রাজা) প্রজাদিগের নিকট হইতে বাকী রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পিতাকে মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া অকৃতকার্য্য হন। পরিশেষে পুরস্ত্রীগণের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যাহা পাইলেন, তাহা মুরশিদাবাদে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ অর্থ নবাব কর্ম্মচারিগণকে ঘুষ দিতেই নিঃশেষ হইয়া গেল। অবশেষে কোনও কৌশলে গোষ্ঠবিহারের রাজা পলায়নপুর্ব্বক রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। নবাব যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করেন। উদয়নারায়ণ পরাজিত হইয়া সুলতানাবাদে পলায়ন করেন। অতঃপর নবাবের দেওয়ান রঘুনন্দন তাঁহাকে ধরাইয়া দেন। রঘুনন্দন নবাবের নিকট হইতে রাজসাহীর অধিকার প্রাপ্ত হন এবং তিনি উহা তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনকে প্রদান করেন। এইরূপে বর্ত্তমান নাটোর রাজবংশের উৎপত্তি হয়। এদিকে গোষ্ঠবিহার অধিকার করিবার জন্য যে সেনা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা গোবিন্দরাম ও তদীয় মগ সেনাপতি নালডুগারির কৌশলে পরাভূত হইল। ইতোমধ্যে নবাবের আদেশে যশোহরের ফৌজদার আর এক দল সেনা উজির খাঁ নামক সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে প্রেরণ করেন। এই সেনাদল গোষ্ঠবিহারের পুর্ব্ব পারে কালুপোল নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করে। এই সময়ে সংবাদবাহী কপোতের ভ্রম ক্রমে পুরস্ত্রীগণ ও পুরবাসীগণ স্থির করেন যে গোবিন্দরাম পূর্ব্বপ্রেরিত নবাব সেনার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। তখন তাঁহারা সম্মান, কুলমর্য্যাদা ও সতীত্ব রক্ষার্থ চিত্রা নদীতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন। মহারাজ দ্বিতীয় বল্লাল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু ক্ষেত্রেই এইরূপ কপোত-কাহিনী (৩) সংযোজিত হইয়াছে। দেবগ্রামের দেবপাল, মহম্মদপুরের সীতারাম রায়, হরিণাকুণ্ডুর শালিবাহন, দেউলিয়ার চন্দ্রকেতু ও বাড়ীবাথানের মুকুট রায় প্রভৃতির নির্ব্বংশ হইবার মূলে এইরূপ সংবাদবাহী কপোতের ভুলের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। গোষ্ঠবিহার হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী তীতুদহ গ্রামের নীচে জলঙ্গী নদীর একটী শাখা বাহির হইয়া "দহ" রূপে পরিণত হইয়াছে, ঐ স্থানে নৌকাযোগে সেনাসহ গোবিন্দরাম উপস্থিত হইয়া সংবাদ পান যে, রাজভবন নবাব সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া পুরমহিলাগণ আত্মহত্যা করিয়াছেন। তখন তিনি ঐ স্থান হইতে সৈন্যদিগকে বিদায় দিয়া অন্যান্য সকলে যেখানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইখানে প্রাণত্যাগ করেন।

যেস্থান হইতে গোবিন্দরাম সেনাগণকে বিদায় দিয়া, নৌকা রাখিয়া গোষ্ঠবিহারে গমন করেন, আজিও তীতুদহ গ্রামের লোকে ঐ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। পূর্ব্বোক্ত মগ সেনাপতি জলপথে সৈন্য প্রেরণের সুবিধার জন্য রাজবাড়ীর নিকট হইতে চিত্রা নদীর একটী খাল বাহির করিয়া ভৈরব নদীর সহিত মিশাইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ঐ খালকে এখনও নালডুগারির খাল নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই খাল বর্ত্তমানে কোথাও বিল, কোথাও জলা, কোথাও বা সমতলরূপে পরিণত হইয়াছে।

নবাবের ফারমাণ অনুসারে গোষ্ঠবিহারের অধিকার বর্ত্তমান নাটোর রাজবংশের উপর বর্ত্তে। নাটোরের কুমার কালিকাপ্রসাদ গোষ্ঠবিহারের পরপারে একটী বৃহৎ আম্রবাগান (পোল) প্রস্তুত করিয়া, তথায় কাছারী নির্ম্মাণপূর্ব্বক কিছুদিন এখানে বাস করেন। কুমার কালিকাপ্রসাদের ডাক নাম ছিল কালু (৪)। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পোলকে (আম্র বাগান) কালুপোল বলা হইত। তদনুসারে এই গ্রামের নাম কালুপোল হইয়াছে। যেস্থানে কাছারী-বাড়ী ছিল ঐ স্থানে ১৮৯২ অব্দে স্যার চার্লস ইলিয়াট সাহেবের আমলে যখন চুয়াডাঙ্গা মহকুমা উঠিয়া গিয়া মেহেরপুরের সামিল হয়, তখন কালুপোল থানা হইয়াছিল। এই সকল স্থান বহুকাল অবধি নাটোরের অধিকারভুক্ত ছিল। বর্ত্তমানে নানা হাত ঘুরিতেছে।

রাজবাড়ীর গঠনাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে প্রতীতি হয় যে, ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল, এবং পাঁচটী মহল্যায় বিভক্ত ছিল। দুইটী মহলের ভিটা এখনও অকর্ষিত আছে। বংশ-লোপ ভয়ে কৃষকেরা এই দুইটী মহল্যা কর্ষণ করে না। তদ্ভিন্ন সমুদায় স্থানই আবাদের জমিতে পরিণত হইয়াছে। রাজবাড়ীর সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ দুইটী পুষ্করিণীর কঙ্কাল এখনও বর্ত্তমান আছে। নদীবেষ্টিত রাজবাড়ীর নিকট পুষ্করিণী দুইটী দেখিয়া মনে হয়, বাহির হইতে শত্রু কর্ত্তৃক রাজভবন অবরুদ্ধ হইলে, জলের অভাব পূরণার্থেই ইহা খনিত হইয়াছিল।

রাজবাড়ীর তিন ধার পরিখা দ্বারা ও এক ধার নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। বর্ত্তমানে চিত্রা নদী রাজবাড়ীর নীচে হইতে অনেকটা সরিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু পূর্ব্ব খাদ এখনও রাজবাড়ীর নিম্নদেশে অবস্থিত আছে। পরিখার খাদ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। লোকে ইহাকে "গন্দ রাজার যোপ" নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

গোষ্ঠবিহার রাজবংশের জাতি-নির্ণয় সম্বন্ধে সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার "যোগরাণী"তে লিখিতেছেন যে,—"কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর জাতি ছিলেন ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁহারা সে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন. তাহার বহুতর প্রমাণ আছে।"

(২) "বৈকুণ্ঠ" "মুর্শিদাবাদ কাহিনী"—শ্রীযুত নিখিলনাথ রায়—Riyazu. S, Salatin Page 17, 18.

(৩) "কপোত কাহিনী"—পৌরাণিক যুগেও কপোত কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে পরিচয় রাজার প্রসঙ্গে রাণীর নিকট কপোত প্রেরণের বর্ণনা পাওয়া যায়।

(৪) রামজীবন পুত্র কালিকাপ্রসাদ আত্মহত্যা করিবার পর রামকান্তকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

ধোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রামযাদু ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে সব-প্রথমে গেলো সাহেবদের বাড়ী। তাকে অসময়ে ব্যস্ত হয়ে আস্‌তে দেখে সাহেবেরা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—হ্যালো রায় বাহাদুর, এমন অসময়ে কি কাজ ?

রামযাদু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বল্‌লে—থাকোহরি ফেরার হয়েছে !······

সাহেবেরা আশ্চর্য্য ও ভীত হয়ে বল্‌লে—অ্যাঁ ! কে বল্‌লে······ ?

থাকোহরি যে তাকে চিঠি লিখে পালিয়েছে এ কথা গোপন ক'রে বল্‌লে—আমি এইমাত্র কতকগুলো চিঠিপত্র সই করাতে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছেই শুনে এলাম।

সাহেবেরা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—পরাণ-বাবু কি বল্‌লেন······ ?

—তিনি বল্‌লেন, এ কথা এখন কাউকে বোলো না ; থাকোহরি করমচাঁদ ধরমচাঁদ ঠাকরসীর তুলার চেক আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে টাকা ক্যাশ করেছে ; আমি চুপিচুপি ঐ টাকাটা আপিসে পুরিয়ে দেবো······

—ঠাকরসীর তুলার বিল তো অনেক টাকার ! সব টাকাই কি থাকোহরি নিয়ে পালিয়েছে ? কিন্তু পরাণ-বাবুকে দিয়ে চেক সই করালে কেমন ক'রে ?

—পরাণ-বাবু তো এখন পত্নীশোকে বিহ্বল হয়ে আছেন, কোনো কাজকর্ম্মই দেখেন না, তাতে আবার থাকোহরিকে অত্যন্ত বিশ্বাস কর্‌তেন······

—আপনি রায় বাহাদুর, থাকোহরির দিকে নজর রাখ্‌তে আমাদের আগেই বলে সাবধান করেছিলেন ; আমরা আপনার সেই উপদেশ গ্রাহ্য করি নি, তথাপি আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজও আপনি সব প্রথমে দৌড়ে এসেছেন আমাদের খবর দিতে, এর জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।······আচ্ছা, আমরা এখনই আপিসে যাচ্ছি, এবং দেখ্‌ছি কতো টাকা থাকোহরি নিয়ে ভেগেছে······পুলিসেও তো খবর দিতে হবে···আপনিও একটু সকাল-সকাল আপিসে যাবেন রায়-বাহাদুর, আপিসের সমস্ত হিসাব-নিকাশ অডিট করাতে হবে, আমাদের অডিটারদের এখনি ফোন্ কর্‌ছি······

রামযাদু যে আজ্ঞে ব'লে খুব নীচু হয়ে লম্বা হাতে সেলাম ক'রে বিদায় হলো।

ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে রামযাদু গেলো মাড়োয়ারী ধনী ব্যাঙ্কার মুলজী শেঠীর কাছে।

মুলজী রামযাদুকে দেখেই হেসে অভ্যর্থনা কর্‌লে—আস্‌সেন রায় বাহাদুর, কী মনে করিয়ে আসিয়েসেন ? সবেরে আপকে দর্শন মিল্‌লো, হামি তো বহুৎ ভাগ্‌মান। আপনকার কোন্ খিদ্‌মতে হামি লাগ্‌তে পারি ?

রামযাদু জুতা খুলে ফরাসের উপর বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে—আমার হাজার পঞ্চাশ ষাট টাকা চাই শেঠজী। আজই এখনই। পরাণ-বাবু বাড়ী বিক্রি কর্‌বেন, সেই বাড়ী আমি কিন্‌বো।

মুলজী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—পরাণ-বাবু বাড়ী বিক্কিরি করিয়ে ফেল্‌বেন ? কেনে ?

রামযাদু বল্‌তে লাগ্‌লো—বৌ ম'রে গেছে ; এখন তো শুধু নিজে আর মেয়ে ; অতো-বড়ো বাড়ী রেখে আর কি কর্‌বেন ? আর চাকরীও কর্‌বেন না, তীর্থে-টীর্থে গিয়ে বাস কর্‌বেন বোধ হয়······

মুলজী বল্‌লে—হাঁ হাঁ, এ বাত মুনাসিব আছে ! তীরথ-বাস বহুত ভালা !

রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—তোমার গুষ্টির মাথা ! তীরথ বাস ভালা তো তোদের আবু পাহাড় ছেড়ে কল্‌কাতায় এসে টাকার কুমীর হয়ে ব'সে আছিস কেনো ?······

তার পর সে প্রকাশ্যে বল্‌লে—টাকাটা হয় আমার ফড়িয়াপুকুরের বাড়ী আর বালিগঞ্জের অন্নপূর্ণা-আশ্রম বাঁধা রেখে দেবেন, নয় তো পরাণ-বাবুর বাড়ীটা আপনি বেনামীতে কিনে নিয়ে বাঁধা রাখুন, আমি টাকা জোগাড় ক'রে বাড়ী খালাস করে নেবো।

মূলজী বল্‌লে—উ তো মুনাসিব বাত আছে! হামি দোনোমে রাজী! আপনকার হ্যাণ্ডনোট ভি চল্‌তে পারে। টাকা কি এখনই চান?

রামযাদু ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত কর্‌লে দেখে শেঠজী বল্‌তে লাগ্‌লো—তো চলেন গদীমে। আপকে সাথ গাড়ী-উড়ী কুছ্ আসে?

রামযাদু বল্‌লে—হ্যাঁ আছে, ট্যাক্‌সি। তবে আপনি একটু মেহেরবানী ক'রে তক্‌লিফ্ উঠান······

"চলেন······"বলেই শেঠজী হাঁক দিলেন—এ হরকরাম, হম্‌রা কুর্ত্তা ঔর চদ্দর ঔর জুতী তো লাও······

মিনিট দুই পরে এক ভৃত্য একটা গিলে-করা সদ্য ধোপার পাট ভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবী, রেশমী ও জরীর পাড়-দেওয়া একখানা উড়ানী ও এক জোড়া সেলিমশাহী জুতা এনে মূলজীকে দিলে। মূলজী প্রস্তুত হতেই রামযাদু তাকে নিয়ে প্রস্থান কর্‌লে।

মূলজীর গদী থেকে টাকা নিয়ে মূলজীকে সঙ্গে করে রামযাদু ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে গেলো।

রামযাদু পরাণ-বাবুর ঘরে গিয়ে বল্‌লে—আমি মূলজী শেঠীকে গিয়ে বল্‌তেই ও আপনার বাড়ী কিন্‌তে রাজী হয়েছে। ও টাকা নিয়ে এসেছে। এটর্নীকে ফোন্ করেছে, তিনিও এলেন ব'লে, এখনই লেখাপড়া হয়ে যাবে, আর আজই রেজেষ্টারীও হয়ে যাবে।

পরাণ-বাবু আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লেন আপনি আমাকে বাঁচালেন মুখুজ্জে মশায়! আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ কর্‌তে পার্‌বো না।

রামযাদু মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—এর জন্যে আপনি এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেনো, এ তো আমার কর্ত্তব্য, আপনার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে তো আমার মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে আছে, তারই কিঞ্চিৎ পরিশোধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।······ শেঠজীকে নীচে বসিয়ে এসেছি······

পরাণ-বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের কাপড়ের ঢল্‌কো খুঁট এঁটে ক'ষে গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে বল্‌লেন—চলুন, চলুন।

পরাণ-বাবু নীচের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করতেই মূলজী ত্রস্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় ক'রে সামনের দিকে অল্প মাথা ঝুঁকিয়ে বল্‌লে—আপনকার বিপদের কথা শুনিয়েসে বাবুজী। বড়ী আফ্‌শোষকী বাত! আদ্‌মীর নসিবই এয়্‌সা······রামজী ললাটমে জো লিখা হায়······ ······রায় বাহাদুর বোল্‌লেন আপনি বাড়ী-উড়ী বিক্কিরি ক'রে তীরথ-বাস কর্‌তে যাবেন! সো তো বহুৎ মুনাসিব হিচ্ছা!

পরাণ-বাবু শেঠের কথা শুনে রামযাদুর উপর খুশী হয়ে উঠ্‌লেন—রামযাদু যে তাঁর বাড়ী বেচার প্রকৃত কারণ প্রকাশ করে নি, এবং কৌশলে তাঁর মানসম্ভ্রম বজায় রেখেছে, এতে তাঁর মন রামযাদুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। এবং তীর্থবাসের কথাটা তাঁর মনে উদিত হবা মাত্রই তিনি পরম আগ্রহে বল্‌লেন—হ্যাঁ শেঠজী, আমি তীর্থবাসই কর্‌বো! বুড়া বয়সে আর সংসারে জড়িয়ে থাক্‌বো কা'র জন্যে?

শেঠজী খুব জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—আপকা লেড়কীর সাদী হোয়েসে?

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—না, সেটা হয়ে গেলেই আমার অবশিষ্ট একটা বাঁধন কেটে যায়।

এমন সময় শিবাপ্রসাদ দত্ত এটর্নী তাঁর এক কেরানীকে সঙ্গে করে দলিল লেখ্‌বার কাগজপত্র নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ কর্‌লে।

মূলজী এটর্নীকে দেখেই বল্‌লে—এই যে এটর্নী বাবুজী আসিয়েসেন। হামি পরাণ-বাবুর দুটা বাড়ী কিন্‌বো, বাকী বেনামী কিন্‌বো··· রায় বাহাদুরের নামে কিন্‌বো······

পরাণ-বাবু রামযাদুর দিকে একবার অপাঙ্গে দেখে নিয়ে বল্‌লেন—"বেশ!" তাঁর মন সংশয়ে সন্দেহে আন্দোলিত হ'য়ে উঠ্‌লো—শেঠ রামযাদুর বেনামীতে বাড়ী কিন্‌ছে কেনো? এর মধ্যেও রামযাদুর নিশ্চয় কোনো কৌশল আছে! নিশ্চয় রামযাদু তাঁর বাড়ীখানি একেবারে বেহাত হয়ে না যায় তার জন্যে কোনো গোপন উপায় অবলম্বন করেছে! এই কথা মনে হতেই পরাণ-বাবুর মন রামযাদুর প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌লো। তিনি প্রসন্ন উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রামযাদুর দিকে চাইলেন।

রামযাদুর মুখ অপ্রতিভ হয়ে শুকিয়ে উঠ্‌লো, সে তাড়াতাড়ি মাথা হেঁট কর্‌লে; তার মনে আশঙ্কা হলো—কেওটের পো বোধ হয় আমার চালবাজী ধাপ্পাবাজী ধ'রে ফেলেছে!

রামযাদুকে মুখ কাচুমাচু ক'রে মাথা নীচু কর্‌তে দেখে পরাণ-বাবুর মুখ ও মন আরো প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌লো—মুখুজ্জে মশায়ের চরিত্র কী স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর নিরহঙ্কার! তিনি বিনয় মূর্ত্তিমান! লোকের মঙ্গল ক'রে প্রশংসা পেতে পর্য্যন্ত চান না; কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি পর্য্যন্ত সহ্য কর্‌তে পারেন না, সঙ্কোচে মুষ্‌ড়ে যান!

মূলজী বল্‌লে—রায় বাহাদুর আপনকার নাম লিয়ে যেই বোল্‌লেন হামি ঐসা তুরন্ত্‌ চলিয়ে আলাম রূপেয়া লিয়ে। আপনকার জরুরী কাম, হামী ঔর দালাল-উলাল দিলোম না, যাচাই ভি কর্‌লোম না, দরাদরী ভি কর্‌তে হিচ্ছা নাই। দরদাম আপনিই একটা মুনাসিব সম্‌ঝে ঠিক ক'রে দিবেন বাবুজী।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আমার এই বাড়ী আর বাঁশতলার বাড়ী সময় নিয়ে বেচ্‌লে এক লাখ টাকা স্বচ্ছন্দে পাওয়া যেতে পারে। আপনি এখন আমাকে ষাট হাজার টাকা দিলে আমার কাজ মেটে।

শেঠ বল্‌লে—আচ্ছা বাবুজী, আপ্‌নার কোথা ভি থাক, হামের কোথা ভি থাক, হামি পচাস হাজার এক রূপেয়া দিবো।

পরাণ-বাবু তৎক্ষণাৎ বল্‌লেন—আচ্ছা, তাই সই।

পরাণ-বাবুর এই উক্তি শুনেই রামযাদু মনের খুশী মুখের কাচুমাচু ভাবে চাপা দিয়ে বল্‌লে—আমি তা হলে এখন আসি। আপিস যেতে হবে······

পরাণ-বাবু তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—আচ্ছা। লেখাপড়াটা হলে দলিলটা রেজেষ্টারী করিয়ে আমিও যতো শীগ্‌গির পারি আপিসে যাচ্ছি। কিন্তু এ কথা এখন······

রামযাদু ব'লে উঠ্‌লো সে কথা আমাকে আপনার বল্‌তে হবে না।···তবে আমি আসি শেঠজী ··শিব বাবু নমস্কার··· ··

রামযাদু ঘরে উপস্থিত তিনজনের কাছে এক নমস্কারে বিদায় নিয়ে প্রস্থান কর্‌লো।

তার ট্যাক্‌সি ছুটে চল্‌লো বালিগঞ্জে অন্নপূর্ণা আশ্রমে।

সে স্ত্রীর কাছে গিয়েই উৎফুল্ল স্বরে বল্‌লে—কেল্লা ফতে রে পাগ্‌লী, কেল্লা ফতে! অসমঞ্জ মুখুজ্জের গল্পের জগদীশ লাহিড়ী যেমন বলেছে বীটু দি ফোর্ট উইলিয়ম আর কি!

খাসা লোক সেই জগদীশ লাহিড়ী! আমাকেও হার মানিয়েছে! তার কাছে আমি অনেক কারচুপি শিখ্‌তে পেরেছি!

মনমোহিনী বিস্ময়ে কৌতূহলে নির্ব্বাক্ হয়ে উৎসুক দৃষ্টি মেলে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। রামযাদু কোটের ভিতরের বুক-পকেট থেকে দু তাড়া কাগজ বাহির ক'রে বল্‌লে—পরাণ-বাবু এই দলিলে সই ক'রে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দান ক'রেছেন, আর এই দলিলে বিক্রি করেছেন; এখন আমি যে দলিলটা সুবিধা বুঝ্‌বো সেইটে দিয়ে সম্পত্তি দখল কর্‌বো। কিন্তু বাড়ী দুটো ছেড়ে দতে হলো, লোকটার অনেক খেয়েছি, একেবারে মূলে হাভাত কর্‌তে পার্‌লাম না। একবার মনে ক'রেছিলাম বোকা মাড়োয়ারীটাকে দিয়ে বাড়ী দুখানা কেনাই, তার পর আমার স্বত্ব দাবী ক'রে বেটাকে দি কলা খাইয়ে। কিন্তু শেষে ভেবে দেখ্‌লাম তাতে আমার দুর্নাম হয়ে যেতে পারে। তাই বাড়ী দুখানার লোভ সাম্‌লাতে হলো। এখন কেওটের পো পটল তুল্‌লে হয়, তার পর কালপেঁচী মেয়েটাকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে বিয়ে দিয়ে দূর ক'রে দিয়ে রামযাদুর রামরাজত্বি রে পাগ্‌লী রামযাদুর রামরাজত্বি! আপিসের বড়ো-বাবুও হবে এই রামযাদু! সাহেব বাঁদর দুটোও রামযাদুর মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে! এখন কেওটের বাচ্ছাকে চট্‌পট্ ভবযন্ত্রণা থেকে সরানো যায় কি ক'রে। বুড়ো মেরে তো খুনের দায়ে পড়া যায় না!

মনমোহিনী ভীত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—না গো না, ও-সব সর্ব্বনেশে মৎলব মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। মা অন্নপূন্নো এমনই মনোবাঞ্ছা পূন্নো কর্‌বেন—আমরা এতো কায়মনবাক্যে তাঁর সেবা কর্‌ছি।

রামযাদু বিরক্ত স্বরে বল্‌লে—দেবতার হাতে কাজের ভার দিয়ে রাখ্‌লে বড়ো দেরী হয় রে ক্ষেপী! নিজের হাতে চট্‌পট্ কাজ সারা যায়!

মনমোহিনী শঙ্কাকুল কণ্ঠে বল্‌লে—না গো না, তোমার নিজের হাতে আর কোনো কাজ সেরে কাজ নেই। আর দুটো দিন সবুরই করো না; বুড়ো যে শোগ পেয়েছে, তাতে আর কদিনই বা বাঁচ্‌বে?

রামযাদু বল্‌লে—তোমার মুখে পুরুষের এই প্রশস্তিটা শুন্‌তে আমার কানে মন্দ লাগ্‌লো না। কিন্তু অনেক বুড়ো যে আবার কেঁচে ছুঁড়ি বিয়ে ক'রে ঘরকন্না

পাতে! সহমরণে যাওয়া যে ইংরেজ গভর্মেণ্ট্ বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

মনমোহিনী বল্লে—তা করুক। তুমি নিজে অনেক কীর্ত্তি করেছো, এখন এই শেষ কাজটা দেবতার হাতেই দিয়ে রাখো।

রামযাদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—নাচার হয়ে দিতেই হবে। কিন্তু মোনো, তুমি রোজ দুবেলা হরির লুট……না না, হরি আবার বষ্টম মানুষ প্রাণী বধে তাঁর আপত্তি হতে পারে……আর আপত্তিই বা কোথায়?……দৈত্য দানব তো কম সাবাড় করেন নি!……তা যাই হোক, তাঁকেও ডেকো, আর মা-কালীর কাছে পাঁঠা মোষ মানত কোরো যেনো পরাণের প্রাণটা চট্ ক'রে চম্পট দেয়!

মনমোহিনী বিরক্তির ভাণ ক'রে বল্লে—না; ও-সব অমঙ্গল-কামনা আমি কর্‌তে পার্‌বো না।

রামযাদু বল্লে—আহা! আমার সময়ের অত্যন্ত অভাব ব'লেই তো সহধর্ম্মিণীর উপর বরাত দিচ্ছি। পরের অমঙ্গল না হলে নিজের মঙ্গল হয় কৈ?……

মনমোহিনীকে আবার কিছু আপত্তি তুল্‌তে উদ্যতা দেখেই রামযাদু তাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লে—আচ্ছা, এখন তর্ক থাক, আমাকে এখনই আপিস যেতে হবে। ঝা করে মাথায় দু ঘটী জল ঢেলে আসি, তুমি বামুনঠাকুরকে ভাত দিতে বলো……

রামযাদু ও মনমোহিনী ঘরের দু দিকের দরজা দিয়ে দুদিকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলো। (ক্রমশঃ)

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৬

জয়হরি—বাজারে বাজারে।

অবস্থা দেখিয়া গাড়ী রিজার্ভ্ করিয়া দিবার ভার আমিই লইয়াছি।

সেই উদ্দেশ্যে বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে ষ্টেসনেই গেলাম।

ষ্টেসন্ অনেকটা ঠাণ্ডা,—তখন কাজকর্ম্ম কম্। বৈকালের প্যাসেঞ্জার্ চলিয়া গিয়াছে।

একটি লম্বা ছন্দের ছিপ্‌ছিপে যুবা, প্রসাধনান্তে মাঠ-মুখো চেয়ার টানিয়া—নিশ্চিন্ত মনে এক এক চুমুক্ চা খাইতেছেন। সামনে একখানি খাতা খোলা। দেখিলেই বোঝা যায়,—আপিসেরও নয়, ধোপার হিসেবেরও নয়,—সখের। হাতে ফাউণ্টেন্-পেন্। মুখে—হুঁ হুঁ হুঁ।

আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"এখন কাজের সময় নয়—আমি off duty, নিজের কাজে আছি। আপনি অন্যত্র বসুন-গে বা বেড়ান-গে।"

"আপনার কথাগুলিতে রেলের সুর পেলুমনা,—সে আওয়াজও নয়, সে তাতও নেই, সে বেগও নেই। দুটো কথা কইতে যে ইচ্ছে হয় ভাই,—কাজ নাই বা হ'ল। তবে আপনাকে যদি বিরক্ত করা হয়—তা হ'লে থাক্। একটু আরাম্ করচেন—করুন।"

ছোক্‌রাটি এক-আঁচ্ অপ্রতিভ ভাবে—"না, আরাম ঠিক্ নয়, একটা নেশা আছে,—তা যে-চাকরি—সময় তো পাইনা,—এই এই-সময়ে যা দু'লাইন। তাও বেরুতে কি চায়,—রেলের আওয়াজেই মগজ ভরা! মিলের্ তরে মাথা খুঁড়্‌চি—মিল্‌লো শেষ্ হুইসিল্!"

অপাঙ্গে একটু হাসির রেখা দেখা দিলে।

"ওঃ—আপনার্ কবিতা লেখার ঝোঁক্ আছে বুঝি! ও যে জোঁকের মত ধরে, আর-একটা না পেলে ছাড়ে কে! ওর আনন্দ যে একবার পেয়েছে তার কি আর ইহকাল পরকাল থাকে ভাই,—সে বাপের সঙ্গে সাপ, ধর্ম্মের সঙ্গে অধর্ম্ম পর্য্যন্ত জুটিয়ে দেয়! ও ঢের্ ভুগেছি দাদা! একটু ফাঁক পাবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রাণ ছট্‌ফট্ করে, কিছু ভালো লাগেনা। না—আমাকে মাপ্ করবেন,—আপনি লিখুন।"

"না না—আপনি বসুন। এই জুম্‌ন্—কুর্‌সি দেও।—

—"রোজ কি আর বেরয়। অভ্যাস,—খাতা নিয়ে

না বসলেও স্বস্তি নেই—তাই বস্‌তে হয়।—এক-কাপ্ চা আনতে বলি।"

"না—থাক্। তবে প্রথম আলাপ—প্রণয় পাকা করতে ওর আর জোড়া নেই;—ওর রং যে আখের উমোরের,—দিন্।—

—হ্যাঁ—ঐ যা বললেন—খাতা না নিয়ে বসলেও স্বস্তি নেই, উটি পাক্কা কথা। বঙ্কিম বাবুরও ঠিক্ ওই নিয়ম ছিল, লেখা আসুক না-আসুক—বসতেই হবে। সে-সময় ঘরে আগুন লাগলেও উঠতেননা।"

"এমনি রোগই বটে! আমারো মশাই ঠিক্ তাই।"

"ও-যে হতেই হবে। একটু না লিখলে—নিদেন দু' লাইন,—স্বস্তি পেতেই পারেননা। হেমবাবুর কোনো কোনো রাত্—মাথার চুল ছিঁড়ে কেটে যেতো।"

"এই দেখুন না।"—

দেখিলাম—বাঁ-কাণের এক ইঞ্চি ওপরে—টাক্ পড়ে' আসছে!

—"না করেও তো পারা যায় না মশাই!"

—"কি করবেন! এটা হল' আপনার সত্যিকার আনন্দের কাজ,—মর্ম্ম-কোষের কাছাকাছি জিনিস,—এর মাধুর্য্যই আলাদা। টাকার কাজ তো পেটের জন্যে দাদা,—আর এর মধ্যে যে আপনার সমগ্র প্রকৃতি আর প্রবৃত্তির সার্থকতা অপেক্ষা করে রয়েছে। তা আপনি রেলে ঢুকলেন কেনো? দেখছি"—···

"আর মশাই! শ্বশুর "ভাগ্য-বেঁড়ের" ষ্টেসন্-মাষ্টার, তিনিই"—

"দেশের এই সবই দুর্ভাগ্য! লাইন্-ময় কত meritই (প্রতিভাই) মাটি-চাপা পড়ে আছে! গোরস্থান আর শ্মশান একই কথা,—সেখানে বসে গ্রে সাহেব যা লিখে গেছেন—সেটা বান্ধবেরই বাণী। আর সাহিত্য যাঁকে পাকা রকম পেয়েছে তাঁর আর মার নেই, তিনি রেলে থাকায় বরং নানা স্থানের নানা দৃশ্যের আমদানী থেকে যথেষ্ট গুছিয়ে নেন্। আপনার যে রকম নিষ্ঠা দেখছি"—···

"আমি মশাই সেই লোভেই"—

"তা বুঝতে পেরেছি। ছাড়বেননা, সরস্বতীর অন্তঃশীলা বেগ—আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে চলবে। যা হোক—আলাপ হয়ে গেল,—পাঁচটা দিন আগে হলে বড় সুখেরি হত,—সাহিত্যালোচনায় বেশ কাট্‌তো।"

"আপনার কথা শুনেই বুঝেছি—আপনিও"—

"এক সময় সখ্ ছিল বটে, তখন মিলের মাধুর্য্যও ছিল। এখন গরমিল্ বাঁচিয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট,"—···

"আমার আবার একটা বদ্-রোগ আছে—মুস্কিলেও পড়ি তাই। শুধু মিলেই হবেনা—মিলের কথা দুটি—এক ওজন আর এক আওয়াজ দেওয়া চাই। না হলে মন্ ওঠেনা।"

"উঠতে পারেনা,—এই বাড়ন্ত যুগে তার কমে কি মানায়?—ছাগলের সঙ্গে পাগলকে এক খোঁটায় বাঁধা বরং চলে, কিন্তু "জলের" সঙ্গে অচল। সে সব দিবসা গতা।—

—"চণ্ডীর স্তব লিখতে লিখতে আমারি একবার প্রথম লাইনের শেষে উপচিকীর্ষা রূপ উৎপাত এসে পড়ে, শেষ—"গুঁপো-নাদীরশা" বসিয়ে সে যাত্রা বাঁচি। 'দিলিরশা' দিলে একদিক বজায় হয় বটে, কিন্তু ওই ওজনে আর আওয়াজে যেন ধিমে মারে। তাই পচন্দ হ'লনা। স্তব শুনে লোক স্তব্ধ হবেনা!—

—"ধরুন—লিখতে লিখতে আপনি "আফ্‌গানিস্থান"এ এসে পড়েছেন,—উপায়? সেকালে "ধান" দিলে মিল্‌তো, আজকাল আপনাকে শ্রেষ্ঠ মিলন খুঁজতে হবে, না হয় বানাতে হবে—যা, বহরে, বলে, আওয়াজে ফিট্ করে। সুতরাং "দাদখানী ধান" বা "আমদানী ধান" ঝাড়তে হবে।"

"আপনার খুব রপ্তো তো! আমার মাথা খারাপ্ করে দিয়েছে মশাই।"

"আমাদের যে খারাপ করবার মতো আর কিছু নেই।"

"এখন, আছেন তো?"

"না ভাই,—একখানা ইণ্টার রিজার্ভ্ করবার জন্যেই এসেছি, কালই চলে যাচ্ছি। আপনাকে পেয়ে এখন আপশোষ হচ্ছে—"

"কাল-ই? ইস্—কিছু জানতুম না,—আর এই কাছেই ছিলেন! আপনি থাকলে আমার "রজনীগন্ধা" খানা জামাইষষ্ঠীর আগেই"—···

"যাচ্চি তো হয়েছে কি ভাই, ঠিকানা দিয়ে তো যাবই,—আবশ্যক হলেই লিখবেন—তাতে সুখীই হব। আমরা এক-নেশার লোক যে!—

—"আচ্ছা—এখন আর যশেডি যাবার উপায় নেই কি?"

"কেনো—যশেডি কেনো?"

"ঐ রিজার্ভের জন্যেই। মেয়েছেলে সঙ্গে,—হাওড়া পর্য্যন্ত একটানা যেতে হবে কি না।"

"ও রিজার্ভের ভার আমার রইলো, ওর জন্যে আপনাকে কষ্ট পেতে হবেনা,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সকালে টাকা জমা করে—পাস্ নিয়ে যাবেন। আমি টেলিগ্রাফে সব ঠিক্ করে রাখচি।"

শেষ—চা, পান, সিগারেট ও নানা কথা। পরে বঙ্কিমবাবুর চেহারা—নাক, চোখ, ভ্রূ, রং প্রভৃতি শুনাইয়া ছুটি।

৬৭

প্রত্যাবর্ত্তনের পরোয়ানা লইয়া প্রভাত দেখা দিল। তাহার আলোক-উজ্জ্বল প্রকাশ, দেহমন-জুড়ান বাতাস, আজ আর আমাদের লক্ষ্যের বস্তু নহে। সকলেই স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম,—বন্ধন বা দ্বিধা-সঙ্কোচশূন্য। কেহ কাহারো অপেক্ষায় নাই।

আবার—সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম—কর্ত্তা আজ ভৃত্য বাণেশ্বরকে—বাণেশ্বর বলিয়া ডাকিতেছেন। সে আজ আর বাণভট্টও নয় বাণলিঙ্গও নয়।

বাড়ীতে আত্মীয়ের বা প্রিয়জনের যখন সঙ্কট পীড়া, কেহ রোগীর শয্যাপার্শ্বে সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত ; কেহ সেবা-শুশ্রূষারত ; ঔষধ পথ্য আর থার্ম্মামেটর্ লইয়া ঘড়ির হুকুম মত কেহ চলিতেছে, আর ডাক্তারের হুকুমমত রোগীর অবস্থা আর টেম্পারেচর্ টুকিতেছে ; কক্ষ মধ্যে ঘড়ির শব্দ ছাড়া কাহারো টুঁ শব্দের অধিকার নাই,—সকলের মুখই মেঘ-গম্ভীর ; তখন এমন কেহও থাকেন যাঁহার কেবলি চেষ্টা বাহিরে বাহিরে থাকা। ঔষধ আনিবার বা ডাক্তার ডাকিবার ভারটা পাইলেই তিনি বাঁচেন ! কতকটা সময় ভাবনা-চিন্তার বাহিরে কাটাইতে পারেন ;—ডিস্পেন্সরিতে বসিয়া দু'চার জনের সহিত বাজে কথাবার্ত্তা বাড়াইয়া যতটা সময় কাটে ততটাই তাঁর লাভ। এটা বোধ করি দুর্ব্বল-চিত্তের লোকের স্বভাব।

আমি তাঁদেরই একজন, তাই আজ এই আনন্দ-বিরল আবহাওয়ার মধ্যে না থাকিয়া, আমার প্রধান কাজটা হ'ল—বৈদ্যনাথ দর্শন।

এখানে আসা অবধি বরাবরই অলক্ষ্যে কোথায় একটা ক্ষোভের খোঁচা ছিল। মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতেই সেটা চ'খে পড়িয়া গেল। আগে এত খুঁজিয়াছি পাই নাই।

আজ বিদায়ের দিনে আমার সেই প্রথম রাত্রির অসহায় অবস্থার অবলম্বন—মুস্কিল্-আসান্ নন্দকিশোর পাণ্ডাকে দেখিতে পাইলাম। দেব দর্শন ভুলিয়া গেলাম। সরাসরি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, পরিচয় দিয়া ধরা দিলাম। তাহার আনন্দ ও বিনয়ের সীমা রহিলনা। দোষীকে এতটা সম্মান কেবল গরীবেই দিতে পারে !

সে সহজেই সুন্দর ভাবে দর্শনাদি করাইয়া চরণামৃতে ও প্রসাদে,—একটি ছোটখাটো লগেজ্ বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। রস মরিয়া আসিয়াছিল,—মাত্র দুইটি টাকা তাহার হাতে দিতে লজ্জা বোধ করিলাম ! সে তাহাকে লক্ষ টাকার আদর দিয়া গ্রহণ করিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে প্রস্তুত ;—অনেক করিয়া বিদায় করিলাম।

বাসায় আজ সকলেরই মধ্য হইতে সাজা-মানুষটি সরিয়া গিয়াছে,—কতক ট্রঙ্কে কতক বাক্সে-বেডিংয়ে,—সোজা মানুষটি কখন সহজেই বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সৌখিন কাচের বাটিতে জবাকুসুমের পরিবর্ত্তে মাটির খুরিতে সনাতন সর্ষপ তৈলই সহজ ব্যবহার্য্য ; স্নান আহ্নিকে গামছাই পট্টবস্ত্র ! জলযোগের মিহিদানা—পাতার ঠোঙা হইতে অনায়াসে হাতে আসিয়া পড়িতেছে ! আর্সির বদলে সার্সি কাজ দিতেছে। ইত্যাকার।

আসিয়া পর্য্যন্ত নিতাই চ'খে পড়িত,—একটা পরিত্যক্ত ফুটো বাল্তি কুল-তলায় কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে ; এখনো তাহার কর্ম্মভোগ কাটে নাই, বানর তাড়াইতে তাহারই পৃষ্ঠে প্রহার চলে,—কাজ ফুরায় নাই—আওয়াজ দিতে হয় ! জলদানে বিস্তর সাহায্য করিয়াছে, ফল যাবে কোথায় ! জলেও গলেনা—উয়েও খায় না।

আহারে বসিলেই এটা নজরে পড়িত—শিহরিয়া উঠিতাম ! অমর হওয়ার সুখ কম নয় ! ভাবিতাম—তাই বোধ হয় মানুষ নিজের জন্য চিতার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে—ফুঁকে দিলেই ফর্সা ! কিন্তু অতি-মানুষে যে আবার জন্মান্তরের ভয় দেখায় !

যাক্,—আজ দেখি সেটাকে ধুইয়া, আবার কাজে

লাগানো হইয়াছে। আজ আর জল ধরিবার আবশ্যক নাই, যে-যার জল তুলিয়া কাজ সারিতেছে।

বারবার কাণে আসিল "দেখো সে সময় তাড়াতাড়িতে দড়িগাছটা না থেকে যায়!"

দড়ির দরকার শেষ পর্য্যন্ত! কেরোসিনের ডিপেগুলো এত জ্বলিয়াও রেহাই পাইলনা,—তাহারাও একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিল।

কখনো শুনিলাম,—"উনুন্‌গুলো যেন আস্তো না থাকে—ভেঙে দিয়ে যেতে ভুল না হয়।" শাস্ত্রবাক্য,—হিঁদুর যে ধর্ম্ম ছাড়া কাজ নাই!

* * * *

ডাক্তার বাবুর নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি। জয়হরি আজ সেইখানেই খাইবে। কিন্তু—এ বাড়ীতেও না খাইলে নয়। সে বলিয়াছে—ও-আবার শক্তটা কি মশাই, —পৌষপার্ব্বণে একাই সাতবাড়ী সামলাই।

ভরসার কথা বটে! এখন যে আস্তো ফেরাতে পারিলে বাঁচি! ওর জন্তেই এমন জল-হাওয়াটা কাছে ঘেঁসতে পেলেনা!

কেবল অমরের সঙ্গেই সাক্ষাৎটা হইলনা। সে গিধোড়ের রাজবাটীতে বড় একটা দাঁওয়ের ফিকিরে ফিরিতেছে: ১০ হাজার টাকার "সপ্লাই",—হাত লাগ্‌লেই—৪০ হাজার নিজের! বাবার মাথায় বিল্বপত্র চড়াইবার জন্ত,—নিয়ম ভঙ্গ করিয়া,—পাণ্ডাকে আগাম বারো আনা পয়সা দিয়া গিয়াছে। আগাম দেওয়ার কথা এই প্রথম শুনিলাম! কাজ হাসিল হইলে, মায় দক্ষিণা—পূজায় পাঁচসিকা খরচ করিবে, এ কথাও বলিয়া গিয়াছে।

পরিচিতের নিকট এ একটি puzzle। আগাম দেওয়া বারো আনা—পূজার পাঁচসিকার মধ্যে উহ্য আছে কি না এ গুহ্য কথা, বাবারও সাধ্য নাই যে বুঝেন।

পাণ্ডা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—"অমরবাবুটি কি সাঁচ্চা বাঙালী আছে মোশাই? বড়া হিসাবী লোক। মোহরলাল ভেঙ্কী বোলতেছিলেন—উনি হামারা পরদাদাকে ভাতিজা আছে; বহুৎ রোজ বাংলা দেশমে আছেন—মিশিয়ে ঘুসিয়ে গেছেন। হামারা হক্ এক্কিশ হাজার, এখন সাফ্ উড়িয়ে নিলেন—মাড়োয়ারি-বাচ্চা হামি—তাক্‌তেই রয়ে গেলুম! বড়া কামের লোক আছেন—মাড়োয়ারির ভি জোঁক্ আছেন! খুন্ পিয়ে লেন।"

(ক্রমশঃ)

তাজের স্বপ্ন *

শ্রীরামেন্দু দত্ত

শাহজাহান। "চোখের দৃষ্টি হ'য়ে আসে ক্ষীণ,
দেহে কমে আসে বল।
ধীরে ধীরে হায় দীপ নিভে যায়—
আঁধার ভূমণ্ডল!
গত যৌবন, আজি দেহমন
জরার বিজয়-ভূমি,
দরদী আমার, দুর্দ্দিনে আজ
কোথা মমতাজ তুমি!
এপারেতে এই দুর্গ-ঝরোখা, ওপারে কবর তোর!
মাঝে নীল জল, যমুনা উছল! অশ্রু দরিয়া মোর!

২

ওপারেতে ওই স্বপনের প্রায়
আধ-আলো-আঁধিয়ারে
কালো পাথরের সমাধি ফুটেছে
সবুজ ঘাসের আড়ে।
সেথা মোর প্রেম ধরি' তৃণরূপ
জনমি' নিত্য নব
সাজাইতে চায় সবুজ শোভায়
কঙ্কালগুলি তব!

---

* পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষ' শিল্পী শ্রীযুক্ত রণদাচরণ উকিল-অঙ্কিত 'তাজের স্বপ্ন' শীর্ষক চিত্র দর্শনে।

এখনো নিবিড় হয়নি তিমির,
এখনো দেখিতে পাই
সজল, ডাগর আঁখিতে তোমার
ওপারে নিদ্রা নাই !
এপারেরও এই চোখেতে কখন নামিবে অন্ধকার !
ওই ছোট দু'টি শিলার সমাধি দেখিতে পাবো না আর !

৩

"রাজার তক্তে বসিয়াছি যবে
পরম পুণ্যবলে
রাজ-প্রেয়সীরে দেবো না ডুবিতে
বিস্মরণীর জলে !
যতদিন আছে চোখের দৃষ্টি,
রয়েছে সিংহাসন,
তোমারে, মহিষী, অমর করিতে
করিব পরাণ পণ !
তোমার ও কালো সমাধির 'পরে
ছুধিয়া পাথর দিয়ে
অপরূপ এক রূপ-নিকেতন
গড়িয়া তুলিব প্রিয়ে !
খুঁজিয়া খুঁজিয়া তামাম দুনিয়া
শিল্পী আনিব ডেকে,
অপরূপ তাজ দিবে মমতাজ
সমাধি তোমার ঢেকে।
দিন-দিনান্ত, যুগ-যুগান্ত, বাহি' অনন্তকাল,
বিশ্ব-মানব বিস্ময়ে চাহি' হেরিবে তাজমহাল !

৪

"কোটি ক্রোশ হ'তে কোটি কোটি লোক
মিলিবে হেথায় এসে,
কোটি প্রেমিকের মিলন-তীর্থ
হ'বে এ কবর শেষে !
এক সুরে মিলে উঠিবে হেথায়
একটি প্রেমের গান,
লভিবে সে সব সঙ্গীত রব
একটি স্বরগে স্থান !
মর্ম্মর দেহে প্রাণ দিব আমি র'বে না পাষাণ স্তূপ—
নিখিলের লোকে দেখিবে ইহার নিত্য নূতন রূপ !

৫

"জীবনে তোমারে নানারূপে পেয়ে
মেটেনি তৃষ্ণা মোর,
সেই সব ব্যথা, তৃপ্তি-হীনতা
ভরিবে সমাধি তোর !
কাঁদিছে হৃদয় নিশিদিনমান
বিরহ-বিধুর হ'য়ে
ক্রন্দন র'বে শিলারূপ ধরি'
তোমারে বক্ষে ল'য়ে !
তোমারে করিব অমর, প্রেয়সী ! মৃত্যুরে দিব বর !
তোমার মতন মাগিবে মরণ মানব অতঃপর।

৬

"যবে মোর শেষ দিবসের আলো
ম্লান হ'বে আঁখিপুটে
সে দিন নয়নে যেন তাজখানি
সুমুখে ভাসিয়া উঠে !
কি জানি আঁধার ভাগ্যে আমার
কি আছে লিখন শেষে,
বুড়া শাজাহান নিহত হ'বে, কি
বাঁচিবে বন্দী-বেশে !
যদি মোর ছেলে রাজ্যের লোভে
আমারে বন্দী করে,
ভিক্ষা করিয়া ল'ব একটুকু
ঠাঁই, এ দুর্গ-'পরে ;
সেথা নিশিদিন বসিয়া রহিব চাহিয়া তাজের দিকে
বেদনা যাতনা মধু হ'য়ে যা'বে, বিষ হ'য়ে যা'বে ফিকে !

শেষ

"যদি আঁখিতারা হয় জ্যোতিহারা, সেই আঁখি দুটি ল'য়ে
ওই তাজপানে ফিরাইয়ে মুখ রহিব তুষ্ট হ'য়ে !
যদি তার পর হয়ে যায় শেষ, যেন এ দেহটি মোর
ধীরে ধীরে দেয় তাজের তলায় শোয়ায়ে পার্শ্বে তোর !

* * * *

"এ কি এ কি চোখে মিলাইছে হায় !
সুখের স্বপন সম !
কোথা ভেসে যায় কল্পনা-রচা
মন্দিরখানি মম !
আবার হেরি যে ওপারে শোভিছে শিলার সমাধি সুধু,
যমুনা—জলের মরীচিকা চলে, বিরহ করিছে ধূ—ধূ !"

শাপে-বর

কথা—শ্রীনিরুপমা দেবী　　　　　　　　　　　　　সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

(ওগো)　ব্যথা দিবে ব'লে দিয়েছিলে ব্যথা,
　　　　ব্যথা তুমি প্রিয় দিলে কই ?
প্রকাশিলে তব প্রেম ব্যাকুলতা
　　　　দুখ কোথা তাহে সুখ বই ?

নব নব রূপে হেরিয়া তোমায়
হৃদি ভ'রে ওঠে নবীন সুধায়
আঁখিজলে আরো হিয়ায় হিয়ায়
　　　　তোমারে যে বঁধু চিনে লই !

(ওগো)　ব্যথা দিবে ব'লে দিয়েছিলে ব্যথা,
　　　　ব্যথা তুমি প্রিয় দিলে কই ?

(প্রিয়)　শাসনের তলে ছলছল করে
　　　　করুণা-মধুর আঁখিজল,
মোর প্রাণ সে যে উজ্জ্বল করে
　　　　স্বর্গের সুধা অবিরল !

দুখ দিয়ে তাই করিনু বরণ
সুন্দর তব ও দুটি চরণ
বক্ষের মাঝে করিয়া হরণ
　　　　মোর প্রেম আজি হ'ল জয়ী,

(ওগো)　ব্যথা দিবে ব'লে দিয়েছিলে ব্যথা
　　　　ব্যথা তুমি প্রিয় দিলে কই ?

হবে, আর কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। এক জায়গায় দু' মাইল এত খাড়াই যে, শেষ বরাবর গিয়ে সাইকেল থেকে নেমে হাঁটতে হোল। এই ভাবে জনার জঙ্গল প্রায় পার হয়ে এসেছি, এমন সময় একটী "মোটর" গাড়ী আমাদের পাশ দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে গিয়ে কিছু দূরে থেমে গেল। তার পর গাড়ীটা পিছু হেঁটে আমাদের কাছে উপস্থিত হতেই দেখি, ভেতরে কয়েকজন কোল্‌কাতার সৌখীন বাবু। তাঁদের মধ্যে একজন আমার বিশেষ পরিচিত। এঁর নাম শ্রীমান অমরেন্দ্রমোহন ঘোষ, Cotton Goss & Co., ইলেক্‌ট্রিকের দোকানের একজন মালিক। যাহোক এ রকম অপ্রত্যাশিত মিলনে উভয়ে উভয়ের কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ির পর আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগ্‌ল। পরে জানা গেল, তাঁরা "হুড্রু" জলপ্রপাত দেখবার জন্যে রাঁচী থেকে বেরিয়ে ভুল করে হুড্রুর রাস্তা ছেড়ে এই জঙ্গলে হাজির হয়েছেন। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তাঁদের এই ভুলই আমাদের সাক্ষাতের মূল। আমরা রাস্তার "ম্যাপ" খুলে পথহারাদের পথ বুঝিয়ে দিতে, তাঁরা প্রত্যুপকার স্বরূপ পথসম্বল কয়েকখানি "পাঁউরুটী" দিয়ে বিদায় নিলেন।

হুড্রু জলপ্রপাত

যখন "এঙ্গারা" (২৫৫ মাইল) এসে থানার ইনেস্‌পেক্টর মিঃ প্রেমপ্রকাশ কচ্ছপ মহাশয়ের অতিথি হলুম, তখন বেলা চারটে। এই এঙ্গারা থেকে হুড্রু জলপ্রপাতের রাস্তা বেরিয়েছে; এখান থেকে ১৪ মাইল। বেলা শেষ; হুড্রুর পথে বড় বন জঙ্গল; কাজেই বাধ্য হয়ে এখানেই থাক্‌তে হ'ল।

৮ই অক্টোবর—সকাল সাড়ে ছটায় "হুড্রু" দেখ্‌তে বেরুলুম। District Boardএর রাস্তা; গরুর গাড়ী চলে' চলে' অতি কদর্য্য হয়ে গেছে। যে রাস্তা দিয়ে রোজ কতশত পথিকের যাতায়াত, আর সেই রাস্তার ওপর এখানকার কর্ত্তাদের একেবারেই নজর নেই; এটা বড়ই আশ্চর্য্য। কতবার যে "পপাত ধরণী তলে" হতে হয়েছিল, তা বলা বাহুল্য। এ ভাবে অনেকটা পথ অতিক্রম করে' জঙ্গলের ভেতর প্রবেশ করলুম। দুপাশে দারুণ জঙ্গল; মাঝখান দিয়ে রাস্তা। হঠাৎ আমাদের Bugler মণী খুব জোরে Bugleএ alarm বাজাতে বাজাতে "ব্রেক্" টিপে থেমে পড়্‌ল। আমরাও
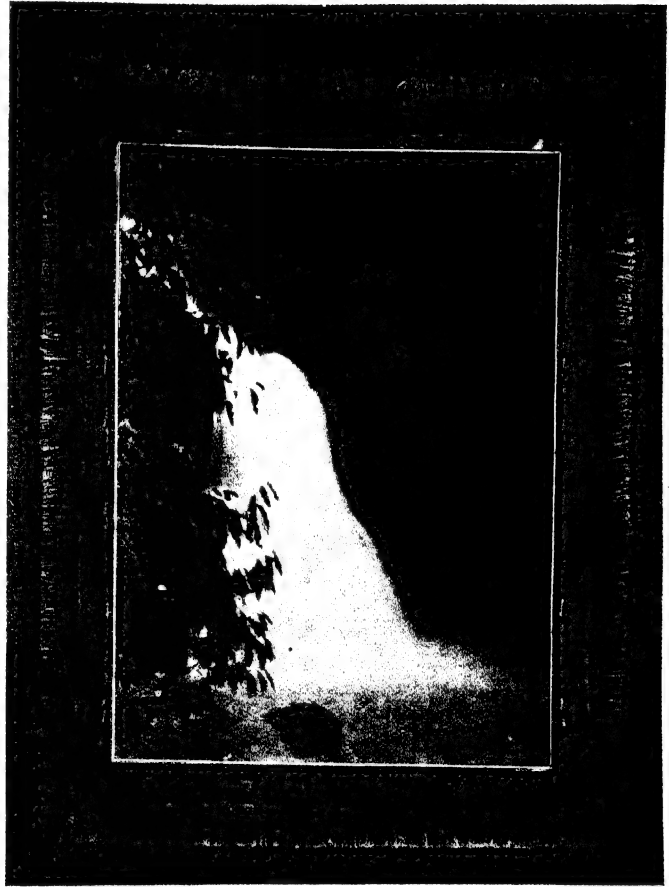
তাড়াতাড়ি Bugleএর স্বর শুন্তে পেয়ে থেমে দাঁড়াতেই দেখি, মণীর প্রায় সাত হাত দূরে একটা প্রকাণ্ড 'হায়না',—বোধ হয় Bugleএর চড়চড়ে আওয়াজে ভয় পেয়ে, পাহাড় কাঁপিয়ে ভীষণ এক গর্জ্জনের সহিত 'লম্ফ প্রদান করে' জঙ্গলের অন্তরালে মিশিয়ে গেল। চকিতে এ ঘটনা হয়ে যাবার পর যদিও আমরা আবার এগুতে লাগলুম, তবুও ভয়ে ভয়ে কেবলই চারিদিকে নজর রাখ্তে রাখ্তে অস্থির হতে হয়েছিল। ১২ মাইল এসে, আর রাস্তা নেই দেখে নেমে পড়লুম। এখানে কতকগুলি জংলীদের কুটীর দেখ্তে পেয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। একটা জংলী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের লম্বা সেলাম দিয়ে বল্লে, "বাবুরো বুঝি ঝরণা দেখ্বি, এখানি তোদের গাড়ী রাখি দে। আট পো রাস্তা চলি যাতি হোবে—হামি তোদের সব নিয়ে যাবো।" আমরা তার ঘরে গাড়ী রেখে দিয়ে তার সঙ্গে যেতে আরম্ভ করলুম। এক মাইল পরে একটী নদী পড়্ল। তা'তে কোমর পর্য্যন্ত জল। সেখানে অনেক জংলী বসে আছে; তা'রা নদী পার করে দেয়। আমরাও নদী পারের অন্য কোন বন্দোবস্ত না দেখে, তাদের কোলে চড়ে পার হয়ে গেলুম। কিছু দূর এগুতেই হুড্রুর ভীষণ গর্জ্জন কাণে আস্তে লাগ্ল। পৌঁছে দেখি, কি এক চমৎকার দৃশ্য! সুবর্ণরেখার বিপুল জলরাশি বিশাল পাহাড়-গুলি ডিঙ্গিয়ে প্রচণ্ড বেগে গুরু গম্ভীর শব্দ করতে করতে একেবারে প্রায় তিন শ' ফীট নীচে বড় বড় পাথরের উপর আছড়ে পড়্ছে। আহা! তার রূপোর মতন সাদা ফেনা, কত উঁচুতে ছড়িয়ে পড়ে "ধোঁয়ায় ভর্ত্তী" মেঘের মত দেখাচ্ছে। তার ওপর সূর্য্যের কিরণ পড়ে "রামধনুর" মত নানা রংএ রঞ্জিত হয়ে কি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করছে। তখন আমরা একটী পাথরের ওপর বসে এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে বিচিত্র ভাবে বিভোর হয়ে রইলুম; কাহারও মুখে কথাটি নেই—সকলেই নির্ব্বাক। কিছুক্ষণ পরে ঝরণার নীচে যাবার মতলব করাতে আমাদের "জংলী" গাইড তাতে বাধা দিলে; কারণ শুনলুম, বৃষ্টির দরুণ পেছল হওয়ায় দুদিন আগে একজন সাহেব নীচে নাম্তে গিয়ে পিছলে পড়ে ইহলোক ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এই ব্যাপার শুনে, নীচে নাম্বার
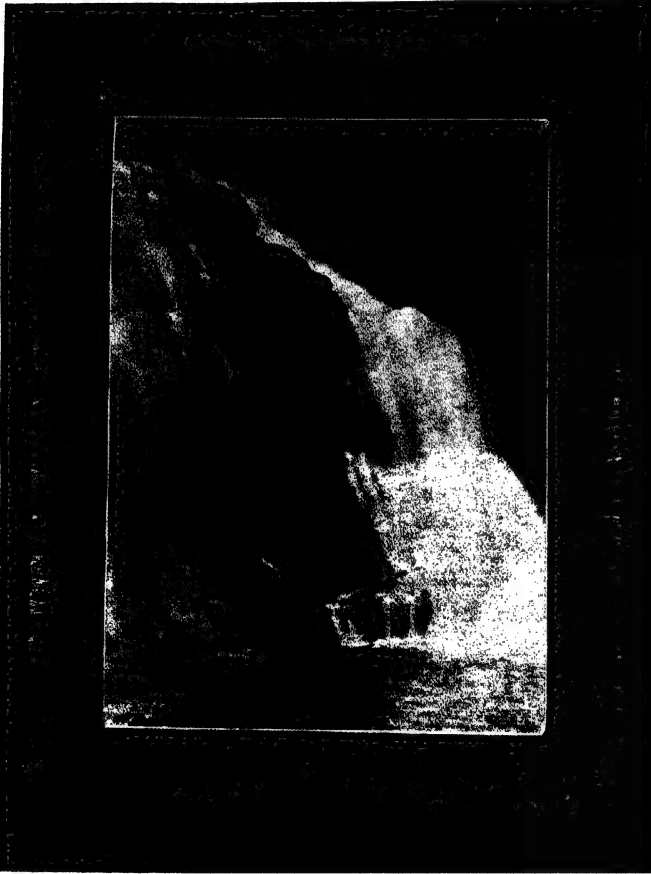
হুড্রু জলপ্রপাতের আর এক দৃশ্য

চেষ্টা না করে হুড্রুর এই বিস্ময়কর শোভা ওপর থেকেই দেখে আশ মেটাতে লাগলুম। সুধু সুধু কুড়ের বাদশার মত বসে থেকে চা'য়ের নেশা চাপল। অদূরে একটী গাছতলায় জহর কিছু শুক্‌নো পাতা ও ডাল নিয়ে উনুন তৈরী করবার চেষ্টা করছে, এমন সময় আমাদের সেই জংলী সঙ্গী বিকট-ভাবে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো,—"বাবো, সাঁপো, সাঁপো!" আর সঙ্গে সঙ্গে জহর ভীষণ এক লম্ফ দিয়ে আমাদের সাম্‌নে এসে হাজির। আমরা ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে গাইড ও রিপোর্টার মহাশয়ের দিকে তাকাতেই দেখি যে, গাছের ওপর "পাইথন" জাতীয় এক প্রকার মস্ত বড় সাপ তার খানিকটা দেহ গাছে জড়িয়ে মুখের দিকটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, জহরলালের মাথার পাঁচ ছ' হাত ওপরে ঘড়ীর "পেণ্ডুলামের" মত দুল্‌ছিল। কি সাংঘাতিক! অজিত আর বিলম্ব না করে তড়াক্‌ করে লাফিয়ে উঠে বন্দুকের এক গুলিতে সাপটাকে ভবপারে পাঠিয়ে দিলে। জংলীর সতর্কতায় জহর আজ নূতন জীবন পেলে।

বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ হুড্রুকে ছেড়ে রেখে, সেই একঘেয়ে বিদ্‌ঘুটে রাস্তা পার হয়ে "এঙ্গারায়" এসে, মিঃ কচ্ছপের কথামত সেখানে স্নানাহার করে, বেলা চারটের সময় রাঁচীর দিকে দৌড়্‌লুম।

তখন বিকেল পাঁচটা, যখন রাঁচী (২৯৮ মাইল) সার্কুলার রোড দিয়ে স্ফূর্ত্তির সহিত আমরা Bugleএর শব্দে মাতিয়ে যাচ্ছিলুম। আমাদের দেখে ছেলে মেয়ে বুড়ো পর্য্যন্ত বাড়ীর বাইরে এসে হাজির। হঠাৎ ডান পাশের একটী ছোট বাংলো থেকে একজন ভদ্রলোক উচ্চৈঃস্বরে আমাদের নাম ধরে ডাক্‌তে, রাস্তায় আস্‌তেই দেখি,—আমার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। তিনি সপরিবারে রাঁচীতে হাওয়া খেতে এসেছেন, তা' আমরা জানতুম না। আমাদের অন্য এক জায়গায় থাকবার কথা হয়েছিল; কিন্তু জামাইবাবুর এই আচম্বিত সাক্ষাতে যে কি রকম সুবিধে হয়ে গেল, বলাই বাহুল্য। এখানে দু' রাত্তির খুব আমোদে কাটালুম। সে বেলা আর কোথাও বেরুন হোল না—জামাইবাবুর কাছে গল্প গুজোবে কেটে গেল।

৯ই অক্টোবর—সকাল সাতটায় উঠে রাঁচী সহর দেখতে বেরুলুম। রাঁচী সহরটী দু'হাজার ফীট উঁচু মালভূমির ওপর। ইহা অতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলি যেমন চওড়া তেমনি গাছপালায় সাজানো। বাড়ীগুলি বেশীর ভাগ "বাংলো" টাইপের ও চারিদিকে বাগানে ভরা। এখানকার আবহাওয়া এত সুন্দর যে, সহরটি এদেশের ছোটলাট সাহেবের গ্রীষ্মাবাসের জন্যে ঠিক করা হয়েছে। এখানকার মোরাবাদী পাহাড় (Temple Hill) ও পাগলদের হাসপাতাল (Mental Hospital) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের একটী সুন্দর উপাসনা-মন্দির ঐ মোরাবাদী পাহাড়ের ওপর আছে। সেই জন্যে কেউ কেউ এই পাহাড়কে "ঠাকুর পাহাড়"ও বলে। পাগলদের হাসপাতাল, মোরাবাদী পাহাড় থেকে কিছু দূরে ও রাঁচী থেকে ছয় মাইল দূরে কাঁকী নামক জায়গায়। এই হাসপাতালে দুটো ভাগ আছে। একটী ভাগে সাহেব

রাঁচীর পথে

পাগল থাকে ও অপর ভাগে দেশীয় পাগল থাকে। সাহেব ও মেম পাগলদের সংখ্যা খুব বেশী নয়; মোট ছশো' আড়াইশো' হবে, কিন্তু দেশীয় পাগল ও পাগলীদের সংখ্যাই বেশী—প্রায় দেড় হাজারের ওপর। শুনলুম্‌—প্রত্যেক মাসে নাকি ৮।১০টী পাগল চিকিৎসায় গুণে ভাল হয়ে যায়। তাদের মধ্যে যারা একটু ভাল হতে থাকে, তাদের কোন কোন কাজে নিযুক্ত করা হয়, যেমন, কাপড় বোনা, জুতো সেলাই, গানবাজনা, লাইব্রেরীতে পড়াশুনা ইত্যাদি। বিকেলবেলায় রোজ, "হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের" ভেতর বেড়াবার জন্যে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কম্পাউণ্ডের চারিদিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা; কারণ, কোন কোন দুরন্ত পাগল সুবিধে পেলেই পালাবার চেষ্টা করে। হাসপাতালের প্রত্যেক "ওয়ার্ড" পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। আজকাল পাগলের চিকিৎসা নতুন ও আধুনিক উপায়ে হয়ে থাকে।

আগেকার মত তাদের বেঁধে রাখা, কি কোন রকম জোর জবরদস্তীতে শাসন করে চিকিৎসা করা বন্ধ হয়ে গেছে। বাস্তবিক, এখানকার কর্ত্তারা অর্থাৎ চিকিৎসকেরা যে কি করে এতগুলো পাগলের সঙ্গে চিরকালটা বাস করেন, তা' বড়ই আশ্চর্য্য। এই পাগলদের সঙ্গে থেকে "পাগলের" চিকিৎসা করা মানে নিজেদেরও পাগল করে তোলা।

যা হোক, এইরূপে রাঁচী সহরটা বেশ ভাল করে দেখে সন্ধ্যা নাগাদ জামাইবাবুর বাড়ীতে ফিরে এলুম।

১০ই অক্টোবর—Bugle ও Revelle বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে সকাল সাড়ে ছ'টায় রাঁচী সহর থেকে বিদায় নিয়ে চাঁইবাসার দিকে রওনা হলুম। রাঁচী থেকে চাঁইবাসা ৯০ মাইল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এখন আমরা কেবল পাহাড়ের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছি। আশেপাশে জঙ্গল। এইভাবে ২৩ মাইল অতিক্রম করে 'খুঁটী'তে, এসে নরেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ীতে একচোট বিশ্রাম নিয়ে, বেলা তিনটের সময় আবার গাড়ীর চাকা দিয়ে রাস্তার কাঁকর সরাতে সরাতে এগুতে লাগলুম। হঠাৎ যেন রাস্তাটা সাম্নে এক পাহাড়ের গায় শেষ হয়ে গেছে মনে হল; কিন্তু কাছে যেতেই দেখি, পাহাড়টা দু' ভাগ হয়ে, রাস্তার দু'পাশ আট্‌কে রেখে, আকাশে মাথা ঠেকিয়ে, অন্ধকার করে রেখেছে। এই গিরিসঙ্কট পনের মিনিট ধরে পার হয়ে আস্‌তেই বনের ভেতর থেকে কতকগুলি জংলী তীর ধনুক বাগিয়ে ধরে আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ এইভাবে তাদের সাক্ষাতে আমরাও না এগিয়ে নেমে পড়্‌লুম। কি জানি, যদি তাদের অব্যর্থ বাণে পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ হয়। পথে কতই জংলী দেখলুম; কিন্তু এ আজ নতুন ধরণের চোখে পড়্‌ল। এদের দেহ বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, রং অতি কালো, পরণে লেংটী কিংবা শর কাঠির বোনা এক রকম কোপ্‌নী বিশেষ; কাঁধে তূণ ও হাতে ধনুক। মাথার চুল বাব্‌রী হয়ে কাঁধে এসে পড়েছে। যা' হোক আমরা এদের সঙ্গে হেসে কথা বলাতে, তারা না বুঝে

"তুলীন্"—সুবর্ণরেখা

হেসাডীর জঙ্গল

আশ্চর্য্যভাবে আমাদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। এ জঙ্গলে বাঘ আছে কিনা জিজ্ঞেস করাতে তারা কেবল হাস্‌তে লাগ্‌ল। হিন্দী, বাংলা ইত্যাদি কোন ভাষায়ই বোঝাতে না পেরে, আমি তখন হামাগুড়ি দিয়ে বাঘের ডাক নকল কর্‌তেই তারা ফূর্ত্তির সহিত চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "হঃ! হঃ! বাঘো মিনাকো—হঃতি মিনাকো—ভলুই মিনাকো" ইত্যাদি। এর মানে এ জায়গায় বাঘ, হাতী, ভাল্লুক ইত্যাদি সবই আছে। এরূপ ইসারায় ও নানা ভঙ্গাতে কথাবার্ত্তা সাঙ্গ করে এদের নিকট বিদায় নিলুম।

প্রায় সন্ধ্যা ছ'টায় একটী ছোটখাটো নদী পার হয়ে সিংভূম জেলায় পড়্‌লুম ও বাঁধগাঁও (৩৫০ মাইল) এসে সেখানকার সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের একমাত্র বাঙ্গালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্র মহাশয়ের অতিথি হলুম। পাহাড়ের ওপর বাঁধগাঁও গ্রামটী ছোটখাটো। ভদ্রলোকের ভেতর ডাক্তারবাবু ছাড়া সবই জংলীর বাস। আমাদের পেয়ে ডাক্তার-বাবুর যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা' বল্‌বার নয়; কারণ ইনি কদাচিৎ বাঙ্গালীর মুখ দেখতে পান। যা'হোক তাঁর এটা বড়ই বাহাদুরী যে, তিনি কি করে এই নির্জ্জন জায়গায় বন্দীর ন্যায় বাস করছেন।

এদেশের জংলীরা হো ও ওরাঁও জাতি। তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেল। তাদের বিবাহপ্রথা ও অতিথি সেবা উল্লেখ-যোগ্য। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের কোন এক নির্দ্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেক লোক জড় হয়। বিবাহার্থী যুবকদের ভেতর যে সকলের আগে গিয়ে সেই মেয়েদের মধ্যে একজনকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, সেই তাকে বিয়ে করে। সেই সময়ে মেয়ের বাপ গরু, মুরগী ও জমী বরের কাছে দাবী করে। যদি বর সেই সব জিনিষ দিতে রাজী হয় তবেই বিয়ে হয়, নচেৎ বিয়ে ভাঙ্গিয়ে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাপ চলে যায়। এদের মধ্যে বিধবা বিয়েও হয়। যে বিধবার ছেলে মেয়ে আছে—তাদের আবার বিয়ের সময়, বরের কাছ থেকে বেশী জিনিষ দাবী করা হয়; কারণ এই সব বিধবা মেয়েদের আদর বেশী—তাদের

হুড্রু পাহাড়ের দৃশ্য

"টেবো" পাহাড়ের ওপর থেকে উপত্যকার দৃশ্য

"সংসারজ্ঞান" আইবুড়ো মেয়েদের চেয়ে বেশী হয়েছে বলে।

এ ছাড়া এরা খুব অতিথিপরায়ণ। সহরের কৃত্রিমতার বিষ এখনও এখানে প্রবেশ করে নি। এরা খুব সরল ও নিরীহ। যদি কোন বিদেশী লোক এদের গ্রামে এসে পড়ে, এরা তার কাছে এসে আলাপ করে ও চাল, ডাল ইত্যাদি দিয়ে একটী নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আশ্রয় দেয়।

১১ই অক্টোবর—ডাক্তার বাবুরও আতিথ্যে আমরা মুগ্ধ হয়ে সকাল সাড়ে সাতটার সময় বাঁধগাঁও ছাড়লুম। কিছুদূর আস্‌তেই ভীষণ খাড়া চড়াই প্রায় আট মাইল ধরে চল্‌ল। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে। কোন জায়গায় রাস্তা এতই সরু ও ঢালু যে, পথ নেই বলেই মনে হয়। রাস্তা কোথাও সাত হাত, কোথাও বা পাঁচ হাত চওড়া। এই রাস্তায় উঠ্‌তে হলে বেশ গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে হয়।

চাকীর জঙ্গলের ভিতর "মেন্‌" রাস্তা

"জনার জঙ্গল"—ঝরণার ওপর পুল
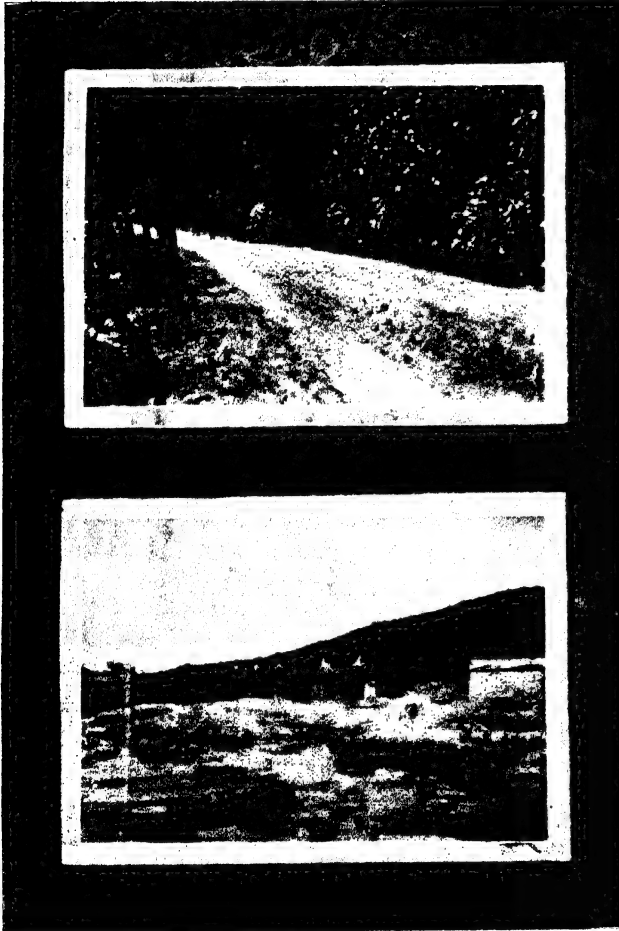
এবার ছোটনাগপুরের নিবিড় জঙ্গল ৫৪ মাইলে (রাঁচী থেকে) আরম্ভ হ'ল। এই ভীষণ পাহাড়ী জঙ্গল ১৯ মাইল রাস্তায় পড়ে। চারিদিকের অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর যে, তা' আমার পক্ষে লেখা শক্ত। যতদূর নজর যায়, কেবল গাছের পর গাছ ফুল ফলে সেজেগুজে দিনের আলোকে অন্ধকার করে কত দিন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে; এবং জায়গাটী এত নির্জ্জন ও নিঝুম হয়ে রয়েছে যে, সেই নির্জ্জনতার ও নিঝুমতার ভেতর দিয়ে আমাদের পথসাথী "বাই-সিকেলের" সর্‌ সর্‌ শব্দ ছাড়া কেবল মাঝে মাঝে দু একটা নাম-না-জানা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ রাস্তা অতি বিশ্রীভাবে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে পাহাড়ের পর পাহাড়, নদীর পর নদী অতিক্রম করে চলেছে। এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে যাবার জন্যে রেলিং ভাঙ্গা কাঠের পুল বাঁধা রয়েছে; পাশে অতল খাদ—ঘোর অন্ধকার! তাকালে মাথা ঘুরে যায়! কোন জায়গায় ছোট ছোট ঝরণা হেলে দুলে পাহাড়ের গা বেয়ে ঐ সব ভীষণ খাদে পড়্‌ছে। আশে পাশে ময়ুর ও হরিণ নিশ্চিন্ত মনে খেলা কর্‌ছে। শুনলুম, এই জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, হাতী ইত্যাদি অনেক রকম হিংস্র জন্তু যখন তখন, যেখানে সেখানে, ঘুরে বেড়ায় এবং মাঝে মাঝে দেশীয় বাইসনও দেখা যায়। যিনি

"জনার জঙ্গল" —গাড়ীটা পিছু হটে আমাদের কাছে উপস্থিত

টেবোর জঙ্গলে সাইকেলে পাম্প করা

"ছুড্রর পথে"— কোলে চোড়ে পার হয়ে গেলুম

ঐ পথে গেছেন, তাঁর সঙ্গেই আলাপ কর্‌তে কেউ না কেউ একবার করে এসেছেন। এমন কি দিনের বেলাও না কি তাঁরা হঠাৎ পরিশ্রান্ত পথিক মহাশয়দের সহিত দেখাশুনা কর্‌তে আসেন। সুতরাং আমরাও সকলে প্রতি মুহূর্ত্তে এরকম একটা মাহেন্দ্র সুযোগের অপেক্ষা কর্‌তে লাগলুম; কিন্তু হায়! আমাদের কপালগুণে তাঁদের মধ্যে আমাদের সঙ্গে Shake-hand কর্‌তে কেউই এলেন না।

এ জঙ্গলে আর একরকম ভয়ানক জানোয়ার আছে। তারা গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। পথিকেরা ক্লান্ত হয়ে গাছ-তলায় বিশ্রাম নেবার জন্যে যখন দাঁড়ায়, তখন লক্ষ্য করে তড়াক্ করে তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। তারা "প্যান্থার" জাতীয় একরকম বাঘ; অনেকটা চিতা বাঘের মত।

এই ভীষণ ১৯ মাইল জঙ্গলের চারটী নাম আছে,—কার্কা, হেসাডী, চাকী ও টেবো। এইরূপে দারুণ চড়াইয়ের পর হঠাৎ আমরা অতল উৎরাইয়ে নাম্‌তে সুরু করলুম। এ উৎরাই অতি ভীষণ—সমানে ১৪ মাইল ধরে চলেছে। সাত আট হাত চওড়া রাস্তাটী হঠাৎ যেন খানিকটা গিয়ে শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু কাছে গিয়েই দেখি, রাস্তাটী এমন বিশ্রী ভাবে বেঁকে ঘুরে গেছে যে, হঠাৎ "ব্রেকের" ওপর নজর না রাখলে, একেবারে কোথায়, কত ফীট নীচে যে পড়্‌তে হবে তার আর চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কোথাও বা রাস্তা এমন হেলে গেছে, দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন সাইকেল শুদ্ধ শুয়ে চলেছে। এই ভাবে হু হু করে, অথচ খুব সাবধানে চলেছি; সহসা দেখি—দূরে, আর একটী পাহাড়ে আমাদের দুই বন্ধু হেল্‌তে দুল্‌তে "বেল্" দিতে দিতে চলেছে। আবার যেতে যেতে খানিকক্ষণ পরে তাদের কথাবার্ত্তা আমাদের ঠিক মাথার ওপর শুন্‌তে পেলুম। দেখি যে, তারা ঐ ভাবে ঘোরা পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছে। এই ভাবে আমরা সাইকেলে "ব্রেক" কষ্‌তে কষ্‌তে অতি ভয়ে ও সন্তর্পণে নীচের সমতলভূমির দিকে নাম্‌তে লাগলুম। এখানকার খাড়াই ও উৎরাই গেল বছরের (১৯২৬) কাশী-ভ্রমণের সময় হাজারীবাগের "ধানোয়া-ভুলুয়া" জঙ্গলের খাড়াই ও উৎরাইয়ের চেয়েও অনেক বেশী। খানিকদূর গিয়ে দেখি, একটী জায়গায় এক ঝাড় আতা গাছ রয়েছে। যেই দেখা, অমনি গাড়ী হতে নামা। ঐরূপ পাকা বড় বড় আতা দেখে আর লোভ সাম্‌লাতে পারা গেল না। জহর ও অজিত তাড়াতাড়ি নিজেদের ছোরা বের করে গাছে কোপ দিতে ছুট্‌ল। কিন্তু—নিরাশ হয়ে দেখি যে, সব আতাই বড় বড় ডেও পিঁপ্‌ড়েগুলোকে আশ্রয় দিয়ে ফুলে রয়েছে। যাক্—আর কি হবে, কোনরকমে কয়েকটী বেছে নিয়ে খাওয়া গেল। ৬২ মাইল-পাথরে (রাঁচী থেকে) আমরা এই নিবিড় বন পেরিয়ে ক্রমশঃ উপত্যকায় নেমে "নাক্‌তী" নামে ছোট একটী গ্রাম পেলুম; সেখানে একটী Inspection Bunglow রয়েছে। বনজঙ্গল পেরিয়ে এসে, পথের ধারে নানা শস্যের ক্ষেত দেখে ও খোলা মেঠো হাওয়া পেয়ে, আমরা হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিন্ত মনে গাড়ী চালাতে লাগলুম। খোলা মাঠে রোদের ঝাঁজ যদিও বাড়্‌ল, কিন্তু ধড়ে যেন প্রাণ এল। এরূপে বেলা বারটায় 'চক্রধরপুরে' এসে হাজির হলুম। এখানে "মেন্" রাস্তার ওপরেই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ঠিকাদার মহাশয়ের বাড়াতে আশ্রয় নিলুম। দুপুরের বিশ্রাম শেষ করে বেলা ৪-১৫ মিনিটে চক্রধরপুর ছেড়ে ৬-৪৫ মিনিটে চাঁইবাসায় (৮০০ মাইল) শ্রীযুক্ত আশুতোষ দুই মহাশয়ের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলুম। এখানেই আজ রাত্তির কাটালুম। ইনি চক্রধরপুরের নগেনবাবুর পিসতুত ভাই। ইনিও ঠিকেদারী করেন। রাত্তিরে খুব আরামে বিশ্রাম নেওয়া গেল।

খেলার পুতুল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৪)

দুপুর বেলা নিজের ঘরটিতে ব'সে সুহাস একখানি কার-পেটের আসনের উপর পশমের ফুল বুনছিল।

গৌরমোহন ঘরের ভিতর এসে ব'ললে—রাঙা বৌদি,' মা আর হরি যে কাল আসছে, আজ চিঠি পেলুম।

বোনার কাজ থেকে চোখ না তুলেই সুহাস বললে—তাঁরা কি বরাবর কাশী থেকেই আসছেন, না আর কোথাও গেছলেন ?

—তাঁরা কাশী থেকে আসবার পথে গয়া হ'য়ে আসছেন।

কারপেটের আর একটা ঘর শেষ করে নিয়ে সুহাস বললে—যাক্, তাহ'লে ন'ঠাকুরপোর কল্যাণে মেজমাসীমার আর কোনও তীর্থই বাকী রইলনা, শেষ গয়া পর্য্যন্ত ক'রে এলেন।

—হ্যাঁ, তাঁর অনেকদিনের সাধ ছিল গয়ায় জ্যাঠাবাবুর পিণ্ডী দিয়ে আসবেন, সে সাধ তাঁর এবার পূর্ণ হ'ল।

—সেদিক থেকে দেখলে তাঁর গয়া যাওয়ার একটা সার্থকতা আছে ব'লতে হবে বটে ; কিন্তু ঐ পিণ্ডী দেওয়ার কি অর্থ আমি বুঝিনি! তুমি কি ওটা বিশ্বাস করো কালোঠাকুরপো ?

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে গৌরমোহন সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে ব'ললে—সেকি রাঙা বউদি! তুমি হিঁদুর মেয়ে হ'য়ে গয়ায় পিণ্ডী দেওয়ার কি সার্থকতা বোঝোনা! গয়ায় পিণ্ডী দিলে যে মৃতব্যক্তির প্রেত-আত্মার সদ্গতি হয়—জানোনা ?

সুহাস অত্যন্ত সহজ ভাবেই বললে—শুনেছি বটে ঐ রকম একটা কি হয়, কিন্তু বিশ্বাস ক'রতে পারিনি!

গৌরমোহন এ কথায় আর অধিকতর বিস্মিত হ'য়ে বললে—এ্যাঁ! বিশ্বাস করতে পারোনা ? সেকি ? কি ব'লছো তুমি—রাঙা বউদি ?

—কি করি ভাই! মানুষ ম'রে গেলে তার আত্মাটা যে গয়ায় পিণ্ডীর মারফৎ সদ্গতি লাভের জন্য অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকে এ কথাটাকে আমি কিছুতেই যুক্তি-যুক্ত বলে মেনে নিতে পারিনি!

গৌরমোহন উত্তেজিত হ'য়ে ব'ললে—কেন ? তুমি কি শোনোনি কত লোক তাদের মৃত আত্মীয়দের কাছ থেকে গয়ায় পিণ্ডী দেবার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছেন ?

সুহাস একটু মৃদু হেসে হাতের কার্পেটখানাকে এবার পাশের মাদুরের উপর নামিয়ে রেখে বললে—আর, আমি যদি বলি তাঁরা যা' বলেন সেটা সত্য নয়, তাহ'লে তুমি কি ব'লবে কালো ঠাকুরপো

গৌরমোহন এবার কাতরভাবে বললে—না রাঙা বউদি, সে হ'তেই পারেনা! মা কখন মিছে কথা বলেন না, তিনি কিছুদিন আগে যথার্থই স্বপ্নে অনুরুদ্ধ হ'য়েছিলেন। জ্যাঠামশাই তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন—

সুহাস গম্ভীর ভাবে ব'ললে—মা যে ভুলেও কখন মিছে কথা বলেন না সে কথা কি আজ তোমার কাছে আমায় জানতে হবে কালো ঠাকুরপো ? আমি তাঁদের সে কথাটাকে ত' মিথ্যে বলিনি, আমি ব'লছি তাঁদের স্বপ্নটা সত্যি নয়!

—তার মানে ?

—তার মানে যে, তাঁরাও এই আমাদের মতো ছেলে-বেলা থেকেই শুনে আসছেন যে গয়ায় পিণ্ডী না দিলে প্রেতযোনি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। তাঁদের আগে আরও অনেকেই যে ঐ রকমের স্বপ্ন দেখেছেন সে গল্পও তাঁরা শুনেছেন। এ ব্যাপারটার উপর একটা অটল বিশ্বাসও আছে। ঠাকুরের গয়ায় পিণ্ডী দেওয়াবার জন্য মেজমাসীমার একটা আগ্রহও ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি অনেকবার আলোচনাও ক'রেছেন ও ভেবেছেনও। কাজেই তাঁর সেই মানসিক উত্তেজনাই একদিন স্বপ্ন হ'য়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়েছিল।

—তাহ'লে, তুমি কি বলতে চাও যে স্বপ্নটা আমাদের মানসিক উত্তেজনার ছায়া ভিন্ন আর কিছু নয় ?

—আমি কেন ব'লবো ভাই। বড় বড় স্বপ্নতত্ত্ববিদেরা স্বপ্নের এই রকম ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকেন।

গৌরমোহন একেবারে হতাশ হ'য়ে ব'ললে—নাঃ, তুমি

দেখ্‌ছি একেবারে নাস্তিক হ'য়ে গেছ! কিছু বিশ্বাস করো না! তবু তুমি বেশী ইংরিজি লেখাপড়া শেখোনি! ইংরিজি পড়লে বোধ হয় খৃষ্টান হ'য়ে যেতে!

সুহাস হেসে উঠে বললে—এ যে তোমার অন্যায় কথা কালো ঠাকুরপো! গয়ায় পিণ্ডী দেওয়ার সার্থকতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে ব'লে আমি অমনি নাস্তিক হ'য়ে গেলুম! তাহ'লে পৃথিবীশুদ্ধ লোক নাস্তিক বলো?—কারণ য়ুরোপ আমেরিকা এরা তো কেউ গয়ায় পিণ্ডী দেয় না!—এবং হয়ত বিশ্বাসও করে না!

—তাদের কথা ছেড়ে দাও। তারা যে ম্লেচ্ছ খৃষ্টান—

—ওঃ! তাহ'লে, তাদের মৃত আত্মাদের আর গয়ায় পিণ্ডী লাভের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না? গয়া বাদ দিয়েই তাদের প্রেতযোনিগুলোর সদ্গতি লাভ হয়! কি বলো?

—তুমি কি যে বলো? তাদের আত্মার বুঝি আবার সদ্গতি আছে?—

সুহাস তেমনিই হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললে—নেই না কি? আমি তা জানতুম না! ওটা বুঝি কেবল হিন্দু-আত্মাদেরই একচেটে!

গৌরমোহন সজোরে সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন ক'রে বললে—নিশ্চয়। শাস্ত্রে যে বলে—কত জন্মজন্মান্তরের পুণ্য-ফলে তবে হিন্দুর গৃহে জন্মলাভ হয়! তার মানে কি?

—তা বটে! বিশেষ করে আবার এই হিন্দু ঘরের মেয়ে হ'য়ে জন্মানোটায়, না?—তা' সে যাহোক্, কিন্তু কথা হ'চ্ছে এখন—ওদের মৃত-আত্মাদের কি পরিণাম হয় তাহলে—?

গৌরমোহন অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে বললে—কি আবার হবে! প্রেতযোনিতেই পড়ে থাকে, ওদের সেই বাইবেলের 'শেষ বিচারের' দিন পর্য্যন্ত!

—ঠিক বলেছো কালো ঠাকুরপো!—সেই জন্যই ক্রমশঃ পৃথিবীতেও প্রেতের ভীড়টা এতো বেড়ে উঠ্‌ছে! প্রেত-লোকে ওদের আর ধরছে না কি না!—এই ব'লে সুহাস হতাশ ভাবে পাশ থেকে কার্পেটের আসনখানাকে আবার কোলের উপর টেনে নিলে। একটু সেটাকে নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, এই ফিকে সবুজ আর আশ্‌মানী রংয়ের সঙ্গে আর কি রং বেশ 'ম্যাচ্' করবে ব'ল্‌তে পারো?

গৌরমোহন একটু ইতস্ততঃ করে ব'ললে—কে জানে ভাই, ব'লতে পারিনি! আমার আবার ওসব রং-ঢংএর মিল সম্বন্ধে কোনও 'আইডিয়া' নেই। আমি একেবারে রং-কাণা!

সুহাস মৃদু হেসে বললে—'ঢং' না হয় না জান্‌তে পারো, কিন্তু 'রং'টা জানা উচিত ছিল! আচ্ছা, আমি এই যে ফুল বুনেছি—এ ফুলগুলো কি চিনতে পার? কি ফুল বলো দেখি?—

গৌরমোহন অনেকক্ষণ ফুলগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—পদ্ম বলেই যেন মনে হ'চ্ছে—কিন্তু ঠিক পদ্ম তো নয়! কি ফুল বউদি! তুমি বলোনা! স্থল-পদ্ম বোধ হয়, না?

—না, স্থলও নয়, জলও নয়; এ গুলো আশ্‌মানী-পদ্ম!

—সে আবার কি? আশ্‌মানী পদ্ম বলে কোনও ফুল আছে না কি?

—আছে, অমরাবতীর নন্দনকাননে—

—অর্থাৎ তোমার মনের সরোবরে! কি বলো?

—এই যে বাঃ! তোমার মধ্যেও কবিত্ব আস্‌ছে দেখ্‌ছি!

—আস্‌বে না? কি রকম লোকের চেলা হ'য়েছি বলো? তোমার ছোঁয়াচ একটু লাগবে বৈ কি?

—একটু লাগলে দোষ নেই; কিন্তু খুব সাবধান—বেশী না লাগে! তাহ'লে দাগী হ'য়ে যাবে—কিন্তু!

—হই হবো—তাতে ভয় করিনে!—ব'লেই গৌরমোহন গুঞ্জন ক'রে গেয়ে উঠ্‌ল—

"আমি তোমার দাগে হবো দাগী!"

সুহাস মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। মুখে ঈষৎ হেসে বললে—দোহাই তোমার, চুপ করো কালো ঠাকুরপো! আমি সব অত্যাচার সইতে পারি, কিন্তু এই বেসুরো গান গাওয়া আমার অসহ্য!

গৌরমোহন লজ্জায় গান বন্ধ ক'রে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল, মনে মনে বললে—ত' তোমার মতো সবাই যদি এখন ঠিক্ সুরে না গাইতে পারে! তার পর, কথাটাকে যেন চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, রাঙা বৌদি! এতদিন ধ'রে এত যত্ন ক'রে এই যে চমৎকার আসনখানি বুন্‌ছো—এ কোন্ ভাগ্যবানের জন্যে?

—বলো দেখি আন্দাজ করে!

—বল্‌বো ?···তোমার ন'ঠাকুরপো'র জন্তে !

—না, পারলে না !

গৌরমোহন এই কথাটাই শুন্‌তে চাইছিল। তার বুকের ভিতরটা আনন্দে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল! সে উৎসাহিত হ'য়ে উঠে ব'ললে—তাহ'লে নিশ্চয় আমিই সেই ভাগ্যবান!

সুহাস হাসতে হাসতে বললে—পাগল! তোমাদের দুই ভা'য়ের মধ্যে একজনকে এটা দিয়ে কি শেষ বাড়ীতে আমি একটা শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ বাধাবো ?

গৌরমোহনের মুখখানি ম্লান হ'য়ে গেল! সে অনেকক্ষণ আর কোনও কথা ব'লতে পারলে না!

তার এই ভাবান্তরটুকু সুহাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অগোচর রইল না! সে বললে—তোমার কি এই আসনখানা খুব পছন্দ হ'য়েছে ?—তা তোমায় আমি ঠিক এই রকম আর একখানা বুনে দেবো ভাই, রাগ করোনা—এখানা দিতে পারবোনা! এখানা আমি যে আমার দাদাকে দেবো বলে তাঁর নাম ক'রে বুন্‌ছি! এবার ভাইফোঁটার দিন আমি তাঁকে এই আসনখানি পেতে বসিয়ে নিজের হাতে সব রেঁধে খাওয়াবো ঠিক করিছি!

গৌরমোহন ব'ললে—হাঁ হাঁ, সেই ভালো; যোগ্য লোকের পূজায় লাগবে। আমরা আসন নিয়ে কি ক'রবো ভাই, আমরা তো—আমরা তো আর জমীদার নই! আমাদের পৈতৃক কাঠের পিঁড়িই যথেষ্ট! আমরা কি আর তোমার হাতে বোনা আসনে বসবার উপযুক্ত!

গৌরমোহনের কথার মধ্যে অভিমান ও শ্লেষ যথেষ্ট পরিমাণে থাক্‌লেও সুহাস এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়ে নীরবে আবার হাতের আসন বোনায় মন সন্নিবিষ্ট করলে!

গৌরমোহন একটা কিছু উত্তরের প্রত্যাশায় সুহাসের মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে যেন অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠে বললে—আবার যে আসন নিয়ে ব'সলে! ব্যাপার কি তোমার ? বেলা যে পড়ে এলো এদিকে ? খাওয়া-দাওয়া হ'য়েছে তো ? না আজ আসন বুনেই দিন যাবে ?—

সুহাস উদাসভাবে বললে—আজ আমাদের খেতে নেই!

সেদিন যে একাদশী এ কথাটা গৌরমোহনের স্মরণ ছিল না। সে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে প'ড়ল। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ প্রশ্ন ক'রলে—আচ্ছা রাঙা বউদি, তুমি তো দেখতে পাই কিছু মানোনা—তবে একাদশী করো কেন ?

সুহাস এই প্রশ্নের উত্তরে খানিকটা ভেবে বললে—তোমাদের ভয়ে ভাই!

—আমাদের ভয়ে ? এ আবার তোমার কি কথা বউদি ?

—একাদশী না ক'রলে তোমরা কি আমাকে ঘরে ঠাঁই দেবে ? বাড়ীশুদ্ধ সবাই মিলে একসঙ্গে নিন্দার এমন একটা ঐক্যতান সুরু করবে যে আমার এখানে তিষ্ঠানো দায় হবে!

—তাহ'লে একাদশীর মাহাত্ম্য তুমি সত্যই স্বীকার করোনা ?

—ও বাবা! তা আবার করি না ? খুব করি! না ক'রে যে আমাদের উপায় নেই! প্রতি একাদশীর দিন তার মাহাত্ম্যটা বেশ হাড়ে-হাড়ে বুঝ্‌তে পারি যে!

—ওই তো তোমার দোষ! তুমি সব কথাই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দাও। বলি, একাদশী করার যে একটা সুফল আছে—সেটা মানো কি ?

—সুফল আছে মানি, কিন্তু সেটা কেবল বৃদ্ধ ও রোগীদের পক্ষে! যারা সুস্থ, সবল, তরুণ, যাদের প্রতিদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত কায়িক পরিশ্রম ক'রতে হয়, তাদের কেবলমাত্র বৈধব্যের অপরাধে একাদশীর কঠিন দণ্ড ভোগ করবার কোনও প্রয়োজন নেই, একথা আমি জোর ক'রে বলতে পারি!

গৌরমোহন একবার ক্ষীণ আপত্তির সুরে ব'লতে গেল—কিন্তু, একাদশীর স্বপক্ষে যে সব প্রবল ও অকাট্য যুক্তি—

বাধা দিয়ে সুহাস বললে—প্রত্যক্ষ জীবনে ব্যবহার ক'রে দেখা যাচ্ছে যে সেগুলো প্রবল বটে, কিন্তু অকাট্য মোটেই নয়!

গৌরমোহন আর কিছু বলতে পারলে না। এই তেজস্বিনী মেয়েটির নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা ও অকুণ্ঠ ব্যবহারের কাছে সে বার বার পরাজয় স্বীকার ক'রতো। তার আজন্মের যা কিছু সংস্কার, যা কিছু বিশ্বাস—সবই যেন এর সঙ্গে তর্ক করতে বসলে একেবারে ওলোট-পালোট হ'য়ে যেতো! তার ভিত্তি পর্য্যন্ত এমন ন'ড়ে যেতো যে গৌরমোহন আর কিছুতেই তাকে আঁকড়ে ধ'রে স্থির রাখতে পারতো না! যে বিশ্বাস সে হারাচ্ছিল তার জন্ত সে মনের মধ্যে একটা কেমন আশঙ্কা বোধ করতো, কিন্তু তবু, তর্কে হেরে সে যেন

প্রতিবারই একটা মুক্তির আনন্দ পেতো! তাই যখন তখন তার মনের সন্দেহগুলোকে নিয়ে সে আসতো তার রাঙা-বউদির সঙ্গে তর্ক করে তার সত্য যাচাই করে নিতে! অথচ, মান্যে বউদিদি হ'লেও, বয়সে সুহাস গৌরমোহনের চেয়ে পাঁচ ছ' বছরের ছোট!

গৌরমোহন আর হরিমোহন দু'জনে খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই। এদের সামান্য কিছু জমীজমা আছে, তারই আয় থেকে সংসার চলে। গৌরমোহনের বিবাহ হ'য়েছে, কিন্তু হরিমোহন বিবাহ করেনি। কিছুদিন আগে সে রেলে একটা চাকরী পেয়ে তাইতে ঢুকে পড়েছিল। বিষয়কর্ম্ম দেখার ভার বড় ভাই গৌরমোহনের উপরই ন্যস্ত ছিল। সম্প্রতি রেলের কর্ম্মচারী হিসাবে বিনা ব্যয়ে দেশ ভ্রমণের 'পাশ' বা ছাড়পত্র পেয়ে হরিমোহন মা'কে নিয়ে তীর্থ করাতে গেছে।

এরা দুই ভাই-ই অল্প বয়সে মাতৃহীন হ'য়েছিল। জ্যাঠাইমা সারদাময়ী ছিলেন নিঃসন্তান, তিনি এদের দু'জনকেই নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন। তাই বাল্যকাল থেকেই সারদাময়ীকে এরা 'মা' বলে ডাকে এবং মায়ের মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে।

সারদাময়ীর কনিষ্ঠা ভগ্না মঙ্গলাময়ী ছিলেন দরিদ্রের পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যখন নিরুপায় হ'য়ে পড়লেন তখন ছেলেদের বলে সারদাময়ী তাকে নিজের কাছেই এনে রেখেছিলেন।

সুহাসের শাশুড়ী অন্নদাময়ী ছিলেন সারদাময়ীর জ্যেষ্ঠা সহোদরা। তাঁর অবস্থা বেশ ভালই ছিল। বিধবা পুত্র-বধূকে নিয়ে তিনি সচ্ছল অবস্থাতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করছিলেন; কিন্তু তাঁর সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল। মৃত্যুকালে সারদাময়ী যখন তাঁর দিদিকে দেখতে গেছলেন তখন অন্নদাময়ী তাঁর বিধবা পুত্রবধূ সুহাসের ভার সারদাময়ীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েই চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন।

সুহাসকে নিয়ে সারদাময়ী যেদিন তাঁর সজল চক্ষু অঞ্চলাবৃত ক'রে ফিরে আসেন, মঙ্গলাময়ী সেদিন তেমন প্রসন্ন মনে এই বালবিধবা বধূটিকে গ্রহণ ক'রতে পারেন নি! তাঁর আশ্রয়টুকুর আবার একজন অংশীদার এসে জুটল এই ভেবেই তিনি সুহাসের উপর বিরূপ হ'য়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর সে বিরাগ সুহাস এত দিনের প্রাণপণ চেষ্টাতেও দূর ক'রতে পারেনি।

সুহাস আসবার আগে সারদাময়ীর সংসারের ভার সমস্ত মঙ্গলাময়ীর উপরই ন্যস্ত ছিল। বার্দ্ধক্য বশতঃ সারদাময়ী নিজে আর এখন সংসারের কাজকর্ম্ম কিছু ক'রে উঠতে পারতেন না। ছোট বোন মঙ্গলাই সব দেখতেন-শুনতেন, করতেন-কর্ম্মাতেন। কিন্তু সুহাস আসবার পর থেকে মঙ্গলাময়ীকে কেবল তত্ত্বাবধানটুকু ছাড়া আর কিছুই করতে হ'ত না। সংসারের সব কাজের ভার সুহাস একে একে নিজের স্কন্ধেই তুলে নিয়েছিল। সাংসারিক সকল বিষয়ে এই মেয়েটির কার্য্যতৎপরতা ও নৈপুণ্য এমনিই অসাধারণ ছিল যে মঙ্গলাময়ী শত চেষ্টাতেও তার কাজে কোনও দোষ ত্রুটীর ছল ধ'রতে পারতেন না। সুহাসের উপর রাগের তাঁর আর একটা প্রধান কারণই ছিল এই যে—নিঃশব্দে মুখ টিপে এ মেয়েটা সমস্ত কাজ এমন নিখুঁৎ ক'রে সম্পাদন ক'রতো যে তিনি তাকে কখন কিছু বলবার অবকাশই পেতেন না! এর কঠিন নিস্তব্ধতার কাছে তাঁর সমস্ত তর্জ্জন গর্জ্জন যেন একেবারে নিষ্ফল হ'য়ে যেতো! আর একটা বিপদ হ'য়েছিল এই যে বাড়ীর ছেলে দু'টি আর গৃহিণী সারদাময়ী নিজে এবং এমন কি এই সে দিনের বউ ঐ বিজলী পর্য্যন্ত হ'য়ে প'ড়েছিল এই নবাগতার একান্ত বাধ্য ও অনুগত। সুহাসের এত বড় অপরাধটা মঙ্গলাময়ী যেন কিছুতেই ক্ষমা ক'রতে পারছিলেন না!

তাই আজ একাদশীর উপবাস-ক্লিষ্ট দেহটাকে দীর্ঘ দিবা-নিদ্রার কোলে বিশ্রাম দিয়ে তিনি যখন উঠে এসে দেখলেন দেওর ভাজে দিব্যি নিরিবিলি ব'সে গল্প ক'রছে—এ দৃশ্য তাঁর চোখে একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠল! তিনি তীব্র ঝঙ্কার দিয়ে বললেন—হ্যাঁগা বউমা, বলি, একাদশী কি আর কেউ করেনা বাছা? সারা দিনটা কি ব'সে ব'সেই কাটাবে? গল্প যে আর ফুরোয় না?

মাসীমার উগ্র মূর্ত্তি দেখে গৌরমোহন আস্তে আস্তে উঠে পাশের একটা দরজা দিয়ে অন্যত্র পালালো। মাসীমা তখন সুহাসকে ডেকে বললেন—এই কাঁচা বয়স নিয়ে ওই সব সোমোত্ত দেওরের সঙ্গে সারাদিন একলাটি ঘরে বসে গল্প করাটা কি ভালো! লোকে যদি দুর্নাম রটিয়ে দেয় তাহ'লে দাঁড়াবে কোথা? আগুনের কাছে কি ঘী থাকে?

কথাটা শুনে সুহাসের সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল। তবু সে প্রাণপণে অধর-কোণে একটু প্রাণহীন বিবর্ণ হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে বললে—হ্যাঁ! এ দেশে ওইটের চেয়ে সহজ প্রাপ্য আর কিছু নেই বটে! তা দুর্নাম যদি এতে আমার রটেই মাসীমা, তাহ'লে সেটা আর যাই হোক্, সম্পর্ক-বিরুদ্ধ যে হবে না এইটুকুই রক্ষে—কি বলেন?

মঙ্গলাময়ী ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে বললেন—ও মা! কি নিঘৃণ্যে মেয়ে তুই!—আর সম্পর্কের কথা তুলিসনি বাপু! সম্পর্ক ত ভারি! যে যেখানে ছিল সব ত' পুড়িয়ে খেয়ে পেটে পুরে—ঢুকেছিস এসে মাসশাশুড়ীর বাড়ী, লজ্জা করে না সম্পর্ক ধ'রে বড়াই ক'রতে? আমাদের এই দুধের বাছা দুটোর মাথা আর চিবিয়ে খাস্‌নি, রাক্কুসী বিদেয় হ'লেই বাঁচি!

সুহাসের চোখ মুখ সহসা কঠিন হ'য়ে উঠলো। সমস্ত শরীর তার কি যেন একটা অসহ্য আঘাতে নিস্পন্দ হ'য়ে গেল। আপনার সমস্ত শক্তি একত্র করে সে নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা ক'রতে লাগল, উপরকার দাঁত কটি দিয়ে সে তার নীচেকার ঠোঁটটি এমন সজোরে চেপে ধরলে যে তার ঠোঁটের উপরটা কেটে দাঁত একেবারে বসে গেল, কিন্তু তবু সে নিজেকে সামলাতে পারলে না। সেইখানেই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল!

মাসীমা চীৎকার ক'রে উঠলেন—ওরে গৌর, একবার শীগ্‌গির এদিকে আয় বাবা, দেখে যা, এ ছুঁড়ী আবার কি নোতুন ঢং সুরু করলে! ফুলের ঘা'য় মূর্চ্ছা যায় দেখছি!—মৃগীর ব্যামো আছে বোধ হয়!

গৌরমোহন নিকটেই ছিল, মাসীর মিষ্ট সম্ভাষণ কতকটা তারও কাণে গেছল। সে ছুটে এসে পড়ল। সুহাসের 'ফিট্' হ'য়েছে দেখে শশব্যস্তে সে তার চোখে মুখে খুব জল আছড়া দিতে লাগল! তারপর দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘর থেকে "স্মেলিং সল্টের" শিশিটা এনে সুহাসের নাকের কাছে ধ'রলে।

মাসী ব'লতে যাচ্ছিলেন—ও সব নষ্টামী—ভিরকুটি—

গৌরমোহন ধমক্ দিয়ে বলে উঠলো—তুমি যদি চুপ ক'রে না থাকতে পারো এখান থেকে চলে যাও। তোমার জন্যে কি আমরা সবাই জব্দ হবো?—বৌদিকে তুমি যে সব কথা বলেছো, তার কতক কতক আমিও শুনেছি—বৌদি জীবনে কখন কারুর কাছে ও রকম অপমানের কথা শোনেনি. বেচারা তাই সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে! ওর দাদার কাণে এসব খবর পৌছলে তিনি যে কি ক'রবেন—কার মাথা নেবেন আমি শুধু তাই ভাবছি!

ভয়ে মঙ্গলাময়ীর মুখ একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেল! তিনি মনে মনে আতঙ্কে যেন শিউরে উঠলেন। ভাবতে লাগলেন—তাই ত, ভারী অন্যায় হ'য়ে গেছে ত'! এ কথা তো তাঁর মোটেই মনে ছিল না যে ছুঁড়ীটে নেহাৎ নিরুপায় ভেতুড়ে নয়!...তিনি একেবারে কাতর হ'য়ে বলে উঠলেন—তাই ত' বাবা গৌর, ওর দাদার কথা ত' আমার একটুও খেয়াল ছিল না! এখন কি হবে বাবা! তুই যা হয় একটা কিছু উপায় কর। অনেক অ-কথা কু-কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে—শুনলে হয়ত তারা আমায় আর আস্ত রাখবে না!—জমীদারের পাইক এসে বেঁধে নিয়ে গেলে আমি কিন্তু আর এ বয়সে বাঁচবো না! আর তাতে তোমাদেরও তো মাথা হেঁট হবে বাবা!

সুহাসের একটু একটু ক'রে জ্ঞান ফিরে আস্‌ছিল। গৌর বললে—মাসীমা, যদি বাঁচতে চাও তাহ'লে এই বৌয়েরই হাতে পা'য়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নাও! আমায় বলা বৃথা!

এই সময় সুহাস অল্প সুস্থ হ'য়ে উঠে হাতের ইঙ্গিতে ওদের দু'জনকেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললে।—

গৌরমোহন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মাসীর একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে ঘর থেকে বার করে নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে এলো, তখনও সুহাস ঘর থেকে বেরোয় না; তুলসী-তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দেওয়া হয়নি, ঘরে ঘরে ধুপ-ধুনা পড়ল না, শঙ্খধ্বনি হ'ল না। এদিকে পাড়ার শিবমন্দির থেকে আরতির বাজনা শোনা যাচ্ছে। মঙ্গলাময়ী একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠলেন। অথচ বউমাকে ডাকতে যেতেও তাঁর সাহসে কুলাচ্ছিল না; তখন নিজেই অগ্রসর হ'য়ে আস্তে আস্তে সব কাজ সারলেন। তারপর এ বেলার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ভাতটা চড়িয়ে দিয়ে তিনি আর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকতে পারলেন না; বৌমার সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল একেবারে অদম্য হ'য়ে উঠলো। তাঁর মনে হ'ল হয়ত ছুঁড়ীটে আবার ভিরমি গেছে—ঘরের ভিতর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে! নইলে সংসারের কাজে তো সে কোনও দিনই এমন গা'ফেলতি করে না! তিনি পা টিপে টিপে সুহাসের ঘরে এলে উঁকি

মেরে দেখলেন—ঘর অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা যেন চাপা কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—ফিরে গিয়ে তিনি একটা আলো হাতে ক'রে নিয়ে এলেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে যে ব্যাপার তাঁর চ'খে পড়'ল তাতে তিনি একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। দেখলেন বউমা উপুড় হ'য়ে পড়ে একেবারে ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

প্রদীপটাকে পিলসুজের উপর রেখে তিনি সুহাসের কাছে গিয়ে বসলেন। আদর ক'রে ডেকে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে চুপ করবার জন্য মিনতি করতে লাগলেন। নিজের অন্যায়ের জন্য কাতরভাবে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। কিন্তু সুহাসের কান্না যেন কিছুতেই আর থামতে চায় না! সে মুখে বলছিল বটে—না মাসীমা, আমি কিছু মনে করিনি, আপনি কেন অত লজ্জিত হ'চ্ছেন? কিন্তু তার দুই চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরে প'ড়ছিল!

মঙ্গলাময়ী আপন বস্ত্রাঞ্চলে একাধিকবার সুহাসের চোখের জল মুছিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই সে অশ্রু-উৎসের গতিরোধ করতে পারলেন না! তিনি শেষে হতাশ হ'য়ে বললেন—আজ এই একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস ক'রে তুমি যদি এমন ক'রে চোখের জল ফেল মা, তা হ'লে আমার অপরাধ যে বাড়তেই থাকবে!

সুহাস একটু ম্লান হেসে বললে—ও কিছু নয় মাসীমা; আমার অমন মাঝে মাঝে হয়! ফিট হবার পর, কেবলই চোখ দিয়ে জল পড়ে, এ কান্না নয়, আপনি ভাববেন না।

মঙ্গলাময়ী মনে করলেন—তাই হবে বা! এও হয়ত বৌমার একটা রোগ! তিনি তখন সুহাসের দুটি হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বললেন—তা হলে আমায় শুধু এই ভরসাটুকু দে মা, যে তোর দাদার কাণে এ সব কথা উঠবে না!

সুহাস চম্‌কে উঠ্‌ল! দাদার নাম উল্লেখ হবা মাত্র তার মনে পড়ল' আর একদিনের কথা;—সেদিনও এমনি কান্নাই সে কেঁদেছিল—যেদিন সত্যেনের মা মৃত্যুশয্যায় তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—সু' সতুকে আমি তোর ভরসাতেই ফেলে রেখে চল্‌লুম। ওর জন্মদাতার নির্ব্বুদ্ধিতায় জন্যে যে স্বর্গ থেকে ও আজ বঞ্চিত হ'ল, দেখিস মা, তার ক্ষোভ যেন কোনও দিন ওকে নরকের দ্বারে না ঠেলে নিয়ে যায়।

মঙ্গলাময়ী সুহাসকে নীরব থাকতে দেখে প্রমাদ গুণলেন। প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—ওরে তোর এই রাঁড়ি-ভুঁড়ি দীন-দুঃখী বুড়ো মাস্‌শাশুড়ীকে কি জমীদারের পাইক বরকন্দাজ ধ'রে-নিয়ে গিয়ে বেইজ্জৎ করবে! সেইটে কি ভাল হবে? দোহাই বউমা, তাকে কিছু জানিও না—আমার মাথা খাও, বলো বলবেনা—

সুহাস ধীরভাবে বল'লে—মাসীমা, এই সব ছোট কথা কি পুরুষমানুষদের কাণে তুল্‌তে আছে? তোমাদের কাছে এতদিন থেকেও কি আমার এ শিক্ষাটুকু হয়নি মনে করো?

মঙ্গলাময়ী এতক্ষণ পরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ব'ল্লেন—আঃ, বাঁচালি মা, আমার যে ভয় হ'য়েছিল সে আর তোকে কি ব'লবো! আমি তাহ'লে যাই মা, এইবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভাতের ফ্যান গালিয়ে ফেলিগে—অনেকক্ষণ ভাত চাপিয়ে এসেছি কিনা—

সুহাস অপ্রতিভের মতো তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে বললে—আমায় মাপ ক'রো মাসীমা—বড্ডই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলুম, তাই এতক্ষণ কোনও কাজে হাত দিতে পারিনি, চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই—

মঙ্গলাময়ী খুব জোর করেই আপত্তি জানিয়ে বললেন—না মা, না, আজ থাক্! ওতো আছেই বারমাস! আজ আর একাদশী ক'রে তোমাকে সারাদিনের পরে আগুন তাতে গিয়ে ঢুকতে হবে না—তোমার আবার যে রকম মাথা ধরার ব্যামো আছে—আজ আর উঠে কাজ নেই—

—তা হোক্—একাদশী তো তুমিও করেছো মাসীমা!—এই কথা বলে সুহাস উঠে পড়ল, এবং এক রকম জেদ্ করেই যেন মঙ্গলাময়ীর সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চল্‌লো। কিন্তু তখনও তার পা' টল্‌ছে! যেতে যেতে তার চোখে পড়ল—কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রে কালো আকাশের বুকের উপর এক একটা নক্ষত্র আজ যেন কেমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিয়েছে!

সেই ভরা-সন্ধ্যার আঁধার যবনিকার অন্তরালে সারা গ্রামখানাই তখন ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হ'য়ে এসেছিল।

(ক্রমশঃ)

কবিওয়ালা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

রঘুনাথ দাস

রঘুনাথ দাস একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা। গুপ্ত কবি ইহাঁকে লালুনন্দলাল ও রামজীদাসের সম-সাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। লালুনন্দলাল যেমন নিতাই বৈরাগীর এবং রামজীদাস ভবানী বেণের গুরু বলিয়া পরিচিত, রঘুও তেমনি সুপ্রসিদ্ধ হরু ঠাকুরের গুরু-রূপে খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালা ১১৪৫ সালে হরু ঠাকুরের জন্ম, সুতরাং রঘুনাথ দাস বাঙ্গালা এগার শত পনের বা কুড়ি সাল হইতে এগার শত সত্তর পঁচাত্তর সালের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন, আন্দাজ করা যাইতে পারে। কাহারো কাহারো মতে ইনি জাতিতে তন্তবায় ছিলেন। একটী গানে ইনি নিজেকে "সিমলেবাসী অধ্যাপক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কলিকাতা সিমুলিয়ায় ইহাঁর নিবাস ছিল।

ইতিপূর্ব্বে লালুনন্দলালের পরিচয় দান প্রসঙ্গে লালুর একটী গানে বীরভূম জেলার মুড়মাঠ গ্রামের কবিওয়ালা কালো পালের নাম পাওয়া গিয়াছে বলিয়াছি। কালো পাল যে জাতিতে সৎগোপ ছিলেন, ঐ গানের মধ্যে সে পরিচয়ও আছে। রামজীদাসের গানে যে চাষাকে লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রুপ আছে, সে চাষাও যে কালো পাল ইহাই আমাদের বিশ্বাস। রঘুনাথ দাসের একটী গানেও কালো পালের নাম এবং জাতিতে পাল যে চাষা ছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। লালুনন্দলাল কি জাতি ছিলেন জানা যায় না। তাঁহার একটী গানে প্রতিপক্ষ কালো পালের স্ত্রীকে উল্লেখ করিয়া কাপড় বোনা শিক্ষা দেওয়ার কথা আছে—

"চাষাণী তোরে কাপড় বোনা শিখাব ভাল ক'রে,
সরু কাপড় বুনিব * * * * ভিতরে।"

লালুর আর একটী গানে কালো পালের স্ত্রীকে ভেক দিয়া বৈষ্ণবী করিয়া কেন্দুবিল্ব প্রভৃতির মেলায় লইয়া যাওয়ার কথা আছে। ইহা হইতে এমন অনুমানও করা যায় যে, কোনো সময়ে কালো পাল লালুর সাথী রঘুনাথ দাস ও রামজীদাসের জাতির উল্লেখ করিয়া হয়তো কিঞ্চিৎ গালাগালি দিয়াছিলেন; লালু সহচরগণের সম্মান-রক্ষার্থে ঐ দুইটী গানে তাহারই পাল্টা জবাব দিয়াছেন। আমরা রঘুর দুইটী গান এখানে তুলিয়া দিলাম; এই গানেই কালো পালের নাম, জাতি ও রঘুর সিমলা বাসের উল্লেখ আছে।

(১)

"আছে চতুর্ব্বর্ণের লোক তোমারি সভায়,
করেছি জয় তোমাকে নতুন সমস্যায়।
ছিষ্টিধর যারা, কোথা সব তারা,
আনিতে ভানবতী কন্যা করেনা ত্বরা,
তুমি সুবোধ শান্ত বুদ্ধিমন্ত সামান্য ভূপতি নও।
আর কি ভোজরাজা কথা কও,
তুমি কন্যা দিয়ে শ্বশুর হও,
ক'রে হেট্ট মাথা কেনে সভার মধ্যে রও।
নতুন শোলোক শুনিলে বিস্তর লোক,
ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা হলে ডুবিবে পরলোক,
শুভদিনে শুভক্ষণে শুভ কর্ম্ম করে নাও।
তোমার যে অবধি বুদ্ধি সাধ্যি করোনা কসুর,
আমি তোমার জামাই তুমি হও আমার শ্বশুর,
কাল পাল আমার শ্বশুর বলি অতঃপর,
পালের বেটা সুমুন্দি ভানবতীর সহোদর,
এরা চারজনে, আসুক এখানে,
আনিতে কও সভার মাঝে তুমি সে জনে,
আগে করেছ প্রতিজ্ঞা তাহা দিয়ে থুয়ে সব ঘুচাও।
তুমি কাল-অতীত কর যত আমার কি তার খেতি,
বিচারে হেরেচ দিতে হবে যে ভানবতী,
তোমার দশ দিকে দশ জনেতে দিচ্ছে টীট্‌কারী,
ইথে ক'রে লজ্জা কি হয়না তোমারি।

ওহে ভোজপতি তুমি দুর্ম্মতি,
যোগ্যা হয়েচে তোমার কন্যা ভানবতী,
ইহার বিহিত কর নৃপবর কেনে তাহার জ্বালা সও।
কয় রঘুনাথে কি উৎপাতে পড়িল ভোজরাজন্,
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল ভক্তি আর ভাজন
তুমি জান যদি মনে কন্যা দিবনা তোকে,
তবে কেনে প্রতিজ্ঞা করেছ মুখে।
জয় গো মহারাজ, কল্লে ভাল কাজ,
রঙ্গ এই দেখে তোমার পেলাম বড় লাজ,
পূর্ব্বে আছ প্রতিশ্রুত এখন কেনে মুখ লুকাও"।

(২)

"ভাই অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দেখিলাম নানা দেশ,
এমন রাজা দেখি নাই পাপিষ্ঠের শেষ,
রাজা ভানবতী কন্যা যুবতি
তুমি কি ভেবেছ মনে হবে তার পতি,
তোর জামাইকে আজ ফাঁকি দিয়ে
বাগবাজারের রাখবে সখ।
ভণ্ড ভোজপুরে চাষা ঠক্,
তুই রাত জাগালি হক না হক'।
কোন্ গুণে বলিব তোরে বিবেচক,
কন্যা দিবে পণ করেছ তখন হারিলে সভাতে
রাজার * * ফাটে এখন,
যে মনস্তাপ পেলাম আমি কহিব তা কাঁহাতক।
এই সভার মাঝে বুদ্ধিমন্ত আছেন অনেকেতে,
বল দেখি বিচারে হেরে হয় কি না হয় দিতে,
দেখ বিচারেতে হেরি তোর একি চমৎকার,
ভানুবতী যে কন্যা তার মূল্য দেওয়া ভার,
মন্ত্রেরি সাধন, কি শরীর পাতন,
ছাড়িব না ভানবতীকে দেখেছি যখন,
তুই মাথায় ক'রে ব'য়ে দিবি আপনা আপনি
মেনে ঝক।
আমি হাজাগজা পণ্ডিত নই যে রাখিব চোপাড়ি,
নতুন শোলক শুনাইলাম আর কি কন্যা ছাড়ি,
ঘরে ব'সে জোর জুলুম করিতেছ দেখ,
কুন্দের উপর চাপলে ধন বাঁক থাকিবে নাক,
প্রতিজ্ঞা করে শোলকে হেরে, দেখিব ভানবতী—
কন্যা কে রাখে ধরে,
আমিত সামান্য নই সিমলেবাসী অধ্যেপক।
আমি এখনো রয়েছি, গায়ের আগুন গায়ে মেরে,
জিতেছি রাজার কন্যা নিব হাতে ধরে,
ধর্ম্মের মুখ চেয়ে ভাই করিনাক জোর,
দেখিব উহার আছে কতদূর দৌড়,
রঘুনাথে কয় ইত বড় দায়, হারিয়া বিচারে
কন্যা দিতে নাহি চায়।
ধর্ম্ম নষ্ট করলে পরে মরবি ঘুরে ঘোর নরক।

হরু ঠাকুরের গানের প্রশংসা করিয়া কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ১২৬১ সালের ১লা পৌষের প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন—

"এই সমস্ত গানে মিলের ও শব্দের যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে তাহা কেহ ধর্ত্তব্য মনে করিবেন না। কেবল ভাব অর্থ ও মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। ১০০ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে এরূপ যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ দৈবশক্তির বলে অশিক্ষিত জনের দ্বারা এমন উত্তম রচনা হওয়াতে কে না শ্লাঘার ব্যাপার বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন"।

এই প্রশংসার কতখানি হরু ঠাকুরের এবং কতখানিই বা রঘুনাথের প্রাপ্য, বিচার করিবার বিষয়। হরুর অনেক অনেক গান প্রথমাবস্থায় রঘু সংশোধন করিয়া দিতেন, সেই কৃতজ্ঞতায় হরু নিজের অনেক গানে রঘুর ভনিতা জুড়িয়া দিয়াছিলেন; এইরূপ একটা প্রবাদ আছে। হরু স্বভাব-কবি ছিলেন, কিন্তু রঘুও কবিত্ব-শক্তিতে কম যাইতেন না। সুতরাং গান দেখিয়া এখন আর বাছিয়া লইবার উপায় নাই কোন্ গান রঘুর কোন্ গান হরুর। অবশ্য হরুর বলিয়া বাজারে চল্‌তি সব গানেই ভেজাল আছে, আমরা এমন কথা বলি না। তবে হরু ও রঘুর কতক গানে যে একটা গোলমাল বাধিয়াছে, মেশামেশি ঘটিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই বলিতেছিলাম গুপ্ত কবির প্রশংসায় কার কতটা প্রাপ্য অংশ বণ্টন করিয়া দিবার কোনো 'কের' না থাকা তুল্-দাঁড়ি আজি আর পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহের কথা।

আমরা রঘুর যে গানগুলি পাইয়াছি তাহার বেশীর

ভাগই অপ্রকাশিত। সুতরাং এগুলি রঘুর নিজের গান বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারা যায়। রঘুর গানের নিজস্ব একটা ভঙ্গী আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত দুই চিহ্নিত গানটী পড়িলেই কবির আসরের একটা সজীব ছবি যেন চোখের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে হয় চারিধারে উৎসাহিত শ্রোতার দল, প্রতিপক্ষগণ যেন দূরে হেঁট মাথায় বসিয়া মাটী খুঁটিতেছে, আর আসন্ন জয়ের উদ্দাম স্ফূর্ত্তিতে নাচিয়া গাহিয়া রঘু আসর মাৎ করিতেছেন,—গানের সুরের এমনি একটা পরিহাস-চটুল ভঙ্গী, ছন্দের এমনি একটা সতেজ সাবলীল গতি।

রঘুর সখী সংবাদের গানগুলিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নিম্নের গানটীতে শ্রীমতী রাধিকা ও চন্দ্রাবলীর—দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকার চির-বিরোধের প্রবাদকে উপেক্ষা করিয়া বিরহিণী শ্রীমতীর অন্তিম দশায় চন্দ্রাবলীর যে ব্যাকুলতার আভাষ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব কবিদের গানেও ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আর কবিওয়ালাদের গানের মধ্যে এ ভাব তো দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গানটী এই—

"শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ কথাতে কুঞ্জেতে ছিলেন প্যারী,
আচম্বিতে চমকিত মনে হলো কি রূপ-মাধুরী,
অধৈর্য্য হইল অঙ্গ ধৈর্য্য অবসান,
কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে প্যারী হতজ্ঞান
দেখে ললিতে সশঙ্কিত,
কি হলো কি হলো আচম্বিত
প্যারীর নিমিখ নাই আঁখিতে।
মুরছি পড়িল প্যারী অমনি ধূলাতে,
বৃন্দে সখি হলো একি চন্দ্রমুখির
আপনার বঁধুর কথা কহিতে।
বিবর্ণ হইল রাই সর্ব্ব অঙ্গেতে,
শীতল হলো রাঙ্গা চরণ
কোমল অঙ্গ ভঙ্গ হেম বরণ
রাইকে দেখে বিদরে বুক
মলিন হ'য়েছে বিধু মুখ
যেন দংশিল ভুজঙ্গেতে।
বিশেখা গো এতদিনে বৃন্দাবনে তেমন চাঁদের
হাট সকল ভাঙ্গিলি,
তোরি এত সাধ হলো পরমাদ
চিত্রপটের সাধ পূরাইলি।
বিরহ বিচ্ছেদ অনলে গোকুলে রাই যদি মলো,
এতদিনে ব্রজভূমে কৃষ্ণের আসার আশা ফুরাইল।
শ্যাম শোকেতে সবে আকুল,
আবার রাই করিল শূন্য গোকুল,
আহা মরি গো মরে যাই,
বিধুবদন শুকায়েছে রাই—
দেখে আমরা ধৈরয নারি ধরিতে।
পদ্মা পেয়ে সমাচার হাহাকার করি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে চলে
বসে' কর কি ও চন্দ্রমুখি প্যারী মলো কেন্দে বলে।
শুনিয়ে ধাইল ত্বরিতে সঙ্গেতে লয়ে সখীগণ,
এল কেশে এল বেশে চন্দ্রাবলী করিয়া রোদন,
আহা রাই কি হলো ব'লে সঘনে
উপনীত গিয়ে কুঞ্জ ভবনে,
দাস রঘুনাথে বলে প্যারী যদি মরে গোকুলে,
কৃষ্ণ আসিবেন না আর ব্রজেতে।"

যাঁহারা রামবসুর বিরহের গানে মুগ্ধ, তাঁহারা বসু মহাশয়ের শতাধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী রঘুনাথ দাসের নিম্নোক্ত গানটি পড়িলে আনন্দিত হইবেন। রাম বসু বাঙ্গালা ১২৩৬ সালে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

"যে দিনে মাধব মধুপুরে যাবে মোর ওলো সখিগণ,
র'য়ে র'য়ে কান্দে হিয়ে মনে পড়ে সেই প্রিয়ের বদন,
যখন যায় মথুরায় আমার মনে হয়,
বলে যাই আসিগে বঁধু কেন্দে কয়,
আমি বয়ান নিরখি তার, ধৈর ধরিতে নারি আর,
বঁধু অমনি আমার নয়ান জলে ভেসে যায়।
সখি শ্যাম কান্দে আর আমারে কান্দায়,
আমায় ছেড়ে যেতে নারে মধুপুরে
আমার সেই মনোদুখ না নিভায়।
ধীরে ধীরে বলে রাই করহে বিদায়,
এখন যাই আবার আসিব ব্রজেতে,
ভেবনা শ্রীমতে তুমি মনেতে,
নিতে কংস পত্র করেছে,
ব্রজেতে অক্রূর এসেছে
যাব যজ্ঞ হেতু মথুরায়।

কেন্দে বলে বংশীধারী, মধুপুরী,—
এবার বিদায় দিতে হবে প্যারী
বল বল রাই তবে আমি যাই, বদন তোল বিনয় করি,
কেন্দেছে কান্দায়ে গেছে শ্যাম কংস ধাম যাত্রা
যে কালে,
যাবার বেলায় বঁধু আমায় সই গো
নয়ান জলে ভাসালে ;
কত কয় মিনতি ক'রে মাধব,
আমার অন্তরেতে জাগে সেই সব,
মনের মরমেতে মরে রই
ব্রজপুরী শূন্য দেখি সই,
আমি বলবো কি আর বিধাতায়।
বিধি এত দুখ দিলে কৃষ্ণ নিলে আমার হিয়া
হ'তে চুরী করে
দিনে ডাকাতি কংস নৃপতি অক্রূরে প্রেরী ব্রজপুরে,
পরাণ পুতলী আমার অক্রূর করিল চুরী,
অবলারে দগিবারে সইরে এত কি চাতুরী,
বিধাতার কি ছিল আমার সঙ্গে বাদ,
নিলে কৃষ্ণ ধনে পূরালে মনোসাধ।
দাস রঘুনাথে বলে শ্যাম বিনে রাই মরে গোকুলে
অক্রূর বধে গেছে অবলায়।"

পূর্ব্বে কবির গানে চাপান ও উত্তর গাহিবার রীতি ছিল, এখনো আছে ; কিন্তু আসরে দাঁড়াইয়া গান বাঁধিয়া প্রশ্ন ও উত্তরের পদ্ধতি উঠিয়া গিয়াছে। উঠিয়া গিয়াছে—কারণ, বর্ত্তমান কবিওয়ালাদের মধ্যে সে কবিত্ব, কবিত্বের সঙ্গে সেইরূপ দ্রুত-রচনা-শক্তি কাহারো নাই। রঘুর একটী চাপান গান তুলিয়া দিলাম,—ইহা হইতেও রঘুর কবিত্বের কিছু পরিচয় মিলিবে।

"সকাতরে ললিতে কহিছে কমলিনী রাই,
অকস্মাৎ বংশীরব তোমার কুঞ্জে শুন্‌তে পাই।
এই ব্রজ ছেড়ে কৃষ্ণ গেছে,
আমরা যত গোপীগণ ভাবি সর্ব্বক্ষণ,
প্যারী কই তোমার কাছে,
ইহার তদন্ত না জানি
শুধাই তোমায় ও কমলিনী
আমার বিস্ময় হলো মনেতে।
কে বাঁশী বাজায় গো নিশিতে
বংশীধ্বনি নিতি শুনি চন্দ্রাননী ওগো
তোমার কুঞ্জেতে।
বাজে বাঁশী বিপিনে শুনি কর্ণেতে
যদি পেয়ে থাক কালাচান্দে সত্য বল রাই
তোমারে শুধাই,
বিচ্ছেদ ঘুচুক গো আমাদের।
যে হতে গেছেন হরি বংশীরব শুনি নাই প্যারী
ওগো আমরা এই ব্রজেতে।
সত্য বল গো শ্রীরাধে যদি কালাচান্দ
এসে থাকেন তোমার কুঞ্জেতে,
তবে কেন আর করি হাহাকার
আমরা এই ব্রজের মাঝেতে।
ব্রজপুরী ছাড়িয়ে কালিয়ে গেছে গো প্যারী
কৃষ্ণ বিনে আমরা সবে প্রাণেতে মরি,
বুঝি হয়েছ কৃষ্ণ সুখি,
আমরা যত গোপীগণ সে শ্রীকৃষ্ণধন
না হেরি গো চন্দ্রমুখি,
আমরা মরি মনোখেদে
তুমি কি জান না রাধে
ওগো না পেয়ে কৃষ্ণে দেখিতে।
বাঁশী শুনে বনে ভাবি মনে আমরা যত ব্রজাঙ্গনে,
কৃষ্ণ দেখিতে সঙ্গেতে লয়ে যাব তোমায় বনে,
কালাচান্দ বিহনে বৃন্দাবনে দেখি শূন্যময়,
কমলিনী কিসে তোমার হলো এত সুখোদয়
আমরা কৃষ্ণ বিনে সদা মরি
হায় নিশি দিশি শ্যাম জপি অবিরাম
তুমি কি জান না প্যারী।
এই ব্রজের ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণ বিনে বাঁচিবে না
রঘু বলে প্যারীর কাছেতে।"

রঘুর কতকগুলি টপ্পা গান পাইয়াছি, তাহার সবগুলিই প্রায় খেউড়। উহারই মধ্য হইতে বাছিয়া একটী (লহর) টপ্পা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। এটীও চাপান গানের অন্তর্ভুক্ত।

"হায় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদেব সে জানে না কথা,
আর মহামুনির ঘরেতে কি করলে বিধাতা

কেউ বুঝতে না পারে,
সাতটী ছেলে জন্ম নিলে দেবতার বরে।
আর যত ঋষি যোগ ছাড়িয়ে সবেতে
গেল পাতাল।
সেই কথা শুধাই তোরে কি হলো জঞ্জাল,
নারী গর্ভে থাকবে কতকাল,
বল কোন্ যুগে হবে ছাওয়াল।
এসে করে দেখ ধ্যান পুরাণের লিখন,
তিনটে পতি একটা নারী আছে বর্ত্তমান
আর পঁচিশ জনা চৌকীদারী আছে তারা হামেহাল।
এই তিন ভুবন সংসারে তারা ভ্রমণ করিছে,
গর্ভে লয়ে মহামুনি কোন্ সমুদ্রেতে আছে,
দিবে নিশি থাকে তারা জলেরি ভিতর,
তুই নিজে হলি গণ্ডমূখ্যু পাবি কি ঠাহর,
বলি তোরে এ বৃত্তান্ত বলতে হবে আদি অন্ত
শ্রীরঘু বলে নইলে বাছা হ'তে হবে নাজেহাল।"

রামজীদাস

১২৬১ সালের (১লা অগ্রহায়ণ) 'প্রভাকরে' কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন—"প্রায় ১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল গোঁজলা গুঁই নামক এক ব্যক্তি পেশাদারী দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন। ঐ ব্যক্তির সহিত কাহার প্রতিযোগীতা হইত জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তৎকালে ঢোকেরার বাদ্যে সঙ্গত হইত।

লালু নন্দলাল, রঘু ও রামজী এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত গোঁজলা প্রভৃতির সঙ্গীত-শিষ্য ছিলেন। রঘুর নিবাস রাসডাঙ্গায়, তিনি তন্তুবায় কুলে জন্মগ্রহণ করেন। গান ও সুর করিতে ভাল পারিতেন। লালু নন্দলাল ও রামজীর বিবরণ অদ্যাপি জানিতে পারি নাই।"

রাজা রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' (১৭৭৯ শকাব্দা ৫৮ খণ্ড, ২৩৫ পৃ:) লিখিত আছে—"কথিত আছে এই কবির গান রচনায় চুঁচুড়া নিবাসী লালু নন্দলাল বিখ্যাত ছিল। তাহার পর হুগলীনিবাসী রামজী ও কলিকাতানিবাসী রঘু তাঁতি প্রসিদ্ধ হয়।"

গুপ্ত কবির লেখা হইতে লালু, রঘু ও রামজী তিনজনেই গোঁজলার শিষ্য ছিলেন, এমন কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। তিনজনের মধ্যে কে গোঁজলার নিকট গান শিখিয়াছিলেন—'প্রভাকরে' তাহারও কোনো পরিচয় নাই। অনুমান হয় রামজী জাতিতে বৈরাগী ছিলেন। ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে ভবানী বেণের নাম বিশেষ পরিচিত। ইঁহাদের সময়ের কেষ্টা মুচি ও ভারত নামক আর দুইজন কবিওয়ালার নাম পাওয়া যায়।

বীরভূমে লালুর দুইজন শিষ্য ছিলেন—নাম কাল পাল ওরফে হারাধন পাল, সাং মুড়মাঠ; এবং বহরি রায় সাং বরুল। বরুল হইতে আমরা যে সব কবির গান পাইয়াছি, তার মধ্যে রামজীদাসের গানের সংখ্যা ২০টী। ইঁহার ভিতর লহর এবং খেউড় গানও আছে।

মুড়মাঠে কাল পালের সহযোগী ক্ষেত্রপাল নামে একজন কবিওয়ালা ছিল, রামজী দাসের গানের মধ্যে দুই জায়গায় ক্ষেত্রর নাম আছে। ক্ষেত্র জন্মান্ধ ছিল বলিয়া একটী গানে দাসজী তাহাকে অতি নিষ্ঠুর কদর্য্যতার সঙ্গে আক্রমণ করিয়াছেন এবং বেজায় বদ্ জবানে গালাগালি দিয়াছেন। ক্ষেত্রপালের জাতির উপর (সৎগোপ—চাষা জাতি) রামজীর লেখা কয়েকটী লহর গানও পাওয়া গিয়াছে। একটী নমুনা দিলাম—

"শুন ভাগিনা ভীমে কথা মোর কই তোমার স্থানে,
জেনে শুনে তোর মামী এমন হয় কেনে,
শাঁখা পরিতে সাধ, সদাই করেন বাদ,
আমার দিবা নিশি ঘটে পরমাদ,
আজ শাঁখার জন্যে বিনয় করে ধরেছে যে আমার পায়।
(ধু) আমার হলো ই কি দায়, তোর চাষা মামী
শাঁখা চায়।

বুঝে না অবোধ স্ত্রাকী ধরে দুটো পায়,
কার্ত্তিক গজানন, ছেলেরা দুজন,
ক্ষুধাতে আকুল হ'য়ে কান্দে সর্ব্বক্ষণ, ভাত না পেলে
বাবা বলে দিগম্বরকে খাবলে' খায়॥ (পরধুয়া)
তোর চাষা মামী সদা মোরে বলে কুবচন,
সে মানে না ক সদাই বলে ভাঙ্গি ত্রিলোচন,
দিবা নিশি দেয় মোরে কত যন্ত্রণা,
ভাঙ্গড় বলে তোর মামী করে গঞ্জনা,
আমি কাঙ্গাল ত্রিলোচন, কোথা পাব ধন,
কি দিয়ে কিনে শাঁখা দিবরে এখন,

(আমার)—সম্ভাবনা ছেঁড়া তেনা বাঘের ছালা
পরি গায়।
আমার যত সম্ভাবনা সকল জান তুমি,
যে রূপেতে কার্ত্তিক গণেশ পালন করি আমি,
ভিক্ষা করে দেশান্তরে বেড়াই নিরবধি,
এতদিনের উপরে ঘরকে এলাম যদি,
উষ্মা করে কি দক্ষ রাজার ঝি,
বল দেখি ভাগিনা আমার উপায় হবে কি,
একে অন্ন চিন্তা চমৎকারা এ দুঃক্ষ আর কইব কায়।
এ দুঃক্ষ তোমার মামী জানেনা আমার,
কুবেরের বাড়ীতে রে তোর মামা করে ধার,
আমার কাছে হবে না তোর মামীর শাঁখা পরা,
এতপরে করিতে হবে রামজীদাসের সারা,
আমিত একা, কোথা পাই টাকা,
তোর মামী আমার কাছে পাবেনা শাঁখা,
শাঁখার তরে উষ্মা করে বাপের বাড়ী চলে যায়॥"

রামজীদাসের একটী গানে সুন্দরের সন্ন্যাসী বেশে বীরসিংহের রাজসভায় বিদ্যার সঙ্গে বিচারের প্রার্থনা আছে। এদেশে বিদ্যা-সুন্দরের পালা চল্ করিয়াছিলেন ভারতচন্দ্র। তার পূর্ব্বে লোকে বীরসিংহ রাজা, রাজকন্যা বিদ্যা, বিদ্যার বর সুন্দর প্রভৃতির কথা জানিত কি না সন্দেহ। এই হিসাবে রামজীকে লালু নন্দলাল অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়; মনে হয় রায় গুণাকরের মৃত্যুর পরও রামজী কিছুকাল জীবিত ছিলেন। বিদ্যাসুন্দর রচনার অল্প দিন পরেই গুণাকরের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে, এবং এই পালার প্রচার হইতেও দুই এক বৎসর লাগিয়াছিল, এইরূপ অনুমানেই আমরা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের আশ্রয় লইতেছি।

'বিদ্যাসুন্দর' পালার আরম্ভ হইল এইরূপ—
"আমি এসেছি তোমার সভাতে,
এই বিদ্যার বিচার দেখিতে। (ধুয়া)
শুন নৃপতি আমি বাস করি বদরিকা আশ্রমে,
তীর্থ ভ্রমণ কর্ত্তে যাই সাগর সঙ্গমে,
আমি এই তামাসা শুনিয়া পথে,
কৌতুকে এসেছি দেখিতে,
যে বিচারে হারাবে তারে লয়ে যাবে সঙ্গেতে॥"

আজ পর্য্যন্ত রামজীদাসের কোনো পদ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমরা যে পদগুলি পাইয়াছি, তাহার মধ্যে ভবানী বিষয়, সখী সংবাদ, বিরহ, গৌরাঙ্গ বন্দনা, সীতার জন্ম, হনুমানের জন্ম প্রভৃতি পালা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনো পালাই সম্পূর্ণ নাই। নিম্নে গৌরাঙ্গ বিষয়ক একটী পদ উদ্ধৃত হইল।

"এবার গৌরাঙ্গ হ'লে কালরূপ অন্তরে রেখে,
কপট সন্ন্যাসী প্যারীর প্রেমেতে ঠেকে,
আর ব্রজপুরের পুরে পুরে বোধেছ কুলবালিকে।
পূর্ব্বেতে ছিলে হরি শ্রীনন্দ যশোদার ঘরে,
চরাইতে ধেনু সেই মোহন বেণু লইয়ে করে,
যত সব ব্রজ শিশু সঙ্গে লয়ে,
আর ধেনু সনে যেতে বনে শ্রীরাধার নাম বাঁশীতে ডেকে।
দ্বাপরে নন্দালয়ে করেচ শ্যাম এসব লীলে,
যমুনায় সাধিতে দান দাঁড়ায়ে কদমতলে,
কাণ্ডারী বাইতে তরি তুমি হে যমুনার ঘাটে,
ধোরিয়ে পশরা সব দধি মাখন খেতে লুটে,
কাঁদিত * * * * তাই দেখে রোদন,
বংশী বদন, হাসিতে কদম্বে থেকে।
একদিন ঠেকেছিলে রাধে প্যারীর দুর্জ্জয় মানে,
তোমারে কয়না কথা রইল প্যারী বিরস মনে,
সাধিতে শ্রীমতীর মান আপনি শ্যাম হলে যোগী,
বিভূতি মাখিয়ে শ্রীঅঙ্গেতে প্রেম-অনুরাগী,
(যত সব লীলে সেই প্যারীর কারণে)
আর ভিক্ষে দেহ রাধে প্যারী ফুকারতে বাহিরে থেকে।
ওহে শ্যাম যত লীলে করেছ সব আছে মনে,
করেছ যে রাসলীলে প্যারীর সনে কুঞ্জবনে,
শোন সেই নিধুবনে রাজা হলেন রাধা প্যারী,
ত্যজিয়ে মুরলী তার কোটাল হলে বংশীধারি,
বেড়াইতে শ্রীরাধিকার হুকুম ব'য়ে—
আর রামজী ভণে অভাজনে ভাব মনে শ্রীরাধিকে।"

সম-সাময়িক কবিওয়ালাদের মধ্যে রামজীদাসের গানে ছন্দে একটা নূতনত্ব দেখিতে পাই। রচনাতেও মিষ্টতা আছে রামজীর সখী-সংবাদের একটী গান—

"তবে হরি বলে শুন দূতি মোর নিবেদন,
র'য়ে র'য়ে পড়ে মনে নিকুঞ্জ কানন,

কুবুজারে দেখি প্রেমে ছাড়া নাহি যায়।
আমি আর ব্রজে যাবনা ব'ল্যো শ্রীরাধায়॥
অভিমানী হ'য়ে কেন আমারে ধেয়ায়,
দেখে যেতে বোলো তারে এসে মথুরায়।
হায় নন্দালয়ে চুরী করে খেতাম নবনী,
দুটী করে বেঁধেছিল যশোদা রাণী,
দেখ শিশুকালে নন্দরাণী করিত পালন,
মা হইয়ে বেঁধেছিল নিগূঢ় বন্ধন,
ব্রজেতে যাইতে দূতী বোলো না আমায়।
ব্রজেতে বসতি দূতী ঘুচিল আমার,
আমার দৈবের ফের কি দোষ রাধার,
দেখ নিকুঞ্জেতে রাধে ছিল ক'রে অভিমান,
যোগী হ'য়ে সাধিলাম কাতর পরাণ,
দাসখত লিখে দিলাম ধ'রে রাধার পায়।
রাধে রাজা গোপী প্রজা কোটাল হরি,
সেই দিনে ব্রজাঙ্গনার হার যায় চুরী,
দেখ চোর ব'লে বেঁধেছিল যত গোপীগণ,
সেই খেদে ছাড়িলাম বাস বৃন্দাবন,
ব্রজেতে যাব না দূতী বলিগো তোমায়।
বৃন্দাবনে মহারাসো রাজকুমারী,
র'য়ে র'য়ে পড়ে মনে প্রাণ কিশোরী,
দেখ নিকুঞ্জেতে রাধে মোরে দিলে যন্ত্রণা,
সেই খেদে ছাড়িলাম ব্রজের বাসনা
আর ব্রজেতে যাবে না হরি রামজীদাসে গায়।"

আমাদের সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে রামজীর দাঁড়া কবির গান একটীও আছে বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত গানই টপ্পা ধরণের। যে গানগুলি তুলিয়া দিলাম—সেগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এসব গান ঠিক্ টপ্পাও নয়, আবার প্রচলিত দাঁড়া কবির সুরের সঙ্গে ইহাদের মিল পাওয়া যায় না। এমনও হইতে পারে যে দাঁড়া কবির সুর সেকালে অনেক রকমের ছিল। যে খাতায় গানগুলি পাইয়াছি তাহাতে গানের পাশে চিতেন, ধুয়া, পরধুয়া, খাদ,—সুরের এইরূপ কয়েকটী সঙ্কেত লিখিত আছে; মোহড়া, মেলতা প্রভৃতি কোনো সঙ্কেতের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সব গান গাহিতে পারে—রাঢ়দেশে এখনো এমন কবিওয়ালা বা দোহারের অসদ্ভাব নাই। সকলের গানের ধরণ একরকমের নহে। রকম রকম সুরের কথা তাহারাও স্বীকার করে। মাসিক পত্রে এই সব বিষয়ে একটু আলোচনা হইলে ভাল হয়। বাছা বাছা কবির গান লইয়া একটা সংস্করণেরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

পৌরাণিকী

শ্রীমৃণালিনী দেবী

১

ইংরাজী ১৮৭১, বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ২৪শে কার্ত্তিক, বুধবার, শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ভবানীপুরে আমার জন্ম হয়। আমার পিতৃদেবের নাম ৺শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সেই সময়ে তিনি নলহাটীতে মুন্সেফ্ ছিলেন। যে দিন আমার জন্ম হয়, পিতা সকালে ১০টার সময় বাড়ী আসিয়াছিলেন। ঐ দিন অপরাহ্ণ ৫টার সময় লর্ড মেয়োর মৃতদেহ জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আসে; তাহা দেখিয়া ফিরিতে তাঁহার রাত্রি হয়। ভোর চারটার সময় আমার জন্ম হয়। পিতামহের নাম ৺কালিদাস ন্যায়রত্ন। শান্তিপুরের লক্ষ্মীতলা-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরুদেব ছিলেন; কোন কারণে রাজার সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি রাজাকে ত্যাগ করেন। তিনি পিতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ভবানীপুরে শ্রোত্রিয়ের ঘরে বিবাহ করিয়া জমি ইত্যাদি পাইয়া প্রপিতামহ এইখানেই

বাস করিয়াছিলেন। পিতামহ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, বেশ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ অবয়ব, সৌম্য মূর্ত্তি ও মিষ্ট বচনে অনেকেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইত। তিনি অনেক লোকের গুরুদেব ও অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের পুরোহিত ছিলেন। কখনো শূদ্রের দান করিতেন না ও সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। আমার পিতামহ শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন। তিনি জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমার পিতামহের পূর্ব্বপুরুষেরা শান্তিপুরে বাস করিতেন; কিন্তু প্রপিতামহ ভবানীপুরে বিবাহ করেন ও শ্বশুরের কিছু সম্পত্তি পাইয়া পূর্ব্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে এখন তাঁহার জ্ঞাতিরা কেহ কেহ বাস করিতেছেন। আমার পিতামহী বেহালার সুপ্রসিদ্ধ হালদার জমিদারদের দৌহিত্রীর কন্যা ছিলেন। তাঁহার আমলে কলিকাতায় আঁহিরীটোলা, চোরবাগান, বড়বাজার ও বউবাজার এ কয়েকটী স্থানে লোকের বসতি ছিল; বাকী স্থান বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। সন্ধ্যাকালে কলিকাতা হইতে বেহালায় একাকী লোক চলিত না; ফাঁসুড়ে ও গুণ্ডার ভয় ছিল।

ঠাকুরমার পিতার নাম ৺ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়। ইনি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিতেন ও বেশ ইংরাজী জানিতেন। ইনি সৌম্যদর্শন ও সুগায়ক ছিলেন এবং গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। ঠাকুরমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথ বাবু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার মত আমুদে লোক আজকাল বাংলাদেশে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঠাকুরমা কিন্তু আমোদ আহ্লাদ বেশী ভালবাসিতেন না। সংসারের কাজকর্ম্ম, পিতার ভ্রাতার পরিবারবর্গের সেবা ও সন্তানসন্ততি পালনে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার মত কর্ত্তব্যপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীলোক এ জগতে দুর্লভ। তিনি এত গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন যে, পাড়ার সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভয় করিত ও সকল বিষয়ে পরামর্শ লইত। ছেলেমেয়ের বিবাহে তত্ত্ব করা, চিকিৎসা করা কিছুই তাঁহার অমতে হইত না।

আমার পিসীমার নাম এলোকেশী। তাঁহার ১১ বৎসর বয়সে ফরিদপুর জেলানিবাসী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। তিনি চার পাঁচ বৎসর সধবা ছিলেন। পিসামহাশয় ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী শোনবর্ষার রাজার দেওয়ান ছিলেন ও রাজসংসারে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। পিসিমা দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী, পিসেমহাশয়ের পূর্ব্বের স্ত্রীও জীবিতা ছিলেন। কেন পিসেমহাশয় পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না,—বোধ হয় কুলীনসন্তান বলিয়া। পিসিমা কখনো শ্বশুরবাড়ী যান নাই।

আমার বাবা বেহালার পাঠশালে ও টোলে বাল্যকালে পড়া সাঙ্গ করিয়া কালীঘাটে একটী ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি এন্‌ট্রেন্স্ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বাবার সহপাঠী ছিলেন—সিতিকণ্ঠ মল্লিক (পরে সবজজ্ হন,), ডাক্তার রাজেন্দ্র মল্লিক, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাশ্মীরের রাজমন্ত্রী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। আড়িয়াদহ নিবাসী দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা দয়াময়ী দেবী আমার জননী। মাতামহ মহাসমারোহ করিয়া বাড়ীতে দুর্গাপূজা করিতেন। প্রতিমার নাম "বুড়ামা"—প্রায় দেড়শত বৎসরের পূজা। আমার দিদিমা কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত ধর্ম্মদার বাঁড়ুয্যেদের কন্যা। তাঁহার পিতা লবণের দারোগা ছিলেন ও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। একবার বাড়ীর ভোজপুরী দরোয়ান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল ও ছোটকর্ত্তাকে ঘিয়ে ভাজিয়া টাকার সিন্দুকের উপর শোয়াইয়া ডাকাতি করিয়াছিল। মাতামহ তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে কখন ঐ দূর দেশে যাইতে দিতেন না।

আমার মাসীমার নাম মায়াময়ী। শান্তিপুরে পিতার এক জ্ঞাতির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। একদিন বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষীয়া রাত্রি ১১।১২টার সময় মাতামহ তামাক খাইবার জন্য মাসীমাকে একটু আগুন আনিতে বলেন। মাসীমা একখানি কোরা ও খুব পাতলা শান্তিপুরে শাড়ী পরিয়াছিলেন। দক্ষিণা বাতাসে আগুনের ফিন্‌কি উড়িয়া তাঁহার কাপড়ে পড়ে ও জ্বলিয়া উঠে। দাদামহাশয় বার বার কাপড় ফেলিয়া দিতে বলেন। কিন্তু মাসীমা অত্যন্ত লজ্জাশীলা ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন,—কাপড় ফেলিলেন না। দাদামহাশয় দৌড়িয়া তাঁহার ঘর হইতে আফিসের উড়ুনী আনিয়া দগ্ধবস্ত্র ছাড়িতে বলিলেন। তখন বুকের ও পায়ের অনেকাংশ পুড়িয়া গিয়াছে। মাখনের মত কোমল শরীর,—তাহার উপর জ্বর হইল ও বিকার দেখা দিল। স্বর্ণপ্রতিমা পিতামাতাকে কাঁদাইয়া অকালে অনন্ত রাজ্যে চলিয়া

গেলেন। মাতামহ মার বিবাহ দিলেন বটে, কিন্তু তেমন আনন্দ হইল না। তখন মা নয় বৎসরের।

মাতামহ এক দিন ভাদ্র মাসে কলিকাতা হইতে বাড়ীর পান্‌সীতে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। সায় সন্ধ্যা বন্দনার পর জপ করিতে করিতে তাঁর ঘুম আসে। এমন সময় হঠাৎ 'গেল গেল' শব্দে চাহিয়া দেখেন যে, একখানা বড় ষ্টীমার নৌকার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে আরোহী সমেত নৌকা জাহ্নবীবক্ষে নিমগ্ন হইল। দু'একজন মাঝি ও তিন চারজন আরোহী অনেক কষ্টে বাঁচিয়াছিল। দিদিমা সাবিত্রীব্রত করিতেন; হঠাৎ দাদামহাশয় মারা গেলেন বলিয়া যে কয় বৎসর ব্রত বাকী ছিল, সে কয় বৎসর তিনি দাদামহাশয়ের খড়মপূজা করিতেন ও নারায়ণ লইয়া ব্রত সমর্পণ করিতেন। তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন যে, ঐ ব্রত যেন তাঁহার পুত্র-কন্যার বংশে কেহ না করে। দাদামহাশয়ের মৃতদেহ অনেক করিয়া গঙ্গাগর্ভে খোঁজা হয়। ঘুস্থড়ির ট্যাকে নৌকা ডুবি হয়। হুগলি অবধি ক্রমাগত জাল ফেলিয়া খোঁজা হয়; কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সন্ধ্যাকালে এই হৃদয়বিদারক সংবাদ বাড়ীতে পৌঁছিল। কন্যা ও স্বামীহারা হইয়া সতী বড়ই মর্ম্মদাহ ভোগ করিলেন।

বড় মামা তখন ১৬ বৎসরের। দিদিমা সন্তানদের মুখ চাহিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া দাদামহাশয়ের মনিব সাহেবদের কাছে বড়মামাকে পাঠাইলেন। সেকালের সাহেবরা বড় দয়ালু ছিলেন; তৎক্ষণাৎ পঁচিশ টাকা বেতনে তাঁহারা বড়মামাকে একটী চাকরী দিলেন ও পরে ভাল করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। বড়মামা ঐ আফিসে বহুকাল চাকরী করেন।

বাবার বিবাহের পর তাঁহার পিতা আর পড়াইলেন না, চাকরী করিতে বলিলেন। তিনি প্রথমে টেলিগ্রাফ আফিসে ও পরে রেল আফিসে চাকরী করেন। কিন্তু কোনটীতেই তাঁর মন বসিল না। পরম করুণাময় তাঁহার জন্য ভবিষ্যতে অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমার পিতার সহপাঠী যোগেশচন্দ্র মিত্র (ইনি পরে জেলার জজ্ হন) তৎকালে আইন পড়িতেছিলেন। তাঁহার কথায় ও উৎসাহে পিতাও আইন পড়িতে ইচ্ছুক হন। পিতামহের ভর্ৎসনা সত্বেও গোপনে তাঁহার পড়া চলিতে লাগিল ও যথাসময়ে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ওকালতী আরম্ভ করিয়া তিনি কেরাণীগিরি ছাড়িয়া দিলেন।

২

বাল্যকালে পিতামহীর নিকট 'আশ্বিনে ঝড়ে'র যে গল্প শুনিয়াছি, তাহারই উল্লেখ করিব। সেদিন ষষ্ঠীর কল্প। ভবানীপুরের মুখুয্যেরা বিখ্যাত বড়মানুষ। তাঁহাদের বাড়ীতে ঠাকুরদাদা চণ্ডীপাঠ করিতে গিয়াছিলেন। ঝড় আরম্ভ হইল, তিনি আর বাড়ী ফিরিতে পারিলেন না। ক্রমে ঝড় বাড়িতে লাগিল, কোন ঝি-চাকর আর কর্ত্তার খবর লইতে পারিল না। ক্রমে পাড়ার অনেক বাড়ী ঝড়ে উড়িয়া গেল, কিন্তু আমাদের নূতন বাড়ী নষ্ট হয় নাই। ৮।১০টী পরিবার আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। সে রাত্রি কাটিল, কিন্তু প্রাতে সপ্তমী পূজার দিনও কর্ত্তা বাড়ী আসিলেন না। বেলা বাড়িতে আশ্রয়প্রাপ্ত সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইল। ঠাকুরমা সকলের জন্য যথাসম্ভব আহারের যোগাড় করিলেন ও পিসিমা খিচুড়ী করিয়া দিলেন। পরদিনও ঝড় পূর্ব্ববৎ রহিল। মহানবমীর প্রভাতে ঝড়ের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, যেন কৈলাসবাসিনী দুরন্ত অসুরকে পরাস্ত করিলেন। দশমীতে দিক্ প্রসন্ন হইল, কিন্তু ভবানীপুর তখন মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে দেখা গেল।

আমার দুইটী সহোদর—বড়দাদা সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মেজদাদা শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাবার সহপাঠী গোপাল বাবু বিলাতফেরতা ডাক্তার ছিলেন। বড়দাদা যখন ছয়মাসের, তখন একদিন রাত্রে হঠাৎ তাঁর খুব অসুখ করে। গোপাল-বাবুকে তখন পাওয়া গেল না। আমাদের পদ্মপুকুরের বাড়ীর সম্মুখের বাড়ীতে তখন ৺গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-বি পাশ করিয়া প্র্যাক্‌টিশ্ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরমার মত লইয়া বাবা তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া দাদাকে দেখাইলেন। ঈশ্বরের এমনি কৃপা যে সেই প্রথম দর্শনেই গঙ্গাপ্রসাদবাবু পিতাকে কি সুনয়নে দেখিলেন। তদবধি উভয়ে চিরবন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

বাবার পাঁচ ছয়টী বন্ধু ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার পিতৃদেবও ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাবান্ হইলেন ও আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম জামাতা জে. ঘোষাল

মহাশয় বাবার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েরা বাবাকে নিজের ভাইএর মত দেখিতেন; বধূরাও কেহ লজ্জা করিতেন না। মহর্ষি যেমন নিজের ছেলেদের উপদেশ দিতেন, তেমনি বাবাকেও কাছে বসাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তাঁহাকে বাবা গুরুর মত ভক্তি করিতেন, আর সত্যেন্দ্রবাবু ও জ্যোতিঃবাবুকে ভ্রাতা মনে করিতেন।

বড়দাদার জন্ম হইবার কিছুদিন পরে আমার পিতামহ বাবাকে ডাকিয়া এক দিন বলিলেন, 'আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে তুমি মুন্সেফ্ হও।' বাবা ক্রমে হাইকোর্টের জজেদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহারা চাকুরী দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। বাবার সহপাঠী সিতিকণ্ঠ বাবু ও অবিনাশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন মুন্সেফ হইয়া বিদেশে গিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে বাবা খবর পাইলেন, তিনি রামপুরহাটের মুন্সেফ্ নিযুক্ত হইয়াছেন। এ সংবাদে পিতামহ খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার পুত্র যে আইন পরীক্ষা দিয়া ভাল কাজ করিয়াছেন, এত দিনে তাহা বুঝিলেন। বাবা ওকালতী করিয়া আমার পিতামহীকে ৮।১০খানা বেশ ভাল গহনা দিয়াছিলেন; আর পিসি জ্যেঠাই মামী সকলকে বহরমপুর হইতে উৎকৃষ্ট গরদ ও গিনি দিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

মা বাবার সঙ্গে রামপুরহাটে গেলেন। রামপুরহাট তখন বন—সীতারামপুর হইতে পাল্কীতে যাইতে হইত। সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাবাকে বড় ভালবাসিতেন। বাবার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। সাহেব খুব সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন। ইঁহার স্ত্রী পুত্র বিলাতে ছিলেন। ঐ সাহেবের কুঠীতে বর্ষাকালে একটী নূতন বাগান তৈয়ার করিবার জন্য ২২।২৪টী কুলীরমণী কাজ করিতে আসে। সকলে যখন ছুটী পাইয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল, তখন সাহেব একজনকে যাইতে দিলেন না। তাহাকে রাখিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে অন্য সাহেবেরা জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত আহার বিহার ত্যাগ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিনি অত্যাচারী বলিয়া আবেদন করিলেন। এদিকে সাহেবেরও সরকারী কাজে তাচ্ছিল্য হইল, চাকুরীও রহিলনা। এমন সময়ে ঐ কুলী রমণীর অসুখ হইল। সাহেব আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন ও সমস্ত সেবা নিজে করিতেন। তখন তাঁহার হাতে এক পয়সাও ছিল না। বাবা যতদূর সাধ্য সাহায্য করিতেন। অতঃপর বাবা এক দিন সাহেবকে বিলাতে তাঁর স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সাহেব নিজেকে ঘোর অপরাধী মনে করিতেন বলিয়া কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তখন বাবাই তাঁর স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করিলেন যেন তিনি শীঘ্র আসেন, তাঁর স্বামী বড় বিপন্ন। টেলিগ্রাম পাইয়া তাঁহার স্ত্রী উত্তর দিলেন যে তিনি শীঘ্রই রওনা হইতেছেন। ঐ কুলী রমণী মারা গেল। সাহেব সেই শয্যায় পাগলের মত পড়িয়া রহিলেন। বাবা সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকিতেন। এক দিন বেলা আটটার সময় সাহেবের নিকট বসিয়া বুঝাইতেছেন। সাহেবের সেদিনের খাবার খরচ নাই, অথচ আর কাহারও সাহায্য লইবেন না। এমন সময় সহসা তাঁর স্ত্রী ও এক ভ্রাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্যার উচ্ছ্বাসের মত মেম একেবারে সাহেবের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ও প্রায় মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি কতকটা শান্ত হইলে সাহেব বলিলেন, 'আমার জীবনদাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কেবল ইঁহার জন্যই বাঁচিয়া আছি। আর আমার বৃত্তান্ত সব ইঁহার মুখে শুনিবে।' ৫।৬ দিন পরে সাহেবকে লইয়া মেম বিলাত গেলেন। বিদায়ের সময় মেম বাবার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। বাবা হাসিয়া বলিলেন, 'আপনি আর সাহেবকে চক্ষের অন্তরাল করিবেন না।'

বাবা শিউড়ীতে ও পরে দেওঘরে বদলি হন। দেওঘরে হাঁসপাতালের সম্মুখে তাঁহার বাসা ছিল। ডাক্তার চন্দ্র তখন সেখানকার ডাক্তার। পরে তিনি বিলাত হইতে পাশ করিয়া ও একজন মেম বিবাহ করিয়া ফেরেন। এই নারী কোন নামজাদা ডিউকের কন্যা ছিলেন। একটু খোঁড়া ছিলেন বলিয়া অন্যত্র বিবাহ হয় নাই। বাবা যখন নলহাটীতে থাকেন, তখন আমার জন্ম হয়। বাবা পরে পাবনায় বদলি হন।

বাবার চাকরী ছাড়িবার একটী বেশ ইতিহাস আছে। হঠাৎ কি-একটী ছুটীর সময় বাবা কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন। সন্ধ্যাকালে টাউনহলে স্কুলের নূতন আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা হইতেছিল। বাবা সেই সভায় যোগদান করিয়া কিছু বক্তৃতা করেন। তাঁহার সুন্দর ভাষা ও ভাবপূর্ণ

যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হন। তিনি হল্ ত্যাগ করাতে সকলেরি মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। একজন সাহেব বলিলেন, 'আমি চিনিয়াছি, ইনি পাবনার মুন্সেফ—শীতল মুখার্জি।' বাবা তৎপর দিনই পাবনায় ফিরিয়া গেলেন ও শুনিলেন, তাঁহার পুরীতে বদলির সংবাদ আসিয়াছে। ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুরীতে রওনা হইলেন। তখন কলিকাতা হইতে জাহাজে করিয়া ১২।১৩ দিনে সমুদ্র পথে পুরী যাইতে হইত। সেখানে গিয়া হঠাৎ হাইকোর্ট হইতে পত্র পাইলেন, 'তুমি ফিরিয়া আইস।' বাবা হাইকোর্টে গিয়া রেজিষ্ট্রার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি টাউনহলে কোন বক্তৃতা করিয়াছিলে?' বাবা সমস্ত অকপটে স্বীকার করায় সাহেব কহিলেন, 'তুমি কর্ম্মে রিজাইন্ দাও। তুমি সরকারী কর্ম্মচারী—ওরূপ কথা বলিবার তোমার ত অধিকার নাই।' বাবা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে ইস্তফা দিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

এ সময় বাবা উদরাময় রোগে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। কলিকাতার ডাক্তার চার্লস্ তাঁহাকে গঙ্গার হাওয়া খাইতে উপদেশ দেন। বাবা বজরা করিয়া গঙ্গায় হাওয়া খাইতে বাহির হন। বরাবর সমস্ত দেশ দেখিয়া চুণার অবধি গঙ্গাবক্ষে গমন করিলেন। তৎপরে রেলপথে আগ্রা, মথুরা ও বৃন্দাবন গেলেন। আগ্রাতে বাবার বাল্যবন্ধু অবিনাশ বাবু ছিলেন। সেথান হইতে আসিবার সময় বাবা অবিনাশ বাবুকে বলেন, 'এদেশে আমার জন্য একটী ভাল চাকুরীর যোগাড় করিও। আমার বাঙ্গালাদেশ আর সহ্য হইবে না।'

বাবা চাকুরীতে ইস্তফা দিবার পর হইতে ঠাকুরদাদা বিশেষ বিরক্ত হন। সর্ব্বদা মা ও বাবাকে ঐ জন্য তিনি ভৎর্সনা করিতেন। আমার ধীরস্বভাবা জননী সমস্ত নীরবে সহ্য করিতেন, পিতাকে কিছুই জানাইতেন না। ঠাকুরদাদা একদিন স্পষ্ট করিয়া বাবাকে বলিলেন, 'আজ বাদে কাল জজ্ হইতে—এমন চাকুরী নিজের দোষে ত্যাগ করিলে! অতঃপর তোমার ছেলেপুলে কি খাইবে?' মা ও বাবা তিরস্কৃত হইয়া অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। মা জগদীশ্বরের চরণে কাঁদিয়া পড়িয়াছিলেন; প্রভাতে তিনি স্বপ্ন পাইলেন 'দয়া, ভাবিও না—তোমার দুঃখ দূর হইয়াছে।' পরদিন প্রভাতে মার মুখে হাসি দেখিয়া বাবা আশ্চর্য্য হইলেন। মা প্রসন্নমুখে বলিলেন, 'ভাবিও না, আমার দুঃখের দিনের আজ অবসান হইল।' সেইদিনই ৯টার সময় আগ্রার অবিনাশ বাবুর নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম

৺শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এল্

আসিল। তিনি জানাইয়াছেন যে, মথুরার শেঠেদের ষ্টেটে বাবার ম্যানেজারি চাকরী হইয়াছে। তখন মথুরায় রেল হয় নাই; আগ্রা হইতে ১৮ ক্রোশ উটের গাড়ী করিয়া যাইতে হইত।

আমরা মথুরায় চলিয়া যাইবার পর জ্যেঠাইমা (৺ গঙ্গা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী) বড়দাদা (৺সার আশুতোষ মুখার্জি) ও হেমলতাকে লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সেখানে যান। জ্যেঠাইমার আর একটী পুত্র ছিল,—তাঁহার নাম হেমন্তকুমার; তিনি ভবানীপুরেই থাকিতেন। বড়দাদা ও হেমলতা বেশ সারিয়া দশমাস পরে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

লেখিকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়—
৺সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল
ও ৺শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

বাবার তখনকার মনিব গোবিন্দদাস শেঠ। ইঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন। একটী পুত্র রাখিয়া বড় ভাই অল্প বয়সে মারা যান। তিনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। মধ্যম ভ্রাতা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন; তাঁহার সময়ে মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীবৃন্দাবনে রঙজীর মন্দির প্রচুর ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ও অতিথি সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য ছোট ছোট ঘর। একটী মন্দিরে শ্রীঅনন্তশয়নের প্রতিমা। লক্ষ্মীনারায়ণ ও অন্যান্য দেবতারও অনেক মন্দির আছে। আবার একটী উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত অঙ্গন, তাহার মধ্যে ভারতবিখ্যাত 'সোণার তালগাছ'। ইহারই সম্মুখে প্রকাণ্ড মারবেল্ পাথরের দালান ও রঙজীর মন্দির। এই অক্ষয় কীর্ত্তি কত দূরদেশ হইতে যাত্রীরা দেখিতে আসিত। দাক্ষিণাত্যে মাদুরায় যে মন্দির আছে, তাহারই অনুকরণে এই মন্দির তৈয়ারি হয়। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে বড় গজগিরি-করা পুষ্করিণী ও শেঠ সাহেবদের দপ্তরখানা ও বৈঠকখানা। তৎপার্শ্বে তিন চারি শত গুরুগোষ্ঠী বাস করেন; প্রত্যেকের বিভিন্ন বাড়ী। মন্দিরে যাহা ভোগ হয়, তাঁহারাই সব পান, একটী কণামাত্র আর কেহ পাইতে পারে না। শেঠ সাহেবেরা ৬০,০০০৲ টাকার ভোগ বৎসরে বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহার উপর তিন চারি খানি প্রকাণ্ড বাগান; এগুলিও অতি সুন্দর। মথুরায় শেঠসাহেবদের আবাসবাড়ীও অতি সুন্দর। ইহার বারান্দা যমুনার উপরে ঝুলিয়া আছে। সম্মুখে রাস্তার অপর পারে দ্বারকাধীশের মন্দির; ইনি কুলদেবতা। ইঁহারও বৎসরে তিন হাজার টাকার ভোগের বন্দোবস্ত ও হীরা জহরতও অনেক। এ-সব মধ্যম শেঠসাহেবের কীর্ত্তি। ইঁহার একটী মাত্র সন্তান, নাম লছমন দাস। ইনি তখনও নাবালক ছিলেন। নয় বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইঁহার কাকা গোবিন্দপ্রসাদ পরম বৈষ্ণব, বিষয়বিরাগী ও জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। বাবাকে ইনিই নিযুক্ত করেন ও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন।

ইতিমধ্যে বাবা ভবানীপুরে একবার আসিয়া বড়দাদার উপনয়ন দিয়া গেলেন। আমরা আবার মথুরায় গেলাম। পিসীমা ও আমাদের বাড়ীর একজন বিধবা রাঁধুনী মথুরায় দেবতার উৎসব দেখিতে যাইতেন। অন্নকূট, দেওয়ালী, কংসবধ, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও শরৎ-পূর্ণিমায় খুব ঘটা হইত। বাবার মনিব-বাড়ীর গাড়ীর অভাব ছিল না। সর্ব্বদা বন্ধু বান্ধব কত যে বেড়াইতে যাইতেন বলিতে পারি না। আমি তখন বাবার কাছেই পড়িতাম। পড়ার মধ্যে অবসর পাইলে দাদাদের সঙ্গে শেঠেদের বাগানে খেলা করিতাম। সেখানে ১০০টী ঘোড়া, ৪০টী উট, কতকগুলি হাতী, প্রায় ৮০টী গাড়ী টানিবার বয়েল ও বিস্তর ঘোড়ার গাড়ী, জুড়ি, বড় বড় ব্রুহাম, পাল্কীগাড়ী, ব্রেক ও টমটম থাকিত। গরু টানিবার

রথ, চূড়াওয়ালা ধামনী, সামপুনি, মঝুলি, এক্কা, উটের গাড়ী, পাল্কী, লালকি, সেয়ানা, ডাণ্ডি, ডুলিও থাকিত। এ-সব কোন সাহেব-সুবা বা রাজা আসিলে সাজান হইত। যেদিন বিবাহের লগ্ন থাকিত, কত আমোদ উৎসব হইত। হাতীকে রং দিয়া চিত্রিত করা হইত—কনে-চন্দন পরাইবার মত। ভাল জরীর আস্তরণ হাতীর গায়ে দেওয়া হইত, পায়ে ঝাঁঝর মল, কটিতে মেখলা, গলায় ছোট বড় ঘণ্টা ও সোণা রূপার বড় বড় হামেল পরানো হইত। সোণারূপার হলকরা হাওদা দেওয়া হইত, কিন্তু সজ্জা হইয়া গেলে হাতীকে আর রাখিবার যো থাকিত না—অহঙ্কারে অস্থির হইয়া মল বাজাইয়া চলিবে!

এই সময় কাশ্মীরের মহারাজা মথুরায় বেড়াইতে আসেন। সঙ্গে নীলাম্বর বাবুও ছিলেন। কাশ্মীর রাজ-সরকারে কাজ করিবার জন্য তিনি বাবাকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু শেঠজী কিছুতেই ছাড়িলেন না। শেঠ সাহেবের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় বাবা দেশে গেলেন। ছোটদাদার উপনয়নের সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে আমার পিতার একজন ভাইঝির—ব্রজবালা দিদির—বিবাহ হইল। তাহার পূর্ব্বে বিবাহ কখনও দেখি নাই। আমার খুব আমোদ হইল। ভগ্নীপতি দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে আদর করিয়া কি পড়ি, কি নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরদিন বৈকালে ব্রজদিদি শ্বশুর বাড়ী গেল, আমি খুব কাঁদিতে লাগিলাম। আমার পিতামহী আমাকে আদর করিয়া কহিলেন, আমাকেও ঐরূপ পরের বাড়ী যাইতে হইবে—সকলেই যায়, শুধু ব্রজবালাকে লইয়া গিয়াছে তাহা নয়।

লেখিকা ও তাঁহার স্বামী ৺শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল

আবার আমরা মথুরায় ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের বাড়ীর রাঁধুনী সৌদামিনী বেশ ভদ্র ঘরের মেয়ে। সে আমায় প্রায়ই সকালে যমুনায় স্নান করিবার জন্য লইয়া যাইত। প্রায়ই আমরা বিশ্রাম ঘাটে যাইতাম। সেই সমস্ত প্রাতঃকালের কথা আজিও আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। বিশ্রামঘাটে ত্রিলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ কংস-ধ্বংস করিয়া বিশ্রামার্থ বসিয়াছিলেন। কলনিনাদিনী সুরতরঙ্গিণী যমুনা সেই স্থানকে ধৌত করিয়া প্রবাহিতা;—অদূরে পূর্ব্বগগনে সবিতৃদেব উদয় হইতেছেন, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শত শত চৌবে ও চৌবেণী স্নানার্থ আসিতেছেন; কেহ বা স্নান সমাপন

করিয়া উদাত্তকণ্ঠে স্তবগান করিতেছেন ও পূজা করিতেছেন। তাঁহাদের অলোকসামান্য রূপে ঘাট উদ্ভাসিত। কোন কোন চৌবের কন্যার সহিত আমার অত্যন্ত আলাপ ছিল। অনেকের পিতামাতা সর্ব্বদা আমাদের বাড়ী যাতায়াত করিতেন। শেঠেদের দরবারে সর্ব্বদাই অনেকের অনেক রূপ প্রয়োজন থাকিত। তাহারা আমাকে 'সখী'—সম্বোধন করিত; কেহ বা কাছে বসিয়া গল্প করিত—যতক্ষণ না সদু দিদির স্নানাহ্নিক শেষ হয়। ঘাট হইতে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে প্রণাম করিয়া পার্শ্বে মহাদেব ও গৌরীর প্রতিমা দর্শনে যাইতাম। অতি সুন্দর মূর্ত্তি—গৌরী শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত ও মহাদেব কৃষ্ণ কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। সময় থাকিলে কুঞ্জানাথের মন্দির, দ্বারকাধীশের মন্দির ও গোবিন্দ গোপীনাথ দাউজি দর্শন করিতে যাইতাম। এখনও এই বৃদ্ধ বয়সে শৈশবের সেই নির্ম্মল দিনগুলি সিনেমার ছবির মত চক্ষের সমক্ষে ভাসিতেছে!

(ক্রমশঃ)

মাতৃস্তোত্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

মাগো আমার পুণ্যময়ি,
তুমিই আমার জগন্মাতা;
জনম জনম পেলাম তোমার
এই করুণা এই মমতা।
গুল্ম হয়ে বসুন্ধরে
স্তন্য তোমার টেনেছি গো;
তারা হয়ে নীলিমা তোর
বুকের দরদ জেনেছি গো।
চাতক হয়ে তোমায় আমি
কাতর হয়ে ডেকেছিলাম,
পূর্ণিমা তোর সুধার আদর
চকোর হয়ে চেখেছিলাম।
বৎস হয়ে শ্যামলী তোর
সাথে সাথে ছুটেছি গো
হরিণ-শিশু তোমার সাথে
কোথায় তৃণ খুঁটেছি গো।
তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী
তুমি আমার ডাকিনী মা,
উষ্ণতা এই রক্তে দিলে
দুগ্ধ তোমার, বাঘিনী মা।
দোলনাতে মা জনম জনম
তুমিই আমায় দোল দিয়েছ;
আমি যখন কুসুম কোরক
লতা হয়ে কোল দিয়েছ।

দুখিনী মা আমায় নিয়ে
ভিক্ মাগিয়া কেঁদেছ গো
শবরী মা আঁচল দিয়ে
বুকে আমায় বেঁধেছ গো।
আমার লাগি হর্ম্ম্য রচি'
আপনি থাক শ্মশানে মা;
চণ্ডী হয়ে আমার লাগি
তুমিই ছোট মশানে মা।
বুঝতে পারি পক্ষিনী মা
এই বুকেতে 'তা' দিয়েছ;
এক ঠাঁয়ে আজ সব পেয়েছি
জনম জনম যা দিয়েছ।
তোমার ডাকে চাঁদ আমারে
টিপ্ দিয়ে যায় বরণ করি,
সাঁজের প্রদীপ লয় মা আমার
আলাই বালাই হরণ করি।
পান্না ঝরে কান্নাতে মোর
মাণিক ঝরে হাস্যেতে গো
লুকাচুরি খেলেন গোপাল
কোমল কচি আস্যেতে গো।
জনম জনম মা হয়েছ,
জনম জনম হবেও মা;
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার,
তোমার কাজল, তোমার চুমা।

জীবনের নিত্য-স্রোতে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

যেখানে সেখানে নয়, একেবারে ড্যালহাউসি স্কোয়ারের চৌমাথায় দেখা। দেখা হওয়াটা অস্বাভাবিকও নয়, অপরাধও নয়; কিন্তু সময়টা আলাপের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। চলমান জনস্রোতের মধ্যে সত্য হঠাৎ থেমে তার পাশের আর একটী পথিককে প্রশ্ন করলে—সুশীল যে, কি খবর? কোথায় কাজ কচ্ছিস? সুশীল সংক্ষেপে জবাব দিলে—চাকরি নেই। খুঁজতে বেরিয়েছি।

সত্য হেসে উঠল। তা ভাল। এরকম খোঁজার ব্যাপার কতদিন চলেছে? অনেকদিন বোধ হয়?

সুশীল কোন কথা বললে না।

গির্জ্জের ঘড়িটার দশটা ঘণ্টা যেন দশ ঘা চাবুক। মানুষের গতি বাড়িয়ে দিলে। মোটারের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের ছোটার সে কী প্রাণপণ চেষ্টা! সুশীল বললে—তোমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে সত্যদা। দশটা বেজে গেল।

সত্যর মুখে আবার হাসি দেখা দিল। তারপর একবার গির্জ্জের চূড়ার ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে—আমার সময়টাকে আমি ঐ তোমাদের ঘড়ি দিয়ে ঠিক মাপ করতে পারি না। রোজই এক সময়ে গিয়ে গিয়ে একেবারে একঘেয়ে লাগছে। আজ না হয় একটু দেরীই হ'ল। আমার খুসীটা কি কিচ্ছু নয়? সুশীল একটু অবাক হ'য়ে সত্যর মুখের দিকে চাইতে সত্য বললে—আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছিস, না? আরে এগুলো হচ্ছে আমার মনের কথা। আপিসের সাহেবদের মনের কথা নয়। এই তফাতের জন্যে হাঙ্গাম যে বাধে না তা নয়; তবে 'বেঁধে মারে সয় ভাল'।

সুশীলের মুখে এবার হাসি দেখা গেল। বললে—আমার কিন্তু মনে হয় আমার কাজ আমি ঠিক ঠিক সময় মতো করে যাব। আমার সত্য কর্ত্তব্যের ত্রুটী আমি হতে দেব কেন?

সত্য তার কথা শুনে এমন ভাবে মুখ বিকৃতি করলে যে সুশীল আর কিছু বলবার চেষ্টাই করলে না। সত্যকে সে জানত। শ্রদ্ধাও করত। নেহাৎ খেয়ালী বলে তাদের গ্রামের মাতব্বররা যখন সত্যকে কিছু বলত, তখনকার কথা সুশীলের মনে আছে। সত্যর কথা ও যুক্তিতে কেউ ফাঁক দেখাতে পারত না। সুশীলের শ্রদ্ধা তখন থেকে। কাজেই আজ সত্যকে বিমুখ হতে দেখে যে আশ্চর্য্য হল। সত্য বললে—দেখ সুশীল, ওসব হচ্ছে কথার কথা। নিছক সত্য বলে কিছু নেই। ব্যবহারিক জগতের 'সত্য' জিনিষটার চেহারার সঙ্গে 'মিথ্যা' জিনিষটার চেহারার কোনও তফাৎ নেই। আসলে ও দুই-ই এক।

সুশীল এর একটা জবাব দেবার জন্যে—'কিন্তু' বলতেই সত্য তাকে বাধা দিয়ে বললে—দেখ, ও নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। কারণ এ তর্ক এখানে দাঁড়িয়ে এক আধ মিনিট কেন, সমস্ত দিন ধরে করলেও মীমাংসা হবে না। খালি পুঁথি বেড়ে যাবে। এখন এসব কথা থাক। এ বিষয়ে যদি উপদেশ চাস, ত যাস আমার বাসায় একদিন সন্ধ্যের পর। তারপর না হয় তোর বৌদির হাতের রান্নাও খাইয়ে দেওয়া যাবে।

সুশীল একটা কৃত্রিম ঔৎসুক্য দেখিয়ে বললে—বৌদিকে এখানে এনেছ না কি?

—আর না এনে করি কি? দেশে যাওয়া আসা করতেও ত বড় কম খরচ হত না। তা ছাড়া রেলের কষ্ট। অনেক হিসেব-পত্তর ক'রে ভেবে চিন্তে কলকাতাতেই বাসা বাঁধা গেছে।

সুশীল নেহাৎ জিজ্ঞাসার ভাবে বললে—আর দেশের বাড়ী? চাবি বন্ধ ত?

নিশ্চয়। কে দেখবে? শেয়াল কুকুরে এসে বোধ হয় এতদিনে বাসা বেঁধে ফেলেছে। তাদেরও ত একটা আস্তানা চাই। কথা শেষ করে সত্য নিজের রসিকতায় নিজেই শুধু হেসে নিলে।

সুশীল চুপ করে রইল। সত্য তার মুখের দিকে চেয়ে

বললে—তুই বোধ হয় ভাবচিস্ এমনি করেই গাঁগুলো সব শ্মশান হয়ে যায়।

—শুধু কি তাই ? আমরাও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। সুশীলের চোখের দৃষ্টি একটা সুস্পষ্ট বেদনার ছায়ায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। গভীর তমাল দীঘির কালো জল যেন সন্ধ্যার ছায়ায় ঘনতর হ'য়ে উঠল।

সত্য সুশীলের হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে—নাঃ, ব্যাপারটা বড্ড গম্ভীর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন তাহলে যাওয়া যাক।

সত্য হনহন করে তার গন্তব্য পথে পাড়ি দিল। আর সুশীল কোন্ দিকে যাবে, স্থির করার জন্যে লালদীঘির কোণে দাঁড়িয়ে ভাববার চেষ্টা করতে লাগল।

পথে তখন লোকের চেয়ে গাড়ীর সংখ্যা বেশী। সময়ের স্রোত যে যত শীঘ্র সাঁতরে পার হ'য়ে যেতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা। গাড়ীর পর গাড়ী মোটারের পর মোটার ··শুধু দৌড়।

কিছুদূরে পাথরের একটা স্মৃতি স্তম্ভ। ওটা যেন কার তর্জ্জনী। শুধু শাসাচ্ছে আর শাসাচ্ছে।

সুশীলের মনে হল—স্মৃতিচিহ্নের নাম দিয়ে প্রতিশোধ তোলবার কি চমৎকার ইঙ্গিত! আজ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, এরা প্রতিদিন প্রভুত্বের ছদ্মবেশে প্রতিনিয়ত একটা কল্পিত অত্যাচারের প্রতিবিধান করবার জন্যে নির্ব্বিচারে রূক্ষ ব্যবহার করে যায়।

যা মিথ্যা তা কি এমনই ভাবেই অটুট থাকবে!

সেদিন আর চাকরী খোঁজা হল না। বিরক্ত ভাবে সে আপিস অঞ্চলের পথ ত্যাগ করলে।

পথের ভিড় তখন কমে গেছে। কেমন যেন একটা থম্‌থমে ভাব। অত্যন্ত গভীর একটা গাম্ভীর্য্যের ছায়ায় যেন সবটা ঢেকে ফেলেছে। সুশীল ধীরে ধীরে অত্যন্ত তিক্ত মনে বাসার দিকে ফিরল।

বাসায় তখন কেউ বড় নেই। সমস্ত ঘরগুলি যেন আলস্য-ভরে ঝিমচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তার কাণে এল তাদের বাসার সবচেয়ে পুরানো বাসীন্দা সনাতনবাবুর গলা। কালাকাল বিবেচনা না করেই তিনি একটা অসময়ের গান গাইছেন ·····

সুশীলকে দেখেই হঠাৎ গান থামিয়ে তিনি শুধোলেন—কি সুশীল, ফিরলে যে ?

কি আর করি। সুশীল এর চেয়ে সংক্ষেপে জবাব বোধ হয় খুঁজে পেলে না। তার সুরে তিক্ততার আমেজ মেশান।

—আপিসগুলোর সব দরজা বন্ধ দেখলে ত ? ও বন্ধ দরজা খুলতে গেলে মাথার জোর চাই। বুঝলে ? ভদ্রলোক কথা বলে নিজেই হেসে নিলেন।

সুশীলও নেহাৎ না হাসলে ভাল দেখায় না বলে অল্প একটু হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সে ত হাসি নয়। সে যেন জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রে তপ্ত পাষাণের নীরব আর্ত্তনাদ—ব্যথায় চিড় খেয়ে দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে পড়তে চায়।

ভদ্রলোকটী সুশীলের দিকে চেয়ে হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্ত্তন করে বললেন—নেহাৎ ছেলেমানুষ তুমি সুশীল! সামান্য সহানুভূতিতে এতটা চঞ্চল হয়ে পড়লে! আমি ত জানি, এ কী কৃচ্ছ্র সাধন। মনকে আমার মন বলে মানতে পারবে না। যা আমি বুঝি বলে মনে করবে তা ভুলে যেতে হবে। কুকুর যা করতে লজ্জা পায় তাই সগৌরবে বুক ফুলিয়ে করতে হবে। তবেই সিদ্ধি। মোক্ষও হতে পারে। হয় ত চতুবর্গফলও লাভ করা যেতে পারে।

ভদ্রলোকটীর মুখে এবার এক আশ্চর্য্য হাসির রেখা খেলে গেল—স্তব্ধ বর্ষারাতের অশ্রান্ত ক্রন্দনধারার মাঝে যেন ক্ষীণ বিদ্যুতের চমক।

তারপর হঠাৎ নিজের কথা বলার ভঙ্গীটার পরিবর্ত্তন করে সনাতনবাবু বললেন—মানুষের অভাব-অভিযোগের আর অন্ত নেই। ও বলে ফুরোবার নয়। তার চেয়ে এখন ঘরে গিয়ে ভাল করে বিছানায় শুয়ে আরাম কর গে। সেই ভাল।

সনাতন বাবু কথা শেষ করেই মুখ ফিরিয়ে আর একটা কিছু ভাববার ভান করলেন।

সুশীল ক্লান্তপদে, অত্যন্ত অবশ শরীর ও মন নিয়ে তার নিজের কুঠরীটীতে ফিরে এল।

ঘরে তখন আর একটীমাত্র অধিবাসী প্রিয়বাবু। বিছানার চারপাশে কাগজপত্র ও বই স্তূপীকৃত করে তিনি তার মধ্যে ডুবে আছেন। সুশীল ঘরে আসায়, দরজার আলোর পথে বাধা পড়ায় একবার মুখ তুলে চেয়ে আবার বইয়ের সমুদ্রে ডুব দিলেন।

বিছানাটা না পেতেই সুশীল তার ওপর শুয়ে পড়ল।

আজ যেন তার নিজেকে অত্যন্ত অবসন্ন মনে হচ্ছিল। শুয়ে শুয়ে সে এই দুর্ব্বলতার যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।

এর চেয়ে বেশী সে বহুদিন হেঁটেছে। আজ ত সবে সে বার হ'য়েছিল মাত্র।

রূঢ় ব্যবহার, নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের আঘাত, সবই সে এতদিন প্রায় নির্ব্বিচারেই সহ্য করে এসেছে। আজ ত কারো কাছেই সে যায়নি।

বাইরের আঘাতটাই কি সব? ঝড়-ঝাপ্‌টাকে সহ্য করেই ত বীজের অঙ্কুর বৃক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। পাতা পড়তে পারে, কিন্তু যা থাকে তার রঙ মলিন হয়ে যায় না। পৃথিবীতে রসের উৎস অফুরান। কিন্তু ক্ষয়ের গ্রহণ যখন লাগে মূলে, তখন গাছের ওপরকার পাতা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। রসের সঞ্চার তখন হয়ে যায় বন্ধ। চোখে ত এ আঘাত ধরা পড়ে না।

সুশীল ভাবে—একটা আশার বাণী কেউ শোনাল না।···

চিন্তার তেপান্তরের মাঠে তার মনের ঘোড়া ছুটে হারিয়ে যায়। কোন কিনারা মেলে না।

অনন্ত আকাশের বুকে কালো ফোঁটার মতো একটা চিল ডানা মেলে পাক খেয়ে মরচে।

কলকাতার এই স্তব্ধ দুপুরের রূপ আজ যেন অপরূপ হ'য়ে তার কাছে ধরা দিল।

এ যেন এক নটী। ভরা আসর থেকে হঠাৎ শ্রোতারা উঠে চলে গেছে। হয় ত এখুনি তারা ফিরবে, হয় ত তারা আর ফিরবেও না। আশা ও আশঙ্কায় সে বিস্ময়ে বিমূঢ়। হতবাক্ প্রতীক্ষমানা।

হঠাৎ প্রিয়দা'র গলা সুশীলের কাণে গেল। সুশীল যেমন নিশ্চেষ্ট ভাবে শুয়ে ছিল, ঠিক তেমনই ভাবে শুয়ে একবার প্রিয়দা'র দিকে দৃষ্টিপাত করলে। প্রিয়দা'র এ ভাবের ডাকের যে কোন সার্থকতা নেই তা সে জানত। হয় ত যখন খুব দুরূহ একটা কোন সমস্যার মীমাংসা আর কিছুতেই হচ্ছে না, তখনই মনটাকে একটা ভিন্ন পথে চালাবার জন্যে প্রিয়দা', তার ঘরে যে কেউ থাকত তাকে ডেকে একটা কোন তর্ক করবার চেষ্টা করত। মনটাকে বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে সমস্যার উপর একটা নতুন আলোকপাত করবার চেষ্টার কথা সুশীলের অজানা ছিল না। এবারও সেই রকমই একটা কিছু মনে করে নেহাৎ তাচ্ছিল্য ভাবে চোখ ফেরাতেই, সে দেখলে প্রিয়দা' একগাদা কাগজের ওপর কি যেন লিখে চলেছেন। শুধু পায়ের পাতাটা একটা তালে নাড়ছেন। সুশীল সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভাবে বললে—কি বলছিলে প্রিয়দা'?

লেখার পালাটা শেষ না করেই প্রিয়বাবু মাথাটা গুঁজেই বললেন—ও। হ্যাঁ। আজ কাগজে একটা চাকরি খালি দেখলুম। এক আপিসে একটী লোক চেয়েছে। সেই আপিস যার, তার সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আমি বরং একখানা চিঠি দিতে পারি। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

শরীরের সমস্ত অবসন্নতাকে আক্রমণে একেবারে বিধ্বস্ত করে একটা উত্তেজনার জোয়ারের চাঞ্চল্যে সে যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু সে ভাবটাকে মৌখিক একটা অবসাদে দমন করে বললে—না, ক্ষতি আর কি? দু'শ জায়গায় যে ঘুরে দেখতে পারে, দু'শ এক জায়গায় দেখতে তার আর আপত্তি কি?

আমার মনে হয় এটা বোধ হয় হবে। বলে' প্রিয়বাবু আবার তাঁর লেখায় ভাল করে মন দিলেন।

সুশীলের মন প্রিয়দার কথায় একেবারে পূর্ণভাবে সায় দিয়ে বসল।

ছেলেরা সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদ্ নিয়ে যেমন খেলা করে, সুশীল ঠিক সেই ভাবে তার এই আশার বুদ্‌বুদ্ নিয়ে চিন্তা করতে বসল। তার মধ্যে আছে আগ্রহ, উত্তেজনা, আশঙ্কা। বেশী ভাবতেও সে সাহস পাচ্ছিল না; আবার না ভেবেও স্থির থাকতে পারলে না।

এমন অবস্থায় প্রায় একরকম জোর করে নিজেকে চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যে সে ভিন্ন দিকে মুখ ফেরাতেই, সেই ঘরের ঘড়িটার দিকে তার চোখ পড়ল। তখন সবে দুটো বেজেছে।

ঘড়ির কাঁটাটা শুধু সময় নয় একটা পন্থাও নির্দ্দেশ করে দিলে। তার মনে হল, এখনও ঢের সময় আছে। কাজটার জন্যে সেইদিনই একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রিয়দা'র কাছে উত্থাপন করবার জন্যে সেইদিকে চাইতেই দেখে—প্রিয়দা' তখন হাতের কলম ফেলে দিয়ে, প্রায় নিষ্ক্রিয় ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন।

নিজের উৎসাহটাকে সংযত করে অত্যন্ত ধীরভাবে সুশীল ডাকলে—প্রিয়দা' !

প্রিয়বাবু চমকে উঠে বললে—সুশীল ? ডাকছিলে ?

সুশীল বললে—হাঁ, আমি বলছিলুম কি—আজ একবার চেষ্টা করলে হয় না। যে বাজার, হয় ত এতক্ষণে লোক এসে গেছে। তুমি যদি একবার চিঠিটা লিখে দাও। কথাটা সুশীল নেহাৎ যেন অপরাধীর মতো শেষ করলে।

বেশ, বেশ, এখুনি লিখে দিচ্ছি। প্রিয়দা' একখানা চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করে দিলেন। খানিকটা ফস্ ফস্ করে লিখে প্রিয়বাবু সেইটা একবার চেঁচিয়ে পড়ে বললেন—এতে হবে না ?

সুশীল বললে—এতে যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে আর কিছুতেই হবে না।

চিঠি নিয়ে সুশীল নীচে নামছে, পথে আবার সনাতন বাবুর সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক তখনও বসে বসে তাঁর গানের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন। জিগ্যেস করলেন—কোথায় ?

উৎফুল্লতাকে যথাসম্ভব গোপন করে, একটা চেষ্টাকৃত ম্লান হাসি এনে বললে—একবার ঘুরে দেখি। এখনও ঢের বেলা আছে।

—কি আর বলব। শিবস্তু তব পন্থানম্। একটা দিব্য প্রশান্তিতে সনাতন বাবুর মুখখানি ভরে উঠল।

বাসা থেকে আপিস নেহাৎ কমদূর নয়। উৎসাহের ভরে অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করার পর পথের দীর্ঘতা যেন দুঃসহ মনে হতে লাগল। মনে মনে উৎসাহের তেজও ম্লান হয়ে এল। শেষে এমন অবস্থা যে আপিসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার মনে হ'ল, যার কাছে এসেছি তার সঙ্গে যদি দেখা না হয় তাহলে সে যেন বেঁচে যায়। অপর ফুটপাথে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মনের এই ক্লৈব্য অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে প্রায় মরীয়া হ'য়ে সে আপিসে ঢুকে পড়ল।

আপিসটা যে বাঙালার তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে একটা আড়ম্বরের চেষ্টা আছে ; কিন্তু শৃঙ্খলা নেই। বৈদেশিকতার একটা অত্যন্ত সুলভ অনুকরণের প্রাচুর্য্য সমস্ত সঙ্গতির সুরমাধুর্য্য একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু এ সব দিকে নজর দেবার মতো অবস্থা তখন সুশীলের ছিল না। সে কৃত্রিম একটা সন্তর্পণতার সঙ্গে সামনেই সেখানকার যে কর্ম্মচারীকে দেখতে পেলে, তাকে প্রশ্ন করলে—মিঃ চক্রবর্ত্তী আছেন ?

কর্ম্মচারীটির নিবিষ্টতা যেন বেড়ে গেল। সুশীল দাঁড়িয়ে ভাবলে এর চেয়ে সে না এলে ভাল হত।

বোধ হয় মিনিট দুই বাদে কর্ম্মচারীটী মুখটি তুলে সুশীলের দিকে চেয়ে বললেন—কি বললেন ? মিঃ চক্রবর্ত্তী ? হাঁ আছেন।

সুশীল তার পকেট থেকে একটুক্রা কাগজ বার ক'রে তাতে তার নাম লিখে বললে—এইটে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে ?

—ও শ্লিপ টিপের দরকার নেই। আপনি যান। ওই বাঁ দিকে। ভদ্রলোক আবার তাঁর কাজে ডুবে গেলেন।

সুশীল ভাবলে—দূর ছাই, দেখা না করেই যাই চলে। সে চলে আসবে ভাবছে, এমন সময় সামনে একটা বেয়ারাকে দেখে তার মতের পরিবর্ত্তন হল। সে তাড়াতাড়ি শ্লিপটা বেয়ারার হাতে দিয়ে বললে—মিঃ চক্রবর্ত্তীকে এটা দিয়ে এস। বেয়ারাটা একবার সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে শ্লিপটা নিয়ে চলে গেল। সুশীল সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার হৃৎপিণ্ডের গতি তখন অসম্ভব মাত্রায় বেড়ে গেছে। এঞ্জিনের ভার হঠাৎ কমে গেলে, তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে, ফ্লাই হুইল যেমন ক্ষেপে যাবার মতো ঘুরতে থাকে, সুশীলেরও তখন প্রায় সেই অবস্থা।

বেয়ারা ফিরে এসে বললে—সা'বকে দিয়েছি। আসুন।

কোন কিছু ভাববার চেষ্টা না করে সুশীল বেয়ারার সাথী হল।

একটা বড় ঘরের খানিকটা কাঠের পার্টিসান দিয়ে আলাদা করা। সেইটা বড় সাহেবের ঘর। বেয়ারা দরজাটা খুলে দিতেই সুশীল ঘরে ঢুকল। কিন্তু ঘরের লোকটীর দিকে চাইতেই তার মনের মধ্যে একটা মস্ত বিপ্লব বেধে গেল। সে কার কাছে চাকরী চাইতে এসেছে ? তারই সতীর্থ—অমল চক্রবর্ত্তী। পৃথিবীতে তখন ভূমিকম্প হয়েছিল কি না, পরের দিনের কাগজে সে খবর বার হয় নি। কিন্তু সুশীলের কাছে পৃথিবীর এ দৌর্ব্বল্য ধরা পড়েছিল। তাই সে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে নিয়ে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করলে।

অমল তার প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বসে,

হাতের কাজ থামিয়ে মুখ তুলে একবার সুশীলের দিকে চেয়ে মুহূর্ত্তের জন্য একটু চিন্তা করে বলে—ও; সুশীল? কি খবর?

চাকরীর কথা-টথা সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। এতদিন যার সঙ্গে সে মাথা উঁচু করে কথা কয়ে এসেছে আজ তার সামনে মাথা নীচু করে কথা কওয়া! অসম্ভব।

প্রিয়দা'র চিঠি চুলোয় যাক। চাইনা চাকরী। তার এখন মনে হতে লাগল কেমন করে এই অবস্থা-সঙ্কট থেকে তার উদ্ধার হবে। নিজেকে যথাসম্ভব সচেতন করে, সমস্ত জড়ত্বকে অতিক্রম করে সুশীল বললে—এই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম বহুদিন দেখাটেখা হয়নি। একবার ঘুরে যাই। তার কথা শেষ হল বটে কিন্তু কথা তেমন স্পষ্ট হল না।

অমল চোখ থেকে চশমাটা খুলে, মুছতে মুছতে একটা ঈষৎ বক্রহাসি হেসে বললে—এখন করছ কি? চাকরী? কথাটা বলেই সেটা সংশোধন করার জন্যে সময় না দিয়েই সে আবার সুরু করলে—ওহো, চাকরী ত তুমি ছেড়েই দিয়েছিলে? কিসের ব্যবসা ফেঁদেছ?

সুশীলের কাণ দুটো যেন অত্যধিকভাবে তপ্ত মনে হল। তবুও স্থির ভাবে সে একটা দুঃখের ভান করে বললে—ব্যবসা করবার মতো টাকা কোথায়? বিনি টাকায় যা হয় তাই করছি। দালালি আর কি।

—I see। চশমাটা যথাস্থানে ফিরে এল। মুখখানা একবার বিকৃত করে চশমাটা ঠিকমতো বসল কিনা পরখ করে, অমল বললে—বাজার কি রকম?

সুশীল দালালির কথা বলেই যেন বড় বিপদে পড়েছিল। কারণ তার হঠাৎ মনে হল এইবার অমল যদি খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা-বাদ করে তাহলে সে আর কিছুতেই অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু অমল সে পথে না যাওয়ায় সুশীল যেন একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। তারপর অমলের কথার জবাব দেবার জন্যে বললে—বাজার তেমন সুবিধা নয়।

এইটাই সে প্রচলিত বাঁধিগৎ বলে জানত।

অমলের কাছে এ কথা নতুন নয়। বাজারের হালচাল তার অজানা নয়। এ সম্পর্কে আর বেশী কথা বলা অনাবশ্যক ভেবে ভদ্রতার খাতিরে সে বললে—অনেকদিন পরে দেখা। সেই প্রথম চাকরী ছাড়ার পর দেখা হয়েছিল। তার পর অবশ্য আমিও এখানে ছিলাম না। সারা ভারতবর্ষটাকে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। এখন দেখছি ওদেশটাকেও ঘুরে আসা দরকার। সে যাক। তোমার আর কি খবর? ছেলেপিলে?

সুশীল যেন একটা মুক্ত জায়গায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বললে—না, ও বালাই নেই। ওর গোড়ার পথই মেরে রেখে দিয়েছি। গলগ্রহ আর জোটাই নি। বলে নিজে খেতে পাই না।

অমল একটা সশব্দ হাসি হাসবার চেষ্টা করলে। ভদ্রতাসঙ্গত হাসির শব্দ যতটা হওয়া উচিত, অমলের হাসির আওয়াজ তার চেয়ে বেশী হয়নি এটুকু হলফ্ করে বলা যায়। হাসি শেষ হলে অমল বললে—যাক এ কথাটা শুনে খুসী হওয়া গেল। বিয়ে করা ব্যাপারটা বড় সোজা নয়। আমাদের মতো গরীবদের দেশে এ কথাটা খুব কম লোকেই বোঝে। অথচ এ কথাটা সকলেরই বোঝা দরকার। আমারও মনে হয়, আমরা যে financial অবস্থার দিক থেকে খুব পিছিয়ে পড়ে আছি, এটা তার একটা খুব বড় কারণ। এমন কি না-ভেবেচিন্তে ঐ বিয়ে করে করে যে আমরা সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, এ কথা বললে যে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, তা আমি মনে করি না।

সুশীল ফস্ করে জবাব দিলে—অবশ্য তোমার মনে করা-না-করায় খুব যায়-আসে না। অমলের মুখখানা যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—না, তা অবশ্য ঠিক কথা। আরও হয় ত কিছু সে বলত, কিন্তু টেবিলের ওপর টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে ওঠায়, সে হঠাৎ কথা বন্ধ করে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলে।

সুশীল এই সুযোগ পেয়ে বললে—আর তোমায় disturb করব না! আসি এখন।

অমল তখন টেলিফোনে কথা সুরু করে দিয়েছে। সে শুধু ঘাড় নাড়লে। সুশীল তাড়াতাড়ি সে ঘর হতে বার হয়ে এল। এ যেন প্রাণ, প্রাণ ত তুচ্ছ মান নিয়ে পলায়ন।

আপিস ত্যাগ করে পথের খর রৌদ্রে যখন সে এসে দাঁড়াল তখন সে সমস্ত ব্যাপারটা একবার আদ্যন্ত ভেবে দেখবার চেষ্টা করলে।

—কোথায় চাকরী আর কোথায় কি? পকেট থেকে

সে প্রিয়দা'র চিঠি বার করে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

মানুষ রাস্তায় চলতে গিয়ে পড়ে গেলে দুঃখিত হয় তখন, যখন সে দেখে অপরে তাকে অতিক্রম করে চলে গেল। এটা ঠিক নিছক দুঃখ নয়, এর মধ্যে হিংসার ভাগও আছে। কথাটা শুনতে একটু শ্রুতিকটু হলেও অসঙ্গত কিছু নয় এবং এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। সুতরাং অমলের আপিস ত্যাগ করে পথে বার হবার পর ওইভাবে প্রিয়দা'র চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ায় তাকে কোন দোষ দেওয়া যায় না। তার মনের মধ্যে যে যুদ্ধার্থী মানুষটা এতদিন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিল, আজ সে যেন হঠাৎ একটা পরাজয়ের বেদনায় গুমরে উঠিল। তার মনে হল পৃথিবীর সকলে যেন তাকে ফেলে এগিয়ে চলে গেল। সে ক্রমাগত পিছিয়েই পড়ছে।...

আত্মগ্লানির এই দাহের জ্বলনে অস্থির হয়ে সে ভাবলে—আর কেন? এ পৃথিবীতে সকলের চেয়ে হীন হয়ে থেকে লাভ কি? কোনো রকমে ট্রাম কি বাসের তলায় পড়ে গেলেই ত সব আপদ চুকে যায়।

কিন্তু......

এই এক কিন্তুতেই সব গোল বেধে গেল। কি উপায়ে আত্মহত্যা করলে সবচেয়ে কম কষ্ট হবে চিন্তা করতে করতে প্রকৃত পন্থাটা আর স্থির করা হল না। তার জানা যতগুলি উপায় ছিল তার কোনটাই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল মনে হল না। হয় ত নতুন দু একটা উপায় সে বার করা যেতে পারত; কিন্তু তার আগেই আপিস ফেরার পথে সত্য তাকে দেখে বললে—সুশীল যে,—এখনও ঘুরছিস না কি?

হঠাৎ সুশীলের মুখের দিকে তার দৃষ্টি পড়াতে চমকে উঠে সত্য বললে—তোর হয়েছে কি? বড্ড যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

তার কণ্ঠে একটা সত্যকারের দরদ। বয়স্থ মানুষের মধ্যেও একটা শিশুভাব ঘুমন্ত থাকে। ব্যথা ও বেদনার সহানুভূতিতে সেই কেঁদে বিহ্বল হ'য়ে ওঠে। আজ সত্যর কথায় সুশীলের ভিতরটাও কেঁদে উঠল। কিন্তু সে ভাবটাকে প্রকাশ না করে সুশীল শুধু সত্যদার মুখের দিকে চাইলে।

সত্য তার কাঁধে নিজের হাতটা রেখে বললে—ক্লান্তিটা ঘোরার নয় নিরাশার, তা বুঝি।

তার পর তাকে উৎসাহ দিয়ে বললে—আজ বড্ড বেশী ঘুরেছিস তাই বোধ হয় খুব ক্লান্তি মনে হচ্ছে। এখন আর ঘুরে লাভ কি? চল, এগিয়ে যাওয়া যাক্।

সুশীল সত্যর সঙ্গে যন্ত্রের মতো এগিয়ে চলল।

পথ চলতে চলতে সাথিটীর দিকে চেয়ে সত্য বললে—তুই যেন একেবারে ভেঙে পড়েছিস! কেন হয়েছে কি? চাকরী না পাওয়ার দুঃখটাকে এত বড় করে দেখছিস কেন?

সুশীল বললে—বড় বলে স্বীকার করা ছাড়া যে গতি নেই। আমাদের দুঃখ কষ্ট যে ওর ওপর নির্ভর করছে।

চলতে চলতেই সত্য এমনভাবে হেসে উঠল যে পথের অন্য লোকে তাকে একটা অপরূপ কিছু মনে করে একবার রুক্ষভাবে তার দিকে তাকাল। সত্য কিন্তু কিছু ভ্রূক্ষেপও না করে বললে—ওটা খুব একটা তুচ্ছ কথা। দুঃখ জিনিষটাকে অত ভয় করলে চলবে কেন? থাক না দুঃখ! হঠাৎ থেমে গিয়ে সত্য গলার স্বর বদলে বললে—হয় ত আমার কথা মনে হবে উপদেশ, কি কাব্য, কি প্রলাপ। যাই হোক, এটা ত সত্যি যে অমাবস্যাটাই শুধু একা আসে না; পূর্ণিমাকে ভুলে চলবে কেন?

কথাটা বলেই তার মনে হল—হয় ত কথাগুলো ঠিকমতো সুশীলকে ঘা দিতে পারবে না, তাই সে কথা থামিয়ে শান্ত ভাবে বললে—দেখ ভাই যুক্তি দিয়ে কি উপমা দিয়ে কাউকে কোন কথা বোঝান যায় না। বুঝতে গেলে তাকে নিজের চিন্তা দিয়ে দেখতে হবে। তবেই গ্রহণ করতে পারবে। কথাগুলো একবার নিজের মনেই [illegible] করে ভেবে দেখিস ত।

চলতে চলতে একটা মোড়ের মাথায় এসে সত্য বললে—আমি চললুম ভাই। এইদিকে এখন আমায় যেতে হবে।

সত্যর সঙ্গ তখন সুশীলের বড় ভাল লাগছিল। তার মন তখন আশার বাণীই শুনতে চায়। তাই সে বললে—সত্যদা, চল আমার মেসে।

সত্য বললে—না, তাহলে বড় দেরী হয়ে যাবে। বাড়ীতে আবার ভাববে।

কথাটা বলেই সত্য হেসে ফেললে। তোর সত্যদার এটা একটু নতুন বলে মনে হচ্ছে, না? কিন্তু আমি বলছি এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তুই জানিস না আমাদের বাঙালীর ঘরের মেয়েরা একেই বড্ড ভাবে। তার ওপর আবার দেরী করে কেন তাদের ভাবনা বাড়িয়ে দিই।

সত্য তার পথে চলে গেল।

সুশীল চুপ করে মোড়ের মাথায় খানিকটা দাঁড়িয়ে তার বাসার পথ ধরলে।

নিঃসঙ্গ অবস্থায় এবার সঙ্গী হল তার চিন্তা। তার মনের অবস্থা আবার দুশ্চিন্তার ধাপে ধাপে নেমে চলল।

মেসে যখন সে পৌঁছল তখন আবার নিরাশার মেঘে তার মনের আকাশ ছেয়ে গেছে। অত্যন্ত নিঃশব্দে যখন সে তার ঘরে প্রবেশ করলে, তখন ঘরে আর কেউ নেই। প্রিয়দাও না।

সুশীল ধীরে ধীরে বিছানাটা পেতে তার ওপর শুয়ে পড়ল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে কালো অন্ধকার গম্ভীরভাবে ধ্যানে বসেছে। আলো জ্বেলে তার ধ্যান ভঙ্গ করার প্রবৃত্তি তখন সুশীলের ছিল না।

শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে সুশীল স্থির হয়ে শুয়ে রইল। নিদ্রিতও হয়ে পড়ল বোধ হয়।

প্রিয়দা' যখন ঘরে এল তখন সুশীল অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যে তার দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনে, সুশীলের চাকরীর খবর বুঝতে তার বিলম্ব হল না।

প্রিয়দা তাঁর টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে সুশীলের দিকটা কাগজ দিয়ে ঢেকে তাঁর বই নিয়ে বসলেন।

রাত তখন গভীর হয়েছে। সুশীলের ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে দেখলে—প্রিয়দা' তাঁর বইয়ের মধ্যে বসে আছেন। তাঁর চোখ তখনও খোলা। বইয়ের পাতার মধ্যে তাঁর চোখের দৃষ্টি বদ্ধ হ'য়ে আছে।

ঘরের কোণের জানালাটা খোলা। বাইরে রজনীর অতন্দ্র দৃষ্টি কোন্ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আকাশে কত তারা। সকলেই কিন্তু নিষ্প্রভ। তাদের দীপ্তি গেল কোথায়?

এই স্তব্ধতার একটা ভারী সুন্দর গাম্ভীর্য্য আছে। এই গভীরতার যেন তল নেই। অতল।

বাইরের বারান্দায় একজন কে পায়চারী করছে। তার পায়ের শব্দটী পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। তার চাপা গলার গুণ গুণ করে গানও কাণে আসছে। সুশীল বুঝতে পারলে সে সনাতন বাবু।

কিছুক্ষণ নিশ্চলভাবে শুয়ে থেকে সে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে তার তক্তাপোষও যেন সচকিত হয়ে উঠল।

প্রিয়দা' মুখ ফিরিয়ে বললেন—সুশীল তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। খেয়ে নাও।

না। খাবার ইচ্ছে নেই। সুশীল কথাটা শেষ করে চুপ করে প্রতীক্ষা করতে লাগল হয় ত প্রিয়দা' এইবার তার চাকরীর কথা প্রশ্ন করবেন। কথাটা মনে হতেই তার মনের গ্লানির ভার যেন আরও বেড়ে উঠল। এবার রাগও যে না হল তা নয়। কিন্তু তা প্রকাশ করার সুযোগ কই?

শুধু 'আচ্ছা' বলেই প্রিয়দা' তাঁর বইয়ের ওপর মন দিলেন।

সুশীল বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার কাছে অন্ধকারের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াল। যেন এর কাছে সে তার বুকের বোঝা নামিয়ে দিয়ে শান্তি পেতে চায়।

বারান্দায় পায়চারি করতে করতে জানালার কাছে এসে সনাতন বাবু স্থির কণ্ঠে বললেন—কে সুশীল? ঘুমোলে না যে?

সুশীল কোন কথা বললে না। বোধ করি কথা বলার ইচ্ছা তার ছিল না।

অত্যন্ত স্নেহের স্বরে, সান্ত্বনার মাধুর্য্যে স্নিগ্ধ করে সনাতন বাবু বললেন—আলোর তলাতেই যে সবচেয়ে অন্ধকার ভাই। যখনই দেখলুম তুমি বড় উৎসাহ করে বার হচ্ছ, তখনই মনে মনে বলেছিলুম, এ উৎসাহে যেন আঘাত না লাগে। জানি এ আঘাত বড় বিষম হয়ে বাজবে!

তার পরে সব চুপচাপ।

পথের ওপর দিয়ে হুহু করে একটা মোটর ছুটে গেল। মানুষের ছোটার আর বিরাম নেই।

আঘাতটা সত্য হতে পারে, কিন্তু তাকে স্বীকার করার মধ্যে সার্থকতা কোথায়? এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন? সমস্ত আঘাত সহ্য করে উঠে দাঁড়াতে হবে। চলতে হবে। আঘাত, মানুষ জীবনে পাবেই। আমি পেয়েছি, তুমি পেয়েছ। সকলেই পেয়েছে। কেউ কম কেউ বেশী।

সুশীল কোন জবাব দিলে না।

সনাতনবাবু আবার একটু চুপ করে রইলেন।

প্রিয়বাবু বইয়ের গাদার মধ্যে থেকে মুখটা তুলে বললেন—সোনাদা, যুক্তি দিয়ে কি মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়? সান্ত্বনা যখন মন থেকে আসবে তখনই শান্তি। তার আগে নয়। ওই অভিমান আর অপমানের জ্বালা যতক্ষণ জ্বলবার তা জ্বলবেই।

তা বটে। এর বেশী কোন কথা আর সনাতনবাবু খুঁজে পেলেন না।

একটু ভেবে তিনি আবার বললেন—এ ও ভাবি প্রিয়, যে কেন এই ছোটাছুটি? চাকরি চাকরি করে হা হুতাশ করে মরি। এর চেয়ে দেশের জমি চষে খেলে যে অনেক সুখে থাকতে পারতুম।

প্রিয়বাবু কোন জবাব দিলে না। কিন্তু তার মুখে একটু হাসি দেখা গেল। যেন অবিশ্বাস! সনাতনবাবুর চোখে সে হাসি ভাল মনে হল না। তিনি বললেন—চাকরীর গোলামী করে দিন কাটানোর চেয়ে চাষ করে স্বাধীনভাবে থাকায় সুখ বেশী নয়? এই কি তুমি বলতে চাও।

—না এমন কথা আমি বলব কেন।

মানুষ যখন নিজের শক্তির ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে কথা বলে, তখন তার বলার সুর এই রকমই হয়।

এতক্ষণ বাদে সুশীলের মুখে কথা বার হল।

—চাকরী করতে গিয়ে জুতো খাওয়ার চেয়ে, স্বাধীনভাবে চাষ করে কোন রকমে বেঁচে থাকাও ঢের সুখের। এ তোমায় স্বীকার করতেই হবে প্রিয়দা’।

এর সত্যাসত্য অবশ্য তোমার প্রিয়দা’র কথার ওপর নির্ভর করে না। এবং পরাধীন হওয়ার চেয়ে স্বাধীন হওয়া যে সুখের তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাধীন যে ইচ্ছে করলেই হওয়া যায় না, এটাও যে বোঝা দরকার। প্রিয়দা’র কথায় সে কী দৃঢ়তা।

কেন, আমার যদি জমি থাকে, আমি ত ইচ্ছে করলেই চাষ করতে পারি। তাতে আমাকে বাধা দেবে কে?

প্রিয়বাবুর মুখে একটা অপূর্ব্ব হাসি দেখা গেল।

সনাতনবাবু বললেন—ঠিক কথা। আমার ত মনে হয়, যাদের জমিজমা আছে তাদের আবার গাঁয়ে ফিরে গিয়ে চাষবাস আরম্ভ করা উচিত। তাহলে গ্রামগুলোরও কিছু উন্নতি হয়, লোকেরও কিছু অবস্থা ভাল হয়।

প্রিয়বাবু কোন কথা বললেন না। তাঁর পাশের বইখানা তিনি আবার টেনে নিয়ে চোখের সামনে ধরলেন। এই অবসরে শুধু বললেন—যারা মোটরে চড়তে অভ্যস্ত, তারা আবার গরুর গাড়ী চড়া সুরু করবে।

সনাতনবাবু বললেন—প্রিয়, তুমি যে এতবড় জিনিষটাকে এ রকম চোখে দেখলে, তা আমি ভাবতেই পারি না। জান মহাত্মা গান্ধীও এই কথাই বলেন। আমাদের গাঁয়ে ফিরে যেতে হবে।

প্রিয়বাবু অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন—ফস্ করে বড্ড বড় লোকের নাম করে ফেললেন। তবে এই অবস্থা থেকে হঠাৎ সত্যযুগে ফিরে গেলে যে আমাদের বিশেষ সুবিধা হবে বলে ত মনে হয় না। সহর ছেড়ে গাঁয়ে যেতে হবে কি গাঁকে সহর করতে হবে এসব তর্কের কথা। এর কোন মীমাংসা কথায় হবে না। সুতরাং কী হবে ও নিয়ে তর্ক করে। তবে যদি কেউ চায় ফিরে যেতে সে যাবে, আমার আপত্তি নেই। আমার আপত্তি এখন রাতটাকে না ঘুমিয়ে কাটাবার চেষ্টা করায়। এখন একটু ঘুমোনর চেষ্টা করা যাক। তাহলেই সব চিন্তার শান্তি হয়ে যাবে।

প্রিয়বাবু ত বইটাকেই উপাধান করে তার ওপর মাথা রাখলেন।

সনাতনবাবু ধীরে ধীরে তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সুশীল প্রিয়দা’র শিয়রের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় আবার শুয়ে পড়ল।

সুশীলের চোখের সামনে চিন্তাও অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল।

প্রভাত। শুধু পরদিনের নয়। কয়েক দিনের। প্রভাতেই সারাদিনের কার্য্যাবলীর চিন্তা সুরু হয়ে যায়। একবার ভাবে গাঁয়ে ফিরে যাবো কিসের আশায়? চাষবাস! প্রিয়দা’র কথা মনে পড়ে যায়। চাষবাসের বিপক্ষে যত যুক্তি আছে সব কটা একের পর এক এসে সারবন্দী হ’য়ে তাকে উপদেশ দিয়ে যায়। সকালটা শুধু নষ্টই হয়।

তার পর ভাবে যাই একবার আপিস অঞ্চলে। কিন্তু কোন আপিসের দরজায় পা দেবার আর সাহস থাকে না। এতদিনের গোলামীর অভ্যাসই আজ বিদ্রোহ করে দাঁড়ায়। আপিসের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাও মনে পড়ে। মনটা গরম হয়ে ওঠে। বড়সাহেবের কথার সঙ্গে কথা না মিললে, এইটাই অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। সাহেব বোকা বলে তিরস্কার করতেও ক্রটী করে না। সাহেবের ভুল হলেও সেই মতে মত না মেলাটাই যে বোকামি এ কথা সুশীল বোঝে না।

এদিক থেকে কথাটা দেখলেই ত গণ্ডগোল চুকে যায়।

দুপুর রৌদ্রে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সে বাসায় ফিরে আসে।

তখন মনে হয়, না, ও-পথ আর নয়। এই দোলা আর ভাল লাগে না।

এই অবস্থায় একদিন সত্যর সঙ্গে দেখা। সে শুনে বললে—সত্যি যদি দেশে গিয়ে বসতে পারিস, তার চেয়ে বোধ হয় ভাল আর কিছু নেই। লোকে বলে বটে গোলামি করতে করতে গোলামি ছাড়তে দুঃখ লাগে; কিন্তু সত্যি বলছি, এর মোহ আজও আমার চোখে লাগল না। এটাকে আমি বরাবর হালের জোয়ালের মতো ভার ভেবে টেনে নিয়ে চলেছি। এর মধ্যে সহজ স্বচ্ছন্দতা নেই।

সুশীলের মন এবারে একেবারে দেশের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সে ভাবলে দেশে তার চলবে কি করে?

জমি জমা যা আছে, তা অল্প। কিন্তু সেও ত একলা লোক। দেশে একটা লোকের কতই বা খরচ হবে?

এইবার একে একে সুবিধার দল হিতার্থীর মতো এসে দেখা দিয়ে যেতে লাগল।

সত্যর বাড়ী সেদিন সে গিয়েছিল। সেদিন বিধুমুখীর কথাগুলো তার মনে পড়ে যেতে লাগল।

—সত্যি কি সুখেই যে মানুষ কলকাতায় থাকে?

বিধুমুখী অভিযোগ করলে—এ কী ছাই জায়গা। না আছে হাওয়া, না আছে রোদ্দুর। শুধু আছে কাণে-তালা-লাগান শব্দ আর কলের কালো ধোঁয়া।

এই যে শব্দ এর তলে আছে বন্দী মানব-প্রকৃতির অশ্রান্ত ক্রন্দন। ঐ যে কুণ্ডলী পাকানো কলের চিমনির ধোঁয়া—ও যে তাদের আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাস। শুধু গুমরে গুমরে ঘুলিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে।

বিধুমুখী আরও বলে—আমার এ ভাল লাগে না। আমরা আবার পাড়াগাঁয়ের মানুষ কি না।

সত্য বললে—এই কলের জল, বিলিতি মাটীর দালান এসব ভাল লাগবে কেন? তোমাদের সেই কলসী কাঁখে ঘাড় মুখ বেঁকিয়ে ঘাট থেকে জল আনা, গোবর দিয়ে মেঝে নিকোন—সেই সবই লাগবে ভাল।

—তোমাদের এই খাঁচার থেকে সেই আমার ঢের ভাল।

সত্য হাসতে লাগল। বিধুমুখীও।

সুশীলের মন, ছেলেবেলার চোখে গাঁয়ের যে ছবি রঙিন হ'য়ে দেখা দিত, সেই ছবি আঁকতে সুরু করে দিলে।

সবুজ ধানের ক্ষেত। টলটলে জলে ভরা পুকুর। আমের বাগান। জামের বাগান। শীতের খেজুরের রস। সে হাওয়ায় আছে স্নেহের সুষমা, সে আলোয় আছে যাদুর মায়া। সত্য ভাবলে মাধুরী ত কখনও এমন কথা বলেনা।

কিন্তু সে যে মাধুরী। এ বিধুমুখী। আতর আর ফুলের সুবাস কি এক জিনিষ। সত্য ভাবতে থাকে। তার যৌবনের স্বপ্নের কথা।

বেদুইনরা মরুতে মরুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কি শুধু মরুরই খোঁজে?

যাযাবর জাত শুধু যাতায়াতই করে। নিছক দুঃখের ফেরে?

সন্ন্যাসী খাপছাড়া ভাবে চলাফেরা করে। শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার আনন্দে?

আবার বিনয় মাধুরীও বাদ যায় না। তারা কি ঘর গড়ে শুধু বালু বেলার উপরে?

বিধুমুখী যে টানে সে কী শুধু শৃঙ্খলের আকর্ষণ? এ যে ভাল লাগে না, এ কথা ত জোর করে বলা যায় না।

ছোট ছেলেটা? নিজের সৃষ্টির শৃঙ্খল!

সুশীল বিধুমুখীর কথায় চঞ্চল হ'য়ে ভাবে, যাই ফিরে?

সত্যকে প্রশ্ন করতে সে বললে—আপত্তি কিসের?

বাসায় ফিরে সুশীল বললে—প্রিয়দা' কি বল?

প্রিয়দা তার ব'য়ের ওপরই চোখ রেখে বললেন—দোলায় দুললে কাজ কিছু হবে না। একদিকে সোজা যেতে হবে। তা সে যাই হ'ক।

—তাই ভাল।

সুশীল কলকাতার বাসা ছেড়ে ফিরে চলল।

বাড়ী তখন ধ্বংসোন্মুখ। বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এল। যখন পৌছবে তখন হয় ত সব অন্ধকারে ডুবে গেছে।

কলের স্বরূপ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

পাশ্চাত্য সভ্যতায় কল খুব একটা বড় স্থান অধিকার করিয়াছে। সমস্ত সমাজই যেন কলকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের ধারা ছিল অন্য রকম। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই সমাজ গঠিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আজ পশ্চিমের সমস্তই বড় বলিয়া ধারণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের বিশেষত্ব-প্রদানকারী কলও আমাদের নিকট শ্লাঘ্য হইয়া উঠিয়াছে। কল আজ ভারতভূমিতে আহূত ও অনাহূত ভাবে জুড়িয়া বসিয়াছে। কলের নিষ্ঠুর পীড়নে আজ বিশ্ব পীড়িত। ভারতবর্ষ সেই কলের পীড়নেই দগ্ধ হইতেছে; কিন্তু তথাপি কলের স্বরূপ আজো ভারতবর্ষের নিকট ধরা পড়িতেছে না। কলের আক্রমণ এত মনোরম যে. তাহা আক্রমণ বলিয়াই মনে হয় না। ভারতবর্ষের ধর্ম্মচ্যুতি ও অনশনের হেতু পরাধীনতা। এই পরাধীনতা বজায় রহিয়াছে ইংরাজের কলের স্বার্থে। সেই হেতু আমাদের দুঃখ ও দারিদ্র্যের কথার আলোচনায় কলের কথা খুব বড় একটা স্থান স্বভাবতঃই লয়। দেশের হিতের জন্য সৎচেষ্টা কলের আপাত-লোভনীয় আকর্ষণে অসৎ চেষ্টাতেও পরিণত হইতে পারে। সেই হেতু কলের স্বরূপ বোঝা দরকার।

প্রথমেই কলগুলিকে দুইটা বড় ভাগে ভাগ করিয়া লইতে হয়। এই ভাগের মূল হইতেছে কলের স্বত্বাধিকারিত্বে। এক রকম কল ব্যবহৃত হয় যাহার মালিক ধনীরা। গরীবেরা তাহাতে শ্রম করিয়া মজুরী উপার্জ্জন করে। গরীবদিগকে খাটাইয়া ধনবানেরা সম্পদ্ বৃদ্ধি করে। গরীবের দাসভাব তাহাতে থাকিয়াই যায়। এই সকল কলে প্রভূত ধনের ব্যবহার, কলের জন্য কাঁচা মাল ও কলে উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ আধিক্য হেতু ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সকল কারণে দরিদ্রগণ এই কলের মজুর মাত্র হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ—কাপড়ের কল বা মিল, চট কল. ধান কল. ট্যানারী বা চামড়ার কল. ময়দার কল, তেল কল, ইত্যাদির কথা বলা যাইতে পারে। ডক বা জাহাজ নির্ম্মাণ-আগার, ওয়ার্কসপ বা যন্ত্রাগণের কর্ম্মশালা প্রভৃতিও একটা বিশেষ কোনও কল না হইলেও কতকগুলি ছোট বড় কলের সমাবেশ দ্বারা গঠিত একটি বৃহৎ কর্ম্মস্থান, যাহাতে শ্রমজীবীরা কর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে এবং এগুলিও কল বা মিল-পর্য্যায়ভুক্ত।

আর একপ্রকার কল আছে দরিদ্র যাহার স্বত্বাধিকারী, যাহা সহজলভ্য, অল্পমূল্য এবং যাহাতে এক বা দুইজন লোক নিজ নিজ গৃহেই কাজ করিতে পারে। সে কলের লাভ কলে যে কাজ করে তাহারই প্রাপ্য। গৃহে গৃহে এই কল পূর্ব্বকাল হইতে চলিতেছিল—কিন্তু অধুনা প্রথম শ্রেণীর কলের প্রতিযোগিতায় সেগুলি লোপ পাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ চরকা, তাঁত, চাক্কি বা জাঁতা, ঘানি, কুমারের চাক, চর্ম্মকারের গৃহস্থিত কারখানার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত কলগুলি তাহাদের ক্ষুদ্রায়তন বশতঃ এবং স্বাভাবিক ভাবে গৃহে গৃহে গৃহস্থের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে বলিয়া—কল বলিয়া আমাদের চোখেই পড়ে না। এই গুলিই যদি একত্র জড় করিয়া একটি স্থানে বসাইয়া কোনও প্রকার যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা চালান হয়, তাহা হইলে বিশেষ পরিবর্ত্তিত না হইয়াও তাহা প্রথম শ্রেণীর কলে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ ঘানির কথা ধরা যাইতে পারে। কলুর ঘানির যে গঠন কলের ঘানিরও সেই গঠন। কলুর ঘানি বলদ টানে। বলদটা বদলাইয়া যদি একটা এঞ্জিনের সহিত অনেকগুলি কলুর ঘানি জুড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই উহা তেলকল হইল। কেবল এক দিকে একটা বলদকে পোষণ করিতে যে ব্যয় হইত, সেই ব্যয়েই হয়ত ৪টি ঘানি চলে বলিয়া চালাইবার ব্যয় সস্তা হয়: এবং চারিটা ঘানি একত্র চালাইবার ব্যবস্থা এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম দরিদ্রের আয়ত্ত নহে বলিয়া উহাকে গৃহস্থের গৃহ ত্যাগ করিতে হয়। চারি ঘানির সমবায়ে উৎপন্ন কল ধনীর ধনে নির্ম্মিত হইয়া ধনবর্দ্ধনের সহায়তা করে।

দরিদ্রের কল জড় করিয়া, দরিদ্রের স্বত্ব ভ্রষ্ট করাইয়া ধনীর অধিকারে আসিলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর গৃহ-ব্যবহৃত কল 'সমষ্টি কলে' পরিণত হয়। অনেকগুলি যাঁতা এক সঙ্গে চলিলে ময়দা কল হয়। অনেকগুলি ঢেঁকির কাজ একটা বড় ঢেঁকিতে করিলে ধানকল হয়; এবং অনেকগুলি চরখা একত্র বসাইলে সূতা কল হয়; অনেকগুলি তাঁত একত্র বসাইলে কাপড়ের কল হয়। অনেকগুলি কুমারের চাক একত্র চলিলে 'পটারী' মিল হয়।

আধুনিক সভ্যতা কুটীরের কলকে জড় করিয়া কুটীরের বাহির করিয়া ধনীর প্রাঙ্গণেই আনিতেছে। এই প্রক্রিয়াই সভ্যতার গতি নিরূপিত করিতেছে। ছোট কল জড় করিয়া সমষ্টি কল বসাইবার সুবিধা এই যে—উৎপাদন ক্রিয়ার ব্যয় কম হওয়ায় উৎপাদিত দ্রব্য সস্তা হয়। কলের তেল, কলের ময়দা, কলের বাসন ও কলের কাপড়—কলুর তেল, জাঁতার ময়দা, কুমারের বাসন ও তাঁতের কাপড় অপেক্ষা সস্তা। প্রচলিত ধারণায় ইহাই মনে হয়—যে সস্তায় দেয় সেই হিতকারী। কল আবশ্যক দ্রব্য সস্তায় দেয়; সেই হেতু কল সকলেরই প্রিয়। কল ধনীর ধন বৃদ্ধি করে বলিয়া ধনিকেরও প্রিয়। কেবল যাহাদের কুটীর ত্যাগ করিয়া, যাহাদিগকে বেকার করিয়া ছোট কলগুলি বড় কলে পরিণত হয়, তাহারাই সেই সেই কলকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না। কিন্তু এই সমষ্টি কলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মনোবৃত্তিও ভারতবাসীর নাই। কুটীর-কলের অধিকারী যখন নিজেই দেখিতে পায় যে, সমষ্টি কল সস্তায় দিতেছে, তখন সে অভিযোগ না করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জানায় যে, তাহার অন্ন গেল। তখন স্বচ্ছন্দ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ কুটীরে তাহার স্বাধীন জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হয়। কুটীর-কল ছাড়া তাহার যে চাষ করার জমি থাকে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ও আংশিক কর্ম্মবিহীন হইয়া সে কষ্টে জীবন যাপন করে। যাহার চাষের জমি নাই, সে অপরের মজুর হয়; আর দুই একজন বা, যে সমষ্টি কল তাহার জীবিকা নষ্ট করিয়াছে, তাহারই মজুর হয়। আবার কুটীর-কলগুলির ভিতর যেগুলি কেবলই অবসর সময়ে চালাইবার উপযোগী, যেগুলি স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হয়—সেগুলি সমষ্টি কলের চাপে অন্তর্হিত হইলে স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণই কর্ম্মবিচ্যুত হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ঢেঁকি, চরকা ও তাঁত এই রকমের।

ইংলণ্ড ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা সমষ্টি-কলের এই আক্রমণ সহজে মানিয়া লয় নাই। যেমনি একটি কল আবিষ্কৃত হইয়া দরিদ্রের অন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তেমনি সে দেশে কলের আবিষ্কর্ত্তাকে শয়তান মনে করিয়া ঠেঙ্গাইয়াছে, বাড়ী পোড়াইয়াছে, কল পোড়াইয়াছে—কোথাও কোথাও চরম লাঞ্ছনা দিয়াছে।

বাস্তবিকই কুটীর-কলের অধিকারীর রুষ্ট হওয়ার অধিকার আছে কি না, এ প্রশ্ন মনে হইতে পারে। কল আবিষ্কৃত হইলে দ্রব্যাদি সস্তা ও সহজপ্রাপ্য হইয়া জনসাধারণের এত সুবিধা হয় যে, তাহাতে দুই একজন ব্যক্তি-বিশেষের যদি কষ্টই হইল, তাহাতেও বিশেষ কিছু আসে যায় না, তাহারা অন্য জীবিকা খুঁজিয়া লইতে পারে—এই মনোবৃত্তি কুটীর-কলের অধিকারীর দুঃখের প্রতি আমাদের করুণা আনিয়া দেয়; কিন্তু তাহাদের দুঃখের প্রতিকারের চেষ্টায় আমাদিগকে নিয়োজিত করে না। কলের সস্তার দিকটা পশ্চিমকে মোহমুগ্ধ করিয়াছে; এবং অধুনা সেই মোহ দ্বারা আমরাও প্রভাবিত হইয়াছি। পশ্চিমদেশের দর্শনশাস্ত্র তাহাদিগকে শিক্ষা দেয় Su vival of the fittes in the Struggle for existence—জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমেরই জয়। সমাজের ভিতর এই সংগ্রাম মানিয়া লইলে সমষ্টি-কলওয়ালা ও কুটীর-কলওয়ালার মনোবৃত্তি এবং দেশের উপর ইহার প্রভাব সম্পূর্ণ বোঝা যাইবে। পশ্চিমের কুটীর-শ্রমিক সেই সংগ্রামে যোগদান করিয়াছে, যুদ্ধ করিয়াছে এবং ধনিকের সমষ্টির সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। ইহার ফলে পাশ্চাত্য দেশে সামাজিক বিপ্লব আসিয়াছে এবং সমস্ত জগতের শান্তিভঙ্গ হইয়াছে।

সমাজের ভিতর এই সংগ্রাম যে জাতি মানিয়া লইয়াছে, তাহাদের ভোগস্পৃহার সীমা থাকে না। নৈতিক বৈধতা আর অবৈধতার একটা সুস্পষ্ট রেখা সে সমাজে পড়ে, যাহা সকলে মানিয়া লয়। একের ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যদি অপরের অবশ্যম্ভাবী পীড়া হয়, তাহা হইলেও তাহা অধর্ম্ম-সঙ্গত বিবেচিত হয় না। সমাজ-শাসনের ব্যবহারিক আইনে অথবা নৈতিক বিচারে তাহা অপরাধের বলিয়া গণ্য হয় না। যে কর্ম্মস্রোতস্বিনী শত শত দরিদ্রের কুটীরের প্রাঙ্গণ-পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া কুটীরগুলিকে শ্রমে মুখর রাখিয়া শত শত প্রজার স্বাস্থ্য ও সুখ বিধান করিতেছে—তাহাকে যদি

ভোগাভিলাষী ধনী বাঁধ দ্বারা স্বীয় প্রাঙ্গণেই বদ্ধ করিয়া একটি বিস্ময়জনক ভোগ-হ্রদে পরিণত করে—তাহা হইলে দরিদ্রের কুটীরগুলি অশোভন, কর্ম্মহীন ও মুমূর্ষু হয়—কিন্তু ইহাতে পাশ্চাত্য সমাজ নৈতিক পীড়া বোধ করে না। পাশ্চাত্য সমাজ বলে—ধনী যাহা করিয়াছে তাহাতে তাহার শক্তিই প্রমাণিত হইতেছে। শক্তিরই জয়। দুর্ব্বল যদি পারে তবে বাঁচুক,—পারে অমনি আর একটা কর্ম্মস্রোতস্বিনীকে ভোগবতীতে পরিণত করুক, কোনও বাধা নাই। এই দারুণ সংগ্রামের ভাব যাহাদের সমাজনীতিতে প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিজেরা পীড়িত হয় ও অপরকে পীড়া দিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহাতে ভোগবাসনার সীমা পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হয়। সমাজ হইতে রাজনীতির ভিতরেও স্বাভাবিক ভাবেই এই ভোগস্পৃহা প্রবেশ করে। প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ ভোগের বাসনায় উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র ভোগোপকরণ যোগাইবার জন্য বাধ্য করিতে পারে এমনি অপর রাষ্ট্রের সন্ধানে বহির্গত হয়।

সামাজিক নীতিসূত্রে জীবনসংগ্রাম (Struggle for existence) এবং যোগ্যতমের জয় (Survival of the fittest) এই যমজ মতবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রের সহজ জীবনধারাকে উদ্বিজিত করিয়াছে। সেই ভোগস্পৃহা সমষ্টি-কলের কার্য্যেও আমরা সংক্ষেপে দেখিয়াছি। ভারতীয় সমাজনীতি উক্ত জীবন-সংগ্রাম মানিয়া লয় নাই। ভারতবর্ষ সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জানিয়া কাহাকেও উদ্বিজিত করা অধর্ম্ম জ্ঞান করিয়াছে এবং ভোগ-বাসনা সংযত করিবার আমোঘ উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছে। ভারতবর্ষ মানুষের প্রবৃত্তির গোড়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে যে, ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্তিতে মানুষ ইতর প্রাণীর সহিত সমান। ধর্ম্ম-বোধই মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে ভিন্ন করিয়াছে। এই ধর্ম্ম বোধ ভোগ-বাসনার সংযমে, ত্যাগে, অহিংসায়, ক্ষমায় ও নানা শীলে মানুষকে দেবোপম করে। ভারতবর্ষ এই সত্যের সন্ধান পাইয়া দৈনন্দিন জীবনে তাহার ব্যবহার করিবার যে পথ আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে জীবন-সংগ্রাম বলিয়া কোন পদার্থকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেয় নাই। জীবন-সংগ্রাম যে ভারতীয় সমাজশীর্ষদের নিকট অপরিচিত ছিল তাহা নহে। মানুষের ভিতরে যে আসুরী বৃত্তিতে জীবন-সংগ্রাম আনিয়া দেয়, তাহার সহিত ভারতীয় ঋষিদের সম্যক পরিচয় ছিল। কিন্তু সে বৃত্তিটা তাঁহারা পরথ করিয়া হেয় বলিয়া ঠেলিয়া দিয়াছিলেন। সে বৃত্তির চরিতার্থতায় নরকে পঁহুছিতে হয় এই তাঁহাদের মত।

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥

* * * *

আশা-পাশ শতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থ সঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধ মিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥

* * * *

অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ॥
প্রসক্তাঃকাম ভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥"

গীতা। ১৬ অধ্যায়। ৭-১২-১৩-১৪-১৬ শ্লোক

"অসুর স্বভাব লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি কি আর অধর্ম হইতে নিবৃত্তিই বা কি—তাহা জানে না। অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ, আচার আর সত্য বলিয়া কিছুই নাই। (ইহারা) শত শত আশাপাশ দ্বারা আকৃষ্ট এবং কামক্রোধ-পরায়ণ হইয়া কামভোগের জন্য অন্যায় পথে অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছা করে। অদ্য মৎ কর্ত্তৃক ইহা লব্ধ হইল, এই প্রিয়বস্তু পাইব, ইহা আমার আছে, পুনরায় ঐ ধনও হইবে; ঐ শত্রু মৎকর্ত্তৃক হত হইয়াছে, অপরকেও আবার বিনাশ করিব; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্ ও সুখী;—(এই ভাবে) অনেক প্রকারে ভ্রান্তচিত্ত, মোহজাল দ্বারা সমাবৃত এবং কামভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া (ইহারা) অশুচি নরকে পতিত হয়।"

ভারতবর্ষ মানুষের এই আসুরী প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া তাহার নিবৃত্তির জন্য এই নিয়ম করিয়াছিল যে, মানুষ বংশ-পরম্পরায় স্ব স্ব কুলের অবলম্বিত ব্যবসায় গ্রহণ করিবে। ইহাই বর্ণধর্ম্ম। বর্ণধর্ম্ম ভারতীয় ঋষিদের সৃষ্ট বলিলে ভুল বলা হইবে। বর্ণধর্ম্ম ঈশ্বর-সৃষ্ট। মানুষের ভিতর নিজ জন্মগত বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা অর্জ্জন করা একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইহা কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টা করিয়া মানুষের মধ্যে প্রবেশ করায় নাই। মানুষ কেন—অন্য জীবের ভিতরও

এই জন্মগত বৃত্তি অবলম্বন সুস্পষ্ট। জন্মানুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের সংস্কার অনুযায়ী সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন। নিজ নিজ কুলের ব্যবসা অবলম্বন দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া স্বধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক মানুষ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহাই ভারতবর্ষের কথা।

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

নিজ নিজ কৌলিক অথবা নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী ব্যবসা অবলম্বন করায় আমাদের ভোগলিপ্সার উপর একটা সীমার গণ্ডী টানিয়া দেয়। যে ব্রাহ্মণ সে যদি কেবল অধ্যাপনা দ্বারাই জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকেও উদরান্নের জন্য ব্যবসা আরম্ভ করিতে হয় না;—আর, একজন ব্যবসায়ী বৈশ্যও অধিকতর সুবিধার জন্য ব্রাহ্মণের ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে না। এই জীবিকার গণ্ডী সমাজের ভোগ-লিপ্সাকে এক দিকে যেমন সীমাবদ্ধ করে, অপর দিকে সেবাবৃত্তিকেও তেমনি সম্প্রসারিত করে। নিজ কুলব্যবসার গণ্ডীতে নিজ নিজ কাজ করিলে সকলেই নিরুদ্বেগে সমাজের সেবা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে। তাহার স্বস্তি বাড়ে এবং জীবিকার্জ্জনের জন্য সমস্ত শক্তি নিযুক্ত না হইয়া স্বাভাবিক ভাবে জনহিতকর অনুষ্ঠানে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারে। যে ব্যক্তি কুমারের গৃহে জন্মিয়াছে, সে যদি মৃৎপাত্র তৈরী করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করে, এবং তাহার যদি এমন আশঙ্কা না থাকে যে, অপর কোন বৃত্তির লোক আসিয়া তাহার জীবিকা কাড়িয়া লইবে, এবং যদি এমন আশাও না থাকে যে, সে অন্য কোন বৃত্তি দ্বারা অপরকে ব্যবসাচ্যুত করিয়া সুবিধা করিবে, তাহা হইলে সমাজে একটা স্বাস্থ্য ও আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়। মানুষের মধ্যে জীবিকা বিভাগ করিবার এই পথ অবলম্বন করায় অন্যায় ভাবে অর্থসঞ্চয়ের বৃত্তিই ভারতে লুপ্ত হইয়াছিল। এই প্রথার বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করা হয়। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত বিচার। সকলের সকল ব্যবসা অবলম্বনের স্বাধীনতা থাকায় জগতে যে ভোগের প্রশ্রয় হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আমরা চোখের সম্মুখেই দেখিতেছি। বৃত্তিগ্রহণের স্বাধীনতা সত্যকার স্বাধীনতা নহে—উহা একপ্রকার অসংযম মাত্র—এবং উহাতে জগতে সমূহ পাপ, সংঘাত, অশান্তি ও দুঃখ আনয়ন করিয়াছে।

ভারতবর্ষ নিজ শিক্ষা ও সাধনা ত্যাগ করাতেই আজ এইভাবে পররাষ্ট্র-শক্তি দ্বারা ধর্ষিত হইতে পারিয়াছে। তাহা না হইলে স্বাভাবিক আত্মশক্তিতেই ভারত পর পণ্য গ্রহণে অসম্মত হইত এবং আজিকার এই দুর্দ্দশাও আসিত না। কিন্তু দুর্দ্দশা তো আজ আর বহিঃস্থ নহে—দুর্দ্দশা যে সমাজের একেবারে অন্তঃস্থানে প্রবেশ করিয়াছে! বাহিরের কল ও তজ্জাত পণ্যই যে আমাদিগকে উত্যক্ত করিতেছে তাহা নহে, আজ আমাদের ভিতরেই যাহার সামর্থ্য আছে সে-ই ধনলাভের আকাঙ্ক্ষায় সমষ্টি-কল বসাইয়া কুটীর-কল ধ্বংস করিবার সহায়ক হইতেছে। একবার বাংলার ক্রমশঃ-বর্দ্ধমান ধানকলগুলির দিকে তাকাইয়া তাহার নৈতিক হেয়তা উপলব্ধি করিতে বলি। এক একটি করিয়া ধানকল বসিতেছে আর অমনি সহস্র বিধবার ও দুস্থ নারীর জীবনোপায়ের একমাত্র পথ নষ্ট হইতেছে। আর ক্রেতারা বিনা আপত্তিতে কলের চাউল ক্রয় করিয়া এই ধ্বংসের সহায়ক হইতেছেন। কলওয়ালাও ধানকল বসাইয়া অর্থ সঞ্চয় অসৎকার্য্য বিবেচনা করিতেছে না। কিন্তু সমাজের শুভের দিকে দেখিতে গেলে—যে সমস্ত সমষ্টি-কল কুটীর-কলের ধ্বংসসাধন করিতেছে তাহাই সমাজের পক্ষে অহিতকারী বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য।—সে কল কাপড়ের কলই হউক, ময়দার কলই হউক—আর ধানকলই হউক। এই সকল কলে ধনবৃদ্ধি হয় ধনিকের; কিন্তু মোটের উপর দরিদ্র আরো দরিদ্র এবং ধনী অধিকতর ধনী হইয়া সামাজিক অসমতা ও দুঃখ বর্দ্ধিত করে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সমাজের হিতের জন্য তাহা হইলে কি সমুদায় কল উঠাইয়া দিতে হইবে? যদি কলের দ্বারা সমাজের সুখ বর্দ্ধিত না হইয়া দুঃখই বর্দ্ধিত হয়, তবে সে কল ব্যবহার না করাই তো সঙ্গত! কলের দ্বারা শ্রমের লাঘব হয়। অল্প আয়াসে অধিক দ্রব্য উৎপাদিত হয়। মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তি ক্রীড়া করিবার অবকাশ পায়। এ সমস্তই সত্য—কিন্তু সেই শ্রমের লাঘব, অধিক দ্রব্যোৎপাদন ও উদ্ভাবনী শক্তির ফলে যদি সমাজে লোভ, হিংসা, দৈন্য ও অসমতা প্রশ্রয় পায়, তাহা হইলে সে সুবিধার তো আবশ্যকতা নাই!

রাষ্ট্রকে যদি একটা গ্রাম বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে এই ধরণের সমস্যার উত্তর সহজে ও সঠিকভাবে পাওয়া

যায়। ধরা যাউক—সংসার-যাত্রা চালাইবার জন্য যে যে ব্যবসা আবশ্যক, সেই সেই ব্যবসায় অবলম্বনকারী গৃহস্থ দ্বারা একটি গ্রাম গঠিত হইয়াছে। যাহা সাধারণ আবশ্যক তৎসমস্তই গ্রামের ভিতরেই পাওয়া যাইতেছে; এবং গ্রামস্থ সমস্ত পরিবারই উপযুক্ত কর্ম্ম ও তাহার বিনিময়ে গ্রাস, আচ্ছাদন, অন্যান্য সামগ্রী ও বিশ্রাম ভোগ করিতেছে। এই গ্রামে—ধরা যাউক, চার ঘর কলু দ্বারা সমস্ত তৈল যোগান হয়। ধরা যাউক, তার পর শ্রমাপহারক একটিমাত্র তৈলের কল এক ঘরে বসান হইল। তাহা হইলে এক ঘরের কলের দ্বারা সমস্ত গ্রামের তৈল যোগান হইবে—বাকী তিন ঘর কলু কি করিবে? তিন ঘর কলুর উপার্জ্জন এক ঘর কলুই করিয়া ধনশালী হইবে এবং তিন ঘর কলুই কর্ম্মবিচ্যুত হইয়া বেকার হইবে। ইহাতে গ্রামের মোট সম্পদ বাড়িবে না। যদি ধরা যায় যে, ঐ তিন ঘর কলুই এক একটি করিয়া তেল কল বসাইবে এবং তাহাদের উৎপন্ন তৈল অন্য গ্রামে বিক্রয় করিবে—তাহা হইলেও যে দুঃখ এক গ্রামের তিন কলুর আসন্ন হইয়াছিল—এক্ষণে তিন গ্রামের নয়টি কলুর গৃহে সেই বিপদ পঁহুছাইয়া দেওয়া হইবে। এমন স্থলে হয় তেলের কলটি ভাঙিয়া দিতে হয়, নচেৎ রাষ্ট্র হইতে এমন ব্যবস্থা করিতে হয়, যাহাতে ব্যবসায়চ্যুত কলু জীবিকা উপার্জ্জনের পথ পায় এবং তাহাদের জন্য অজ্ঞাত বা এতাবৎ অনাবশ্যক কোনও সেবা-কর্ম্ম সৃষ্ট হয়। সেই তিনঘর কলু দ্বারা ললিতকলা সৃষ্টির সুযোগ রাষ্ট্র দিতে পারে। আর যদি সেই কলুরা ললিতকলা পরিচালনায় উপযোগী না হয়, তাহা হইলে যাহারা সেই কর্ম্মে উপযোগী তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া কলুদিগকে তৎপরিত্যক্ত কার্য্য দেওয়া যাইতে পারে। কলের তেল যতটুকু সস্তা হইত তাহা না করিয়া তাহার উপর শুল্ক বসাইয়া পূর্ব্বতন মূল্যেই তৈল বিক্রয় করতঃ সেই শুল্ক-লব্ধ আয় হইতে তিনঘর কলাবিদের অভাব মিটান যাইতে পারে। এই উপায়ে সমষ্টি-কল রাষ্ট্রীয় সম্পদ হইলে জগতে দুঃখ বৃদ্ধি না করিয়া সুখ বৃদ্ধিই করিতে পারে।

কলের স্বরূপ বিচার করিতে সেইজন্য এই দিকটারই উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, সেই কলের উদ্ভব হেতু কাহারও দুঃখ না হয়। যদি দুঃখ হয় তবে সে দুঃখ নিবারণ করার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবে; এবং যদি করিতে না পারে তবে সে কল ভাঙিয়া ফেলিবে। এই দৃষ্টিতে কলের দিকে দেখিলে কল সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

এই পরীক্ষা আজকালকার সমষ্টি-কলগুলির উপর প্রয়োগ করিলে অনেকগুলি কলই টিকিতে পারে না। হয় এইগুলি উঠাইয়া দিতে হয়, নয় ত রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করিয়া দেশের শুভার্থেই ব্যবহার করিতে হয়। ধনিকের ধন সঞ্চয়ের যন্ত্ররূপে সমষ্টি-কল জগতে যে হানি করিতেছে, তাহা কোনও সভ্যতার প্রসারের স্তোক দ্বারাই আজ আর ঢাকা যায় না। কলের সম্বন্ধে এবম্বিধ ধারণা পোষণ করায় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহা হইলে আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোন্ কোন্ কল আমাদের হানিকারক বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে—তাহা হইলে আমি অবশ্যই মানুষের প্রাথমিক আবশ্যক অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবসায় যে কলগুলি গ্রহণ করিয়া দরিদ্রকে কর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছে, সেগুলি উঠাইয়া দেওয়া উচিত বলিব। ধানকলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করায় রাষ্ট্রের লাভ, স্বাস্থ্যেরও লাভ। এখনো ধান গ্রামে গ্রামে ঢেঁকিতে ভানা হইতেছে। যাঁহারা ভাবুক—ধানকলের প্রচলনের দুর্ব্বিপাক হইতে তাঁহারা দেশকে রক্ষা করিবেন। যে কলগুলি চলিতেছে তাহা যদি আজই উঠিয়া যায়, তাহা হইলেও মুষ্টিমেয় ধনিকের ক্ষতি বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের বিষম লাভ। তেল কল ও ময়দা কল সম্বন্ধেও ইহাই প্রযোজ্য। এমন আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই সকল কল উঠাইয়া দিলে শহরের ঐ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগান অসম্ভব হইবে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কলের তৈল ব্যবহার বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ঘানির তৈল ব্যবহার আরম্ভ হইবে। কলের ময়দা আটা ব্যবহার বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঘরে যাঁতা চলিতে থাকিবে। কোনও ব্যবস্থার বিপর্য্যয় না করিয়াও ইহা সম্পাদিত করা যায়। বস্ত্রের সম্বন্ধেও ঠিক এই ব্যবস্থা করা সম্ভবপর। ইহা যে অচিরেই কর্ত্তব্য ও করা সম্ভব, তাহা যাঁহারা চরখার সূতার উন্নতি লক্ষ্য করিয়াছেন, যাঁহারা চরখার ধ্বংসের ইতিহাস জানেন, এবং যাঁহারা তাঁতির সহিত কাপড়ের কলের যে দ্বন্দ্ব আজো চলিতেছে তাহার পরিচয় রাখেন—তাঁহারা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন। বস্ত্রের সম্বন্ধে প্রথমেই বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। চরখা পুনঃ প্রচলনের জন্য শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের ও দেশপ্রেমিকের একমাত্র ও প্রথম কর্ত্তব্য খদ্দর

ব্যবহার করা। ভদ্র সম্প্রদায় ইহা আরম্ভ করিলেই ক্রমশঃ দেশময় ইহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে; এবং যে কৃষক-পত্নী আজ সূতাকাটার অভ্যাস হারাইয়া কতবড় অমূল্য বস্তু হারাইয়াছে তাহার কল্পনাও করিতে পারিতেছে না—সেই কৃষক-পত্নীরা পুনঃ চরখা অবলম্বনে দেশকে স্বাস্থ্যে, সম্পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। ইহা পুনঃ পুনঃ দেখান হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের বস্ত্র প্রয়োজন পরিপূর্ণরূপে চরখা দ্বারা মিটিতে পারে। যত হাতের তাঁত আজ চলিতেছে, তাহাতে এখনো প্রায় দেশের আবশ্যক বস্ত্রের অর্দ্ধেকটা বোনা হইতেছে। বিলাতী ও দেশী কলের তাঁতের সমবেত প্রতিযোগিতা সত্বেও কতক তাঁত বাঁচিয়া আছে। কিন্তু কল প্রতিদিন চেষ্টা করিতেছে যাহাতে কলের সবটা সূতা কলেই বোনা হইয়া বাহির হয়। বস্তুতঃ নানা অসুবিধায় ও নানা রকমের খুচরা দ্রব্যের স্থানীয় রুচি অনুযায়ী বিশেষ চাহিদার জন্যই এখনো সকল তাঁতকে নিরন্ন করিতে কল সমর্থ হয় নাই। যে সকল হাত-তাঁত আজও চলিতেছে, তাহা নাম মাত্র চলিয়া অধিকাংশ সময়ই বসিয়া থাকে। সেই হেতু হাত-তাঁতের সংখ্যা না বাড়াইলেও, বর্ত্তমান চল্‌তি হাত-তাঁতগুলিই ভারতবর্ষের সমস্ত বস্ত্র বুনাইয়া উঠিতে পারে। আর সূতার হিসাব তো অত্যন্তই সহজ। কয়েক বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে যত বস্ত্র ব্যবহার হয় তাহার পরিমাপ জনপ্রতি বৎসরে ১২ গজ। যত বস্ত্র বিদেশ হইতে বোনা হইয়া আইসে, যত বস্ত্র দেশী মিলে প্রস্তুত হয় এবং যত সূতা হাত তাঁতে বোনার জন্য বিক্রীত হইয়া বস্ত্র হয়, তাহার সমষ্টি জন-প্রতি বৎসরে ১২ গজ অর্থাৎ জন-প্রতি মাসে এক গজ। পরিবারে ৫ জন লোক থাকিলে পরিবারে প্রতি মাসে ৫ গজ বস্ত্রের প্রয়োজন। এই ৫ গজ কাপড়ের সূতা মাসে কাটিতে একটি পরিবারের দৈনিক মাত্র আড়াই ঘণ্টা সময় দেওয়া প্রয়োজন। যখন কৃষক পরিবারের মেয়েরা বসিয়া থাকে, সেই সময়ের কতক অংশ ব্যবহার করিয়াই গড়ে প্রতি পরিবার দৈনিক ২।৷০ ঘণ্টা সূতা কাটিয়া বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে পারে এবং দেশকে বৃহৎ অশুভ হইতে মুক্ত করিতে পারে।

কলের বিষয়ে সকল কথা বলা হয় নাই। যাঁহারা কলের সম্বন্ধে পূর্ব্ব বিবৃত ধারণা পোষণ করেন, তাঁহারা কেনই বা নিজেরা রেল ষ্টীমার ইত্যাদি ব্যবহার করেন, প্রেস ও ডাক, টেলিগ্রাফ ব্যবহার করেন—এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তরে সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য যে, আমরা কল মাত্রই নষ্ট করিবার প্রয়াসী নহি। কেবল কল দ্বারা যে সামাজিক অনিষ্ট হইতেছে, তাহারই প্রতিকারের কামনায় কলের ব্যবহার সংযত করিতে বলি। ডাক, টেলিগ্রাফ, রেল, ষ্টীমার থাকুক—কিন্তু তাহাদের নিজ হিতকারী গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকুক। যেমন রৌদ্র ও আলো কাহাকেও মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, যেমন রাজপথের ব্যবহারের জন্য বিশেষ শুল্ক দিতে হয় না—স্বাভাবিক ভাবে লোকে প্রয়োজনানুরূপ ব্যবহার করে—তেমনি আদর্শ অবস্থায় ডাক ও রেল, মোটর ও টেলিগ্রাফ সাধারণের হিতে মাত্র নিয়োজিত হইবার পথ আছে। যাঁহারা কলের স্থিতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক জানিয়াও সেই সেই কল ব্যবহার করেন—তাঁহারা কতক কলের সংশোধিত ব্যবস্থা আনয়নের অভিপ্রায়েই তাহা ব্যবহার করেন; আর কতকটা নিজ বিচার বুদ্ধির দ্বারা সংযমের সহিত যথা সম্ভব কম অনিষ্টপাতের সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বকই ব্যবহার করেন। ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও রুচি দ্বারাই কলের ব্যবহার সংযত কি অসংযত হইল নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এতৎসম্বন্ধে কোনও সাধারণ সূত্র দেওয়া অসম্ভব।

ক্যামবোডিয়া

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

ক্যামবোডিয়া ফরাসীদের এসিয়া মহাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ উপনিবেশ ইণ্ডো-চীনের অংশ। ক্যামবোডিয়ার উত্তরে শ্যাম, পশ্চিমে শ্যাম এবং শ্যাম উপসাগর, দক্ষিণে কোচিন চায়না, পূর্ব্বে আনাম এবং লাওস (Laos)।

'মেকং' ক্যামবোডিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদ। এই নদের জল সমস্ত দেশকে উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা করিয়া রাখিয়াছে। ক্যামবোডিয়ার জীবন এই নদের উপর নির্ভর করে, এই কথা বলা যায়। বর্ষাকালে এই নদের জল দুই কূল ছাপাইয়া যায়।

ইহার ফলে নদের দুই পাশের জমি বহুদূর পর্য্যন্ত পলীমাটিতে ভরিয়া গিয়া চাষীর আনন্দ বর্দ্ধন করে। জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নদের জল কুল ছাপাইয়া থাকে। তাহার পর জল কমিতে থাকে। মার্চ্চ মাসে জল অত্যন্ত কমিয়া যায়।

ক্যামবোডিয়ার রাজপুত্র। সম্মান অটুট রাখিবার জন্ত পোষাক এবং অলঙ্কারাদি বাঁধা নিয়মে পরিধান করিতে হইবেই

নদের দুই পাশের গ্রামগুলিতে লোকসংখ্যা খুব বেশী। কারণ, এই স্থানে চাষবাসের সুবিধা অন্য সকল স্থান অপেক্ষা বেশী। স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত ভাল। গ্রামের সারির কিছু দূরেই বিস্তীর্ণ জলাভূমি—তাহার পরে পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের তরাইএ ধান চাষ হয়। পাহাড়ের উপর ভীষণ অরণ্য। অরণ্যে কত রকমের পশুপক্ষী যে বাস করে,তাহা বলা যায় না।

বর্ষাকালে মেকং নদ যখন কানায় কানায় পূর্ণ থাকে, তখন "Tonle sap" নামক প্রকাণ্ড হ্রদটি লম্বায় হয় ১১৮ মাইল, চওড়ায় ১৫॥০ মাইল। ইহার গভীরতা গড়ে ৩৯ ফিট থাকে। গরমকালে এই হ্রদের জল "মেকং" নদ দিয়া বহিয়া যায়। প্রকাণ্ড হ্রদটি তখন তাহার বর্ষাকালের আয়তনের ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র হইয়া যায়। এই সময় এই হ্রদ হইতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধরা হয়। ক্যামবোডিয়ার এই হ্রদের নোনা মাছ দেশে বিদেশে চালান হয়। মৎস্য চালান ক্যামবোডিয়ার একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসা।

"Prom Penh" ক্যামবোডিয়ার রাজধানী। নিকটের Prom পাহাড়ের উপর Khmu pagoda অবস্থিত। ক্যামবোডিয়ার রাজধানীর লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০০০।

বর্ত্তমান ক্যামবোডিয়ান পুরুষের ইঙ্গ-ক্যামবোডিয়ান পোষাক

ক্যামবোডিয়ার রাজা সহরেই বাস করেন। শাসন-কার্য্যে তাঁহার সুবিধা এবং সাহায্যের জন্য ফরাসী সরকার একজন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। ক্যামবোডিয়ার রাজধানীতে অনেকগুলি মন্দির এবং প্যাগোডা আছে। "রৌপ্য প্যাগোডা" এবং রাজপ্রাসাদ দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে বহু লোক গিয়া থাকে।

বর্ত্তমান ক্যামোডিয়া তাহার অতীত গৌরবময় দিনের সামান্য চিহ্ন মাত্র। ১২ শতাব্দীতে ৭ম জয়বর্ম্মণের রাজত্ব কালে ক্যামবোডিয়ার সীমানা ছিল বঙ্গ উপসাগর হইতে চীনসাগর পর্য্যন্ত। এই সময় ক্যামবোডিয়া রাজ্য ৬০টি সুবাতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সুবা রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে নিজ নিজ শাসনকার্য্য পরিচালনা করিত। আভ্যন্তরিক শাসনে রাজা হস্তক্ষেপ করিতেন না। ক্যামবোডিয়ার গৌরবময় দিনের "Angkor thom" নীরোর রোম-সহর অপেক্ষা বৃহৎ এবং বিখ্যাত ছিল। ক্যামবোডিয়ার শিল্প-কলার তুলনা ছিল না। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ক্যামবোডিয়া অতি শক্তিশালী বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্য ছিল। ধন-জন-গৌরব—কিছুরই কমতি ছিল না। এই সময়ে ক্যামবোডিয়ার এক একটি প্রাসাদ এবং মন্দিরের অদ্ভুত এবং বিচিত্র চিত্রখোদিত গঠন-প্রণালী দেখিয়া দেশ-বিদেশের লোকে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইত। বর্ত্তমানে ক্যামবোডিয়ার যে সকল স্থানে ভীষণ অরণ্যানী—হিন্দু রাজত্বকালে সেই সকল স্থানে বহু সহর, গ্রাম, প্রশস্ত রাজপথ ইত্যাদি বিরাজ করিত। কালের প্রবাহে সকলই লোপ পাইয়াছে। হাজার বৎসরের চেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ব্রাহ্মণগণ এবং হিন্দু যোদ্ধারা সুমাত্রা এবং জাভার হিন্দুরাজাদের সাহায্যে যে কীর্ত্তি ক্যামবোডিয়ায় স্থাপন করেন—আজ হাজার বৎসরের অবহেলাতে সেই অতুলনীয় কীর্ত্তির নাম মাত্র রহিয়াছে।

নর্ত্তকীদের প্রধানা। শিক্ষার্থিনী নর্ত্তকীদের ইহার কথায় চলাফেরা করিতে হয়। ইহার অলঙ্কার রাজানুগ্রহের পরিচায়ক

ক্যামবোডিয়ার এখনো হিন্দু-ধর্ম্মের সামান্য চিহ্ন রহিয়াছে। হিন্দু কীর্ত্তি যদিও সব লোপ পাইয়াছে—হিন্দু-ধর্ম্ম এখনো কোনো রকমে টিকিয়া রহিয়াছে। ১২শ শতাব্দীর পর হইতেই চীনদেশ হইতে মোঙ্গলেরা ক্যামবোডিয়া রাজ্যের বিভিন্ন অংশ কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করে। এই আক্রমণকারীদের অনেকে কাছাকাছি দেশে বসবাস করিতে থাকে। ইহারাই বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশীয় এবং শ্যামদেশীয় লোকদের পূর্ব্বপুরুষ। তিব্বতীরাও সুবিধা পাইয়া ক্যামবোডিয়া রাজ্যের কিছু কিছু অংশ জোর করিয়া দখল করিয়া লইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে ইহারা এই সকল দেশের লোক হইয়া গেল। নিজ দেশের সহিত তাহাদের আর কোনো সম্বন্ধই থাকিল না। ক্যাম-

বোডিয়ান্‌রা শ্যামদেশীয়দের এবং আনামীজ্‌দের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফরাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করে। ফরাসীরা ক্যামবোডিয়ানদিগকে তাহাদের শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা করিল; এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ক্যামবোডিয়ানরা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হয়, তাহার জন্য পাকাপাকি ভাবে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিল। ফরাসীদের সাহায্য পাইয়া ক্যামবোডিয়ানরা তাহাদের শত্রুর হাত হইতে ক্যামবোডিয়ার পূর্ব্বে রাজধানী আংকোর এবং তাহার চারিদিকের জঙ্গলাদি উদ্ধার করিল।

ক্যামবোডিয়ান সঙ্গীতকারিণী নর্ত্তকীদ্বয়

ক্যামবোডিয়ার জঙ্গলে যে সমস্ত জঙ্গলি জাতি বাস করিত, তাহারা নানা প্রকার রোগে প্রায় লোপ পাইবার অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের সংখ্যা অতি সামান্য মাত্র। জঙ্গলের মাঝে মাঝে প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কতক ভাঙ্গিয়া একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কতক কোনো রকমে দাঁড়াইয়া আছে। বর্ত্তমান রাজসভা, রাজা, রাজার ক্ষমতা ইত্যাদি সব কিছুই ফরাসী শক্তির ভরসায় দাঁড়াইয়া আছে। ফরাসী সরকারের ইঙ্গিতেই শাসনকার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হয়। বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে এবং মন্দির-গাত্রে যে সকল চিত্রাদি খোদিত আছে, তাহা অতুলনীয়। রাজসভার নর্ত্তকীদের নৃত্য অনুপম। এই ধরণের মনোহর নৃত্য অন্য কোথাও দেখা যায় না। বর্ত্তমান নৃত্য-পদ্ধতি প্রাচীন ধারাতেই চলিয়া আসিতেছে; তাহার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে পোষাকে কিছু কিছু অদল বদল হইয়াছে।

বর্ত্তমান ক্যামবোডিয়া আয়তনে প্রায় ইংলণ্ডের সমান। লোক-সংখ্যা ১৫,০০০০০র কিছু বেশী। ক্যামবোডিয়ার জমি অত্যন্ত উর্ব্বর—কিন্তু ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগাদির অতি বাহুল্যে দেশের বহু স্থান লোকবাসের পক্ষে অযোগ্য।

ক্যামবোডিয়ার অসভ্য জাতিরা পাহাড়ের উপর বাস করে। শিকার ইত্যাদি করিবার সময় তাহারা দিনে তরাইএ অবতরণ করে। খাদ্যাভাব না হইলে তাহারা পাহাড় ত্যাগ করিয়া নীচে নামে না। মশার অত্যাচারই ইহার কারণ। পাহাড়ের নীচের জলাভূমি এবং তরাইএ এক এক স্থানে এত মশা যে, তাহাদের সঙ্গীত অতি দূর হইতে শোনা যায়। রাত্রিকালে এই সকল স্থানে জন্তুরাও থাকিতে পারে না। সভ্য ক্যামবোডিয়ানরা মেকং নদের তীরের সহর এবং গ্রামে বাস করে। "Tonle ꞩap" প্রকাণ্ড হ্রদের চারিদিকেও বহু সহর এবং গ্রাম আছে।

"Prom Penh" সহরটি দূর হইতে স্বপ্নপুরীর মত মনে হয়। সহরের চারিদিকে বহুদূর ব্যাপিয়া হরিৎ ধান্যক্ষেত্র। তাহার মাঝে মাঝে সবুজ বনানী। মাঝে মাঝে তুলার
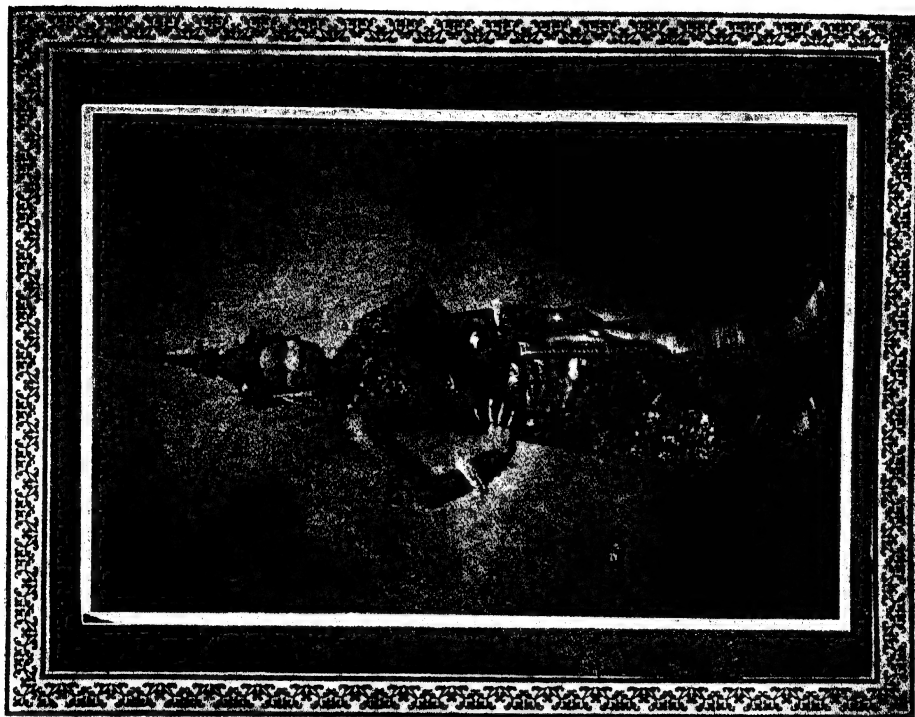
ক্যামবোডিয়ান অভিনেত্রী এবং নর্তকী। ইহাদের নৃত্য অতীব মনোহর

ক্যামবোডিয়া-রাজ। পুরুষানুক্রমে একই পোষাক এবং অলঙ্কার চলিয়া আসিতেছে

ক্ষেত্রও আছে। সহরের মধ্যস্থিত মন্দির এবং প্যাগোডার চূড়াগুলি দুর হইতে অতি মনোহর দেখায়।

সহরের পথঘাটে সর্ব্বত্র নানা রংএর পোষাক পরিহিত নরনারীরা চলাফেরা করিতেছে। নারীদের চলনভঙ্গী অতি চমৎকার। নারীদের চুল ছোট করিয়া ছাঁটা; তাহাদের বক্ষদেশ উন্মুক্ত। তাহাদের প্রতি পাদক্ষেপে ছন্দের দোলা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পুরুষের দেহের গঠন সুন্দর। তাহাদের প্রতি অঙ্গ সুগঠিত, কোথাও অমিল নাই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা উলঙ্গ অবস্থায় পথে খেলা করিয়া

আংকোর থোমের "সপ্তমুখী-কেউটে"

বেড়াইতেছে। তাহাদের খোদাই করা ব্রোঞ্জের জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়।

সহরের বাহিরে যে সকল মন্দিরাদি আছে, সেখানে লোকজন বিশেষ নাই। পূজা দিবার জন্য পূজারি এবং লোকদল মাঝে মাঝে এই সকল মন্দিরাদিতে গমন করে। পূজা শেষ হইলে আবার সকলে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। রাত্রিকালে এই সকল মন্দিরের নিকট গেলে মনে হয় যেন মায়াপুরীর মধ্যে রহিয়াছি। মন্দিরে যে সময় দিবারাত্র উৎসব চলিত, সেই সকল দিনগুলি যেন মনের মধ্যে উঁকি মারিতে থাকে।

আংকোর ভাটের প্রধান মন্দিরটি ৮২০ ফিট লম্বা এবং ৬৫৬ ফিট চওড়া। এই মন্দিরের ৫টি চূড়া আছে। মধ্যের চূড়াটি ১২৩ ফিট উচ্চ। মন্দির প্রস্তরের তৈরী এবং এই সমস্ত প্রস্তরের সর্ব্বত্র নানা বিচিত্র চিত্র খোদিত আছে। যে সকল শিল্পী এই সকল চিত্র খোদাই করিয়াছিল, তাহাদের তুলনা নাই। তাহারা মরিয়াও অমর হইয়া আছে।

বর্ত্তমান ক্যামবোডিয়ানদের পোষাক বিচিত্র। উর্দ্ধাঙ্গে কোট, নিম্নাঙ্গে ধুতি—ঠিক ধুতি বলা ভুল—লুঙ্গিতে কাছা লাগাইলে যেমন হয় সেই প্রকার। অতি চমৎকার রেশমের কাপড়ে এই সকল পোষাক প্রস্তুত হয়। মেয়েরা প্রাচীন পদ্ধতিতে তাঁতে এই সকল রেশমী বস্ত্র বুনিয়া থাকে।

দেশের লোকদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল। সাধারণতঃ তাহারা লম্বা এবং মোটাসোটা। ক্যামবোডিয়ানদের মন অতি সরল। ক্ষুদ্রকায় চতুর আনামিজরা ইহাদের অতি সহজেই নানা প্রকারে ঠকাইয়া থাকে। আনামিজরা ক্যামবোডিয়ানদের

দ্বিপ্রহরের আহার

গ্রামবাসীদের বিচিত্র পোষাক

ঠাট্টা করিয়া মহিষ বলিয়া সম্বোধন করে। ক্ষুদ্রকায় মঙ্গোলিয়ানদের হাতে নিরীহ ক্যামবোডিয়ানরা কি প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করে, তাহা দেখিলে বাস্তবিক কষ্ট হয়। ক্যামবোডিয়ানদের নিজেদের উপর কোনো বিশ্বাস আছে বলিয়া মনে হয় না। ফরাসীর অধীনে আসিবার পূর্ব্বে সমান। সামান্য আত্মবিশ্বাস থাকিলে ইহারা শত্রুদের দমন করিতে পারিত। এমন কি রাজ্য রক্ষা করিতেও পারিত। আনামিজ দস্যুদের অত্যাচারের নমুনা একটি দিব। তাহারা গ্রাম আক্রমণ করিয়া তিনজন লোককে এক সঙ্গে বন্ধন করিয়া মাটিতে গলা পর্য্যন্ত পুতিত। তাহার
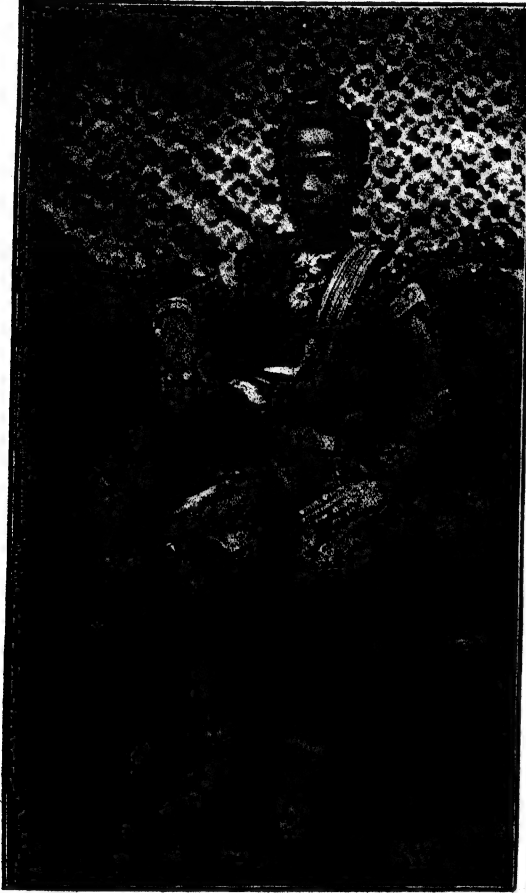
ক্যামবোডিয়ার সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালিকা

স্ত্রী-পুরুষের সাধারণ পোষাক (ক্যামবোডিয়া)

আনামিজ জলদস্যুরা ক্যামবোডিয়ানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। জনকয়েক দস্যুতে সমস্ত গ্রামের লোকদের মারধর করিয়া লুটপাট করিয়া, এবং অবশেষে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া চলিয়া যাইত। অথচ এক জন ক্যামবোডিয়ান পুরুষের দেহের শক্তি প্রায় ৪ জন আনামিজের পর তিনজনের মাথার উপর হাঁড়ি চড়াইয়া নীচে আগুন দিয়া তাহাতে রন্ধন করিত। এইজন্য মনে হয় যে ফরাসীরা যদি ক্যামবোডিয়া দখল না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় ক্যামবোডিয়া হইতে ক্যামবোডিয়ানরা একেবারে সমূলে ধ্বংস পাইত।

ক্যামবোডিয়ান তলোয়ার খেলোয়াড়—স্ত্রীলোক
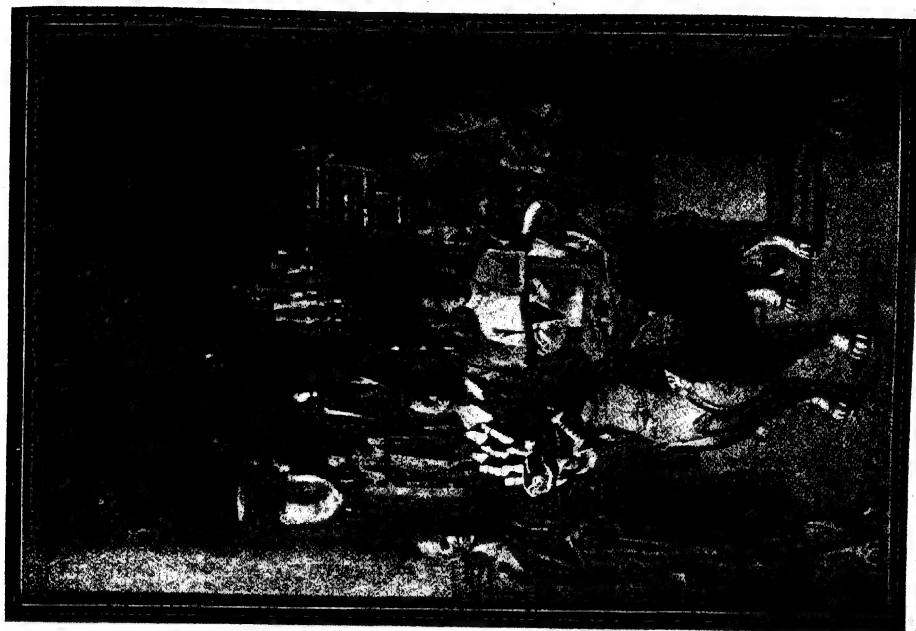
বুদ্ধ-মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য
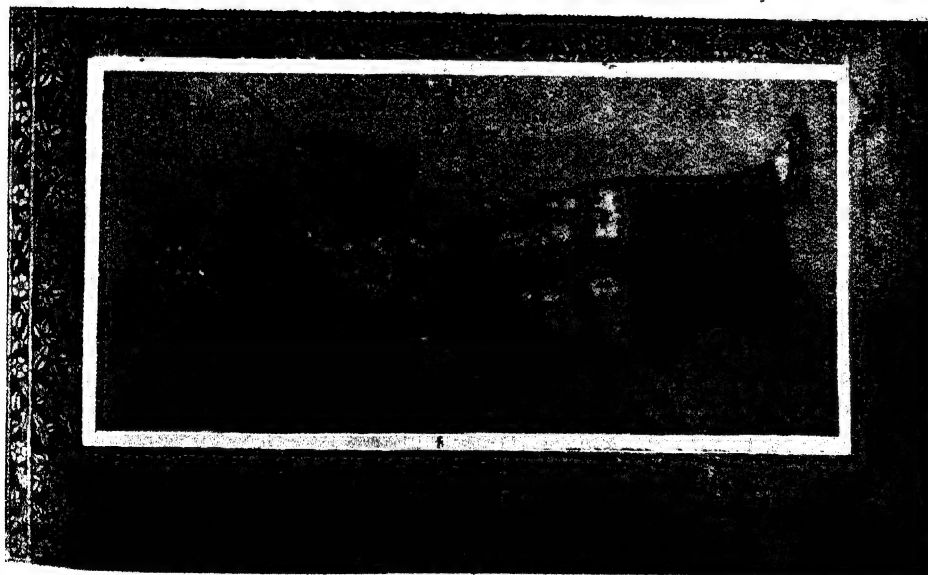
মশার আবাস, যে, কোনো লোক সেই সকল মন্দিরের ত্রিসীমানায় যাইতে ভরসা করে না।

ক্যামবোডিয়ার বর্ত্তমান রাজার প্রাসাদ Pnom Hillএর পাশে এবং মেকং নদের পাশে। প্রাসাদে একটি প্রকাণ্ড প্রায়

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত

১০০ ফিট লম্বা ঘর আছে। এই ঘরে একটি নীরেট সোনার দেবমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির অঙ্গে হীরা জহরতাদির বহুমূল্য অলঙ্কার আছে। মূর্ত্তিটিকে জবড়জঙ্গ দেখায় না। মূর্ত্তির নির্ম্মাণকৌশল এমন যে, এত অলঙ্কারাদি থাকা সত্ত্বেও মূর্ত্তির একটি অতি শান্ত পবিত্র শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজপ্রাসাদের মধ্যে ফরাসী-রাজকর্ম্মচারীদের অত্যন্ত বেখাপ্পা লাগে। ক্যামবোডিয়ার অসভ্য জাতিদের চরিত্রে—মালয় হিন্দু চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সভ্য ক্যামবোডিয়ান অপেক্ষা তাহারা আকারে-প্রকারে কৃশ হইলেও—বুদ্ধিতে বিশেষ কম নয়। এই অসভ্য জাতিরা "ব্রা" নামক দেবতার পূজা করে। "ব্রা" বোধ হয় 'ব্রহ্ম' শব্দের অপভ্রংশ। ইহাদের পূজাদি করিবার জন্য কোনো পুরোহিত নাই। ক্বচিৎ কখনও এই অসভ্যরা দেবতার রোষ শান্তির জন্য নরবলি দিয়া থাকে। তবে এই প্রথা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। আমোদের মধ্যে ঘুড়ি উড়ানোই ইহাদের অতি প্রিয়। ব্যাঘ্র, বন্যশূকর, হাতী, বন্যমহিষ ইত্যাদি সঙ্কুল জঙ্গলে ইহারা অতি কষ্টে বাস করে। সর্পভীতিও অত্যন্ত বেশী। ক্যামবোডিয়ার জঙ্গলবাসীদের আবাস-ভূমির কাছাকাছি যে সকল সর্পাদি সরীসৃপ বাস করে, তাহারা আমাদের দেশের ছেলে জাতীয় নয়—কেউটে জাতীয়। বর্ষাকালে জোঁকেরও ছড়াছড়ি। মশার অত্যাচারও অল্প নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য, এমন ভীষণ দেশের অসভ্যরা বেশ বাঁচিয়া আছে; কিন্তু কোনো শ্বেতাঙ্গ একদিনও সেখানে থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার প্রাণ লইয়া

রাজার আর একদল নর্ত্তকী—ইহারা অন্দরে থাকে

প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আশা অতি কম। যে সকল শ্বেতাঙ্গ এই দেশে বাস করে, তাহারা জানালায় দস্তাপাত চালুনির মত ছিদ্র করিয়া লাগায়। তাহা ছাড়া বিছানার চারিদিকে খুব পুরু মশারি খাটায়। অসভ্যদের বোধ হয় মশার কামড় ইত্যাদি সহ্য হইয়া গেছে। এই অসভ্যদের বর্ণজ্ঞান নাই। তাহাদের স্মৃতিশক্তিও অত্যন্ত কম—নাই বলিলেই হয়। ক্রয়-বিক্রয় করিবার কালে দ্রব্যাদি গণনা করিবার সময় ইহারা অত্যন্ত গোলমালে পড়ে এবং লোককে গোলমালে ফেলে। কোনো রকমে ১০টা পর্য্যন্ত ইহারা সংখ্যা ঠিক রাখিতে পারে। তাহার বেশী হইলেই বিপদ! কোনো

করে। বৌদ্ধধর্ম্ম কিন্তু লোকের মন হইতে বৈদিক আচার ব্যবহার এবং সংস্কার একেবারে দূর করিতে পারে নাই।

ক্যামবোডিয়ানদের পারিবারিক জীবন ভাল। সন্তানদের অতি আদরে এবং যত্নে পালন করা হয়। হাজার দোষ করিলেও তাহাদের বকা বা প্রহার করা হয় না। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ না থাকিলেও লোকে এক স্ত্রী লইয়াই ঘর-সংসার করে। সচরাচর দ্বিতীয় স্ত্রী কেহ গ্রহণ করে না। পিতার সম্পত্তির উপর পুত্র কন্যার সমান অধিকার। ক্যামবোডিয়ান নারীর কোনো বিদেশীকে বিবাহ করা বহুদিন পর্য্যন্ত আইনে নিষিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে এই আইন নাই।
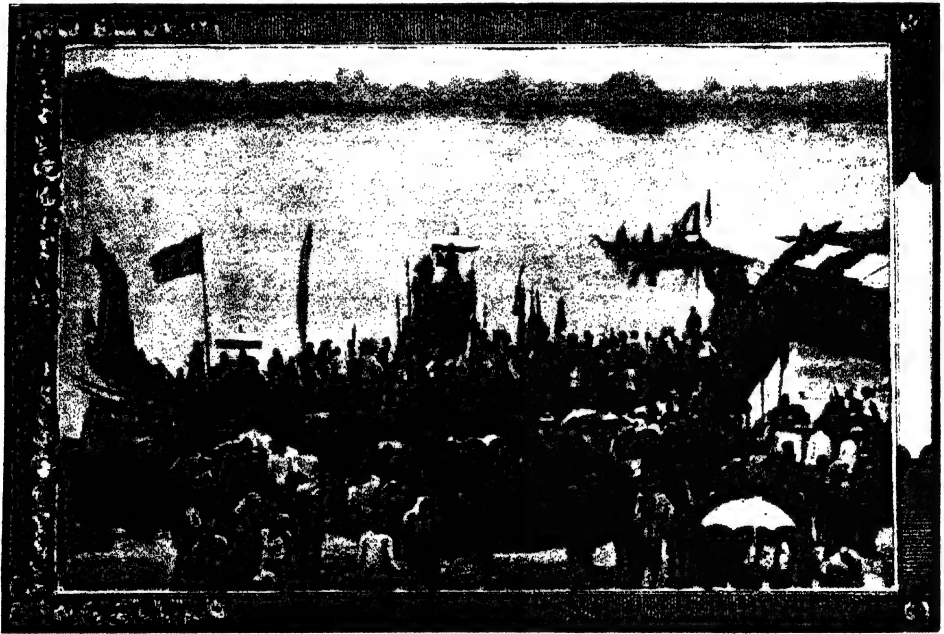
শ্মশানে শেষ কর্ত্তব্য। শ্মশান হইতে উপযুক্ত পাত্রে চিতাভস্ম মৃতব্যক্তির গৃহে লইয়া যাওয়া হইবে

জিনিষ যদি ১০০টি দিতে হয়, তাহা হইলে ইহারা দশ দশ করিয়া দশটি থোক করিয়া দিবে—কিন্তু এক সঙ্গে একশ কিছুতেই দিতে পারিবে না।

ক্যামবোডিয়ানদের অনেক উৎসবাদি আছে। এই সকল উৎসবের সময় নানা প্রকার ক্রীড়াদি প্রদর্শিত হয়। ঘোড়দৌড়, বাচখেলা, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি উৎসবের অঙ্গবিশেষ।

বর্ত্তমান ক্যামবোডিয়ার ধর্ম্ম সিংহলে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম। ১৩শ শতাব্দীতে এই বৌদ্ধধর্ম্ম "হিন্দুধর্ম্মের" স্থান দখল

ক্যামবোডিয়ায় বিবাহ-ছেদ অতি সহজেই হয়। স্বামী বা স্ত্রী—যে কেহ ইচ্ছা করিলেই বিবাহ বাতিল করিতে পারে। দেশে আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, এবং শিশুহত্যা নাই বলিলেই হয়।

ক্যামবোডিয়ানরা চীনা এবং আনামিজদের নিকট হইতে অহিফেন-সেবন শিক্ষা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহারা অতিরিক্ত মাত্রায় অহিফেন-ধূম্র পান করে না। উৎসবাদি উপলক্ষে মদ্যপান চলিত থাকিলেও মাতাল হইতে বড় একটা কাহাকেও দেখা যায় না। লোকেদের প্রধান খাদ্য ভাত।

বর্ষ-অবসানে

বাণীকুমার

ক্ষণেকের তরে দাঁড়াও চৈত্ররাতি!
বিদায় নেবে কি ওগো চেনা মোর সাথী?
আজি কি কালের শ্রান্ত মরণ মানি'
বীণাতে তোমার বাজে ম্লান গানখানি?
নবীনের সুরে হে প্রাচীন অভিমানী—
নিভাইলে ধ্রুববাতি?
ধরণী ব্যথার অঞ্জলি ভরি' 'আনি'—
অশ্রু-সজল-ব্যাকুল জানায় বাণী।

ক্ষণেক শান্ত হও গো ক্লান্ত রাতি।
কোথা' চলো—ফেলি' চির দিবসের সাথী?
এসেছিলে যবে এখানে কিশোর বেশে,
বসুন্ধরা যে বরি' নিল ভালোবেসে;
রবির কিরণে চাঁপার সুরভি এসে
করিয়াছে মাতামাতি।
প্রকৃতি তোমায় দিয়েছিল তূণ ভরি'—
কুসুম-সম্মোহনে পরিপূর করি'।

পিছনে তোমার বাজে আহ্বান-ভেরী,—
যাবার সময় এসেছে—নাহি কি দেরী?
কৈশোর তব যৌবনে হ'লো সারা,
তৃপ্ত করিল আষাঢ়ের জলধারা,—
গাহিলে কী গান ভাদরে উদাস-পারা
কৌতুকে ধরা ঘেরি'?
আঁখিজল সে-যে পারে না রাখিতে ধ'রে;
বিফল হুতাশে ধরার মিনতি ঝোরে?

ধরণী সাজিল কোমল শ্যামল সাজে—
যে-ভাবনা তব ঘুরিত মরম-মাঝে।
আকাশে মুগ্ধ চুম্বন ছিল তা'রি,
মেঘেতে ছিল না আঁকা বেদনার বারি;
চটুলা তটিনী ফেলি মঞ্জীর ভারী—
গাহিল সেদিন লাজে:
—"প্রাণের সকল কামনা দিয়ে যে আমি
বাসিয়াছি ভালো তোমারে দিবস যামী!"

নব পথ রেখা আঁকি' যাও চিররাতি—
ধরার সোহাগ বারেবার ওঠে মাতি'।
গাহিল তোমার বীণা যে-দিনের সুরে
সে-দিনের বাণী ধরার আলোকে ঘুরে,
সেই আনন্দ মিলালো নিকটে দূরে—
চির-স্মরণের সাথী।
তব প্রিয়া আজি ছলছল আঁখি মেলি'
দাঁড়াইয়া দ্বারে—যাবে নির্ম্মম হেলি'?

শাশ্বতী-মায়া পারে না রাখিতে ধরি'?
চিরন্তনী যে রাখে সুর-থালি ভরি'!
সেজেছে বসুধা কত না বর্ণে রূপে,
ধ'রেছে অধরে সীধু-পান চুপে চুপে,
মোহিয়াছে নিতি প্রাণের সুরভি-ধূপে
নব নব সুখে বরি'!
তবু কেন আজি যাও অচেনার কূলে,
চারু-জাগানিয়া স্মৃতির মহিমা ভুলে'?

হে প্রাচীন তুমি ক্ষণিক দাঁড়াও আজি,
বিস্মরণের দিনগুলি এলো সাজি'।
বিদায়ের ক্ষণে দেখো চেয়ে একবার—
তোমার কণ্ঠে দুলে অনন্ত হার;
বসন্ত আনে মঞ্জুল ফুল-ভার
বরণ-বিভূতি-রাজি!
প্রথম উষা যে তোমার জন্মকালে
চুম্ব দিল—সেই লেখা তব ভালে।

ওগো চিরভোলা যাবে চলি'—জানি জানি;
রেখে যাও তব নিত্য-বোধিনী বাণী।
সমীর-দোলায় সেই তান যেন জাগে,
বন-মর্ম্মর গাহে যেন অনুরাগে,
আকাঙ্ক্ষা-প্রিয়া সেই সুর যেন মাগে—
মিলন রাগিণীখানি।
কত যুগান্ত ধরা বল্লভ লাগি'—
একটী কামনা পূরা'তে রহিবে জাগি'।

অভিশাপ

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ, বি-এ

(১)

তখন সন্ধ্যা। গোধূলির রক্ত-লেখা দূর দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। ছায়ার স্পর্শে তাপক্লিষ্ট উদ্যানখানি ফুলে ফুলে জ্যোৎস্নার মত হাসিয়া উঠিয়াছিল। উষা তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সবটুকু প্রীতি মাখাইয়া গাছভরা ফুলগুলি ছিঁড়িয়া নিজের শুভ্র আঁচলখানিতে স্তূপীকৃত করিয়া আনন্দে দিশেহারা ভ্রমরের মত এগাছ সেগাছ করিয়া ফিরিতেছিল। উৎসাহ উল্লাসে তাহার প্রাণখানি আজ উথলিয়া পড়িতেছিল শুধু মীরার নূতন বরের কথা ভাবিয়া। সে ভিন্ন ভিন্ন ফুলের ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে কত রকমের মালা গাঁথিয়া সাজাইবে আজ নূতন বর আর মীরাকে, তাই লইয়াই ব্যস্ত। আঁচল-ভরা ফুলেও যেন তার মন আজ তৃপ্ত হয় নাই। সে সাজাইবে ফুলের বাসর, ফুলের মালায় ভরিয়া দিবে বরের তরুণ শরীর-খানি আর মীরার গৌরীকে।

"উষি, পোড়াকপালি! নিজের কপাল পুড়িয়েছিস্, তাই বুঝি আর পরেরটাও সহ্য হচ্ছে না। হিংসেয় বাগানের সব ফুলগুলো যে ছিঁড়ে নষ্ট কর্‌লি! কেন, জানিস্‌নে যে আজ ফুলের কত দরকার?"

উষার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—"না কাকীমা, নষ্ট করিনি; বরের আর মীরার মালা—"

"হতভাগি! এমন কথাও মুখে বের করিস্? ওমা, কি শত্রু গো! দুধ দিয়ে সাপ পুষেছি আমি। আপনার কপাল পুড়িয়ে বসে' আছেন, তাই আর পরের কল্যাণ ওঁর সহ্য হচ্ছে না। শুভ কাজে উনি দেবেন মালা। মুখে বাধ্‌লোনা ও কথা বল্‌তে? বেরো পোড়ারমুখী আমার বাড়ী হ'তে।"

উষা বজ্রাহতার ন্যায় নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই নিদারুণ তিরস্কারের অর্থ সে কিছুই বুঝিল না। পলকে তার দীপ্ত উল্লাস যেন শিশির-ছোঁয়া পদ্মের মত ম্লান হইয়া গেল। কাকীমা সশব্দে বাগানের দরজা বন্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

আবাল্য-সহচর অশ্রু উষার চক্ষু ছাপাইয়া উঠিল। তার কি জীবনের সব সুখ—সব আনন্দ—মা বাপের অকাল-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তা'কে ছাড়িয়া গিয়াছে! আজ মনে হইল তার সেই শৈশবের কথা: মায়ের মৃত্যুকালের সেই ম্লান মুখখানি স্পষ্ট হইয়া তার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বেদনায় ভাঙ্গিয়া-পড়া বুকখানিকে দুই হাতে চাপিয়া উষা বাগানের খিড়্‌কি দিয়া চুপি-চুপি পাশের বাড়ীতে চলিয়া গেল। কাকীমার উগ্র-ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া সে স্পষ্টই বুঝিয়াছে—আজ এ উৎসবের বাড়ীতে তার স্থান নাই।

(২)

মুক্তেশ তখনো বেড়াইয়া ফিরে নাই। চাকর তাহার পড়ার ঘরে আলো দিয়া গিয়াছে। উষা সঙ্কোচহারা পাগলিনীর মত মুক্তিদা'র ঘরে গিয়া তাহার বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। অজ্ঞাত বেদনার অশ্রু চোখ ছাপাইয়া অবিরল ধারে ঝরিতে লাগিল। আজ যেন তাহার স্পষ্টই মনে হইল সে অনাথা—সে একাকিনী।

উষার জন্মের অল্পদিন পরই সহসা বিসূচিকা রোগে পিতা অসিতমোহনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ মোহিতের হাতে তাঁর বিধবা পত্নী আর শিশু কন্যার ভার অর্পণ করিয়া অসিতমোহন স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তি ভ্রাতার নামেই দান করিয়া গিয়াছিলেন। উষা তার একমাত্র সম্বল জননীর বক্ষঃ বেড়িয়া ধীরে ধীরে কচি লতাটীর মত উঠিয়া যখন সবে মাত্র সাতে পা দিয়াছে, সহসা সে এক চৈত্রের ঝড় আসিয়া তাহার আশ্রয়-তরু উৎপাটিত করিয়া গেল। তার পর সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল সে এই পরিবারে আশ্রিতা অনাথার মতই জীবন কাটাইতেছে। কে জানে তার দুঃখের কাহিনী? কে জানে তার গোপন হৃদয়ের সুগভীর ব্যথা? অর্থের অসৎ ব্যবহার হইবার ভয়ে যখন স্ত্রীর পরামর্শে মোহিতমোহন অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাকে তৃতীয় পক্ষের বন্ধনে এক বৃদ্ধের সহিত গাঁথিয়া দিলেন, তখন উষা শুধু হাসির আলোতেই ভরা ছিল।

কেমন —কি সে বিবাহ ? যেন তার শৈশবের কোন পুতুল-খেলা। বিবাহের আনন্দ তার ছোট লাল-শাড়িখানি আর দুই একখানি নূতন গহনার মধ্যে ফুটিয়াই তাহাকে আমোদিত করিল। কিন্তু সে হাসিও বুঝি বিধাতার সহ্য হয় নি। তাই বৎসর না ফিরিতেই যখন কাকীমা জোর করিয়া স্নানের ঘাটে লইয়া গিয়া তার হাতের শাঁখা আর তামা বাঁধানো চুড়ী দুগাছি খুলিয়া দিয়াছিলেন, তখন সে শুধু ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল,—"না—কাকীমা, আমি হারাব না—।" তার সে উল্লাস নাটকের যবনিকা হইয়া গিয়াছে। সেই তার বৈধব্যের শোক-অশ্রু ঝরিয়া গিয়াছে—শুধু রঙীন্ কাপড়খানি আর দুই টুকরা গহনার লালসায়। তার পর সুরু হইয়াছে তার সীমাহীন—অবসরহীন নির্য্যাতনের পালা। শুধু এক বেলার এক মুষ্টি অন্নের জন্য বহিয়া যাইতেছে তার ক্ষুদ্র জীবনখানির উপর এক নিদারুণ প্রলয়ের ঝড়।

মুক্তির মা তাকে বড় ভালবাসিতেন। শুধু তার দুঃখের কথা ভাবিয়া তাঁর কোমল মাতৃত্বটুকু যেন লুটাইয়া পড়িত উষার মরুময় জীবনের উপর। তাই সে তার নির্য্যাতন কারাগার হইতে কেবল অবসর খুঁজিত তাঁহার কোলে ছুটিয়া আসিবার। আজ তিন মাস হইল মুক্তির মাতাও গুটাইয়া লইয়াছেন তাঁহার সে অঞ্চলখানির ছায়া। মুক্তির মায়ের মৃত্যুর পর উষা আর এ বাড়ীমুখো হয় নাই। হয় তো সেও শুধু তীব্র শাসনের ভয়ে। আপনার মনে যখন সে তাহাদের বাগান হইতে এই বাড়ীটির দিকে চাহিত, তখন কতবার ভাবিয়াছে সে—মুক্তিদার সঙ্গে মিলিয়া তাহার মায়ের জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদে। কিন্তু সে অশ্রু তাহার অঞ্চলেই শুকাইয়া গিয়াছে।

(৩)

ঘরে আস্তেই সহসা আজ উষাকে এ অবস্থায় দেখে মুক্তির বুকখানা যেন চম্‌কে উঠ্‌লো। তার মুখে কথা সর্‌লো না ; নিশ্চল হ'য়ে চেয়ে রইলো শুধু লুণ্ঠিতা উষার দিকে। এ কি ! আজ বাড়ীভরা আনন্দের মাঝে,— এ উৎসবের দিনে—উষা এ অবস্থায় ? মুক্তির সাহস হ'ল না কোন কথা তাকে জিজ্ঞেস্ করে ; শুধু শঙ্কিত চিত্তে একবার উপরের দিকে চেয়ে ডাক্‌লো —"উষা !"

সে ডাক যেন উষার বুকের তল পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছে-ছিল। এতকালের সঞ্চিত বেদনা হঠাৎ কেঁপে উঠলো তার বুকের ভিতর। জলভরা বড় চোখ দুটো তুলে একবার মুক্তির মুখের দিকে চেয়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। সমবেদনায় মুক্তির তরুণ বুকখানা ভ'রে গেল। সস্নেহে উষার হাতখানি ধরে' অশ্রু ছল ছল কণ্ঠে বল্‌লো—"ছিঃ উষি, এ কি ?"

উষার মুখে কোন উত্তর ফুট্‌লো না। কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস যেন মরুভূমির তপ্ত হাওয়ার মত তার ছোট বুকখানিকে দুলিয়ে দিয়ে গেল।

মুক্তি এর অর্থ কিছুই বুঝ্‌লো না। আজ, মীরার বিবাহ-উৎসবে বাড়ীভরা আনন্দ ; আর উষার এ কি ভাব ! কাকীমার ব্যবহারের কথা সে অবশ্যই জান্‌তো। কিন্তু শুভদিনেও যে তার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না তা মুক্তি ভাবতে পারে না। উষাকেও তো সে বহুবার পরীক্ষা ক'রেছে, কিন্তু সেখানে তো আছে শুধু এক অপার সরলতা আর ধৈর্য্য। উষার জীবনে যে কপটতা বা প্রবঞ্চনার কোন স্থান নাই, তা মুক্তি স্থির জান্‌তো। তাই আজ তার এ ভাববিপর্য্যয়ের অর্থ সে কিছুই খুঁজে পেল না। সশঙ্কিত চিত্তে মুক্তি উষার মাথায় হাত দিয়ে ধীরে জিজ্ঞেস কর্‌লো—"উষা, বহুদিন হ'তে তুই কত সাজান গোছানর কথা বল্‌তিস্, মীরার বিয়ের কথায় কত আনন্দ কর্‌তিস্. কিন্তু আজ যে এমন করে—"

মুক্তির কথা শেষ না হ'তেই উষা ব'লে উঠ্‌লো—"আমি যে বিধবা—মুক্তি দা'।"

"তাতে কি হ'ল উষি ?"—মুক্তির কথা যেন হঠাৎ বুকের মধ্যে আট্‌কে গেল। ঢোঁক গিলে শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরবে উষার বেদনা-ব্যাকুল মুখখানির দিকে চেয়ে রইলো। মুখ ফিরিয়ে উষা অতি কষ্টে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লো—"শুভ কাজে বিধবার সংস্পর্শ যে অকল্যাণকর।"

উষার একটী কথায় চকিতে মুক্তির মনে যেন তার বহু দিনের তর্ক, সমালোচনা, শাস্ত্র সব একসঙ্গে চম্‌কে উঠ্‌লো। মনে হ'ল সমাজের স্বার্থপরতা, পক্ষপাতিত্ব, নির্য্যাতন আর অবিচার। যা' নিয়ে সে বহুদিন মাথা ঘামিয়ে বহু তর্ক যুদ্ধ করেছে. তাই যেন এক জটিল কূট সমস্যার মত ভেসে উঠ্‌লো তার চোখের উপর। আপনাকে সংযত ক'রে নিয়ে মুক্তি স্থিরভাবে মুক্ত বাতায়ন-পথে শূন্যের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস্

কর্‌লো—"উষা, বিধবার কথা নিয়ে কি তোমায় কেও কিছু বলেছেন ?"

উষার মেঘভরা হৃদয়ে একটা মলয়ের স্পর্শ গিয়ে লাগ্‌লো। অবিরলধারে ঝরে' পড়্‌লো তার এই ক্ষুদ্র জীবনের সবটুকু বেদনার সঞ্চিত কাহিনী। কতবার সে হাল্‌কা হ'তে চেয়েছিল এই বোঝাগুলো নামিয়ে দিয়ে, তা' শুধু সেই জান্‌তো। আজ যেন মরণের তীরে দাঁড়িয়ে সে তার অতীত জীবনের বেদনার ইতিহাস একটী নিশ্বাসের ব্যবধানে মুক্তির চোখের উপর খুলে' ধর্‌লো। কে যেন তার গোপন হৃদয়ের দ্বার মুক্ত ক'রে স্রোতের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে।

মুক্তি এতদিন শুধু উষাকে কল্পনার নেত্রে তার তর্ক, মীমাংসা ও সমালোচনার উদাহরণরূপে দেখেছিল মাত্র। সে উষাকে স্নেহ কর্‌তো—কেবল তার মাধুর্য্য আর অকপট কোমলতাকে। সে শুধু বাহিরের উষাকে এত দিন একটী তরুণ আলোক-রেখার মত অনুভব ক'রেছিল ; জান্‌তো না—সে প্রভাতী হাসির পিছনে কি এক গাঢ় অন্ধকার তাকে অনন্ত কালের জন্য ঘিরে রেখেছে। বাহিরের উষা গোপনে তার অন্তরে এক অচল প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বটে, কিন্তু সেখানে ছিল শুধু আকর্ষণ আর ভালবাসা। উষার দুঃখের কথা ভেবে সে উষাকে তার স্নেহের ছায়ায় রেখেছিল ; কিন্তু জান্‌তো, সে দুঃখ বুঝি শুধু বাহিরের নির্য্যাতনের ভিতর। আজ যখন উষা তার প্রভাতী হাসির পিছনের সেই অনন্ত অন্ধকারের পটখানি পলকে মুক্তির সাম্‌নে খুলে ধর্‌লো, সেই গাঢ় অন্ধকার পটের বুকে লেখা সারা বিশ্ব-প্রকৃতির যুগ-যুগান্তরের বিপ্লব-ইতিহাস যেন এই বালিকার জীবনের বিরাট শূন্যতায় পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌লো তার চোখের উপর। আজ যেন সে অন্তরের উষাকে আপনার অন্তরে অনুভব কর্‌লো!

উষা বিধবা—শৈশবের পুতুল-খেলার সাথে। অনাথা বালিকার ত্যক্ত জীবনে এ যেন এক দারুণ অভিশাপ। অন্তরে তুষানল, বাহিরে সমাজের তীব্র শাসন, আর সংসারে ক্রীতদাসীর মত অবহেলা ও নির্য্যাতন। কাকীমার বিষ-দৃষ্টি তার সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ জীবনের এক অপরিহার্য্য ব্যাধির মত ঘিরে রেখেছে তাকে। মা বুঝি তাই আপনার অকাল বৈধব্যের সাথে মাতৃত্বটুকু মিশিয়ে অত বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলেন এই বালিকা উষাকে। এতদিন উষাকে ভাল-বেসেছি, স্নেহ করেছি সত্য ; কিন্তু অনুভব করিনি কোনদিন তার ক্ষুদ্র অন্তরের এ অসীম হাহাকার। মায়ের বুকে বেজেছিল এই অনাথার ত্যক্ত জীবনের ব্যথা, তাই বুঝি মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তাঁর রোগশীর্ণ হাতখানি আমার মাথায় দিয়ে সমবেদনা-ব্যাকুল কণ্ঠে, জলভরা চোখে আমায় বলেছিলেন—"বাবা মুক্তি, উষাকে দেখো, বড় দুখিনী সে।" বুঝেছিলাম বটে মায়ের সে ভাষা ; কিন্তু মর্ম্মে জাগেনি তাঁর প্রাণের প্রকৃত অনুভূতিটুকু।

চিন্তার আলোড়নে মুক্তি অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে পড়্‌লো। বেদনা-ব্যাকুল চক্ষে শুধু একদৃষ্টে চেয়ে রইলো উষার অশ্রুসিক্ত মুখখানির দিকে। সে যেন বর্ষাধৌত শরতের একটী স্নিগ্ধ পদ্ম। মুক্তি ধীরে ধীরে উষার চোখ দুটী মুছিয়ে, সস্নেহে তার চিবুক স্পর্শ করে' ডাক্‌লো—"উষি!"

উষার বড় বড় চোখ দুটী পলকহারা হ'য়ে চেয়ে রইলো মুক্তির মুখখানির দিকে। যেন আপনার অস্তিত্ব বিলিয়ে দিতে চায় সে করুণ আঁখি দুটী তার সমবেদনা-ম্লান চাহনির সাথে। উষার মুখে কোন কথা সর্‌ল না ; সে শুধু বিকারীর মত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুক্তির হাতখানিকে দুই হাত দিয়ে চেপে ধর্‌লো।

মুক্তির কুমার জীবনে কি সে এক স্বর্গীয় স্পর্শ তাকে আত্মহারা করে দিল। অতি কষ্টে আপনার অস্তিত্বটুকুকে সংযত ক'রে নিয়ে মুক্তি উঠে দাঁড়ালো। তার বিবেকটুকু আঁকড়ে ধ'রে যেন কিসের প্রতীক্ষায় যন্ত্রের মত সে ব'লে ফেল্‌লো—"উষা, জানো, তোমার এ বৈধব্যের অকারণ সামাজিক নির্য্যাতন হ'তে মুক্তি পাবার জন্য শাস্ত্রে যথেষ্ট বিধি আছে ? স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন তাই এ সামাজিকতার বিরুদ্ধে।"

"জানি, হাঁ - বিদ্যাসাগর ; কিন্তু হিন্দু আমরা।" উষা তার ভাষাহারা ভাবের আবেগে অস্ফুট স্বরে শুধু কয়েকটী কথা ব'লে উন্মাদের মত উঠে বস্‌লো। কে যেন আজ স্পর্শ ক'রেছে তার সুরের তারটীকে।

"বিদ্যাসাগরের চেয়ে হিন্দুত্বের দাবী কেউ বেশী কর্‌তে পারে না।"

"জানি, কিন্তু তিনি তো সব ক্ষেত্রেই তার দরকার বলেন নি। সেটা শুধু প্রয়োজন মত—"

"উষা, জানো তুমি—সমাজের নির্য্যাতন, পক্ষপাতিত্ব,

অবিচার থেকে মুক্ত হ'তে হ'লে, সে সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়। তাকে স্বেচ্ছাচার বলে না। সামাজিক যে সকল আচারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই—তার বিরুদ্ধে, যদি নির্য্যাতন হ'তে মুক্তি পাবার জন্য, মাথা তুলে দাঁড়ান হয় তাতে পাপ হয় না, সে ব্যভিচার নয়। সমাজের গোপন ব্যভিচারের কাছে সে ন্যায়-ধর্ম্ম। তুমি সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারো না সে প্রতিকারের জন্য ?"

"জানি না—"উষা আচলে মুখ লুকিয়ে নুইয়ে পড়্‌লো। মুক্তি জান্‌তো যে সে আজ সাত বৎসরকাল ধরে' উষাকে অনেক লেখাপড়া, অনেক তর্ক সমালোচনা শিখিয়েছে বটে, কিন্তু তার লজ্জাশীল নারী-স্বভাব কোন দিন আপন মর্য্যাদার সীমা লঙ্ঘন করে না। তাই হাসিমুখে উষার হাত দুখানি ধরে' মুক্তি বুকের উপর টেনে নিয়ে বল্‌লো -"এসো তবে প্রাণের বিনিময়ে মায়ের শেষ বাক্য পালন করি, তাঁর সুপবিত্র চরণের উদ্দেশে প্রণাম ক'রে ;—এই স্বার্থপর সমাজ আমরা চাইনে।"

উষা বিদ্যুতের মত তার হাত দুখানি মুক্তির হাত হইতে মুক্ত করিয়া বলিল—"না মুক্তিদা, আমায় ক্ষমা কর্‌বেন। আমি সমাজের চিরন্তনী প্রথার বিরুদ্ধে মাথা তুল্‌তে চাইনে। সমাজ আমার জীবনের নির্দ্দিষ্ট একটা গতি হ'তে ফিরিয়ে রেখেছে বটে, অদৃষ্টের বিধানে আমার একটা সীমাবদ্ধ সুখের লেখা মুছে গেছে বটে ; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আর এক সীমাহীন—সুন্দর অধিকার চিরদিনের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত ক'রে রেখেছে। আমি পত্নীত্বের অধিকারটুকু হ'তে বঞ্চিত হয়েছি সত্য ; কিন্তু আমার মাতৃত্বের দাবীতে তো সমাজ হস্তক্ষেপ করেনি। আপনি যত্ন করে' শিক্ষা দিয়ে যে গৌরব আমার মধ্যে পরিস্ফুট কর্‌তে চেয়েছিলেন—তার মহত্ব নিজে বিস্মৃত হ'য়ে যাবেন না। আমি সমাজের কাছে সেই দাবীটুকুর জন্য মাথা তুল্‌তে চাই। আমি পত্নীত্বের অধিকার চাইনে। শুধু মাতৃত্বের অধিকারটুকুতে এ জীবনটা বিলিয়ে দিতে পার্‌লে আপনাকে সার্থক জ্ঞান কর্‌বো। আমার আলোর সন্ধান দিয়ে আর অন্ধকারের দিকে টেনে নেবেন না। আমায় মাপ করুন মুক্তিদা, আপনিই শিখিয়েছিলেন—'এ ভারত ভোগের বাসর নয়, ত্যাগের তপোবন। আপনিই ব'লে দিয়েছিলেন—'এ ভারতের ইতিহাস সীতার অশ্রু দিয়ে লেখা, সাবিত্রীর নিষ্ঠা দিয়ে তৈরী, পদ্মিনীর চিতাগ্নিতে প্রদীপ্ত। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনায় ত্যাগের বিজয়-পতাকা এঁকে গেছে এর ললাটে পান্না তার শিশু সন্তানের রক্তে মাতৃ-মন্ত্রের আল্‌পনা দিয়ে।' ত্যাগ যাদের মন্ত্র, পরের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন যাদের ধর্ম্ম, নিঃস্বার্থ মাতৃস্নেহে অনাথ আতুরের সেবা করা যাদের সাধনা —সেই ভারত-নারীর মাঝে যখন জন্ম পেয়ে সার্থক হ'য়েছি, তখন আর ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আমায় সমাজের কাছে ভিখারিণী সাজাবেন না। মাতৃত্বের অতুল ঐশ্বর্য্যের দাবী হ'তে নামিয়ে আমায় কাঙ্গালিনী কর্‌বেন না। যার জন্য সমাজের কাছে আমায় হাত পাত্‌তে হবে, তার চেয়ে অনেক মূল্যবান রত্নে ভগবান নারীর হৃদয় পূর্ণ ক'রে রেখেছেন। আমাকে তার সদ্ব্যবহার কর্‌তে দিন্। সহস্র অনাথ-অসহায় রুগ্ন সন্তান—যারা এক বিন্দু স্নেহের জন্য হাহাকার করে' বেড়াচ্ছে—তাদের কোলে তুলে নিয়ে আমায় সার্থক হ'তে দিন্। আমায় ক্ষমা করুন।"

মুক্তি স্থির দৃষ্টিতে উষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উষার তরুণ মুখের সেই গৌরবময় দীপ্তি ক্ষণেকের জন্য তার সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িৎ প্রবাহের মত ছুটিয়া গেল। লজ্জায়-গ্লানিতে আত্মহারা হইয়া সে তার হাত দুখানি উষার পায়ের দিকে বাড়াইয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"উষা, মা আমার, ক্ষমা কর আমায়। ভাবতে পারিনি যে তুমি এত উচ্চে ; তাই সন্তান হয়ে' আজ অন্ধ পশুর মত জগৎ-পূজ্য মাতৃত্বের অবমাননা করে'ছি। উঃ—আমার এ পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নেই উষা !—"অনুতাপদগ্ধ মুক্তি উষার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। সসঙ্কোচে উঠিয়া দাঁড়াইতেই উষার শিথিল আঁচলের সেই সঞ্চিত ফুলগুলি ছড়াইয়া পড়িল মুক্তির সর্ব্বাঙ্গে পবিত্র নির্ম্মাল্যের মত।

মীরার বিবাহ-বাসরে বরণের শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

(৪)

কাজের বাড়ীতে যখন চাক্‌রাণীর পালায় উষার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হ'য়েছিল, কাকীমা তাঁর উথ্‌লে-পড়া স্নেহের পরশ ছড়িয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন উষাকে। বিয়ে-বাড়ীর কাজ মিটে গেলে, যেদিন কাকীমা অন্নদায় হ'তে মুক্তি পাবার আশায়—উষার জীবনের শুভ্র ছবিখানিকে মুক্তির নামের এক ঘৃণিত কলঙ্ক মাখিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সাম্‌নে ধরেছিলেন, সেইদিন হ'তে উষা আর কারো সম্মুখে

আসেনি। সেই তীব্র বিষ যেন তার শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। কাকীমাকে সে অন্নদায় হ'তে মুক্তি দিয়েছিল বটে, কিন্তু কাকীমা তাকে পূর্ব্ব অন্নের ঋণদায় হ'তে মুক্তি দেন্ নি। তাই প্রাণপণে সে সংসারের সব কাজকর্ম্ম করে' দিয়েছে। উষা যখন সত্য সত্যই তার উঠ্‌বার শক্তি হারিয়ে ফেল্‌লো—তখন সে তার মায়ের ত্যক্ত ঘরখানির একটী কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। দোতলায় যেতে আস্‌তে কতবার মোহিতমোহনের চোখে এই বালিকার করুণ ছবিটী পড়েছে; কিন্তু কুলটা ভ্রাতুষ্পুত্রীর মৃত্যুকামনা ক'রে তিনি সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। আজ উষাকে দেখে তাঁর অন্তরের মধ্যে যেন সত্যই কি একটা বিরাট শূন্যতা হাহাকার ক'রে উঠ্‌লো। পত্নীর দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি গোপনে উষার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন, হয় তো সেটা রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িত কোন এক অজ্ঞাত শক্তির আকর্ষণে।

ধীরে উষার ললাট স্পর্শ ক'রে তিনি ডাক্‌লেন—"উষা-মা!"

উষা চেষ্টা ক'রেও তাঁর কথার উত্তর দিতে পার্‌লো না, শুধু তার কালিভরা চোখ দুটো তু'লে মুখের পানে চেয়ে রইলো। শ্রান্ত চোখ হ'তে কেবল ঝরে' পড়ে'ছিল কতকটুকু ব্যথার জল। তার পর সব নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে। মোহিতমোহন উচ্ছ্বসিত বেদনায় ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন; অজ্ঞাতে শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তাঁর সারা বুকখানিকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

* * * *

উষা চিরদিনের মত কাকীমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। কিন্তু উষার সকল সংস্পর্শ থেকে রক্ষা ক'রে চলেও, যেদিন তিনি মীরার হাত ধ'রে স্নান করিয়ে এনেছিলেন—তারও এয়োতির চিহ্নখানি ধু'য়ে, সেইদিন পথের পাশে 'জননী উষা'র নামাঙ্কিত মুক্তেশের প্রতিষ্ঠা করা ছোট "অনাথ-আশ্রম"টি দিকে চেয়ে কিসের একটা অজ্ঞাত চিন্তায় যে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল, তা' তিনিই জানেন।

দক্ষিণে

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

(৫)

চিদাম্বরম্

কাঞ্জিভরম্ থেকে সন্ধ্যার আগেই চিংলিপুটে ফিরে আসা গেল। রাত্রি এগারোটার সময় গাড়ী, হাতে অনেক সময়। এই অবসরে শহরটা একটু ঘুরে দেখা গেল। চিংলিপুট শহরটী সুন্দর; এর চারিদিকেই ছোট বড় পাহাড়। রাস্তা-গুলি সরু কিন্তু পরিষ্কার। যে দিকেই চাওয়া যায় সে দিকেই ফাঁকা অসমতল মাঠ। এখানে একটি ছোট হাসপাতালও আছে। ছোট মহকুমা হোলেও এখানে জলের কল আছে। ভোর থেকে বেলা দশটা আর ওদিকে তিনটে থেকে ছটা অবধি রাস্তার কলে মেয়েদের ভিড় লেগেই আছে। বাঙালী-দের বাড়ীর মতন এ দেশের গৃহস্থদের বাড়ীতেও জল খরচ হয় অসম্ভব রকমের বেশী। দক্ষিণে অনেকেই কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম গরম জলে স্নান করেন। অনেকে আবার গরম জল পানও করেন। হোটেলে দেখেছি জল উনুনের ওপরে চড়ানই আছে, সেই ফুটন্ত জল অনেকে পান করছে। এখানে একটি ছোট্ট বাজারও আছে, বাজারে দোকানপত্র বেশী নেই। দু-চারটে পিতল কাঁসার বাসনের দোকান আছে। মনে হোলো বাসনগুলি অন্য জায়গা থেকে আমদানি করা হয়েছে। আর কিছু থাকুক আর না থাকুক একখানি মদের ও একটি আফিংয়ের দোকান আছে।

শহর দেখে ফিরে এসে মোট-ঘাট বেঁধে ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। ষ্টেশনেই ভাতের হোটেল আছে। সেখানে জনপ্রতি ছ-আনা পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে খেতে

বসা গেল। দক্ষিণের লোকে বেশী ঝাল খায় বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু মাদ্রাজ ও চিংলিপুটের হোটেলে খেয়ে মনে হ'য়েছিল তাদের এই দুর্নাম ভিত্তিহীন। কিন্তু ষ্টেশনের এই হোটেলে খেতে বসে তাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বেকার মতেই ফিরে আসতে বাধ্য হোতে হোলো। ডাল এবং তরকারী মুখে দিয়েই বুঝতে পারা গেল যে সে জিনিষ উদরে গেলে অনধিকার চর্চ্চার অবশ্যম্ভাবী ফল অচিরেই ভুগতে হবে। আমরা সে সব বাদ দিয়ে কেবল ঘি দিয়ে ভাত খেয়ে বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে আসা-মাত্র ম্যানেজার বল্লে, যে জনপ্রতি আরও তিন আনা কোরে পয়সা দিতে হবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি অপরাধে ?

সে বল্লে—তোমরা ঘি বেশী খেয়েছ।

ঘি বেশী খাওয়ার জন্য এ পর্য্যন্ত কোথাও আমাদের পয়সা বেশী দিতে হয়-নি। কাজেই মনে হোলো এ ব্যক্তি আমাদের ওপরে জুলুম করছে। ম্যানেজারকে বুঝোতে চেষ্টা করলুম যে, শাস্ত্রে বলেছে ঘি জিনিষটা বিনামূল্যেই খাবার চেষ্টা করবে, নেহাৎ যদি দাম দিতেই হয় তো ঋণ রাখবে। অতএব এবারকার মতন দামটা রইল, দক্ষিণ দরজায় যাবার মুখে এই দিক দিয়েই তো যেতে হবে তখন পয়সাগুলো চেয়ে নিও।

কিন্তু ভাতের হোটেলের ম্যানেজার হোলে কি হয়! সে ইংরেজি পড়েছে, শাস্ত্রের কথা সে কিছুতেই শুনতে চায় না। এদি'ক আমরাও অশাস্ত্রীয় কাজ করব না বলে বদ্ধ-পরিকর। ষ্টেশনে হৈ হৈ কাণ্ড! শেষকালে মাঝামাঝি কি একটা রফা হওয়ায় উভয় পক্ষ শান্ত হোলো।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় গাড়ী এসে হাজির হোলো। গাড়ী একেবারে ভর্ত্তি। তারই মধ্যে কোনো রকমে মালপত্র চাপিয়ে উঠে বসা গেল। মাদ্রাজ থেকে চিংলিপুট অবধি যে রকম গাড়ীতে এসেছি এ আবার সে রকম গাড়ী নয়। একেই তো সরু গাড়ী, তার ওপরে আবার গাড়ীর মধ্যে চলা-ফেরা করবার জন্য মাঝখান দিয়ে একটু রাস্তা কোরে দেওয়া হয়েছে। ফলে বেঞ্চিগুলি আধ-খানা কোরে কাটা। দু-একটা ষ্টেশনের পর যাত্রী প্রায় অর্দ্ধেক নেমে গেল। কিন্তু তা হোলে কি হবে! শুতে গিয়ে দেখি যে, কোমরের পর থেকে বাকীটুকু নীচের দিকে ঝুলতে থাকে। কোনো রকমে কুঁকড়ে হাঁটু দুটোকে থুৎনিতে ঠেকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করি; কিন্তু তন্দ্রার ঘোরে একটু হাত পা ছড়ালেই ঘুম ছুটে যায়। বিরক্ত হোয়ে উঠে বসি। এই রকম একবার ওঠা একবার শোওয়া করতে-করতে একটুখানি ঘুম এসেছে, এমন সময় কে যেন ধাক্কা দিয়ে ঘুমটা ছুটিয়ে দিলে। ধড়মড় কোরে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলুম—কি বাপু ?

সে ব্যক্তি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা বুঝি বাংলা মুলুকের লোক ?

—হ্যাঁ।

—দেখ দিকিন তোমাদের জিনিষপত্তর ঠিক আছে না দু-একটা সরেছে ?

বলে কি রে বাবা! তড়াক্ কোরে লাফিয়ে উঠে জিনিষপত্র গুণতে আরম্ভ করা গেল। চার জনে মিলে তিন চার বার গুণে দেখা গেল যে জিনিষ ঠিকই আছে। লোকটী বল্লে—এখন আর ঘুমিও না, এইখানে বড্ড চোরের উৎপাত। এইখানে চোরেরা ঘুমন্ত যাত্রীদের মালপত্র নিয়ে নামে তারপরে পণ্ডিচেরীতে সরে পড়ে। তখন আর তাদের ধরতে পারা যায় না।

মনে হোলো—বা রে পণ্ডিচেরী!

এইবার লোকটি টিকিট দেখতে আরম্ভ করলে। গাড়ীতে আমরা চারজন ছাড়া আরও আট দশ জন লোক ছিল। কিন্তু টিকিট চাওয়ার ফলে প্রকাশ পেল যে, তার মধ্যে অধিকাংশ লোকই বিনা মাশুলে বিহার করছেন। সেই লোকটি একে-একে তাদের ঘাড় ধরে ট্রেণ থেকে নামিয়ে দিলে।

গাড়ী ছাড়বার পরে শুয়ে পড়তে আর সাহস হোলো না। বসে উ'ঠ ঘু'র কোনো রকমে চক্ষুকে সজাগ রাখবার চেষ্টা করছিলুম, এমন সময় আধ-ঘুম ও আধ-জাগরণের মধ্যে কাণে এল—চিদাম্বরম্। তাড়াতাড়ি মালপত্র নিয়ে ষ্টেশনে নেমে পড়া গেল।

চিদাম্বরমে যখন নামলুম তখন তার ও আমার উভয়ের চক্ষুই ঘুমের আবেশে ঢুলুঢুলু। শেষ-রাত্রের লগ্নে বিবাহ-আসরে বর-বধূর অবস্থা আর কি! আসন্ন-মিলনের সুখস্বপ্নে অন্তর উৎফুল্ল; কিন্তু রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন। ষ্টেশন থেকে বাইরে এসে নিদ্রালস চক্ষে সেই সূক্ষ্ম অন্ধকারের আবরণ ভেদ কোরে রহস্যময়ী প্রকৃতির রূপ দেখে মুগ্ধ হোয়ে

গেলুম। ষ্টেশনের বাইরে আসা-মাত্র ঝট্‌কাওয়ালারা ছুটে এল। ইতিমধ্যে ষ্টেশনেই দু-জন পাণ্ডা জুটে গিয়েছিল, তারা দু-জনেই অবোধ্য ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল যে, স্বর্গে যাবার সোজা রাস্তা এ ওর চেয়ে ভাল চেনে। গোল-মাল ক্রমেই বেড়ে চলেছে দেখে তাদের বলা হোলো—দেখ আমরা একজন লোক চাই। তোমাদের দু-জনের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ তা জানি না, জানতেও চাই না। যে কেউ একজন হোলেই আমাদের চল্‌বে; কিন্তু দক্ষিণা পাবে চার গণ্ডা পয়সা।

আমাদের মুখে এই রাজোচিত দক্ষিণার কথা শুনে এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অন্য শিকার সন্ধানের চেষ্টায় সরে পড়্‌ল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাড়াতাড়ি একখানা ঝট্‌কা নিয়ে এসে বল্লে—সোয়ারী হোতে আজ্ঞা হয়।

আমরা তাকে বুঝিয়ে দিলুম যে, এমন সুন্দর সকালটা ঝট্‌কায় চড়ে মাটি করব না। মালপত্র ঝট্‌কায় চাপিয়ে দিয়ে হেঁটেই রওনা হওয়া গেল। সুন্দর পরিষ্কার চওড়া রাস্তা,—যেদিকে চোখ ফেরানো যায়, দীর্ঘ নারিকেল গাছ মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে। আকাশে তখন ঊষা ও অরুণের লুকোচুরি খেলা সুরু হয়েছে। পলায়মানা ঊষার বসন সঞ্চালনে দেখতে-দেখতে ধরণীর জীবজগতে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। চলতে-চলতে পথশ্রম হওয়া তো দূরের কথা, প্রকৃতির সজল বীজনে রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত দেহ যেন জুড়িয়ে গেল। দক্ষিণের প্রকৃতি এই প্রথম তার স্নেহের পরশ বুলিয়ে আমাকে তার দিকে আকর্ষণ করলে। দূর থেকে মন্দিরের উঁচু গোপুরমগুলি দেখা যাচ্ছিল। আমরা সেই গোপুরম্‌-গুলি লক্ষ্য কোরে অগ্রসর হোতে লাগলুম। প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁটার পর মন্দিরের কাছেই একটা ধর্ম্মশালায় গিয়ে ওঠা গেল। একতলা উঁচু বাড়ী। ঘরগুলি বেশ বড়; কিন্তু আলো বাতাসের অত্যন্ত অভাব। দিনের বেলাটা কোনো রকমে সেখানে কাটানো যায়; কিন্তু রাত্রে দরজা বন্ধ করলেই দম্‌ আট্‌কে মরতে হবে। আর দরজা খোলা রাখলে মালপত্র চুরি গিয়ে না খেয়ে মরতে হবে।

যা হোক্‌ ধর্ম্মশালার একটা ঘর দখল কোরে সেখানে জিনিষপত্র রেখে হাত মুখ ধুয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল।

চিদাম্বরমের মন্দিরকে একটি ছোটখাট কেল্লাও বলা চলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই মন্দির অনেকবার কেল্লার কাজই করেছে। মন্দিরটী শিব ও বিষ্ণুর প্যাক্টের একটি নিদর্শন। এখানে নটরাজ শিব ও পিরুমালাকইল বিষ্ণু পাশাপাশি বিরাজ করছেন। এখানে লক্ষ্মী, পার্ব্বতী, গণেশ, সুব্রহ্মণ্য, তা ছাড়া ছোট বড় আরও কত যে দেব দেবী আছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই।

চিদাম্বরমের এই দেবতাদের দুর্ভোগও অনেক গিয়াছে। মন্দিরটী ইংরেজ, ফরাসী, মুসলমান এই তিন জাতিই প্রত্যেকে কিছুদিন কোরে নিজেদের অধিকারে রেখেছিল। কাজেই চিরদিনই যে এঁদের নিরামিষ ভোগ খেয়ে কাটাতে হয়নি, এমন সন্দেহ করবার কারণ আছে।

মন্দিরের কাছাকাছি এসে টের পাওয়া গেল যে, ষ্টেশন থেকে যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গ নিয়েছে সে পাণ্ডা নয়, গাইড মাত্র। আমরা তাকে অভয় দিয়ে বল্লুম—কোনো ভয় নেই, তোমাকে দিয়েই আমাদের কাজ চলে যাবে।

এই দেবমন্দিরগুলি কেল্লার দেওয়ালের মতন পরে পরে চারটি প্রকাণ্ড দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রথম দেওয়ালটী ছাড়া প্রত্যেক দেওয়ালের পরেই কতকগুলি মন্দির বা মণ্ডপ আছে। প্রথম দেওয়াল পার হোয়ে চোখে পড়ে খানিকটা পোড়ো জংলী জমি, এর মধ্যে বস্তীও আছে। প্রাচীরের ভেতর দিকে কেল্লার মত ঘর। এই ঘরগুলি এক সময় সত্যই সেনানিবাস ছি , এখন ভেঙে-চুরে গিয়েছে। দ্বিতীয় দেওয়ালে বিরাট গোপুরম্‌। আমরা প্রথমেই একেবারে সোজা ভেতরে চলে গেলুম। নটরাজের মন্দির তখন সবেমাত্র খোলা হয়েছে। মন্দিরের ছাতটি সোনার। এক একখানি মোহর দিয়ে এক একটি পাতা তৈরি কোরে জোড়া দিয়ে গম্বুজের মতন গোল গড়ানে ছাদ তৈরি করা হয়েছে। শোনা গেল যে, এই ছাদ তৈরি করতে ছাব্বিশ হাজার একুশ না বাইশ—ঠিক মনে নেই,—মোহর লেগেছিল। গাইড বল্লে—আমরা দিনে রাতে ছাব্বিশ হাজার বাইশ বার নিঃশ্বাস ফেলি বলে ঠিক ঐ সংখ্যক মোহর গুণে দেওয়া হয়েছিল। নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে ঠাকুরঘরের ছাদের কি সম্পর্ক আছে তা বুঝতে পারলুম না; তবে সোনার এমন অপব্যবহার দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস দুটো আপনিই বেরিয়ে পড়্‌ল। ঘরের মধ্যে রূপোর সিংহাসনে নটরাজ অধিষ্ঠিত। ঠাকুরঘরের দরজাও রৌপ্যমণ্ডিত। নটরাজ এখানে এমন ভোল ফিরিয়ে আছে

যে তাঁকে দেখে চেনাই মুস্কিল। তাঁর অঙ্গে মালকোঁচা দিয়ে কাপড় আঁটা। পা থেকে আরম্ভ কোরে কাণ অবধি গহনায় ঢাকা। নটরাজের এই অবস্থা দেখে দুঃখ হোলো। অরূপের যে বিরাট কল্পনাকে নটরাজ মূর্ত্তিতে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, তার এতখানি অপমান আর কোথাও হোতে দেখিনি। মুসলমানেরা প্রতিমূর্ত্তি ভেঙে হিন্দু দেবতার যে অপমান করেছে, চিদাম্বরের এই হিন্দুরা নটরাজের সর্ব্বাঙ্গে গহনা চাপিয়ে ও কাপড়ে মুড়ে প্রত্যহ তার চাইতে অনেক বেশী অপমান করছে।

নটরাজের মন্দিরের পাশেই বিষ্ণুমন্দির। বিষ্ণুমন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শিব ও বিষ্ণু দুই দেবতারই দর্শন লাভ হয়।

বিষ্ণুর চালচলন সেকেলে, তাই অত সকালে তিনি ওঠেন না। নটরাজের মন্দিরের সম্মুখে একটু অগ্রসর হোলেই গরুড়-স্তম্ভ। এই গরুড়-স্তম্ভের নীচে একটি স্ত্রীলোক আল্পনা দিচ্ছিল। অতি সুন্দর আলপনা, আর তার মধ্যে কত রকম রংয়ের যে বাহার তা আর কি বল্‌ব! শুনলুম যে, এই স্ত্রীলোকটী আজ পঁচিশ বছর ধরে প্রত্যহ সকালে দেবতার উদ্দেশে এইখানে আল্পনা দিয়ে আস্‌ছে। আমরা তার আলপনার প্রশংসা করায় সে বল্লে—আমাকে টাকা দিয়ে যাও, আমি প্রতিদিন—যতদিন বাঁচব তোমাদের নাম কোরে এখানে আল্পনা দেব। কথাটা শুনেই প্রশংসার উৎসাহ অনেকখানি কমে গেল। প্রকাশ্যে বলা গেল—আচ্ছা, তোমার কথা বিবেচনা কোরে দেখ্‌ব। বিবেচনার ফলাফল প্রকাশ কোরে না বল্লেও বোধ হয় পাঠকের বুঝতে কষ্ট হবে না।

চিদাম্বরম্—মন্দির, গোপুরম ও সরোবর

গরুড়-স্তম্ভের কাছাকাছি ছোটখাট আরও অনেকগুলি দেবদেবীর মন্দির আছে। এরই নিকটে শিবের বাসর-গৃহ। সুন্দর চক্‌চকে কালো পাথরের ঘর। এই বাসর-গৃহের কাছেই একটি স্থানে আকাশলিঙ্গমের মন্দির। সম্মুখে একটি পর্দ্দা ঝোলান। পাণ্ডারা যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে পর্দ্দা সরিয়ে আকাশলিঙ্গম দর্শন করায়। আকাশলিঙ্গম বলে কোনো জিনিষ নেই, পর্দ্দা সরালেই ঘরের দেওয়াল দেখা যায়।

যাত্রীরা যদি জিজ্ঞাসা করে বিগ্রহ কোথায়? তা হোলে উত্তর হয় যে, আকাশ মানে তো শূন্য! শূন্যের আবার মূর্ত্তি কোথায়?

এখানকার যা কিছু দেখে আমরা তৃতীয় প্রাকারে গেলুম। এইখানে লক্ষ্মীর মন্দির। এ মন্দিরটী দেখলে অতি পুরাতন বলে মনে হয়। এখানকার কারুকার্য্য অতি সুন্দর। এই প্রাকারের মধ্যেই বাহনমণ্ডপ। এখানে দেবতাদের যান থাকে। এখানে আরও কতকগুলি মন্দির আছে; তার মধ্যে পার্ব্বতীর মন্দিরটী উল্লেখযোগ্য। এখান থেকে আমরা দ্বিতীয় প্রাকারে গেলুম। এখানে চুণ সুরকী দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড একটি ষাঁড়ের মূর্ত্তি আছে। এই প্রাকারের মধ্যেই সহস্র স্তম্ভের ঘর। ঘরখানি প্রকাণ্ড, তার মধ্যে সারি সারি থাম। থামগুলির বাহার এক সময়ে ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে—নটরাজের গায়ে জামা চড়ানোর মতনই এগুলির ওপরে বেশ কোরে চূণকাম করা হয়েছে। শোনা গেল যে, সহস্র স্তম্ভের ঘরখানিতে এক হাজারের চেয়ে কুড়ি পঁচিশটা থাম কম আছে। কিন্তু এ দুঃখু রাখবার দরকার কি ছিল বুঝতে পারলুম না। কারণ ঘরটি দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে থামের জন্যই ঘর করা হয়েছে, ঘরের জন্য থাম নয়। দুটো চারটে কোরে কোণে কোণে থাম জুড়ে দিলেই এক হাজার পূর্ণ হোয়ে যেত। এই ঘরে ওঠবার সিঁড়িটী চমৎকার! সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নামলেই দু-পাশে উঁচু গোল গোল পাথরের থাম খাড়া করা আছে। বোধ হয় উৎসবের দিনে এগুলির ওপরে চাঁদোয়া খাটানো হয়।

সহস্র স্তম্ভের ঘরের পাশে প্রকাণ্ড টেম্পাকুলম্। এই টেম্পাকুলমের নাম হচ্ছে শিবগঙ্গা। কথিত আছে যে, রাজা বর্ম্মচক্র এই পুষ্করিণীতে স্নান কোরে মহাব্যাধির হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। সুস্থ হোয়ে তাঁর দেহের বর্ণ সোনার মতন হোয়ে গিয়েছিল বলে শিবগঙ্গার অপর নাম স্বর্ণ-সরোবর। শিবগঙ্গার উত্তর দিকে সুব্রহ্মণ্যের মন্দির। এই মন্দিরটীর কারুকার্য্যও চমৎকার। সুব্রহ্মণ্যের মন্দিরের আশেপাশে আরও কতকগুলি মন্দির আছে। এরই কাছাকাছি শত স্তম্ভওয়ালা একটি ঘর আছে। এ ঘরটির অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়; সেজন্য এর দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকে। এই স্থান থেকে কিছুদূরেই গণেশের মন্দির। গণেশের মূর্ত্তিটী প্রকাণ্ড। শোনা গেল যে, এর চেয়ে বড় গণেশের মূর্ত্তি নাকি ভারতবর্ষে আর নেই।

চিদাম্বরমের মন্দিরটীকে ছোটখাট একটি শহরও বলা চলতে পারে। এর প্রত্যেক জিনিষটী ভাল কোরে খুঁটিয়ে দেখতে অনেক সময় লেগে যায়। আমাদের সময় অল্প, তবুও সমস্তটা দেখে বেরুতে আমাদের প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগেছিল। মন্দিরের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতেই দু-বার দুম্‌দাম্ কোরে তোপের আওয়াজ হোলো। জিজ্ঞাসা কোরে জানা গেল যে, প্রথমবারের তোপ হচ্ছে ঠাকুরের স্নান করবার এবং দ্বিতীয়বারের তোপ হচ্ছে ঠাকুরের প্রাতকালীন আহারের। আমাদের গাইডকে জিজ্ঞাসা করলুম যে, ঠাকুর স্নান করবেন সেজন্য তোপ দাগবার কি প্রয়োজন? আমাদের কথা শুনে লোকটা চটে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, আজিকার দিনে মানুষ তার জ্ঞানের ভাণ্ডারে নূতন সত্য আহরণ করবার জন্য কী না করছে; আর আমরা এখানে বসে ঠাকুর এবারে আহারে বসলেন বলে এখনো তোপ দাগ্‌ছি। যুগের পর যুগ আমরা এইভাবে নিজেদের বুদ্ধিকে অপমান কোরে বিদেশীদের নানা রকম মন্তব্যের কারণ হোয়ে রয়েছি। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তার বিশেষ কোনো রূপ বা তাঁর কোনো প্রতীক্ মনের মধ্যে ধারণ করার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই; কিন্তু সেই বিশেষ রূপ বা চিহ্নটীকে যখন স্নান ও আহার করান হয়, তাকে গহনায় মুড়ে তার বিবাহ দিয়ে বাসর-শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হয়, তখনি সেটা পুতুল খেলায় দাঁড়ায়। এর দ্বারা স্রষ্টার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা তো হয়ই এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর যে শ্রেষ্ঠ দান বুদ্ধি—সেই বুদ্ধির প্রতি অবহেলা কোরে দাতা ও দানের অপমান করা হয়। যাক্ এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করায় বিপদ আছে।

মন্দিরের মধ্যেই একটি দোকানে 'গাবি' পান কোরে তো শহরে বেরুনো গেল। বহুদিন থেকে শুনে আসছিলুম যে দক্ষিণে সুন্দর সুন্দর পিতল ও তামার মূর্ত্তি পাওয়া যায়। মাদ্রাজে তামার মূর্ত্তি দু-একটা দেখেছিলুম; কিন্তু তার দাম যা হাঁকলে, সে দামে সোনার মূর্ত্তি তৈরি করানো যায়। ছোট নটরাজ মূর্ত্তি কেনবার ইচ্ছা ছিল। কাঞ্জিভরমে খোঁজ করেছিলুম; কিন্তু সেখানে শোনা গেল যে চিদাম্বরমে সুন্দর নটরাজ মূর্ত্তি পাওয়া যাবে এবং সেখানে দামও বেশ সস্তা। বাজারে গিয়ে পুরাতন মূর্ত্তি সন্ধান কোরে কোথাও পাওয়া গেল না। একটি দোকানদার আমাদের খাতির কোরে ডেকে নিয়ে গিয়ে

কতকগুলো পেতলের ইস্কুপ, কব্জা ও ভাঙা মূর্ত্তি দেখিয়ে তাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে আরম্ভ কোরে দিলে।

কিন্তু সে জিনিষগুলিকে ডাহা মাটিতে পুঁতে রেখে বা অন্য প্রক্রিয়ায় পুরোনো কোরে তোলা হয়েছে। ব্যাপার দেখে আমরা দোকানদারকে বুঝিয়ে বল্লুম যে, পুরোনো জিনিষের ওপর আমাদের কোনো লোভ নেই, আমরা চাই ভাল মূর্ত্তি। নতুন হোলে কোনো ক্ষতি নেই, বরং ভালই। দোকানদার অনেক খোঁজা-খুঁজি কোরে শেষে অন্য দোকান থেকে একটা মূর্ত্তি নিয়ে এল; কিন্তু সেটাকে মূর্ত্তি না বলে মূর্ত্তির ভূত বলা চলে। যা হোক্ মূর্ত্তি পাওয়া গেল না। শোনা গেল যে, তাঞ্জোর ও মাদুরায় খুব সুন্দর-সুন্দর মূর্ত্তি কিনতে পাওয়া যাবে। নটরাজের দেশে নটরাজ মূর্ত্তি পাওয়া গেল না, এর চেয়ে আপশোষের কথা আর কি আছে!

চিদাম্বরম্ শহরটী সুন্দর, রাস্তা ঘাটগুলি বেশ পরিষ্কার। ঠিক কাঞ্জিভরমেরই মতন। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। দু-এক স্থানে নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন করানো হয়। এখানকার ব্রাহ্মণগুলির শরীর বেশ নিটোল গোল। এত বড় মন্দির, যাত্রীর ভিড়ও কিছু কম নয়; কিন্তু তার অনুপাতে ভিখারীর সংখ্যা একেবারে নেই বল্লেই চলে। দক্ষিণের মন্দিরগুলিতে ভিখারীর উৎপাত নেই; উৎসব অথবা মেলার সময় কি হয় বলতে পারি না। কিন্তু আমরা যে সময় গিয়েছিলুম, সে সময় ভিখারী একেবারেই ছিল না। এ দেশের লোকের অভাব খুবই কম। খাওয়া সে তো না খাওয়ারই মধ্যে, পরার অবস্থাও তথৈবচ! বোধ হয় দৈন্যও এই কারণে খুব ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পারে না।

শহর ঘুরে-ফিরে বাজারে যাওয়া গেল। সেদিন নিজেরাই রান্না কোরে খাওয়া হবে স্থির হয়েছিল। খুব বড় বাজার, মুদীর দোকানে চাল কিনতে গিয়ে বিপদ! সের কাকে বলে সে বোঝে না। চারজন লোকের ভাত হবে বলাতে সে মেপে চাল দিলে। অবশ্য রান্নার পর দেখা গেল যে, আমাদের মতন আটজন লোকেও তা খেয়ে উঠতে পারে না। যাক্, চাল ডাল, কাঠ ঘি ইত্যাদি কিনে ধর্ম্মশালায় ফিরে এসে রান্না চড়িয়ে দেওয়া গেল। থাকবার ঘরের পাশেই একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে রান্নার ব্যবস্থা। ঘরের এক কোণে তিনটে ইঁট রেখে কাঠের জ্বালে রান্না চাপিয়ে দেওয়া গেলো। রান্না যে মাথামুণ্ডু কি হচ্ছে তা চোখে দেখবার উপায় নেই; শুধু শব্দ শুনে আর গন্ধ শুঁকে বুঝতে হবে, এত অন্ধকার! রান্না করা যাচ্ছে এমন সময় একটি লোকে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলে—তুমি নাড়ী দেখতে জান?

মনে করলুম লোকটীর বোধ হয় জ্বর হয়েছে। বলা গেল—হ্যাঁ জানি, দেখি তোমার হাত।

সে বল্লে—আমার নয়। একটু দয়া কোরে আমাদের ঘরে যদি চল, তা হোলে বড় উপকার হয়। সেখানে একজন শরীরটা একটু অসুস্থ বোধ করছে, তার নাড়ী দেখে বলতে হবে জ্বর হয়েছে কি না।

বল্লুম—চল দেখে আসি।

লোকটী আমায় সঙ্গে কোরে তার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি একটি প্রৌঢ়া বসে আছে, আর তারই পাশে একটি সুন্দরী তরুণী শুয়ে আছে। লোকটী ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রৌঢ়াকে দেখিয়ে বলে—ইনি আমার স্ত্রী আর তরুণীকে দেখিয়ে বল্ল—এটি আমার কন্যা।

আমি তো একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! সভয়ে জিজ্ঞাসা করা গেল—কার নাড়ী দেখতে হবে?

লোকটী তার মেয়েকে দেখিয়ে বল্লে—আজ মাসখানেক আমরা তীর্থ কোরে বেড়াচ্ছি; কিন্তু দিন দশেক থেকে মেয়ে রোজ এই রকম অসুস্থ হোয়ে পড়ে। আমার মনে হচ্ছে, ও-সব কিছু নয়, ঘোরা অভ্যাস নেই বলে ঐরকম হচ্ছে; কিন্তু আমার স্ত্রী বলে যে ওর একটু একটু জ্বর হচ্ছে। জানেনই তো স্ত্রীলোক সব জায়গায়ই সমান। তা আপনি ওর নাড়ীটা যদি একটু দেখেন।

তখন আর ভাববার সময় নেই। গম্ভীরভাবে বলা গেল—দেখি হাতটা।

তরুণীর হাত এত গরম যে তাতে হাত রাখা যায় না। নাড়ী বোঁ বোঁ কোরে ছুটেছে। চক্ষু ঘোলাটে রক্তবর্ণ। বোধ হোলো একশো চারের কম জ্বর নয়। জিজ্ঞাসা করলুম—এ রকম অবস্থা কতদিন থেকে হয়েছে?

লোকটী বল্লে—দিন দশেক থেকে রোজই হচ্ছে। কোনো দিন তিনচার ঘণ্টা থাকে; কোনো দিন বা দিন রাত্রি সমানে থাকে।

—কি খেতে দিচ্ছ?

—রুটি ডাল।

লোকটীকে ঘরের বাইরে ডেকে এনে বল্লুম—তোমার

মেয়ের খুব বেশী জ্বর! এখুনি একে ডাক্তার দেখানো কর্ত্তব্য। এতদিন অবহেলা কোরে অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছ—বলতে-বলতে মেয়েটার মা বাইরে এসে উপস্থিত। আমার কথাবার্ত্তা শুনে সে কাঁদবার উপক্রম করছে দেখে তাকে বল্লুম—দেখ, এখন যদি কান্নাকাটি কর, তা হোলে তোমার মেয়ে মনে করবে, তার ভীষণ রকমের একটা কিছু হয়েছে—তাতে তার অসুখ বেড়েই যাবে।

স্ত্রীলোকটী আমার কথা শুনে কান্নাটা তখনকার মতন মুলতুবী রেখে আমাকে বল্লে—তা হোলে বুড্ডা যতক্ষণ না দাওয়াই নিয়ে ফিরে না আসে ততক্ষণ আমাদের ঘরে চল।

এ প্রস্তাব মন্দ নয়। অন্ততঃ কান্নাকাটি শোনার চে'য় প্রীতিকর।

ঘরে গিয়ে বসা গেল। প্রৌঢ়া গল্প সুরু করলে। তাদের বাড়ী যোধপুরে, জাতে বেনিয়া। তোমরা কলকাতায় যে সব বেনিয়া দেখ আমরা সে বেনিয়া নই, তার চেয়ে ভাল বেনিয়া। একটি মাত্র মেয়ে—মেয়ে আমার কেমন সুন্দরী একবার ভাল কোরে দেখ। কিন্তু জামাই ব্যাটা আবার এক বড় লোকের পেত্নী মেয়ে বিয়ে করেছে। কি করি! মেয়েকে নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়েছি—

প্রৌঢ়া অনর্গল বকে যেতে লাগল। রোগিণীও মাঝে মাঝে দু-একটা ফোড়ন দিতে লাগল—হঠাৎ পোড়া গন্ধ নাকে যেতেই আর কথা না বলে ছুটে এসে দেখি ভাত ধরে গেছে। বন্ধুরা পাশের ঘরেই কেউ দাড়ি কামাতে আর কেউ বা তেল মাখতে ব্যস্ত! তারা আমার ওপরে রান্নার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত; কিন্তু আমি যে ওদিকে নাড়ী দেখতে গিয়েছি সে খবরও তারা জানে না।

তাড়াতাড়ি ভাত নামিয়ে ফেলা গেল। তারপর অন্যান্য রান্না রেঁধে স্নান কোরে এসে খেতে গিয়ে দেখি যে, হাঁড়ি শুদ্ধ ভাত একটি তাল হোয়ে আছে। কি করি, সেই তাল থেকে খামচে-খামচে যে যতখানি পারলুম খেয়ে নেওয়া গেল। কাল সারারাত্রি ঘুম হয়নি। চক্ষু ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। আর বাক্যব্যয় না কোরে বিছানা পেতে ঘুমের কোলে আশ্রয় নেওয়া গেল।

কথা ছিল তিনটের ট্রেণে তাঞ্জোর যাত্রা করা হবে। সে ট্রেণটা সন্ধ্যার একটু পরেই তাঞ্জোর পৌঁছয়। কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল, তখন সে ট্রেণখানা প্রায় তাঞ্জোরে পৌঁছে গেছে। তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বেঁধে নিয়ে গাড়ী ডেকে ষ্টেশনে রওনা হওয়া গেল।

ষ্টেশনে গিয়ে দেখি, ধর্ম্মশালার সেই যোধপুরী বেনিয়া সপরিবারে সেখানে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় চলেছ?

সে বল্লে—সোজা রামেশ্বরমে যাব। এতদূর এসে সামান্য একটুর জন্য রামেশ্বরমে যাওয়া হবে না, সেটা কাজের কথা নয়।

জিজ্ঞাসা করলুম—মেয়ে কেমন আছে?

সে মেয়েকে দেখিয়ে দিলে। ষ্টেশনের ধারে একটা বিছানা কোরে দেওয়া হয়েছে, সেখানে শুয়ে সে বেচারী ছটফট্‌ করছে। জিজ্ঞাসা করলুম—ওর অসুখ বেড়েছে নাকি?

লোকটা বল্লে—নাড়ীটা একবার দেখ না।

লোকটার ওপরে রাগ হোলো। তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে অন্যদিকে চলে গেলুম। আমার বিশ্বাস যে, রামেশ্বরমে পৌঁছবার পূর্ব্বেই মেয়েটী বৈতরণী পার হোয়ে গেছে। (ক্রমশঃ)

রাতের যাত্রী

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

তোর নিভ্‌লরে অই নিভ্‌ল প্রদীপ রাত্রি শেষে।
তুই চল্‌রে পথে জীবন ছায়ায় নির্নিমেষে॥
তোর মরণ-বাঁচন নিজের ঘরে,
পারবি কি তুই রাখতে ধ'রে;
তোর শেষের আলোয় আকাশ কাঁদে যাত্রী বেশে॥

তোর কতদিনের চাওয়া-গাওয়া গুঞ্জরণে,
তোর দীর্ঘ পথের আসা-যাওয়া সঙ্গোপনে;
তোর দুঃখ-সুখের মালায় গাঁথা
আলোর আসন ধুলায় পাতা
তোর বন্ধু কখন আসবে চুপে সর্ব্বনেশে॥

ভ্রাম্যমানের জল্পনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(বার্টরাণ্ড রাসেল)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

আমরা ক্রমে সমুদ্রের কাছে এসে পড়ছিলাম। অদূরে খাড়া শুক্‌ন পাথর গুলো নীলাভ জলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে যেন আর মাথা তুল্‌তে পারছিল না। আকাশে থেকে থেকে মেঘ এসে পায়ের শ্যামলতাকে তার মেদুরচ্ছায়ায় অপরূপ সৌন্দর্য্যে রঙিয়ে তুল্‌ছিল। আমরা মাঠের ওপর দিয়ে, আলের ওপর দিয়ে, পাহাড় বেয়ে, ঢালু বেয়ে, অচল ডিঙিয়ে নানাবিধ গতিতে চল্‌তে লাগলাম। ষষ্টিবৎসরের বৃদ্ধ রাসেলের নানা স্থলে উল্লম্ফন ও পাহাড় চড়ার সঙ্গে তাল রেখে চলা আমার মতন যুবকের পক্ষেও কঠিন হ'য়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে ভাব্‌ছিলাম—এদের কী অপর্য্যাপ্ত প্রাণশক্তি! আর চিন্তার সঙ্গে শারীরিক ব্যায়ামে আনন্দের কী সুন্দর সমন্বয়! কেবল মনে হচ্ছিল বিধাতা যাদের দেন, তাদের দুহাতে দেন, আর যখন কেড়ে নেন তখন একেবারে নিঃস্ব ক'রে দেন—একান্ত নিষ্ঠুরের মতন। অথচ একদিন ছিল যেদিন ভারতের নরনারীর জীবনও যুরোপীয়দের মতনই চিন্তা, চেষ্টা, শক্তি—সবেই গরীয়ান্ ছিল! কেন জানি না মনে হচ্ছিল একটি গানের নিবিড় আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাসের কথা: "কোথা লুকালে ভারত ভানু পুন উদিবে কবে পূরব ভাগে?"

কেবল রাসেলের সঙ্গে কথা কইতে কইতে থেকে থেকে মনে হচ্ছিল—ভারত ভানু উঠতে পারে বুঝি কেবল এম্‌নিই একটা শক্তিসমৃদ্ধ প্রাণবন্ত জাতির আঘাতে। রাসেলের সঙ্গেও একবার ভারতে ইংরাজের অত্যাচার নিয়ে একটু আলোচনা হ'য়েছিল। তিনি ব'লেছিলেন: "তোমাদের মঙ্গলের জন্যই যে আমরা ভারতবর্ষে আছি একথা কেবল খৃষ্টিয়ান মিশনরি ও ইংরাজ ইম্পিরিয়ালিষ্ট্‌ই বিশ্বাস করতে পারে, আমরা গিয়েছিলাম তোমাদের ওখানে শুধু টাকা করতে। কিন্তু তবু একথা কি তোমরা স্বীকার কর না যে আমাদের যুরোপীয় সভ্যতার অভিঘাতের একটা দরকার ছিল—তোমাদের?"

আমি ব'লেছিলাম: "করি মিষ্টার রাসেল; আর বিদেশীর পরাধীনতার গ্লানির একমাত্র সান্ত্বনা মেলে আমাদের কেবল এই চিন্তায় যে আমাদের জাতীয় জীবনের জড়তার ফলে আমাদের জনসাধারণের মন এত ঝিমিয়ে পড়ছিল যে যুরোপের প্রাণশক্তির ধাক্কা না পেলে হয়ত এতদিনে তার ঐহিক নির্ব্বাণ লাভ হ'ত।"

রাসেল ব'লেছিলেন: "শুধু তাই নয়, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিয়সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ের প্রায় একটা যুগধর্ম্ম বল্‌লেই চলে। ইংরাজের বাতাসেই ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিস্‌মের বীজ তোমাদের দেশের মাটিতে উড়ে গিয়ে পড়ে। তাছাড়া যূথবদ্ধ হ'য়ে কাজ করার ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তিরও একটা প্রত্যক্ষ পরশ তোমরা পেয়েছ—আমাদের মধ্যে দিয়ে।"

কিন্তু এ সব কথা হয়েছিল শেষ দিন, চা খাওয়ার টেবিলে। তাই আপাততঃ এ-প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া যাক্। যথাস্থানে।

একটা পাহাড়ে চড়তে চড়তে রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলাম: "সমাজ সংস্কারে বিশ্বাস কি তাহলে আমাদের কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে না এই কথাই আপনি বল্‌তে চান?"

—"না, তা বলি নি ত। আমাদের মনের মূল বিশ্বাসগুলো বদ্‌লালে আমাদের কর্ম্ম যে কম বেশি বদ্‌লাবে এটা ত খুবই স্বাভাবিক।"

—"তবে?"

—"আমি জোর দিতে চেয়েছিলাম মূলতঃ আমাদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এই সত্যটির উপর যে আমাদের মূল বিশ্বাস গুলিকেই যাঁরা কর্ম্মের মূল নিয়ন্তা বা প্রেরণা ব'লে মনে ক'রে থাকেন, তাঁরা ভ্রান্ত।"

—"মানে?"

—"কি জানো? বর্ত্তমান মনস্তত্ত্বের একটা আবিষ্কার ভারি সত্যি। সেটা এই যে আমাদের শুধু কর্ম্ম নয়, বিশ্বাসও মূলতঃ নির্ভর করে আমাদের নিহিত প্রকৃতিটির

ওপরে। তাই দেখা যায় যে প্রায়ই, যে-সব বিশ্বাসকে আমরা আমাদের কোনো কোনো আচরণের মূল ব'লে মনে করি, সে সব বিশ্বাস আমাদের কর্ম্মের আসল প্রেরণা নয়।"*

—"কিন্তু বিশ্বাস যদি মানুষের প্রকৃতিকে রাঙিয়ে না ই তুল্‌বে, তাহ'লে মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসের ফলে এত শত সুন্দর চরিত্র গ'ড়ে ওঠে কেমন ক'রে ?"

—"সুন্দর চরিত্র গ'ড়ে ওঠে ঐ যে বল্‌লাম আমাদের মূল প্রকৃতিটির প্রভাবে, ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাবটা এক্ষেত্রে বস্তুতঃ অবান্তর।"

—"তাহ'লে সুন্দর চরিত্র ধার্ম্মিক লোকদের মধ্যে যে এত মেলে তার কি ?"

—"আহা—যাদের তোমরা অধার্ম্মিক বল তাদের মধ্যে কি সুন্দর চরিত্র মেলে না ? আমি বল্‌তে চাইছি এই কথাটি মাত্র যে চরিত্রের মহত্ত্বটা ধর্ম্মের লেবেলের ওপর নির্ভর করে না মোটেই।"

—"কিন্তু আপনি কি তাহ'লে একথা অস্বীকার করতে চান যে জগতে আজ অবধি ধর্ম্মের রাজ্যেই বেশির ভাগ বড় চরিত্র দেখা গেছে ?"

—"না, তা চাই না। আমি চাই কেবল এই কথাটি বল্‌তে যে এ-রকমটা হওয়ার মূল কারণ শুধু এই যে আজ অবধি সভ্য মানুষ ধর্ম্মের নামের মোহকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি। কাজেই এখনো জগতে তথাকথিত ধার্ম্মিকদের সংখ্যা অধার্ম্মিকদের চেয়ে বেশি। একথা যখন সত্যি তখন মান্‌তেই হবে যে ভাল চরিত্রের সংখ্যা ধার্ম্মিকদের মধ্যে বেশি মিল্‌বেই। গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে কথাটাকে এই ভাবে বলা চলে: মানুষের মধ্যে ভাল লোক ধর, শতকরা দশজন। এখন, শতকরা নব্বইজন মানুষ যদি ধর্ম্মের লেবেল প'রে চলে তাহ'লে নয়জন ভাল লোক মিল্‌বে ধার্ম্মিকদের মধ্যে ও একজন মাত্র—অধার্ম্মিকদের মধ্যে। কাজেই দেখ্‌ছ এক্ষেত্রে সংখ্যা দিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায় না, যেহেতু সচ্চরিত্রতার মূল প্রেরণা হচ্ছে—আমাদের নিহিত প্রকৃতি, ধর্ম্ম নয়।"

—"কিন্তু ধর্ম্মের প্রেরণাটা চরিত্রবলের মূল কারণ হ'তেও ত পারে ?"

রাসেল সহজ সুরে ব'লে বস্‌লেন: "এ সম্ভাবনা স্বীকার করলেও করা যেতে পারত যদি দেখাতে পারতে যে ধর্ম্মের ফলে মোটের ওপর মানুষের সুখ শান্তি বেড়েছে।"

—"আপনি কি তাহ'লে মনে করেন—"

—"আমি মনে করি যে ধর্ম্মের নামে মানুষ মানুষের যত ভাল ক'রেছে তার চেয়ে মন্দ করেছে ঢের বেশি।"

—"তাহ'লে জগতের সেই সব মহামানুষের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন—যাঁরা ধর্ম্মের প্রেরণাতেই প্রেম, মৈত্রী প্রভৃতির প্রেরণা ও আলো পেয়েছিলেন ?"

—"ধর্ম্মের আলোতেই যে তাঁরা এ প্রেরণা পেয়েছিলেন একথা সত্য ব'লে মনে করবার কোনো কারণ নেই।"

—"নেই ?"

—"না।"

"তাহ'লে ধ্যান সাধনা প্রভৃতির ফলে বুদ্ধ খৃষ্ট প্রভৃতি যে-সব বাণী পেয়েছিলেন সে-সব আপনি উড়িয়ে দিতে চান ? ধর্ম্মে যে পুলক, উল্লাস প্রভৃতি মানুষ পায় সে-সব কি তাহ'লে ভুয়ো ?"

—"ভুয়ো কেন ? মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে data হিসেবে এ-সবের খুবই মূল্য আছে। কিন্তু পুলক, রোমাঞ্চ, ধ্যান ধারণা প্রভৃতির ফলে যে মানুষ সৃষ্টিতত্ত্বের সম্বন্ধে কোনও বড় সত্যের পরিচয় পেয়েছে তা আমি বিশ্বাস করি না। অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে মানুষ যেটুকু সত্য অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছে সেটুকু সে পেয়েছে চেষ্টায়, পরীক্ষায়, যুক্তিতে, কর্ম্মে, ত্যাগে—এ-রকম ধর্ম্মের পুলক রোমাঞ্চে নয়। ধর্ম্মের সাধনায় মানুষ মোটের উপর স্বার্থপরই হ'য়ে এসেছে আজ অবধি।"

—"কি রকম ?"

—"ধর্ম্মের একাকিত্ব ও আনন্দের মধ্যে ক্রমাগত মগ্ন থাকতে থাকতে মানুষ ক্রমে নিজেকে ছাড়া আর কিছুকে ভালবাসতে ভুলে যায় ; ফলে সে ধীরে ধীরে বাইরের দাবী-দাওয়ার মর্য্যাদা রাখা-না-রাখা সম্বন্ধে একেবারে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে ও জীবনের বৈচিত্র্যময় আনন্দ ও কর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে।"

* Bernard Hart তাঁর Psychology of Insanityতে মানুষের এই আত্মপ্রবঞ্চনা সম্বন্ধে বর্ত্তমান মনস্তত্ত্ববাদীদের মত উল্লেখ ক'রে লিখ্‌ছেন: "He fondly imagines that his opinion is formed solely by the logical pros and cons before him. We see in fact, that not only is his thinking determined by a complex of whose action he is unconscious, but that he believes his thoughts to be the result of other causes which are in reality insufficient and illusory

—"কিন্তু উল্টো দিকে সে বলতে পারে না কি যে তার অন্তর্মুখী জীবনে সে যে নিবিড় আনন্দ পায় তাতে তার একটা ক্ষতিপূরণ মেলে ?"

"তা পারবে না কেন ? কিন্তু তার একথার উত্তরে বলা চলে যে আনন্দ পাওয়াটাই যদি মানুষের জীবনযাত্রার চরম সমর্থন হয় তাহ'লে বিলাসী ও মাতালকে দোষ দেওয়া উচিত নয়।"

—"আপনি কি বলতে চান যে এ-সব সাধকদের আনন্দের সঙ্গে বিলাসী বা মাতালদের আনন্দের কোনো প্রকৃতিগত প্রভেদ নেই ?"

—"কি প্রভেদ ?"

—"কি বলেন আপনি! সাধকেরা তাদের ধর্ম্মের আনন্দের জন্যে যে স্বার্থত্যাগ স্বীকার করে, যে কষ্ট সহ্য করে, যে—"

—"মাতাল কি করে না ? সে তার সর্ব্বস্ব ওড়ায়, প্রিয়জনকে কষ্ট দেয়, সাধারণের শ্রদ্ধা হারায়—কত ক্ষতি সহ্য করে শুধু তার নেশার আমোদের খাতিরে ! নয় ?"

আমরা হেসে উঠলাম।

একটু পরে আমি বললাম: "ঠাট্টা থাক্ মিষ্টার রাসেল। বুদ্ধ প্রভৃতি সম্বন্ধে কি সত্যিই আপনি এমন কড়া কথা বলতে পারেন ?"

—"বুদ্ধের শত্রুপক্ষ যে বলে তিনি ভিক্ষোপজীবী ছিলেন সে অভিযোগকে ত' একেবারে নাকচ করা যায় না। কারণ এ রকম জীবনটা যে মোটের ওপর আরামের জীবন একথা মানতেই হবে।"

ব'লে একটু থেমে বললেন :

—"কিন্তু বুদ্ধের সম্বন্ধে আমার নিজের মত যদি জিজ্ঞাসা কর তাহ'লে আমি বলব যে যত ধর্ম্মসাধক আজ অবধি জগতে জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে বুদ্ধই আমার কাছে সব-চেয়ে প্রিয়।"

—"খৃষ্টের চেয়েও ?"

—"সে বিষয়ে সন্দেহ আছে ?"

—"খৃষ্টের সম্বন্ধে আপনার আপত্তি কি শুনি ?"

—"শুধু এই যে খৃষ্ট জগতের হিতের চেয়ে অহিত ক'রেছেন ঢের বেশি।"

—"আপনি কি সত্যিই একথা বলেন ?"

—"কেন বলব না ?"

"কিন্তু জীবনকে কি তিনি অনেকখানি সৌন্দর্য্য দেন নি ?"

—"যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি সৌন্দর্য্য কেড়ে নিয়েছেন যে। ইহুদি ধর্ম্মের বীজ তিনি ছড়িয়ে গেছেন গ্রীক সভ্যতার মাটিতে। ফলে কত সুন্দর সৃষ্টির যে কণ্ঠরোধ হ'য়েছে তার ইয়ত্তা কে করবে ?"

—"আপনি গ্রীক সভ্যতার যে একজন মস্ত ভক্ত তা জানি, কিন্তু—"

মিঃ রাসেল ও দিলীপকুমার

—"মস্ত ভক্ত ঠিক্ নয়। তবে গ্রীক সভ্যতার অনেক অবদানকে আমি মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করি। জ্যামিতি তারাই আবিষ্কার ক'রেছিল সব প্রথমে। সেজন্যে মানুষ তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বে।"

আমি হেসে বল্‌লাম: "আপনি বিজ্ঞানের যে-রকম ভক্ত তাতে আপনার কৃতজ্ঞতার গভীরতা বেশ অনুমান করতে পারি।"

—"বিজ্ঞান মানুষের একটি মহীয়সী কীর্ত্তি একথা কে অস্বীকার করবে? যদি বৈজ্ঞানিকদের কাজ করবার স্বাধীনতা একটু বেশি দেওয়া হয় তাহ'লে আমরা আজ অবধি যতটুকু জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চয় ক'রেছি শুধু তাই দিয়েই সমাজকে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন বদ্‌লে দিতে পারতাম যে সেটা অভাবনীয়। আশা করি এ স্বাধীনতা বৈজ্ঞানিক-দের মিলবে—ক্রমে ক্রমে।"

—"কি ভাবে সমাজ বদ্‌লে দিতে পারতেন আপনারা?"

—"একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত নেও। আজকের দিনে মানুষের মধ্যে শতকরা দশজন হচ্ছে ক্ষীণপ্রাণ ও বিকলমস্তিষ্ক। অর্থাৎ তাদের দিয়ে সমাজের কোনো হিতই সাধিত হ'তে পারে না, তারা কেবল জগতের দুঃখই বাড়াতে পারে। এখন দেখ বৈজ্ঞানিক উপায়ে এরকম বিকল মানুষের জন্ম নিবারণ করা যায়—এখনই যায়। কেমন ত? তাহ'লেই দেখ সংসারে বেশ খানিকটা দুঃখও এখনই নিবারণ করা চলে—বিজ্ঞানের বলে। এটা কম কথা নয়।"

আমরা পাহাড়টা দিয়ে নিঃশব্দে নাম্‌তে লাগ্‌লাম।…

রাসেল তাঁর কথার সূত্র ধ'রে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন: "এটা অবশ্য বিজ্ঞানের ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা খুবই ছোট দৃষ্টান্ত মাত্র। কারণ বিজ্ঞানের শক্তির কথা যতই ভাবা যায় ততই দেখা যায়, মানুষের জীবনরেখার গতি বদ্‌লে দেবার ক্ষমতা তার কি আশ্চর্য্য রকমের!"

আমি বল্‌লাম: "যথা?"

রাসেল বল্‌লেন: "ধর আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকদের ওপর ভার দেওয়া হ'ল উত্তরোত্তর উন্নত মানুষের জন্ম সহজ ক'রে তুল্‌বার। বিজ্ঞানের কৃপায় যে জ্ঞান আজ আমাদের অধিগম্য হয়েছে শুধু সেইটুকু শক্তির সাহায্যেই আমরা তাহ'লে আজই এটা করতে পারি যাতে ক'রে যোগ্য লোক ছাড়া আর কেউ শিশুর জন্ম দিতে পারবে না। তাহ'লে দুদিনে যে-রকম মানুষ জন্মাতে আরম্ভ করবে মানুষ হিসেবে তারা যে আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত শ্রেণীর জীব হবে এতে কি আর সন্দেহ আছে?"

—"কিন্তু আপনি কি বল্‌তে চান তাহ'লে যে মাত্র কয়েকজন লোক পিতা হবার অধিকারী হবে?"

—"হাঁ, কিন্তু এতে ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে যাবার কী আছে—যখন যৌন সম্মিলন রোধ করা হচ্ছে না? নরনারীর মিলিত হবার বাধা থাক্‌বে না। কেবল সেই সব ক্ষেত্রে তাদের সন্তানের জন্ম নিবারণ করতে বাধ্য করা হবে যে সব ক্ষেত্রে পিতামাতার সম্মিলনে উন্নত মানুষের জন্মের সম্ভাবনা থাক্‌বে না।"

—"কিন্তু বাধাবিপত্তি—"

—"জানি মিষ্টার রায়, ব্যাপারটা যে এত সহজ নয় তা আমার অগোচর নেই, আমি কেবল এটা একটা স্থূল দৃষ্টান্ত হিসেবে বল্‌লাম যে বিজ্ঞান কি ভাবে মানুষের প্রগতিকে সহজ ক'রে আন্‌তে পারে।"

আমরা একটা পাহাড়ের শেষে এসে পৌঁছলাম। সাম্‌নে উদার সিন্ধুর বীচিমালা রূপালি সূর্য্যকিরণে ঝলমল করছিল। দূরে দুএকটা নৌকা পাল তুলে দিয়ে চ'লেছিল। নীলাভ জল দিক্ চক্রবালের কাছে সাদা মেঘের কোলে আত্মসমর্পণ ক'রে দিয়ে কেবল একটি গানের শেষ চরণের স্মৃতি জাগাচ্ছিল:

"যেথানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো!"

রাসেল অতৃপ্ত নয়নে সমুদ্র দেখ্‌তে মগ্ন হ'য়ে গেলেন, তাঁর কথা বন্ধ হ'য়ে গেল।

—"আপনি বুঝি সমুদ্র খুব ভালবাসেন মিষ্টার রাসেল?"

—"প্রকৃতির মধ্যে আর কিছু আমি এত ভালবাসি না।"

একটু থেমে সস্মিতমুখে রাসেল বল্‌লেন:—

"কনফ্যুসিয়াস ব'লেছেন যে ধার্ম্মিক লোকে পাহাড় পর্ব্বত ভালবাসে ও জ্ঞানী ভালবাসে সমুদ্র।"

ব'লে আমার দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লেন: "কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে কি তথ্যের সাক্ষ্যে যে এমন একটা কথা তিনি জোর ক'রে ব'লে বস্‌লেন তা বলা কঠিন!"

—"বোধ হয় তিনি নিজে দুটোই ভালবাস্‌তেন ব'লে।"

—"সম্ভব" ব'লে রাসেল একটু হেসেই ব'লে বসলেন: "কিন্তু কনফ্যুসিয়াসের অভিজ্ঞতা অনুসারে তাহ'লে ধর্ম্ম ও আমার মধ্যে সম্বন্ধ হওয়া উচিত—আদায় কাঁচকলায়—

যেহেতু পাহাড় পর্ব্বতের প্রতি প্রেম আমার উচ্ছল নয় মোটেই।"

রাসেল ও আমি পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর বেয়ে বেয়ে নেমে সমুদ্রতীরে পৌছলাম। সেখানে মিসেস ডোরা রাসেল, জন, কেট ও ফরাসী গভর্ণেসটি ছিলেন। মিসেস রাসেল ছাড়া সকলেই সেই তুষার-শীতল সমুদ্রের জলে স্নানে নেমে গেলেন। রাসেলের সাঁতারে আনন্দ দেখে তাঁর খানিক আগের একটা কথা মনে হ'ল।

তিনি বলেছিলেন: "ধার্ম্মিক হওয়ার বিপক্ষে আমার আর একটা প্রধান আপত্তি এই যে তার ফলে আমরা বহির্জগতের কর্ম্ম ও ঘটনাদির প্রতি আস্তে আস্তে উদাসান হ'য়ে পড়ি। এটা স্বাস্থ্যকরও নয়, এর ফলে মানুষ অনর্থক জীবনের অনেক রসসম্পদই হারায়। কাজেই ধর্ম্ম জীবনে সমৃদ্ধি না এনে মোটের ওপর দৈন্যই আনে।"

আমি উত্তরে ব'লেছিলাম: "কিন্তু যারা ধর্ম্মে আনন্দ পায় তারা যে তার নিবিড় আনন্দের মধ্যে একটা মস্ত ক্ষতিপূরণ পায় না তা কেমন ক'রে বলেন আপনি? অর্থাৎ কেমন ক'রে প্রমাণ করবেন যে তাদের অন্তর্জীবনের রসসম্পদ কম?"

—"তাদের কাছে একথা প্রমাণ করার কোনো উপায়ই নেই, তাদের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে যাওয়াও বৃথা। কারণ যেখানে মানুষ গোটাকতক গায়ের জোরের কথার বর্ম্মে নিজের মনকে লুকিয়ে রাখে, সেখানে যুক্তির শেল যে পশে না এ ত অত্যন্ত জানা কথা।"

—"তবে?"

—"তবে কি জান? জীবনের কি কি বস্তু কাম্য সে সম্বন্ধে গোটাকতক মূল ধারণা শিশুর মনে বাল্যেই বপন ক'রে দেওয়া যায়। তাই যে-রকম মনোভাব জীবনকে সমগ্রভাবে দেখ্‌বার পক্ষে আমাদের সহায়স্বরূপ হয়, সেরকম মনোভাব ছেলেবেলা থেকে শিশুদের মধ্যে চারিয়ে দিলে সমাজে তার সুফল ব্যাপক হয়ই। নইলে জীবনকে শুধু খাটো ক'রে দেখে তার অপমানই করা হয়ে থাকে।

"কারণ শিশুদের মনে যে ছাপটা পড়ে তার প্রভাব যে কি-রকম স্থায়ী হয়, সেটা আমরা এখন সবে উপলব্ধি করতে আরম্ভ ক'রেছি।" *

রাসেল যখন সাঁতার দিচ্ছিলেন তখন আমি মিসেস রাসেলের সঙ্গে গল্প করছিলাম সেই সমুদ্রতীরে ব'সে।

আমি মিসেস রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনার Hypatiaতে আপনি লিখেছেন যে স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতির মধ্যে যে বৈষম্যটা আমরা সচরাচর এত বড় ক'রে দেখে থাকি, আসলে সেটা তত বড় নয়। কিন্তু সেটা কি সত্যি?"

—"মানে?"

—"ধরুন, আপনার কি মনে হয় না যে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ভালবাসার বেশি কাঙাল?"

"আজ অবধি সমাজ-ব্যবস্থাটা যে-রকম হ'য়ে এসেছে, তাতে মেয়েদের পক্ষে ভালবাসাকে বেশী আঁকড়ে থাকতে হ'য়ে এসেছে বটে, কিন্তু তার হেতু শুধু এই যে মেয়েদের সামনে অন্য সব কর্ম্মের পথই এতদিন বন্ধ হ'য়ে এসেছে। কাজেই একথা জোর ক'রে বলা যায় না যে পুরুষের মতন সুযোগ সুবিধে পেলে মেয়েরা জীবনের উদার কর্ম্ম-প্রচেষ্টা প্রভৃতিতে আনন্দ পেতে আরম্ভ করবে না।"

—"ভালবাসা সম্বন্ধে না হয় হ'ল। কিন্তু সন্তান সম্বন্ধে? মনে হয় না যে সন্তান তাদের কাছে অত্যন্ত বেশি দরকার?"

—"বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম দেখ্‌লে ত মনে হয় না যে মেয়েরা বস্তুতঃ সন্তান বেশি চায়। সন্তানের প্রতি যারা বীতরাগ, সে-সব মেয়ের সংখ্যা আজকের দিনে নিতান্ত কম নয়। শুধু তাই নয়, এই শ্রেণীর মেয়েদের সংখ্যাই ক্রমে বাড়তে চলেছে।"

—"কিন্তু সেটা কি সন্তানের প্রতি বিমুখতার জন্যে? আপনার কি মনে হয় না যে মেয়েদের অনেক সময়ে অত্যন্ত বেশি সন্তানের জন্ম দিতে হয় ব'লেই এটা ঘটেছে?"

—"একথাটা অনেক পরিমাণে সত্যি। শ্রমিকদের মধ্যে আমি দেখেছি অনেক মা বৎসরের পর বৎসর পূর্ণ বিশ্রাম বা একটানা ঘুম কাকে বলে জানে নি। স্বাস্থ্যও

* রাসেল তাঁর Education বইখানিতে লিখেছেন যে প্রথম পাঁচ-বৎসরের শিক্ষার ফলেই শিশুর চরিত্র একরকম গঠিত হ'য়ে গেছে বলা চলে। বর্ত্তমান শিশু-মনস্তত্ত্ববিৎরা নাকি য়ুরোপে এই রকম কথাই বলছেন।

হারায় তারা। ফলে তারা জীবনের আনন্দকেও হারায় ও শেষটায় সন্তানদের প্রতি বিমুখ হ'য়ে পড়ে। নইলে বেশির ভাগ মেয়েরা যে স্বভাবতঃ সন্তানবৎসল একথা আমার খুবই মনে হয়। তাদের যদি দু একটির বেশি ছেলেপিলে না হ'ত তাহ'লে শিশুদের প্রতি তাদের অনুরাগ যে বাড়ত বই কমত না একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে। কিন্তু তাতে কি? অল্প ছেলেপিলে হ'লে শুধু যে তাদের সন্তানস্নেহ বাড়ত তাই ত নয়, শিক্ষা ও সুযোগ পেলে যে তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাইরের কাজ কর্ম্মেও যথেষ্ট মন দিতে পারত, আনন্দও পেত।"

ক্রমে শিশুজন্ম নিবারণ করা-না-করা সম্বন্ধে মিসেস রাসেল অনেক কথাই বল্লেন। বল্লেন যে এ-সব আধুনিক পদ্ধতি সত্যিই খুব সমর্থনীয়।

লোকে এটাকে পাপ মনে করে কেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন যে ওটা একটা গতানুগতিকতা ও কুসংস্কারের দরুণই মানুষের মনকে এত আশ্রয় ক'রেছে। আসলে এই আইডিয়াটাই ভুল যে পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা। *

আমাদের মধ্যে এইরকম সব কথাবার্ত্তা হচ্ছে এমন সময়ে মিষ্টার রাসেল স্নান ক'রে এসে আমাদের পাশে একটি পাথরের ওপর বস্‌লেন।

তাঁর দিকে চেয়ে মিসেস রাসেল তাঁর কথার সূত্রটি টেনে বল্লেন: "শিশুজন্ম নিবারণ করতে না পারার কুফল—অশেষ। আমাকে যদি আমার স্বামী আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য করতেন, তাহ'লে দুদিনে সন্তানদের প্রতি আমার স্নেহ বিতৃষ্ণায় পরিণত হ'ত। শুধু তাই নয়, শেষটা আমি হয়ত তাঁকে ছেড়ে যেতাম।"

ভাবলাম এখানে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় মেয়েদের মনোভাবের মধ্যে কী তফাৎ! এরকম কথা বলা দূরে থাকুক ভাবাও পাপ—আমাদের সতী স্ত্রীর পক্ষে!

বল্লাম: "শিক্ষিত সহৃদয় লোকদের চোখেও অজস্র শিশুর জন্ম দেওয়াটার কষ্ট ও গ্লানি কেন পড়ে না বুঝি না। অনেক ক্ষেত্রেই যে তারা আধুনিক উপায়ে birth control কেন করে না—যেখানে করলে তাদের পারিবারিক জীবন এত সুখের হ'ত—"

রাসেল হঠাৎ উষ্ণস্বরে ব'লে বস্‌লেন: "দেখ্‌ছ ত কেন আমি ধর্ম্মের এত বিপক্ষে? জগতে অগুন্তি দরিদ্র ও স্বাস্থ্যহীন শিশুর জন্মদান যে আজও পাপ ব'লে গণ্য হয় নি তার জন্যে ধর্ম্ম বড় কম দায়ী নয় জেনো। তাই আমি তোমাকে খানিক আগে বল্‌ছিলাম যে শুধু ধর্ম্মের নামেই মানুষকে পশু করার সমর্থন করাটার আদর হওয়া মানুষের সমাজে সম্ভব হয়েছে। যদি ধর্ম্মের পাঞ্জা না থাকত তাহ'লে অনেককেই আমরা criminal নাম দিয়ে একঘরে করতাম যারা আজ ভদ্র নামে সম্মানিত।"

—"এ কথাটা কিন্তু একটু বেশি কঠিন হ'য়ে পড়ল না কি মিষ্টার রাসেল?"

—"মোটেই না। কারণ যে ভদ্রনামধারী মানুষ বছর বছর তার অসুস্থ স্ত্রীকে রুগ্ন সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য করে তাকে criminal ছাড়া আর কি নামে বর্ণনা করা যেতে পারে বল?"

—"কিন্তু সে যে স্ত্রীর জন্যে নিজেও সেই সঙ্গে দুঃখ পায় একথাটাও ত ভুল্‌লে চল্‌বে না—যদিও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সময় সে একথা ভাবতে পারে না।"

রাসেল উষ্মার সঙ্গে ব'লে উঠলেন: "স্ত্রীর জন্যে সে দুঃখ সত্যি পায় না কখনই। যদি বলে যে পায়, তাহ'লে আমি তাকে হয় মিথ্যাবাদী না হয় কপট বলব। কারণ সাদা সত্যটি হচ্ছে শুধু এই যে নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাটাই তার কাছে সব চেয়ে বড়,—স্ত্রীর স্বাস্থ্য বা সন্তানের দায়িত্ব অকিঞ্চিৎকর। লম্বা লম্বা কথা ব'লে ধর্ম্ম তার এ

---

* মিসেস রাসেল তাঁর The Right to be Happy ব'লে বইটিতে লিখ্‌ছেন: "The Roman Catholics openly advocate widespread celebacy for men and women, which is, for them, the most holy life and the only legitimate escape from parental responsibility. This teaching therefore quite clearly denies that sex is either a necessity or a lawful pleasure to men or to women and allows its indulgence only when the perpetuation of the race is desired. This is a perfectly natural result of the worship of fertility associated with agricultural superstitions. Yet any one capable of examining his or her instincts without regard to prejudice associated with past environments finds that there is a clear division between the impulse to sexual enjoyment and the desire to have children.

পাশবিকতার সমর্থন করে যেহেতু সে ধর্ম্মের চল্‌তি নীতি অনুশাসনগুলিকে মুখে মেনে চলে।"

—"কিন্তু স্ত্রীকে যদি সে ভালবাসে—"

—"ভালবাসে না। ভালবাসার ধর্ম্ম এ নয়। সে ভালবাসে শুধু নিজেকে। এটা সহজেই প্রমাণ করা যায়।"

—"কেমন ক'রে ?"

—"ধর, যদি আজ একটা আইন পাশ হয় যে তার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি ক'রে যদি সে বছর বছর সন্তানের জন্ম দেয় তাহ'লে তাকে যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে মারা হবে, তাহ'লে কি মনে কর যে সে birth controlএর ব্যবস্থা না ক'রে তার স্ত্রীর ওপর ফের অত্যাচার করবে ?"

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

—"অথচ সে নিজে কি তার স্ত্রীকে ঠিক্ অনুরূপ যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে মারে না ? এবং এহেন দুঃসহ যাতনা নিবারণের উপায় আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও মানুষ নামধারী জীবের সমাজে এ পাশবিক আচরণ করতে সে সাহস করে কেন ? না, ধর্ম্ম তাতে বাহবা দেয় ও birth control করতে গেলে সেটাকে পাপ ব'লে ভয় দেখায়।"

আমি একটু ভেবে বল্‌লাম : "কিন্তু এজন্যে ঠিক ধর্ম্মকে দায়ী করা যায় কি না ভাবি। ধর্ম্মের মধ্যেকার কুসংস্কারকে করা যেতে পারে বটে, কিন্তু ও দুটো ত ঠিক্ এক বস্তু নয়।"

—"মানে ?"

—"ধরুন—রবীন্দ্রনাথ। তিনি ত আধুনিক পদ্ধতিতে শিশু-জন্ম নিবারণকে অন্যায় মনে করেন না, অথচ তিনি ত ধর্ম্মের বিরোধীও নন, নাস্তিকও নন।"

—"কিন্তু এখানে তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ কোন লেবেল-মারা ধর্ম্মের সম্প্রদায়ভুক্ত নন যে। ধর্ম্ম তত অনিষ্ট করতে পারে না যদি কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তার বিশ্বাসগুলোকে আমাদের জোর ক'রে গিলিয়ে দেওয়া না হয়। ধর্ম্ম যতদিন ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে ততদিন সে খুব হানি করতে পারে না।"

—"হানি না হয় করতে পারে না, কিন্তু ভালও কি করে না কখনো ?"

—"না, ধর্ম্মের দ্বারা ভাল কখনো হয় না, সেটা নিশ্চিত।"

আমরা হেসে উঠ্‌লাম।

হাসি থাম্‌লে মিসেস রাসেল বল্‌লেন : "যদি মেয়েদের মত নেওয়া হ'ত তাহ'লে দেখ্‌তে পাওয়া যেত যে তারা অবস্থা প্রতিকূল হ'লে মা হ'তে চাইত না ও আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে শিশু-জন্ম নিবারণ করতে একটুও ইতস্ততঃ করত না। শুধু তাই নয়, সন্তান অনাহূত ভাবে না এলে সন্তানের প্রতি স্নেহও মন্দা হয় না, যেমন আজকাল ঢের 'মা'র ক্ষেত্রে হচ্ছে।"

ব'লে একটু থেমে বল্‌লেন : "আমার নিজের কথা অন্ততঃ বলতে পারি। আমার দুটি সন্তান হওয়ার পরেও যে আমি আরও একটি সন্তান চাই তার কারণও এই যে আমার পূর্ব্বে দুই সন্তানের ক্ষেত্রে আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মা হ'তে হয় নি।"

আমি হেসে বল্‌লাম : "আপনি তাহ'লে আরও একটি সন্তান চান ?"

মিসেস রাসেল হেসে বল্‌লেন : "হাঁ। আমার মনে হয় আমাদের তিনটি সন্তান হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

ব'লেই মিষ্টার রাসেলের দিকে চেয়ে বল্‌লেন : "কিন্তু আমার মা একথা শুনে আমাকে কি বলেছেন জানো বার্টরাও ?"

মিষ্টার রাসেল জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর দিকে তাকালেন। মিসেস রাসেল মৃদু মৃদু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন : "আমি কথায় কথায় একদিন মাকে বল্‌ছিলাম যে, কিছুদিন পরে আমার আর একটি সন্তান হ'লে বেশ হবে। তাতে তিনি বল্‌লেন : 'অমন মূর্খের মতন কাজ কোরো না ডোরা। আমি চারটি সন্তানের মা হ'য়েছি কারণ আমি মূর্খ ছিলাম।'"

মিষ্টার রাসেল বল্‌লেন : "তিনি একথা ব'লেছিলেন নাকি ? সত্যি ?"

আমরা সকলে খানিকক্ষণ ধ'রে হাস্‌তে লাগলাম।

হাসি থাম্‌লে আমি রাসেলকে বল্‌লাম : "আপনার Education বইখানিতে আপনি একাধিক সন্তানের সমর্থন ক'রেছেন, সেইজন্যেই বুঝি মিসেস রাসেল আর একটি সন্তান চান ?"

মিসেস রাসেল বল্‌লেন : "হাঁ—অনেকটা তাই বটে। শিশু বাড়ীতে অন্য কয়েকটি শিশুর সঙ্গে একসঙ্গে খেলা-ধুলা ও বাদবিসম্বাদ করতে না পারলে তার বাল্যকালের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। একলা একলা মানুষ হ'লে শিশু অনেক ক্ষেত্রেই কুনো হ'য়ে পড়ে।"

আমি রাসেলকে বল্লাম: "আপনার Education বইখানিতে আপনি আপনার নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন যে বাড়ীতে একলা মানুষ হওয়ার ফলে আপনি যখন কলেজে এসেছিলেন তখন একটি prig হ'য়ে এসেছিলেন।"

রাসেল হেসে বল্লেন: "হাঁ। কিন্তু তারপর আরও একটু লিখেছিলাম যে সে priggishnessটা আমার আরোগ্য হ'য়েছে কিনা সেটা আমার বন্ধুরা বেশি ভাল বল্‌তে পারবেন।"

মিসেস রাসেল সে হাসিতে যোগ দিয়ে একটু পরে বল্লেন: "কিন্তু সাধারণতঃ প্রতি দম্পতীর দুটির বেশি সন্তান হওয়া বোধ হয় বাঞ্ছনীয় নয়।"

মিষ্টার রাসেল গম্ভীরভাবে বললেন: "কিন্তু ডোরা Statistic অনুসারে প্রতি দম্পতীর ২·৪ ক'রে সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত। কিন্তু এটা কাজে করা একটু কঠিন।"

আমরা আবার হেসে উঠ্‌লাম।

আমি বল্লাম: "আমার মাঝে মাঝে ভাব্‌তে আশ্চর্য্য লাগে মিষ্টার রাসেল, যে মহাত্মা গান্ধির মতন হৃদয়বান্ লোকও শিশু-জন্ম নিবারণের আধুনিক পদ্ধতির বিরোধী হন!"

রাসেল বল্লেন: "তিনি যে অত্যন্ত ধার্ম্মিক লোক মিষ্টার রায়, একথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন?" ব'লে একটু থেমে বল্লেন:

"যাঁরা প্রিন্সিপল্ হিসেবে শিশু-জন্ম নিবারণের বিরোধী তাঁদের সে প্রিন্সিপল্ আমি বুঝি, কেবল সে-রকম ভারতীয় দেশভক্তদের আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

—"কি?"

—"যাঁরা শিশু-জন্ম নিবারণে বাধা দেওয়ার ফলে নারী জাতিকে ধরতে গেলে শুধু সন্তানের জন্ম দেবার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, তাঁদের আমার জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁরা স্বাধীন সমাজ বল্‌তে কি বোঝেন?—স্বাধীন মানুষের সমষ্টি না একদল দাস? কারণ যে-সমাজ সন্তান না চাইলেও মেয়েদের জোর ক'রে তাদের মা হ'তে বাধ্য করে সে-সমাজ কেমন ক'রে অনুযোগ করে যদি ইংরেজরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরও ঠিক সেই রকম ভাবে চালাতে বাধ্য করে? যেখানে আমরা অধীনস্থ লোকদের ওপর অত্যাচার করি সেখানে আমরা কেমন ক'রে তাদের দুষি যারা আমাদের পরাধীন ক'রে রাখ্‌তে চায়? অন্ততঃ এতে আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।"

মিসেস রাসেল বল্লেন: "বার্টরাণ্ড, ফেরা যাক্ চল, চা খাবার সময় হয়েছে।"

আমরা ফিরিলাম।

পথে চল্‌তে চল্‌তে রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি কি একবার আমাদের দেশে আস্‌তে পারেন না এখন?"

রাসেল বল্লেন: "বোধ হয় না। আমি একটা নতুন স্কুল করেছি যে। তার দায়িত্ব বহু। কাজেই এখন কিছু-দিনের জন্যে আমার পক্ষে তোমাদের দেশে যাওয়া সম্ভব হবে না বোধ হয়—যদিও যেতে ভারি ইচ্ছে করে।"

"—কিন্তু কেন করে, বলতে পারেন?"

—"ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের আবহাওয়াটাকে যেমন ভাবে অনুভব করা যায়, দূর থেকে শুধু কল্পনায় ঠিক্ সে রকম অনুভূতি ত আসে না।" ব'লে একটু থেমে বল্লেন: "কেবল তরুণ ভারত সম্বন্ধে আমি একটু নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েছি।"

—"কেন?"

—"কেম্ব্রিজ অক্‌স্‌ফোর্ডের তরুণ ভারতীয়দের সঙ্গে একটু সংস্পর্শে এসে।"

—"বুঝেছি, তাদের জাতীয়তা ও সঙ্কীর্ণ দেশভক্তি আপনার ভাল লাগ্‌তে পারে না।"

—"ঠিক্ তাদের জাতীয়তা বা দেশভক্তিও নয়—যদিও আমি নিজে প্রাণ গেলেও জাতীয়তা বা দেশ-ভক্তি শেখাতে পারব না; আমি সবচেয়ে দমে গেছি—তাদের মধ্যে অতীত আচার ব্যবহারের প্রতি গোঁড়ামির দৃষ্টান্ত দেখে। কারণ সব দেশেই অতীত যুগের আচার ব্যবহার বিশ্বাস প্রভৃতি মন্দ; সুতরাং শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে এটা অন্যরকম হবে একথা মনে করার কোনও কারণই নেই।"

খানিকক্ষণ বাদে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রাসেল বল্লেন: "গান্ধি নাকি রুষদেশের সঙ্গে একত্র কাজ করতে অস্বীকার ক'রেছেন—রাশিয়া ঈশ্বর মানে না ব'লে?"

—"হ্যাঁ।"

"—এটা অত্যন্ত মূঢ়তা। কারণ, ভারতবর্ষকে সাহায্য করার এখন শুধু নাস্তিক রাশিয়া ছাড়া জগতের অন্য কোনো জাতেরই স্বার্থ নেই।"

—"কিন্তু আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে রাশিয়া ভারতবর্ষকে সাহায্য করবে?"

—"করি। কারণ য়ুরোপের বিরুদ্ধে এশিয়ার পাণ্ডা হওয়ায় আজ রাশিয়ার একটা সত্য স্বার্থ আছে। চীনদেশের দৃষ্টান্ত দেখ না।"

ব'লে একটু থেমে চিন্তিত সুরে বল্লেন: "কিন্তু এখন এ সহায়তা তোমাদের পক্ষে কার্য্যকরী হবে ব'লে মনে হয় না—অর্থাৎ, এ শান্তির সময়ে নয়।"

—"কখন হবে তাহ'লে?"

—"আর একটা বড় যুদ্ধ য়ুরোপে শীঘ্রই বাধবে। সে সময়ে ইংলণ্ড অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবে। সেই সময়ই হচ্ছে তোমাদের স্বাধীনতা লাভের মাহেন্দ্র লগ্ন। কিন্তু যতদিন সে লগ্ন না আসে ততদিন তোমরা তোমাদের অধীনতার নিগড় কাটতে পারবে বলে মনে হয় না।"

(ক্রমশঃ)

ব্রাইটান্

কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

কুজ্ঝটিকাময় লণ্ডনের সদা বারিপতন, ঘোলাটে ঘোলাটে মেঘ ও কন্ কনে শীতের মধ্যে থাকিতে থাকিতে যখন প্রাণের ভিতরটা সব ঘুলিয়ে যায়—মেঘমুক্ত নীল আকাশ ও সূর্য্যালোক দেখবার জন্য প্রাণ যখন হাঁফিয়ে ওঠে—শ্বাসরোধের মত অনুভূতি আসে—তখন দলে দলে লোক ব্রাইটানে হাঁফ ছাড়তে আসে। ব্রাইটান লণ্ডন হইতে ট্রেণে এক ঘণ্টার পথ। সহরটি সমুদ্রের উপর ছবিখানির মত দাঁড়িয়ে আছে। উন্মুক্ত আকাশ সূর্য্যালোকে বার মাস সাগরবক্ষে তাহার প্রতিচ্ছবি দেখে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে থাকে। সেই সুমধুর দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য দলে দলে কর্ম্মক্লান্ত লোক এখানে ছুটে আসে ও আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। প্রকৃতি দেবীর রমা নিকেতন ব্রাইটানে আছে অনন্ত আকাশ আর অতল-স্পর্শী সমুদ্র—স্বাস্থ্য-সম্পদ, অপরিমেয় সৌন্দর্য্য আর অতুলনীয় জীবনী-শক্তি। ব্রাইটানের অণু-পরমাণুতে স্বাস্থ্য বিজড়িত। ব্রাইটানের ন্যায় প্রাণারামদায়ী সুস্নিগ্ধ বায়ু জগতে দুর্লভ। যিনি একবার ব্রাইটানে গেছেন ও তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন, তিনি যখনই অবসর পাবেন,

প্যালেস্ উত্তরণ-মঞ্চ

তখনই আবার সেখানে যাবার জন্য তাঁকে ব্যাকুল হ'তেই হবে; প্রাণের ভিতর আপনা হতে একটা আকুলি-বিকুলি এসে পড়বেই। মনে করবেন না, ব্রাইটান একটা নূতন সহর, হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে—গ্রীষ্মকালের দর্শকদের মনোরঞ্জন কর্ত্তে স্বল্পকালের জন্য জমকাল হয়ে কয় মাস নির্বান্ধব পুরীর মত পর বৎসরের গ্রীষ্মের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। এটা তা নয়। বারমাসই এখানে আনন্দের প্রস্রবণ ছুটছে। বিলাতের মধ্যে এটা একটা বড় সহর। লোকসংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ। দুইটী সুদৃশ্য উত্তরণ-মঞ্চ আছে, তাহার যে কোনটীর দক্ষিণের প্রান্তভাগে পদব্রজে ভ্রমণ কালে আরও স্পষ্টতররূপে সহরের মনোহারিত্ব দৃশ্যপটের ন্যায় প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। পশ্চিমে সেল্‌সি বিল্ (Selsey Bill) আর পূর্ব্বে বীচি হেড্ (Beachy Head) সাগরতীরের প্রায় সব স্থানেই একসঙ্গে চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর ওদিকে সাগর-বক্ষে বহু দূরাগত বাণিজ্যপোত ইংলিশ চ্যানেল্ পার হইতেছে, তাহা দিগন্তস্পর্শীবৃত্তে দেখিতে দেখিতে মন কোন্ অজানা
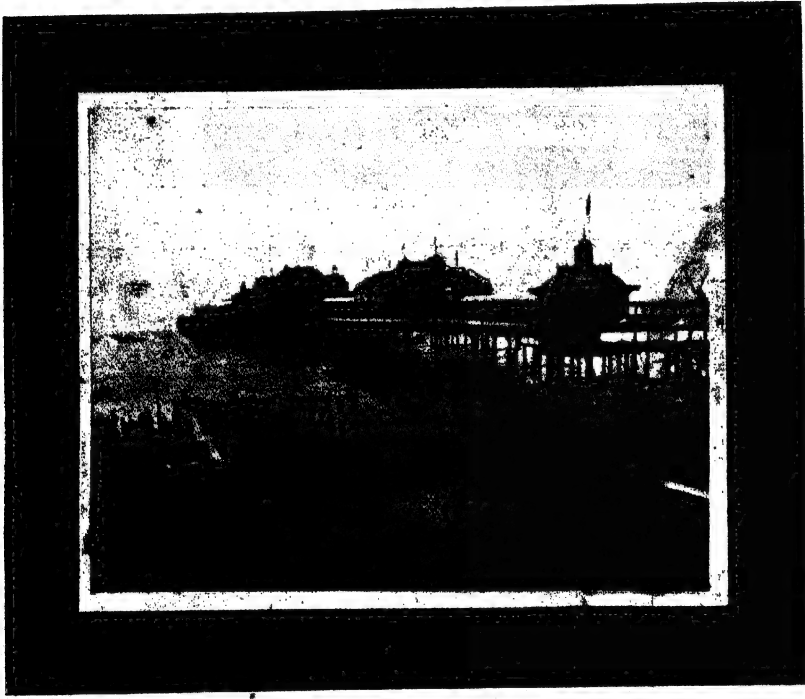
পশ্চিম উত্তরণ-মঞ্চ

শতাধিক মাইল সুসজ্জিত রাজবর্ত্ম; রজনীতে তাহা বৈদ্যুতিক আলোকে সমুজ্জ্বল। দুই সহস্র সাত শত একার ভূমি লইয়া সহরটী স্থাপিত; আর সহরতলী নয়শত একার ভূমি লইয়া অবস্থিত। সহরের পুরোভাগের স্বচ্ছন্দ বিহার-স্থান ক্রমান্বয়ে দৈর্ঘ্যে চারি মাইল বিস্তৃত। সমৃদ্ধি-শোভমান "কিংস রোড" (King's Road) নামক রাজপথের উপর দাঁড়াইলে সহরের শোভা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। ব্রাইটানে যে অনন্তের উদ্দেশে ধাবিত হয়, তার কুলকিনারা পাওয়া যায় না। আর রজনীতে ব্রাইটানের পুরোভাগের উজ্জ্বল আলোকমালা, তোরণ-মঞ্চদ্বয়ের আলোকগুচ্ছ লম্বিত পুষ্পমাল্যের মত সুসজ্জিত হয়ে মনে হয় যেন চ্যানেলের ঘরমুখো জাহাজ-গুলাকে সহর্ষে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য অপেক্ষা করছে। আর নভোমণ্ডলস্থিত তারকারাজি সহরের পশ্চাতে উত্তর দিকের গিরিশৃঙ্গে বিজলী বাতির আলোকের সহিত মিলিত হয়ে

সাগর-মুকুরে যখন প্রতিফলিত হয়, তখন বহুদূরব্যাপী এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সৃজন করে। যারা প্রথম ব্রাইটানে আসে, তারা এই অতি প্রাচীন ও মনোমুগ্ধকর স্থান দেখে একেবারে অবাক্

Drive) সংলগ্ন একোয়েরিয়াম (Aquarium) বা কৃত্রিম সরোবর হ'তে কেম্পটাউন (Kemp Town) পর্য্যন্ত চমৎকার আচ্ছাদিত পথ পূর্ব্বদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

কিংস ক্লিফ্ এবং লিফ্‌ট্

হয়ে যায়; ও পরম কল্যাণকর উৎস-বারি পান করে নব-জীবন লাভ করে ফিরে যায়। মেদিরা ড্রাইভের (Madeira

তার পশ্চাদ্ভাগে হরিৎবর্ণের লতাবিটপী নবকিশলয়ে শোভিত হয়ে নয়নের তৃপ্তি সাধনে সদা তৎপর। এই পথের উপর কয়েকটী সোপান অধিরোহণ করিলে সিমেণ্ট-মণ্ডিত সুপ্রশস্ত স্বচ্ছন্দ বিহার-স্থান। তাহার পার্শ্বে উপবেশনের জন্য আসন সজ্জিত। সেখান হতে ইংলিশ প্রণালীর দৃশ্য অতীব মনোহর ও প্রাণ-স্পর্শী। আরও কতকগুলি সোপান আরোহণ করিলে সমুদ্র-সমীপবর্ত্তী প্যারেডস্থান (Parade)।

ব্রাইটান—সাগরতীর

তাহার পার্শ্বে উত্তর দিকে যে সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী আছে, তাহা লণ্ডন সহরের উৎকৃষ্ট নগরোদ্যানের চতুর্দ্দিকের সুরম্য হর্ম্মশ্রেণী অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নহে। সুখ-বিচরণের মধ্যভাগে বৈদ্যুতিক উত্তোলন-যন্ত্র, সাগর-তীরের প্যারেড-স্থান এবং মেদিরা ড্রাইভে (Madeira Drive) যাইবার পথের সহিত সংযুক্ত আছে। কৃত্রিম সরোবর একোয়েরিয়ামের পশ্চিমে কিংস রোড (King's Road) চিত্তাকর্ষক এরূপ সুন্দর উত্তরণ-মঞ্চ পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। সেখানে ঐক্যতান বাদনের জন্য আচ্ছাদনযুক্ত ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড আছে, সুপ্রশস্ত শীতোদ্যান আছে—আর আছে রঙ্গালয়। সারা বছর ধরে কনসার্ট ও ব্যাণ্ড বেজে স্থানটীকে সরগরম করে রাখে। রঙ্গালয়ে খ্যাতনামা নট নটীদের দ্বারা খুব ভাল ভাল নাটক অভিনীত হ'য়ে দর্শকগণকে মুগ্ধ করে রাখে। সহরে আরও দুইটী রঙ্গালয়, একটী বৈচিত্র্য-রঙ্গমঞ্চ, আর

লোয়ার এসপ্ল্যানেড্—পূর্ব্ব দিক্
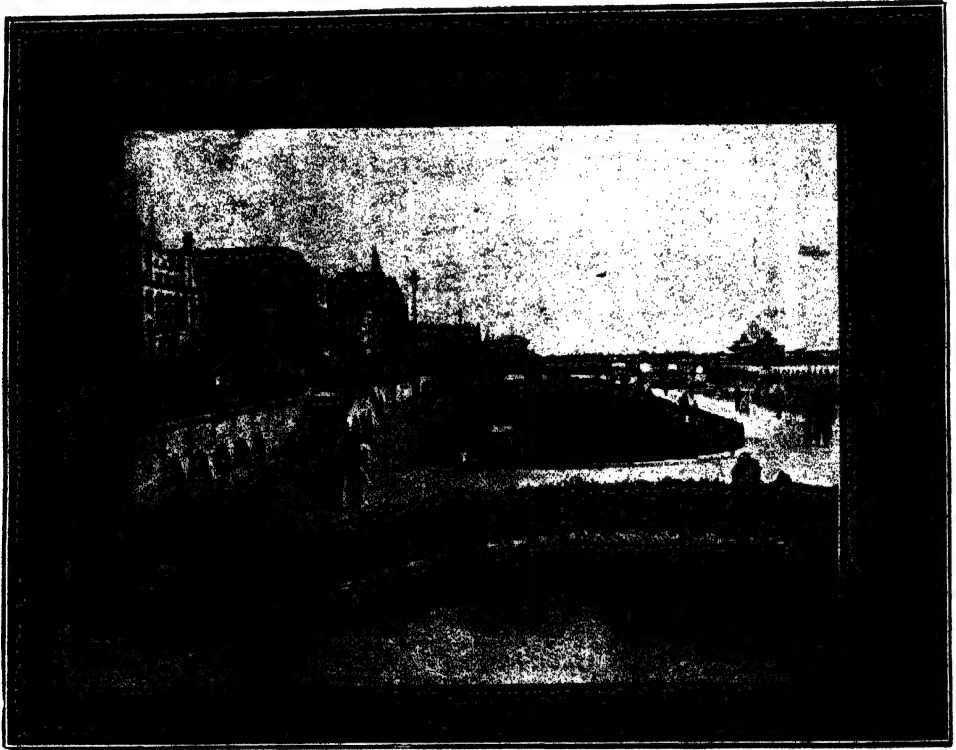
পণ্যবীথিকায় পূর্ণ। আর তারই মাঝে মাঝে বড় বড় হোটেল ও বোর্ডিং হাউসগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলিতে দর্শকগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য আধুনিক কালোচিত যতদূর সম্ভব উচ্চাঙ্গের সুবন্দোবস্ত আছে! বস্তুতই এজন্য ব্রাইটানের খ্যাতি প্রতিপত্তি জগৎময় ছড়িয়ে পড়েছে। একোয়েরিয়ামের সন্নিকটে প্যালেস পায়ার (Palace Pier) অবস্থিত। আলোকচিত্র বায়স্কোপের অগণ্য রঙ্গালয় আছে। "ডোম" (Dome) বা গম্বুজ ব'লে একটা বাড়ী আছে, সেখানে পূর্ব্বে রাজা চতুর্থ জর্জ্জের অশ্বশালা ছিল। এখন তাহা সাধারণ সম্মিলনের প্রকাণ্ড হল। সেখানে পৃথিবীর নামজাদা গায়ক-গায়িকাদের সম্মিলিত সঙ্গীত হ'য়ে থাকে। আর মাঝে মাঝে রয়েল প্যাভিলিয়ন (Royal Pavilion) বা রাজকীয়

চন্দ্রাতপে ঐক্যতান বাদন বা নানা আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সহরের নাগরিক আকর্ষণের মধ্যে উক্ত রয়্যাল প্যাভিলিয়ান প্রথম স্থান অধিকার করেছে। রাজা চতুর্থ জর্জ্জ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তিনি সাগর-তীরে বাস উপলক্ষে এই বাটী নির্ম্মাণ করে অবস্থান করতেন। আর তাঁহার পর অনেক রাজাই এই বাটীতে বাস করে গেছেন। এই বাটী সংলগ্ন আর একটী বাড়ী আছে; তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদের অশ্বারোহণ শিক্ষার বিদ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রথমে ভারতীয় আহত সৈন্যদের, পরে বিকলাঙ্গ রাজকীয় সৈন্যদের এখানে থাকিতে দেওয়া হইত। দক্ষিণ দিকের তোরণ-দ্বারটী ভারতের কৃতজ্ঞ রাজন্যবর্গ ও আপামর সাধারণ ভারতীয় আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মাণ ক'রে ব্রাইটানকে উপহার দিয়েছেন। আর সেই মহাযুদ্ধে যেসকল হিন্দু ও শিখ সৈন্য ব্রাইটানে দেহরক্ষা করেছেন, তাঁদের শবদাহ স্থানের উপর বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিস ও ব্রাইটানের নাগরিক সভার ব্যয়ে একটী ছত্রি
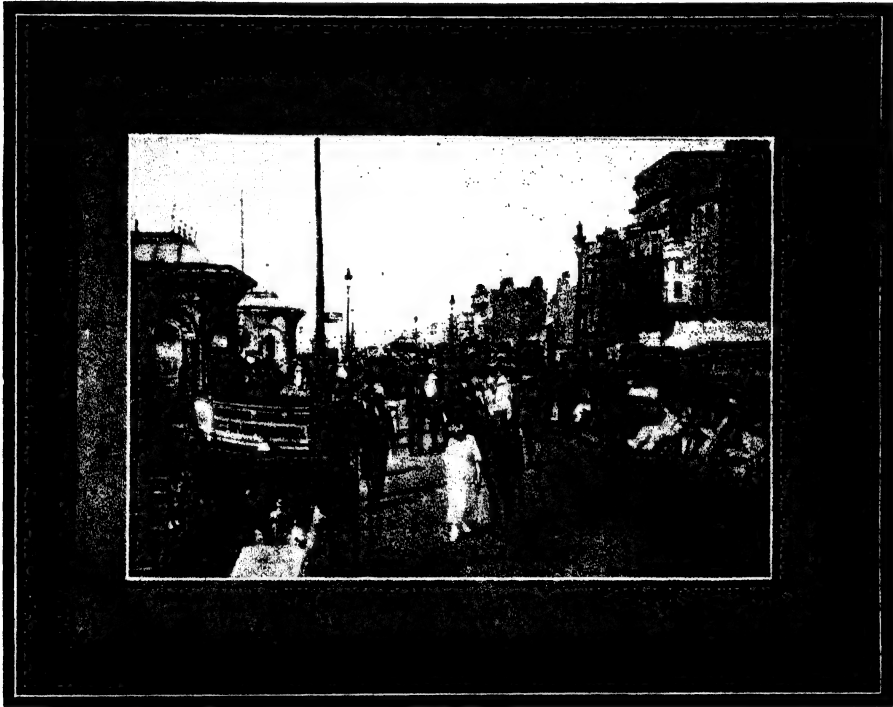
কিংস রোড—পশ্চিম উত্তরণ-মঞ্চের প্রবেশ-পথ

হত; এখন সেখানে স্কেটিং রিঙ্ক (Skating Rink) অবস্থিত। নাগরিক সভা সাধারণের মনোরঞ্জন ও শিক্ষা বিস্তারের অভিপ্রায়ে এই সম্পত্তি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন। রাজারা যে প্রকোষ্ঠগুলি ব্যবহার করতেন, সেগুলি নির্দ্দিষ্ট দিনে যৎকিঞ্চিৎ দর্শনী লইয়া সাধারণকে দেখিতে দেওয়া হয়। সেগুলি দর্শনযোগ্য বটে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই সমগ্র স্থানটী হাসপাতালে পরিণত করা নির্ম্মিত হয়েছে। বিদেশে বিভূমে পরার্থে প্রাণোৎসর্গকারী বীরগণের পবিত্র শ্মশানভূমি ব্রাইটানের তিন মাইল উত্তরে পাচাম (Patcham) হতে দেড় মাইল দূরে ডাউন্সে (Downs) অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত রাজকীয় প্যাভিলিয়নে জনপ্রিয় সাধারণ পাঠাগার, যাদুঘর ও চিত্রশালা স্থাপিত হয়েছে। সেখানে দর্শকদের বিনা দর্শনীতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। পাঠাগারে একলক্ষ সতের হাজার পুস্তক রক্ষিত

আছে। অধিকাংশ পুস্তকই বাড়ীতে লইয়া গিয়া পড়িতে দেওয়া হয়। কেবল কতকগুলি পুস্তক সেখানে বসিয়া পড়িয়া লইতে হয়। পাঠাগার সংলগ্ন সংবাদপত্র, মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা প্রকোষ্ঠ আছে, সেখানে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পত্র ও পত্রিকা সাধারণের পাঠের জন্য সজ্জিত থাকে। যাদুঘরটিও খুব বড় ও সংগৃহীত দ্রব্যও অকিঞ্চিৎকর নহে। উইলেটের (Willett) সংগৃহীত প্রস্তরীভূত গৈরেয় এবং ঐতিহাসিক মৃত্তিকার বাসনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানবজাতির জাতীয় পক্ষী প্রদর্শিত হয়, তাহাও একটী দর্শনীয় স্থান। এরূপ সংগ্রহ পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। রক্ষণাধারে তাহা প্রকৃতির সহিত মানানসই করে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বুথ যাদুঘরে যেতে হলে একোয়েরিয়াম হইতে ট্রাম গাড়ীতে যাওয়া যায়।

ব্রাইটানের হোটেলগুলি জগদ্বিখ্যাত। হোটেল, বোর্ডিং-বাড়ী ও গার্হস্থ্য প্রকোষ্ঠ—সকল রকম আর্থিক অবস্থার লোকের উপযোগী ব্যবস্থা আছে। সুবৃহৎ বিপণী-

রয়্যাল প্যাভিলিয়ন—পূর্ব্ব দিক্
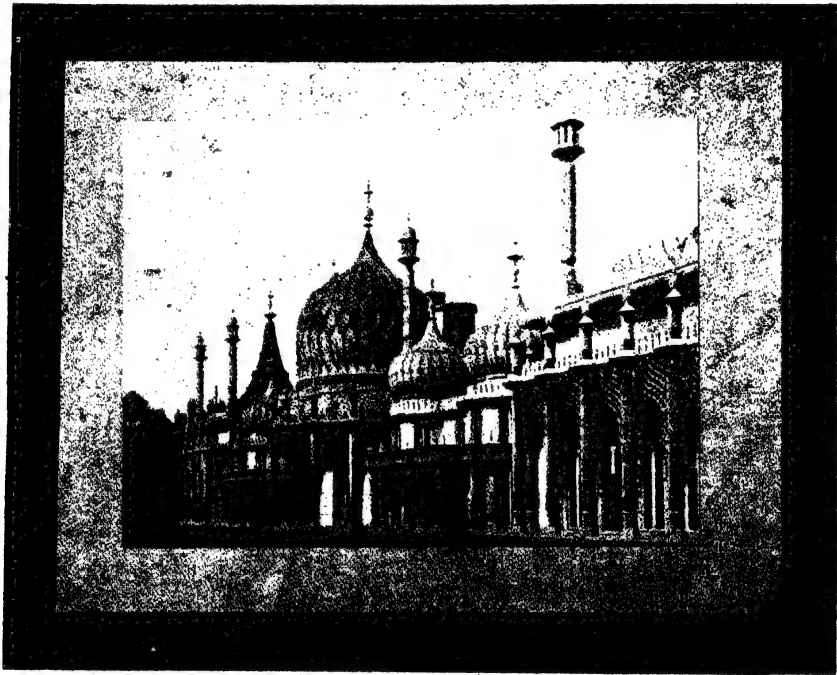
মূল বিভাগ ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক বিজ্ঞানাগার স্মরণাতীত কালের স্মৃতি জাগরিত রাখিয়াছে। প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক প্রদর্শনী-গৃহে মৃগয়ালব্ধ জন্তুর মস্তক শ্রেণীবদ্ধ করে রক্ষিত হয়েছে। আর স্থায়ী চিত্রশালা খ্যাতনামা শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রে কেমন সুন্দরভাবে সুশোভিত। তাহা ছাড়া দেশী বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী তো এখানে লাগিয়াই আছে। বুথ (Booth) যাদুঘর, যেখানে বিলাতের নানা-শ্রেণী বা ক্ষুদ্র পণ্যগৃহগুলি নিত্যাবশ্যক নানা দ্রব্য-সম্ভারে পূর্ণ। দ্রব্য-সমাবেশ এবং মূল্য-নির্দ্ধারণ লণ্ডন বা অপর কোনও সহরের তুলনায় অধিক নহে ; বরং কোন কোন দ্রব্যের মূল্য সুলভ বলিয়াই মনে হয়। রাজকীয় প্যাভিলিয়নের পাঁচ মাইলের মধ্যে ছয়টী অষ্টাদশ-রন্ধ্র বিশিষ্ট গল্‌ফ-খেলার মাঠ (18-hole Golf course) আছে ; আরও নানাবিধ রকম বে-রকমের ক্রীড়াক্ষেত্র আছে। সমুদ্র-স্নান ও নৌবিহারের
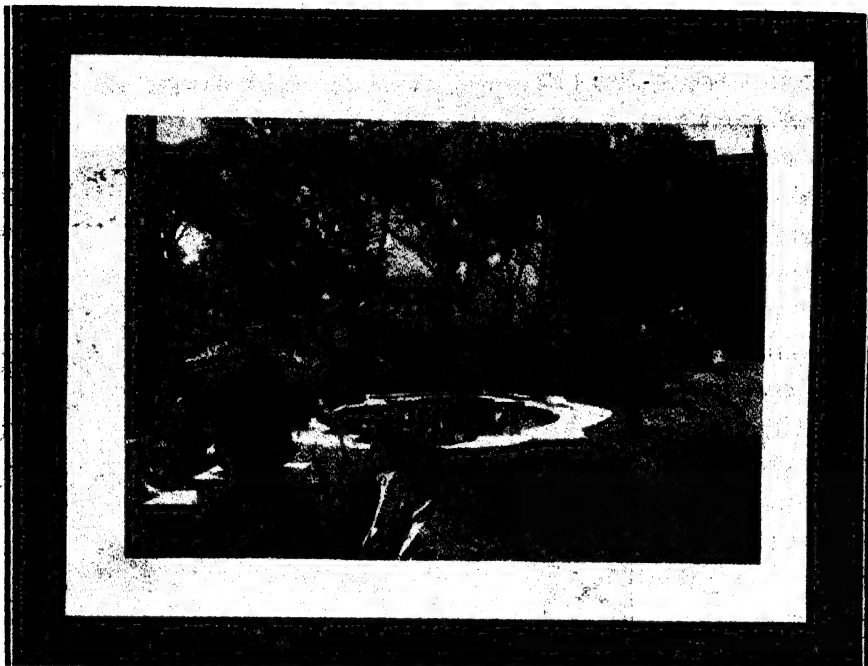
রয়্যাল প্যাভিলিয়ন সংযুক্ত উদ্যান
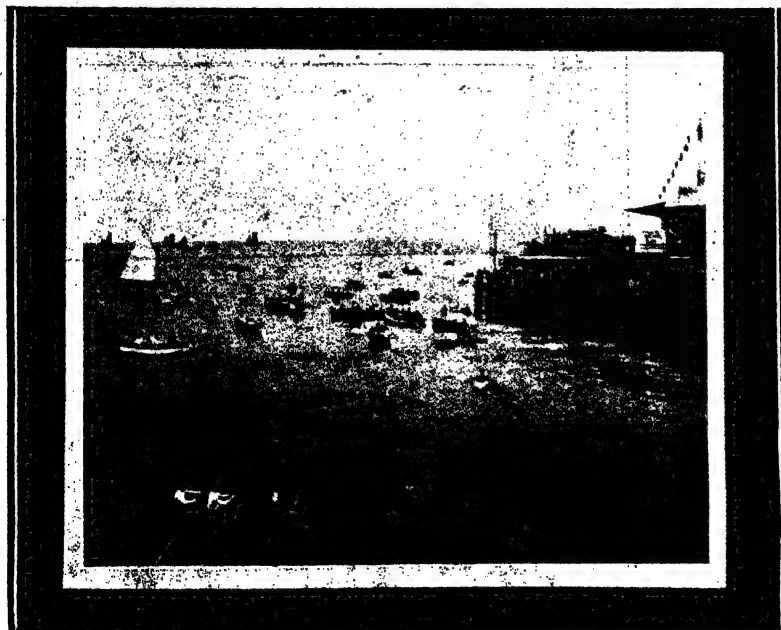
সাগরে নৌ-বিহার

সুন্দর ব্যবস্থা আছে। উভয় উত্তরণ-মঞ্চ হইতেই ষ্টীমার সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত করে; এমন কি ফ্রান্স পর্য্যন্ত যায়। দক্ষিণ রেলওয়ের নিউহেবেন-দিপের (Newhaven Dieppe) পথে য়ুরোপখণ্ডে যাতায়াত কালে ব্রাইটানে উঠিতে বা নামিতে পারা যায়; সেজন্য অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয় না। বাসের পক্ষে ব্রাইটান অত্যুৎকৃষ্ট স্থান। এখানে বড় বড় বিদ্যালয় আছে; আর সাধারণের জন্য অনেকগুলি প্রমোদ-কাননও আছে। সহরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—আর বৃষ্টির লেশমাত্র নাই। যদি বা কখনও বারি-পতন হয়, পতিত হইবামাত্র মৃত্তিকায় শুষিয়া লয়। আর তুষার-পতন এখানে নাই বলিলেই হয়। ট্রেণের বেশ সুবিধা আছে। বিলাতের উত্তর ও পশ্চিম দিকের ট্রেণগুলি বরাবর এখানে আসে। তার উপর ব্রাইটান লণ্ডন মহানগরী হতে এক ঘণ্টার পথ। দিনের বেলা লণ্ডনে কাজ করে এখানে রাত্রি-যাপনের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সহস্র সহস্র ব্যবসায়ী লোক এখানে বাস করে; এবং ডেলি প্যাসেঞ্জার হ'য়ে লণ্ডন বা অন্যান্য সহরে যাতায়াত করে থাকে।" সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থলের মধ্যে এখানকার মত এত বিদেশী বিশ্ববাসী লোক আর কোথাও আসে না। প্রকৃতি ও মানব ব্রাইটানকে সর্ব্বপ্রিয় চিত্ত-বিনোদন স্থান করিবার জন্য যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে! প্রকৃতি দেবীর নন্দনকানন ব্রাইটানের জলবায়ুতে কি এক অপূর্ব্ব মাধুরী মাখান আছে, তাহা উপলব্ধি করা যতটা সহজ, বর্ণনা করা ততটা নহে। স্বাস্থ্যের আকর ব্রাইটান সহরের চতুর্দ্দিকের শ্যামল পল্লীদৃশ্য অতীব নয়নানন্দ-দায়ক—"যেদিকে ফিরাই আঁখি সকলই সুন্দর।"
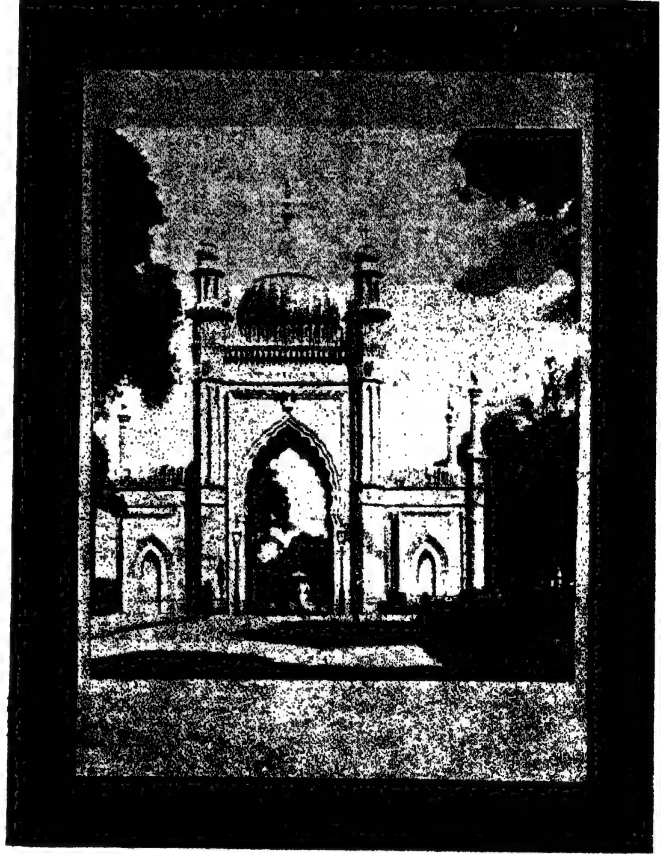
রয়্যাল প্যাভিলিয়ন—উত্তর দিকের প্রবেশ-দ্বার

বিশ্ব-সাহিত্য

টমাস হার্ডি

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

টমাস হার্ডির পিতা চাহিয়াছিলেন যে, ছেলে ধর্ম্মযাজক হইবে; ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিয়া জীবনকে ধন্য করিবে। কিন্তু বালকের মনে কোন্ অজ্ঞাত বয়সেই ঈশ্বরের সুন্দর মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল—বালকও তাহা জানিত না—আমাদেরও তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু তিনি হার্ডিকে দিয়াই তাঁর মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছেন; হার্ডির চরম অবিশ্বাসকে উপেক্ষা করিয়া তিনি হার্ডিকে দিয়াই তাঁহার সৃষ্টিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। যে নির্ম্মম ভাগ্য মানুষকে নিয়ত অন্ধকার হইতে অন্ধকারে লইয়া চলিয়াছে—হার্ডিও সেই নির্ম্মম দেবতার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ হইতে মুক্তি পান নাই। হার্ডি ঈশ্বরকে স্বীকার করিতেন না; কিন্তু তাঁহার জীবনের আরম্ভ হয় ভাঙ্গা মন্দির সংস্কারের কাজে। দিনের পর দিন ধরিয়া এই মন্দির-ভাস্কর ইংলণ্ডের নানা প্রদেশের ভাঙ্গা গির্জ্জা সংস্কার করিয়া বেড়াইয়াছে; মিস্ত্রী যে ভাবে ভাঙ্গা জোড়া দেয়, সে ভাবে নয়: প্রেমিক যে ভাবে প্রিয়তমের আঘাতে চন্দন-প্রলেপ দেয়, সেই একান্ত পবিত্র নিষ্ঠায় এই অবিশ্বাসী ভাস্করটী যাহাকে মানিত না, তাহারই আবাসকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার স্পর্শে ইংলণ্ডের কত জীর্ণ গির্জ্জা অভিনব রূপ ধরিয়াছে। কালির আঁচড়ে তাঁহার মহিমা না রাখিয়া হার্ডি পাথরে তাহা গাঁথিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, মনে হয়, হার্ডি এইখানেই পরাজিত হইয়াছিলেন; তিনিই জানিতেন না—তাঁহারই চরম অবিশ্বাসের অন্তরালে সেই মায়াবী আপনার কাজ করাইয়া লইতেছে।

দীর্ঘ তেরো বৎসর ধরিয়া হার্ডি মন্দির-ভাস্করের কাজ করিয়াছিলেন; এবং ১৮৭০ সালে যখন তিনি তুলি আর বাটালী ত্যাগ করিয়া কলম ধরিলেন, তখনও সেই ভাস্করই রহিয়া গেলেন। এবার আর ইঁট-পাথরের ভাঙ্গা মন্দির নয়—রক্ত-মাংসের ভাঙ্গা মন্দিরের দিকে তাঁহার নজর পড়িল। তিনি দেখিলেন, সুন্দর আকাশের তলায় প্রাচীন পৃথিবীর বুকে অসংখ্য ভাঙ্গা মন্দির ঘুরিয়া ফিরিয়া মরিতেছে; কোন্ অজ্ঞাত হস্তের অমোঘ আঘাত সকলকে জীর্ণ-দীর্ণ করিয়া দিয়াছে। ভাঙ্গা মন্দির মেরামত করিয়া ফিরিয়া যৌবনে হার্ডি ভাঙ্গা মন্দিরকে ভালবাসিয়াছিলেন। তাই জীর্ণ জীবনের কাহিনী তাঁহার মনকে আকুল করিয়া তুলিল। মন্দিরের দেবতাকে ভুলিয়া তাহার জীর্ণ অঙ্গনকেই তিনি ভালবাসিলেন। ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করিয়া ব্যথাহত মানুষকে ভালবাসিলেন। ব্যথাকে ভালবাসিতে গিয়া দেখিলেন যে তাহা অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী, নিয়ত, কাল-পরিব্যাপ্ত।

এই ভাস্করের কাজ তাঁহার সাহিত্য-জীবনেরই অন্তর্ভুক্ত; অথবা ইহাই হার্ডির সাহিত্য-জীবনের নেপথ্য-বিধান। তাঁহার বিরাট উপন্যাসগুলি গড়িয়া তোলার মধ্যে এই ভাস্করটী লুকাইয়া আছে। গল্পের গঠনের মধ্যে, তাহার পরিণতির মধ্যে, নানা চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে রীতিমত একটা নিখুঁত গঠনের সূক্ষ্মতা আছে। তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে অনেকেই ভাস্কর; এবং তাঁহার গল্পের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গেই বহু পুরাতন মন্দিরও যেন সজীব মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে; সেগুলিও বইএর চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ভাস্করের মতই তিনি গল্প গড়িয়া তুলিতেন। রুষ লেখকরা প্রাণের আবেগকে বিশ্বাস করিয়া যেমন ভাবে গল্প গড়িয়া গিয়াছেন—হার্ডি তাহা করেন নাই। উপন্যাস লেখার কতকগুলি মূল সূত্র তিনি মানিতেন; যেমন, গল্পাংশ, কথোপকথন, চরিত্র-সৃষ্টি, প্রকৃতির সমাবেশ। এইগুলিকে একসঙ্গে নিপুণভাবে গাঁথিয়া তোলাই উপন্যাস—ইহাই হার্ডি ভাবিতেন; এবং এই সঙ্গতি-বোধ তাঁহার ভাস্কর-জীবনেরই শিক্ষা।

বস্তুতঃ ডরচেষ্টারসায়ার প্রদেশের জীর্ণ গির্জ্জাগুলি সংস্কার করিতে করিতে তিনি সেই প্রদেশের জীবনের

মর্ম্মস্থলের সাক্ষাৎ পরিচয় পান। এই পরিচয়ই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের মূল ভিত্তি।

হার্ডির সাহিত্য-জীবন যখন আরম্ভ হয়, তখন মেরিডিথের যশ ইংরাজী সাহিত্য-জগতে পূর্ণমাত্রায় দীপ্যমান। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস Desperate Remedies তিনি প্রকাশের আশায় একজন প্রকাশককে দেখিতে দেন। মেরিডিথ ছিলেন সেই গ্রন্থ প্রকাশকের গ্রন্থ বিচারক। তিনি এই বই দেখিয়াই লেখকের গৌরবময় ভবিষ্যতের কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন; এবং এই বোঝার ফলেই সেই প্রবীণ সাহিত্যরথীর সহিত উদীয়মান সাহিত্যিকের চিরকালের জন্য বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। মেরিডিথ জীবনের শেষভাগে ইংরাজী কথা-সাহিত্যের সমস্ত পরিচালন-ভার হার্ডিকে দিয়া গেলেন। আমরা জানি মেরিডিথের ভবিষ্যৎ-বাণী বিফল হয় নাই।

Desperate Remedies এর প্রকাশের পর হার্ডি যেন সাহিত্য-লোকের রহস্য-পথের দিশা খুঁজিয়া পাইলেন। তার পর তিন বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট তিনখানি বই লিখিয়া ফেলিলেন। ১৮৭২, ১৮৭৩, ১৮৭৪ সালে ক্রমান্বয়ে Under the Greenwood Tree, A Pair of Blue Eyes, Far from the Maddening Crowd প্রকাশিত হয়; ইহার চার বছর পরেই তাঁহার সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, The Return of the Native প্রকাশিত হয়। এই সময়টাই হার্ডির সাহিত্য-জীবনের গৌরবময় যুগ। হার্ডি অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইংরাজী সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার ছোটগল্পগুলি বাদ দিলে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। এই সমস্ত বইএর তারিখের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার লেখনী কেমন ধাপের পর ধাপ নিশ্চল ও অলস হইয়া আসিতেছিল। ১৮৭০ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত তিনি সাতখানি উপন্যাস লেখেন। ১৮৮১ হইতে ১৮৯২ পর্য্যন্ত পাঁচখানি। ১৮৯২ হইতে ১৯০২ পর্য্যন্ত মোটে দুইখানি। ১৮৯৭ হইতে তিনি আর কথা-সাহিত্যের জন্য কলম ধরেনই নাই। ১৮৯৭ সালের পর হইতে হার্ডি কথা-সাহিত্য ছাড়িয়া কবিতাকে স্মরণ করেন। ইহার ফলে ইংরাজী সাহিত্যের ক্ষতিই হইয়াছে।

ব্যবহারিক জগতে যেমন অর্থনৈতিক ক্ষতি আছে, সাহিত্য-জগতেও তদনুরূপ ক্ষতি আছে। মিল্টন যখন জীবনের বিশ বৎসর ধরিয়া গদ্য লিখিয়া কাটাইয়াছিলেন, তখন ইংরাজী সাহিত্য-মহলে এই অর্থনৈতিক ক্ষতি ঘটিয়াছিল। টলষ্টয় যখন সাহিত্য-লক্ষ্মীকে নির্ব্বাসন দিয়া তত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন, রুষসাহিত্য সেদিন অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। মাইকেল যতদিন ইংরাজী ভাষায় ইংরাজী কাব্য লিখিয়া বেড়াইয়াছিলেন, ততদিন বাংলা-সাহিত্যকেও সেইরূপ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হার্ডি কথা-সাহিত্য ত্যাগ করিয়া কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যকেও সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। হার্ডির কবিতাগুলি ভাবের দিক দিয়া যতই সুন্দর হউক না কেন, সেগুলি ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের আসরে কোনও দিন প্রথম স্থান পাইবে না—ইহা আমরা সকলেই জানি।

অনেক সমালোচক বলেন যে, হার্ডি বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্যই উপন্যাস লেখা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ উপন্যাস Jude the Obscure কে সমালোচকগণ প্রীতি-সম্ভাষণ জানান নি। এই বইখানির জন্য তাঁহাকে তীব্র আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে।

Jude the Obscure এ Hardy র সাহিত্যিক মনোবৃত্তি যেন ইচ্ছা করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল যে, মানুষের সহজ জীবন ও প্রেমের মধ্যে বিকৃতি ও গ্লানি দেখা যাইবেই—যেন মানব-প্রেমের মধ্যে ইহা ব্যতীত আর কিছুরই থাকার সম্ভাবনা নেই। এই বিষয়টীক ফুটাইয়া তুলিতে তিনি যে পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও একেবারে রস শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। একদিন রুষিয়ার টলষ্টয়ও বর্ত্তমান সভ্যতার উপর, বিশেষতঃ নরনারীর যৌন সম্বন্ধের অস্বাভাবিকতার উপর এই রকম ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তারই ফলে আমরা Kruetzer Sonata পাই। কিন্তু প্রত্যেক রস শাস্ত্রের ছাত্রই জানেন, Kruetzer Sonata ও Jude the Obscure অথবা Tess of the D'urbervills এ কি ভয়ানক তফাৎ। টলষ্টয়ের মন যতই মতবাদে আচ্ছন্ন হউক না কেন, তাঁহার লেখনী কোনও দিন তাঁহাকে রস-বিরুদ্ধ পথে লইয়া যায় নাই; জোর করিয়া ঘটনা সাজাইয়া সাজাইয়া তাঁহাকে তাঁহার মত-প্রতিষ্ঠা করিতে হয় নাই। বিরাট মমতা-বোধ ও একান্ত রসানুরাগ, এমন কি তাঁহার সব চেয়ে মতবাদ-দুষ্ট উপন্যাসকেও বিশ্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও প্রতিষ্ঠা করাইয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু হার্ডি রসকে ভুলিয়া মতকে গ্রহণ করিলেন, এবং সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে মতকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই

তিনি ঘটনা সাজাইয়া চলিলেন; এবং সেই ঘটনা-সমাবেশের একমাত্র লক্ষ্য হইল আপনার মতকে কোনও রকমে স্ব-প্রতিষ্ঠ দেখা। তাই ঘটনাগুলি, খণ্ডভাবে যতই মধুর ও করুণ হউক না কেন, তাহার সমগ্র মূর্ত্তি একটা শুষ্ক মস্তিষ্ক-চালনার রূপ পরিগ্রহণ করিয়া রস পরিবেশন করিতে ভুলিয়া গেল। Tess of the D'urbervillesএর মুখপত্রে যেদিন তিনি বইএর নামের তলায়, "A Pure Woman Faithfully presented" কথাটী লেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন, সেইদিনই মনে হয় রস-স্রষ্টা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহা না হইলে তিনি Tessকে ফাঁসীকাষ্ঠে চড়াইতেন না। নায়িকাকে ফাঁসীকাষ্ঠে চড়ান কোনও অপরাধ নয়; Shakespeare কার্ডিলিয়াকেও ফাঁসী দিয়াছেন। কিন্তু এ যেন আপনার মতকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই নায়িকাকে ফাঁসী দেওয়া। নায়ক নায়িকারা সকলেই লেখকের আপনার সৃষ্টি। তাই বলিয়া যদি লেখক আপনার খেয়াল বা মতকে বজায় রাখিবার জন্যই তাহাদের উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই বিধান করেন, তাহা হইলে কোনও ব্যবহারিক আইন অবশ্য লেখকদের কোনও কিছু বলিতে পারে না; কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম কোনও দিন তাঁহাদের ক্ষমা করিবে না—টেস্‌কে ফাঁসী দেওয়ার অপরাধের শাস্তি হার্ডিকে ভোগ করিতেই হইবে।

Jude the Obscure এ হার্ডি যে নিদারুণ দুঃখবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে লেখকের এতখানি হাত যে, দুঃখ রসমূর্ত্তি গ্রহণ না করিয়া দুঃখের কাষ্ঠ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। দুঃখের যে রস-মূর্ত্তি হার্ডির প্রথম রচনাগুলিকে বরণীয় ও এক পবিত্র সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছিল, এখানে আসিয়া তাহা শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। এখানে ঘটনা প্রাকৃতিক ভাবে চলিতেছে না; সমস্ত ঘটনাগুলির অন্তরালে বসিয়া লেখক পুতুল-নাচের মত ঘটনাগুলিকে টানিতেছেন এবং এই অন্তরালটুকুও এখানে একেবারে বে-আবরু। কার্য্য ও কারণের সমাবেশের নিয়ম এখানে লেখকের হাতে; তাই রোমাঞ্চকারী গল্পের মত ঘটনাগুলি আপনাদের স্বাভাবিকত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু হার্ডি স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন যে, Jude the Obscure তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। টলষ্টয়ও একদিন বলিয়াছিলেন যে, Anne Kereninaর মত নিকৃষ্ট উপন্যাস লেখার দরুণ তিনি অনুতপ্ত। তবে আমরা জানি, বড় লেখকদের আপনাদের সৃষ্টি সম্বন্ধে মতামতকে ভবিষ্যৎ জগৎ খুব বেশী শ্রদ্ধা করে না। হার্ডি উপন্যাস লেখা বন্ধ করায়, বিখ্যাত সমালোচক William Lyon Phelps বলিয়াছিলেন, "It is a matter of sincere regret that Mr. Hardy has stopped novel writing, but we want no more Judes."

এক শ্রেণীর বই আছে, যাহার নাম মানুষ মাত্রেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে; কিন্তু আসলে খুব কম লোকেই তাহাদের আদ্যোপান্ত পড়ে। Karl Marxএর Dos Kapitalএর নাম আমরা কে না জানি? কত লেখায়, কত ভাবে Dos Kapitalএর নাম উচ্চারিত হয়; কিন্তু Dos Kapitalএর পাঠকের সংখ্যা বোধ হয় গোটা দেশে হাতে গোণা যায়। জগতে অনেক বড় বড় বই আছে, যাহাদের সৌভাগ্য Dos Kapitalএর অপেক্ষা কোনও অংশে বেশী নয়। মনে হয়, হার্ডির সুবৃহৎ দৃশ্যকাব্য The Dynastও সেই পর্য্যায়ভুক্ত। The Dynastএর চেয়ে আয়তনে বড় নাটক জগতে নাই—কাব্যও খুব কম আছে। এই সুবৃহৎ নাটকের রঙ্গভূমি সমস্ত পৃথিবী; এবং ইহার নায়করা নেপোলিয়ান প্রমুখ বিশ্ব-বিজেতাগণ। প্রাচীন গ্রীক্‌ পদ্ধতি অনুসারে এই নাটকের রচনা। এই সমস্ত বিশ্ব-বিজয়ী বীরগণের রণ-বাদ্যবিপুল জীবনও নির্ম্মম নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র। জলবুদ্বুদের মধ্যে তাহারা শুধু আয়তনে বৃহত্তর—সাধারণ মানবের সহিত এই মাত্র ভেদ। সবার উপরে অমোঘ দণ্ড লইয়া রহিয়াছে এক অন্ধ মহাশক্তি—অসীম ব্যঙ্গভরে সে শুধু দেখিতেছে, পৃথিবীর মাটীর খেলাঘরে অসংখ্য মানব-শিশু শুধু দু'দণ্ডের তরে কোলাহল করিয়া অনন্ত শূন্যে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে। The Dynastএর কালের অধিষ্ঠাত্রী মানব-জীবন সম্বন্ধে বলিতেছেন, "The purpose of existence is neither good nor bad, but simply to exist"—মানব জীবনের ভাল কিম্বা মন্দ কোনও লক্ষ্য নেই—আছে এই মাত্র তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই উক্তি আর একজন দুঃখবাদী তাপসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বস্তুতঃ Schopenheaurএর দুঃখবাদের সঙ্গে হার্ডির দুঃখবাদের যথেষ্ট মিল আছে। মানব-জীবন সম্বন্ধে এই জার্ম্মাণ দার্শনিক বলিয়া গিয়াছিলেন, আরও রূঢ় ভাবে—"Our life is the penalty for the crime

of our birth"—"আমাদের জীবন তো শুধু জন্ম-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত।"

হার্ডি'র লেখার প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপী স্থান অধিকার করিয়া আছে। হার্ডি'র প্রকৃতি কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতির রূপ নয়। ইংরাজ-কবি প্রকৃতিকে মানুষের বেদনার রসে ভরপুর দেখিয়াছিলেন—মানুষের আত্মার আত্মীয়রূপে। কিন্তু হার্ডি'র প্রকৃতি নিষ্করুণ, মানবের সুখে-দুঃখে উদাসীন। কিন্তু তবুও হার্ডি এই প্রকৃতিকে ভালবাসিয়াছিলেন। যে ভালবাসার অভাবে হার্ডি ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সেই ভালবাসায় তিনি প্রকৃতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। হার্ডি'র উপন্যাসে প্রকৃতি শুধু বর্ণনার উপাদান নয়-সে সজীব চরিত্র। তাহার ছায়ায় নায়ক-নায়িকাদের মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিতেছে। The Return of the Native-এ Egdon Heath জীবন্ত হইয়া গল্পকে চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে। The Woodlanders পড়িয়া একজন বলিয়াছিলেন, "To me a tree has become a different thing since I first read this particular novel." প্রকৃতির সহিত এই নিগূঢ় আত্মীয়তার ফলে হার্ডি Wessex নামে এমন এক নূতন ভৌগোলিক দেশ সৃষ্টি করিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে মনে হয়, বুঝি সত্যই উহা ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কোনও প্রদেশ; কিন্তু আসলে হার্ডি'র Wessex ভূগোলের বহির্ভূত।

হার্ডির নারী-চরিত্রগুলি বড় কমনীয় এবং বড়ই দুর্ব্বল-চিত্ত—পুরুষের পরুষ পীড়নে তাহারা সকলেই জর্জ্জরিত! এই প্রসঙ্গে একটী গল্প আছে। হার্ডির নায়িকাদের এই অসহায় মূর্ত্তি দেখিয়া কোনও এক নারী হার্ডির এক বইএর এক ধারে লিখিয়া রাখে—How I hate Hardy! ভাগ্যক্রমে সেই বইখানি হার্ডির দৃষ্টিগোচর হয়! অতি বাল্যকালে এক বিচিত্র উপায়ে হার্ডি নারী-চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। ডরচেষ্টারের তরুণী মেয়েরা তাহাদের প্রেম-লীলায় এই বালকটীকে দৌত্যে পাঠাইত। কিশোর বয়সে যখন সবে মাত্র হার্ডি লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন, তখন তিনি সেই গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েদের প্রেম-পত্র লিখিয়া দিতেন। তাহারা যাহা বলিয়া যাইত, বালক অবিকল তাহা লিখিত। এই বিচিত্র উপায়ে হার্ডি অতি অল্প বয়স হইতেই নারী-চরিত্রের রহস্যময় দিকের সহিত পরিচিত হন।

হার্ডির দুঃখবাদ সাহিত্যে তাঁহার চরম দান। এক বিরাট অন্ধকার অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া তাঁহার সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। হার্ডির উপন্যাসগুলি পড়িয়া মনে হয়, যেন এতক্ষণ ধরিয়া কি এক ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলাম; সহসা জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সেই পুরাতন পরমাত্মীয় পৃথিবী সহসা যেন অকরুণ হইয়া উঠিয়াছে; শ্যামল তৃণগুচ্ছ যেন ব্যর্থ বিদ্রোহের বাণীর মত পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছে; সূর্য্যালোক যেন মৃত্যুমাখা। এই দুঃখবাদের মূলে কোনও ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের ভিত্তি নাই। ইহার মূল তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্রে ও মনোভাবে। প্রকৃতি, মানুষ ও পশুপক্ষীকে তিনি আপনার প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভাবিতেন। কত নিশীথ রাত্রে ডরচেষ্টারের কত পথহারা কুকুর-শাবক জানে যে, সেখানে সেই গভীর রাত্রেও একজন আছে যে তাহাদের সামান্য ক্রন্দনে জাগিয়া উঠিয়া তাহাদের বুকে করিয়া লইয়া যাইবে। হার্ডির এই জীব-প্রীতির কথা তাঁহারই সমসাময়িক ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হার্ডি মানুষের সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিলেন, কি ভীষণ দুঃখে আর দৈন্যে তাহার জীবন পরিপূর্ণ। আর এই দুঃখ শাশ্বত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; বারে বারে কিসের আশায় মানুষ আকাশের দিকে হাত তুলিয়াছে—বজ্রনিনাদে তাহার প্রার্থনারই প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে। হার্ডি কখনই ভাবিতে পারিতেন না যে, এই নিত্য বেদনার সহস্র বীভৎসতার উপরে এক অনন্ত পুরুষ বসিয়া আছেন—আবার তিনি না কি করুণাময়! বেদনার এই চিরন্তন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনা করিতে অপমান বোধ করিতেন—যদি সে ঈশ্বর থাকে, তবে সে মানবের ঊর্দ্ধে নয়, মানবই তাহার ঊর্দ্ধে।

এক অন্ধ নিয়তি মানুষকে জীবনের অন্ধকার হইতে মৃত্যুর অন্ধকারে লইয়া চলিয়াছে। যূপবদ্ধ পশুর মত মানুষ অপেক্ষায় রহিয়াছে—কখন্ কোথা হইতে কিসের আঘাতে এই ক্ষণিকের জীবনোৎসব শেষ হইয়া যাইবে। যে শক্তি মানুষকে এমনি লইয়া চলিয়াছে, তাহাও আবার অন্ধ, বিবেকহীন, মানুষের সুখদুঃখে উদাসীন। সৃষ্টির কোনও উদ্দেশ্য নাই—শুধু আছে এই মাত্র—কিছুকাল পরে থাকিবে না এই মাত্র।

হার্ডির যদি কোনও ভগবান্ থাকে, তবে সে শিশুর মতন খেলাঘরে বসিয়া অসীম উদাসীন খেয়ালে অর্থশূন্যভাবে ভাঙ্গিতেছে আর গড়িতেছে—তাহার ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মানব-জীবন ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

মনে হয়, হার্ডি বিশ্ব-জননীর কাল-ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন—পদতলে লাঞ্ছিত শিব। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, বিশ্ব-জননীর অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি—ভিখারী দেবতা—তবুও সে শিব।

পুস্তক-পরিচয়

অনাগত—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত। মূল্য দেড়টাকা। প্রফুল্লবাবু 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অন্যতম সম্পাদকরূপে সাহিত্য-ক্ষেত্র সুপরিচিত। কিন্তু উপন্যাস রচনায় তিনি নূতন ব্রতী। লেখা পাকা হাতের; সর্ব্বত্র সরস, সুপাঠ্য ও স্বচ্ছন্দগতি, কোথাও তাল-ভঙ্গ হয় নাই। বর্ত্তমান কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার অনেকগুলি এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বিপ্লববাদীদের প্রচেষ্টা, রাজদ্রোহীদের মধ্যে কাহারও কাহারও পুলিশের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র ও নিজের দলের লোককে ধরাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা, নারী নির্য্যাতন, গোঁড়া সমাজের হৃদয়হীন ব্যবহার, শ্রমিকদিগের জীবিকা-সমস্যা প্রভৃতি আধুনিক বঙ্গের যে সকল মর্ম্মকথা—জ্বলন্ত প্রশ্ন তাহা গ্রন্থকার পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। যাঁহারা সজাগ আছেন ও চক্ষু খুলিয়া সমাজের অবস্থা দেখিতেছেন, তাঁহারা বঙ্গ-গৃহের এই নিত্য অভিনয়ের দৃশ্যপট এড়াইবেন কিরূপে? তরুণদের আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য পুস্তকখানির প্রতি পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক-জোড়া নায়ক ও এক-জোড়া নায়িকা এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে পর পর দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়া দুর্গম পথে অতি সন্তর্পণে তাঁহাদের প্রেমের উদ্গম ও বিকাশ দেখাইবার সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। প্রতিমা ও মোহিতের প্রেমে মীন-কেতনের চিন্ময় আধ্যাত্মিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। চির বিদায়ের প্রাক্কালে তাঁহাদের পরস্পরের গণ্ডে যে পবিত্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই স্মৃতি সম্বল লইয়া তাঁহারা জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। ইঁহাদের চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপাদানে নির্ম্মিত; একজন ভীরু, লাঞ্ছনম্রা; অপর, প্রকৃতির দুর্দ্দান্ত শিশু, অগ্নিগর্ভ, তেজস্বী ও নির্ভীক। এই দুই বিরুদ্ধ গুণ কি করিয়া প্রেমের পথে পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়াছে, সে রহস্য প্রেমের দেবতাই ভেদ করিতে পারেন। কিশোর ও অনিন্দিতার চরিত্রের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য ছিল,—উভয়েই তেজস্বী, আত্মনির্ভরশীল ও ভাবোন্মাদ। এই চারিটি চরিত্রের প্রেমের পথ ক্ষণতরে আঁধার করিয়া দুইটি উপচ্ছায়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা কষ্টি পাথরের মত খাঁটি সোনা পরীক্ষা করিয়া প্রেমের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছিল মাত্র। অনিন্দিতা ও কিশোরের জীবন প্রতিহিংসায় কণ্টকিত হওয়া সত্ত্বেও প্রজাপতির আশীস্ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন নাই।

পুস্তকখানি আমরা একাসনে বসিয়া দুই ঘণ্টায় শেষ করিয়াছি। আখ্যানবস্তুর আকর্ষণী শক্তি না থাকিলে ইহা সম্ভবপর হইত না। গ্রন্থকার যে উপন্যাসরচনায় নূতন পথিক, তাহা প্রথম কয়েকটী অধ্যায়েই বেশ বুঝা যায়। প্রথম কয়েকটী পৃষ্ঠা পড়িয়া মনে হইয়াছিল, কোন প্রবন্ধ পড়িতেছি। উপন্যাস পড়িতেছি, কিম্বা 'আনন্দবাজারের' কোন সুলিখিত প্রবন্ধ পড়িতেছি, পুস্তক আরম্ভ করিয়া আমাদের সেই বিভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ লেখকের ঘটনা-বিবৃতির শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া শেষ কয়েক অধ্যায়ে আখ্যানবস্তু নিবিড় ভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে; এবং গ্রন্থকার যে উপন্যাসক্ষেত্রে বিশেষরূপ কৃতিত্ব লাভ করিবেন, তাহার ভরসা প্রদান করিয়াছেন। একটী সামান্য কথার উল্লেখ করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। গ্রন্থকার একাধিকবার শ্যামবর্ণা প্রতিমার কর্ণমূল লজ্জায় রাঙা করিয়া দিয়াছেন। ইহা বিলাতী রচনার অনুসরণ জনিত ভ্রম, না, তিনি 'শ্যাম'বর্ণ কালিদাসের "তন্বীশ্যামা শেখরদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী" অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

কজ্জলী—পরশুরাম রচিত ও যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত। মূল্য দেড়টাকা। আমরা কোন পুস্তকের সমালোচনা করি না—পুস্তক-পরিচয় দিই; কিন্তু এই 'কজ্জলী'র পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। 'পরশুরাম রচিত,' আর 'যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত'—ইহার অধিক পরিচয় যে কি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। পরশুরামের প্রথম আবির্ভাব যেদিন আমাদের এই 'ভারতবর্ষ'ই হয়, সেইদিনই বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট অংশে তাঁহাকে যে আসন প্রদান করা হইয়াছিল, তিনি সেই উচ্চ আসনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে তাঁহার আসল মূর্ত্তি সকলের জানা হইয়া গেলেও, তিনি তাঁর ছদ্মনাম ত্যাগ করিতে চাহেন না; এই নামেই 'গড্ডালিকা' প্রকাশিত হইয়াছে, এই নামেই 'কজ্জলী' প্রকাশিত হইল। 'গড্ডালিকা' যেমন হইয়াছিল, 'কজ্জলী'ও তেমনই হইয়াছে—এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ। 'বিরিঞ্চিবাবা' আর 'কচিসংসদ' বাঙ্গালা ব্যঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়; কচি-সংসদের সভ্যদিগের প্রত্যেককে আমরা চিনিতে পারি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরশুরাম কোন দিন কচিদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন নাই; অথচ তিনি তাহাদের নাড়ীনক্ষত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে সত্যসত্যই অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ছোট গল্প ও উপন্যাসে ভণ্ড সাধুদের অনেক চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু ঐ যে বিরিঞ্চিবাবা, তিনি একেবারে মনের মধ্যে দাগ কাটিয়া রাখিয়াছেন। শতমুখে বলিলেও কজ্জলীর প্রশংসা শেষ করা যায় না। তার পর সোনায় সোহাগা শ্রীমান্ যতীন্দ্রকুমারের ছবিগুলি। ছবিতেই লেখার বাহার বাড়িয়াছে, না লেখাতেই ছবির বাহার বাড়িয়াছে, সে কথা বলা কাহারও পক্ষে সম্ভব কি না বলিতে পারি না। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যেমন পরশুরাম, তেমনই যতীন্দ্রকুমার। প্রশংসা ভাগ করিয়া দিতে গেলে দশ-আনা ছয়-আনা করিবার যো নাই—একেবারে সমান সমান।

নীহারিকা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত, মূল্য এক টাকা। বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান কাব্য-জগতে বাগচী-কবির স্থান কোথায়, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। যাঁহার 'লেখা' 'রেখা' 'নাগকেশর' বাঙ্গালার অতুল সম্পদ; যাঁহার 'নাগকেশর' পড়িয়া বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "তোমার নিপুণ ছন্দের পায়ে পায়ে অনায়াস নৃত্য-লীলার নূপুর বাজিতেছে, আবার, তাহার হাতে ও মাথায় কানায়-কানায়-ভরা বিচিত্র রসের থালি" এই নীহারিকা সেই যতীন্দ্রমোহনেরই কাব্য-কুঞ্জের পারিজাত। ইহার প্রথম কবিতা 'নীহারিকা' হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ কবিতা 'বিদায়ে' পর্য্যন্ত পড়িয়া মনে হইল, কবি যতীন্দ্রমোহনের জীবনের উপর দিয়া সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশায় কি অভিনয়ই হইয়া গিয়াছে; আর তাহারই অভিব্যক্তি এই নীহারিকা। অন্ধকারকে উজ্জ্বল করিয়া আকুল হৃদয় কবি বলিতেছেন—

"ওগো-মাতা, ওগো-অন্ধকার!
আলোকের অন্ধ শিশু—অক্ষমের লহ নমস্কার;
কি ভাবে তোমারে ডাকি, শ্যাম শ্যামা তাই গড়ি' মনে
তোমার অরূপ রূপ বাঁধিবারে সীমার বন্ধনে
চাহি প্রাণপণে!
অতুল সে কালোরূপে, ছায়া-চ্ছবি তব প্রতিমার,
নমি বারম্বার, অয়ি অন্ধকার!"

অন্ধকারের এমন প্রাণস্পর্শী বর্ণনা বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে বড়ই দুর্লভ। কন্যাবিয়োগে কাতর কবি বলিতেছেন—

"হেন কাম্য কি সে তবে—বাঞ্ছনীয় সবাকার চেয়ে?
সে আমার—সে আমার—সে আমার ছিল ছোট মেয়ে!
বিধাতারও চেয়ে সত্য সে আমার ঐটুকু ইলা—
আত্মার আত্মীয়তম—অন্তরের গূঢ় অন্তঃশিলা।"

প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে পিতার এই যে আর্ত্তনাদ, ইহা বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। আর একটীমাত্র কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিব। 'বিদায়' কবিতার শেষের দিকে কবি বলিতেছেন—

"ঐখানে ঐ সুদূর পারের নূতন পথের শেষে
মোর তরে কি বাজছে সাঁঝের শাঁক!
এবার—সে ত দেখাই গেল'—যাব যে ঐ পারে—
যেখানে ঐ নীল মোহানার বাঁক।"

কবি যতীন্দ্রমোহনের এই 'নীহারিকা'র প্রত্যেক কবিতাই এমনই সুন্দর। এমনই পবিত্রতা মাখা।

আলোর আঁধার—শ্রীপঞ্চানন মজুমদার প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। যখন আমাদের দেশে স্বদেশীর বান প্রবল হইয়াছিল, সেই সময়ের ঘটনা লইয়া যে সকল উপন্যাস রচিত হইয়াছে, এখানি তাহাদের অন্যতম। গ্রন্থকার মজুমদার মহাশয়ের লিপিকৌশলে ঘটনাগুলি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। বিনয়, সদানন্দ, ইন্দুমতী, বীণা প্রভৃতির চিত্র মনোরম হইয়াছে। লেখকের বর্ণনায় পুস্তকখানি সত্যসত্যই সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহাতে কোন প্রকার বাহুল্য বর্ণনা নাই।

চুম্বক ও চুম্বকশক্তি—শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত; মূল্য একটাকা। ইংরাজীতে যাহাকে Magnets and Magnetism বলে তাহারই বাঙ্গালা নাম চুম্বক ও চুম্বকশক্তি। আমাদের কলেজসমূহে মধ্যপরীক্ষায় চুম্বকসম্বন্ধে অধ্যাপনা হয় অবশ্য ইংরাজী ভাষার সাহায্যে; ভূপেন্দ্রবাবু এই পুস্তকে সেই সকল কথাই সরল বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি এই ভাবে দেশীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হওয়ার যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; তাই আমরা ভূপেন্দ্র বাবুর এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

কৃষ্ণকান্তের উইলের আলোচনা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত; মূল্য আট আনা। সুধী অধ্যাপক ললিতবাবু 'ভারতবর্ষে' বিধবা-সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রে অন্যান্য উপন্যাসের আলোচনার সহিত কৃষ্ণকান্তের উইলের কথাও বলিয়াছিলেন; সেইগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি ছাপিয়াছেন। কৃষ্ণকান্তের উইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইয়াছে। এ সময়ে শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রসিদ্ধ সমালোচক ললিত বাবুর এই প্রবন্ধগুলি হইতে বিশেষ সাহায্যলাভ করিতে পারিবেন; কারণ কৃষ্ণকান্তের উইলের বিভিন্ন চরিত্রের এমন বিশ্লেষণ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন—অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। বেদান্ত সম্বন্ধে এমন সুলিখিত, সুসম্বদ্ধ পুস্তক অতি কমই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ যে ভাবে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, আধুনিকগণ তাহার মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না; তাঁহাদের জন্য যে ভাবে, যে প্রকার আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন, অধ্যাপক চৌধুরী মহাশয় তাহাই করিয়াছেন এবং বিভিন্নদেশের অধ্যাত্মবাদীদিগের মতবাদেরও সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার একটী বিষয় বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সাধনা বাদ দিয়া কেবল তত্ত্বালোচনায় বিশেষ কোন ফল হয় না। বৈদেশিক আচার্য্যগণ শুধু তত্ত্বালোচনাই করেন, হিন্দু আচার্য্যগণ সাধনার দ্বারা তত্ত্বকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। পুস্তকখানি সুবৃহৎ হইলেও পিপাসুর পক্ষে অমূল্য সম্পদ।

শৈলজার কথা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত; মূল্য এক টাকা। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রভাস' কাব্য সর্ব্বজনপরিচিত। প্রভাসে যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, মহাভারতের পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র তাঁহার এই কাব্যে একটী অতুলনীয় নূতন চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন এবং আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এই নূতন মহনীয় চরিত্রের সমাবেশে নবীনচন্দ্রের প্রভাস সর্ব্বাংশে উজ্জ্বল হইয়াছে। সে চরিত্র শৈলজা। শৈলজা মহাভারতে নাই—কবির মানস-সৃষ্টি। লেখক মহেন্দ্রবাবু নবীনচন্দ্রের সেই শৈলজার চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন; সুন্দর ভাষায় কবির এই মানস-সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। এই শৈলজার কথা পড়িয়া আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি।

গৃহাগ্নি বা বধূদাহ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এখানিকে উপন্যাস না বলিয়া চিত্র বলিলেই ঠিক হয়। বধূ নির্য্যাতন উপলক্ষ করিয়া আমাদের সমাজের অনেক কথাই গ্রন্থকার এই পুস্তকে লিখিয়াছেন। তিনি ভাবুক, স্বদেশপ্রেমিক ও ধর্ম্মপিপাসু; সুতরাং তাঁহার কথাগুলি যে হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহাতে সন্দেহ না। উপন্যাসের আবরণও বেশ হইয়াছে। গ্রন্থকারের মহৎ উদ্দেশ্যের সফলতা কামনা করি।

বেদান্ত দর্শন, দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত—মহন্ত শ্রীসন্তদাস ব্রজবিদেহী প্রণীত; মূল্য ৩॥০ টাকা। বেদান্ত দর্শন অপেক্ষা তাহার বিভিন্ন ভাষ্যজালই এক্ষণে শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়, সাধারণ পাঠকের ত কথাই নাই। এ অবস্থায় যাঁহারা সমস্ত তর্কের নিরসন করিয়া নানা ভাষ্যের জাল ছিন্ন করিয়া বেদান্তের কথা বর্ণনা করেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য। মহন্ত সন্তদাস মহোদয়কে আমরা তাঁহার গৃহস্থাশ্রম হইতেই জানি। তিনি ইংরাজী সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত; তাহার পর গুরু কৃপালাভ করিয়া এখন সন্ন্যাসী মহন্ত। তিনি পুস্তকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সাধারণের অধিগম্য না হইলেও যাঁহারা বেদান্ত দর্শন পাঠে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে। 'ব্রহ্মসূত্রে'র ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব সরল করিবার চেষ্টা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রী—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা চারি আনা। শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ বাবু কথা-সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত; তাঁহার অনেক ছোট গল্প আমরা পড়িয়াছি এবং বিশেষ ভাবে উপভোগও করিয়াছি। তাঁহার এই 'স্ত্রী' পুস্তকে তাঁহার সুলিখিত পাঁচটী গল্প ছাপা হইয়াছে। প্রথম গল্পটীর নামেই পুস্তকখানির নামকরণ হইয়াছে। এই পাঁচটীর কোনটীই তুচ্ছ করিবার মত নহে, সবগুলিই লেখকের লিপি-কৌশলে উজ্জ্বল; রচনায় অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস নাই, অকারণ ভঙ্গিমা নাই, বেশ সরল অথচ সুন্দর।

জন্ম-শাসন—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত; মূল্য—এক টাকা বারো আনা।

পাশ্চাত্য ভাষায় এ সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক থাকিলেও বাঙ্গলা ভাষায় 'জন্ম-শাসন'কে প্রথম পুস্তক বলা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কয়েকখানি বাঙ্গলা পুস্তকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জন্ম-শাসন সম্বন্ধে অল্পাধিক আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু কোনটাতে এরূপ বিশদ আলোচনা দেখা যায় নাই। জাতির কল্যাণের জন্য শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে জন্ম-শাসন প্রথার অনুসৃতি যে অত্যাবশ্যক, তাহা লেখক এই পুস্তকে বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। জন্ম-শাসক প্রক্রিয়া সমূহ এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই দোষগুণ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। জন্ম-শাসনের বিপক্ষে যে মতবাদ প্রচলিত আছে, পুস্তকে সে সম্বন্ধে বিশেষরূপ বিচার করিতেও লেখক ক্রটী করেন নাই।

ইনফ্যাণ্টাইল লিভার—ডাক্তার শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি প্রণীত। মূল্য দুই টাকা।

এদেশে শিশুমৃত্যুর হার পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক। যকৃতের রোগেই বহু শিশুর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সন্তোষবাবু শিশু যকৃত সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার "Infantile Cirrhasis of the Liver" নামক ইংরাজী পুস্তক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই পুস্তকখানির এই অনুবাদ সন্তোষবাবু নিজেই করিয়াছেন। শিশু-যকৃত রোগ সম্বন্ধে সকল বিষয়ই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অল্পশিক্ষিত চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং সাধারণ গৃহস্থেরাও ইহা পাঠে সকল বিষয় সহজেই বুঝিতে পারিবেন। পুস্তকখানির অধিক প্রচারে দেশের যে মঙ্গল হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নারী-মঙ্গল—শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ প্রণীত; মূল্য বার আনা। পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার যে এতদিন পরে তাঁর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত কবিতারাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, ইহাতেই আমরা সন্তুষ্ট; আর অতি পুরাতন কয়েকটী লেখা দিয়া এই 'নারী-মঙ্গল' ছাপাইয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। কিন্তু তিনি যেগুলিকে 'অতি পুরানো' বলিয়া যেন একটু তুচ্ছ করিয়াছেন, আমরা তাহাই দেব-নির্ম্মাল্যের মত মাথায় করিয়া লইয়াছি—এমনই পবিত্র তাহাদের সুবাস।

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ প্রণীত, মূল্য ১।০ টাকা। এই পুস্তকখানিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ত্রিপুরা রাজ্য, মেহেরকুল ও পাটিকারা রাজ্যের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও শেষ হয় নাই, এখানি প্রথম খণ্ড। ত্রিপুরার 'রাজমালা' প্রকাণ্ড ইতিহাস; শীতলবাবু সেই ইতিহাসের কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই পুস্তকে দিয়াছেন; দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক রহস্য প্রকাশিত হইবে। এই প্রথম খণ্ডে তিনি যে ভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই শুধু প্রশংসা নহে অনুমোদন করিবেন। এই পুস্তকখানির যে আদর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাহারা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত বাবু এই পুস্তকখানির নাম দিয়াছেন 'সাহারা'। ইহাতে তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখ, আধি-ব্যাধির যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে 'সাহারা' নামটির সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু, তাঁহার যাহা মূল বক্তব্য তাহার সহিত সাহারার কোন সম্বন্ধই নাই। সেদিক দিয়া বলিতে গেলে এই পুস্তকখানির নাম 'ভোজন বিলাস' বলিলেই ঠিক হইত। তিনি তাঁহার বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রৌঢ়ত্বের সীমা পর্য্যন্ত কখন কি খাইয়াছেন, তাহার সুদীর্ঘ বিবরণ এই পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; রসগোল্লা সন্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব স্থানে স্থানে প্রকট করিয়াছেন, তাহা মিষ্টান্নের ন্যায়ই উপভোগ্য। তিনি কিন্তু একটী ক্রটী রাখিয়াছেন;

নানাবিধ খাদ্যের বিবরণের সঙ্গে যদি তাঁহাদের পাকপ্রণালী দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় ঔদরিকদিগের বিশেষ সুবিধা হইত। রসিক ও সমালোচক ললিত বাবু এই ত্রুটীর সংশোধন করুন। ভোজন-বিলাসীরা এই বইখানি গৃহিণীদিগের হস্তে তুলিয়া দিলে যথেষ্ট লাভবান হইবেন।

পর্দ্দানশীন—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ প্রণীত ; মূল্য বারো আনা। নয়টী ছোট গল্প দিয়া এই 'পর্দ্দানশীন' বাহির করা হইয়াছে। গল্প কয়টাই মনোরম, যেমন আখ্যানভাগ সুন্দর, তেমনই বলিবার ভঙ্গী মধুর; আমরা সব কয়টী গল্পই সমানে উপভোগ করিয়াছি। ছোট গল্প লেখায় যে আর্ট, তাহা প্রভাত কিরণ বাবু বেশ আয়ত্ত করিয়াছেন।

শ্রীরাজমালা।—শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। মূল্যের উল্লেখ নাই। ভারত-বিশ্রুত সুপ্রাচীন ত্রিপুর-রাজবংশের পুরাবৃত্ত এই রাজমালা। কাশ্মীরের 'রাজ তরঙ্গিণী', মহীশূরের 'রাজাবলী' আর এই 'রাজমালা" একই পর্য্যায়ভুক্ত। অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম, 'রাজমালা'র একটী সুমার্জ্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হইবে; অনেক সুধী পণ্ডিত ব্যক্তি এই সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্তও হইয়াছিলেন; কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে 'রাজমালা'র এই সংস্করণ দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। সম্প্রতি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় এই রাজমালার প্রথম লহর প্রকাশ করিলেন। এমন সুবৃহৎ রাজমালার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা এখানে অসম্ভব; আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, এই পুস্তক সম্পাদনে যত্ন, চেষ্টা ও অর্থ ব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। প্রথম লহর সম্পাদনে সম্পাদক মহাশয়কে সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা অনেক পুস্তক ও পুঁথির সহিত তথ্য মিলাইতে হইয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুর-ইতিহাসের উদ্ধারের জন্য বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন; তিনি আজ জীবিত থাকিলে যে কি আনন্দলাভ করিতেন, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর যে পিতার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা অতীব সুখের বিষয়। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ-পিপাসু তাঁহারা ত এই 'রাজমালা'কে অভিনন্দিত করিবেনই, সাধারণ পাঠকগণও ইহা পাঠ করিয়া অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ও চিত্রাদি ত্রিপুর-রাজবংশেরই উপযুক্ত হইয়াছে।

মুক্তি-পথে।—শ্রীমৃগেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। রৌলট কমিসনের রিপোর্টে প্রকাশিত কিছুদিন পূর্ব্বের স্বদেশী বিপ্লব-ব্যাপারের কয়েকটী ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসখানি লিখিত হইলেও ইহা ইতিহাস নহে, উপন্যাস মাত্র। গ্রন্থকার ঘটনাগুলি সুকৌশলে গ্রথিত করিয়াছেন অথচ নাম-ধাম কিছুই দেন নাই; স্থানে স্থানে কল্পনায়ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। উপন্যাস হইলেও এই মুক্তি-পথ পাঠ করিলে কিছুদিন পূর্ব্বের বিপ্লব প্রচেষ্টার অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। উপন্যাসখানি বেশ লেখা হইয়াছে, বর্ণনা কৌশলের প্রশংসা করিতে হয়। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি।

শ্রুতি-স্মৃতি।—স্বর্গীয় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত; মূল্য দশ আনা। অকালে পরলোকগত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বাঙ্গালী পাঠক সমাজ কখনও ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা যে প্রগাঢ় ছিল, তাহাও কাহারও অজ্ঞাত নহে। তিনি নানা বিষয়ে কত প্রবন্ধ যে লিখিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার গৃহে এখনও অনেক অপ্রকাশিত লিপি রহিয়াছে। তাহারই মধ্য হইতে 'শ্রুতি-স্মৃতি' শীর্ষক কতকগুলি বৃত্তান্ত তাঁহার পুত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। এই স্মৃতি-লিপি তিনি এত রাখিয়া গিয়াছেন যে, বর্ত্তমান পুস্তকের ন্যায় আরও চারি পাঁচখানি পুস্তক হইতে পারে। এই খণ্ডে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের, অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির সম্বন্ধে এমন অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহা আমরা জানিতাম না। সুতরাং এই পুস্তক পাঠ করিয়া সকলেই অনেক নূতন অনেক সারগর্ভ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

ভারত ভেষজ-প্রভাব।—শ্রীসুরেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ভট্টাচার্য্য প্রণীত; মূল্য ১৶০। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহুদিন চিকিৎসা কার্য্য করিয়া দেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি পাঠ লব্ধ বিষয়ের অবতারণা না করিয়া কোন্ কোন্ ব্যাধিতে আমাদের দেশের কোন্ কোন্ গাছ-গাছড়া, লতা-গুল্ম ফল প্রদান করে, তাহারই প্রত্যক্ষলব্ধ বিবরণ কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন। আমরা, কি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী কি সাধারণ জনগণ, সকলকেই এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

রেডিয়াম চিকিৎসা।—ডাক্তার শ্রীসুবোধ মিত্র প্রণীত; মূল্য এক টাকা। কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের রেডিয়াম বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার মিত্র এই রেডিয়াম চিকিৎসা পুস্তকখানি অতি সরল ভাষায়, একেবারে সাধারণ লোকের বোধগম্য চলতি ভাষায় লিখিয়াছেন। যাঁহারা কোন দিন রঞ্জন-রশ্মি (X-ray) দেখেন নাই, তাঁহারাও এই বই খানি পড়িয়া এই ব্যাপার সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন এবং এই চিকিৎসা ক্যানসার রোগে কেমন ফলপ্রদ তাহাও জানিতে পারিবেন। ক্যান্সার রোগ সারে না, এই কথাই এতদিন জানা ছিল; কিন্তু সময় থাকিতে রেডিয়াম চিকিৎসা অনুসৃত হইলে যে এই ভীষণ রোগও সারে, তাহা এই পুস্তকে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বইখানি সকলেরই পড়া উচিত। এই বইখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থ চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে প্রদত্ত হইবে।

পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী রামানন্দ।—শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ প্রণীত; মূল্য দুইটাকা। গ্রন্থকার প্রণীত "উপাসিকা চরিত" (ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির জীবনী) পাঠ করিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট আনন্দলাভ করিয়াছি। তাঁহার প্রণীত স্বামী রামানন্দের জীবনী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। স্বামী রামানন্দ অন্য কেহ নহেন, তিনি আমাদের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন। "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ" হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর নবীনদল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, রামকুমার তাহার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। তেজীয়ান স্বাধীন প্রকৃতি রামকুমারকে কোন কালে কেহ বন্ধনের ভিতরে ধরিয়া রাখিতে

পারে নাই। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি দুর্গাপূজা উপলক্ষে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে নিজ পিতার আদেশে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। তৎ সময়ে তাঁহার মনে নিরাকার ব্রহ্ম স্বরূপের জ্ঞানের উদয় হয়। সহসা চণ্ডীপাঠ বন্ধ করিয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসেন। তাহার ফলে পিতার অসন্তোষ-ভাজন হন। পিতা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি বাটী হইতে বিতাড়িত হইলেন। তিনি যখন নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে পথে বেড়াইতেছিলেন, তাঁহাকে আশ্রয় দিবার কেহই ছিল না, তখন তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গোচরে ও আশ্রয়ে আসিলেন, এবং মহর্ষির স্নেহ-পূত হৃদয়ের একটা স্থান অধিকার করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ছাড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইলে বিদ্যারত্নকে সঙ্গে লইতেন। এইরূপে মহর্ষির সংসর্গে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান সুপুষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। বিদ্যারত্ন অনুমান ২৫ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৬১ অব্দে উপবীত পরিত্যাগে হিন্দুসমাজ হইতে বহিস্কৃত হন, এবং আসাম অভিমুখে মজুরদিগের অবস্থা অনুসন্ধানার্থ গমন করেন। তিনি নিজ চক্ষে মজুরদিগের দুরবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহার সঙ্গে আসাম অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইয়া উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রণীত "কুলি-কাহিনী" মজুরদিগের দুর্গতির জীবন্ত ছবি। তিনি যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে কুলি-আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়,—এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এই সময় তাঁহার জীবন ভিন্ন পথে পরিচালিত হইবার সূত্রপাত হয়। তাঁহার ভাবী গুরুদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন,—"আমি তোমার কার্য্যে একান্ত প্রীত হইয়াছি।" ১৮৮৮ অব্দে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয় তিনি উহার পর এক দিন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন,—এমন সময়ে তিনি এক মধুর ও গম্ভীর আকাশ-বাণী শ্রবণ করিলেন,—"তুমি অমুক স্থানে চলিয়া যাও।" সেই বাণীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি তাঁহার গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং নর্ম্মদা খণ্ডে তাঁহার দর্শন পাইলেন। ঐ গুরু স্থূলদেহে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তাঁহাকে যোগদীক্ষা দান করিলেন এবং উপবীত সংস্কার দিলেন, এবং সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দিলেন। তাঁহার আদেশ ক্রমে নিকটবর্ত্তী এক ভারতী তাঁহাকে সন্ন্যাস আশ্রমে দীক্ষিত করিলেন। এই সময় হইতে তিনি স্বামী রামানন্দ নামে খ্যাত। ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহার মর্ম্মান্তিক মত-পার্থক্য না ঘটিলেও, তিনি আর ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত রহিলেন না। তিনি প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তিনি চির পথিকের বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ঘুরিতে লাগিলেন। কোথায় কৈলাস কোথায় গঙ্গোত্রী—তাঁহার অগম্য স্থান আর রহিল না। তাঁহার আন্তরিকতা ও সাধুতা দেখিয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইল। শিষ্যগণের মধ্যে এখনও অনেকে জীবিত। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি আবার আদেশ পাইলেন,—"বারাণসী ফিরিয়া যাও।" এই স্থানেই ইং ১৯০১—১৬ই ডিসেম্বর তিনি চিরসমাধি লাভ করিলেন। গ্রন্থকার তাঁহার সুনিপুণ লেখনী সঞ্চালনে রামানন্দ স্বামীর জীবনের ঘটনাগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ভাষা ও বর্ণনা-শক্তি চিত্তাকর্ষক। যাঁহারা সাধুপুরুষের জীবনকে বিস্মৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা সত্য সত্যই সমাজের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভাজন। গ্রন্থকার তাঁহার সরকারী কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেও যে এইরূপ সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিতে পারিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ রামানন্দের বিশ্বাস ও ধারণা যাহাই থাকুক, আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করি।

মাষ্টার টেইলর—অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত প্রণীত ; মূল্য ২৲। যাঁহারা সামান্য বেতনের চাকুরীর জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও অকৃতকার্য্য হইতেছেন, যাঁহারা যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়াও সামান্য উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের দরজীর কাজ শিখাইয়া যথেষ্ট উপার্জ্জনের পন্থা দেখাইবার জন্য এই মাষ্টার টেইলার বইখানি লিখিত হইয়াছে। এ বই পড়িলে অনায়াসেই দরজীর কাজ শিখিতে পারা যায় এবং তাহা হইতেই স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের একটা উপায় হয়। সুতরাং এ বইখানি বেকারদিগের পড়া উচিত ; এবং গৃহস্থের ঘরের মেয়েদের যে এখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৪

আষাঢ় মাসের প্রারম্ভ। কয়েকদিন হইতে বর্ষা নামিয়াছে। সমস্ত দিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িয়া বৈকালের দিকেও আকাশ পরিষ্কার হইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। দোতলার পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসিয়া সরমা অনুৎসুক ভাবে কম্পাউণ্ডের বাহিরে কাশীর রাজপথের লোক চলাচলের দিকে চাহিয়া ছিল। নিকটে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া সুকুমারী পশম ও কাঠি লইয়া মিণ্টুর জন্য গলাবন্ধ বুনিতেছিল এবং মাঝে মাঝে অপাঙ্গে সরমাকে দেখিতেছিল।

তিন মাস হইল সরমা ভাগলপুর হইতে কাশী আসিয়াছে ;—এ তিন মাসের মধ্যে রমাপদর আর কোনো সংবাদই সে পায় নাই, একমাত্র এই সংবাদ ভিন্ন যে, তাহাদের কাশী আসিবার দুই দিন পরেই রমাপদ ভাগলপুর পরিত্যাগ করিয়া বোম্বাই রওনা হইয়াছে, এবং পরে তথা হইতে যে কোথায় সে গিয়াছে তাহার কোনো সন্ধানই জানা নাই। এই তিন মাসের মধ্যে ভাগলপুরের ঠিকানায় রমাপদর নামে চিঠি অনেকগুলিই গিয়াছে—সরমা লিখিয়াছে, সুকুমারী লিখিয়াছে, নরেশও লিখিয়াছে—কিন্তু না আসিয়াছে সে সব চিঠির উত্তর, না আসিয়াছে সেগুলি ফিরিয়া। রমাপদর জন্য দুশ্চিন্তাই যখন মনের মধ্যে প্রধান হইয়া ছিল তখন সরমা ঘন-ঘন চিঠি লিখিত। কিন্তু নৈরাশ্যের সহিত অভিমান যেমন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল তাহার চিঠি লেখা তেমনি কমিয়া আসিল। অবশেষে কিছুদিন হইতে সে চিঠি লেখা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ভালবাসার সহিত অভিমানের একটা সরল অনুপাতের হিসাব আছে। যেখানে যত ভালবাসা, অভিমান সেখানে তত বেশি। পানা যেমন ক্রমশঃ পুষ্করিণীর সমস্ত জলকে আবৃত করিয়া ফেলে, অভিমানও তেমনি সমস্ত ভালবাসাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে। পানার নীচে জলের মত, অভিমানের তলার সমস্ত ভালবাসাটাই প্রচ্ছন্ন থাকে; কিন্তু তলাইয়া যাহারা না দেখে তাহারা অনেক সময়ে ভুল করিয়া বসে।

সুকুমারীও এই ভুল করিয়াছিল। সরমা যখন রমাপদকে চিঠিলেখা এবং রমাপদর সংবাদের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ একেবারে বন্ধ করিয়া দিল তখন সে মনে করিল, এতদিনে মন বসিল,—পুত্রের স্বাস্থ্যোন্নতি দেখিয়া সরমা অবশেষে স্বামীর দুঃখ ভুলিল। সে বুঝিল না, যে কীটকে বাহিরে দেখা যায় না, ভিতরকে সে গভীর ভাবেই জীর্ণ করিয়া দেয়। আজ বর্ষাপরাহ্নের ম্লান আলোকে সরমার কৃশ মলিন মূর্ত্তি হঠাৎ চোখে ধরা পড়ায় সুকুমারী বুঝিল নিদানে তাহার ভুল হইয়াছিল, নিবৃত্তি বলিয়া যাহা সে অনুমান করিয়াছিল বস্তুতঃ তাহা নিবৃত্তি নহে,—বৃদ্ধি।

"সরো!"

সুকুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সরমা বলিল, "কি দিদি?"

"তুই এত রোগা হয়ে যাচ্চিস্ কেন বল তো?"

মৃদু হাসিয়া সরমা বলিল, "রোগা? কই আমার ত মনে হয় না।"

"তোর মনে না হ'লেই ত' হ'ল না;—আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

বিরসমুখে সরমা বলিল, "তা-ই যদি হ'য়ে থাকি তাতে এমনই কি হয়েচে দিদি;—যার জন্যে কাশী আসা তার ত' উপকার হয়েচে।"

ব্যস্ত হইয়া সুকুমারী বলিল, "ষাট! শনি-মঙ্গল বারে যা-তা কথা ফস্ ক'রে মুখ থেকে বের করতে নেই সরো।" তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "রমাপদর জন্যে বড্ড বেশি ভাবিস,—না?"

মৃদুস্বরে সরমা বলিল, "এমন আর কি ভাবি।"

সুকুমারী বলিতে লাগিল, "এমন যে হবে তা কে জানত বাবু? আর এমনই বা কি অপরাধ হয়েচে যার জন্যে একেবারে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে! এখন কেবল মনে হয় কি কুক্ষণেই ভাগলপুর যাবার মতি হয়েছিল, আর কি কুক্ষণেই তোর ছেলেটার উপর প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম! হিতে যে এমন বিপরীত হবে তা কে জান্‌ত!"

সরমা বলিল, "তোমার কি অপরাধ দিদি? তুমি যা করেছ তার ফল ত ভালই হয়েচে। আমার অদৃষ্টে যে দুঃখ লেখা আছে তুমি তার কি করবে বল?"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু তুই বেশি ভাবিস নে সরো, সে যেখানে আছে ভালই আছে। তা ছাড়া, চিঠিপত্র এখান থেকে যা যাচ্চে সমস্তই সে পাচ্চে—নইলে এতদিনে একটাও ত' ফিরে আস্‌ত।"

"তা হবে।" বলিয়া সরমা পূর্ব্বের মত রাজপথের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সুকুমারী বলিল, "রমাপদর খবরের জন্যে উনিত' অনেককেই চিঠি পত্র লিখ্‌চেন; কিন্তু আমি বলি, এ-সব ব্যাপার চিঠিপত্রের উপর নির্ভর না ক'রে একেবারে জায়গায় গিয়ে প'ড়ে সন্ধান করতে হয়। তা তুই ত' ওঁকে পাঠাবার কথায় কিছুতেই রাজি হ'লি নে। বলিস্ তো আজই ওঁকে পাঠিয়ে দিই।"

সরমা বলিল, "না দিদি,—অনর্থক কষ্ট দিয়ো না—কোথায় জামাইবাবু তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াবেন?

আমাদের খবর নেবার মত যখন তাঁর অবস্থা হবে তখন আপনিই খবর নেবেন।"

বিস্ময়পূর্ণ স্বরে সুকুমারী বলিল, "বলিস কি সরো! খবর নেবার মত অবস্থা হ'লে তবে খবর নেবে? আর অবস্থা যদি না হয় তা হ'লে নেবে না?"

সরমা বলিল, "মনের অবস্থাও ত' খবর নেবার মত হওয়া চাই দিদি।"

উত্তেজিত স্বরে সুকুমারী বলিল, "কিন্তু হঠাৎ মনের এমন দুরবস্থাই বা কেন হ'ল তাও ত বুঝিনে! রোগা ছেলেকে সারাবার চেষ্টা মার পক্ষে কি এত বড়ই অপরাধ? মা না হয়ে আমি যা বুঝতে পারি, বাপ হয়ে রমাপদ তা বুঝতে পারে না, এতই সে অবুঝ? আমি ত বাপু, তোর ওপর রমাপদর এ অন্যায় অভিমানের একটুও সুখ্যাতি করতে পারলাম না।"

ঠিক এইখানেই সরমার দুঃখ। ঠিক এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই তাহার মনের মধ্যে দুর্জ্জয় অভিমান উৎপন্ন হইয়াছে। রমাপদর প্রতি তাহার অভিযোগের ইহাই প্রধান কারণ। কিন্তু সত্য হইলেও এটুকু স্বামী-নিন্দা সে অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে পারিল না;—বলিল, "অভিমান ত শুধু আমার ওপরই নয় দিদি,—নিজের ওপরই বোধ হয় তাঁর বেশি অভিমান!"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু নিজের ওপর অভিমান ক'রে তোকে এ-রকম কষ্ট দিয়ে কি পৌরুষ আছে বল ত শুনি?"

সত্যকে অপছন্দ করা যত সহজ, খণ্ডন করা তত নয়। তাই সরমা এবার আর প্রতিবাদ করিবার মত কোনো কথা না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। যে ব্যাপারের মধ্যে যুক্তির জোর নাই তাহা লইয়া তর্ক করা যাইতে পারে কিন্তু তার বেশি আর কিছুই করা যায় না।

সরমাকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া সুকুমারী মনে করিল তাহার কথাটা একটু শক্ত হইয়াছে তাই সরমা নীরব হইয়া গেল। দুঃখিত স্বরে সে বলিল, "কিছু মনে করিস নে, সরো, তোর কষ্ট দেখে বড় দুঃখ হয়, তাই এ-সব কথা মুখ দিয়ে বেরোয়।"

এ কথার কোনো উত্তর দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না, নরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার হাতে একখানা চিঠি। বলিল, "রমাপদর চিঠি এসেছে।"

ব্যগ্রস্বরে সুকুমারী বলিল, "চিঠি এসেচে? কি লিখেচে? এ কি তোমার শেষ চিঠির উত্তর?"

নরেশ বলিল, "হ্যাঁ, সেই চিঠিরই উত্তর।"

এই 'শেষ চিঠি' আর 'সেই চিঠি'র একটু বিশেষ অর্থ আছে। রমাপদর নিকট হইতে কোন চিঠির উত্তর না পাইয়া সুকুমারীর পরামর্শে ও প্ররোচনায় নরেশ এই মর্ম্মে রমাপদকে পত্র দিয়াছিল যে তাহার আপত্তি না থাকিলে সরমার সম্মতিক্রমে সে ঘিণ্টুকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহার নামে উপস্থিত অর্দ্ধেক সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছে। সরমাকে সুকুমারী বুঝাইয়াছিল যে পোষ্য-পুত্র লইবার প্রস্তাবের বিষয়ে পত্র পাইলে রমাপদ উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিবে না। আপত্তি জানাইলেও লাভ হইবে,—রমাপদর কতকটা সংবাদ পাওয়া যাইবে। তাই, সেই চিঠির উত্তর আসিয়াছে শুনিয়া সে আগ্রহভরে বলিল, "কি লিখেচে, পড় শুনি।"

চিঠি না পড়িয়া নরেশ বলিল, "ঘিণ্টুকে দত্তক দেবার জন্যে সরমাকে অনুমতি দিয়েছে, আর লিখেছে এই চিঠিই যদি যথেষ্ট না হয়, তা হ'লে তাকে লিখলে উকিলের পরামর্শ মত অনুমতি পত্র লিখে দেবে।"

শুনিয়া বিস্ময়ে সুকুমারীর মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরিত হইল না, এবং অভিমানে সরমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। যে ব্যাপার একজন আশা এবং অপরে আশঙ্কা করে নাই তাহা উভয়কেই বিচলিত করিল, কিন্তু অনেক গভীরভাবে করিল সরমাকে। অনুমতি দিবার এই অকুণ্ঠ অব্যাহত সম্মতি-প্রকাশ রমাপদর পূর্ব্বেকার মনোভাবের সহিত এত অসদৃশ,—স্ত্রী এবং পুত্রের প্রতি অনাসক্তি ও উপেক্ষা ইহার মধ্যে এত সুপ্রতীয়মান যে, দুঃখে, ক্ষোভে ও ক্রোধে সরমার মনের মধ্যে নিমেষের মধ্যে যে বৃত্তি জাগিয়া উঠিল তাহাকে শুধু অভিমান বলিলে লঘু করিয়া বলা হইবে। দীপ্তি হইল দাহ;—অভিমান হইল অপমান।

চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করা যায় বল?"

সরমা কিছুই বলিল না,—সে যেমন বসিয়া ছিল পথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। সুকুমারী বিমূঢ়ভাবে নরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি করবার কথা বলছ?"

নরেশ বলিল, "প্রথমতঃ, এ চিঠির কি উত্তর দেওয়া যায় ?"

নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর সুকুমারীর আর তেমন আস্থা ছিল না ; বলিল, "তোমরা যা ভাল বোঝ তা কর।"

এ-রকম কথা নরেশকে সে বোধ হয় এই প্রথম বলিল ; এ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে সে নরেশকে তাহার নিজের ইচ্ছামত কাজ করাইয়াছে—নিজের পথে চালাইয়াছে। এমন কি, যে ফল নরেশ তাহার পকেটের ভিতর চিঠির মধ্যে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা একমাত্র সুকুমারীরই বুদ্ধি এবং চেষ্টার ফল ;—কিন্তু হাতে পাইয়াও সে ফল আস্বাদ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না। ফল ত হাতের ভিতর, কিন্তু ফলের ভিতর কি রস আছে কে জানে!

সরমাকে সম্বোধন করিয়া নরেশ বলিল, "তুমি কি বল সরমা ?"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সরমা বলিল, "চিঠিখানা একজন ভাল উকিলকে দেখান। উকিল যদি বলেন এ চিঠি যথেষ্ট হবে না তা হলে আর একখানা চিঠি আনাবার ব্যবস্থা করুন।"

সবিস্ময়ে সুকুমারী বলিল, "দত্তক দিতে তুই রাজী আছিস্ সরো ?"

"আছি।"

"রমাপদর এই রকম চিঠির উপরেও ?"

"হ্যাঁ, চিঠির উপরেও। চিঠিতে তিনি ত' সম্মতিই জানিয়েছেন।"

"কিন্তু এ-কে কি তুই সম্মতি বলিস্ ?"

"বলি বই কি। চিঠি প'ড়ে জামাইবাবু যেমন বুঝেছেন তেমনিই ত' আমাদের বললেন।"

নরেশ বলিল, "আমি কিন্তু তোমাকে এ বিষয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম না সরমা। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, রমাপদকে এখানে আনাবার জন্যে কি লেখা যায়।"

নরেশের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সরমা বলিল, "তাঁকে এখানে আনাবার বিশেষ কোনো দরকার আছে কি জামাইবাবু ?"

নরেশের মুখে সমবেদনা এবং প্রীতির সুমিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল ; বলিল, "সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে স্পষ্টভাবে আলোচনা করলে তুমি হয় ত একটু লজ্জিত হবে। মাছ ডেঙ্গায় উঠে যদি জিজ্ঞাসা করে, 'জলের কি বিশেষ কোনো দরকার আছে ?'—আমি তার উত্তরে কি বলি বল ?"

সরমার মুখে মৃদু হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল, এবং সুকুমারী যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বদ্ধ গুমটের মধ্যে হঠাৎ একটু ফুরফুরে হাওয়া খেলিয়া গেলে যেমন চারিদিক হাল্কা হইয়া উঠে, সামান্য এইটুকু কৌতুক-পরিহাসে তেমনি দুঃখের জমাটটা একটু আলগা হইয়া গেল।

সুকুমারী বলিল, "সময় অসময়, বিষয় অবিষয় জ্ঞান নেই, সব তাতেই ঠাট্টাটুকু করা আছে।" কিন্তু এই ঠাট্টাটুকুর জন্য কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দের চিহ্ন তাহার মুখে-চক্ষে ঢাকা রহিল না।

নরেশ বলিল, "যে সময়ে ঠাট্টা করা চলে সে সময় অসময় নয়, আর যে বিষয়ে, ঠাট্টা করা যেতে পারে সে বিষয় অবিষয় নয়। এ অনেকটা কেউটে সাপের বিষের মত,—সুস্থ সবল লোককে যেমন মারতে পারে—মরণাপন্ন লোককে তেমনি বাঁচাতে পারে। কিন্তু মাত্রা জ্ঞান থাকা চাই।"

স্বামীর প্রতি প্রীতি-প্রসন্নমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সুকুমারী বলিল, "মাত্রাজ্ঞানের ওপরই একটু নজর দিতে বলছি। ঠাট্টা রেখে এখন বল কোথা থেকে রমাপদ চিঠি দিয়েছে।"

"ঝরিয়া থেকে।"

"ঝরিয়া থেকে ?—ঠিকানা কি দিয়েছে ?"

চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া দেখিয়া নরেশ বলিল, "মালাবার হিল্ কোল কনসার্ন, ঝরিয়া।"

"সেখানে কি করে কিছু লিখেছে ?"

"না,—বোধহয় চাকরি করে।"

"কেমন আছে কিছু লিখেছে ?"

"না,—ভালই আছে নিশ্চয়।"

"চিঠি বাংলাতে লিখেচে, না ইংরাজীতে ?"

"বাংলায়।"

সুকুমারী চিঠি দেখিতে চাহিল না—ইতিপূর্ব্বে নরেশকে চিঠি পড়িতে বলিলে চিঠি না পড়িয়া নরেশ পকেটে পুরিয়াছিল সে কথা তাহার মনে ছিল। সে বুঝিল চিঠি দেখাইতে নরেশের আপত্তি আছে—অন্ততঃ সরমার সম্মুখে।

নরেশ বলিল, "এখন তোমাদের পরামর্শ কি ?"

সুকুমারী বলিল, "সেটা তোমার অসাক্ষাতে ক'রে তারপর তোমাকে জানাব—এখন তুমি পালাও।"

নরেশ প্রস্থান করিল।

সুকুমারী বলিল, "সরো, চিঠিখানা দেখতে চাস্ ?"

সরমা বলিল, "না।"

"ঝরিয়া যাবি ?"

"না।"

"ওঁকে পাঠাবো ?"

"না।"

"চিঠি লেখ তা হ'লে।"

"না।"

"না, তবে মর্ !"

সরমা হাসিয়া বলিল, "সেটা হাতের মধ্যে থাকলে ত' বাঁচতুম !"

(ক্রমশঃ)

"জল্পনা"র আলোচনা

অধ্যাপক শ্রীবিভূতি চট্টোপাধ্যায় এম-এ

মাসের পর মাস আমরা দিলীপ বাবুর "ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা" "ভ্রাম্যমানের জল্পনা" ইত্যাদি প'ড়ে আসছি। তাঁর ঐ লেখাগুলির মধ্যে যে জানবার, বোঝবার অনেক জিনিষ আছে, এ কথা অনেকেই স্বীকার ক'রবেন। তাঁর এক "মনের পরশ"ই বিলাত-প্রবাসীর যে ছবি গড়ে' দেয় মনের সামনে, বাংলা ভাষায় তার তুলনা খুব কম। স্তরের পর স্তর মনের কি ভাবে পরিবর্ত্তন হয়, ছোটখাট ঘটনা অবলম্বন করে' সে কথা জানতে হ'লে, আমরা দিলীপবাবুরই কাছে যাব, এ কথা ঠিক। রবিবাবুর য়ুরোপের চিঠি, রমেশ বাবুর বিলাতের চিঠি পড়েছি। তবে রবি বাবুর চিঠিগুলি চিঠির মতই হয়েছে। ঘটনার পর ঘটনা আমরা তাতে পাই বটে, কিন্তু কোন মতামতের বা তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তিনি করেন নি। আমাদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমরা রবিবাবুর বা রমেশ বাবুর চিঠির সঙ্গে "মনের পরশের" তুলনা করছি। এর তুলনাই হতে পারে না। কেন না রবিবাবু বা রমেশ বাবু যা লিখেছেন তা' চিঠি, আর "মনের পরশ" উপন্যাস বিশেষ। "মনের পরশে"র অনেক মতামতের সঙ্গে আমাদের মতামতের মিল না হ'তে পারে; কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত যে, মনের ছাপ যে ভাবে পড়, লেখক সেই দিক দিয়েই গেছেন। তবে মনে হয় যে, কখন কখনও তাঁর কলম দিয়ে এমন অনেক কথা বেরোয়, যা প'ড়ে মনে হয় যে, হয় ত তিনি লেখার পর ভাল করে ভেবে দেখেন নি, তিনি কি লিখেছেন।

গত পৌষ মাসের "ভারতবর্ষে" তাঁর "জল্পনার" এক সংখ্যা বেরিয়েছে। আমরা তাঁর প্রত্যেক লেখাই আগ্রহের সঙ্গে পড়ি যদিও মতের মিল অনেক সময়ই হয় না; কেন না আমাদের মতই ত' সব বা শেষ মত নয়! তবে উক্ত মাসের "ভারতবর্ষে" তাঁর যে লেখা বেরিয়েছে, তা'তে তিনি দু' চারটে এমন কথা বলে'ছেন, যা' হজম করা শক্ত।

প্রথমে তিনি বলেছেন, "আজ ইংরাজ ভারত শাসন না করলে সম্ভবতঃ ইংরাজী হ্রদগুলি আমাদের চোখে Swiss হ্রদের চেয়ে সুন্দর বলে ঠেকত, ও তখন আমরা নানা যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করতাম যে, ইংরাজী হ্রদের তুলনায় Swiss হ্রদ হীনপ্রভ হ'তে বাধ্য।" এখন, ভাববার বিষয় এই যে, ইংরাজ-বিদ্বেষ আমাদের মধ্যে থাকলেও, আমরা কি ইংরাজদের বা তাঁদের দেশের প্রকৃত কোন গুণ বা সৌন্দর্য্য অস্বীকার করি? আমাদের যেন মনে হয় যে, প্রকৃত গুণ বা সৌন্দর্য্য কোন এক দেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কেন না, কোন জিনিষ যখন রূপে গুণে বিকশিত হ'য়ে ওঠে, তখন সে সৌন্দর্য্য ত মালিকের হাতের মুঠার ভিতরেই বাঁধা থাকে না। বাগানে একটী গোলাপ ফুল ফুট্‌ল। এখন বাগানের মালির বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ বা মনোমালিন্য থাকে ত থাকুক,—গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্যকে সে বিদ্বেষ স্পর্শ করে না। আমাদের জাতি-বিদ্বেষ যখন তথাকথিত চরম সীমায় উঠেছিল, তখনও কি আমরা ভক্তিভরে Shakespeare, Wordsworth, Milton ইত্যাদি পড়ি নি? এমন কি, যে ইংরাজ (লর্ড মেকলে) বাঙালীকে বলেছিলেন, "a nation of slaves" তাঁর ইংরাজী গদ্যকে আমরা ঘৃণার চোখে ত দেখিই নি, বরং তাঁর ঐ গুণটিকে আমরা স্বীকার করেছি। আবার আমাদের ইংরাজ-বিদ্বেষের সময়ও তাঁরা রবি বাবুকে শ্রদ্ধা করেছেন। এ সবের কারণ এই যে, যাঁদের কথা বল্লাম, তাঁদের গুণ ও সৌন্দর্য্য দেশ-কালের অধীন নয়। তারা ছড়িয়ে পড়ে'ছে চারিদিকে কালের মধ্যে দিয়ে। তাই মনে হয় যে—দিলীপ বাবু যে বলেছেন যে আমরা এতদূর বিদ্বেষী হ'য়ে পড়ে'ছিলাম যে, তাঁদের দেশের সৌন্দর্য্যও গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে উঠেছিলাম, আর সেই জন্যেই Galsworthy ও Hardy আমরা পড়ি নি, বা সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিনি, এ কথা সত্য না হতেও পারে।

'ভ্রাম্যমানের জল্পনা'য় আরও লেখা আছে, "এখনও আমাদের দেশে খুব কম সাহিত্য-রসিকই বোধ হয় খবর রাখেন Galsworthy একজন কত বড় শিল্পী। আমরা আত্ম-

হারা হয়ে উঠি, হামসুন, বার্বুস, মার্গারেট,হাউপ্টম্যান, চেকভ প্রভৃতির নামে। কিন্তু বস্তুতঃ Galsworthy ও Hardy যে এঁদের চেয়ে ঢের বড় শিল্পী সে খবর রাখি না। আমরা এঁদের গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলাম বিশেষ করে ইংরাজ সাহিত্যকে হীন প্রতিপন্ন করবার জন্যেই।......নইলে Galsworthy ও Hardyর নাম আমাদের দেশে এত কম শোনা যায় কেন—যেখানে, বয়ে, মেটারলিঙ্ক, ব্রিয়ো, প্রভৃতির নাম সাহিত্য-সমালোচকের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত? কেন আমরা আজ অবধি এঁদের গুণ গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে উঠেছিলাম?"

এখন এই কথাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে যা' দাঁড়ায় তা' এই—১। Galsworthy ও Hardy যে কত বড় শিল্পী এ খবর বাংলার খুব কম সাহিত্য-রসিকই রাখেন। ২। আমরা উক্ত Continental লেখকদের নামে আত্মহারা হয়ে উঠি। ৩। Galsworthy ও Hardy উক্ত Continental writer-দের চেয়ে ঢের বড় শিল্পী। ৪। আমরা Continental writerদের গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলাম ইংরাজী সাহিত্যকে হীন প্রতিপন্ন করবার জন্যেই। উদাহরণ:—আমরা বয়ে, মেটারলিঙ্ক ও ব্রিয়ো, সম্বন্ধে সমালোচনা করি; অথচ Hardy ও Galsworthy সম্বন্ধে করি না।

আলোচনা।—১। প্রথম উক্তি যেন মনে হয় যে বাংলা দেশ সম্বন্ধে খাটে না। কেন না, বাংলার সাহিত্য-রসিকগণ Galsworthy ও Hardy যে খুব বড় শিল্পী এ খবর রাখেন না, এ কথা তখনই বলা যেতে পারে, যখন কোন ব্যক্তি সংখ্যার প্রকাশ করে দেখাতে পারেন যে, বাংলার এতগুলি সাহিত্য-রসিকের মধ্যে এতগুলি Galsworthy ও Hardyর খবর রাখেন না। তবে ঐ কথা বলতে পারেন তিনি, যিনি তাঁর দেশকে খুব ভাল করে চেনেন বা দেশের জ্ঞানের সঙ্গে যাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ভ্রাম্যমান যদি বাংলার সাহিত্য-রসিকগণের জ্ঞানের ও বিদ্যার সমস্ত পরিচয় পেয়ে ঐ কথা বলে থাকেন, তবে তাঁর ঐ উক্তি আমরা মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু বিষয়টা কি একটু সন্দেহজনক নয়?

২। তাঁর দ্বিতীয় উক্তি সম্বন্ধে শুধু এই বলতে চাই যে আমরা Continental writerদের বই আগ্রহ সহকারে পড়ি; তবে একটা রেষারেষির ভাব নিয়ে যে পড়ি তা' মনে হয় না। কেন না রেষারেষি করে কোন বইই বোধ হয় পড়া হয় না।

৩। দিলীপ বাবুর তৃতীয় উক্তি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবার আছে। স্বীকার করি, Galsworthy ও Hardy শিল্পী; কিন্তু হামসুন, বার্বুস, মার্গারেট, হাউপ্টম্যান, চেকভ বয়ে, মেটারলিঙ্ক—এঁরাও ত শিল্পী! শিল্পের দিক থেকে প্রত্যেকেই বড়। আর সকলেই ত এক পথ দিয়ে যান নি। প্রত্যেক শিল্পেরই বিশেষত্ব আছে, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ নয়। কিন্তু এ কথা ঠিক যে শিল্পী হিসাবে কার স্থান কোথায় এ কথা জোর করে অন্ততঃ আজ বলা শক্ত। আর এঁদের স্থান ধার্য্য করতে হলে, প্রত্যেককে দেখতে হবে যে, তাঁরা যে পথ অবলম্বন করেছেন শিল্পকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে, সেই পথেই তাঁরা কতদূর কৃতকার্য্য বা অগ্রসর হয়েছেন। তা' ছাড়া Swinburne বলেছেন, "Criticism of art must rest upon the plane of art; that is to say, on the plane of the object criticised. এ থেকে এই কথাই প্রকাশ হয়—সাহিত্যকলাকে বিচার করতে হবে সাহিত্য-কলারই মাপকাঠিতে। তাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উক্ত Continental writers ও Galsworthy ও Hardyকে ঐ ভাবে কেউ বিচার না করছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁদের স্থান ধার্য্য করা কি অন্যায় নয়? তা ছাড়া সমালোচক যে কথা বলবেন সে সবের প্রমাণ দেওয়া উচিত, যতদূর সম্ভব। সমালোচনা সন্দেহ-জনক হওয়া উচিত নয়। তাই দিলীপ বাবুর উক্তি "Hardy ও Galsworthy Continental writerদের চেয়ে ঢের বড় শিল্পী—"এ কথা যেন মনে হয় যে তিনি একটু বাড়িয়েই বলেছেন।

৪। চতুর্থ উক্তির আলোচনা আগেই হয়ে গেছে।

সাহিত্য-সমালোচনার মাঝে ব্যক্তিত্বকে নিয়ে টানাটানি করা উচিত নয় যদি সে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাহিত্য-কলার কোন যোগ না থাকে। সমালোচনা করতে গিয়ে যদি moral detective হয়ে শিল্পীর দরজায় দাঁড়াতে হয়, তবে তার চেয়ে অন্যায় বোধ হয় আর কিছুই নেই। তিনি কাগজে কলমে যা লিখেছেন, সেই হচ্ছে তাঁর মনের সত্য প্রকাশ—তাঁর বাণী। তাই যখন দিলীপ বাবু বলছেন, "Wells টাকা-আনা-পাই বুঝদার—নামপিপাসু adventurer। Galsworthy শিল্পী। Wells এমন জিনিষ কখনও লেখেন না যার অর্থ-মূল্য নেই। Galsworthy যা বলবার প্রেরণা পান কেবল তাই লেখেন—এ বিষয়ে Hardy ছাড়া একমাত্র

Barnard Shaw Galsworthyর সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য।"—তখন আমরা ঐ উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা না করে' পারি না।

প্রথমে মেনে নেওয়া যাক্—Wells টাকা-আনা-পাই বুঝদার—নামপিপাসু adventurer। এখন, এ উক্তি সত্য হ'লেও তাঁর সাহিত্যকলার সঙ্গে ঐ উক্তির কি সম্বন্ধ? কবে তিনি কা'র সঙ্গে কোন্ বিষয়ে দরকষাকষি করেছেন, সে কথায় সাহিত্য-সমালোচকের কি দরকার? আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, কোন্ বই বা কোথায় তিনি Wells সম্বন্ধে এমন তথ্য সংগ্রহ করেছেন বা পরিচয় পেয়েছেন যা' নিয়ে তিনি তাঁকে ঐ অপবাদ দিয়েছেন? আমরা Wellsএর আজ পর্য্যন্ত যত বই বেরিয়েছে, প্রায় সবই পড়ে'ছি; কিন্তু এ কথা কোথাও পাই নি। তা' ছাড়া, "They (personal faults) are of so little weight as to count for nothing when set against one least fraction of the life that has swayed hearts, vitalised remembrances, stirred emotions, and been for good or evil, a motive power in life of intellect, imagination, or passion of countless readers. To demonstrate the base concomitants of the soil where gems lie embedded to the obscuring to the vital light-giving properties of those gems is to render ill-service to those great men, and to mankind at large. It is moreover, the interpretations of the stars, not of the 'unpurpled vapours', which leads the knight errant on the path of truth. (Edin. Rev. 1906.) তাই যেন আমাদের মনে হয় যে, দিলীপবাবু Wellsএর ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা না করলেই ভাল করতেন। আবার, ভ্রাম্যমান এ কথা কি করে জানলেন যে Wells এমন কথা কখনও লেখেন না যার অর্থ-মূল্য নেই? এ কথা মেনে নেওয়া যেতে পারত যদি তিনি শুধু ছাত্রদের জন্তে পাঠ্যপুস্তক আর নোট্ লিখতেন। কিন্তু তিনি ত তা' করেন নি! লিখেছেন রোম্যান্টিক গল্প *। তা'ও আবার এমন সময়ে আর এমন দেশে যখন তথাকথিত realistic উপন্যাসই লোকে বেশী পড়তে ভালবাসত। এ থেকে কি এই প্রমাণ হয় না যে তাঁর বই লেখার আর যে কোন উদ্দেশুই হোক্, অর্থ-মূল্য ছিল না?

আর একটা কথা এই মনে জাগে যে যাঁর কলম থেকে "The Passionate Friends," "Kipps", "Tono-Bungay" বেরিয়েছে, তিনি যদি শিল্পী না হন, তবে শিল্পী কে? বিশেষ করে তাঁর "Tono-Bungayতে" এমন একটি চরিত্র নেই যা' ফুটে ওঠেনি। উপন্যাসের নায়ক গ্রন্থকার স্বয়ং আর নায়িকা Beatrice, এক ধনীর কন্যা। চরিত্রগুলি এতই ফুটে উঠেছে যে কোন্ যায়গায় কে কি বলবে সে কথা আমরাই বলে দিতে পারি। যখন নায়ক নায়িকা এক রাত্রে নিস্তব্ধ, সুপ্ত লণ্ডনের এক পথে চাঁদের আলোয় বেড়াতে বেরিয়েছে, তখনকার তাদের মনের অবস্থা যদি Wells নাও বলতেন, তবুও আমাদের অজানা থাকত না। Beatrice যেন আনন্দের ঝরণা—তার প্রত্যেক কথা, গান, এমন কি চলাফেরাও যেন আনন্দের অফুরন্ত ছন্দের মতন মধুর। গোড়া থেকে উপন্যাসটিতে শিল্পী এমনই atmosphereএর সৃষ্টি করেছেন যে, মনে হয়, এ আমাদের চিরপরিচিত। সে রাতে Beatrice তার প্রেমাস্পদকে বলছে, "Look here, I insist upon our being dead.......To-night you and I are *out of life*. It's our time together. There may be other times but this we won't spoil. We are in Hades if you like, where there's nothing to hide, nothing to tell. *No bodies even*. ...We loved each other down there...and were kept apart but now it doesn't matter. Its' over......তা'রপর তা'রা চলতে লাগল দুজনে নিশুতি রাতের স্তব্ধ, জনকোলাহলহীন পথের ওপর দিয়ে।...পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ যেন তা'দেরই জন্তে এক নতুন স্বপ্নপুরী গড়ে দিয়েছে।——...দু'জনেই আনন্দে ভরপুর —ঐ নিস্তব্ধতাই যেন তা'দের কাছে অপূর্ব্ব সম্পদ; তখন তারা পৃথিবীর কঠিনতার বাইরে। এমনি এক শুভ মুহূর্ত্তেই ওমর খৈয়াম বলেছিল,

* যেমন, "The War of the Worlds"; "The Time Machine"; 'The Wonderful Visit"; "The Sea Lady"; "The Sleeper Awakes"; "The Food of the Gods"; "The War in the Air"; "The First Men in the Moon"; "In the Days of the Comet"; "The World set Free"; "Men like Gods".

"বেরিয়ে চল আমার সাথে
আজকে কোনও কুঞ্জপথে···"——(নরেন্দ্র দেব)

এ-রকম মুহূর্ত্ত জীবনে খুব কমই আসে, আবার এলেও বেশীক্ষণ থাকে না। তাই তারা কথা কইতে বেশী চায় না। আবার যে দু'একটী কথা তারা বলেছে, তা'ও আনন্দের সামঞ্জস্য হারায় নি। তারা চায় সমস্ত চেতনা দিয়ে এই সুসময়কে তা'দের জীবন-পেয়ালায় ভরে' নিতে।—ভবিষ্যতের ভাবনা তখন তারা ভুলেই গেছে,—এমন কি নায়ককে যে পরের দিন দেশ ছেড়ে যেতে হ'বে তার সে কথাও মনে নেই! মনে পড়ল তখন, যখন ঐ মুহূর্ত্ত তা'দের কাছ থেকে দূরে।

আবার বইখানির finish এতই সুন্দর যে, চোখে জল আপনি চলে' আসে, -"Light after light goes down. England and the kingdom, Britain and the Empire, the old prides and the old devotions glide abeam astern, sink down upon the horizon, pass—pass. The river passes—London passes—England passes···এই কয়টী লাইনে বর্ত্তমানের ছবি আঁকা হয়ে গেল!···এ বাণী যদি শিল্পীর না হয়—তবে কা'র? এই কি "টাকা-আনা-পাই বুঝদার, নামপিপাসু adventurer"এর বাণী?

দিলীপবাবুর কাছে আর্টের অর্থ কি, তা' আমরা জানি না; তবে আমাদের কাছে, "যাহা সৎ, যাহা সুন্দর, তাহার ডাকে মানবের সৃষ্টিপর আত্মার যে সাড়া, তাহাকেই বলে আর্ট *।" আর ঐ ভাবে যিনি আর্টের সৃষ্টি করতে পারেন তিনিই আর্টিষ্ট। এই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় যে, Wells সাধারণ আর্টিষ্ট নন, তিনি পাকা আর্টিষ্ট। চরিত্র-সৃষ্টির জন্যে তিনি ইংরাজী সাহিত্যে বেশ উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। (Encyclopedia Brittanica, 11th Edition, Vol. 29th দেখুন)। এ পর্য্যন্ত Wells সাহিত্যিক। কিন্তু এক বিষয়ে Wells আর সব সাহিত্যিক-দের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে' গিয়েছেন। কারণ তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, রোম্যান্টিসিষ্ট, ঐতিহাসিক, আর সোসিয়ালিষ্ট (Socialist)। তাঁর শ্রেষ্ঠ বইগুলিতে আর্ট, বিজ্ঞান, ইতিহাস আর Sociology'র এমনই সুন্দর সমন্বয় যে, বই পড়ার সময় কোন একটা বিষয়ই বড় হ'য়ে ওঠে না, আর্টের সীমা ছাড়িয়ে যায় না বা চোখে লাগে না। বিজ্ঞানকে রোম্যান্সে পরিণত করতে পেরেছেন শুধু Wells; এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাঁর "Men Like Gods" বইখানি। কিন্তু এই বিজ্ঞানকে সাহিত্যে স্থান দিতে গিয়ে Shaw তাঁর "A Doctor's Dilemma" একেবারে অসুন্দর করে ফেলেছেন।

আজকালকার সাহিত্যিকদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। একদল জীবনের সত্যে পৌঁছাতে চান জীবনের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিশ্লেষণ করে'; আর অপরদল এক একটী অঙ্গ জোড়া লাগিয়ে তবে দেখতে চান। কোন্ দল বড় বলা শক্ত, কেন না, দু'দলই চলেছেন সত্যের সন্ধানে। প্রথম দলের লোকেরা করেন সমালোচনা আর দ্বিতীয় দলের লোকেরা করেন সৃষ্টি। Shaw এই প্রথম দলের লোক; আর Galsworthy, Hardy, Wells এঁরা এই দ্বিতীয় দলের। দ্বিতীয় দলের সাহিত্যিকদের বইয়ে খুব কমই বিশ্লেষণ দেখতে পাওয়া যায়। এঁরা সব সময়েই চরিত্রের সৃষ্টি করে থাকেন। কিন্তু Shawএর (প্রথম দলের) বইয়ের মধ্যে সৃষ্টি নেই বললেও চলে, দু'চারটি পুরুষ চরিত্র ছাড়া। কিন্তু তিনি প্রত্যেক চরিত্রের ব্যবচ্ছেদ করছেন আমাদেরই চোখের সামনে।

Wells, Galsworthy ও Shaw, এঁদের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। Galsworthy ও Wellsএর চোখে সমাজের দোষ ধরা পড়ে তখনই, যখন তাঁরা তাকে সমাজের গুণের back-Groundএ দাঁড় করান। কালোকে দেখাতে হ'লে এঁরা সাদাকে back-ground করেন। কিন্তু Shawএর চোখে কোন জিনিষই ভাল লাগে না যতক্ষণ না তিনি তার ব্যবচ্ছেদ করছেন। আবার, Wells, Galsworthyকে যদি একটি ফুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা যায় যে সেটি কেমন, তাঁরা উত্তর দেবেন হয় ভাল, নয় মন্দ, তাঁদের অন্তরের পছন্দ অপছন্দ হিসাবে; কিন্তু Shawকে বললে, তিনি বলবেন, "দাঁড়াও, আগে একে টুক্‌রা করে অণুবীক্ষণের তলায় ফেলি, তার পরে বলব ভাল কি মন্দ।" যতক্ষণ না তিনি ফুলটিকে ছিঁড়ছেন ততক্ষণ তিনি ভাল কি মন্দ এ কথা বলবেন না, এমন কি সারা পৃথিবী ভাল বললেও। এই কথাগুলি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই। ভালবাসা সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র।

* আর্টের এই সংজ্ঞা রবিবাবুর দেওয়া। "প্রবাসী," ১৩৩০ বৈশাখ দেখুন।

এই ভালবাসা সম্বন্ধে Wells ও Galsworthyর নায়ক নায়িকা বা অন্যান্য চরিত্র শুধু ভালবেসেই তৃপ্ত। তাই Beatrice নায়ককে বলছে "And why do I love you? Not only what is fine in you but what isn't? *For I do.* To-night I love the very rain drops on the fur of your coat......" আমাদের কবির বাণীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে।

"যা' পেয়েছি ভাগ্য বলে মানি,
দিয়েছ তো তব পরশখানি,"—(রবীন্দ্রনাথ)

Wells, Galsworthy, এঁদের কাছে ভালবাসার মূল্য খুবই বেশী। অথচ তাঁদের ভালবাসার কোন লক্ষ্য নেই। তাঁদের নায়ক নায়িকা ভালবাসা অনুভব করেন, তাই Wells এক জায়গায় বলছেন, "O the longing, the longing that is like a physieal pain, the hunger of the heart for one who is intolerably dear..." (The Passionate Friends)। আর এক জায়গায় বলেছেন, "We loved, we made love......*The facts are nothing.* Everything we touched, the meanest things became glorious......It glows in my memory like some bright *casual* flower starting up amid the debris of catastrophe." কিন্তু Shawএর কাছে *facts*এরই দাম বেশী। Shawএর কোন বই থেকে চেতনা দিয়ে ভালবাসাকে অনুভব করা যায় না। কারণ তিনি ভালবাসার ছবি আঁকেন নি; তিনি সমালোচক, তাই ভালবাসারও সমালোচনা করেছেন, "There is no love sincerer than the love of food." (Man and Superman). "Back to Methuselah"র এক জায়গায় Shaw ভালবাসার উদ্দেশ্য দেখিয়েছেন। Maidenএর সঙ্গে Stephenএর বিয়ে হয়েছিল; কিন্তু কিছু দিন পরে Maiden Stephenকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। Stephen তা'কে জিজ্ঞাসা করে যে সে তাকে ভালবাসে কি না। Maiden তা'র উত্তর দিচ্ছে, "Yes, but never to let our hearts grow cold! Never to become as ancients!......Never to change or forget *To be remembered* for ever as the first company of true lovers faithful to this vow too often made and broken by past generations." Shawএর কাছে ভালবাসার উদ্দেশ্য আছে, আবার সেটা অনেকটা Biologistএর কাছে যেমন! তা' ছাড়া Shaw ভালবাসায় বিশ্বাস করেন না। "He does not believe in love. The love scenes in the play of Mr. Shaw are written with intelligence to show how silly lovers are." এই প্রেরণা নিয়ে Wells, Galsworthy, তাঁদের love scenes আঁকেন নি। আমার এই দিক দিয়ে Shawকে দেখার উদ্দেশ্য এই—Shaw আর্টিষ্ট হিসাবে বড় নন। কিন্তু অসামান্য প্রতিভা, নৈতিক উন্নতির ক্ষমতা, তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও সমালোচনার জন্যে তিনি চিরকালই আমাদের শ্রদ্ধা পাবেন। কিন্তু আর্টিষ্ট হিসাবে তাঁর স্থান কোথায়? Galsworthy অন্তরের প্রেরণা দিয়ে লেখেন এ কথা মানি; কিন্তু যে প্রেরণা দিয়ে সাহিত্য হয় সে প্রেরণা দিয়ে কি Shaw তাঁর বই লেখেন? "Candida," ও "Man and Superman" তাঁর শ্রেষ্ঠ বই। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ বইতেও কি সে প্রেরণা আছে যে প্রেরণা নিয়ে Galsworthy তাঁর Forsyte Sagas লিখেছেন বা Wells তাঁর "Kipps", "Tono-Bungay", বা Hardy তাঁর "Jude the Obscure" ও "Life's little Inn" লিখেছেন? সেই জন্যে Shaw যে কি করে' Galsworthy'র সঙ্গে আসন পেলেন এ কথা ঠিক বুঝতে পারি না। এ যেন ডাক্তারের কাছে শিল্পীর আসন। Shaw নির্ভীক। দৃষ্টি তাঁর অতি সূক্ষ্ম। সে দৃষ্টি যেদিকে পড়বে তার শেষ না করে তিনি ছাড়বেন না। জ্ঞানের দিক দিয়ে তার দাম বেশী হতে পারে; কিন্তু সাহিত্যে তার মূল্য কোথায়?

উপসংহারে দিলীপবাবু বলেছেন, "কেবল একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়; সেটা এই যে প্রলোভনে পড়ে বড় শিল্পীরও পতন হয়। Galsworthy Forsyte Sagasএর প্রথম চার খণ্ডের পর শেষ করলে ভাল করতেন।" দিলীপ বাবু কি ভেবে এ কথা বলেছেন জানি না। তবে আমাদের মনে হয় যে White Monkey ও Silver Spoon না হ'লে যেন Forsyte Sagasএর finishing touchই হোত না।

শোক-সংবাদ

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

বিগত ৫ই মার্চ্চ সোমবার অকস্মাৎ সংবাদ আসিল লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আর ইহজগতে নাই। তিনি সুস্থ শরীরে

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

৩রা মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্নের গাড়ীতে তাঁহার পুত্র বহরমপুরের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সিংহের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। পরদিন রবিবার একটী সান্ধ্য-সমিতিতে যোগ দিয়া গৃহে আসিয়া যথারীতি আহারাদি করিয়া শয়ন করেন। পরদিন সোমবার প্রাতঃকালে সাতটার সময়ও তিনি শয্যাত্যাগ না করায় সুশীলচন্দ্র মনে করিলেন, তাঁহার শরীর হয় ত একটু অসুস্থ হইয়াছে, সেই জন্য তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। তিনি তখন স্থানীয় সিভিল সার্জ্জনকে সংবাদ পাঠান। ডাক্তার সাহেব আসিয়া দেখেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে; তিনি পরীক্ষা করিয়া বলেন রাত্রি তিনটায় সময় হৃদযন্ত্রের কার্য্য সহসা লোপ হইয়া গিয়াছিল।

লর্ড সিংহের পরিচয় জানেন না এমন বাঙ্গালী নাই। বৃটিস গবর্ণমেণ্টের যাহা কিছু উচ্চ শ্রেষ্ঠ চাকুরী, বাঙ্গালীর মধ্যে লর্ড সিংহই তাহা লাভ করিয়াছিলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রধান ব্যবহারাজীব হইয়াছিলেন। গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম বড়লাটের আইন-সচিব করেন, তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম লর্ড উপাধি-ভূষিত করেন, তাহাকেই সর্ব্বপ্রথম বিহারের গভর্ণর করেন, তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম সহকারী ষ্টেট সেক্রেটারী করেন। লর্ড সিংহও বৃটিশ শাসনের পরম ভক্ত ছিলেন; তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন যে, ইংরাজ ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিবেন। কন্‌গ্রেসের সভাপতি রূপে তিনি অনেক দিন পূর্ব্বে এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন। এখন সব শেষ হইয়া গেল! ধনে মানে পদ-মর্য্যাদায় সর্ব্বাংশে বড় একজন বাঙ্গালী চলিয়া গেলেন। আমরা তাঁহার বিয়োগে সন্তপ্ত পত্নী, পুত্র কন্যাগণের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি

বাঙ্গালাদেশ, বাঙ্গালার পণ্ডিতসমাজ, ব্রাহ্মণ সমাজ একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে এতদিনে হারাইলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন, প্রকৃত পণ্ডিত ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে দুইজন পণ্ডিতের অপূর্ব্ব বাগবিভূতিতে বাঙ্গলা-দেশে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন পরলোকগত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, অপর জন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি। সে সময়ে বাঙ্গালী এই দুইজন পণ্ডিতের হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা-মূলক বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার কিছুদিন পরেই তর্কচূড়ামণি মহাশয় আর বড় একটা বক্তৃতা করিতেন না, কোন আন্দোলনেও তেমন যোগ দিতেন না। ইদানীং তিনি নিজের ধর্ম্মে কর্ম্মেই নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন, সাংসারিক বিষয়ে একেবারে নির্লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালাদেশের, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-সমাজের একটী অত্যুজ্জ্বল রত্নের তিরোধান হইল।

শেষ-প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১

কাল সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সারা রাত্রি বৃষ্টি পড়িয়াছে। সকাল হইতে সেটা বন্ধ আছে বটে, কিন্তু এলো-মেলো হাওয়ার জ্বালায় আকাশের মেঘ কাটিতে পারে নাই। আজও হয়ত তেমনিই সুরু হইবে এমন আশঙ্কাও আছে। বেলা বোধ হয় তৃতীয় প্রহর। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে আশুবাবুর বসিবার ঘরের সমস্ত শার্সিগুলাই বেলা-বেলি বন্ধ হইয়াছে, তিনি আরাম-কেদারার দুই হাতলের উপর দুই পা মেলিয়া দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি একটা পড়িতেছিলেন, সেই কাগজের পাতার পিছনের দরজার দিকে একটা ছায়া পড়ায় বুঝিলেন এতক্ষণে তাঁহার বেহারার দিবানিদ্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কহিলেন, কাঁচা ঘুমে ওঠোনি তো বাবা, তা'হলে আবার মাথা ধরবে। বিশেষ কষ্ট বোধ না করো ত গায়ের কাপড়টা দিয়ে গরীবের পা দুটো একটু ঢেকে দাও।

নীচের কার্পেটে একখানা শাল লুটাইতেছিল, আগন্তুক সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাঁহার দুই পা বেশ করিয়া ঢাকিয়া দিয়া পায়ের তলা পর্য্যন্ত বেশ করিয়া মুড়িয়া দিল।

আশুবাবু কহিলেন, হয়েছে বাবা, আর অতি-যত্নে কাজ নেই। এইবার একটা চুরুট দিয়ে আর একটুখানি গড়িয়ে নাওগে,—এখনো একটু বেলা আছে। কিন্তু বুঝবে বাবা কাল।

অর্থাৎ কাল তোমার চাকুরি যাইবেই। কোন সাড়া আসিলনা, কারণ প্রভুর এবম্বিধ মন্তব্যে ভৃত্য অভ্যস্ত। প্রতিবাদ করাও যেমন নিষ্প্রয়োজন, বিচলিত হওয়াও তেমনি বাহুল্য।

আশুবাবু হাত বাড়াইয়া চুরুট গ্রহণ করিলেন, এবং দেশলাই জ্বালার শব্দে এতক্ষণে লেখা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অভিভূতের মত স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, তাই তো বলি, একি মোধোর হাত। এমন কোরে পা ঢেকে দিতে তো তার চোদ্দ পুরুষে জানেনা।

কমল বলিল, কিন্তু এদিকে যে আমার হাত পুড়ে যাচ্চে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া জ্বলন্ত কাঠিটা তাহার হাত হইতে ফেলিয়া দিলেন, এবং সেই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহাকে জোর করিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, এতদিন তোমাকে দেখ্‌তে পাইনি কেন মা?

এই প্রথম তাহাকে তিনি মাতৃ সম্বোধন করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের যে কোন অর্থ নাই তাহা উচ্চারণ করিবামাত্র তিনি নিজেই টের পাইলেন।

কমল একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া দূরে বসিতে যাইতেছিল, তিনি তাহা হইতে দিলেননা, বলিলেন, ওখানে নয় মা, তুমি আমার খুব কাছে এসে বোসো। এই বলিয়া তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। বলিলেন, এমন হঠাৎ যে কমল?

কমল কহিল, আজ ভারি ইচ্ছে হ'ল আপনাকে একবার দেখে আসি,—তাই চলে এলাম।

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু কহিলেন, বেশ করেছো। কিন্তু ইহার অধিক আর তিনি বলিতে পারিলেন না। অন্যান্য সকলের মতো তিনিও জানেন এদেশে কমলের সঙ্গী সাথী নাই, কেহ তাহাকে চাহেনা, কাহারও বাটীতে তাহার যাইবার অধিকার নাই—নিতান্ত নিঃসঙ্গ জীবনই এই মেয়েটিকে অতিবাহিত করিতে হয়, তথাপি এমন কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না—কমল তোমার যখন খুসি স্বচ্ছন্দে আসিয়ো। আর যাহার কাছেই হোক্, আমার কাছে তোমার কোন সঙ্কোচ নাই। ইহার পরে বোধ করি কথার অভাবেই তিনি মিনিট দুই তিন কেমন একপ্রকার অন্যমনস্কের মত মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাতের কাগজগুলা নিচে খসিয়া পড়িতেই কমল হেঁট হইয়া তুলিয়া দিয়া কহিল, আপনি পড়ছিলেন, আমি অসময়ে এসে বোধ হয় বিঘ্ন কোরলাম।

আশুবাবু বলিলেন, না। পড়া আমার হয়ে গেছে।

যেটুকু বাকি আছে তা না পড়লেও চলে—আর বিশেষ ইচ্ছেও নেই। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, তা'ছাড়া তুমি চলে গেলে আমাকে একলা থাকৃতেই তো হবে, তার চেয়ে বোসে ছুটো গল্প করো আমি শুনি।

কমল কহিল, আমি তো আপনার সঙ্গে সারাদিন গল্প করতে পেলে বেঁচে যাই। কিন্তু আর সকলে রাগ করবেন যে? তাহার মুখের হাসি সত্বেও আশুবাবু ব্যথা পাইলেন; কহিলেন, কথা তোমার মিথ্যে নয় কমল। কিন্তু যাঁরা রাগ করবেন তাঁরা কেউ উপস্থিত নেই। এখানকার নতুন ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালী। তাঁর স্ত্রী হচ্চেন মণির বন্ধু, একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন। দিন দুই হ'ল তিনি স্বামীর কাছে এসেছেন,—মণি তাঁর ওখানেই বেড়াতে গেছেন। ফিরতে বোধ হয় রাত্রি হবে।

কমল সহাস্তে প্রশ্ন করিল, আপনি বললেন যাঁরা রাগ করবেন। একজন তো মনোরমা, কিন্তু বাকি কারা?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই। এখানে তার অভাব নেই। আগে মনে হোতো অজিতের হয়ত তোমার প্রতি রাগ নেই, কিন্তু এখন দেখি তার বিদ্বেষই যেন সবচেয়ে বেশি। যেন অক্ষয় বাবুকেও হার মানিয়েছে।

কমল চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এসেও তাকে এমন দেখিনি, কিন্তু হঠাৎ দিন দুত্তিনের মধ্যে সে যেন বদলে গেল। এখন অবিনাশকেও দেখি তাই। এরা সবাই মিলে যেন তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে।

এবার কমল হাসিল, কহিল, অর্থাৎ কুশাঙ্কুরের উপর বজ্রাঘাত! কিন্তু আমার মত সমাজ ও লোকালয়ের বাইরে তুচ্ছ একজন মেয়ে মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কিসের জন্তে? আমি তো কারও বাড়ীতেই যাইনে।

আশুবাবু বলিলেন, তা' যাওনা সত্যি। সহরের কোথায় তোমাদের বাসা তাও কেউ জানেনা, কিন্তু তাই বলে তুমি তুচ্ছ নয় কমল। তাই তোমাকে এরা ভুলতেও পারেনা, মাপ করতেও পারেনা। তোমার আলোচনা না ক'রে, তোমাকে খোঁটা না দিয়ে এদের স্বস্তিও নেই, শান্তিও নেই। অকস্মাৎ হাতের কাগজগুলা তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এটা কি জান? অক্ষয় বাবুর রচনা। ইংরেজী না হলে তোমাকে পড়ে শুনাতাম। নাম ধাম নেই, কিন্তু এর আগাগোড়া শুধু তোমারই কথা. তোমাকেই আক্রমণ। কাল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ীতে নাকি নারী-কল্যাণ-সমিতির উদ্বোধনহবে,—এ তারই মঙ্গল-অনুষ্ঠান। এই বলিয়া তিনি সেগুলা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, এ শুধু প্রবন্ধ নহে, মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়ে নানা কথা বার করা হয়েছে। এর মূল নীতির সঙ্গে কারও বিরোধ নেই,—বিরোধ থাকতেই পারে না, কিন্তু, এ তো সে নয়। ব্যক্তি-বিশেষকে পদে পদে আঘাত করতে পারাই যেন এর আসল আনন্দ। কিন্তু অক্ষয়ের আনন্দ আর আমার আনন্দ তো এক নয় কমল, একে তো আমি ভাল বলতে পারিনে।

কমল কহিল, কিন্তু আমি তো আর এ লেখা শুনতে যাবোনা,—আমাকে আঘাত করার সার্থকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, কোন সার্থকতাই নেই। তাই বোধহয় ওরা আমাকে পড়তে দিয়েছে। ভেবেছে ভরা-ডুবির মুষ্টি লাভ। বুড়োকে দুঃখ দিয়ে যতটুকু ক্ষোভ মেটে। এই বলিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া কমলের হাতখানি আর একবার টানিয়া লইলেন। এই স্পর্শ টুকুর মধ্যে যে কি কথা ছিল কমল তাহার সবটুকু বুঝিলনা, তবু তাহার ভিতরটার কি একরকম করিয়া উঠিল। একটু থামিয়া কহিল, আপনার দুর্ব্বলতাটুকু তাঁরা ধরেছেন, কিন্তু আসল মানুষটিকে তাঁরা চিনতে পারেননি।

তুমিই কি পেরেচো মা?

বোধহয় ওঁদের চেয়ে বেশি পেরেচি।

আশুবাবু ইহার উত্তর দিলেননা, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, সবাই ভাবে এই সদানন্দ বুড়োলোকটির মত সুখী কেউ নেই। অনেক টাকা, অনেক বিষয় আশয়—

কিন্তু এ তো মিথ্যে নয়।

আশুবাবু বলিলেন, না, মিথ্যে নয়। অর্থ এবং সম্পত্তি আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু ও মানুষের কতটুকু কমল?

কমল সহাস্তে কহিল, অনেকখানি আশুবাবু।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন, পরে কহিলেন, যদি কিছু না মনে করো ত তোমাকে একটা কথা বলি,—

বলুন।

আমি বুড়োমানুষ, আর তুমি আমার মণির সম-বয়সী।

তোমার মুখ থেকে আমার নিজের নামটা আমার নিজের কানেই যেন বাধ্‌লো কমল। তোমার বাধা না থাকে তো আমাকে বরঞ্চ কাকাবাবু বলে ডেকো।

কমল বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, কথায়, আছে নেই-মামার চেয়ে কানা-মামাও ভালো। আমি কানা নই বটে, কিন্তু খোঁড়া,—বাতে পঙ্গু। বাজারে আশুবদ্যির কেউ কানা-কড়ি দাম দেবেনা। এই বলিয়া তিনি সহাস্য কৌতুকে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, না-ই দিলে মা, কিন্তু যার বাবা বেঁচে নেই তার অত খুঁত্‌খুঁতে হলে চলেনা। তার খোঁড়া-কাকাই ভালো।

অন্য পক্ষ হইতে জবাব না পাইয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কেউ যদি খোঁটাই দেয় কমল, তাকে বিনয় কোরে বোলো, এই আমার ঢের। বোলো, গরীবের রাঙই সোনা।

তাঁহার চেয়ারের পিছন দিকে বসিয়া কমল ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া অশ্রু নিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল; উত্তর দিতে পারিলনা। এই দুজনের কোথাও মিল নাই; শুধু অনাত্মীয়-অপরিচয়ের সুদূর ব্যবধানই নয়, শিক্ষা, সংস্কার, রীতি-নীতি, সংসার ও সামাজিক ব্যবস্থায় উভয়ের কত বড়ই না প্রভেদ! কোন সম্বন্ধই যেখানে নাই, সেখানে শুধু কেবল একটা সম্বোধনের ছল করিয়া এই বাঁধিয়া রাখিবার কৌশলে কমলের চোখ দিয়া বোধহয় বহুকাল পরে জল গড়াইয়া পড়িল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মা, পারবে তো বল্‌তে?

কমল তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, না।

না? না কেন?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিলনা, অন্য কথা পাড়িল। কহিল, অজিতবাবু কোথায়?

আশুবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কি জানি, হয়ত' বাড়ীতেই আছে। পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ক'দিন থেকে আমার কাছে বড় একটা সে আসেনা। হয়ত সে এখান থেকে শীঘ্রই চলে যাবে।

কোথায় যাবেন?

আশুবাবু একটুখানি হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, বুড়োমানুষকে সবাই কি সব কথা বলে মা? বলে না। হয়ত' প্রয়োজনও বোধ করেনা। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুনেচো বোধহয় মণির সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ অনেকদিন থেকেই স্থির ছিল, হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ওরা কি নিয়ে একটা ঝগড়া করেছে। কেউ কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই কয়না।

কমল নীরব হইয়া রহিল; আশুবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জগদীশ্বর মালিক, তাঁর ইচ্ছে। একজন গান-বাজ্‌না নিয়ে মেতে উঠেচে, আর একজন তার পুরোনো অভ্যাস সুদে-আসলে ঝালিয়ে তোলবার জোগাড় করচে। এই তো চল্‌চে।

কমল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলনা, কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, কি তাঁর পুরোনো অভ্যাস?

আশুবাবু বলিলেন, সে অনেক। গেরুয়া প'রে সন্ন্যাসী হয়েছে, মণিকে ভাল বেসেছে, দেশের কাজে বন্দী হ'য়ে জেল খেটেছে, বিলেত গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, ফিরে এসে সংসারী হবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বোধহয় সেটা একটু বদ্‌লেছে। আগে মাছ-মাংস খেতোনা, তারপরে খাচ্ছিলো, আবার দেখ্‌চি পরশু থেকে বন্ধ করেছে। মোধো বলে বাবু ঘণ্টা-খানেক ধ'রে ঘরে বোসে নাক টিপে নাকি যোগাভ্যাস করেন।

যোগাভ্যাস করেন?

হাঁ। মোধোই বল্‌ছিল ফেরবার পথে কাশীতে নাকি সমুদ্র-যাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে।

কমল অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সমুদ্র-যাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবেন? অজিতবাবু?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, পারে ও। ওর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা।

কমল হাসিয়া ফেলিল। কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে মানুষের ছায়া পড়িল। এবং, যে-মোধো এত বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ মনিবকে সরবরাহ করিয়াছে সেই আসিয়া সশরীরে দণ্ডায়মান হইল। এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সংবাদ এই দিল যে, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন্দ্র, অজিত প্রভৃতি বাবুদের দল আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। শুনিয়া শুধু কমল নয়, বন্ধুবর্গের অভ্যাগমে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে অভ্যর্থনা করাই যাঁহার স্বভাব, সেই আশুবাবুর পর্য্যন্ত সমস্ত মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। আগন্তুক ভদ্রব্যক্তিরা সকলেই চমকিত হইলেন। কারণ এই মেয়েটির এখানে

এভাবে দর্শন মিলিতে পারে তাহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত। হরেন্দ্র হাত তুলিয়া কমলকে নমস্কার করিয়া কহিল, ভাল আছেন? অনেকদিন আপনাকে দেখিনি।

অবিনাশ হাসিবার মত মুখভঙ্গী করিয়া একবার দক্ষিণে ও একবার বামে ঘাড় নাড়িলেন—তাহার কোন অর্থ ই নাই। আর সোজা মানুষ অক্ষয়। সে সোজা পথে সোজা মৎলবে চলিতে ভালবাসে। তাই, কাঠের মত ক্ষণকাল সোজা দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অবজ্ঞা ও বিরক্তি বর্ষণ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। আশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আর্টিকেলটা পড়লেন? বলিয়াই তাহার নজরে পড়িল সেই লেখাটা মাটিতে লুটাইতেছে। নিজেই তুলিতে যাইতেছিল, হরেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল, থাক্‌না অক্ষয়-বাবু, ঝাঁট দেবার সময় চাকরটা ফেলে দেবে অখন।

তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া অক্ষয় কাগজগুলা কুড়াইয়া আনিলেন।

হাঁ, পড়লাম, বলিয়া আশুবাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, অজিত ও-ধারের সোফায় বসিয়া সেই দিনের খবরের কাগজটায় চোখ বুলাইতে সুরু করিয়াছে। অবিনাশ কিছু একটা বলিতে পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কহিল আমিও অক্ষয়ের লেখাটা আগাগোড়া মন দিয়ে পড়েচি, আশুবাবু। ওর অধিকাংশই সত্য এবং মূল্যবান। দেশের সামাজিক ব্যবস্থার যদি সংস্কার করতেই হয় তো এই ধারাতেই করা উচিত। বহু-পরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পথেই তাদের চালনা করা কর্ত্তব্য। ইয়োরোপের সংস্পর্শে আমরা অনেক ভাল জিনিস পেয়েছি, নিজেদের বহু ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েচে মানি, কিন্তু আমাদের সংস্কার আমাদের নিজের পথেই হওয়া চাই। পরের অনুকরণের মধ্যে কল্যাণ নেই—ভারতীয় নারীর যা বিশিষ্টতা, যা তাঁদের নিজস্ব, সে থেকে যদি লোভ বা মোহের বশে তাঁদের ভ্রষ্ট করি আমরা সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হব। এই না অক্ষয়বাবু?

কথাগুলি ভালো, এবং সমস্তই অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধের। বিনয়বশে তিনি মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু আত্ম-প্রসাদের অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে বার কয়েক শিরশ্চালন করিলেন।

আশুবাবু অকপটে স্বীকার করিয়া কহিলেন, এ নিয়ে তো তর্ক নেই অবিনাশবাবু। বহু মনীষী বহুদিন থেকে এ কথা বলে আস্‌ছেন, এবং বোধহয় ভারতবর্ষের কোন লোকই এর প্রতিবাদ করে না।

অক্ষয়বাবু বলিলেন, করবার যো নেই। এবং এ ছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে যা প্রবন্ধে লিখিনি, কিন্তু কাল নারী-কল্যাণ-সমিতিতে আমি বক্তৃতায় বোল্‌ব।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া কমলের প্রতি চাহিলেন, কহিলেন, তোমার তো আর সমিতিতে নিমন্ত্রণ নেই, তুমি সেখানে যাবে না। তবু, এ তোমাদেরই ভাল-মন্দের কথা। হাঁ কমল, তোমার তো এ প্রস্তাবে আপত্তি নেই? এ যে সত্য তা' তুমিও মানো তো?

কমল মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, কোন্‌টা আশুবাবু? অনুকরণটা না ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটা?

আশুবাবু কহিলেন, ধরো, যদি বলি দুটোই?

কমল কহিল, অনুকরণ জিনিসটা শুধু যখন বাইরের নকল, তখন সে ফাঁকি। ফাঁকি যে সত্য নয় সে সবাই জানে। কিন্তু অন্তরে-বাহিরে' সে যখন এক হয়ে মেলে তার মধ্যে আর ফাঁক থাকে না। তাতে লজ্জা পাবার তো আমি কিছুই দেখ্‌তে পাইনে।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আছে বই কি কমল, আছে। সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজের বিশেষত্ব হারাই। তার মানে আপনাকে হারানো। এর মধ্যে যদি দুঃখ এবং লজ্জা পাবার কিছু না থাকে তো কিসের মধ্যে অ'ছে বলো ত?

কমল বলিল, গেলোই বা বিশেষত্ব আশুবাবু। ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং ইয়োরোপের বৈশিষ্ট্যে প্রভেদ আছে,—কিন্তু কোন দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যেই মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই তার আদর। আসল কথা বর্ত্তমান কালে সে বৈশিষ্ট্য তার কল্যাণকর কি না। তা যদি না হয়, সে তো শুধু একটা অন্ধ মোহ।

আশুবাবু ব্যথিত হইয়া কহিলেন, শুধুই অন্ধ মোহ কমল, তার বেশি নয়?

কমল বলিল, না, তার বেশি নয়। কোন একটা জাতের বিশেষত্ব বহুদিন ধরে চলে আসচে বলেই সেই ছাঁচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুল্‌তে হবে তার অর্থ নেই। মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর

তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই। সেইখানেই সত্যিকার লজ্জা আশুবাবু।

আশুবাবু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কহিলেন, তা'হলে তো সমস্ত একাকার হয়ে যাবে? ভারতবর্ষীয় বলে তো আমাদের আর চেনাও যাবে না?

তাঁহার কুণ্ঠিত, বিক্ষুব্ধ মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া ফেলিল, বলিল, মুনি-ঋষিদের বংশধর ব'লে হয়ত চেনা যাবেনা, কিন্তু মানুষ বলে চেনা যাবে। আর আপনারা যাঁকে ভগবান বলেন তিনিও চিন্‌তে পারবেন, তাঁর ভুল হবে না।

অক্ষয় উপহাসে মুখ কঠিন করিয়া বলিল, ভগবান শুধু আমাদের? আপনার নয়?

কমল উত্তর দিল, না।

অক্ষয় বলিল, এ শুধু শিবনাথের প্রতিধ্বনি, শেখানো বুলি!

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট।

দেখুন হরেন্দ্র বাবু—

দেখেচি। বিষ্ট।

আশুবাবু সহসা যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিলেন। কহিলেন, স্থাখো কমল, অন্তের কথা জানিনে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য শুধু কথার কথা নয়। এ যাওয়া যে কতবড় ক্ষতি তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। কত ধর্ম্ম, কত আদর্শ, কত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, উপাখ্যান, শিল্প,—কত অমূল্য সম্পদ এই বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করেই তো আজও জীবিত আছে। এর কিছুই তো তাহলে থাক্‌বেনা?

কমল কহিল, থাক্‌বার জন্তেই বা এত ব্যাকুলতা কেন? যা' যাবার নয় তা' যাবেনা। মানুষের প্রয়োজনে আবার তারা নতুন রূপ, নতুন আদর্শ, নতুন সৌন্দর্য্য নিয়ে দেখা দেবে। সেই হবে তাদের সত্যিকার পরিচয়। নইলে, বহুদিন ধরে কিছু একটা আছে বলেই তাকে আরও বহুদিন ধরে আগ্‌লে রাখ্‌তে হবে এ আমি মানিনে।

অক্ষয় বলিলেন, আপনার মানা না-মানায় কিছুই আসে যায়না।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার অভদ্র ব্যবহারে আমি আপত্তি করি অক্ষয় বাবু।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তোমার যুক্তিতে সত্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যা তুমি অবজ্ঞায় উপেক্ষা কোরচ, তার ভেতরেও বহু সত্য আছে। নানা কারণে আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরে তোমার অশ্রদ্ধা জন্মেছে। কিন্তু একটা কথা ভুলোনা কমল, বাইরের অনেক উৎপাত আমাদের সইতে হয়েছে, তবু যে আজও সমস্ত বিশিষ্টতা নিয়ে বেঁচে আছি সে কেবল আমাদের সত্য আশ্রয় ছিল বলেই। জগতের অনেক জাতিই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল বলিল, তাতেই বা দুঃখ কিসের? চিরকাল ধরেই যে তাদের যায়গা জু'ড়ে বসে থাকতে হবে তারই বা আবশ্যকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, এ অন্য কথা কমল।

কমল কহিল, তা হোক্। বাবার কাছে শুনেছিলাম আর্য্যদের একটা শাখা ইয়োরোপে গিয়ে বাস করেছিলেন, আজ তাঁরা নেই। কিন্তু তাঁদের বদলে যাঁরা আছেন তাঁরা আরও বড়। তেম্‌নি যদি এদেশেও ঘট্‌তো, পূর্ব্ব পিতা-মহদের জন্যে আজ আমরা শোক করতেও বোস্‌তামনা, নিজেদের সনাতন বিশেষত্ব নিয়ে দম্ভ করেও দিনপাত কোরতামনা। আপনি বলছিলেন অতীতের উপদ্রবের কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড় উপদ্রব যে ভবিষ্যতে অদৃষ্টে নেই, কিম্বা সমস্ত ফাঁড়াই আমাদের কেটে নিঃশেষ হয়ে গেছে তাও সত্য না হ'তে পারে আশুবাবু। তখন আমরা বেঁচে যাবো কিসের জোরে বলুন ত?

আশুবাবু এ প্রশ্নের উত্তর দিলেননা, কিন্তু অক্ষয়বাবু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তখনও বেঁচে যাবো আমাদের আদর্শের নিত্যতার জোরে, যে আদর্শ বহু সহস্র যুগ আমাদের মনের মধ্যে অবিচলিত হয়ে আছে। যে আদর্শ আমাদের দানের মধ্যে, আমাদের পুণ্যের মধ্যে, আমাদের তপস্যার মধ্যে আছে। যে আদর্শ আমাদের নারীজাতির অক্ষয়-সতীত্বের মধ্যে নিহিত আছে আমরা তারই জোরে বেঁচে যাবো। হিন্দু কখনো মরেনা।

অজিত হাতের কাগজ ফেলিয়া তাঁহার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল, এবং মুহূর্ত্ত কালের জন্য কমলও নির্ব্বাক হইয়া গেল। তাহার আশুবাবুর কথা মনে পড়িল, মনে পড়িল প্রবন্ধ লিখিয়া এই লোকটাই তাহাকে অকারণে আক্রমণ করিয়াছে, এবং ইহাই সে কাল নারীর কল্যাণ-

উদ্দেশ্যে বহু নারীর সমক্ষে দম্ভের সহিত পাঠ করিবে। এবং, এই শেষোক্ত ইঙ্গিত শুধু তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া। দুর্জ্জয় ক্রোধে মুখ তাহার আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে কথা কইতে আমার ইচ্ছে হয়না অক্ষয়বাবু, আমার আত্মসম্মানে বাধে। বলিয়াই সে আশুবাবুর প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকালস্থায়ী হয়না, এবং তার পরিবর্ত্তনেও লজ্জা নেই,—এই কথাটাই আপনাকে আমি বল্‌তে চেয়েছিলাম। তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য যদি যায়, তবুও। একটা উদাহরণ দিই। আতিথেয়তা আমাদের বড় আদর্শ। কত কাব্য, কত উপাখ্যান, কত ধর্ম্ম-কাহিনী এই নিয়ে রচিত হয়েছে। অতিথিকে খুসি করতে দাতাকর্ণ নিজের পুত্রহত্যা করেছিলেন। এই নিয়ে কত লোকে কত চোখের জলই যে ফেলেছে তার সংখ্যা নেই। অথচ, এ কাহিনী আজ শুধু কুৎসিত নয়, বীভৎস। সতী স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল,—সতীত্বের এ আদর্শেরও একদিন তুলনা ছিলনা,—কিন্তু আজ সে কথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে। আপনার নিজের জীবনের যে আদর্শ, যে ত্যাগ লোকের মনে আজ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে, একদিন সে হয়ত শুধু করুণার ব্যাপার হবে। এই নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহের বাড়াবাড়িতে লোকে উপহাস করে চলে যাবে।

এই আঘাতের নির্ম্মমতায় মুহূর্ত্তকালের জন্য আশুবাবুর মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। বলিলেন, কমল, একে নিগ্রহ ব'লে নিচ্চো কেন, এ যে আমার আনন্দ। এ যে আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বহু যুগের আদর্শ!

কমল বলিল, হোক্ বহু যুগ। কেবল বৎসর গণনা করেই আদর্শের মূল্য ধার্য্য হয়না। অচল, অনড়, ভুলে-ভরা সমাজের সহস্র বর্ষও হয়ত অনাগতের দশটা বছরের গতিবেগে ভেসে যায়। তা'র সেই দশটা বছরই ঢের বড় আশুবাবু।

অজিত অকস্মাৎ জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, আপনার বাক্যের উগ্রতায় এঁদের হয়ত বিস্ময়ের অবধি নেই, কিন্তু আমি বিস্মিত হইনি। আমি জানি এই বিজাতীয় মনোভাবের উৎস কোথায়। কিসের জন্যে আমাদের সমস্ত মঙ্গল-আদর্শের প্রতি আপনার এতবড় নিবিড় ঘৃণা। কিন্তু চলুন, আর আমাদের মিথ্যে দেরী করবার সময় নেই,—পাঁচটা বেজে গেছে।

অজিতের পিছনে পিছনে সকলেই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কেহ তাহাকে একটা অভিবাদন করিল না, কেহ তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না। সকলে চলিয়া গেলে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, কমল, আমাকেই আজ তুমি সকলের চেয়ে বেশী আঘাত করেছ, কিন্তু তোমাকেই আজ যেন আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেচি। আমার মণির চেয়ে যেন তুমি কোন অংশেই ছোট নয় মা।

কমল বলিল, তার কারণ আপনি যে সত্যিকার বড়-মানুষ কাকাবাবু। আপনি তো এঁদের মত মিথ্যে নয়। কিন্তু আমারও সময় বয়ে যায়, আমি চোল্‌লাম। এই বলিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

প্রণাম সে সচরাচর কাহাকেও করে না, তাই এই অভাবনীয় আচরণে আশুবাবু অকস্মাৎ যেন ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, আবার কবে আসবে মা?

আর হয়ত আমি আস্‌বনা কাকাবাবু। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আশুবাবু শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলেন। এ কথা তাঁহার মনেও উদয় হইল না এই মেয়েটি কতবড় কথাই না তাঁহাকে বলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সাময়িকী

চৈত্রের "ভারতবর্ষে"র প্রচ্ছদপট যাঁহার প্রতিকৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইল তিনি দেশবিশ্রুত পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব কর্ণধার মনীষী স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হাবড়া জেলার নারীট গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ৺ হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত। ইনি প্রথমে মহিষাদল রাজ-ষ্টেটের দ্বারপণ্ডিত, পরে কলিকাতার মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাটীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র

মহেশচন্দ্র বাল্যে মেদিনীপুর, ঘাটাল, রসিকগঞ্জনিবাসী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ স্বর্গীয় ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ৺কাশীধামে ৺বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ও পরমহংস জ্যোতিঃস্বরূপের নিকট বেদ, উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা সমাপন করেন। পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। অনন্তর তিনি সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেব কর্তৃক উক্ত কলেজের অধ্যাপক পদে বৃত হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মহেশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামে গমন করেন। কাশীতে মহেশচন্দ্রের বিস্তর সংকীর্ত্তির কথা প্রচলিত আছে। তাঁহার চেষ্টায় ৺অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরে ও অন্যান্য দেবালয়ে যাত্রীগণের উপর অযথা উৎপীড়ন নিবারিত হয়। কলিকাতা এবং অন্যত্রও তাঁহার বহু সদনুষ্ঠান বিরাজিত। তন্মধ্যে পঞ্জিকা-সংস্কার, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় টোল ও চতুষ্পাঠী সমূহে গবর্মেণ্ট কর্তৃক বৃত্তিদানের ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার প্রবর্ত্তন, ইডেন হিন্দু হোষ্টেল নির্ম্মাণার্থ অর্থসংগ্রহ, হাবড়া-আমতা রেলওয়ে নির্ম্মাণের ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহেশচন্দ্র সটীক কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ, মীমাংসাদর্শন, কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণ তহবিলের পক্ষেও বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি সি-আই ই এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ভূষিত হন। স্ব গ্রাম নারীটে ইনি একটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৩১২ সালের ২৯শে চৈত্র মহেশচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

বিগত হরতাল উপলক্ষে কলিকাতা সহরে যে গোলমাল, হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহার সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। সে সময় কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটনের সহিত কলেজের ছাত্রগণের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কথাও কেহ এত শীঘ্র ভুলিয়া যান নাই। এই উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করা হয়, কলেজের ছাত্রাবাস ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের সমস্ত ছাত্রকে ছাত্রাবাস হইতে বিতাড়িত করা হয়। তাহার পরই কন্‌ভোকেশনের বক্তৃতায় মাননীয় চ্যানসেলর বঙ্গের গবর্ণর শ্রীযুক্ত জ্যাক্‌সন মহোদয় যে ভীতি-প্রদর্শন করেন, তাহাও সকলে অবগত আছেন। যাহা হউক, সুখের বিষয় এই যে, এই গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে, শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। বিগত ৩রা মার্চ্চ তারিখে প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বার মুক্ত হইয়াছে, ছাত্রেরা 'দিয়াছে মন নিজ নিজ পাঠে'। ইডেন হিন্দুহোষ্টেলেও ২রা মার্চ্চ অপরাহ্ণকাল হইতে হাঁড়ি চড়িয়াছে, ছাত্রেরা অনেকে আবাসে গমন করিয়াছেন। গবর্ণর বাহাদুর এই উপলক্ষে শান্তিতে বাস করিয়া লেখাপড়া করিতে ছাত্রদিগকে উপদেশ দিয়া এক পত্র বাহির করিয়াছেন। যাক্, ছাত্র ও শিক্ষকগণের মনোমালিন্য দূর হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারের পর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টনকে স্থানান্তরিত করা হইবে; এমন কি জনরব প্রচারিত হইয়াছিল যে, তিনি বর্দ্ধমান বিভাগের ইনেস্পেক্টর হইবেন, হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রামস্‌বোথাম প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল হইবেন এবং শ্রীযুক্ত ব্যারো সাহেব তাঁহার স্থলে হুগলীতে আসিবেন। এখন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, শ্রীযুক্ত রামস্‌বোথাম ও শ্রীযুক্ত ব্যারো এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; সুতরাং শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টনই আপাততঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্ত্তা থাকিয়া গেলেন।

আগামী বড়দিনের সময় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর রাজধানীতে হইবে। এখন হইতেই তাহার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ইন্দোরে বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক নাই; বোধ হয় সেই জন্যই সেখানকার বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ এত পূর্ব্বেই সমস্ত ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে; ইন্দোর ও ঐ প্রদেশের নানা স্থানের প্রতিষ্ঠাপন্ন বাঙ্গালীগণ এই সমিতির সদস্য হইয়াছেন। ইন্দোরের হোলকার কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, বঙ্গ-গৌরব শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে মূল সভাপতি পদে বৃত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। আমরা

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের এই প্রচেষ্টার সাফল্য সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

আমরা এতদিন বিলাতে নির্ম্মিত ওয়াটারপ্রুফ বা বর্ষাতিই ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম। এমন প্রবল স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও এ দিকে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। যাহা হউক, ১৯২৫ অব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উৎসাহে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম-এ, বি-এল্ মহাশয় এই বর্ষাতি প্রস্তুতের কারখানা খোলেন; এবং নানা প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে তাঁহার প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে; তাঁহার কারখানার প্রস্তুত বর্ষাতি বিলাতী জিনিস অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। মনোরঞ্জন বাবু এই শ্রেণীর ব্যাপারে নূতন ব্রতী নহেন। তিনি পূর্ব্বে বঙ্গ-লক্ষ্মী মিলের প্রধান রাসায়নিক ছিলেন, সুতরাং তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার পিতা রেবতীমোহন ঘোষ মহাশয় ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারীপুরের প্রধান উকিল ছিলেন; তাঁহারই নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া মনোরঞ্জনবাবু স্বদেশী কার্য্যে ব্রতী হয়েন। অল্পদিন পূর্ব্বে রেবতীবাবু স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রই তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিবেন।

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে সরকার পক্ষ হইতে ১৯২৮-২৯ সালের আয়-ব্যয়ের বাজেট্ বা হিসাব দাখিল করা হইয়াছে। চলিত বৎসরে বঙ্গীয় সরকার আয় অপেক্ষা ব্যয়ের হিসাব অধিক করিয়াছিলেন; আগামী বর্ষেও তাহাই করিবার বরাদ্দ হইয়াছে। এই বৎসরে আনুমানিক আয় ১০,৯২,৬১,০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; ব্যয় ধরা হইয়াছে ১১,৮৪,৫১,০০০ টাকা। ইহাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৯১,৯০,০০০৲ টাকা বেশী হইবে। বাজেটের ব্যবস্থাতে কলিকাতা মাদ্রাসা ও ইস্‌লামিয়া কলেজের ছাত্রদিগের খেলা ও সাঁতার শিক্ষার নিমিত্ত সরকার দুই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আর ঢাকা মুস্‌লিম্ হলের জন্য ৩ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা এ ব্যবস্থায় ঈর্ষান্বিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই; মুসলমান ছাত্রগণের অভাব যে অধিক, তাহা আমরা জানি। তবুও সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যে সকল অভাব আছে, তাহা খেলা বা সাঁতার শিক্ষা বা বৈঠকখানা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে; তাদের দিকেও একটু দৃষ্টিপাত করিলে কি সঙ্গত ও শোভন হইত না?

ই, আই, রেল পরামর্শ-সমিতির কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণের চেষ্টায় উক্ত রেল-কর্ত্তৃপক্ষ প্রাচীন ইতিহাস, কলা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের জন্য আগামী ইষ্টারের ছুটীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক বিশেষ ট্রেণের ব্যবস্থা করিতেছেন। উপযুক্ত পরিমাণ ছাত্র হইলে আগামী ২রা এপ্রিল তারিখে উহা হাওড়া হইতে ছাড়িবে এবং কাশী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, দিল্লী, আগ্রা ও বিন্ধ্যাচল পরিভ্রমণ করিবে। ভাড়া, আহার ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ প্রত্যেক ছাত্রকে ৬০ টাকা দিতে হইবে। ভ্রমণার্থীকে ট্রেণ ছাড়িবার ১৪ দিন পূর্ব্বে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা কলেজের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট দেখাইয়া টিকিট ক্রয় করিতে হইবে। উক্ত স্পেশাল ট্রেণে কয়েক জন অভিজ্ঞ অধ্যাপকের অধীনে দুই শত ছাত্রের ভ্রমণের বন্দোবস্ত থাকিবে। ট্রেণের সঙ্গে হিন্দু কন্‌ট্রাক্টর দ্বারা পরিচালিত ভোজনাগার থাকিবে। রেল কোম্পানী এ ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রগণের জ্ঞানার্জ্জনের একটা সুন্দর পথ দেখাইয়াছেন। দেশ-ভ্রমণ ও পুরাকীর্ত্তিদর্শন যে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ তাহা আমাদের দেশের শিক্ষা-বিভাগ বা ছাত্রগণের অভিভাবকেরা কখন ভাবিয়া দেখেন নাই; ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রগণের অধীত বিষয়ের হাতে-কলমে শিক্ষাপ্রদানের জন্য কোথাও লইয়া যাইবার ব্যবস্থা অবশ্য ছিল; কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের দেশ-ভ্রমণ-স্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার কোন ব্যবস্থা ইতঃপূর্ব্বে হয় নাই। ছাত্রপ্রতি ৬০৲ টাকা ব্যয়ও অতিরিক্ত নহে; বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকগণ সঙ্গে থাকিবেন। আমাদের বিশ্বাস দুই শতের অনেক অধিক ছাত্র এই ভ্রমণে যোগ দিবেন।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকানগরীতে শ্রীমতী লীলা নাগ এম-এ এবং অপর কয়েকটী মহিলার উদ্যোগে "দীপালি" সমিতি সংস্থাপিত হয়। তদবধি এই সমিতি নানাভাবে নারীগণের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। এই দেশে লিখিতে পড়িতে

জানে এইরূপ নারীর সংখ্যা শতকরা ৪ জনেরও কম। নারীগণ মিলিত হইয়া যাহাতে পরস্পর সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, নানা বিষয়ে আলোচনা দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদের আদর্শ উচ্চ হয়, আকাঙ্ক্ষা মহৎ হয়, দেশের কার্য্যে উৎসাহ ও ত্যাগ-স্বীকারে ইচ্ছা হয়, শিল্পশিক্ষা দ্বারা অসহায় মহিলাগণের আয়ের সংস্থান হয়, এই সকল ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। ১৯২৭ সালে ঢাকার নানা পল্লীতে ৮টী শাখা-সমিতি ছিল। কায়েৎটুলীতে এই বৎসর নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বক্সীবাজার, উয়ারী প্রভৃতি স্থলে পূর্ব্ব হইতেই শাখা-সমিতি ছিল। ছাত্রীগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশের জন্য ভাবিতে ও কার্য্য করিতে শিখাইবার জন্য "ছাত্রীসঙ্ঘ" স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রীসংখ্যা বেশী হওয়াতে একটী শাখা-সভাও স্থাপিত হইয়াছে। দুস্থ বালিকাগণের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঁচটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির সভ্যারাই শিক্ষা দিয়া থাকেন। তবে বেতনভোগী শিক্ষয়িত্রীরও প্রয়োজন হইয়াছে। প্রায় দুইশত বালিকা এই সকল স্কুলে পড়িতেছে। দীপালির সভ্যাগণের জন্য একটী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে অনেক উত্তম পুস্তক রহিয়াছে। সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন শিক্ষা দিবার জন্য একটী সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত ও শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা দেবী তাহাতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেতার, এস্রাজ, বেহালা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ৪০।৫০টি ছাত্রী শিক্ষালাভ করে। অল্পব্যয়ে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১০।১২টী ছাত্রী চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিয়া থাকেন। পূজার পূর্ব্বে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ছায়াচিত্র সংযোগে "মা ও দেশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রায় ৫০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি দীপালি সমিতি একটী নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জানুয়ারী মাস হইতে নারীশিক্ষা-মন্দির নামে একটী নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে নূতন প্রণালীতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। কারু ও চারু শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে। যাহাদের বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক শিক্ষালাভের সুবিধা হইবে না তাহাদের জন্য সপ্তাহে কয়েক দিন এখানে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিবে। অনেকে কার্য্যোপলক্ষে বা শিক্ষার জন্য সহরে আসিয়া সুবিধামত বাসস্থান প্রাপ্ত হন না। তাঁহাদের জন্য "মহিলাশ্রম" খোলা-হইবে। তাহাতে অল্প ভাড়াতে তাঁহারা থাকিতে পারিবেন।

আমাদের দৈনিক সহযোগী "আনন্দবাজার" হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ একান্তই নিষ্প্রয়োজন। ১৮৩৫ সালে ভারতবর্ষ ৭ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার জিনিষ আমদানী ও ১১ কোটী ৩২ লক্ষ টাকার জিনিষ রপ্তানী করিয়াছিল এবং তখন ভারতবর্ষ রপ্তানী করিত অত্যুৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র, মশলাদি, বহুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতি ও আমদানী করিত স্বর্ণ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু-দ্রব্য। সেই সময় ভারতে টাকায় এক মণ পাঁচ সের চাউল, এক মণ পাঁচ সের গম ও সাড়ে ছয় সের সরিষার তৈল পাওয়া যাইত এবং বস্ত্রের জন্য বিদেশীয়দের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত না; কাজেই ভারতবাসীর দেহে শক্তি, মনে উৎসাহ ছিল; কিন্তু ইংরাজ শাসনের ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ আজ ৬১১ কোটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ বৎসরে ২২৬ কোটী টাকার মাল আমদানী ও ৩৮৫ কোটী টাকার মাল রপ্তানী করে; যাহার ফলে বিদেশীয়দের কাঁচা মাল সরবরাহ করিবার জন্য ভারতবর্ষ এক বিরাট কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে ও যাহার জন্য ভারতবাসীকে পরনের কাপড় হইতে গৃহপ্রদীপ জ্বালিবার তৈলটুকুর জন্য বিদেশীয়ের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কৃষিজাত খাদ্য-দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাওয়ার জন্য ভারতবাসী দু'বেলা দু'মুঠা অন্নের মুখ দেখিতে পায় না, তাই আজ ভারতবাসীর দেহে শক্তি নাই, মনে বল নাই।

প্রতি বৎসর ভারতের বাজারে কি সব পণ্য বিক্রয় করিয়া বিদেশীয়েরা ক্রোড়পতি হইতেছে, তাহা নিম্ন তালিকা হইতে বুঝুন :—

বস্ত্র	৬৫	কোটী	৬৭	লক্ষ
শীত-বস্ত্র	৪	"	৬৭	"
ফ্যান্সী-পোষাক	১	"	৬৫	"
নকল সিল্ক	২	"	১৯	"
লবণ	১	"	৪	"
কেরোসীন ইত্যাদি	১০	"	৫	"
দেশলাই			৯৪	"
সিগারেট	২	"	১৩	"
মদ্য	৩	"	৩৪	"

কাঁচের চুড়ি	১	কোটী	১	লক্ষ
ঝুটা মুক্তা			৩৬	"
কাচের বাসন			৪১	"
সাবান	১	"	৪৬	"
টিনে রক্ষিত খাদ্য-দ্রব্য	১	"	৯৩	"
বিস্কুট			৪২	"
পেটেণ্ট ফুড			৮৮	"
জমাট দুধ			৬২	"
বাদ্য-যন্ত্র			২২॥	"
মনোহারী দ্রব্য			৮৯	"
চিনামাটির জিনিষ			৭৬	"
কাঠের খেলনা			৪৩	"
অঙ্গরাগ			৫০	"

ঐ সকল জিনিষ কিনি কি দিয়া ?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ব্যাপারে টাকা-পয়সার কারবার নাই—আমদানী জিনিষের মূল্য, জিনিষ রপ্তানী করিয়া পরিশোধ করিতে হয়। কাজেই ঐ সকল জিনিষের জন্য আমাদিগকে প্রতিমিনিটে ভারতবর্ষ হইতে

১১৮	মণ	চাউল
৬৫	"	গম
৫৫	"	মুশুরীর ডাল
৫০	"	অড়হর ডাল
৫৫	"	চীনা বাদাম

প্রতি সেকেণ্ডে

৭	মণ	খৈল
১০	"	তৈল বীজ
৭	"	হাড়

প্রতি বৎসর ৫ লাখ গরু বিদেশে পাঠাইতে হইতেছে। ভারতের বাজারে এখন আর টাকায় ৪॥ সেরের বেশী চাউল, ৪॥ সেরের বেশী গম ও ১।৵৹ সেরের বেশী সরিষার তৈল পাওয়া যায় না। কাজেই ভারতের একতৃতীয়াংশ লোক দুবেলা দুমুঠা অন্নের মুখ দেখিতে পায় না—দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য্য না থাকায় ভারতবাসীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে, যাহার জন্য

প্রতি মিনিটে ভারতে—

সামান্য ব্যাধিতে	২২ জন	লোক
"	৪ "	শিশু ও
ম্যালেরিয়ায়	৭ "	লোক

মারা যাইতেছে এবং বাঙ্গলা দেশে প্রতিদিন

ম্যালেরিয়ায়	২,০০০
যক্ষ্মায়	৩০০

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ২০০ জননী ও ৮১৬ শিশু মারা যাইতেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী প্রণীত "পথের শেষে" মূল্য—২৲

শ্রীযুক্ত জ্যোতি-বাচস্পতি প্রণীত "ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র" মূল্য—১।৹

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, প্রণীত "গোপেশ্বর-গীতিকা" মূল্য—১।৹

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ প্রণীত "নেশার ঘোরে" মূল্য—১৶৹

শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-তীর্থ প্রণীত "দম্পতি-জীবন" মূল্য—৸৹

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "স্বাধীন মানুষ" মূল্য—১।৹

শ্রীশরৎ অন্নদাঠাকুর প্রণীত "বঙ্গজীবন" মূল্য—২৲

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ প্রণীত "পর্দ্দানশীন্" মূল্য—৸৹ ও "দখিন হাওয়া" মূল্য—।৹

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত "মরুশিখা" মূল্য—১।৹

শ্রীনগেন্দ্রবালা লাহিড়ী প্রণীত "পদস্খলন" মূল্য [illegible]

রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, মূল্য—৬৲

শ্রীমতী তমাললতা বসু প্রণীত গল্পের বই 'অমিয়' মূল্য—১।৹

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea,**
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works.
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA

বৈশাখ—১৩৩৫

দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চদশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

বর্ণধর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এম-এ

আজকাল বর্ণধর্ম্ম বলিতেই জাতিভেদ বুঝায়। কিন্তু বর্ণ-ধর্ম্মের মৌলিক অর্থ ও ব্যবহার এই প্রকার নহে। বর্ণধর্ম্ম বলিতে মাত্র এইটুকু বুঝায় যে, যে কোনও ব্যক্তিকে জীবিকার জন্য তাহার পৈতৃক কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। ধোপার পুত্র ধোপার কার্য্য দ্বারা ও অধ্যাপকের পুত্র অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে। ধোপার পুত্র বড় শাস্ত্রবিদ্ হইতে পারে, অধ্যাপনাও করিতে বাধা নাই,—তাহার যে কোনও কর্ম্ম করিয়া তৃপ্তি, সেই কর্ম্মই সে করিতে পারে ; তবে কেবল এইটুকু মাত্র নিষেধ যে, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পৈতৃক ভিন্ন অন্য কর্ম্ম নয়। ইহার ফলে এই হয় যে, মানুষ যে যাহার পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে,—অপরের জীবিকায় হাত দেওয়ার লোভ থাকে না ; অপরেরও স্বীয় জীবিকায় হাত দেওয়ার আশঙ্কা থাকে না। অথচ মানুষের উর্দ্ধতন গতি লাভ করিবার, প্রতিভার বিকাশ দ্বারা, সাধনার দ্বারা নিজের ও সমাজের উন্নতি করিবার সমস্ত পথই খোলা থাকে। জীবিকার জন্য অর্জ্জনের একটা গণ্ডী পড়ায় অজ্ঞানীর এবং লোভীরও সমাজে অসাম্য উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা থাকে না।

মহাত্মা গান্ধী বর্ণধর্ম্ম বলিতে ইহাই বুঝিয়াছেন * (১)।

---

* "বর্ণধর্ম্মের কদর্থ ও অপব্যবহারেই সমাজে পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। বর্ণ বলিতে কাহারও ব্যবসায় পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ বুঝায়। বর্ণধর্ম্ম মানে কোনও ব্যক্তির জীবিকার জন্য তাহার পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করার নিয়ম। প্রত্যেক বালক স্বাভাবিক ভাবেই নিজ পিতার বর্ণ বা পেশা অবলম্বন করে। বলিতে গেলে 'বর্ণ' বংশানুক্রমের

এবং বর্ণধর্ম্মের এই অর্থই গীতাতেও পাওয়া যায়। গীতার কর্ম্মযোগ মানুষের এক শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তাহাতে বর্ণধর্ম্মের অর্থ যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—আমরা নিজেদের অজ্ঞতা বশতঃই সে অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং তাহার ফলে বহু স্থলে শ্লোকের সঙ্গে শ্লোকের সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া আমাদিগকে অন্ধকারে হাতড়াইয়া ফিরিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রচলিত টীকা ও ব্যাখ্যার দ্বারা বহু শ্লোকের অর্থ একেবারেই অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে এবং অর্থও মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই। অথচ বর্ণধর্ম্মের সদর্থ জানিয়া যদি এইসব শ্লোকের অর্থ করা যায়, তবে শ্লোকের সঙ্গে শ্লোকের সঙ্গতি যেমন সহজ হয়—অর্থও তেমনি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং এই সম্পর্কে গীতার আলোচনা হয় তো কাহারও কাছেই অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে না। বর্ণধর্ম্মের সঙ্গে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। সেইজন্য এখানে তৃতীয় অধ্যায় লইয়াই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। তৃতীয় অধ্যায়ের শ্লোকাবলী একটি মালার ন্যায়। এক শ্লোক হইতে শ্লোকান্তরে জ্ঞানপূর্ণ বাক্যাবলী অপূর্ব্ব শৃঙ্খলায় গ্রথিত। এই শ্লোকের শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। পাদটীকায় গীতার শ্লোক এবং তাহার শব্দগত অর্থ দেওয়া হইল।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

কর্ম্মযোগ

সংশয়

১—২ শ্লোক

তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে ভগবান উপদেশ দিতেছেন। অর্জ্জুনের সংশয় নিরশনার্থে উপদেশের আরম্ভ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবানকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন সংশয়-গ্রস্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান একবার আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, পরে কর্ম্মযোগের কথা বলিয়াছেন। 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়'—যোগযুক্ত হইয়া কামনা বর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ম্ম কর—সেই যোগযুক্ত অবস্থালাভে বুদ্ধি সমাধিতে অচল হয়। কর্ম্মযোগই বুদ্ধিকে অচল-সমাধিতে স্থিত করিতে পারে। এই প্রকারে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্মযোগীর লক্ষণ জানাইতেছেন যে—স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়সকল বিষয় হইতে সংহরিত। কূর্ম্ম যেমন নিজের অঙ্গ সকলকে নিজের ভিতর প্রত্যাহৃত করিয়া থাকে—স্থিতপ্রজ্ঞও তেমনি থাকেন। এই প্রকারে ভগবান্ একবার ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার দ্বারাই কর্ম্ম করিয়া যোগযুক্ত হইতে বলিতেছেন, পরক্ষণেই আবার ইন্দ্রিয়সকল সংহরণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে বলিতেছেন। জ্ঞান ও কর্ম্মের পথের এই বিরোধ সনাতন, এই সংশয়ও সনাতন। এই সংশয় নিরশনে ভগবান উদ্যত। প্রথম শ্লোক দ্বারা অর্জ্জুন সংশয় জ্ঞাপন করিয়া—ভগবানকে অনুরোধ করিতেছেন—যেন তিনি একটা পথের কথাই স্থির করিয়া বলেন। এমন একটা পথের সন্ধান অর্জ্জুন পাইতে চাহেন যাহাতে নিশ্চয় শ্রেয়োলাভ হয় (২)। জ্ঞান ও কর্ম্মপথের কোন্‌টা গ্রহণীয় তাহা জানা আবশ্যক।

একমাত্র পথের নির্দ্দেশ

৩—৮ শ্লোক

তিন হইতে আট এই ছয়টি শ্লোক দ্বারা সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ যে অসম্ভব, কোনও অবস্থাতেই যে কর্ম্মত্যাগ করা যায় না—ইহা অবলম্বন করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ যে ভিন্ন নহে—একই যোগ—ইহা বুঝাইয়াছেন। জ্ঞান ও কর্ম্মের দুইটা আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠ নহে। সাধারণ বিশ্বাস যে, কর্ম্মত্যাগ করিলে প্রাক্তন কর্ম্ম ভোগ করিয়া পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল এই জন্মে ভোগ করতঃ আর নূতন কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নূতন বন্ধন সৃষ্টি করা হয় না, ইহাতেই বন্ধন হইতে মুক্তি ঘটে। কিন্তু এই যুক্তি সমীচীন নহে। কেন না একেবারে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। সঙ্কল্পপূর্ব্বক কর্ম্ম আরম্ভ না করিলেও, এমন অনেকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহা দেহ ধারণের সহিত অভেদ্য-ভাবে যুক্ত। দেহ ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আহারের চেষ্টা করিতেই হইবে, আহার করিতেই হইবে,

নিয়ম। 'বর্ণ' হিন্দুদের উপর যে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন নহে। পরন্তু হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক মুনিগণই ইহা অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ণধর্ম্ম মনুষ্যসৃষ্ট নহে ইহা নিউটনের মাধ্যা-কর্ষণের ন্যায় প্রাকৃতিক অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম। যেমন নিউটনের পূর্ব্বেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বর্ত্তমান ছিল, তেমনি বর্ণধর্ম্মও বর্ত্তমান ছিল—যেমন নিউটন মাধ্যাকর্ষণে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তেমনি হিন্দুরা এই ধর্ম্ম বা প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন মাত্র। পাশ্চাত্যদেশ কতকগুলি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া ও ব্যবহার করিয়া আর্থিক সম্পদ বাড়াইয়া লইয়াছে। তেমনি হিন্দুরা এই অমোঘ সামাজিক ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া অধ্যাত্মক্ষেত্রে এমন সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাহা পৃথিবীর আর কোনও জাতি করিতে পারে নাই।"—ইয়ং ইণ্ডিয়া—২৪শে নভেম্বর ৯২৭।

শরীরস্থ যন্ত্রাদি নিজ নিজ ক্রিয়া করিতেই থাকিবে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক সমাধিস্থ হওয়ার যোগ ধ্যানযোগ। তাহার বিষয় পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত আছে। কিন্তু সেই প্রকার যোগযুক্ত অবস্থাও নিরবচ্ছিন্ন নহে, তাহারও ছেদ আছে। সেই ছেদকালে আবার কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম আরম্ভ হয়। কোনও অবস্থাতেই স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় হওয়া মানুষের স্বভাবের অতীত, অবশ হইয়া অনিচ্ছাতেও কর্ম্ম করিতেই হয় (৫)। সেই হেতু কামনা পূর্ব্বক কর্ম্ম আরম্ভ করা হইতে বিরত থাকিলেই সম্পূর্ণ নৈষ্কর্ম্য লাভ করা হয় না—আর যতটুকু কর্ম্মসন্ন্যাস করা দেহীর সাধ্য, ততটুকু কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য কেবল কর্ম্মত্যাগই যথেষ্ট নহে। 'ন চ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিংসমধিগচ্ছতি' (৪)। এই 'এব' দ্বারা কেবল কর্ম্মত্যাগ সিদ্ধির পক্ষে অপ্রচুর—ইহাই সূচিত হইতেছে,—আরো কিছু চাই। ভগবান এই জন্য স্পষ্ট উপদেশ দিতেছেন যে,—'নিয়তং কুরুকর্ম্ম ত্বং' (৮) সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায়, বিহিত, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিবে। যে ব্যক্তি ভ্রান্তিবশতঃ 'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য' (৬) হাত পায়ের কর্ম্ম বন্ধ করিয়া মনে মনে বিষয় চিন্তন করে—সে মিথ্যাচার। শ্রেয়োলাভের পথ এত সহজ নহে। শ্রেয়োলাভ করিতে হইলে 'ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য' ইন্দ্রিয়সকলকে মন দ্বারা সংযত করিয়া অর্থাৎ মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করিয়া 'কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগ' (৭) কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিতে হইবে। ৭ম শ্লোকেই ভগবান্ শ্রেয়োলাভের একমাত্র পথ অত্যন্ত সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। অর্জ্জুন যে দ্বিতীয় শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'তদেকং বদ নিশ্চিত্য' একটা পথের কথা নিশ্চয় করিয়া বল—৭ম শ্লোক তাহারই সংক্ষিপ্ত উত্তর। সেই একমাত্র পথ হইতেছে মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করা। এই যে অনাসক্তি—ইহাও মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযমের ফল। ভক্তি দ্বারাও যে ইহার সহায়তা হয় তাহা যথাস্থানে বলিয়াছেন।

যজ্ঞচক্রের অনুবর্ত্তন

৯—১৬ শ্লোক

এতাবৎ কর্ম্ম করা আবশ্যক, ও মন সংযম পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করাই একমাত্র পথ এই কথা ভগবান স্পষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান কেবল পথ দেখাইয়া সন্তুষ্ট নহেন—কেমন করিয়া কি ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহার উপদেশ দিতেছেন। আমাদের সমস্ত কর্ম্ম দুইটা বড় ভাগে ভাগ করিতে পারি—একটা হইতেছে ত্যাগার্থে

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২
লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮

হে জনার্দ্দন, যদি কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এই তোমার মত হয় তবে হে কেশব, কি ঘোর কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ ॥১॥ ব্যামিশ্রের মত বাক্য দ্বারা যেন আমার বুদ্ধি মোহযুক্ত করিতেছ—সেইহেতু নিশ্চয় করিয়া একটি (পথ) বল যাহাতে শ্রেয় পাইতে পারি ॥২॥ হে নিষ্পাপ, ইহলোকে দুই নিষ্ঠার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—জ্ঞানযোগ সাংখ্যদিগের এবং কর্ম্মযোগ যোগীদিগের ॥৩॥ কর্ম্ম আরম্ভ না করার দ্বারাই পুরুষ নৈষ্কর্ম্য লাভ করিতে পারে না, কেবল সন্ন্যাস দ্বারাই সিদ্ধি পাওয়া যায় না ॥৪॥ কদাচিৎ কেহ ক্ষণমাত্র অকর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না, সকলে অবশ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণবশতঃ কর্ম্ম করে ॥৫॥ যে কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিয়া মন দ্বারা বিষয় স্মরণ করে তাহাকে মিথ্যাচার বলা হয় ॥৬॥ যে ইন্দ্রিয় সকলকে মন দ্বারা সংযত করিয়া অনাসক্ত থাকিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগ আরম্ভ করে সেই পুরুষ বিশিষ্টতা লাভ করে ॥৭॥ নিয়ত তুমি কর্ম্ম কর, (কারণ) কর্ম্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম না করিলে শরীর যাত্রাও তো তোমার চলিতে পারে না ॥৮॥

কর্ম্ম—আর একটা জীবিকার জন্য কর্ম্ম *। মানুষের জীবিকার জন্য সামান্যই আবশ্যক—বৃহৎ কর্ম্ম হইতেছে সেবামূলক বা ত্যাগমূলক কর্ম্ম। এক্ষণে কর্ম্ম করিতে বলিয়া ত্যাগমূলক কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা ও তাহার ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন। ত্যাগমূলক কর্ম্মের নাম যজ্ঞ কর্ম্ম, আসক্তি-রহিত সাধনাত্মক কর্ম্মের নাম যজ্ঞ (মনুতেও এই অর্থে যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে)। নিয়ত যদি কর্ম্ম করিতে হয় (৮) তবে কি কর্ম্ম করিব এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠে। তদুত্তরে ভগবান বলিতেছেন—যজ্ঞ কর্ম্ম কর। যজ্ঞচক্রের অনুবর্ত্তন অবশ্য করণীয়। ৯ হইতে ১৬ শ্লোক পর্য্যন্ত যজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিয়া পরে দেহ ধারণের জন্য আবশ্যক অপর প্রকারের কর্ম্ম অর্থাৎ জীবিকা-উপার্জ্জন কর্ম্মের কথায় তিনি বলিতেছেন যে তাহাও অনাসক্ত পুরুষের করণীয় ও মোক্ষ-বিরোধী নহে। জীবনব্যাপী সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির পথ ভগবান দেখাইতেছেন।

যজ্ঞকর্ম্ম অর্থাৎ ত্যাগমূলক কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন হয় না (৯); তদ্ব্যতীত অপর সমস্ত কর্ম্মে বন্ধন হয়। অতএব মুক্তিকামীকে ত্যাগমূলক কর্ম্মই করিতে হইবে। যজ্ঞের প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে স্বাভাবিক। 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা' (১০) প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রবৃত্তি মানবহৃদয়ে দিয়াছিলেন। এই যজ্ঞপ্রবৃত্তি প্রজার বৃদ্ধির কারণ হইবে এবং ইহাই মানুষকে অভীষ্ট প্রদান করিবে। মানুষের চরম ইষ্ট মোক্ষলাভ। এই যজ্ঞপ্রবৃত্তি মানবহৃদয়ে দিয়া প্রজাপতি মানুষকে পুনঃ তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হওয়ার পথ, চরম অভীষ্টলাভের পথ করিয়া দিয়াছেন (১০)।

দেবতাগণকে যদি আমাদের কর্ম্মফল প্রদানকারী বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ত্যাগমূলক কর্ম্মে প্রীত হইয়াই দেবতাগণ শুভ করেন (১১)। পৃথিবীতে যে সকল ইষ্টভোগ আমরা লাভ করি, পৃথিবীর অন্নজল পাইয়া যে আমাদের দেহ বর্দ্ধিত করিতেছি—এই পাওয়ার মধ্যেও দেবতাদিগের হস্ত অর্থাৎ আমাদের ত্যাগমূলক কর্ম্মের ফল বর্ত্তমান। অন্নপানাদি প্রাপ্ত হইয়া দেহ পুষ্ট করিয়া যে কেবল ভোগই করিয়া যায়, দেবতার প্রীত্যর্থে পুনঃ ত্যাগে প্রবৃত্ত না হয় তাহাকে চোর বলা যায় (১২)। ত্যাগফলস্বরূপ যে অন্ন জলাদি ভোগোপকরণ বসুন্ধরা যোগাইতেছে, ইহা সমষ্টির ত্যাগের ফল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মানুষ নিজে কর্ম্ম করে এবং অপরকে কর্ম্ম দ্বারা প্রভাবিত করে। মানুষ নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে এবং অপরকেও ভোগ করাইতেছে। যে ব্যক্তি

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তেযজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তান প্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তেসর্ব্ব কিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ। স জীবতি ॥১৬

যজ্ঞ ব্যতীত অন্যকর্ম্ম এই লোকে কর্ম্মবন্ধনস্বরূপ হয়। সেই হেতু, হে অর্জ্জুন, মুক্তসঙ্গ (অনাসক্ত) হইয়া কর্ম্ম কর ॥৯॥ আদিতে যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি বলিলেন—ইহা দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, ইহা তোমাদের অভীষ্ট দানকারী হউক ॥১০॥ ইহা দ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধনা কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে ভাবনা (সংবর্দ্ধনা) করুন, পরস্পর সংবর্দ্ধনাদ্বারা পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হও ॥১১॥ দেবতাগণ যজ্ঞসংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্টভোগ দান করেন। তাঁহাদের দত্ত তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে সে চোর ॥১২॥ যজ্ঞাবশিষ্ট আহারকারী সাধুগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যাঁহারা আত্মকারণে পাক করেন সেই পাপীগণ পাপই ভোজন করেন ॥১৩॥ ভূতগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন, মেঘ হইতেই অন্ন উৎপন্ন, যজ্ঞ হইতে মেঘ হয়, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় ॥১৪॥ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভব বলিয়া জানিবে। সেই হেতু সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ॥১৫॥ এইরূপ প্রবর্ত্তিত চক্র যে ইহলোকে অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ, সেই ইন্দ্রিয়ারাম পাপায়ু বৃথাই জীবনধারণ করে ॥১৬॥

* এই প্রবন্ধে 'ত্যাগার্থ' শব্দ যে স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে—তাহার সহিত যজ্ঞার্থ, পরার্থ ও পরমার্থ অর্থযুক্ত রহিয়াছে। যেখানেই 'জীবিকার্থ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই স্থানেই স্বার্থ ও দেহার্থ শব্দের ভাব তাহাতে জড়িত আছে।

কর্ম্মফল প্রদানকারী দেবদত্ত অন্নাদি ভোগ করিয়া পুনরায় ত্যাগ দ্বারা দেবতাদিগকে ভোগ না করায় সে চোর স্থানীয় (১২)। কিন্তু যিনি যজ্ঞাবশিষ্ট আহার করেন, তিনি সাধু (১৩)। যজ্ঞাবশিষ্ট আহারের ভিতরেও একটি জীবনব্যাপী সাধনার কথা নিহিত রহিয়াছে। যজ্ঞকর্ম্ম অর্থাৎ ত্যাগার্থে কর্ম্ম ব্যতীত নিজের ও পরিবারের আহারও যোগাইতে হইবে। এই আহার যোগানোর কাজ যজ্ঞকর্ম্ম নহে। কিন্তু যদি যজ্ঞের অবশিষ্ট আহার করা যায়—যজ্ঞের জন্যই সমস্ত কায়িক বৃত্তি নিয়োগ করিয়া যদি কেবলমাত্র দেহধারণোপযোগী আহার্য্যাদি সংগ্রহের শক্তি এই কর্ম্মে নিয়োগ করা যায়—তাহা হইলেই যজ্ঞাবশিষ্টাশীঃ হওয়া গেল। ইহাই কর্ম্মের দ্বিতীয় পর্য্যায়। এক যজ্ঞার্থে কর্ম্ম, আর অন্য স্বীয় ও পরিবারের দেহধারণোপযোগী পদার্থসংগ্রহের কর্ম্ম। শেষোক্ত কর্ম্ম—জীবিকার জন্য কর্ম্মের কথা—পরে বলিতেছেন।

মানুষ অন্নের দ্বারা বাঁচিতে পারে না, বাঁচিতে পারে ত্যাগ দ্বারা। যে অন্নে আপাতদৃষ্টিতে দেহ পুষ্ট হয় সে অন্নও ত্যাগ সম্ভাত। অন্ন উৎপাদন বৃষ্টির উপর নির্ভর করে অর্থাৎ প্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থার উপর নির্ভর করে—তাহাও যজ্ঞ অর্থাৎ ত্যাগসম্ভূত। অথবা ত্যাগমূলক কর্ম্মই যজ্ঞ (১৪)। ত্যাগমূলক কর্ম্মের স্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্ম। এই হেতু ব্রহ্মও কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলা যায় (১৫)। প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির সহিত যজ্ঞ অথবা ত্যাগমূলক কর্ম্ম সৃষ্টি করিলেন (১০)। মানুষ সেই ত্যাগমূলক কর্ম্ম অবলম্বনে আবার ব্রহ্মেই পৌছিতে পারে। এই যে কর্ম্ম অবলম্বনে ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আবার ব্রহ্মতেই শেষ হওয়ার চক্র—তাহাই যজ্ঞচক্র। যিনি এই চক্র অনুবর্ত্তন না করেন, ত্যাগ দ্বারা জীবিত কাল না কাটাইয়া ভোগে কাটান, তিনি পাপী, তাঁহার জীবন বৃথা (১৬)।

কর্ম্মের শেষ

১৭—১৯ শ্লোক

অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিলেই নিষ্কাম কর্ম্ম করা হইল। কিন্তু কোন্ অবস্থা পর্য্যন্ত কতদিন এইরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে? কর্ম্মের শেষ কোথায়? এতদুত্তরে ইহা বলা যায় যে, যজ্ঞচক্র অনুবর্ত্তন আরম্ভ করিয়া চক্র সম্পূর্ণ করিলেই কর্ম্মের শেষ হইল—কর্ম্মের আবশ্যকতা ফুরাইল। যখন কর্ম্ম করিতে করিতে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দেখা দিবে, যখন আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি হইবে তখন আর কর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিবে না (১৭)। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিবার লক্ষ্য ব্রহ্মভূতি, ব্রহ্মসংস্পর্শ। সেই অবস্থা যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মযোগ পূর্ণ হইয়াছে—তাঁহার আর কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা নাই। সেই অবস্থায় যিনি পৌছিয়াছেন তিনি সমস্ত প্রয়োজনের অতীত (১৮)। কিন্তু তাহা হইলেও কর্ম্মের শেষ হইতেছে না। যদি ব্রহ্মভূতির সঙ্গে সঙ্গেই দেহান্ত হয় তাহা হইলে কোনও কথা থাকে না। কিন্তু তার পরও যদি দেহপালন করিতে হয়—তাহা হইলে ততটুকু কর্ম্মের প্রয়োজন থাকিয়া যায়। (এই কথা ২০ শ্লোক হইতে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিতেছেন।) যে হেতু ব্রহ্মভূতি লাভ না করা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেই হইবে ('তস্মাৎ' ১৯ শ্লোক) সেই হেতু অনাসক্ত হইয়া সতত কার্য্য করিয়া যাও। এইরূপেই ব্রহ্মে পৌছিতে পারিবে (১৯)।

জীবিকার জন্য কর্ম্ম

২০—২৬ শ্লোক

কেবলমাত্র নৈষ্কর্ম্ম্য অবলম্বনে সিদ্ধি পাওয়া যায় না—কিন্তু যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধি পাওয়া যায়। জনকাদি তাহার উদাহরণ—তাঁহারা কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে—জনকাদি ঋষিগণ মরণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়াই গিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম্মে ছেদ হয়

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০

যে মানব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়েন তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই ॥১৭॥ ইহলোকে তাঁহার কর্ম্মে কোনও প্রয়োজন নাই, কর্ম্ম না করাতেও নাই। সমস্ত ভূতে ইঁহার অবলম্বনের প্রয়োজনও কিছু নাই ॥১৮॥ সেই হেতু অসক্ত হইয়া সতত করণীয় কার্য্য করিবে। পুরুষ অসক্ত হইয়া কর্ম্ম আচরণ করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হয় ॥১৯॥ জনকাদি মুনিগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি পাইয়াছিলেন। লোক সংরক্ষণের দিকে দেখিয়াও তুমি কর্ম্ম করিতে পার ॥২০॥

নাই। সিদ্ধিলাভ হইলেও লোক-সংগ্রহার্থে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন (২০)। লোক-সংগ্রহ অর্থে লোক-রক্ষণ। ইহার ভিতর নিজের দেহরক্ষাও আসিয়া পড়ে। দেহরক্ষার জন্য যেমন অজ্ঞানী কর্ম্ম করে—জ্ঞানীরও তেমনি কর্ম্ম করা আবশ্যক। জনকাদির উদাহরণ হইতে ইহাই স্পষ্ট হয়। জনকাদি লোকরক্ষার্থে, ধর্ম্মরক্ষার্থে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। জনক ভূমিকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজা ছিলেন, তাঁহার অনেক ছিল—তথাপি নিজে হলচালনা করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানীরা যদি কর্ম্মত্যাগ করেন—যদি অনাবশ্যক বোধেই করেন—তবে সমাজে তাহার প্রভাব অত্যন্ত অহিতকর হয়। কারণ শ্রেষ্ঠ যাহা আচরণ করেন ইতর জনও তাহাই করে—তাঁহারা যাহা প্রমাণ করেন ইতর সাধারণও তাহাই গ্রহণ করে (২১)। 'প্রমাণং কুরুতে'—ইহার অর্থ 'প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন'—এইরূপই প্রচলিত টীকাতে পাওয়া যায়। কিন্তু এতদপেক্ষা ইহার সহজ অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। 'প্রমাণং কুরুতে' মানে প্রমাণ করেন। জ্ঞানীরা আচরণ দ্বারা যাহা প্রমাণ করিয়া দেন, ইতর সাধারণ তাহাই গ্রহণ করে। জ্ঞানীরা যদি আচরণ দ্বারা প্রমাণ করেন যে শ্রেষ্ঠত্ব পাইলে আর জীবিকার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন নাই, সাধারণেও তাহা হইলে সেই মত আচরণের দিকে আকৃষ্ট হইবে। জীবিকার জন্য লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে হইলে জ্ঞানী-দিগকেও সেই মত আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। নরদেহে কৃষ্ণরূপে অবস্থিত ভগবানের তো কোনো কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। 'ন অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যম্' অপ্রাপ্ত এমন কিছুই নাই যাহা প্রাপ্ত হইতে হইবে। দেহধারণের উপকরণ সংগ্রহের এবং আহারেরও আবশ্যকতা নাই। তথাপি যেহেতু তিনি নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। তিনি কর্ম্ম করিয়াই যাইতেছেন (২২)। তাহার হেতু এই যে তিনি যদি অতন্দ্রিত হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম না করিয়া যান তাহা হইলে মানুষেরাও তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়া কর্ত্তব্যচ্যুত হইবে (২৩)। বর্ণধর্ম্ম আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, নিজ নিজ বর্ণের জীবিকা গ্রহণ করিয়া জীবিতকাল কাটাইতে হইবে। এই ধর্ম্ম পালন করা হইতে জ্ঞানীরও নিষ্কৃতি নাই। যদি আমি অনাবশ্যক বোধে নিজ জীবিকার জন্য যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তদনুযায়ী কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে আমার উদাহরণে প্রজাদের মধ্যে এই ফল ফলিবে যে, লোকে জীবিকার জন্য কর্ম্ম করা হেয় জ্ঞানে ত্যাগ করিবে অথবা অল্পায়াস বা অধিক লাভের আশায় নিজবর্ণ ত্যাগ করিয়া অন্য বর্ণের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইবে। তাহা হইলে আমা দ্বারা প্রজা উৎসন্ন হইবে, (উৎসীদেয়ুঃ ২৪), বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে। বর্ণসঙ্কর অর্থে আমি এই বুঝি যে, এক বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া অপর বর্ণের কর্ম্ম জীবিকার জন্য গ্রহণ করা।

অজ্ঞানীরা আসক্তিপরায়ণ হইয়া যেমন কর্ম্ম করে, জ্ঞানীরা অনাসক্ত হইয়াও জীবিকার জন্য তেমনি কর্ম্ম করিবেন। জ্ঞানবান হইয়া বর্ণধর্ম্ম ত্যাগ করিলে সমাজ ধ্বংস হইবে। শ্রেষ্ঠরা যদি জীবিকার জন্য বর্ণানুমোদিত কর্ম্ম না করেন, তবে ইতর সাধারণও বর্ণের মর্য্যাদা রাখিতে পারিবে না। 'ন বুদ্ধিভেদংজনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম সঙ্গিনাম্' (২৬)। জ্ঞান পাইয়াছেন বলিয়াই যেন

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥২৩
উৎসীদেয়ুরীমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত!
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্ লোক সংগ্রহম্ ॥২৫
ন বুদ্ধিভেদংজনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬

শ্রেষ্ঠ যেমন আচরণ করে, ইতরজন তাহাই করে। সে যাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে লোকে তাহারই অনুবর্ত্তন করে ॥২১॥ হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছুই নাই। অপ্রাপ্ত অথচ পাওয়ার উপযুক্তও কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ম্ম করি ॥২২॥ হে পার্থ! যদি আমি কদাচিৎ অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই তাহা হইলে মানবেরা আমার পথই সর্ব্বপ্রকারে অনুবর্ত্তন করিবে ॥২৩॥ আমি যদি কর্ম্ম না করি তবে লোক উৎসন্ন হইবে, আমা হেতুই সঙ্কর উৎপন্ন হইবে এবং আমা হেতুই প্রজা মলিন হইবে ॥২৪॥ হে ভারত, আসক্ত হইয়া অবিদ্বানগণ যেমন কর্ম্ম করিয়া থাকে, লোক রক্ষণ ইচ্ছায় জ্ঞানীরাও তেমনি অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে ॥২৫॥ যাহারা অজ্ঞ ও কর্ম্মে আসক্ত তাহাদের সংশয় উৎপাদনের হেতু হইবে না। বিদ্বান্ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম আচরণ করিয়া সেবা করিবে ॥২৬॥

কেহ স্ববর্ণের কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করা ত্যাগ না করেন। ইহাতে অজ্ঞানী কর্ম্ম-সঙ্গীর সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। বৈশ্য বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি বংশ-পরম্পরা-ক্রমে কুমারের কাজ করিতেছেন তিনি যদি জ্ঞানলাভ করিয়া স্বকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে অজ্ঞ ও বিষয়ে আসক্তের মনে এই সংশয় উদিত হইবে যে, শ্রেষ্ঠের পক্ষে বর্ণে থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করার আবশ্যকতা নাই। হয় তো বা মনে করিবে, জ্ঞানীর পক্ষে কুমারের কাজ মর্য্যাদাহানিকর। এইরূপ মনে করার ফলে অজ্ঞের আচরণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু যদি বিদ্বান জ্ঞানলাভ করিয়াও কুমারের বৃত্তিই পূর্ব্বের ন্যায় চালাইতে থাকেন, তবে বৃত্তির মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে, সমাজে কোনও জীবিকা অগৌরবের না হওয়ায় সমাজে সন্তোষ থাকিবে এবং ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে। বিদ্বান্‌কেও বর্ণ-ধর্ম্ম আচরণ করিয়াই সমাজসেবা করিতে হইবে (২৬)।

গুণকর্ম্ম-বিভাগ-তত্ত্ব বা বর্ণধর্ম্ম

২৭—২৯ শ্লোক

গুণকর্ম্ম-বিভাগ সম্বন্ধে তত্ত্ব ভগবান এই স্থানে বিবৃত করিয়াছেন। 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' (২৭) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রকৃতি কর্ম্ম করে। সত্ত্বগুণ মানুষকে একপ্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, রজোগুণ অপর প্রকার এবং তমোগুণ ভিন্ন প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। কিন্তু এই তিন গুণ সর্ব্বদাই মিশ্রিত থাকিয়া যে গুণের আধিক্য সেই প্রকার ছাপ দেয়। মানুষের প্রকৃতিতেই এই তিনগুণ থাকে। প্রকৃতিজাত এই গুণ মানুষকে (প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি—২৭) গুণানুরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত করে। মূঢ় যে, সে অহঙ্কার বশে মনে করে আমিই করিতেছি (২৭)। জ্ঞানীগণ এই গুণের বিষয় অবগত হইয়া গুণানুযায়ী কর্ম্মবিভাগ করিয়াছেন। গুণের বিভাগ অনুযায়ী কর্ম্মের বিভাগ হইয়াছে। মানুষের সকল কর্ম্ম চারিটা বড় ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা যায়। যে কোনও কর্ম্মই হউক তাহা মুখ্যতঃ বিদ্যাদান, রক্ষণ, ধনোৎপাদন ও সেবা এই চারি বড় শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ১৮।৪১

স্বভাব অর্থে প্রাণিগণের পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, যাহা বর্ত্তমান জন্মে তাহাদিগকে স্বপ্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া প্রকাশিত হয়। সেই পূর্ব্বজন্মের সংস্কারই আত্মার বিশেষ বংশে দেহ লগ্ন হওয়ার নিয়ামক। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের বিশেষ সংযোগ-বিয়োগ দ্বারাই এই পূর্ব্ব সংস্কার কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশিত হয়। এই স্বাভাবিক বৃত্তি অনুযায়ী জীবিকার জন্য কর্ম্মের যে ভাগ তাহাই গুণকর্ম্ম-বিভাগ। যিনি গুণকর্ম্ম-বিভাগ-তত্ত্ব সম্যক রূপে জানেন—'গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ' (২৮) তিনি জানেন যে আমি করিতেছি এমন ভাবা অহঙ্কারের ফল। আমার স্বভাবজাত বা প্রকৃতিগত গুণ আমাকে ইহাই করাইতেছে, এইরূপ বোধ জ্ঞানীর হইয়া থাকে। কর্ম্মের বিভাগ গুণ অনুযায়ী এবং এই বিভাগ প্রকৃতিগত, জন্মলব্ধ বলিয়া যিনি জানেন—যিনি এই তত্ত্বে জ্ঞানী হইয়াছেন—তিনি অনাসক্ত হইয়া স্বকর্ম্ম করিতে পারেন (২৮)। কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বের ভাব দূর হওয়াতে আসক্তি হয় না। যে কর্ম্মই কর না কেন—কোনও কর্ম্মই ছোট বড় বোধ হয় না। কুমারের কাজও ভালো, মেথরের কাজও ভালো ; এবং উভয়েই সমান সম্মানজনক ; এবং তাঁহার পক্ষে সমান লোভনীয়। কেন না, কর্ত্তা নহি মনে করায়—তাঁহার আসক্তি এবং তজ্জাত কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ উভয়ই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই ২৮ শ্লোকের গূঢ় মর্ম্ম।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

যাহাদের এই গুণকর্ম্ম-বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, তাঁহারা 'প্রকৃতের্গুণ সংমূঢ়াঃ'। যাহারা এই জ্ঞান পাইয়াছেন তাঁহারা যেন অজ্ঞানীকে বিচলিত না করেন (২৯)। যদি জ্ঞানী

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো! গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥২৮
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥২৯

প্রকৃতির গুণদ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম হয়। অহঙ্কার বিমূঢ়-আত্মা আমি কর্ত্তা এই মনে করে॥২৭॥ কিন্তু হে মহাবাহো, যিনি গুণ-কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ব অবগত আছেন তিনি গুণসকল গুণের কর্ম্মে বর্ত্তায় ইহা জানিয়া আসক্ত হয়েন না॥২৮॥ প্রকৃতির গুণ সম্বন্ধে মূঢ়েরা গুণকর্ম্মে আসক্ত হয়। জ্ঞানী সেই অজ্ঞানীদিগকে বিচলিত করিবেন না॥২৯॥

হইয়াও কেহ স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন না করেন তাহা হইলেই অজ্ঞদিগকে বিচলিত করা হইবে। যে কুম্ভকার তত্ত্বজ্ঞান পাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কুম্ভকারের কার্য্য অথবা অধ্যাপনার কার্য্য সমান; কিন্তু তথাপি তাঁহাকে জীবিকার জন্য কুম্ভকারের কার্য্যই করিতে হইবে। নচেৎ তিনি অজ্ঞানী কুম্ভকারকে বিচলিত করিবেন। জীবিকার জন্য কুম্ভকারের কার্য্য করিয়া লোকসেবার জন্য অধ্যাপনার কার্য্য করুন, তাহাতে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন না। ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত বর্ণ-ধর্ম্ম।

ভক্তিপথে বর্ণধর্ম্ম পালনের সাহায্য হয়

৩০—৩২ শ্লোক

আমি অকর্ত্তা ইহা মনে করিলেই কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ দূর হয়। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এই অনুভূতি আনা যায়। ২৭ ও ২৮ শ্লোকে ভগবান তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু এত না জানিয়াও একটা সোজা উপায়েও কর্ম্মের প্রতি অনাসক্তি আনা যায়—সে হইতেছে ভগবৎ-প্রেম। ভগবৎ-প্রেম উপস্থিত হইলে আর কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান থাকে না। যে কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জিত হইতেছিল, তাহা বর্জ্জনেরও কোনো হেতু থাকে না। হে অর্জ্জুন, তুমি আমার উপর সমস্ত কর্ম্ম ন্যস্ত করিয়া—আশা-শূন্য, মমতাশূন্য ও আধ্যাত্মচিত্ত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান কর। যুদ্ধেও তোমার শোক থাকিবে না (৩০)। আমি এই কর্ম্ম বিভাগ করিয়াছি—ইহা হইতে অব্যাহতি নাই। যাঁহারা আমার এই অভিমত অনুযায়ী নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন—'যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ' তাঁহারা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। যাঁহারা এ কথা বুঝিয়াছেন যে, আমিই যজ্ঞকর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছি, এবং আমিই বর্ণ-ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছি—যাঁহারা ইহা জানিয়াছেন যে, যেমন যজ্ঞকর্ম্ম আবশ্যক, তেমনি জীবিকার জন্য বর্ণ-ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করা আবশ্যক—তাঁহারা আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী যজ্ঞকর্ম্ম ও জীবিকার জন্য অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন (৩১)। ('মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ'—তাহারাও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়—এই প্রকার অর্থ না করিয়া 'অপি' 'কর্ম্ম করিয়াও'—এই অর্থ যুক্তিযুক্ত।) যাহারা আমার নির্দ্দেশিত পথে চলে তাহারা কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়। ভগবানের মত অনুসারে চলার কথা এতাবৎ যাহা বলিয়াছেন তাহা এই যে অনাসক্ত হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিবে, অনাসক্ত হইয়া জীবিকার জন্য কর্ম্ম করিবে, অনাসক্তি লাভ করিতে তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্য লইবে, এবং আমার প্রতি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, ভক্তি আশ্রিত হইয়া অনুক্ষণ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা—যজ্ঞার্থ কর্ম্মে ও জীবিকার্থ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকার যোগই কর্ম্মযোগ। যাহারা ভগবানের মত অনুসারে চলে না তাহারা নষ্ট হয় হয় (৩২)।

বর্ণধর্ম্ম মাহাত্ম্য

৩৩—৩৭ শ্লোক

জ্ঞানীগণও নিজ নিজ প্রকৃতির অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে স্বভাবতঃ প্রণোদিত হয়েন। 'অপি' অর্থে জ্ঞানীরাও, কেবল অজ্ঞানীরা নহে। বর্ণধর্ম্ম জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উপর সমভাবে ক্রিয়াশীল। জন্মগত গুণ সকলের অনুগমন সকলে করিয়া থাকে। নিগ্রহ করিয়া কি লাভ? অর্থাৎ লাভ নাই, বরং ক্ষতি (৩৩)। কেবল মানুষ নহে, অন্য জন্তুরা পর্য্যন্ত প্রকৃতিগত বা স্বভাবজাত গুণ সকল অবলম্বন করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে। সেই হেতু ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, প্রকৃতিগত গুণ অবলম্বন করতঃ জীবিকা অর্জ্জন স্বাভাবিক ও সহজ। যদি দেহ ধারণের জন্য জীবিকা উপার্জ্জন করিতেই হইল, যদি সকল বৃত্তিই সমান সম্মানজনক, তবে যে বৃত্তি বা কর্ম্ম স্বভাবের অনুকূল তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি স্বভাবজাত, জন্মগত ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা না করা যায়,তাহা হইলে প্রকৃতির প্রতিকূলে যাওয়া হয়; তাহাতে অধিক সময়, অধিক সাধনা আবশ্যক হয়। ঐ প্রকার প্রতিকূল কর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টাতে সমাজের উপর কি ফল হয় সে কথা এক্ষণে না বিচার করিয়া নিজের

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০
যে মে মতমিদং নিত্য মনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানু তিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২

অধ্যাত্মচিত্তে সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া কামনা ও মমতাশূন্য হইয়া, বিগত-শোক হইয়া যুদ্ধ কর ॥৩০॥ যাঁহারা শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াবিহীন হইয়া আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন—তাঁহারা কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়েন ॥৩১॥ যাঁহারা আমার এই মত অসূয়া পরবশ হইয়া অনুষ্ঠান না করেন সেই সকল জ্ঞান-বিমূঢ় নির্ব্বোধ নষ্ট বলিয়া

উপর কি ইষ্টানিষ্ট হয় তাহারই বিচার করা হইতেছে। মানুষকে যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিতেই ভগবান পূর্ব্বে বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—যজ্ঞার্থ কর্ম্মেই সমস্ত সময় নিয়োগ করিয়া—দেহধারণ কর্ম্মে অবশিষ্ট নিয়োগ করা। দেহধারণের জন্য যত কম হয়, যত হাল্কা হয় ততই লাভ। জন্মগত কর্ম্ম-গ্রহণে সহজে দেহ ধারণ হয়। যিনি কর্ম্মকারের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতি বড় জিনিস লইয়া পিটাপিটি করার, অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কর্ম্ম করার অনুকূল। সেই ব্যবসাই পিতৃগত বলিয়া তাঁহার পক্ষে সহজ। তিনি যদি প্রকৃতির অনুকূল এই কর্ম্ম না করিয়া প্রতিকূল কর্ম্ম স্বর্ণকারের কাজ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃতির নিগ্রহ করা হইবে। অধিক সময়, অধিক সাধনা লাগিবে। কিন্তু তাহার আবশ্যকতা তো নাই। জীবিকার দ্বারা জীবন ধারণই যখন উদ্দেশ্য, লোহার কামারের কাজ যখন সমাজের পক্ষে আবশ্যকীয় ও সাধু, তখন প্রকৃতির অনুকূল এই কর্ম্ম করিয়া সমাজে জীবিকা অর্জ্জনই অনুমোদিত হয়। তপস্যা দ্বারা, সাধনা দ্বারা প্রকৃতিকে ফিরাইবার যে আবশ্যকতা—তাহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, ত্যাগার্থে কর্ম্ম, সেবা-কর্ম্মের জন্য রাখাই তো সাধু। 'নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি'—এই বচন লইয়া অনেক গোল হইয়াছে। প্রকৃতির নিগ্রহে লাভ নাই এ কথা বলা চলে না। যাহার প্রকৃতিতে যে গুণের আধিক্যই থাকুক—তাহা শুদ্ধ সত্ত্বময়ী করাই মানুষের সাধনা। কাজেই নিগ্রহে কোনও লাভ নাই, এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই বাক্যের অর্থ তখনই সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট হয়—যখন আমরা জীবিকার্থে প্রকৃতিজাত গুণের প্রয়োগের কথা ধরি। জীবিকার জন্য প্রকৃতি-নিগ্রহ না-ই করিলে। প্রকৃতির নিগ্রহ শক্ত কাজ। সে কাজ বৃহত্তর, মহত্তর উদ্দেশ্যে কর, জীবিকার জন্য সহজে যাহা হয়, যাহা স্বভাবজ, তাহাই কর।

তৃতীয় অধ্যায়ের এই ৩৩এর শ্লোকের অর্থ আরও স্পষ্ট করার জন্য অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে স্থানে বর্ণধর্ম্মের বিবৃতি আছে, তাহার সাহায্য লইতেছি।

> ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
> কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১
> শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
> স্বভাবনিয়তংকর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭
> সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
> সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

৪১ শ্লোকে বলিতেছেন, 'স্বভাব-প্রভবৈঃ গুণৈঃ' কর্ম্ম (জীবিকার্জ্জনের কর্ম্ম) ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪৭ শ্লোকে বলিতেছেন, স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম করিয়া পাপ হয় না। ৪৮ শ্লোকে বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়, সহজকর্ম্ম—অর্থাৎ সহজাত কর্ম্ম—যে কর্ম্ম তোমার জনক হইতে তুমি পাইয়াছ, তাহা যদি তোমার নিকট সম্পূর্ণ ভাল না বোধ হয়, যদি সদোষ মনে হয়, তাহা হইলেও তাহা তুমি ত্যাগ করিও না। কেন না—ত্যাগ করিয়া তো আর একটা কিছু অবলম্বন করিতে হইবে। তখন পরীক্ষা করিয়া দেখিবে তাহাও দোষযুক্ত। সমস্ত কর্ম্মেই কিছু না কিছু দোষের স্পর্শ আছে। অতএব "স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য" (১৮।৪৬) নিজবর্ণের কর্ম্ম দ্বারাই তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হও।

অতঃপর 'নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি' ভগবান কেন বলিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট পরিষ্কার হইবে। কর্ম্মের দুই বৃহৎ ধারা—পরার্থে ও স্বার্থে। এই দুই কর্ম্মের ধারা অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া গীতা

> সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি।
> প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩
> ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
> তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪
> শ্রেয়ান্‌স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
> স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫
> অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
> অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় ! বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬
> কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
> মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭

জানিও ॥৩২॥ জ্ঞানীরাও আপন প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করে। ভূতগণ প্রকৃতিরই অনুগমন করে। নিগ্রহ করিয়া কি হইবে? ॥৩৩॥ ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে রাগ দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী, তাহাদের বশে আসিও না, তাহারা ইহার (প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম গ্রহণের) পরিপন্থী ॥৩৪॥ অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্ম সুঅনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধনও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ ॥৩৫॥ হে কৃষ্ণ, কাহার প্রেরণায় এই পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও যেন সবলে নিয়োজিত হইয়া পাপ আচরণ করে? ॥৩৬॥ রজোগুণ সমুদ্ভব এই কাম, এই ক্রোধ মহা অশনকারী ও অত্যুগ্র, ইহাদিগকে বৈরী বলিয়া জানিও ॥৩৭॥ যেমন বহ্নি ধূমে

স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এই উভয় প্রকার কর্ম্ম প্রবৃত্তিই ঈশ্বর-দত্ত। ১০ম শ্লোকে 'সহযজ্ঞাঃ' ইত্যাদি দ্বারা যেমন বলিয়াছেন যে, যজ্ঞার্থে কর্ম্ম মানুষের সৃষ্টির সহিতই প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবিকার্থে কর্ম্ম সম্বন্ধেও তেমনি 'সদৃশং চেষ্টতে' ইত্যাদি ৩৩এর শ্লোকে বলিয়াছেন যে, জন্মগত জীবিকা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তিও ঈশ্বরপ্রদত্ত বা প্রকৃতিজাত।

একটি বিষয়ে ভগবান আবার সাবধান করিয়া দিতেছেন। ভগবান্ বলিতেছেন, ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত এবং আসক্তিই কর্ত্তব্যপালনে বাধা দেয়। 'তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ' (৩৪) 'তাহারা ইহার বিঘ্ন'। 'তাহারা'—রাগদ্বেষ, 'অস্য'—ইহার—বর্ণধর্ম্ম অবলম্বনে জীবিকা অর্জ্জনের—বিঘ্ন। অতঃপর বর্ণধর্ম্মের মাহাত্ম্য বহুকষ্টে উচ্চারিত শ্লোকে কীর্ত্তন করিতেছেন। 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ'—নিজের জাত ব্যবসা যদি ভাল না লাগে, যদি ভাল ভাবে আচরণ করা না যায়, যদি নিজ বর্ণের কর্ম্ম অনুষ্ঠান 'বিগুণ' হয়, তথাপি তাহা পরধর্ম্ম অনুষ্ঠান অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। স্বধর্ম্ম মানে মানবধর্ম্ম নহে। তাহা হইলে পরধর্ম্ম মানে অমানবের ধর্ম্ম হইত। ভাল করিয়া অপরের ধর্ম্ম আচরণ করা অপেক্ষা খারাপভাবে নিজের ধর্ম্ম আচরণ করা ভাল—এ কথার একমাত্র সদর্থ হয়—যদি বর্ণধর্ম্ম পালন জীবিকার্জ্জন সম্বন্ধেই নিবদ্ধ রাখি। নচেৎ যদি কোনও শূদ্র ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, বিদ্যাদান কর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করিতে পারে, তবে তাহাতে বাধা কোথায়? একজন লোক যদি সাত্বিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়, তাহাতে জগতের হানি না লাভ? ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বর্ণধর্ম্ম জীবিকার্জ্জনের সহিত সংস্পৃষ্ট, যজ্ঞার্থ কর্ম্মের সহিত নহে। শূদ্র ব্রাহ্মণের জীবিকা গ্রহণ করিবে না, ব্রাহ্মণ শূদ্রের কর্ম্ম গ্রহণ করিবে না—মরিলেও না। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'—নিজের বর্ণানুমোদিত কর্ম্মে যদি মরিতে হয়, তাহাও ভাল। এখানে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধকর্ম্ম অবলম্বনে মরার কথা বলা হয় নাই। নিজ বর্ণের কর্ম্মে যদি জীবিকার্জ্জন না হয়, যদি সংসার না চলে, তবে মরাও ভাল—তবুও যেন অপরের নির্দ্দিষ্ট জীবিকায় হাত দেওয়া না হয়। ঐ কর্ম্ম ভয়াবহ। 'নিধনং' না খাইতে পাইয়া মরার সম্ভাবনাতেই প্রযুক্ত হইয়াছে। নচেৎ অপর-ধর্ম্মে গিয়া বাঁচার কথা আসিতেই পারে না। স্বধর্ম্মে মরা—মানবধর্ম্ম পালনে, শূদ্রের শূদ্রের-আচারে থাকিয়া মরা নহে। পরন্তু যে যাহার নির্দ্দিষ্ট জীবিকা অবলম্বনে দেহরক্ষায় অপারগ হইয়া মরার কথাই বলিয়াছেন। নিজ বর্ণে থাকিয়া স্বল্প উপার্জ্জন হেতু মৃত্যু বরণও ভাল। উহাতে একব্যক্তি বা এক পরিবার নষ্ট হয় (সমাজও ঐ জীবিকার অসুবিধা দূর করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারে); কিন্তু পরধর্ম্ম অবলম্বনে বাঁচিলে সমস্ত সমাজকে মরণাঘাত করা হয় (৩৫)।

কামনাই বর্ণধর্ম্ম পালনের বাধা

৩৬—৩৯ শ্লোক

যদি এমন হইল যে, প্রকৃতির আকর্ষণে নিজ নিজ সহজাত কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, তবে কে বলপূর্ব্বক মানুষকে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আচরণ করায়? 'অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ পাপং চরতি' (৩৬)। 'অয়ং পুরুষঃ'—এই পুরুষ। কোন্ পুরুষ? যে পুরুষ জীবিকার জন্য পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে সে—কেন এই পাপ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়? ইহার উত্তরে ভগবান ৩৭ শ্লোকে বলিতেছেন যে, কামনাই বলপূর্ব্বক স্বভাববিরুদ্ধাচরণ করিয়া এই দুষ্কর্ম্ম করায়। কামনা এবং কামনা প্রাপ্তির অন্তরায় ক্রোধই কর্ম্মচ্যুতি করায়। এই বাসনাকে মহাপাপ বলিয়া জানিবে।

ইহা মহাশন, ইহার ক্ষুধা মিটে না। কামনা দুষ্পূর অনলের ন্যায় জ্ঞানীর জ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইহাই জ্ঞানীর শত্রু, ইহাই স্বধর্ম্ম পালনের বিঘ্ন উপস্থিত করে, স্বাভাবিক গুণের বিরুদ্ধে ইহা বর্ণধর্ম্ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক অপরের জীবিকা গ্রহণে প্ররোচিত করে, মানুষ ও সমাজকে নষ্ট করে।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্য বৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় ! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯

আবৃত হয়, দর্পণ যেমন ময়লায় আবৃত হয়, গর্ভ যেমন জরায়ু দ্বারা আবৃত তেমনি কাম দ্বারা ইহা আবৃত ॥৩৮॥ জ্ঞানীদিগের নিত্য বৈরী কামনারূপ দুষ্পূর অনল দ্বারা জ্ঞান আবৃত ॥৩৯॥ ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি এই

কামনার উৎপত্তি কোথায়

৪০

কামনাই যজ্ঞার্থ কর্ম্মের অন্তরায়—কামনাই স্বধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক নিজ বর্ণে থাকিয়া জীবিকা সংগ্রহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অন্তরায়। এই কামনা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে বাসা বাঁধিয়া আছে। ইন্দ্রিয় যখন ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে আকৃষ্ট হয় তখন মনে সাড়া পড়ে। মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সহযোগে কর্ত্তব্য স্থির করে; কিন্তু ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই তিনের উপর বাসনা তাহার রং ফলায়, জ্ঞান আবৃত করে, বিচার ঠিক ঠিক করিতে দেয় না (৪০)।

কামনা জয়েই ইষ্টলাভ

৪১—৪৩ শ্লোক

সেই জন্য এই তিনের—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির—সংযম পূর্ব্বক, কামনাকে আশ্রয়চ্যুত কর। জ্ঞান ও জ্ঞান দ্বারা যে অনুভূতি, এই উভয়কেই কামনা নাশ করে। এই কামনা দূর করিবার উপায় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে নাই—কেন না এইগুলি আশ্রয় করিয়াই কামনা বাস করে। কিন্তু বুদ্ধির পরপারে যে আত্মা, সেই আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারাই কামনা নাশ করা যায়। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই অচঞ্চলা বুদ্ধিযোগে মনকে আত্মায় স্থির করিয়া কামনা জয় কর।

গীতার ভিতর যে যে স্থানে বর্ণধর্ম্মের উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থানেই বর্ণধর্ম্ম মানে পিতৃগত জীবিকা গ্রহণ। সমাজে এখন যেভাবে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা গীতার বর্ণধর্ম্মানুমোদিত নহে। এই জন্য এখনকার জাতিভেদ প্রথা গীতার ধর্ম্মের বিকার বলিয়া অবশ্যই গণ্য করিতে হইবে। এখনকার মত জাতিভেদ হিন্দুসমাজে কোনও অতীত কালে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাতেই ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে। গীতার ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, কোনও দেশ, কাল ও জাতির স্বার্থে ইহা সঙ্কীর্ণ নহে। ব্রাহ্মণেতর জাতিও যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে; অথচ জীবিকার জন্য নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতেই হইবে. এই অনুশাসনের ভিতরে যে ব্যক্তিগত চেষ্টার অব্যাহত স্বাধীনতা রহিয়াছে, অথচ লোভ বর্দ্ধিত হইয়া সমাজ নষ্ট না হওয়ার যে পরম রমণীয় বিধান রহিয়াছে, ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের গৌরব। বর্ণধর্ম্মের কদর্থ দ্বারা সমাজের গ্লানি হইলেও এখনো হিন্দুরা গতানুগতিক ভাবে বহুল পরিমাণে পৈতৃক ব্যবসাই অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু আজ একে অন্যের জাতিগত ব্যবসা অবলম্বনে আর পতিত হয় না, সমাজও তাহাতে পীড়া বোধ করে না।

গীতায় উক্ত বর্ণধর্ম্ম যখন প্রচলিত ছিল, তখন সমাজে এক দিকে যেমন প্রতিভা বিকাশের ও মানব-সমাজের হিতকর অনুষ্ঠানসমূহ শুভকরী হইবার ব্যবস্থা ছিল, অপর দিকে তেমনি সমাজের ভিতর লোভ ও দ্বন্দ্ব বর্দ্ধিত না হওয়ার একটা স্বাভাবিক পথ ছিল। ধনের ও ক্ষমতার কমবেশী মানুষের সমাজে থাকিবেই। সেই অসাম্য যত কম হয়, ততই সমাজের মঙ্গল। বলশেভিকবাদীরা সমাজের ভিতর ধনিক ও শ্রমিক এই দুইটি মাত্র শ্রেণী-বিভাগ সম্মুখে রাখিয়া আকাঙ্ক্ষা করে যে, এই দুই দলের ভিতর সংঘাত দ্বারা ক্রমশঃ ক্রমশঃ ধনিকের দৌর্ব্বল্যবশতঃ শ্রমিকের প্রাধান্য হইবে ও তখন সমাজে সাম্য আসিবে। সেই সাম্য হইতেই যে আবার অসাম্য উপস্থিত হইবে, শ্রমিকদিগের ভিতর অধ্যবসায়ী ও ক্ষমতাপন্নগণ যে অন্য শ্রমিকদিগের উপরই প্রভুত্ব করিবে, তাহার হিসাব বলশেভিকরা করেন না। ভারতবর্ষে বর্ণধর্ম্ম আবিষ্কার দ্বারা এই প্রকার ধনিক ও শ্রমিকের সংঘাত উপস্থিত হয় নাই এবং বর্ণধর্ম্ম অম্লান থাকিলে কোনও দিনই

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনম্ ॥৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো। কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩

কামনার অধিষ্ঠান স্থান। এই কামনা—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারাই জ্ঞান আবৃত করিয়া মুগ্ধ করে ॥৪০॥ হে অর্জ্জুন, সেই জন্য তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশকারী পাপস্বরূপ কামনাকে নাশ কর ॥৪১॥ ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার চক্ষু শ্রোত্রাদি হইতে শ্রেষ্ঠ, মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সেই বুদ্ধি হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা সেই (আত্মা) এমন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ॥৪২॥ এমন বুদ্ধি হইতে যে শ্রেষ্ঠ (আত্মা) তাহাকে জানিয়া আত্ম দ্বারা আত্মাকে অবলম্বন করিয়া কামনারূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে নাশ কর ॥৪৩॥

সমাজে তীব্র ও অশোভন অসাম্য ও দুঃখ দেখা দিত না। গীতার ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম্ম হিন্দু সমাজকে আজও পুনরায় সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনযাত্রা ও ধর্ম্মপালন একীভূত করিতে পারে। পশ্চিমের প্রবল ধনমোহের যদি কিছুও বাধা দিবার থাকে, তবে তাহা ধর্ম্মে আস্থা। গীতার উক্ত হিন্দুধর্ম্মে সেই আস্থা ফিরিয়া আসিলে সমাজ সংস্কৃত ও গ্লানিমুক্ত হইয়া শুদ্ধ ও স্বাধীন হইবে।

কথা হইতে পারে যে, গীতার বর্ণধর্ম্মের এই ব্যাখ্যা নূতন। ইহা নূতন কি পুরাতন তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী মনে করেন গীতায় বর্ণ-ধর্ম্মের অর্থ তিনি যাহা করিয়াছেন তদ্ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। অপর দিকে অনেকানেক সর্ব্বজনমান্য ভাষ্যকার অন্য প্রকার ভাষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভিতরও যখন মতের পরস্পর গুরুতর বিরোধ রহিয়াছে—তখন যে মত গীতার বাক্যের সরল অর্থ ধরিয়া পাওয়া যায়, যে মত গীতার অন্যান্য উক্তি হইতে সমর্থিত হয় এবং যাহা ব্যতীত গীতার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—সেই সদর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অধুনা যেভাবে জাতিভেদ প্রচলিত, তাহা অবশ্যই সংশোধন করা আবশ্যক ; এবং তাহার পরিবর্ত্তে গীতার উক্ত বর্ণধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলেই, ভারতবর্ষের ধর্ম্মের গ্লানি দূর হইবে – হিন্দুধর্ম্ম সূর্য্যপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া সমাজে শুভ ও শান্তি আনয়ন করিবে।

লালাবাবুর দীক্ষা

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর, বি-এ

সিত মর্ম্মরে খচি' বিরাট দেউল রচি'
আর্ত্ত আতুর তরে খুলি দানসত্র,
গড়িয়া অনাথশালা, সার করি ঝোলামালা,
ভক্তগণের নামে লিখি দানপত্র,
লালাবাবু বৈরাগী,— গুরুকরণের লাগি,
সারা পথ ভরি ভেট-উপহারপুঞ্জে,
বাবাজী কৃষ্ণদাস যেখানে করেন বাস,
একদা এলেন সেই নিভৃত-নিকুঞ্জে।

ভক্তমুখে নাম গান শুনিয়া জুড়াল প্রাণ
বাজিয়া উঠিল তাঁর হৃদয়ের যন্ত্র,
সাধুর চরণে ধরি' ক'ন লালা, "কৃপা করি
এ অধমে দি'ন তরী,—তরণের মন্ত্র।"
সাধু ক'ন স্নেহভরে "এবে ফিরে যাও ঘরে
এখনো আসেনি তব দীক্ষার লগ্ন,
নিজে যাবো, এলে দিন রবো না ক উদাসীন ;"
এত কহি আঁখি মুদি পুন জপে মগ্ন।

লালাবাবু যা'ন ফিরে বুক ভাসে আঁখিনীরে,
ভেট দক্ষিণা সাথে ধিক্কারে ক্ষুণ্ণ,
ভাবেন, "হায়রে তবে যশই কিনেছি ভবে,
পায়ের কড়ির থলি একেবারে শূন্য ?
পুণ্যের আহরণে এখনো মনের কোণে,
ছায়ারূপে বিরাজিছে অভিমান দম্ভ,
ছাড়িয়া বিষয় মায়া সে বুঝি ধরেছে কায়া,
বাহিরে তাহার রূপ মঠ বেদী স্তম্ভ।
যার ধন সেই পায়, লোকে মোর গুণ গায়,
তাই শুনি নিশিদিনই, ভাবি তাই সত্য।
ব্রজনাথ করে দান, জাগে মোর অভিমান,
ভবরোগীটির এ যে দারুণ কুপথ্য।"

এই ভাবি সব ছাড়ি মন্দির মঠ-বাড়ী,
চলিলেন লালাবাবু ঝুলি লয়ে স্কন্ধে,
পথে পথে ব্রজধামে জয় শ্যাম রাধা নামে,
মাধুকরী করি সদা ফিরেন আনন্দে।
ব্রজবাসিগণ তায় সবে পিছু পিছু ধায়,
লাখপতি ভিখ মাগে 'বলি রাধাকৃষ্ণ',

দীন ভিক্ষুক যারা দুই পাশে কেঁদে সারা,
দু'ধারে ভবনগুলি চাহিছে সতৃষ্ণ।
ভাণ্ডার খালি ক'রে আনে থালী ডালি ভ'রে
দিতে রাজভিখারীরে,—ছুটে সবে ব্যস্ত,
ভিখারী লয় না কিছু বদন করিয়া নীচু,—
মুষ্টি ভিক্ষা তরে পাতে বাম হস্ত।

মাস-ছয় গেল চ'লে গুরুর চরণ তলে
জানালেন লালাবাবু পুন সংকল্প,
হেসে তারে গুরু ক'ন, "দেরী নাই, সুলগন
নিকটে এসেছে বাছা,—বাকী আছে অল্প।"
লালাবাবু ফিরে যা'ন, ভেবে খুঁজে নাহি পান,
দীক্ষার বাধা কোন্ ঐহিক সূত্র,
কোথা কোন্ ফুটা দিয়া যায় হায় বাহিরিয়া
সঞ্চয় তাঁর,—কী সে দুগ্ধে গো-মূত্র ?

সারা পথ আঁখি-জলে তিতাইয়া লালা চলে,
নয়নে নাহিক নিদ—রুচে না ক অন্ন,
শেঠেদের বাড়ীটার পাশ দিয়ে যেতে তাঁর,
জাগিল সহসা চিতে নব-চৈতন্য।
সহসা ভাবেন থামি, "কি ধন পেলাম আমি,
কে করিল করাঘাত হৃদয়-মৃদঙ্গে ?
এই শেঠেদের বাড়ী, রেশারেশি আড়া-আড়ি,
চলিয়াছে কতদিন—ইহাদের সঙ্গে,
ব্রত দান খয়রাতে কতই এদের সাথে,
প্রতিযোগিতায় আমি ছিনু রজোদৃপ্ত,
পুণ্য-পণ্য তরে দর ডাকাডাকি ক'রে,
যশ-পিপাসারে মোর করিয়াছি তৃপ্ত।
মনের কুহর মাঝে আজো অভিমান রাজে,
হায়, হায়, অধমের হলো না ক' শিক্ষা,
এ ব্রজের দ্বার-দ্বার গেছি আমি বারবার,
পারি নাই এ দুয়ারে মাগিবারে ভিক্ষা।"

এত ভাবি একেবারে শেঠের তোরণ-দ্বারে,
হাঁকিলেন লালাবাব, "রাধে গোবিন্দ।"
শেঠেদের ঘরে ঘরে সে ধ্বনির সাড়া পড়ে,
ছুটে আসে পরিচর-পরিজনবৃন্দ।
কাঁদিল প্রহরী দ্বারী,— কেঁদে উঠে ভাণ্ডারী,—
দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে পদধূলিপঙ্কে,
শেঠ্জী ছুটিয়া আসে বাঁধে তাঁরে বাহুপাশে,
নারীরা ফুঁপায়ে কাঁদে ফুকারিয়া শঙ্খে।

ভেদি' রোদনের রোল, হরিবোল, হরিবোল,
টলমল সারা বাড়ী প্রেমের তরঙ্গে,
উদ্দাম কীর্ত্তনে তাণ্ডব নর্ত্তনে,
প্রেমের গুরুর নাম ঘোষিল মৃদঙ্গে।
শেঠ কয় জুড়ি পাণি "আজি পরাজয় মানি,
ইহলোকে পরলোকে জিতে গেলে বৈরী,
ঝুলিখানি তব কাঁধে ভরা জয় সংবাদে,
সোনা দিয়ে পরাজয় করিয়াছি তৈরী।"
শেঠ হাঁকে, "বার বার সারা শেঠ ভাণ্ডার
সাথে দাও বন্ধুর, তবে পাবো তুষ্টি"
লালাবাবু ক'ন "ভাই, এ জঠরে ঠাঁই নাই
এক কটোরায়ো, চাই শুধু এক মুষ্টি।"
এক মুঠি প্রেমকণা,— ভিখারী হাজার জনা,
লালাবাবু ফিরে যান, সাথে চলে হর্ষে
সবে হরি হরি বলি,' করতাল কুতূহলী,
শেঠকুল মহিলারা ফুল লাজ বর্ষে।
ফিরে যেতে দ্বারদেশে হেরিলেন, গুরু এসে
কহিছেন, "আজি শেষ হয়েছে পরীক্ষা,
নেচে হরি হরি বলো, যমুনার ঘাটে চলো,
লগ্ন এসেছে লালা, লও আজি দীক্ষা।"

দুষ্টগ্রহ

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল

৭

নেলীর বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। সে এখনও খুব দুর্ব্বল, কিন্তু মস্তিষ্কের বিকৃতি সারিয়াছে। এখন কেবল ক্রমে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া তাকে সুস্থ করিবার প্রয়োজন।

রমেনের দেওয়া টাকার মধ্যে যাহা উদ্বৃত্ত ছিল, তাহা হইতে পাঁচ টাকা জমা দিয়া মাসে পাঁচ টাকা দিবার করারে করুণা একটা সেলাইয়ের হাত-কল কিনিয়া আনিল; আর সামান্য কিছু কাপড় আনিল। তার মনে একটা দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা হইল--সে রমেনের ঋণ পরিশোধ করিবে—আত্মরক্ষা করিবে। সেই অসম্ভব আশায় সে দিনরাত বসিয়া সেলাই করিতে লাগিল।

করুণা সকালে বসিয়া সেলাই করিতেছিল, রমেন আসিয়া দুয়ার ঠেলিল।

করুণা শক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমেন জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছে নেলী?"

করুণা শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "ভাল আছে।"

তার কথার ভিতর একটা বিরুদ্ধ ভাব এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ হইল যে রমেন একটু ক্ষুব্ধ হইল।

সে নেলীর বিছানার পাশে গিয়া বসিল। নেলী স্নিগ্ধ-হাস্যে সম্ভাষণ করিয়া তাকে পুরস্কৃত করিল।

অনেকক্ষণ রমেন নেলীর পাশে বসিয়া তার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিল। করুণা তার কোনও কথায় যোগ দিল না। রমেন এক-আধটা কথা তাকে জিজ্ঞাসা করিল; করুণা তার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়া সেলাইয়ে মনোনিবেশ করিল।

করুণার মনের ভিতর তখন দারুণ সংগ্রাম চলিতেছে। রমেনকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিবার জন্য সে ব্যস্ত হইল; কিন্তু তার অনুগ্রহের বোঝা তার মাথার উপর চাপিয়া তাকে নিরস্ত করিল। সে বোঝায় সে পীড়া বোধ করিল। তার নিগূঢ় অর্থ সে যাহা অনুমান করিতেছিল, তাতে তার সমস্ত অন্তর নিদারুণ শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কাজেই যতক্ষণ রমেন বসিয়া ছিল, ততক্ষণ সে অসহ্য অস্বস্তি বোধ করিল।

শেষে রমেন বলিল, "ডাক্তার বাবু বলছিলেন, এখন কয়েকদিন বাদে নেলীকে কোথাও চেঞ্জে পাঠাতে পারলে ভাল হয়। আপনার কোনও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ কোথাও নেই, যার কাছে ওকে মাসখানেকের জন্য পাঠাতে পারেন?"

করুণা সংক্ষেপে বলিল "না।"

চিন্তিতভাবে রমেন বলিল, "তাই তো! আচ্ছা দেখি।"

করুণা চট্ করিয়া বলিল, "মাপ ক'রবেন, আপনি সম্বন্ধে কোনও চেষ্টা ক'রবেন না।"

"কেন ক'রবো না বলুন দিকিনি," বলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমেন করুণার দিকে চাহিল।

করুণা বলিল, "আমার পক্ষে কথাটা বলা ভয়ানক অকৃতজ্ঞের কাজ; কিন্তু দয়া ক'রে ভুল বুঝবেন না। আপনার দয়া আমার চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু যা' আপনার কাছে পেয়েছি, তাই কোনও দিন শোধ ক'রতে পারবো কি না জানি না,—আর কোনও অনুগ্রহ ক'রে আমার বোঝা দয়া ক'রে বাড়াবেন না।"

হাসিয় রমেন বলিল, "ওঃ এই কথা! সেজন্য ভাববেন না মিসেস দাস, আমার দেনা আপনি না পারেন নেলী শোধ দেবে—কি বল নেলী?"

নেলী হাসিল। করুণার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

রমেন যখন উঠিল, তখন করুণা দ্বারের কাছে গিয়া তা'কে বলিল, "দেখুন, নেলী তো এখন ভালই হ'চ্ছে—এখন আর আপনার কষ্ট ক'রে আসবার দরকার নেই।"

এইবার রমেন ক্ষেপিয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন বলুন দিকিনি আপনি বরাবর আমাকে এই রকম ক'রে দূর করবার চেষ্টা ক'রছেন? কি ক'রেছি আমি আপনার? আপনি নিশ্চয়ই এ কথা বুঝতে পারছেন যে, আপনি এতে আমার অপমান ক'রছেন। এমন অপমান হ'বার যোগ্য কাজ আমি কি ক'রেছি?"

করুণা মাথা নীচু করিয়া এ তিরস্কার শুনিল। তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া রমেন উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল—করুণা কোনও উত্তর দিতে পারিল না। ক্রমে টস্ টস্ করিয়া তার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ইহাতে রমেন ভয়ানক সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তার মনে হইল ভারী অন্যায় হইয়া গিয়াছে তার রাগ করা; অথচ কথায় সে-কথা সে প্রকাশ করিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পর করুণা বলিল, "আমার অপরাধ হ'য়েছে, ক্ষমা ক'রবেন।" বলিয়া সে মুখ ঘুরাইয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। রমেন কিছুক্ষণ মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

ইহার পর এক সপ্তাহ রমেন আসিল না; তার কোনও খবরও করুণা পাইল না।

ইহাতে করুণার মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। সেদিন বিদায়ের সময় রমেনকে সে যে-কথা বলিয়াছিল, তাহাতে যে রমেন মর্ম্মান্তিক ব্যথা অনুভব করিয়াছে, সে-কথা সে তখনই বুঝিয়াছিল। বুঝিয়াই তার মনটা ভয়ানক দমিয়া গিয়াছিল। জগতে তার একমাত্র উপকারী, একমাত্র ব্যথার ব্যথীর মনে এমন করিয়া দাগা দিয়া সে আপনাকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিল না।

তার পর হইতেই সে দিনরাত এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। যতই সে ভাবিত, ততই আত্ম-তিরস্কারে মন ভরিয়া উঠিত। রমেনকে সেদিন কোনও রকম রূঢ়তা দেখাইবার বা তিরস্কার করিবার কোনও হেতু এখন সে খুঁজিয়া পাইল না। যতই সে রমেনের কথা ভাবিতে লাগিল, তার চিত্ত ততই তার অনুকূল হইয়া উঠিল, আর আপনাকে তার নিজের চক্ষে ততই হেয় অশ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে হইল।

তার স্থির বিশ্বাস হইল, রমেন তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে,—ভালবাসে বলিয়াই সে আসে। করুণা তাকে ভালবাসে না—কোনও দিনই তার মনে ভালবাসার ছায়া-মাত্রও আসে নাই। কৃতজ্ঞতা তার না ছিল এমন নয়; কিন্তু যখন তার মনে হইত যে, রমেনের যা কিছু উপকার সকলের উদ্দেশ্য মন্দ, তার যৌবনের আকর্ষণেই রমেন তাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন তার কৃতজ্ঞতা আচ্ছন্ন করিয়া জাগিয়া উঠিত একটা দারুণ বিরক্তি ও অশ্রদ্ধা। কিন্তু এখন তার আর রাগ হইল না। রমেনের প্রেমের প্রতি তার শ্রদ্ধা হইল, কৃতজ্ঞতায় হৃদয় তার পূর্ণ হইল; আর সে যে রমেনের ভালবাসার প্রতিদানে কেবলই তাকে কঠোর আঘাত করিয়া আসিয়াছে, এ কথা ভাবিয়া তার অন্তর অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল।

এখন তার মনে হইল যে, রমেন যে তাকে ভালবাসে, তার ভিতর স্বার্থও নাই, যৌবনের বুভুক্ষাও নাই। আছে সুধু তার অন্তরের ঔদার্য্যের পরিচয়। নহিলে, কি সে—যার জন্য রমেন তাকে কামনা করিবে? যৌবন তার আছে বটে, কিন্তু রূপ নাই, বিদ্যা নাই, গুণ নাই, কিছুই নাই। নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সারা জীবন বুঝিয়া সে তার ভিতরকার কোনও শক্তিই সম্যক পরিপুষ্ট করিতে পারে নাই। তবু যদি রমেন তাকে ভালবাসে, সে তার ঔদার্য্যের পরিচয়।

যখন সে রমেনের চিত্তের এই পরিচয় স্থির করিল, তখন তার মনে হইল যে, এমন ভালবাসার প্রতিদানে তাকে অদেয় তার কিছুই থাকিতে পারে না।—দেহের যে পবিত্রতা, নারীত্বের যে সম্মান এতদিন সে এত যত্নের সহিত, নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা লইয়া যদি রমেন তৃপ্ত হয়—হউক, তাতে তার কিছুই বলিবার নাই।

ধর্ম্ম? ভগবান জানেন ধর্ম্ম কোথায়! অদৃষ্টের ফেরে তার বিবাহ হইয়াছিল এমন লোকের সঙ্গে, যার কাছে সে কোনও দিন কিছুই পায় নাই, সুধু অপমান ও নির্য্যাতন ছাড়া। তার সঙ্গে সহবাস, তার কাছে নিদারুণ অপমান হাত পাতিয়া লইলে তার ধর্ম্ম হইত, আর এই রমেন—যে মানুষের মধ্যে দেবতা, তার চরণে আপনার সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে হইবে পাপ?

এ কথা ভাবিতে তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; তার ভিতরকার মজ্জাগত সম্মানবোধ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।—সে ভাবিল, "ছিঃ! কি ভাবছি আমি! ওসব কথা নয়।"

ইহার পর সে ডাক্তারবাবুর কাছে বার বার রমেনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছে, প্রতিদিনই ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন, "কি জানি? রমেন বাবু তো আসেন নি আমার কাছে!"

ছয় দিন যখন এমনি করিয়া কাটিয়া গেল, তখন তার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। তার আর সন্দেহ রহিল না যে, তার কাছে নির্ম্মম কশাঘাত খাইয়া ব্যথিত রমেন তাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, আর সে আসিবে না।

রমেনের প্রতি করুণার এক ফোঁটা লোভ ছিল না, কিন্তু তার প্রাণে এমনি করিয়া ব্যথা দিয়াছে ভাবিয়া তার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একবার তার পায় ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া তার হাতে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিবার জন্ত সে অস্থির হইয়া উঠিল।

সে অনেকক্ষণ মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল। ভগবানকে ডাকিয়া আকুল অন্তরে প্রার্থনা করিল, "পথ দেখাও আমায় ভগবান—কি ক'রবো আমি ব'লে দেও। অমন দেবতার অন্তরে এমনি ব্যথা দিয়ে আমার ধর্ম্ম হ'বে কি?"

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে পরদিন বৈকালে রমেনকে একখানা চিঠি লিখিল। সে লিখিল,

"রমেন বাবু,

সেদিন আপনাকে আমি ভয়ানক শক্ত কথা ব'লেছিলাম। তার পর আপনি আর আসেন নি। ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলাম, আপনি তাঁর কাছেও কোনও খবর নেন নি। নিশ্চয়ই আপনি আমার উপর খুব রাগ ক'রেছেন।

আমি নিতান্ত হতভাগিনী, তাই আপনার অন্তরে এমন ব্যথা দিয়েছি। দয়া ক'রে একবার আসবেন, পায় ধ'রে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার একটা অবসর দেবেন।

আর আমার মুখে কোনও কড়া কথা শুনতে পাবেন না। আপনি দেবতা, আমি আপনার পায়ের তলার কীটাণুকীট। আমার বিষয়ে আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই ক'রবেন, যাতে আপনার তৃপ্তি হয় তাতেই জীবন সার্থক মনে ক'রবো।

দয়া ক'রে আসবেন। নেলী অনেকটা ভাল, সেও আপনাকে দেখতে চায়। ইতি—"

চিঠিখানা বার বার সে পড়িল—খামে পুরিল। তার পর তার মনে হইল, ঠিক হইল না। একটু ভালবাসার কথা না থাকিলে বোধ হয় রমেনের ভাল লাগিবে না। তাই সেখানা মুচ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া সে আবার লিখিল,

"রমেন বাবু,

আপনাকে সেদিন কষ্ট দিয়াছি। তার পর হইতে বড় যাতনা ভোগ করিতেছি। দয়া করিয়া আপনি আসিবেন—আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিবেন না।

আপনি বিশ্বাস করিবেন কি? আমি আপনাকে ভালবাসি—আপনার ভালবাসা আমার মাথার মণি—সেই স্পর্দ্ধায়ই আপনাকে কটু কথা বলিয়াছি। অপরাধিনীকে ক্ষমা করিয়া আসিবেন, আর অপরাধ করিব না। ইতি—"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই চিঠিখানা খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া সে উঠিল।

নেলীর বিছানার পাশে গিয়া দেখিল, নেলী জাগিয়াছে। সে বলিল, "তুমি কাকে চিঠি লিখলে মা?"

এ প্রশ্নে করুণার সমস্ত শরীর যেন লজ্জায় ছাইয়া গেল। লজ্জায় সে স্বীকার করিতে পারিল না রমেনকে সে চিঠি লিখিয়াছে। সে মিথ্যা করিয়া বলিল মিসেস চৌধুরীকে লিখিয়াছে। মিসেস চৌধুরী তার পূর্ব্বছাত্রীর মা।

"কি লিখলে মা?"

করুণা সহিতে পারিল না। কত মিথ্যা কথা বলিবে সে? তাড়াতাড়ি সে বলিল, "এই তোর অসুখের কথা।" বলিয়াই সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। অপর দিককার জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সে মনে মনে ঘৃণায় মরিয়া গেল। ছি, কি লজ্জার কথা! মেয়ের দুটি ছোট্ট প্রশ্নেই সে বুঝিল যে, যে-কাজ সে করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা করিলে সে এ মেয়ের কাছে আর মুখ দেখাইতে পারিবে না। সে তাড়াতাড়ি চিঠি দুইখানি কুড়াইয়া লইয়া দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া তাহা জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল।

সে জানালাটা ছিল ঠিক রাস্তার উপরে। করুণা চিঠি দুখানা ফেলিয়া দিয়া একটু সুস্থ মনে নেলীর জন্যে খাবার তৈয়ার করিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় সেই গলির ভিতর একটি সুসজ্জিত সৌখীন যুবক আসিয়া এদিক সেদিক চাহিয়া সেই জানালার তলা হইতে সেই কাগজগুলি তুলিয়া লইল। করুণা চিঠি দুইখানা না ছিঁড়িয়াই দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছিল —যুবকটি যত্নের সহিত তার ভাঁজ খুলিয়া চিঠি দুখানা পড়িল। পড়া শেষ হইলে তার মুখে একটা পৈশাচিক আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা গেল।

চিঠি দুখানা যত্নের সহিত তার জামার পকেটে পুরিয়া সে যুবক তার সুচিক্কণ গুম্ফে একটু চাড়া দিল, চকচকে কুঞ্চিত টেড়িটা হাত দিয়া আর একটু দুরস্ত করিল। রেশমী চাদরখানা বেশ ভাল করিয়া গায় পরিয়া লইল। তার পর একটা সিগারেট ধরাইয়া তার কোঁচান মিহি ধুতির কোঁচাটা যত্নের সহিত বাঁ হাতে ধরিয়া সে তার সরু বেতের ছড়িখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে করুণার দুয়ারে ধাক্কা দিল।

দুয়ার ভেজান ছিল, খুলিয়া গেল।

করুণা তখন নেলীর জন্য দুধ গরম করিয়া বাটী হাতে চামচ দিয়া ঘুঁটিতেছিল। দরজাটা খুলিতেই সে মুখ তুলিয়া চাহিল। ধপ করিয়া দুধের বাটী তার পায়ের তলায় পড়িয়া গেল, —সে পাথরের মূর্ত্তির মত আগন্তুকের দিকে চাহিয়া রহিল।

আগন্তুক হাসিয়া বলিল, "কিগো, একেবারে চমকে গেলে যে—এঃ দুধটা নষ্ট ক'রে ফেল্লে।" বলিয়া অগ্রসর হইয়া করুণার পিঠে হাত চাপড়াইয়া বলিল "বেড়ে, আছ বেশ।"

করুণার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। আগন্তুক তার হাত ধরিয়া টানিয়া নেলীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "হঠাৎ শুনলাম নেলীটার অসুখ। তা' তুমি আমাকে একটা খবরও দেও নি। ছি!"

নেলীর খাটের পাশে বসিয়া সে বলিল, "কিরে নেল্, কেমন আছিস।"

আগন্তুককে দেখিয়া নেলীর পাণ্ডু মুখ ভয়ে একদম সাদা হইয়া গিয়াছিল, সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "ভাল আছি।"

করুণা তখন আগন্তুকের হাত ছাড়াইয়া গিয়া নেলীর জন্য আবার দুধ গরম করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। একটা দারুণ বিরক্তির ছায়ায় তার সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়াছিল। সে যে একটা ভীষণ সঙ্কটে পড়িয়াছে, তার কপালে চিন্তা-রেখায় তাহা লেখা ছিল।

করুণার দুধ গরম করা হইয়া গেলে সে নেলীকে খাওয়াইল। তখন পর্য্যন্ত তার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

আগন্তুক বলিল, "করুণা, এক পেয়ালা চা কর না। আর কিছু খাবার আনতে দেও।"

করুণা শুধু বলিল, "চা ঘরে নেই।"

"Bother it—আচ্ছা, তবে শুধু চার আনার খাবার আনতে দেও। Damn it, তোমার এ বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে আমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে।"

করুণা বলিল, "খাবার কে আনবে? আমার তো আর দশটা দাসী চাকর নেই।"

"আরে dash it, এ বাড়ীর কোনও একটা ছোকরাকে ধ'রে পাঠিয়ে দাও না, না হয় তাকে এক পয়সা খেতে দিও— না হয় তুমিই গিয়ে নিয়ে এসো না, তুমি তো পথে না বেরোও এমন নয়!"

করুণা এ কথায় ভ্রূকুটি করিয়া উঠিল। একটুখানি বিরক্তি হজম করিয়া সে বলিল, "ও কথা আবার বড় গলায় বলতে যে পারছো সে তুমি ব'লেই—মানুষ হ'লে পারতো না। আমায় পথে দাঁড় করিয়েছে কে?"

হো হো করিয়া হাসিয়া আগন্তুক বলিল, "বাঃ, বেশ acting হ'চ্ছে—encore নেও। ওসব মানের কান্না রাখ, ক্ষিদে পেয়েছে মাইরি, দাও খাবার আনতে।"

করুণা দুয়ার খুলিয়া এদিক ওদিক চাহিল, দেখিল সেই পাঞ্জাবী ছোকরা বসিয়া আছে। আঁচল হইতে একটা আধুলি খুলিয়া সে তাকে বলিল, "আমাকে এই ময়রার দোকান থেকে চার আনার খাবার এনে দেবে বাবা?"

বালক কর্ত্তার সিং উঠিয়া বলিল, "কেঁও নহী মেম সা'ব।" বলিয়া সে আধুলিটা হাত পাতিয়া লইল।

তাকে দেখিয়া আগন্তুক তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা এনামেলের পেয়ালা সংগ্রহ করিল, এবং কর্ত্তার সিংএর নিকট গিয়া বলিল, "বহুত আচ্ছা বাবা, বেড়ে ছোকরা তুমি, আর অমনি এক পেয়ালা চাও নিয়ে এসো বাবা। দেখো তাড়াতাড়ি —জলদী আও—নইলে চা জুড়িয়ে যায়েগা চাঁদ।—আর শোন, অমনি এক পয়সার খাবার কিনে তুম্ খা যাও—বুঝা!"

কর্ত্তার সিং হাসিয়া বলিল "হাঁ বুঝা।"

কর্ত্তার সিং চলিয়া গেলে করুণা আপনাকে বেশ শক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা আবার তুমি কি জন্যে আমাকে জ্বালাতে এলে বল দিকি নি?"

আগন্তুক সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "বল্লাম তো, নেলীকে দেখতে এসেছি—নইলে তোমার ও সোণার বরণ চন্দ্র বদন দেখতে আসিনি।"

"আমাকে দেখতে তুমি আস নি জানি, নেলীর জন্য তোমার যে প্রাণ কত কাঁদে তাও জানি। কিন্তু গেলোবার কি কথা ছিল? তুমি দিব্যি ক'রে ব'লে গিয়েছিলে, আর আসবে না। আবার কোন্ মুখে এসেছ শুনি?"

"আসবার জন্য আমার কারও মুখ ধার ক'রতে হয় নি। আমার এ মুখখানা খুব সুন্দর না হ'তে পারে; কিন্তু তোমাকে দেখাবার পক্ষে এখানা বেশ চলনসই।"

"ও সব কথা রেখে দেও, কাজের কথা বল,—তুমি কথা দেওনি যে তুমি আর আমার কাছে আসবে না?"

হাসিয়া আগন্তুক বলিল, "দেখ, কথা দিয়ে কথা রাখে যারা ভদ্রলোক। আমি নিজেও কোনও দিন নিজেকে ভদ্রলোক বলে পরিচয় দি নি, আর তুমিও কোনও দিন আমায় ভদ্রলোক ব'লে ভুল কর নি।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া করুণা বলিল, "একদিন সে ভুল ক'রেছিলাম, সেই থেকে ভুগছি।"

"বস, তবে আর সে ভুল কেন ক'রবে? আমি ভদ্দর লোক নই তাই এসেছি।"

"কেন এসেছ?"

"দরকার আছে তাই এসেছি—সে কথা পরে বলছি, আগে খাবার টাবার খেয়ে সুস্থির হ'য়ে নি। তোমার হয় তো একটু অসুবিধা হ'চ্ছে—হয় তো আমার জন্য অন্য কারও অসুবিধা হ'চ্ছে। কিন্তু কি করবে—ঘণ্টাখানেক না হয় আমার জন্যেই অপব্যয় ক'রলে।"

রাগে করুণার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। দাঁতে দাঁতে লাগিয়া গেল। তার চোখ দিয়া আগুন ছুটিল।

তার সে মূর্ত্তি দেখিয়া আগন্তুক হাসিয়া উঠিল। তার দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া সে বলিল, "বড্ড রাগ হ'চ্ছে, না? মাইরি, তোমার এই রাগটা আমার ভারী ভাল লাগে। যা'ক, একেবারে ফেটে যেও না। আসুক খাবার, খেয়ে দেয়ে সুস্থির হ'য়ে সব কথা বলা যাবে—সত্যি বলছি কথাটা বড্ড দরকারী।

করুণা মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। আগন্তুক একটা মোড়ায় বসিয়া আর একটা সিগারেট ধরাইল। (ক্রমশঃ)

আঁখি-জল

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আর কিছু নাহিক সম্বল,
শুধু সখা আছে আঁখি-জল!
ডেকে ডেকে যবে তোমা এ বিশ্ব-মাঝারে
পরিশ্রান্ত হ'য়ে দুটী বাহু আসে ফিরে,
রসনা অসাড় হ'য়ে হ'য়ে যায় মূক,
নীরব হাহাতে মোর শুধু ফাটে বুক,

সে বক্ষের ক্ষত হ'তে তবে সখা ছাপায়ে আঁখির কূল
উষ্ণ শোণিত অশ্রু হইয়া বহি' যায় কুলু কুল!
সে আবেগ আঁখি-নীরে ও রাঙা চরণ
যদি পাই ধুয়ে দিই করিয়া যতন,
কত সুখে ধরি বুকে জুড়া'ব জীবন,
সদা মোর এই আকিঞ্চন।

নারী

শ্রীমতী আশালতা দেবী

সেদিন কোথায় যেন চোখে পড়েছিল প্রাচীন গ্রীস ও রোমে একদা নারীকিরণ-বর্ষণের জন্য দু-একটি বাতায়ন খোলা হয়েছিল। প্রমাণের হয় ত অভাব হবে না, কিন্তু বাতায়ন প্রান্ত থেকে কি করে কিরণ-বর্ষণ হয়, তা আমার আদৌ জানা নেই। যাহোক, তার পর এই তথ্যটি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠল যে, নারীর প্রভা পুরুষের অন্তরে দীপ্তি দেয়, তার প্রতিভাকে অনুরঞ্জিত করে; কিন্তু এ ক্ষুদ্র সার্থকতা অতিক্রম করে আর সম্প্রসারিত হয় না। পুরুষের মনোবৃত্তির উপর নারীর প্রেরণা অত্যন্ত কাজ করে এবং তার সৃষ্টিশক্তির পক্ষেও নারী লাবণ্য-বর্ষণ অত্যাবশ্যক, এই সহজ সত্যটী স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত দাঁড়াল, সৃষ্টি করার ক্ষমতা নারীর নেই, তার কাজ লালন ও রক্ষণ। নারী যে সাহিত্যে, ললিতকলায়, সঙ্গীতে মৌলিক কিছু দিতে পারেনি, এই তার অকাট্য প্রমাণ।

কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে এ কথা স্বীকারও ত করতে পারিনে। প্রতিভার কথা আলাদা,—প্রতিভা থাকলেও স্থায়ী সৃষ্টি করে দিতে হলে বহু দিনের সাধনা প্রয়োজন। সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিতে একই স্রোতঃপথে বহুকাল নিয়োজিত রাখতে হয়,—এই সুযোগ এবং অবসর স্ত্রীলোক পেয়েছেন কি না আমি জানি না। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা বহু-ব্যাপ্ত নয়। য়ুরোপে নারী অনেক দিন এ সুবিধা পেয়েছে; তত্রাচ তাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমন কিছু দিতে পারে নি, যা একান্ত করে তাদেরই নিজস্ব; এবং যদি বা অল্প স্বল্প কিছু দিয়ে থাকে, সে কেবল পুরুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অনুকরণ মাত্র। নারীর একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের ছাপ তার মাঝে নেই। তর্ক করতে বসে এই পর্য্যন্ত অনেকে এসেচেন; এবং তার পর উপসংহার হয়েছে, মানসিক শক্তি পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের কম। শরীর-বিজ্ঞান তার প্রমাণ প্রয়োগ নিয়ে এসে বলছে, এত পরীক্ষা করে দেখা গেছে—পুরুষের 'ব্রেণে'র ওজন নারীর চেয়ে বেশী। কিন্তু এ সমস্ত জটিল শরীর-বিজ্ঞানের তথ্য কোন কারণেই নিঃসংশয়িত নয়; এবং এখনও বিস্তর মতবিভেদ আছে।

স্ত্রীলোক যে সৃষ্টি করতে পারে নি, মনে হয় তার অনেক কারণ রয়েচে। নারীর অস্তিত্বই এমনি, সংসারের শত কাজে তার রম্য ব্যাপ্তি সর্ব্বস্থানে জড়িত হয়ে রয়েচে। একটি মাত্র বিন্দুতে তার প্রসারিত মনোবৃত্তিকে প্রত্যাহার করে নিয়ে স্থাপন করা বহু শতাব্দী ধরে তার ঘটে ওঠে নি। সাধারণ বিষয়ে একটা সহজ জ্ঞান স্ত্রীলোকের চট করে হয়ে যায়; কিন্তু কোন একটা বিষয় নিয়ে তার শেষ তল অবধি বুঝবার চেষ্টা করা তার প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না। স্ত্রীলোকের মনে অতীতের ছায়া নেই এবং সুচির-ভাবষ্যতের কোন স্বপ্ন নেই,—তার জীবন শুধু বর্ত্তমান। যাঁরা বড় শিল্পী হন, তাঁরা কোন দিন তাঁদেরই জীবনে পূর্ণ সম্মান পাননি। বেশীর ভাগ জায়গায় তাঁরা ভবিষ্যতের অগ্রদূত, তাই ধ্যান-মৌন দৃষ্টি তাঁদের বহু দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের প্রতি নিবদ্ধ থাকে,—বর্ত্তমানের দারিদ্র্য, ভুল বোঝা, কোন কিছুই তাঁদের বাধা দিতে পারে না। স্ত্রীলোক বর্ত্তমানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন না। উপস্থিত মত স্বজন, প্রতিবেশীকে সুখী করতে পারলেই তাঁরা সন্তুষ্ট বোধ করে থাকেন। স্নেহে, করুণায়, প্রতিবেশ এবং সাহচর্য্যে স্ত্রীলোকের জীবন শত সহস্র পাকে বর্ত্তমানের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েচে। তাই তাঁরা নিজে কি, তার চেয়েও বেশী লোকের চক্ষে তাঁদের অস্তিত্ব কেমন করে প্রতিফলিত হয়েচে, এই চিন্তাতেই সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকেন।

স্ত্রীলোকের যুক্তির চেয়ে হৃদয়াবেগ বেশী। সত্যকে নির্ম্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে হলে ব্যক্তিগত আবেগ যতটা বর্জ্জন করতে হয়, তাঁরা তা পারেন না। তাই দুঃখ-কষ্টে তাঁরা বিচলিত হন, অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেন; কিন্তু দুঃখ-বেদনা যেখানে কেবল পরিস্বচ্ছ আবরণ মাত্র, যার অবকাশ-পথে বিশ্বের সত্য স্থির হয়ে রয়েচে, এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করেও যেখানে জীবনের জয়গান, তার খোঁজ তাঁরা রাখেন না। আর্ট জিনিষটা অত্যন্ত সহজে লাভ করা যায় না। তার জন্য একাগ্রতা এবং আরও অনেক কিছু আবশ্যক। স্ত্রীলোকের সর্ব্ব স্থানে প্রসারিত অস্তিত্ব যদি কোন দিন

সংহত হয় এবং যথেষ্ট গভীরতা লাভ করে, সেদিন হয়ত সে সৃষ্টি করবে। স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আরও গুটিকতক কথা বলা যায়। বহু শতাব্দী ধরে পুরুষ-জাতি চিন্তা-জগতে প্রধান স্থান অধিকার করে এসেচে। নারী চিন্তা-জগতে স্থান অধিকার করবার বহু পূর্ব্বে একটা সাহিত্য গড়ে উঠেছে এবং সেটা পুরুষেরই তৈরী। তাই মনে হয়, নারীকে সে যেন বড় বেশী আচ্ছন্ন করে তুলেছে। জগতের যে প্রতিবিম্ব আমরা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে পাই, সেটা পুরুষের দৃষ্টি এবং পুরুষের temperament'এর মধ্যবর্ত্তিতায় রমণীর মনে পৌছেচে। এই সব প্রতিচ্ছায়া, প্রতিবেশ, শত যুগের আবেষ্টিত প্রভাব অতিক্রম করে স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ভাবে এবং পরিশুদ্ধ অবস্থায় যদি জগতের এবং জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেই দিনই তার সৃষ্টির মাঝে সে তার বিশেষ ছাপটি রেখে যেতে পারবে, যদিচ আমার সন্দেহ হয় সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নারী এবং পুরুষের কোন স্বতন্ত্র ধারা আছে কি না। নারী বহুদিন থেকে যে কাজে নিযুক্ত রয়েচে তাতে কোন একটিমাত্র বিষয়ের শেষ তল অবধি বুঝে দেখবার মত মনোবৃত্তি তার গঠিত হয়ে ওঠেনি। গৃহকাজে, সংসারের সর্ব্বত্র একটি স্নিগ্ধ ব্যাপ্তিতে প্রতিভার পরিশীলন হয় না।

অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকের যুক্তির ক্ষমতা নেই এবং এ জিনিষটা বোধ হয় প্রকৃতির সৃষ্টি। একান্ত বাস্তব এবং বর্ত্তমান ছাড়া বিশুদ্ধ চিন্তা, বিজ্ঞান, উচ্চ গণিত কোন অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট বিষয় তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন না। এক কথায়, জীবন যাপন করতে হলে যে সব জিনিষ আমরা দেখতে পাই, স্পর্শ করতে পাই, প্রত্যক্ষ ভাবে যা আমাদের ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েচে, তাই তাঁরা বেশ সহজ ভাবে গ্রহণ করেন। বেশ ত করেন, তাই বলে কি বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর তাঁদের অধিকার নেই এই মানতে হবে? এ অবধি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জগতে নারী সম্বন্ধে যাঁরা ভেবেচেন, তাঁদের সবারি সিদ্ধান্ত—নারীর কাজ সৃষ্টি নয়; এই জন্যই প্রকৃতির দরবারে তার অক্ষমতা বহু পূর্ব্বেই ঠিক হয়ে গেছে। পৃথিবীতে গুটিকতক লোক অসাধারণ এবং বেশীর ভাব সাধারণ। অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর লোকেরও ব্যক্তিহিসেবে জগতে যেখানে মান্য নেই, তবু তার গৃহে তার সম্মান আছে এবং এ গৃহের শিল্পী হচ্ছেন নারী। অতিশয় তুচ্ছ লোকের মনেও তার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রবলভাবে জানবার একটা আকাঙ্ক্ষা রয়েচে, এবং এই আকাঙ্ক্ষা সে এক স্থানে পূর্ণ দেখতে পায় যেখানে তার ক্ষুদ্র জগতের সেই একমাত্র অধীশ্বর, একটি গৃহের দীপালোক, তারই উপর অবিকম্পিতভাবে নিবদ্ধ রয়েচে। গৃহকে শ্রী দান করা নারীর সৃষ্টি। সে পৃথকভাবে সৃষ্টি করতে পারে না, সন্তানের জন্ম এবং তাকে পালনের মধ্য দিয়ে তার যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সে জগতকে দান করবার চেষ্টা করে; কিন্তু এ সমস্তই নিগূঢ় এবং অব্যক্ত। পুরুষের প্রতিভার উপর তার নারী-প্রকৃতি স্নিগ্ধ লাবণ্য বিস্তার করে। এইখানে কিছু কহিবার আছে। সমস্ত পুরুষের সৃষ্টি-শক্তির উপরই নারী-লাবণ্য কাজ করে কি না—বিস্তর সংশয়ের কথা। এক শ্রেণীর পুরুষ আছে, যাদের মনোবৃত্তির উপর এই প্রভাব কাজ করে, সর্ব্ব স্থানে করে না। তাছাড়া, কেবলমাত্র স্ত্রীলোকের প্রেরণায় কোন-দিন কেহ বড় আর্ট সৃষ্টি করে নি। পুরুষের সৃষ্টির অদম্য আবেগ, ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করার চেষ্টা, এ জিনিষটি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিজের জোরেই সে পথ করে নিয়েচে। নারী তাকে আপনার স্নেহবর্ষণে আশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু সৃষ্টির মূলে সে নেই। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, স্থাপত্যশিল্পে যেখানেই মানুষ সত্য এবং সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করে চরিতার্থতা লাভ করেচে, সে কেবল সেই বস্তুকে আবিষ্কার করারই বিপুল আনন্দে পথবাহন করেচে। নিজের অন্তরবাসী নিভৃত সৌন্দর্য্যকে মূর্ত্তি দান করতে বসে আত্মবিস্মৃত আবেগে সে সৃষ্টি করেচে; এবং ভিতর থেকে এ অবলম্বন না খুঁজে পেলে, বাহিরের কোন নারীর প্রীতিস্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণে সে অগ্রসর হতে পারত না। জীবন-মূলে এবং সৃষ্টির মূলে নারী নেই। কেবল তার মাধুর্য্যের এবং আশ্রয়ের দিক থেকে হয় ত পুরুষ-জাতি সহায়তা আশা করেচে। কবির অন্তরে সে কবি নয়, কেবল মাত্র কবি-জীবনের একটি গভীর অনুভূতি, একটি রম্য ব্যাপ্তি। যে কোন দিক থেকে হোক, পুরুষের জীবনের উপর নারীশক্তির বিস্তার,—তার কতটুকু অংশের জন্য তার গর্ব্ব অনুভব হওয়া প্রয়োজন এবং কতটা তার পুরুষের বিমুগ্ধ হৃদয়বৃত্তির আরোপ মাত্র, সেও অতিশয় জটিল।

'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা'—মানবী যদি কোন দিন নিভৃত অবকাশে বিচার করতে বসে, তখনই বুঝতে পারবে, যে সত্যকার তার শক্তি কতটুকু এবং কতটুকু মুখর

এবং অভিভূত যৌবন কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করেচে। নারী-কিরণ-বর্ষণের উপর আমার এতটুকু অশ্রদ্ধা নেই; কিন্তু বাতায়ন-প্রান্ত থেকে যে সে কাজ সম্পন্ন হতে পারে, তাও বিশ্বাস করি নে। Sex এবং তার সমস্ত প্রকার আনুষঙ্গিক মাধুর্য্য, আকর্ষণ, অভিভূতভাব, পৃথক করে কেবল চিন্তা, জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক থেকে নারীর কিরণের কাছে পুরুষ মানুষ যখন প্রত্যাশা করে, সে বস্তুটি বিকীর্ণ হতে হলে, সমাজে নারীর অস্তিত্ব অনিবার্য্যরূপে স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত অলক্ষিত এবং সাধারণ হতে হবে, এত সাধারণ যে নারীর বিভিন্ন sex'র দরুণ যে সমস্ত মনো-বিপর্য্যয় ঘটা সম্ভব, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন সচেতনতা অবধি থাকবে না; এবং এই হলে তবে তার নারী-লাবণ্য, কেবল লাবণ্য হয়েই, পুরুষের প্রতিভাকে, উচ্চ চিন্তাকে স্নিগ্ধ করবে। গ্রীস এবং রোমে যে বাতায়ন খোলার উল্লেখ হয়েছিল তার অর্থ—সে সমাজে গুটিকতক নারী তাঁদের লাবণ্য বিস্তার করতেন এবং প্রাচীন গ্রীসের সমস্ত শ্রেষ্ঠ প্রতিভা তার দ্বারা অভিনিষিক্ত হয়েছিলেন। এ প্রথাটি ভালো। অথচ এ সম্বন্ধের ভিত্তি কেবল যে মনোব্যাপারকেই আশ্রয় করেছিল তার কোন প্রমাণ নেই।

"It is necessary to say a few words about that class of women who were called in the Greek tongue Hetaerae; and who are supposed to have represented intellectually a higher level of culture.————But we have no evidence that the relations which they formed rested as a rule on any but the simplest physical basis.

(The Greek view of women)

Sexual love বাদ দিয়ে কেবল মাত্র মনের দিক থেকে পরিচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব নারী এবং পুরুষের সম্ভব কি না, এ প্রশ্নের হয় ত উত্তর দেওয়া যায় না। এইটুকু কেবল মনে হয়, নারী-কিরণ নিয়ে স্ত্রীলোকের এতকাল কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি হয়েই এসেছে।

আজ অবধি স্ত্রীলোক দিয়ে জগতের স্থায়ী কলা-সৃষ্টি কিছুই হয়নি,—কেন হয়নি? তার সঠিক উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। নারীর ক্ষেত্রে সুযোগের অভাব, মস্তিষ্কের গঠন-পার্থক্য, মানসিক শক্তি-পরিচালনার অভাব, এ সমস্ত বাদ দিয়েও, সৃষ্টি-শক্তি তার মাঝে প্রকৃতির দেওয়া নেই, অথবা মানুষের কৃত্রিম সমাজ-গঠনের ফলে সাময়িক রূপে এই রকমে দাঁড়িয়েছে, তার মীমাংসা আজও হ'বার সময় হয় নি; এবং এখনই কোন কথা জোর করে বলা যায় না। সৃষ্টির এক স্থানে মানুষ তার ব্যক্তিগত ইতিহাসকে অচৈতন্য রেখে দেয়; যে সত্য সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বলোকের পক্ষেই সত্য, তাকে তার ব্যক্তিদিকের বিচার এবং আবেগ দিয়ে আচ্ছন্ন করে না। পুরুষের প্রতিভার চারিদিকে একটা আইডিয়ার মণ্ডল রয়েচে, নিজের সত্যকে সে উপলব্ধি করতে চায়; সুদূর ভবিষ্যৎ যার ফল সে ইহজীবনে আশা কোন দিনও করতে পারে না, তারই জন্য এ জীবনের সুখ-কামনাকে সে বিসর্জ্জন দিয়েচে। কিন্তু নারীর বর্ত্তমান ছাড়া কল্পনার প্রসারতা এতদূর নেই, যার দ্বারা সুচির-ভবিষ্যৎকে এবং সমগ্র মানব-জীবনকে সে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে। সে শুধু নিজের অস্তিত্বকে এই বিরাট স্পন্দনের একটি ধ্বনিমাত্র বলে' অনুভব করে। আমাদের দেশে অন্য ললিতকলার চেয়ে গানে অনেক স্ত্রীলোক সক্ষমতা দেখিয়েছেন। গানের মধ্যে একটা সংহত বুদ্ধির ঐক্য থাকবার প্রয়োজন করে না। সে একটি বিশেষ ভাব-মাত্রকে নিয়ে তার অন্তঃস্থল অবধি দেখাবার চেষ্টা করে। সে ভাবের কোন পৌর্ব্বাপর্য্য নেই, ক্ষণ-কালের জন্য উদ্ভাসিত ভাবের মধ্যে যত অনির্ব্বচনীয়তা রয়েচে, তারই সূক্ষ্মতম অংশগুলি সে প্রকাশ করতে বসে। বুদ্ধি-বৃত্তিতে না হোক, হৃদয়বৃত্তিতে এবং ভাবসম্পদে স্ত্রীলোকের অবধি নেই এবং যুক্তির চেয়ে impulsive বলে তার অখ্যাতি রয়েচে। গানে যুক্তির দরকার করে না, ভাষার চেয়েও সূক্ষ্ম বস্তু নিয়ে তার কারবার, এবং ভাষা যেখানে এসে থেমেচে, সঙ্গীত সেইখান থেকে আরম্ভ হয়েচে। গানে ষ্টাইলের বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন ওরিজিনাল আইডিয়ার আবশ্যক করে না, মানুষের চিরন্তন কালের ভাবরাশি নিয়েই সে নিজেকে চিরনূতন করে প্রকাশ করে। সোপেনহর গানের সংজ্ঞা সম্বন্ধে যা লিখেচেন, তা ভারী স্পর্শ করে। তিনি বলেন, গানের সহিত, যে গান করচে, সে কোন ওরিজিনাল আইডিয়া প্রকাশ করে না; কিন্তু তার চরিত্রের যে সমস্ত সূক্ষ্ম সমাবেশ বহুদিনের সংস্পর্শে, কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে লেশমাত্র ধরা যায় না, তাকেই প্রকাশ করে। "Music is not the copy

of the ideas, but the copy of the will itself।" প্রকৃতির মত তার মধ্যে যুক্তি নেই, কারণ নেই, কেবল একটি নিমেষের অনুভবকে সে প্রকাশ করতে বসেচে। স্ত্রীলোককে হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে যতপ্রকার তুলনা দেওয়া হয়েচে, তার মধ্যে সে শক্তি ও প্রকৃতি, এইটেই সব চেয়ে পরিচিত। তাই বোধ হয় অন্য ললিতকলার চেয়ে গানে সে নিজেকে ভাল করে ব্যক্ত করতে পারে। পাশ্চাত্যের গান আমাদের মত নয়। সেখানে গান গাওয়ার চেয়ে হার্ম্মনির সৃষ্টি করার শ্রেষ্ঠত্ব বেশী। তাই সেখানে যখন অনেকে আক্ষেপ করতে বসেচেন—স্ত্রীলোকে গানের technic এতদিন ধরে শেখা সত্ত্বেও সঙ্গীত-জগতে স্থায়ী কিছু দিতে পারল না, তখন সে করুণোক্তির সঙ্গে আমাদের মেলে না।

নারীর মনের উপর নারীদেহের ভারী প্রভাব রয়েচে। বড় বড় লোকের অতিশয় personality থাকে। নারীর ব্যক্তিত্ব বেশীর ভাগ তার দেহের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েচে; এবং এই দেহের উৎকর্ষতার সহিত সে সহজেই সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করতে পারে। নৃত্যকলায় এবং অভিনয়ে এই জন্য সে পারদর্শিতা দেখিয়েচে। নারীর অভিনয় সম্বন্ধে ভারী সুন্দর গুটিকয়েক কথা চোখে পড়েছিল—

A great actress is not the feminine equivalent of a great actor; being a great actress is not the same thing as acting; it is a thing peculiar to womankind. It is the sedulous development of a personality to superb proportions."

H. G. Wells.

নারীর কাজ তার গৃহকে, তার অস্তিত্বকে, স্বজন এবং প্রতিবেশীর সহিত বহুধা-বিভক্ত জটিল সম্বন্ধকে, সুন্দর, কোমল করে রাখা। এজন্য তার কত ছলনা, কত প্রিয়বাক্য, কত সাজসজ্জার প্রয়োজন। তার কাছে সত্য কেউ চায়নি, অপ্রিয় সত্যকে গোপন করতে হয়—চারিদিক থেকে সে এই শুনেচে। সত্য কোমল নয়, সব সময় প্রিয়ও নয়। তাই আজ যখন সবাই বলচে স্ত্রীলোকের নিকট ভূষণহীন নিরলঙ্কার সত্যের চেয়ে তুচ্ছ কল্পনা বড়, অকারণে সে মিথ্যা বলে, তখন নারীর কিছুই বলবার নেই। জীবন ত সর্ব্বত্র রম্য নয়,—কঠোর সত্যের উপর নারী-অস্তিত্বের মসৃণ আবরণ প্রসারিত করতে যেয়ে তাকে নিঃশব্দে অনেক মিথ্যা সঞ্চিত করতে হয়েচে; এবং আজ যদি সেটাকে ত্যাগ করবার সময় হয়ে থাকে, ভালই।

পুরুষের চোখে নিজের অস্তিত্বকে অহরহ সুমধুর ভাবে প্রতিফলিত করবার নিরবসর চেষ্টা, এরই মাঝে শতকোটি অভিনয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কোমলতার চর্চ্চা করে কেউ কোনদিন সত্যকে পায়নি; এবং সত্যের প্রতি আবেগ এবং তৃষ্ণা না থাকলে তার দ্বারা কোন সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। নারী রহস্যময়ী—আজীবন শুনে এসে এমনি ধারণা জন্মেছে, যেন নারী-প্রকৃতির রহস্যময় ভাবের জন্যই তার যা কিছু আকর্ষণ নির্ভর করে আছে। তাই রহস্যচর্চ্চা করা স্ত্রীলোকের একটা কাজ, তার মনোবেগের যেন কোন পৌর্ব্বাপর্য্য নেই। সহসা অশ্রু এবং অকারণ হাস্যের বর্ণপাতে এই নারীরহস্যকে সে আরও ছায়াঙ্কিত করে তুলেচে। রহস্য এবং কোমলতা আপাততঃ অন্তরালে থাক, আমার মনে হয়—নারীর যদি কোন পথ খোলা থাকে, সে কেবল আপনার সত্যকে উপলব্ধি করা। পুরুষের উপর সে কতটা শক্তি-বিস্তার করেচে, এ কথা এখন না ভাবলেও চলে; নিজের মনের উপর তার কতটা অধিকার রয়েচে এইটিই সর্ব্বপ্রথম কথা হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে শিক্ষার বহুপ্রসার হলেও, নারী সৃষ্টি করতে পারবে কি না, সংশয়ের কথা। যে শিল্পী তার দৃষ্টি বহুদূরবদ্ধ, নির্ম্মুক্ত,—বর্ত্তমানের সহিত একান্তভাবে সে সংযুক্ত হয়ে নেই। স্ত্রীলোকের জীবন গৃহ, সংসার, সমাজ, লোক-নিন্দা-খ্যাতি প্রভৃতি অনেক বস্তুর সহিত এত সূক্ষ্ম এবং সহস্র সূত্রে আবদ্ধ হয়ে রয়েচে, যে জীবনকে সর্ব্বপ্রকার দেশকালের অতীত করে ক্ষণকালের জন্যও অনুভব করার আকাঙ্ক্ষা দুরাশা; অথচ এ ছাড়া পথও নেই। কেবল স্ত্রী-শিক্ষা আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা এবং ভগিনী সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু কোন বড় সৃষ্টি-শক্তি সে এনে দিতে পারবে না।

স্ত্রীলোকের মনে ভালবাসা পাবার, ভালবাসবার এবং মা হবার আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে প্রবল—এ কথার পুনরুক্তি করা বাহুল্য। কেবল স্ত্রীলোক নয়, সর্ব্ব মানবের ক্ষেত্রেই ভালবাসার একটা প্রধান স্থান রয়েচে। জীবনকে জীবন যাপনের জন্যই আমরা বড় স্থান দিই নে, আর্ট, চিন্তা, প্রেম—এদের জন্যই জীবনগৌরবে মানুষ আনন্দ পায়। একটা জিনিস ভাল, কিন্তু তারও সীমা রয়েচে, আরো বাড়ালে আরো তা

হয় না। স্ত্রীলোকেরও একটা সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ব রয়েচে, একটি বিশেষ দিকের উপর ঝোঁক দিতে বসলে সামঞ্জস্য ঠিক থাকে না। ভালবাসাকে স্বীকার করে নিয়েও পৃথিবী শেষ হয়ে যায় না এবং জগতের স্পন্দমান বিশাল মানব-জীবনের মাঝে প্রেমকে তার ঠিক স্থানটী দিতে হলে কেবল তাকে আশ্রয় করে থাকলেই চলে না। তাই আজ যদি স্ত্রীলোকেরা বলেন, প্রেমকে আমরা অস্বীকার করবার বিন্দুমাত্র স্পর্দ্ধা করি নে, কিন্তু পৃথিবীর বহুধা এবং জটিল সম্বন্ধের মাঝে এর প্রকৃত স্থান কোথায় সে বিষয়েও অন্ধ থাকতে চাই নে, তাহলে ভুল বলা হয় না; এমন কি ভালবাসাকে খাট অবধি করা হয় না। বিদেশের সাহিত্য পড়ে দেশের সাহিত্যকে আমরা তাচ্ছিল্য করি নে। অন্য দেশের আলো যখন তার উপর এসে পড়ে, তখন বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে তার স্থান কোথায়, সেই উপলব্ধির সঙ্গে তাকে আরও ভাল করে অনুভব করতে পারি।

Sex'এর প্রভাব নারী এবং পুরুষের উপর বিভিন্ন প্রকার। পূর্ব্বকালে এবং এখনও নারী পুরুষের অধীনতা স্বীকার করেচে। তার আর যত কারণই থাক, বায়লজীর দিক থেকে প্রথম কারণ স্ত্রীলোকে sex'এর প্রাবল্য বেশী অনুভব করে। Sex সংক্রান্ত স্বাধীনতা পুরুষজাতি যতটা পায়, ঠিক তাই নারী কোন দিন দাবী করতে পারে না এবং সে স্বাভাবিকও নয়। Sexual life স্ত্রীলোকের সহিত আরও অবিচ্ছেদ্য ভাবে ভাবিত। পুরুষের পৃথিবীতে আরও অনেক জিনিষ রয়েচে, সে তার সৃষ্টি করবার প্রবৃত্তি অন্য পথেও পরিতৃপ্ত করতে পারে। মানব-জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র সে যত স্পষ্ট করে অনুভব করে স্ত্রীলোক তা পারে না। ইংরিজীতে যাকে ego বলা হয়, সে জিনিষটা যত মন্দ ভাবা হয় তা নয়। এমন কি, এ জিনিষটার যতক্ষণ না উপলব্ধি হয়, মানুষ কোন সৃষ্টিই করতে পারে না। স্ত্রীলোকের এই বস্তুটি রয়েচে; কিন্তু তার প্রকৃতি অন্য রকম। চিন্তায়, বুদ্ধিতে কোথাও স্ত্রীলোক তার বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করবার সুযোগ পায় না, যত বেশী প্রেমের মধ্য দিয়ে নিজেকে সার্থক করবার প্রবৃত্তির মাঝে পায়। তাই প্রেমের দিকটা যে স্ত্রীলোকের জীবনে শূন্য, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভব ঘটেনি, এবং নারীর নিভৃত সত্যের উপলব্ধি হয়নি।

"A woman's essential ego must be brought out by love before she can do anything great for others or for herself."—Ellen Key.

নারীর কাছে প্রেম অত্যন্ত সত্য; কিন্তু সে তার নিজেরই পূর্ণতার জন্য আবশ্যক,—পুরুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করা তার অর্থ নয়। পুরুষ চিত্তের উপর স্ত্রীলোক কতটা অধিকার বিস্তার করেচে এবং সেই শক্তির মানদণ্ড কোথায় বাড়ছে, কোথায় কমছে, প্রতিদিনের সহস্র ছলনায়, হাস্যে ও কটাক্ষে তার ভারকেন্দ্র সমান করবার সমাপ্তিহীন চেষ্টা, এই স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ব নয়। স্ত্রীলোক ত্যাগ করে' সৃষ্টির আনন্দ পেতে চায়, নিঃশব্দ সমর্পণের মাঝে সে তার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা আকাঙ্ক্ষা করে। আমাদের শাস্ত্রে বলে 'আত্মানং বিদ্ধি'—সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে জান, নিজেকে জানার দ্বারাই মানুষ তার বিশেষ দান জগতে রেখে যেতে পারে। সমস্ত প্রতিভার মূল self-realisation—নিজের বিশেষ ক্ষমতার উপলব্ধি এবং তাকেই উন্নত করবার চেষ্টা। স্ত্রীলোক self-assert করে কোন দিন নিবিড় তৃপ্তি পায়নি। তার যা কিছু দেবার সে কেবল নিজেকে নিঃশেষে দান করে তবেই সে দিতে পারে। এইজন্য ভালবাসা স্ত্রীলোক চায়, এই তার চরিতার্থতার পথ।

প্রেমের মধ্য দিয়ে নারী যখন সন্তানকে জন্ম দেয়, বিশ্ব-জগতে সেই তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। পুরুষের চেয়ে নারীর জীবনে প্রেম প্রবল, অত্যাবশ্যক; এবং ঠিক এই কারণেই বিবাহিত জীবনে প্রেমের দিকে সে যখন অসুখী হয়, নারীর হৃদয়বৃত্তি তার দ্বারা অধিকতর বিবর্ণ হয়। অত্যন্ত বিশাল মানব-জীবনের তুলনায় ব্যক্তি তার তুচ্ছতা অনুভব করে; কিন্তু মানুষের মনে চিরকালের জন্য যে ব্যক্তিত্বের আকাঙ্ক্ষা রয়েচে, অন্ততঃ কোন এক স্থানে সে অকিঞ্চিৎকর নয়। গৃহের মাঝে সে এই পরিতৃপ্তির পথ খুঁজে পায়, কিন্তু নারীর পক্ষে এই গৃহের আরও বেশী আবশ্যক রয়েচে। সে সহজেই বুঝতে পারে তার ভিতর একটি স্বাভাবিক শক্তি রয়েচে, যার দ্বারা সে নিজের চারিদিকে সৌন্দর্য্য এবং শান্তি সৃজন করতে পারে, গৃহপ্রতিষ্ঠায় তার ব্যক্তিত্ব, নিজের বিশেষ ক্ষমতা পরিচালনে সুযোগ পেয়ে আনন্দ লাভ করে।

অনেকে বলেন স্ত্রীলোকের organize করবার ক্ষমতা নেই। যুক্তিশীল হয়ে একটা জিনিষকে বুঝবার মত ধৈর্য্য নেই। সে সব কথা হয় ত এখন সত্য; কিন্তু চিরকালের জন্য সত্য নয়। স্ত্রীলোকের যদি বিশুদ্ধগণিতের প্রতি অনুরাগ

জন্মায়, এমন কি যদি তারা পোলিটিকাল ইকনমি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করে, তবু গৃহের মাঝে আপনার প্রশান্ত স্নিগ্ধ স্থানটীর সম্বন্ধে কোন দিনই তাদের ভুল হবে না। অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকের একটা স্থির আইডিয়া কখনই নেই, কেবল impulse ; কিন্তু এগুলি দৃঢ়বদ্ধ সত্য নয়। পূর্ব্বকালের অসভ্য মানুষের আইডিয়া অথবা আইডিয়াল কোন জিনিষেরই বাহুল্য ছিল না। আজকাল স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা কালচার প্রভৃতির দ্বারা অনেকটা পুরুষের মতই যুক্তিসহ, বিচারশীল এবং বিশ্লেষণপূর্ণ হয়ে আসচেন ; এবং কেবল আবেগের বসে প্রেমে পড়া প্রভৃতি ক্রমশঃ উঠে যাচ্ছে বলে মনে হয়। স্ত্রীলোকের একটা বিশেষ দিক, যেমন প্রেম, মাতৃত্ব এবং গৃহের প্রতি কামনা, sex প্রভৃতি স্বীকার করে নিয়ে, এইবার তাকে বাদ দিলে, এখন তার আর একটা দিক বাকী থাকে, যেখানে সে শুধু নারী নয়, সমস্ত মানবের আদর্শ, আবেগ সমানভাবে তার মাঝে স্থান পেয়েচে। অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট জিনিষের প্রতি তার বিতৃষ্ণা, এ কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করতে পারিনে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন কি তার নেই? প্রতিদিনের ব্যবহার ছাড়া বিশুদ্ধ জ্ঞানে সে কি আনন্দ পায় না? এ যদি স্বীকার করতে হয় তা হলে বিজ্ঞান, দর্শন, গণিতে কোন কিছুতেই সে নিবিড় আনন্দ পাবে না। বহু দূরস্থ নক্ষত্রের অপরিসীম রহস্যের সমাচার জেনে তার লাভই বা কি, সে ত অতিশয় অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট জিনিষ। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব কেবল নারীতেই পর্য্যবসিত নয়, এক স্থানে তার চির অপূর্ণ, তৃষাতুর, অনন্ত বৈচিত্র্যশীল মানুষেরই মন রয়েচে। এই মনের অপরিমেয় দাবী কি করে পূর্ণ করা যায়? স্ত্রীলোক এবং পুরুষকে আর একটা দিক থেকে দেখা যায়, যেখানে তারা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ,—প্রেম, সাহচর্য্য কোন কিছুই সেখানে সঙ্গ দিতে পারে না। সেখানে সে মানবাত্মার সঙ্গে মুখোমুখী করে দাঁড়িয়েচে এবং মানুষের সর্ব্বোচ্চ শ্রেষ্ঠতা শুধু তারই মাঝে নিহিত রয়েচে। কোন প্রেমই কোন দিন জীবনের সমস্ত আশ্রয় হতে পারে না ; জীবন তার পরিপূর্ণতার পথে প্রেমকেও এক জায়গায় অতিক্রম করে গেছে। এ সমস্ত দিকে নারীকে কেবল নারী এই সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করতে বসলে ভুলই করা হবে। মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল হতে পারে, তবু এরই সহিত সে শেষ সার্থকতা লাভ করেনি—মাতৃত্ব ছাড়া আরও সে কামনা করে।

"——and children are not enough to hold her for ever ; for when she is really a woman and not merely a female, when she has a rich soul and abounding vitality she is made for so many things."—John Christopher.

নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধেও আমার বিস্তর সংশয় রয়েচে। দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা অহঙ্কার—এ সমস্তই তার মাধুর্য্য বাড়ায় ; যদি নৈতিক দিকে তার আচরণ পরিশুদ্ধ থাকে, তা হলে আর কিছুই তার দরকার হয় না। নৈতিক জীবনে শুদ্ধ থাকার প্রয়োজন স্ত্রীলোকের পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড় এ কথাও কাহারও কাহারও মনে উঠেছে। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সহিত সতীত্বের কোন বিরোধ নেই ; এবং এটাও মিথ্যা নয় যে কেবল সতীত্ব লাভ করেও অনেক স্ত্রীলোক অসংযমী, মিথ্যাচারী থাকতে পারেন। নারীর এই দিকটার উপর কেবলই জোর দিয়ে তার চরিত্র স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠবার সুযোগ পায়নি, এক দিকটা স্ফীত হয়ে উঠেচে এবং অন্য উচ্চ মনোবৃত্তি অবহেলা পেয়ে এসেচে। স্ত্রীলোকের morality তার sexual moralityর সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে রয়েচে। এটা মানুষের তৈরি সমাজের বিধান নয়। প্রকৃতি এই নিয়মই করেচেন যখন ভালবাসা এবং সন্তানকে পুরুষের চেয়ে নারীর সহিতই অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করেচেন। তত্রাচ নারীর আদর্শের মাঝে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করার আকাঙ্ক্ষা স্থান পায়।

"As far as woman is concerned, all morality has become synonymous with the absence of sensuality and the existence of a marriage certificate."—Ellen Key. এখানেও সেই একই কথা পুনশ্চ বলা যেতে পারে—নৈতিক জীবনের এই দিকটায় শুদ্ধ থাকবার নারীর বিশেষ প্রয়োজন রয়েচে ; এবং এই বিশেষ প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়েও, তার আর একটা দিক আছে, যেখানে সমস্ত মানুষের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের আদর্শ তারও আদর্শ।

নারীর আদর্শ কামনা সমস্ত বিষয়েই পুরুষের সহিত একটা পার্থক্যের প্রাচীর গড়ে উঠেচে। আজকাল প্রায়

সকলেই স্বীকার করেন—স্ত্রী-শিক্ষা আবশ্যক ; কিন্তু সেই শিক্ষাটা কেমন করে দেওয়া হবে, সেই নিয়ে নানা প্রকার মতভেদ ঘটেচে। অনেকের মতে স্ত্রীলোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ অন্য রকম হওয়ার প্রয়োজন। অথচ এইটে বুঝতে পারিনে, স্ত্রীলোককে যখন পুরুষকে ভালবাসতে হবে, এবং সেই ভালবাসা নিয়ে সুখী হতে হবে, তখন পরস্পরের শিক্ষার মাঝে এত ব্যবধান থাকলে চলবে কি করে? অধিকাংশ স্ত্রীলোককে যে রকম করে জীবন কাটাতে হবে, তাদের শিক্ষার সহিত পরবর্ত্তী জীবনের যেন বিরোধ না ঘটে। বেশ ত, নাই ঘটল ; কিন্তু প্রতি দিনের ব্যবহার, সুবিধা এবং উপযোগিতার বিচার ছাড়াও শিক্ষার একটা অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট দিক রয়েচে। শিক্ষার যে অংশটা সাধারণ ভাবে মানব-চিত্তের উপর কাজ করে, সেখানে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মাঝে কোন্ খানে যে বিভিন্নতা আসে, বলা কঠিন। মনের প্রসারতা, সৌন্দর্য্য-গ্রহণের ক্ষমতা, প্রতি দিনের তুচ্ছ এবং সাধারণ জীবন-যাপনের মাঝেও মাধুর্য্যের সঞ্চার করা, এ সব স্থানে নারীর শিক্ষা অন্য প্রকার হবার আবশ্যক করে না। এমন কি, যদি কেহ বলেন, স্ত্রীলোককে সন্তান পালন করতে হয়, এজন্য দর্শন শেখার চেয়ে তার স্বাস্থ্য-তত্ত্ব শেখাই সমীচীন, এরূপ বলায় স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও ভারী ভুল হবে। কেবল প্রয়োগ এবং ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগার মাঝেই শিক্ষার সার্থকতা নেই। সে যদি তার অনেকটা অংশ প্রতি দিনের ব্যবহারের অতীত বস্তু নিয়েই কারবার করে, তার মাঝে দোষের কিছুই নেই। স্ত্রীলোকের বিচার-ক্ষমতা এবং বিশেষ করে যুক্তির শক্তি পুরুষের সমকক্ষ নয় ; এইজন্য তাঁদের উচ্চ গণিত শেখা উচিত। উচ্চ গণিতের জ্ঞান প্রত্যক্ষ ভাবে হয় ত তাঁদের পরবর্ত্তী জীবনে কোন কাজেই না আসতে পারে ; কিন্তু মনের সুসংহত পরিণতি এবং সুশৃঙ্খলিত যুক্তির ক্ষমতা সঞ্চার সে অপরিদৃশ্য ভাবে করবে। বিজ্ঞান, দর্শন, আর্ট প্রভৃতি শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি তাঁরা পুরুষ জাতির আইডিয়া অনুভব করতে না পারেন, তা'হলে মনোজগতে দুজনের মিলবে কি করে? আমার মনে হয়, ড্রয়িংরুমের গান করা, পশম বোনা, কলের সেলাই শেখা, জেলি করতে জানা, কিম্বা শেলি বাইরনের গুটিকতক কবিতা পড়তে শেখার সঙ্গে স্ত্রীলোকের উচ্চ গণিত, বিজ্ঞান, শরীরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, দর্শন শেখা ভাল। হয় ত বিষয়গুলি জটিল এবং সময়-সাপেক্ষ হতে পারে ; কিন্তু এতে তাঁদের অতি সুকোমল, ত্রস্তভাব এবং impulsive চরিত্রের অনেকটা নিরসন হতে পারে। এখন কোমল হৃদয়-রাশি হয়ে থাকবার সময় নেই। কোন কাজই স্ত্রীলোকেরা impulse বাদ দিয়ে বেশ গুরুতর ভাবে নিতে পারেন না। লেখাপড়া জিনিষটাও ফ্যাসনের খাতিয়ে না নিয়ে, পুরুষরা যেমন করে জীবনের একটা দিক বলে নেয়, তেমনি করে আমাদের গ্রহণ করার প্রয়োজন। এ সব বিষয়ের সহিত গৃহ-কাজের অথবা সন্তান-পালনের অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে হয় ত কোন সংযোগ নেই ; কিন্তু কোন শিক্ষার অর্থ ই কোন দিন জীবনের বাস্তব সুবিধা এনে দেওয়া হতে পারে না ;—তার কাজ মনকে উদার, উন্মুক্ত, সৌন্দর্য্যোন্মুখ করা, বিশ্লেষণ এবং বিচার-শক্তিকে উৎকর্ষতা দেওয়া এবং সর্ব্বোপরি জীবন সম্বন্ধে একটা সত্যান্বেষী এবং গভীর outlook এনে দেওয়া। তাছাড়া, স্ত্রীলোকের outlook যদি হাস্য-কটাক্ষ-বহুল না হয়ে গভীর হয়, তাঁরা তাঁদের জীবন, ভালবাসা, sexual relation, সন্তানের জন্ম, শিশুর অপরিস্ফুট মনের প্রথম বিকাশ, সমস্ত জিনিষকে গভীর ভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন ; এবং মনের উপর শিক্ষার প্রভাবে যদি তাঁদের চরিত্রের superficiality কমে, তাহলে তাঁদের গৃহ আরও অধিক রম্য ও মধুর হবে। মানুষ যেমন এক দিকে বাস্তবকে চায়, বাস্তবের মাঝে আপনাকে কার্য্যক্ষম বলে অনুভব করতে আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি আর এক দিকে সে অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট চায়, যেখানে তার স্বপ্নময় দৃষ্টির কাছে বিশ্বের দিকপ্রান্ত প্রসারিত হয়ে যায়। অ্যাবষ্ট্র্যাক্টের প্রতি এবং বহুদূর ভবিষ্যতের প্রতি এই আকর্ষণ না থাকলে কোন সত্যই আবিষ্কার হোত না। স্ত্রীলোকের শিক্ষাতে সর্ব্বপ্রযত্নে অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট অংশটা বাদ দিলে সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। শিক্ষার যে দিকটা মানুষের মনে অনির্ব্বচনীয়তার সৃষ্টি করে, যেখানে তার সৌন্দর্য্যের সপ্তলোক, তার বেশীর ভাগই অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট। তার পর আজকাল সর্ব্ব স্থানে, এমন কি, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও, এক একটা বিশেষ দিক নিয়ে এক একজন বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হচ্ছে। তার দ্বারা জ্ঞানরাজ্য অত্যন্ত বিভক্ত হয়ে অত্যন্ত প্রাচীর-সমাকুল হয়ে পড়ছে ; একজনের অধিকার-সীমার বাইরে তার পা দেবার যো নেই। এর দ্বারা এক বিষয়ের শেষ তল অবধি বুঝবার যথেষ্ট সুযোগ হলেও, সাধারণ ভাবে সুসম্পূর্ণ মনের পরিণতির পথে বাধা হয়েচে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য

বিষয়কে শুধু চরম সীমা অবধি জানা নয়, মনের ব্যাপ্তি এবং সামঞ্জস্য। স্ত্রীলোকের গুটিকতক বিশেষ বিষয়ে প্রবণতা রয়েচে বলে' যে জীবনকে তার বহুদিক থেকে গ্রহণ করা অনুচিত, কিম্বা মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রসারতার পথে বাধা দেয়, এ বলেও আমার মনে হয় না; এবং নারীর নারীত্বকে স্বীকার করে নিয়েও সে এদিকে যেতে পারে।

স্ত্রীলোককে সামাজিক আর্থিক সব দিক দিয়ে বাদ দিয়ে ধরলেও sexর দিক থেকে চিরদিনই পুরুষের অধীনতা স্বীকার করতে হবে, কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতি দিয়েচেন, মানুষে নয়। এবং অধীনতার গ্লানি যে জিনিষটি নিঃশেষে নির্ম্মল করে দিতে পারে, সে ভালবাসা। কিন্তু ভালবাসা বস্তুটি নিরতিশয় জটিল। নিজের বিচার-বুদ্ধি এবং সুবিধা-অসুবিধা বোধের উপর ভালবাসা নির্ণয়ের ভার দিলেও যে অনেক সময় ঠকতে হয়, তার সাক্ষ্য রয়েচে। অনেকে এক নিঃশ্বাসে বলবেন, এর সাক্ষ্য হাতের কাছেই রয়েচে, য়ুরোপ এবং সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা—কিন্তু সে থাক। আর্থিক দিক থেকে তত নয়, দেহের দুর্ব্বলতাও নয়; কিন্তু প্রেমহীন দেহের অধীনতা সব চেয়ে অসহ্য। আর্থিক স্বাধীনতা স্ত্রীলোকে চান; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের দাবীটা পুরুষের মত সর্ব্বব্যাপী এবং পুরুষের সমকক্ষও নয়। যেখানে স্ত্রীলোক এবং পুরুষের মধ্যে প্রেম রয়েচে, সেখানে আর্থিক ভাবে যদি নারী অধীন হয়ে থাকে, সেটা মন্দ নয়। কারণ নারীর যে সর্ব্বপ্রধান শক্তি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য সেটা তার চারিদিকে একান্ত সহজ ভাবে সৌন্দর্য্য এবং প্রশান্তি সৃষ্টি করা। প্রকৃতির একটি দৃশ্যের মত সে ছায়াচ্ছন্ন, নির্ব্বাক, কুণ্ঠিত—এই রকম প্রবৃত্তি স্ত্রীলোকের মধ্যে রয়েচে বলে, তার অনুভব করা উচিত নয়; গৃহের মাঝে সে নিজের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে উপযোগী স্থান পায়। গৃহ-রচনার মধ্য দিয়ে সে পৃথিবীকে যত সৌন্দর্য্য, সুখ, স্নিগ্ধতা এবং শান্তি দিতে পারে, স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জনের দ্বারা তত নয়।

"—there are other suppressed forces in a woman's being besides only the desire of knowledge and the thirst for activity, and that neither the right to work nor that of citizenship can compensate for trampled possibilities of happiness." Ellen Key.

প্রেমকে যদি বন্ধনের একমাত্র গ্রন্থি বলে ধরা হয়, তবে এই হিসেবে স্ত্রীলোকের আর্থিক স্বাধীনতা থাকা দরকার। কেবল অর্থের জন্যই যে অধীনতা স্বীকার নয়—এইটে জানিয়ে রাখা; অথচ এটা কোন দিন সম্ভব কি না জানি নে। ভালবাসা ঠিক যুক্তির পথে চলে না। পুরুষজাতি চায়, সে যাকে ভালবাসে, তাকে সমস্ত বাধা থেকে আশ্রয় দেয়; এবং তার দুর্ব্বল অসহায়তাকে একান্ত স্নেহের সহিত রক্ষা করে। স্ত্রীলোকের যদি পুরুষেরই মত একটা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়ে থাকে এবং সেও বাহিরের কাজে যোগ দেয়, তার আশা, নিরাশা, বিফলতার সংঘর্ষে নারীর মনের অনেকখানি অংশ পূর্ণ হয়ে থাকে। তার পরও হয় ত তার স্নেহশীল স্বভাব অব্যাহত থাকবে; কিন্তু প্রেম এমন করে বাস করতে পারে না। আমাদের ব্যক্তিত্বের অবশেষ অংশটুকু এবং উদ্বৃত্ত সময় নিয়ে সে নিজেকে পরিপোষণ করতে পারে না। প্রেম অবসর চায়, অগাধ ভাবে সমস্তই পেতে চায় এবং স্বপ্ন চায়। এ দাবী কর্ম্মব্যস্ততার খাতিরে নারী যদি অগ্রাহ্যও করে, ভালবাসা জটিল ব্যাপারে স্থান পাবে না। যদিচ নারীর প্রত্যক্ষ ভাবে অর্থোপার্জ্জন না করলেও চলে; কিন্তু অর্থোপার্জ্জন করার মত শিক্ষা থাকা তার অত্যন্ত আবশ্যক। এ ক্ষমতা থাকার পরও সে আপনার ইচ্ছায় প্রেমাধীন হয়ে তার গৃহদীপটি যখন জালায়, তখনই তার মাঝে নারীর সৌকুমার্য্য স্থান লাভ করে। বাইরের দিকে সর্ব্বদিক থেকে যখন দাবী পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে হৃদয়ক্ষেত্রে পাবার উপায় দুরূহ হয়ে আসে। বাইরের দিকে আশ্রয় দিয়ে এই যে একটা প্রভুত্বের দাবী জন্মায়, সে কেবল পরস্পরের মনোমিলনের ক্ষেত্রে নারীকে বাধা দেয়নি, পুরুষের প্রাপ্তির পথেও ব্যবধান সৃষ্টি করেচে। অর্থ বস্তুটাকে কাজ করে হোক বা বড় বড় কথা দিয়ে হোক, যেমন করেই চাপা দেবার চেষ্টা করা যাক, তার মধ্যে যে দোষ তার ফল পরিস্ফুট হয়ে উঠবেই। কল্যাণের এবং স্নেহের সম্বন্ধের মাঝে এই অধিকারের দাবী অনেক মাধুর্য্য আচ্ছন্ন করেচে। নারী যদি এ বিষয়ে সক্ষম হন এবং তার পরেও তাঁর ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য, গৃহ-রচনার জন্য, এবং ভালবাসার জন্য বিনম্র হাস্যে অধীনতা স্বীকার করেন, তবে মনের দিক থেকে পরস্পরের সম্বন্ধ গ্লানিহীন প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে। Sexual love এবং মনের দিক থেকে বন্ধুত্ব, এ দুটো জিনিষ; একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা নারী এবং

পুরুষের মাঝে সম্ভব কি না, তার উত্তর জানি নে পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু স্নেহাস্পদের মাঝে যদি উভয়ের বিমিশ্রণ হয়, তার চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি মনোভাব এই হওয়া আবশ্যক, যেন তাঁরা তাঁদের সমস্ত বিশেষত্ব এবং বিশিষ্ট ক্ষমতা নিয়ে একজন অপরকে সাহায্য করেন। আইডিয়া এক না হলেও ভালবাসা জন্মায় এবং সর্ব্বত্র আইডিয়া একও হয় না; কিন্তু দেহ ছাড়া মনের দিক থেকে সঙ্গ পাবার মানুষের মনে একটি তৃষ্ণা রয়েচে। স্ত্রীলোকের শিক্ষা, স্ত্রীলোকের outlook যদি শিশুকাল থেকে বিভিন্ন ভাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা হয়, তবে মনের এ তৃষ্ণা নির্ব্বাণ হবে কি করে? Sex ছাড়া পরিচ্ছিন্ন বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে হলে, নারীর নারীত্ব ছাড়া বিশ্বমানবের আদর্শের সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে।

কালবোশেখীর ঝড়

শ্রীহরিধন মিত্র

আমি কালবোশেখীর ঝড়
ভীম প্রলয়ঙ্কর।
আমি, ব্যোমপথব্যাপী ধরণীরে ছাপি সন্ সন্ সন্ করিয়া,
চলেছি বহিয়া অনল লইয়া করাল মূরতি ধরিয়া;
পাখার ঝাপটে সাপটে দাপটে আলোকে দিয়াছি নিবায়ে,
করি মড় মড় অটবীর ধড় ফেলেছি থাইয়া চিবায়ে;
কুটীর প্রাসাদ করে ভূমিসাৎ দিয়াছি কোথায় উড়ায়ে,
গরবেতে ভরা শির উঁচু করা গিরিরে ফেলেছি গুঁড়ায়ে;
আমি, তুরগতূর্য্য সমরধূর্য্য আমি বীর মেঘনাদ,
হীনসম বোধে কে আমায় রোধে আমার কে সাধে বাদ?
আমি কালবোশেখীর ঝড়
ভীম প্রলয়ঙ্কর।

ওগো, আমি একা আসি নাই:
তিমির জলদ করকা বরষা মোর সেনা, মোর ভাই।
আমি অখিল ধরায় দিয়াছি ছড়ায় আনিয়া তিমির রাশ,
ভয়াল মূর্ত্তি পেয়েছে স্ফূর্ত্তি জগতের চারিপাশ;
আমি গুড় গুড় গুড় হুড় হুড় হুড় এনেছি মেঘের ডাক,
শ্রবণে করিতে বধির ত্বরিতে ঘটাতে দুর্ব্বিপাক;
আমি চট্ চটা পড় করকায় ঝড় এনেছি উগ্র টানে,
রুদ্র মাদল এনেছি বাদল ভাসাতে বরষা বানে;
আজ আকাশ চিরিয়া জগৎ ঘিরিয়া করিব সুখের নৃত্য,
কি ক্ষুধা রে আজ হৃদয়ের মাঝ, কি পুলক-ভরা চিত্ত।
আমি একা আসি নাই
তিমির জলদ করকা বরষা মোর সেনা, মোর ভাই।

আমি মিলনের প্রভু
ছোট বড় নীচ জাতি ভেদাভেদ দেখিতে পারি না কভু।
ঝরা ফুলপানে টিট্‌কারী দানে হয়েছে যে ফুল ফুল্ল,
তাহারে টানিয়া ছিঁড়িয়া আনিয়া করি গো তাহারি তুল্য।
হেরে ঝরাপাতা যে পাতারা কথা ক'য়েছিল কুতূহলে,
গাছ হ'তে নিয়ে সব উড়াইয়ে ডুবাই সিন্ধুজলে;
কোথায় ধর্ম্ম? কোথায় কর্ম্ম? মোর চোখে দেওয়া ধূলি?
যত ভণ্ডের সাধুষণ্ডের উড়াইয়া দিই খুলি!
মিছা ভেদাভেদ কোরাণ ও বেদ মিছা রে জাতির পাঁতি,
সব ধ'রে ধ'রে দেই ধূলো ক'রে, ক'রে দিই সম সাথী।
আমি মিলনের প্রভু
ছোট বড় নীচ জাতি ভেদাভেদ দেখিতে পারি না কভু।

আমি সুন্দর, আমি সুন্দর
আমি কালবোশেখীর ঝড়।
আমি, ভুলাইয়া জ্বালা নদীবীচিমালা ফেলি গো সাগর-বুকে,
ঝরা ফুল নিয়ে যাই গো রাখিয়ে মন্দির-দ্বার-মুখে;
বিশ্বের আলো যে বেসেছে ভালো যে কাঁদে গৃহের মাঝ,
ভেঙে তার ঘর পথের উপর নামাইয়া দিনু আজ;
মাতায়ে লোভায়ে দিলাম ডোবায়ে ভাবুকের খালি প্রাণ,
প্রেমিকের বুকে গ'ড়ে দিনু সুখে ভালোবাসিবার স্থান;
বিশাল জগতে কিছু পারে র'তে যাহা মোর তুলনার?
প্রণয়িনী কোলে তবু এতো গোলে দোল দিনু ঝুলনার!
আমি সুন্দর, চির সুন্দর;
আমি ভীম প্রলয়ঙ্কর!

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

৫

"থরনৃভিলা" নাম দেওয়া হইলেও, সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ছবিটীর মতন বাড়ীখানিতে কাঁটার মধ্যে শুধু দুএকটা গোলাপ গাছেই যা সঙ্গত মতন কাঁটা ছিল, তার চেয়ে বেশি কোথাও না। যেমন এ দেশের প্রায় সব বাড়ীই হয়,—পিছনে পাহাড়ের উঁচু দেওয়াল, সাম্‌নের দিকে 'খডে'র পরিখা। তার মধ্যে দিয়া কতকগুলা উচ্চশীর্ষ বার্চ্চ ও চিড় গাছ খাড়া হইয়া যেন পাহারাওয়ালার মতন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। খানিকটা দূরে একটা খুব ঝাঁপ্‌ড়া-ঝোপড়া বরাশ গাছ তার বাসী স্থলপদ্মর মতন ঘন গোলাপী রংয়ের রাশি রাশি ফুলের বাহার খুলিয়া দিয়া খোস-মেজাজে খুসী মনে বাতাসে নড়াচড়া করিতেছে। সেই একটা গাছের ফুলেই যেন ফাল্গুনের ফাগের উৎসব সমাধা হইয়া গিয়াছে। এম্‌নি তার অগুন্তি অসংখ্য ফলন! বাগানের বেড়ার গায়ে একটী সাদা গোলাপের লতা এই সবেমাত্র একটুখানি লতাইয়া উঠিয়াছে; গোটাকয়েকমাত্র কুঁড়ি তাহাতে ধরিয়াছে, ফুল এখনও একটাও ফোটে নাই।

অতুলেশ্বর বাবু সলিলের বাসায় গিয়া তাগাদা করিয়া তাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া এই বাড়ীখানাই তাহাকে পছন্দ করিতে বলিলেন।

বাড়ীখানা অ-পছন্দ করিবার মত কোন সঙ্গত কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও সলিল একটুখানি ইতস্ততঃ করিল। বাড়ীটার এদিক ওদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানিয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বলিল, "একটু ছোট হবে না?"

অতুল বাবু শুনিয়া যেন অবাক হইলেন, এমনই ভাবেই কহিলেন, "ছোট হবে! বলেন কি? ছোট কেমন করে হবে? ছোট তো হ'তেই পারে না! এতগুলো ঘর রয়েচে, এতেও আপনার ছোট হবে মনে হচ্চে কেমন করে বলুন তো?"

সলিল একটু কুণ্ঠিত ভাবে কাসিল। তার পর গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া বলিল,—"আমার একলার পক্ষে নিশ্চয়ই ছোট হবে না; বরং বড় হবে, বল্লেও বলা যেতে পারতো। তবে যদি মা কিম্বা দিদি এঁরা কেউ, অথবা দুজনেই আসেন, সেই জন্যেই একটু ভাবচি।"

এতক্ষণে এই ছোট হওয়া কথাটার অর্থবোধ করিতে পারিয়া অতুল বাবু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, সে আগে তাঁরা আসুনই তো,—তখন তার জন্যেও সুব্যবস্থা হয়ে যেতে আটকাবে না। আপাততঃ ওই ল্যাণ্ডোর-বাজারের ঘিঞ্জি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তো এখানের এই সুন্দর সানন্দ খোলা জায়গাটীতে এসে আত্মরক্ষা করে নিন। শাস্ত্রেই বলে রেখেছে যে,—'আত্মানাং সততং রক্ষেৎ!' আমি শাস্ত্রবাক্যের আর যত যা' মানি বা না মানি, এইটুকুকে হাড়েহাড়েই মেনে চলি। 'আত্মানাং সততং রক্ষেৎ'—এটা কিন্তু বড্ডই দরকারী কথা! আত্মরক্ষা না করলে, জগতে আর করতে পারবার রইলো কি? নিজে বজায় থাকলে তবেই না আমার পুত্র, দারা, ধন সব রইলো! নৈলে কে' কার বলুন তো?"

সলিল হঠাৎ এই দার্শনিক তত্ত্বের জন্য তেমন প্রস্তুত ছিল না; সে তখন উত্তরের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া মুগ্ধচিত্তে সেই অনন্ত তরঙ্গায়িত মেঘপুঞ্জ সদৃশ ঘনায়মান পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতেছিল। দূরে—দূরে—বহুদূরে উহাদেরই সবচেয়ে শেষ-স্তরে অস্তসূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণে সোনারূপার তারে বোনা শাড়ীর মত দূর-প্রসারিত দৃষ্টির তলায় ক্ষণে ক্ষণে এক অপরূপ দৃশ্য উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন শত শত সুরকন্যা ঐ দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-সমাবাসিত দেবতাত্মা হিমাচলের ঐ সুদূর প্রান্তে তাঁদের সান্ধ্য-বিচরণ সমাধা করিতেছেন। উহাঁদেরই স্বর্ণসূত্র-খচিত রজতাম্বরের ঝিলিমিলি, বিশুদ্ধ কষিত সুবর্ণ-ভূষণের অজস্র হীরকদ্যুতি এই অপরাহ্ণের অস্তরাগে মুগ্ধ দর্শকের নেত্রে অমন করিয়া ঝিলিক্ হানিতেছে! তুষার-পর্ব্বতের শৃঙ্গ বলিয়া উহাদের চেনা না থাকিলে বিস্ময়ে সহসা যেন চমকিয়া উঠিতে হয়।

অতুলেশ্বর বাবুর কথা কাণে ঢুকিলেও সলিলের সেটা ঠিক মনে ঢোকে নাই। সে শুধু তার ঐ শেষ কথাটার, অর্থাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটুকুরই উত্তর সমাধা করিয়া জবাব দিল,—"তা' তো বটেই!" বলিয়া আবার সেই রূপসাগরেই ডুব দিয়া রহিল।

অতুল বাবুও তার দৃষ্টির অনুসরণে ঐ দিকেই চাহিয়া দেখিলেন। সূর্য্যের আলো ক্রমেই সন্ধ্যা-ছায়ায় মিলাইয়া আসিতে থাকায়, দূরের সেই অপরূপ জ্যোতিচ্ছটা একটা মিশ্রালোকের মধ্যে পড়িয়া যেন ক্রমশই ম্লান হইয়া আসিতেছিল। নূতন উজ্জ্বল পালিশ করা গহনা যেন ব্যবহার-ম্লান, নূতন শাড়ী যেন পরিত্যক্ত পুরাতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল। ঐ দিকে চাহিয়াই অতুলবাবু বলিলেন, "ও কি দেখচেন! দেখতে হয় ত সকালে! সে এক গ্র্যাণ্ড দৃশ্য! বিশেষ দিনটী বেশ পরিষ্কার থাকলে ত আর কোন কথাই নেই! এই বাড়ীর ঐ উত্তর দিককার বারান্দায় বসে বসে চা খেতে-খেতেই হিমালয়ের ঐ সুদূর উন্মুখ উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তটাই স্পষ্ট দেখতে পাবেন।"

সলিল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তাহলে এই বাড়ীটাই নেওয়া যাক। ওঁরা যদি আসেনও, কোন রকম করে কুলিয়েও যেতে পারে। কিন্তু যে রকমের গতিক,—মা যে এখানে আসেন, তার ভরসাও খুব বেশী কিছু দেখতে পাই নে।"

অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পিতা বর্ত্তমান?"

সলিল নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—না। তার মুখে বিষাদের একটা ক্ষীণ ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সে একটুক্ষণ গম্ভীরভাবে দৃষ্টি নত রাখিয়া পরক্ষণে আবার সেই গন্ধর্ব্ব-লোকের মতই অত্যাশ্চর্য্য স্বর্গপুরীর অভিমুখে প্রত্যাশিত নেত্রদ্বয় ফিরাইল। কিন্তু কোথায় সে সব! মৃগতৃষিকার মত, ছায়াবাজির মত সেই অপূর্ব্ব-দর্শন অলকাপুরী, কি স্বর্গ-অপ্সরাদের নৃত্যসভা, কিম্বা ওই ধরণের সেই আরও কোন কিছু—সে যেন কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। আছে কেবল, সেই আসন্ন সায়াহ্নের পরিম্লান ধূসর ছায়াতলে, চির-অপরিবর্ত্তিত, ভারতবর্ষের দুর্গতোরণ স্বরূপ বিশালমূর্ত্তি নীল-কৃষ্ণ অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী! মহাসমুদ্রের বীচি-বিস্তারের মত তাহার যেন শেষ নাই, সংখ্যা নাই। একের পর আর এক—এমনি করিয়া কোথা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের গায়ে বার্চ্চ ও চিড়ের শ্যামলতা তখনও সন্ধ্যা অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই, দূরের দেবদারু ও ঝাউবন তাদের ঘন শ্যামলিমার উপর অনন্ত নীলিমার আবরণ ঢাকা দিয়া সেই অসীম নীল সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে।

অতুলবাবু বলিলেন, "তা হলে এই বাড়ীটাই নেওয়া ঠিক হলো ত? কাল সকালেই আমি বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে সব 'সেটল' করে ফেলবো। কদ্দিনের এগ্রিমেণ্ট করা যাবে বলুন তো? পুরো সিজনের ভাড়া নিশ্চয়ই ওরা চেয়ে বসবে। তবে সেটা আমি এবারে আর দিচ্চি নে। আমার বেলা ওরা তাই করিয়ে নিয়েছে বটে, তা' তখন তো আর এসব জানা ছিল না। তিন মাসের ভাড়া নিয়েও অনেকে দেয়।"

বাড়ীটার ভিতর বাহির দেখিয়া লইয়া দুজনে রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলেন। অতুলবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, একটা কাজ করলে তো হয়!"

সলিল জিজ্ঞাসুভাবে চাহিল। হঠাৎ কি কাজ যে কাহাকে করিতে হইবে, তাহার কিছু আন্দাজ সে পাইয়া উঠিল না। অতুলেশ্বরবাবু বলিলেন, "একলা আর ওখানে কি করতে ফিরে যাবে? রাতটা এইখানেই কাটিয়ে কাল সকালে একেবারে নিজের নূতন বাসায় গিয়ে উঠলেই চুকে যেতো। সেই ভাল না?"

সলিল কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "না না, তার তো কিছু দরকার নেই। অনর্থক আবার আপনাদের অত বিব্রত হওয়া কেন? আমি ওখানেই যাচ্চি—"

অতুলবাবু গম্ভীর মুখে বাধা দিলেন,—"দেখুন সলিল-বাবু! বিব্রত আপনি আমায় না করতে ইচ্ছুক থাকলে আর হবে কি? আমার স্বভাবটাই কেমন বিব্রত হ'বার জন্যে উৎসুক হয়েই রয়েছে। আপনাকে একলাটী সেই ল্যাণ্ডোর বাজারের কোটরটুকুতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আজকের রাত্রের মতন যা হবো, আপনাকে নিয়ে বিব্রত হওয়া তার চাইতে যে মন্দ, তা' ঠিক আমায় চেনা থাকলে আপনার মনে হতো না। আমার আজকাল ওইটেই একটা রোগের মতন হয়ে দাঁড়িয়েচে। মনটা যেদিকে ঝোঁকে, সেদিক থেকে আর তাকে যেন টেনে সরিয়ে আনতে কিছুতে পেরে উঠি নে। তা' আমার ছোট-মা কিন্তু সে কথাটা মানতে চায় না। সে বলে 'না বাবা!

ও তোমার রোগটোগ নয়। একলা মায়ের আদুরে-গোপাল ছেলে ছিলে কি না,—যখন য'া ধরেছ, না করে তো আর ছাড়ো নি; ঠাকুমাও তোমার সকল আবদার শুনে শুনে তোমায় একরোখা তৈরি করে তুলেছে। এখন বিশ্বের লোক তো আর ঠাকুমা নয়; তারা তোমার খেয়ালের সঙ্গে সায় দিয়ে চলবে কেন? কাজেই তারা যখন তোমার আবদারের অবাধ্যতা করে, আর তুমি নিরুপায় হয়ে পড়ো, তোমার তখন অনভ্যাসের অস্বাচ্ছন্দ্যটাকে অসুখ বলেই মনে হয়।'"

বলিয়া হাসিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তা দেখুন সলিলবাবু! মেয়েটা হয় ত নেহাৎ মিথ্যে বলে নি। কতকটা তাই বটে! ছোটবেলায় বাপ-মায়ের মরা-হাজা একটা ছেলে ছিলুম, মা বেটী আমায় বড়ই সন্তর্পণে মানুষ করেছিল। সে যে কি যত্নেই রেখেছিল,—গুরুসেবা, ঠাকুরসেবা মানুষে অত ক'রে করে না। স্বভাবটা সেই বিগড়ে দিয়েচে বই কি কতকটা! যখন যা চেয়েছি, অসঙ্গত হলেও যোগান দিয়েচে। লেখা-পড়াও তো ঐ করেই বেশি দূর হয়ে ওঠে নি। এল-এ পাশ করে অনার নিয়ে বি-এ পড়ছিলেম। ঐ সময়ে মা খুব ঘটা করে বিয়ে দিলে। বউ, তা খুব রূপসী বউই মা নিজে দেখে-শুনে দু' বচ্ছর ধরে বেছে বেছে ঘরে এনেছিল। এখন বলতে লজ্জাও করে,—কলেজে গেলে বউএর কাছে থাকতে পাই নে বলে, ছুতোনাতা করে কলেজ যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলুম। মাও বল্লে, শরীর যখন ভাল থাকচে না, তখন কাজ কি অমন পাশ করায়। ছেড়ে দে!—শুধু যেদিন কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে এসে বসলুম, সেদিন শুধু সেই নতুন বৌটাই কেঁদে ফেলেছিল! একেই বলে যার জন্যে চুরী করি, সেই বলে চোর! কি বলেন?"

মানুষ যে এতখানি সাদাসিদা হইতে পারে, সলিলের বোধ করি এর আগে তা' জানা ছিল না। সে এই অতি সামান্য সময়ের পরিচিত, অথচ এখনও ভাল করিয়া পরিচয়ে না আসা লোকটীর সরলতা ও অমায়িকতায় প্রশংসা-বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া, ইঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আর কিছু বলিবার না পাইয়া, ধীরে ধীরে কহিল, "আপনার ওখানেই যাই চলুন। কিন্তু একবারটী যে ভজহরিকে খবরটা দিয়ে আসতে হবে। একে তো কাল রাত্রে না যাওয়াতেই সে কেঁদে কেটে এক করেছে,—আজও খাবার নিয়ে বসে থাকবে।"

অতুলবাবু হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার আপনার আর যাবার দরকার নেই। আমি খবর দিয়ে লোক পাঠাচ্চি।"

(ক্রমশঃ)

পুর্ব্বরাগ

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

প্রথম ফাল্গুনের পলাশ-ঝরা রাঙা পথের ওপর দিয়ে তরুণী চলেছিল তার নীলা শাড়ীর নীল আঁচলখানি ঝরা-ফুল রাঙা পলাশে ভরে' নিয়ে—নীল আকাশের পাতে উদয়-রক্ত-রাগ-সজ্জায় সাজিয়ে স্নিগ্ধ প্রভাত-শ্রীর মতন।

একটা কোকিল কোথা থেকে ডেকে উঠল—'কুহু-কু-উ'। একটা আমের গাছের কয়েকটি বোল ঝরে পড়ল। দুটি দোয়েল শিষ দিয়ে পুষ্পিত পলাশ-শাখা থেকে উঠে শুভ্র বকের বীথির পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে বকুলতলার ফুল ছড়ানো ঘাসের ওপর নিরালা ছায়ায় বস্ল। কয়েকটি প্রজাপতি সম্মুখের কামিনী ঝাড়ের রসের ঘাটে থেকে তাদের হাল্কা পান্‌সীর পাখার পাল তুলে দিয়ে পলাশ-তলার রূপের হাটের দিকে ভেসে গেল।

চল্‌তে চল্‌তে তরুণী হঠাৎ চমকে উঠল—খানিকটা পথ গিয়ে পথের বাঁকে যেখানে স্ফুট-লাল মালতী-লতানো দীপ্ত কৃষ্ণচূড়া গাছটা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এসে চমকে উঠে কি দেখে সে থমকে দাঁড়াল। একবার অতসী রঙ মাথার ওড়নাটা তার কালো চুলের অপরাজিতা-স্তবকের ওপর একটু ভালো করে টেনে দিয়ে আবার সরিয়ে নিলে। তার পর তরুণী আঁখির পলক হারিয়ে চেয়ে থাক্‌ল…

আশ্চর্য্য-সুন্দর সে এক নধর কিশোর সেই পথ বেয়ে

আস্‌ছিল—শিশু বসন্ত-বন-দেবতার মত। অশোক-রঙানো উত্তরীটি তার অশোক-তলার 'ফুলের ঝড়' লেগে কাঁপছিল, পথের দলিত ফুল-রেণুতে চরণ-তল তার সিক্ত, অধর-পুটে স্থল-কমলের রাঙা হাসি! সে নিশ্চয় চাঁপাবন থেকে বেরিয়ে এসেচে···তার গায়ের বাতাস লেগে বাতাস চাঁপার গন্ধে ভরে গেল। তরুণীর হৃদয় একটা অজানা আনন্দে শিউরে উঠল।

কিশোর আস্‌তে আস্‌তে তরুণীকে দেখলে—তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তার পর আরো নিকটে এসে তরুণীর আঁচল-ভরা পলাশ ফুলের দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্‌লে—"আমায় দুটো ফুল দেবে কি?"

কিশোর তার উত্তরীয়-প্রান্ত মেলে ধর্‌লে।

তরুণীর আঁচলে ছিল—তার দেবতা-পূজার ফুল। তরুণী বল্‌লে—"ফুল নেবে? ফুল তুমি কী করবে? এ আমার পূজার ফুল যে।"

কিশোর বল্‌লে—"খেলা কর্‌ব, মালা গেঁথে গলায় পরব; দেবে না?"

তরুণী তার উত্তরীয়ের ওপর আঁচলের অনেকগুলি ফুল ঢেলে দিলে।

কিশোর বল্‌লে—"আর দুটো দেবে না?"

তরুণী তার সবগুলি ফুল তাকে দিয়ে দিলে।

কিশোর তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লে—"আমি যাচ্চি!" তার পর সে পথ দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগল।

একটুখানি চুপ করে থাক্‌বার পর তরুণী তাকে ডেকে বল্‌লে—"কিশোর!"

কিশোর মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে—"কি?"

তরুণী বল্‌লে—"তুমি কোথা থেকে এলে, কোথা যাচ্চ? এর আগে তোমাকে আর দেখি নি ত!"

কিশোর সে কথার উত্তর না দিয়ে তাকে বল্‌লে—"তুমি আমাকে ফুল দিলে; আমার কাছে কিছু চাইলে না যে!"

"কি চাইব?"

"দাম—"

কিশোর ধীরে ধীরে আবার তরুণীর কাছে ফিরে এসে হঠাৎ তার গলা জড়িয়ে ধরল। তরুণী শিউরে উঠে অভি-ভূতের মত চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাক্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে তরুণী পথের দিকে চেয়ে দেখলে—কিশোর চলে গেছে। সে ভাবলে—পূজার ফাঁকে কে এসে আজ অমন করে আমার পূজার ফুল ফাঁকি দিয়ে নিয়ে চলে গেল? তাকে আর পাই না! কিন্তু তার ওপর কোন রাগ হচ্চে না ত। মনে হ'চ্চে, আরো বেশী করে ফুল কেন আঁচল ভরে তুলে রাখি নি আগে? কেন একগাছি মালা গেঁথে রাখি নি?

উপন্যাসের উপসংহার

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ, বি-টি

পাড়াগাঁয়ের পথ, তায় বৃষ্টির পর—কাদায় পিচ্ছিল। সংকীর্ণ পথে স্থানে স্থানে জল জমিয়াছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় গাছের উপর হইতে যে জল ঝরিতেছে, তাহাও প্রায় অর্দ্ধেক বৃষ্টি। গ্রামের প্রান্তে গাছের আড়ালে সূর্য্য কখন ডুবিয়া গিয়াছে। দিনের আলো যেটুকু আছে, তাহাও এখনি নিবিয়া যাইবে। বনের মাঝে প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে এমন দুই একটা বাড়ী হইতে এক-আধবার শঙ্খধ্বনি শুনা গিয়াছে। তাহাদের ক্ষীণ ধ্বনি শুনিয়া মনে হইতেছে, ইহারাও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে; আর বুঝি বেশী দিন বাজিবে না।

এমনি সময় দুইটী যুবক পূর্ব্বোক্ত সংকীর্ণ পথ দিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিল। দুজনেরি বয়স প্রায় এক—২৩।২৪ বৎসর হইবে। দুজনেরি পরিচ্ছদ সাধারণ—তবে একটু বেশী পরিষ্কার, এই যা। জুতা দুজোড়া একটু বেশী দামী; কিন্তু পল্লীপথে চলিয়া স্থানে স্থানে কর্দ্দমাক্ত। একজনের হাতে একটী সুদৃশ্য মাঝারি ব্যাগ।

সংকীর্ণ পথে দুজনের পাশাপাশি যাইবার উপায় ছিল না—একজনকে আগে, একজনকে পিছনে যাইতে হইতে-ছিল। যে আগে যাইতেছিল সে বলিল—সন্ধ্যা তো হয়ে এ'ল, এখন কোন্ দিকে যাওয়া যায় উপেন?

পশ্চাতের উপেন নামধারী যুবক বলিল—ঐ যে সামনে

গাছগুলোর আড়ালে একখান বাড়ী দেখা যাচ্চে, ঐখানেই চল। দুইজনে একটু দ্রুতপদে সেইদিকে অগ্রসর হইল।

বাড়ীখানি নূতন ও পাকা—চারিদিক প্রাচীর দিয়া ঘেরা। কেবল চণ্ডীমণ্ডপখানি খড়ের। সেই চণ্ডীমণ্ডপের ম্লান প্রদীপের আলোকে দুইজন কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। একজন গৃহস্বামী, অপর তাহার প্রতিবাসী। যুবক দুইজন যখন চণ্ডীমণ্ডপের কাছাকাছি আসিয়াছে, তখন কেবল নিম্নলিখিত কথোপকথন তাহাদের কাণে আসিল—

একজন বলিল—মাপ কর্‌বেন, আপনার এ প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি নে।

অপর জন বলিল—তবে আমিও আপনাকে কোন সাহায্য কত্তে প্রস্তুত নই।

অন্য লোককে আপনি যে ভাবে টাকা দেন, আমাকেও সেই ভাবে দিন; আমি অন্য কোন সুবিধে এ সম্বন্ধে চাই নে।

আপনি না চাইতে পারেন, কিন্তু আমি তাতে রাজী নই। আপনি শোধ দিতে পার্‌বেন না জেনে ব্রাহ্মণের ভদ্রাসন বেচে নেবার জন্য আমি টাকা দিতে চাই নে। বাইরে কে দাঁড়িয়ে?

যুবকদের মধ্যে একজন বলিল—আজ্ঞে, আমরা পথিক।

প্রশ্নকর্ত্তা গৃহস্বামী। সে দ্বারের কাছে অগ্রসর হইয়া রুক্ষস্বরে বলিল—পথিক্ পথে যাও; ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে কেন?

যুবকটী বলিল—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; আপনাদের গ্রামে এসেছি। এখন একটু স্থান না দিলে কোথায় যাই বলুন? আজ আপনারই অতিথি আমরা।

গৃহস্বামী বলিল—এটা অতিথি সৎকারের জায়গা নয়, অন্যত্র যাও।

যুবক বলিল—কেন, আপনাকে তো বেশ সঙ্গতিপন্ন বলেই মনে হচ্চে।

গৃহস্বামীর এবারে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। একেবারে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল—সঙ্গতিপন্ন বলেই মনে হচ্চে! আমার সঙ্গতি আছে, গায়ে লেখা আছে, নয়? বাপ ঠাকুর্দ্দা বাড়ী করে গেছলেন—তাই মাথা গুঁজবার একটা জায়গা আছে, নইলে গিয়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হ'ত। বলে কি না সঙ্গতি আছে! বত বেটা—

বাধা দিয়া দ্বিতীয় যুবক বলিল—না হয় আপনার সঙ্গতি নেই; কিন্তু সেজন্য গাল দেবার দরকার কি? বল্‌লেন জায়গা হবে না, চলে যাচ্চি।

হাঁ চলে যাও, এখনি যাও। কোথাকার কারা সব এসেই ভাতের হাঁড়ীর খবর নিতে আসে।—যুবকদ্বয় একটু বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

গৃহস্বামীর সঙ্গে যে অপর ব্যক্তি ছিলেন, তিনিও উঠিয়া যুবকদ্বয়ের পিছু পিছু বাহির হইলেন।

ঝিল্লির ডাক সুরু হইয়াছে। অন্ধকার দেখা দিয়াছে। মশকের দল একবার সাড়া দিয়া সবে চুপ করিয়াছে। হঠাৎ একদল শৃগাল পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল হইতে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। যুবকদ্বয় কিয়ৎক্ষণের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল,—এইবার কি করা উচিত। রেলওয়ে ষ্টেসন সেখান হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে। এই গ্রামের নাম 'পাষণ্ডপুর' গোছের একটা কিছু রাখিয়া ষ্টেশনেই ফিরিবে, না অন্য দুই একজন গৃহস্থের বাড়ী চেষ্টা করিবে?

এমন সময় পিছন হইতে একজন বলিলেন—বাবা, তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে, এই গরীবের ঘরে রাতটা কাটিয়ে যাও।

যুবকদ্বয় পিছন ফিরিয়া দেখিল—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। অনুমানে বুঝিল—ইনিই বোধ হয় ঐ বাড়ীর অধিকারীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।

দুজনেই একসঙ্গে বলিল—এতে আবার আপত্তি? আমরা তো নিরুপায় হয়ে ভাবছিলাম ষ্টেসনেই ফিরে যাব।

বৃদ্ধ যুবকদ্বয়ের সম্মতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহাদের পথ দেখাইয়া চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে বলিলেন—বাবা, তাহ'লে বড় অন্যায় করতে গ্রামের উপর। সবাই ঐ হরিশ সর্ব্বজ্ঞের মত অতিথিকে বিমুখ করত না। অথচ তোমরা এই ধারণা নিয়ে যেতে যে গ্রামে অতিথিকে এক রাত্রের জন্য আশ্রয় দেয় এমন মানুষ নেই।

মিনিট দশেক নিঃশব্দে পথ চলিয়া ব্রাহ্মণ বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা এক বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দড়ি দিয়া বাঁধা বাঁশের একখানি আগড় সদর দরজার কাজ করিতেছিল। আগড়খানি খুলিয়া বৃদ্ধ বলিলেন এই গরীবের কুঁড়ে বাবা। দিনের আলোতে দেখিলে বুঝা যাইত যে, ব্রাহ্মণ বিনয়-বশে

এ কথা বলিলেও ইহার ভিতর একবিন্দু অতিশয়োক্তি ছিল না।

ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র একটী মৃৎপ্রদীপ সাবধানে হাতে লইয়া একখানি কুটীর হইতে এক কিশোরী নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্যস্তভাবে বলিল—আলো নিয়ে যাচ্ছি বাবা, সামনে সেই গর্ত্তটা আছে দেখ্‌বেন।

বলিতে বলিতে কিশোরী পিতার সম্মুখে আসিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, তাহার পিতার পিছনে দুইটী অপরিচিত লোক।

ব্রাহ্মণ কন্যাকে লজ্জিত দেখিয়া তখনি বলিলেন—এঁরা আজ রাতে আমাদের অতিথি মা, লজ্জা করলে চল্‌বে না, তোমাকেই ত সব করতে হবে। . .

কিশোরীর মুখের সংকোচ ভাব কাটিয়া গেল। যে কুটীর হইতে সে আলো লইয়া আসিয়াছিল, তাহা ছাড়া অপর যে দুইখানি কুটীর ছিল, কিশোরী আলো দেখাইয়া সকলকে তাহারি একখানির সম্মুখে লইয়া গেল।

ঘরের ভিতর পিলসুজের উপর আর একটী প্রদীপ ছিল। সেটি জ্বালিয়া দিয়া মেয়েটী চলিয়া গেল। ঘরের সম্মুখে খানিকটা অল্প পরিসর রোয়াক, উপরে খড়ের চালা—তাহাই বারান্দার কাজ করে।

মেয়েটী ঘরের সম্মুখে একটী ছোট ঘড়ায় এক ঘড়া জল, একটী ঘটি ও ভাঁজ করা একখানি গামছা সেখানে রাখিয়া দিল ও ঘরের মধ্যে বসিবার জন্য একটী মাদুর বিছাইয়া দিল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—বাবা, এবার তোমরা হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেল। কাপড়-চোপড় সব ভিজে গিয়েছে—অসুখ করবে।

যুবক দুইজন হাত মুখ ধুইয়া লইতে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের সঙ্গে কাপড় আছে কি বাবা? না আমি দেখে শুনে দুখানা নিয়ে আস্‌ব?

তাহারা বলিল কাপড় তাহাদের সঙ্গেই আছে। ঘরের ভিতর আসিয়া দুইজনে ব্যাগের ভিতর হইতে শুষ্ক বস্ত্র ও জামা বাহির করিয়া ভিজা কাপড় জামা ছাড়িয়া ফেলিল। সিক্ত বস্ত্রাদি ঘরের একটী কোণে জড় করিয়া রাখিল। দুই বন্ধু হস্তপদাদি বেশ করিয়া ধুইয়া মাদুরের উপর বসিল। উপেন্দ্র বলিল—এবার একটু চা হ'লে চমৎকার হয়।

চা আসিল না; আসিল দুইটী পাথর বাটীতে ১০।১২ খানি করিয়া পাকা পেঁপে ও খানকতক করিয়া বাতাসা, তাহার সঙ্গে দু' গেলাস জল।

দুই বন্ধু জলযোগ করিয়া চুপিচুপি বলাবলি করিতেছে—একটু গরম জল করিয়া দিতে বলা উচিত কি না, এমন সময় ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—আমি গরীব, দেখতেই পাচ্চ বাবা। একটু কষ্ট হবে তোমাদের আজকের রাতটায়।

কষ্ট! বলেন কি আপনি! আপনি আজ আশ্রয় না দিলে কি হ'ত বলুন দেখি!

একে কি বাবা আশ্রয় দেওয়া বলে? এ কিছুই নয়! বলিয়া কথাটা চাপা দিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের কি চা-টা খাওয়া অভ্যাস আছে?

একজন একটু উৎফুল্ল হইয়া বলিল—আজ্ঞে, হাঁ—আছে একটু অভ্যাস। আমাদের কাছে চায়ের আর সব আছে, কেবল একটু গরম জল হ'লেই আমরা চা করে নিতে পারি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—তা এতক্ষণ বলনি কেন বাবা? আমাদের তো পাড়াগাঁ—একখানা মুদিখানার দোকান, সেখানে অমনি একরকম চা কিনতে পাওয়া যায়। ভাবছিলাম যদি তোমাদের অভ্যাস থাকে, সেখান থেকে একটু চা এনে দেব। আমার এক ভাগ্‌নে মাঝে মাঝে আসে। সে এলে তার জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করে দিতে হয়।

ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিয়া কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন—মা, গায়ত্রী—একটু গরম জল করে দাও তো, এঁরা একটু চা খাবেন।

কন্যা রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল—বাবা, তাহলে তো চায়ের যোগাড় কত্তে হবে; চা তো নেই।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—ওঁদের সঙ্গে সব আছে, কেবল একটু গরম জল হ'লেই হয়ে যাবে।

গায়ত্রী একটু পরেই একটী পরিষ্কার পিতলের পাত্রে গরম জল আনিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বন্ধুদ্বয় ততক্ষণ ব্যাগ হইতে একটী দুজনের উপযুক্ত চাদানি, দুটী পেয়ালা পিরিচ, বিলাতি দুধ প্রভৃতি বাহির করিয়া বসিয়াছিল। তাহারা ক্ষিপ্রহস্তে চা তৈয়ারী করিয়া দুইটী পেয়ালায় ঢালিতে লাগিল। গায়ত্রী উহাদের চা তৈয়ারী করা নিবিষ্টমনে দেখিয়া লইল।

গায়ত্রী কক্ষ হইতে চলিয়া আসিতে এক বন্ধু চায়ে এক চুমুক দিয়া বলিল—বাঃ সুন্দর চা।

অপরে বলিল—মেয়েটীও বেশ!

যে চায়ের প্রশংসা করিয়াছিল সে বলিল—মুখের গড়নটী কি সুন্দর!

অপরে বলিল—মনে রাখিস্!

(২)

প্রভাতে ব্রাহ্মণ বন্ধুদ্বয়ের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বলিলেন—তোমরা হাতমুখ ধুয়ে নেও—গায়ত্রী তোমাদের জন্য চা তৈয়ারী কর্‌চে।

দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

আকাশ তখন মেঘলেশহীন; নবোদিত সূর্য্য-কিরণে চারিদিক সমুজ্জল। দুই জনে চাহিয়া দেখিল—ঘরের মেঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বুঝিল, কোন্ সকালে আসিয়া মেয়েটী ঝাড়ু দিয়া গিয়াছে। রাত্রিকালের পেয়ালা ইত্যাদির কোন চিহ্নই নাই।

দুই বন্ধু বাহিরে রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইল। সুসজ্জিত পরিস্কৃত উঠানটী রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। কোথাও এতটুকু ময়লা পড়িয়া নাই। রোয়াকের এক কোণে দুইটী পরিস্কৃত ঘটিতে দুই ঘটী জল ও দুইটী দাঁতন রহিয়াছে। পাশে এক বাল্‌তি জল। দুইজনে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া লইল।

গৃহমধ্যে আসিয়া বসিতে ব্রাহ্মণ বলিলেন, বাবা, শরীর ভাল ত? দুইজনেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ।

ব্রাহ্মণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—শৌচে গেলে না কেন তাহ'লে?

একজন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—চা খাওয়ার পরই শৌচে যাওয়ার অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন—বড় বদ্ অভ্যাস বাবা। এ সব অনাচার শরীরের হানি করে। এ অভ্যাসগুলো বদ্‌লে ফেলো বাবা।

এমন সময় গায়ত্রী দুইটী পাথরের বাটীতে খানিকটা করিয়া পল্লীগ্রামের 'সুজী' ও সহরের 'হালুয়া' ও দুই পেয়ালা চা একে একে আনিয়া রাখিয়া দিল। এক বন্ধু বলিল—আপনিই আজ চা করেছেন দেখচি। একটু গরম জল দিলেই হ'ত—আমরাই করে নিতাম।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, আমি তো ওঁদের চা কর্‌তে দেখেছি, আমি করে দেব? আমি বল্লাম,—তা পারিস কর। এখন খেয়ে দেখ ঠিক হয়েচে কি না।

দুই বন্ধুতেই চায়ের আস্বাদ লইয়া বলিল—বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েচে তো! উনি তা'হলে আগে থাক্‌তে চা কত্তে জান্‌তেন!

ব্রাহ্মণ বলিলেন—বলেছিলাম তো, আমার ভাগনে যখন এসে ২।১ দিন থাকে, তখন সে চা খায়। তবে সে প্রায় নিজেই তৈরি করতো—পাছে খারাপ হয়ে যায়। ভাল কথা, তোমাদের কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয় নি। তোমাদের নাম কি বাবা?

একজন বলিল—উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অপরে বলিল—বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাড়ী কোথায় বাবা, তোমাদের?

কল্‌কাতায়।

দুজনেরি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দুজনেরি পিতামাতা আছেন তো? ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

উপেন্দ্র বলিল—আমার বাবা, মা, দুজনেই আছেন। বিনয়ের বাপ, মা দুজনেই স্বর্গে গেছেন।

ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বেদনার সহিত বলিলেন—আহা!

বিনয়ের সুকুমার মুখের পানে চাহিয়া ব্রাহ্মণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—সংসারে তোমার কে আছেন তা'হলে বাবা?

আমার এক দিদি আছেন।

সধবা না, বিধবা?

বিধবা, তিনিই আমাকে মানুষ করেছেন।

আর একটু পরে দুই বন্ধু অবশিষ্ট প্রাতঃকৃত্য শেষ করিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। তার পর একটু ঘুরিয়া আসিয়া বাড়ী ফিরিল।

বিনয় বলিল—আজ তা'হলে আমরা এখন যাই। ১১টা না কটার গাড়ী আছে, তাইতেই যাব।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—সে কি হয় বাবা? রান্না হয়ে গিয়েছে, চাট্টি খেয়ে ওবেলার গাড়ীতে যাবে। কাল রাত্তিরে তো খাওয়া হয়নি।

তাহাই স্থির হইল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, পাশের এই ভাঙ্গা বাড়ীটা কাদের?

ব্রাহ্মণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ওটা বাবা আমাদেরই বাড়ী ছিল। সব ভেঙ্গে চুরে গেল। ব্রাহ্মণী হঠাৎ একটা ভাঙ্গা জায়গা থেকে পড়ে আঘাত পান—একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েন। সে শয্যা আর তিনি ত্যাগ করেন নি। তার পর গায়ত্রী বললে—বাবা, এ বাড়ীতে আর থাকব না। সেইজন্য পাশে এই কুঁড়ে দুখানা তুলে বাস করছি। তার পর অত্যন্ত নিম্নস্বরে প্রায় আপন মনে বলিলেন—এখন মেয়েটাকে একটা সৎপাত্রে দিতে পারলেই আমার কাজ শেষ হয়।

উপেন্দ্র বিনীত স্বরে বলিল—আপনি যদি দোষ গ্রহণ না করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—স্বচ্ছন্দে কর বাবা।

উপেন্দ্র—আচ্ছা, আপনি টাকা ধার কত্তে গিয়েছিলেন কেন?

ব্রাহ্মণ—গায়ত্রীর বিবাহের জন্য।

উ—কত টাকা?

ব্রা—এক হাজার।

ও ভদ্রলোক বুঝি রাজী হলেন না?

না, উল্টে বলেন—যদি আমার সঙ্গে বিবাহ দেন তো আমি আপনাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার কত্তে রাজী আছি। হা অদৃষ্ট!

আপনি দুঃখিত বা ব্যস্ত হবেন না। আমরা আপনার মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করব। হয় সৎপাত্র যোগাড় করে দেব, নয় ত অর্থ সংগ্রহ করে দেব।

ব্রাহ্মণের চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। অশ্রুগদগদ কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলিলেন—বেশ বাবা! কিন্তু আমারও একদিন ছিল। যখন এই সামান্যর জন্য অপরের দ্বারস্থ হতে হ'ত না।

উপেন্দ্র—আমরা সে সংবাদ পেয়েছি। আপনারাই তো একদিন এ-দিকের জমীদার ছিলেন।

ব্রাহ্মণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সবই ভগবানের ইচ্ছা!

(৩)

কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে একখানি সুন্দর বাড়ী। চারিদিকে বাগান—মাঝখানে একখানি নাতি-বৃহৎ অট্টালিকা। এই অট্টালিকার একটী সুসজ্জিত কক্ষে একটী যুবক ঘুমাইয়া আছে। বেলা ৮টা বাজে—এখনও উঠিবার নাম নাই। বাড়ীর কর্ত্রী এক বিধবা, বয়স অনুমান ৪০ হইবে। ৩।৪ বার আসিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। শেষবার আসিয়া যুবকের গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন, ওরে ও বিনয়, ওঠ, বেলা ৮টা বেজে গেল যে!

এতক্ষণে যুবকের ঘুম ভাঙ্গিল। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বলিল—ইস! খুব বেলা হয়ে গেছে তো দিদি।

দিদি বলিলেন—তা হবে না! কখন থেকে ডাকছি!—তোর ঘুম আর ভাঙ্গে না। উপেন কখন থেকে এসে বসে আছে।

যুবক শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল কোথায় উপেন?

তোর পড়বার ঘরে—দিদি উত্তর দিলেন।

বিনয় ক্ষিপ্রহস্তে প্রাথমিক প্রাতঃকৃত্য সারিয়া লইয়া পাশেরই একটী পুস্তকপূর্ণ আলমারি-ভরা কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইল।

একটু পরেই পরিচারক আসিয়া চা ও বিস্কুট দিয়া গেল। দুই বন্ধু তাহার সদ্ব্যবহারে লাগিয়া গেল। উপেন জিজ্ঞাসা করিল—দিদিকে বলেছিস্?

বিনয় উত্তর করিল—না, তুমি বল।

উপেন বলিল—আমাকে সে কথা তোর বলে দিতে হবে না। সে সব আমার বলা হয়ে গেছে। দিদির মত আছে। তুই যেন শেষটা আবার বেঁকে বসিস্ নে।

এইস্থানে পূর্ব্বের ব্যাপারটা একটু সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

বিনয় ও উপেন দুই বন্ধুর একই পাড়ায় বাড়ী। উপেন বিনয় অপেক্ষা বছর চারেকের বড়। ইহাদের বন্ধুত্ব যেন দুই ভায়ের বন্ধুত্ব। উপেন বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে। একটী ছেলেও হইয়াছে। বিনয়ের দিদির অত্যন্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও বিনয় এতকাল বিবাহ করে নাই। বি-এ পাস করিয়া কলেজ ছাড়িয়া বিনয় বাড়ীতে লেখাপড়া লইয়া আছে। মাসিক পত্রাদিতে গল্প লেখে; ইহারি মধ্যে দুখানি গল্পগ্রন্থ ছাপাইয়া ফেলিয়াছে। গল্প উপন্যাস পড়িয়া ও লিখিয়া তাহার মনটাও কতকটা ঐ ভাবের হইয়া গিয়াছে। প্রভাত বাবুর 'আমার উপন্যাসে'র মত গল্পই বিনয়ের গল্পলেখার আদর্শ। বিনয় লেখেও ঐ ধরণের গল্প।

বিবাহের জন্য বারবার অনুরুদ্ধ হইয়া বিনয় উপেনকে একদিন বলিয়াছিল—ঘটক আসিয়া সংবাদ দিল, সমান অবস্থার পাত্রী দেখিয়া বিবাহ দেওয়া হইল—এসব বিবাহে তাহার রুচি নাই। 'আমার উপন্যাসে'র মত বিবাহ হইলে বিবাহ মুখরোচক বটে।

উপেন্দ্র বলিয়াছিল—তাহা হইলে তো ছদ্মবেশে পল্লীগ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। আর যেখানে দুর্লভ রত্ন মিলে তাহা কুড়াইয়া আনিতে হয়।

দিদির কাণে সে কথা উঠিলে—তিনি বলেন, বেশ তো, তাই তোরা খোঁজ কর না। মেয়ে ভাল হলেই হ'ল, আর বিনয়ের মনের মত হলেই হ'ল। নাই বা হ'ল বড় লোকের মেয়ে।

তার পর দুই বন্ধু মিলিয়া কত সহর, কত পল্লী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। মনের মত পাত্রী কোথাও জুটে নাই। সে দিন দুই বন্ধু মিলিয়া কাঁচড়াপাড়া ষ্টেসনে নামিয়া সুবর্ণপুরে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গায়ত্রীকে পছন্দ করিয়া আসিয়াছে। উপেন্দ্র আজ প্রভাতে আসিয়া দিদিকে সে কথা সব বলিয়াছে।

দুই বন্ধুর চা পান প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় দিদি সেখানে আসিলেন। আসিয়াই তিনি কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন, উপেন, আমায় তাহ'লে কালই সেখানে নিয়ে চ। আমি মেয়ে দেখে আশীর্ব্বাদ করে আসব। কি বলিস বিনয়?

বিনয় লজ্জিতমুখে বলিল—সে তোমাদের যা ইচ্ছা কর। কিন্তু আমার একটা কথা রাখ্‌তে হবে।

কি বল্—দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিনয় বলিল—সেখানে গিয়ে কিন্তু অবস্থা ভাল নয় এটা বল্‌তে হবে। কোনো গতিকে দিন চলে এইটে জানানো চাই। আর বিয়ের কিছু দিন আগে থেকে কিছু দিন পর পর্য্যন্ত একটা সামান্য ছোট বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌তে হবে।

দিদি হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা বেশ, তাই হবে। তবে আমার একটা কথাও তোকে রাখ্‌তে হবে। আজ হচ্ছে ২০শে আষাঢ়। শ্রাবণের প্রথমের দিকেই যে দিন আছে সেই দিনেই বিয়ে হবে। আমি গিয়ে একেবারে দিন স্থির পর্য্যন্ত করে আসব।

বিনয় কোন আপত্তি করিল না।

স্থির হইল উপেন দিদিকে লইয়া সুবর্ণপুর যাইবে। সেখানে পাত্রী আশীর্ব্বাদ করিয়া দিন দেখাইয়া একেবারে দিন স্থির করিয়া তবে আসিবেন।

(৪)

দিদি ফিরিয়া আসিয়া গায়ত্রীর প্রশংসায় 'পঞ্চমুখ' হইলেন। বলিলেন, অমন মেয়ে হাজারে একটা মিলে না। রূপে গুণে সমান। আমায় নিজে হাতে রেঁধে খাইয়েছে। কি সুন্দর রান্না—যেন অমৃত! মেয়েটীকে আমার বড় ভাল লেগেছে। বাবা তো সাধুপুরুষ। ১০ই শ্রাবণ দিন স্থির করে এসেছি। মেয়েটী এমন সুলক্ষণা, দেখে মনে হচ্ছিল যে, এক-গা গয়না দিয়ে মেয়েটীকে সাজিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আসি। তা বিনয়ের জন্য হবার যো নেই। খালি দুটী দুল দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে এলাম।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ দুল্ দিদি? তোমার সেই হীরের দুল তো?

দিদি বলিলেন—তাহোক্। তার গায়ে তো দাম লেখা নেই। সে দুল দেখ্‌লে মণিকার ছাড়া আর কেউ বল্‌বে না যে তার দাম অত।

উপেন আশ্বাস দিয়া কহিল—তোর উপন্যাসের কোন ত্রুটী হবে না। অবস্থা একটু ক্ষুণ্ণ এ কথা আমি বলায়, ব্রাহ্মণ বল্লেন—তাহোক্ বাবা, সেই বিনয় ছেলেটীকে তো পাব। তাহলেই আমার যথেষ্ট। তিনি যতই গরীব হোন্, আমার কাছে তিনি রাজা। তিনি যে কেবল আমার উপর দয়া করে আর আমার গায়ত্রীকে ভালবেসে গ্রহণ কচ্ছেন, এ আমি বেশ বুঝেছি।

দিদি বলিলেন—আসবার সময় ব্রাহ্মণ বল্লেন—মা, তোমরা যেমন আমাকে আজ কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করলে, আমি আজ সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, গায়ত্রীকে নিয়ে কোন দিন কোন দুঃখ পেতে হবে না। উনি এমন অন্তরের সঙ্গে কথাটা বল্লেন যে, সে কথা শুনে চোখে জল এসেছিল।

উপেন বলিল—দিদি বলে এলেন, আপনি কোন রকম খরচের ব্যবস্থা করবেন না। কিছুতে যেন ধার করা না হয়। বরযাত্র আমরা পাঠাব না। শুধু উপেন, পুরুত ও নাপিত

আস্‌বে। বেশী আন্‌তে গেলে তো রেল-খরচ আছে। দরকার কি?

বিনয়ের কলিকাতায় আর তিন খানা বাড়ী ছিল—সে সব পাশাপাশি—ভাড়া খাটে। সমস্যা হইল বাড়ী লইয়া। কোন্ বাড়ীতে উঠিয়া যাওয়া হইবে। দুই বন্ধু সারা সকাল ঘুরিয়া সিমলায় একটা গলির মধ্যে একটা একতলা বাড়ী ভাড়া করিয়া আসিল। বাড়ীতে তিন খানি শয়ন-ঘর একখানি রান্নাঘর; কল ও পায়খানা।

বাড়ীখানা পুরানো। কয়দিনে বাড়ীখানাকে ঘষিয়া-মাজিয়া কোন গতিকে বাসোপযোগী করা হইল। বিবাহের দুদিন আগে সেই ভাড়াবাড়ীতে উঠিয়া যাওয়া হইল। পুরাতন ভৃত্য ও পাচক বাড়ীর জিম্মায় রহিল। তাহারা ক্ষুণ্ণ হইল যে বাবুর বিবাহের আনন্দ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। বিনয়ের দিদি তাহাদিগকে বুঝাইলেন—ও বাসায় উৎসবাদি কিছুই হইবে না। কিছুদিন পরেই এখানে আসা হইবে। বিবাহের যা আমোদ তখনই হইবে। কাজেই তাহাদের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

যথাসময়ে বিবাহের দিন আসিল। কথামত বরের সঙ্গে কেবল উপেন, পুরোহিত ও নাপিত গেল। ব্রাহ্মণ বিবাহের সময় ১ জোড়া স্বর্ণবলয় দিয়াছিলেন। বিনয় বিবাহ সভাতেই বলিয়াছিল, এ বালার যে অনেক দাম। আপনি আবার কেন খরচ কত্তে গেলেন?

ব্রাহ্মণের চোখে জল আসিল। বলিলেন—না বাবা, এতে আমার খরচ কত্তে হয়নি। এই বালাজোড়াটী ব্রাহ্মণীর। অনেক কষ্ট গিয়াছে, তবু বালাজোড়াটী হস্তান্তর করতে পারিনি। গায়ত্রীর বিবাহে আর কিছু না পারি, এ জোড়াটী দেবই—এই সংকল্প করেছিলাম।

পুরোহিত মন্ত্র পড়িলেন। শ্রদ্ধাভরে বরবধূ মন্ত্রোচ্চারণ করিল। বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল।

পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণ সজলচক্ষে কন্যাকে বিদায় দিলেন। গায়ত্রীর দরবিগলিত অশ্রুধারা মুছাইয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, মা, আমার চোখের জল দেখে তুমি কাতর হয়ো না। এ আমার আনন্দাশ্রু। তোমাকে যে আমি এমন সুপাত্রে দেব, এ আশা আমার ছিল না। তোমাকে সুপাত্রে অর্পণ করে যে আমি কত সুখী, তা একমুখে জানান যায় না, মা। জীবন পরীক্ষাস্থল। তুমি যেন এ পরীক্ষায় জয়লাভ করো—এই আশীর্ব্বাদ করি।

প্রভাতের সেই বিদায়ের দৃশ্যে বিনয়, উপেন, পুরোহিত কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না।

(৫)

বৌ?

কি বলছেন দিদি?

তুমি কেন আবার তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এলে? বিয়ের কনের কি রাঁধতে আছে?

তা হোক্ দিদি। আমি থাক্‌তে আপনাকে রাঁধতে নেই।

তুমি চলে গেলে কি হবে ভাই। শ্রাবণ যাবে, ভাদ্র যাবে, তবে তো আশ্বিন মাসে আস্‌বে। এ দুমাস তো আমাকেই চালাতে হবে।

বধূ নতমুখে রহিল। কিছু বলিল না, কিন্তু রান্না ছাড়িল না।

বিবাহের বধূ গায়ত্রী আসিয়া অবধি সব কাজ নিজে করিতেছে। রান্না করা, বাসন মাজা, ঘরঝাট দেওয়া—কোন কাজই সে দিদিকে করিতে দেয় নাই।

এক রাত্রে বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—গায়ত্রী, তোমার কষ্ট হচ্চে?

গায়ত্রী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

বিনয় বলিল—এই ছোট, একতালা বাড়ী, ঝি, চাকর নেই, সব কাজ নিজেকে কত্তে হ !

গায়ত্রী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—আমাদের কুঁড়ে ঘর তো দেখেছ; তার চেয়ে তো এ বাড়ী খারাপ নয়। আর ঝি, চাকর, বামুন সবই তো সেখানে আমি ছিলাম।

গায়ত্রীর কথার ধরণে বিনয় হাসিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, বাপের বাড়ীর চেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে কি একটু ভাল থাক্‌তে মেয়েমানুষের ইচ্ছে হয় না?

গায়ত্রী একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—আমি যে রকম আছি, এ রকম থাক্‌তে পেলেই সুখী হ'ব।

গায়ত্রীর একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, সত্যি করে ব'লু—সেখানকার কোন কিছুর জন্য তোমার মন কেমন করে না?

তা কি করে না? বাবার জন্য মাঝে মাঝে বড় মন কেমন

করে। বাড়ীতে তো কেউ নেই, বাবা একেবারে একলাটী। বলিতে বলিতে গায়ত্রীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। ফোঁটা কয়েক জল বিনয়ের হাতের উপর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িল।

এ কি, তুমি কাঁদছ গায়ত্রী? ছি! বলিয়া বিনয় সস্নেহে গায়ত্রীর চক্ষু মুছাইয়া দিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—আমি তো শ্বশুর মহাশয়কে সব লিখে দিয়েছি। পরশু আমি তোমাকে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব। তবে কেন কাঁদছ?

গায়ত্রী একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—আমি তো যাবার জন্য কাঁদছি না। বাবাকে তো একলা থাকতেই হবে—তাই জন্যে এক এক সময় বড় মন-কেমন করে।

বিনয় বলিল—এখন তোমার বাবা আমারও বাবা। তিনি যদি দয়া করে আমাদের এখানে থাকেন তাহ'লে তো বেশ হয়। আমি একটা কাজ তো করবই—তাতেই কজনের খুব চলে যাবে।

গায়ত্রী বলিল—বাবা বাড়ী ছেড়ে কোথাও তো যাবেন না। ২।১ জায়গায় সভাপণ্ডিতের কাজ বাবা পেয়েছিলেন; তাও তিনি যান্‌নি। কত কষ্ট সহ্য করে বাড়ীতেই আছেন।

বিনয় বলিল—তাও যদি না থাকেন তিনি, বৎসরের মধ্যে ২।৪ মাস আমরা গিয়ে সেখানে বাবার কাছে থাকব। মনে করবো আমাদের দুটো বাড়ী, এখানে একটা সেখানে একটা।

গায়ত্রী এইবার বড় উৎফুল্ল হইয়া বলিল—তাহ'লে বেশ হবে। বাবা তাহলে খুব খুসী হবেন।

পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবাকে আমি এ কথা তাহ'লে বল্‌ব তো?

বিনয় অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত বলিল—নিশ্চয় বল্‌বে। তুমি তো বল্‌বেই; আমিও তাঁকে বল্‌ব। আচ্ছা, আর তোমার কোন অসুবিধা হয় কি না সত্যি বল ত। বলিয়া বিনয় গায়ত্রীকে সাদরে আপনার বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখিল।

স্বামীর এই সস্নেহ কথাবার্ত্তা শুনিয়া গায়ত্রীর হৃদয় প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। স্বামীর কাছে সে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিনয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, বল আমায়, আর কি অসুবিধা হয়।

গায়ত্রী ধীরে ধীরে বলিল—সেখানে কুঁড়ে ঘরে হ'লেও চারিপাশে গাছপালা বাগান সব আছে কি মা—এখানে সে সব দেখতে পাওয়া যায় না। প্রথম প্রথম একটু হয় ত মনটা কেমন করবে। তারপরে ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে।

যদি কখন অবস্থা ফেরে, তোমার পছন্দমত বাগানশুদ্ধ একখানা বাড়ী কলকাতাতেই কিনবো। কি বল?

স্বামীর নির্ব্বন্ধে গায়ত্রী মুখে বলিল, আচ্ছা। মনে মনে বলিল, তোমার সঙ্গে যেখানেই আমি থাকি, সেই আমার স্বর্গ।

(৬)

আশ্বিন মাস। দেবীপক্ষ পড়িয়াছে। দেবীর বোধন বসিয়া গিয়াছে। সুবর্ণপুর গ্রামে মাত্র দুইখানি পূজা। একখানি রায় বাবুদের বাড়ী—তাঁহারা আধুনিক জমীদার। অপরখানি গায়ত্রীর পিতা হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। হরকান্তের বাড়ী প্রতিমা নাই। শুধু ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা হয়। পূজা করেন তিনি নিজে। গায়ত্রী একা সব গুছাইয়া দেয়—ফুল আনিয়া দেয়, ভোগ রাঁধে। পুরাতন একঘর গোয়ালা প্রজা, নাম সনাতন—বাহিরের জিনিষ-পত্র সেই যোগাড় করিয়া আনে। সারা বৎসরে হরকান্ত কষ্টে-সৃষ্টে যাহা কিছু সঞ্চয় করেন, এই পূজায় তাহা ব্যয় করেন। এ বৎসর পূজায় আর একটু আয়োজন বাড়াইতে হইয়াছে। জামাতা পত্র দিয়াছেন, দিদিকে লইয়া ষষ্ঠীর দিন পৌঁছিবেন। চার দিন সকলে থাকিবেন। বিজয়া দশমীর পর দিন চলিয়া যাইবেন—গায়ত্রীও সেই সঙ্গে যাইবে।

ক্রমে ষষ্ঠী আসিল। আজই বিনয়ের আসিবার কথা। ব্রাহ্মণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন। পূজার ব্যবস্থাদির মাঝে মাঝে তিনি গায়ত্রীকে বলিতেছেন—ওমা, এদের আসবার প্রায় সময় হ'ল। খাবার দাবার ব্যবস্থা সব ঠিক করে রেখ।

গায়ত্রী পিতার ব্যস্ততা দেখিয়া মৃদু হাসিয়া আশ্বাস দিতেছে—সব ঠিক আছে বাবা।

বেলা ১০টার মধ্যে বিনয় দিদিকে লইয়া পৌঁছিল।

হরকান্ত আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন—এস মা এস, এস বাবা এস। আজ আমার ঘর আলো হ'ল মা। তুমি যে এসেছ মা, এ আমার বড় ভাগ্য।

বিনয়ের দিদি বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন—আমিও তো আপনার মেয়ে, আমার আসা আর বেশী কথা কি।

হরকান্ত হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ মা, ঠিক বলেছ মা।

পূজার কয় দিন হরকান্ত গ্রামের কয়টি দরিদ্র ও একটী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন। ব্রাহ্মণটী তাঁহার বাল্যবন্ধু—সঙ্গীতজ্ঞ। শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতে তিনি যেন সিদ্ধ। তাঁহার কণ্ঠের 'মা মা' রূপ মধুর প্রাণপূর্ণ ঝঙ্কারে মনে হয়, যেন মা না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না।

বড় আনন্দে পূজার কয় দিন কাটিল।

বিজয়ার রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া হরকান্তকে কহিলেন—কাল তাহ'লে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেবেন। এবারটা বৌয়ের সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে। আপনি আবার ২।৪ দিন বাদে চলে আসবেন। আমাদের বাড়ীতে একটীবার আপনার পদধুলি দিতে হবে।

হরকান্ত প্রসন্নমুখে বলিলেন—তা বেশ মা। তুমি যখন নিজে এসে আমাকে এ কথা বলেছ—নিশ্চয়ই যাব। তুমি মা স্বয়ং লক্ষ্মী—তোমার অদৃষ্টে যে কি করে বৈধব্য ঘটল, তা ভেবে মা আমি আশ্চর্য্য হই। বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের নয়নযুগল আর্দ্র হইয়া আসিল।

শ্বশুরকে একবার একাকী পাইয়া বিনয় বলিল—আমার একটা বড় অন্যায় হয়ে গেছে—আপনার কাছে।

হরকান্ত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন বাবা। তুমি তো কোন দিন কোন অন্যায় করনি।

বিনয় বলিল—আপনার কাছে বলা হয়েছিল—আমাদের অবস্থা সচ্ছল নয়। চাকরি না করলে চলবে না, আর একতলা ভাড়াটে বাড়ী। এ কথাগুলো সব সত্যি নয়।

হরকান্ত হাসিয়া বলিলেন—সে আমি জানি বাবা। তুমি যে ভাগ্যবানের পুত্র, নিজেও ভাগ্যবান, এ কথা আমার অবিদিত নেই।

বিনয় বিস্মিত হইয়া বলিল—কি করে জানলেন যে আমি গরীব নই।

তোমাকে দেখেই বাবা, আমি জেনেছি, তুমি 'লক্ষ্মীমন্ত'; তোমার মতন এমন মুখাকৃতি, এমন অঙ্গ সৌষ্ঠব সাধারণ লোকের মধ্যে দেখা যায় না। তাই দেখে আমি চিনেছিলাম। তারপর মা লক্ষ্মী যেদিন দুটী দুল দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন, সেদিন আমার কোন সংশয় রইল না। ঐ হীরের দুল জোড়াটীর দাম যে অন্ততঃ হাজার টাকা হবে—অনেক দিন পরে ওসব জিনিস হাতে পড়লেও তা আমি বুঝেছিলাম। তবে তুমি গায়ত্রীকে পরীক্ষা করতে চাও আমি বুঝেছিলাম—সেজন্য তাকে এ কথা বলিনি। শুধু মনে মনে আশীর্ব্বাদ করেছিলাম—মা তুমি পরীক্ষায় যেন জয়লাভ করো।

বিনয় শ্বশুরের চরণ বন্দনা করিয়া কহিল—আপনার সঙ্গে আমি যেটুকু প্রতারণা করেছি—আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

হরকান্ত বলিলেন—আচ্ছা বাবা, বেশ বেশ। আমার শেষ জীবনে মার বড় দয়া ছিল, তাই তুমি এটুকু করেছিলে।

গায়ত্রী কিন্তু এ সকল কথা কিছুই জানিল না। এবার তাহার সঙ্গে বাবাও যাইবেন, এ সংবাদে সে বড়ই আনন্দ লাভ করিল।

পরদিন আহারাদির পর ঘর দুয়ার তালা বন্ধ করিয়া, সনাতনকে বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া হরকান্ত কন্যা-জামাতার সহিত যাত্রা করিলেন।

শিয়ালদহ ষ্টেসনে উপেন বিনয়ের ঘরের মোটর লইয়া উপস্থিত ছিল। মোটর সকলকে লইয়া বিনয়দের আপনার বাড়ীতে পৌঁছিল।

সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকা, বহু দাসদাসী—চতুর্দ্দিকে সুন্দর উদ্যান—এ সমস্ত দেখিয়া গায়ত্রী সত্যসত্যই প্রথমটা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল।

প্রথম সুযোগেই বিনয় বিস্মিতা গায়ত্রীকে বলিল—তুমি বাগানসুদ্ধ বাড়ী ভালবাস; সেইজন্য দেখ, এই বাড়ী ব্যবস্থা করেছি। এবার থেকে আমরা এই বাড়ীতেই থাকব। এ সবই আজ থেকে তোমার। আর আমি ত তোমার আছিই আগে থেকে। পরীক্ষায় তুমিই জিতেছ।

গায়ত্রীর ততক্ষণে বিস্ময় ঘুচিয়া গিয়াছিল। বুদ্ধিমতী সে, একটু একটু করিয়া সব বুঝিয়াছিল। আনন্দ বিকসিত মুখে সে স্বামীর চরণে প্রণাম করিতে গেল। বিনয় তাহাকে অর্দ্ধপথ হইতে উঠাইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

বাহির হইতে উপেন্দ্র হাঁকিয়া বলিল—ও বিনয়, তোর উপন্যাসের উপসংহার হ'ল এতক্ষণে!

রহস্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

ভগবান যেমন কৃপণ
আবার তিনি তেমনি দানী,
কি বিরাট ব্যাপার দেখে
মরিস কেঁদে রে সন্ধানী।
নিদাঘে কেবল ধূ ধূ,
ধূসরের ধুলোট শুধু,
বরষায় সাজান ধরা,
শ্যামলিমার ভাসান আনি।

২

শরতে কমল বনে
মহোৎসবের ছড়াছড়ি,
সেফালি যুথী বেলীর
লতায় পাতায় জড়াজড়ি।
কাননে যে ফুল ফোটে,
ধূলাতে যে ফুল লোটে,
শীতে তার আধেক পেলে
ধরা যে লয় আশীষ মানি।

৩

ময়ূরের গায়েই দিলেন
রঙের তুলি উজাড় করে।
ধূসর আর কেবল ভুসো
পাপিয়া আর পিকের তরে।
আকাশে পট ঝুলানো,
কেবলি নীল বুলানো,
ফড়িঙের ফিন্ ফিনে গায়
নানান্ রঙের কি আমদানী।

৪

কি সুধার পরিবেশন
ক্ষুদ্র শ্যামার কণ্ঠে মরি,
ডিম্বে ওই প্রজাপতির
পান্না মণির কি মাধুরী।
বাঘিনীর বক্ষে আহা
কি নিবিড় সুতের মায়া,
চকোরের চক্ষে আহা
পাতলে চাঁদের কে রাজধানী।

৫

খুঁজিয়া ধরার ভিতর
কোথাও কি আর মেলে নি দেশ!
মৃগের ওই নাভির ভিতর
এই সুরভির উপনিবেশ!
দশনে অহির দিলে
হলাহল বেবাক ঢেলে,
মধুর ভার মৌমাছিকে
জুটলো না কি অপর প্রাণী!

৬

ভাগ্যে হায় কেউ বা দেখে
সে বিশ্বরূপ ভুবন-জোড়া
কেহ বা যুগল রূপের
মাধুরীতেই আপনহারা।
কেউ পেলে সেবাধিকার,
কেউ কৃপাদৃষ্টি বা তাঁর
যেচে হায় জনম ধরে
পেলাম না তাঁর পা দুখানি।

সিংহল দ্বীপ

কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

মান্দ্রাজ হইতে যখন দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য-শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন দেখিবার জন্য রওনা হই, তখন লঙ্কা দ্বীপে যাইব কি না স্থির করিতে পারি নাই। লঙ্কা যাওয়ার পক্ষে অনেক অন্তরায় শুনিয়া ছিলাম। সেখানে যাইতে হইলে প্রথমেই সিংহল গভর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ডাক্তারের নিকট হইতে অনুমতি পত্র লইতে হইবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ২৪ ঘণ্টা আটকাইতে ও মালপত্র বাতিল বা শোধন করিতে পারেন। তার পর জাহাজের কাষ্টম কর্ম্মচারীরা সুটকেস ও অন্যান্য মোট খুলিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন; সে এক হাঙ্গাম। আর জাহাজে উঠিলে সামুদ্রিক পীড়া বা Sea Sickness তো আছেই। এইরূপ নানা ঝঞ্চাট। যাহাই হউক, অপ্রত্যাশিত ভাবে পথেই ইহার একটা মীমাংসা হইয়া গেল। সিংহল যাওয়ার সঙ্কল্প স্থির হইল। কাঞ্চি দেখিয়া ২৯শে ডিসেম্বর চিংলিপুট আসিলাম। ডাক বাঙ্গলায় রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে ত্রিকুন কুনারম্‌ ও মহাবলীপুরম্‌ যাইবার জন্য রওনা হইলাম। ত্রিকুন কুনারমের শৈল-শৃঙ্গে সুবিখ্যাত পক্ষীতীর্থ। উক্ত দেবস্থানের ট্রাষ্টী ও স্থানীয় ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কুমার স্বামী মুদলিয়ারের (M. M. Kumarasami Mudaliyar) বাংলায় জনৈক সিংহলবাসী বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তাঁহার নাম মনিয়াগার মুত্তুকুমারু (Maniagar Mathucumaru) তিনি জাফ্‌না সহরের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী—আমাদের দেশের ডেপুটী কালেকটারের মত একটী পদে অধিষ্ঠিত। তিনি মান্দ্রাজে থিওজফিক্যাল
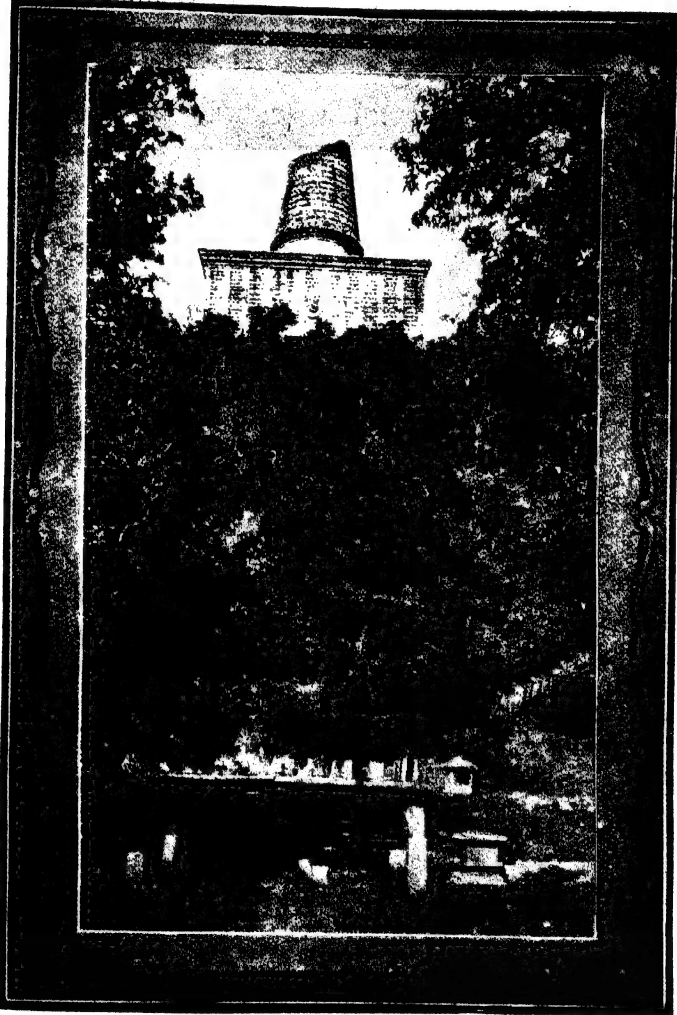
অভয়গিরি দাগোবা—অনুরাধাপুর

কন্‌ভেনসনে আসিয়াছিলেন; প্রত্যাগমন কালে পক্ষীতীর্থ দর্শনে আসিয়াছেন। আরও কয়েক স্থান ঘুরিয়া জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সিংহলে ফিরিবেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। আর কনিষ্ঠা মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা কুমার স্বামীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমার স্বামী বড় সাদাসিধে লোক; প্রাণ খুলিয়া বহু দিনের পরিচিতের ন্যায় আমাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন এবং আতিথ্য-সৎকার না করিয়াও ছাড়িয়া দিলেন না। অধিকন্তু আমাকে ত্রিকুনাকুনারমের ছবির এলবাম্ উপহার দিলেন। মহাবলী-পুরমে যাইবার সময় শ্রীযুক্ত মুত্তুকুমারু সন্তানগণ সহ আমাদের সহযাত্রী হইলেন। আমরা একখানি "বাস" রিজার্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে যথেষ্ট স্থান ছিল। কোনও পক্ষেরই অসুবিধা হইল না। মুত্তুকুমারুও বড় অমায়িক লোক। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় পথে কয়েক ঘণ্টা বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল। মহাবলীপুরম দ্বীপে সমুদ্র-তীরে একটী বহু দিনের পুরাতন প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির আছে। তাহার কতকাংশ সমুদ্র-কুক্ষিগত হইয়াছে; এখনও সমুদ্র-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে মন্দিরগাত্র আলোড়িত হইতেছে। তাহার গুরুগম্ভীর শব্দ নির্জ্জন দ্বীপটীকে সদা সন্ত্রস্ত করিতেছে। এই মনোরম স্থানের সহিত স্মৃতি জড়িত রাখিবার জন্য মিঃ মুত্তুকমারু পুত্র কন্যাগণকে মন্দির-পার্শ্বে বসাইয়া ফটো গ্রহণ করিলেন। পরিতাপের বিষয়, মিঃ মুত্তুকুমারুর পত্রে পরে অবগত হইলাম, সে প্লেটখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সহিত সিংহল যাওয়ার কথা হইল। তিনি আনন্দের সহিত বলিলেন, পথে আপনাদের যাহাতে কোনওরূপ অসুবিধা না হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। মান্দাপানের ডাক্তার ও জাহাজের কাষ্টম কর্ম্মচারী আমার অনুগত লোক; তাহাদের আমি পত্র দ্বারা জানাইয়া রাখিব।

তার পর কয়েক দিন আমরা তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, শ্রীরঙ্গম্, মাদুরা, সেতুবন্ধ, রামেশ্বরম্ প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইলাম। রামেশ্বরম্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মান্দাপান ক্যাম্পে ডাক্তারের সহিত দেখা করিলাম। দেখা হইবামাত্র তিনি আপনা হইতে বলিলেন যে, তিনি মিঃ মুত্তুকুমারুর পত্র পাইয়াছেন। আমরা কয়জন আছি জিজ্ঞাসা করিয়া তৎক্ষণাৎ p rmit বা অনুমতি-পত্র লিখিলেন—আমাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটী প্রশ্নও করিলেন না—মালপত্রের কোনও উল্লেখই হইল না। সেগুলি আমাদের সঙ্গেও ছিল না—মান্দাপান ষ্টেসনের ওয়েটিং রুমে রাখা হইয়াছিল; সহযাত্রীরা সেইখানে নামিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে সহযাত্রীদের মধ্যে কেবল রামগোপালবাবু গিয়াছিলেন। মান্দাপান ক্যাম্প ষ্টেসন মান্দাপান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ক্যাম্প হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ট্রেণ পাওয়া গেল না। আমরা রেল লাইন ধরিয়া হাঁটিয়া গেলাম। প্রখর সূর্য্যতাপে ক্লিষ্ট হইলেও মন তখন উৎসাহে ভরপুর; সে জন্য কোনও কষ্টই অনুভূত হইল না। ষ্টেসনের বাথরুমে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সারিয়া লইলাম। কেহ কেহ সমুদ্র-স্নানেও গেলেন। ষ্টেসনের অদূরে এক তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইয়া আহার করা হইল। ধনুষ্কোটী যাইবার ট্রেণ আসিতে বিলম্ব ছিল। আমরা ওয়েটিং রুমে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইলাম। মান্দ্রাজ হইতে দক্ষিণ-ভারত দেখিবার জন্য আমরা নয়জন রওনা হইয়াছিলাম। তন্মধ্যে রাজকুমার বাবু রামেশ্বরম্ হইতে বরাবর কলিকাতায় ফিরিলেন। তিনি বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপকতা করেন। কলেজ খুলিয়া গিয়াছে। কাজেই, সিংহল পর্য্যন্ত যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। সুতরাং সিংহল-যাত্রী রহিলাম আমরা আটজন। তন্মধ্যে দুইজন ছিলেন চিকিৎসক—ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম-বি হোমিওপ্যাথ ও ডাক্তার তিনকড়ি মজুমদার এলোপ্যাথ। দুইজন উকীল—শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সান্ন্যাল—কলিকাতা হাইকোর্টের, ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার—রাজসাহীর। তিনি বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহকারী সম্পাদকের কার্য্যেও ব্রতী আছেন। শ্রীযুক্ত রামগোপাল চৌধুরী ইন্সিওরেন্স এজেণ্ট ও শেয়ার ব্রোকারের কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী রাজসাহী কাশিমপুরের ও শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী রঙ্গপুর টেপার ভূস্বামী। নলিনীবাবু হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর, ও সেনা বিভাগের লেফ্‌টেনাণ্ট উপাধিধারী তরুণ যুবক। তাঁহাকেই আমাদের দলের কাপ্তেন করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তাহার পরিচালনাধীনে থাকিতে সকলে রাজী হইতেন না—মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হই

অধ্যাপক রাজকুমার বাবুর সহিত প্রায়ই তাঁহার ঘোর বাক্‌-যুদ্ধ হইত ; কেহই হার মানিতে সম্মত হইতেন না। তাঁহারা কলেজে সহপাঠী ছিলেন ; সেজন্য আবশ্যক মত যুদ্ধ স্থগিত রাখা অসম্ভব হইত না। দলের মধ্যে আমি ছিলাম বয়সে

ঈশ্বরমুনী দাগোবা—অনুরাধাপুর

কেলনা গঙ্গা—কলম্বো
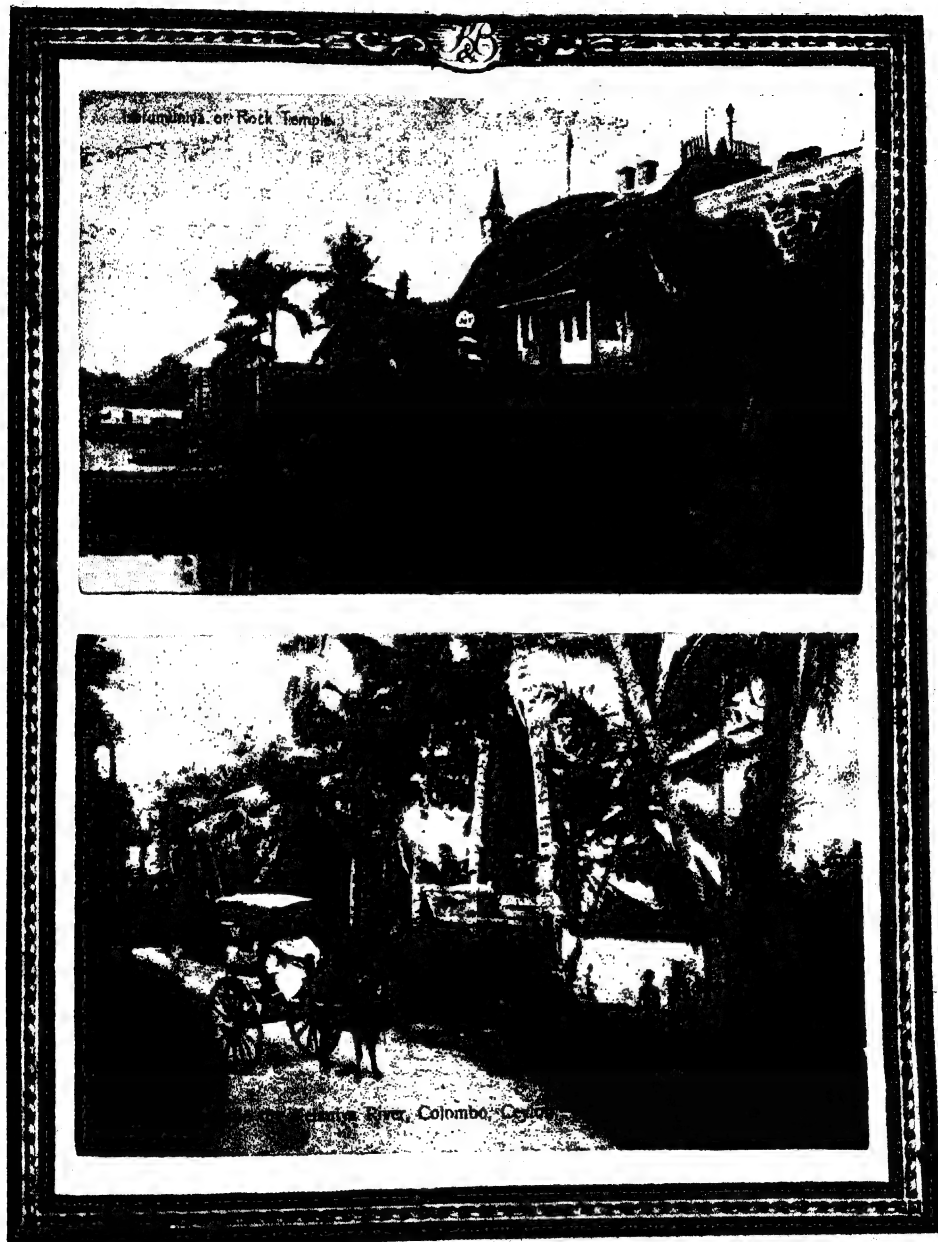
সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; কিন্তু তা হইলেও তরুণদের উদ্যম, উৎসাহ ও বিমল আনন্দ দেখিয়া মন পুলকে পূর্ণ হইত—তাঁহাদের সাহচর্য্যে ভ্রমণের কষ্ট কষ্ট বলিয়াই মনে হইত না। মধ্যে মধ্যে দুরারোহ পাহাড়ে উঠিতে হইত। তাঁহারা সঙ্গে থাকায় আমি সেগুলিতে উঠিতে সাহসী হইয়াছিলাম; নতুবা হয় তো উঠিবার উদ্যমও করিতাম না। একে দুই হাঁটুতে বাত; তাহার উপর একদিনে ৩।৪টী উচ্চ পাহাড়ে উঠা-নামা আমার বয়স ও স্থূল দেহের পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

মান্দাপান হইতে অপরাহ্নে ট্রেনে চড়িয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ধনুষ্কোটী পীয়ারে পৌঁছিলাম। মান্দাপানে মেঘের সঞ্চার দেখিয়াছিলাম; পথেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে জাহাজে উঠিলাম। ক্রমে জাহাজ ছাড়িল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাস বহিতেছিল। সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ আথাল পাথাল বাড়িয়া চলিল; জাহাজ বিষম হেলিতে দুলিতে লাগিল। দাঁড়াইয়া থাকা বা পা ঠিক রাখা অসম্ভব হইল। আরোহীগণ অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। প্রায় সকলেরই সামুদ্রিক পীড়া উপস্থিত হইল। সাহেব বিবি, যাঁহারা প্রায়ই সমুদ্রে যাতায়াতে অভ্যস্ত, তাঁহারাও চক্ষু বুজিয়া আরাম চেয়ারে গা ঢালিয়া দিলেন। আমার সঙ্গীদের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া পড়িল। তাঁহারা কেহ মাথা তুলিতে পারিলেন না। কেহ আরাম কেদারায়, কেহ বেঞ্চে, কেহ বা শয্যার গাদায় ঢলিয়া পড়িলেন। আমি প্রথম হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলাম—সমুদ্র-পীড়াকে আমার নিকট ঘেঁষিতে দিব না। কার্য্যেও তাই হইল—স্বচ্ছন্দে প্রকৃতির অনন্ত লীলা উপভোগ করিতে লাগিলাম। উপরে মেঘাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশ; নিম্নে অনন্ত সমুদ্রের বিকট হুঙ্কারের সহিত বীচি-বিক্ষোভ, সদা আলোড়ন-বিলোড়ন, আছাড়-পাছাড় দেখিতে দেখিতে মন এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইয়া সেই অনন্ত লীলাময় বিশ্বস্রষ্টার দিকে ধাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টা অতীত হইল। তখন তরুণ বন্ধুদের ধ্যান ভঙ্গের প্রয়াস পাইলাম। কাহারও কাহারও ভাঙ্গিল; কিন্তু কেহই মাথা তুলিতে পারিলেন না। প্রত্যাগমন কালেও ঠিক এইরূপই হইয়াছিল। ধ্যানভঙ্গে একজন বলিলেন, যদি আপনি জাহাজের উপর পা ঠিক রাখিয়া জাহাজের উপর তলা ও নীচে তলা ঘুরিয়া আসিতে পারেন, তবেই আপনার বাহাদুরী বুঝিব। আমি তাহাতে পিছপাও হইলাম না। সতর্কতার সহিত পা স্থির রাখিয়া তাঁহাদের কথা মত ঘুরিয়া আসিলাম। সকলে বিস্মিত হইলেন। বলা বাহুল্য, মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি সফলতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলাম।

জাহাজে উঠিয়াই আমাদের এ দেশের নোট পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইয়াছিল। যাইবার সময় কোনও বাটা লাগে না; কিন্তু ফিরিবার কালে টাকায় দুই পয়সা হিসাবে বাটা কাটিয়া লইয়া থাকে। আমরা এ দেশী নোটের পরিবর্ত্তে সিংহলদেশে প্রচলিত এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নোট এবং খুচরা খরচের জন্য ৫০ সেণ্ট, ২৫ সেণ্ট, ১০ সেণ্ট, ৫ সেণ্ট ও এক সেণ্ট মুদ্রা সংগ্রহ করিলাম। সেখানকার এক শত সেণ্টে আমাদের এক টাকা, ৫০ সেণ্টে আট আনা, ২৫ সেণ্টে চারি আনা। তার পর দশ সেণ্ট, পাঁচ সেণ্ট, এক সেণ্টের সহিত আমাদের চলিত মুদ্রার হিসাবের কিছু গোল হয়; আদান-প্রদানেও বাধ-বাধ ঠেকে। জাহাজ ক্রমে সিংহলের নিকটবর্ত্তী হইল; দূরে আলো দেখা যাইতে লাগিল। এই ত্রিশ মাইল সমুদ্র পার হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। জাহাজ তালমেনার পীয়ারে লাগিবামাত্র কাষ্টম কর্ম্মচারীগণ আসিয়া আরোহীদের মালপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—সাহেব বিবিদের মালও বাদ পড়িল না। আমাদের সিংহলী বন্ধু মিঃ মুত্তুকুমার এখানেও পূর্ব্বে পত্র দ্বারা জানাইয়া রাখিয়াছিলেন; সেজন্য আমাদের বেগ পাইতে হইল না—মাল প্রদর্শন মাত্র পাশ হইয়া গেল—কোনওরূপ পরীক্ষা করা হইল না। জাহাজ হইতে নামিবার সময় কুলী পাইতে কিছু বিলম্ব হইল। ট্রেনের নিকট আসিয়া দেখি, বিষম ভীড়। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল। কাষ্টম কর্ম্মচারীর অনুরোধে গার্ড সাহেব আমাদিগকে প্রথম শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। আমরা রিজার্ভ কামরায় মোটগুলি গুছাইয়া রাখিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলাম। রাত্রি ২টার সময় ট্রেন অনুরাধাপুর ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলে আমরা নামিয়া পড়িলাম, এবং বাকী রজনী ওয়েটিং রুমে অতিবাহিত করিলাম।

অনুরাধাপুরের কথা লিখিবার পূর্ব্বে সিংহল দ্বীপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি। ভারতের সহিত নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলেও আমরা অনেকে সিংহল সম্বন্ধে অজ্ঞ। সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই এক মাস মধ্যে আমার সহিত বহু লোকের দেখা হইয়াছে;

তাঁহাদের অধিকাংশ সিংহল সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। সকলেই জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যাবাসীগণের মনে লঙ্কাদ্বীপের নাম এখনও ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস বিভীষণ অমরত্ব লাভ করিয়া রাক্ষসের রাজা হইয়া লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছেন —মানুষ পাইলে গিলিয়া খান। আমার উড়িয়া পাচক ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপে—লেখাপড়া জানে; বহু শ্লোক তাহার কণ্ঠস্থ; রামায়ণ মহাভারত সর্ব্বদা পাঠ করিয়া থাকে। সে পর কতকগুলি ছবি মনের মধ্যে আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম—লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, মায়ামৃগ, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, জটায়ুর বাধা প্রদান, অশোকবনে চেড়ী কর্ত্তৃক সীতাদেবীর নির্য্যাতন। সেতুবন্ধন, হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কাদাহন, রাম রাবণে মহাযুদ্ধ, সীতা উদ্ধার ইত্যাদির চিত্র লঙ্কার কথা বলিলে এখনও হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ভূগোল পাঠ-কালে মানচিত্র দেখিয়া সিলোন বা সিংহলের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। মানচিত্রে ভারত ও সিলোনের একরকম
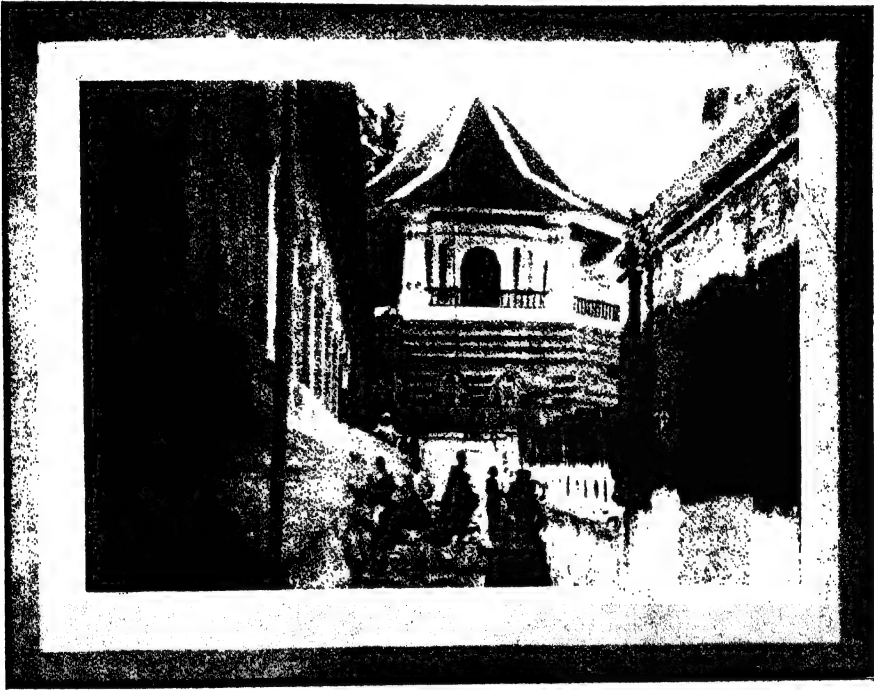
বপাং দন্ত মন্দির

আমার লঙ্কা গমনের সংবাদ শুনিয়া প্রথমে বিশ্বাস করিতে চাহে নাই; তার পর তাহার মনিবের রাক্ষসের উদরসাৎ হওয়া অবধারিত জানিয়া শোকপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আমার উড়িয়া মালিরাও সশরীরে আমাকে রাক্ষসের দেশ হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অতিরিক্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতে রামায়ণ শুনিয়া শুনিয়া কল্পনারাজ্যে আমরা সোনার লঙ্কাপুরীর ও তৎকালীন ঘটনাবলীর পর লাল রঙ্ দেখিয়া মনে হইত সিলোন ভারতেরই একাংশ—মানর উপসাগর তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। তাহার পর ভূগোল ও ইতিহাস পড়িতে পড়িতে সিলোন সম্বন্ধে আরও সামান্য কিছু জ্ঞান হইয়াছিল। ২৭ বৎসর পূর্ব্বে বারাণসীতে অবস্থান কালে সিংহলী বৌদ্ধ সুবিখ্যাত ধর্ম্মপালের সহিত পরিচয় হয়, তাঁহার নিকট সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবের আভাস পাই। এই ধর্ম্মপালই বৌদ্ধগয়া হিন্দু মোহন্তের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন। সিংহল যাইবার পূর্ব্বে সিংহলের বৌদ্ধ কীর্ত্তির বিরাটত্ব সম্বন্ধে একরূপ অজ্ঞই ছিলাম। সিংহল হইতে ফিরিয়া আসার পর অনেকেরই মুখে একরূপ প্রশ্ন—রাবণের রাজধানী দেখিয়াছি কি না এবং রাক্ষস-বংশধরগণ দেখিতে কিরূপ? পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীর সহিত ইতিমধ্যে দেখা হয়। তিনি বলেন, সিংহল লঙ্কা দ্বীপ নহে। তিনি প্রাচীন গ্রন্থ ঘাঁটিয়া জানিয়াছেন, উজ্জয়িনী নগরী হইতে দক্ষিণাভিমুখে একটী সরল রেখা সমুদ্রের উপর পর্য্যন্ত কিছুদূর টানিলে যে স্থানে পৌঁছায়, সেইখানে লঙ্কা দ্বীপ। এখন তাহা লুপ্ত হইয়াছে। তাহা বর্ত্তমান সিংহলের পাশ্চম-দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সিংহলে রাবণ রাজার রাজধানীর কোনও নিদর্শন দেখিতে পাই নাই। তবে ত্রিঙ্কোমালীর বনমধ্যে রাবণের রাজবাটী এবং নিউরেলিয়ার পথে একটী জঙ্গল অশোকবন ছিল বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—তাহা অনুমানমাত্র বলিয়াই মনে হয়। সিংহলীদের পুরাবৃত্তে প্রকাশ, সেখানে রাবণ রাজার সপ্ত-প্রাচীর বেষ্টিত রাজধানী ছিল; সমৃদ্ধ শোভমান রাজপ্রাসাদ অমরাপুরীতুল্য স্বর্ণ ও রত্নাদি মণ্ডিত ছিল। রাবণ ও তাহার সহচরগণ সদা কুকর্ম্মনিরত পাপাচারী হওয়ায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এক দিন সহসা সাগর হইতে উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া রাজধানী ভাসাইয়া লইয়া যায়। এখন সে সব সমুদ্র গর্ভে নিহিত আছে। ইহাই নাকি দ্বিতীয় জলপ্লাবন। ইহার পূর্ব্বে আর একবার মহাপ্রলয় হইয়াছিল। আদম গিরিশৃঙ্গে মর্ত্তের নন্দনকানন (ইডেন উদ্যান) ছিল। আদিম মানব মানবী সেখানে বাস করিতেন। পাপানুষ্ঠানের জন্য তাঁহারা সেখান হইতে বিতাড়িত হন। তাহার পরে খৃষ্ট জন্মের ২৩৮৭ বৎসর পূর্ব্বে সিংহলে মহাপ্রলয় হয়। সেই সময় সমগ্র দ্বীপটী ভীষণ বন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল। পণ্ডিতপ্রবর আশার (Usher) সাহেব বহু গবেষণা করিয়া বাইবেল লিখিত মহাপ্লাবনের (deluge) যে কাল-নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সহিত সিংহল মহাপ্লাবনের কেবল ৪০ বৎসরের পার্থক্য দেখা যাইতেছে। আদম শৃঙ্গের উপর একটী পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই পদচিহ্ন বহন করায় আদমশৃঙ্গ প্রাচ্যের এক বড় তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছে। এই পদচিহ্ন যে কাহার, তাহা কেহ জানে না। নানা জনের নানা মত। কেহ বলেন, ইহা আদি মানব আদমের, কেহ বলেন বুদ্ধদেবের, কেহ দেবাদিদেব মহাদেবের। আবার রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতদ্বৈধ। একদল বলেন, সাধু সেণ্ট টমাসের, আর একদল বলেন, এথিপিও রাণী খন্দেশের খোজার পদচিহ্ন। পদচিহ্ন যাহারই হউক, এই তীর্থক্ষেত্র এখন বৌদ্ধ অধিকারভুক্ত; নিত্যনৈমিত্তিক পূজার্চ্চনা তাঁহাদেরই হাতে।

সিংহলের আদিম অধিবাসী যাহারা ছিল, তাঁহারা রাক্ষস কি না, সিংহলী পুরাবৃত্তে তাহার উল্লেখ নাই। আমাদের দেশের সাঁওতাল, কোল, ভীলদের মত সভ্যসমাজ-বর্জ্জিত এক কৃষ্ণকায় বন্য জাতি সে দেশে বাস করিত। তাহারা বেঙ্গ নামে অভিহিত হইত। তাহারা তীর ধনুক লইয়া বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইত। বৃক্ষকোটর, পর্ব্বতগুহা বা পর্ণকুটীর তাহাদের আবাস স্থান ছিল। এখনও তাহাদের বংশধরগণ বিদ্যমান। সিংহলে জঙ্গলপথে ভ্রমণ কালে মধ্যে মধ্যে রুক্ষকেশ, অর্দ্ধনগ্ন মানবকে ভীষণ জঙ্গলের মধ্য হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছি। তীর ধনুক তাহাদের মধ্যে কাহারও হাতে ছিল না। কাহারও কাহারও হাতে বন্দুক দেখিয়াছি। ঐরূপ কুৎসিত মানবীও মধ্যে মধ্যে নজরে পড়িয়াছে। ইহারা অশোক বনের চেড়ীবংশ-সম্ভূতা কি না এবং মানবগণ রাক্ষস বংশ হইতে উদ্ভূত কি না, সে তত্ত্ব নৃতত্ত্ববিদেরা দিতে পারিবেন —তাহা বর্ত্তমান লেখকের সাধ্যায়ত্ত নহে।

সিংহল দ্বীপ দৈর্ঘ্যে ২৭৬ মাইল, প্রস্থে ১০৩ মাইল—মোটামুটি ২৫০০০বর্গ মাইল মধ্যে আবদ্ধ। অধিবাসীর সংখ্যা ২৫ লক্ষ। তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ১,৫২০,৫৭৫; হিন্দু ৪৬৫,৯৪৪; মুসলমান ১৭১,৫৪২ ও খৃষ্টান ২৪০,০৪২; তন্মধ্যে রোম্যান ক্যাথলিক ১৮৪,০০০ ও প্রোটেষ্টাণ্ট ৫৪,০০০। জাতি হিসাবে অধিবাসীদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সিংহলী, এক-পঞ্চমাংশ তামিল, এক পঞ্চদশ অংশ আরববংশ-সম্ভূত। যুরোপীয়ের সংখ্যা ছয় সহস্র, যুরোপীয় বর্ণসঙ্কর জাতি পঞ্চদশ সহস্র। শতকরা ৭০ জনের ভাষা সিংহলী, যুরোপীয় ভিন্ন বাকী ৩০ জনের ভাষা তামিল। সিংহলী পালিভাষা হইতে উদ্ভূত। তামিল দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ী ভাষা। বঙ্গজাতির ভাষা দুর্ব্বোধ্য। "ত্রিপিটক" বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। খৃষ্ট জন্মের ৩০৯ শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত। বুদ্ধঘোষের ভাষ্য খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত। "দ্বীপবংশ" বহুকালের রচিত পুরাবৃত্ত। "মহাবংশ" ৪৬০ খৃষ্টাব্দে রাজকুলোদ্ভব বৌদ্ধ পুরোহিত মহানাম কর্ত্তৃক পালি-

ভাষায় রচিত হয়। খৃষ্ট জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়সিংহ কর্তৃক সিংহল বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে আটশত বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। ইতিহাস হিসাবে গ্রন্থখানি অমূল্য। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে টার্ন্যুর সাহেব (George Turnour) মহাবংশের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেই অনুবাদ অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তীকালে সিংহলের যাহা কিছু ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক গ্রন্থে এই দ্বীপ তাপ্রবন নামে, এবং পরবর্ত্তীকালে সিরণদিব, সিরিণদিব এবং জীলোন নামেও অভিহিত হইয়াছে। জীলোন হইতেই বোধ হয় সিলোনের উৎপত্তি। রামায়ণের যুগে এ দ্বীপটী লঙ্কাদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। তবে সিংহল নাম কবে হইতে হইল? মহাবংশে প্রকাশ, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোনও প্রদেশ হইতে বঙ্গরাজবংশ সম্ভূত বিজয়সিংহ দ্বীপটী অধিকার করিয়া সেখানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে উপনিবেশটী দ্বীপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিজয় সিংহের পদবী "সিংহ" হইতে দ্বীপটীর সিংহল নামকরণ হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বিজয় সিংহ তত্রস্থ রাজকুমারী কুবেণীর পাণিগ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় জনৈক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তিনি ৩৯ বৎসর সিংহলে রাজত্ব করেন। তাঁহার দেহাবসানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুযশ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও ভারতবর্ষ হইতে রাণী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রাণীর সমভিব্যাহারে তাঁহার ছয় ভ্রাতা গিয়া সিংহলে বাস করেন। পাণ্ডুযশ তাঁহাদিগকে নূতন নূতন নগর পত্তন করিয়া বাস করিবার অনুমতি দেন। তদনুসারে তাঁহারা আপন আপন নামে ছয়টী নগর স্থাপন করেন। তন্মধ্যে রাজশ্যালক বিচিত্রের নামে বিচিত্রপুর, রত্নের নামে রতনপুর, অনুরাধার নামে অনুরাধাপুর উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তী কালে খৃষ্ট জন্মের ৩৭০ বৎসর পূর্ব্বে অনুরাধাপুরেই সিংহলের রাজধানী স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় এক হাজার তিনশত বৎসর ধরিয়া এইখানেই রাজধানী ছিল। পাণ্ডুযশের পুত্র পাণ্ডুকাব্য খৃষ্ট জন্মের ৪৩৭ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অনুরাধাপুরে বহু রাজসৌধ নির্ম্মাণ করেন। প্রজাহিতকল্পে তিনি সদা সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি নগরের আবর্জ্জনা বিদূরণের অতি সুন্দর ব্যবস্থা করেন।

অর্দ্ধযন্ত্রাকৃতি প্রস্তর ফলক—অনুরাধাপুর

রাজপথ সম্মার্জ্জন ও পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার জন্য বহুলোক নিযুক্ত ছিল। নগরের পুরীষ বহন জন্য ২০০ জন, শববহন জন্য ১৫০ জন, দাহ বা সমাহিতকারী ১৭০ জন এবং নাগরিকগণের রক্ষার জন্য বহু প্রহরী দিবারাত্রি প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত। আদিম নিবাসী বেঙ্গগণকে তিনি সহরের উপকণ্ঠে বাস করাইয়াছিলেন। ২৪০০ বৎসর গত হইল, মিউনিসিপ্যালিটী সৃষ্টির বহু কাল পূর্ব্বে নগর পরিচ্ছন্ন রাখার কিরূপ সুব্যবস্থা ছিল দেখাইবার জন্য উপরি উক্ত বিবরণ "মহাবংশ" হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম। সিংহল বাঙ্গালীর উপনিবেশ—সেই অতীত যুগের সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া, আমাদের পরস্পরের আদর্শ ও লক্ষ্যের একতার উল্লেখ করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দেন। সিংহল দেশীয় রাজ-পরিচ্ছদে ভূষিত না থাকিলে তাঁহাকে দেখিলে বাঙ্গালী বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। সিংহলের নদীগুলির নামের সহিত বাঙ্গলার গঙ্গার নাম সংযুক্ত আছে; যথা মহাবলী গঙ্গা, কেলনী গঙ্গা, কুলু গঙ্গা, বালু গঙ্গা প্রভৃতি। শেষোক্ত তিনটী নদী আদম শৃঙ্গের তলদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কেলনী গঙ্গা কলম্বো সহরের দক্ষিণে সমুদ্রে মিশিয়াছে। কুলু ও বালু গঙ্গা

জেথবনরাম দাগোবা—অনুরাধাপুর
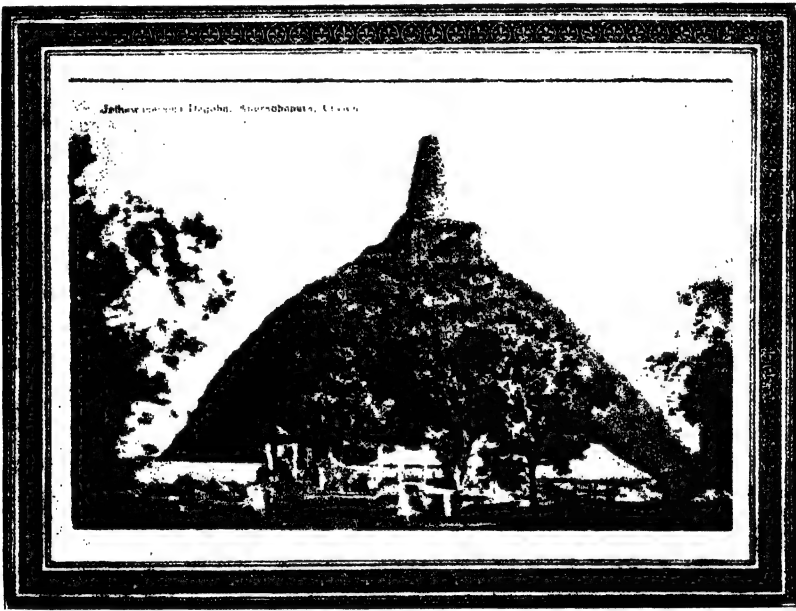
বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকলাপে পরিপূর্ণ—বাঙ্গালীর গৌরবপূর্ণ। সিংহলীরা দেখিতে বাঙ্গালীর মত—তাহারা এখনও বিজয়-সিংহের বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। কান্দী সহরে একটী যুবকের সহিত পরিচয় হয়। সে আইন পড়িতেছে। সে হুবহু বাঙ্গালীর মত দেখিতে। কোন্ স্মরণাতীত যুগে বাঙ্গলার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিল, তাহাই তাহার গর্ব্বের জিনিষ হইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, তাহার খুল্লতাত আমারই মত দেখিতে। কান্দীর রাজবংশধরের সহিত যখন পরিচয় হয়, তিনিও বার মাস জলে পূর্ণ থাকে, সমুদ্র তীর হইতে ৭০ মাইল পর্য্যন্ত বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। মহাবলী গঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়—পিদুরুতল পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে উদ্গত হইয়া কান্দী সহরের উত্তর পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার উপর কয়েকটী বৃহৎ সেতু আছে। তন্মধ্যে পেরদনিয়ার সেতুটি দেখিতে অতি সুন্দর; মার্কিন দেশের মত সাটীন কাষ্ঠে নির্ম্মিত। দ্বীপটী নদ, নদী, হ্রদ ও বৃহৎ জলাশয়ে পূর্ণ। কৃত্রিম হ্রদ অসংখ্য—স্বাভাবিক হ্রদের মধ্যে কলম্বো, বলগদা ও নিগম্ব উল্লেখযোগ্য। বহু পুরাকাল হইতে কৃষি

সম্পদ সমৃদ্ধ করিবার জন্য এই সকল হ্রদ ও খাল খনন করা হইয়াছিল। সেগুলি সংরক্ষণের অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। যিনি যখনই রাজা হইতেন, জলসেচনের সুব্যবস্থা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তাই সিংহল এককালে ধনধান্যপূর্ণ স্বর্ণপুরী নামে অভিহিত ছিল। সিংহলে তিনটী বন্দর আছে, পূর্ব্ব উপকূলে ত্রিঙ্কোমালী, দক্ষিণে গল, পশ্চিমে কলম্বো। ত্রিঙ্কোমালী স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে জগতে অতুলনীয়। এটী যেমন বিস্তীর্ণ তেমনি নিরাপদ। কিন্তু তা হইলে কি হয়? ব্যবসা বাণিজ্যের ও কৃষিলব্ধ দ্রব্যের কেন্দ্র যে এখান হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে বনভূমি; অধিবাসীরাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অই বিপদসঙ্কুল শৈলপূর্ণ "গল" বন্দরের ইহা অপেক্ষা কদর আছে। কলম্বো বন্দর এখন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও ত্রিঙ্কোমালী ভারতসাগরের নৌসেনা বিভাগের প্রধান কেন্দ্র। দ্বীপটী পর্ব্বত-বহুল দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায়। সেগুলি এক কালে বহিঃ শত্রু হইতে আত্মরক্ষার প্রধান সহায় স্বরূপ ছিল। পর্ব্বতগুলির উচ্চতাও নিতান্ত অল্প নহে। তন্মধ্যে চারিটী প্রধান। পিতুরু তলগল পর্ব্বত ৮২৯৫ ফিট উচ্চ, কিরিগোলপোতা ৭৮৩৬ ফিট, তোতাপনকন্দ ৭৭৪৬ ফিট ও আদম পীক্ ৭৩৫২ ফিট। উচ্চতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেও আদম শৃঙ্গ সর্ব্বজন পরিচিত সুপ্রসিদ্ধ পর্ব্বতচূড়া।

সিংহল রত্নগর্ভা। মৃত্তিকাভ্যন্তর বহুমূল্য রত্নের আকর। পদ্মরাগমণি, গোদন্তমণি, পান্না, নীলকান্তমণি, রেখালমণি, পোখরাজ, চন্দ্রকান্তমণি, বিড়ালাক্ষি (Cats'eye) মণি প্রভৃতি জহরত মা বসুন্ধরা সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্বে স্বর্ণের খনিতে এত স্বর্ণ ছিল যে, দ্বীপের নামই স্বর্ণলঙ্কা বলিয়া পরিচিত ছিল। সিংহলের সাগরও রত্নপ্রসূ—বিশ্ব-বিশ্রুত মুক্তার জন্ম এই স্থানে।

কয়েনমেলি দাগোবা—অনুরাধাপুর

সিংহলের ন্যায় উর্ব্বরা ভূমি পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। এখানকার মত এরূপ অপর্য্যাপ্ত সুরসাল ও সুমিষ্ট ফল অল্প দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। নারিকেল ও কদলীবৃক্ষ তো সিংহলকে সদা উৎসব সাজে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সুমিষ্ট আম্র তো বার মাসই ফলিয়া থাকে। তা ছাড়া, পেঁপে, আনারস, আপেল, আঙ্গুর, ডালিম, কমলালেবু, বাতাবিলেবু, কাঁটাল, আতা, রুটিফল, খরমুজ, ফুটি প্রভৃতি গ্রীষ্ম-মণ্ডলের প্রায় সকল প্রকার সুস্বাদু

ফল জন্মিয়া থাকে। তরিতরকারীও নানাবিধ। দারুচিনি ও প্রায় সব রকম মশলা, চা, কফি, কোকো, রবার, তামাক ও ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ধান্য তো বারমাস হইয়া থাকে। তবে ধান্য অধিক পরিশ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ। ধান্য অপেক্ষা ফলকর বৃক্ষে অধিক লাভবান হওয়া যায় বলিয়া লোকে ধান্যচাষ বেশী করে না। ভারত হইতে আমদানী চাউলের উপর ইহারা বেশী নির্ভর করে। সেজন্য এখানে খাদ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য। পূজার্চ্চনার জন্য ইহাদের পুষ্পের নিত্য প্রয়োজন। প্রকৃতিদেবী তাই নানা রঙের পুষ্প-সম্ভারে উদ্যান সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

সিংহলে অরণ্যের অভাব নাই। আমরা ভীষণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া কয়েক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এরূপ মূল্যবান বৃক্ষপূর্ণ জঙ্গল অল্পই দেখিয়াছি—আবলুষ, সাটীন প্রভৃতি বৃক্ষসম্পদে বনভূমি গরীয়ান। অরণ্যে যে সকল জীব জন্তু বাস করে তাহাও অতুলনীয়। সিংহলের হস্তীর ন্যায় প্রখর বুদ্ধি-শালী ও কর্ম্মঠ হস্তী জগতে অল্পই আছে। প্রাচী ও প্রতীচির সর্ব্বদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে সিংহলের হস্তী সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। কি সমরাঙ্গনে, কি শোভাযাত্রায়, কি অতিগুরু ভার বহনের জন্য সেকালে সিংহল হইতে হস্তী বহু-মূল্যে ক্রয় করিয়া ব্যাপারীগণ জগতের সর্ব্বত্র রপ্তানি করিত। এখনও এখানে বন্য হস্তীর উৎপাত নিতান্ত অল্প নহে। প্রাচীন নগর হইতে রাত্রিতে জঙ্গল-পথে বন্যহস্তীসঙ্কুল স্থান দিয়া আসিবার কালে আমাদিগকে আশু বিপদ-শঙ্কায় বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন নাম স্মরণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারই কৃপায় সে যাত্রায় কোনও বিপদ ঘটে নাই। সেখানকার বনে বা হ্রদতটে যত্রতত্র হরিণশিশু ইতস্ততঃ স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে। নানারঙ্গে চিত্রিত পক্ষীকূজনে বনভূমি সদা মুখরিত হইতেছে। তিনশতাধিক জাতীয় পক্ষী সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

রুয়েলমেসি দাগোবা—অনুরাধাপুর (সংস্কার চলিতেছে, ভারা বাঁধা আছে)

সাধারণতঃ সিংহলের লোকের আর্থিক অবস্থা ভারতবর্ষ

দ্বারপাল—অর্দ্ধযন্ত্রাকৃতি প্রস্তর ফলক ও সোপান—অনুরাধাপুর

লঙ্কারাম দাগোবা—অনুরাধাপুর

অপেক্ষা ভাল বলিয়াই মনে হয়। স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলে স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা থাকে। এখানে দারিদ্র্য নাই বলিলে চলে। আমাদের দেশের মত অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত চেহারা আমার নজরে একটীও পড়ে নাই। মেয়ে-পুরুষ সকলেই লুঙ্গি পরে। পুরুষের গায়ে কোট ও স্ত্রীলোকের গায়ে জ্যাকেট। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সভ্যতানুমোদিত পোষাকের পারিপাট্য আছে। সাধারণের আহার্য্য অন্ন, ব্যঞ্জন ও মৎস্য। সমুদ্রে ও জলাশয়গুলিতে নানারূপ সুস্বাদু মৎস্য যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সমুদ্রের দৃশ্য—অনুরাধাপুর

রন্ধনে সরিষার তৈল ব্যবহৃত হয় না—নারিকেল বা তিল-তৈলের প্রচলন আছে। বৌদ্ধগণ জীবহিংসা করেন না, তবে মাংসাদি ভক্ষণে নিষেধ নাই। ছানা বা ক্ষীরের মিষ্টান্ন এখানে প্রস্তুত হয় না। হালুয়া এবং ময়দা ও সবেদার খাবার পাওয়া যায়। সহরের ঘর-দ্বার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইটের প্রাচীর ও খোলার চালা হইলেও গঠন-প্রণালী সুন্দর। অনেকটা বিলাতি ধরণের। পল্লীগ্রামে খড়ের চালাও আছে; তবে তাহাতে এ দেশের মত মট্‌কা বাঁধে না। রিকস্, মোটর ও বাস প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতের মত গো ও অশ্ববাহিত ঝট্‌কাও আছে। জঙ্গলের মধ্য দিয়া যে রাস্তা-গুলি গিয়াছে, তাহা অতি সুন্দর। অন্যান্য রাস্তাঘাটও ভাল। সহরগুলি আশফাল্ট-মণ্ডিত রাস্তা ও বৈদ্যুতিক আলোকে সমুজ্জ্বল। দোকানপাটও সুসজ্জিত। সমুদ্রতীর-বর্ত্তী স্থানগুলিতে চিরবসন্ত বিরাজ করিতেছে। দূরবর্ত্তী স্থানে কোথাও গ্রীষ্মাধিক্য, কোথাও শীতাধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে। নিউরেলিয়া (৬২০০ ফিট উচ্চ) নামক শৈলাবাসে অত্যধিক শীত—কান্দীর (১৭২৭ ফিট) শীত সহনীয় হইলেও নিতান্ত অল্প নহে। আমরা পৌষমাসে সিংহল গিয়াছিলাম।—তখন আমাদের দেশের ভাদ্রমাসের মত গুমট ও সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি প্রায়ই হইত।

সিংহল প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি। যেদিকে তাকাইবেন, দেখিবেন, ফল-ফুল-শোভিত চিরশ্যামল বিটপীশ্রেণী। সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর যেন সবুজ মখমলের আস্তরণে সমাচ্ছাদিত। শৈলমালাও যেন সৌন্দর্য্যের আধার। অধুনা পর্ব্বতের ঢালু অংশে রবার, কোকো, কফি ও চায়ের চাষ রীতিমত চলিতেছে। তাহার দৃশ্য ও মনোহারী।

এখন সিংহল ইংরাজ-রাজের খাস উপনিবেশ (Crown Colony)। একজন গবর্ণর আছেন। ব্যবস্থাপক সভা আছে; তাহার সভ্য মনোনীত করা হয়। আমরা যখন সিংহলে, তখন সেখানে Statutory Commission বসিয়াছিল। তাঁহারা সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছিলেন। আমরা সাইমন কমিশনের উপর বীতশ্রদ্ধ; সিংহলীদের নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম, সেখানকার কমি-শনের উপর তাহাদের আস্থা আছে।

ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে সিংহলের কতকাংশ ওলন্দাজের অধিকারে ছিল; আর বাকী কান্দীর সিংহলী রাজার অধীনে। ওলন্দাজদের সহিত য়ুরোপখণ্ডে ইংরাজের যুদ্ধ বাধিলে ভারত হইতে ইংরাজ সৈন্য গিয়া সিংহলে ওলন্দাজ রাজ্য আক্রমণ করে। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে আমিন্স সহরের সন্ধির সর্ত্তানুসারে ওলন্দাজের সিংহল রাজ্য ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়।

দ্বীপের অবশিষ্টাংশ আরও ১৯ বৎসর কাল কান্দীর রাজার অধানে ছিল। ইতঃ মধ্যে ইংরাজের সহিত তাঁহার কয়েকবার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—প্রত্যেকবারই ইংরাজগণ পরাভূত হন। শেষ রাজার আমলে রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কান্দী-রাজ্য অধিকার করিয়া সমগ্র দ্বীপের ঐকচ্ছত্র অধিপতি হইয়া খাস উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ওলন্দাজদের পূর্ব্বে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিগম্বো, কলম্বো, জাফ্না প্রদেশ পর্ত্তুগীজগণের অধিকারে ছিল। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ কলম্বোর

কাঁন্দি হ্রদ

সন্নিকটে প্রথম বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করে। তাহার পর রাজ্য-পত্তন ও বিস্তার। পর্ত্তুগীজ অঞ্চল হইতে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা আরম্ভ হয়। পর্ত্তুগীজরা যখন আসে, তখন রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব চলিতেছে। দ্বীপটি সাত খণ্ডে বিভক্ত। রাজাও সাতজন। তামিল আক্রমণ হইতে সিংহলের অধঃপতন আরম্ভ হয়। বিজয় সিংহের বংশধরগণ দুই সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া সিংহলে রাজত্ব করেন। রাজত্বকালের শেষ ৪।৫ শতাব্দী ধরিয়া মালাবার উপকূলের তামিলগণের সহিত সিংহল রাজ্যের বহু সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ভাগ্যলক্ষ্মী কখনও তামিলগণের উপর, কখনও বা সিংহলীদের উপর প্রসন্না হইতেন। কাজেই শাসন শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইয়া অরাজকতায় দেশ পূর্ণ হইতেছিল। সেই সুযোগেই দ্বীপে পর্ত্তুগীজ ও পরে ওলন্দাজ আধিপত্য বিস্তৃতি লাভ করে। তামিল রাজত্ব কালের দুরপনেয় কলঙ্ক প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি নাশ। সেই অতুলনীয় কীর্ত্তির পরিচয় দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অনুরাধাপুরই বৌদ্ধ কীর্ত্তির প্রধান কেন্দ্র। তাই আমরা সিংহলে নামিয়া প্রথমেই অনুরাধাপুরে গিয়াছিলাম। অনুরাধাপুর কলিকাতা হইতে ছয় দিনের পথ। সিংহলে ডাকবাঙ্গলাকে বিশ্রামাবাস বা Rest house বলে। অনুরাধাপুরেও একটী বিশ্রামাবাস আছে। সেখানে স্থানাভাব থাকায় আমাদিগকে দুই দলে বিভক্ত হইয়া অর্দ্ধেক পিন্ বাংলায় আর অর্দ্ধেককে সেণ্ট্রাল হোটেলে আশ্রয় লইতে হয়। পিন্ অর্থাৎ দাতব্য; কিন্তু এখানে ভাড়া দিতে হয়। প্রত্যেক কামরা দৈনিক এক টাকা। বাঙ্গলো রক্ষকের বকসিসও ঐরূপ দিতে হয়। সেদিন অন্নগ্রহণের সুবিধা হইল না। কূপোদকে স্নানাদি সারিয়া জলযোগ করিয়া অনুরাধাপুর দেখিবার জন্য ট্যাক্সীতে রওনা হইলাম। প্রতি ট্যাক্সির ভাড়া নয় টাকা। সঙ্গে পথ প্রদর্শক (Guide) লওয়া

হইল। আমরা পূর্ব্বে বিবরণ পড়িয়া রাখিয়াছিলাম; এখন গাইডের সাহায্যে পুস্তকের সকল স্থান মিলাইয়া দেখিতে লাগিলাম। অনুরাধাপুরে এত দেখিবার জিনিষ আছে যে, কয়েক ঘণ্টায় তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখা কুলাইয়া উঠে না। তবু যতদুর সম্ভব আমরা দেখিয়া লইলাম। দুপুরবেলা খুব গরম পড়িয়াছিল। অপরাহ্নে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা তাহাতে নিরস্ত হইলাম না—জলে ভিজিয়া ভিজিয়াও দেখিতে লাগিলাম। তবে একবার খুব জোরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়। সে সময় আমাদিগকে মোটরে আশ্রয় লইয়া আটক থাকিতে হইয়াছিল। অনুরাধাপুরের সর্ব্বত্র ভগ্নাবশেষে পূর্ণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি খৃষ্টজন্মের ৩৭০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত অনুরাধাপুর সিংহলের রাজধানী ছিল। সহরের মধ্যস্থলে বিংশ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া রাজার 'মহামেঘ' নামে এক সুরম্য প্রমোদোদ্যান ছিল। রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন জন্য এই উদ্যানটী দান করেন। উৎসর্গের দিন এক মহোৎসবের আয়োজন হয়। "মহাবংশে" তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। মগধের রাজা বিম্বিসার বুদ্ধদেবকে তাঁহার প্রমোদকানন ধর্ম্মকার্য্যের জন্য অর্পণ করেন। সিংহল-রাজ তিস্ব সেই সদৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণায় তাঁহার উদ্যানটী ধর্ম্মার্থে দান করেন। শুভদিনে শুভক্ষণে রাজবাটী হইতে মিছিল বাহির হইল। প্রাসাদ হইতে প্রধান পুরোহিতের আবাস পর্য্যন্ত রাজপথ পত্রপুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। বহুমূল্য রত্ন-সমন্বিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রাজা রথারোহণ করিলেন। মন্ত্রী ও প্রধান রাজপুরুষগণ বাহির হইলেন। সৈন্যসামন্ত তাঁহাদের পশ্চাতে চলিল। রাজভৃত্য ও প্রহরীগণ তাহাদের অনুসরণ করিল। মন্দিরে পৌঁছিলে পুরোহিতগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন করা হইল। তাঁহারা সেখান হইতে শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া নদীতীর পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন। সেখানে রাজা রথ হইতে অবতরণ করিয়া স্বর্ণনির্ম্মিত লাঙ্গল হস্তে লইলেন। "মহাপদ্ম" ও "কুঞ্জর" নামক রাজ-হস্তীদ্বয়ের স্কন্ধে লাঙ্গল সংযুক্ত করা হইল। লাঙ্গল হস্তে রাজা ভূমি কর্ষণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সঙ্গে আবার শোভাযাত্রা চলিল। তাহাতে ছিল কারুকার্য্য-খচিত পাত্র, নানারঙ্গে চিত্রিত পতাকা, চন্দনচূর্ণের আধার, সুবর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত দর্পণ, পুষ্পভারাবনত সাজি, কদলীবৃক্ষ নির্ম্মিত বিজয়-তোরণ, সুবেশা ছত্রধারিণী, নানাবিধ বাদ্য এবং নাগরিকগণের জয়োল্লাস। মহাস্থবির রাজকর্ষিত হল-চিহ্ন—উৎসর্গীকৃত ভূমির প্রান্তরেখা নির্দ্দেশের ঘোষণা করিলেন; এবং দ্বাত্রিংশ ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তাহার পর ভূকম্পন হইল।

এইবার বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহের জন্য রাজা উদ্‌গ্রীব হইয়া ভারতে সম্রাট অশোকের নিকট দুত প্রেরণ করিলেন। অশোকের সাহায্যে বুদ্ধের কণ্ঠাস্থি, দক্ষিণ শোবন দন্ত ও বুদ্ধদেব যে পাত্রে আহার করিতেন তাহা সংগৃহীত হইল। সিংহলে সেগুলি পৌঁছিলে রাজ্যে মহোৎসব হইল। তার পর "থুপারাম" নামক নবনির্ম্মিত দাগোবায় সেগুলি সংরক্ষণ করা হইল। সেই সময়কার বহু অলৌকিক ঘটনার কথা "মহাবংশে" উল্লিখিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। খৃষ্ট জন্মের ৩০৭ বৎসর পূর্ব্বে "থুপারাম" নির্ম্মিত হয়। সিংহলের দাগোবার রীতি অনুসারে থুপারাম দেখিতে ঘণ্টাকৃতি। ঘণ্টার ব্যাস ৬০ ফিট, উচ্চতা ৬০ ফিট। অনুরাধাপুরের এইটীই সর্ব্বপ্রথম দাগোবা। "ঈশ্বর মুনী" দাগোবাও রাজা তিস্বের বিরাট কীর্ত্তি। একটী পর্ব্বত কাটিয়া তাহারই উপর এটী নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরে যাইতে দুইটী চাতাল, তাহার সোপান ও দ্বারপাল মূর্ত্তি সুন্দর অবস্থায় আছে। উপরের চাতালের প্রাচীর-গাত্রে সপ্তদশটী বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত আছে। দক্ষিণ প্রাচীরে তিনটী নারী, এক নর, এক ভৃত্য এবং তৎসন্নিকটে বিকটাকার উপবিষ্ট মানব-মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। উত্তর প্রাচীর বাদ্য-বাদন নিরত ত্রিমূর্ত্তিও চিত্রিত। এই দাগোবার অনতিদূরে তপস্বিনীগণের আবাস-গৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। মিহিনতালী পর্ব্বতস্থিত দাগোবা ও বিহারাদিও তিস্বের কীর্ত্তি। তাঁহার পুরা নাম দেবানিপ্রিয় তিস্ব। পাণ্ডুকাব্যের পরই খৃষ্ট জন্মের ৩০৬ বৎসর পূর্ব্বে ইনি সিংহলের রাজা হন। ইঁহারই আমলে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সিংহলে আগমন করেন। ইহারই নিকট তিস্ব পাত্রমিত্র সহ বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পুরনারীগণ দীক্ষিতা হইবার জন্য আগ্রহান্বিতা হইলেন। মহেন্দ্র তাঁহার ভগ্নী সঙ্ঘমিত্তকে আনাইবার উপদেশ দিলেন। তিনি তখন পাটুলিপুত্র মঠের

প্রধানা তপস্বিনী। রাজা স্বীয় মন্ত্রী অরিথ্যকে মহারাজ অশোকের নিকট সঙ্ঘমিত্তকে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে সঙ্ঘমিত্ত সিংহলে আসিলেন। সঙ্গে আনিলেন বোধিদ্রুমের একটী শাখা। মহাসমারোহের সহিত শাখাটী অনুরাধাপুরে রোপণ করা হইল। সেই সময়ের বহু অলৌকিক ঘটনার কথা "মহাবংশে" লিখিত আছে; তাহার আর উল্লেখ করিলাম না। সঙ্ঘমিত্তের নিকট রাণী সহচরীগণসহ নবধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। রাজা তিস্ব চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর পর চারিজন বংশধর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় কেহই যশস্বী হইতে পারেন নাই। শেষ রাজা সুরতিস্ব রাজ্য ধ্বংসের সূত্রপাত করিয়া যান। তিনি একদল মালাবার সৈন্য রাজ্যরক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন। তাহাদের সেনানায়ক সুরতিস্বকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল পূর্ব্বক কিছুকাল রাজত্ব করে। পরে সে রাজ্যচ্যুত হইলেও রাজ্যের অন্ধি-সন্ধি তাহাদের অগোচর থাকিল না। মধ্যে মধ্যে মালাবার উপকূল হইতে বহু সৈন্য আসিয়া রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তাহাদের সহায়তায় খৃষ্ট জন্মের ২০৪ বৎসর পূর্ব্বে মহীশূরের রাজপুত্র ইলাড়া সিংহলের রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া ত্রিশ বৎসর কাল সিংহলে রাজত্ব করেন। বিদেশী হইলেও তিনি নিরপেক্ষ ভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। সদাশয়তা গুণে প্রকৃতি-রঞ্জনেও তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। সিংহলের রাজবংশধর দুতুগামিনী অনন্যোপায় হইয়া ইলাড়াকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন।

সন্তানগণসহ শ্রীযুক্ত মুত্তুকুমার—জাফনা

উভয়ে হস্তীপৃষ্ঠে থাকিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইলাড়াই প্রথম বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। দুতুগামিনী তাহা প্রতিরোধ করিয়া সুকৌশলে বর্শা চালনা করিলেন। তাঁহার হস্তী "কন্দুক" ইলাড়ার হস্তীকে আক্রমণ করিল। বর্শা ইলাড়ার হৃদয় বিদ্ধ করিল; তিনি হস্তী সমেত ভূমিতে নিপতিত হইলেন। দুতুগামিনী পিতৃ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ইলাড়া যে স্থানে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহার শবদেহের সৎকার রাজসম্মানের সহিত সেই স্থানেই করা হইল। তদুপরি একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়। মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য নিয়ম প্রচারিত হয় যে, সেই স্থান দিয়া যাইবার সময় শোভাযাত্রার বাদ্য বন্ধ করা হইবে এবং সকলে এমন কি রাজাকেও যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে যাইতে হইবে। দুতুগামিনী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া "রুয়েন মালী" দাগোবা নির্ম্মাণ করেন। ইহা উচ্চে ২৭০ ফিট। ভিত্তি মৃত্তিকাভ্যন্তরে একশত ফিট গাঁথা হইয়াছিল। প্রথম স্তর স্ফটিক প্রস্তর, তারপর লৌহ ও পিত্তলের পাত, এইরূপ পর পর সিমেণ্ট দ্বারা গ্রথিত। ইহাতে বহুমূল্য উপহার এবং বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত ছিল। এই সুবৃহৎ দাগোবা সংস্কারের জন্য একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সেই সমিতি সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দাগোবা সংস্কার কার্য্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। এই পর্ব্বত সদৃশ দাগোবার—নিম্ন-প্রদেশ হইতে নূতন করিয়া ইষ্টক দ্বারা গাঁথা হইতেছে। প্রায় ¾ অংশ গাঁথনি উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সোপানও নির্ম্মিত

হইতেছে। এখনও ভারা বাঁধা আছে। সেই ভারার চড়িয়া আমার যুবক বন্ধুগণ যতদূর সংস্কার হইয়াছে—ততদূর পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে লেফটেনাণ্ট নলিনী বাবুই অগ্রণী ছিলেন। এই দাগোবা-সংশ্লিষ্ট গৃহগুলিরও সংস্কার হইয়াছে। একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠে রাজা দুতুগামিনীর সহিত ইলাড়ার সৈন্য সামন্ত সহ যুদ্ধযাত্রার দারুমূর্ত্তি সজ্জিত করা আছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বের মুখভাব, পরস্পরের প্রতি বিকট দৃষ্টি সঞ্চালন নিপুণতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই গৃহপ্রাচীরে বুদ্ধের জীবিত কালের বিভিন্ন ঘটনার চিত্র নূতন করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। রুয়েনমালী দাগোবার সম্মুখভাগে একটী প্রস্তর-বেদী আছে। সেই বেদীতে শয়ান থাকিয়া দুতুগামিনী তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি রুয়েনমালীর দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন।

দুতুগামিনী "পিত্তল প্রাসাদ" নির্ম্মাণ করেন। ১৬০০ কঠিন প্রস্তরের স্তম্ভের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই বৃহৎ অট্টালিকা নবম তল পর্য্যন্ত উচ্চ ছিল। প্রত্যেক তলে একশতাধিক প্রকোষ্ঠ। সর্ব্বসমেত প্রকোষ্ঠ-সংখ্যা এক সহস্র। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। কার্ণিশগুলি রত্ন-খচিত। তাহার তলে স্বর্ণের পুষ্পহার; তাহাও রত্ন-খচিত। এই প্রাসাদে এক সহস্র শয়ন-কক্ষ ছিল। তাহার রত্ন-মণ্ডিত গবাক্ষ চক্ষুর ন্যায় উজ্জ্বল প্রতিভাত হইত। প্রাসাদের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড স্বর্ণমণ্ডিত হল ছিল। তাহার স্তম্ভগুলি সুবর্ণ-নির্ম্মিত। তাহাতে সিংহ ও নানারূপ জন্তু, দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল। প্রত্যেক স্তম্ভ উজ্জ্বল মোতির মালায় সজ্জিত ছিল। এই হলের ঠিক মধ্যস্থলে মণিমাণিক্য মণ্ডিত অতি সুন্দর ও মনোহর হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত সিংহাসন স্থাপিত ছিল। সিংহাসনের একদিকে স্বর্ণ নির্ম্মিত সূর্য্যের প্রতিকৃতি; আর একদিকে রৌপ্যের চন্দ্র মূর্ত্তি। অপর দিকে মুক্তার তারকা। প্রত্যেক কোণ হইতে হলের সকল দিকে মণি-রত্নের পুষ্প-গুচ্ছ প্রলম্বিত ছিল। স্বর্ণলতার মধ্যে মধ্যে জাতকের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। সিংহাসনের উপর বহুমূল্য আসন। তাহার পার্শ্বে নানা কারুকার্য্য-সমন্বিত হস্তিদন্তের ব্যজনী। পাদপীঠে বহুমূল্য পাদুকা এবং সিংহাসনের উপর চাকচিক্য-ময় শ্বেত চন্দ্রাতপ। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ মূল্যবান কার্পেট মণ্ডিত—বসিবার উচ্চাসনগুলিও বহুমূল্যের। মন্দির-প্রবেশ-দ্বারে হস্ত ও পদ প্রক্ষালন জন্য সুবর্ণ পাত্র ও জলাধার।

মহাবলী গঙ্গার উপর সেতু

আর যে কত কি ছিল তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়। এই বিরাট সৌধের টালিগুলি পিত্তল নির্ম্মিত ছিল। তাই প্রাসাদের নাম হইয়াছিল "পিত্তল প্রাসাদ।" খৃষ্ট জন্মের ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা সদতিস্বর আমলে সর্ব্বোচ্চ দুই তল ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। দুই শতাব্দী পরে আরও দুই তল ভাঙ্গা হয়। ক্রমে অন্য তলগুলিও ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত হয়। খৃষ্ট জন্মের ৯০বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধগণের মধ্যে ধর্ম্মোপদেশের বৈধতা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। একদল তাঁহাদের মত

বোধিদ্রুম—অনুরাধাপুর

শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিতে চান; অপর দল তাহাতে সম্মত না হওয়ায় দুইটী দল হয়। নববিধানীদের অভয়গিরি নামে এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। চৌদ্দশত বৎসর ধরিয়া সিংহলে এই দলাদলি চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাসেন রাজার রাজত্ব কালে দলাদলি বেশ পাকিয়া উঠে—রাজা নববিধানকে সমর্থন করেন এবং পিত্তল প্রাসাদের যাহা কিছু মূল্যবান দ্রব্য ছিল তাহা লইয়া গিয়া নববিধান মঠের শোভাসম্পদ বর্দ্ধিত করেন। তিনি পুরাতনী দলের অনেক মঠ ধ্বংস করেন। কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইবার পর আবার সেগুলির পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। এখন পূর্ব্বগৌরবের নিদর্শন স্বরূপ সেই পিত্তল প্রাসাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সারি সারি বহু প্রস্তর-স্তম্ভ খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে।

মহাসেনের প্রধান কীর্ত্তি মহাবিহার সংলগ্ন "জ্যোতি" উদ্যানে "জ্যেত বনরাম" দাগোবা ও মঠ নির্ম্মাণ। দাগোবাটি ৩১৫ ফিট উচ্চ ছিল। এখন ২৫০ ফিট। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা পরাক্রম বাহু দাগোবাটির সংস্কার করেন। Sir Emerson Tinnent সাহেব এই দাগোবা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—The solid mass of masonry in this vast mound is prodigious. Its diameter is three hundred and sixty feet and its present height (including the pedastal and spire) two hundred and forty nine feet; so that the contents of the semicircular dome of brick work and the platform of stone seven hundred and twenty feet square and fifteen feet high exceed twenty

millions of cubic feet. Even with the facilities which modern invention supplies for economising labour, the building of such a mass would at present occupy five hundred brick layers for six to seven years, and would involve an expenditure of at least a million sterling. The materials are sufficient to raise eight thousand houses, each with twenty feet frontage, and these would form thirty streets half a mile in length. They would construct a town the size of Ipswich or Coventry, they would line an ordinary railway tunnel twenty miles long or form a wall one foot in thickness and ten feet in height, reaching from London to Edinburgh. Such are the dagobas of Anuradhapura—structures whose stupendous dimensions and the waste and misapplication of labour lavished on them are hardly outdone even in the instance of the Pyramids of Egypt." উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে অনুরাধাপুরের দাগোবাগুলির বিরাটত্ব উপলব্ধ হইবে। এইরূপ বিশাল পর্ব্বত সদৃশ দাগোবা জগতে কুত্রাপি নাই। দাগোবাটি বহুদিন জঙ্গলাবৃত ছিল। নয় বৎসর হইতে ইহার সংস্কার কার্য্য চলিতেছে। পুরোহিত গুণরত্ন (Rev. E. Gunaratna) ইহার প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার সহিত পরিচয় হইল। তিনি একটী হলের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দেখাইলেন। দেখিলাম, বুদ্ধের মহাবলি নির্ব্বাণ মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি লম্বে ২৭ ফিট। বেদীর উপর উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া বুদ্ধদেব শায়িত আছেন। সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি। অর্থাভাবে সংস্কার কার্য্য ধীরে ধীরে চলিতেছে। এখনও চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। আমরা যে যাহা পারিলাম চাঁদা দিলাম।

খৃষ্ট জন্মের ১০৪ বর্ষ পূর্ব্বে অলগম বাবু রাজা হন। তিনি এক বৎসর রাজত্ব করিতে না করিতে বহু মালাবার সৈন্য আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। তিনি তাহাদের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া নিরাপদ স্থানে পলায়ন করেন। তিনি পঞ্চদশ বর্ষ ধরিয়া জঙ্গলে বা পর্ব্বত-গুহায় অজ্ঞাতবাস করেন। রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে যে সকল পর্ব্বত তাঁহার আশ্রয় স্থান ছিল সেগুলিকে তিনি মন্দিরে পরিণত করেন। দানবালার পর্ব্বত-কাটা মন্দির ও মিতেলির পর্ব্বত-গুহার মন্দির তাঁহার স্মৃতি এখনও জাগরূক রাখিয়াছে। তাঁহার আর এক মহান কীর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করণ। মহেন্দ্রের সময় হইতে এতদিন মুখে মুখে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইতেছিল। খৃষ্ট জন্মের ৯০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি মেতেলির আলুবিহারে বৌদ্ধ পুরোহিতগণকে আহ্বান করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা পালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করান। তাঁহার আর এক অতুলনীয় কীর্ত্তি অনুরাধাপুরের "অভয়গিরি" দাগোবা নির্ম্মাণ। এটি উচ্চে ৪০৫ ফিট, ব্যাসার্দ্ধ ১৮০ ফিট এবং পরিধি ১১৩০ ফিট। এরূপ সুবৃহৎ দাগোবা সিংহলে দ্বিতীয় নাই। তিনি খৃষ্ট জন্মের ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করেন।

আমরা অনুরাধাপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে দেখিতে পবিত্র "আত্মস্থানে" বোধিদ্রুমতলে আসিয়া পৌছিলাম। ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট অশোক-দুহিতা সঙ্ঘমিত্র যে বোধিদ্রুম শাখা রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া স্থানটীকে কুঞ্জবনের মত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সিংহলের ইহা এক প্রধান তীর্থক্ষেত্র। দ্বীপের নানা প্রদেশ হইতে বহু নরনারী প্রতিনিয়ত পূজার্চ্চনার জন্য এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। অধিকাংশ নারী মানসিক পূজা দিয়া থাকেন। পুষ্প, শস্যগুচ্ছ, ধূপ ও বাত্তি পূজার প্রধান উপকরণ। দেখিলাম, পবিত্র তরুতলে নতজানু হইয়া তাহারা স্বয়ং পূজা, প্রার্থনা এবং সমস্বরে সুরলয় যোগে স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে। সে সময় কোনও পুরোহিতের সাহায্য লইতে দেখিলাম না। বর্ত্তমান প্রধান পুরোহিত শ্রীযুক্ত রত্নপালের সহিত পরিচয় হইল। তিনি তাঁহার নাম ইংরাজীতে আমার নোট বহিতে লিখিয়া দিলেন। সেদিন পূর্ণিমা—বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। প্রাঙ্গণ-পার্শ্বে একটী অস্থায়ী মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল—সেদিন রত্নপাল সেখানে ধর্ম্মোপদেশ দিবেন। সন্ধ্যা ৮টার সময় সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য তিনি আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান প্রতিকৃতি আছে। উচ্চ ১৫ ফিট হইবে। বালি ও সিমেণ্ট দ্বারা সেটির সংস্কার করা হইতেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান বোধিদ্রুম ও তৎসংলগ্ন

মন্দিরাদি দেখিয়া তাহার বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। বোধিদ্রুমের চতুর্দ্দিকে তিনতাক চাতাল আছে। চাতালে উঠিবার সোপান শ্রেণীর নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রস্তর-ফলক। সিংহলে প্রত্যেক প্রাসাদ বা মন্দিরের প্রবেশ-পথের সোপান নিম্নে ঠিক ঐরূপ প্রস্তর-ফলক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ভিতরে প্রথম স্তরে আবর্ত্তিত পদ্ম দ্বিতীয় স্তরে হস্তী, অশ্ব, সিংহ ও বৃষমূর্ত্তি, তৃতীয় স্তরে বৃক্ষপত্রগুচ্ছ, চতুর্থ স্তরে চঞ্চুতে পদ্মসহ রাজহংস-শ্রেণী অঙ্কিত থাকে। আর দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র স্তম্ভে দুইটী দ্বারপালের প্রতিমূর্ত্তি। এই একই রীতি প্রায় সর্ব্বস্থানে অনুসৃত হইয়াছে। বোধিদ্রুমের প্রথম চাতালের পূর্ব্বদিকে ইষ্টক নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি অসংস্কৃত অবস্থায় উপবিষ্ট আছে। পূর্ব্বে মূর্ত্তিটী সুবর্ণমণ্ডিত ছিল। উদীয়মান সূর্য্যের প্রখর রশ্মি এই মূর্ত্তির উপর আসিয়া পড়িত। দ্বিতীয় চাতালের পশ্চিম দিকের প্রবেশ-দ্বারের উপর মকর-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বোধিদ্রুমের পার্শ্বে একটী সুচিত্রিত হল আছে। সেখানে বেদীর উপর ভূমি স্পর্শ বুদ্ধ ও ধ্যানী বুদ্ধের বিরাট মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাঁহাদের পুষ্পাদি সহ পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। সেই হলের এক পার্শ্বে পালি ও সংস্কৃত ভাষায় অনেক পুঁথি সংগৃহীত আছে। বাড়ীটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বলিয়াই মনে হইল। কান্দীর অধিপতি রাজসিংহ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে এই সকল মন্দির সংরক্ষণ কল্পে বহু ভূখণ্ড দান করিয়াছেন।

বৌদ্ধযুগের প্রাচীর ও সোপান

বোধিদ্রুমের অনতিদূরে "ময়ূরপ্রাসাদ" অবস্থিত ছিল। এখন কতকগুলি প্রস্তর-স্তম্ভ তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাসাদটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ষ্টেট-হাউসের উত্তর দিকে রাজাদের ও তাহার দক্ষিণে রাজবংশীয়দের শ্মশান-ভূমি। অদূরে একটী ক্ষুদ্র পাঠাগার। তাহার নিকট অর্দ্ধশয়ান তিনটী বৃষমূর্ত্তি আছে। সেগুলি বহুদিনের। সিংহলী নারীদের বিশ্বাস—এই বৃষদের প্রদক্ষিণ করিলে বন্ধ্যাত্ব দোষ খণ্ডিত হয়। আরও কিছুদূরে প্রস্তরের একটী জলাধার আছে; লম্বে ৭ ফিট, চওড়া ২৷৷০ ফিট। রাজা দুতুগামিনীর স্নানের জন্য এখানে ঔষধ সংযুক্ত জল রক্ষিত হইত।

বর্ত্তমান কারাগৃহের দক্ষিণে "মরিসঘতি দাগোবা।" রাজা দুতুগামিনী মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বে তাঁহার আহার্য্য দ্রব্য দিয়া একজন পুরোহিতকে অগ্রে ভোজন করাইয়া তবে নিজে আহার করিতে বসিতেন। একদিন মরিস (লঙ্কা) দিয়া প্রস্তুত "সম্বর" (ঝালযুক্ত জলীয় পদার্থ) দিতে ভুল হইয়াছিল। তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই দাগোবাটি নির্ম্মিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে দাগোবাটির সংস্কার করা হইয়াছে। শ্যামদেশের রাজপুত্র সংস্কারের সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। এই দাগোবার অনতিদূরে তিন মাইল ব্যাপিয়া তিস্বওয়া। সরোবর (ওয়া=জলাশয়)। খৃষ্ট জন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রাজা তিস্ব এটী খনন করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সরোবরটীর পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে।
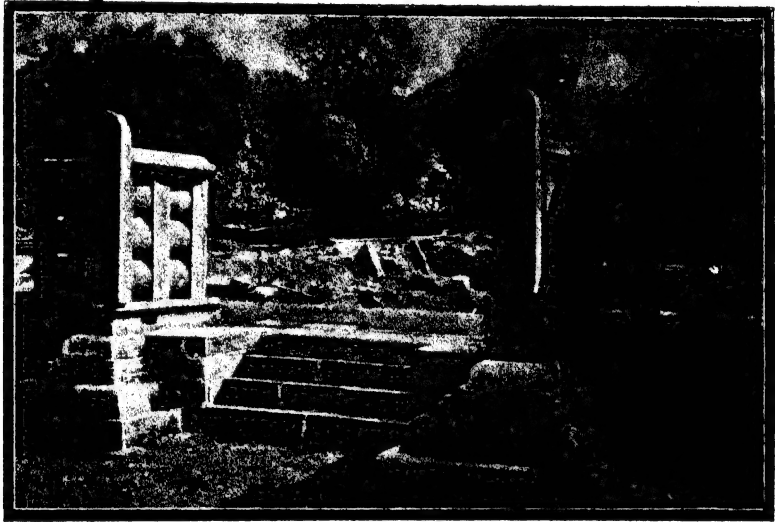
তৃতীয় মাইল ষ্টোনের দক্ষিণে "লঙ্কারাম দাগোবা" অবস্থিত। তাহার সন্নিকটস্থ পর্ব্বতে কতকগুলি গুহাগৃহ

আছে। প্রথম গুহার নিকট একখানি ১৫ ফিট লম্বা শিলা-লিপি আছে। তাহার বিবরণ মূলার সাহেব কৃত Ceylon Inscription ৩৭, ৭৫ ও ১০৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। দ্বিতীয় গুহাশ্রেণীর পর্ব্বতের উপর পুষ্প উপহার দিবার জন্য চারিটী বেদী আছে। ইহার কিছুদূরে একটী বড় ঢীবি। সেখানে রাজা দুতুগামিনীর সমাধি-মন্দির ছিল। তাহার নিকট "রাণীর প্রাসাদ।" প্রাসাদ মণ্ডপের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে হস্তী স্নান করাইবার "পকুনা" (পুষ্করণী)। মণ্ডপের পার্শ্বে তিনখানি শিলালিপি আছে। এখানে বহু মৃত্তিকা স্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। অদূরে তিনটী প্রস্তরের চৌবাচ্ছা আছে। প্রত্যেকটী এক একখানি প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তত করা হইয়াছে। আকৃতি ডোঙ্গার মত। তাহাতে পুরোহিতগণের খাদ্য রাখা হইত। তন্মধ্যে একটী লম্বে ৭৩ ফিট, প্রস্থে ৫॥ ফিট। ইহার কিছুদূরে ৭ ফিট উচ্চ ধ্যানী বুদ্ধের উপবিষ্ট-মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী অটুট অবস্থায় আছে। তাহার পার্শ্বে সেকালের দুইটী রাজপথ আছে। "মহাবংশে" পূর্ব্ববর্ত্ম ও পশ্চিম বর্ত্ম বলিয়া তাহার উল্লেখ আছে। এখানে প্রকাণ্ড হস্তিশালা ছিল। হাতিশালার প্রস্তরস্তম্ভগুলি উচ্চে ১৬ ফিট, প্রস্থে ২ ফিট। তাহার পর একটী রাজ-প্রাসাদ ও রাণীর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ।

আমরা যতদূর পারিলাম সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই সব দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম ও পরদিনের প্রোগ্রাম ঠিক করিয়া ফেলিলাম। স্থির হইল একখানি মোটরবাস্ ভাড়া করিয়া তাহাতে মালপত্র সমেত আমরা যাইব। পথে যাইতে যাইতে যেখানে রাত্রি হইবে, সেইখানকার বিশ্রাম-বাটিকায় আশ্রয় লওয়া হইবে। প্রথম দিন মিহিনতালি ও পলনারোয়া বা প্রস্থিনগর যাওয়া হইবে। তাহার পর সিগেরিয়া, দামবালা ও আলুবিহার দেখিয়া কান্দী যাওয়া স্থির থাকিল। তিনজন মোটরবাস ঠিক করিবার জন্য গেলেন—আমি একা বাসায় থাকিয়া পরদিন যেখানে যেখানে যাওয়া হইবে তাহার বিবরণ পাঠ ও দ্রষ্টব্য স্থান সম্বন্ধে নোট করিতে লাগিলাম। বাস ঠিক করিয়া তাঁহারা যখন ফিরিলেন,তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সকলেই ক্লান্ত। জলযোগান্তে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু তাহাতে এক বিঘ্ন উপস্থিত। আমরা যে পল্লীতে বাসা লইয়াছিলাম, তাহার অধিবাসী অধিকাংশই খৃষ্টান। সেদিন রবিবার—স্কুল ও আফিস বন্ধ। প্রাতে পল্লীর যুবকেরা পিন্‌বাঙ্গালায় আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের ভাষা না জানায়—তাহাদের সকৌতুহল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইতেছিল না। এমন সময় দুইজন ইংরাজীজানা যুবক আসে। তাহারা দোভাষীর কার্য্য করে। তাহাদের সাহায্যে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। সহযাত্রী সুরেন্দ্রবাবু স্নানের পূর্ব্বে এক সুগন্ধি তৈল মাখিতেছিলেন। তাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। তিনি তাহাদের মধ্যে অল্প অল্প তৈল বিতরণ করেন। তাহারা সেই তৈল মাথায় দিয়া চলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে পাড়ার অন্য যুবকেরা আসিয়া জুটে। সুরেনবাবু অগত্যা তৈলের শিশি বাক্স মধ্যে পুরিয়া ফেলেন। সেই দোভাষীদের মধ্যে একটী যুবক আমাদের বাসা ত্যাগ করিল না। আমরা যখন জলযোগ করি, তাহাকে আহারের জন্য ২৫ সেণ্ট দিয়া বিদায় করা হয়। তার পর আমরা ট্যাক্সিতে চলিয়া যাই। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই খৃষ্টান যুবক আসিয়া হাজির হইয়াছে। আমরা যখন শুইতে যাই, সে তখন তাহার পারিশ্রমিক টাকার জন্য দাবী করিতে লাগিল। কিছু দেওয়া হইল; সে তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না ও কিছুতে নড়িতে চাহিল না। অগত্যা নিদ্রার ব্যাঘাত আশঙ্কায় তাহার প্রার্থিত অর্থ দণ্ড দিয়া তাহাকে বিদায় করিতে হইল। বলা বাহুল্য রাত্রিতে বেশ সুনিদ্রা হইয়াছিল। প্রাতে মোটরবাসে মালপত্রসহ আমরা মিহিনতালি যাইবার জন্য রওনা হইলাম। ভাড়া ধার্য্য হইয়াছিল দৈনিক চল্লিশ টাকা।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

ফরিদপুর জেলার মেয়েলী গান

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বি-এ

পল্লী-গান যে সংগ্রহ করিয়া পুস্তক আকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন, তা আর বেশী করে না বল্লেও চলে। পল্লী গানে অতীত বাঙলার সত্যিকার ছাপ রয়েছে। ধর্ম্মের বিপ্লবময় বন্যা এবং দর্শনের শান্ত মধুর স্রোত ইহার মধ্যে প্রবাহিত। লোক প্রথার অন্তরালে দৈনন্দিন জীবনের যে আভাষ রয়েছে তাহা আমাদিগকে অনেক কিছু বুঝিবার জন্য উদ্বোধিত করে। বাঙালীর সহজ সরল ও সরস জীবন-গতির এক অধ্যায় আমরা এই সব মেয়েলী গানের মাঝে পাই। গানগুলি এত সুন্দর, এত কবিত্বময় এবং এত অনাড়ম্বর যে ইহা আমাদিগকে অতি অল্পেই মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

তবু কেমন যেন একটা half seriousness ভাব! আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহের প্রচেষ্টা কোথাও চল্‌ছে বলে মনে হয় না।* মাত্র দু একজন তরুণ পান্থ এই ভীষণ দুর্গম পথে সম্বলহীন হয়ে যাত্রা করেছেন বুকে সাহস এবং মুখে হাসি নিয়ে। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ডাঃ দীনেশ সেনের "ময়মনসিংহ গীতিকা" প্রকাশিত হয়েছে। দেশ বিদেশের জহুরীগণ [যথা রমা রেঁলা, সিলভ্যান লেভি, ইত্যাদি] সমালোচনার কষ্টি-পাথরে পরখ করে খাঁটী জহরত বলেই মত দিয়েছিলেন। তা দেখে গর্ব্বে আমাদের বুক ফুলে উঠ্‌ছে কিন্তু আর একদিক্ দেখলে দুঃখে প্রাণ মুস্‌ড়ে পড়ে, বেদনায় হৃদয় ম্রিয়মাণ হয়। সেটা হচ্ছে এই যে অত প্রশংসাবাদ পাওয়া সত্ত্বেও পল্লী গানগুলি বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সংগ্রহ করবার বা প্রকাশ করবার চেষ্টা আদৌ হচ্ছে না। এটা যে জাতির পরিপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সম্পূর্ণভাবে মুখোমুখি দেশের সাথে পরিচিত হবার ইচ্ছে মোটেই আমাদের মনে নাই, দেশের প্রাণ-বীণার সাথে সুর আলাপনের ইচ্ছা মোটেই নাই।

নিম্নলিখিত গানগুলি ফরিদপুর জিলার লক্ষ্মীকোল গ্রাম হতে জনাব তালেব উদ্দীন ও আজহারউদ্দীন বি-এ সাহেবগণের সাহায্যে ও সাহচর্য্যে সংগৃহীত হয়েছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

এই গানগুলি কোন্ সময়কার রচনা তা ঠিক্ করা মুস্কিল। তবে এটা সত্য যে, ইহা মুসলমান প্রভাবের বা তার পরের সময়কার। গান গুলির ভাষা অতি সহজ ও সরল, লীলাভঙ্গী অতি মনোহর ও চমৎকার, expression বেশ সুন্দর। পদাবলী-রচয়িতা কবি শশিশেখরের ভাষার সাথে এবং রচনা-প্রণালীর সাথে বেশ খাপ খায়—মনে হয় যেন একই ছাঁচে ঢালা ও একই যুগের তৈরী।

* যখন এই প্রবন্ধ লেখা হয় তখন কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে ডাঃ দীনেশ সেনের initiativeএ Ballad collectors নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই সব গানে কতকগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এগুলি মুসলমান কি হিন্দু কবির রচনা তা নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। গানের সাধারণ পোষাক দেখে মনে হয় হিন্দু কবির রচনা; কিন্তু সে ভ্রান্তি ভাষা দেখে অপনোদিত হয়। যাহোক্ বিশেষজ্ঞগণের হাতে এর ঠিকুজী আর গোত্র নিরূপণ করবার ভার দিয়ে খালাস পাওয়া যাক্।

(১) "কোলের ব্যাসাদ":—"গঙ্গা মাকে" পার করার জন্য অনুনয় বিনয় করা হচ্ছে; আর মানত করা হচ্ছে "ঝাঁপির ব্যাসাদ" ও "কোলের ব্যাসাদ"। - অর্থ সন্তান। গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

(২) "ঝাঁপির ব্যাসাদ"—অর্থ গহনা-পত্র, টাকাকড়ি

(৩) "মহীফল রাজা কেটেছে দীঘি, আমি সেই দীঘিতে যাবো।" মহীফল শব্দ মহীপাল শব্দের উচ্চারণ বিভ্রাট। মইপল বা মহীফল উভয় শব্দই গানে শ্রুত হওয়া যায়।

c.f "The founder of this family (Pal) has left a great monument of his reign to the vast pond of Muhee-pull-diggy, in the Dinagepore district."

Vide History of Bengal by J. C. Marshman, Serampore, 1838 Page 2.

(১)

ঐটু ঐটু মসনের ফুল, জামাই ২ল কতদুর?
জামাই এল ঘামিয়ে, ছাতি ধর নামিয়ে।
ছাতির উপরে ওকেলা, বিবি নাচে বিমলা।
সাধুর ননদের বড় জ্বালা।
এক ননদের জালায় জ্বালায় শরীর হ'ল কালা।
কানছি কোণা ঘরের কোণে ছিট্‌কীর ডাল, (১)
তাই দিয়ে উঠাব নিধের (পিঠের) ছাল।
সাধুর নন্দর বড় জ্বালা।

(২)

ঢাকাই পানে তে আলরে দামাদ
দামাদ মশুরী টানায়ে, মশাল জ্বালায়ে।
কি কি জেওর আনিছ রে দামাদ বিবির লাগিয়া
[দামাদ] "এনেছি এনেছিরে মামা (২) সাহেব

(১) কান্‌চি কোণাই সাধারণতঃ ছিটকীর গাছ জন্মে। ছিটকীর ডালগুলি খুব সরু। ইহা দিয়া মারিলে শরীরে দাগ বসিয়া যায়।

(২) মামা—আম্মা শব্দের অপভ্রংশ। ইহা আরবী শব্দ--অর্থ মাতা।

কাগজে জড়িয়ে, নিক্তিতে তুলিয়ে।"
বিবি বড় ও মেমির ওমেলা (৩)
ফেলিল ছিটায়ে, ফেলিল উদেয়ে। (৪)
দামাদ বড় রসিকের রসিকে
(হারে) তুলিল খুটিয়ে, (হারে) পড়াল বসায়ে।

(৩)

"গাছের কুলে কি হালে পুরুষে কিসেরই বাস্ত বাজে।
তোমারি সোয়ামী কি হালে নীলা দোসর বিয়ে করে।"
"আমি নীলে (?) থাকতে কিসের দুঃখ, কিহারে সাধু
দোসর বিয়ে কর।
আমার এক থালার ভাতরে সাধু দুই থালে হ'ল,
এক বাটার পানরে সাধু দুই বাটায় হ'ল,
এক ফুলের বিছানা রে সাধু দুইখানে হ'ল।"
"সোয়ামীরে বরিতে কি হালে পুরুষে কি কি ছামানা লাগে।"
"সোয়ামীরে বরিতে কি হালে সামিলে সোণার ফুল লাগে।
সোয়ামীরে বরিতে কি হালে সামিলে সোণার
ধান দুবলা লাগে ?"
"সতীনের বরিতে কি হালে পুরুষে কি কি ছামানা লাগে ?"
"সতীনের বরিতে কি হালে সামিলে আঁইশ্‌টে
কুলে চালন লাগে।"
"কি হারে সাধু কিসের দুঃখের দোসর বিয়ে কর।"
"স'য়া যদি খাবার পার, লো নীলে স'য়া বসে খাও,
না যদি খাবার পাও সাথে নায়া রে যাও।"
"একটু করে সোওরে সাধু তোমার শিথানে একটু বসি,
একটু সরে সোওরে সাধু তোমার পথানে একটু বসি।"
"আমার শিথানে রয়েছে রে নীলে উয়ার পায়ের জুতা,
আমার পথানে রয়েছে রে নীলে খেঁহি কুত্তার বাচ্ছা।"
ওই না কথা শুনে নীলা ধুলায় লুটায়ে কাঁদে।
ধুলায় লটায়ে কাঁদেরে নীলে, কোলের জয়ধর কোলে নিল,
ধুলায় লুটায়ে কাঁদেরে নীলে, ঝাঁপির ব্যাসাদ গলায় নিল।
আর কতদূর যায়েরে নীলে মধ্যি সমুদ্দুর পা'ল,।
মধ্যির সমুদ্দুর পেয়ে রে নীলে ধুলায় লুটায়ে কাঁদিতে লাগিল।
"পার কর পার কর রে গঙ্গা মা ঝাঁপির ব্যাসাদ দেব,
পার কর পার কর রে গঙ্গা মা কোলের ব্যাসাদ দেব।
ওই না কথা শুনেরে গঙ্গামা পার করিয়ে দিল,
এপার হতে ওপার যেয়েরে নীলে ধুলায় লুটায়ে
কাঁদিতে লাগিল।

"পার করলে পার ক'লে গঙ্গামা জোড়া পাঁঠা দেব,
পার করলে পার ক'লে গঙ্গামা জোড়া মোষ দেব।"
খবরের আগে খবর গেল নীলের বাপজানের আগে,
খবরের আগে খবর গেল নীলের চাচাজানের কাছে।
আগে পাছে মা বাপ মধ্যি চল্‌লো নীলে।
"কিসের দুঃখে নীলে তুমি হাঁটে নায়রে এলে ?"
"তোমাদের জামাই রে বাবাজান দোসর বিয়ে করে ;
তোমাদের জামাই রে চাচাজান দোসর বিয়ে করে।"

(৪)

আবের গাছটী কাটিয়া,
চন্দন কাঠটী ঝুরিয়া,
আ'লরে বাছার দামাদ নিহারে ভিজিয়া,
আ'লরে বাছাধন রোদে ঘামিয়া।
বিবি যদি তুমি আপন হও
আবের পাখা নিয়ে হাজির হও,
আবের জুতা নিয়া হাজির হও।
আমি কি সাধু হারে তোমার জুতার যোগ্য,
আমি কি সাধু হারে তোমার আবের পাখার যোগ্য ?
আবের পাখা দামাদ বেচিয়া,
আবের আবের জুতা দামাদ বেচিয়া,
আনরে তোমার আবের পাথার মানুষ।

(৬)

হলদি কোটা কোটা, জামাই মোটা মোটা।
সেও হলদি কোটবো না, সেও বিয়ে দেব না।
কাঁচা মেয়ে দুধের সর, কেমনি করবি পরের ঘর ;
পরে ধরে মারবি, খাম ধরিয়া কাঁদ্‌বি।
কান্‌ছি কোনা ছিটকীর ডাল, ডাল দিয়ে উঠাবি
পিঠের থাল।
মায়ে দিল তেল কাজল, বাপে দিল শাড়ী.
ভায়ে দিল লাঠির গুতা (?) চল্‌লো ভাতার বাড়ী।
[লাঠির গুতা খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল, মায়ে প্রবোধ দিতেছেন]।
ওমা ওমা কেঁদনা, সানের গালে তেওনা।
দুয়ারে যে ধান ছিটি পক্ষী খায়,
সোণার যে জামিরণ শশুর বাড়ী যায়।

(৭)

ও মোর সাধুরে কাঁঠালের কোন (?) ক্যালায়
গেল মুচিরে।

---

(৩) অর্থ—অভিমানিনীর অভিমানিনী। ওমেলা শব্দ পারশী গোমান শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ অহঙ্কার, বড়াই (কলিজার্থে) অভিমান।

(৪) উর্দ্ধ করিয়া।

আঁধারে কামাও, জোছনায় না যায়ো, কি মোর সাধুরে।
প্রভাতে খুখাল বিবির মাথায় কেশ ;
আমও তো বলো লো, ও যে ত চালে লো কি মোর সাধুরে
বিনি পাকীতে যায়ো না শ্বশুর বাড়ী।

(৮)

ফুলের সাজি কাঁধে না করেরে বেগম ফেরে গলি গলি
ফুলের সাজি কাঁধে নী করেরে বেগম ফেরে রাস্তায় রাস্তায়।
তোমার ফুলের দামরে বেগম হবে কত টাকা ?"
"আমার ফুলের দামরে রাজার বেটা হবে হাজার টাকা।"
"আমার সাথে চলরে বেগম দিব সীথির সিঁদুর।
আমার সাথে গেলে দিব নাকের নতনী।"
"তোমার সাথে গেলেরে রাজার বেটা মা বলিব কারে"
তোমার মাতার চেয়েরে বেগম আমার মা জান খুব ভাল।
"তোমার সাথে গেলেরে রাজার বেটা বাবাজান বলিব কারে।"
"তোমার বাবাজানের চেয়ে রে বেগম আমার বাবাজান ভাল।"
"তোমার সাথে গেলেরে রাজার বেটা চাচাজান বলিব কারে"
তোমার চাচাজানের চেয়ে রে বেগম আমার চাচাজান ভাল।"

(৯)

নিলে ঘোড়া বাঁধরে দামাদ ওরোফুলের ডালে,
নিলে ঘোড়া বাঁধরে দামাদ কেয়াফুলের ডালে।
সেই না ফুল বাড়িয়ে প'ল ছাওয়াল দামাদের গায়ে,
সেই না ফুল বাড়িয়ে প'ল রসিক দামাদের গায়ে।
সেই না ফুল খুটেরে দামাদ বাঁধে কোচার মুড়ের
সেই না ফুল খুটেরে দামাদ বাঁধে গামছার মুড়ের।
সেই না ফুল খুটেরে দামাদ পাঠায় বিবির মায়ের আগে।
সেই না ফুল পা'য়ারে বিবির মা কাঁদে মনে মনে,
সেই না ফুল পা'য়ারে বিবির বোন ভাবে দেলে দেলে,
কোথাকার কোন সৈয়দ লুটিয়ে নিবের আ'ছে।

(১০)

ধূপি ফুলের আটুনী, কুঞ্জে ফুলের ছাটুনী
চম্পাফুলের গিরিল বাগিয়ে।
ছাড়ে দেওরে কালেনি, ছাড়ে দেওরে মালেনি,
ছাড়ে দেও আমার টাউন ঘোড়ার লাগাম,
ছাড়ে দেও আমার চলন ঘোড়ার লাগাম।
আমি ফিরে আসৃতি খাব বাটার পান
আমি ফিরে আসৃতি কব দুচার কথা'।"
মায়ে ত বলেরে, ও ফুল মালারে,
তুমি ঘরে আসে খাও দুধ ভাত।
"অওত ভাত খাব না, অওত ঘরে যাবোনা
আমার মন চলেছে কালাচাদের সাথে
আমার মন চলেছে নীলা ঘোড়ার সাথে।
মায়েত বলেরে ও আল্লা রসুলরে
বেটির জন্ম না হয় কার ঘরেরে।

(১১)

স্ত্রী।— "ঝাঁক উড়ে ঝাঁক পড়ে
সাধু উয়্যারে বলে কি ?"
স্বামী।— "তোমার বাবা মিলায়াছ বাজার
খাড়ায়ে তামাসা দেখ।
ঐনা বাজলরে কিনিচ সিঁদুর
পড়িয়া নায়ারে যায়ো।
কিসের জন্নি নায়ারে যাবেরে
প্রিয়া, আমার "পুরণী" নাই ঘরে
কিসের জন্নি যাবারে নায়ারে
আমার জননী নাই ঘরে।"
"ঝাঁক উড়ে ঝাঁক পড়ে
সাধু উয়্যারে বলে কি ?"
"ঐ না বাজারে কিনিব নত্নী
পড়িয়া নায়ারে যায়ো।

(১২)

স্ত্রী।— ভাত ত কড় কড়, ব্যন্নন হ'ল বাসি,
ভাইধন আইছেরে নিবার রে
সাধুরে আমার নায়ার খাবার দাও।
স্বামী।— তুমি যাবে নায়ারে, রে ফুলমালা, আমার ভাত রাধবে কেডা,
তুমি যাবে নায়ারে, রে ফুলমালা, আমার পান বানাবি কেডা।"
"ছয় মাসের ভাত রে সাধু আমি ছয় দণ্ডে রাধিব
ছয়মাসের পানরে সাধু আমি এক দণ্ডেই দেব।"
"তুমি যাবে নায়ারে রে ফুলমালা আমার বেছানা দিবে কেডা,
ছয় মাসের বিছানারে সাধু এক দণ্ডেই দেব।"
তুমি নায়ারে গেলেরে ফুলমালা আমার কথা কইবে কেডা,
ছয়মাসের কথারে সাধু আমি এক দণ্ডেই দে'ব।"

কস্তুরীর কথা

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্‌সি

প্রাচীন কাল হইতে সভ্য মানব যে সকল সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, বোধ হয় তন্মধ্যে মৃগনাভি প্রাচীনতম। চীনদেশে ইহার বিশেষ আদর এবং পুরাতন চীনাসাহিত্যে রোগ-নাশক রূপে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক পাও-পুত্‌সী বলেন যে "মৃগনাভি সঙ্গে থাকিলে সর্পদংশনের ভয় থাকে না ; কস্তুরী-মৃগ সর্প ভক্ষণ করে—এজন্য একখণ্ড কস্তুরী সঙ্গে রাখিয়া পর্য্যটকগণ উহার গন্ধ দ্বারা সর্পকুলকে দূরে রাখিতে পারেন।" চীনদেশে কস্তুরীর নাম স্তায় হিয়াং—অর্থাৎ মৃগের সুগন্ধি।

আমাদের দেশেও ঔষধরূপে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে। 'ভাবঃপ্রকাশে' তিন প্রকার কস্তুরীর বর্ণনা আছে—কামরূপী, নেপালী ও কাশ্মীরি। তন্মধ্যে কামরূপী কস্তুরী কৃষ্ণবর্ণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইগুলি বোধ হয় তিব্বত ও চীনদেশীয় কস্তুরী; কেবল কামরূপবাসীরাই মধ্য-ভারতে ইহার ব্যবসায় করিতেন। 'ভাবঃপ্রকাশের' মতে নেপালী কস্তুরীর রং হইত নীল এবং উহার গুণও বিশেষ ভাল ছিল না। কাশ্মীরি কস্তুরী নিকৃষ্ট বলিয়া আদৃত হইত না।

উত্তেজক ও কামবর্দ্ধক রূপে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে; অল্প জ্বর, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও বীর্য্যহীনতায় ইহার ব্যবহার হয়। শাস্ত্রোক্ত 'স্বল্পকস্তুরী ভৈরব', 'মৃগনাভ্যাদ্যাবলেহ' ও 'বসন্ততিলকরস' ইত্যাদি ঔষধে কস্তুরীর ব্যবহার আছে।

ইয়োরোপীয়গণের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম ট্যাভারনিয়ার কস্তুরী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি প্রাচ্য-ভ্রমণে আসিয়া উহা দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাঠ করা যায় যে, তিনি পর্য্যটন কালে প্রায় ৭৬০৫ থলি কস্তুরী ক্রয় করিয়াছিলেন।

আরবগণ এই বস্তু ইয়োরোপে প্রচলিত করেন। সালাদিন ১১৮৯ খৃঃ রোম সম্রাটকে যে সকল উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে। আভিসেনা দশম শতাব্দীতে তাঁহার ভেষজ বিষয়ক পুস্তকে মৃগনাভিকে নানা রোগনাশক মহৌষধিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিখ্যাত পর্য্যটক মার্কোপোলো লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে প্রাচ্য দেশে মৃগনাভি প্রচলিত পণ্য দ্রব্য ছিল।

কস্তুরীমৃগের নাভিদেশে ইহা পাওয়া যায়, এজন্য ভারতবর্ষে ইহার নাম 'মৃগনাভি'। এই মৃগ উত্তরভারত ও মধ্য এসিয়ার অধিবাসী। উত্তর সাইবেরিয়া ও চীনদেশের উত্তরপূর্ব্ব ভূখণ্ডেও এই মৃগ দেখা যায়। কিন্তু বিশেষ করিয়া মোঙ্গলীয়া, তিব্বত, নেপাল, কাশ্মীর, আসাম, চীনদেশের অন্তর্গত সুরকুটান এবং বৈকাল হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেই কস্তুরীমৃগ হইতে মৃগনাভি সংগৃহীত হয়।

কস্তুরী মৃগের জননেন্দ্রিয়ের আচ্ছাদনচর্ম্মের ঠিক সম্মুখভাগে উদরের ভিতরের একটি থলিতে কস্তুরীর উদ্ভব হয়। কেবলমাত্র পুরুষ-হরিণেরই এই সুগন্ধি জন্মে। কস্তুরী-থলির অন্তরদেশে ছোট ছোট কতকগুলি গর্ত্ত আছে। এখানে কস্তুরী জন্মে ও পরে পরিচালিত হইয়া থলিতে উপস্থিত হয়। প্রথম ইহার বর্ণ ঈষৎ লাল এবং শিরাপের মত ঘন থাকে। তারপর হরিণের মৃত্যু ঘটিলে ক্রমশঃ উহা কৃষ্ণবর্ণ দানাদার পদার্থে পরিণত হয়। ২।৩ বৎসর বয়সের হরিণের কস্তুরী বড় একটা দেখা যায় না। তার পর যৌবন উপস্থিত হইলে কস্তুরীর উদ্ভব হইয়া ৬।৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত থাকে। এই বয়স পার হইয়া গেলে হরিণের আর কস্তুরী থাকে না। সঙ্গীয় হরিণীর যখন যৌবনস্পৃহা জাগরিত হয়, তখনই হরিণের বেশী পরিমাণ কস্তুরী দেখা যায়। এই দুই কারণে বোধ হয় যে যৌন-সংশ্রবের সঙ্গে কস্তুরীর উদ্ভবের কোন সম্বন্ধ আছে। কস্তুরীমৃগ যেখানে থাকে, তাহার চতুর্দ্দিকে গন্ধ পাওয়া যায়। শিকারীরা শিকার খুঁজিতে এই গন্ধই অনুসরণ করে।

এক এক থলিতে আড়াই তোলা হইতে পাঁচ তোলা পরিমাণ কস্তুরী হয়। এই থলিগুলি দেখিতে গেলে, এক পার্শ্বে একটু চাপা। কোন কোন সময় পার্শ্বস্থ চামড়া এমন কি জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত কস্তুরী থলির সঙ্গে একসঙ্গে কাটিয়া বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে। কখনও থলির পার্শ্বের সকল চামড়া ইত্যাদি সরাইয়া কেবলমাত্র একটি নীল পর্দ্দাসহ কস্তুরী কাটিয়া বাহির করা হয়। কস্তুরী একটি নীল পর্দ্দার থলিতে থাকে। এজন্য এই কস্তুরীর চলিত নাম 'নীলকস্তুরী'। এই পর্দ্দা অতি সূক্ষ্ম, সামান্য নাড়াচাড়িতেই উহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। এজন্য ইহার ভিতরকার কস্তুরীতে ভেজাল মেশান সহজ কার্য্য নয়। একারণ সাধারণতঃ নীলকস্তুরী অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে এবং বেশীমূল্যে বিক্রীত হয়।

কস্তুরীমৃগ অত্যন্ত বুনো প্রকৃতির হয়। ইহারা সংঘবদ্ধভাবে বাস করে না, কিন্তু হরিণ-হরিণী প্রায়ই একসঙ্গে থাকে। দিবাভাগে এই হরিণগুলি লুকাইয়া থাকে। একবার সন্ধ্যায় আর একবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ইহারা আহার অন্বেষণে বাহির হয়। এই হরিণ শিকার সহজ কার্য্য নয়। শিকারি কুকুর ইহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠে না; ইহারা এতই ক্ষিপ্রগতি যে পার্ব্বত্য প্রদেশেও ইহারা অনুসরণশীল কুকুরকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া যায়। ইহারা যেখানে বাস করে তা'র চারিদিকে বেড়া তৈয়ারী করা হয়—আর তা'র মাঝে মাঝে ফাঁক রাখিয়া সেখানে ফাঁদ পাতা হয়। এই ফাঁদের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়—কারণ বড় বড় জন্তু ইহাদের ফাঁদে পাইলে সানন্দে সুস্বাদু হরিণমাংস ভোজন করে। কস্তুরী কম থাকুক আর বেশী থাকুক, শিকারীরা সকল হরিণকেই হত্যা করিয়া মৃগনাভি আহরণ করে।

সাধারণতঃ ছোটবড় মোট ২২টি কস্তুরীর থলি একসঙ্গে করিয়া এক একটি কট্টি তৈয়ারী হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক একটি কট্টি তৈয়ার করিতে ২২টি হরিণের জীবননাশ ঘটে। কিন্তু শিকারীরা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বিবেচনাশক্তির অভাবে যে কোন বয়সেরই হউক না কেন হরিণ-হরিণী নির্ব্বিচারে হত্যা করে। ইহাতে প্রতি কট্টিতে গড়ে প্রায় ৩০।৩২টি মৃগের মৃত্যু ঘটে। এক অচিনলু হইতেই বৎসরে গড়ে ২০০০ কট্টি চালান যায়। ইহাতে ৬০০০০ হাজার হরিণের মৃত্যু ঘটে। ইহার সঙ্গে সঙ্গোপনে, কাহানসিঙ্গ বাতাঙ্গ ইত্যাদি সহরের চালান যোগ দিলে দেখা যাইবে যে বৎসরে কস্তুরীর জন্য প্রায় ১০০০০০ হরিণের প্রাণ বিনষ্ট হয়। ইহাদের জনন ক্ষমতাও সামান্য। এইরূপ চলিতে থাকিলে কস্তুরী মৃগের বংশ লোপ পাইবে, কস্তুরী আর পাওয়া যাইবে না।

সারেঙ্গের লামাগণ ইহা উপলব্ধি করিয়া এই অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন যে কোন শিকারীকে কস্তুরীমৃগ হত্যা করিতে দেখিলে তাহার দুই হস্ত ছেদন করিয়া তাহাকে মন্দিরের কপাটের উপর লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করা হইবে।

এখন বিচার্য্য ইহাই যে হত্যা না করিয়া কস্তুরী মৃগ হইতে মৃগনাভি সংগ্রহ করা যায় কি না। খোঁয়াড়ে ধরিয়া এই বন্য হরিণের নিকট হইতে কস্তুরী আহরণ করা যাইবে না। যদি ইহাদিগকে কোন বদ্ধস্থানে আবদ্ধ

করিয়া বাঁধ করিতে দেওয়া হয়, তবে কস্তুরী আহরণের একটী পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহারা অনেক সময় রৌদ্রতাপে শুইয়া শুইয়া বিশ্রাম করে। এই সময় শরীরের যে স্থানে কস্তুরী থাকে, তাহা দেখা যায়। তখন হরিণকে কোনরূপ ব্যথা না দিয়া বোধ হয় কস্তুরী আহরণ করা যায়।

মৃগনাভি বহুমূল্য সামগ্রী। প্রতি তোলার মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে ...টাকা। এজন্য ইহাতে ভেজাল মিশাইবার প্রলোভন বড় বেশী। যাহারা কস্তুরী ক্রয় করে তাহারা এজন্য নিয়ম করিয়াছে যে হরিণের নাভিদেশে যে থলিতে উহা জন্মে সেখান হইতে বাহির না করিয়া ঐ থলিশুদ্ধ বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও ভেজাল মিশান বন্ধ হয় না। শিকারীদের নিকট হইতে চীনা ব্যবসায়ীরা উহা কিনিয়া লইয়া বন্দরে আসিবার পথে বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে থলিগুলির মুখ উন্মোচন করে এবং শুষ্ক রক্ত, অন্য জৈবিক পদার্থ ও মাটি কস্তুরীর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পুনরায় থলির মুখ বন্ধ করে। বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে বোঝা যায় না যে থলির মুখ কোন দিন খোলা হইয়াছিল। এ কারণ আসল কস্তুরী একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে সাংহাই গভর্ণমেণ্ট আসল কস্তুরী পাইবার এক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কস্তুরীর বাণিজ্যশুল্কের পরিবর্ত্তে তম্মূল্যের কস্তুরী লওয়া হইত এবং আদেশ ছিল যে যদি কেহ ভেজাল দেওয়া কস্তুরীর থলি বাণিজ্যশুল্ক রূপে দেয় তবে রাজ-কর্ম্মচারী যেন তৎক্ষণাৎ সে ব্যবসায়ীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

কস্তুরীর আসল নকল বিচারের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ কয়েকটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। যদি রক্ত মিশ্রিত থাকে, তবে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে উহার কিয়দংশ উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ দেখা যায়। সুরাসার ও জলে কতভাগ গুলিয়া যায় তাহা দেখিয়াও কস্তুরীর গুণের ক্রমবিভাগ করা যায়। আসল কস্তুরী জলে গুলিয়া তাহাতে Bichloride of mercuryর জল দিলে কোন বস্তু জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে না। কিন্তু গলনাটের আরক ও লেড এসেটেডের জল দিলে একটি পদার্থ বিচ্ছিন্ন হইতে দেখা যায়। মহিষের রক্তের সঙ্গে এমোনিয়া মিশাইয়া শুষ্ক করিয়া আসল কস্তুরীর সঙ্গে মিশাইয়া কস্তুরীরূপে বাজারে বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং কস্তুরীতে অ্যামোনিয়ার সামান্য গন্ধও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু পুরাতন আসল কস্তুরীর গন্ধ পুনর্জীবিত করিতে অনেক সময় এমোনিয়া ব্যবহার করা হয়। এজন্য এমোনিয়ার গন্ধমাত্রই কস্তুরীকে নকল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

উত্তেজকরূপে কস্তুরীর ব্যবহার আমাদের দেশে দীর্ঘকাল চলিয়া আসিতেছে। যখন মানুষে আর যমে রোগী লইয়া যুদ্ধ চলিতে থাকে, তখন কস্তুরী মানুষের শেষ অস্ত্র। কস্তুরী আর মকরধ্বজ ছাড়া এ দেশের কোন বৃদ্ধ বাঁচিয়া থাকিতে ভরসা পান না। আমাদের দেশে ইহা ব্যবহারের অনেক পরে ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়াতে ইহা স্থান পাইয়াছে।

ঔষধ ও সুগন্ধিরূপে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। অন্ত ভেষজের সঙ্গে বা এমনই শুধু মধুর সঙ্গে ইহা আমাদের দেশে সেবনীয়। ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া অনুসারে ইহা সুরাস'র সহ আরকরূপে সেব্য; শলাকাবিদ্ধ করিয়া (Injection) ও ইহার প্রয়োগ আছে।

সুগন্ধিরূপে ইহার প্রয়োগ এদেশে প্রথম হয়। কিন্তু বিদেশীয়গণ সুরাসারে দ্রব করিয়া সুরাসারযুক্ত অন্য সুগন্ধির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহার এক অভিনব প্রয়োগ-প্রণালী আবিষ্কৃত করিয়াছেন। সেই অবধি সুগন্ধির স্থায়িত্বলাভের জন্য মৃগনাভির ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কস্তুরীর আরক তৈয়ারীর বহুবিধ প্রণালী প্রচলিত আছে। কেহ Glycerine, জল ও সুরাসার—কেহ বা জল ও সুরাসার—আবার কেহ বা কেবল সুরাসার কস্তুরীর দ্রাবক রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুরাসারে শতকরা ৪ ভাগ কস্তুরী দিয়া যে আরক প্রস্তুত হয় তাহা গন্ধগুণে প্রচলিত অন্য আরক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ সুগন্ধিরূপে কস্তুরীর ব্যবহারে বিশেষ অভিজ্ঞতা আবশ্যক।

বিজ্ঞান এই বহুমূল্য জৈবিক পদার্থটীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া সংযোগ দ্বারা ইহা সৃষ্টি করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেছে। এক জার্ম্মাণীতেই কস্তুরী তৈয়ারের জন্য ১৯২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত তের রকম পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া উহার পেটেণ্ট লওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোনটির গন্ধই মৃগনাভির অনুরূপ নহে।

বিদ্যুতের কথা

শ্রীসরোজেন্দ্র নাথ গুহ এ-এম-ই-ই (B. Tech)

বিদ্যুৎ (electricity) বলিলে আজকাল সকলেই একটা কিছু ধারণা করিতে পারেন; কারণ ইহার ব্যবহার আজকাল সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু বিদ্যুৎ কি এবং কোথা হইতে ও কি উপায়ে ইহার উৎপত্তি, তাহা সাধারণ লোকের নিকট অজ্ঞাত। বিদ্যুতের ব্যবহার না থাকিলে যে লোকের কত অসুবিধা হইত, তাহা আর বলিবার নহে। বিদ্যুতের ব্যবহারের জন্যই আমরা সকল রকমের সুখ সুবিধা পাইতেছি এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি। বিদ্যুৎ কেবল আমাদের বিলাসিতার সামগ্রী স্বরূপই ব্যবহার হয় না, আমাদের বাস্তব জীবনেও ইহার অতীব প্রয়োজন আছে। বিদ্যুতের ব্যবহার না থাকিলে খনি হইতে মণিমুক্তা ও কয়লা উত্তোলন করা এবং পাহাড়ের তলদেশ দিয়া টানেল (tunnel) তৈয়ার করা একরূপ অসাধ্যই হইত। বিদ্যুতের উপকারিতার কথা বলিয়া শেষ হয় না। বাস্তবিকই বিদ্যুৎ একটী আশ্চর্য্য জিনিষ। সাধারণের ধারণা কল চলে, বিদ্যুৎ তৈয়ার হয়—তাহাতে আলো জ্বলে, পাখার বাতাস পাওয়া যায় এই পর্য্যন্ত। বিদ্যুতের খবর কোন্ সময়ে মানব সমাজে আসিয়াছিল, এবং কোন্ কোন্ Stageএর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ আজকালকার অবস্থায় আসিয়াছে, তাহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে বিদ্যুতের খবর জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, আজকাল তাহার খবর আমরা কত সহজেই না জানিতে পারি।

পূর্ব্বে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে লোকের কি ধারণা ছিল এবং কোন্ কোন্

অবস্থার ভিতর দিয়া ক্রমে ইহার উন্নতি হইয়া আজকালকার অবস্থায় পঁহুছিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব।

জগতের প্রারম্ভ হইতেই বিদ্যুৎ বর্ত্তমান। বিদ্যুতের কথা আমরা বজ্রপাত হইতেই জানিতে পারি। পুরাকালের লোকেরাও আমাদের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন; এবং তাঁহারা বজ্রপাতের কারণ কি তাহা বাহির করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃত কারণ অপেক্ষা এ সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী বেশী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

খৃঃ পূর্ব্ব ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে থেলস্ (Thales) নামে এক বৈজ্ঞানিক amber নামে একপ্রকার পদার্থ আবিষ্কার করেন এবং তাহা ঘর্ষণ করিলে পর তাহাতে আকর্ষণী শক্তি পান। বৈদ্যুতিক জগতের ইহাই প্রথম সূত্রপাত। থেলস্ (Thales) ও তাঁহার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরীক্ষা করেন নাই। তার পর খৃঃ পূর্ব্ব ৩২১ বৎসরে থিওফ্রেটাস (Theophratus) নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক lyncurium নামে একপ্রকার পদার্থ আবিষ্কার করেন। তাহাও ঘর্ষণ করিলে পর আকর্ষণী শক্তি লাভ করে। কিন্তু তিনিও এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া যান নাই। কাজে কাজেই পরবর্ত্তী কালে লোকেরা এই সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

বিদ্যুতের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা ষোড়শ শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হয়। এই শতাব্দীর শেষভাগে Doctor Gilbert নামে একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে গন্ধক, রজন, ও গালাবাতি প্রভৃতি অনেক বস্তু ঘর্ষণ করিলে পর amber এর ন্যায় আকর্ষণীশক্তি সংযুক্ত হয়। তাঁহার এই আবিষ্কার পরবর্ত্তীকালে বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক আলোচিত ও পরীক্ষিত হইয়া বিদ্যুতের প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আমরা যদি একটী কাচের দণ্ডকে কিম্বা গালাকে শুকনা রেশমী রুমাল দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহা কাগজের ছোট ছোট টুকরার নিকট ধরি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ কাচদণ্ড কিম্বা গালা দ্বারা কাগজটুকরাগুলি আকৃষ্ট হয়। ঘর্ষণ করিবার ফলে গালাবাতিতে ও কাচদণ্ডে একপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়াই তাহারা এইরূপ আকর্ষণ করে। ঘর্ষণ করিলে পর আমরা দুই প্রকার বিদ্যুৎ পাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কাচদণ্ডকে রেশম দ্বারা ঘর্ষণ করিলে পর যোগ-তাড়িত এবং গালাবাতিকে ফ্লানেল দ্বারা ঘর্ষণ করিলে বিয়োগ তাড়িত পাওয়া যায়। বিদ্যুতের ভাব (charge) কেবল ঘর্ষিত বস্তুর উপরই নির্ভর করে না; কিন্তু যাহা দ্বারা ইহা ঘর্ষণ করা যায়, তাহার উপরও ইহার প্রভাব আছে। যোগ ও বিয়োগ—দুই প্রকার বিদ্যুৎ আছে। ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে similarly charged দুইটী বস্তু পরস্পর বিতাড়িত এবং unsimilarly charged দুইটী বস্তু পরস্পর আকৃষ্ট হয়।

বিদ্যুৎ চলিতে হইলে তাহার রাস্তার প্রয়োজন হয়। যাহা দ্বারা বিদ্যুৎ চলিতে পারে তাহাকে পরিচালক এবং যাহা দ্বারা বিদ্যুৎ চলিতে পারে না তাহাকে অপরিচালক কহে। পরিচালক হইতে যাহাতে বিদ্যুৎ না পলায়ন করিতে পারে সেইজন্য ইহা একপ্রকার অপরিচালক পদার্থ দ্বারা আবৃত (insulated) করা হয়; কারণ বিদ্যুৎ পলায়ন করিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ঘর্ষণ করিবার ফলে আমরা যে বিদ্যুৎ পাই, তাহা আমাদের কোন কাজে আসে না; কিন্তু ইহা বৈদ্যুতিক শক্তির প্রথম ধাপ।

(২)

ঘর্ষণের ফলে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ খুব সামান্য; সুতরাং বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ১৬৭৫ খৃঃ অটো ভন গুরিক (Otto Von Guericke) নামক একজন বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যুতিক কল তৈয়ার করেন। প্রথমতঃ এই machineএ একটী Sulphurএর Sphere ছিল এবং তাহা এক হাত দ্বারা একই axisএ ঘুরাইতে হইত এবং অপর হাত দ্বারা ইহা চাপিয়া ধরিতে হইত যাহাতে ইহা ঘর্ষণ পাইতে পারে। ক্রমে ক্রমে এই কলের পরিবর্ত্তন হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। অবশেষে ১৭৬০ খৃঃ Ramsden নামক একজন বৈজ্ঞানিক ইহার উন্নতি বিধান করেন। তাঁহার electric machineএ একটী গোল কাচের (circular glass) plate ছিল এবং তাহা cushion দ্বারা ঘর্ষিত হইত। বর্ত্তমানের electric machine Ramsdenএর machineএর একটু উন্নত ধরণ। এই machineএ শুকনা atmosphereএ বেশ ভাল কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু ঠাণ্ডার দিনে ইহা বড়ই কষ্টদায়ক। Influence machine তৈয়ার হইবার পর হইতে ইহার ব্যবহার হ্রাস পাইয়াছে।

Influence সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। আমরা জানি যে কোন electric bodyর নিকট কোন বস্তু ধরিলে পর, তাহা আকর্ষিত হয় এবং আকর্ষিত হইলে পর সেই বস্তুটী ঐ বিদ্যুৎসম্পন্ন electrified বস্তু হইতে একটী বৈদ্যুতিক শক্তি (electric charge) পায়। কিন্তু এখন আমরা জানিব যে স্পর্শ (actual contact) ছাড়াও কোন বস্তু electric charge পাইতে পারে; এবং তাহাকেই 'Influence' অথবা 'Electrostatic Induction' কহে। অনেক প্রকারের Influence machine আছে। তন্মধ্যে Wimhurst machineএর প্রচলনই খুব বেশী।

Wimhurst machine হইতে বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তাহা সঞ্চয় (Store) করিবার কোন উপায় নাই। তখন চিন্তা চলিতে লাগিল, কি উপায়ে এই বিদ্যুৎকে সঞ্চয় করা যাইতে পারে। ১৭৪৫ খৃঃ ভন ক্লিষ্ট (Von Kleist) নামক একজন ধর্ম্মযাজক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, তিনি যদি বোতলের ভিতরে কোন ক্রমে বিদ্যুৎ প্রবেশ করাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি উহা Store up করিতে পারিবেন; যেহেতু glass nonconductor। সুতরাং তিনি একটী বোতলের অর্দ্ধেক জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন; এবং তাহাতে একটী তারের (wire) এক দিক প্রবেশ করাইলেন; এবং অন্য দিক (terminal) একটী ছোট বৈদ্যুতিক কলের সাথে সংযুক্ত করিলেন। অল্প ক্ষণ পর তাহাতে যথেষ্ট বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইয়াছে মনে করিয়া যেমনি তিনি বোতলটি সরাইতে গেলেন,

আমি একটী প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ধাক্কা পাইলেন। ইহার কিছু দিন পরে Prof. Muschenbrock of Leyden ও তাঁহার ছাত্র Cuneus উভয়েই এই বিষয়ে আলোচনা ও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও এই পরীক্ষা করিবার সময় ভয়ানক shock পাইয়াছিলেন এবং Prof. Muschenbrock এতদূর অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন. "আমি সমস্ত ফ্রান্সরাজ্যের বিনিময়ে দ্বিতীয় আর একটী ধাক্কা খাইতে প্রস্তুত নহি।" যাহা হউক, এই সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াও তাঁহারা বিদ্যুৎ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলেন এবং Muschenbrockএর সম্মানের জন্য ইহার নাম "Leyden jar" রাখা হইল।

প্রথম প্রস্তুত (original) ধারণার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। জলের পরিবর্ত্তে ভিতরে টিনের পাত ও বাহিরে আর এক প্রকার বস্তু দ্বারা আবৃত হওয়ায় ইহা হইতে ভাল ফল পাওয়া যাইতে লাগিল। Leyden jarএর বিদ্যুৎ ধারণ করিবার শক্তি (capacity) খুব বেশী।

১৭৮০ খৃঃ Luigi Galvani নামক একজন ইটালী দেশীয় বৈজ্ঞানিক প্রাণিগণের উপর বিদ্যুতের প্রভাব পরীক্ষা করিতেছিলেন ; এবং সেই জন্য কতকগুলি সদ্যমৃত ব্যাঙ একটী তামার তার দ্বারা ঠ্যাং একত্রীকৃত করিয়া জানালার লোহার গরাদের সাথে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। কতক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন যে, ব্যাঙএর শরীরে বিদ্যুৎ প্রবেশ করাইলে পর, তাহার পা যেরূপ একত্রীকৃত (twitch) হয়, ইহাও ঠিক সেরূপ হইয়াছে। তিনি জানিতেন যে, বিদ্যুৎ প্রবেশ ব্যতীত এই প্রক্রিয়া হইতে পারে না। তিনি চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন ভাল কারণ বাহির করিতে না পারিয়া, এবং প্রাণিগণের tissueর মধ্যে একপ্রকার বিদ্যুৎ জন্মায় এই মনে করিয়া, ঘোষণা করিলেন যে, তিনি একপ্রকার "Animal Electricity" আবিষ্কার করিয়াছেন।

কিন্তু কিছু দিন পরে Prof. Allesandro Volta নামক সেই দেশীয় একজন বৈজ্ঞানিক ইহার প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিলেন যে, জানালার লোহা ও তামার তারের সংস্পর্শে (contact) এই বিদ্যুতের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহাতে এই অবস্থা ঘটিয়াছে। Volta দেখিলেন যে, দুইটী ভিন্ন metal যখন বায়ুর সংস্পর্শে রাখা যায় তখন একটী Positive ও আর একটী negative বৈদ্যুতিক শক্তি (charge) পায় ; কিন্তু তাহা খুব সামান্য। এই যুক্তি সপ্রমাণ করিবার জন্য ১৮০০ খৃঃ Volta দুইরকমের metal অনেকগুলি করিয়া স্তূপীকৃত করিলেন। ইহার নাম Voltaic pile। ইহাতে copper ও Zinc ছিল এবং তাহাদের পরস্পর হইতে লবণ-জল মিশ্রিত কাপড় দ্বারা পৃথক করা হইত। এই স্তূপের এক দিকে থাকিত Zinc ও অপর দিকে থাকিত Copper ; এবং সেই terminal দুইটী যখন একটী তার দ্বারা সংযুক্ত করা হইত, তখনই continuous current প্রবাহিত হইত। বিদ্যুতের প্রবাহ (continuous current) জানিতে হইলে আমাদের Electrical Pressure সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। জল কোন পাত্রে রাখিলে তাহার যেমন একটা Pressure হয়, এবং তাহা জলের উচ্চতার উপর নির্ভর করে, কিন্তু তাহাও পাত্রবিশেষে জলের পরিমাণের উপরও নির্ভর করে। বিদ্যুতের Pressureও সেইরূপ। ইহা বিদ্যুতের quality ও conductorএর capacityর উপর নির্ভর করে। বিদ্যুতের Pressureকে Potential কহে, এবং তাহা উচ্চ হইতে নিম্ন দিকে ধাবিত হয়। পৃথিবীর (earth) potential negative, এবং বিদ্যুৎ সর্ব্বদা positive potential হইতে negative potentialএ প্রবাহিত হয়। জল যেমন কোন pipeএর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইলে কিছু বাধা প্রাপ্ত হয়—বিদ্যুতেরও চলিবার পথে ঠিক তেমনি বাধা আছে। তাহাকে resistance কহে।

প্রত্যেক জিনিষের পরিমাণের যেমন একটা মাপ আছে বিদ্যুতেরও তাহাই। Electrical Pressure বা potentialএর unit হইল volt। বিদ্যুৎ প্রবাহের (actual flow of electricity) unit হইল ampere এবং resistanceএর unit হইল ohm। কোন জিনিষ মাপিবার সময় যেমন আমরা এত সের বলি, বিদ্যুতের বেলায়ও এত volt বা এত ampere বিদ্যুৎ বলা হয়।

তৎপরে Volta pile ছাড়িয়া cell তৈয়ার করিতে মনোনিবেশ করিলেন ; এবং একটী পাত্রে Zinc অথবা copper plate dilute sulphuric acidএ নিমজ্জিত রাখিয়া একপ্রকার cell তৈয়ার করিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি ভালরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না ; কারণ, তাহার cellএর বিদ্যুৎ সমান তেজে (constant strength) থাকিত না ; এবং খুব তাড়াতাড়ি দুর্ব্বল (weaken) হইয়া পড়িত।

Cell হিসাবে Danielই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহাতে একটী বড় তামার পাত্রে একটী porous pot ও তাহার ভিতর একখণ্ড Zinc থাকে ; এবং porous potএর ভিতর dilute sulphuric acid ও তামার পাত্রে strong copper sulphate solution ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং circuit পূর্ণ করিলেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে থাকে।

অনেক প্রকার cellএর প্রচলন আছে ; যেমন silver zinc, platinum zinc, carbon cell ও dry cell। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে dry cellএর সুবিধা খুব বেশী। অনেকগুলি cellকে একত্র করিয়া আমরা battery তৈয়ার করিতে পারি। এই cell হইতে সাধারণতঃ আমরা নিম্ন (low) Voltএর বিদ্যুৎ পাই ; কারণ একটী cellএর বৈদ্যুতিক ধাক্কা (electromotive force) ১·৫ হইতে ২ Volt পর্য্যন্ত। Cellগুলিকে 'series' অথবা 'parallel' ভাবে connection করিয়া আমরা ভিন্ন ভিন্ন ফল পাইতে পারি। 'series' ভাবে connection করিলে current একটী cellএর সমান হয়, কিন্তু voltage যতগুলি cell connection করান যায় তত গুণ হয়। 'Parallel' ভাবে connection করিলে voltage একটী cell এর সমান হয় ; কিন্তু current যতগুলি cell connection করান যায় তত গুণ হয়। ইহাই হইল 'Series' ও 'Parallel' ভাবে দলবদ্ধ করিবার বিভিন্নতা।

Cell দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার পর বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কি উপায়ে এই বিদ্যুৎ store করা যায়। Leyden

jar দ্বারা যদিও বিদ্যুৎ store করা যায়, কিন্তু তাহা একেবারে discharge হইয়া যায়। তাই তাহাতে অসুবিধা আছে। ১৮৭৮ খৃঃ Gaston Plante নামক একজন বৈজ্ঞানিক একপ্রকার accumulator তৈয়ার করেন। মোটামুটীভাবে যন্ত্রটী এইরূপ—ইহাতে দুইটী সীসার পাত আছে; তাহারা পরস্পর insulating material দ্বারা বিভক্ত এবং তাহা dilute sulphuric acidএ নিমজ্জিত থাকে। ইহার দুই terminalsএ cell বা Dynamoর terminal সংযুক্ত করিয়া কতক্ষণ ইহাতে বিদ্যুৎ pass করাইয়া ইহাকে charge করিতে হয়। ১৮৮১ খৃঃ Faure নামক একজন বৈজ্ঞানিক ইহার কিছু উন্নতি বিধান রিয়াছেন।

Storage Batteryকে charge করিতে হইলে যে electrical source দ্বারা ইহা charged হইবে তাহার যত Voltage, ইহারও তত Voltage থাকা দরকার; না হয় ইহা পুড়িয়া যাইবে। একটী Storage Battery সাধারণতঃ দুই Voltএর হয়। আমরা যদি ২২০ Volt এর main হইতে Storage Battery charge করিতে চাই, তাহা হইলে অন্ততঃ ১১০টী battery in series join করিতে হইবে। Storage battery সাধারণতঃ dynamo হইতে charged হয়। Storage batteryর capacity ampere hourএ কথিত হয়। Ampere hour বলিতে আমরা বুঝি যে অত ampere বিদ্যুৎ এত ঘণ্টা হইতে pass করান হইয়াছে এবং dischargeএর সময়ও প্রায় তত ampere hour পাওয়া যায়। Voltaic cell অথবা Accumulator হইতে আমরা যে বিদ্যুৎ পাই তাহার Voltage বড় কম। অনেক সময় আমাদিগের বেশী Voltageএ কম currentএর দরকার হয়। তখন আমরা 'Induction coil'এর সাহায্য গ্রহণ করি। Magnet যেমন magnetism induce করে, তেমনি current of electricityও অন্য current of electricityকে induce করিতে পারে। ইহাই Induction coilএর principle।

যদি আমরা দুইটী তার পরস্পরের নিকট রাখি, এবং একটীর দুই terminal একটী batteryর সাথে ও অপরটীর দুই terminal একটী galvanometer * এর সাথে সংযুক্ত করি, এবং যদি battery হইতে প্রথম coilএ current পাঠাই, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, galvanometerএর needleটীও deflected হয়। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, দ্বিতীয় coilটীতেও current উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু needle টী অবিলম্বেই আবার ইহার original positionএ আসে, এবং ইহাতে বুঝা যায় যে, বৈদ্যুতিক শক্তি কেবল ক্ষণিকের জন্যই ইহাতে সৃষ্টি হইয়াছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রথম coilএ current বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ আর galvanometerএ কোন deflection হয় না, কিন্তু যখনই আবার প্রথম coilএর বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখনই আমরা দেখিতে পাই যে, galvanometerএ আবার deflection হইয়াছে; অর্থাৎ দ্বিতীয় coilএর currentএর অস্তিত্ব ইহাতে ধরা পড়িয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, একটী current আর একটী currentকে, যখন সে প্রবাহিত কিম্বা বন্ধ হয় (on and off), তখনই কেবল induce করিতে পারে।

যে coilএ current যায়, তাহাকে Primary ও যে coilএ current induced হয়, তাহাকে Secondary coil কহে। যদি দুইটী coil এক রকমের হয়, তাহা হইলে Primaryর Voltageএর মতই Secondaryর induced Voltage হইবে। Secondary coilএর number of turns যদি দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে induced Voltageও দ্বিগুণ হইবে। এইভাবে Secondary coilএর number of turns দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, অর্দ্ধগুণ কিম্বা বহুগুণ করিয়া আমরা সেই পরিমিত induced voltage পাইতে পারি।

Induction coilএর Scientific purposeএই বেশী দরকার হয়। X-Ray ও Wirelessএ ইহার ব্যবহার বেশী। Battery হইতে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় এবং তাহা যে কাজে লাগান যায়, তাহা আমরা জানি। Batteryর electric current ফুরাইয়া যাইতে পারে; এবং electrical currentএর বেশী ব্যবহার হইলে ইহাতে সঙ্কুলানও হয় না। তাই সর্ব্বসময় electric current পাইবার জন্য একপ্রকার যন্ত্রের সৃষ্টি হয়—তাহাকে Dynamo কহে। Dynamoর সৃষ্টি জানিতে হইলে আমাদিগকে magnet ও magnetismএর কথা কিছু জানিতে হইবে, কারণ magnetismএর সাথে dynamo বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

জগতের অনেক স্থানেই একপ্রকার লৌহ পাওয়া যায়, যাহা অন্য লৌহকে আকর্ষণ করে এবং সূত্র দ্বারা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলে পর উত্তর ও দক্ষিণ মুখে অবস্থিতি করে। ইহাকে Loadstone কহে এবং প্রাচীন-কাল হইতেই ইহার গুণ জানা আছে। Loadstoneই বাস্তবিক পক্ষে আসল চুম্বক। ইহা ছাড়া artificial চুম্বকও আছে। যদি আমরা এক টুকরা steel loadstone এ ঘর্ষণ করি, তাহা হইলে steelও চুম্বক হইয়া যায়। এই উপায়ে আমরা অনেক magnet তৈয়ার করিতে পারি, কিন্তু মজা এই যে ইহাতে loadstone তাহার magnetic শক্তি হারায় না। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য উপায়েও চুম্বক তৈয়ার করা যাইতে পারে। এই সকল উপায়ে প্রস্তুত চুম্বককে artificial magnet কহে। লৌহ খুব তাড়াতাড়ি magnetised হয়; কিন্তু steel হইতে দেরী লাগে। লৌহ যেমন তাড়াতাড়ি magnetised হয়, তেমনি তাড়াতাড়ি demagnetisedও হয়। এইজন্য Steel দ্বারা magnet তৈয়ার করাই প্রশস্ত।

যদি আমরা একটী bar-magnetকে লৌহগুঁড়ার (iron-filings) উপর দিয়া গড়াইয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, magnetএর দুই terminalএ গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে iron filings আবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু barএর মধ্যভাগেই মোটেই আবদ্ধ হয় না। যে দুই terminalsএ ironfilings গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে আবদ্ধ থাকে, তাহাকেই magnetএর pole কহে। কোন magnetকে সূতা দ্বারা ঝুলাইয়া দিলে পর ইহার দুই terminal উত্তর ও দক্ষিণমুখ হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে।

* current মাপিবার যন্ত্র।

উত্তরমুখী terminalকে north pole ও দাক্ষিণমুখী terminalকে South pole কহে।

প্রত্যেক magnetএরই দুইটী করিয়া pole থাকে এবং সেখানেই magnetism সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আমরা মনে করিতে পারি যে, একটী bar magnetকে মধ্যভাগে ভাঙ্গিয়া দুইটী ভিন্ন ভিন্ন Single pole বিশিষ্ট magnet পাইতে পারি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ঘটে না। magnet ভাঙ্গিবা মাত্রই তাহারা দুই pole বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দুইটী magnet হয়। magnet দ্বারা আজকাল জগতের অনেক কাজ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে compass একটী অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। ইহা না হইলে নাবিকদিগের পক্ষে জাহাজ চালান অসম্ভব হইত। উত্তাল, তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর মধ্যে ইহার সাহায্যে নাবিকগণ দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া তাহাদের গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হয়।

বিদ্যুৎ দ্বারাও magnet তৈয়ার করা যায়। ১৮১৯ খৃঃ Prof. Oerstead আবিষ্কার করেন যে একটী freely ঝুলান magnetic needleএর নিকট একটী বৈদ্যুতিক শক্তি-প্রবাহিত তার ধরিলে পর magnetc needleটী deflected হয়। যদি কোন তড়িৎশক্তি-প্রবাহিত তারের নিকট iron filings ধরা যায়, তাহা হইলে লৌহগুঁড়াগুলি তার দ্বারা আকর্ষিত হয়; কিন্তু তারের ভিতর প্রবাহিত বিদ্যুৎ বন্ধ করিয়া দিলে iron filings গুলি পড়িয়া যায়। কোন iron rodএর চারিদিকে insulated wire দ্বারা জড়াইলে এবং সেই তারে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত করাইলে পর iron rodটী একটী magnet হয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক প্রবাহ (Current) বন্ধ করিয়া দিলে পর আবার তাহার magnetism ছাড়িয়া দেয়। এই প্রকারের magnetকে electro-magnet কহে। Permanent অপেক্ষা electromagnet দ্বারা অনেক বেশী কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক প্রবাহ বর্ত্তমান ততক্ষণ পর্য্যন্তই ইহা স্থায়ী। Electrical machineriesএর অনেকের ভিতরই Electro-magnetএর ব্যবহার আছে।

Oersteadএর বিদ্যুৎ দ্বারা যে magnetism পাওয়া যায়, এই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া Michael Farady নামক একজন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে থাকেন; এবং ১৮৩১ সালে তিনি আবিষ্কার করেন যে, একটী coil of wireকে একটী bar magnetএর চারিদিকে ঘুরাইলে অথবা magnetকে coil of wireএর চারিদিকে ঘুরাইলে সেই coil of wireএ electric current induced হয়। একটী coil of wireএর দুই terminal একটী galvanometerএর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া তাহার চারিদিকে একটী magnet ঘুরাইলে পর দেখা যায় যে Galvanometerএ deflection হইয়াছে এবং তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে electric currentএর সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা জানি যে একটী magnetএর চারিদিকে 'magnetic force' অথবা 'lines of force' থাকে। Faradayএর মত যে 'lines of force' কোন conductor cut করিলেই electric currentএর সৃষ্টি হয়।

এই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া তিনি প্রথম dynamo তৈয়ার করেন। ইহাতে একটী copper disc ছিল এবং তাহা একটী horse shoe magnetএর polesএর ভিতর rotated হইত। দুইটী সরু তার (wire) Spring Contact দ্বারা একটী Shaftএ ও আর একটী circumferenceএ লাগান থাকিত; এবং সেই তার দুইটী দ্বারা electricity conducted হইত। এই machine খুব inefficient হইল; কিন্তু ইহাই জগৎব্যাপী প্রচলিত dynamoএর প্রথম সংস্করণ।

এই প্রকার copper discএর dynamoতে সুবিধা না হওয়ায় ১৮৩২ খৃঃ Faraday আর এক প্রকার dynamo তৈয়ার করেন। ইহাতে Copper discএর বদলে খুব লম্বা insulated wire দ্বারা দুইটী bobin তৈয়ারী করেন এবং তাহাদের মধ্যে একটী horse-shoe magnet fixed করিয়া ঘুরাইতে থাকেন। এই machine দ্বারা তিন বেশ electricity পাইতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাতেও কিছু অসুবিধা হইল। কারণ, rotationএ magentএর magnetism কমিয়া যাইতে লাগিল। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তিনি ইহার সংস্কার করিলেন। তাহাতে magnetকে fixed রাখিয়া bobin of wire ইহার চারিদিকে ঘুরাইতে হইত। এই প্রকারে dynamoর খুব improvement হইল; কারণ, rotating coils ও magnetএর সংখ্যা increase করিয়া ইহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা যাইতে লাগিল।

Dynamoর revolving coilকে armature ও magnetকে pole কহে। Dynamoর Shaftএ কতকগুলি insulated copper segments অথবা insulated ring থাকে। তাহাদিগকে commutator ও slip ring কহে। Slip ring অথবা Commutatorএর উপর brush থাকে এবং তাহা দ্বারাই electricity conducted হয়। Dynamo ঘুরিলে পর armatureএ বৈদ্যুতিক শক্তি জন্মায় ও তাহা commutator অথবা Slip ringএ আসে; এবং সেখান হইতে brush দ্বারা outer circuit প্রবাহিত হয়। ইহাই হইল dynamo হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল Principle।

দুই প্রকার electricity আছে—এক Alternating Current ও দ্বিতীয় Direct Current। এইজন্য Alternating ও Direct Currentএর dynamoর বিভিন্নতাও আছে। কোন কোন কাজে A. C. এবং কোন কোন কাজে D. C. সুবিধাজনক। বড় বড় Power-stationএ A. C. এবং ছোট Powr-stationএ D. C. উৎপাদিত হয়। Alternating voltage অনেক বেশী করা যায়; কিন্তু Direct currentএ সে current সুবিধা নাই। A. C, এবং D, C, machineriesএ তফাৎ আছে।

Dynamo হইতে আমরা Constant electric Supply পাই। Dynamoর ব্যবহারকে যদি আমরা reverse করি, অর্থাৎ mechanical force দ্বারা না চালাইয়া যদি ইহার armatureএ electric current Supply করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে,

armatureটী খুব তাড়াতাড়ি ঘুরিতে থাকে ; এবং তখন ইহা electrical energy না উৎপাদন করিয়া mechanical force দিতে থাকে। এই Principle কেই clectric motor কহে।

আসলে Dynamo ও motor একই machine। Mechanical force দ্বারা ঘুরাইলে পর সে dynamo হয় ও clectric power উৎপাদন করিতে থাকে ; কিন্তু electric power দ্বারা ঘুরাইলে পর সে mechanical power দেয় এবং motor নামে অভিহিত হয়। Motorএর অনেক সুবিধা আছে। যদি electrical energy পাওয়া যায়, তাহা হইলে যেখানে খুসী একটী motor বসাইয়া যে কোন Plant চালান যাইতে পারে। Motorএর ব্যবহার না থাকিলে belt দ্বারা mechanical force transmit করিতে হইত। কিন্তু বেশী দূরে কোন Plant থাকিলে belt সাহায্যে তাহা চালান অসম্ভব হইত।

বৈদ্যুতিক শক্তি কি machine দ্বারা উৎপাদিত হয় তাহা আমরা জানি। প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈয়ার করিতে হইলে Power Stationএর দরকার। Power Stationগুলিতে কতকগুলি dynamo ও তাহাদিগকে চালিত করিবার জন্য যাহা দ্বারা mechanical force পাওয়া যায় এইরকম কতকগুলি machnie থাকিবে। Gas Enrgine, Petrol Engine, Oil Engine, Steam Engine অথবা turbine দ্বারা অবস্থা ও সুবিধা অনুযায়ী dynamo চালান হইয়া থাকে। জলের সুবিধা থাকিলে water forces দ্বারা turbine ঘুরাইয়াও বিদ্যুতের কল চালান হইয়া থাকে। বোম্বের Tata Hydro Electric ও শিলংএর Hydro Electric Company এই উপায়ে চলিতেছে।

Dynamo Direct Currentএর হইলে voltage সাধারণতঃ ৪০০ হইতে ৫০০ volts পর্য্যন্ত উৎপাদন করা যায়। Power Station বড় হইলে অর্থাৎ বেশী দূর পর্য্যন্ত Power Supply করিতে হইলে Alternating Currentএর Dynamo ব্যবহৃত হয়। A. C dynamoতে হাজার হাজার voltage উৎপাদন করান যায়। আমেরিকায় নায়গ্রা জলপ্রপাত দ্বারা alternator (A. C dynamo) চালাইয়া ৬০,০০০ volts পর্য্যন্ত উৎপাদন করে এবং ২০০।৩০০ মাইল দূরবর্ত্তী সহরগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা আজকাল জগতের সমস্ত কাজই চলিতেছে। ইহার ব্যবহারের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের সর্ব্বদা ব্যবহারের ট্রামগাড়ী—ইহাও বিদ্যুতের দ্বারা চালিত। দ্রুতগামী রেলগাড়ী, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ও আনন্দোৎসবের আলোকমালা এবং কারখানার কাজ সমস্তই ইহার উপর নির্ভর করে। চিকিৎসা শাস্ত্রেও ইহার ব্যবহার কম নহে, X-Ray ও Electric treatment চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর আনিয়াছে। আমাদের নিত্যব্যবহারের telegarph, atlephone সমস্তই ইহার উপর নির্ভর করে।

বিদ্যুতের বিস্তৃত ব্যবহার চারিদিকে দেখিয়া মনে হয়, বাস্তবিকই বিদ্যুৎ পৃথিবীতে যুগান্তর আনিয়াছে।*

* Electricity by W. H. Mc Gormigk ও Ganot's Natural Philosophy হইতে সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছি—'লেখক'।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬৮)

বাসার পাশেই ইষ্টেসন। বাঁশী বাজিলেই কর্ত্তার কান খাড়া হয়,—ঘণ্টা দিলেই মনটা চঞ্চল, অস্থির হয়ে পড়েন—"ছেড়ে গেলো নাকি!"

মাল-গাড়ির মাল ইষ্টেসনে হাজির হইয়া গিয়াছে, জয়হরি খবরদারিতে আছে।

বাসায় কর্ত্তা লগেজ লইয়া ব্যস্ত। গুনিয়া কখনো দাঁড়ায় ১৩, মিনিট পাঁচেক পরে ১৭, পরক্ষণেই ১৯, পশ্চাৎ ফিরিতেই ২১। আবার গোণেন। ফের গরমিল্!

বিব্রতভাবে ইষ্টেসনে গিয়া জয়হরিকে গুণিতে পাঠাইলেন। সে গিয়া রিপোর্ট দিল—আটাশ

Puzzled! বাসায় ছুটিলেন।

রোয়াকে একখানা টালির উপর বসিয়া নানা চিন্তা সহযোগে সিগারেট্ টানিতেছিলাম। সে চিন্তার মাথামুণ্ড নাই,—ধোঁয়ার সঙ্গে বেশ মেশে।

হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"একবার উঠতে হবে,—অনেক কষ্ট দিয়েছি—আর একটু। লগেজগুলো গুণে একবার ঠিক্ ক'রে দিন। যতবার গুণি—রকম রকম পাই, কারণ বুঝতে পারছি না।"

বলিলাম—"ব্যস্ত হবেন না,—কারণ আমার জানা আছে। গাড়ি না-ছাড়া পর্য্যন্ত ও জিনিসটি বাড়ে"—

"তাই নাকি! তা একবার উঠুন্।"

গণিয়া বলিলাম—৩১

"আমাকে ডোবালে!"

"চিন্তিত হবেন না, এখনো অনেক বাকি দেখছি। পানের প্যাট্‌রা, চুণের ভাঁড়, জরদার বোতোল, জলের কুঁজো, ঘটি গেলাস গামছা, প্রসাদী ফুল-বিল্বপত্রের পুঁট্‌লি, ষ্টোভ্ প্রভৃতি চায়ের চব্বিশ পরগণা—দেখছি না। অন্ততঃ উনোপঞ্চাশ পর্য্যন্ত পৌঁছুনো চাই।"

"কাকে,—আমাকে? বলেন কি!"

"এই নিয়ম! ওঁরা গাড়িতে না ওঠা পর্য্যন্ত বাড়ের মুখ। দেখছেন না—ঐ-দিকে ওঁরা কত ব্যস্ত,—দেল থেকে পেরেক্ খুলছেন। রাতের গাড়িতে যাচ্ছেন—এইটুকুই আশার কথা, রাস্তায় বাড়-বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম,—তবে বর্দ্ধমানে আরো দু নম্বর বাড়বে। ছেলেদের গাড়ির ব্যবস্থা রাখতে বলে পাঠিয়েছেন তো?"

"অনেক ভুগেছি মশাই,—আর নয়। সোনার-চাঁদেরা নিদেন দুখানা সিক্ক্ সিলিণ্ডার "সন্-বীম্" নিয়ে বাপের অঙ্গ হিম করতে আসবেন। কাজ নেই মশাই আমার ষ্টেট এন্‌ট্রিতে, ঢের ঘোড়ার গাড়ি মিলবে. একখানা নিলেই হবে! আর ওই চোর বেটা গরুর গাড়িতে মালপত্র নিয়ে যাবে।"

"তবে আর কি,—তাদের কাজ তো তারা সেরেই ফেলেছে। ছেলের কামনা আর কিসের জন্যে,—আমাদের মানুষ করে দেবার তরেই তো।—আচ্ছা আপনার অনেক কাজ,—লগেজের ভার আমার রইলো।"

"আঃ—বাঁচালেন মশাই।"

দু'পা গিয়াই ফিরিলেন;—"জানি ও-দড়িগাছটা থেকেই যাবে! সে হারামজাদা গেল কোথায়?"

"ও আমি খুলিয়ে নিচ্ছি, আপনি অন্য কাজ দেখুন গে।"

"হ্যাঁ—ষ্টেসনের ও-ছোকরাটি আপনার কেউ হন্ বুঝি! আমাদের কিছুই করতে হচ্ছে না, তিনি খুব ইণ্টারেষ্ট্ নিচ্ছেন।"

"উনি আমার সতীর্থ—বন্ধু।"

"বয়স তো"—

"আজ-কালের ছেলেরা বয়সের মাপে ছোট বড় হয় না।"

"ওঃ,—তাই প্রায়ই বলে—'আপনি বুঝতে পারবেন না বাবা'!"

চলিয়া গেলেন।

* * * *

ক্রমে সময় হইয়া আসিল। বাড়ীর ভিতর আর চাওয়া যায় না। কয় ঘণ্টার মধ্যে এত বড় পরিবর্ত্তন বিধাতাও পরিকল্পনা করিতে পারেন না।

ঘরের মেঝে আর উঠান—টুকরা কাগজে, ছেঁড়া ন্যাকড়া আর ন্যাতায়, শূন্য দধিভাণ্ড খুরি শালপাতার ঠোঙা, ভাঙা চেঙারি, মুড়ো ঝাঁটা, ফুটো কল্‌সী, পরিত্যক্ত পোল্‌তে, পোড়া কাট, কয়লার গুঁড়ো, ছেঁড়া মোজা প্রভৃতি সযত্ন-সঞ্চিত এবং অধুনা বা সদ্য বিক্ষিপ্ত সম্পত্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে কি বীভৎস দৃশ্য,—মহা-শশ্মানের মডেল্!

পণ্ডিত আর পুরোহিত মহাশয়েরা আক্ষেপ করেন,—ইংরাজি লেখাপড়ায় দেশের সর্ব্বনাশ করিল,—সব গেল! আমি তাঁহাদের শান্তির জন্য শপথ করিয়া বলিতে পারি,—তাঁহারা আশ্বস্ত হউন, কিছুই যায় নাই, সব বজায় আছে। সহরের দশবিশ ঘরের কথা ধর্ত্তব্য নহে;—শিক্ষিত সাধারণে সনাতন অভ্যাস সযত্নেই পালন করিয়া থাকেন।

এর মধ্যে আর তিষ্টান যায় না। ট্রেণ ছাড়িতেও বিশেষ বিলম্ব নাই।

সকলকে লইয়া—সহ বাল্‌তির দড়ি, দুর্গা বলিলাম। পথে পা দিয়া প্রাণটা যেন ফিরিয়া পাইলাম।

কর্ত্তা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলিলেন "খুব সময়ে এসে গেছেন। দড়িটে দেখছি রয়েই গেল,—যাক্, আর সময়ও নেই,—যার কপালে আছে—এই যে এনেছেন দেখছি, আপনার কি···কত কষ্টই দিলুম। আপনারা ছিলেন তাই"—

"নিন্,—এখন দেখে-শুনে গাড়িতে বসিয়ে দিন, আমি একবার"—বলিতে বলিতে সরিয়া গিয়া অদূরেই কবি-বন্ধুর সহিত সময়োচিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

মিনিট তিনেক পরেই জয়হরি ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—"কর্ত্তার জুতা জোড়াটি দালানেই পড়ে আছে—এখন উপায়? আর তো সময় নেই।"

বন্ধু বলিলেন—"এই তো বাসা, আমি পাঁচ মিনিট গাড়ী ডিটেন্ করিয়ে রাখবো"—

কর্ত্তাও অস্থিরভাবে আসিয়া উপস্থিত,—"একটা কিছু ফেলে যাওয়া আমার চিরকেলে রোগ,—অমন নিসনের বাড়ীর প্যানেলা জোড়াটা রয়ে গেল মশাই ;—দু'বচরও পায় দিইনি ! দালানে ছেড়ে খেতে বসেছিলুম,—কাজে কর্ম্মে খেয়াল ছিল না, সেইখানেই রয়ে গেল। বেটারা দালানও বানিয়েছে—এমুড়ো ওমুড়ো ; তার ভেতর ওই কাহিল শরীর নিয়ে হরদম্ আড়াল করে, ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন,—রথ থাকলেও রয়ে যেতো ! যাক্—লোকসেনে কপাল !—ও হারামজাদা বেটাও সেই যে ইষ্টেসন্ কাম্ড়ে রইলো।—যাক্, সেই বাপ্ মলে যা খালি পা হয়েছিল মশাই,—আর এই হ'ল ! যাক্"—

বলিলাম—"এমন্টা হতেই পারে না,—আমাদের কপাল কোনো দিনই ও-জিনিসটি ছাড়া নয়। আমরা ভুল্লেও সে ভুলবে না। আপনার পায়ে তবে কি ভীম-সনের ক্ষীরেলা ? নিসনের প্যানেলা নয় ?"

সকলে তাঁর পায়ের দিকে চাহিয়া অবাক্ !

"তাই ত' ! মনটা একদম বসে গিয়েছিল,—এক-ছটাক রক্ত শুকিয়ে দিয়েছে ! এতক্ষণ কিছু টের পাইনি মশাই। সাধে কি ঐ চীনে বেটার দোকানের জুতো কিনি,—পায়ে আছে কিনা জানতে দেয় না। উঃ, আপনি না বলে দিলে আজ পথেই শুইয়ে ফেলতো।"

কবি-বন্ধু হেসেই খুন্।

জয়হরি বলিল—"ও আমার হামেশা হয় মশাই,—ওটা আমাদের পৈতৃক প্রপার্টি। বাবা আমাকে না পেয়ে সারা গাঁ-খানা খুঁজে বেড়িয়েছেন, শেষ থানায় লিখিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে এসে বাড়ী ঢুক্তেই,—তাঁর কোল্ থেকে মা যখন আমাকে কোলে করে নিলেন,—তখন হরির-লুট !"

"তা না তো আজ জয়হরি বাবুকে ছাড়তে আমার প্রাণ এমন করে ! Things which are equal to—বলিয়া কর্ত্তা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল।

বন্ধু বলিলেন—"নিন্—সব উঠে পড়ুন।"

আমাকে বলিলেন—"মাঝে মাঝে কষ্ট দেবো কিন্তু ! নামটা মনে আছে তো,—নিভৃত নিবাস রায়।"

"বলতে হবেনা বন্ধু, আমিও ওই মিলের মধ্যেই মরে আছি, আমাদের নিভৃত নিবাস ছাড়া চলে না।"

বন্ধুর বদনে এক-পোঁচ্ হাসি।

সেকেণ্ড্ বেল্ দিতেই গাড়ি ছাড়িল।

"আচ্ছা—আমি যশেড্ডিতে টেলিগ্রাফ্ করে দিচ্ছি—তারা আপনাদের ঠিক্ করে গাড়িতে বসিয়ে দেবে।"

দশ চাকা না ঘুরিতেই বন্ধু ছুটিয়া গাড়ির পা'দানে উপস্থিত,—

—"একটা কথা, "পরন্তপে"র মিল্ পাচ্ছি না। যশেডিতে যাকে বলবেন—সেই আমাকে টেলিগ্রাফ্ করে দেবে। নমস্কার।"

লাফিয়ে পড়লেন।

আমি মুখ বাড়াইয়াই ছিলাম, একটু উচ্চ কণ্ঠে বলিলাম—

"মটন্ চপ্"—চল্বে না ?"

বাঃ—Splendid,—চমৎকার ! খুব চলবে—খুব চলবে, many thanks—"

চলুক্ না চলুক্—গাড়ি ছুটিয়া চলিল।

(ক্রমশঃ)

প্রতিকৃতি

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

আমারে করেছ তুমি স্বহস্তে রচনা,
শিল্পীর সৃষ্টির মত প্রাণের উল্লাসে
দুঃসহ প্রেরণা-বলে ; এ দেহে উদ্ভাসে
তোমার সত্ত্বার এক ক্ষুদ্রতম কণা ;
আমার রক্তের ধারা পেয়েছে উষ্ণতা
গতি, শক্তি, উচ্ছলতা—ও-দেহের তাপে,
শততন্ত্রী বীণা সম বক্ষে মম কাঁপে,
ও-মনের সুনিবিড় প্রশান্ত পূর্ণতা।

এ সৃষ্টি কেমনে আমি রাখি অমলিন
সদ্য-বিকসিত শুভ্র কমলের মত,
মধ্যাহ্ন ঝড়ের ধূলি ঝরে অবিরত
পর্ণ শিথিলতা, বৃন্ত ক্ষীণ, বর্ণহীন।

আমি যেন কালো মেঘে বিদ্যুতের শিখা,
ধূমভারে হতদীপ্তি হোমানল-শিখা।

মধ্যভারতে কয়েক দিন

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

(ছত্তরপুর)

সেকালে বাঙ্গালী প্রায় তীর্থ-ভ্রমণের জন্যই বিদেশে বাহির হইতেন। সেকাল অর্থে আমি মুসলমান আমলের কথা বলিতেছি। একালে সে বালাই কমিলেও, বিদেশ-যাত্রীর সংখ্যা যে বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, এ কথা না বলিলেও চলে। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, জাতীয় প্রকৃতি, যে কেহ কেহ না যান এমন নহে। সখে অর্থাৎ ফ্যাসানের খাতিরে, আর বাতিকে অর্থাৎ বায়ু সেবনার্থে। এই তিনটী প্রকারভেদ ছাড়িয়া দিলে, আরো দুইটী কারণে বাঙ্গালী বিদেশে যান—কমিশনে এবং নিমন্ত্রণে। কমিশনের নানা অর্থ অভিধানে কয়—তন্মধ্যে পরের পয়সায় বিদেশ যাওয়া, চাকুরী,
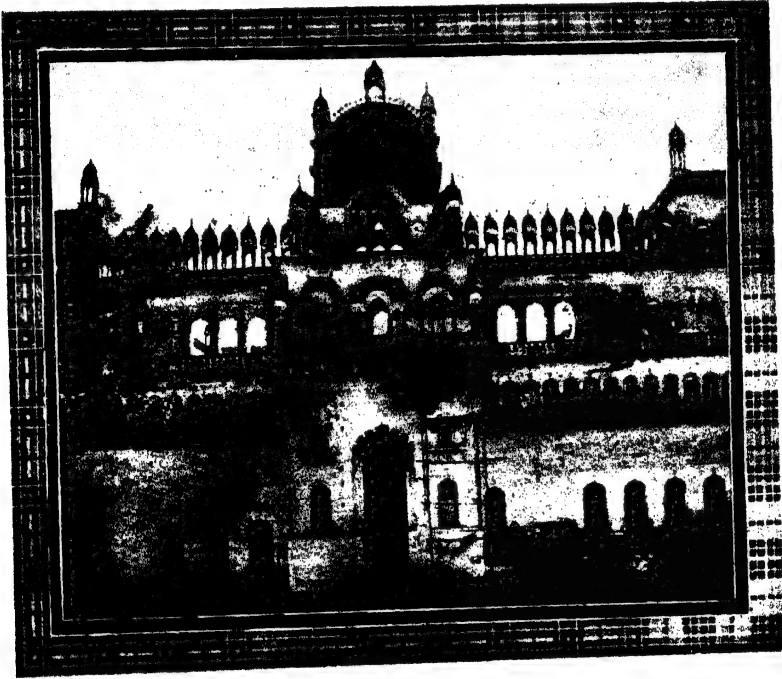
রাজগড়—গিরিনিবাস (সম্মুখভাগ)

সামাজিক আচার ব্যবহার, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য প্রতি বৎসর বহু বাঙ্গালী ভারতের নানা স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও ইয়োরোপ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া থাকেন। সখে এবং বাতিকেও দালালি, গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত অনুসন্ধিৎসু সংঘারাম ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু বুঝাইতে পারে। কিন্তু নিমন্ত্রণের অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। আমরা সদ্‌ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রণ পাইলে বড় উৎফুল্ল হই ; এবং সব্যগ্র-সম্ভ্রমে তাহা রক্ষা করিয়া থাকি।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই কারণেই আমাকে মধ্য-ভারতে পাড়ি দিতে হইয়াছিল।

মধ্যভারতের ছত্রপুর (ছতরপুর) রাজ্য। এই রাজ্যের যিনি অধীশ্বর হিজ হাইসেস মহারাজা স্যর বিশ্বনাথ সিংহ বাহাদুর কে সি-আই-ই,—তিনি অতি সাধু প্রকৃতির লোক। বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ অনন্যসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজা বৃন্দাবনবাসী বাঙ্গালী বৈষ্ণব (অদ্বৈতবংশীয়) স্বর্গীয় প্রভুপাদ নীলমণি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছত্রপুরে বাঙ্গালীর ঠাকুর নিতাই গৌর সীতানাথের শ্রীবিগ্রহ এবং বিগ্রহের সেবা পূজার সুবন্দোবস্ত দেখিবার মত। বৈষ্ণবধর্ম্ম, বৈষ্ণব পদাবলী ও বৈষ্ণব আচার্য্যগণের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার ইঁহার আর অন্ত নাই। এই জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে কোনো কোনো পণ্ডিত, বৈষ্ণব, সাধু বা সাহিত্যিক ছত্রপুরে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইহাই মহারাজের একমাত্র ব্যসন। বাঙ্গালার কবি চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং জীবন-কথা জানিবার জন্য মহারাজা আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

পথের কথা বলিবার মত কিছু নাই। ট্রেণে যাওয়ার সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি এখনো সমপরিমাণেই বর্ত্তমান আছে। রাস্তা-ঘাটেরও বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তবে কোথাও অতিবৃষ্টি আর কোথাও বা অনাবৃষ্টির জন্য দৃশ্যের কিঞ্চিৎ ইতর-বিশেষ ঘটিয়াছে। রেলকর্ম্মচারী এবং কুলীদের প্রকৃতি দেখিলাম এখনো ভালয় মন্দতে মিশিয়া রহিয়াছে। ষ্টেশনে যান-বাহনের অবস্থাও তথৈবচ। আমি গিয়াছিলাম ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে। ৺পূজা সেখানেই কাটিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়াছি দেওয়ালীর পূর্ব্বে।

রাজগড়—গিরিনিবাস (দূর হইতে)

পশ্চিমের ছোটখাট সহর বলিতে যাহা বুঝায়, রাজধানী ছত্রপুর তাহার বেশী কিছু নহে। রাজ্যটীও ছোট। পরিমাণ-ফল ১১১৮ বর্গমাইল। বিন্ধ্যাচলের শাখা-প্রশাখাগুলি ছত্রপুরকে প্রায় ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তবে এখানকার পাহাড়গুলি রাজপুতনার মত নেড়া-মাথা নহে। তাহার শ্যামল শ্রী দেখিলে চোখ জুড়ায়। পাহাড়ে সীতাফল (আতা)

এবং বেল এত যে রসনা তৃপ্তিরও যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। সমুদ্র হইতে এই পাহাড়-শ্রেণীর উচ্চতা ১৬০০০ ফিট। ভূমি প্রায় সমতল, উর্ব্বর এবং বৃক্ষবহুল। ভূমির উচ্চতা সমুদ্র হইতে প্রায় ৬০০ ফিটের কম নহে। বৃষ্টির পরিমাণ সমতলে ৩৬ ইঞ্চি হইবে। রাজ্যে ঋতু-পর্য্যায়ে গ্রীষ্মেরই আধিক্য—লু্য চলে!

ছত্রপুর রাজ্য বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত। রামায়ণের আমলে এই দেশের নাম ছিল দশার্ণ। মহাভারতেও দশার্ণের উল্লেখ আছে। এই রাজ্যের রাজা হিরণ্যবর্ম্মার কন্যার সঙ্গে পঞ্চাল-রাজ-নন্দন শিখণ্ডীর বিবাহ হইয়াছিল। দেশে দশার্ণ নামে একটী নদী আছে, এখন তাহার নাম ঢাসন। পরে এই দেশের নাম হয় যেজাগভূমি বা জুঝৌতি। যজুর্হোতৃ অর্থাৎ যজুর্বেদীয় যজ্ঞকারা ব্রাহ্মণ বা যজ্ঞে দানগ্রহণকারী এক সময়ে এ দেশে সংখ্যায় অধিক ছিলেন বলিয়া হয়তো এ দেশের নাম যজুর্হোতৃ বা যেজাগভূমি হইতে অপভ্রংশে জুঝৌতি হইয়াছিল। বিন্ধ্যাচলের অন্তর্ভুক্ত, তাই বিন্ধ্যেলখণ্ডী হইতে কালে বুন্দেলখণ্ড হইয়াছে, এ অনুমানও করা যায়। রামায়ণে কালঞ্জরের নাম আছে; কালঞ্জর বুন্দেলখণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত। জনক-তনয়ার স্নান-পুণ্যোদক পবিত্র চিত্রকূট বা রামগিরি একদিন আদি কবি বাল্মীকিকে যে ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার বহু শত বর্ষ পরে মেঘদূতের কবির চক্ষেও সেই পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য তেমনি প্রতিভাত হইয়াছিল। আজিও সে শোভা এতটুকুও ম্লান হয় নাই। অতীতের স্মৃতি বুন্দেলখণ্ডের এই পুণ্যক্ষেত্রকে তেমনই রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। মেঘদূতের বেত্রবতী জল কলকলে কবির মন্দাক্রান্তার তালে বন্দেলা প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় আজিও আন্দোলিত করে। মৌর্য্য, সুঙ্গ, কাণ্ব, গুপ্ত, কলচুরী, গাহড়বাড়, চন্দেল প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজবংশের সঙ্গে এই বুন্দেলখণ্ডের অনেক কাহিনী জড়াইয়া আছে। আবু রিহাস, ইবনবতুতা, হিউয়েন্থ সং প্রভৃতির ইতিহাসে এই দেশের (জুঝৌতি) নাম পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গেও ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

বামন অবতার

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় মহারাষ্ট্রে যেমন, বুন্দেলখণ্ডেও

তেমনি এক শক্তিধর পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ছত্রপতি শিবাজী যেমন রামদাস স্বামীর মন্ত্রণায় এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, বুন্দেলা-বীর ছত্রসালও তেমনি প্রাণনাথ স্বামীর সহায়তায় ছত্রপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামদাস স্বামী ছিলেন শৈব, প্রাণনাথ স্বামী ছিলেন বৈষ্ণব। তবে ইনি সন্ন্যাসী ছিলেন না। ইঁহার প্রধান আস্তানা ছিল পান্নায়। প্রাণনাথ স্বামীর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় পান্নায় যে বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই ছত্রসাল ইঁহার নাম ছিল, কি ছত্রপতির মত ইনিও ছত্রসাল উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক জানা যায় না। প্রবাদ আছে, শেষ জীবনে 'মৌ' রাজধানীতে আপন আংরাখাখানি খুলিয়া রাখিয়া ইনি কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন, অর্থাৎ ছত্রসালের মৃত্যু সম্বন্ধে কেহ কোনো সংবাদ দিতে পারে না।

কালে ছত্রসালের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে ছত্রপুর এইরূপ একটী পৃথক রাজ্যে পরিণত হয়। কুমার শোনে শাহ পরমার

অনন্ত শয্যা
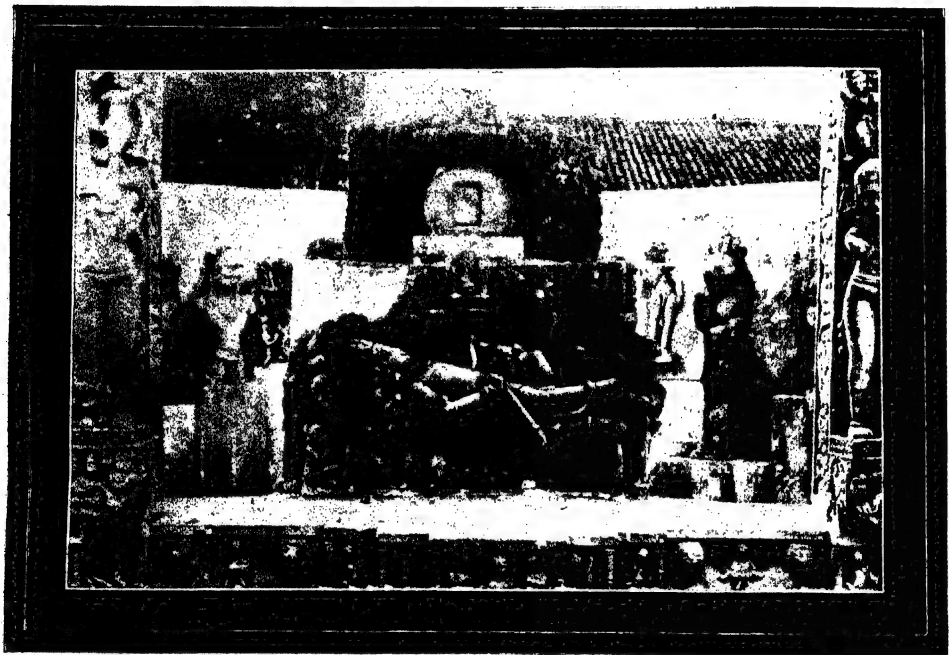
মন্দিরে প্রাণনাথ স্বামীর ও তাঁহার পত্নীর তৈলচিত্র আছে। মন্দিরে কোনো মূর্ত্তি নাই, কেবল মুকুট ও মুরলীর পূজা হইয়া থাকে। মন্দিরের ঐশ্বর্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সম্প্রদায় জাতিভেদ মানেন না। ইহাঁদের মঠাধ্যক্ষকে পরমহংস বলে। এই শুদ্ধি আন্দোলনের দিনে এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুসন্ধানের বিষয়। কথিত আছে, প্রাণনাথ স্বামীই পান্নার রত্নখনির সন্ধান দিয়া ছত্রশালকে রাষ্ট্রীয় মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থচিন্তার দায় হইতেও মুক্তিদান করিয়াছিলেন। এই রাজ্য স্থাপন করেন। শোনে শাহ পান্না-নরেশ হিন্দুপতির জায়গীরদার ছিলেন। হিন্দুপতির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সর্নেৎ সিং রাজ্যচ্যুত হন এবং রাজভ্রাতা গদী অধিকার করেন। সর্নেৎ সিং লঁড়ি পরগণার জায়গীরদার রূপে বাস করিতে থাকেন। নাবালক পুত্র হীরা সিংকে রাখিয়া সর্নেৎ লোকান্তরিত হইলে শোনে শাহ নাবালকের অভিভাবকত্বে ব্রতী হন এবং কিছু দিন পরে নিজেই জায়গীর দখল করিয়া বসেন। পান্না নরেশ লঁড়ি আক্রমণ করেন; কিন্তু যুদ্ধে

পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যান। অতঃপর কেন্ নদী উভয় রাজ্যের মধ্যসীমা রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। কেনের পূর্ব্বে পান্না, পশ্চিমে ছত্রপুর। ইহাই ছত্রপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহা ইংরাজী ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের কথা। মাঝে বাঁদার নবাব চর্থারী ছত্রপুর ইত্যাদি দখল করিয়া লইয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮০৬ খৃঃ ইংরাজ বাঁদা দখল করেন, সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যগুলি ইংরাজের অধিকারভুক্ত হয়। ইং ১৮০৮ সালে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট শোনে শাহকে ছত্রপুর ফিরাইয়া দেন। সে সনন্দ এখনো আছে। শোনে শাহের পুত্র প্রতাপসিংহ। ইং ১৮২৭ খৃঃ ১৮ জানুয়ারী এজেণ্ট জেনারেল কর্ণেল বেলী প্রতাপ সিংহকে রাজা বাহাদুর উপাধি দান করেন।

প্রতাপ সিংহের পুত্র-সন্তান না থাকায় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম জগৎরাজ। ইনি ১৮৭৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে গদী প্রাপ্ত হন, এবং মাত্র কয়েক মাস রাজ ভোগ করিয়া নবেম্বর মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমান মহারাজা হিজ হাইনেস্ স্যর বিশ্বনাথ সিংহ তখন চৌদ্দ মাসের শিশু। ইং ১৮৬৬ খৃঃ ১৯ আগষ্ট ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যেমন ধর্ম্মানুরাগী ও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সুশাসক বলিয়াও ইঁহার তেমনি খ্যাতি আছে। রাজা বাহাদুর ইঁহাদের বংশানুক্রমিক উপাধি, কিন্তু ইঁহার বিচার নৈপুণ্যে প্রীত হইয়া ই ইংরাজ সরকার ইঁহাকে মহারাজা উপাধি দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান নববর্ষে ইনি কে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইং ১৮৭৭ খৃঃ যখন দিল্লীতে দরবার হয়, ইনি তখনো বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। রাজমাতা নাবালক পুত্রকে লইয়া নিজেই দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মহারাজের চিত্র এবং সঙ্গীতানুরাগও উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেও বেশ ভাল ছবি আঁকিতে পারেন, গাহিতে পারেন, গান রচনা করিতে পারেন। তাঁহার রচিত নব বৃন্দাবন লীলা প্রভৃতি কয়েকখানি সুন্দর গীতিনাট্য আছে। মহারাজের রচিত নব বৃন্দাবন লীলা হইতে একটী গান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হোয়কে গুরু যদুকুলকে।
আপন মিথুন আসিলে লিয়ে সব সাজ॥
হমকো মিথুন কর হীনে সুখ করো নভ বিরাজ।
দয়া তনক না তুম্হারে ক্যায়সে দ্বিজরাজ।
বিলাস মঞ্জরী ত্যজ দেও ঘাতককে কাজ।

বিলাসমঞ্জরী মহারাজের গুরুদত্ত নাম ; গানের বিষয়—বিরহে চন্দ্রের প্রতি তিরস্কারোক্তি।

মহারাজের চিত্র-সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার সংগ্রহের মধ্য হইতে যে চিত্রখানি আমায় দিয়াছিলেন, তাহা ফাল্গুনের ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আরো অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র মহারাজের সংগ্রহে আছে।

হিন্দী এবং ইংরাজী পুস্তকের সংখ্যাও মন্দ নহে। রাজধানীতে 'সরস্বতী সেবাসদন' নামে একটী সাধারণ পাঠাগারও আছে। মহারাজের লাইব্রেরী এবং সেবাসদনে দৈনিক-সাপ্তাহিক, মাসিক প্রায় সকল প্রকার হিন্দী পত্রই নিয়মিত আসে। মহারাজের দেওয়ান রায় শ্রীযুক্ত শুকদেব বিহারি মিশ্র বাহাদুর একজন স্বনামধন্য সাহিত্যসেবী। হিন্দী সাহিত্যিকগণের মধ্যে মিশ্রবন্ধুর নাম প্রায় সর্ব্বজনপরিচিত। দেওয়ানজী সেই মিশ্রবন্ধুর অন্যতম। মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গোলাব রায় এম এ, এলএল-বি, মহাশয়ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তি। আমার খবরাখবরের জন্য যে যুবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি রাজধানীর ভারতীয় অতিথিগণের তত্ত্বাবধায়ক। সাহিত্যসেবায় তাঁহার উৎসাহও প্রশংসনীয়। যুবকের নাম পণ্ডিত রামনারায়ণ শর্ম্মা। বিবিধ মাসিক এবং সাপ্তাহিকে তাঁহার লেখা প্রকাশিত হয়। হাস্যরসাত্মক রচনায় তিনি ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। যুবকের কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং বিনয় মধুর ব্যবহারে মনে হইল, মহারাজ অযোগ্য পাত্রে ভারার্পণ করেন নাই। আর একটী যুবক মহারাজের এডিকং—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চম্পালাল শর্ম্মার ব্যবহারেও বড় প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। ইনি একজন কবি—স্বভাব-কবি। অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন, পড়িয়াও দুই চারিটী শুনাইয়াছেন। অধিকাংশ কবিতাই 'নায়কা ভেদ' লইয়া লেখা। হিন্দী সাহিত্যে নায়কাভেদের অন্ত নাই,—কিন্তু হইলে কি হয়, যাঁর যেদিকে রুচি। বিহারী, সুরদাস, কেশব প্রভৃতি হিন্দী কবিগণের কবিতা ইহাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ, আবৃত্তি ভঙ্গীও সুন্দর। ইহাঁর রচিত একটী কবিতাও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটী অনুকূল নায়কের লক্ষণ লইয়া রচিত।

"বড় ভাগি রাধে তুহী রসুধা তুয় পূণ্য লতাহুঁ জগীহী রহে
ব্রজ চন্দ্র নিংশঙ্ক হিয়েকো হারা নিশ বাসর কণ্ঠ লাগিহি রহে
ব্রজ মে বহু নার মন্নওক মুখি চতুরা চিৎরূপ পগিহি রহে
দ্বিজ চম্প জু চঞ্চল চিত উঁউ তুয়া আনন্ ওর লাগিহি রহে"

রাজ্যে দর্শনীয় বিষয় অনেক আছে। পুরাতন রাজধানী 'মৌ'-এর প্রাসাদ এবং রাজগড়ের গিরিনিবাসের সৌন্দর্য্য

মুহূর্ত্তে মনোহরণ করে। রাজগড়ের চতুর্দ্দিকে উচ্চ বা খণ্ড শৈলের শ্যাম সমারোহ, মাঝে মাঝে তাহারই অনতি-ব্যবধান-অবকাশে নাতিবিস্তৃত শস্য শষ্প-সমাকীর্ণ উপত্যকা-খণ্ড। কোথাও বা বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-পরিবৃত ক্ষুদ্র বনভূমি, আর তাহারই মধ্যস্থলে পাহাড়ের উপরে প্রাসাদোপম প্রস্তর সৌধ, যেন একখানি সুপটু পটুয়ার নিপুণ হস্তের অঙ্কিত চিত্র বলিয়াই মনে হয়। মহারাজা এই গিরিনিবাসের আবশ্যক সংস্কার সাধন করিয়া দৃশ্যটী আরো মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন।

মহারাজের প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে একটী বিষ্ণু ও একটী লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং দেওয়ান-জীর আবাস-বাটীর বৃক্ষবাটিকাস্থিত একটী শেষশায়ী ও একটী বামন মূর্ত্তি ছত্রপুরের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। মূর্ত্তি কয়েকটীর ভাস্কর্য্য ও তক্ষণ-শিল্প যে-কোনো দেশের যে-কোনো প্রসিদ্ধ শিল্পীর গৌরব স্পর্দ্ধা করিতে পারে। মূর্ত্তিগুলি বোধ হয় খাজুরাহো হইতে আনীত। খাজুরাহোর কথা দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলিব।

রাজ্যের যেখানে যাহা কিছু দর্শনীয় আছে, মহারাজা বাহাদুর সে সমস্তই দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। যেখানেই গিয়াছি হয় রামনারায়ণ, না হয়তো চম্পালাল সঙ্গে থাকিয়া যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। তত্রত্য রাজ-কর্ম্মচারীগণও এ বিষয়ে এত সতর্ক যে, আমি যে একজন বিদেশী লোক তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, এ কথা যেন মনেই হইত না। মনে হইত ইঁহারা যেন আমার কতদিনের পরিচিত, কত আপনার—অথচ কি সম্ভ্রমপূর্ণ বিনীত মধুর আচরণ। কিন্তু এ সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও পথের দুর্গমতার জন্য কয়েকটী স্থানে যাইতে পারি নাই—যথা "মহা পাণ্ডোয়া", (পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাসের স্থান) 'রণে' (জলপ্রপাত) ইত্যাদি।

যে কয়েকটি স্থান দেখিয়াছিলাম তাহার মধ্যে 'গঙ্গৌ' এবং "স্বরগ দোয়ার" উল্লেখযোগ্য। গঙ্গৌ—কেন নদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া চাষের সুবিধার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট এক কৃত্রিম

মহারাজ বিশ্বনাথ সিং—ছত্রপুর
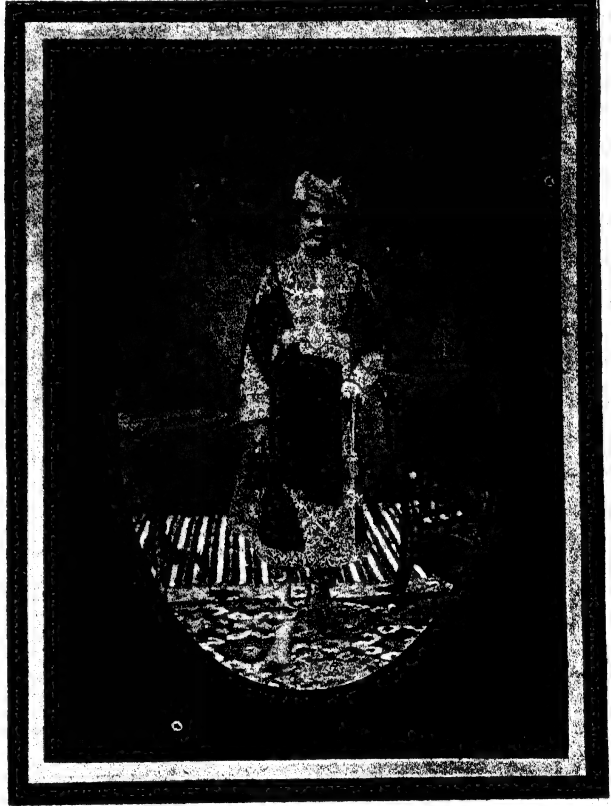
হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঁধটী প্রায় এক মাইল লম্বা হইবে। বাঁধের উপর হইতে হ্রদের জল গলিত রজত ধারার মত নদীর বুকে ঝর ঝর ঝরিয়া পড়িতেছে। সে দৃশ্য, সে ঝঙ্কার এই পার্ব্বত্য নদীর উপর যেন এক মায়াপুরীর ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে। কিন্তু গঙ্গৌ মাত্র সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্বই নহে, ইহা দ্বারা সে অঞ্চলের চাষের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

শুনিলাম কিছুদূরে কেনের উপর এইরূপ বাঁধ আরো একটী আছে। গভর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে।

আর একটী সুন্দর দৃশ্য গঙ্গৌ দেখিতে যাইবার পার্ব্বত্য পথ। পাহাড়ের উপর আঁকিয়া বাঁকিয়া সর্পিল গতিতে এই পথ ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়াছে তাহার শিখর-সমতলে; আবার সেথান হইতে নামিয়া একেবারে গিয়া পৌছিয়াছে নদীর কিনারায়। পথের এক-একটি বাঁক অতিক্রম করিতেছি, পাশের পাহাড়-চূড়াগুলি মাথা নোয়াইয়া পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে, আর তাহার অন্তরালবর্ত্তী হরিৎ উপত্যকা অথবা ক্ষুদ্র বনভূমি চিত্রলেথার মত জাগিয়া উঠিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শ্যামলতার ঢেউ বহিয়া গিয়াছে—দৃশ্যের এই আরোহ-অবরোহ না দেখিলে বুঝানো যায় না। স্বর্গদ্বারের বৈচিত্র্য—একটী পাহাড়ের গুহায় এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, পাহাড়ের বক্ষ চুয়াইয়া মহাদেবের মাথায় অনবরত জল ঝরিয়া পড়িতেছে। মহাদেবকে স্নান করাইয়া সেই জল নিকটবর্ত্তী একটী কুণ্ডে গিয়া জমিতেছে;—কিন্তু কুণ্ডটীর সেই একই ভাব

—কানায় কানায় ভরিয়া আছে মাত্র বাকী জল যে কোথায় যায় কোনো সন্ধান নাই। প্রায় পাঁচশত সিঁড়ি বাহিয়া স্বর্গ-দ্বারে পৌছিতে হয়। রাজকর্ম্মচারীগণ আবশ্যক ডুলির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আমার প্রয়োজন না থাকিলেও একটা ডুলি আমার সহযাত্রী রাজগুরু-পুত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গৌর গোপাল ভাগবতভূষণ মহাশয়ের কাজে লাগিয়াছিল। ভাগবত-ভূষণ মহাশয়ের যুবক পুত্র শ্রীমান মদনগোপাল ডুলির সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। নামিবার পথে লজ্জায় পড়িয়া ভাগবত-ভূষণ মহাশয়ও 'পাঁওদলেই' কাজ সারিয়াছিলেন। আমরা আহারের পর ছতরপুর হইতে রওনা হইয়াছিলাম—কিন্তু পাহাড় হইতে নামিয়া দেখি নীচে ৪।৫ জন লোক নানারকমের খাবার লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। শুনিলাম রাজ্যের অন্যতম কালেক্টার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামভট্ট মহাশয় পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পাইয়া রাজগড়ে আসিয়া আমাদের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। খাবারের মধ্যে ছিল—দুধ, দই, নানারকম মেওয়া, পেঁড়া এবং পানিফলের লুচি, ও ময়দার লুচির সঙ্গে

মৌ (মহেবা) রাজপ্রসাদ (অপরাংশ)

কয়েকপ্রকার তরকারী। যাঁহারা খাবার বহিয়া আনিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ এবং ভট্টজীকে নমস্কার দিয়া আহার্য্য গ্রহণে আমাদের অক্ষমতা জানাইলাম। তবে সেগুলি আর ফিরিয়া গেল না। আমাদের সঙ্গের ড্রাইভার ও ডুলি-বাহক প্রভৃতির মধ্যে খাবারগুলি বণ্টন করিয়া দিলাম।

আমাকে রোজ দুইবার করিয়া দরবারে হাজিরা দিতে হইত;—বৈকালে ৩টা হইতে পাঁচটা, এবং সন্ধ্যার পর সাতটা হইতে নয়টা। আলোচনার বিষয় ছিল প্রধানতঃ—চণ্ডীদাসের জীবনকথা, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, পদাবলী এবং সহজিয়া ধর্ম্ম ও সাহিত্য। মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য কথাও যে না উঠিত এমন নহে—যথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সঙ্গে শ্রীসম্প্রদায়, মাধ্ব প্রভৃতির পার্থক্য, গীতা ও ভাগবত, মধুরভজন, শ্রীচৈতন্য দেবের মতামত ইত্যাদি ইত্যাদি। আলোচনায় যোগ দান করিতেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবতদাস শাস্ত্রী। তিনি রামানুজ সম্প্রদায়ের সাধু—একজন বড় পণ্ডিত। এলাহাবাদে ইঁহার মঠ আছে। আরো দুইজন সাধু ছিলেন সন্মাজী (রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত) ও নাগাজী (নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত)। কিছু দিন পরে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন—বৃন্দাবন-ধাম হইতে রাজগুরুপুত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল ভাগবতভূষণ মহাশয়।

মৌ (মহেবা) রাজপ্রসাদের সম্মুখভাগ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশ্রুতনামা পণ্ডিত পরম ভাগবত প্রভুপাদ নীলমণি গোস্বামী মহাশয় রাজগুরু ছিলেন। ভাগবতভূষণ মহাশয় পিতার উপযুক্ত পুত্র,—যেমন পণ্ডিত, তেমনই উদার, বিনয়ী। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের কথা—ইনি নিজে একজন সুগায়ক। যেমন সুকণ্ঠ, পদাবলী-সাহিত্যে অভিজ্ঞতাও তেমনি। ইঁহার পুত্র শ্রীমান মদনগোপাল আমার নিত্য সঙ্গী ছিল। সেবাপরায়ণ মিষ্টভাষী প্রিয়দর্শন যুবক। মহারাজের স্নেহপূর্ণ সুমিষ্ট ব্যবহারে এবং এই সব সাধু-সঙ্গে প্রবাসের দিন বড় আনন্দেই কাটিয়াছিল। আলোচনায় প্রীত হইয়া মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন ও পদাবলীর হিন্দী অনুবাদ প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এজন্য উপযুক্ত লোকেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব অনুবাদ কার্য্য এতদিন আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের

আলোচনায় মাঝে মাঝে মিঃ গোপাল রায় এম-এ, এল এল্-বি মহাশয়ও আসিয়া যোগ দিতেন। তিনি কোনো কোনো দিন পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে প্রাচ্য দর্শনের মিল অমিলের প্রসঙ্গ তুলিতেন। মহারাজ সকল সময়েই সাগ্রহে সমস্ত আলোচনাতেই যোগদান করিতেন।

নিত্য সন্ধ্যায় গানের মজলিশ বসিত। মহারাজা নিজেও গাহিতেন। ব্রজলীলার গান, ভজন গানই অধিকাংশ।

পণ্ডিত রামনারায়ণ লেখক শ্রীমান্ মদনগোপাল

শুনিলাম রাজধানীতে একজন উঁচুদরের গাইয়ে আছেন,—নাম ওস্তাদ ভোলে। আমি তাঁহার গান শুনিতে চাহি জানিয়া মহারাজ একদিন সে ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। গান-বাজনার কসরৎ করতব বুঝি না; কিন্তু এই ওস্তাদের মধুর কণ্ঠস্বর এবং মুদ্রাদোষহীন গাহিবার ভঙ্গী আমার বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল ইহাঁর তানালাপ,—কানে যেন তাহার রেশ লাগিয়া আছে। ওস্তাদজীর বয়স হইয়াছে; তিনি জাতিতে মুসলমান।

মহারাজা বাহাদুর খুব উপবাস দিতে পারেন। পঞ্জিকায় পর্ব্বাহের অভাব নাই এবং মহারাজ তাহার একটীও বাদ দেন না। উপবাসের দিন তিনি অধিকাংশ দিন রাজগড়ে চলিয়া যান; কখনো কখনো খাজুরাহোতেও দিন কাটাইয়া আসেন। স্নানের পর রওনা হইয়া যান এবং সন্ধ্যায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস, আচারপালনে এমন দৃঢ় নিষ্ঠা আমি অনেক গোস্বামীরও দেখি নাই—রাজা-রাজড়ার তো দূরের কথা। প্রথমা মহারাণীর পরলোক গমনের পর ইনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। মহারাজার একমাত্র পুত্রের বয়স পাঁচবৎসর। ভগবান এই রাজবংশধরকে রাজোচিত গুণের সঙ্গে দীর্ঘজীবী করুন।

খেলার পুতুল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৫)

—কিরে, অনি'যে হঠাৎ এসে হাজির হলি এর মানে কি ?

—কেন, তুমি ত' আর মেমসাহেব নও, যে তোমার বাড়ীতে খবর না দিয়ে আসাটা আমার অনুচিত হ'য়েছে ? তাই যদি মনে করো, না হয় বলো ধুলোপায়েই বিদেয় হ'য়ে যাই, উনি এখনও গাড়ী নিয়ে বাইরে অপেক্ষা ক'রছেন !

—বলিস' কি অনি ? সুশীলও এসেছে নাকি ? সেই কি তো'কে সঙ্গে ক'রে এনেছে ? কী আশ্চর্য্য ! তুই যে আমাকে একেবারে অবাক্ ক'রে দিলি বোন্ ?

—আমি তোমার এখানে আসতে চাইনি, জানি তুমি নিজের দুঃখই সামলাতে পারছনা ! আবার আমার দুঃখের বোঝা এনে তোমার ব্যথাকে ভারী ক'রে তুলবার আমার মোটেই ইচ্ছে ছিলনা, কিন্তু উনি পীড়াপীড়ি ক'রে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে এলেন—

—তা' আমার প্রতি তাঁর হঠাৎ এমন অসীম অনুগ্রহের কারণটা কি অনি ?

—তোমার প্রতি অনুগ্রহ ? পাগল হ'য়েছো দিদি ! উনি আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখাবার জন্ত আমাকে এখানে নিয়ে এলেন ! বললেন—চল' অনিলা, আজ রবিবার ছুটীর দিনটা তোমাকে একটু তোমার মন্দাদিদির বাড়ীতে ঘুরিয়ে আনি,—তাহ'লে তোমার মনটা হয়ত একটু ভাল হ'তে পারে !

—আমার এখানে নিয়ে এলে যে তোর মনটা ভাল হ'তে পারে এ খবর তাকে কে দিলে ?

—কি জানি কেমন ক'রে জানতে পেরেছেন যে তোমাকে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে !

—বোধ হয় আমরা পরস্পরকে খুব বেশী চিঠিপত্র লিখি দেখে ওটা সে অনুমান ক'রে নিয়েছে ; তা' সে যাই হোক্, সুশীলের জন্ত কিন্তু আমার খুব সহানুভূতি হ'চ্ছে !

—কেন বল' তো ?

—আমাদের দু'জনের অবস্থা অনেকটা সমান ব'লে !

—অনিলা এ কথাটা ঠিক বুঝতে না পারলেও এর একটা কিছু ভাবার্থ ধরবার সে চেষ্টা করছিল, কিন্তু একটু পরেই মন্দা তার বক্তব্যটুকু আরও পরিষ্কার ক'রে দিলে ; সে যেন আপন মনেই বলতে লাগ্‌ল—যে স্বামী আমাকে আজও ভালবাসতে পারেনি, আমি নির্ব্বোধের মতো তা'কেই ভালবেসে কষ্ট পাচ্ছি, আর যে স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসতে পারলেনা—সুশীল বেচারা তারই মন পাবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা ক'রছে !

—অনিলা আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না ! অস্থির হ'য়ে বলে উঠল—দিদি, তুমি ভয়ানক ভুল ক'রছো ভাই ! এ তোমার সে জিনিস নয় ! তোমার বোনটির এই যৌবনপুষ্ট দেহের প্রলোভনেই সে মুগ্ধ ! ও সব তার একটু শুধু চালাকী, আর কিছু নয় !

—না না, এ তোর অন্যায় কথা অনি ! সুশীল অমন ভাল ছেলে, সে তোকে কত যত্ন করে—কত ভালবাসে—

মন্দার কথায় বাধা দিয়ে অনিলা ব'ললে—যত্ন ক'রে খুবই, এ কথা মানি, কিন্তু সে আমাকে নয়, আমার বাইরের এই খোলসটাকে !—আর ভালবাসার কথাটা এ ক্ষেত্রে না তুললেই ভাল হয় দিদি, কারণ স্ত্রীর দেহটাকেই যে সবচেয়ে বেশী দামী ব'লে মনে করে এবং তার মনটাকে অনায়াসে দু'পায়ে দ'লে চলে, তার পক্ষে ভালবাসা একটা অসম্ভব কিছু নয় কি ?

মন্দা বিস্মিত হ'য়ে ব'ললে—কিন্তু এই একটু আগে তুই-ই তো ব'ল্‌লি যে যাতে তোর মনটা একটু ভাল থাকে এই জন্তেই সে তোকে আজ এতদূরে আমার কাছে ব'য়ে এনেছে !—

একটু ম্লান হেসে অনিলা ব'ললে—সে বুঝি আমার জন্যে এনেছে মনে করেছো ? দিন দিন শীর্ণ হয়ে পড়ছি, এ দেহের লাবণ্য-কুসুম—প্রভাতেই শুকিয়ে ঝরে আস্‌ছে দেখে, দেহের মালিক একটু শঙ্কিত হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর এক বন্ধু ডাক্তার উপদেশ দিয়েছেন যে, আমার মন যাতে প্রফুল্ল থাকে সেই ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই তাঁর ভোগের এই উপকরণ অম্লান থাকতে পারে, তাই ওঁর এই উৎসাহ! তাছাড়া আমাকে এখানে নিয়ে আস্‌বার আরও একটা কারণ হ'চ্ছে, উনি এই নূতন মোটর ড্রাইভ্‌ ক'রতে শিখেছেন কিনা, একটা লম্বা ট্রিপ্‌ দিয়ে হাতটা দোরস্ত ক'রে নেবার বাসনাও এর মধ্যে গুপ্ত আছে।

—সত্যি অনি, তুই বড্ড রোগা হ'য়ে গিয়েছিস। তোর সে সদাপ্রফুল্ল মুখে আর ভুবনমোহন হাসিটুকু লেগে নেই, তোর সে অনিন্দ্য রূপের জ্যোতিঃ যেন কী একটা গভীর বিষাদের ছায়া এসে ঢেকে দিয়েছে! কিন্তু ভাই, তবু আমি বলবো যে মানুষের কাজের বিপরীত দিকটাই যদি তুমি কেবল দেখো তাহ'লে তাদের উপর তোমার অশ্রদ্ধাটা শুধু বেড়েই চলবে!

—কি ক'রবো দিদি, ভাল কিছু দেখতে না পেলেও তুমি কি বলতে চাও আমি কল্পনায় সেটা তাঁর ওপোর আরোপ ক'রে নেবো?......তাও হয়ত' পারতুম যদি স্বামী আমার মনের আদর্শের একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত না হ'তেন।

—সে কথা ঠিক বটে, কিন্তু দেখতে তো পাচ্ছিস্‌ বোন্‌; আদর্শের অনুকূল স্বামী পেয়েও আমি আজ পর্য্যন্ত সুখী হ'তে পারিনি, সুতরাং—

মন্দার কথা শেষ হবার আগেই অনিলা ব'লে উঠল— কিন্তু সেই স্বামীকে জয় করবার চেষ্টায় যে তোমার সব দুঃখ আনন্দে রূপান্তরিত হ'য়ে উঠ্‌ছে দিদি,—আর আমার কি দশা একবার ভেবে দেখো দেখি! জীবনের আঠারোটা বৎসর উত্তীর্ণ হবার পর অভিভাবকরা যাকে ধরে এনে বল্‌লেন এরই গলায় তোমায় মালা দিতে হবে,—শুভদৃষ্টির সময় তার মুখের দিকে চেয়ে বিতৃষ্ণায় আমার মন কেঁদে উঠ্‌ল! ঘৃণায় আমার দু'চোখ সেই যে তার কুৎসিত মুখখানার উপর থেকে ফিরে এল, আজও আর সে মুখের দিকে আমি ভাল ক'রে চাইতে পারিনি! অথচ তাকেই সেদিন সবার সম্মুখে বরমাল্য পরাতে হ'য়েছিল—উঃ কি শাস্তি এই মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মানোয় বলো তো—বলতে বলতে অনিলা কেঁদে ফেললে।

মন্দা নিজের আঁচলে তার চোখ মুছে দিয়ে ব'ললে— সত্যি বলিছিস্‌! তোর বিয়ের রাত্রের কথা আমি আজও ভুলিনি। পাত্র মস্ত বড়লোকের ছেলে—লেখাপড়া শিখেছে, অনেকগুলো পাশ করেছে—শুনে মনে করেছিলুম তোর ভাগ্য ভাল, কিন্তু বর এসে যখন গাড়ী থেকে নাম্‌ল' আমি তার সে মর্কট মূর্ত্তি দেখে কিছুতে আর তোকে গিয়ে বলতে পারলুম না যে তোর মালা গলায় নেবার জন্য আজ কেমন মানুষটি এসেছে—!... ...চোখে আমারও জল এসেছিল। সম্প্রদানের সময় আর কেউ বুঝতে পারুক বা না পারুক, আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম যে ওই কদাকার ব্যক্তিটির গলায় বরমাল্য দিতে তোর হাতদুখানা কিছুতেই উঠতে চাইছেনা!......"ক'নে বড় লাজুক" বলে যারা জোর করে তোর হাত ধ'রে সেদিন সুশীলের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল, তারা জানতেও পারলে না যে সে কুণ্ঠা ব্রীড়াবনতমুখী নববধূর মধুর রাঙা সরমটুকু নয়, সে তোর এই অভিশপ্ত নারীজীবনের ধিক্কারজনিত লজ্জা!

কাতর আর্ত্তকণ্ঠে অনিলা বললে—দিন যে আর কাটেনা ভাই,—এ ধিক্কৃত জীবন যে আর আমি বইতে পারছিনি দিদি!—

বল্‌তে বল্‌তে সে যেন একেবারে ভেঙে পড়ল!

মন্দা তাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে আদর ক'রে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ব'ললে—কি করবি ভাই! উপায় কি বল্‌? হিঁদুর ঘরের মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি যখন, তখন এসব দুর্ভাগ্য আমাদের বইতেই হবে—

—এমনি ক'রে মুখটিপে স'য়ে যাই বলেই ত' আমাদের প্রতি অন্যায়ের কিছু প্রতিকার হয়না, এবং হবেওনা বোধ হয় কখনও, যদি আমাদের দিক থেকে এখনও এর প্রতিবাদ না আসে—এই কথা ক'টি বল্‌তে বল্‌তেই অনিলার কণ্ঠ যেন অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে উঠলো!

মন্দা অনেকক্ষণ আর কিছু ব'ললে না, চুপ ক'রে বসে রইল।

অনিলা সে স্তব্ধবাক্‌ মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল, বুঝি চেষ্টা করছিল মন্দার মনের ভিতরের নিঃশব্দ কথাগুলোর ভাষাটা পড়ে নেবার।

বহুক্ষণ এমনি ক'রে কেটে গেল, তারপর অধীর হয়ে অনিলা জিজ্ঞাসা করলে—কি ভাবছ দিদি ?

মন্দা যেন চম্‌কে উঠ্‌লো ! হঠাৎ অনিলার ডানহাতটা চেপে ধরে প্রশ্ন ক'রলে—একটা কাজ করতে পারিস্ ?

—কি ?

অনিলার চোখেমুখে একটা আগ্রহ ফুটে উঠল !

মন্দা তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—বিদ্রোহী হ'তে পারিস্ অনি ?

অনিলা এ প্রস্তাবে যেন শিউরে উঠ্‌লো ! চট্ ক'রে এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারলেনা। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল !

তার দু'টি গাল বেয়ে যখন চোখের জল গড়িয়ে প'ড়তে লাগল, মন্দা বললে—বুঝিছি অনু, যে কারণেই হোক্, তুই ওটা পারবিনি, অতএব—

অনিলা বাধা দিয়ে বললে—এ সঙ্কল্প আমার মনে প্রথম কবে এসেছিল জানো ?—ফুলশয্যার রাত্রে !···ঝক্‌ঝকে পালিশ করা মেহাগিনী কাঠের নূতন খাটের উপর সদ্যপ্রস্তুত ধব্‌ধবে নূতন শয্যা তখন পর্য্যন্ত কোনটাই কোনও দ্বিতীয় লোকে একবারও ব্যবহারে করেনি ! বুঝতেই পারছো সে বিছানা আমার কাছে কি লোভনীয় ! তুমি তো জানো আমি ছেলেবেলা থেকে কিছুতেই কারুর ব্যবহার করা বিছানায় শুতে পারিনি, তার উপর ফুলের ছড়াছড়ি !—ফুলে ফুলে ঘরের সমস্ত আস্‌বাব, এমন কি বিজলী বাতীর ঝাড়টি পর্য্যন্ত ঢেকে দিয়েছিল ! ঘরের ভিতরের আলোটুকু সেরাত্রে মনে হচ্ছিল যেন কোন্ নন্দনলোকের সুরভি-স্নাত-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ! ফুলের কুঁড়ির গয়না এনে যখন পড়্‌শিনীরা আমায় পরিয়ে দিতে সুরু ক'রলে, আমি কিছু আপত্তি করলুমনা।···জীবনে এই একটা রাত্রির জন্য হিঁদুর মেয়ের চির-অন্ধকার সংসার-কারাগারের মধ্যে—কাব্যের স্বর্গলোক গড়ে ওঠে ! আমিও তাকে ভাঙ্‌তে ভয় পেলুম ! ক্ষুধিত অন্তর কিছুতেই এমন একটি রজনীর দুর্লভ আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রতে চাইলে না !···আমার মনে হ'তে লাগল, আমার আজকের এই স্মরণীয় রাত্রিশেষের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারের এই পুষ্পকলিগুলি যখন ধীরে ধীরে আমার প্রতি অঙ্গে প্রস্ফুটিত হ'তে থাকবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে—প্রিয়তমের প্রথম চুম্বন আলিঙ্গনের আনন্দ-স্পর্শে আমার অন্তরের অস্ফুট প্রেমের মুকুলমঞ্জরীও ধীরে ধীরে বিকশিত হ'য়ে উঠবে !···কী যেন একটা আশায়, কেমন যেন একটা কি সার্থকতার সম্ভাবনা কল্পনা ক'রে আমার দেহমন অকারণ প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো !······

কিন্তু সে ফুলউৎসবের ফুল্ল যামিনীতে যে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো—যখন দেখলুম যে, সে আমার কল্পনার ছবি নয়—সে আমার মনের মানসমূর্ত্তি নয়—সে এক কুশ্রী অপরিচিত—যাকে আমি কোনও দিনই কামনা করিনি, তখন আমার সে পুষ্প-বাসরের সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্য্য, আশা ও আকাঙ্ক্ষা—যেন তাশের প্রাসাদের মতো নিমেষে চূর্ণ হয়ে গেল !

হৃত-স্বাস্থ্য দুশ্চরিত্রের মুখে যে-রকম একটা শ্রীহীন কুরূপের কদর্য্য ছাপ পড়ে যায়—ঠিক্ তেমনিই কুৎসিত মুখ নিয়ে, ও অপটু দেহ নিয়ে আমার নবপরিণীত পতি এসে সে ঘরে দাঁড়াতেই সে ঘরের বায়ু পর্য্যন্ত আমার কাছে দূষিত হ'য়েছে ব'লে বোধ হ'তে লাগল। তারপর তিনি যখন আবার আমার সঙ্গে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর রহস্যালাপ সুরু ক'রলেন, তাঁর সে অসভ্যতা আমার কাছে অসহ্য বোধ হ'তে লাগল ! ইচ্ছে হ'ল, তখনি সে ঘর থেকে ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই ; কিন্তু পাছে তা'করলে সকলের হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপের পাত্রী হ'য়ে পড়ি এই আশঙ্কায়, লজ্জায় তা' পেরে উঠিনি ; কিন্তু মন আমার এই বিবাহের উপর সেইদিন থেকেই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল।

—তবে কেন তুই তাকে এতদিন ধরে স্বীকার ক'রে নিয়ে চল্‌ছিস্ অনু ?

—তোমাকে তো কতদিন বলেছি দিদি, এ বিষের জ্বালা আমি নীরবে সহ্য করছি—এ তুঁষের আগুনে আমি যে নিঃশব্দে পুড়ে মরছি—এ শুধু আমার বাবার মুখ চেয়ে ! তিনি যদি জানতে পারেন যে, এ বিবাহে আমি সুখী হ'তে পারিনি, তাহ'লে তাঁর মনে বড় কষ্ট হবে ! তুমি তো জানো, সংসারে আমি বাবার চেয়ে আর কাউকেই বেশী ভালবাসতে পারিনি ! তাঁর অফুরন্ত স্নেহধারাই আমার এ বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র পাথেয়।

—কিন্তু, তাই যদি সত্য হয়, তবে তিনি তোমার বিবাহ দেবার সময় কন্যার রুচি ও পছন্দর দিকে একটুও দৃষ্টি রাখেন নি কেন ?

—সে জন্ত তাঁর খুব বেশী দোষ দেওয়া যায়না ভাই, জানো তো তিনি একটু সেকেলে ধরণের লোক। মেয়ের ভাত-কাপড়ের দুঃখটা যাতে কোনও দিন না হয়, তিনি তাঁর সমসাময়িক আর সকলের মতো সেই দিকটাতেই বেশী লক্ষ্য রেখেছিলেন! মেয়েরও যে একটা পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে, সে কথা তাঁর মনেই হয়নি।

—কিছু মনে করিস্‌নি ভাই, মেয়ের বিয়ের বোঝাটা দিন দিন যে-রকম ভারী হ'য়ে উঠেছে, তাতে কোনও স্নেহময় জনকই আর কন্যার জন্ত এখন নিখুঁত পাত্র সংগ্রহ করে উঠতে পারেন না! ভাত-কাপড়ের দুঃখটাই যখন দেশে প্রধান হয়ে ওঠে তখন অন্ত কোনও অভাবের দিকে দৃষ্টি রাখবার আর কারুর উৎসাহই থাকেনা! এ সবই ঠিক্, কিন্তু, একটা বিষয়ে আমার মনে হয় আমাদের অভিভাবকদের কর্ত্তব্যের ক্রটী একেবারে অমার্জ্জনীয়। শুন্‌তে পাই, কেরাণীগিরি করতে গেলেও নাকি ছেলেদের 'হেল্‌থ এক্‌জামীন' দিয়ে ঢুকতে হয়, কিন্তু বিয়ে করতে যাবার সময় তাদের সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মোটেই প্রয়োজন হয়না! অথচ এই ব্যাপারে ছেলের স্বাস্থ্য পরীক্ষাটা আমার বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত!

—সে ব্যবস্থা যদি থাকতো, তাহলে আমার বিশ্বাস যিনি আজ আমার পাণিগ্রহণ ক'রে পিতাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেছেন, তাঁর অদৃষ্টে এ পুণ্য সঞ্চয় করাটা আর এ জীবনে বোধ হয় ঘটতো না।

—শুধু তোর কথা ব'লেই বল্‌ছিনি অনু, সে ব্যবস্থা থাকলে আজ অনেক মেয়েই বোধ হয় অকাল-বৈধব্য থেকে রক্ষা পেতে পারতো। এ দেশের অনেক বাপ মা'ই নিজেদের সখ মেটাবার জন্তে জেনেশুনে রুগ্ন ছেলের বিয়ে দিতেও একটুও ইতস্ততঃ করেন না!

—আর ছেলেগুলোও এমনি দায়িত্ব-জ্ঞানহীন যে তারা নিজেদের কুৎসিৎ ব্যাধি থাকা সত্বেও তা গোপন ক'রে নির্লজ্জের মতো একটা নিরীহ বালিকাকে বিবাহ করে তার সমস্ত জীবনটা নষ্ট ক'রে দেয়।

—শুধু তার জীবনটাই নয় অনু, পিতার অন্যায়ে তার সন্তান-সন্ততিরা পর্য্যন্ত বংশ পরম্পরায় ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

ফুলি ঝী এসে খবর দিলে—বড়মা, বাবু আসছেন—

অনিলা তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে পাশের ঘরে উঠে যাচ্ছিল, মন্দা তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললে—ওঁর সামনে আর তোকে লজ্জা ক'রতে হবেনা! আমার বিয়ের দিন বাসর-ঘরে ওঁকে নিয়ে কি রঙ্গটাই করিছিলি ব'লতো!

অনিলা মন্দার হাত ছাড়িয়ে আবার উঠে প'ড়ে বললে—তখন যে আমার ঘাড়ে এ ভূতটি এসে চাপেনি দিদি! ওঁর আবার সদ্‌গুণ নেই—বদ্‌গুণ আছে কিনা! কারুর সামনে বেরুবার হুকুম নেই, জানলার পাখীটি পর্য্যন্ত খুলবার জো নেই! ছাদে ওঠাও নিষেধ! এই যে মোটরে বা গাড়ীতে যাই আসি, তাও চারিদিকে স্ক্রীণ টাঙিয়ে কিম্বা দোর জানালা বন্ধ করে ফৌজদারী আদালতের আসামীদের মতো!—

মন্দা অবাক্ হ'য়ে তার দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে বললে—বলিস্ কিরে? ছি, ছি! লোকটার দেখছি ভেতর বাইরে দুই-ই নোংরা!

—সে আর একবার ক'রে ব'লতে! যারা নিজেরা দুর্ব্বল-চিত্ত ও নষ্ট-চরিত্রের মানুষ, তারাই অন্ত মানুষকে বিশ্বাস ক'রতে পারেনা!

মন্দা এবার হাসতে হাসতে বললে—তা ভাই, তোর সম্বন্ধে এ কথাও তো বলা যেতে পারে যে, সে তোকে অবিশ্বাস করেই যে এ-রকম ক'রে তা নয়, বেচারী হয়ত' চোরের ভয়েই তোকে সর্ব্বদা আগলে আগলে রাখে!

ললাট-জোড়া তার দুটি টানা ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে অনিলা জিজ্ঞাসা করলে—তার মানে?

মন্দা আরও খানিকটা হেসে ফেলে বললে—বুঝতে পারলিনি পোড়ারমুখী, তোর এই দুর্লভ রূপসম্পদ যদি না থাকতো তাহ'লে বোধ হয় তোকে এত কড়া পাহারায় ও রাখতো না! তাছাড়া, এ কথাটাও কি আর এতদিনেও তোর মাথায় ঢোকেনি যে, বাইরে থেকে তোকে ওর এত জোর করে ধ'রে রাখবার প্রধান কারণই হচ্ছে—তোর ভিতরটার ও এখনও একটুও নাগাল পায়নি ব'লে!

—যাও, তোমার সবেতেই ঠাট্টা দিদি! ব'লতে ব'লতে অনিলা পাশের ঘরে চলে গেল।

মন্দা চেঁচিয়ে বললে—ধন্য পতিব্রতা মেয়ে তুই অনিলা—স্বামীর হুকুম কিছুতে অমান্য করিস্‌নি দেখছি! তোর তবে যথার্থ ই "পতি পরম গুরু"?

অনিলা পাশের ঘর থেকে উত্তর দিলে—এটা নেহাৎ আত্মরক্ষার জন্যই ক'রতে হয় দিদি! যাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, তার কাছে অপমানিত হবার লজ্জা আমার কিছুতেই সইবেনা! বাইরের লোকে কিন্তু এটা বোঝেনা, তারা আমাকে তোমারই মতো পতিব্রতা সতী ব'লে ভুল করে!

—সত্যি, বাইরেটাকে ঠকানো এত সহজ যে সেই প্রলোভনে অন্তরের সত্যকে স্বীকার ক'রতে আমরা একান্ত ভয় পাই!

সত্যেন ঘরে ঢুকে বললে—সুশীলবাবু কি বাইরেই বসে থাকবেন? তিনি তোমার বন্ধুর স্বামী, তাঁকে ভিতরে ডেকে এনে খাতির করাটাই বোধ হয় তোমার পক্ষে ভাল দেখাবে! কারণ সেটা শুধু শোভন ও সুন্দর নয়, কর্ত্তব্যের মধ্যেও!

মন্দা একটু মুখ-টিপে হেসে পরিহাসের দৃষ্টিতে সত্যেনের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—সুশীলবাবুর স্ত্রী যখন আমার বন্ধু, তখন সে কি তোমারও বন্ধু নয়?

সত্যেন একটু ইতস্ততঃ ক'রে ব'ললে—আমি সেটা মনে করলেও তোমার বন্ধু হয়ত' সেটা না মনে ক'রতে পারেন।

—ও! আমার বিয়ের রাত্রে বাসর-ঘরে তার হাতে তোমার বারবার কাণমলাটা বুঝি আজ আর মনে নেই!

—না থাকবারই কথা বটে, সে আজ অনেকদিন হ'য়ে গেল যে! কিন্তু আমি তা ভুলিনি মন্দা, কারণ সে কাণমলা-গুলোকে আমি সে রাত্রে আমার কৃতকর্ম্মের শাস্তি ব'লেই ধরে নিয়েছিলুম কিনা?

মন্দার মুখখানি গম্ভীর হ'য়ে গেল! সে মুহূর্ত্তকাল চুপ ক'রে থেকে বললে—আমার বন্ধু তোমাকেও তার বন্ধু বলেই মনে করে, কিন্তু সুশীলবাবুর স্ত্রীর সে কথা মনে করবার হুকুম নেই—বুঝলে? তাই সে আর তোমার সামনে বেরুতে পারেনা! অতএব বুঝতেই পারছো যে সুশীলবাবুকেও অগত্যা বাইরের ঘরেই ব'সে থাকতে হবে।

—কিন্তু, তোমার উপর আমার তো সেরূপ কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই মন্দা! তুমি ইচ্ছা করলে অনায়াসেই সুশীলবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করতে পারো, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই!

সত্যেনের মুখে এ কথা শুনে মন্দা মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে বললে—তোমার পক্ষে তা না থাকাই উচিত বটে, কিন্তু আমার যে তাতে বিশেষ আপত্তি আছে গো!

—কেন মন্দা?

—যিনি তোমার সামনে তাঁর স্ত্রীকে বার হতে দেন না, তাঁর সামনে তোমার স্ত্রীর বেরিয়ে কথা বলাটায় আমার মন কিছুতেই সায় দিতে চায় না! আমি তাঁকে ভিতরে আনতে চাইনে!

—স্বামীর এই অনাদরে তোমার বন্ধু হয়ত' ক্ষুণ্ণ হ'তে পারেন!

এ কথার উত্তরে মন্দা বেশ জোর ক'রেই ঘাড় নেড়ে বললে—না, তা তিনি মোটেই হবেন না!

সত্যেন একটু বিস্মিত হয়ে ব'ললে—তুমি কি সেটা ঠিক জানো?—

এর উত্তরে মন্দার মুখ থেকে যে কথাগুলো প্রায় বেরিয়ে প'ড়ছিল, হঠাৎ পাশের ঘরের দরজার আড়ালে দৃষ্টি প'ড়তেই এক জোড়া মিনতিভরা ব্যাকুল চোখের নিঃশব্দ নিষেধ তাকে কিছুতেই আর তা ব'লতে দিলে না।

সত্যেন কোনও উত্তর না পেয়ে আবার বললে—সুশীল-বাবু আমাদের বন্ধু এবং অতিথি, তাঁকে বাইরে থেকেই অভ্যর্থনা ক'রে বিদায় দিলে তোমার গৃহিণীপনার কর্ত্তব্যের একটা ত্রুটী থেকে যেতে পারে!

মন্দা তার দীপ্ত দুই চোখ সত্যেনের মুখের দিকে তুলে ব'ললে—আর তাঁকে ভিতরে আনলে আমার পক্ষে স্ত্রী হিসেবে স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষার দিক থেকে কি তার চেয়েও বড় কর্ত্তব্যের ত্রুটী হবে না?

সত্যেন কথাটা শুনে মনের মধ্যে যেন চম্‌কে উঠল। সে আর কিছু ব'লতে পারলে না।

একটু পরে মন্দা ব'ললে—তুমি আমাকে আজও পর্য্যন্ত স্ত্রী বলে স্বীকার না ক'রলেও বা ঠিক্ স্ত্রীর মতন গ্রহণ ক'রতে না পারলেও আমি তো আর হিঁদুর মেয়ে হ'য়ে তোমার পত্নীত্ব অগ্রাহ্য করতে পারিনি! যার জন্যে হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর বজায় রয়েছে তার কল্যাণটুকু আমাদের যতখানি দেখতে হয়, তার মান মর্য্যাদার দিকেও আমাদের তেমনি দৃষ্টি রাখতে হয়—বুঝলে?

গোকুল এসে খবর দিলে—বাইরে যে বাবু এসেছেন

তিনি যাবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন, ছোটো মা-ঠাকরুণকে তৈরি হয়ে নিতে বললেন।

মন্দা গোকুলকে বলে দিলে—যা, তুই বল'গে যা—যে, "বড়মা ব'ললেন—সন্ধ্যের আগে আপনাদের কিছুতেই যাওয়া হবেনা!"

গোকুল চলে গেল।

মন্দা সত্যেনকে বললে—আমি এদের না খাইয়ে ছাড়বো না। তুমি যাও, সুশীলের সঙ্গে আর একটু গল্প করগে. আমি চা' আর জলখাবার এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মন্দার এই গৃহিনীপনা দেখে সত্যেনের বারবার আর একজনের কথা মনে পড়তে লাগল! এ গৃহে যার আসনখানি আজ মন্দা দখল করেছে, তাকে স্মরণ হওয়াতে মন্দার জন্য সত্যেনের চোখে একটা প্রশংসার দৃষ্টিও ফুটে উঠলো!

সে নতমুখে কি ভাবতে ভাবতে বাইরে চলে গেল।

অনিলা ঘর্ম্মাক্ত মুখে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ব'ললে—দিদি, তুই কি ভয়ানক মেয়ে! এমন দেবতার মতো স্বামীরও তুই কি বলে নিন্দে করিস ভাই!

মন্দা ম্লান হেসে ব'ললে—দেবতা নিয়ে কি মানুষ ঘর ক'রতে পারে! বিশেষ আমাদের দেবমূর্ত্তিগুলি যখন সবই হয় মাটির—নয় পাথরের!

—না না, দিদি উনি মাটির মানুষ—বটেন, কিন্তু ম'নে হয়—দেবতাও সত্যি!

—মনে হয় নাকি? দেখিস্, যেন ওর প্রেমে পড়িস্নি অনি! ওর মধ্যে ওই দেবতাটিকে দেখেই ত তোমার দিদি এখানে এসে ওকে ভাল না বেসে কিছুতেই থাকতে পারলে না! কথাটা বলতে বলতেই মন্দার চোখ মুখের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেল! সে অনেকক্ষণ চুপটি ক'রে যেন নিজের অন্তরের মধ্যে কিসের অনুসন্ধান ক'রে ফিরতে লাগল! তারপর হঠাৎ অনিলার দিকে ফিরে কাতর ভাবে বললে—প্রতিদিন ওই পাথরের দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ে আমি নিজেকে এবং হয়ত আমার প্রেমকেও অবমানিত করছি, কিন্তু তবুও কিছুতেই ঐ দেবতার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারছিনি বোন্!

—আর দরকারই বা কি দিদি! ওই পাথরকে গলাবার সাধনাতেই যে একটা তুচ্ছ নারীর জীবন অনায়াসে ব্যয় ক'রে ফেলা যায়!

—নাঃ! তোর লক্ষণ বড় খারাপ দেখছি! মনের মধ্যে কাউকে ভালবাসবার যে বিপুল আকাঙ্ক্ষা পুষে নিয়ে তুই হাহাকার করে বেড়াচ্ছিস, দেখে ভয় হয়, পাছে কবে কোন্ অযোগ্যের পূজায় তা লেগে যায়!

অনিলা মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ দিদি, ভালবাসাও কি যোগ্যতার বিচার-সাপেক্ষ?

—নইলে সুশীল তোর ভালবাসা পেলেনা কেন বল্? আর আমিই বা এই এমন ভালমানুষটীকেও কিছুতেই ভোলাতে পারছিনি কেন? আমাদের যোগ্যতার অভাব ছাড়া এ আর কিছু নয়! আমি তাই প্রাণপণে ওঁর যোগ্য হবার জন্য তপস্যা করছি!

—তোমার তপস্যায় নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হবে দিদি!

—সে কত দিনে—কোন্ কালে—কবে কি হবে বা না হবে—তার জন্য আর ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে পারছিনি। এই এক তরফা লড়াই আর একদিনও আমার ভাল লাগছে না! মাঝে মাঝে বড় ক্লান্তি বোধ হয়, আমি যেন অবসন্ন হ'য়ে পড়ি! ...মন্দা আবার অন্যমনা হ'য়ে পড়ল, যেন কোন্ ভাবনার অতল সাগরে সে তলিয়ে গেল! অনিলা তার এই ভাবান্তর দেখে নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। খানিক পরে স্বপ্নোত্থিতের মত নড়ে-চড়ে উঠে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—প্রেমের যে একটা দুর্জ্জয় অভিমান আছে রে অনু. তুই যদি কখনও কারুর প্রেমে পড়িস্ তাহ'লে বুঝতে পারবি যে, অন্য পক্ষের কাছ থেকে একটু সাড়া না পেলে তার বেঁচে থাকাই অসহ্য বলে মনে হয়! দুনিয়ার কিছুই আর তার ভাল লাগে না! সব কিছুরই উপর একটা কি যেন রুদ্ধ রোষের আক্রোশ—কি যেন একটা অভিমানের বোঝা এসে চেপে বসে!

ফুলির মা এস ব'ললে—চা তৈরি হ'য়ে গেছে; জলখাবারও সাজিয়ে দিয়েছি বড়মা! দিদিমণির জন্যে কি ও-সব এখানে নিয়ে আসবো?

—হ্যাঁ, এইখানেই নিয়ে আয়।

—আর জামাইবাবুর দরুণ চা আর—খাবার কি গোকুলকে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেবো?

—না, বড় ঘরে আসন পেতে সাজিয়ে দিয়ে বাবুকে বলে পাঠাতে হবে। তিনি তাঁকে ভিতরে ডেকে নিয়ে আসবেন—

ফুলির মা' চলে যাচ্ছিল, অনিলা তাকে ডেকে বললে—না না, ফুলির মা, তুই ও-সব বাইরেই পাঠিয়ে দিগে যা।

মন্দা বললে—সে হয়না অনু। অতিথিকে আমি তার যোগ্য মর্য্যাদা দিতে বাধ্য, তবে সে তার অতিরিক্ত যে কিছু পাবেনা, এটাও ঠিক।

অনিলা আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে এই যে তুমি ওর সামনেই বেরুবেনা বললে—তবে কেন তাকে আবার ভিতরে ডেকে পাঠাচ্ছ?

মন্দা একটু স্নিগ্ধ হেসে বললে—অন্তঃপুরে আস্‌বার অধিকার অনেকেরই আছে বোন্, কিন্তু, তাই ব'লে অন্তঃপুরিকাদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অধিকার কি সকলের থাকে?

তারপর, ফুলির মাকে ডেকে মন্দা বলে দিলে—ওঁরা ভিতরে এলে আমায় ডেকে দিস্, আমি গিয়ে দোরের আড়াল থেকে একটু খাতির যত্ন ক'রে আসবো।

এমন সময় গোকুল এসে বললে বড়মা, মামাবাবু এসেছেন।

—কখন এসেছেন রে?

—অনেকক্ষণ।

—কি করছেন?

—বাইরে যে জামাইবাবু এসেছেন তাঁর সঙ্গে খুব রেগে কথা বলছেন।

—এই গো, নিশ্চয় সুশীলের সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে বসেছে যা শীগ্‌গীর দাদাকে আমার নাম ক'রে ভিতরে ডেকে নিয়ে আয়।—

গোকুল চলে যেতে অনিলা জিজ্ঞাসা ক'রলে—এ মামাবাবুটি আবার কে এলেন?

—দাদা এসেছেন।

—দাদা? কে—মণিদা নাকি?

—হ্যাঁ রে, নইলে আর কে আবার আমার দাদা আছে বল্?

—মণিদা বিলেত থেকে ফিরল' কবে? আমি ত কিছুই জানিনি! কতদিন যে তাঁর খোঁজ-খবর রাখতে পারিনি তার ঠিক নেই! মনটা এমনি তোলপাড় হ'য়ে আছে! মণিদাকে বহুকাল দেখিনি ভালই হ'ল আজ দেখা হবে এখন—

অনিলার কথা শেষ হবার আগেই মন্দার মণিদা ঘরে এসে ঢুকে ব'ললেন—কিরে মন্দাকিনী, তুই যে ক্রমেই মন্দোদরী হ'য়ে উঠ্‌ছিস দেখছি—এতো রোগা হ'য়ে যাচ্ছিস্ কেন?

—হবো না? যে রাবণের হাতে তোমরা দিয়েছো, ভেবে ভেবে তো শেষে শুকিয়ে যাচ্ছি!

মণীন্দ্র হো হো' করে হেসে উঠল।

ফুলির মা চা আর জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতেই মণীন্দ্র বললে—বাঃ তোর ডিপার্টমেন্টের এ্যারেঞ্জমেন্ট্‌টা তো খুব ভাল দেখছি!—আসতে। আসতেই চা ও জলযোগ হাজির! কিন্তু সত্যেন্ রাস্কেলটা খালি বসে বসে তামাক পোড়াচ্ছে—একটা সিগারেট খুঁজলেও পাওয়া যায় না!

মন্দা বললে—ও কিন্তু তোমার জন্যে আসেনি দাদা, ও এসেছে আমার ঘরের আর একটি অতিথির জন্যে!

—কে সে? ওই বাইরে যে হাঁডয়টুটি বসে আছে, তার জন্যে না কি? লোকটা পাশ করা মুর্খ্য! বলে স্ত্রী-স্বাধীনতা দিলে দেশটা উচ্ছন্ন যাবে? আরে পর্দ্দা চাপা দিয়েই যে তোরা উচ্ছন্ন যেতে বসিছিস্! মেয়েদের বাদ দিয়ে কখন ছেলেরা বড় হ'তে পারে? ওদের নীচু ক'রে রাখলে যে তোদেরও নীচু হ'তে হবে এটা বোঝে না—

মন্দা তার দাদার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললে—আহা, না না—তার জন্যে নয়। এই যে মেয়েটি বসে রয়েছে এর জন্য; তুমি তো কোনও দিকে চেয়ে দেখবেনা!

মণীন্দ্র অনিলাকে দেখে অপ্রতিভ হ'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল—মন্দা ডেকে বললে—ও দাদা, পালাতে হবেনা, ওকে চিন্‌তে পারছোনা?—কে বলো দেখি?

মণীন্দ্র এবার অনিলাকে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে নিম্নস্বরে প্রশ্ন ক'রলে—কে বল্ তো মন্দা? আমি তো ঠিক ধরতে পারছিনি!

—ও যে আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু অনিলা, এইবার চিনতে পারছো?—

—ও হো হো—সেই ত' বটে। আরে অনু—তুই এসেছিস্ কখন? কেমন আছিস্? ইস্, কতবড় হয়েছিস্ রে! চেহারা একদম বদলে গেছে!—ছেলেবেলায় ত' এতো সুন্দরী ছিলিনি? তোকে যেন কাশ্মীরের মহারাণী কি ভূপালের বেগম বলে মনে হচ্ছিল!

—যাও যাও, আর অত ঠাট্টা ক'রতে হবে না! দিদি না চিনিয়ে দিলে তো চিনতেই পারছিলে না! ঘরে ঢুকে

তো এ গরীব মানুষটার দিকে নজরই পড়েনি—ব'লতে ব'লতে অনিলা উঠে এসে মণীন্দ্রের পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম কর'ল এবং পায়ের ধুলো নেবার জন্য হাত বাড়াতেই—মণীন্দ্র শশব্যস্তে তার পাদুটো সরিয়ে নিয়ে বললে থাক্ থাক্—ও কি, অমন ক'রে কথায় কথায় যার তার পায়ের কাছে মাথা নোয়াস্‌নি—ওই করে করে আমরা একেবারে গোলামের জাত হ'য়ে পড়েছি! দাস-মনোভাব একেবারে আমাদের অস্থি-মজ্জার মধ্যে ঢুকে পড়েছে! আমাদের এই প্রণামের পদ্ধতিটা সব আগে বদ্‌লানো দরকার দেখছি!

অনিলা বললে—তুমি বিলেত ঘুরে এসে বুঝি একেবারে সাহেব হ'য়ে গেছ' মণিদা? মনে নেই, ছেলেবেলায় বিজয়া দশমীর দিন তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত না কর'লে আমাদের ঘাড় ধরে মাথাটা নিজের পায়ের উপর নুইয়ে দিতে?

—তা ব'লে বুঝি বুড়ো হ'য়েও সেই ছেলেমানুষী ক'রতে হবে—বা রে! তোর যুক্তি তো বেশ!

—তুমি বুড়ো হ'য়ে পড়েছো নাকি? কে বলেছে? নাতি নাত্‌নীরা—না তাদের দিদিমা?—

মন্দা অনিলার বাহুমূলে একটা চিম্‌টি দিয়ে বললে—দূর বোকা মেয়ে, দাদা যে বিয়ে করেনি আজও, তা বুঝি জানিস্‌নি? বুড়ো না হ'লেও তোমার মণিদা' এখনও আইবুড়ো বটে!

অনিলা এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে মুহূর্ত্তের জন্য কেমন যেন একটু বিমনা হ'য়ে পড়ল! তার পরই প্রশ্ন ক'রে ফেললে—কেন মণিদা? তুমি আজও বিয়ে করোনি কেন?

মন্দা বললে—মনের মতন মেয়ে পাননি বলে!

কথাটা শুনে অনিলা বেশ খুশী হ'য়ে উঠ্‌লো। একগাল হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলে—হ্যাঁ দাদা, সত্যি?—

মণীন্দ্র বললে—তুই ও ফাজিল মেয়েটার কথা বিশ্বাস করিস্ নি কিছু।

মণীন্দ্র আরও একটা কি কথা ব'লতে যাচ্ছিল—এমন সময় ফুলির মা এসে খবর দিলে—বড়মা, ওঁরা এসেছেন, চা আর খাবার দেওয়া হ'য়েছে—মামাবাবুরও কি ওই সঙ্গে সাজিয়ে দেবো?

অনিলা বললে—না না, ওই আমার জন্য যেটা দিয়ে গেছো মণিদাকে ওইটাই খেতে হবে। উনি ওটাতে দৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন, ও আর আমি খাবো না!

—উত্তম প্রস্তাব! এ ব্যবস্থায় আমার কোনও আপত্তি নেই। বলেই চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে মণীন্দ্র একটি চুমুক দিলে।

মন্দা ব'ললে—তাহ'লে তুই এখানে দাদার সঙ্গে গল্প কর, আমি ওদের একটু দেখে আসি কেমন?

অনিলা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। মন্দা ফুলির মাকে আর এক প্রস্তর চা ও জলখাবার সে ঘরে দিয়ে যেতে বলে চ'লে গেল—যাবার সময় একবার শুধু ফিরে অনিলাকে বলে গেল—সুশীল কিন্তু তোমার এ দুঃসাহসের কথা শুন্‌লে চটে যেতে পারে অনু!

—যাক্ গে, বড় ব'য়ে গেল! দাদা, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চা খেতে সুরু ক'রলে যে! এইখানে বোসো না ভাই, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে!

ব'লতে ব'লতে অনিলা উঠে তার নিজের আসনখানি ঝেড়ে মুছে মণীন্দ্রের জন্য পেতে দিলে। (ক্রমশঃ)

ধ্রুবতারা

শ্রীপ্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ

কোন্ সুদূরের তারা তুমি
কাহার পানে চাও;
কাহার তরে এক পলকে
দৃষ্টি হানি যাও॥
জ্যোছনা রাতে তোমার সাথে
কতই দূরে যাই:
একলা ঘরে ঘুমের ঘোরে
তোমার কাছে পাই

জান্‌লার পাশে ঘুমাই যখন
তোমার আঁখি জাগে তখন
আমার তরে, ওগো আমার তরে।
তোমার ছবি সদাই জাগে
তোমার পরশ সদাই লাগে
আমার 'পরে, ওগো আমার 'পরে॥

(৬)

তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ-টার সময় তাঞ্জোর পৌছন গেল। প্রকাণ্ড ষ্টেশন, মাদ্রাজ ছেড়ে অবধি এত বড় ষ্টেশন দেখিনি। রাত্রে কোথায় গিয়ে উঠ্‌ব ঠিক ছিল না। চিংলি-পুট ও চিদাম্বরমের ধর্ম্মশালার অবস্থা দেখে ঠিক করা হয়েছিল যে বরং ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে পড়ে থাক্‌ব, তবু ধর্ম্ম-শালায় আর যাব না। রেলওয়ে টাইম টেবিলে দেখেছিলুম যে, যাত্রী-দের রাত কাটাবার জন্য ষ্টেশনের দো-তালায় সুন্দর ঘর ও খাট বিছানা সস্তায় ভাড়া পাওয়া যায়। ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারা গেল যে তারা প্রত্যেক যাত্রীর রাত কাটানোর মাশুল বাবদ প্রায় দু-টাকা নেয়। রাত কাবার হোলেই কিন্তু ঘর ছেড়ে দিতে হবে। এই রকম সস্তায় কটা রাত্রি কাটানো যেতে পারে তারই একটা হিসাব করছিলুম এমন সময় ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন—ষ্টেশনের বাইরেই রাজার চৌলট্রী আছে, সেখানে যাও। সেখানে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না।

ষ্টেশন-মাষ্টারের কথা শুনে মুটেদের মাথায় মাল চাপিয়ে তখুনি বেরিয়ে পড়া গেল। ষ্টেশন থেকে একটু দূরেই রাজার চৌলট্রী। চারদিকে বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রাসাদ বল্লেই হয়। বড়-বড় ঘর, সুন্দর খাট-বিছানা, তাতে আবার নেটের মশারি টাঙান। ইজি-চেয়ার, বেঞ্চি, চেয়ার, আয়না, টেবিল। ঘরের মধ্যে ম্যাটিং পাতা। তা ছাড়া প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে ভাল বাথরুমও আছে। ভাড়া মাত্র দেড় টাকা। ব্যবস্থা দেখে হেসে মারা যাই আর কি!

ত্রিচিনপল্লীর পাহাড়ে মন্দির

জিনিষপত্র নামিয়ে হাতমুখ ধুয়ে সুস্থ হোয়ে খাবার চেষ্টায় বেরুনো গেল। অত রাত্রে সব দোকানই বন্ধ, অগত্যা ষ্টেশনের রেস্তরাঁয় যাওয়া গেল। তারা বল্লে—শুধু রুটি আর ডিম দিতে পারি।

কি করা যায়! বলা গেল—তাই নিয়ে এস।

ঘণ্টাখানেক ধরে ডিম আর রুটি খাওয়ার পর তারা যখন বল্লে—আর নেই, তখন বিল আনতে হুকুম করা হোলো। বিল দেখে আমাদের চক্ষু স্থির! শুধু রুটি আর ডিমেই দশটাকা পার হোয়ে গিয়েছে। ভাগ্যিস্ অন্য আর কিছু ছিল না! টাকা দিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম।

'তাঞ্জোর' এই কথাটির উৎপত্তি হয়েছে নাকি

'তানজান' শব্দ থেকে। কথিত আছে এই শহরের নিকটেই এক অরণ্যে 'তানজান' নামে এক দৈত্যের আবাস ছিল। একবার বিষ্ণুর সঙ্গে এই দৈত্যের লড়াই বাধে। ফলে দৈত্যের মৃত্যু। মরবার সময় দৈত্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করে যে, তার নামে যেন ঐ স্থানের নাম রাখা হয়। তারপরে সেই 'তানজান' শব্দটী বিকৃত হোতে-হোতে তাঞ্জোরে পরিণত হয়েছে। তাঞ্জোরের পুরাতন ইতিহাস প্রায় সবই রহস্যের জালে আবৃত। একাদশ শতাব্দী থেকে এখানকার কিছু কিছু স্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর কোনো সময়ে এই স্থান চোল রাজা কুলতুঙ্গের রাজধানী ছিল। চোল রাজারা অনেক আগেই এ স্থানে রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেও এখানে চোল রাজাদের অবস্থান ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে আরম্ভ কোরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অবধি এখানে নায়ক রাজারা রাজত্ব করতেন। নায়কেরা প্রথমতঃ বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিনিধি হোয়ে এই স্থান শাসন করতেন। তারপরে ভারতের সনাতন রীতি অনুসারে সুবিধা বুঝে রাজ-প্রতিনিধি থেকে তাঁরা রাজা হোয়ে দাঁড়ালেন। নায়কদের প্রথম রাজা তাঞ্জোরে শিবগঙ্গা কেল্লা নামে একটি ছোট কেল্লা তৈরি করেন। এর পরে রাজা বিজয়রাঘব নায়ক এরই সংলগ্ন একটি বড় কেল্লা তৈরি করিয়েছিলেন। দুটি কেল্লারই এখন 'ফতে' হওয়ার অবস্থা।

বিজয়রাঘব নায়কের রাজত্বকালে তাঁর সঙ্গে মাদুরার নায়ক রাজাদের লড়াই বাধে। মাদুরার সেনাপতি আলাগিরি তাঞ্জোর আক্রমণ করে। এই যুদ্ধেই রাজা বিজয়রাঘবের মৃত্যু হয়। যুদ্ধের পর রাজ-অন্তঃপুরিকারা পাছে শত্রুহস্তে লাঞ্ছিতা হয় এই আশঙ্কায় মৃত্যুর পূর্ব্বে বিজয়রাঘব তাঁর পুত্র মান্নারুকে ডেকে প্রাসাদের অন্দর-মহলটী বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দিতে আদেশ দেন। মান্নারুও পিতৃ-আজ্ঞা পালন কোরে ফিরে এসে যুদ্ধে যোগ দেয় ও পরে নিহত হয়। বিজয়রাঘবের প্রধানা মহিষীর একটি শিশুপুত্র ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে কৌশলে সে ছেলে-টীকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। এই ছেলে পরে বিজাপুর পাঠান রাজাদের সহায়তায় নামে-মাত্র এখানকার রাজা হয়। এর পরই এখানে মহারাষ্ট্র শাসন প্রবর্ত্তিত হয় এবং তার পরই ইংরেজ শাসন।

তাঞ্জোর সুব্রহ্মণ্যের মন্দির

সকালবেলা উঠে চৌলট্রীর নিকটেই এক হোটেলে কাফি ইত্যাদি পান কোরে গাড়ী নিয়ে বেরুনো গেল। প্রথমে শহরের মধ্যে রাজপ্রাসাদ দেখতে গেলুম। প্রাসাদ প্রধানতঃ ইটেরই তৈরি। দেখলেই খুব পুরানো বলে মনে হয়। তার কত যে ঘর, কত মহল, আর বড়-বড় খিলান-করা হল তার আর ঠিকানা নেই। কত ঘর ভেঙে পড়ছে, কত ঘরে তালা লাগান তারও অন্ত নেই। প্রাসাদের মধ্যেই সরস্বতী মহল নামে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী। শোনা গেল যে, এই লাইব্রেরীতে আঠার হাজার সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আছে। তার মধ্যে আট হাজার পাণ্ডুলিপি নাকি তালপাতায় লেখা। গাইড বল্লে সে সব পাণ্ডুলিপি নাকি অমূল্য। গাইডের এ কথায় খুব বেশী আস্থা স্থাপন করা গেল না। কারণ

সেগুলি খুব মূল্যবান হোলে এতদিনে সেগুলি বড লিয়ন অথবা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে না গিয়ে তাঞ্জোরের মতন অস্বাস্থ্যকর স্থানে ঐ ভাঙা প্রাসাদের মধ্যে পড়ে থাকত না। তিন চার-জন পণ্ডিত তালপাতার পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠোদ্ধার করছেন দেখা গেল।

লাইব্রেরীর সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড থামওয়ালা ঘর। এই ঘরটিকে দরবার-গৃহ বলা হয়। দরবার-গৃহের ঠিক মাঝখানে তাঞ্জোরের শেষ রাজা শিবাজীর একটি শ্বেত মর্ম্মর-মূর্ত্তি। প্রতিমূর্ত্তির মাথায় পাগড়ী নেই। শ্বেত পাথরের একটি প্রকাণ্ড মারাঠী পাগড়ী মূর্ত্তির নীচে এক কোণে রেখে দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসা কোরে জানা গেল যে, পাগড়ীটি অত্যন্ত ভারী। পাছে পাগড়ীর ভারে মূর্ত্তির ঘাড় ভেঙে যায়, এই আশঙ্কায় ওটিকে মাথার ওপরে না রেখে পায়ের কাছে রাখা হয়েছে। এইখান থেকে অনেক সুড়ঙ্গ ও অলি-গলি পার হোয়ে ভেতরের দিকে আর একটি প্রকাণ্ড ঘরে যাওয়া গেল। এই ঘরখানিকে বেশ কোরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। চারিদিকে ভূতপূর্ব্ব রাজাদের বড় বড় ছবি টাঙান। ঘরের মাঝখানে একটা উঁচু কাঠের বেদীর ওপরে চাঁদোয়া খাটানো। এইখানে নাকি আগে সিংহাসন ছিল। ঘরের ওপরে ছোট ছোট জানলা আছে; দরবারের সময় রাজবাড়ীর মেয়েরা সেখানে বসে দেখতেন।

এই প্রাসাদের মধ্যেই অস্ত্রশালা আছে। রাজ্যটা যে কেন বেহাত হয়েছে, তা এই অস্ত্রশালাটী দেখলেই সম্যক উপলব্ধি হয়। বর্ত্তমান কালের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, এই রকম হাতিয়ার নিয়ে কোনো কালে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রধান যে দুটি কাজ—অর্থাৎ যুদ্ধ করা ও পলায়ন করা—এ অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে অসম্ভব। তবে অস্ত্রগুলির যে বাহার আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। দেখলেই মনে হয়, হ্যাঁ অস্ত্র বটে!

এই প্রাসাদের মধ্যে বিজয়রাঘবের অন্দরমহল এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কত নির্দ্দোষী সহায়হীনা নারীর রক্ত যে এই ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে আছে, ইতিহাস তার সংখ্যা জানে না। প্রাসাদের পূর্ব্ব দিকের দরজার কাছে হাওয়া মহলের মতন উঁচু একটা বাড়ী আছে।
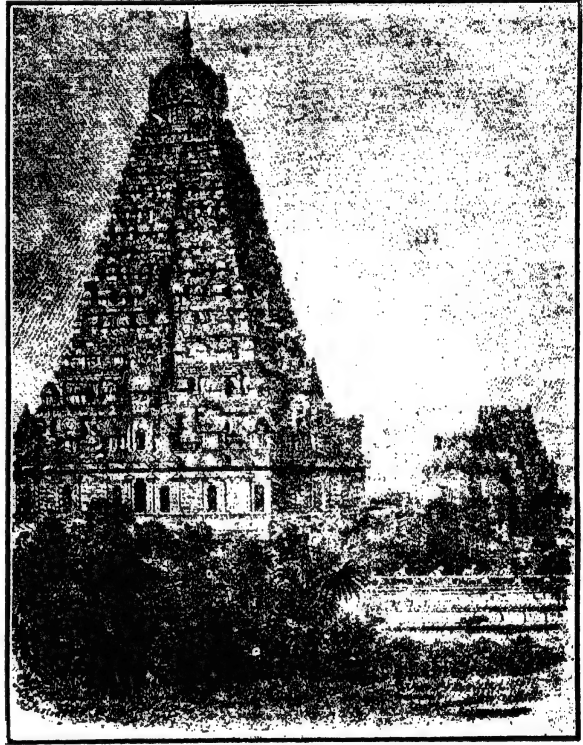
তাঞ্জোর ভদ্রেশ্বর স্বামীকইল শিবের মন্দির

সেটা কি পদার্থ তা জিজ্ঞাসা কোরে জানতে পারলুম—তাসা মাড়ু। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর বুঝতে পারা গেল যে, সেটা সময় নিরূপণ করবার একটা যন্ত্র। জয়পুর, দিল্লী বা কাশীর মানমন্দিরে এ রকম যন্ত্র দেখিনি। বাড়ীটার ওপরে ওঠবার জন্য কৌতূহল হোলো; কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় সে বাসনা এখনো অতৃপ্তই আছে।

প্রাসাদ দেখা শেষ কোরে মন্দিরে যাওয়া গেল।

তাঞ্জোরের মন্দির পুরাতন কেল্লার মধ্যে অবস্থিত। কেল্লাটীর অবস্থা অতি শোচনীয়। চারিদিকের দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে, লুপ্তপ্রায় বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। পরিখা ভরে আস্‌ছে। এই পরিখার ওপরে একটি কাঠের সেতু। সেটী পার হোলেই ছোট্ট একটী গোপুরম্। গোপুরম্‌টীর অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। এটী পার হোয়ে কিছুদূর গেলেই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দির।

তাঞ্জোর প্রাসাদের একটি ঘর

প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি উঁচু জায়গায় কাল পাথরের বিরাট একটি ষাঁড়ের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী যেমন বড়, তেমনি এর গঠন-কৌশল সুন্দর। ষাঁড়টীর সম্বন্ধে এখানে অনেক মজার গল্প প্রচলিত আছে। আমাদের গাইড বল্লে, মন্দির যখন তৈরি করা হচ্ছিল, সেই সময় এখানকার লোকেরা দেখতে পেলে যে, বাইরের মাঠে একটি বড় ষাঁড় চরে বেড়াচ্ছে। উপরি উপরি দু-চার দিন এই দৃশ্য দেখবার পর এক দিন তারা ষাঁড়টাকে ধরে এনে মন্দিরের সামনে বসিয়ে দিলে। ষাঁড়ও কোনো আপত্তি না কোরে সেখানে বসে পড়্‌ল। তার পরে দেখতে-দেখতে তার রক্তমাংসের দেহ পাষাণে পরিণত হোলো।

ষাঁড় সম্বন্ধে দ্বিতীয় গল্প হচ্ছে এই যে, প্রথমে মূর্ত্তিটী এর চেয়ে অনেক ছোট ছিল। তার পরে প্রতি দিনই দেখা যেতে লাগ্‌ল যে, মূর্ত্তিটী বেড়েই চলেছে। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে ষাঁড়টীর ককুদে একটি লৌহ কীলক বসিয়ে দেবার পর তার সেই বর্দ্ধমান-বিলাস বন্ধ হয়েছে। এই ষাঁড়ের এক পাশে একটি উঁচু চত্বর। উৎসবের দিনে এখানে সেবা-দাসীদের নৃত্য হয়। তাঞ্জোরের সেবাদাসীরা মহারাষ্ট্রীয় এবং শোনা গেল যে, দক্ষিণের সমস্ত মন্দিরের চেয়ে এখানকার সেবাদাসীরা শ্রেষ্ঠ। কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে পারলুম না।

তাঞ্জোরের মন্দিরটী সুন্দর। শুধু সুন্দর বল্লেই এর সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না। দক্ষিণের অন্যান্য যত মন্দির দেখেছি, তার মধ্যে তাঞ্জোরের মন্দিরকেই সব থেকে সুন্দর বলে মনে হয়েছে। এর কারুকার্য্যের মধ্যে বাহাদুরী দেখাবার প্রয়াস নাই; কিন্তু বাহাদুরী যথেষ্ট আছে। এর কল্পনার মধ্যে পাগলামী নেই, যুক্তি আছে। এ মন্দির দেবতাকে তুলে রাখবার সিন্ধুক নয়, এটা সত্যিকারের মন্দির। এখানে দেবদর্শন করতে এসে মনে হয় না যে, কেল্লার মধ্যে পরিভ্রমণ করছি, যদিও সত্যি-কারের কেল্লার মধ্যে এই মন্দির তৈরি হয়েছে। এ মন্দির পাতালগামী অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যে নেমে যায়নি, আকাশের সঙ্গে সমতা রক্ষা কোরে এর সুউচ্চ বিমান—দূর থেকেই তীর্থযাত্রীদের জানিয়ে দেয় যে এটা মন্দির। এ মন্দির গোপুরম্-সর্ব্বস্ব নয়—এ দেবপুরম্।

দক্ষিণের প্রায় সমস্ত মন্দিরই এক গণ্ডীরমধ্যে অবস্থিত হোলেও বেশ বুঝতে পারা যায় যে, অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে

সেখানে নতুন মণ্ডপ ও মন্দির বাড়ান হয়েছে কিন্তু তাঞ্জোরের মন্দির দেখলেই মনে হয় যে এটি একটি অখণ্ড জিনিষ। কাঞ্জিভরম, চিদাম্বরম্ প্রভৃতি মন্দিরের বিমান অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাঞ্জোরের এই মন্দিরের বিমান খুব উঁচু। মন্দিরের ভিত থেকে একেবারে চূড়া পর্য্যন্ত ২১৬ ফিট। ভিত থেকে একশো° আটষট্টি ফিট ওপরে প্রকাণ্ড গম্বুজ অথবা আমলকী-বীজ (Key Stone) বসান হয়েছে। এটি একটি নিরেট অখণ্ড প্রস্তরখণ্ড। এই পাথরখানির ওজন আশী টন। মন্দিরের ঐ উচ্চতা থেকে আরম্ভ কোরে চার মাইল দুর অবধি গড়ানে বালির পথ তৈরি কোরে তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পাথরখানিকে ওখানে তোলা হয়েছিল। এই গম্বুজের চার কোণে চারটি পাথরের ষাঁড় বসান হয়েছে। ষাঁড়গুলি লম্বায় ৬ ফিট ও চওড়ায় চার ফিট। এগুলির ওজনও বড় কম নয়। মন্দিরের ওপর থেকে নীচ অবধি কারুকার্য্য ও নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে ভরা।
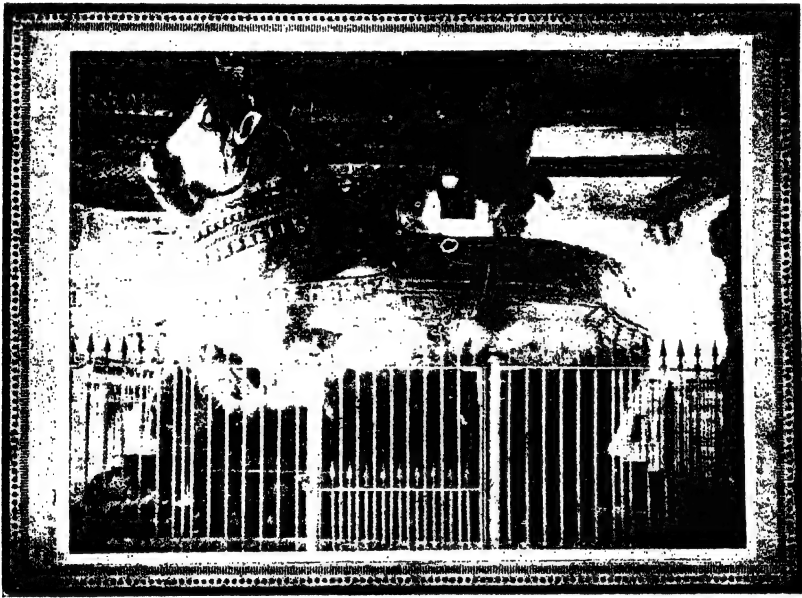
ঐতিহাসিকেরা বলেন যে তাঞ্জোরের চোল নরপতি রাজরাজের রাজত্বকালে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। রাজরাজের রাজত্বকাল অনুমান ১০২৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৩৪ অবধি। প্রকাশ যে রাজরাজের সেনাপতি সামবর্ম্মার তত্ত্বাবধানে এই মন্দিরটী তৈরি হয়। সেনাপতি মশায় ছিলেন কাঞ্জিভরমের লোক। মন্দিরের বিগ্রহ হচ্ছেন শিব, তাঁর নাম ভদ্রেশ্বরস্বামীকইল। বিগ্রহটী আমরা দেখতে পাইনি। তখন ঠাকুরের ভোগের সময় বলে মন্দির বন্ধ ছিল। ভেতরে যেতে পাইনি বলেই বোধ হয় মন্দিরটার বাইরের সৌন্দর্য্য মনকে এতখানি আকৃষ্ট করেছিল।

প্রাঙ্গণের এক কোণে সুব্রহ্মণ্যের মন্দির। এটি শিবের মন্দিরের অনেক পরে তৈরি। এই মন্দিরটীর সৌন্দর্য্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য লিখে প্রকাশ করা যায় না। ঠিক যেন নিপুণ কারিগরের হাতের তৈরি একখানি গয়না। মন্দিরের ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। সেখানে গিয়ে দু-বাক্স দেশলাই জেলেও কিছু দেখা গেল না। সেখানকার সুব্রহ্মণ্য মূর্ত্তির অনেক প্রশংসা শুনেছিলুম, না দেখে যাওয়া হবে না স্থির কোরে বসে থাকা গেল। প্রায় মিনিট দশেক বসে থাকার পর অন্ধকারের ভেতর থেকে আস্তে-আস্তে কালো পাথরের মূর্ত্তি চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌ল। দক্ষিণের এই সুব্রহ্মণ্য

মন্দিরের বিরাট নন্দী মূর্ত্তি

মূর্ত্তির পরিকল্পনা আমাদের দেশের কার্ত্তিকের মূর্ত্তির চেয়ে অনেক সুন্দর ও সঙ্গত। দেবসেনাপতিকে সেখানে সত্যিই সেনাপতির রূপ দেওয়া হয়েছে। সুব্রহ্মণ্যের আট মুণ্ড ও চার হাত। মূর্ত্তির মধ্যে ভঙ্গি ও গতির অদ্ভুত সমাবেশ। যেমন সেনাপতি, তেমনি তার উপযুক্ত বাহন। সুব্রহ্মণ্যের মন্দিরের মধ্যে একটা সুড়ঙ্গ আছে। গাইড সেইটে দেখিয়ে বল্লে—এই সুড়ঙ্গপথে রাজ-পুরনারীরা মন্দিরে যাতায়াত করতেন।

প্রাঙ্গণের আর একদিকে নটরাজের মন্দির। নটরাজের অবস্থা এখানে অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু এখানেও তাঁর অঙ্গে গয়না-গাঁটি নেই বটে কিন্তু লাল রংয়ের কাপড় মালকোঁচা দিয়ে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মন্দির থেকে একটু দূরে গাইড আমাদের গণপতি মণ্ডপ দেখাতে নিয়ে গেল। এখানে দেবতাদের যান থাকে। সারি-সারি অনেকগুলি রং-চং-করা কাঠের রথ সাজান আছে। এরই কাছে সারি-সারি একশো আটটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকটি শিবলিঙ্গের প্রত্যহ পূজা হয়।

মন্দির থেকে বেরিয়ে গাইডকে নিয়ে আমরা নটরাজ-মূর্ত্তি অনুসন্ধানের জন্য বাজারে গেলুম। বাজার হাটকে কিন্তু একটি মূর্ত্তিও পাওয়া গেল না। তখন গাইড আমাদের নিয়ে কারিকরের বাড়ীতে উপস্থিত হোলো। সেখানে তারা চিদাম্বরমের মতই কতকগুলো ইস্কুপ ও বল্‌টু বের করলে। বোঝা গেল, এরা এই রকম সব জিনিষ সংগ্রহ কোরে রাখে এবং মার্কিণী মেয়েদের কাছে খুব চড়া দামে বিক্রি করে। জয়পুরে এই রকম পুরোনো জিনিষ তৈরি করবার রীতিমত কারখানা আছে। সেখানে একশো, দুশো, পাঁচশো বছরের পুরোনো ছবি আজ একশো বছর ধরে হাজারে-হাজারে বিক্রি হচ্ছে। আমার বিশ্বাস যে জয়পুরের কারিগরেরা যদি নটরাজ প্রভৃতির চাহিদা বুঝতে পারে তা হোলে নটরাজের মূর্ত্তিতে দেশ ছেয়ে ফেলবে। তাঞ্জোর প্রভৃতি জায়গায় খোঁজপত্র কোরে মনে হোলো মূর্ত্তি তৈরি করবার কারিগর এখান থেকে লুপ্ত হোয়ে গেছে। এর কারণ, দেশীয় চারুশিল্পের প্রতি দেশবাসীর দারুণ অবহেলা।

তাঞ্জোরে পেতল ও তামার থালা, ঘটি বাটী ও ফুলদানীর ওপরে চমৎকার রূপার কাজ হয়। এই জিনিষ মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউটে দেখেছিলুম। সেখান থেকে এখানকার দাম অনেক কম।

যা হোক্, বাজার থেকে কিছু সওদা কোরে যখন বাড়ী ফিরলুম তখন বেলা প্রায় দুটো। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সকাল বেলার সেই হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দক্ষিণে এ পর্য্যন্ত যতগুলি হোটেলে অন্ন গ্রহণ করেছি তার মধ্যে এই হোটেলটী সব চেয়ে বড় এবং খাবার ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়েও এটি শ্রেষ্ঠ। অথচ এখানকার দাম অন্য জায়গারই সমান। আমরা যখন খেতে গেলুম তখন বেলা প্রায় তিনটে। অত বেলাতেও ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ দুই বিভাগ থেকেই দলে দলে লোক খেয়ে বেরুচ্ছে। এখানকার অনেক লোকই বোধ হয় দু-বেলা হোটেলেই খায়। তাঞ্জোরের এই হোটেল-টীর আর একটি বিশেষত্ব দেখলুম যে, প্রত্যেকের আসনের দু-পাশে দুটি উঁচু কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো মাদুরের পর্দ্দা দেওয়া। খেতে বসে কেউ কারুকে দেখতে পায় না। এ ব্যবস্থাটী বড় ভাল লাগ্‌ল।

সেই দিন বেলা পাঁচটার ট্রেণে আমাদের ত্রিচিনপল্লী যাবার কথা। কাল রাত্রে যে মুটের দল আমাদের মালপত্র নিয়ে এসেছিল তাদেরই আসতে বলে দেওয়া হয়েছিল। বেলা চারটে বাজতে না বাজতে তারা এসে হাজির।

তাঞ্জোরের এই মুটেদের সম্বন্ধে দুটো কথা বলা যাক্। ষ্টেশন থেকে রাস্তায় বেরুতে হোলে খুব উঁচু একটা ওভার-ব্রিজ পার হোতে হয়। ওভারব্রিজে ওঠবার সময় মুটেরা আমাদের মালগুলোকে নিয়ে এমন টল্‌তে আরম্ভ করলে যে ভয় হোতে লাগ্‌ল। হঠাৎ মালগুলি এত ভারি হোয়ে উঠ্‌ল কি কোরে তা ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। তার পরে রাস্তায় নেমেও যখন তারা পা দিয়ে শূন্যে ঊর্দ্ধু লিখতে লিখতে চল্‌তে আরম্ভ করলে তখন আমাদের সন্দেহ হোলো যে আমাদের মালের ভার ছাড়া ওদের মধ্যে অন্য কিছু মালেরও ভার পড়েছে। চৌলট্রিতে উঠে জিনিষপত্র নামাবার সময় দেখা গেল যে, তারা চুর্‌চুরে মাতাল হোয়ে রয়েছে। তাদের অবস্থা দেখে Temperance Associationএর লোক হয় ত কেঁদে ফেলতেন, কিন্তু আমাদের হাসি পেল। কুলিদের মধ্যে এই পাপ প্রবেশ কোরে দেশটা উচ্ছন্নে গেল বলে অনেককে দুঃখ করতে শুনি। কিন্তু তাঞ্জোরের এই কুলির দলকে নিছক কুলি মনে করতে একটু সমাহ হোলো। পোষাকে

তারা দক্ষিণের লুঙ্গি-পরা ভদ্রলোকের চাইতে ঢের বেশী সভ্য। প্রায় প্রত্যেকেরই গলায় মোটা মোটা সোনার দানা ও সোনার হার। কাণে পাথর বসান সোনার টাপ জল্ জল্ করছে। তাদের মেয়েরা পরে বিশ হাত সাড়ী। সে দামের সাড়ী আমাদের দেশের খুব কম ঘরেই আটপৌরে রূপে ব্যবহার করে। আজকাল বাংলার অনেক মেয়ে সে সাড়ী পোষাকীরূপে ব্যবহার করেন। তাদের মেয়েদের অঙ্গে মোটা মোটা সোনার গয়না। যারা মদও খায় না অথচ পরিবার প্রতিপালন করতে পারে না তাদের চেয়ে এই মাতাল পরিবার-প্রতিপালনক্ষম কুলির দল ঢের উন্নত শ্রেণীর জীব।

তাদের সেই অপরূপ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলুম—এত মদ কেন খাস্ রে?

তারা বল্লে—হুজুর রাত্রি জাগতে হয়, মদ না খেলে খাটতে পারি না।

বল্লুম—তা অত খেতে আছে! আর একটু হোলে জিনিষগুলি যে ফেলে দিয়েছিলি!

তারা হেসে বল্লে—আমরা টলি কিন্তু পড়ি না।

পরদিন বেলা চারটের সময় কুলির দল এসে সেলাম জানালে। তাদের দিকে চেয়ে দেখি যে কালকের রাতের চেয়েও অবস্থা শোচনীয়। রাত্রিবেলা তবুও দাঁড়াতে পারছিল, কিন্তু তখন আর দাঁড়াতে পাচ্ছে না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে পাশাপাশি চার জন দাঁড়িয়ে গেল। তাদের সেই রাজোচিত হালচাল দেখে সন্দেহ হোতে লাগ্‌ল—আমাদের মতন দীনের মোট মাথায় থাকবে কিনা?

বল্লুম—তোমাদের যা অবস্থা দেখ্‌ছি তাতে ভরসা কোরে তোমাদের মাথায় মোট তুলে দিতে পারছি না। আপাতত পথ দেখ, আমরা অন্য মুটের ব্যবস্থা করছি।

আমাদের কথা শুনে তারা আশ্বাস দিয়ে বল্লে—তোমাদের কিচ্ছু ভয় নেই। আমাদের এই অবস্থা দেখে

শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের ফটক

পাছে তোমরা এই রকম অপ্রীতিকর কথা বল তার ব্যবস্থা আগেই কোরে রেখেছি।

—অর্থাৎ—

—অর্থাৎ, মোট আমরা নিজেরা মাথায় নিয়ে যাব না। বাড়ী থেকে সেজন্য বলদের গাড়ী নিয়ে এসেছি।

নেমে গিয়ে দেখি সত্যিই তারা একখানা বলদের গাড়ী নিয়ে এসেছে।

মুটেরা মাল নামিয়ে গরুর গাড়ীতে তুলে ষ্টেশনে চলে গেল। আমরা হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে কিছু পরে ষ্টেশনে গিয়ে দেখলুম মাল সব ঠিক আছে। গাড়ী আসতেই তারা মাল তুলে দিয়ে ছুটি নিলে।

তাঞ্জোর থেকে ত্রিচিনপল্লীর ব্যবধান মাত্র চৌত্রিশ মাইল। যতদুর স্মরণ হয় আমরা তাঞ্জোরে পাঁচটার সময় গাড়ীতে চড়েছিলুম, ত্রিচিনপল্লীতে গিয়ে যখন নামলুম তখন রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছে। শুনলুম ষ্টেশনের কাছেই ধর্ম্মশালা। চাঁদের আলো ও পরিষ্কার রাস্তা দেখে হেঁটেই অগ্রসর হওয়া গেল। মাল-পত্র অবিশ্যি গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ষ্টেশনের কাছেই একটি উঁচু গির্জ্জা। তার চার পাশে বড় বড় গাছ। এই গির্জ্জার পাশ দিয়ে আমাদের যেতে হোলো। চাঁদের আলোয় গির্জ্জাটী বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। চৌলট্রীতে গিয়ে দেখা গেল যে সে স্থান আগেই ভর্ত্তি হোয়ে গেছে। একটি মাত্র ঘর তখনো খালি ছিল, কিন্তু সে ঘরে মালপত্র সমেত চার জন বাঙালীর পক্ষে বাস করা অসম্ভব। চৌলট্রীর রক্ষক মশায় আমাদের বলে দিলেন যে শহরের মধ্যে ভাল ধর্ম্মশালা আছে। তাঁর কথা শুনে শহরের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। কিছুদুর গিয়েই আমরা একটি বড় বাঁধান পুষ্করিণীর ধারে এসে পড়লুম। এই পুষ্করিণীটিই এখানকার টেপ্পাকুলম্। পুষ্করিণীর মাঝে একটি সুন্দর মণ্ডপ। ওপারেই পাহাড় (Trichinopoly Rock.) এই পাহাড়ের ওপরে মন্দির। মন্দিরের ওপরে তখন একটি বিজলীর আলো জ্বলজ্বল করছিল। পুষ্করিণীর এপার থেকে সে দৃশ্যটি বড় চমৎকার।

প্রায় মাইল খানেক হেঁটে আমরা ধর্ম্মশালায় এসে উপস্থিত হলুম। এখানে একতলায় বড় বড় ছুটি হলে সাধারণ যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা। দোতলায় অসাধারণ যাত্রীদের জন্য সুন্দর-সুন্দর ঘর আছে। আমাদের জন্য এই অসাধারণ যাত্রীদের একটি ঘর খুলে দেওয়া হোলো। ঘরের সামনেই বড় বারান্দা। সেখান থেকে পাহাড়ের মন্দিরটী খুব কাছে বলে মনে হোতে লাগল। সেই রাত্রে একজন গাইডও জুটে গেল। এত রাত্রে আহারের কি ব্যবস্থা করা যায়। গাইড বল্লে—চল দেখা যাক্। হাত মুখ ধুয়ে হোটেলের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল।

আমাদের একটি বন্ধু, প্রত্যহ তাঁর মাংস খাওয়া অভ্যাস। এই ক'দিন ধরে নিরামিষ খেয়ে খেয়ে তাঁর অবস্থা শোচনীয় হোয়ে উঠেছিল। তিনি বল্লেন—যেমন কোরে পারি এখুনিই মাংসের হোটেল খুঁজে বার করব।

বন্ধুবর পণ কোরে অদৃশ্য হলেন। আমরা গাইডের সঙ্গে অগ্রসর হোতে লাগলুম। কিছু দূরে গিয়ে একটা হোটেল পাওয়া গেল। খাবার দাবার কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে ব্যক্তি বল্লে—তরকারি কিছু নেই। ডাল আছে, দই আছে আর আচার যা আছে তা বাংলা দেশের লোকে চোখে দেখেনি।

কিছুক্ষণ পরামর্শ কোরে বলা গেল—আচ্ছা দাও খেতে।

ইতিমধ্যে আমাদের মাংসাশী বন্ধুটী হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বল্লে—মাংসের হোটেল পাওয়া গিয়েছে, চল।

কিন্তু সেখানে তখন পাত পাতা হোয়ে গিয়েছে। উঠি কি কোরে! অগত্যা বন্ধুবর অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সেখানেই বসতে বাধ্য হলেন। সেদিন সেখানে যা খাইয়েছিল তার স্বপ্ন দেখে এখনো মাঝে-মাঝে চম্‌কে উঠতে হয়। খানিকটা লঙ্কাবাটা জলে গুলে হয়েছে ডাল। আচারের কথা উল্লেখ না করাই ভাল। মাংসাশী বন্ধুটী গজগজ্ করতে করতে উঠে গেলেন, আর আমরাও প্রতিজ্ঞা করলুম যে, নিরামিষ আর নয়। বন্ধুটি সেই রাতে আবার মাংসের হোটেলে গিয়ে খেয়ে পরদিন আমাদের সকলের খাবার ব্যবস্থা কোরে এলেন।

সকালবেলা উঠেই যাতে ঘোরা সুরু করতে পারা যায় সেইজন্য রাত্রি বারোটার সময় মোটরের ব্যবস্থা কোরে তার পরে শয়ন করা গেল।

সকালবেলা চা পান ও জলযোগ শেষ কোরে মোটরে ওঠা গেল। ত্রিচিনপল্লী শহরটী দু-ভাগে বিভক্ত। ক্যান্টনমেণ্টে সাধারণতঃ ফিরিঙ্গীরা ও ধনী লোকেরা থাকেন। এখানে একদল দেশী সৈন্যও রাখা হয়েছে। ত্রিচিনপল্লী ফোর্ট হচ্ছে

দেশী শহর। এখানে একটি কেল্লাও ছিল, এখনো তার চিহ্ন বর্ত্তমান। পাহাড়ের ওপরকার মন্দিরও এক সময়ে কেল্লার কাজ করেছে। প্রথমে আমরা পাহাড়ের মন্দির দেখতে গেলুম। রাত্রে যে টেপ্পাকুলমের ধার দিয়ে গিয়েছিলুম এবার তারই অন্য ধার দিয়ে মোটর চল্‌লো। এই টেপ্পাকুলমের একধারে একটি বাড়ীতে ইংলণ্ডের অন্যতম ভাগ্যবিধাতা ক্লাইভ এক সময়ে বাসা বেঁধে ছিলেন। সে বাড়ীটায় এখন [St. Joseph's] School হয়েছে। টেপ্পাকুলম্ ছাড়িয়ে একটা মোড় বেঁকে একটুখানি গিয়েই একটি ছোট দরজার সিঁড়িতে আলো ও হাওয়া আসবার জন্য পাহাড় কেটে বড় বড় ঘুলঘুলি তৈরি করা হয়েছে। সে এক বিরাট কাণ্ড! কিছুদূর উঠেই একটি খোলা চওড়া রাস্তা পাওয়া যায়। এই রাস্তাটী গোল হোয়ে পাহাড়ের চতুর্দ্দিক বেষ্টন কোরে আছে। যাত্রীরা এই রাস্তাতেই ঘুরে মন্দির প্রদক্ষিণ করে। রাস্তার পরে আবার সিঁড়ি। কিছুদূর ওঠবার পরে সিঁড়ির দু-পাশে দুটী বড় ঘর দেখতে পাওয়া যায়। এই দুটি ঘরেই একশোটী কোরে থাম আছে। ডানদিকের ঘরটিতে ঠাকুরের জিনিষ-পত্র রাখা হয়, আর বাঁ দিকের ঘরে বছরের মধ্যে দু-বার
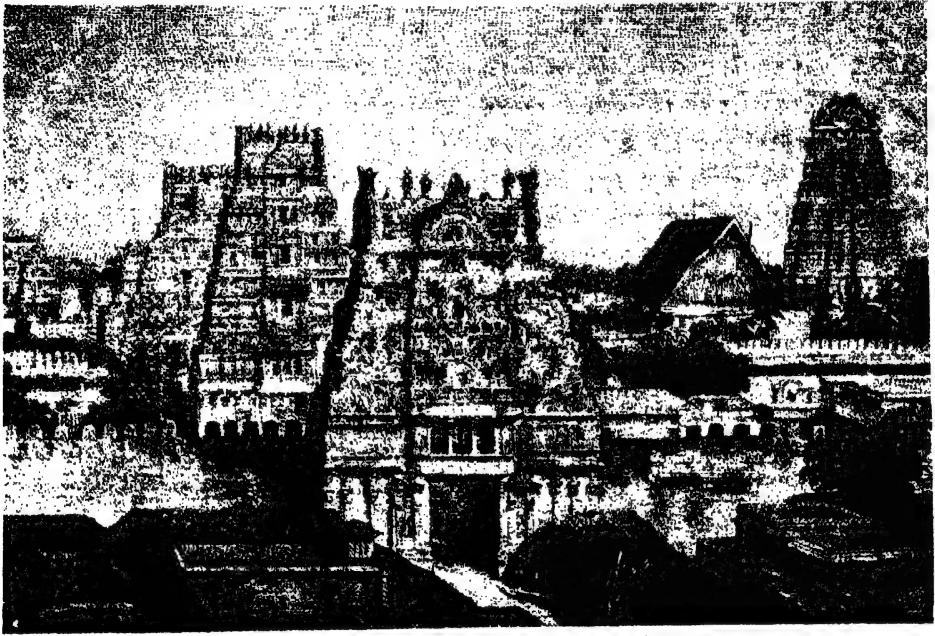
শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য

সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। গাইড বল্লে—এই পাহাড়ে ওঠবার রাস্তা।

দরজার কাছে গিয়ে দেখি ওপরে ওঠবার সিঁড়ি রয়েছে। রাত্রিবেলায় পাহাড়ের চূড়োর ওপরে মন্দিরটী দেখে মনে হয়েছিল হয়ত পাহাড় কেটে অন্য জায়গার মতন ঘুরোনো রাস্তা করা হয়েছে। সিঁড়ি দেখে একটু নিরাশ হলুম। যা হোক, সিঁড়ি দিয়ে তো উঠতে আরম্ভ করা গেল। পাহাড় কেটে সিঁড়ি করা হয়েছে। ওপরে পাথরের ছাত। দেবতা এসে কিছুদিন কোরে থেকে যান। এখান থেকে আরও খানিকটা উঠে আসল মন্দির। এই ঘরটি একেবারে কুঁদে তৈরি করা হয়েছে। ঘরের মধ্যে গণেশের মূর্ত্তি। পাহাড়ের ওপর থেকে শহরের দৃশ্যটী চমৎকার। দূরে কাবেরী নদী দেখা যায়।

পাহাড় থেকে নেমে আমরা শ্রীরঙ্গম্ মন্দির দেখতে গেলুম। শ্রীরঙ্গমের মন্দির ত্রিচিনপল্লী শহর থেকে কিছু দূরে কাবেরী নদীর মধ্যে একটি দ্বীপে অবস্থিত।

সেখানে যাবার জন্ত কাবেরীর ওপরে প্রকাণ্ড সেতু হয়েছে।

আমাদের গাড়ী নদী পার হোয়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌ল। এ স্থানটীকেও একটি শহর বলা চলে।

শ্রীরঙ্গমের এই বিষ্ণু মন্দিরটী বোধ হয় দক্ষিণ ভারতের সমস্ত মন্দিরের চাইতে বড়। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পরে পরে সাতটী প্রাচীর। এখানে সর্ব্বসমেত পনেরোটী গোপুরম্ আছে। প্রথম প্রাচীরটী একেবারে পাথরের তৈরী।

ত্রিচিনপল্লীর দিকের দরজাটী অতি সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেটীর নির্ম্মাণকার্য্য অসম্পূর্ণই রয়ে গিয়েছে। মন্দিরের মধ্যেই বাজার, বস্তী ও কত দেবতার মণ্ডপ আছে তার আর ইয়ত্তা নেই। মন্দিরেরই একটা ঘরের মধ্যে দেখা গেল ময়দার কল বসান হয়েছে। দক্ষিণের অধিকাংশ মন্দিরের মতনই প্রথমে এটি ছোট মন্দিরই ছিল, তার পর ক্রমে ক্রমে এক একজন নতুন রাজা এক একটা মহল বাড়িয়েছেন, আর তার চারিদিকে প্রাচীর ও সঙ্গে সঙ্গে উঁচু গোপুরম্ তুলেছেন। ফলে ভেতরের আসল বিষ্ণুমন্দিরের চাইতে যত বাইরের দিকে আসা যায় ততই তার কারুকার্য্য ও আড়ম্বর বেশী হয়েছে দেখা যায়। এখানেও সহস্র স্তম্ভের একটি ঘর আছে, কিন্তু শোনা গেল যে ঘরের মধ্যে নয় শত চল্লিশটী মাত্র স্তম্ভ আছে। উৎসবের দিনে ষাটখানা বাঁশের স্তম্ভ খাড়া কোরে হাজার স্তম্ভ পূরণ করা হয়। শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের আয় নাকি খুব বেশী। আর এখানকার বিষ্ণুর যত গয়না আছে এত গয়না ভারতের অতি অল্প দেবতার ভাণ্ডারেই আছে। পয়সা দিলে সে সব গয়না দেখবার ব্যবস্থা হোতে পারে। এখানকার সেবাদাসীদেরও খুব নাম ডাক। মন্দিরের মধ্যেই এক ছবির দোকানে সেবাদাসীদের ফটো বিক্রি হচ্ছে। সেবাদাসীদের সম্বন্ধে এখানকার কয়েকজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে কিছু আলোচনা হয়েছিল। যতদূর বুঝতে পারা গেল তাতে মনে হয় যে, এই হীন প্রথা শীগ্‌গীরই উঠে যাবে। উঠে যাবার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, সেবাদাসীরা আজকাল ঠাকুর অর্থাৎ ঠাকুরের সেবায়েৎদের সেবায় লাগে না। তারা এ বিষয়ে একেবারে স্বাধীনা।

শ্রীরঙ্গমের এই বিষ্ণুর নাম রঙ্গনাথস্বামী। এই মন্দির থেকে আধ মাইল দূরে, এই দ্বীপের মধ্যেই জম্বুকেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দিরটী দেখে আমরা চৌলট্রীতে ফিরে এলুম। গাইড বল্লে—তাড়াতাড়ি স্নান কোরে খেতে চল। বেশী বেলা হোয়ে গেলে আবার কালকের মতন তরকারী ফুরিয়ে যাবে।

আমাদের মাংসাশী বন্ধুবর সেদিন আমিষ হোটেলে আহারের ব্যবস্থা ঠিক কোরে রেখেছিলেন। স্নান সেরে সেখানে খেতে যাওয়া গেল। নিরামিষ হোটেলের চেয়ে আমিষের হোটেল সর্ব্বাংশে ভাল। এখানেও কলাপাতার ব্যবস্থা বটে, কিন্তু এখানকার গেলাস, বসবার আসন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভদ্র। অসুবিধার মধ্যে ঝাল একটু বেশী কিন্তু অনেকদিন পরে মৎস্য, মাংস পেয়ে ঠিক আহারের সময় ঝালের তেজটা তেমন পাই'ন। দাম নিরামিষ হোটেলেরই সমান। এতদিন বৃথা নিরামিষ হোটেলে ঘা'স-চচ্চাড় খেয়েছি বলে আফ্‌শোষ হোতে লাগল।

খাওয়া সেরে চৌলট্রীতে ফিরে এসে বিছানাপত্র বেঁধে মোটরে কোরে ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে রওনা। সেখান থেকে চারটের ট্রেণে মাদুরা যাত্রা। (ক্রমশঃ)

তোমার জয়

শ্রীনরেন্দ্র দেব

তিমির-ঘেরা অরুণ-আলোয় তরুণ মনের ধ্যানে
কল্প-রংয়ের রামধনুতে একটি ছবি প্রাণে
স্বপ্ন-ছায়ায় ছিল আঁকা,—ছিল শুধুই আঁকা—
ছিলনা তার চটুল চোখে চাউনি চপল-বাঁকা,
অধর-কোণে ছিলনা তার হৃদয়-হরা হাসি
তবুও মোর তরল-প্র ... বাজাতো বাঁশী!

আমার হৃদয়-আঙিনাতে
স্বয়ম্বরের এক সভাতে
বাজিয়ে কাঁকন মৃণাল-হাতে
দুলিয়ে বরণ-মালা
ধরা-ছোঁয়ার ঢের তফাতে দাঁড়িয়েছিল বালা!
রূপ ছিল তার রূপ-কথা সে, সাপের মাণিক জ্বালা!

মাথায় ছিল মেঘের বরণ এলোচুলের রাশ,
পিঠ ছুঁয়ে তা পড়্‌তো ভুঁয়ে, প'রতো চিকণ বাস ;
পদ্ম ফুলের পা' দু'খানি, চাঁপার কলি হাতে
শিরিষ মুকুল দুলতো কানে, সেঁউতি সিঁথি মাথে !
কাজল-রেখা ভোম্‌রা-ভুরু, ডাগর নয়ন খাসা
স্বপন পুরীর সাতমহলে একলা ছিল বাসা !

সেইখানে সেই বিজন দেশে
[illegible] ন্সে ভেসে
দেখতে যেতেম, নির্নিমেষে
নিষ্কলঙ্ক রূপ,

সুগন্ধে মোর চিত্ত ভ'রে জ্বল্‌তো প্রেমের ধূপ !
সেই প্রতিমা গড়াই আমার দুখের মাঝে সুখ,
তার পূজাতেই দিবস রাতে উঠ্‌তো ভ'রে বুক !

সে ছিল মোর মনে-মনে
বুকের কোণে সঙ্গোপনে
জড়িয়ে মম চিত্ত সনে
স্বপন-প্রিয়ার ছবি ;
তারই চরণ ঘিরে ঘিরে
আবেদনের অশ্রু নীরে
ভালবাসার তীর্থ-তীরে
গাইত কিশোর কবি !

গান শুনে সে আস্‌তো মনের বাতায়নের দ্বারে,
কেমন যেন লজ্জা পেয়ে চাইত' বারে বারে,
তার চোখে সে আবেশ দেখে মুগ্ধ হতেম আমি
বিহ্বল আমার চিত্ত যে তার নিত্য অনুগামী !
কল্পনা মোর রিক্ত বুকে ক'রতো হাহাকার,
চাওয়ার সুরেই বাজ্‌তো শুধু মর্ম্ম-বীণার তার !
এই জীবনে সবার চেয়েই চেয়েছিলেম তাকে,
চেয়েছিলেম ভরিয়ে নিতে আমার সকল ফাঁকে,
চেয়েছিলেম বুকের প'রে আলিঙ্গনের মাঝে
সাথীর মতো পাশটিতে মোর, সঙ্গী সকল কাজে।

*　　*　　*　　*

চেয়েছিলেম বন্ধু বলে জড়িয়ে যেন ধ'রতে পারি,
চেয়েছিলেম প্রিয়তমায়—সখী—সচিব—মিত্র—নারী !
যৌবনে মোর রাজ্যে তাকে চেয়েছিলেম রাণীর মতো,
সাধন-পথে সাধ ছিল গো মিলবে দোসর বাণীব্রত !
সেই শুভদিন আস্‌বে কবে—আস্‌বে কবে লগ্ন ভালো
পথ চেয়ে তাই বসেছিলেম জ্বালিয়ে নিয়ে আশার আলো !

*　　*　　*　　*

আষাঢ় এসে বারে বারেই অন্তরে মোর অশ্রুপাতে
ঘনিয়ে যেন তুলতো কতো প্রাণের আবেগ সজল রাতে ;
মেঘ ডেকেছে গুরু-গুরু নেশার আবেশ জাগিয়ে মনে,
শিউরেছে বুক তড়িৎ আলোয় অভিসারের গোপন-ক্ষণে।
কাটিয়ে দিছি অপেক্ষাতে একলা জেগে দিবস নিশি,
কদম কেয়ার কুঞ্জবনে স্বপ্ন-ছায়ার মায়ার মিশি !
পায়নি তারে—নাইবা পেলাম—হারাইনি ত আমার মনে,
সে ছিল মোর বাঁশীর সুরে—গানের গোপন গুঞ্জরণে !

*　　*　　*　　*

পথ চেয়ে মোর পড়্‌ল' বেলা, জীবন স্রোতের শ্রান্তধারা,
দুঃখ সুখের তরঙ্গ সব বালুর বেলায় আজকে হারা !
আশার প্রদীপ নিবিয়ে দিলে বিফলতার দম্‌কা বায়ু
দিনের শেষে রাত এসেছে, ফুরিয়ে আসে অল্প আয়ু
রুদ্ধ ক'রে যেদিন আমার উপেক্ষিত মুক্ত-দ্বার
ভাব্‌ছি এবার খুঁজতে যাবো বৈতরণীর খেয়ার পার—
সেদিন যেন দুয়ারে কার শুন্‌তে পেলেম করাঘাত,
ক্লান্ত চরণ উঠ্‌লো কেঁপে, বশ মানেনা অবশ হাত !

কে এলো আজ বন্ধ-দ্বারে ?
এই কথাটাই বারে বারে

শূন্য-হিয়ার অন্ধকারে ক'রলে হঠাৎ জ্যোতির্পাত !

*　　*　　*

আমি　খুলে দিলেম দ্বার,
দেখি　একি চমৎকার !
ওগো　পথ চেয়ে গো যার
প্রাণ করেছি ক্ষয়,
এ যে　সেই মানুষই এসে
এই　বিদায় বেলা হেসে
আজ　নিবিড় ভালবেসে
ব'ল্‌ছে—তোমার জয় !
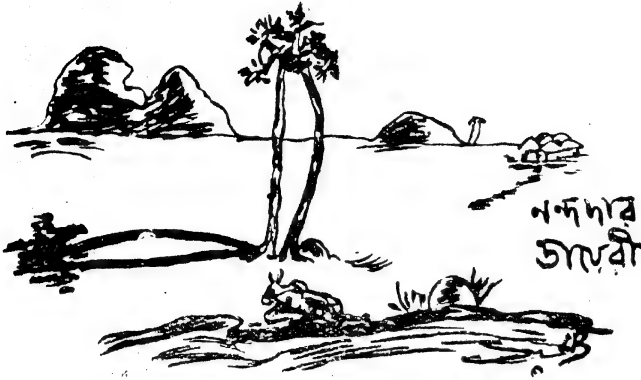
শ্রীলক্ষ্মীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ও অঙ্কিত

খবরের কাগজে প্রকাশ, আলিপুরের ব্যারোমিটারে জোয়ার-ভাটা খেলিতেছে। একপাল কালো মেঘ বোম্বে হাওয়া-আফিস হইতে কলিকাতার হাওয়া আফিসের দিকে রওনা হইয়াছে। তাহারা সোজা চেরাপুঞ্জি আসিতে পারে বটে, তবে পাঞ্জাব চলিয়া যাওয়াও আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং মুষলধারে বৃষ্টি না হওয়াও যেমন সম্ভব, হওয়াও তেমনি অসম্ভব নহে। আফিস হইতে ফিরিবার সময় একটা কালো মেঘকে ক্যানিং ষ্ট্রীট পার হইতে দেখিয়াছি। তাহার উপর সেদিনকার ঝড়ে ছাতার শিকগুলি উত্তরমুখী হইয়া গিয়াছে,—শত সাধ্য-সাধনাতেও নামাইতে পারি নাই। গলির মোড়ে হাজরাদের বৈঠকখানায় প্রাত্যহিক সান্ধ্যসভা বসিত ; গুটি গুটি সেই দিকে চলিলাম।

পাঁজী দেখি নাই অশ্লেষা, কি মঘা,—রামনিধির সেতারের তার ছিঁড়িয়াছে, ইস্কাপনের গোলাম হারাইয়াছে, নন্দদার দাঁতের গোঁড়া ফুলিয়াছে। নিরুপায়! অগত্যা সাত মাস আগের একখানি দৈনিক লইয়া তাহার 'কারেন্ট এনগেজমেণ্টস্' পড়া সুরু করিলাম।

আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া যোগেন্দ্র বলিল, "আষাঢ়স্য প্রথম দিবস, মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে বাতাস—তার উপর ঐ কালো মেঘটা! আমার আজকে কেবল মেঘদূতের কথাই মনে হচ্ছে।"

বোধ হয় সেই বোম্বাই মেঘটা। প্রেম জিনিষটা মন্দ নহে, সেটা সেই গান্ধর্ব্ব-বিবাহের যুগ হইতে এই অসবর্ণ বিবাহের যুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রেমের কলম, নূতন জিনিষ বটে!

পটলা বলিল, "তা যাই বলুন যোগেনবাবু, আমার কিন্তু বাদলা দেখলেই গরম পাকৌড়ির কথা মনে পড়ে। বেশ ঝাল ঝাল।"

কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। চাঁদ নাই, তারা ঢাকিয়া গিয়াছে। ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বোধ হয় সেই মেঘটার দলবল এতক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

দাঁতের গোড়াটা চাপিয়া ধরিয়া নন্দদা বলিলেন, "উঃ, এইরকম বৃষ্টি একবার হয়েছিল আমরা হরিদ্বার লছমনঝোলায় থাকতে। দুধারে দুই পাহাড়—কেদারনাথ আর বদরীনাথ, আগাগোড়া বরফে মোড়া। সেই খাঁটী বরফ গলে দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে মা গঙ্গা বয়ে যাচ্ছেন। কি শীত! বললে বিশ্বাস করবে না—মেঘে শানায় না—শেষে এক বোতল করে গ্লীসারীণ খেতে আমার শ্বাশুড়ীর ত—"

কিছুদূরে সরিয়া বসিয়া যোগেন্দ্র বলিল, "নাড়ী-ভুঁড়ি সব জুড়ে এক হয়ে গিয়েছিল। সে আমি জানি। শেষে কলকেতায় এসে ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ্ কোম্পানীকে দিয়ে অয়েল করাতে হয়। দেখ নন্দদা, ছেলেবেলায় পেট্রোগ্যাড্ থেকে মস্কো বেড়ানোর ডেস্‌ক্রিপসন লিখে ভূগোলে ফার্ষ্ট হয়েছিলুম; কিন্তু বাস্তব জীবনে কখনও গিন্নী আর পাণ্ডার ভয়ে শ্রীরামপুর পার হইনি। কেউ বলে স্ত্রৈণ, কেউ বলে কুড়ে, কেউ বলে কাপুরুষ। সব সহ্য হয় কিন্তু—যাক্ গে। মা কালীর দিব্যি এবার যদি না হরিদ্বার ঘুরে আসি। চাক্‌রী যায়—সেখানে একটা গ্লীসারীণের আড়ৎ খুলবো।"

পট্‌লা। অমনি একটা ঘড়ির দোকান। নন্দদা বল্‌ছিলেন গান্ধীজীর সঙ্গে না কি চীনেদের রাজার পরামর্শ হয়ে গেছে—তারা সব এখানে আসবে। শেষে কোন্ দিন বলবে মাথায় ঝুঁটি রাখ। আমার মাথায়ও ঝুঁটি আর আমার সহধর্ম্মিণীরও মাথায় ঝুঁটি—না, সে বড় লজ্জা করবে। তার চেয়ে আপনার ঘড়ির দোকানে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হব।"

ফুটপাথ ডুবিয়া গিয়াছে, অথচ আকাশ তেমনই অন্ধকার।

রামনিধি বলিল, "থামলেন কেন নন্দদা! এ জিনিস্ থেকে আপাততঃ বাড়ী ফেরা যাচ্ছে না। ভাল কথা, আপনার সাহিত্য-চর্চ্চা কেমন চলছে?"

যোগেন্দ্র। "সাহিত্য? নন্দদা—

'সাহিত্যিকের বেশে তুমি কর গো বিশ্বজয়
এ কি গো বিস্ময়——"

নন্দদা, তুমি যে পাকা রত্নটি, তা ত জানা ছিল না। তার পর, এ-সব কবে থেকে?"

নন্দদা। ও—সে এক মস্ত ইতিহাস, আর তোমাদের বিশ্বাস হবে না। তার চেয়ে—"

যোগেন্দ্র বলিল, "ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব সব শুন্‌বো। আর বিশ্বাসের কথা যদি বলো, তবে এমন অনেক কিছুই বলো যা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু তার জন্যে ত তোমায় কোন দিন ক্ষুণ্ণ হতে দেখি নি। অতএব ও-সব গৌরচন্দ্রিকা রেখে তোমার ইতিহাস আরম্ভ কর।"

সম্পূর্ণপ্রায় বর্ম্মা চুরুটটায় একটা শেষ-টান দিতেই সেটা নিভিয়া গেল। গল্প বলিবার উৎসাহে দাঁতের ব্যথা ভুলিয়া নন্দদা আরম্ভ করিলেন—

"বীরভূমের অনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তীকে তোমরা অনেকেই জান। আমাদের গাঁয়েই বাড়ী। কণ্ট্র্যাব্যাণ্ডিষ্ট এণ্ড কোম্পানীতে ষাট টাকা মাহিনায় চাকরী করতেন। ষাট টাকায় কলকেতায় বাসা ভাড়া করে থাকা অসম্ভব; কাজেই একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ভাঙ্গা মেসে থাকেন। প্রায় প্রত্যেক শনিবার তিনটায় সময় অনাথবাবুকে একহাতে হয় একটা কফি নয় একটা ইলিশ মাছ, আর একহাতে ভাঙ্গা ছাতাটাকে নিয়ে হাওড়ার বাস্ ধরতে দেখতুম। ক্রমে অনাথ-বাবুর বড় মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠ্‌ল। দেশে স্ত্রী, ছেলে, দুই মেয়ে, বুড়ো পিসীমা, কলকেতায় মেসের খরচ, তার উপর সপ্তাহান্তে ট্রেণের টিকিটটা, মাছটা, কফিটা, পাড়া-

হয় একটা কফি নয় একটা ইলিশ মাছ

গাঁয়ে ম্যালেরিয়া, এ সব ত লেগেই আছে। ষাট টাকা মাহিনা, উপরি নাই; এদিকে মেয়ে ষোলো ছাড়িয়ে সতেরয় পড়েছে। দেশে শিরোমণি, চক্রবর্ত্তী মশাইরা ত ওৎ পেতে বসে আছেন, একবার পেলে হয়। গলাটা ক্যাঁক করে টিপে ধরে মনুর আইন সমঝে দেবেন।

শনিবার তিনটে বেজে পনর মিনিট। ভাঙ্গা ছাতাটা বগলে পুরে অনাথবাবু হাইকোর্টের ট্রামে উঠলেন। যা হোক চারটে পয়সা বাঁচবে। দুজন কলেজের ছেলে হো হো করে হাসতে হাসতে প্রেসিডেন্সী কলেজের দিকে চলে গেলো। অনাথবাবু কিছুক্ষণ সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন;—তাঁর নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়্‌ল। গাঁয়ের গাছে গাছে কুল চুরী, নিঃসম্পর্কীয় মাসী পিসীর কলসী ভাঙা, লুকিয়ে তামুক খাওয়া, কত কি! তার পর যৌবন—আফিসে ঢুকবার আগে কি উৎসাহই না ছিল। শ্বশুর মারা যাবার

পর নগদ পাঁচ হাজার টাকা আর মাসতুতো সম্বন্ধী উদয়কে পেয়ে চাষ করতে নেমেছিলেন। জমীতে ঘাসের অভাব নেই, দুধেরই অভাব। উদয়ের মতে গরু পোষাই যুক্তি-সঙ্গত। গুটিদশেক গরু ও বলদ, তারপর বংশবৃদ্ধি, ক্ষীর ছানা মাখম, তিন মাসে সওয়া গজ ভুঁড়ি। উদয়ের বৌ এ বিষয়ে একেবারে এক্সপার্ট—সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন। বলে, 'শেষে ছাড়তে চাইবে না। বলবে—কি বৌই করেছিলি উদো।' তিন দিন পরে উদয়ের বৌ সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এলেন। গরু তখনও বলরামপুরের হাটে, সন্দেশ রসগোল্লা কল্পনায়। দেখতে দেখতে উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু ছিল অস্ত গেল। আর এখন, পনর বছর আফিসে কাজ করে উৎসাহ, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য সব গিয়েছে। শরীরটি হয়েছে যেন কলেপেষা এক-টুকরা আখ—রসকষবিহীন।

সন্ধ্যা সাতটার সময় অনাথবাবু ট্রেণ থেকে নামলেন। ষ্টেশন থেকে বাড়ী এক কোশ টাক পথ। চারিদিকে মাঠ—ধানজমী নয়, লাল কাঁকরের উঁচু নীচু মাঠ। এখানটায় বড় বড় টিপি, ওখানে গর্ত্ত। গাছপালা নেই বললেই হয়—মধ্যে মধ্যে দু একটা আগাছার ঝোপ, আর কোথাও বা একটা মোটা বেঁটে খেজুর গাছ, চারিদিকে মাঠটার মতই শুকনো। লাল কাঁকরের আঁকাবাঁকা পথ কত গাঁয়ের বুক-চিরে চলে গেছে। পথের দুধারে অজস্র কাশফুল—হাওয়াতে সমুদ্রের ঢেউর মত নাচ লাগিয়েছে। কাছেই তালদীঘি। চাঁদের আলোয় চারিদিক ভরে গেছে। কত ভাবুক হয় ত সেখানে পড়ে গড়াগড়ি দিত, কত কবি হয় ত দিস্তের পর দিস্তে সাদা কাগজ কালো করে ফেলতো, কত বিরহী দীর্ঘশ্বাসে ঝড় তুলতো; কিন্তু অনাথবাবু নির্ব্বিকার, একেবারে জীবন্ত গদ্য। শিরোমণি মশায়ের দন্তপংক্তির কথা মনে হয় আর সর্ব্বদেহে কাঁপন লাগে,—পুলকে নয় ভয়ে।

ক্রমে সর্ব্বেশ্বরীতলা, চাটুয্যে বাড়ী, বাজার ছাড়িয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলেন। দূরে শিরোমণির বাড়ী দেখা যাচ্ছে। হ্যারিকেনের সধূম আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় না বটে, তবে চেনা যায়—ঐ শিরোমণি,তার পাশে চক্রবর্ত্তী, নকুড় ঘোষাল; সভার মধ্যে ভুঁড়ির ভারে কাৎ হয়ে পড়ে আছে দীনেশ রায়। বাপ! একেবারে ত্র্যহস্পর্শ যোগ—পেলে ছিঁড়ে খাবে। অনাথবাবু জুতোজোড়া খুলে হাতে নিলেন, পাছে শব্দ হয়। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠ্‌ল; শিরোমণি মশাই হাঁকলেন, "কে যায়?"

ধরলে রে—! পাশেই একটা কচু-ঝোপ,—অনাথবাবু তারি মধ্যে বসে পড়লেন। শিরোমণির চোখ অন্ধকারেও

ঝোপের মধ্যে বসে পড়লেন

জ্বলে; তবে কচুবনে থই পায় না। সর্ব্বাঙ্গে পাঁক মেখে কিছুক্ষণ পরে অনাথবাবু বাড়ী এসে পৌছুলেন। পিতৃপুরুষের আমলের প্রকাণ্ড বড় বাড়ী। প্রপিতামহ জমীদারের নায়েব ছিলেন; বহু প্রজার রক্তশোষণ করে বাড়ীটি তৈরী করিয়ে-ছিলেন। এখন আলো দেবার সামর্থ্য নেই, পরিষ্কার করবার লোক নেই। সদর দরজা ভেঙ্গে গেছে; চণ্ডীমণ্ডপে আরকিওলজিষ্টদের রিসার্চ্চ-রুম বসেছে। অন্দরে গুটি দুই-তিন ঘর পরিষ্কার করে অনাথবাবুরা থাকেন। অনাথবাবুর মেয়েটির নাম বঙ্গভারতী, রোগা লম্বা চেহারা, বর্ণ—উজ্জ্বল শ্যাম। ছেলেটি ছোট—আট ন' বছর বয়স। বাপকে দেখে চীৎকার করে উঠ্‌ল, "ও মা দেখে যাও, বাবাকে গরুতে তাড়া করেছে।" গরুই বটে তবে ষাঁড়, ধর্ম্মের ষাঁড়। কাকেও গুঁতোবার সুবিধে না পেয়ে শিরোমণি মশাইদের সারারাত্রি ঘুম হয় নি।

সকালে চক্রবর্ত্তী মশাই এসে উপস্থিত। ভগ্নদূত! অনাথবাবু দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন, মাথায় লাল মাটী,—বোধ হয় পথে শিং শানাতে শানাতে এসেছেন। কি করেন, নিরুপায়। শ্রীদুর্গা শরণ করে অনাথবাবু খোঁয়াড়ে চল্‌লেন।

সভায় আজ বিশেষ সমারোহ। এ-রকম মুখরোচক জিনিষ পাড়াগাঁয়ে বড় একটা জোটে না। নাকের ডগার উপর নিকেলের চশমাটা দড়ি দিয়ে বেঁধে শিরোমণি মশাই ঘনঘন পঞ্জিকার পাতা নাড়াচাড়া করছিলেন। গাঁয়ের আবালবৃদ্ধ সকলেই উপস্থিত, বনিতার রিপ্রেজেন্‌টেটিভও দু' একটি আছেন। উপরন্তু পাশের গাঁয়ের স্বরূপ রায় এসেছেন। অতি সজ্জন ব্যক্তি, বয়স বোধ হয় পঞ্চান্ন। সম্প্রতি চতুর্থ পক্ষ গত হয়েছে। প্রকাণ্ড পিলেটি গরদের চাদর দিয়ে ঢেকে চুপ করে বসেছিলেন।

শিরোমণি। এস ভায়া এস। কাল রাতে যে বড় আসনি। আমরা ভেবে মরি।

শিরোমণির স্বর অহেতুক কোমল। এ যেন ফাঁসীর খাওয়া।

অনাথবাবুর বাক্যস্ফূর্ত্তি হল না—কে যেন গলা চেপে ধরেছে। অনেক কষ্টে কতকগুলি সংযুক্তবর্ণ উচ্চারণ করে থেমে গেলেন।

বিশেষ ভণিতা সহকারে আধঘণ্টা ধরে শিরোমণি মশাই যা বল্লেন, তার ভাবার্থ হচ্ছে যে, শিরোমণি অনাথবাবুকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভাবেন; তাই ভায়ার কন্যাটিকে বয়স্থা দেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বরূপকে পাত্র ঠিক করেছেন। স্বরূপ রায় সৎ ব্রাহ্মণ, মহাধনবান। অনাথবাবুর, তাঁর কন্যার এবং চতুর্দ্দশ পুরুষের উপর ভগবান বড়ই সন্তুষ্ট; নইলে এরূপ পাত্র পাওয়া শক্ত। এটা ঠিক যে, স্বরূপের কিঞ্চিৎ বয়স হয়েছে। তা হিন্দু পুরুষের আবার বয়েস! আর মেয়ের যদি বরাতের জোর থাকে, তবে আবার কোন্ না স্বরূপের জন্যে ষষ্ঠপক্ষের খোঁজ করতে হবে। এই বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

অনাথবাবু দাদার বয়সী পাত্রের দিকে চেয়ে প্রথমে একটু আধটু আপত্তিসূচক মাথা নেড়েছিলেন; কিন্তু শিরোমণি মশায়ের দু একটু মনুর চাঁট খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। শিরোমণি পঁচিশ টাকা ঘটক-বিদায় পেয়েছেন,—অনাথবাবুকে কন্যাদায় থেকে মোচন করবেনই। অগত্যা দুই মুদ্রা ও কিঞ্চিৎ দুর্ব্বাঘাস খরচ করে খোঁয়াড় থেকে মুক্তি পেলেন।

হারাধন কলেজে-পড়া ছোক্‌রা। বল্লে, "জ্যাঠাইমা, জামাইকে বাবা বলতে পারবে,ও ঠিক তোমার বাবার বয়সী।"

* * * * *

যোগেন্দ্র বলিল, "ও নন্দদা, ইতিহাস যে জীবনীতে গিয়ে দাঁড়াল। সাহিত্য কই!"

"আসছে," বলিয়া নন্দদা আবার বলিতে লাগিলেন—"যথা-সময়ে বিয়ে হয়ে গেল। রায় মশাই বেশ বড় লোক। ধানের গোলা, মাছ-ভরা পুকুর, খেজুর গাছ, তেজারতী কারবার কিছুরই অভাব নাই। তিন চারটি গরু, কয়েক ঘর প্রজাও আছে। মাসশ্বাশুড়ী ও ননদটি কিঞ্চিৎ উগ্র-স্বভাবা হলেও বঙ্গভারতীর তাদের তত দুঃসহ বোধ হয় নি। কিন্তু বিপদ হল গে বাড়ীর পাশের মুসলমান বস্তিটি নিয়ে। এতদিন এরা বেশ শিষ্ট শান্তই ছিল—এমন কি স্বরূপ রায়কে দাদা খুড়ো বলে ডাকতো। কিন্তু বছর খানেক থেকে তোমাদের ঐ রেণেসাস না কিসের সাড়া তাদের মধ্যে পড়ে গেছে। এদের এখন ধারণা, এরা একেবারে খাস তুর্কীস্থান থেকে চালান এসেছে; এবং সবাই এক একটা ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন। হিন্দু মানে না, মন্দির মানে না, এমন কি উত্তমর্ণ স্বরূপ রায়কে পর্য্যন্ত মানে না। এরা আজকাল লুঙ্গী পরে, মাথার মধ্যে চৌকা করে কামিয়ে ঠিক সেই অনুপাতে দাড়ী রাখে। সপ্তাহান্তে মুরগী খায়, এবং শীঘ্রই গরু কাটবার ও উর্দ্দু বলবার চেষ্টায় আছে। বিয়ের পর রায় মশাই এদের কাছে সুদ চেয়েছিলেন—সেই আক্রোশে এরা এক দিন পাঁচীল টপকে রায় বাড়ীতে ঢুকে নতুন বৌকে ধরে নিয়ে গেল। বেশী দূর যেতে হয় নি, পথের মাঝেই প্রকাশ ঘোষের বাঁকের বাড়ীতে বঞ্চাবাত উড়ে গেল, কিন্তু অনিষ্ট যা করবার তা করে গেল। শিরোমণির অভাব কোন গাঁয়েই নেই, এ গাঁয়েও ছিল না। যথা-সময়ে সভায় ষোল আনির তর্ক ও বিচার হয়ে গেল। ব্রাহ্মণবাক্য বেদবাক্য। বঙ্গভারতীকে গাঁয়ের শেষে ছেড়ে দিয়ে এসে রায় মশাই ষষ্ঠ পক্ষের খোঁজে লেগে গেলেন। এর কিছুদিন আগেই সস্ত্রীক অনাথবাবু বীরভূম ছেড়ে স্বর্গধামে যাত্রা করেছিলেন।

অনাথের সহায় ভগবান, ভগবানের অনুচর পাদ্রী, ঠিক সেই সময় পাদ্রী কাটথ্রোট স্মাগলার আর তার মেম হলোবেলী বিশ্বপ্রেম বিলুতে বেরিয়েছিলেন। সাহেবটি রাঙ্গা আলুর মত দেখতে। মাথায় মস্ত টাক; কিন্তু প্রকাণ্ড ভুরুতে সে অভাব মিটেছে। ম্যাপ দেখে আফ্রিকার সভ্যতা সম্বন্ধে বই লিখে ডাক্তার উপাধি পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষেরও একটা লিখবার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু সম্প্রতি একটি কাফ্রীর

কাছে প্রহার খেয়ে সে সব ইচ্ছা ছেড়ে দিয়ে পাত্রী হয়েছেন। মেমটি সাহেবের থেকে সাত আট ইঞ্চ বড়, বয়েসেও বোধ হয় তাই। যাই হোক মেয়েটির তবু একটা আশ্রয় জুটলো। জুতামোজা পরে, দশ আনা ছ' আনা চুল ছেঁটেও তার সেখানে দিন মন্দ কাটছিল না, কিন্তু হঠাৎ আবার আর এক বিপদ উপস্থিত। বেচারী টিকতে পারল না। পালিয়ে এল। আর এসে চাপ্‌বি ত চাপ আমারি ঘাড়ে।

তখন সবে ভাগলপুরে বদলী হয়েছি। অনাথবাবু গ্রাম-সুবাদে দাদা হতেন, বিশেষ মেয়েটি যখন অনাথা—ফেলতে ত পারি নে। কাজেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হল। মাস খানেক বেশ নিরুপদ্রবেই কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যেবেলা আগ্রা এক্সপ্রেসকে বিদেয় করে এসে বৈঠকখানায় বসে তামাক খাচ্ছি, এমন সময় কে যেন একজন এল—পুরুষ কি মেয়ে অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না। মাথায় বড় বড় চুল, গায়ে সেমিজ, পায়ে নাগরা।

তাও কিছু বুঝলুম না

বল্লুম, 'কে ও'।

মিহি গলায় আওয়াজ এল, "আমি নির্ঝর ভট্ট।" তাতেও কিছু বুঝলুম না। আলো জ্বেলে দেখি, ওমা, এ যে শিরোমণি মশায়ের ছেলে। বেটাছেলেই বটে। আজকাল মেয়েদের মাথার চুল আমাদের দেশের ছেলেদের লাগছে। যেটাকে সেমিজ ভেবেছিলুম, সেটা দেখি পাঞ্জাবী। আর নাগরা ত উভয়পদী। ছোকরা কলকেতায় পড়তে এসে ভটচায কেটে ভট্ট করে একেবারে বিলকুল কচি সংসদের মেম্বার বনে গেছে।

বল্লে, "আপনার এখানে বঙ্গভারতী বলে একটি তরুণী আছে কি? তার এই দুঃসময়ে সহায়তা দিতে আমি তাকে চাই!"

চাও কি রকম?

"হ্যাঁ চাই—আমি তাকে ভালবাসি। জীবনের খেয়াঘাটে বসে আছি আমি, সে আমার খেয়া, সুবাতাস। বিয়ে আমি করব না, সেটা নিছক গন্ধ—আমি চাই বিশুদ্ধ প্রেম।"

বাপের বয়সী আমি—আমায় বলে কিনা প্রেম করবো। অসীম ধৈর্য্য আমার, ধন্য আমার অহিংসাব্রত। এরই জোরে নন্‌-কো-অপারেশনের সময় সাহেবের হাতে বিস্তর মার খেয়েও কখন ফিরে মারি নি।

বল্লুম, "আচ্ছা বাবাজী, ভাল কথা। বেশ ভেবে চিন্তে দেখি। এখন আমিই তার অভিভাবক কি না।"

বহুকষ্টে তাকে বিদায় দিলুম, কিন্তু ভাবতে হল না। মা সেই রাত্রেই কোথায় নিরুদ্দেশ হলেন, তার আর খোঁজ পেলাম না।

কিছুদিন কেটে গেল। একদিন রাত্রে দেখি, মা স্বপ্নে এসে উপস্থিত। বল্লেন, "বাছা নন্দ, তোর কাছে আমি বড়ই সুখে ছিলাম; কিন্তু হতভাগা নির্ঝর ভট্ট থাকতে দিল কই। যা হোক তোর সেবায় আমি খুসী হয়েছি। সম্প্রতি আমি dead language societyতে আমার বোন সংস্কৃত ও হীব্রুর কাছে চল্লাম, তুই আমার কাছে বর চেয়ে নে।"

কি বর আর চাইব। বল্লুম, "মা, গোবদ্যি স্বরূপ, কবিরাজ শিরোমণি, এ্যালোপাথিক টমসন, হাকিমী ছোলতান আর হোমিওপ্যাথিক কচিসংসদের হাতে পড়ে বড় কষ্ট ভোগ করেছ। এখন একটু বিশ্বনাথের চরণামৃত খাও—শান্তি পাবে।"

"বাছা তুই বাঙ্গলাভাষার চর্চ্চা কর, সেই আমার শান্তি-জল হবে,"—এই বলে মা অন্তর্ধান হলেন।

যোগেন্দ্র বলিল, "নন্দদা বঙ্গভারতীর সঙ্গে কি তোমার শাশুড়ীর পরিচয় ছিল?"

নন্দদা চেয়ারের ভাঙ্গা হাতলটা কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "ধৈর্য্য!"

এবারের শিল্প-প্রদর্শনী

শ্রীঅখিল নিয়োগী

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির নামান্তরই শিল্প। শিল্প সভ্যতার চরম বিকাশ।

মানুষের ভাবধারা যখন প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার গতানুগতিক গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে চায় না—বাইরের বিচিত্রা প্রকৃতি যখন তাকে ইসারা করে হাতছানি দিয়ে ডাকে—তখন সে কলা-লক্ষ্মীর কমলবনে গিয়ে মনের ক্ষুধা মেটায়।

বর্ষার সজল মেঘ—কেকার নৃত্য—শরতের কাশফুল শিউলী তলার প্রথম শিশির—বসন্তের শিহরণ—মানব হৃদয়ে নানা ছন্দের দোলা লাগায়। প্রাণে জোয়ার আসে—আর সেই সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে সৃষ্টির সহজ আকাঙ্ক্ষা।
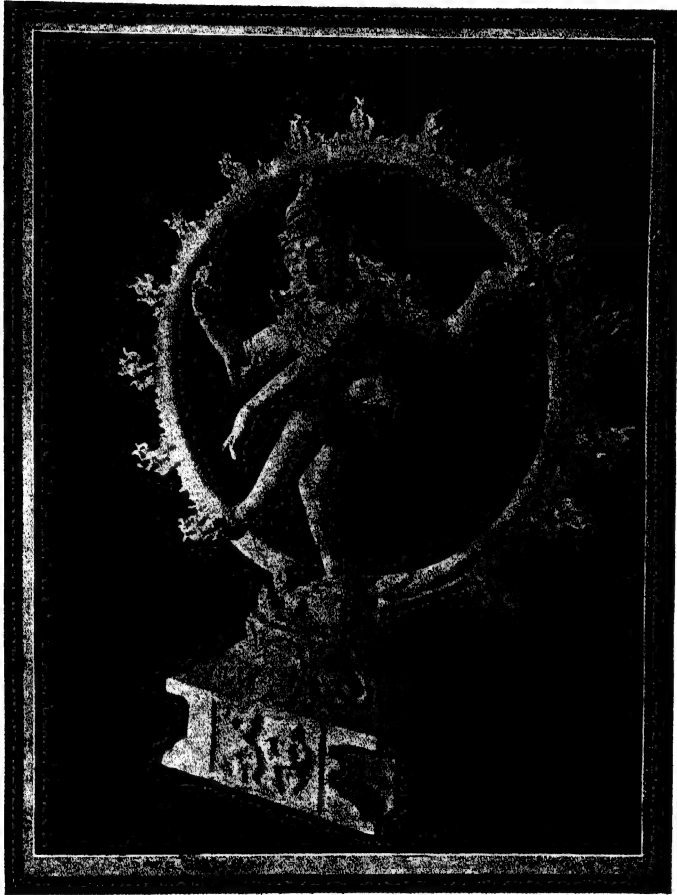
শিল্পের জন্ম সেই বাসনার বিকশিত অরবিন্দের মাঝখানে!—শিল্প মানুষের মনকে যত সহজে নাড়া দিতে পারে এমনটি আর কেউ নয়। "ঋষি টলষ্টয়ের মতে একের ভাবধারার অনুভূতি অপরের ভেতর সঞ্চারিত করার নামই শিল্প"। পাশ্চাত্য মনীষিরা বলে থাকেন শিল্প মানুষকে যে ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে ধর্ম্মও নাকি ততটা পারে না। বিশেষ দেশ বা জাতি নিয়ে ধর্ম্মের গণ্ডী; কিন্তু উচ্চাঙ্গের যে কোনো শিল্প মানুষ মাত্রকেই রস পরিবেশন করতে পারে। জগতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সব অদ্বিতীয় শিল্পী জন্মগ্রহণ ক'রে তাঁদের কল্পলোকের বিচিত্র ভাবধারা ধরণীতে রেখে গেছেন তা' কোনো জাতি বিশেষের সম্পত্তি নয়—যুগে যুগে বিশ্বের রূপদক্ষদের মনে তা শিল্পোৎকর্ষের পলি-মৃত্তিকা বয়ে নিয়ে আসে।

নটরাজ

—শ্রীভবেশচন্দ্র সান্যাল

ভারতীয় শিল্পের হারিয়ে-যাওয়া খেই খুঁজতে গেলেই

আজ আমাদের সাম্‌নে জেগে ওঠে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব-প্রবর্ত্তিত প্রাচীন শিল্পকলা!

এদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথকে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের পুনঃ প্রবর্ত্তক বলা যেতে পারে। এঁর তুলির টানে টানে ফুটে উঠ্‌ল—ভারতীয় শিল্পীর আপন বৈশিষ্ট্য, প্রতিচিত্রে জাগিয়ে তুল্‌ল বিগতশ্রী ভারতের লুপ্ত ভাবধারা। এই যুগ-

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

—শ্রীপুলিন কুণ্ডু

প্রবর্ত্তকের ডাকে সাড়া দিল—একদল আপন-ভোলা তরুণ শিল্পী—চোখে তাদের রূপের নেশা, হাতে তাদের কল্পনার রঙীন তুলি—বুকে তাদের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা!—ভারতীয় শিল্পের এই নতুন অভিযান রস-পিপাসুদের চোখে নতুন করে মায়া কাজল পরিয়ে দিলে।

শিল্পচর্চ্চার কথা বল্‌তে গেলেই আমাদের একটা লজ্জার কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে! শিল্প-শিক্ষার্থীরা দেশের কাছ থেকে কতটা উৎসাহ আর সহানুভূতি পেয়েছে?

খুব বেশী দিন নয়—বাঙ্‌লা দেশের গত দশ বছরের শিল্পচর্চ্চার ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে—শিক্ষার্থীরা সেখানে অবজ্ঞাত, সহানুভূতি ও উৎসাহ দিয়ে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্য দরদী প্রাণের সেখানে একান্ত অভাব।

ছেলেবেলা থেকেই শিল্পের প্রতি একটা টান্ থাকা সত্ত্বেও—তাদের যথার্থ আকাঙ্ক্ষিত পথে চল্‌তে পারে নি—এমন দৃষ্টান্ত খুঁজ্‌লে পরে বাঙ্‌লাদেশের অনেক ঘরে পাওয়া যায়।

নিতান্তই যদি কোনও ছেলের ইস্কুলে কিছু লেখাপড়া হচ্ছে না দেখা যায়, তখনই তার অভিভাবকেরা তাকে আর্ট ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'তে বলেন। অর্থাৎ তাঁদের ধারণা শিল্পচর্চ্চা এতই সহজ ও সামান্য যে সেজন্য আর লেখাপড়া শেখবার কিছু প্রয়োজন নেই!

কাজেই গড্ডলিকা প্রবাহে পড়ে অনেক সময় প্রতিভাও রাস্তা খুঁজে পায় না—সত্য তার কাছে অনাবিষ্কৃত রয়ে যায়।

আশার কথা এই—শিল্প ও শিল্পীর প্রতি দেশের সেই সঙ্কীর্ণ ভাবটা দিনে দিনে কেটে যাচ্ছে—দরদ দিয়ে শিল্পী ও তাঁর সৃষ্টিকে দেখ্‌বার ও বোঝবার লোক দেশে আজকাল মেলে! শিক্ষিত ভদ্র সমাজে—নানা তর্কের মধ্যে শিল্পের আলোচনাও একটু স্থান পায়। দেশের অনেক মাসিক ও সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠাতেও কারু ও শিল্পকলার জন্য খানিকটা করে জায়গা থাকে।

উচ্চাঙ্গের শিল্প প্রচারে সাময়িক পত্রিকার সবচেয়ে বেশী হাত আছে। পাশ্চাত্য দেশে প্রত্যেক বড় পত্রিকার একজন করে নামজাদা চিত্রকর থাকেন—তাঁদের মতানুসারেই চিত্র নির্ব্বাচিত হয়। উঁচু আদর্শের চিত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প-শোভা সম্বন্ধে লোকের চিন্তা-ধারাও

শিল্পীর বন্ধু
—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

এ, এন্, চৌধুরী
—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

(১) তৈল-চিত্র বিভাগ—(Oil colour Section)

(২) জল-চিত্র বিভাগ—(Water colour Section)

(৩) সাদা কালোর বিভাগ—(Black & white Section)

(৪) ভারতীয় চিত্র বিভাগ—(Indian Painting Section)

(৫) ছাত্র বিভাগ—(Students' Section)

(৬) বিজ্ঞাপন শিল্প-বিভাগ—(Commercial Section)

অন্যান্য বছরের মতো ভারতের নানা প্রদেশ থেকে অনেক সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী তাঁদের ছবি পাঠিয়ে প্রদর্শনীকে গৌরবান্বিত করেছিলেন।

উৎকৃষ্ট কাজের জন্যে সমিতি এ বছর নিম্নোক্ত শিল্পীদের পুরস্কৃত করেছেন—

(১) গভর্ণর প্রদত্ত স্বর্ণ-পদক ও পঞ্চাশ টাকা—শিল্পী—মিস্ টি-কেন-ওয়ার্দি ব্রাউন। চিত্র সংখ্যা—১৪৫।

(২) সমিতির স্বর্ণ পদক—চিত্র সংখ্যা—১০৩—শিল্পী—শ্রীদেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী।

(২ক) বিশেষ পুরস্কার স্বর্ণ কেন্দ্র পদক—শিল্পী—শ্রীভবানী চরণ লাহা—চিত্র সংখ্যা ২৮৯।

তৈল-চিত্র-বিভাগ

(৩) তৈল চিত্রের প্রথম পুরস্কার—১০০৲ টাকা—শিল্পী মিঃ লিও-ই লেন চিত্র সংখ্যা—১৩১।

(৪) তৈল চিত্রের দ্বিতীয় পুরস্কার—স্বর্ণ কেন্দ্র পদক—শিল্পী—মেজর সি জি লয়েড। চিত্র সংখ্যা—১৯০।

জল-চিত্র-বিভাগ

(৫) জলচিত্রের প্রথম পুরস্কার—১০০৲ টাকা। শিল্পী—ডি, জি, কুলকারণি। চিত্র সংখ্যা ১৯৯।

(৬) জল চিত্রের দ্বিতীয় পুরস্কার স্বর্ণ কেন্দ্র পদক—শিল্পী মেজর ও, ই, এইচ কমডেন্। চিত্র সংখ্যা—২৯০।

ভাস্কর্য্য-বিভাগ

(৭) সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য—(দেওয়া হয় নাই)

(৮) দ্বিতীয় পুরস্কার—স্বর্ণ কেন্দ্র পদক শিল্প সংখ্যা ৫১১ শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

(৮ক) সোসাইটীর রৌপ্য পদক—শিল্পী শ্রীভবেশ সান্যাল। শিল্প সংখ্যা—৫১৩।

ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগ

(৯) ভারতীয় শিল্পের প্রথম পুরস্কার—১০০৲ টাকা—শিল্পী শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—চিত্র সংখ্যা—১০৮।

(১০) ভারতীয় শিল্পের দ্বিতীয় পুরস্কার। শিল্পী—শ্রীসুধাংশু চৌধুরী চিত্র সংখ্যা—৯২।

(১০ক) ভারতীয় শিল্পের তৃতীয় পুরস্কার—সমিতির রৌপ্য পদক শিল্পী—শ্রীচারু রায়—চিত্র সংখ্যা ৬৭।

সাদা কালোর বিভাগ

(১১) সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাদা কালোর কাজ—১০০৲ টাকা (দেওয়া হয় নাই)

(১২) স্বর্ণ কেন্দ্র পদক—শিল্পী—মিস্ বি, এম, কুপার—চিত্র সংখ্যা—১৮।

(১২ক) রৌপ্য পদক (সোসাইটী প্রদত্ত) শিল্পী এইচ, জি, ত্রিষ্টন চিত্র সংখ্যা—৪৫।

ছাত্র বিভাগ

(১৩) সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র—১০০৲ টাকা—শিল্পী—শ্রীরাসবিহারী দত্ত চিত্র সংখ্যা—৩৬৬।

(১৪) দ্বিতীয় পুরস্কার—স্বর্ণ কেন্দ্র পদক—শিল্পী—শ্রীবিমল চন্দ্র মজুমদার চিত্র সংখ্যা—৩৬৯।

বিশেষ পুরস্কার

(১৫) ২৫৲ টাকা—শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণধন খান্না চিত্র সংখ্যা—৪৫৯।

(১৫ক) সমিতির ব্রোঞ্জ পদক শিল্পী—শ্রীবিপিনবিহারী চৌধুরী চিত্র সংখ্যা—২১।

(১৬) সন্তোষের রাজা প্রদত্ত স্বর্ণ পদক—শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্র ঘোষ দস্তিদার—চিত্র সংখ্যা—৫০০।

(১৭) শ্রীযুক্ত পি কুণ্ডু প্রদত্ত স্বর্ণ কেন্দ্র পদক—শিল্পী—শ্রীঅরুণ রায় চিত্র সংখ্যা—৩০২।

(১৮) সমিতির রৌপ্য পদক শিল্পী শ্রীপি, কর্ম্মকার চিত্র সংখ্যা—২০৭।

(১৯) মহারাজা নদীয়া প্রদত্ত রৌপ্য পদক—শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহ—চিত্র সংখ্যা—১২৩।

(২০) শ্রীযুক্ত আব্দুল আলী প্রদত্ত রৌপ্য পদক—শিল্পী—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত চিত্র সংখ্যা—৫৪।

পুরস্কার-প্রাপ্ত ছবিগুলো ছাড়া বি, এম, কুপারের আঁকা একটি মহিলার ছবি (Portrait of a lady Pic. no. 18) আমাদের খুব ভালো লেগেছে। ছবিটি প্যাষ্টেলে আঁকা।

নাসিকের বাজার

—ভি জি কুলকার্ণী

পুষ্করতীর্থ

—শ্রীবিমলচন্দ্র মজুমদার

শিল্পী, stickএর প্রতি টানে যে অপূর্ব্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন—তা বাস্তবিকই দেখবার জিনিষ।

শিল্পী শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্রকরের শিল্পানুরাগ ও অধ্যবসায় অনুকরণীয়। অন্য কাজে লিপ্ত থেকেও কি করে অবসর সময়ে শিল্পচর্চ্চা করা যায়—এঁর বিষয় আলোচনা করলে আমরা তা' জানতে পারবো। ইনি উকিল। পঞ্চাশ বছর বয়েসে ইনি ছবি আঁকা সুরু করেন। এখন এঁর বয়স পঞ্চান্ন। এই পাঁচ বছরের ভেতর নিজের চেষ্টায় তিনি কি চমৎকার ছবি আঁকতে শিখেছেন—তা তাঁর এই কাজটি (A Head study Pic. No. 51A) দেখলেই বোঝা যায়। মুখের প্রত্যেকটি শিরা, কুঁচকে যাওয়া চামড়া—ইনি জল রংয়ে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ রাওয়ের আঁকা "জয়োল্লাস" (Triumph Pic. No 70) নামে একখানি ছবির ও রংয়ের সামঞ্জস্য (colour combination) সুন্দর হ'য়েছে!

শোভন শিল্প হিসেবে (Docorative art) শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহের ৫১ সংখ্যার ছবিখানি মনে পড়ে। শিল্পীর প্রতি রেখা চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে হয় যে 'সীতা' নাম দেওয়াতে ছবির ব্যাখ্যান অসঙ্গত হয়েছে। নামের সঙ্গে কাজের ঠিক সামঞ্জস্য বজায় থাকে নি।

বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত চারু রায়ের আঁকা নিঃসঙ্গ যামিনী (Solitary night Pic. No. 83) ছবিখানি অপূর্ব্ব হ'য়ে ফুটে উঠেছে। রাত্রির ঘন অন্ধকারের সঙ্গে প্রিয়তমের বিরহে তরুণীর প্রাণের ব্যাকুল চাহনীর চমৎকার মিশ্ খেয়েছে।

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্রের 'রূপ ও সজ্জা' (Beauty & Decoration Pic. No 68) আমাদের খুব ভালো লেগেছে। দর্পণে নিজের রূপ দেখে, তরুণীর লীলায়িত ভঙ্গীটুকু শিল্পীর তুলিতে অপূর্ব্ব ভাবে ধরা দিয়েছে। অজন্তার অনুকরণে পটভূমিকার (Back ground) শোভন বেশ মনোরম।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদের বিশেষত্ব এই যে এঁর আঁকা কোনো ছবির কোনো জায়গা দেখে মন খুঁৎ-খুঁৎ করে ওঠে না—এঁর প্রদর্শনীতে পুরস্কার প্রাপ্ত (Sumatra birds Pic. No. 106) ছবিখানা ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে পক্ষীমিথুন নামে প্রকাশিত হ'য়েছিল।

দেবীপ্রসাদের পরই আর একটি তরুণ শিল্পী আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ইনি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এই তরুণ শিল্পী ছাত্রাবস্থাতেই নানাভাবে শিল্পচর্চ্চা করে যশস্বী হ'য়েছেন।

এঁর আঁকা ছবিগুলি ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের ভাব ধারা—আমাদের মনের বনে যেন গত উৎসব-স্মৃতির গৌরব ফুল ফুটিয়ে তোলে।

বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে ইনি ভারতীয় চিত্রকলার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার পেয়েছেন। পূর্ণচন্দ্রের আঁকা ঘুমন্ত রাজকন্যা (চিত্র সংখ্যা ১১০) এবং প্রসাধন (চিত্র সংখ্যা ১০৩) আমাদের অন্তরে আনন্দের সাড়া জাগিয়ে তোলে।

মোগল শিল্প কলার অনুসরণে আঁকা শ্রীযুক্ত ফণীগুপ্তের সাহজাদা ছবিখানির বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য—মনোমুগ্ধকর!

তৈল-চিত্র বিভাগে প্রথমেই নজরে পড়ে শ্রীযুক্ত অতুল বসুর আঁকা একটি Portrait। অতুলবাবু এখানকার শিল্প-শিক্ষা শেষ করে ইউনিভারসিটির বৃত্তি পেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিলাত গিয়েছিলেন। তাঁর সে শিক্ষা সার্থক হয়েছে। অল্পের ভেতর চমৎকার কাজ কি করে দেখান যায়—এটি তারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

মিঃ লেনের আঁকা দুখানি প্রাকৃতিক দৃশ্যের তৈলচিত্র বাস্তবিকই নয়নানন্দকর! এ সৃষ্টি তাঁর মতো রূপদক্ষের তুলির টানেই সম্ভব। একখানার নাম নীল ও সোনা (Blue & Gold Pic. No 130) এবং অপরটী প্রত্যূষ (Early morning Pic. No. 135)। ছবি দু'খানার বর্ণ-সামঞ্জস্য এবং রচন-পারিপাট্য অপূর্ব্ব।

বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানাতে হ'চ্ছে এবার আমরা শ্রীযুক্ত ঠাকুর সিংহের ছবি দেখে খুসী হ'তে পারিনি। যাঁর হাত দিয়ে গত বছর "স্বর্ণ দেউলের" মতো ছবি বেরিয়েছিল এবার সেই তুলিতে "সে কি রে আসিবে ফিরে" (when he will come back Pic. No. 172) দেখে আমাদের অনেকটা হতাশ হ'তে হ'ল। তাঁর এ চিত্রে শিল্পীর দক্ষতায় কোনও উল্লেখ যোগ্য বিশেষত্ব নেই!

শ্রীযুক্ত যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের—'My first rejected portrait' ছবির নামটি বিশেষ করে উপভোগ করবার মতো।

ছবিখানাকে কে নামঞ্জুর করেছেন আমরা জানি না—

মহিলার প্রতিকৃতি

—মিস্ বি এম কুপার

দিদিমা
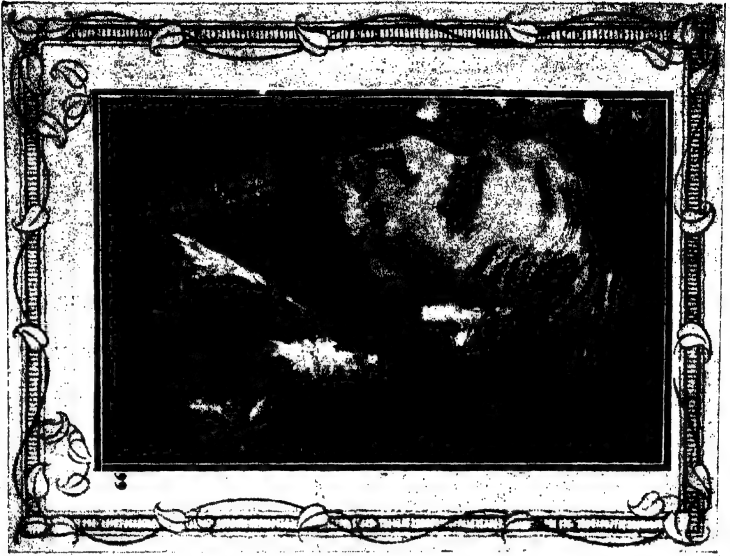
—আর ডি পানভাল্‌কার

কিন্তু এটা ঠিক যে তাঁর দুঃসাহসের প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সাহার Glow (Pic. No. 120) ছবিখানায় শিল্প-বিধির (Technique) আনুগত্য এবং বর্ণ-সামঞ্জস্য বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার মতো।

রাজপুত্র

—শ্রীফণীভূষণ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহের পুরস্কার প্রাপ্ত "জান্‌লার ধারে" (By the window No. 122) ছবিখানি আমরা বিশেষ করেই দেখলুম। ওই ধরণের অথচ ওর চাইতেও বহু শ্রেষ্ঠতর কাজ প্রদর্শনীতে থাকা সত্ত্বেও কেন যে সমিতি এই ছবির জন্য পদক দান করলেন—তা' আমরা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

শ্রীযুক্ত পি, কুণ্ডুর "যৌবনে" (সুভাষ বসু) ছবিখানায় যৌবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর পাকা হাতের তুলি চলেছে ভালো।

শ্রীযুক্ত পি, কর্ম্মকারের একটি Portrait sketch এবং শ্রীযুক্ত কেদার ব্যানার্জ্জির হাতের স্যার কৈলাসের তৈল চিত্রও অতি দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করা হ'য়েছে ব'লে মনে হ'লো।

পর্ত্তুগীজ মহিলা

—মিস্ টী কেনওয়ার্দি ব্রাউন

জলচিত্রবিভাগে উল্লেখ করবার মতো ছবি খুব কমই আছে।

মেজর কন্‌ষ্টনের "নালায় মেঘলা দিন" (A cloudy day in a Nullah. Pic. No. 139) এবং "চুনারের পথে তুষার" (The Snows from the road to Chunar Pic. No. 240) এই ছবি দু'খানিতে শিল্পীর শক্তি অপূর্ব্ব কৃতিত্ব নিয়ে চোখের সুমুখে ভেসে উঠে।

সার কৈলাস বসু

—শ্রীকেদারনাথ ব্যানার্জি

নিজের ছবি

—শ্রীরাসবিহারী দত্ত
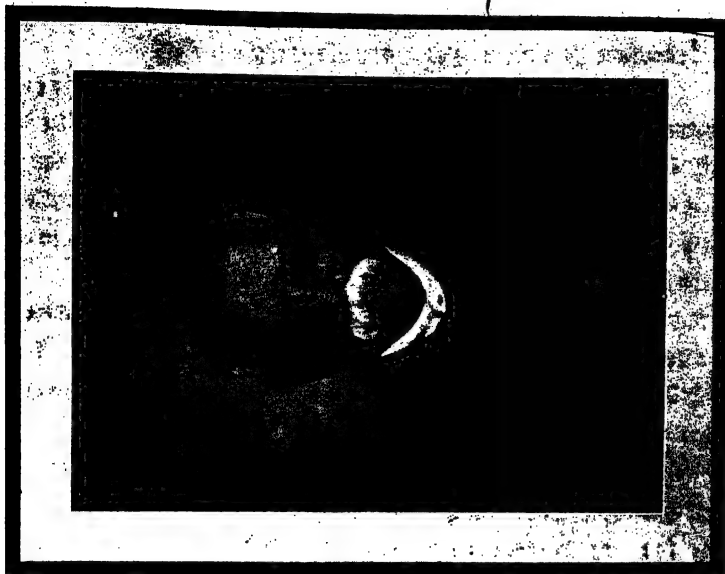
"জল-রঙের খসড়া-চিত্রে" (water colour sketch) শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহার শিল্প-প্রতিভা খুব চমৎকার ফু'টে উঠেছে।

তুলির মৃদু পরশের ভেতর দিয়ে (Delicate Touch) কি করে প্রাণ-মাতানো ছবি আঁকা যায়—শ্রীযুক্ত কুলকারনি তাঁর কাজগুলিতে তা' ভালো করেই দেখিয়েছেন।

একটি বিশেষ ছবির কথা উল্লেখ করে আমরা জলচিত্র বিভাগের কথা শেষ করবো। প্রদর্শনী দেখবার সুযোগ যাঁদের ঘটেছে, তাঁরা নিশ্চয়ই এই ছবিখানাকে বিশেষ করে দেখে থাকবেন। এটি একখানা Portrait study (Pic. No. 251)। শিল্পী শ্রীযুক্ত আর, ভি গান্‌ভান্‌কার তাঁর মায়া-তুলির পরশে এমন অপূর্ব্ব ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন যে, দেখ্‌লে অবাক্ হ'য়ে দু'দণ্ড চেয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে।

আমাদের মনে হয়, গত সাত বছরের ভেতর এমন ছবি প্রদর্শনীতে খুব বেশী আসে নি। শুধু Portrait study হিসেবে দেখ্‌লে এই অপূর্ব্ব স্বষ্টির প্রতি অবিচার করা হয়। এ শুধু তুলির আঁকা ছবি নয়—শিল্পী যেন তার সঙ্গে জীবন্ত প্রাণটুকুও গেঁথে দিয়েছেন।

শিল্প বিভাগের সঙ্গে তুলনায় শিক্ষার্থীদের কাজ খুব ভালই হ'য়েছে বল্‌তে হ'বে।

এর ভেতর তরুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রঘোষ দস্তিদারের বাসি ফুল (Faded flower Pic. No. 447) খুব উচ্চাঙ্গের কাজ বলে মনে হ'ল। বাসি ফুলের সঙ্গে তুলনা করে শিল্পী বালবিধবার যে কল্পনা করেছেন—তা' একাধারে শিল্প ও কাব্যপ্রতিভার পরিচায়ক।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দত্তের দু'টী কাজ (প্রসাধন—চিত্র সংখ্যা ৩৫১ এবং দুপুরের গাল-গল্প—চিত্র সংখ্যা ৩৫৩) আমাদের খুব ভাল লেগেছে। ইনি এ বছর নিজের তৈল চিত্র এঁকে ছাত্র বিভাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার পেয়েছেন।

ছাত্র বিভাগের শ্রীযুক্ত বিমল মজুমদারের প্রাকৃতিক দৃশ্য-গুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহের ছবিগুলি আমরা বিশেষ করে উপভোগ করেছি। শিল্পীর চিন্তাধারা উন্নত এবং স্বষ্টি অপূর্ব্ব। তাঁর কোনো চিত্র পুরস্কৃত হতে দেখ্‌লে আমরা খুসী হ'তুম।

এই বিভাগের শ্রীযুক্ত বলাই বন্ধু রায়ের Study (No. 372) খুব উচু ধরণের কাজ হ'য়েছে। বাহুল্য (Details) বর্জ্জিত এই কাজটি আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

ভাস্কর্য্য বিভাগে শ্রীযুক্ত ভবেশ সান্যালের "নটরাজ" একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প-নৈপুণ্য!

বিজ্ঞাপন শিল্প বিভাগের Posterগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবারকার প্রদর্শনীর খানকয়েক উৎকৃষ্ট ছবির আলোক-চিত্র এই প্রবন্ধের সঙ্গে সন্নিবেশিত করা হ'য়েছে।

মূল চিত্রের সম্পূর্ণ রস উপভোগ করতে না পারলেও এ থেকে অনেকটা স্বাদ গ্রহণ করতে পারা যাবে।

শূন্য ঘরে

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

খেলা-ঘর পড়ে আছে নির্জ্জন আঁধারে,
কেহ নাহি পশে সেথা, শেফালির বনে
গন্ধ ভেসে চলে যায় আপনার মনে,
আকুল কামনা কারো না ফিরায় তারে।
নিরুদ্যম জ্যোৎস্না পাতে বিষণ্ণ শয়ন
গৃহের দুয়ারে, ল'য়ে গীতি-গন্ধ-হাসি
বাজায় না কেহ তার মরমের বাঁশি,
নীরবে ফিরিয়া যায় নামায়ে নয়ন!
ঘুমহারা তারা খোঁজে বিরাম-আলয়
কোমল নয়ন পাতে,—জাগে দুরাশায়!
কণ্ঠপথে বাক্য আসি রুদ্ধ হ'য়ে যায়,
উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া কহে এ নয় এ নয়!
সর্ব্বহারা মর্ম্মমূলে তপস্বী একাকী
জাগে প্রাণ,—ফিরে তারে বক্ষে পাবে না কি?

ধোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাণ-বাবু বেলা দ্বিপ্রহরে আপিসে গিয়েই দেখ্‌লেন দুজন অডিটর আপিসের সমস্ত হিসাবের খাতা নিয়ে অডিট কর্‌তে লেগে গেছে। এই ব্যাপার দেখেই তাঁর মুখ শুকিয়ে গেলো। থাকোহরির চুরি ধরা পড়া অনিবার্য্য; তাঁরও অপমান হওয়া অনিবার্য্য। তাঁর মনে হলো সমস্ত আপিস যেনো থমথম কর্‌ছে, সকলে যেনো তাঁর দিকে বার বার আড় চোখে তাকাচ্ছে। পরাণ-বাবু সঙ্কোচে কুণ্ঠায় অপ্রতিভ ভাবে চোরের মতন নিজের জায়গায় বস্‌তে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রামযাদু তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এসে মুখ খুব কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—সাহেবরা থাকোহরির চুরির খবর টের পেয়েছে কেমন ক'রে; তারা আপনাকে বল্‌তে বলেছে যে যে কদিন অডিট হবে সে কদিন আপনি আপিসে আস্‌বেন না···

পরাণ-বাবুর মুখ কালো হয়ে উঠ্‌লো, তিনি নীরবে একবার রামযাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চল্‌লেন; লজ্জায় অপমানে তাঁর উঁচু মাথা এমন হেঁট হয়ে গেলো যে তিনি আর কারো দিকে চাইতে পার্‌ছিলেন না। যেখানে তিনি এতোদিন সিংহবিক্রমে প্রভুত্ব করেছেন, সেখান থেকে অপদস্থ হয়ে বেরিয়ে যেতে তাঁর পা যেনো ভেঙে পড়্‌তে চাচ্ছিলো। তিনি কোনোমতে আপিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে গাড়ীতে চড়লেন, এবং অপমানের আতিশয্যে মুহ্যমান অচৈতনপ্রায় হয়ে ব'সে রইলেন।

রামযাদু পরাণ-বাবুকে চ'লে যেতে দেখেই সাহেবদের কাম্‌রায় গিয়ে ঢুক্‌লো এবং সাহেবদের সেলাম ক'রে বল্‌লে—পরাণ-বাবু আপিসে এসেছিলেন, অডিট হচ্ছে দেখে তিনি চ'লে গেলেন, বল্‌লেন সাহেবদের বোলো যতোদিন অডিট হবে ততোদিন আমি আপিসে আস্‌বো না।

সাহেবরা বল্‌লে—বেশ। তা হলে আজ থেকে আপনি আপিসের চার্জে থাক্‌বেন···

রামযাদু মাথা নত ক'রে হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম কর্‌বার ছলে তার পরিতোষের হাসি ঢাকা দিয়ে সাহেবদের কাছ থেকে স'রে পড়্‌লো এবং আপিসে ফিরে এসে পরাণ-বাবুর আসনে গিয়ে জেঁকে বস্‌লো।

পরাণ-বাবু নিজের বাড়ীতে ফিরে গিয়েও যেনো অপরাধ ধরা পড়ায় ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লেন, চাকর-বাকরদের দিকেও তাকিয়ে দেখ্‌তে তাঁর সাহসে কুলাচ্ছিলো না। ঘরে ঢুকে দেখ্‌লেন কৃষ্ণকলি ঘুমিয়ে পড়েছে। কন্যার দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই তাঁর বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস পড়্‌লো।

পরাণ-বাবু সেই ঘরে ব'সে একখানা চিঠি লিখ্‌লেন; নিজের উইলখানা বাহির ক'রে তাতে কিছু লিখ্‌লেন; তার পর টেলিফোন ধ'রে আপিসে রামযাদুকে ডাক্‌লেন।

রামযাদু টেলিফোনে সাড়া দিতেই তিনি বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি একবার দয়া ক'রে শীঘ্র আসুন; আমি দীর্ঘকালের জন্য খুব দূর দেশে চ'লে যাচ্ছি, আপনাকে আমার কিছু ভার দিয়ে যাবার আছে···

রামযাদু এই সংবাদ পেয়েই উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো,······ পরাণ-বাবু দীর্ঘকালের জন্য আপিসে অনুপস্থিত থাক্‌লে সেই আপিসের বড়ো বাবু হবে, এই কথা মনে হতেই সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লে—আমি এখনই যাচ্ছি, আপনার সকল ভার আমি নেবো, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কিছুদিন ঘুরে আসুন······

পরাণ-বাবু যে বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছেন এ কথা রামযাদু কাউকে বল্‌লে না; তার মনে হলো সে যদি পরাণ-বাবুকে কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাঠাতে পারে তা হ'লে সে সাহেবদের সহজেই বুঝিয়ে দিতে পার্‌বে যে পরাণ-বাবু তহবিল ভেঙে ফেরার হয়েছে। রামযাদু তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে সাহেবদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে চল্‌লো পরাণ-বাবুর বাড়ীর দিকে।

পরাণ-বাবু রামযাদুকে টেলিফোনে ডেকেই এসে ঘুমন্ত কৃষ্ণকলিকে একবার চুমু খেলেন ও তার মাথায় হাত রেখে

অনেকক্ষণ ধ'রে তাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। তার পর কৃষ্ণকলির বিছানার পাশে অপর একটি খাটের উপর শুয়ে তিনি একটা শিশি থেকে খানিকটা কিছু গলায় ঢেলে দিয়ে চোখ বুজলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত নেতিয়ে বিছানার উপর ঢ'লে পড়্‌লো।

রামযাদু যখন এসে সেই ঘরে ঢুক্‌লো তখন দেখ্‌লে পরাণ-বাবু আড়ষ্ট হয়ে বিছানার উপর প'ড়ে আছেন, তাঁর হাতে একটা শিশি······

এই অবস্থা দেখেই প্রথমে রামযাদুর মনটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো, মানুষের স্বাভাবিক পরার্থপরতা তাকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুল্‌লো······পরাণ-বাবু আত্মহত্যা করেছেন না কি? কী সর্ব্বনাশ! এই জন্যেই কি তিনি বল্‌ছিলেন যে তিনি দূর দেশে চ'লে যাবেন ···

রামযাদুর এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পরমুহূর্ত্তেই তার মনে হলো যে সে একা আত্মহত্যার ঘরে রয়েছে, সে না খুনের দায়ে প'ড়ে যায়। সে অম্‌নি চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—ওরে বোঁচা, ওরে কে কোথায় আছিস ছুটে আয় ·····

চাকরেরা দৌড়ে এলো, চেঁচামেচিতে কৃষ্ণকলির ঘুম ভেঙে গেলো; সে ঘরে লোক-সমাগম ও সকলের ব্যস্ততা দেখে সে ধড়মড় ক'রে উঠে বস্‌লো এবং হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে ফেল ফেল ক'রে তাকাতে লাগ্‌লো।

রামযাদু প্রথমেই একজন চাকরকে বল্‌লে—কৃষ্ণকলিকে এখান থেকে নিয়ে যাও······ওকে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াও গে······

কৃষ্ণকলিকে সরিয়ে নিয়ে যেতেই রামযাদু তাড়াতাড়ি পরাণ-বাবুর কাছে গিয়ে দেখ্‌লে যে পরাণ-বাবুর হাতের শিশিতে লেবেলে লেখা রয়েছে পোটাশিয়াম সায়ানাইড!

সেই কথা দুটো পড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে রামযাদুর বুক কেঁপে উঠ্‌লো—তা হ'লে আর কোনো আশা নেই······

তথাপি তখনই সে টেলিফোন ধ'রে পরাণ-বাবুর অনুগ্রহভাজন দু-তিন জন ডাক্তারকে ডাক দিলে এবং পুলিসেও খবর দিলে।

চাকরেরা জল পাখা নিয়ে এসেছিলো। রামযাদু তাদের দিকে ফিরে ম্লান মুখে বল্‌লে—আর ও-সব কি হবে, শেষ হয়ে গেছে······

চাকরেরা সেইখানে ব'সে প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

পরমুহূর্ত্তেই রামযাদু একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠ্‌লো, তার স্বার্থবুদ্ধি সচেতন হয়ে উঠ্‌লো। সে দেখ্‌লে পরাণ-বাবুর বালিশের পাশে একখানা খামের চিঠি আছে, তার উপরে তারই নাম লেখা এবং সেই চিঠির পাশে একখানা লেখা কাগজ খোলা প'ড়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি নিজের নাম-লেখা চিঠিখানা তুলে পকেটে ফেল্‌লে এবং খোলা কাগজখানার উপর একটু ঝুঁকে পড়্‌লে তাতে পরাণ-বাবু লিখে রেখে গেছেন যে তিনি পত্নীশোক ও অপমানের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আত্মহত্যা করেছেন।

এইবার রামযাদুর মুখের মলিনতা অনেকখানি কেটে গেলো। সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গেলো নিজের চিঠি পড়্‌তে। চিঠি খুলেই রামযাদু যেমন যেমন এক এক লাইন দ্রুত প'ড়ে যেতে লাগ্‌লো তেমন তেমন তার মুখ ক্রমশঃ উজ্জ্বল প্রফুল্ল উৎফুল্ল বিকশিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। পরাণ-বাবু সেই চিঠিতে লিখে রেখে গেছেন—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

প্রণামান্তে নিবেদনম্

মুখুজ্জে মশায়, আমি মহাযাত্রায় চলিলাম। পিতৃমাতৃ-হীনা বালিকা কৃষ্ণকলি রহিল, তাহাকে দেখিবেন। তাহার মাতার অঙ্গের যে অলঙ্কার রহিল, তাহার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা হইবে; সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলে হাজার পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যাইবে; ইহা হইতে কৃষ্ণকলির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা তাহার বিবাহের সময় তাহার যৌতুক হইবে। একটি শিক্ষিত সৎপাত্র দেখিয়া তাহাকে সম্প্রদান করিবেন।

আমার শেষ উইল আয়রন-চেষ্টের মধ্যে রহিল। তাহাতে আমি আপনাকে কৃষ্ণকলির অভিভাবক ও অছি নিযুক্ত করিয়াছি। আপনি ব্যতীত আমার হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় বন্ধু আর কেহ নাই। কৃষ্ণকলির মঙ্গলের জন্য সম্পত্তি বিক্রয় বন্ধক দিবার ক্ষমতা ও অধিকার আপনার রহিল।

আমার ঋণ কিছু নাই; দোকানদারদের পাওনা সব চুকাইয়া চলিলাম। যদি কাহারো বাকী থাকে তবে আয়রন-চেষ্টে যে নগদ দশ হাজার টাকা রহিল তাহা হইতে শোধ করিয়া দিবেন। ঐ টাকা হইতে আমার শ্রাদ্ধ করাইবেন—

বেশী ঘটা করিবেন না, কেবল কাঙালী ভোজন করাইলেই আমার সন্তপ্ত আত্মা তৃপ্ত হইবে।

আপিসের ঋণ শোধ করিবার জন্য মুলজী মাড়োয়ারীর কাছে বাড়ী বেচার দেড় লক্ষ টাকার চেক সই করিয়া আপিসে লইয়া গিয়াছিলাম, সাহেবদের দিবার অবসর পাই নাই; সেই চেক আপনার নামে এন্ডর্স্ করিয়া সই করিয়া রাখিয়া গেলাম; আপনি তাহা আপিসের হিসাবে জমা করাইয়া দিবেন।

আপনার উপর অনেক ভার চাপাইয়া গেলাম; আপনি পরোপকারী ধার্ম্মিক মহাশয় ব্যক্তি; আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই ভার গ্রহণ ও সম্পাদন করিবেন এই আশা সঙ্গে লইয়া গেলাম। আপনাকে মুখে কিছু বলিয়া যাইতে পারিলাম না; আপনি আমার মহাপ্রয়াণের আভাস পাইলে আমাকে বাধা দিতেন এই আশঙ্কায়।

যাহা মনে আসিল লিখিলাম। যাহা অনুক্ত রহিল তাহা আপনি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ও ধর্ম্ম অনুসারে করিবেন এই অনুরোধ।

কৃষ্ণকলি রহিল তাহাকে দেখিবেন।

পরলোকের যাত্রী
প্রণত
শ্রীপরাণচন্দ্র বিশ্বাস।

পত্র প'ড়েই রামযাদুর মুখ আনন্দিত হাস্যে একেবারে বিকশিত হয়ে উঠ্‌লো। পত্র পড়া শেষ হ'তে না হ'তে সে শুনতে পেলে বাড়ীর দরজায় মোটর-গাড়ী এসে থাম্‌লো। রামযাদু অম্‌নি তাড়াতাড়ি পত্রখানা জামার পকেটে পুরে মুখ ম্লান ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যে ঘরে পরাণ-বাবুর দেহ প'ড়ে আছে সেই ঘরে গেলো। একটু পরেই ডাক্তার এসে ঘরে ঢুক্‌লো এবং উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কী মুখুজ্জে মশায়! ব্যাপার কি?

রামযাদু কপালে করাঘাত ক'রে বল্‌লে—আর ব্যাপার কি? সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড!

ডাক্তার তাড়াতাড়ি গিয়ে পরাণ-বাবুর দেহ পরীক্ষা কর্‌তে প্রবৃত্ত হলো। অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—হোপ্‌লেস্···ডেড্ অ্যাণ্ড্ গন্··

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরো তিন জন ডাক্তার এলো; থানার দারোগা, ডেপুটি কমিশনার অফ্ পুলিশ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, করোনার প্রভৃতিতে ঘর ভ'রে গেলো। সবাই দেখে শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—এ ক্লিয়ার কেস্ অফ্ সুইসাইড্!

রামযাদু মুখ বিষণ্ণ করে বল্‌লে—আপনারা একটা সার্টিফিকেট দিয়ে যান ··এতো বড়ো মানী লোকটাকে মর্গে নিয়ে যেতে যেনো না হয়······

সকলে একবাক্যে ব'লে উঠ্‌লো—অফ্ কোর্স্······ অবশ্য ·····

রামযাদু সার্টিফিকেট সংগ্রহ ক'রে পরাণ-বাবুর শব শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর্‌তে ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লো। এতো সব লোক বাড়ীতে অধিকক্ষণ থাকে এ তার পছন্দ হচ্ছিলো না।

*　　*　　*　　*

পরাণ-বাবুর সৎকারের পর বাড়ী ফিরে গিয়ে রামযাদু মনমোহিনীকে বল্‌লে—মনো, মা অন্নপূর্ণার কৃপাতে আমাদের অন্নের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরাণ তো প্রাণত্যাগ কর্‌লেন এখন কালপেঁচী মেয়েটা সর্‌লেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।

মনমোহিনী বল্‌লে—আহা কচি মেয়ে, এসে অবধি কেবলই বাবা বাবা ব'লে কাঁদ্‌ছে ··ওর কি আপনার লোক কেউ নেই?

রামযাদু বল্‌লে—ওর মার কেউ কোথাও ছিলো না; অনাথ মেয়ে দেখে পরাণের বাবা দয়া ক'রে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন; পরাণের নিজের লোক কেউ থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে ·····পয়সা থাক্‌লে আপনার লোকের অভাব হয় না··· পয়সার লোভে আত্মীয়তার দাবী কর্‌তে কেউ না কেউ আস্‌বে ··কিন্তু পরাণের উইলে আমি কৃষ্ণকলির সম্পত্তির অছি নিযুক্ত হয়েছি ··যদি কেউ আত্মীয়তা দাবী কর্‌তে আসেন, কৃষ্ণকলিকে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু সম্পত্তি না ··সম্পত্তি ডবল-ব্যারেল বন্দুক·বিক্রীর খত আর উইল—দিয়ে আমি রক্ষা কর্‌বো ··

মনমোহিনী গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—তা বেশী লোভ কর্‌তে গিয়ে বিপদে প'ড়ো না যেনো···যা রয় সয় তাই ভালো······

রামযাদু বল্‌লে—কিছু ভয় নেই রে ক্ষেপী! রামযাদু সব আটঘাট বেঁধে কাজ করে ··

রামযাদু পরাণ-বাবুর বাড়ীর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি তুলে

নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসেছে, একদিনও বিলম্ব করে নি। পাছে পুরাতন চাকরেরা থাকলে তারা পরাণ-বাবুর সম্পত্তির সাক্ষী হয়ে থাকে এবং কৃষ্ণকলিকে জানিয়ে দেয় যে তার বাবার কী ঐশ্বর্য্য ছিলো, তাই রামযাদু পরাণ-বাবুর ভৃত্যদের বিদায় ক'রে দিয়েছে; বিদায় দিবার সময় সে তাদের বলেছে—বাবু তো দেনায় ডুবে আত্মহত্যা করলেন; বাবুর মেয়ে তো এখন আমার ঘাড়েই পড়লো, আমি বাবুর নিমক খেয়েছি, আমি তো আর ওকে ফেলতে পারবো না, আমরা খেতে পরতে পেলে কৃষ্ণকলিও খেতে পরতে পারবে; তা ছাড়া মেয়ের বিয়েও তো আমাকেই দিয়ে দিতে হবে...বাবু তো এক পয়সাও রেখে যান নি...কিন্তু আমার তো এমন অবস্থা নয় যে তোমাদের সকলকে আমি রাখি, তোমরা এখন এসো গে, পরে দরকার হ'লে তোমাদের খুঁজে ডেকে নেবো, তোমরা হ'লে পুরোনো বিশ্বাসী চাকর...তোমাদের আমি অমনি ছাড়িয়ে দিতে পারবো না, তোমাদের আমি এক বছরের মাইনে দিয়ে বিদায় দেবো...আমার যতোক্ষণ এক পয়সা আছে ততোক্ষণ বাবুর বদনাম হ'তে দেবো না......

চাকরেরা চোখের জল মুছতে মুছতে ও রামযাদুর বদান্য সদাশয়তার প্রশংসা শতমুখে প্রচার করতে করতে বিদায় হয়ে চলে গেছে।

তার পর রামযাদু মূলজী শেঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাকে বললে—শেঠজী, পরাণ-বাবু তো তার বাড়ীঘর সব কিছু আগেই আমাকে বিক্রী ক'রে চুকেছিলেন; আরও টাকার দরকার হওয়াতে আমাকে বললেন—দেখুন মুখুজ্জে মশায়, আমার আরও পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার দরকার হয়েছে, আপনি যদি ধার দিতে পারেন.....আমার কাছে অতো টাকা কোথায় যে আমি ধার দেবো? তখন আমি আমার নিজেরই কেনা বাড়ী আপনার কাছে বন্ধক রেখে পরাণ-বাবুকে টাকা জোগাড় ক'রে দিলাম। তা পরাণ-বাবু তো আত্মহত্যা ক'রে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা মেরে চ'লে গেলো। আমি যখন মধ্যস্থ হয়ে আপনার কাছ থেকে টাকা দিইয়েছি, তখন ও-টাকার জন্যে আমিই দায়ী, যদিও আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে ফাঁকি দিতে পারতাম...আপনার টাকাটা আপনি বুঝে নিন...কিন্তু কিছু কম নিতে হবে শেঠজী.....কিছু লোকসান আপনারও হোক,' কিছু আমারও হোক......

মূলজী মাড়োয়াড়ী রামযাদুর কথা শুনে কিছু বলতে যাচ্ছিলো—হামি.....

কিন্তু মূলজীর বাক্যের উপক্রমেই রামযাদু বাধা দিয়ে বললে—বেশী ছাড়তে বলছি না...দশ হাজার...মকদ্দমা মামলা করতেও তো খরচ আছে......

মূলজী ব'লে উঠলো—এ ক্যা বাত বাবুজী! আপকো বিস্‌ওয়াস্ করকে হামি রূপেয়া দিলো...

রামযাদু অমনি বললে—আপনার আপত্তি থাকে আমি জেদ করবো না, আমি যখন মধ্যস্থ হয়েছিলাম, তখন আমিই দায়ী, আমার এক পয়সা থাকতে আমি কাউকে ফাঁকি দিতে পারবো না...আচ্ছা আপনার টাকা নিন, কেবল সুদটা ছেড়ে দিন...

মূলজী সন্তুষ্ট হয়ে বললে—আচ্ছা সো হামি ছাড়িয়ে দেলো...পান শও রূপেয়া তো......

রামযাদু পরাণ-বাবুর আপিসের ঋণ শোধের জন্য সংগৃহীত টাকা থেকে মূলজীর ঋণ শোধ ক'রে দিলে এবং পাঁচ শত টাকা সুদ বাঁচিয়ে লাভ ক'রে যথালাভের আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

কিন্তু রামযাদুর লাভ পাঁচ শত টাকার চেয়ে ঢের বেশী হয়ে গেলো...রামযাদুর বরাত-জোর। রামযাদু যে নিজের টাকা দিয়ে পরাণ-বাবুর ঋণ শোধ করে দিচ্ছে এই খোসনাম শীঘ্রই শহরময় রাষ্ট হয়ে গেলো; বাজারে তার ক্রেডিট দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। খবরের কাগজে রায় বাহাদুর রামযাদু মুখুজ্জের প্রশংসা বিঘোষিত হতে লাগলো।

পরদিন রামযাদু আপিসে গিয়ে সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, সাহেবেরা বললে—পরাণ-বাবু আত্মহত্যা করলেন, বড়োই দুঃখের কথা! তিনি যদি আমাদের বলতেন তা হ'লে আমরা তাঁকে ঋণ শোধ করবার দীর্ঘ সময় দিতাম, তিনি ক্রমে ক্রমে শোধ ক'রে দিতেন... তা ছাড়া বাস্তবিক এ ঋণ তো তাঁর নয়, যদিও তাঁর জামিনের জন্য তিনি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী ছিলেন...

রামযাদু মুখ বিষম মলিন ক'রে বললে—বড়োই দুঃখের কথা। আমাকেও যদি ঘুণাক্ষরে আগে জানাতেন, আমি আমার সর্ব্বস্ব বেচে বন্ধক রেখে তাঁকে টাকা জোগাড় ক'রে দিতাম......

সাহেবেরা খুশী হয়ে বললে—আপনার মতন বিপদের বন্ধু

পাওয়া বড়ো সৌভাগ্যের কথা রায় বাহাদুর! আমরা কাগজে দেখ্‌লাম, আপনি পরাণ-বাবুর অনেক ঋণ শোধ করে দিয়েছেন, চাকরদের বক্‌সিস দিয়ে বিদায় দিয়েছেন, অনাথা মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছেন! ধন্য আপনি!

রামযাদু মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—আমি প্রশংসা পাবার যোগ্য কিছুই করি নি; আমার যা কিছু সবই পরাণ-বাবুর··আপনারা যদি বলেন তা হলে আপিসের ঋণটাও .....

সাহেবেরা উৎফুল্ল হয়ে ব'লে উঠ্‌লো—না না, সে আপনাকে দিতে হবে না; আমরা পরাণ-বাবুর কর্ম্ম-কুশলতায় অনেক রকমে অনেক লাভ করেছি, দেড় লাখ টাকা তাঁর নামে আমরা খরচ লিখে দিয়েছি...তা ছাড়া প্রভিডেণ্ট্‌ ফাণ্ডে তাঁর কিছু টাকা আছে·····থাকো-হরিটাকে গেরেপ্তার কর্‌তে পার্‌লে তার কাছ থেকেও কিছু আদায় হবে·····সে যাই হোক, আপনার সদাশয় প্রস্তাবের জন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ রায় বাহাদুর···আজ থেকে আপনিই আপিসের বড়ো-বাবু নিযুক্ত হলেন রায় বাহাদুর···

রামযাদু অবনত হয়ে সেলাম করে প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—আমার উপর আপনাদের অসীম অনুগ্রহের উপযুক্ত হতে আমি চেষ্টা কর্‌বো······

রামযাদুর মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণ হলো, তার জীবন-তরণী অনুকূল পবনে লাভের বাণিজ্যে যে বন্দরেই ভিড়্‌ছে সেখানেই তার ধুলা-মুঠা ধরতে সোনা-মুঠা হয়ে উঠ্‌ছে।

কয়েক দিন পরে এক ব্যক্তি এসে রামযাদুকে বল্‌লে—আমি পরাণ-বাবুর ভাইপো···আমি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী······

রামযাদু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—সম্পত্তি রেখে ম'রে গেলে অনেক ভাইপো জোটে। বেশ, ভাইপো মশায়, পরাণ-বাবুর সম্পত্তির মধ্যে আছে একটি খাঁদা কালো-কুচ্ছিত মেয়ে, স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন, আর কুল্লে লাখ দুই টাকা ঋণ, যা আমি শোধ ক'রে দিয়েছি, সেটাও নিয়ে গেলে আমি সুখী হবো, বুঝ্‌ছেন তো আজ-কালকার দিনে অতোগুলো টাকা······

সে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠ্‌লো—আপনি প্রবঞ্চনা কর্‌ছেন·····

রামযাদু রুষ্ট না হয়ে হেসে বল্‌লে—বেশ, তা হ'লে আমার দারোয়ানকে ডাক্‌বার আগে আপনি রাস্তা দেখুন··· আদালতের দরজা তো খোলা আছে···ষ্ট্যাম্পকাগজের দাম ট্যাঁকে না থাকে, আমি দিয়ে দিচ্ছি······

এই ব'লে রামযাদু পকেট থেকে একমুঠো টাকা তুলে ভাইপোর দিকে ছড়িয়ে ফেলে দিলে।

পরাণ-বাবুর ভাইপো হ'তে অভিলাষী লোকটি একে-বারে নরম হয়ে গিয়ে বল্‌লে—আপনি রাগছেন কেনো? আপনারা বড়ো লোক, আপনাদের সঙ্গে কি আমরা মামলা-মকদ্দমা করতে পারি? তবে আমার যেটা ন্যায্য পাওনা··

রামযাদু ঈষৎ হেসে বল্‌লে—আপনার ন্যায্য পাওনা হচ্ছে, পরাণ-বাবুর ঋণ আর তাঁর মেয়েটি·····তা আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন, আমার একটুও আপত্তি নেই··কিন্তু পরাণ-বাবুর উইল চিঠি দলিল সব আমার কাছে আছে, আপনি কৃষ্ণকলিকে অবলম্বন ক'রেও আমাকে কাবু কর্‌তে পারবেন না·····

তখন সেই লোকটি মুখ শুষ্ক ক'রে উঠে চ'লে যেতে যেতে ব'লে গেলো—আমি কাল আবার আস্‌বো, আপনি একটু ভেবে দেখবেন ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ আমি কিছু পেতে পারি কি না·····

রামযাদু বল্‌লে—ধর্ম্ম আর ন্যায় আপনার দিকে কিছুমাত্র অনুকূল থাক্‌লে পরাণ-বাবু তাঁর উইলে আপনার নাম উল্লেখ কর্‌তে ভুল্‌তেন না।

এর পরে আর কোনোদিন সেই লোকটি রামযাদুকে দেখা দিয়ে বিরক্ত করতে আসে নি। রামযাদুও অতি শীঘ্র অনায়াসে পরাণ-বাবুর সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ ও আয়ত্ত ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌লো।

কিন্তু এর অল্প পরেই আর একটি ক্ষুদ্র উপদ্রব এসে রামযাদুর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটাবার উপক্রম কর্‌লে। সত্যদাস রামযাদুকে বল্‌লে—পরাণ-বাবুর কোন্ বিক্রী-কবালায় আমি নাকি সাক্ষী আছি?

রামযাদু হেসে বল্‌লে—তোমার স্মৃতি-শক্তি এতো ক্ষীণ! দলিলে সই ক'রেছিলে মনে নেই······

সত্যদাস বল্‌লে—সে তো আপনি ব'লেছিলেন 'আমার পাব্‌লিশারের সঙ্গে একখানা বইয়ের রয়্যালটির লেখাপড়া হবে, তাতে তুমি একটা সাক্ষীর স্বাক্ষর করে দাও।' আমি

আপনার কথায় বিশ্বাস ক'রে শাদা ষ্ট্যাম্পকাগজে সই ক'রে দিয়েছিলাম।

রামযাদু আশ্চর্য্য হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লে—তুমি কারো কাছে টাকা খেয়ে উৎপাত তুল্‌তে এসেছো নাকি ?

সত্যদাস বল্‌লে—টাকা আমি আপনারই খেয়েছি, কিন্তু ধর্ম্মের মাথা খেতে পারি নি···যদি দরকার হয় তবে আমি সত্য কথা বল্‌বো তাই আপনাকে ব'লে রাখছি .....

রামযাদু চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়ে বল্‌লে—আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে তোমার কি ভালো হবে ?

সত্যদাস নম্রস্বরেই বল্‌লে—শত্রুতা আমি কর্‌ছি না ; সত্য আমি গোপন কর্‌বো না ; তাতে আপনি রাগ কর্‌লে কি কর্‌বো ?

রামযাদু চোখ রাঙিয়ে বল্‌লে—তোমার চাকরী, কবিত্বের যশ কার হ'তে ?

সত্যদাস বিনীতভাবে বল্‌লে—কিন্তু সে সবের চেয়েও সত্য বড়ো···আমার বাবা আমার নাম রেখেছিলেন সত্যদাস······

রামযাদু এ কথার উত্তরে কেবল বল্‌লে—আচ্ছা !

সেইদিনেই রামযাদু আপিসে গিয়ে সত্যদাসকে এক মাসের নোটীসের বদলে একমাসের মাইনে আগাম দিয়ে বল্‌লে—তোমাকে আর বিশ্বাস নেই তুমি পথ দেখো ; আমার বাড়ীতেও আর তোমার থাকা হবে না······

সত্যদাস নম্রভাবে নমস্কার করে বল্‌লে—যে আজ্ঞে······

সত্যদাস যখন আপিস থেকে বেরিয়ে যায় তখন তার সহকর্ম্মীরা চুপিচুপি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বড়ো-বাবু চট্‌লো কিসে ?

সত্যদাস হেসে ব'লে গেলো—আমাকে আর বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছেন না ····

সকলে বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো—একা থাকোহরি চুরি ক'রে সকলের উপরই অবিশ্বাস টেনে দিয়ে গেছে ! ছোঁড়া কী সর্ব্বনাশই না করে গেলো · —

পরদিন রামযাদু অনেক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে—

চুরি ! চুরি ! চুরি !

সত্যদাস দত্ত নামে এক ব্যক্তি আমার বাড়ীতে থাকিতো ; তাহার অসৎচরিত্র মিথ্যাবাদিতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য তাহাকে চাকরী হইতে বর্‌খাস্ত করা হইয়াছে ; সে যাইবার সময় আমার লেখা বহু কবিতার খাতা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ; সে হয় তো আমার ছদ্মনাম রামশর্ম্মা ব্যবহার করিয়া অথবা নিজেরই নামে ঐসব কবিতা সাময়িক পত্রে অথবা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে ; কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই আমার কবিতার ষ্টাইল দেখিয়াই চিনিতে পারিবেন যে সেগুলি চোরাই মাল। ঐ ব্যক্তি আমার শত্রুতা সাধনের জন্য অন্যবিধ চেষ্টাও করিতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই তাহার পরিচয় দিয়া রাখিলাম। শ্রীরামযাদু মুখোপাধ্যায়

সত্যদাস সেই বিজ্ঞাপন প'ড়ে হতাশার হাসি হেসে আপন মনে বল্‌লে—কবি বলে পরিচিত হবার সখ ছিলো ; যা লিখে প্রকাশ করেছি তাতে সুখ্যাতি পেয়েছে রামযাদু ; এখন তো প্রকাশের পথও বন্ধ হলো ; নিজের জিনিস এখন আমার চোরাই মাল ! ধন্য রামযাদুর মহিমা ! ধন্য তার কপাল !

"আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি,
এই ছিল মোর ঘটে !
তুমি মহারাজ, সাধু হ'লে আজ,
আমি আজ চোর বটে !" (ক্রমশঃ)

প্রচ্ছদপট-পরিচয়

রাজা দিগম্বর মিত্র সি-এস-আই

ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগকে এদেশে নবযুগ বলা যাইতে পারে। সে যুগে যাঁহারা প্রথম ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়া যুগান্তরের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র সি-এস-আই মহোদয় তাঁহাদের অন্যতম। তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেরই জীবনী ও রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর সমালোচনা ও বাদানুবাদ বাঙ্গলা সংবাদ ও সাময়িক পত্রে যে পরিমাণে হইয়া থাকে, রাজা দিগম্বর মিত্র সম্বন্ধে তাদৃশ আলোচনা হইতে দেখি না ; অথচ বাঙ্গলা

দেশে তাঁহার অবদান অপর কাহারও অপেক্ষা অল্প নয়। আজ আমরা ভারতবর্ষের প্রচ্ছদপটে তাঁহার ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্র মুদ্রণের এবং তাঁহার জীবনী সমালোচনার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

দিগম্বর মিত্র কলিকাতার সন্নিহিত কোন্নগরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরবাটী মিত্র-বংশসম্ভূত। ইংরেজী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মতিথি সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই জানিবার উপায় নাই—তাঁহার ঠিকুজী-কোষ্ঠীখানি দৈব দুর্ব্বিপাকে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দিগম্বরের পিতামহ রামচন্দ্র মিত্র তৎকালীন টেলর কোম্পানীর কর্ম্মশালায় কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র—শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ। টেলর কোম্পানী পরে লেবার্ণ কোম্পানী নামে কার্য্য করিতে থাকেন। রামচন্দ্রের তিন পুত্রই এই কোম্পানীর আপিসে কার্য্য করিয়াছিলেন। দিগম্বর শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র।

দিগম্বরের শৈশব কাল কোন্নগরে অতিবাহিত হয়। সেখানকার গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় কিছুদিন বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া দিগম্বর দশম বর্ষ বয়সে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক গোলদীঘির দক্ষিণে অবস্থিত স্কুল সোসাইটীর বিদ্যালয়ে—যাহা পরে হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত হইয়াছে—ভর্ত্তি হন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে একই দিনে দিগম্বর মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী এই বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে রামতনু ও দিগম্বর গোলদীঘির উত্তর দিকে হিন্দুকলেজে মিঃ ডিরোজিওর ক্লাসে ভর্ত্তি হন। ডিরোজিওর ছাত্রগণ যে কি ভাবে শিক্ষা লাভ করিতেন, তাহার বহু আলোচনা বঙ্গ-সাহিত্যে হইয়া গিয়াছে; এখানে তাহার পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র। বস্তুতঃ ডিরোজিওর প্রত্যেক ছাত্রই তাঁহার শিক্ষা গুণে কালে এক একজন এক এক স্বনামধন্য মহারথী হইয়া মান সম্ভ্রম-যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে দিগম্বর হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন।

কলেজে ছাত্রাবস্থায় দিগম্বরের বিবাহ হয়। কলেজ ত্যাগের পর তিনি মুর্শিদাবাদে নিজামত স্কুলে শিক্ষকতা করিতে গমন করেন। কিন্তু স্কুলমাষ্টারী তাঁহার ভাল না লাগায় তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ও কলেক্টারের হেডক্লার্কের পদ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজসাহীতে চলিয়া যান। কিন্তু ছয়মাসের মধ্যেই তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসেন। সম্ভবতঃ এখানে তিনি মুর্শিদাবাদের কলেক্টারের আপিসে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। এখানে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে তিনি এরূপ দক্ষতা অর্জ্জন করেন, যাহার ফলে উত্তর কালে তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বহরমপুরের দেশীয় পদাতি সেনাদলে ক্লার্কের কার্য্য গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের বেনিয়ান অথবা ব্যক্তিগত দেওয়ান কান্তবাবুর কাশীমবাজার জমিদারীর উত্তরাধিকারী রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের এষ্টেটের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হন। তবে প্রথম কয়েক বৎসর তিনি রাজার ম্যানেজারী অপেক্ষা ব্যক্তিগত সহচর ভাবেই কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্য সূত্রে তিনি জমিদারী পরিচালনে অসাধারণ দক্ষতা অর্জ্জন করেন। দিগম্বরের চেষ্টায় জমিদারীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। রাজা কৃষ্ণনাথ দিগম্বরের পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ এক লক্ষ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। দিগম্বর কিন্তু দীর্ঘকাল এই পদে কার্য্য করিতে পারেন নাই—কয়েক বৎসর মাত্র কার্য্য করিবার পর তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জমিদারীর ম্যানেজারী তাঁহার শেষ চাকুরী। অতঃপর চাকুরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দিগম্বর বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে রেশম ও নীল বাঙ্গলার প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য ছিল। তিনি বিলাতী প্রথায় নীল প্রস্তুত করিবার জন্য মালদহ জেলায় ফ্যাক্টরী স্থাপন করিলেন। সাহেব নীলকরদিগের ন্যায় তিনি চাষীদিগের উপর জুলুম জবরদস্তী অত্যাচার করিতেন না বলিয়া তাঁহার ফ্যাক্টরীতে কম লাভ হইত। তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। নীলের সঙ্গে সঙ্গে রেশমের কাজও আরম্ভ হইল। ক্রমে রেশমের কারখানা বহু-বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কিন্তু মধ্যে একবার বাজারের অবস্থা মন্দা হওয়ায় তাঁহাকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তিনি নীলের ব্যবসায় তুলিয়া দিয়া কেবল রেশমের ব্যবসায় আরও কিছুদিন চালাইয়াছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দিগম্বর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত লাট দেবীপুর জমিদারী ক্রয় করেন। তৎকালে বঙ্গদেশে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটী নামে একটি জমিদার সভা এবং বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে একটি রাজনীতিক সভা ছিল। অনেক ব্যক্তি উভয়

সভারই সদস্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ ছুইটি সভার পরিবর্ত্তে উভয়কে সম্মিলিত করিয়া একটি সভায় পরিণত করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। তাঁহাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ছুইটি সভা সম্মিলিত হইলে অতি প্রভাবশালী একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারিবে। তাঁহারা অপরাপর সদস্যগণের নিকট তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিলে সকলেই এরূপ মিলনের অনুমোদন করেন। তদনুসারে উভয় সভা মিলিত হইয়া বর্ত্তমান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে পরিণত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার সভাপতি, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব প্রতিনিধি সভাপতি (ভাইস-প্রেসিডেণ্ট), বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক এবং বাবু দিগম্বর মিত্র সহকারী সম্পাদকের পদে নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। অতঃপর পুনরায় কোম্পানীকে ঐরূপ অধিকার দেওয়া হইবে, কিম্বা তাহা রহিত করা হইবে, এই বিষয় লইয়া বিলাতে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বহু লোক একচেটিয়া অধিকার রহিত করিবার পরামর্শ দিতেছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অধিকার রহিত করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া বিলাতের কমন্স সভায় আবেদন প্রেরণ করেন। দিগম্বরের জীবনী-লেখক বলেন, এই আবেদন-পত্র হিন্দু পেটরিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে দিগম্বর মিত্রই রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পর হইতে দিগম্বর মিত্র মহাশয় সাধারণের কার্য্যে অবতীর্ণ হ'ন। এই সময়ে দেশের শাসন ব্যাপারে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। প্রধানতঃ একটি বিষয় সাধারণের আলোচ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ-স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তি দেশের আইন এমন ভাবে রচনা করিবার পরামর্শ দিতেছিলেন, যাহাতে দেশীয় লোক ও ইয়োরোপীয়গণ সমভাবে আইনানুসারে পরিচালিত হন। কিন্তু এই সাম্যভাব ইয়োরোপীয়গণের অনুমোদিত ছিল না। তাঁহারা তীব্রভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। সাম্যভাবের প্রবর্ত্তক কয়েকটি আইন প্রণীত হইয়াছিল; কিন্তু ইয়োরোপীয়গণের প্রবল প্রতিবাদে তাহার কার্য্য স্থগিত হয়। অবশেষে মেকলে প্রণীত দণ্ডবিধি আইন, এবং নবরচিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন ব্যবস্থাপক সভায় বিচারার্থ উপস্থাপিত হইলে ইয়োরোপীয়েরা তাহার প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদের উত্তরে বঙ্গের তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ টাউন হলে সমবেত হইয়া একটি প্রতিবাদ সভার অধিবেশন করেন। এই সভায় কয়েকজন উদার-প্রকৃতি ইয়োরোপীয়ও যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে এই সভায় চারিজন মিত্র—বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র বক্তৃতা করেন। একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতে গিয়া দিগম্বর মিত্র যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা যেমন যুক্তিপূর্ণ ও সরস, তদ্রূপ সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

এই সময় বরাবর ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ফলে কোম্পানীর কাগজের দর শতকরা ৩০ টাকার উপর কমিয়া যায়। বাবু দিগম্বর মিত্র এই সময়ে প্রচুর কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করেন। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে এই সকল কাগজের দর পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় দিগম্বর বিলক্ষণ লাভবান হন।

আজ যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য করদাতাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে, ১৮৬০।৬১ খৃষ্টাব্দে দিগম্বর মিত্রের চেষ্টায় তাহার সূত্রপাত হয়। তৎকালে কলিকাতা সহর ছয়ভাগে বিভক্ত ছিল। দিগম্বর প্রত্যেক বিভাগ হইতে একজন করিয়া করদাতাদের প্রতিনিধি লইয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই মর্ম্মে একটি আইন পাশ হইয়াছিল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে (সন ১২৬৭ সাল) মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদবধ" কাব্য বিরচিত হইলে দিগম্বর উহার প্রথম সংস্করণের মুদ্রাঙ্কনের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন। মাইকেল এজন্য উক্ত গ্রন্থের "মঙ্গলাচরণে" দিগম্বরের "উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পূর্ব্বক" গ্রন্থখানি দিগম্বরের "শ্রীচরণে সমর্পণ" করেন।

এই সময়ে বাঙ্গালাদেশে এক প্রকার জ্বরের আবির্ভাব হয়। এই জ্বরে ছুই চারি দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। জ্বরের প্রাদুর্ভাব এত বেশী হইয়াছিল যে অল্প সময়ের মধ্যেই বহুলোক কালগ্রাসে পতিত হয়। লোকে ইহার নাম দিয়াছিল "নতুন জ্বর"; কারণ, পূর্ব্ব পরিচিত সকল প্রকার জ্বর হইতে এই নূতন জ্বরের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ ছিল। জ্বরে মৃত্যু-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ায় ইহার কারণ

ছিল। দেখিলাম তাহাতে বৃষ্টির জল জমিয়া আছে। সেই জলে তাড়াতাড়ি স্নান সারিলাম—তখন দেখি আপত্তিকারী নলিনী বাবু এবং অপর সকলেই সেই জলটুকুতে স্নান করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। একজন বলিলেন জলের মধ্যে পোকা

প্রস্থিনগর—"সাতমহল-প্রাসাদ"

প্রস্থিনগর—"গল-বিহার"

বিজ্ বিজ্ করিতেছে; কিন্তু তাহাতেও কাহারও স্নান বন্ধ থাকিল না। যাই হৌক, চটপট্ জলযোগ করিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। এই যাত্রী-নিবাসটি (Pilgrim's Rest) ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সেখানকার খৃষ্টান অধিবাসী মিঃ পেড্রিস (Mr. Pedris) ও তাহার পত্নী তাঁহাদের অষ্টাবিংশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রের অকাল-মৃত্যুর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমরা সেই যাত্রী-নিবাসেই একজন গাইড্ পাইলাম। সে হিন্দি ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী বলিতে পারে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থিনগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিবার জন্য গাড়ীতে উঠিলাম।

অনুরাধাপুর হইতে প্রস্থিনগর ৬৫ মাইল। সেখানে যখন সিংহলের রাজধানী ছিল, সে সময় এখানে রাজার একটি উদ্যান-বাটী ছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি এখানে আসিয়া বাস করিতেন। তামিলগণ পুনঃ পুনঃ অনুরাধাপুর আক্রমণ করিয়া যখন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, তখন এটী দ্বিতীয় রাজধানীর ন্যায় ব্যবহৃত হইত। বহিঃ শত্রুর আক্রমণ এবং অন্তর্বিপ্লব অনুরাধাপুরের অধঃপতনের প্রধান কারণ। রাজধানীর বহির্ভাগে তামিলগণ শিকড় গাড়িয়া বসিয়া ছিল; আর ভিতরে গৃহ বিবাদ লাগিয়া ছিল। রাজবংশের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রাজা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় ষড়যন্ত্র, গুপ্ত-হত্যা, পরস্পর রেষারেষি ও বিদ্বেষ ভাব পুরামাত্রায় চলিতেছিল। সিগ্‌রী দুর্গনির্ম্মাতা পিতৃহন্তা কাশ্যপের আমলে গৃহ-বিবাদ খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী সিংহলে রক্তারক্তি ও অরাজকতার ইতিহাস। এই কাল মধ্যে দ্বাদশ জন নৃপতি ও কত লোক যে নিহত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা ছিল না। খুন জখম তো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে ছিল। এই অরাজকতার যুগে বহু শান্তিপ্রিয় লোক প্রাণ ভয়ে দেশত্যাগী হইয়াছিল, কৃষি-কার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। জল-সেচন-প্রণালী, অট্টালিকা ও মন্দিরাদি সংস্কারাভাবে নষ্ট হইতেছিল। রাজশক্তিও ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। বহিঃশত্রুর তো এই সুবর্ণ সুযোগ। তামিলগণ এত দিনে সফলকাম হইল। তাহারা রাজধানী অনুরাধাপুর দখল করিয়া ফেলিল। অনন্যোপায় হইয়া তদানীন্তন রাজা প্রস্থিনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। তামিলগণ বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিল। তাহাদের হাতে পড়িয়া বৌদ্ধ কীর্ত্তি সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। যাহা কিছু মূল্যবান বস্তু ছিল সব অপহৃত হইল। বুদ্ধ-মূর্ত্তি নিগৃহীত, পুরোহিতগণ নির্য্যাতিত ও মন্দির-চূড়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অনুরাধাপুরের অধঃপতন এবং প্রস্থিনগরের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়। অত্যাচারে, অনাচারে ও অবহেলায় কালক্রমে অনুরাধাপুরের বিরাট কীর্ত্তিগুলি ধ্বংস-স্তূপে পরিণত এবং নিবিড় জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন হইল। প্রস্থিনগর অনুরাধাপুর হইতে অনেকটা দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তামিলগণ অনুরাধাপুর লইয়াই তুষ্ট ছিল; সে দিকে আর ঘেঁসে নাই। এক শতাব্দী কাল শান্তির সুযোগে প্রস্থিনগর সমৃদ্ধি-শোভমান নগরীতে পরিণত হয়। নব নগরী বহু রাজ-সৌধ, দেব-দেউল, বিহার, প্রমোদ-কানন, কৃত্রিম হ্রদ প্রভৃতিতে পরিশোভিত হয়। এত দিন পরে তামিলগণ প্রস্থিনগরের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিচলিত হইল, সেদিকে লোলুপ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা মধ্যে মধ্যে প্রস্থিনগর আক্রমণ করিতে লাগিল। সিংহলী রাজা যখন বিক্রমশালী হইতেন, তাহাদের গতিরোধ করিতেন; কিন্তু দুর্ব্বল হইলে শত্রুর হস্ত হইতে নাগরিকগণ নিষ্কৃতি পাইতেন না; তাঁহাদের লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। লুট-তরাজ, খুন-জখম অবাধে চলিত; রাস্তা-ঘাট নররক্তে অনুরঞ্জিত হইত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে সিংহলীগণ আবার মাথা তুলিয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে এক জন প্রকৃত বীরের অভ্যুদয় হয়। রাজা পরাক্রম বাহু সিংহলের প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করেন। তাঁহার রাজ্য হইতে তামিলগণকে বিদূরিত করিয়া, অপর সব ছোট-বড় রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করাইয়া তিনি স্বয়ং সমগ্র দ্বীপের অধিপতি হন। তাঁহার বিজয়-বাহিনী দিগ্বিজয় করিয়া, সিংহলের গৌরব-কিরীট মহিমান্বিত করে। "মহাবংশে" লিখিত আছে যে পরাক্রম বাহু যৌবনে যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিজ্ঞান, আইন-কানুন, ধর্ম্মকর্ম্ম, ন্যায়, চিকিৎসা-শাস্ত্র, কবিতা ও গীত-বাদ্যে অসাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি অশ্বারোহণ, তরবারি-সঞ্চালন এবং তীর-ধনু প্রয়োগে অশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন, প্রকৃতি-পুঞ্জের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করেন। তিনি রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমেই মন্ত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আমার রাজ্যের অতিশয় দুরবস্থা হইয়াছে।

তাহার প্রতিকারের প্রধান উপায় হইতেছে—প্রজার হিত-সাধন না করিয়া এক বিন্দু বৃষ্টির জল সাগরে যাইতে না দেওয়া; আর রাজ্যের সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি বিনা চাষে ফেলিয়া না রাখা। আমাদের হস্তে রাজ্যভার পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; প্রজাপুঞ্জ যাহাতে সুখে থাকে, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। তাহাদের মঙ্গল সাধনই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।"

তিনি মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন করিতেন; এবং যোগ্যতানুসারে রণদক্ষ সেনানীগণকে সামরিক বিভাগের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করিতেন।

যখন রাজ্যের সকল বিভাগের কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে লাগিল, যুদ্ধের মাল-মসলা প্রস্তুত হইল, সৈন্য-বল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি আপন শক্তির সঠিক পরিচয় পাইলেন, তখন তিনি সিংহলে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া সাফল্য-মণ্ডিত হন। একচ্ছত্র নরপতি হইয়া তিনি দ্বিতীয়বার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেন। সেই বিরাট ব্যাপারের বর্ণনার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি—"ঝঞ্ঝা-বিতাড়িত সাগর-বক্ষ যেরূপ উদ্বেলিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গের ভীষণ শব্দে দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত করে, বিকট দুন্দুভি-নিনাদ কর্ণ-পটহে তদপেক্ষা অধিক আঘাত দ্বারা শ্রবণ-শক্তি লুপ্ত করিবার উপক্রম করিতেছিল। সুবর্ণাচ্ছাদনে হস্তীযূথ দেখিয়া মনে হইল, যেন রাজপথ মেঘাবৃত হইয়াছে; আর তাহাতে সৌদামিনী ক্রীড়া করিতেছে। সামরিক অশ্ব-

প্রস্থিনগর—রাজ্যাভিষেক-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ
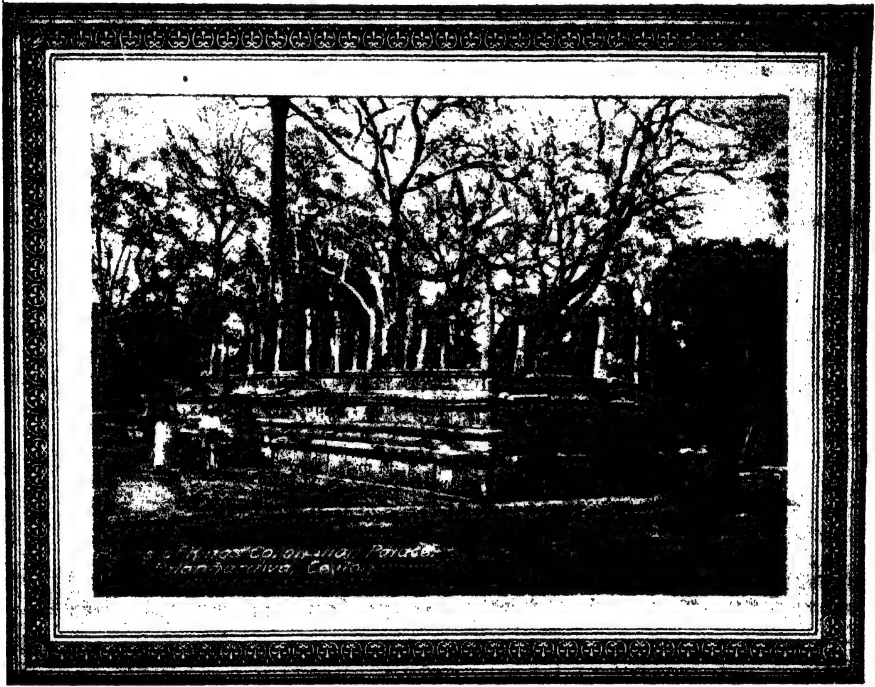
অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সম্ভ্রান্ত যুবকগণকে আনাইয়া রাজবাটীতে রাখিয়া দেন; এবং নিজের তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে অশ্ব ও হস্তী পরিচালন ও যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন।

তিনি বিদেশে মণি-রত্নের রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া, এবং রাজস্ব-বিভাগে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ দ্বারা প্রজাগণকে কর-ভারে নিপীড়িত না করিয়াও, ধনাগারে প্রচুর অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন করেন। সৈন্যগণকে রণ-নিপুণ করিবার জন্য

শ্রেণীর প্লুত গতিতে মনে হইতেছিল, যেন সহরে সমুদ্রের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। রঙ্-বেরঙের ছত্র এবং স্বর্ণ-মণ্ডিত পতাকার বাহুল্যে আকাশ-মণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। সদা শব্দায়মান করতালি-ধ্বনি ও জনগণের তরঙ্গায়িত পরিচ্ছদে বায়ুমণ্ডল আন্দোলিত হইতেছিল। রাজার দীর্ঘ-জীবন-কামনা-সূচক জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইতেছিল। পত্রপুষ্প-শোভিত কদলী-বৃক্ষের তোরণ, চারণগণের বিজয়-গীতি, আর ধূপ-ধূনায় সুগন্ধ চারি দিক্ আমোদিত করিতেছিল। সমগ্র রাজ্য উৎসব-সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। নাগরিকগণ নানা বর্ণের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া রাজপথে বিচরণ করিতেছিল। আর সর্ব্বত্র "দীয়তাং ভুজ্যতাং" তো সমান ভাবে চলিতেছিল। বন্ধন-মুক্ত হস্তীর ন্যায় সৈনিক পুরুষগণ সমরসাজে সজ্জিত হইয়া যত্র তত্র পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ধনু-হস্তে সুসজ্জিত তীরন্দাজগণকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, বুঝি বা দেবতাগণ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। নগরের রাজ-সৌধাবলী সুবর্ণ এবং মণি-মুক্তায় ভূষিত হইয়া তারকা-মণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। আর মহা-মহিমান্বিত রাজাধিরাজ রত্ন-মণ্ডিত রাজ-পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া এক জোড়া সুসজ্জিত হস্তীর উপর স্থাপিত স্বর্ণ-মণ্ডিত মঞ্চে উপবেশন করিয়া নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার হীরকাদি রত্ন-খচিত সমুজ্জ্বল রাজমুকুট সূর্য্যোদয়-কালীন পূর্ব্বদিকের শৈলবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। তাঁহার সুঠাম গঠন এবং দৈহিক সৌন্দর্য্য বসন্তের শ্রীকেও লজ্জা দিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া সুন্দরী রমণী-গণের চক্ষু আনন্দ-রসে আপ্লুত হইতেছিল। তাঁহার সুখ-শান্তি-পূর্ণ মুখজ্যোতিঃ সহস্রাক্ষ দেবতার ন্যায় দেখাইতে-ছিল। নগর প্রদক্ষিণের পর তিনি প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বিতীয়বার রাজ্যাভিষেকের পর রাজ্যে শান্তি বিরাজিত দেখিয়া পরাক্রম বাহু ধর্ম্মোন্নতি ও প্রজার সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করেন। বৌদ্ধগণ দলাদলি প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল, সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা নষ্ট হইতে বসিয়াছিল এবং দরিদ্রেরা অনশনে কষ্ট পাইতেছিল। তিনি বিভিন্ন মত-পন্থী বৌদ্ধগণকে আহ্বান করিয়া ধর্ম্ম-সমন্বয় ও মত-বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেন। রাজ্য পুনঃ স্থাপনে তাঁহাকে যত না কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, এই ধর্ম্ম-মীমাংসা-কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে তাঁহাকে ততোঽধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল। উপযুক্ত পাত্রের জন্য সৈনিক বিভাগের উচ্চ পদ উন্মুক্ত রাখিয়া তিনি সম্ভ্রান্ত-বংশীয়গণকে বজায় রাখিবার উপায় বিধান করেন। তিনি সুরম্য উদ্যান মধ্যে সুসজ্জিত অতিথিশালা স্থাপন দ্বারা দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি উৎকৃষ্ট স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সেই সকল স্থানে পীড়িতের জন্য আরোগ্য-গৃহ (হাসপাতাল) নির্ম্মাণ করেন। তিনি স্বয়ং সু-চিকিৎসক ছিলেন। সুযোগমত পীড়িতের তত্ত্বাবধারণ তিনি স্বয়ং করিতেন। রোগীর সেবার জন্য প্রত্যেকের নিকট একজন সুশ্রূষাকারী সর্ব্বদা উপস্থিত থাকার তিনি ব্যবস্থা করেন। তিনি চিকিৎসকগণের নিকট রোগীদের সংবাদ লইতেন। এমন কি, সময় সময় তিনি স্বহস্তে তাহাদের ঔষধ ও পথ্য সেবন করাইতেন। তাঁহার এই স্বাভাবিক সৌজন্য ও সহৃদয়তার গুণে প্রজাগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত, এবং তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

শত্রু হস্তে পড়িয়া অনুরাধাপুরের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি প্রস্থিনগরকে সুরক্ষিত করিবার জন্য নগরের চতুর্দ্দিকে উচ্চ পাড়যুক্ত গভীর পরিখা খনন, সুদৃঢ় দুর্গ এবং পর পর তিনটি নগর-প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। "বিজয়ন্ত" প্রাসাদ তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। প্রাসাদটি সাত তলা ছিল—প্রকোষ্ঠ সংখ্যা এক সহস্র। প্রাসাদস্তম্ভগুলি অতি সুদৃশ্য ছিল। প্রাসাদটি অষ্ট-ধাতু নির্ম্মিত ও শত শত চূড়া-সমন্বিত ছিল। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ মূল্যবান কার্পেট-মণ্ডিত স্বর্ণ ও হস্তীদন্ত নির্ম্মিত আসবাবে সজ্জিত ছিল। তিনি তেত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই সময় মধ্যে তিনি যে সকল ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মাণ করেন, সেগুলি অধিকাংশই বিরাট ব্যাপার। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি অতি উদার মত পোষণ করিতেন। তিনি এক দিকে ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত-ঘটিত ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করাইতেন; আবার অপর দিকে বৌদ্ধ পুরোহিতের নিকট জাতকও শ্রবণ করিতেন।

তিনি প্রজাগণের বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগেরও ব্যবস্থা করেন। তিনি উজ্জ্বল সুবর্ণ-স্তম্ভ-সমন্বিত রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করাইয়া বীর-কাহিনীর অভিনয় প্রদর্শন দ্বারা দর্শকগণের চিত্ত বীর-রসে পূর্ণ রাখিতেন। তিনি স্থানে স্থানে আনন্দ-ভবন নামে বৃহৎ হল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার অপূর্ব্ব

দৃশ্য দেখিলে মনে হইত, দেবগণ বুঝি সেখানে আসিয়া বাস করিতেছেন; এবং সারা জগতের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির নিদর্শন যেন সেখানে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে।

বুদ্ধদেবের দন্ত সংরক্ষণ জন্য পরাক্রম বাহু শিল্প-কলার আদর্শ কারুকার্য্য-খচিত সুবর্ণের দ্বার, গবাক্ষ এবং ছাদযুক্ত এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জগতের যাহা কিছু সুন্দর ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু, সে সব এই মন্দিরে সংগ্রহ রাখা হইয়াছিল। এরূপ জ্যোতিঃ পূর্ণ মন্দির সে সময় আর ছিল কি না সন্দেহ।

সহরের মধ্যে সুন্দর সুন্দর উদ্যান ও তন্মধ্যে স্নানাগার থাকিত। একটি উদ্যানে স্নানের জন্য একটী বড় হল ছিল, তাহার ঔজ্জ্বল্যে চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। সেই হলে এমন কল স্থাপিত ছিল যে, তাহা টিপিবামাত্র মুষল-ধারে বৃষ্টি পতিত হইত। পরাক্রম বাহুর রাজত্ব কাল প্রস্থিনগরের সুবর্ণ-যুগ গিয়াছে। তাঁহারই আমলে প্রস্থিনগর উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তির বহু নিদর্শন আজিও পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি বহন করিতেছে। তোপওয়া হ্রদের উপত্যকায় পর্ব্বত-গাত্রে পরাক্রম বাহুর বিশাল শিলামূর্ত্তি এখনও দণ্ডায়মান আছে। প্রস্থিনগরের দিকে মূর্ত্তি পশ্চাৎ ফিরিয়া আছে,—হস্তে তাল-বৃন্তের "ওল" বা পুঁথি। মূর্ত্তির ভাব-ভঙ্গীতে মনে হয়, পার্থিব সম্পদের নিদর্শন প্রস্থি-নগরকে তুচ্ছ জ্ঞানে পশ্চাতে রাখিয়া তিনি ধর্ম্মগ্রন্থকে সার বুঝিয়া, তাহাই পুরোভাগে যত্নের সহিত ধরিয়া আছেন।

এখন এখানকার বহু প্রাচীন কীর্ত্তি মৃত্তিকা-স্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং গভীর জঙ্গলে ঢাকিয়া আছে। বহু দূর ব্যাপিয়া এই জঙ্গল এখনও রহিয়াছে। ধ্বংসাবশেষের অতি অল্প অংশই লোক-লোচনের সমক্ষে বাহির করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কির-বিহার-সংলগ্ন জ্যেত-বন-রামের মন্দির-স্তূপ প্রথমেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি দৈর্ঘ্যে ১৭০ ফিট এবং ৮০ ফিট উচ্চ। প্রাচীর ১২ ফিট পুরু, ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত এবং চূণকাম করা। এখনও কতক কতক চূণকাম ও স্থানে স্থানে তাহার উপর ফ্রেস্কো চিত্র চিত্রিত আছে। এটীর সংস্কার কার্য্য চলিতেছে। প্রবেশ-দ্বারের অপর দিকে ৬০ ফিট উচ্চ বুদ্ধ-মূর্ত্তি অসংস্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে। স্থানটীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিলে মন বিষাদে পূর্ণ হয়। মন্দিরের বহির্ভাগ ও অপর কীর্ত্তিগুলি দেখিলে তাহার উপর হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পুরোহিতগণের বাসের জন্য এখানে আটটি ত্রিতল অট্টালিকা ছিল। প্রধান পুরোহিতের আবাস-গৃহের বড় জাঁক-জমক ছিল। এখানে প্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষণ জন্য সত্তরটী ত্রিতল গৃহ, পৃথক পুস্তকাগার এবং ধর্ম্মোপদেশের জন্য বড় বড় হল ছিল।

প্রস্থিনগর—"বিজয়ন্ত" প্রাসাদ

থূপরম মন্দিরটিকে ছাদ সমেত ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উদ্ধার করা হইয়াছে। এটীও ইষ্টক-নির্ম্মিত। ইহাতে দ্বাদশটী বুদ্ধ-মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম দিকের প্রাচীর-গাত্রে একখানি শিলা-লিপি একরূপ নিখুঁত অবস্থায় উদ্ধার

করা হইয়াছে। অঙ্কিত শিলা-লিপির ভাবার্থ—"মহামহিম কলিঙ্গ চক্রবর্ত্তী ওকাক বংশসম্ভূত পরাক্রম বাহু সমগ্র লঙ্কাকে সদা উৎসবময় দ্বীপে, কল্পতরুর অনুরূপ এবং অতুলনীয় শোভাময় সৌধে পরিণত করিয়াছেন। সীতা, চোড়, গৌড় প্রভৃতি বশ্যতা স্বীকার করিলে তিনি বহু সৈন্যসহ মহা-দ্বম্ব দ্বীপে গমন করেন। তত্রত্য রাজা ও প্রজাগণ তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে অভয় প্রদান দ্বারা সদ্ব্যবহার করেন। দম্ব দ্বীপে অবতরণ করিয়া কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না পাওয়ায় তিনি তথায় বিজয়-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কা দ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লঙ্কা বহুকাল অযত্নে পড়িয়া ছিল। তিনি দম্ব দ্বীপ ও লঙ্কার নানা স্থানে অতিথিশালা স্থাপন করেন এবং বহু দরিদ্রকে অকাতরে অর্থ প্রদান করেন। তাহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া তিনি প্রতি বৎসর চারিবার করিয়া দরিদ্রগণের মধ্যে অর্থ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। সুবর্ণ, রত্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি দান দ্বারা দেশের দারিদ্র্য নাশ এবং জগতের ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া তিনি দৈহিক ক্লান্তি অপনোদনের জন্য এই আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন।"

থূপরম মন্দির অশ্বত্থ ও বন্য বৃক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। প্রাচীরগুলি শিকড়ের চাড়ে ফাটিয়া গিয়াছে। দুর্গটীরও এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। দুর্গের মত চওড়া দেওয়াল সচরাচর দেখা যায় না। "সাত্‌মহল প্রাসাদ"টী সাত তল। প্রত্যেক তলেই প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে সিঁড়ির চিহ্ন আছে; কিন্তু সেটী বেশী দূর গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বহির্ভাগে দ্বিতলে যাইবার একটী সিঁড়ি আছে।

শত্রুর হস্তে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কায় ভক্তগণ বুদ্ধদেবের দন্ত সংরক্ষণ জন্য কি বিপুল আয়োজনই না করিয়াছিলেন। অনুরাধাপুর বিপন্ন হইলে প্রস্থিনগরে এবং সেখান হইতে বর্ত্তমান কান্দী সহরে কিরূপ যত্নের সহিত তাহা সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পরাক্রম বাহুর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজা নিঃশঙ্কমল্ল প্রস্থিনগরকে আর একটী সুন্দর দন্ত-মন্দির উপহার দেন। মন্দিরটির ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। তবুও প্রস্তরের কারুকার্য্য ও ছাঁচগুলি কত সুন্দর অবস্থাতেই না রহিয়াছে।

প্রস্থিনগরের মধ্যে গল-বিহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পর্ব্বত কাটিয়া মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতিমূর্ত্তিগুলি অসংযুক্ত বলিয়া ভ্রম হইলেও সেগুলি পর্ব্বতেরই অংশ বিশেষ এবং স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। মন্দির-পার্শ্বে উন্মুক্ত আকাশতলে ৪৬ ফিট লম্বা বুদ্ধের মহানির্ব্বাণের বিরাট মূর্ত্তি—দক্ষিণ হস্ত ও তাকিয়ায় উপর মস্তক স্থাপন করিয়া তিনি শয়ান অবস্থায় রহিয়াছেন। কি সুন্দর সৌম্য ও শান্তিময় মূর্ত্তি—পরিধেয় বস্ত্রের ভাঁজগুলি পর্য্যন্ত কি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত! বুদ্ধদেবের পদপার্শ্বে পদ্ম বেদীর উপর তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দের ২৩ ফিট উচ্চ মূর্ত্তি। আনন্দ নিরানন্দ-ব্যঞ্জক বদনে গুরুর প্রশান্ত মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি সংযোজন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। গুরুর মহাপ্রয়াণে শিষ্যের মনোভাব কি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই পর্ব্বতে উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি আছে; সেটী ১৫ ফিট উচ্চ। বেদীতে সিংহ-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। গল-বিহার পরাক্রম বাহুর এক বড় কীর্ত্তি। শুনিলাম, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক য়ুরোপীয় যুবক স্পর্দ্ধা সহকারে বুদ্ধের মহানির্ব্বাণ মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল! তিন দিনের মধ্যে একটি বন্য হস্তী তাহাকে নিহত করে।

প্রস্থিনগরের ভগ্ন স্তূপের মধ্যে আরও অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে। বলু-বন্-রামের ভগ্ন স্তূপে প্রাচীন কালের ভাস্কর্য্যের বহু সুন্দর নিদর্শন আছে। দলদা মন্দিরের বিশেষত্ব মোচড়ান স্তম্ভ। প্রস্তরস্তম্ভ সর্প-গতির মত আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। এটীকে রাজা নিঃশঙ্কমল্লের লতা-মণ্ডপও বলে। পরাক্রম বাহু নির্ম্মিত থূপরম বিহারে স্বর্ণ-প্রস্তর আছে। ওয়াতাদাগ-বিহারে ধ্যানী বুদ্ধের চারিটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। রাজ্যাভিষেক-প্রাসাদ, "বিজয়ন্ত"-প্রাসাদ, হস্তীমুণ্ডের উপর উচ্চ বেদী—পূর্ব্বে ইহার উপর চন্দ্রাতপ ছিল; এখন পড়িয়া গিয়াছে। তাহার সন্নিকটে "কুমার-পকুমা"। রাজপুত্রেরা সেখানে স্নান করিতেন। এখানে দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘাট ও বেদী আছে। ধনাগার, রক্ষীগৃহ প্রভৃতিরও নিদর্শন রহিয়াছে। রং-কোট বিহারের পরিধি ১৮৬ ফিট। ধর্ম্ম-শিব-প্রাসাদ সাত তল ছিল। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দ্রাবিড়ী মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে একটি শিব-মন্দির আছে। আমাদের গাইড সেটিকে দলদ মাল্গো বলিয়া পরিচয় দেয়। সেটী কিন্তু নিঃসন্দেহে শিব-মন্দির—শিব-লিঙ্গ এখনও সেখানে বিদ্যমান

রহিয়াছেন। সম্ভবতঃ ১১৯০ খৃষ্টাব্দে নিঃশঙ্কমল্লের আমলে এটি নির্ম্মিত হয়। ছাদ এবং বহির্ভাগের মণ্ডপ ভগ্ন হইলেও মন্দিরটি উত্তম অবস্থাতেই আছে। আর একটি মন্দিরের নাম বিষ্ণু দেবালয়। সেখানে বিষ্ণু-মূর্ত্তির স্থলে শিবলিঙ্গের নিম্নার্দ্ধের নিদর্শন ও পার্শ্বে একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি আছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তদানীন্তন সিংহলের রাজা বাঙ্গালী কবি রামচন্দ্র কবি ভারতীর শিষ্য হন। সেখানে রামচন্দ্র "বুদ্ধা গম-চক্রবর্ত্তী" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি "ভক্তি-শতকম্" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থারম্ভের শ্লোকে বুদ্ধ ও শিব যে অভিন্ন তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে—

কান্দীর পবিত্র দন্ত-মন্দির

জ্ঞানং যস্য সমস্ত বস্তু বিষয়ং যস্যান বচ্যং বচঃ
যস্মিন্ রাগল বোহাপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
যস্যা হেতু রনন্ত সত্ত্ব সুখদা নাল্পা কৃপা মাধুরী
বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাং শুস্মৈ নমস্কুর্ম্মহো।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা)

সুতরাং প্রস্থিনগরে ভগ্নস্তূপ মধ্যে শিব-লিঙ্গ-মূর্ত্তি থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল—সে জঙ্গলের মধ্যে থাকা আর নিরাপদ নহে ভাবিয়া আমরা প্রায় দুই মাইল হাঁটিয়া আসিয়া মোটর-বাসে উঠিলাম। যদিও গল-বিহার পর্য্যন্ত এবং তাহার পরেও পাকা রাস্তা আছে, কিন্তু সে পথে মোটর-বাস যাওয়া নিষিদ্ধ। প্রস্থিনগরে রাত্রি-বাসের আশ্রয় মিলিল না; নতুবা সেখানে পরদিবস একবেলা থাকিয়া যাইবার আমাদের অভিপ্রায় ছিল। মোটর-চালকও সেই ভীষণ জঙ্গল পথ দিয়া ২৬ মাইল রাস্তা রাত্রিতে যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। বলিল, পথে বন্য হস্তী মধ্যে মধ্যে উৎপাত করিয়া থাকে—সম্মুখে পড়িলে মহা বিপদ—প্রাণ সংশয়। প্রস্থিনগর ত বনাকীর্ণ; রাত্রিবাসের স্থান নাই। অগত্যা সেই পথে ফিরিয়া হাবারাণার ডাক-বাংলায় রাত্রি যাপন করাই আমরা স্থির করিলাম। মোটর-চালক বেচারা আর কি করিবে? আমরা তাহাকে সাহস দিলাম—বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলে পথে কোনও বিপদ ঘটিতে পারে না। সে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমাদের কথাটা বোধ হয় তাহার প্রাণে লাগে নাই; তাই সে পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া বিপন্মুক্ত হইতে চাহিতেছিল। সে অতিরিক্ত বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল। আমরা ত্রস্ত হইয়া তাহাকে জোরে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলাম। সে তাহাতে কর্ণপাতও

করিল না। সে তখন প্রাণভয়ে মরিয়া হইয়া গাড়ী ছুটাইয়াছে—তাহাকে রোধিবে কে? মধ্যপথে আসিয়া কিন্তু আপনা হইতে গাড়ীর গতিরোধ হইল। কলের উপর এত অত্যাচার—সে অসহযোগ (Non-co-operate) করিয়া বসিল। গাড়ী কিছুতেই চলে না—কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। নিকটে লোকালয় নাই। দুই দিকে নিবিড় বন। দেখিয়া ভগ্নদূতও কেহ থাকিবে না। বিপদকালে মধুসূদনের নাম ভিন্ন আর উপায় কি? অনেক নাড়া চাড়া ঠকাঠকি ও ঠেলাঠেলির পর মধুসূদন সদয় হইলেন—গাড়ী চলিল। আমরা রাত্রি দশটার পর হাবারাণা ডাক-বাংলায় পৌঁছিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম সাহেবরা একধার অধিকার করিয়াছেন। কেবল দুইটি শয়ন-কক্ষ খালি আছে। আমরা তাড়া-

কান্দী দন্তমন্দিরে গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তির সম্মুখে সিংহলযাত্রী আটজন বাঙ্গালী

শুনিয়া আমার যুবক বন্ধুগণের মুখ শুকাইল—একে পথশ্রান্ত ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর; তাহার উপর এই বিপদাশঙ্কা; বিদেশে বিভূমে বেঘোরে পড়িয়া প্রাণ না যায়। একবার বন্য হস্তীদের সম্মুখে পড়িলে আর কাহাকেও দেশে ফিরিতে হইবে না—হস্তী শুণ্ডের আছড়ানী বা হস্তী-পদপিষ্ট হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার হইবে না। তখন হয় ত দেশে সংবাদ দিবার মত তাড়ি তাহা দখল করিয়া শয্যা পাতিয়া ফেলিলাম ও রাত্রি ভোজনের ব্যবস্থা করিলাম। অন্ন-জীবী বাঙ্গালী—কয়দিন পেটে অন্ন পড়ে নাই; সকলেই অন্নাহারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই ডাক-বাংলার লোকদের মধ্যেই হিন্দু পাচক মিলিল। তাহার দ্বারা রন্ধন করাইয়া আমরা রাত্রি দুপুরে অন্নাহার করিয়া শয়ন করিলাম।

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

৬

বাড়ী ফিরিয়া সাম্‌নের সেই ঘরখানায় পা দিতে না দিতেই ছোট্ট বুটজুতার খুটখাটের সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুর শিশুকণ্ঠের কলস্বর শ্রুত হইল, "বাবামণি! ডিডি টোমাটে বড্ড ডাগ করেটে টুমি কি আড টা ঠাবে না?"

অতুলবাবু সহাস্যমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মঞ্জুর আপেলের মতন রাঙ্গা গাল দুটী আদরভরে টিপিয়া দিয়া তার দাড়ী ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া সস্নেহে কহিলেন, "তোমার দিদিকে বলে এস মঞ্জু! আমরা দুজনে চা খাব বলে' একটু দেরি করে এসেছি। বলে এস, সলিলবাবু রাত্রেও এখানে খাবেন।"

মঞ্জু বাপের আদেশ শুনিয়াই তাঁহার পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দ্বারের বাহিরে সলিলকে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহাকে চিনিতে পারিয়াই সে একটা সুউচ্চ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল,—

"বাবু! বাবু! টাল্‌টের ঠেই বাবু! ডিডি! ঠোন্‌" বলিতে বলিতেই সে ভিতর বাড়ীর দিকে ছুটিল।

"আসুন!" বলিয়া সলিলকে ডাক দিয়া অতুলবাবু চিমনির ধারে একখানা ইজিচেয়ারে হাত পা মেলিয়া বসিয়া পড়িলেন। "এই যে এই কৌচখানায় ভাল করে বসুন না,—একটা সিগার?"

সলিল, তার টুপিটা ষ্ট্যাণ্ডের গায়ে, আর ছড়িটা একটা দেয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া গৃহস্বামীর নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিয়াছিল। সিগারের নিমন্ত্রণে একবার হাতটা বাড়াইয়াই ঈষৎ যেন কুণ্ঠা-বোধ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "না, থাক—"

"চলে তো?"

সলিল চুপ করিয়া রহিল।

"তা'হলে দোষ কিছু নেই। বয়সে আমি আপনার চাইতে অনেক বড় বটে, তবে এখনকার দিনে নিজের বাপ-দাদার সাম্‌নেই চল্‌চে, তা আমি তো কোথাকারই কে! সেকালে তবু নল্‌চে আড়াল দিয়ে খাওয়ার একটা কথা ছিল। এখন সে সবেরও পাট নেই। বেপরোয়া! আর মশাই! বেটাছেলের কথা তো ছেড়েই দিন,—তারা তো চিরদিনই এসব নেশা-ফেশা করেই থাকে। এখনকার হালফ্যাসানে মেয়েরাই সিগারেট, সিগার ধরেছেন। ভদ্রঘরের সব মেয়ে মশাই! দিব্যি সভাস্থলে দাঁত দিয়ে সিগার চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখে এলুম। এতে তাঁদের পক্ষে লজ্জার কোন কারণ আছে বলেও তাঁরা মনে করচেন না। তা' আপনার আবার লজ্জা কিসের?"

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সলিল আর লজ্জার কারণ পাইল না; কিন্তু একটু সলজ্জ ভাবেই সে আতিথ্যকারীর হাত হইতে তাঁহার প্রস্তাবিত হাভানা সিগার তুলিয়া লইয়া দেশলাই জ্বালিল।

কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপানের পর সলিলই এবারে কথা কহিল, "আমারও তাহলে একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে।"

"কি কথা রাখতে হবে বলুন? আপনার বাসা ঠিক হলে সেখানে গিয়ে চা, চুরুট, কেক, বিস্কিট, পান, তামাক আরও যা যা দেবেন, খাওয়া তো? তা' তাতে আমি খুব রাজী আছি। সে আপনি আমায় বল্লেও আমি যাব, আর না বল্লেও যে যাবো না তা'ও মনে ভরসা করবেন না।" বলিয়া তিনি হাসিলেন।

সলিল বলিল, "সে তো হবেই, সে আর আমি আপনাকে বেশি করে বল্‌বো কি? এও যেমন, ও ও তো তেমনি আপনারই বাসা। আপনিই তো আমায় আন্‌চেন। তা' না, আপনি আমায় আপনি বলচেন কেন? ওটা তো ঠিক বলা হচ্চে না। তুমি বলাই আমার ভাল লাগবে।"

অতুলবাবু তাঁর মুখ হইতে সজোরে একরাশি ধূম নিজের বাঁ পাশের দিকে ছাড়িয়া দিয়া সেদিকটাতে একেবারে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়া তার পর হাসিয়া বলিলেন, "এই! বেশ তো, সেই যদি তোমার কানে ভাল শোনায়, তাই না হয় বলা যাবে। তার জন্যে আর হয়েচে কি! কি রে আরতি! কই মা, তোর আজ এত দেরি যে!"

"হুঁঃ, দেরি বৈকি! নিজেই সাত ঘণ্টা দেরি করে

এলেন! এখন, 'যত দোষ, নন্দ ঘোষ'!" বলিতে বলিতে গত রাত্রের সেই বিদ্যুচ্চপলা মেয়েটী একটী তড়িৎ-শিখার মতই ঘরের মধ্যে স্ফুরিত হইয়াই মুহূর্ত্তে যেন তেমনই করিয়াই স্থির হইয়া গেল। ও মা! মা গো! ছি-ছি-ছি! বাবার সঙ্গে যে অন্য লোক বসে রয়েচেন! হ্যাঁ তো! মঞ্জু যে সে কথা বলিয়াও ছিল! সেই গত রাত্রের বৃষ্টিতে-ভেজা লোকটাই না? তাই তো! সেই তো বটে! আরতি কাপড়ের আঁচলখানা একটু ঠিক করিয়া লইয়া পিছন দিকে চাহিল। তাদের পাহাড়ী চাকর রাম সিং চায়ের ট্রে লইয়া আসিতেছে কি না।

ইত্যবসরে সলিলকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৃহস্বামী-কন্যাকে স্বাগত জানাইল। তার সেই বিনম্র নমস্কারের উত্তরে আরতিও দু'হাত যোড় করিয়া তাহার অগ্রভাগ নিজের নত মস্তকে ঠেকাইয়াই একটুখানি সলজ্জ হাসিয়া কহিল,

"বাবা বুঝি আপনাকে টেনে এনেছেন? বাবার হাতে একবার এসে পড়লে আর রক্ষা নেই।"

সলিল তার চুরোটধরা হাতখানাকে পিছন দিকে লুকাইয়া রাখিয়া খাড়া থাকিয়াই এই কথার উত্তরে ঈষৎ হাসিল, "না—উনি টেনে আনবেন কেন? আমি আপনিই ওঁর স্নেহের টানে ছুটে এসেছি।" একটুখানি থামিয়া, আরতির ততক্ষণে চা তৈরির জন্য নিবিষ্টভাবে টেবিলের পাশে দাঁড়ান মূর্ত্তি একটী মুহূর্ত্তের জন্য স্থির চক্ষে চাহিয়া দেখিয়া পুনশ্চ কহিল,

"এসে হয় ত আপনার অনেক কাজ বাড়িয়ে ফেল্লুম! হয় ত এর জন্যে অনেকখানি অসুবিধে আপনাকে সইতে হবে। কিন্তু—"

আরতি বিস্মিত-স্মিতমুখে মুখ তুলিয়া অতিথির মুখের দিকে চাহিল, "আমার আবার কিসের কাজ বাড়ালেন? সে যদি কিছু বেড়ে থাকে তবে সে আপনারই বেড়েচে। না বাবা?"

আরতি এইটুকু বলিয়াই মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল, এবং সেই গূঢ় হাস্যে উদ্ভাসিত মুখখানাতে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্যের প্রভাব টানিয়া আনিয়া নতমুখে চা-দানীতে চামচে করিয়া চিনি মিশাইতে লাগিল।

অতুল বাবু বিস্ময়াধিক্যে তাঁর অর্দ্ধ-শয়ানাবস্থা হইতে অর্দ্ধোত্তোলিত গাত্রে কহিয়া উঠিলেন, "আমায় বল্লি? আমায় জিজ্ঞেস কর্‌লি? তা' হ্যাঁ রে মা! আমি কেমন করে বল্‌বো বল্ ত? কি ওঁর কাজ এখানে আসার জন্যে বাড়লো? হ্যাঁ সলিল! তুমি কিছু বুঝতে পারলে?"

সলিল যদিও কিছুমাত্র বিস্মিত হয় নাই, তথাপি সে চেষ্টা-কল্পিত বিস্ময়েরই সুরে প্রত্যুত্তর দিল, "কেমন করে পারবো বলুন? আমি তো জ্যোতিষ জানি না"

"নাও বাবা! উঠে এসে চা খাবে, না ঐখানেই দিয়ে আসবো বল? শুয়ে শুয়ে চা খেলেই কিন্তু তুমি একটা না একটা আক্‌সিডেণ্ট করে বস্‌বে! হয় গরম চায়ে হাত পোড়াবে, না হয় তো সুটটায় দাগ ধরাবে, না হয়—"

"তুই বড্ড বেশী বলছিস্ বুলু! অত কিচ্ছু আমি কিন্তু করি না। মোটে এক দিন একটুখানি হাত পুড়িয়েছিলুম, আর একটী দিনই না সেই পাঁশুটে সুটটার ওপোর, সেও নেহাৎই সামান্য, তা' ধোপাবাড়ীতে তারও খানিকটা ফিকে করে দিয়েছিল,—"

আরতি হাসিয়া বাপের ইজিচেয়ারের পাশে রাম সিং স্থাপিত ছোট্ট বেতের টেবিলটার উপর তাঁহার চায়ের পিরিচ-পেয়ালা স্থাপন করিতে করিতে তাঁহার কথায় বাধা দিয়া সহাস্যে কহিয়া উঠিল, "তবে দুঃখের বিষয় যে সেটা আর পরাই চল্লো না। তা যাগ্‌গে—এখন তুমি চা খাও। একে তো এই সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এই যে আপনি নিন্। বিস্কিট আর দুখানা কেক? স্যাণ্ডউইচ একটু? কিচ্ছু না? মঞ্জু! এই মঞ্জু!"

ভিতরের দিক হইতে মঞ্জুর সাড়া আসিল "টি? ডিডি?"

আরতি সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল "চা খাবি না?"

"আমি ডে এট্টা ডান টট্টি! ঠুন্‌বে? ঠোন 'টটো আঠা ট'ড়ে টোমারই ডুয়াড়ে ভিঠারীর বেঠে এঠেটি' টারপর টি ডিডি? 'ঠোল ডাড় ঠোল টোলো মুখ টোল, ডেট ডেট ঠট টেডেটি', টাপড়ে টি ডিডি?—"

"টা'পড়ে টিট্যু নয়! তুই এখন চা খাবি তো আয় দিকিনি?" স্নেহ-স্নিগ্ধ হাস্যের আভায় আরতির মুখখানি যেন মধুরোজ্জ্বল আরতি-প্রদীপের মতই দেখাইতেছিল। সহসা মুখ ফিরাইতেই তার চোখের উপর অপ্রত্যাশিত ভাবে পড়িয়া গেল, তাদের অতিথির চোখের দৃষ্টি। আরতি সে চাহনীতে কিছু যেন বিস্ময় এবং কতকটা যেন লজ্জাও

অনুভব করিল। তাহাতে কি ছিল, ঠিক বলা যায় না; কিন্তু আরতির এই সর্ব্বপ্রথম আজই মনে হইল, সে এখন বড় হইয়াছে। নিজের চোখের দৃষ্টি সে সহসাই নত করিয়া লইয়া নীরবে ভাইএর জন্য তার ছোট প্লেটে খাবার সাজাইতে লাগিল।

সলিলকুমারও এতক্ষণে তার নিজের চা-পাত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছিল; কিন্তু মনের মধ্যে তার তখনও সেই ট'কারের চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল;—

"কত আশা করে, তোমারই দুয়ারে—
ভিখারীর মত এসেছি!"—

যে এই গান লিখিয়াছে, সে কি তার এই গত রাত্রের অবস্থার কথা নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াই এটা লিখিয়াছিল? ভিখারীর মতন যদি সত্য সত্যই কেহ কাহারও দুয়ারে আসিয়া থাকে, তবে সে নিজেই তাই আসিয়াছে বটে! এর মধ্যে আর কষ্ট-কল্পিত কবি কল্পনা নাই! ভিখারীর মতই আসাটা হইয়াছে বটে, কিন্তু আশা সে কই কিছুই করিয়া আসে নাই, এখনও করিতেছে না। তবে ও রকম একখানি মুখ যদি বিধাতা তার জন্য তুলিয়াই ধরেন, তা' হইলে সে নিশ্চয়ই যে মুখ ফেরায় না, এ কথাটাও খুব নিশ্চিত! মুখখানা খাসা মুখ!

পথের সাথী

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

পথের সাথী, পথেই মোদের দেখা
পথের বাঁকে মোদের ছাড়াছাড়ি;
বিদায় দেহ, চলি এবার একা,
অকূল পথে একেলা দিই পাড়ি।
পথের সাথী, ক্ষম আমায় ক্ষম,
চোখের কোণে জল জমেনি মম,
অলস বাহু অধীর রাহু সম
ব্যাকুল নহে রাখ্‌তে তোমায় কাড়ি'
পথের সাথী, আমি কি নিরমম
পথের বাঁকে হেলায় চলি ছাড়ি'!

পথের সাথী, চুকিয়ে দে'ছি কাঁদা,
ফুরিয়ে আমার গেছে সকল চাওয়া;
হৃদয় এখন পড়্‌বে কিসে বাঁধা,
হৃদয় যে মোর হাল্‌কা উদাস হাওয়া।
পথের সাথী, এই হাওয়া সে কবে
পড়্‌ল লুটে বাঁশির ভীরু রবে,
কোন বধিরায় ডাক্‌ল "হে বল্লভে"
না গেল তার তিলেক সাড়া পাওয়া।
পরম চাওয়া চাইতে গেলেম যবে
চক্ষে আমার শুকিয়ে গেল চাওয়া।

পথের সাথী, কুসুম না ফুটিতে
আমার শাখে মুকুল গেল ঝরে,
আর ভাবিনে কখন অলক্ষিতে
আবার মুকুল ধরে কি না ধরে।
পথের সাথী, চল্‌তে কি মোর সাধ!
পদে পদে নাই কি অবসাদ?
বাহির জুড়ে পাতা ঘরের ফাঁদ
তবু আমার পা পড়ে না ঘরে।
পায় লেগেছে ব্যর্থ চলার স্বাদ
সেই সুখে মোর বুক রয়েছে ভরে;

পথের সাথী বিদায় দেহ তবে
ক্ষম তোমায় ভুল্‌তে যদি পারি,
তোমার স্মৃতি স্ব হবে যবে
স্বপ্নে হয়তো ঝর্‌বে আঁখি বারি।
পথের সাথী, ভুল্‌ব তোমায় বলে
হৃদয় মম কেমন যেন দোলে,
হায়রে যে জন যাবেই যাবে চলে
বুকের বোঝা কেনই করে ভারি!
পথের সাথী, মর্ম্মে তবু জ্বলে
তোমার শিখা—তোমারো শিখা,—নারি!

ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও আমাদের বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্য

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের দুইটি ধারা বহুকাল হইতে পাশাপাশি বহিয়া আসিতেছে; একটি মঙ্গল-কাব্যের ধারা,—আর একটি বৈষ্ণব কবিতার। এক দিকে আমরা পাই ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি, আর এক দিকে পাই মহাজন-পদাবলী। প্রথম ধারাটি হচ্ছে মহাকাব্যের, দ্বিতীয়টি গীতি-কবিতার। ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ এই দুইটি ধারার জের মাত্র। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এক দিক হইতে মঙ্গল-কাব্যের ধারাকে যেমন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, রামপ্রসাদের গানগুলি ঠিক তেমনি করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল বাংলার গীতি-কবিতার ধারাকে। আমার মনে হয়, ভারতচন্দ্র অবধি আসিয়া প্রথম ধারাটি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ বোধ হয় এই যে, এই ধারাটি কালের সকল পরিবর্ত্তনের সহিত সমানে পা ফেলিয়া চলিয়া আসিতে পারে নাই। ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবে যে রীতিতে কাব্য লেখা হইত; ঠিক সেই ভাবে সেই রীতিতে কাব্য লেখা যাইতে পারে, কিন্তু পাঠক যে খুব বেশী জুটিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কোনও জিনিষকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাহাকে নূতন করিয়া রূপ দিতে হয়। সে রূপ কতকটা কালের এবং কতকটা শিল্পীর নিজের। সৃষ্টির মধ্যে ঠিক এমনি করিয়াই প্রত্যেক জিনিষ বাঁচিয়া আছে। মানুষ বাঁচিয়া আছে তার বংশধরদের ভিতর দিয়া; গাছ পালা বাঁচিয়া আছে তাদের চারগাছগুলিকে জন্ম দিয়া। সাহিত্যের ধারাও ঠিক এমনি করিয়াই বাঁচিয়া থাকে। সে নিজেকে যুগে যুগে নূতন করিয়া পাইতে চায়, নূতন রূপে নূতন ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে যায়। এবং এইখানেই সে সজীব, সে প্রাণবান।

ভারতচন্দ্র চাহিয়াছিলেন চার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার ধারাকে বাঁচাইয়া রাখিতে—ঠিক যেমনটি ছিল সেই ভাবে। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার মিসরের কোন এক সুন্দরী রাজকুমারীকে মমি করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টার মত ভারতচন্দ্রের চেষ্টা হয় ত সফল হইয়াছে; কিন্তু মিসরবাসীরা যেমন ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্ম দিবার জন্য মমিকে লইয়া ঘর করিতে চাহিল না—চাহিল জীবন্ত নারীকে, বাঙ্গালীও তেমনি রসসৃষ্টি করিবার সময় ভারতচন্দ্রকে চাহিল না—খুঁজিল এমন একটি ধারা যাহা জীবন্ত, যাহা প্রাণচঞ্চল। তাহারা গ্রহণ করিয়া বসিল রামপ্রসাদকে। তাই ভারত-চন্দ্রের ধারা ঈশ্বর গুপ্ত অবধি আসিয়া থামিয়া গেল, আর রামপ্রসাদের ধারা রবীন্দ্র-সঙ্গমে মিশিয়া দ্বিগুণ বেগে আজও ছুটিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের সহিত আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কি ভাবে, কি বলিবার ভঙ্গীতে আমরা যদি কাহাকেও অনুসরণ করিয়া থাকি ত সে রামপ্রসাদ সেনকে—ভারতচন্দ্রকে নয়। অনেকে হয় ত বলিবেন, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সেদিন পর্য্যন্ত ত বাংলার আসর জমাইয়া রাখিয়া-ছিল। কথাটা খুব সত্য! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গলার আসর এত সরগরম করিয়া রাখিয়াছিল, সে কি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, না গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের পালা? কেউ কেউ হয় ত বলিবেন, "ও ত একই কথা হইল,—সেই একই জিনিষ;—একটা না হয় কাব্যে লেখা, আর একটা না হয় নাট্যাকারে ঢালিয়া সাজা। বিষয়বস্তু ত সেই একই। আমার বক্তব্য এখানে এই যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এবং গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের পালার মধ্যে—আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটি মহাকাব্যের রীতিতে লেখা, অপরটি গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত। একটির মধ্যে পাই ঘটনার সমাবেশ—অপরটির মধ্যে পাই সুরের লীলা। একটির মধ্যে পাই কৌশল—অপরটির মধ্যে পাই অনুভূতি।

বাংলাদেশ ঘটনা চায় না—সে চায় অনুভূতি। কৌতূহল অপেক্ষা রসানুভূতিকেই বাঙ্গালী চিরকাল বড় আসন দিয়া আসিয়াছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ঘটনাবহুল—তাহার মধ্যে আখ্যায়িকাই বড়। সমগ্র কাব্যটি কর্ম্মকোলাহল-মুখর। বিদ্যাসুন্দরের মিলন—সে যেন একটা মল্ল-যুদ্ধ।

দেহের সহিত দেহের সে কি গলদঘর্ম্ম সংঘর্ষ! তার মধ্যে সুর নাই রস নাই—আছে কেবল ঘটনা, আছে কেবল কর্ম্মকোলাহল—আছে কেবল পরিশ্রম এবং ক্লান্তি। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে অশ্লীলতার অভাব নাই। ভারতচন্দ্রের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-তালিকার কোন itemই গোপাল উড়েতে বাদ পড়ে নাই; কিন্তু গোপাল উড়ের বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে বেশ একটু সুর আছে, বেশ একটু কল্পনা আছে, একটু দরদ এবং ব্যথা আছে, যাহা সমস্ত ব্যাপারটাকে অতটা স্থূল এবং দৈহিক হইতে দেয় নাই।

আসল বক্তব্য ছাড়াইয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম। বলিতেছিলাম রামপ্রসাদের কথা। কি ভাবে, কি ভাষায়, কি বলিবার ভঙ্গীতে আমরা কাব্য লিখিবার সময় আজিও রামপ্রসাদকেই অনুসরণ করিতেছি। বাংলার বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্য বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকেই বুঝায়। বৈষ্ণব কবিদের নিকট রবীন্দ্রনাথ যে বহু দিক হইতে ঋণী, সে কথার উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু রামপ্রসাদের নিকট রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি ঋণী, সে কথা আমরা আজ পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিলাম না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্য দিয়া যে সুরটি সবচেয়ে বেশী করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং যে সুরটি থাকার জন্য তাঁহাকে আমরা mystic কবিদের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া থাকি —সেই অসীমের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা, সুদূরের জন্য প্রাণের সেই অতৃপ্ত পিয়াসা রবীন্দ্রনাথ কোথা হইতে পাইলেন? এ জিনিষ ইংরাজ মিষ্টিক কবিদের নিকট হইতে ধার-করা জিনিষ নয়, ইহা বাংলার মাটিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আমার মনে হয়, ইংরাজিতে যাহাকে মিষ্টিক কবিতা বলা হয়, তাহার সূচনা বাংলা-সাহিত্যে প্রথম পাই রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে।

এই সাধক কবির—

"শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়ি খান উঠেছিল,
কু আশার কুবাতাস লেগে ডব্‌কা খেয়ে পড়ে গেল।"

সত্যই সুদূরের পিয়াসী একটি ব্যাকুল হিয়ার করুণ আর্ত্তনাদ। কবির মন সহসা এক দিন কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে এই জড় জগতের সমস্ত সংস্কার এবং বস্তুর গতি ছাড়াইয়া শ্যামাপদ রূপ অনন্ত আকাশের অসীমতার মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিয়াছিল। সে কি বিরাট আনন্দ—সে কি অখণ্ড অনুভূতি!—কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? জড়-জগতের শতসহস্র আকর্ষণ পর মুহূর্ত্তেই তাঁর বাঁধনহারা মনটাকে আবার জোর করিয়া টানিয়া নামাইয়া দিল,—এ দুঃখ রাখিবার জায়গা কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না।"

কবির—

"মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।"

সুদূরের পিয়াসী বদ্ধ আত্মার আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুধু ভাবের দিক হইতে নয়, ভাষার দিক হইতেও রামপ্রসাদের নিকট বাংলার বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্য যে কতখানি ঋণী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রসাদী সঙ্গীতে মামুলি উপমা এবং রূপকের চর্ব্বিত চর্ব্বণ নাই—সংস্কৃতের অনুকরণে বঙ্গ ভাষাকে অলঙ্কারে সাজাইতে গিয়া প্রকৃতির দুলাল রামপ্রসাদ সংস্কৃতের রাজভাণ্ডারে গিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ান নাই। তাঁহারি পর্ণকুটীরের আশে পাশে যে সকল বন্যফুল নিত্য ফুটিয়া উঠিত, তাহারি অম্লান শুভ্র মাল্যখানি তিনি তাঁর কাব্য-সরস্বতীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন।

ব্যবহার করিতে করিতে প্রত্যেক জিনিষেই অরুচি ধরিয়া যায়। পুরাতন অলঙ্কার ব্যবহার করিতে করিতে একঘেয়ে হইয়া উঠে। যুগ যুগ ধরিয়া রস পরিবেশন করিতে করিতে পুরাতন রূপক এবং উপমাগুলির রস-ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যায়। তখন রসের পংক্তি-ভোজনে বসিয়া আমাদিগকে হাত গুটাইয়া লইতে হয়। অনেক দিনের গাঁথা বাসি ফুলের মালা তার শুষ্ক ফুলগুলিকে ঝরাইয়া ঝরাইয়া ক্রমেই যেমন সূত্রসার হইয়া পড়ে,—কালে কালে প্রাচীন কাব্যালঙ্কারগুলির অবস্থা অনেকটা তদ্রূপ হইয়া দাঁড়ায়। তখন নূতন করিয়া ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দিয়া যাইবার জন্য মালাকরের ডাক পড়ে। রামপ্রসাদেরও একদিন ডাক পড়িল।

প্রত্যেক যুগ তার নিজের চারি পার্শ্বের দেখা শোনা জিনিষগুলির রূপকে অবলম্বন করিয়া, যাহা দেখা যায় না, সেই অরূপকে রূপ দিতে চায়। এমনি করিয়া কুমুদ ও চাঁদের

চোখে দেখা সম্পর্কটুকুকে অবলম্বন করিয়া একটা যুগ পুরুষ ও প্রকৃতির সূক্ষ্মতম অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধটিকে একটি বিশেষ রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এমনি করিয়াই উপমা গড়িয়া উঠে—রূপক গড়িয়া উঠে। কিন্তু সৃষ্টির নিয়মই এই যে, যে জিনিষটির সহিত আমরা অনেক কাল পরিচয় স্থাপন করি, তাহার মধ্যে আর রহস্য খুঁজিয়া পাই না।—সে তখন গৃহিণী হইয়া উঠে—প্রিয়া থাকে না। সে তখন আমাদের নিকট বড্ড বেশী পরিচিত হইয়া পড়ে,—তাঁহার সহিত আমাদের সম্পর্কটা বড্ড বেশী বাস্তব হইয়া উঠে। তখন আর তাহার মধ্যে ব্যঞ্জনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—তাহা তখন আর নিজের সীমা ছাড়াইয়া অসীমের দিকে পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তখন তাহা আর প্রতাক থাকে না—জড়বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের প্রাচীন কাব্যালঙ্কারগুলি ঠিক এমনি করিয়াই বড্ড বেশী পরিচিত হইয়া যাওয়ায় ক্রমেই প্রতীকের উচ্চ আসন হইতে জড়ত্বের নিম্ন পৈঠায় নামিয়া আসিতেছিল—ঠিক এমনি সময় রামপ্রসাদ আসিলেন তাঁর নূতন করিয়া দেখা, নূতন করিয়া শোনা চারি পাশের বস্তু-জগতের রূপের প্রতীক লইয়া। "কোলুর চোখঢাকা বলদ" আসিল সারা বিশ্বের সীমাবদ্ধ জীবের প্রতীক রূপে। দূর নীল আকাশে উধাও হইয়া উড়িয়া যাওয়া ঘুড়িখানি আমাদের হৃদয়-দুয়ারে আসিল "সুদূরের" বার্ত্তা লইয়া। আমরা পুরাতন রূপক এবং উপমাগুলির মধ্যে যে ব্যঞ্জনাকে, যে অরূপকে খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, তাহাকে নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কেন, ভারতচন্দ্রও ত অনেক নূতন এবং ঘরোয়া অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁর, "হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।" "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।" "এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।" "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।" প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি ত সম্পূর্ণ মৌলিক এবং নূতন।

উপর হইতে দেখিলে কথাটা সত্য বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে অনেক গলদ বাহির হইয়া পড়ে। এক শ্রেণীর কবি আছেন, তাঁহারা যে জিনিষটিকে বলিতে চান, সেটিকে খুব গুছাইয়া এবং তাগ্‌সই করিয়া বলিতে পারেন। বিষয়-বস্তুকে ছাড়াইয়া বিষয়াতীতের দিকে ইঙ্গিত করা ইঁহাদের উদ্দেশ্য নয়;—বিষয়-বস্তুটিকে যথাসম্ভব সুন্দর এবং পরিপাটি করিয়া ফুটাইয়া তোলাই ইঁহাদের কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। ইঁহারা অরূপকে রূপ দিবার জন্য আদৌ ব্যস্ত নন, রূপকে সুরূপ করিয়া তুলিতে পারিলেই ইঁহারা নিশ্চিন্ত। উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে এই সকল কৌশলী কবিদের সহিত দরদী কবিদের প্রভেদ বড় সামান্য নয়। উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি দরদী কবিদের কবিতায় নিকটকে দূরের সহিত, সসীমকে অসীমের সহিত মিলাইয়া দিয়া সার্থক হইয়া উঠে, আর কৌশলী কবিদের কবিতায় তাহারা নিকটকে নিকটতরের সহিত, পরিচিতকে অধিকতর পরিচিতের সহিত মিলাইয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। ভারতচন্দ্রের উপমা এবং রূপকগুলি পরিচিতকে অধিকতর পরিচিত করিয়া দেয়—অপরিচিতের সন্ধান তাহারা একেবারেই রাখে না। তাঁর "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।" "হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।" প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি আমাদের চিরপরিচিত জিনিষগুলিকেই ঘনিষ্ঠতর ভাবে আমাদের সহিত পরিচিত করাইয়া দেয়,—পরিচিতের মধ্যে অপরিচয়ের যে চিরন্তন রহস্যটুকু বর্ত্তমান তাহার প্রতি ভুলিয়াও ইঙ্গিত করে না। এক কথায়, ভারতচন্দ্রের উপমা এবং রূপকগুলি আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলিকে রূপ দিয়াছে; আর রামপ্রসাদের উপমা এবং রূপকগুলি রূপ দিতেছে সেই সূক্ষ্মতম চৈতন্য বস্তুকে, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের অনন্ত বস্তুপিণ্ড যাহাকে কোন দিন রূপ দিতে পারে না। তাই ভারতচন্দ্রের উপমা এবং রূপকগুলি বাঙালীর প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি ঘরকরণার কাজে লাগিয়া গেল; আর রামপ্রসাদের অলঙ্কার-গুলি বাঙ্গালীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত হইয়া রহিল। তাই ভারতচন্দ্রের দেওয়া উপমা এবং রূপকগুলি প্রবাদ বাক্য হইয়া বাঙ্গালীর মুখে মুখেই চলিতে লাগিল; আর রামপ্রসাদের অলঙ্কারগুলি বাঙ্গালীর বুকের মধ্যে গিয়া বাসা বাঁধিয়া বসিল। তাই ভারতচন্দ্রের উপমা ও রূপক-গুলির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই বাঙ্গালীর মজলিসে; আর রামপ্রসাদের অলঙ্কারগুলির অনুরণন্ শুনি রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতায়।

সাহিত্য-সংগ্রাম

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল

ময়মনসিংহের লোক হইয়া মেদিনীপুরের সাহিত্য-পরিষদে আমার মৌড়লী করিবার দাবী সম্বন্ধে একটা কথা উঠিয়া আপনাদের বিব্রত করিতে পারে। কিন্তু দাবী আমার আছে এবং তার নজীর স্বয়ং সেক্সপীয়ার। ময়মনসিংহ খুব বড় জেলা, মেদিনীপুরও বড় জেলা। তা ছাড়া ময়মনসিংহ ও মেদিনীপুর উভয়েরই নামের প্রথম অক্ষর 'ম'। There is an M in Monmouth and an M in Macedon। ইহার পর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে কি, যে, আমি আপনাদের কুটুম্ব? তা ছাড়া আমাদের দেশে এক রৌদ্রে ধান শুকাইলে কুটুম্বিতা হয়; কোনও অজ্ঞাত, অশ্রুত এবং হয় তো অস্তিত্ববিহীন পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক কল্পনা করিলে এত আত্মীয়তা হয় যে, তাতে বিবাহে বাধে! আর এ স্থলে কুটুম্বিতা হইবে না।

কিন্তু তবু আমি বলি, আপনারা কাজটা ভাল করেন নাই। মেদিনীপুর বোধ হয় অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট জায়গা। এখানকার সাহিত্য-পরিষদ্ এত দিন পর্য্যন্ত দিব্যি প্রশান্ত ভাবে আপনার জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। আপনাদের আমাকে টানিয়া আনিয়া সেই প্রশান্ত জীবনের মধ্যে বিপ্লব বহিয়া আনা ভাল হয় নাই।

আমার একটা বিশেষত্ব সাহিত্য-জীবনেও আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। Falstaff বলিয়াছিলেন, তিনি cause of wit in others। আমিও ঠিক তেমনি অপর লোকের ভিতর অযথা বিপ্লব উদ্রেকের হেতু। এটা বোধ হয় আমার গ্রহের ফল। আমি যত নির্ব্বিরোধী হই না কেন, আমাকে দেখিলে আশে পাশে বিরোধ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠে। তাই আপনারা আমাকে আনিয়া ভাল করেন নাই।

যাহা হউক, আপনারা আমাকে এ অপ্রত্যাশিত সম্মান প্রদান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আপনাদের ইহাতে যে ক্ষতি হউক, আমার পক্ষে এটা একটা প্রকাণ্ড লাভ। সুদূরবর্ত্তী অনাত্মীয় অপরিচিতের নিকট এমন সমাদর লাভ করিয়া আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, বিনয়ের আড়ম্বর করিয়া আমি তার মর্য্যাদা-হানি করিব না।

বাঙ্গলার সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে আমার বিদায়ের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে।' যে কয়দিন এই রঙ্গালয়ে নাচিয়া গেলাম, তার স্মৃতিটুকুও ভবিষ্যতে থাকিবে কি না জানি না। তাতে দুঃখ নাই। পুরস্কারের আশা মনে ছিল না, এ কথা বলিতে পারি না; কিন্তু এ কথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, পুরস্কারের প্রলোভনে সাহিত্যের কারবার করিতে আমি নামি নাই। বাঁশীর ডাক যখন কানে পৌঁছিয়াছিল, কুলের কথা ভাবিতে পারি নাই; পুরস্কার তিরস্কারের কথা মনে পড়ে নাই;—বাহির হইয়া ড়িয়াছিলাম। সাধ্যমত সেবা দিয়া যত্ন দিয়া অন্তরের দেবতার পূজা করিয়াছি, প্রসাদ বিতরণ করিয়াছি আমার দেশবাসীর পাতে। দেবতার তৃপ্তি হইয়াছে কি না দেবতাই জানেন। দেশবাসীর তৃপ্তি হইয়াছে কি না তাহা জানিবার সৌভাগ্যও আমার বিশেষ হয় নাই। বরং অনেকের যে আক্রোশ জন্মিয়াছে তার ভূরি পরিচয় পাইয়াছি। যদি তাঁদের তৃপ্তি হইয়া থাকে, আমার চেষ্টায় তাঁরা যদি কিছু আনন্দ পাইয়া থাকেন, তবে আমার সেবা সার্থক হইয়াছে। যদি তাঁদের তৃপ্তি না হইয়া থাকে—আমার দুর্ভাগ্য।

আমার এই সংক্ষিপ্ত সাহিত্য-জীবনে যে জিনিষটা আমাকে পীড়া দিয়াছে, সেটা এই যে, রসের বাজারে আজকাল কাঁকরের আমদানী বেশী। যাহা নিছক আনন্দ-দানের ব্যাপার, সেখানে বিরোধী মল্লদের তাল ঠোকাঠুকীতে আকাশ ভীষণতায় ভরিয়া গিয়াছে।

একবার একটা গানের মজলিস বসিয়াছিল। দেশের যত গণ্যমান্য গায়ক সবাইকে সে মজলিসে ডাকা হইয়াছিল। দেশের যত গান-পাগল লোক ছুটিয়া গিয়াছিল গান শুনিয়া আনন্দ পাইবে বলিয়া। লোকে লোকারণ্য, কিন্তু সবাই শান্ত স্তব্ধ—পাছে আনন্দের এত প্রচুর আয়োজনে বিন্দুমাত্র রসকণার অপচয় হইয়া যায় কোলাহলে। একজন বিখ্যাত

কালোয়াৎ তানপুরা লইয়া বসিলেন। আর একজন তাঁর হাত হইতে তানপুরা কাড়িয়া লইয়া ঠাস করিয়া তাঁর গালে মারিলেন একটা চড়। কেন না, তাঁর মতে তিনি বড় নায়ক—প্রথম গাইবার অধিকার তাঁর। আহত গায়ক তাল ঠুকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন;—তার পর গায়কে গায়কে বাদকে বাদকে মারামারি ঠোকাঠুকি, শ্রোতার দলে চেঁচামেচী ঘুসোঘুসী! একটা বিষম হট্টগোল লাগিয়া গেল।

মজ্‌লিস ভাঙ্গিলে বাড়ী ফিরিবার পথে প্রত্যেক দল এই কথা লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন যে, অপর সমস্ত দলকে খুব এক চোট দেওয়া হইয়াছে। যারা সুধু গান শুনিবার জন্য আসিয়াছিল, তারা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া গেল।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজকাল ঠিক এমনি একটা কাণ্ড চলিতেছে। যাঁরা রসিক, রসসৃষ্টি যাঁদের কাজ, তাঁরা সকলে মিলিয়া আজ একটা মহা হট্টগোল লাগাইয়া দিয়াছেন পরস্পরকে আঘাত করিতে, লাঠির মাত্রায় রসের পরিমাপ করিতে! আজকার সাময়িক সাহিত্য পড়িলে মনে আপনি প্রশ্ন উঠে, এ কি বাণীর কমল-বন, না কুরুক্ষেত্র? সাহিত্যের নাম লইয়া যাঁরা আজ এই বীভৎস তাল-ঠোকাঠুকি করিতেছেন, তাঁহারা হয় তো ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সাহিত্যের অস্তিত্বের একমাত্র অধিকার এই যে সাহিত্য আনন্দ দেয়। তাঁরা যাহা করিতেছেন তাতে আনন্দ দেয় না,—রসজ্ঞের মনে সুধু পীড়া উৎপাদন করে। গ্রীসের পুরাণে বাগ্‌দেবী ছিলেন বর্ম্ম-চর্ম্ম অস্ত্র-শস্ত্রে মণ্ডিত—কিন্তু আমাদের ভারতীর শোভা তাঁর বীণা—তাঁর মূর্ত্তি শান্তির আধার।

এই যে সংগ্রাম আজ চলিয়াছে, ইহার ন্যায়ান্যায় বিচার করিব না। সত্য বা যুক্তি কার দিকে কতখানি আছে, সেটা এখন বিচারের বিষয় নয়। এখন সকল রসজ্ঞের একমাত্র চিন্তার বিষয় এই যে, কলারূপিণী বাগ্‌দেবীর পুণ্য মন্দির অসুন্দর কোলাহলে কলঙ্কিত হইতেছে; সে কলঙ্ক নিবারণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

রসের বিচারে তর্কের অবসর আছে, সে কথা অস্বীকার করিতে চাই না; সকলের কাছে সব রস সমান ভাল লাগিতেই হইবে, এমন কথা কেহ বলিবে না। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তার বিচার হওয়াটাও অবশ্য দরকার; নতুবা রসের বাজার মেকী ও ভেজালে ভরিয়া যাইবে। কিন্তু সে বিচারের একটা সম্ভ্রান্ত পদ্ধতি আছে। দুঃখ এই যে, সে পথের পথিক বড় বেশী নাই। দুরূহ সে পথ,—অনেক অনুশীলন ও সাধনা-সাপেক্ষ। সহজ অবন্ধুর নোংরা পথের যাত্রী জুটিয়াছে অনেক। আরও দুঃখ এই যে, যাঁদের হাতে এই সব আবর্জ্জনা দূর করিবার শক্তি ও অধিকার আছে, তাঁরাই ইহাদিগকে আপনাদের পক্ষপুটে আশ্রয় দিতেছেন।

এই সাহিত্যিক মল্লযুদ্ধের দ্বন্দ্বের বিষয় লইয়া বিচার-বিতর্কের হয় তো যথেষ্ট হেতু আছে। উভয় পক্ষে অনেক যুক্তি হয় তো আছে, যার আপেক্ষিক গুরুত্ব সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু হট্টগোলটাই বিচারের পক্ষে সব চেয়ে প্রশস্ত নয়। যখন গোল বাধিয়া যায়, সেখানে বিচারের নিক্তি লইয়া সূক্ষ্ম তোল-কার্য্য করিবার চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন গোল থামান। এখন সেই দরকারটা সবার আগে। গোল থামিলেই বিচার চলিতে পারে। আস্তিন যতক্ষণ গুটান থাকে, ততক্ষণ বিচার চলে না। সাহিত্য আইনের ধারাগুলি তখন নির্ব্বীর্য্য—Silent legis inter arma.

বর্ত্তমান সাহিত্যিক ঝগড়ার বিষয় সম্বন্ধে বিচার আমি করিব না,—কোন্ পক্ষে সত্য কতটুকু তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোনও চেষ্টা করিব না। কিন্তু এ আলোচনায় যে পরিমাণ উত্তাপ ও অসহিষ্ণুতা দেখা যাইতেছে, তার যে কোনও প্রকৃত হেতু বা প্রয়োজন নাই, সেই কথাটা একটু বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ঝগড়াটা লাগিয়াছে বিশেষভাবে তরুণ দলকে লইয়া। এই তরুণ সাহিত্যিকরা সাহিত্যের মধ্যে না কি এমন একটা বিশ্রী ঢং আনিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা সুধু সমাজের পক্ষে অহিতকর নয়, সাহিত্য-ধর্ম্মেরও বিরুদ্ধ—ইহাই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। তা ছাড়া তাঁদের ভাষা, তাঁদের ভাব, তাঁদের দারিদ্র্য, তাঁদের তরুণত্ব—এ সবগুলিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁদের অপরাধের হেতু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁরা তরুণ যুবক তাঁরা যে তাঁদের তারুণ্য শিরায় শিরায় অনুভব করেন, আর কথায় বা কাজে প্রকাশ না করিয়া পারেন না, এটাও একটা অপরাধ!

সাহিত্য ও সমাজে এই দুরন্ত বিপ্লব যারা উপস্থিত করিয়াছে, এতবড় একটা প্রকাণ্ড শক্তি লইয়া যারা আসিয়াছে যে বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রথী নারায়ণী সেনা লইয়া

তাদের বধের আয়োজন করিয়াছেন—তারা কারা সেই কথা নির্ণয় করিবার ব্যর্থ চেষ্টা আমি দুই একবার করিয়াছি।

ঠিকানা যথেষ্ট পাই নাই ; কিন্তু একটা কথা জানিয়াছি—আমি সে তরুণের দলে নই। বয়সের হিসাব করিলে কথাটা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তরুণ বলিয়া যাঁদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, তার মধ্যে প্রায় আমার বয়সের লোকও আছেন। তাই এ বিষয়ে স্বধু বয়সের উপর নির্ভর করা নিরাপদ হইত না। কিন্তু এখন এ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নাই যে, আমি তরুণ নই।

প্রথম কথা এই যে, এই তরুণ দলে যে শক্তিমান লেখক কতকগুলি আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি না থাকিত, তবে তাদের আস্ফালনে বিচলিত হইয়া মহারথী হইতে পদাতিক পর্য্যন্ত ব্যূহবদ্ধ হইতেন না।

এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তাদের দোষ সম্বন্ধে এত অধিক অসহিষ্ণুতা ভাল লক্ষণ নয়।

কেন না, তরুণের স্বভাবই ভুল করা। ভুল করিতে করিতে লোকে ঠিক কথাটা শেখে। কিন্তু ভুল করিলে যে শিশুকে ক্রমাগত বেত্রাঘাত করা হয়, সে কোনও দিনই মানুষ হয় না—তার ভুলও প্রায় সংশোধিত হয় না।

যদি তরুণেরা ভুল করিয়া থাকে, যদি তাদের অন্যায় কিছু হইয়া থাকে, তবে প্রবীণ যাঁরা তাঁদের কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে তরুণের গুণান্বেষণ করিয়া তার জন্য তাকে সমাদর করা, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ত্রুটি দেখান। কিন্তু নিঃসংশয় শক্তি ধারণ করিয়া বহু তরুণ লেখক আজ প্রবীণ বা প্রবীণের ছায়াপুষ্ট নবীনদের কাছে এই সমাদরের কণামাত্রও প্রাপ্ত হয় না, এটা বড় পরিতাপের বিষয়।

আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, তরুণের প্রতি বিদ্বেষ কোনও জাতির পক্ষে স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। প্রবীণ কবি যত বড়ই হউন, যত আকাশচুম্বী তাঁর মহিমা হউক, তবু তিনি প্রবীণ,—বিধাতার বিধানে তাঁর জীবনের অবশিষ্ট পরিমাণ সংক্ষিপ্ত। প্রবীণ যখন চলিয়া যাইবেন, তরুণ তখন থাকিবে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তাদের হাতে। সন্তানের অপরাধটাকে বড় করিয়া দেখিয়া যে পিতা প্রত্যেক শক্তিমান বংশধরকে বধ করে, তার বংশ-রক্ষা বা প্রতিষ্ঠার আশা করা মিথ্যা। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সন্তানের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ বিরল। তাই তাদের বংশ থাকে ও প্রতিষ্ঠালাভ করে। আমাদের সাহিত্য-সমাজের যাঁরা ধুরন্ধর, তাঁরা যদি তরুণের প্রতি অতিরিক্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হন, তবে সেটা সাহিত্যের ভবিষ্যতের পক্ষে অনুকূল বলিয়া মনে হয় না।

তা ছাড়া, আমার মনে হয় যে, যে-সব প্রবীণ সাহিত্যিক তরুণদের প্রতি অতিমাত্র ক্রোধ দেখান, তাঁদের মনে একটা স্বাভাবিক ভ্রান্তি আছে যে, তাঁরা আজ যেমনটি, চিরদিনই তেমনটি ছিলেন। আজ আমার জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা ও শক্তি যতটা, ততটা যে কাল ছিল না তাহা নিশ্চিত ; আমার তরুণ বয়সে তাহা আরও কম ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ এই সহজ সত্যটা স্মরণ রাখা আমাদের প্রায়ই কঠিন হয়। তাহা যদি না হইত, নিজেদের তরুণ বয়সের ঠিক ধারণা ও স্মৃতি যদি তাঁহাদের মনে থাকিত, তবে তাঁরা তরুণদের প্রতি এত কঠোর হইতে পারিতেন না। এ কথাটা আমার বিশেষভাবে মনে পড়িয়াছিল একজন প্রবীণ প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের একটা লেখা পড়িয়া। তিনি নবীন লেখকদের অনভিজ্ঞতা ও কাঁচা হাতের উপর কত না বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, যদি তাঁর তরুণ বয়সের কোনও লেখা তাঁর সামনে থাকিত, তবে তিনি এত অপর্য্যাপ্ত বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন।

আর একটা কথা বোধ হয় ইঁহারা ঠিক মনে রাখিতে পারেন না যে, রসের বাজারে বৈচিত্র্য হয় নানা প্রকারে। আমি যদি একজন প্রকাণ্ড প্রতিভাবান লেখক হই, আমার লেখার যদি তুলনা না থাকে, তাই বলিয়া আমার চেয়ে কম শক্তিমান যে কেউ সাহিত্য রচিতে পারিবে না, এমন কথা নাই। আর তার রচনায় আমার মত রসের প্রাচুর্য্য কি ঘনতা না থাকুক, তাতেও আনন্দের উপাদান থাকিতে পারে। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা নিজের মানদণ্ডের পরিমাণে যাহা খাটো, তাকে ভাল বলিয়া বুঝিতেই পারেন না। সেটা যে ভাল, সে কথা তাঁদের নজরে পড়ে না ; সেটা যে খাটো সেই কথাটাই তাঁদের পীড়া দেয়। উৎকর্ষ যাতে আছে, তাতে যেমন অন্য প্রকারে বৈচিত্র্য দেখা যায়, উৎকর্ষের তারতম্যেও তেমনি বৈচিত্র্য থাকে। কিন্তু অনেকটা সমালোচনার এই মূল সূত্র যে যেটা ষোল আনা নয়, সেটা যে চৌদ্দ আনা সেটা দেখিব না। দেখিব যে সেটা দুই আনা কম। কথাটায় কিছু থাকিতে পারিত যদি চৌদ্দ আনা আপনাকে ষোল আনা বলিয়া চালাইতে

চাহিত। কিন্তু তাকে চৌদ্দ আনার মর্য্যাদাও এঁরা দিতে চান না।

তরুণদের উপর চারিদিক দিয়া যে বিদ্রূপ ও তিরস্কারের বজ্রবাণ ঝরিয়া পড়িতেছে, তাদের প্রধান কথাটা এই যে, তারা মানুষের ভিতর যৌন লালসাটাকে লইয়া অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছে। এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সত্য হইলে কতটা সত্য, ইহা ভাল কি মন্দ, কি ভালমন্দ দুয়ের বার, সে কথার বিচার আমি করিব না; কেন না, ঝগড়া করিতে আমি বসি নাই, ঝগড়া মিটাইবার একটা ক্ষীণ এবং হয় তো ব্যর্থ চেষ্টা আমি করিব।

ধরিয়া লইলাম কথাটা যথার্থ এবং কথাটার ভিতর দোষের কথা আছে,—রসের দিক দিয়াও বটে, সমাজের দিক দিয়াও বটে।

একটা কথা অবশ্য কেউ অস্বীকার করিবেন না—লালসা লইয়াও রসসৃষ্টি অসম্ভব নয়। এই যৌন বৃত্তি—পাশব বৃত্তিই বলুন তাকে—ইহা লইয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বহু অপূর্ব্ব রসরচনা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং লালসাকে অবলম্বন করিয়া রসরচনা করিয়াছে বলিয়াই তরুণদের দোষ হইয়াছে এমন কেহ বলিবেন না।

অতএব নবীনদের যদি এ বিষয়ে কোনও দোষ থাকে, সে এই যে, তাঁরা লালসার আলোচনায় মাত্রা রক্ষা করিতে পারেন নাই,—জীবন ও সমাজের ভিতর এই প্রবৃত্তির যে স্থান, তাহা রক্ষা না করিয়া ইহার মর্য্যাদা অতিরিক্ত বাড়াইয়া দিয়াছেন।

ধরিয়া লইলাম ইহা সত্য!—কিন্তু এ কথাও সমান সত্য যে, যৌন আকর্ষণটাকে জীবনের মধ্যে অতিরিক্ত বড় করিয়া যদি কেউ দেখে সে যুবক। যুবকের পক্ষে এটা স্বাভাবিক ত্রুটি—এবং তাহা মার্জ্জনীয় হ'ক বা না হ'ক, তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইবার কিছু হেতু নাই।

সুতরাং এ বিষয়ে তাঁদের যদি কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে সেটা তাঁদের যৌবনের স্বাভাবিক অতিচার বলিয়া ধরিয়া লওয়াই উচিত। আর সেভাবে ইহার দিকে চাহিলে এগুলির প্রতি বিদ্বেষের তীব্রতা ঘুচিয়া গিয়া একটা উদার সহনশীলতা আসিয়া পড়িবে। ইহাতে আমরা হয় তো হাসিব বা ব্যথা পাইব—কিন্তু ক্রুদ্ধ হইব না। ত্রুটি যেখানে আছে সেটা চাপা দিবার প্রয়োজন নাই—চোখে আঙুল দিয়া তাহা দেখাইবারও হয় তো প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার জন্য সর্ব্বব্যাপী সমর-সজ্জার কোনও ওজুহাত নাই। অথচ আজকালকার মাসিক কাগজের পাতায় পাতায় যে সাহিত্য সমালোচনা দেখিতে পাই, তার মধ্যে দেখিতে পাই, সুধু দুরন্ত ক্রোধ, তীব্র অসহিষ্ণুতা এবং শিষ্টতা-বহির্ভূত বিদ্রূপ। যাঁরা বয়সে প্রবীণ বা অতি প্রবীণ, প্রতিষ্ঠায় গরীষ্ঠ, দেখিতে পাই যে, তাঁরাও এ বিষয়ে লিখিতে গিয়া সংযমের সীমা রক্ষা করিতে পারেন না।

তরুণদের আর একটা অপরাধের কথা শুনিতে পাই যে, তাঁরা আপনাদিগকে তরুণ বলিয়া ঘোষণা করিতে ব্যস্ত—তাঁরা যে তরুণ এইটাই যেন তাঁদের প্রাধান্যলাভের চরম ফারমান—এই কথাটা তাঁরা জানাইতে চান। আর তাঁরা বলেন যে, তরুণ বলিয়াই তাঁরা প্রাচীনের নির্দ্দিষ্ট সকল বিধি-নিষেধের অতীত—বুড়োদের মাপকাটিতে তাদের বিচার করা চলিবে না। এমন কথা কোনও তরুণ লেখক ঠিক বলিয়াছেন কি না আমি জানি না; কিন্তু ধরিয়া লইলাম, এই কথাই তাঁরা দিন রাত বলিতেছেন। কিন্তু এটাও যে সহজ যৌবন-ধর্ম্ম। বয়সে যতই ভাটি পড়িতে থাকে ততই জগতের কাছে নানা দিকে খোঁচা খাইয়া আমরা নিজেদের খাঁটি ওজনটা বুঝিতে থাকি। কিন্তু উদ্দাম যৌবনের স্বভাব এই যে, তারা সীমার পরিমাণ করে না। সীমা যে কোথাও আছে, সেটা না জানাই তাদের স্বভাবগত ধর্ম্ম। তাই তাদের কল্পনা হয় সীমাহারা, আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী, আর নিজের শক্তি ও মর্য্যাদার উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অতল ও অটল! তাই স্পর্দ্ধিত যৌবন, বয়সের কাছে মাথা নত করিয়াই থাকুক বা মাথা খাড়া করিয়াই দাঁড়াক, তার মনের ও মুখের কথা এই যে, বুড়োরা এ জগৎটাকে ঠিক চালাইতে পারিতেছে না, চালাইতে পারে তাহারা। এই যে স্বভাবসিদ্ধ স্পর্দ্ধা, এটা যদি আমাদের তরুণদের লেখার ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াই থাকে, তাতে কি আমাদের পক্ক দেশ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে? যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও সীমাতিক্রমী স্পর্দ্ধা যৌবনের স্বভাব-ধর্ম্ম, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের পক্ষে সেটা লজ্জার কথা। যাঁরা তরুণ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে পারেন না, তাঁদের অন্তর যতই নবীন থাকুক, তাঁদের ক্রোধ যদি তাঁদের মর্য্যাদা ও সম্ভ্রমকে লঙ্ঘন করে, তবে সেটা লজ্জারও কথা, দুঃখেরও কথা।

তরুণদের যে সব অপরাধের তালিকা সাহিত্য-সমালোচনায় দেখা যায়, তার সবগুলি কি আমরা সংসারের ক্ষেত্রে আমাদের ঘরে ঘরে দেখিতে পাই না! আমাদের নিজেদের যৌবনে আমরা যাহা দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, আমাদের ছেলেদের ভিতর রোজ যেটা আমরা অনুভব করি, সেই সহজ যৌবন-ধর্ম্ম যদি তরুণের ভিতর সাহিত্য-ক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তবে আমরা বুড়োরা কি লাঠি লইয়া তাদের তাড়া করিয়া নিজেদের সম্ভ্রম-হানি করিব?

যে জ্ঞানী, প্রবীণ, সে ইহাতে আত্মহারা হইবে না। উপদেশ ও আচরণ দিয়া সে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে, ভুল করিলে চোখে আঙুল দিয়া তাহা দেখাইয়া দিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে অশেষ স্নেহ সহকারে সে তরুণের গুণরাশি বাছিয়া লইয়া তার সমাদর করিবে।

কিন্তু এ ভাব বাঙ্গলার সাহিত্য-সমালোচনায় কোথায়? প্রবীণ সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁদের চোখে কোথাও তরুণের লেখার দোষ পড়িলে তাঁরা অস্থির হইয়া যান—গুন খুঁজিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের হয় না। ইহাদের সব লেখা পড়িবার অবসর তাঁদের হয় না। না হউক, তবু যেটুকু চোখে পড়িয়াছে তারি জোরে তাঁরা সাধারণ ভাবে তিরস্কার করেন। এমন অনেক লেখক এই তরুণদের ভিতর আছেন, যাঁরা অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন—কেউ কোনও দিন তার সমালোচনা করেন নাই। তার গুণ থাকিলে মুখ ফুটিয়া তাহা বলেন নাই, দোষ খুঁটিয়া দেখান নাই। কিন্তু হঠাৎ হয় তো তার কোনও লেখা কারও চোখে পড়িয়া গিয়াছে, যার ভিতর হয় তো একটা বিশেষ দোষ আছে; অমনি তাহার জ্ঞাতিগুষ্টি সহ সকলের উপর তিরস্কার ও বিদ্রূপ বর্ষণ হইতে লাগিল; কিন্তু তখনও দোষটা চোখে আঙুল দিয়া দেখান হইল না।

প্রবীণ যেখানে ক্রোধে আত্মহারা, নবীন যে সেখানে মাত্রা রক্ষা করিয়া কথা কহে না তাহা বলাই বাহুল্য। কথায় কথা বাড়িয়া যায়। গালির উত্তরে গালি আসে; বিদ্রূপের জবাবে আসে বিদ্রূপ। এমনি করিয়া পুঁথি বাড়িয়া চলিয়াছে। রসসৃষ্টি পড়িয়া থাকুক, রসালোচনা, রস গ্রহণ পড়িয়া থাকুক—উপস্থিত কাজ এই লড়াইয়ে জেতা—ইহারই জন্য যেন সবাই প্রাণপণ করিয়া লাগিয়াছেন।

কাজেই সাহিত্যের ফুল-বাগানে মল্লভূমি বসিয়া গেছে। বাছা বাছা ফুলগুলি সব পায়ের তলায় গুঁড়াইয়া যাইতেছে। উদ্‌গ্রাহ-মল্ল সাহিত্য-বীরগণ নির্ব্বিকারে রূপের ঝরণা যে সব ফুল, তাই ছিঁড়িয়া কাটিয়া গুঁড়াইয়া তার পেটের ভিতরের কুরূপ উৎকীর্ণ করিয়া দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

শঙ্কিত বীণাপাণি বুঝি ধীরে ধীরে তাঁর সাধের বন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন।

আজ সবার এ কথা বলিবার দরকার হইয়াছে,—এ কেলেঙ্কারী শেষ কর। থামাও তোমাদের ঝগড়া! পাঠকের আজ বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়া বলিবার দরকার হইয়াছে যে, আমরা রসের বাজারে খুন্তি বা কোদাল কিনিতে আসি নাই, মাটি খুঁড়িয়া কেঁচো বাহির করার কেরামতি দেখিতে চাই না। সেই মাটির বুকভরা সৌন্দর্য্য যেখানে ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমরা সুধু তাই চাই। আর কোনও বেসাতী এ হাটে বিকাইবে না!

বিদ্রূপে কি রস নাই? কে বলে নাই? কিন্তু ব্যঙ্গ এক, আর ব্যঙ্গ-রস আর এক বস্তু।

কাম হইতেও রস জন্মে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাতে অতি সহজে ভেজাল দেওয়া চলে। কাম আমাদিগকে একটা বিচিত্র তৃপ্তি দেয়। প্রকৃত আদিরসের সঙ্গে সেই প্রাকৃত তৃপ্তির আনন্দটা অনেক সময় লোকে তফাৎ করিয়া দেখিতে পারে না। কাদা হইতে পদ্ম ফোটে; তাতে আনন্দ দেয়। কাদা সুধু ঘাঁটাঘাটি করিয়াও এক রকম আনন্দ হয়। দুইটার ভিতর প্রভেদ অনেক। কামের পাঁক হইতে তেমনি কাব্যরস জন্মিতে পারে; কিন্তু সুধু কামের আলোচনায়ও আবার এক রকম রস সৃষ্টি হয়। বিচক্ষণ শিল্পী সে প্রভেদ ধরিতে পারে।

তেমনি ব্যঙ্গ হইতে রস হয়। কিন্তু ব্যঙ্গ করিয়াই একটা অপরিচ্ছন্ন আনন্দ আছে। প্রকৃত ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করিতে পারে কলাকুশলী। তার স্বরূপ উপভোগ করিতে পারে সেই, যার ভিতর হাস্যরস চাখিবার শক্তি আছে। কিন্তু ব্যঙ্গ করিবার যে নোংরা আনন্দ, তাহাকে প্রকৃত ব্যঙ্গরস বলিয়া অনেক অপটু কারিগর ভুল করে অবিচারী জনসাধারণও তাকে উপভোগ করিয়া মনে করে ব্যঙ্গরস উপভোগ করিতেছি।

যেখানে প্রকৃত রস আছে, সে রচনা আমার শিরোধার্য্য—তা হউক সে ব্যঙ্গ বা আদিরসঘটিত। কিন্তু রসের যেখানে অসদ্ভাব, সে কাম-কথা বা ব্যঙ্গ সমান ঘৃণার বস্তু!

আমি যে ব্যঙ্গ-রচনার কথা বলিতেছি, তাহা শেষের শ্রেণীর। ইহার আতিশয্য সাময়িক সাহিত্য কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। রস-রচনার বিধিদত্ত অধিকার লইয়া যাঁরা জন্মিয়াছেন, তাঁরা শক্তির সাধনা ছাড়িয়া যে এই রূপে দুই হাতে সুধু আপনাদের শক্তির অপচয় করিতেছেন, এইটাই দুঃখের বিষয়।

আমি যুদ্ধ করিতে বসি নাই—আমি সুধু শান্তির প্রয়াসী। আমি জানি যে, যে সব কথা আমি বলিয়াছি, ইহার অনেক কথায় লোকের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিবে, বিদ্রোহ গজাইয়া উঠিবে, অনেকে তর্ক করিবার জন্য কোমর বাঁধিবেন। এ কথা অনেকে বলিবেন যে, আমি তরুণদের প্রতি যে অসহিষ্ণুতা ও অবিচারের প্রতিবাদ করিতেছি, সেই অসহিষ্ণুতা ও অবিচার আমি করিতেছি তাদের ব্যঙ্গ-কারীদের। এ সব মিটাইবার কথা নয়—ঝগড়ার কথা। অনেকে বলিবেন যে, যাদের আমি লক্ষিত করিয়াছি, তাদের নাম গোত্র দিয়া তাদের রচনার আলোচনা করিয়া আমাকে দেখাইতে হইবে।

এ কথা উঠিতে পারে। যাঁরা ব্যঙ্গ করিয়াছেন বা তিরস্কার করিয়াছেন, তাঁদের নিন্দা করা বা দোষ দেখান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে আমি এ আমন্ত্রণ অস্বীকার করিতাম না। বিশিষ্ট আলোচনার দ্বারা আমার সাধারণ প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু ইঁহাদের নিন্দা করাটা আমার লক্ষ্য নয়। আমার লক্ষ্য ইঁহাদিগের যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করা। তাহা করিতে গিয়া যদি আমি এমন কিছু বলিয়া থাকি, যাতে তাঁদের অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ লক্ষণ দ্বারা কোনও তিরস্কার করা হইয়াছে, তবে আমি করজোড়ে তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

মানুষের সব কারবারে, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে একটা চরম সত্য আছে। সেটা এই যে, মানুষ গতিশীল। এই গতির ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন। সে পরিবর্ত্তনের বিধি অতিক্রম করিবার শক্তি কোনও সমাজ বা সামাজিক অনুষ্ঠানের নাই—সাহিত্যেরও নাই। সামাজিক আচার, অনুষ্ঠান, মত ও বিশ্বাস, আদর্শ, রুচি, ভাষা প্রভৃতি এমন কিছুই নাই, যাহা শাশ্বত ও চিরন্তন। দেশভেদে এসব ভিন্ন হয়, কালভেদেও এগুলি ভিন্ন হয়। সুস্থ যে সমাজ সে সমাজে এই সব পরিবর্ত্তনের প্রতি বিমুখ হইয়া একেবারে দুয়ার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যখন যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়, সে তাহা অনায়াসে গ্রহণ করে। তাতেই সমাজ সুস্থভাবে বৃদ্ধিলাভ করে। যেখানে পরিবর্ত্তনের সম্মুখে সংস্কার একটা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া আপনার প্রাচীন-ধারণা সকল আকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকে, সেখানে সমাজ, হয় জীবনের রসধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, নতুবা নিষিদ্ধ মতামত শক্তি সঞ্চয় করিয়া একদিন একটা প্রচণ্ড বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া সে অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পুরাতন সমাজকে ওলট পালট করিয়া দেয়।

রসের জগতেও এই গতি ও বৈচিত্র্যের নিয়ম ষোল আনা খাটে। রসের প্রকৃতি ও চরিত্র গতিশীল। সে গতিটা আমরা সব সময় বুঝিতে পারি না; কেন না, সহজ সুস্থ সমাজে সবার গতি হয় প্রায় এক সঙ্গে। তাই অনবরত চলিতে থাকিলেও আমরা মনে ভাবি যে, আমরা সবাই ঠিক এক স্থানেই বসিয়া আছি। কিন্তু গতি আছে। আজকার সাহিত্যের সঙ্গে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের সাহিত্য, আর তার সঙ্গে তার পঞ্চাশ বৎসর আগের সাহিত্য তুলনা করিলে আমরা এই গতি লক্ষ্য করিতে পারি। সে গতির কতকটা সহজ-লক্ষ্য, কতকটা অলক্ষ্য। রসের নূতন উপকরণ, নূতন অবয়ব অনবরত সৃষ্ট হইয়া মানবের আনন্দ বিধান করিতেছে। সুতরাং সম্পূর্ণ নূতন একটা কিছু দেখিলেই যদি আমরা বিচলিত হইয়া তার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াই, তবে সেটা আমাদের পক্ষে আত্মহত্যার তুল্য হইবে। আমাদের মন সর্ব্বদা উদার ভাবে নূতন ভাব, নূতন প্রক্রিয়া গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ করিয়া রাখিতে হইবে—সুস্থভাবে পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। তার জন্য যেমন একদিকে প্রয়োজন সকল সংস্কারের অন্তরালে প্রকৃত রসবস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তেমনি প্রয়োজন অশেষ সহনশীলতা—সকল নূতন মত ও নূতন ধারা অবিকৃত চিত্তে বিচার করিবার মত ধৈর্য্য ও প্রশান্ততা।

যদি এই সুস্থ ভাব আমরা দেখাইতে না পারি, তার

ফল হইবে এই যে, প্রত্যাহত নূতন পন্থা শক্তি সঞ্চয় করিয়া আমাদের রস-সাহিত্যের গোড়া ধরিয়া টান মারিবে —সব সংস্কার সব আচার মঙ্গলামঙ্গল বিচার না করিয়া চুরমার, ওলট পালট করিয়া দিবে।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাই, সেখানে কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি সাহিত্যিক বিপ্লব বড় বেশী হয় নাই। কেন না ইংলণ্ড সর্ব্বদা আপনাকে নূতনের গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে—নূতনকে সুস্থভাবে বরণ করিয়া আপনার জীবনের সঙ্গে সমীকৃত করিয়া লইয়াছে। ফ্রান্সে তাহা হয় নাই, রুষিয়ায় তাহা হয় নাই। তাই নূতন যখন সেখানে শক্তিসঞ্চয় করিয়াছে, তখন সে সমাজের সব অনুষ্ঠান চুরমার করিয়া দিয়া আপনার অধিকার প্রচার করিয়াছে। বিপ্লবের দোষ এই যে, তাতে সমাজের সবগুলি গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়; সমাজের অঙ্গগুলি টুকরা টুকরা হইয়া পড়ে। তার সেই ভাঙ্গন হইতে জোড়া দিয়া নূতন সুস্থ জীবন গড়িতে অনেক সময় লাগে।

সুতরাং নূতন সাহিত্যের নূতন ধারার মধ্যে যদি দোষের কথা থাকে, তাকে বর্জ্জন করা যেমন প্রয়োজন, তার ভিতর বরণ করিবার যদি কিছু থাকে, তাকে বরণ করিয়া লওয়াও ঠিক তেমনি প্রয়োজন। নূতনের বিচারে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একটা সর্ব্বংসহ সহিষ্ণুতা, প্রশান্ত রসজ্ঞান ও সুস্থ সমতাযুক্ত জীবন। যেখানে ইহার পরিবর্ত্তে দেখিতে পাই নিদারুণ অসহিষ্ণুতা, প্রচলিত সংস্কারের অন্ধ অনুবর্ত্তিতা, এবং যা কিছু সে গণ্ডীর বাহিরে তাহা নির্ব্বিচারে ধ্বংস করিবার জন্য একটা প্রচণ্ড উগ্রতা—তখন শঙ্কা হয় যে, আমাদের সাহিত্যের জীবন বুঝি সুস্থ নয়, বুঝি ইহা গতিশীলতায় বিমুখ হইয়া ধ্বংস পথের পথিক হইতে বসিয়াছে।

নূতন যা কিছু তাই ভাল হয় না। বরং নূতনের ভিতর মন্দ কিছু থাকাই স্বাভাবিক। কেন না নূতন নূতন, অপরীক্ষিত। পরীক্ষার দ্বারাই দোষ মোচিত হয়, নূতন সংস্কৃত হইয়া স্বাস্থ্যকর হইয়া ওঠে। কিন্তু নূতন চাল দুষ্পাচ্য বলিয়া যে নূতন ধান কাটিয়া পাড়িয়া ঘরে তুলিয়া না নেয়, সে গৃহস্থকে বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

নূতনকে সর্ব্বদা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে আমি বলি না—আমার আপত্তি নূতনের প্রতি তীব্র বিদ্বেষে, তার প্রতি একটা নির্ব্বিচার বিরুদ্ধতায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, সাহিত্যের জগতে তরুণের এক মানদণ্ড ও প্রবীণের আর এক মানদণ্ড নাই। কিন্তু আজকালকার সমালোচনায় দেখি, বিভিন্ন মানদণ্ড রোজই নিযুক্ত হইতেছে। যে লেখা তরুণের কোটায় পা দেয় না, তার প্রতি বিচারে দেখি অশেষ সহৃদয়তা, তার দোষ সম্বন্ধে অসামান্য উদারতা ও অন্ধতা। আর যাহা তরুণ পদবী লাভ করে, তার বিচারে দেখি অসামান্য কঠোরতা, তার সত্য বা কল্পিত, অণুবীক্ষণের দ্বারা দৃষ্ট বা অদৃষ্ট সামান্য ত্রুটিকে বাড়াইয়া তার ধ্বংসের আয়োজন।

কবির মত আমিও চাই যে তরুণকে সহজ ও সাধারণ রসের মানদণ্ডে পরিমাপ করিয়া তার গুণাগুণ বিচার করা হউক। আমার দুঃখ এই, নবীনের প্রতি এই সমদৃষ্টি আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে এত বিরল।

আর কথা বাড়াইব না। অনেকে হয় তো আমার কথায় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। অনেকে হয় তো ভাবিতেছেন, আমি ঝগড়া থামাইবার নাম করিয়া ঝগড়া করিতেছি—শান্তির নামে বিপ্লব আনিতেছি। কিন্তু ঝগড়া করা আমার লক্ষ্য নয়, বিরোধের ইন্ধন জোগাইতে আমি আসি নাই। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শান্তি। *

* মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন ও শাখা-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

শেষ কাজ

শ্রীচরণদাস ঘোষ

পুরা-কাহিনী না হইলেও এটি ঠিক এ-কালের নহে। সে-কাল নিঃশেষ হইয়া এ-কালে পড়ি-পড়ি করিতেছে,—কোনো মোহানায় হয় ত বা পড়িয়াছেও,—কোনো সীমান্তে উভয় প্রান্ত মুখোমুখি হইয়াছে,—ঠিক এম্নি সময়টির আখ্যান এইটি।

পূর্ব্বদিক রাঙা হয় নাই,—প্রকৃতির শ্যামরূপ উষার আভাষ দিয়াছে মাত্র। ভাগীরথীর তট জন-বিরল—সবে দু'একজন প্রাতঃস্নান করিয়া ঘাটে পায়ের দাগ ফেলিয়া গিয়াছে,—এমনি সময়ে একটি ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইল, সঙ্গে বছর বারোর একটি ছেলে। ব্রাহ্মণের সর্ব্বদেহ ঢাকিয়া নামাবলী, হাতে গীতা, কেশ-বিরল মস্তকে কুণ্ডলীকৃত শিখা। গঙ্গার জলো হাওয়া প্রথম তাঁহার বুকে লাগিতেই, ছেলেটিকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্ নিমে, রোজ আমার সঙ্গে আস্‌বি—"

ছেলেটির মুণ্ডিত শির ও বসন দেখিয়া প্রতীয়মান হইল, তার সদ্য উপনয়ন হইয়াছে। তাই বুঝি বা, তার শুভ্র অন্তরের বিচার দিয়া ব্রাহ্মণ-জীবনের গুরুত্ব কষিতে গিয়া বলিয়া ফেলিল, "যদি ঘুমিয়ে পড়ি?"

ব্রাহ্মণ শাসন-কঠিন কণ্ঠে বলিলেন, "ঘুমুবি কি! বামুনের ছেলে—ব্রাহ্মণ হলি—গায়ত্রী জপবার এই সময়। চান কোরে তিনটিবার জপলেই, বুঝলি—কে তুই?"

ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন, একটি বালক অকস্মাৎ তাঁর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার বয়স পনের-ষোলো; গৌর হৃষ্টপুষ্ট দেহ। মুখে উদ্বেগ, আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের একখানা ঘন-কৃষ্ণ ছায়া। ব্রাহ্মণ পা-কয়েক পিছাইয়া তীক্ষ্নকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করিলেন, "কে তুই?"

ছেলেটি কি বলিতে গিয়া মুখ নামাইল, যেন তার অন্তরে এক গল্প সাজানো ছিল, চকিতে ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। একটু পরেই মুখ তুলিল, সে-মুখ অশ্রু-সজল। ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমার মা ঐ—কাল থেকে পড়ে!" বলিয়া ঈষৎ দূরে গাছের আড়ালে রাখা বস্ত্রাবৃত একটি শবের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

ব্রাহ্মণের সঙ্গী ছেলেটি অতর্কিতে দৌড়িয়া গিয়া শব দেহটার উপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লাফ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা, চুল বেরিয়ে রয়েচে—একটা মড়া মাগী—"

ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে একটা হেঁচ্‌কা টান মারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হতভাগা কোথাকার! পালিয়ে আয়। এখুনি বল্‌বে—পয়সা দাও!" বলিয়াই পাশ কাটাইয়া ছেলেটিকে সাম্‌নে রাখিয়া ধাক্কা দিতে-দিতে ঘাটে নামিয়া গেলেন।

অত্যল্প কাল পরেই আর একটি দল দেখা দিল। তাঁহাদের আকার-প্রকার ও বেশভূষা দেখিয়া বুঝা গেল, তাঁরা নির্ঘাৎ এক চতুষ্পাঠীর। বাহিনীর সুমুখে অধ্যাপক, পশ্চাতে ছাত্রমণ্ডলী। গঙ্গার ঢেউ-নাচা জল চোখে পড়িতেই, অধ্যাপক ছাত্রগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করলে, মানব জন্মান্তর প্রাপ্ত হয় না—মৃত্যুর পর পরব্রহ্মে লীন হয়। ভাগীরথী, নর্ম্মদা কাবেরী ও কর্ম্মনাশা—এই চারিটি পবিত্র-সলিলা—"

একটি ছাত্র সসম্ভ্রমে বলিল, "দেব, শাস্ত্রে অধ্যয়ন করেচি—কর্ম্মনাশার বারি অ-পবিত্র! এ কি প্রহেলিকা?"

অধ্যাপক গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, "বটে! কিন্তু বাক্য নির্গত হয়েচে—আর্ষপ্রয়োগ! এস বৎসগণ, বারিস্পর্শ করে আমরা কলুষ বিনাশ করি—"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত মাতৃহারা বালকটি একদৃষ্টে ইঁহাদের দিকে তাকাইয়া ছিল। বুঝি বা, এইবার এক অকাট্য জোর আশ্বাস তার কচি বুককে টান দিতেছিল—এঁরা ত দেবতা! বাতাসের ন্যায় উড়িয়া গিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কাতর-নম্রকণ্ঠে বলিল, "আপনারা—"

"কে তুমি—" অধ্যাপক চমকিয়া উঠিলেন।

"আমি ও-গাঁয়ের! আমার মা মরেচে—এখনো পোড়াতে পারিনি। মড়াঘাটে ওরা টাকা চায়, কিন্তু, আমার ত নেই—আমাকে পায়ে রাখুন—"

অধ্যাপক ছাত্রদের প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, মহাকবি শঙ্করের সেই শ্লোকটি মনে পড়ে—যথা—

"কা তব—"

প্রথম ছাত্রটি বলিয়া উঠিল, "মহর্ষি পতঞ্জলির যোগ ধর্ম্মের অবতারণা বোধ করি এই অবস্থারই প্রতিষেধক! এইরূপ শোকতপ্ত জীবকে ন্যায়-শাস্ত্র বিশেষ কিছু ফল প্রদান করতে পারে না!"

অধ্যাপক। হাঁ বৎসগণ, সাংখ্য-মীমাংসায়ও এর তত্ত্ব-নিরূপণ করা যায় না!

পুনশ্চ কাতর নিবেদন করিয়া ছেলেটি অধ্যাপকের পা ধরিবার উপক্রম করিতেই, তিনি সর্ব্বশরীর গুটাইয়া পিছু হটিয়া সরিয়া গিয়া ত্রাসে বলিয়া উঠিলেন, "কর কি, কর কি! শব স্পর্শ করেচ—চণ্ডাল তুমি!" ছাত্রদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এস বৎসগণ, অস্পৃশ্যের ছায়া গাত্রে আপতিত হয়েচে, আজ স্নানান্তে বেদের কয়েক চরণ আবৃত্তি করতে হবে!" অতঃপর সকলেই একে-একে পাশ কাটাইয়া গঙ্গাগর্ভে নামিয়া পড়িল।

অস্পষ্ট কুহেলির ন্যায় নররূপী ওই দেবতাদের উপর অকারণে একবার চাহিয়াই ছেলেটি সেইখানেই বসিয়া পড়িল—চোখে হাত চাপিয়া। তার অপুষ্ট ঐ অবয়বে যতটুকু জ্ঞান বুদ্ধি ছিল, এই দুর্দ্দিনে উহাই দৈত্যের আকার ধরিয়া তাহাকে যেন তাড়া করিয়া আসিল। শিশুর নিকট পৃথিবী যতই কল্পিত, যেমনই মিথ্যা হোক্, মায়ের সত্তা তার কাছে বিরাট সত্য; নতুবা বাড়ীময় ছড়ান অত নরনারীর ভিতর সেই নির্দ্দিষ্ট নারীর কোলে উঠিবার জন্য অত করিয়া কাঁদিয়া সারা হইত না! সেই শিশু বাড়িয়া বড় হইয়াছে, সে তার সর্ব্বস্বকে ভস্ম করিতে না পারিয়া ফোঁটা-দুই চোখের জলও ফেলিবে না? যাহারা বুঝে বুঝুক, সে কিন্তু, পৃথিবীর অত্যাচার, মানবের নির্য্যাতন, পাষণ্ডের ভণ্ডামি বুঝিবে না। সৃষ্টির সুরু হইতে যাহা বুঝিয়া আসিয়াছে, তাহাই বুঝিয়া সান্ত্বনা পাইবে, বুঝিবে—সে গরীব, পৃথিবীতে তার কেউ নাই! তবে—?

"কে তুমি—"

চাপা হাত চোখ হইতে সরাইয়া মুখ তুলিতে-তুলিতে ছেলেটি দেখিতে লাগিল—সুমুখে আর একদল মহা-মানব! ইঁহাদের পরিধানে কষায় বস্ত্র, হস্তে কমণ্ডলু, মাথায় ও মুখ-ভরিয়া লম্বিত কেশদাম। অতএব গল্পে শোনা রাশি রাশি ঋষিদের সামনে তার ভাঙ্গা বুক হইতে কোন প্রত্যুত্তরই হঠাৎ উঠিতে পারিল না। শুধুই অবশ নেত্রে সে চাহিয়া রহিল।

এবার পৃথিবীতে মানব-অন্তরের একটু বিকার ঘটিল। সুমুখকার মূর্ত্তিটি স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "কি হয়েচে বাবা তোমার?" স্নেহপরবশ হইয়া ছেলেটার মস্তক স্পর্শ করিতে হাত বাড়াইতেই, পশ্চাৎ হইতে একজন ক্ষিপ্রহস্তে তাঁর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "স্বামীজি—ও মুসলমান!"

"মিছে কথা। মা বল্‌তো—বাবা হিঁদু!" বলিয়াই ছেলেটি ছিলা কাটা ধনুকের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন তার চোখ-মুখ ফুঁড়িয়া যেন অলৌকিক দেব-দীপ্তি নির্গত হইতেছে।

পশ্চাতের লোকটি চোরামুখে একটু হাসিয়া স্বামীজিকে পশ্চাদ্দিকে একটু টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "একটু ইতিহাস আছে—বাবা না হোক্, মা ওর হিঁদুর মেয়ে বটে—নন্দপুরের এক বামুনের। গাঁয়েরই এক পাজি মুসলমান জোর করে ওর মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখে—তারই সন্তান ও। এখন সে-বেটাও মরেচে, ওরাও ভিখিরী—"

"থাক!" স্বামীজি ঈষৎ মুখ নামাইলেন। মুহূর্ত্তেই ছেলেটির দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কোথায়—বাড়ীতে?"

শবদেহটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ছেলেটি তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "না—ওই!"

এই কণ্ঠস্বরে যে কাহিনী নির্গত হইল, উহা যেন স্বামীজির পায়ের রাস্তাটা কাদা করিয়া দিল—সেই কাদায় পা ফেলিয়া পিছ্‌লাইয়া শবের কাছে আটক পড়িয়া ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিলেন, "মুখের কাপড়টা—"

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ছেলেটি আদেশ পালন করিল।

থর্, থর্, থর্,—স্বামীজির সর্ব্ব-অবয়ব থর্থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানা ছাই হইয়া গেল। তাঁহার মুক্ত জীবনের অবিচল সন্ন্যাস অকস্মাৎ আলোড়িত হইয়া উঠিল! তদ্দণ্ডেই নিজেকে সংযত করিয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিয়ে এলে কি কোরে?"

"মাথায় চাপিয়ে।"

"মাথায় চাপিয়ে?"

ছেলেটি অধোবদনে উত্তর দিল—"হাঁ।"

স্বামীজি পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "আর কেউ আসেনি?"

"না। ওরা কবর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মা আমাকে বল্‌তো—বিমল, তুই আমাকে গঙ্গা দিস্!" ছেলেটি একটু দমিয়া গেল। মুহূর্ত্ত-কয়েক ইতস্ততঃ করিয়াই বলিয়া ফেলিল, "মড়াঘাটে গেলাম, ওরা বল্লে—টাকা দে! কিন্তু, আমার ত—"

"বিমল—"

ছেলেটি চমকিয়া উঠিল! বিহ্বলনেত্রে একটিবার স্বামীজির পানে চাহিয়াই নতমুখ হইল।

স্বামীজি দাবী করিলেন, "সাড়া দাও—"

অধোমুখেই ছেলেটি উত্তর দিল, "আজ্ঞে—"

"বল, মুসলমানের বউ কি গঙ্গা পায়?"

"মা বলেচে—পায়! বলেচে—তোর সে, তিনি ও নয়! হাঁ, বাবা—এই—"

টক্কর লাগিলে মানুষ যেমন হুম্‌ড়ি খাইয়া সাম্‌নে যাহা-কিছু পায় তাহাকেই ধরিয়া ফেলে, তেম্‌নি সংসারত্যাগী আজন্ম ব্রহ্মচারী, অটল স্বামীজি হঠাৎ টলিয়া উঠিয়া সুমুখের ওই সুকুমার বালকটিকে সাপ্‌টিয়া ধরিয়া মত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মুখ লুকুস্‌নে, বাবা, আমিই তোর জনক!" বলিয়াই ছেলেটির মুখে ঘনঘন চুমু খাইতে লাগিলেন। অতঃপর অগ্রভাগে সারি দিয়া দণ্ডায়মান অনুচরদিগকে লক্ষ্য করিয়া সতেজকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "অচ্যুতানন্দ, যোগানন্দ, কমলানন্দ—প্রবৃত্তির আশীর্ব্বাদের অর্থ প্রেম! মনেও কোরো না, যোগের অস্ত্রে প্রবৃত্তিকে টুক্‌রো করলেই তার মহিমা লুপ্ত হয়! ওর এক এক ফোঁটা রক্ত মানব-অন্তরের দ্বারে দ্বারে চোখের সৃষ্টি করে। সেই নিহিত নেত্র ফুঁড়ে যে জ্যোতিঃ বের হয়—তারই নাম অন্তর্দৃষ্টি! সৃষ্টির ইতিহাসে এই দৃষ্টিরই স্ফুরণকে বলে—প্রেম! আজ যা চোখে দেখ্‌চ, সেই প্রেমেরই একখানা ছবি! চিত্রকর আমি, ছবি—ওই পরমাশ্চর্য্য নারীদেহ!" অপরাধীর ন্যায় অবশ শবদেহটির কাছে সরিয়া গেলেন ও মুখোমুখি হইয়া বসিয়া উহার একখানি শীর্ণ শক্ত হাত চাপিয়া ধরিয়া মৃতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "জাহ্নবী সাক্ষী—তুমি আমারই স্ত্রী, আমারই সন্তান বিমল!" বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এক মারাত্মক রহস্যের জটাজালে শিষ্যমণ্ডলী এতক্ষণ মূক, স্তম্ভিত হইয়া ছিল। এবার তাহাদের শাস্ত্রীয় আত্মা এই গর্হিত ও অশাস্ত্রীয় কাণ্ডে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যে অগ্রণী, বিস্ময়ে ও আতঙ্কে তার মুখ ফাটিয়া উদ্গারিত হইল, "গুরুদেব—"

স্বামীজি এক হাতে বিমলের গলা বেড়িয়া, অপর হাতে চিবুক ধরিয়া নির্ঘোষকণ্ঠে বলিলেন, "অবাক হয়ো না! মুখ মিলিয়ে দেখ—এক কি না!" একটু পরেই সুরু করিলেন, তোমরা দেখ্‌চ, মঠের রাশি-রাশি পুঁথি, জীবনব্যাপী যোগ-যাগ, কৃচ্ছ্র-সাধনা আমার গাল দুটো চড়িয়ে রাঙা করে দিচ্চে। কিন্তু, সমস্ত ছাপিয়ে আমি কি দেখ্‌চি শুন্‌বে—ওই একটি নারী, আর এই সন্তান, গৃহস্থের স্ত্রী আর পুত্র! অচ্যুতানন্দ, শাস্ত্রে মানুষ শুক্রাচার্য্য হতে পারে, তপস্যায় বাল্মীকি হতে পারে, কিন্তু নিজের বলে কেউ প্রেমিক হতে পারে না! এ হওয়াটা স্বেচ্ছাধীন নয়, মানুষের হাতের বাইরে! একজনকে ইহলোকে মৃত্যু চেয়ে নিতে হয়, তারপর সেই নিঃশেষে সৃষ্টির রস দিয়ে যখন অপরকে জর্জ্জর কোরে তোলে, তখনই সে প্রেমিক! দৃষ্টান্ত দেখ—আমি আর ওই শব!"

শাস্ত্র-গুরুর আচারে প্রতিবাদ করিবার প্রথা নাই, তথাপি এই লোমহর্ষণ অনাচারকে মানিয়া লইতে উহাদের বাধিল। উহারা মনে মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া কোনো ক্রমেই এই কঠোর রহস্যের সদুত্তর পাইল না। এদিকে সংযমের পাথর দিয়া গাঁথা এই মানব-অবয়বের কোন্ ফাঁকে যে ঈদৃশ ফাঁক রহিয়া গিয়াছে, তাহারও এতটুকু সূত্র খুঁজিয়া পাইল না। সাহস করিয়া অচ্যুতানন্দ কি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, পারিল না—অন্তরের সমস্ত বাণীই শিহরিয়া উঠিল—গুরু যে! কিন্তু, শিষ্যের মুখের অর্থ তীক্ষ্ণধী স্বামীজির নিকট গোপন রহিল না। একটু হাসিলেন। অতঃপর মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "শোনো—" বলিয়া মূর্ত্ত দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় শবদেহটার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সুরু করিলেন, "মঠের অধ্যক্ষ আজ আমি—স্বামীজি! আমার মুখপানে চেয়ে তোমরা কতই না কৌতূহল চেপে রাখচ! কিন্তু উপহাসের মত, আমি আর আমাকে খোলোস পরিয়ে রাখবো না! এই ত সময়—জীবনের এই চল্‌তি দিনে, জীবনব্যাপী চাপা এক মহাপাপের এই উৎসব-বাসর!—সে আজ অনেক দিনের কথা। গুরুদেব দেহরক্ষা করেচেন—তাঁর রত্নবেদীতে আমারই আসন পড়বে, আমি

তাঁর বড় শিষ্য! কতদিন ধরে যে অভিষেক-উৎসব চলেচে তার হিসেব আমি রাখিনি, শুধুই রেখেচি—হিমাচল হতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত যত পাহাড়-কান্তার, মঠ-আশ্রম—সব উজাড় করিয়া সাধু, সন্ন্যাসী, যাজ্ঞিক, কাপালিক জড় হয়েচেন,—গুরুদেবের মঠে সকল তীর্থের নর-বিগ্রহের সমন্বয় হয়েচে। মাসাবধি কাল ধরে মঠের আকাশ যজ্ঞধূমে সমাচ্ছন্ন। কাল প্রদোষে আমার প্রতিষ্ঠা—আজ আমি নরলোকের শ্রেষ্ঠ-ভিক্ষু! মঠের নিয়মে—গৃহীর আবাসে ভিক্ষায় বার হয়েচি! পরনে—গেরুয়া, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, হাতে কমণ্ডলু! সারাদিন ভিক্ষায় কেটেচে—শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। গ্রামে গ্রামে কত গৃহীর দ্বারে যে ভিক্ষাধ্ব ঝুলি তুলে ধরেচি, তার ঠিক নেই। সকালেই আকাশে একখানা মেঘ উঠেছিল, বেলা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি পড়্‌তে সুরু হয়েচে, আর ঝড়-ঝাপ্টা! কিন্তু, ভ্রুক্ষেপ নেই আমার, থাকলে চল্‌তো না। রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হলে, মঠে ফিরতে হবে—এই বিধান। রাত্রির আঁধার চিরে প্রহর উত্তীর্ণ হয়-হয়, এক বিরাট মাঠ পার হয়ে একটা গ্রামে ঢুক্‌লাম—সুমুখে দুর্য্যোগ, পেছুনে দুর্য্যোগ, চারিদিক ঘিরে দুর্য্যোগের নাচ চলেচে! পেছুনে তাকিয়ে দেখ্‌লাম—দেশ জলে ভাস্‌চে, আর সুমুখে হাহাকার! গাছের পর গাছ ভেঙেচে, ঘরের পর ঘরের চাল উড়েচে, দেওয়াল পড়েচে—যেন গ্রামের নিঃশ্বাসটুকু প্রলয়ের ঝঞ্ঝা চুমুক দিয়ে শুষে নিয়েচে! সারাদিন মাতামাতির পর প্রকৃতি তখন যেন একটু হাঁপিয়ে পড়েচে! টিপি-টিপি জল পড়লেও বৃষ্টি থেমেচে, এক আধটা ঝাপটা এলেও, ঝড় বয়নি! আকাশে শাসন থাক্‌লেও দ্বাদশীর চাঁদ মাঝে-মাঝে চল্‌কে উঠচে! রাস্তায় লোক নেই, ঘর-বাড়ী নিশুতি! নোয়ান বাঁশ, ভাঙা গাছ, পড়া দেওয়াল ভাঙতে-ভাঙতে, খানিক অগ্রসর হয়েছি, হঠাৎ কাণে গেল—কোথায় কে কপাট ঠেল্‌চে, আর এক নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ! একটা দমকা আস্‌তেই ঐ শব্দ আর ঐ আর্ত্তনাদ হটে গিয়ে মিলিয়ে গেল। মনে হলো, দুর্য্যোগের অবসানে পৃথিবীর কোন্ আদি সুরে কাঁপন ধরেছিল, আবার উৎপত্তির মূলে লীন হয়েচে!—আবার সেই শব্দ, আর ওই রোদন—সুমুখে একটু আগে! গুরুদেবকে স্মরণ করে পায়ে জোর দিলাম। বাধা সরিয়ে রাস্তা করতে-করতে খানিকটা আস্‌তেই ডানদিকে একটা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে এক নারীমূর্ত্তি চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—সে কি মর্ম্মভেদী! সঙ্গে-সঙ্গে দরজায় বার-কতক ঘা মেরেই রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলে! বুঝ্‌লাম—দেহী আমাকে দেখে ভয় পেয়েচে। অভয় দিয়ে ডেকে বল্‌লাম—আমি শিবামঠের প্রধান শিষ্য! মূর্ত্তিটি ফিরে দাঁড়ালো, তখন আমিও কাছাকাছি হয়েচি। গুরুদেবের নিষেধ—তার মুখপানে তাকাইনি, তবে মনে হলো, মেয়েটি অল্পবয়সী। আমার পানে এক নিমেষ ফেলেই, পায়ের গোড়ায় আছ্‌ড়ে পড়ে কেঁদে বলে উঠ্‌লো, "আমাকে রক্ষে করুন,—মোছলমানে ধরতে আস্‌বে, এখ্‌খুনি নিয়ে যাবে!" হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না, কেননা গুরুদেবের উপদেশ—একমাত্র ইষ্টদেবী ছাড়া ইহকাল পরকালে দ্বিতীয় প্রকৃতি সর্ব্বথা পরিহারের বস্তু!***আমাকে নীরব দেখে সে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, "ওই আমাদের বাড়ী! আজ ভোরে পাঁচিল টপ্‌কে পড়ে পনের-ষোলো—অনেক মোছলমান আমাকে জোর কোরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল—"

"তোমায় যবন স্পর্শ করেচে—" শিউরে উঠে পেছিয়ে এলাম!

মেয়েটি কি ভেবে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—"ঐ পর্য্যন্ত—ধর্ম্ম নিতে পারেনি—আমি পালিয়ে এসেচি। এতক্ষণ টের পেয়েচে। এলো বলে—চুলের মুটি ধরে টেনে নিয়ে যাবে! আমাকে নিয়ে পালিয়ে চলুন—" বলেই আবার পায়ে হাত দিতে এলো।

গুরুদেব ক্রোধ বিসর্জ্জন দিতে উপদেশ দিয়েচেন, তাই প্রাণপণে রোষ চেপে বল্‌লাম, "ছুঁলে আমায় ভস্ম হয়ে যাবে—ছুঁয়ো না! যবনের স্পর্শেই তুমি অস্পৃশ্যা—তোমার স্বামীও তোমায় গ্রহণ করবে না।"

বিবশনেত্রে আমার মুখপানে চেয়ে থেকে মেয়েটি বললে, "আমার বিয়ে হয়নি—বাবা গরীব!" মুখ নামিয়ে আবার সুরু করলে—"গ্রহণ বাবাও করেন নি। বাড়ীর ভেতর থেকে হেঁকে বল্‌লেন—তোমাকে ঘরে নিলে, আমার যজমানি বন্ধ হবে। সমাজের নিষেধ—নিষেধ ভাঙ্‌লে কঠোর শাস্তি!"

আমি জোর গলায় বল্‌লাম, "নিশ্চয়ই! মূর্ত্তিমতী অনাচারকে কে আশ্রয় দেবে! এ হিঁদুর সমাজ, এখানে কুলটার—"

"সন্ন্যাসী!—" মেয়েটার কণ্ঠ চিরে যেন বাজ পড়লো! একটু থেমেই আবার বলে উঠ্‌লো,"মুখ ছোটো করবেন!"

শিবামঠের ভাবী স্বামীজি আমি—আমার অপমান! দুর্জ্জয় ক্রোধে আমার দেহ কেঁপে উঠলো! কিন্তু, মুখ বুজে রইলাম পাছে ক্রোধ প্রকাশ পায়—গুরুদেবের নিষেধ! তার পর কুৎসিত বেষ্টনীর পাশ কাটিয়ে চলে যাবো, মেয়েটা দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "আর একটু! শুধু শুনে যান, স্বামী আমার—আপনিই! অতি দুর্দ্দিনে মেয়েমানুষে যাঁকে চায়, তিনিই তার স্বামী—তিনি পায়ে রাখুন, আর নাই-ই রাখুন! জানি, আমার নিস্তার নেই, এখ্‌খুনি পশুর দল এসে আমায় লুট করবে, আমার দেহটা নিয়ে শুকুনির মত ছিঁড়ে খাবে! কিন্তু, লোকসান কিছু হবে না আমার! আমি হিঁদুর মেয়ে, হিঁদুর বউ হিঁদুর ধর্ম্ম অমর!" একটা ঢোঁক গিলে আবার সুরু করলে, "হতে পারে, আমার গর্ভে ছেলের সৃষ্টি হবে—পশুর ছোঁয়াচে। তা হোক্—সে সন্তান তোমার! ওদের প্রতি চুম্বনের পেছুনে—শুধু তোমারই প্রেম! মিলিয়ে দেখো—ছেলের মুখটি পর্য্যন্ত—তোমারি মুখ!" বলেই সরে দাঁড়ালো।

কেন জানিনে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো! তবে স্পষ্ট জানি—গায়ে কাঁটা দিয়েচে! কেন জানিনে, তার মুখের ওপর হঠাৎ চোখ ওঠালাম, তবে এটা জানি—অনিমেষে তার দিকে চেয়ে রয়েচি!—গুরুদেব, গুরুদেব—না, না, এ যে বিরাট সুষমা ও মুখে, দুর্দ্দান্ত চমক! তারপর, তারপর চোখ বুজে, ঘাড় ফিরিয়ে—সন্ন্যাসী আমি, গৃহত্যাগী আমি, ভিক্ষু আমি—আমার ফেরবার পথে ঝাঁপ দিলাম! তখন চাঁদের বুক থেকে একখানা ঘন মেঘ সরে ধরাতলে আলো ফেলেচে! * * * খানিকদূর গিয়েই পেছুনে অকস্মাৎ নর-কলরব কাণে গেল; ফিরে দেখ্‌লাম—তার চারদিকে আগুনের বেড়া পড়েচে, ঘিরে জন কুড়িক নরপ্রেত! প্রত্যেকের হাতে এক-একটা জ্বলন্ত মশাল! নিমেষেই আলো নিবলো, শেষ আলোয় ঝাপসার মত দেখ্‌লাম—পাষণ্ডদের কাঁধে শোয়ানো এক দেববালা!" মুখ নীচু করিলেন। দেখা গেল, তাঁর মুখ ছাইয়া একখানা বেদন-ম্লানিমার মেঘ উঠিয়াছে। মুহূর্ত্ত পরে মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাস্! আজ আমার হাতের কাজ শেষ হয়েচে!" বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অতঃপর যেমন করিয়া শিব উমার নারী-কলেবর বুকে তুলিয়াছিলেন, তেমনি করিয়াই স্বামীজি বুঝি-বা তাঁর যুগ-যুগান্তের প্রিয়তমার শবদেহ কোলে, বুকে—কাঁধে তুলিয়া লইয়া শ্মশান-ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। পশ্চাতে রহিল—নির্ব্বাক্ আশ্রম-বাহিনী, আর এক আকস্মিক সন্তান।

চির-অদর্শন

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

এ জীবন কতটুকু—মৃত্যু কত বড়!
আশা নিরাশায় পূর্ণ উত্তপ্ত জীবন
বিস্মৃতির এক কোণে রহে জড়সড়,
সুখ দুঃখ মনে হয় কেবলি স্বপন।
মৃত্যু শুধু টেনে যায় জ্বালাময় রেখা,
কবে সে বাঁচিয়াছিল না হয় স্মরণ,
মিথ্যা সে ক্ষণের তরে প্রাণ নিয়ে দেখা,

সত্য এ যুগান্তব্যাপী চির অদর্শন।
মানুষ মরেছে, শুধু তাই পড়ে মনে,
মুখে মুখে যুগে যুগে হয় সে প্রচার,
জগৎ মরিয়া থাকে তাহার মরণে,
বর্ষে দিনে যশে গানে মরে সে আবার।
সফল তাহার মৃত্যু উদার মহান্,
যার প্রাণে মিশে থাকে জগতের প্রাণ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শিক্ষায় লাভালাভ

শ্রীহরিহর শেঠ

লাভের জন্যই ত শিক্ষা। লাভ আছে বলিয়াই জগতের সভ্য আখ্যাধারী মানব-সম্প্রদায় মধ্যে লোকশিক্ষার জন্য এত চেষ্টা, এত উদ্যোগ, এত অর্থ ব্যয়। লাভ কোন্ ক্ষেত্রে কতটা হয় বা না হয় সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু লাভার্থই অর্থাৎ এই উদ্দেশ্য লইয়াই যে সর্ব্বক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা, তাহাতে আর অন্য কথা কিছু নাই। এই লাভ শিক্ষার্থীর হইলেও, যাহার উদ্যোগে শিক্ষার ব্যবস্থা, তাহার লাভের উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ ইহা সৃষ্ট হয়। সুতরাং দেশের লোক শিক্ষার ব্যবস্থাকর্ত্তা যদি ভিন্ন দেশীয় ও বিভিন্ন স্বার্থের হয়, তাহা হইলে তৎপ্রবর্ত্তিত শিক্ষা দেশবাসীর পক্ষে লাভজনক বা তাহাদের ধাতুগত হইবে, এমন নিশ্চয়তা বা এমন সম্ভাবনা সন্দেহজনক ত বটেই, বরং তাহাতে শিক্ষার্থী তথা জাতির স্বার্থহানির সম্ভাবনা অধিক। সেখানে শিক্ষা নামে যাহা পাওয়া যায়, তাহার লাভাংশ অপেক্ষা লোকসান কতটা তাহাই বিবেচ্য।

আজ আমাদের শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিত দেশপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ নানারূপেই চেষ্টিত হইতেছেন এবং অল্পে অল্পে উহার বিস্তার কল্পে সফলতা লাভ করিতেছেন। কিন্তু এই যে শিক্ষা আমরা পাইয়াছি এবং পাইতেছি, সুসভ্য ইংরাজ-রাজের প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর শাসনের অধীনে থাকিয়া সেই শিক্ষা আজও শতকরা দশজন ভারতবাসীকেও ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিল না বলিয়া যে আমরা শাসক-সম্প্রদায়কে সুযোগ পাইলেই গালি দিতেছি; সে শিক্ষায় আমাদের লাভালাভের হিসাব-নিকাশের একটা সময় যে এখনও আইসে নাই তাহা বলিতে পারি না।

ইংরাজ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে যে আমরা ছিলাম, আজও যে আমরা ঠিক সেই আমরা আছি তাহা নহে। পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে। তন্মধ্যে আমাদের ভাবে ও কার্য্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাই এখানে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাই অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের মূলে বিশেষভাবে বিরাজিত। সুতরাং আমাদের পরিবর্ত্তনের স্বরূপ ও উহার ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমাদের লাভালাভ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

আমাদের পরিবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রথম কথা—আমরা সভ্য হইতেছি। পরিচ্ছদ, কথা, ব্যবহার, জীবন-যাপন-বিধি, আহার ও সাধারণ চাল-চলন, মোটামুটি সভ্যতার পরিমাপক। ইহার সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবন্ধ-কলেবর অযথা বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং সে আলোচনা করিব না। আমাদের যুগোপযোগী সভ্য হইতে হইলে এ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে এখন মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া যাইলেও, আমরা সভ্য হইয়া পৃথিবীর অপর পাঁচ জাতির এক জাতি হইতেছি—মনে মনে এই আত্মপ্রসাদ লাভ ভিন্ন কার্য্যতঃ বা মূলে কি লাভ হইতেছে তাহাই বিবেচ্য।

আমাদের পূর্ব্বেকার পরিচ্ছদ ছিল ধুতি চাদর; এখনকার পোষাক রকমারি—আধুনিক ধরণের জামা কাপড় জুতা। আহার, ব্যবহার, কথা, জীবন-যাপন-বিধি, চালচলন মধ্যেও পরিবর্ত্তন হইয়াছে অনেক। কিন্তু ইহাতে আমাদের লাভ কি হইয়াছে? অথবা আজিও যে সব বন্য পাহাড়িয়া অসভ্য বর্ব্বর নামধারী অর্দ্ধনগ্ন অশিক্ষিত জাতিরা আছে, তাহাদেরই বা এই অবস্থার জন্য আধুনিক সভ্য আখ্যাধারী ব্যক্তিগণের চক্ষে হীন বলিয়া বিবেচিত হওয়া ভিন্ন অন্য বিশেষ ক্ষতি কি হইতেছে, ইহাও ভাবিবার বিষয়।

দেখা যাইতেছে, আমরা সভ্য হইয়া বলিতেছি—আপনি কোথায় যাইতেছেন? তাহারা বলিতেছে, তুই কোথা যাচ্চিস্? আমরা সভ্য হইয়া অতি গরমের দিনেও জামা মোজা না আঁটিয়া ভদ্র-সমাজে বাহির হইতে পারিতেছি না; তাহারা তখন খালি গায়ে কোমরে একখানা ছোট কাপড় জড়াইয়া নিঃসঙ্কোচে যাইতেছে। আমরা সভ্য হইয়া অর্দ্ধেক দেশবাসীর পেটে যখন অন্ন নাই, যখন দশ বার টাকা দামের একটা ফাউণ্টেন্ পেন না হ'লে চল্‌চে না, তখন তৎস্থানে তাদের আবশ্যক একটা বাঁশের কঞ্চি বা সর। আমরা সভ্য হইয়া যখন নিজের বাজার লইয়া যাইবার জন্য মুটের পয়সা দিতে নারাজ, অথচ সেই সব জিনিষ বইবার জন্য পাঁচ সাত টাকা দামের একটা ভাল ব্যাগ বা আটাসে কেশ না হলে চলে না, তখন অসভ্যদের একখানা ছেঁড়া গামছাই সে কাজের জন্য যথেষ্ট। আমরা সভ্য হইয়া তাড়াতাড়ি দুটো ভাত মুখে দিয়া টেড়ি চশমা ভূষিত হইয়া ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করিয়া পরের আফিষে কলম পিসিয়া গোলামির দ্বারা মাসে বিশ পঁচিশ না হয় পঞ্চাশ অর্থাৎ দৈনিকের হিসাবে বার আনা এক টাকা না হয় দু'টাকা উপায়ে পেটের অন্ন সংগ্রহ করচি, আর তারা কোদাল কর্ণিক বাটালি নিয়ে এক দেড় টাকা রোজের কাজ করে' দিন গুজরাণ করচে। আমরা আফিষ থেকে এসে বৈঠকখানায় বসে তাস পিটে, নভেল পড়ে অথবা সখের থিয়েটারের আড্ডায় বা পরের কথা নিয়ে, না হয় কংগ্রেস কথা, রয়েল্ কমিশন্ বয়কট প্রভৃতি নিয়ে সময় কাটাচ্চি, তারা না হয় তখন দুটি গরম গরম বা পান্তা ভাত সজনে শাক দিয়ে খেয়ে ছেলে পরিবার সব একত্র মিলে গৃহপ্রাঙ্গণ বা দাওয়ায় বসে গ্রাম্য ভাষায় গল্প ক'রে বা গ্রাম্য সুরে একটা গান গেয়ে কাটায়। আমরা আত্মীয় বন্ধুর বাড়ীর বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কাজকর্ম্মে যৌতুক লৌকিকতা দ্বারা এবং ভোজনকালে উপস্থিত হইয়া

আত্মীয়তা সামাজিকতা রক্ষা করি ; আর তারা সূর্য্যোদয় হতে যতক্ষণ না কাজ শেষ হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত যতটা পারে গায়ে গতরে খাটিয়া সে কাজ তুলিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়। আমরা হা হা করিয়া কাষ্ঠ হাসিতে ও নীরস ছেঁদো কথায় অনেক সময় আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করি, বন্ধুর মর্য্যাদা রক্ষা করি, তাহারা তাদের গ্রাম্য ভাষায় সরল কথায় অকৃত্রিম আলাপনে সে কার্য্য সমাধা করে।

সভ্য ও অসভ্যদের মধ্যে বাহিরের পার্থক্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ ইহাই। শিক্ষাহীনতা জন্য ভিতরেও আরও প্রভেদ আছে এবং সে প্রভেদ তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিতদের চক্ষে হেয় ইহাও ঠিক। কিন্তু যাহা তাঁহাদের চক্ষে হীন তাহাই যে সর্ব্বক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য তাহা কে বলিবে? যাহাদের অসভ্য বলি তাহাদের বাহিরের কার্য্যাবলীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে ; তুলনায় তাহা ভাল কি মন্দ, কি তাহাতে কতটা লাভালাভ, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় ; কিন্তু মনের দিক হইতে বিবেচনা করিলে বুঝি সাঁওতাল ধাঙ্গড় কুকি নাগপুর হাজারিবাগের পাহাড়িয়াদের সত্যবাদিতা, প্রত্যুপকারিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রভৃতি যে সব চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা কোন্ সভ্য সমাজভুক্ত লোককে না মুগ্ধ করে? তুলনা করিলে এই গুণাবলী কোন্ সভ্য জাতির মধ্যে এমন ব্যাপক ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়? চৌর্য্য, বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা অসভ্য অশিক্ষিতদের নিজস্ব গুণ, আর সাধুতা, অকপটচারিতা পরোপকারিতা সভ্য শিক্ষিতদের একচেটিয়া সম্পত্তি, এ কথা কে বলিতে পারেন? সুতরাং শিক্ষায় লাভ ও শিক্ষার অভাবে লোকসানের কথা কহিতে হইলে শিক্ষালোকে আলোকিত নয় এমন লোকদের ক্ষতি কতটা তাহা বলা কঠিন। সুভাবে সুখ শান্তি ভোগই যদি মানুষের কাম্য হয়, তবে তথাকথিত অসভ্যদের তুমি স্থানে তুই, জামা জুতার স্থানে খালি গা নগ্ন পদ, চা বিস্কুট স্থানে মুড়ি চালভাজা, মদের স্থানে তাড়িতে কি সুখ কি তৃপ্তির অভাব হয়, তাহা বুঝা কঠিন। পল্লী গৃহস্থের কাছে কালিয়া পোলাওএর স্বাদ, ইলেক্‌ট্রিক্ আলো পাখার সুখ, মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারের তৃপ্তি যেমন অজ্ঞাত, তেমনই তাঁদের কাছেও সজনে খাড়ার চচ্চড়ি, চৈত্রমাসে কচি নিমপাতা বা কচি আমের ঝোল কি তৃপ্তিদায়ক বা নিদাঘ মধ্যাহ্নে হাঁটুর উপর আট হাত কাপড় কতটা আরামের তাহাও অজ্ঞাত। মোটর জুড়ির অধীশ্বর অট্টালিকা-বাসী সভ্য শিক্ষিত বাবুগণ, তাদের সে সরল জীবন-যাপনের সুখ কতটা, কেমন করিয়া তাহার পরিমাণ করিবেন! তৃপ্তি আহারে নয়, বিহারে নয়, প্রাসাদে নয়, রাজসিংহাসনে নয় ; তৃপ্তি—মনে। ব্যাধিহীন দেহে প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে জল দেওয়া বাসি ভাত মুখে দিয়ে স্ত্রী পুরুষে সারাদিন ধরে দিন-মজুরী করে সাঁঝের সময় চাঁদের আলোয় ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের সমক্ষে গোময়লিপ্ত মাটির মেজের চ্যাটাইয়ের উপর শয়ন করে' আমাদের শ্রুতিসুখহীন তাদের নিজস্ব সরল ভাষায় কথোপকথন ; অথবা মধ্যাহ্নে গাভী চরাইতে চরাইতে গাছের তলায় বসে একটা তলতার বাঁশি বাজিয়ে গান করার মধ্যে কতকটা সুখ থাকতে পারে, পরচর্চ্চারত ব্যাধিদুঃখক্লিষ্ট প্রাসাদবাসী ভোগের দাস পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শুইয়া তাহা কিরূপে কল্পনা করিবেন? বাঁশঝাড় ও জঙ্গলময় পল্লীর বক্ষে দ্বিধাহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হিন্দু মুসলমান সব একত্র এক পরিজনের মধ্যে থাকার মত করে থেকে এক দাওয়ায় বা বারোয়ারি-তলার মাটির রোয়াকে বসে' ব্রাহ্মণকে মুসলমানের দাদাঠাকুর, এবং ব্রাহ্মণের মুসলমানকে করিম খুড়ো ব'লে সম্বোধন আলাপনের কি সুখ তাহা সভ্য সম্পন্ন সহরের শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান কি করিয়া উপলব্ধি করিবেন? সেখানে দু কাঁদি তাল কেটে বা দুটো সজনে ডাল ভেঙ্গে তার ডাঁটায় গাঁ শুদ্ধ লোকের খাওয়ার কি তৃপ্তি,—সভ্যতার দাস সহরের শিক্ষিত মানব তাহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবেন? মূর্খ অশিক্ষিতদের এই স্বাভাবিক শান্ত সরলতার লাভ বড়, কি সহরের কেতা-দোরস্ত শিক্ষিতদের কৃত্রিমতাময় কথায়, কাজে ও ব্যবহারে বেশি লাভ—কে তাহার নিরাকরণ করিবেন? শিক্ষিতদের কাছে এই সব আদব-কায়দা যত এত অন্যত্র নাই ; সুতরাং কৃত্রিমতাও এখানে অধিক আর এই কৃত্রিমতা মানেই সত্যের উপর আবরণ।

এই কি আমাদের আধুনিক শিক্ষার যা কিছু লোকসান বা লাভের কথা! আমাদের এখনকার যাহা শিক্ষা তাহা পাশ্চাত্যের দেওয়া। এই শিক্ষাই না কি আমাদের স্বাধীনতার স্পৃহা দিয়াছে। আবার স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার ইহাও এখনকার শিক্ষিত জনেরই কথা। জানি না আমরা আজ যদি মাতৃভাষায় জাতীয় ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে এই পরাধীনতার নিগড় কেমন করিয়া কুসুম-কোমল বলিয়া অনুভূত হইত বা এই জন্মগত অধিকার মাটি চাপা পড়িয়া থাকিত! এই শিক্ষা আমাদের জাতীয়তা লাভের পথে আমাদের সর্ব্বনাশ আনিয়াছে ও আনিতেছে। শিক্ষার নামে আমরা তাহাদের কাছে নিজেদের বিকাইয়া দিতে, আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। শিক্ষার নামে আজ বিদেশীদের কেরাণী মজুর নায়েব গোমস্তা হয়ে আমাদের রক্তে তাদের পোষণ ব্যবস্থাই করিয়া দিতেছি। শিক্ষার অঙ্গ সভ্যতার নামে আহারে ব্যবহারে, বিলাসে, কথায়, ভাবে, পোষাকে আজ সর্ব্ব প্রকারে আমাদের জাতীয়তা হারাইয়া বৈদেশিক প্রভাব আভরণ করিয়া শুধু তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল দৃঢ়তর করিতেছি মাত্র। শিক্ষিত হইয়া আমাদের ধর্ম্ম সমাজ শিল্প সবই ক্রমে ক্রমে ভাসাইয়া দিয়া দেশকে জন্মভূমিকে পরদেশীর পদতলে লুটাইয়া দিতেছি। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আমরা দিনে দিনে অন্নহীন বস্ত্রহীন হইয়া পড়িতেছি, তেমনই আমরা যাঁহাদের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি তাঁদের শ্রীবৃদ্ধির সহায় হইতেছি। শিক্ষাহীন কেঁইয়া মাড়োয়ারি ভাটিয়া প্রভৃতিরা নিজবলে বিশ্বাস রাখিয়া স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোন্ দুর্গম দূর দেশে না যাইতে পারেন? আর তেমনই শিক্ষিত বাঙ্গালী সামান্য চাকুরীর জন্য কোথায় না যাইতে প্রস্তুত? শিক্ষাহীন ও শিক্ষিতের মধ্যে প্রভেদ এখানেও। পূর্ব্বোক্ত দেশবাসীদের কেরাণীগিরী বিদ্যা শিক্ষা নাই ; সুতরাং অর্থ সংস্থানের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মশক্তির চালনা করিতেছেন ; তাঁহাদের পরিশ্রম-বিমুখতা নাই। আর আমরা শিক্ষিত হইয়া চক্ষের সামনে চাকুরী পাইয়া কর্ম্ম শক্তিতে দিন দিন পঙ্গুত্ব পাইতেছি। এই সব দুর্ব্বলতার ফলেই আজ

আমরা শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়, ভাবনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও হারাইতে বসিয়া সর্ব্ব রকমে দাসভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি।

আমাদের আত্মবিস্মৃতির ফলে এক কথায় শিক্ষার নামে আমরা কাঞ্চন ভুলিয়া কাচ লইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। এতদিন অনেকে শিক্ষার বিনিময়ে কেরাণী মুহুরী ইঞ্জিনিয়ার হইয়া গোলামি করিয়াছি, বাকি যাহারা শিক্ষাহীন থাকিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া কৃষি শিল্পের দ্বারা কতকটা স্বাধীন ভাবে অন্ন সংস্থান করিয়াছিল, আজ তাহাদের সে দিনও যাইতে চলিয়াছে। আর কেরাণী নায়েব মুহুরীরূপে পাইয়া কাজ মিটিতেছে না—ও-সবের জন্য লোকাভাব অনেক দিন ঘুচিয়াছে। এখন ভোকেশান্যাল এডুকেশনের নামে আবার তাঁহাদের সূত্রধর রাজমিস্ত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। যে মোহে আমরা এই সবের মধ্যেও মধুরত্ব পেয়েছি, সেও এই শিক্ষারই মোহ। মোহের বশেই আজ প্রত্যক্ষ সর্ব্বনাশের কূলে বসেও এই শিক্ষাতেই আবার ডুবিতে যাইতেছি। আমাদের ধন মান শিক্ষা দীক্ষা হাব ভাব সমস্তই স্বেচ্ছায় বিদেশীর হাতে তুলে দিয়ে তারপর স্বরাজের ভিক্ষাপাত্র হস্তে বসে থাকা, এ একটা গভীর রহস্য বা জগতের অন্যতম আশ্চর্য্য বলা যাইতে পারে। তার পর নিরক্ষর মূর্খ পল্লীবাসী ও কৃষক কৃষাণ। তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার একটা পাকা রকম ব্যবস্থার কথা হইতেছে। যাঁহাদের কৃপায় আমাদের এই উচ্চ শিক্ষা, তাঁহারাই এই নূতন শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী হইয়াছেন। এ শিক্ষার লাভও যে কি হইবে তাহা ভবিতব্যই জানেন।

আমরা কেহ কেহ মুখে বলিয়া থাকি, এখনকার বিদ্যা অর্থকরী; কিন্তু সে কথার অর্থ খুঁজিয়া পাই না। তাহা হইলেও বুঝিতাম একটা বড় সমস্যার সমাধান হইল। কিন্তু কৈ, সে দিকেও আশার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ইংরাজের চাকুরী লাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রারম্ভিক যুগে যাঁহারা এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা চাকুরী পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় সে কয়জন? আর ঠিক চাকুরী দ্বারা প্রকৃত অর্থ সংস্থান করিয়াছেনই বা কয়জন? অথচ এই লোভে পড়িয়াই আমাদের উপযোগী আমাদের দেশের শিক্ষা আমরা ছাড়িলাম। আমাদের ক্ষুধাও মিটিল না জাতিও দিলাম।

অর্থের জন্য শিক্ষা বা শিক্ষা ও অর্থের সমন্বয় চেষ্টা—ইহা এ দেশের নয়, এ দেশে কখন প্রচলিত ছিল না। জ্ঞানার্জ্জন জন্য বিদ্যাচর্চ্চাই এ দেশের পুরাতন আদর্শ। এদেশে শিক্ষিতদের সভ্যতা, আড়ম্বরময় পোষাকের দৈন্যে অথবা দারিদ্র্যের জন্য কোন দিন ম্লান হয় নাই; অথবা বিলাসী ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছেও সে দৈন্য কখন প্রতীয়মান হয় নাই। বিদ্যাই মানুষের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আভরণ বলিয়া চিরদিন বিবেচিত হইয়াছে, বিদ্বানই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছেন। বিদ্বানের আসন রাজসভায়ও সব দিন বিশেষ স্থান পাইয়াছে। রাজপুত্রও বিদ্যার্থীরূপে গুরু-পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিত। তখন অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন ও ঐশ্বর্য্যহীনতা, অসভ্যতা বর্ব্বরতা বলিয়া বিবেচিত হইত না। দেশের কাছে শিক্ষিতের কাছে শিক্ষাই সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য ছিল সে শিক্ষার চাহিবার ছিল শুধু বিকশিত বুদ্ধি, মার্জ্জিত রুচি ও উন্মেষিত জ্ঞান। তখন যাহার দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ পরিণতি হইত, তাহাই শিক্ষা নামে অভিহিত হইত। সেই বৃত্তি লইয়াই তখন ছেলেদের লেখাপড়া শিখানো হইত। ইংরাজ বণিক বাণিজ্যের নামে অনেক জিনিষের সহিত আমাদের সে মনোবৃত্তিও জয় করিয়াছে। সে অর্থে শিক্ষা কথাটি আর বড় বেশি ব্যবহৃত হয় না। আর তাই আজ পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদেরও মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে, আমরাও তাঁহাদেরই মত মনে করিয়া থাকি, ইংলণ্ডের ভাষায় শিক্ষার ছাপ যাহার না থাকে, সে তাহার মাতৃভাষায় যত বড় পণ্ডিতই হৌক, শিক্ষিত বা সভ্য বলিতে যাঁহাদের বুঝায় তাঁহাদের গণ্ডির মধ্যে তাঁর স্থান হইতে পারে না। ভিতরের কথা এই ত গেল,—বাহিরেও তাহাই। শীতের দিনে দোহারা কাপড়ের বুক-পাশে ফিতা বাঁধা আমাদের দেশোপযোগী সহজ সস্তা আরামপ্রদ বেনিয়ন জামাও বহু স্থলে যিনি পরিধান করেন তাও তাঁর কতকটা অসভ্যতার পরিচায়ক। সে সব স্থানে সভ্য মত পোষাক হইতেছে গলা ও বুক খোলা জামা। সভ্য হইবার জন্য ইংরাজি শিক্ষা যেখানে চাইই, ইংরাজ-পছন্দ পোষাক ভিন্ন যেখানে সভ্য হওয়া যায় না, মাতৃভাষা বা সুবিধা ও দেশোপযোগী অথবা জাতীয় পোষাক হীনতার পরিচায়ক, ইহা যে শিক্ষা হইতে পাইতেছি তাহাই আমাদের গরিষ্ঠ শিক্ষা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, হায় আমাদের অদৃষ্ট।

আজ দেশে শিক্ষার আদর্শ ভিন্নরূপ, শিক্ষিতের স্বরূপ স্বতন্ত্র। বিদ্যায় তখন দিত বিনয়, জ্ঞান-গরিমা, এখন বহু ক্ষেত্রেই দিতেছে অহংজ্ঞান, আত্মগরিমা। আজ দেশে যখন অর্থসমস্যা, অন্নসমস্যাই সব চেয়ে বড় সমস্যা, তখন শিক্ষায় দিতেছে কর্ম্মশক্তির অসাড়তা, শ্রমবিমুখতা এবং দাসত্ব স্পৃহা ও আত্মবিস্মৃতি। তখন শিক্ষিতজন ছিল জ্ঞানের আধার, শিক্ষাতে মানুষকে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিত। অর্জ্জিত বিদ্যা জীবন পথের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ছিল। আর আজ সেই বিদ্যা শীতের দিনে গরম শীতবস্ত্রের পরিবর্ত্তে হইয়াছে কতকটা দৃষ্টি মনোরম মূল্যবান সুখ-গাত্রাবরণের মত। এ সজ্জা সভ্যতানুমোদিত পরিচ্ছদেরই মত। ইহাতে সজ্জিত হইয়া সভায় শোভা বর্দ্ধিত করা যায় বা সামান্য গৃহস্থ এবং দীনজনের দৃষ্টিতে আড়ম্বরময় হওয়া যায় বটে; কিন্তু ইহাতে শীত নাশ হয় না। বরং ইহার সৌন্দর্য্য রক্ষার্থ ব্যস্ত থাকায় কাজের ব্যাঘাত ঘটে।

আমরা যখন অশিক্ষিত বর্ব্বর ছিলাম,তখন পেট ভরিয়া দুবেলা খাইতে পাইতাম। পরনের কাপড় নিজেরাই প্রস্তুত করিতাম, এমন কি উদ্বৃত্ত বস্ত্র পৃথিবীর বহু দেশে সরবরাহ করিতাম। তখন ছিল ক্ষেত্রে ফসল, উদ্যানে ফল, পুকুরে মৎস্য, গোলা ভরা ধান; তখন ছিল অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, হৃদয়ে উল্লাস, পল্লীজনের মধ্যে অকপট সৌহার্দ্দ, আনন্দ-মুখরিত গ্রাম। আমরা নিজেদের গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলাম। কিন্তু আজ আমরা শিক্ষিত হ'য়ে কোথায় হারালাম সে সুখ শান্তি, ধনরত্ন,—আমাদের সে মহিমা, গরিমা। আমাদের সোনার দেশে আজ আমরা অন্নের কাঙ্গাল।

আমি জানি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁহারা এই সামান্য লেখকের কথা একটুও ধরিতে চান,তাঁহাদের কাছে একটা ভীষণ প্রতিবাদ পাইতে পারি। তাঁহাদের কথা—সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ,

জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়েরই দান। মহামানব গান্ধীকেও এইখান হইতেই পাইয়াছি। নাম করিবার আরও আছে সত্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা না পাইলে তাঁহাদের পাইতাম না এ কথা ধরিয়া লইলেও এবং মৎপক্ষ সমর্থনের জন্য রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম না লইলেও এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিব, তুলনায় সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর। এখানে আরও একটা কথা বলা দরকার, এখনকার শিক্ষার মধ্যে লাভ যে কিছুই নাই ইহা আমার বলিবার কথা নয়। জাতীয়তার দিক দিয়া এখন সাধারণ ভাবে যে লাভ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে বলিতে হয়, এখন যাহাকে শিক্ষা বলা যাইতেছে তাহা শিক্ষা নয়, শিক্ষার নামে শিক্ষার অবমাননা মাত্র।

দিল্লীর রূপায়তন

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

এস্কিমোরা গোটা-দুই-তিন আঁচড় আঁকা-বাঁকা ভাবে টেনে একটা হাতী ঘোড়া বা ম্যামথের পরিষ্কার জীবন্ত ছবি শক্ত হাড়ের ওপর ফুটিয়ে তুল্‌ত ...কথাটা কারো অবিশ্বাস নয়; কারণ, যে কোন একটা যাদুঘরে গেলেই তার রাশি-রাশি নিদর্শন চোখে পড়ে। আমাদের শ্যামলা বাঙলায়ও ঘরে ঘরে শাঁখের গায়ে, দেয়ালের গায়ে কতকগুলি সোজা ও বাঁকা সরু ও মোটা রেখা দিয়ে আলপনায় যে কত রকম বিচিত্র লতাপাতা বা দেব-দেবীর ছবি গৃহলক্ষ্মীরা ফুটিয়ে তুল্‌তেন—সেগুলিও তস্‌বির জগতে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। কটকের বাসনের চটক বিখ্যাত হ'য়ে গেছে তার গায়ের কারুকার্য্যে।

শিল্প প্রাণের জিনিষ। মনের ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে যেমন দরকার লেখার—তেমনি দরকার রেখার। তুলি ও কলম সরস্বতীর দুই ক্রীড়নক। আমাদের বাঙলায় আজ তুলি ও কলমের রাজত্ব চলেছে। সেই বাঙলারই ভাবধারা হাজার মাইল দূরে দিল্লীতে এসে সাড়া দিয়েছে। দিল্লী এককালে শিল্প সম্ভারে শ্রেষ্ঠ ছিল; কিন্তু বর্তমানে তার মনের ভিতরকার শিল্পের সূক্ষ্ম ভাবধারা লোপ পেয়েছে। তারা আজকাল তাদের কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়ালে রামসীতা বা হনুমানজীর বিচিত্র পট এঁকে দিতে আরম্ভ করেছে। যে দেশে শিল্প বা সাহিত্যের চর্চা হয় না ..কবির বীণার সুর-ঝঙ্কারে যেখানে লোকে মোহিত হয় না ..শিল্পীর তুলির রঙে যেখানকার আকাশ বাতাস রঙীন হ'য়ে ওঠে না ·সে দেশকে অন্ধকার পাষাণপুরী বলা চলে। দিল্লীরও এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

আজ এদেরই মাঝে দিল্লীর প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সারদাচরণ উকীল, মাননীয় এস্‌. আর, দাশ, রায় বাহাদুর লালা সুলতান সিং, দিল্লীর চিফ্‌-কমিশনার, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রকুমার সেন প্রভৃতির উদ্যোগে শিল্প প্রদর্শনী খোলা হ'য়েছিল। সাধারণের সামনে রূপদক্ষরা এই রূপচত্রের দরজা খুলে দিয়ে যে ধন্যবাদভাজন হ'য়েছেন তাতে সন্দেহ নাই।

প্রদর্শনীর সাজসজ্জা সমস্তই প্রাচ্য ধরণে প্রস্তুত হ'য়েছিল; এবং কলানুযায়ী হ'য়েছিল। তা ছাড়া বম্বে, মাদ্রাজ, বাঙলার প্রাচীন চিত্রাবলী প্রভৃতি এরূপভাবে সাজান হ'য়েছিল যে দেখিবামাত্র ছবির শ্রেণী ভাগ করা যায়। ছবিও এসেছিল প্রচুর। তবে আমাদের দেশের যাঁরা শ্রেষ্ঠ চিত্রীশিল্পী, তাঁদের ছবি বেশী আসেনি। যাও এসেছিল তা আবার প্রতি-যোগিতার জন্য নয়।

প্রথম পুরস্কার পেয়েছে বাঙলারই শিল্পী অশ্বিনী রায়ের 'দধীচি'। ছবিটিতে শিল্পী ধ্যানমগ্ন 'দধীচি'র পূত ভাব ও বক্ষপঞ্জরের তেজঃপুঞ্জ ভাব খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেবতাদের সৌম্যভাব প্রশংসনীয়। ত'বে পার্শ্ব দৃশ্য (Back Ground) ওরূপ মেঘাচ্ছন্ন করবার কারণ বুঝিলাম না। তাঁর 'বিরহী শিব'ও সুন্দর হ'য়েছে; ত'বে পার্শ্ব দৃশ্য তুষারাচ্ছন্ন করলে বোধ হয় ভালো হ'ত এবং ছবিটির ভাব আরও ফুটত।

এর পরেই তরুণ শিল্পী রণদা উকীলের 'ভোজরাজ ও বত্রিশ পুত্তলিকা' ছবিটির উল্লেখ করা যায়। প্রদর্শনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ decorative ব'লে এটা পুরস্কার পেয়েছে। বর্ত্তমানে য়ুরোপে decorative artএর ধরণে চিত্রাদি আঁকা লোপ পেয়েছে। ভারতেও এক বরোদার প্রমোদবাবু ছাড়া আর কেউ এদিকে মন দেন নি। রণদাবাবু যে তাঁর এই নিজস্ব ধরণে শ্রেষ্ঠ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর "বসন্তবঁধু" চিত্রটী যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এটী বুঝবেন। "বসন্তবঁধু" পঠমঞ্জরীর—

> নেত্রাম্বুধারাঙ্কিতা চারুদেহা বিয়োগ দুঃখানত চন্দ্রবক্তা।
> চিরং প্রিয়ং ধ্যানরতা সুদীনা মুহু শ্বসন্তী পঠমঞ্জরীয়ম্‌॥"

পঠমঞ্জরী বিরহ যন্ত্রণায় চন্দ্রবদন নত করিয়া অতি দীনভাবে বহুক্ষণ স্বামী চিন্তায় নিমগ্ন থেকে মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করছেন রাগিণী বসন্তের এই রূপ ছবিটীতে দেখান হ'য়েছে। তাঁর রাধা' ও কৃষ্ণ,' 'তাজনির্ম্মাণ স্বপ্ন' প্রভৃতি অতীব সুন্দর হ'য়েছিল।

এর প'রেই লাহোরের প্রসিদ্ধ শিল্পী চাঘ্‌তাইএর নাম করা যায়—তাঁর অঙ্কিত 'প্রেমশিখা,' 'সাহারার রাণী,' 'আকুলতা' প্রভৃতি ছবিগুলি সুন্দর ও মনোহর হ'য়েছে। 'প্রেমশিখা' ছবিটিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের—

> "...পুষ্প যেমন আলোর লাগি
> না জেনে রাত কাটায় জাগি
> তেম্‌নি তোমার আশায়
> আমার হৃদয় আছে ছেয়ে।"

এই ভাবটী ফুটে উঠেছে। এই ছবিটী প্রদর্শনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও রূপক চিত্ররূপে পুরস্কার লাভ করেছে।

Black and white বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে বরদা উকীল অঙ্কিত 'মা' নামক ছবিটী। ছবিটীতে মাতৃত্বের মহীয়সী ভাব অক্ষুন্ন রয়েছে। তাঁর-'সাঁওতালবালা' ছবিটীও মনোরম।

এর পরেই শ্রীমতী প্রতিমা দেবী অঙ্কিত 'সরস্বতী'র নাম করা যেতে পারে। ছবিটী মহিলা অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে পুরস্কার পেয়েছে। প্রতিমা দেবী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে ছবিটীর সৃষ্টি করেছেন তাঁহার গ্রীষ্মের রূপ ছবিটীতে বৈশাখের তৃপ্তিহীন রুদ্র রূপ দেখান হ'য়েছে।

হালদানকরের 'পবিত্র দীপ' এবং পারনান্দেকর অঙ্কিত 'সাঁচিস্তূপ' ছবি দুটী উল্লেখযোগ্য। প্রথমটী দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে পুরস্কার পেয়েছে এবং শেষেরটী তৈলরঙ ও স্থপতি বিষয়ক বলে দুইটী পুরস্কার পেয়েছে। ছবি দুটীই চমৎকার।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ চিত্র এসেছিল। তাঁহার চিত্রগুলি প্রায় সকলেই দেখেছেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। তাঁহার 'মেঘদূতম্' 'ডাকবাঙলো' 'বক্তিয়ারের অনুসরণ' এই ছবি তিনখানি যে প্রদর্শনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তা নিঃসন্দেহ। 'মেঘদূতম্' ছবিটীতে উতলা কলাপীর নর্ত্তন এমন সুন্দরভাবে দেখান হ'য়েচে যে, একবার দেখিলে ভোলা যায় না। 'বক্তিয়ারের অনুসরণ' ছবিটীতে অন্ধকারের বুক চিরে আব্‌ছাভাবে যেরূপ সুন্দররূপে নৌকাটী আঁকা হ'য়েচে তা প্রায় দেখা যায় না।

তার পর অবনীন্দ্রনাথের যোগ্য শিষ্য প্রসিদ্ধ শিল্পী সারদাবাবুর 'ইদের চাঁদ' 'সতী বিয়োগে' 'সমাধি পাশে' প্রভৃতি ছবি অতুলনীয়। 'ইদের চাঁদ' ছবিটীতে গরীব ঘরের যে নিখুঁত ছবিটী দেখিতে পাই তা ছবিতে সচরাচর দেখা যায় না। সমাধি পাশে ও 'সতী বিয়োগে' ছবি দুটী সিল্কের ওপর আঁকা—বিয়োগ বেদনা ছবি দুটীতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেচে। 'সতী বিয়োগে' ছবিটী দেখিলে মনে হয় পাষাণও যেন বেদনায় গলিয়া পড়িতেছে। আর একটী ছবি ছোট্ট হ'লেও নজরে প'ড়ে—সেটী ঝর্ণা ধারে'। ছবিটীর ভিতরে একটা করুণ ভাব জেগে উঠেচে। তাঁর ছবির কথা বলাই বাহুল্য।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—স্বপ্ন' 'মায়াপুরী' ছবি দুটীর অঙ্কন-চাতুর্য্য প্রশংসনীয়।

সমরেন্দ্র গুপ্তের ছবিগুলিও মনোহর হ'য়েচে। দাক্ষিণাত্যের বিজয় রাগ্য অঙ্কত 'অভিসারিকা' ও 'কুমুদিনী' বেশ হইয়াছে।

ইহার সহিত সুশীলকুমারের কথা বলা উচিত। সুশীলবাবু মূক ও বধির হইয়া সারদাবাবুর শিক্ষকতায় এক বৎসরের মধ্যেই যেরূপ সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন তাহা অতীব আনন্দের বিষয়।

সুনয়না দেবী অঙ্কিত চিত্রাবলী ও সুশীলা দেবী কর্ত্তৃক শ্লেট পাথরে ক্ষোদিত 'নর্ত্তকী' চিত্রটী মনোরম হইয়াছে।

ইহা ছাড়া দিল্লী 'মডার্ণ স্কুলে'র দশ বৎসরের একটী ছাত্র ও নয় বৎসরের একটী ছাত্রী Pen and ink এবং নক্সা চিত্র খুব সুন্দরভাবে আঁকিয়াছে। এ দুটীই পুরস্কার পেয়েছে।

দিল্লী প্রদর্শনীতে আর একটী বিভাগ খোলা হ'য়েছিল, যার মূল্য শিল্পরস-পিপাসুদের কাছে খুব বেশী—তা প্রাচীন মূল চিত্রাদির সমাবেশ।

ইহার মধ্যে কাশ্মীরি রামায়ণের চিত্রাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলি সিপাহী বিদ্রোহের সময় এক অশিক্ষিত গোরা সিপাহীর হাতে পড়ে। সে ছবিগুলিকে রামায়ণ হইতে ছিঁড়িয়া বইখানি ফেলিয়া দেয়। পরে একজন এগুলি কিনিয়া ছিলেন। এক্ষণে উহা পণ্ডিত অমরনাথ নামক এক ভদ্রলোকের সম্পত্তি। ছবিগুলি সংখ্যায় ৭১—এবং ইহাতে রামের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বনগমন, অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেক, সীতার পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ ধনী রায় বাহাদুর লালা পরাশ দাশের সংগৃহীত রাজপুত ও মুঘল চিত্রাদি দর্শন যোগ্য। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, সেলিমের দরবার দিল্লীর শেষ বেগম জীনৎমহল, মুহম্মদ তুঘ্‌লক প্রভৃতি ছবি খুব সুন্দর। ইহা ব্যতীত অভ্রের উপর অঙ্কিত প্রাচীন চিত্রাবলী বড়ই আশ্চর্য্যজনক ও মনোরম। এই ছবিগুলি দেখিয়া জঙ্গীলাট বাহাদুর বলিয়াছেন—এরূপ সুন্দর ও সুপ্রশস্ত অভ্রখণ্ড কোথায় পাওয়া গেল? এমন নিখুঁত যে কাচের সহিত ইহার প্রভেদ নাই।

সুখের বিষয় দিল্লী প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত সাড়ে সাত হাজার টাকার ছবি মহারাজা পাতিয়ালা, মহারাজা বিকানীর, মহারাজা কর্প্‌রথালা প্রভৃতি দেশীয় রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলী কিনিয়া লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীলের উদ্যোগ ও উদ্যম প্রশংসনীয়। এই প্রথম বৎসরেই যেরূপ সুন্দর চিত্রাদির সমাবেশ হইয়াছিল, আশা করা যায়, আগামী বৎসরে এই প্রদর্শনী আরও সাফল্য লাভ করিবে।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল মহাশয়ের চেষ্টায় দিল্লীতে শিল্পকলার চর্চ্চা মাত্র কয়েক বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আবহাওয়া ইতিমধ্যেই বদলাইয়াছে, রুচিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার শিক্ষকতায় দিল্লী মডার্ণ ছাত্রবৃন্দ বেশ আশানুরূপ চিত্রাদি আঁকিতেছে। তরুণ শিল্পী রণদা বাবুর চিত্রাদিও উত্তর ভারতে একটা সাড়া আনিয়াছে। গত সিমলা প্রদর্শনীতে তাঁহার অঙ্কিত "শ্রীদুর্গা" সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করায় তাঁহার নিজেরও সম্মান বাড়িয়াছে, বাঙালীরও সম্মান বাড়িয়াছে। প্রাচীন ভারতের ভাবধারা যে শিল্পের ভিতর দিয়াও এতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে তাহা সত্যই আমাদের গৌরবের বিষয়।

হিন্দ্‌ ও ইরাণের যোগ-সন্ধানে

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

মনে হয় আজ, কোন্ সে আদিম জগতে, প্রথম প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে, অগ্নিহোত্রী আর্য্য-জাতির প্রাণের স্পন্দন ছন্দ-ঝঙ্কারে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল; মনে পড়ে, দুইটী ভ্রাতৃজাতি;—জ্ঞানে গরীয়ান, স্বাধীনতায় অটল, সত্যব্রতে মহীয়ান্; কল্পনায় অতুল; আর মনে পড়ে এই সৌভ্রাত্র-মিলনের ব্যপদেশে বিশ্বজগতে নূতন উষা-বন্দনা-গীতি!

আবার মনে পড়ে সেই দিন যে দিন এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদের অন্তরালে এই দুইটী জাতি সমগ্র এসিয়া-খণ্ডের পরাভব ও পতনের প্রথম সোপান রচনা করিয়াছিল! সহযোগিতা ও মিলন-বিমুখতার জন্যই এই দুইটী সমাজকে ক্রমে ক্রমে সেমিটিক (Semetic) ও টুরানিয়ান (Turanian) জাতিদ্বয়ের বর্ব্বরতার রক্তানলে আহুতি প্রদান করিতে হইয়াছে; পরিশেষে সমগ্র এসিয়াখণ্ডের মহাপতনে সে বিরাট কালানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আজ আবার এই দুই সমাজের সংহত শক্তির উপর সেই অধঃপতিত মহাদেশের উন্নতি ও জাগরণ বিশিষ্টভাবে নির্ভর করিতেছে।

মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিকাল হইতেই হিন্দ্‌ ও ইরাণ দুইটী সমাজই

সমগ্র এসিয়ার চিন্তাধারাকে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে। তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষাকে অপরাপর দেশসমূহ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চিরন্তন ভাবে প্রতিপালন ও পরিপোষণ করিয়া চলিতেছে। এই সে হিন্দের "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' এসিয়ার মহাদেশ চীন সাম্রাজ্যের ধর্ম্মমন্ত্র; এই সে ইস্লামের সুফীধর্ম্ম, হিন্দের 'সোঽহং' আর ইরাণের মজদাপন্থার রূপান্তর।

ইরাণ সভ্যতার আসন আরব সভ্যতার এত ঊর্দ্ধে যে কোনও ক্রমেই ইহাদের কোনও তুলনা চলে না; আর শুধু এই চিরপ্রমাণিত তথ্যের উচ্চারণে যুগে যুগে যে কত লোককে অত্যাচারিত ও ক্লিষ্ট হইতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

অন্ধ কবি বাস্ সার (Bash Shar) এই তথ্যটী অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিবার বিনিময়ে প্রাণদণ্ড লাভ করেন (১)। আমরা সে কথাটী এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The earth is dark and the fire resplendent and the fire has been adored since it became fire."

[ভাবার্থঃ—ধূম্রবর্ণ জড় মৃত্তিকাখণ্ডের সহিত জ্বালামুখী তেজোময় অগ্নির কি বিরাট পার্থক্য! অগ্নিতে এই অগ্নির বিকাশে কে না মুগ্ধ হয়?—মনে রাখিতে হইবে পারসিক আর্য্যেরা অগ্নিহোত্রী।]

ভগবানের ইচ্ছা চিরদিনই অভাবনীয় ও রহস্যময়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতাকেও যখন ভাণ্ডাল (Vandal) ও গথদিগের পাকচক্রে পরাভব মানিতে হইয়াছিল, তখন অসভ্য আরবদিগের অত্যাচারের সম্মুখে যে ইরাণের এই প্রাচীন ও বিরাট সভ্যতা বিচলিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এই পরাভব ও পতনের অন্যান্য যে সকল কারণই থাকুক না কেন, ইরাণ ও হিন্দ্‌এর পরস্পর অসহযোগিতা যে একটী প্রধানতম কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

দরিয়ুস অথবা জেরাক্সসএর অসাধারণ কার্য্যশক্তি ও সাধনা যদি চাণক্য অথবা শুক্রাচার্য্যের প্রেরণা ও মন্ত্রণায় নিয়ন্ত্রিত হইত, তবে বিশ্ব-জগতের কোনও রাষ্ট্রপদ্ধতি তাহার সমকক্ষ হইতে পারিত না এই দুই সমাজের মহামিলনে যে এক পরিপূর্ণ ও অখণ্ড শক্তির উদ্ভব হইত, তাহা চিন্তা করিলেও মন বিস্ময়াবিষ্ট হয়। ম্যাজিনির মত চিন্তাবীরের অনুপ্রেরণায় প্রবুদ্ধ হওয়াতেই কর্ম্মবীর গ্যারিবল্ডীর শক্তিত্রতে ইটালীর ভাগ্য রচিত হইয়াছে; তাই আজ ইটালীর ঐশ্বর্য্য বিশ্বজগতের বুকে জ্বলজ্বল করিতেছে। চিন্তার সঙ্গে কর্ম্মের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকিলে কোনও বিরাট কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মন চিরদিনই ভাবপ্রবণ; আর ইরাণীর মধ্যে কর্ম্মপ্রবণতা সমধিক। এই দুই জাতির সংমিশ্রণে পরস্পরের দোষ ক্ষালন হইয়া একটা বিরাট পরিপূর্ণ শক্তির উদ্বোধন হয়। চীন ভারতের ভ্রাতৃ-জাতি নহে, মানব ইতিহাসের প্রথম হইতে চীনের সঙ্গে হিন্দ্‌এর সাদৃশ্য বেশী পরিস্ফুট নহে; তথাপি শক্তির সামঞ্জস্য সাধনে উভয়ের মিলনের সার্থকতা আছে। আর ইরাণ! তাহার কথা একেবারে স্বতন্ত্র। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন সর্ব্ববিষয়ে ইহারা একীভূত। উভয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা একই ভিত্তির উপর। জীবনযজ্ঞ একই রীতিনীতির ও পন্থার অনুসরণে।

এই মহামিলনের যুগে সমগ্র অগ্নিহোত্রী আর্য্যসমাজের পুনঃ সংগঠনের জন্য এই দুইটী আপাত-বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণ অত্যন্ত দরকারী। মেকলে বলিয়াছেন, 'minds differ as rivers differ' স্রোতস্বতীর মত মানুষের মন বিভিন্ন ভাবে চলে।—কেহ বা ধর্ম্মরাজ গৌতমের প্রচারিত অহিংসা-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত, কেহ বা ধর্ম্মরাজ জরথুষ্ট্রদেবের ধর্ম্মনীতি 'হোর্ব্বতাত্' সত্যপথে অটল। রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা এই বিভিন্নতায় পরিচয় সর্ব্বদাই পাইয়া থাকি, যেমন মহাত্মা গান্ধী আর লোকমান্য তিলকের অনুসৃত পন্থা নির্ব্বাচনে।

পৃথিবীর যে কোনও আদর্শ ধর্ম্মে মানব মনের বিভিন্ন ভাবের স্বাধীনতা ও পন্থার স্থান থাকিবেই। আদর্শ ধর্ম্মে মানসিক জীবনের তিনটী অঙ্গ চেতনা (Knowing) কামনা (willing) ও বেদনা (feeling) এই তিনটী ভাবের স্থান প্রকৃতই লক্ষ্যের বিষয়; আর ধর্ম্মরাজ গৌতম, জরথুষ্ট্র ও গোবিন্দের মধ্যে এই ত্রয়ীর যে প্রকৃষ্ট পরিচয়, সাধন-নীতি ও বিচিত্র বিকাশ লক্ষিত হইবে এমন আর কিছুতেই নহে। ধম্মপদ, গাথা ও গীতার (২) একত্র সমাবেশে যদি একটী 'ত্রিপিটকে'র স্থিতি স্থাপন সম্ভব হয়, তবে পৃথিবীতে এমন কোনও ধর্ম্ম বা ধর্ম্মনীতি নাই, যাহা এই সংহতিকে অতিক্রম করা তো দূরের কথা, এমন কি কল্পনা-নেত্রেও সমকক্ষ হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে!

ভারতের ভিত্তির উপর কেমন করিয়া ধর্ম্মরাজ জরথুষ্ট্রের ধর্ম্মনীতি রক্ষিত ও সঞ্জীবিত রহিয়াছে, সে কথার আলোচনা আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করিতে চেষ্টা করিব। সহোদর-ভ্রাতার মধ্যে যে সম্বন্ধ, এই দুইটী জাতির মধ্যেও ঠিক তাই। আর এই বিশ্বপ্রেমের যুগে এই দুইটী নিকটতম আত্মীয়ের পরস্পর সম্মিলন কি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় নহে? আর সত্য কথা বলিতে কি, এই বিশ্বপ্রেমের ভিত্তি প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ এই নিকট আত্মীয়ের মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত; অন্যথা এই প্রথম সোপান বর্জ্জন করিয়া শুধু চীৎকার করিলে কি হইবে?

জেন্দ্ ভাষায় 'পয়গম্বর' (Carrier of mission) অথবা সংস্কৃত ধর্ম্মরাজের (Lord of duty) সংজ্ঞায় এই বিরাট অতিমানবত্রয়ের সম্পূর্ণ শক্তি প্রকাশ হয় না—নারায়ণ (Resort of all mankind)ই ইহার একমাত্র সংজ্ঞা। এই নর ও নারায়ণের একত্র সমাবেশ মহাভারতের অনেকস্থলে দৃষ্ট হইয়াছে (শান্তিপর্ব্ব ৩৩৩-৩৪); এবং প্রতি অধ্যায়ের প্রথমেই "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্" এই শ্লোকের আবরণে এই বিরাট সংজ্ঞার বন্দনা উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। পরন্তু এই এই ঋষি

---

(১) Browne's Literary History of Persia, vol I, P. 267.

(২) ধম্মপদ:—বুদ্ধগীতা, বৌদ্ধদিগের নিত্য পাঠ্য ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্মনীতি।

গাথা:—জরথুষ্ট্র-গীতা। অগ্নিহোত্রী পারসিকদিগের নিত্যপাঠ্য।

নারায়ণ প্রবৃত্তিমার্গের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম ঋষি নারায়ণো অব্রবীত।—শান্তিপর্ব্ব ৩৭৪—৮৩।

ঋষি নারায়ণই প্রবৃত্তি-মার্গের (আত্ম-দর্শন Self-realisation) প্রচারক। কিন্তু এখানেই ইহার শেষ নহে। পয়গম্বরের প্রথম শিষ্য "ফরসোষ্ট্রকে" (যস্না ৪৬, ১৩-১৪) নানা স্থানে প্রকৃষ্টরূপে 'নর' আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে (যস্না ২৮-৮)। আর ধর্ম্মরাজ জরথুষ্ট্রদেবের প্রধানতম প্রচার বার্ত্তা এই প্রবৃত্তিমার্গ সাধন (আত্মদর্শন—হৌর্ব্বতাত)। এই উভয় ঘটনা একত্র চিন্তা করিতে গেলে মনে হয় যে মহাভারতে উল্লিখিত এই ঋষি নারায়ণ ধর্ম্মরাজ জরথুষ্ট্রদেব ব্যতীত আর কেহ নহেন। এই সংজ্ঞবদ্ধতার যুগে এসিয়ার সমগ্র আর্য্য-সমাজের এই নারায়ণত্রয়ের পাদমূলে, ক্ষুদ্র সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়া নবীনতর ধর্ম্মালোকে এক বিরাট সংহত শক্তির উদ্বোধন প্রয়োজন। (৩)

কিন্তু এই সংমিশ্রণকে ব্যষ্টিগত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী ভাবিয়া চিন্তিত হইবার কারণ নাই; কারণ ইহাতে সামাজিক সংযোগের কথা আসে না। যে ক্ষেত্রে হিন্দুদের সহিত একই ধর্ম্মনীতি অনুসরণ করিয়া জৈন সম্প্রদায় এক নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে, শিখসঙ্ঘ এই একই জাতীয়তার আবহাওয়ার মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, সেখানে ধর্ম্মসংযোগে সামাজিক সম্পর্কের কথা উঠে না। এই যে ধর্ম্মরাজ গৌতম, যাহার উপর অনেকে নিরীশ্বরবাদিতার দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই তিনিও যখন অবতাররূপে পূজা ও বন্দনা পাইয়া আসিতেছেন, তখন ধর্ম্মরাজ জরথুষ্ট্রই বা কেন না এ পূজা পাইবেন? আর বৌদ্ধগয়া যদি হিন্দুর পক্ষে পরম তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে মজদা ধর্ম্মের প্রচার স্থান রাই (Rai) নগরী কি করিল?

আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋক্‌বেদের সূক্তের ভাষা ও ভাবধারার সহিত 'গাথা'র শ্লোকের কি প্রকার নিকট সম্বন্ধ তাহা পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। আমরা এখানে মাত্র একটী শ্লোকের উল্লেখের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

যেহ্যা বক্সো বহু ফ্রাসি মনংহা।
অহ্যা ক্রতু ফ্রোমা শাস্ত বহিস্তা ॥ (৪)
যস্না (যজ্ঞ) ৫১-৬

এত সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য থাকিতেও আমরা যে একটা বিরাট মনগড়া পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া, গোটা আর্য্য সমাজ ও আর্য্য দেবতার অবমাননা করিতেছি, ইহা কি একান্ত পরিতাপের বিষয় নহে?

মানব ইতিহাসের প্রথম হইতেই যে এই দুইটী প্রাচীন জাতি একই ছিল তাহার পরিচয় উভয়ের আচরিত রীতি নীতি, আচার বিচার, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতিতে সুচারুরূপে প্রকট হইয়া আছে। ইহাদের দৈব পরিকল্পনা একই ছিল; একই অগ্নিদেবতাকে উভয়জাতি পূজা করিত। সর্ব্বজীবে করুণা, বিশেষ করিয়া গো মাতার প্রতি ভক্তি, তাহাতে একটী অখণ্ড মূর্ত্তিমতী শুচিতার পরিকল্পনা সকলই তাহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। বিশেষ করিয়া এই আত্মীয়তার চিহ্ন একই প্রকার উপবীত গ্রহণে পরিস্ফুট হইয়াছে। একই ধর্ম্মজীবনের ও ভ্রাতৃত্বের এই প্রকৃষ্ট মিলন-চিহ্ন, ব্যক্তিগত সাধনার এই মহা মিলন-রাখী—যজ্ঞোপবীত (কুস্তি বা জুন্নার।)—অনাগত কোন এক মাঙ্গলিকের সূচনা করিতেছে।

হিন্দুরা উপবীত স্কন্ধে ধারণ করেন, পারসিকরা বক্ষের নিম্নে রক্ষা করেন—কিন্তু এ পার্থক্য বড় সামান্য ও এরূপ পার্থক্য সাধারণ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে দেখা যায়। 'ঋগ্'বেদীয় ব্রাহ্মণগণের উপবীত মাত্র বক্ষের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছায়, আবার 'সাম'বেদীয়গণের প্রায় উরু দেশের সান্নিধ্য পর্য্যন্ত লম্বিত থাকে, পরন্তু শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের সময় উপবীত দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ করিতে হয়—সাধারণতঃ যদিও উহা বামস্কন্ধেই লম্বমান থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি এই দুইটী ব্রাহ্মণ শাখাকে কেহ দুইটী জাতি বলিতে সাহসী হইবেন?

প্রকৃতপক্ষে 'আবেস্তা' হিন্দুর পক্ষে পঞ্চম বেদ—গাথা আমাদের প্রথম উপনিষদ গ্রন্থ। ব্যাকরণ-বারিধি পানিনি এই জেন্দ্ ভাষাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন— বহুলং ছন্দসি;—ছন্দ আর জেন্দ্ একই কথা। (৫)

সেকেন্দর শাহের সহযাত্রী গ্রীক্ ঐতিহাসিকের বর্ণনায় তক্ষশীলার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে সেখানে মজদা ধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। পারসিকগণ শবকে প্রোথিতও করেন না বা ভস্মীভূতও করেন না; তাঁহারা মৃতদেহ তাঁহাদের "নীরবগৃহে" (Tower of silence) রক্ষা করেন; সেখান হইতে গৃধিনীজাতীয় পক্ষী সে দেহ উদরসাৎ করে। তক্ষশিলায়ও সে ব্যবহার প্রচলিত ছিল। (৬)

---

(৩) নারায়ণ জরথুষ্ট্র (শ্বেতবর্ণ—স্পিতাম।)
নারায়ণ গোবিন্দ (কৃষ্ণবর্ণ—কৃষ্ণ।)
নারায়ণ গৌতম (জ্যোতির্ম্ময়—বুদ্ধ।)

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত গুজরাটী পত্রিকা 'চেরাগে'র একটী প্রবন্ধের অনুসরণ।

(৪) ইহার অবিকল সংস্কৃত কথা অনুবাদ।
যস্ত ব্রহ্ম বহ পৃচ্ছ্য মনসা।
অস্য ক্রতু প্রমা শাস্ত বহিষ্ঠম্ ॥

বঙ্গানুবাদ:—প্রজ্ঞা দ্বারা যে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করে তাহার কর্ত্তব্য কি তাহা আমাকে সম্যক্ জানাইয়া দাও।

(৫) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। মোক্ষমূলর বলিয়াছেন:—

I still hold that the name of "Zend" was originally a corruption of the Sanskrit word 'Khandas' (i.e. metrical language··) which is the name given to the language of the Vedas by Panini and others. When we read in Panini's grammar that certain forms occur in 'Khandas' but not in the classical language, we may almost always translate the word 'Khandas' by Zend for nearly all these rules apply equally to the language of the Avesta.

(৬) Oxford History of India. V. A. Smith P. 62.

ভারতের ইতিহাসের চিরপ্রসিদ্ধ মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত যে প্রথমতঃ মজ্‌দাধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে অনেক বিতর্ক চলিতেছে। Dr. Spooner এই মতই পোষণ করেন। পরন্তু পাটলীপুত্রের রাজ-প্রাসাদ প্রভৃতি পারসিপোলিসের প্রাসাদশিল্পেরই অনুকৃতি। (৭) এই হিন্দুস্থানের 'পঞ্চতন্ত্র'ই পহ্লবীতে 'কলীল ওয়াদিম' রূপে পারসিকের সাহিত্য-সম্ভার বৃদ্ধি করিয়া যোগসূত্র রচনা করে। (৮) শিলালিপি, সাহিত্য প্রভৃতি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সর্ব্বত্রই পারসিকদের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ যে এক সময়ে পারস্য সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মুদ্রারাক্ষসে, বিষ্ণুপুরাণে, রঘুবংশে, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি প্রায় সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই এই ভ্রাতৃত্বাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তক্ষশীলা, গির্‌নার প্রভৃতি প্রাচীন শিলালিপিতে পারসিকদের যোগরাখী সুস্পষ্ট,—আচারে, ব্যবহারে, ধর্ম্মনীতিতে একত্বের ছাপ সমুজ্জ্বল। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই যোগরেখার বিশিষ্টতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এই যোগসূত্রকে লক্ষ্য করিয়াই বর্ত্তমানে সমগ্র আর্য্যসমাজের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধনে যত্নবান হইতে হইবে। এই মিলন অন্তর্নিহিতরূপে, ধম্মপদ, গাথা ও গীতায় অঙ্গাঙ্গিভাবে পরিলক্ষিত হয়। ধম্মপদের নিবৃত্তি-মার্গের বিকাশ গাথার প্রবৃত্তিমার্গের সহযোগে ও সম্পর্কে আবার এই উভয়ের একটা সংহত ও অসাধারণ বিকাশ গীতার মধ্যে! তাই আজ যদি এই 'ত্রিপিটকে'র উদাত্তছন্দে সমগ্র এসিয়ার বক্ষস্পন্দন ধ্বনিত করিবার চেষ্টা হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে এক বিরাট মহামিলনের শক্তি-গৌরব পৃথিবীর বক্ষে শান্তি সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। আজ জাপান জাগিয়াছে সত্য, চীনের বেদনা বোধ হইতেছে প্রকৃতই, ভারতের জীবনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে নিশ্চিত; কিন্তু সমগ্র এসিয়াখণ্ড আজ এই ত্রয়ীর মিলন-মেলার দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে—তাহার প্রাণের স্পন্দন যে এই সংহতির মধ্যে!

(৭) Journal of the Asiatic Society, 1915. Jan. and July.

(৮) মহামতি নসীরবানের সময়ে তাঁহার চিকিৎসক দ্বারা পারস্যে নীত ও পহ্লবীতে অনূদিত হয়। ক্রমশঃ ইবন্ খলদুন অনুবাদ করিয়া আরব সাহিত্যে ইহাকে স্থান দান করেন। কলীল ওয়াদিম সম্ভবতঃ আমাদের 'করকট ও দমনক'। Arabic literature—Gibb.

নিরাশায়

মহারাজকুমারী ৺অনঙ্গমোহিনী দেবী

১

দুখের সৃজন এ পুরী বিজন,
(হেথা) আছি পথ চাহি বসিয়া;
পরশি আমায় কম্পিত বায়
গোপনে যেতেছে শ্বসিয়া।
সে যে গেছে ছলি দূর পথে চলি,
(তাই) কিবা দিবা কিবা প্রভাতে
আসে রে আঁধার ঘিরি চারি ধার—
উজল আলোক নিভাতে।

২

বিজনে তিমিরে কাননের তীরে
(বুঝি) বাজে পুন বেণু বীণা গান!
না, না! এ যে কাণে বায়ু বহে আনে
সুদূর সিন্ধুর কলতান।
কেন চিত হায়, ভুলাইতে চায়—
(ওগো) আপনারি গড়া ছলনায়?
বিনোদিতে মন রচিব স্বপন?
নাই, নাই, তাহে ফল নাই।

৩

কোন খেদ নাই, পুষি বেদনায়
যাব এ জীবন যাপিয়া—
শুধু স্মৃতি তার রাখিব আমার
(এই) প্রেম ভরা প্রাণ ছাপিয়া!
আজি নিরাশায় ও গো কি ভাষায়
কাঁদিয়া জানাব যাতনা?
যাক্ রাতি যাক্ জীবন পোহাক,
(করি) বিজনে নিরাশ সাধনা।

২

খাজরাহো

ছতরপুর রাজ্য প্রায় বুন্দেলখণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত। খাজরাহো এই ছতরপুর রাজ্যের কেন্দ্র। খাজরাহো মধ্যভারতের অতীত গৌরব-কীর্ত্তির মহা-শ্মশান, খাজরাহো হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধ ভারতের অবদান-পরম্পরার অন্যতম সুবিশাল ধ্বংস-স্তূপ। সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই, সে পরাক্রান্ত চন্দেল্ল সম্রাটগণ নাই, খাজ-রাহো রাজধানীরও সে শ্রী নাই, সে ঐশ্বর্য্য নাই। চৈনিক পরি-ব্রাজক হিয়ুয়েন্থ সং লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে এই মন্দিরগুলির অস্তিত্ব বেশ ভাল-ভাবেই ছিল। সুতরাং বলিতে হয়, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে খাজরাহো ভারতের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থলরূপে বৈদেশিকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। অনুমান হয়, গজনীপতি মহমুদের আক্রমণের সময় হইতেই ইহার অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল। তখন এখানকার রাজা ছিলেন নন্দরায়। তিনি সমতল-ভূমির উপর অবস্থিত এই রাজধানী শত্রুর গতিরোধের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচনা করিয়া কাঞ্জির গিরি-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহমুদ এই অরক্ষিত নগরী লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়া চলিয়া যান। এলাহাবাদ হইতে ঝাঁসি মাণিকপুর রেলপথে হরপালপুর ষ্টেশন। হরপালপুর হইতে ছতরপুর প্রায় ৩৪ মাইল। ছতরপুরের ২৭ মাইল পূর্ব্বে খাজরাহো। হরপালপুর হইতে মোটরবাসে খাজরাহো যাওয়া যায়। খাজরাহো নামের সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে এখানে প্রচুর খর্জ্জুর-বৃক্ষ ছিল। সেই জন্য ইহার নাম হয় "খর্জ্জুর বাহক।" তাহা হইতে কালে অপভ্রংশে দাঁড়াইয়াছে খাজরাহো। এখানকার একটী সরোবরের নাম 'খর্জ্জুর তালাব'। ছতরপুর রাজবংশের রাজচিহ্নের মধ্যে খর্জ্জুর-বৃক্ষ অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে খাজরাহো একটী ক্ষুদ্র পল্লী মাত্র। ইবন বতুতা কিন্তু এখানে একটি সাত মাইল ব্যাপী সহরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এক শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান মহারাজের পিতামহ ছতরপুরাধীশ স্বর্গীয় প্রতাপসিংহ খাজ-রাহোর মন্দিরগুলির সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া-ছিলেন। প্রথমবার সম্বৎ ১৯৬১ হইতে ৬৭ পর্য্যন্ত এবং

জৈন মন্দির

দ্বিতীয়বার ১৯৭৮ হইতে ১৯৮৩ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া মন্দিরগুলির সংস্কার-কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। প্রথমবারে বিরানব্বই হাজার এবং দ্বিতীয়বারে আটচল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই টাকার অর্দ্ধেক দিয়াছিলেন ভারত সরকার এবং অর্দ্ধেক দিয়াছিলেন ছতরপুর-রাজ। বর্ত্তমান

গণেশ

মহারাজা H. H. স্যর বিশ্বনাথ সিংহ কে-সি-আই-ই মহোদয়ও খাজরাহোর সংস্কারে যথাপ্রয়োজন অর্থব্যয় করিয়া ইহাকে ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ছতরপুর দরবারের দৃষ্টি না থাকিলে এতদিন খাজরাহোর অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ।

শিবরাত্রির সময় খাজরাহোতে প্রতি বৎসর এক মাস ব্যাপী একটা মেলা বসিয়া থাকে। মেলার সময় ছতরপুরের মহারাজা বাহাদুর সদলবলে খার্জরাহোতে গিয়া অবস্থিতি করেন। এই এক মাস খাজরাহো রাজধানীর গৌরব লাভ করিয়া থাকে। মেলায় বহু দূরদেশ হইতে দোকান-পশারী এবং যাত্রীদল আসিয়া স্থানটীকে জনাকীর্ণ করিয়া তুলে। নানা দেশের নাচওয়ালী, যাত্রাওয়ালা প্রভৃতির ভীড়ও কম হয় না। এদিক্‌কার যাত্রার দলের একটু মোটামুটি পরিচয় দিতেছি।

একটী যাত্রার দলে দেখিলাম জন আষ্টেক লোক। ৪টী বালকের মধ্যে দুইটী সখী, একটী রাধিকা এবং একটী কৃষ্ণ সাজিয়া এক একখানি চেয়ারে বসিয়া আছে। একজন বৃদ্ধ সারেঙ্গী, একজন ঢোল-বাদক ও একজন হা র মো নি য়া ম-বাদক, আর একটী বালক। আমাদের দেশের তাঁতিয়া যেমন তাঁত বুনিবার সময় পায়ে ঝাঁপ টেপে, এক হাতে সানা টানে, আর এক হাতে মাকু ঠেলে এবং মুখে গল্প চালায়, এই ঢোলবাদক এবং হারমোনিয়াম-বাদকও তেমনি গান এবং বাজনার সঙ্গে মাঝে মাঝে বক্তৃতাও করিতেছিল। ইহারা একটা বন্দনা গান গাহিলে পর হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী ও সখী দুইটী সিংহাসন হইতে নামিয়া নাচ জুড়িয়া দিল। তাহার পর গান। গানে পরস্পরের উক্তি-প্রত্যুক্তি ছিল। পরে দানলীলা আরম্ভ হইল। সখী দুইটী ও প্রিয়াজী নিজেরাই দধি বিষয়ের গান করিতে লাগিল, কৃষ্ণও গানের মধ্য দিয়া বুঝাইয়া দিল, সে পথে দানী সাজিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে অন্য যে বালকটীর উল্লেখ করিয়াছি, সে মধুমঙ্গল নাম লইয়া আসরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ বলিল, মধুমঙ্গল, দান লইতে হইবে। মধুমঙ্গল বলিল পাত্র চাই তো,—তা একখানা বড় দেখিয়া গাছের পাতা লইয়া আইস। কৃষ্ণ বলিল মান পাতা? মধুমঙ্গল—আরো বড়। কৃষ্ণ—কলাপাতা? মধু-মঙ্গলের কিন্তু পছন্দ হয় না। সে আরো বড় আরো বড় করিয়া
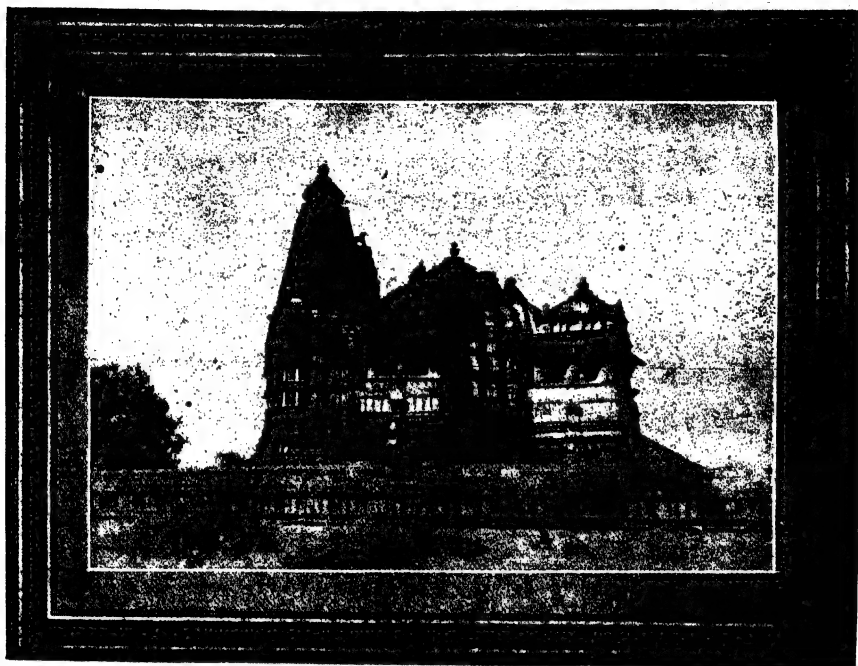
চিত্রগুপ্তের মন্দির

শ্রমজীবি-দল

শেষে নিজেই বলিল, তেঁতুল পাতা আনো। কৃষ্ণ পাতা আনিতে গেলে সখী দুইজন মধুমঙ্গলকে বেশ ঘা কতক দিয়া তাড়াইয়া দিল এবং পথ পরিষ্কার দেখিয়া পলাইয়া গেল। কৃষ্ণ ফিরিলে মধুমঙ্গল কাঁদিয়া তাহাকে নিজের দুর্দ্দশার কথা জানাইল। কৃষ্ণ বলিল, সে কথা পরে। এখন তাহারা কোথায় বল? মধুমঙ্গল বলিল, আমার ট্যাঁকে। কৃষ্ণ বাড়ী আসিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল। ইত্যবসরে বৃদ্ধ সারেঙ্গী মাথায় একখানা ওড়না ঢাকা দিয়া যশোদা হইয়া দাঁড়াইল! বেশ কাছা দিয়া আঁটিয়া মল্লবটী পরা, একজোড়া পাকা সখীর সঙ্গে দেখা। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিল, চন্দ্রাবলীর বাড়ী কোন্‌টা? সখী বলিল, ঐ যে লাগরঙ্গের উঁচা বাড়ী, চন্দ্রাবলী ঘোল বিলাইতেছে। সখী কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর দরজায় আসিয়া ডাক দিল। চন্দ্রাবলী বলিল, কে? সখী বলিল, বাহির হইয়া দেখ, তোমার বহিন্ আসিয়াছে,—আমি বাড়ী চিনাইয়া দিতে আসিয়াছি। চন্দ্রাবলী বলিল, তা তুমি কেন, তোমার সঙ্গে তো আমার ঝগড়া, তুমি যাও। পরে কৃষ্ণকে বলিল, বহিন্, দাঁড়াও আমি যাইতেছি। বলিয়া বাইরে আসিয়া বলিল, তোমাকে তো কথনো দেখি নাই!
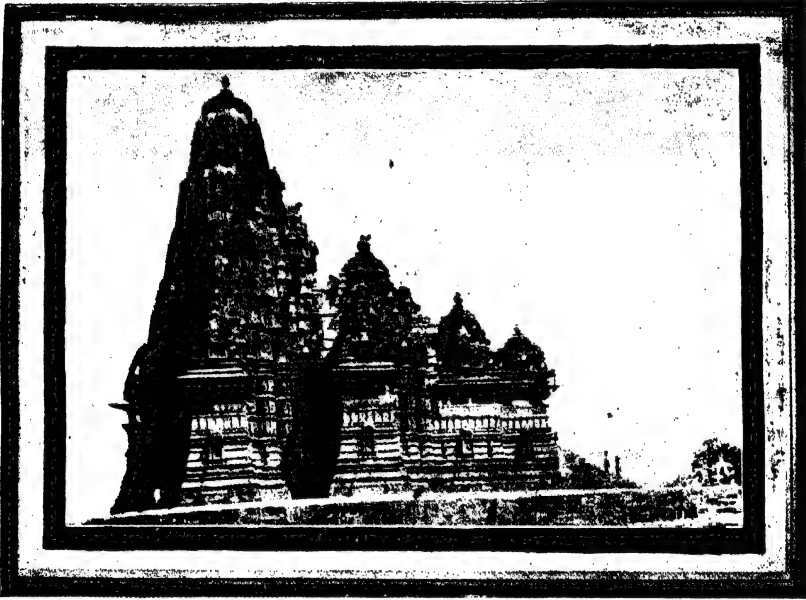
খান্দারিয়া মহাদেবের মন্দির

গোঁফওয়ালা যশোদা; অথচ ইহাতে দর্শক বা অভিনেতা কাহারো কোনো কুণ্ঠার কারণ দেখিলাম না। যশোদা বলিল, বল, তুমি এমন বিমর্ষ কেন! কেহ কি মারিয়াছে, না গালি দিয়াছে? কৃষ্ণ বলিল, সখিরা কেহ কিছু বলে নাই; চন্দ্রাবলী গোয়ালিনী আমার মনোহরণ করিয়াছে। যশোদা বলিল, তার জন্ম ভাবনা কি, আমি তোমার বিবাহ দিয়া অমন চারিটা বউ ঘরে আনিয়া দিব। কৃষ্ণ বলিল, না আমার তাহাকেই চাই, আমি তাহাকে ছলিতে যাইতেছি। কৃষ্ণ স্ত্রীবেশে চন্দ্রাবলীকে ছলিতে গেল। রাস্তায় এক তুমি বহিন্ যদি তবে আমার বিবাহের সময় আইস নাই কেন? কৃষ্ণ বলিল সে সময় আমার দ্বিরাগমনের দিন ছিল। চন্দ্রাবলী—আইস, আলিঙ্গন দাও। কৃষ্ণ আলিঙ্গন দিলে—চন্দ্রাবলী জিজ্ঞাসা করিল তোমার ছাতি মরদানী কেন? কৃষ্ণ—ছেলে বেলা হইতে খেলা-ধূলা করিয়া। "পা মরদানী?" "তোমার বাড়ীর পথ ভুলিয়া বনে বনে ঘুরিয়া।" "চল জল আনি গিয়া!" "না—একবার জল আনিতে গিয়া পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম।" এই সব কথাবার্ত্তার পর উভয়ে জল আনিয়া খাইতে বসিল। দুইজন লোক এক-

বুদ্ধমূর্ত্তি

কুবের (?)
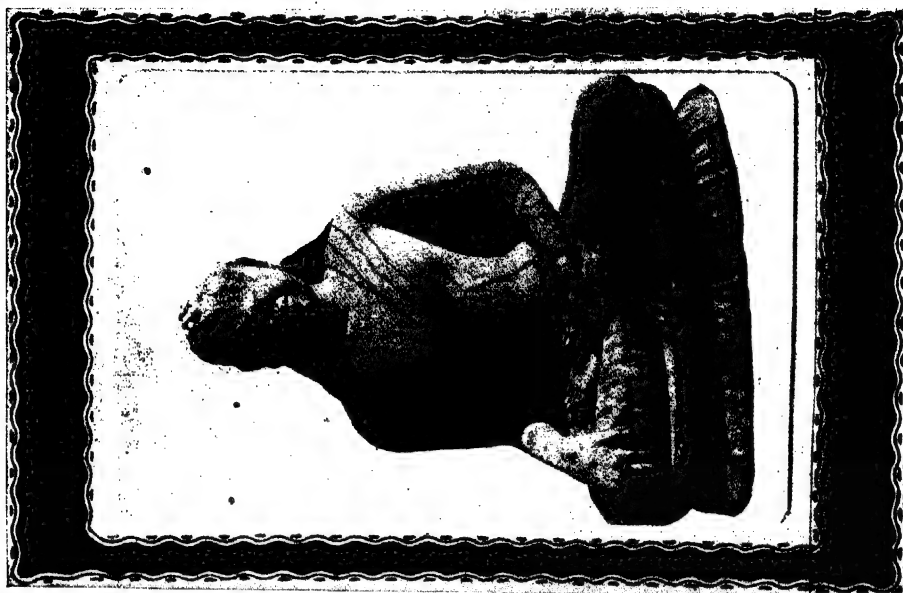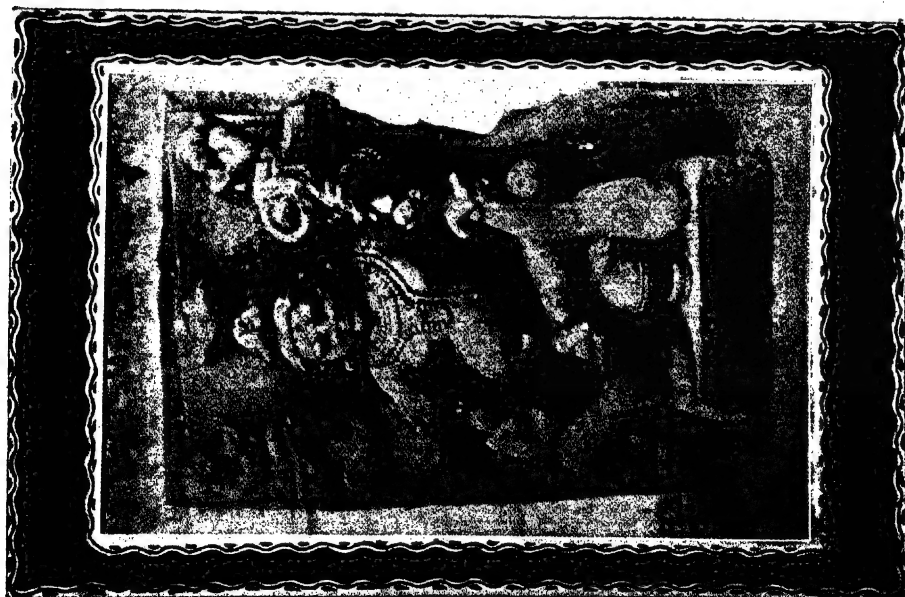
খানা কাপড়ের পর্দ্দা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে সেই মধুমঙ্গল-সাজা ছেলেটী চন্দ্রাবলীর স্বামী তোষল সাজিয়া আসিয়া হাজির হইল। তোষল হাঁকিল, বাড়ীর মধ্যে কে? চন্দ্রাবলী বলিল, বহিন্। তোষল যেন শুনে নাই,—বলিল, ভঁইস? ভঁইস কিরূপে বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল? চন্দ্রাবলী বলিল, ভঁইস নয়—বহিন্, তোমার শ্যালী। তোষল আনন্দে মাটীতে গড়াইয়া লুটোপুটী! খানিকপরে বলিল, কি করিতেছ? "খাইতেছি; খাওয়াইতেছি।" "কি খাওয়াইতেছ?"

নন্দাকেশ্বর

"ক্ষীর, দহি, ভুরা, ছাপ্পান্ন ব্যঞ্জন!" "আমার জন্য কি করিতেছ?" "চানার শাক আর চানার রুটী!" "বটে! বহিনের জন্য অত আর আমার জন্যে এই! তা যাক, আমি এখন গোষ্ঠে চলিলাম। তা দেখিও, বহিন যেন ভাই না হইয়া যায়।" তোষল চলিয়া গেলে কৃষ্ণ ছদ্মবেশ ছাড়িয়া নিজ রূপ ধরিল। চন্দ্রাবলী বলিল, বহিন্ ছিলে—ভাই হইয়া গেলে! তখন কৃষ্ণ আপন উদ্দেশ্য বলিয়া বলিল, "চল রাত্রি হইয়াছে, ঘুমাই গিয়া!" পালা শেষ হইয়া গেল।

খাজরাহোর ধ্বংসস্তূপে বর্ত্তমানে মাত্র ত্রিশটী মন্দির দাঁড়াইয়া আছে। বাকী মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঐ সমস্ত মন্দিরের কতকগুলি মূর্ত্তি একত্র করিয়া একটা নাতি-উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা খোলা জায়গায় রাখা হইয়াছে। ইহাই এখানকার আজবঘর নামে পরিচিত। মন্দিরগুলিকে পাঁচ-ভাগে ভাগ করা যায়—পশ্চিমে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির, গণেশের মন্দির, মহাদেবের মন্দির, জগদম্বা, চিত্রগুপ্ত, বিশ্বনাথ, নন্দীশ্বর, পার্ব্বতী, চতুর্ভুজ, বরাহ, মৃত্যুঞ্জয় ও কালীদেবীর মন্দির। উত্তরে,—সত্যধরা, বংসী, বামন, লক্ষ্মণ, হনুমান ও ব্রহ্মার মন্দির। দক্ষিণ ও পূর্ব্বে—গন্থাই (বৌদ্ধ) মন্দির। বাকী ছয়টী জৈনমন্দির—পার্শ্বনাথ, আদিনাথ, জীননাথ ও শ্বেতনাথ। ইহার মধ্যে পার্শ্বনাথ ও আদিনাথের দুইটী করিয়া মন্দির। কড়ার নামক লহরের কিনারায় নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরগুলির মধ্যে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মন্দিরের প্রাচীর-বেষ্টনী ও কুড়িটী ভাঙ্গা মন্দির মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহারই পশ্চাতে ব্রহ্মার মন্দির। কিন্তু এই মন্দিরটী পঞ্চমুখ শিবের মন্দির বলিয়াই মনে হইল। শিবের চারিটী মুখ চার দিকে, আর একটী মুখ ঊর্দ্ধ দিকে। মহাদেবের দুই পার্শ্বে বিষ্ণু ও

ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী

দেবী

জৈনদের অম্বিকাদেবী

কুবের (২)
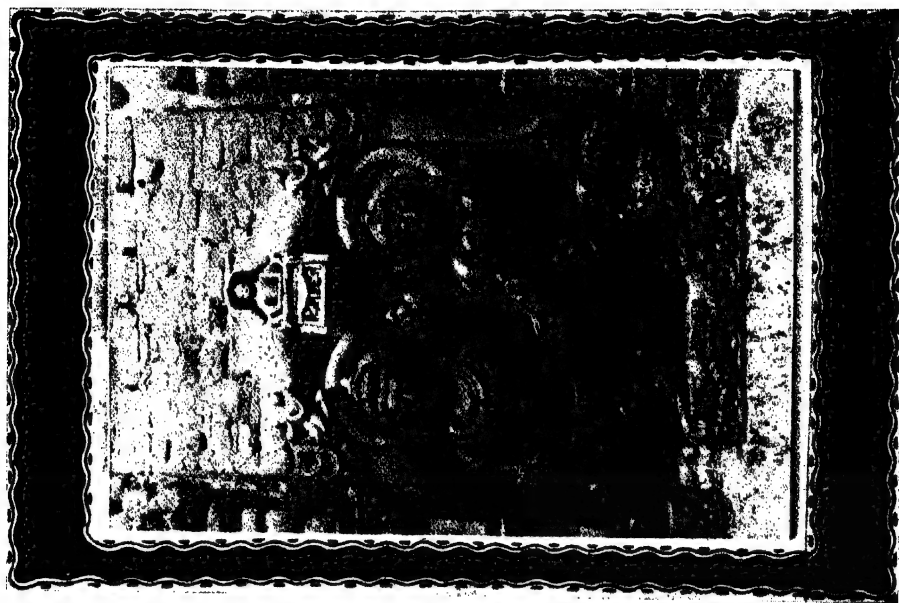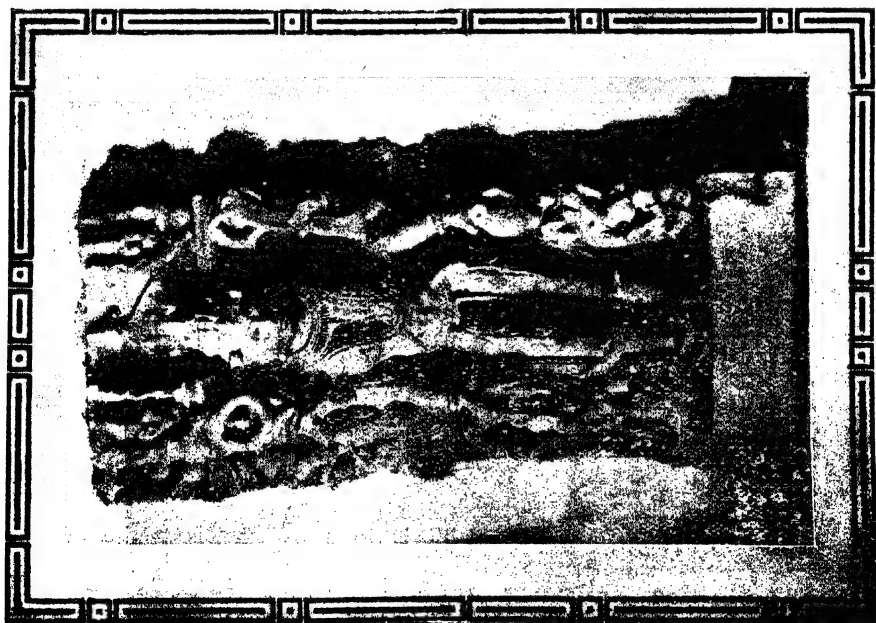
ব্রহ্মা। মন্দিরটী একেবারে খর্জ্জুর সরোবরের কিনারায়। অনেকের অনুমান এই মন্দির সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। এই দুইটী ভিন্ন আর একটী প্রাচীন মন্দির আছে। ইহার স্তম্ভে অনেকগুলি ঘণ্টা ক্ষোদাই আছে বলিয়া ইহাকে ঘণ্টাই মন্দিরও বলে। বাকী মন্দিরগুলি খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যেই খাজরাহোর সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু মন্দির আছে—খাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দির। ইহার উচ্চতা ১১৮ ফিট, দৈর্ঘ্য ১০৯ ফিট এবং প্রস্থ প্রায় ৬০ ফিট হইবে। মণ্ডপ, অর্দ্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল-গর্ভগৃহ ইত্যাদি মন্দিরের সমস্ত লক্ষণগুলিই ইহাতে মিলাইয়া পাওয়া যায়। কারুকার্য্য হিসাবেও এই মন্দির উল্লেখযোগ্য—ছাতে পর্য্যন্ত কাজ! মন্দিরের কোনো অংশে এমন একটুও স্থান নাই—যেখানে প্রস্তর ক্ষোদাই করিয়া গঠিত মূর্ত্তি না পাওয়া যায়। ক্যানিংহাম সাহেব না কি গণিয়া গাঁথিয়া হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন ইহার ভিতরে ২২৬টী এবং বাহিরে ৬৪৬টী মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে।

মন্দিরের গাত্রে নানা রকমের অশ্লীল মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। স্থানীয় লোকে এগুলিকে "কোকশাস্ত্রের মূর্ত্তি" বলে। পুরী ভুবনেশ্বরে এই মূর্ত্তি দেখিয়াছি; কিন্তু সে মূল মন্দিরে নহে,—মণ্ডপ, অর্দ্ধমণ্ডপ ও মহামণ্ডপ, অর্থাৎ জগমোহন গাত্রে। আর খাজরাহোর গর্ভগৃহের বহির্দ্দেশেও এই সমস্ত মূর্ত্তির প্রাচুর্য্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যতদূর স্মরণ হয়, দাক্ষিণাত্যের কোনো মন্দির-গাত্রেই এরূপ মূর্ত্তি দেখি নাই,—মাত্র ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্ত্তী সীমাচলে নৃসিংহমন্দিরে এই ধরণের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। মনে হয়, সেখানেও মন্দিরের গর্ভগৃহ-গাত্রেই ঐ সব মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। উত্তর-ভারতের কোনো মন্দিরেও এইরূপ মূর্ত্তি আছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। বাঙ্গালার কোনো মন্দিরে, এমন কি রহস্যপীঠ কামরূপের কামাখ্যা মন্দিরেও ইহার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। মন্দির নির্ম্মাণে ভুবনেশ্বর হইতে সীমাচলে যে রীতি চলিয়াছিল, তাহার সঙ্গে মধ্য ভারতের এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের কারণ কি,—ভরসা করি কোনো বিশেষজ্ঞ তাহার সদুত্তর দান করিবেন। তন্ত্রে নায়িকা সাধনের যে সমস্ত আসনের উল্লেখ আছে, খাজরাহোর কোকশাস্ত্রের মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে তাহার অনেকটা মিল পাওয়া যায়।

উৎসব

জৈন মন্দিরের মধ্যে পার্শ্বনাথের মন্দির দেখিতে বড়

সুন্দর। এই মন্দিরে নেমীনাথের একটী নগ্নমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী প্রায় আট ফিট লম্বা। আমরা সে মূর্ত্তির ফটো পাই নাই। একটী জৈন দেবীমূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত হইল। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তি পুরাতন বলিয়াই মনে হয়; কারণ,"মাথায় কোঁকড়ানো চুল" না কি বুদ্ধমূর্ত্তির প্রাচীনত্বেরই নিদর্শন! কুবেরের তুইটী প্রতিরূপ দিলাম—একটীতে কুবের চতুর্ভুজ, অপরটীতে দ্বিভুজ। প্রথমটীতে ধনেশ্বরের ঐশ্বর্য্য পরিচায়ক রত্নস্থালী তাঁহার সুনাম বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় মূর্ত্তিটী হাতেও যেমন খাটো, তাহার ধনবত্তার প্রতীকটীও তেমনি ছোট। মূর্ত্তি দুইটীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। নন্দীকেশ্বরের মূর্ত্তিটী যদিও আকারে তাঞ্জোর অথবা রামেশ্বরের বাহন-পুঙ্গব-দ্বয়ের গৌরব-স্পর্দ্ধা করিবার যোগ্য নহেন, তথাপি সমগ্র উত্তর-ভারত বা মধ্য-ভারতে তিনি যে একেশ্বর সে বিষয়ে বোধ হয় কেহ কোনোরূপ সন্দেহ করিবেন না। অষ্টভুজ গণনায়কের মূর্ত্তিটীও উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে একটী দেবীমূর্ত্তি এবং ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর যুগল মূর্ত্তি। দুইটী চিত্রই প্রকাশিত হইল। খাজরাহোর মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত চিত্র হইতে সেকালের অনেক রীতি পদ্ধতিও অবগত হওয়া যায়;—দৃষ্টান্ত স্বরূপ উৎসব ও শ্রমজীবি-দলের ছবি দিলাম। বস্তুতঃ সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রত্নতাত্ত্বিক, অথবা সাধারণ পর্য্যটক—খাজরাহো সকলেরই মনোহরণ করে। খাজরাহো ভারতের সার্ব্বজনীন তীর্থগুলির অন্যতম।

চাকর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১)

মুঙ্গেরে তার বৈমাত্র ভাইয়ের কাছে আসামের চা-বাগান থেকে দশ বছর বাদে ফিরে এসে শরণ দেখ্‌ল যে সে তার বাস্তভিটাটির অংশ ছাড়তে রাজি নয়। বুঝ্‌ল রক্তের টান যতই সত্য হোক্ না কেন, জমির টান সে-টানের চেয়ে কম সত্য নয়। তার দুএকজন জ্ঞাতি বল্‌ল: "মকদ্দমা কর"। সে একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বল্‌ল: "কার জন্যে? একটা ত পেট মোটে—তার জন্যে ভাইয়ের সঙ্গে মোকদ্দমা কর্‌ব? না হয় কুলিগিরিই ক'রেছি, তবু—"

মুঙ্গেরের একান্নবর্ত্তী মুখুয্যে পরিবারে সে চাকরি নিল।

(২)

মুখুয্যে পরিবারের তিনপুরুষ ধ'রে মুঙ্গেরে বসবাস। তিন ভাই। বড় ভাই যোগেন্দ্র—কল্‌কাতায় ব্যারিষ্টার। পশার মন্দ নয়। তবে বেশির ভাগ সময় কল্‌কাতায়ই তাঁর কাট্‌ত ব'লে সংসারের ভার স্ত্রী জ্ঞানদা ও মেজভাই রমেন্দ্রের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

জ্ঞানদা আধুনিক বিলাত-ফেরত স্বামীর ঘরণী হ'য়েও পুরোদস্তুর আধুনিক হ'তে পারেন নি। দেখা যায় যে বাস্তবে ভারতললনাও অনেক বিষয়েই সাবেক কালের ধরণ-ধারণের প্রভাব শুধু পাতিব্রত্যের জোরে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন না—যদিও শাস্ত্রে—তথা সমাজ-হিতৈষীদের লেখায়—হিন্দু নারীর পতিপরায়ণতার কথা সম্বন্ধে নানা ওজস্বিনী উক্তি পড়া যায়।

রমেন্দ্র মুঙ্গেরের একটি জমিদারের গোমস্তা। বেশ দুপয়সা আয় করতেন—লোকে বল্‌ত। মানুষটি অল্পভাষী; দেখ্‌তে নিরীহ প্রকৃতির—অথচ ভিতরে একটা দার্ঢ্য ছিল। বাইরে সেটা ঠিক্ প্রতীয়মান হ'ত না সব সময়ে। জান্‌তেন তাঁর নব্যা স্ত্রী—চামেলী, যেহেতু তিনি সুন্দরী ও বিলাত-ফেরত বাপের একমাত্র কন্যা হওয়া সত্ত্বেও এই নিরীহ স্বামীটিকে বশে আন্‌তে পারেন নি।

পাড়ার লোকের মিলিত দৃষ্টি বেশি ক'রে পড়ত—ছোট ভাই অমরেন্দ্রের ওপর। কারণ ছেলেটা ষোল বছর বয়সে সেই যে স্কুল বিতাড়িত হ'য়ে ব'য়ে গিয়েছিল, তার পর থেকে তার উড়নচ'ড়ে ভাব আর গেল না, কুসঙ্গও সমান বজায় রইল। শুধু যাত্রা, থিয়েটার, আড্ডা, তাশ-পাশা দাবা, একটু আধটু বাঁশি বাজানো, পাড়ার মড়া-পোড়ানো,

হৈ-চৈ—এই সব নিয়েই ছিল! লোকের অপরাধ কি? ·· তার ওপর সাতাশ আটাশ বছর বয়স হ'তে চল্‌লো, সংসারে স্থিতি হ'ল না! সুতরাং পুন্নাম নরক সম্বন্ধে তার ঐকান্তিক ঔদাসীন্য দেখে পরলোকপরায়ণ যত পাড়ার ত্রস্ত মাতব্বরগণ যে ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌বেন এ আর বেশি কথা কি? কেবল তার দুঃখে আশে-পাশের ভদ্রলোকের নয়নে অমর এত বেশি অশ্রু-আভাষ দেখ্‌ত যে তার মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য মনে হ'ত যে বাংলার যত পরদুঃখকাতর বাঙালীকে বিধাতা এত দেশ থাক্‌তে বেহারের অন্তর্গত একটি নীরস দেশে পাঠালেন কেন? এমন সময় তার একজন দরদী মিল্‌ল।

শরণ এসেছিল এই একান্নবর্ত্তী পরিবারেই চাকর হ'য়ে। সমস্ত বাড়ীরই চাকর সে। কিন্তু হঠাৎ সে বেশি ভক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল এই অকেজো ছোটবাবুটির। কারণ অভাবে কার্য্য হয় না। তাই তার অনুরাগের কয়েকটি কারন নিশ্চয়ই ছিল। তবে প্রধান কারণ সম্ভবতঃ ছোটবাবুর বিবাহ-বৈরাগ্য। এ কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন, নইলে সুধীসমাজে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। কথাটা এই যে মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত 'একটি ছোটখাট খোঁপা ও গোলগাল মুখবিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি' এই লেবেল না পরে, ততদিন পাড়ার লোকের কাছে হয়ত একটু কৃপাপাত্র থাকে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সে ক্ষতিপূরণও পায়। সেটার নাম—দুচারজনের কাছে থেকে একটু 'আহা' শোনার সৌভাগ্য। কেন যে এ সৌভাগ্য তার লাভ হয় সে-সম্বন্ধে সমাজ-তাত্ত্বিকেরা অনেক গবেষণাই ক'রে থাকেন। যেমন তাঁরা বলেন যে পুরুষের সংসার-তরীতে ব্যক্তিবিশেষ হাল না ধরলে, বাইরের সহৃদয় লোকে তার মজ্জমান অবস্থার জন্যে একটু সহানুভূতি না দেখিয়েই পারে না। এ ব্যাখ্যার মধ্যে সত্য থাকুক বা না থাকুক, এটা সত্য যে বাড়ীর বড় বউ জ্ঞানদা প্রায়ই অমরের পাতেই মাছের মুড়োটি দিতেন। হেতু—তার বউ নেই।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে বাড়ীর মেজবউ চামেলী বিলাত-ফেরতের মেয়ে। সুতরাং সব বিষয়েই যে সে বাড়াবাড়িটা অপছন্দ করবে এ কথা অনুমেয়। বলত "দিদি, এ যে তোমাদের ছোট ঠাকুরপোকে প্রশ্রয় দেওয়া ভাই। যদি বিয়ে না করলে মুড়োর ওপর স্বত্ব কায়েম হ'য়ে যায় তবে মানুষ বিয়ে করবে কেন বল দেখি?" জ্ঞানদা বল্‌তেন: "এত তাড়াতাড়ি কি মেজোবউ? সংসারে শতকরা নিরেনব্বই জন ত ভাই হাত-পা-বাঁধা—না পারে খই খেতে, না পারে হাত খুল্‌তে। যতদিন ঝাড়া-হাত-পা ততদিনই যা একটু আমোদপ্রমোদ, তার পরে ত মাথায় হাত! তাই এখন একটু আমোদ করে নিক্ না। কদিনই বা আর?" চামেলী বল্‌ত: "তার মানে তুমি বল যে ও বিয়ে না করে সেই ভাল?" জ্ঞানদা হেসে বল্‌তেন: "সাতপাক না ঘুরে কি আর কারুর পার আছে ভাই? জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে। ভাই, আমার বলাবলির ওপর কি যায় আসে বল্? আমি শুধু বলি যে থাকুক না একটু ছাড়া—যদ্দিন পারে—শেষটায় ফাঁদে পা যখন দিতেই হবে।" চামেলী হঠাৎ সুর বদ্‌লে নিয়ে দরদ দেখিয়ে বল্‌ত: "এ কি আর আমোদ দিদি! না আছে নাওয়া-খাওয়ার সময়, না আছে দুটো সাধ-আহ্লাদ, না আছে সময়ে মাথায় একটু তেল, না আছে খরচপত্রের একটা হিসেব।" জ্ঞানদা বুঝতেন মেজো বউয়ের কোথায় ব্যথা। বল্‌তেন: "তা মেজোবউ, হেঁশেল আলাদা না হ'লে ত আর ভাই সিন্দুক আলাদা করা যায় না, কি করবি বল্? কেবল আমি বলি এই কথা যে, ও কতই বা খরচ করে—মাসে গোটা পঞ্চাশ ষাট টাকা বই ত নয়। ভগবানের আশীর্ব্বাদে বড় দুভায়ের ত আর এ হাত-খরচাটা দিতে গায়ে লাগে না। আর বিয়ের কথা বল্‌ছিস্—তাহ'লে কি খরচ ওর বাড়বে না রে?" চামেলী অপ্রসন্ন সুরে বল্‌ত: "আমি বুঝি সেই কথা ভেবেই বল্‌ছি দিদি? টাকাটা নিজের ও স্ত্রী-পুত্তুরের জন্যে খরচ করা আর পাঁচ ভূতের সেবায় লুটিয়ে দেওয়া—এ দুই সমান হ'ল?" ব'লে মুখ ভার ক'রে চ'লে যেত। জ্ঞানদা একটু হেসে তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাক্‌তেন; পরে একটু করুণ হেসে কাজে মন দিতেন।

চামেলী এ রকম আলোচনার পর প্রায়ই রমেন্দ্রকে গিয়ে বল্‌ত যে আলাদা হ'লেই সদ্ভাবটা সহজে থাকে। রমেন্দ্র সারাদিন জমিদারীর তদারকের কাজ ক'রে রাত্রে বিছানায় শুয়ে স্ত্রীর এ রকম অকাট্য যুক্তিবাদে ততটা কান দেবার উৎসাহ পেতেন না। মাঝে মাঝে বড় বৌদির কাছে হেসে বল্‌তেন: "বৌদি, তোমাদের মেয়েদের সব কথায় কান দিতে গেলে কানের আসল দরকারী কাজগুলোই বাকী থেকে যায়।" জ্ঞানদা হেসে বল্‌তেন: "যত বড়াই বৌদির

কাছে। এ কথা তার সামনে বল্‌বার মুরদ যদি থাক্‌ত—" রমেন্দ্র সে হাসিতে যোগ দিয়ে বল্‌তেন: "এ তোমার ভারি কাঁচা কথা হ'ল বৌদি। তাই যদি থাক্‌বে তাহ'লে বৌদি এনে লাভটা কি বল?" জ্ঞানদা চামেলীকে ডেকে বল্‌তেন: "নে, মেজোবউ তোর ওঁ'র একবার কথার ছিরি শোন্‌। সাম্‌লা ভাই তোর জিনিষ—নইলে বেহাত হবার ভয় আছে। বুঝলি?" চামেলি শুনে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে কাজে চ'লে যেত। সে একটু নব্যা গোছের মেয়ে; স্বামীকে নিয়ে বৌদির এতটা সেকেলে গোছের ঠাট্টা তার কাছে ঠিক্‌ সুপাচ্য হ'ত না বোধ হয়। সে অম্লের বাষ্প তার ফুটে উঠ্‌ত রাত্রে; সে রাগ ও মান দুই-ই করত রমেন্দ্রের বেরসিকতা সত্ত্বেও। কিন্তু রমেন্দ্র 'নব্য' নন; 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'স্বর্ণলতা'র মতন দুএকটা উপন্যাস ছাড়া বড় একটা নভেল নাটকও পড়া নেই। কাজেই স্ত্রীকে "ওগো, খেয়ো, না খেলে পিত্তি পড়ে" ব'লেই পান চিবুতে চিবুতে জমিদারীর গন্ধময় কাজে ছুট্‌তেন। চামেলীর রাগের তাপটি অগত্যা আপনিই কমে আস্‌ত। যেখানে অপরের মনে একটা দাগ ফেল্‌বার জন্যেই ফোঁস-ফোঁসানি, সেখানে নৈকট্যের অভাবে নেপথ্যে রাগের তাপমান যন্ত্রের উগ্রতাকে বেশিক্ষণ চড়িয়ে রাখা যায় না। কেবল এ নিষ্ফল মানের প্রতিক্রিয়ায় তার আক্রোশটা প্রতিহত হ'য়ে পড়ত গিয়ে জ্ঞানদা ও অমরের ওপর। শেষটায় সেটা সংক্রামক হ'য়ে পড়ল শরণের ওপর। যদি না পড়ত তবে এ পরিবারের সংসারযাত্রার একটা অধ্যায় অন্ততঃ ঠিক্‌ এ রকম পরিণতি নিত না।

শরণের ওপর চামেলীর রাগ হওয়ার অন্য দুএকটি কারণও ছিল অবশ্য, কিন্তু একটা প্রধান কারণ যে তার মনের ক্ষোভের প্রতিক্রিয়াটি সেটা নিশ্চিত। অর্থাৎ যদি চামেলীর মান রমেন্দ্র রাখ্‌তেন তাহ'লে হয়ত এ পরিবারের ইতিহাসটা চামেলীর দ্বারা ঠিক্‌ এভাবে প্রভাবিত হ'ত না।

শরণের বুদ্ধি ছিল। (কেবল যখন রাগত তখন তার সহজবোধের ধারণা একটু প'ড়ে যেত।) সে দুদিনেই বুঝ্‌ল যে এ-বাড়ীতে ছোটবাবুর অনাদরের পালে হাওয়া তোল্‌বার চেষ্টায় মেজ বৌমার ঔদাসীন্য ছিল না, কেবল বড় বৌমা ও মেজোবাবুর জন্যে সে পালটা স্ফীতিলাভ করতে পার্‌ত না। সঙ্গে সঙ্গে এই আড্ডাধারী, অকেজো ও হসন্তের মতনই অবজ্ঞাত মানুষটির প্রতি তার কেমন-যেন একটা মায়া প'ড়ে গেল। সে এসেই দুদিনে ছোটবাবুর বাহন হ'য়ে উঠল। হ'ল যে কোমর বেঁধে উঠে প'ড়ে লেগে গিয়ে তা নয়। কিন্তু পাঁচটা যোগাযোগে সংসারে এম্‌নি ক'রেই একটা মানুষ আর একজনের কাছে এসে প'ড়ে থাকে।

চামেলীর মনে এতে শরণের বিরুদ্ধে কেমন যেন একটা অপ্রীতির ভাব সঞ্চিত হ'য়ে উঠল। ফলে সে অনেক সময়ে নিজের অজ্ঞাতসারে শরণের শ্রমশীলতাকে ছোট ক'রে দেখ্‌তে চাইত ও নিষ্ফলতা নিশ্চিত জেনেও জ্ঞানদার কাছে গিয়ে নালিশ না জানিয়ে পার্‌ত না। বল্‌ত: "শরণাটার গায়েও ছোট্‌ঠাকুরপোর হাওয়া লেগেছে যেন। দিনরাত হৈ হৈ ক'রে বাড়ীর দরকারী কাজ ফেলে রাখে।" জ্ঞানদা বল্‌লেন: "ও-চাকরটা ত উপ্‌রি মেজোবউ, ও যখন ছিল না তখনও ত চ'লে যেত।" চামেলী রাগ ক'রে বল্‌ত: "দিদি, তোমার ঐ একরকম কথা। কাজ কি আর আট্‌কে থাকে কখনো—কারুর জন্যে? ইংরেজিতে বলে সময় ও স্রোত কারুর অপেক্ষা রাখে না। কিছুই কারুর জন্য প'ড়ে থাকে না। কিন্তু তাই ব'লে কি আর চাকর বাকরের আল্‌সে হ'লে চলে?" জ্ঞানদা বল্‌তেন: শরণ ত' আল্‌সে নয় মেজোবউ, ন্যায্য কথা বোলো। দিনরাতই ত বাড়ীর ঝাড়-পোঁছ নিয়েই আছে। তার পরে যদি ও ঐ অকর্মা মানুষটার একটু তদারক করে সে ত ভালই—বিশেষ তুমি-আমি ঘর-কন্নার কাজে ব্যস্ত থেকে সে-কাজটা করতে পারি না। তার ওপর সেদিন ত তুই-ই বল্‌ছিলি ওকে একজনের দেখাশুনো করা দরকার, বিয়ে না দিলে মানুষ সৃষ্টিছাড়া হয়ে যায় ও এই রকম কত কথা। তাহ'লে—" চামেলী বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌ত: "পারি নে বাবু। অত তর্কাতর্কি আমার আসে না। আমি ত আর তোমার মতন ভাটপাড়ার তর্কবাগীশের মেয়ে নই দিদি যে তর্কে তোমার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌ব?" জ্ঞানদা হেসে বল্‌তেন: "তবে তর্ক করতে আসিস্‌ই বা কেন মেজবউ, আর ধুয়ো তুলিস্‌ই বা কেন!" চামেলী মুখ ভার ক'রে স্থানত্যাগ করত। দুপুর বেলা বল্‌ত ক্ষিদে নেই। তখন জ্ঞানদার করতে হ'ত সাধ্যসাধনা; বল্‌তেন: "তুই এখন বাড়ীর সব ছোট বউ মেজোবউ, তুই না খেলে আমি অন্ন মুখে তুলি কেমন ক'রে বল্‌!" চামেলী বল্‌ত: 'একজনের ক্ষিদে না থাক্‌লে আর একজন অন্ন মুখে তুল্‌তে

পারবে না, এ আবার কোন্ দিশি কথা ?" জ্ঞানদা বল্‌তেন : "এটা আমাদের দিশি কথা রে, আমাদের গেঁয়ো আচার ; হ'ল ? আমি যে তর্কবাগীশের ঘরের মেয়ে মেজোবউ, এ কথা খোঁটা দিয়ে ব'লে তার পরেই ভুলে গেলে চল্‌বে কেন বল্ ? তোর মতন বিলেত-ফেরতের ঘরের মেয়ে হ'লে বাড়ীর ছোটবউ অনাহারে থাক্‌লেও নিজে ভাত মুখে তুল্‌তে পার্‌তাম।" চামেলির মন অনেক সাধাসাধির পর একটু ভিজ্‌ত। অবশ্য জঠরানলের শিখা উত্তরোত্তর জ্বলে-ওঠাও ছিল মন-ভেজার একটা কারণ ; সে জ্ঞানদার মতন ব্রত-উপবাস প্রভৃতি ত কখনো করেনি। তাই শেষটায় গিয়ে বস্‌ত খেতে। কেবল যখন জ্ঞানদা তার আহারান্তে হেসে বল্‌তেন : "অ-ক্ষিদেয় যে তুই ভয়ঙ্কর কষ্ট পাচ্ছিলি তা ত মনে হয় না মেজো বউ," তখন সে রাগ ক'রে বল্‌ত : "ও-রকম ক'রে বললে কিন্তু আর কখ্‌খনো খাব না ব'লে রাখ্‌ছি—হাজার সাধ্‌লেও।" জ্ঞানদা তার গাল টিপে দিয়ে বল্‌তেন : "আরে, তর্কবাগীশের ঘরের মেয়ে না-হ'লে না-হয় তর্কই করা যায় না মান্‌লাম, কিন্তু ঠাট্টাও কি বুঝতে পারা যায় না ?"

(৩)

বাড়ীতে মা-ষষ্ঠীর কৃপা অঢেল ছিল না। যোগেন্দ্রের একটি মাত্র আটবছরের ছেলে ষষ্ঠীচরণ, ও রমেন্দ্রের একটি পাঁচবছরের মেয়ে সুনন্দা ও বছর তিনেকের ছেলে মোহিত। সুনন্দা মেয়েটি একটু হাবা-গাছের। সে প্রায়ই বেফাঁস কথা ব'লে ফেল্‌ত ও চামেলীর কাছে ধমক ও মার খেয়ে মর্‌ত। শরণের প্রিয়পাত্র ষষ্ঠীবাবু, কারণ ষষ্ঠীচরণের 'ধার ছিল'—শরণ প্রায়ই বল্‌ত। বোকা ছেলেপিলে সে একদম দেখ্‌তে পারত না। মোহিতকে সে কোলে-পিঠে কর্‌ত বটে, কিন্তু সেটা ঠিক্ মায়ায় নয়, দয়ায়। ছেলেটা বড় রুগ্ন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ষষ্ঠীচরণ শরণদাকে যেমন ভালবাস্‌ত, শরণও তাকে তেম্‌নি পেয়ার কর্‌ত। চামেলী এজন্যেও শরণের প্রতি নিজের অজ্ঞাতে একটু-একটু ক'রে বিমুখ হ'য়ে উঠ্‌ছিল। সুনন্দার ফ্রক প্রভৃতি কেচে দিতে বললে যে শরণ বড়-একটা গা কর্‌ত না, এতে চামেলীর গা উঠ্‌ত জ্বলে। কিন্তু জ্ঞানদার কাছে নালিশ জানিয়েও লাভ ছিল না। তিনি বাড়ীর বুড়ি ঝি মাতুকে দিয়ে সুনন্দার জিনিষপত্র কাচিয়ে নিতেন। এতে ফ্রক কাচা হত বটে, কিন্তু চামেলীর তুষ্টিসাধন যে হ'ত না এ কথা বলাই বেশি। সে মাঝে মাঝে শরণকে দিয়েই জোর ক'রে কাজটা করাত বটে, কিন্তু জ্ঞানদার কাছে নালিশ না ক'রে যে শরণকে কথা-শোনাতে পার্‌ত না এ কথা ভেবে শরণকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করিয়েও পূর্ণ তৃপ্তি পেত না।

শরণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ না বুঝলেও অনেকটা বুঝছিল। আগেই বলা হয়েছে যে সে ছিল একটু রাগী মানুষ ; নিজের মনের ভাব গোপন রাখ্‌তেও জান্‌ত না। তাই চামেলীর প্রতি তার নিহিত বিমুখতাটা সে লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ত না—নানা সূত্রে প্রকাশ হ'য়ে পড়ত। ফলে বাড়ীতে নিত্য নানারকম ছোট-খাট অশান্তির সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সে চামেলীর বিরাগকে বড় গ্রাহ্য কর্‌ত না। কারণ সে জানত তার খুঁটি শক্ত আছে ;—অর্থাৎ বড় বৌমার তার ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল—প্রথম থেকেই। সুতরাং চামেলীর প্রতি তার ঔদাসীন্যটা যে দুদিনে বিমুখতায় পরিণতি লাভ করেছিল, এ জন্যে সে মাঝে মাঝে একটু বিব্রত বোধ করলেও, বাড়ীতে মেজবৌমার চেঁচামেচিকে খুব বেশি আমল দিত না। তাছাড়া সে প্রথম থেকেই কেমন-যেন তাঁর কুনজরে প'ড়ে গিয়েছিল ব'লে ভাবত মুখে দুটো মিষ্টি কথায় বিশেষ প্রতীকার হবে না। জ্ঞানদা কখনো কখনো তাকে এজন্যে জনান্তিকে একটু আধটু বক্‌লে বা চামেলীর সঙ্গে মুখে মিষ্টি ব্যবহার করতে বললে সে বল্‌ত : "বড় মা, গোড়া কেটে আগায় জল দিয়ে লাভ কি বলুন।"

তাছাড়া জাতে গোয়ালা হ'লেও তার বুদ্ধিটা ঠিক গোয়ালার মতন ছিল না। সে স্কুলে একটু বাংলা ও ইংরেজি প'ড়েছিল, তাছাড়া আসামের চা-বাগানে অসহ্য নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে তার অনুভূতির অনেকগুলি পাপড়িই দল মেলেছিল। রাগলে তার বুদ্ধিভ্রংশ হ'ত বটে, কিন্তু খুব চট্ ক'রেও সে রাগ্‌ত না ও না-রাগলে একটু তলিয়ে অনেক জিনিষ বোঝার চেষ্টা করত। সে প্রথম থেকেই বুঝেছিল এ পরিবারের সঙ্গে চামেলীর কোথায় একটা গরমিল আছে, যাকে জোর ক'রে জোড়াতাড়া দিয়ে মিলে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। এ গরমিলের জন্যে সে অবশ্য সমস্ত দোষটা চাপাত মেজ বৌমারই স্কন্ধে। অবশ্য অপরের প্রকৃতির সঙ্গে কারুর কারুর প্রকৃতি অনেক সময়েই নিজেকে

থাপ খাইয়ে চল্‌তে পারে পারে না ও সেজন্যে অনেক সময়েই কোনো পক্ষকেই ঠিক্‌ দায়ী করা চলে না। কিন্তু এত শত সূক্ষ্ম বিচার নিয়ে যে শরণ মাথা ঘামাত না বলাই বেশি। তার মনটা ছিল সজাগ কিন্তু সহিষ্ণু নয়। তাই সে বিচারের দায়িত্ব অম্লানবদনে গ্রহণ ক'রে এক পক্ষের স্কন্ধেই সমস্ত অপরাধের বোঝাটা দিত চাপিয়ে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে রায় দেওয়ার পরেই সে একটু অস্বস্তিও বোধ করত; কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মনের মধ্যের প্রতিকূলতাটি পাক খেয়ে খেয়ে পুঞ্জীভূত হ'তে থাকৃত। চামেলীর বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রতিকূলতাটা হয় ত তার মনের কোণে এত শীঘ্র জমাট বাঁধতে পার্‌ত না, যদি না বোকা মেয়ে সুনন্দা তার কাছে সরলমনে দুএকদিন গল্প ক'রে ফেল্‌ত যে 'তার মা তার বিরুদ্ধে বড়মা ও বাবার কাছে ব'লেছে যে সে কুড়ে, অবাধ্য ও নেশাখোর, ও আরো কত কি। শুনে সে মনে মনে জ্বল্‌তে থাক্‌ত ও ভাব্‌ত কি ক'রে মেজবৌমাকে আঘাতটা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু খুব প্রকাশ্য ভাবে সেটা করা চলেনা ভেবে সে মনে মনে গুমরে গুমরে বেড়াত। কিন্তু প্রতিশোধ-স্পৃহায় সে সুবিধে পেলেই এমন ভাবে চামেলীর কথা অগ্রাহ্য কর্‌ত, যেটাকে জ্ঞানদার কাছে জানাতেও চামেলীর একটু অপমান বোধ হ'ত। নেহাৎ থাকৃতে না পার্‌লে সে শেষটায় জানাত বটে, কিন্তু ফলে একটু আধটু বকাঝকি হ'লে শরণ এমন ভাবে জ্ঞানদার তিরস্কারকে এড়িয়ে যেত ও বুদ্ধি ক'রে এমন জরুরি ওজর দেখাত যে চামেলীকে খানিকটা হার মান্‌তেই হ'ত; আর প্রতিবার তার অনুযোগের বিফলতার ফলে শরণের প্রতি আক্রোশটা আরও ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌ত। শরণ মনে মনে যে মেজবৌমার আক্রোশের ঘনায়মান ছায়াপাতে একটুও অস্বস্তি বোধ না কর্‌ত তা নয়, কিন্তু তাঁর অন্যায় নালিশের কথা মনে ক'রে সে একটু একটু ক'রে বে-পরোয়া হ'য়ে উঠ্‌ছিল।

(৪)

মানুষের মন অনেক সময় একদিকে চাপ বোধ করলে অন্যদিকে ছাড়া পেতে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। কাজেই চামেলীর প্রতি শরণের প্রীতি যে অনুপাতে ফিকে হ'য়ে আসে, অমরের প্রতি তার অনুরাগ ঠিক্‌ সেই অনুপাতেই গাঢ় হ'য়ে ওঠে। এ অকেজো লোকটির নাওয়া খাওয়া যাতে সময়ে হয়, সেজন্যে তার উৎকণ্ঠা দিন দিনই বেড়ে চলে; তার অগোছাল ঘরটির বেহিসাবী আস্‌বাব-পত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাটা তার কাছে একটা মস্ত কাজ ব'লে গণ্য হ'তে থাকে; এক কথায়, সে বাড়ীর কাজকর্ম্ম থেকে যেটুকু অবসর পায় সেটুকু সময়ে সে নিরন্তর তার উদ্ভাবনী শক্তিকে চালনা করে—কিসে ছোট-দাদামণির স্বাচ্ছন্দ্য একটু বাড়বে। তার ক্ষোভ প্রধানতঃ এই যে ছোটবাবু তাকে কোনো রকম ফরমাস কখনো করেন না। করলে ভাল হ'ত—তার দিক্‌ দিয়ে। কারণ তাহ'লে তাকে সর্ব্বদা কল্পনা করতে বেগ পেতে হ'ত না কোথায় কবে কোন্‌ সূত্রে ছোটবাবুর কি ছোটখাট দরকার হতে পারে। যে-মানুষ চায়—জানায়, ফর্ম্মাস করে—তার অভাব মোচন করতে পারাটা শক্ত নয়; কিন্তু যে-মানুষ মুখ ফুটে কিছু বলে না, তার দাবীটাও বেশি। অন্ততঃ শরণের অবচেতন মনের মধ্যে এইরকম ধরণেরই একটা আবছা যুক্তি ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। ফলে অমরের জুতা ছিঁড়ে যাব-যাব হ'লেই বাড়ীতে মুচির অভ্যাগম হয়; তার একমাত্র ফরাসের চাদর ও মশারি ময়লা হ'তে না হ'তে বাড়ীতে সান্‌লাইট্‌ সাবানের আমদানী হয়; তার জামাকাপড় ছিঁড়ে যাবার উপক্রম করলেই সেলাইটা অলক্ষিতে সুনির্ব্বাহিত হ'য়ে যায়; তার বন্ধুবান্ধব আস্‌তে না আস্‌তে পান সিগারেট আলাদিনের দৈত্যের মতনই ডাক্‌তে না ডাক্‌তে হাজিরি দেয়।

এইরকম ক'রে অমরের দৃষ্টি কখনো আকর্ষণ করার চেষ্টা না ক'রে মুখ বুজে তার পরিচর্য্যা ক'রে ক্রমে সে তার দৃষ্টিতে প'ড়ে গেল। অমর দেখ্‌ল তার জীবন-যাপনের যোড়া-তাড়া-লাগা পালের ফুটোগুলো হঠাৎ মেরামত হ'য়ে কোথা থেকে একটা অনভ্যস্ত আরামের হাওয়া এসে লাগ্‌তে আরম্ভ ক'রেছে।

(৫)

যন্ত্রতন্ত্রের যুগ আসার সঙ্গে সঙ্গে এমন সব বিলাসের সাজ-সরঞ্জাম নিত্য যেন ভুঁই ফুঁড়ে ওঠে, যার অভাব মানুষ কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নি। যান্ত্রিক স্রষ্টাসম্প্রদায় বলেন, মানুষের অভাব তৈরি হয় নাকি শুধু এই উপায়েই। এ কথা সত্য হোক্‌ বা না হোক্‌ অমরের উদাসীন বেপরোয়া মনস্তত্ত্বটি পর্য্যালোচনা করলে যেটা অকাট্য হ'য়ে ওঠে সেটা এই যে

নতুন আরামের সন্ধান পেলে ক্রমে মানুষের কাছে অভ্যস্ত রিক্ততাটাকে ফাঁকি মনে হয়, অনভ্যস্ত সেবাটা একান্ত আবশ্যক হ'য়ে ওঠে।

তার লক্ষ্যহীন, বেপরোয়া, উধাও গতির মধ্যেকার বিশৃঙ্খলতাটির দিকে কখনো তার চোখ পড়ে নি ; এমন কি জীবনে শৃঙ্খলার যে একটা স্থান আছে এ কথা কখনো অনুভব করবার তার সুযোগ হয় নি। কিন্তু শরণের মূক পরিচর্য্যা ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের সদা-সতর্ক চেষ্টার ফলে ক্রমে তার দৃষ্টি পড়ল—জীবনে শৃঙ্খলার সৌন্দর্য্যের দিকে। ক্রমে কোনো দিন কোনো আকস্মিক কারণে শরণের কাজে শৃঙ্খলার ত্রুটি হ'লে তার মনটা তার অজ্ঞাতে একটু যেন খুঁতখুঁত করতে থাকে। পরে এ অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে অবশ্য তার আশ্চর্য্য মনে হ'ত, কিন্তু তাই ব'লে তার মনের কোণে অস্বস্তিটি কম্‌ত না। এ-সময়ে তার প্রায়ই মনে হ'ত তার একটি ডেপুটি বন্ধুর কথা। বন্ধুটি তাকে ব'লেছিলেন যে প্রথম প্রথম তিনি তাঁর অধীনস্থ আরদালি প্রভৃতির সেলাম ও ব্যস্ততায় মনের মধ্যে নিজেই কেমন যেন একটু ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তেন ; কিছুদিন পরে অধীনস্থ লোকের সম্মান-প্রদর্শনে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন ; ক্রমে ক্রমে শেষটায় এম্‌নিই হ'ল যে সেলাম না পেলে তাঁর মনের মধ্যে তাঁর শত চেষ্টা সত্ত্বেও একটা ক্ষোভের ভাব গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। মনে হ'ত সেলাম করাটা ছোটলোকের একটা কর্ত্তব্য।

শরণের সুনিপুণ হাতের সেবায় অমরেরও মনে প্রথম প্রথম একটু কিন্তু-কিন্তু ভাবের উদয় হ'ত। ক্রমে তার মনে একটা আরামের ভাব দেখা দিল। তার পরে ক্রমে তার মনে হ'তে লাগ্‌ল যেন তার বৈঠকখানা-ঘরের শ্রীহীন অবস্থাটা পরমকারুণিক বিধাতার জাগতিক নিয়ে একটা দুঃসহ অন্যায়! প্রথম প্রথম সে শরণকে কোনো রকম ফরমাসই করত না, ক্রমে সে একটা ইতস্ততঃ ভাবের সঙ্গে তাকে নানা রকম ছোট-খাট কাজের আদেশ দিত ; শেষে এমন হ'ল যে তার মনে হ'তে লাগ্‌ল চাকর না হলে একজন মানুষের চলে কেমন ক'রে?

(৬)

এমন সময়ে হঠাৎ ষষ্ঠীচরণের টাইফয়েড হ'ল। জ্ঞানদা মাত্র কিছুদিন আগে প্লুরিসি থেকে উঠেছিলেন ব'লে, রাত-টাত-জাগা বা সদা-সতর্ক সেবা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি দুশ্চিন্তায় দুদিনে কালিবর্ণ হ'য়ে গেলেন। যোগেন্দ্র কল্‌কাতা থেকে তার করলেন "নার্স মুঙ্গের যেতে রাজি হচ্ছে না।" স্বামীর সাহেবিয়ানা সত্ত্বেও বাড়ীতে 'নার্স' আনায় জ্ঞানদার বিশেষ অনিচ্ছা ছিল, কেবল নেহাৎ অক্ষম ব'লেই তিনি রাজি হ'য়েছিলেন ; কারণ চামেলী সেবা করতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও 'পরের-মেয়ে'কে তিনি নিজের ছেলের ছোঁয়াচে রোগের কাছে আস্‌তে দিতে রাজি ছিলেন না। অগত্যা রমেন্দ্রের অনুরোধে তিনি নার্স যোগাড় করবার জন্যে দাদাকে টেলিগ্রাম করাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। নার্স যখন পাওয়া গেল না তখন তিনি একদিকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বটে, কিন্তু অন্যদিকে ভাবনায়ও প'ড়ে গেলেন। অসুস্থ শরীরে রাতটাত জাগার কাজে তাঁকে একলাই লেগে যেতে হ'ল। কিন্তু দুচার দিনের মধ্যেই তাঁর দুর্ব্বল শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। চামেলী দিদির সেবায় রত হ'লেন বটে, কিন্তু জ্ঞানদা তাঁকে ষষ্ঠীচরণের কাছে ঘেঁষতেও দিলেন না, বুড়ি মাতু কোনোমতে সে-শুশ্রূষার ভার নিল। ডাক্তার বল্‌লেন "উহুঁ"। জ্ঞানদা মহা ভাবনায় পড়লেন।

শরণ এগিয়ে এল। বল্‌ল "বড়মা, জাতে গোয়ালা ব'লে এতদিন বলতে সাহস করিনি, কিন্তু রুগীর সেবা করতে আমি একটু-আধটু জানি।"

জ্ঞানদা অকূলে কূল পেলেন। জ্বরের ঘোরে ষষ্ঠীচরণও প্রায়ই যখন "শরণদা শরণদা" ক'রে চীৎকার করত, তখন তিনি মাঝে মাঝে ভাব্‌তেন গোয়ালার হাতের সেবা ও জলগ্রহণে দোষ কি? তবু অনেক দিনের কুসংস্কার একদিনে যায় না, তাই তিনিও শরণকে ডাকেন নি, শরণও আস্‌তে সাহস পায় নি।

তাছাড়া এখন উপায়ও ছিল না। কাজেই খানিকটা আশা ও খানিকটা মাতৃহৃদয়ের সহজবোধের ভরসা এ দু'য়ের প্ররোচনায় প'ড়ে তিনি শরণের শরণ নিতে সম্মত হ'লেন। মনটা তাঁর ভ'রে উঠ্‌ল। তাঁর জননীর প্রাণ একটা মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ব'লে উঠ্‌ল এইবার বুঝি চরণের ফাঁড়া কেটে গেল। সেদিন রাত্রে তিনি প্রথম ঘুমলেন কয়েক ঘণ্টা।

(৭)

শরণ সব কাজ ফেলে দিনরাত ষষ্ঠীচরণের সেবায় আত্মনিয়োগ কর্‌ল। কী অক্লান্ত সেবা সে, ও কী স্নেহের

অন্তর্দ্দৃষ্টি! জ্ঞানদা মাঝে মাঝে জ্বর-গায়ে ষষ্ঠীচরণকে দেখতে আসতেন। শরণের নারীর মতন একান্ত স্নেহ-সতর্ক সেবা দেখে তাঁর চোখে জল আস্‌ত। মা হ'য়েও তাঁর পুত্রের অসুখে তিনি কখনো এমন সেবা করতে পারেন নি এর আগে।

যোগেন্দ্র রোজ তার করতেন—আসবেন কি না। জ্ঞানদা ক'দিন থেকে ভাব্‌ছিলেন লিখে দেন, "এসো"। কিন্তু আবার ভাবতেন কেন কাজে-ব্যস্ত লোকটাকে কষ্ট দেওয়া—বিশেষতঃ ডাক্তার যখন বল্‌ছেন এখনও খুব ভয়ের কারণ নেই।

(৮)

তেইশ দিন পরে ডাক্তার একদিন একটা বড় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: "আর ভয় নেই। রোগী সেবার গুণেই বেঁচে গেল।" জ্ঞানদারও জ্বর ছাড়ল তার দুএকদিন পরে। তিনি স্বামীকে লিখে দিলেন যে চরণ শরণের শুশ্রূষাতেই এ যাত্রা বেঁচে গেল।

(৯)

কিন্তু সংসারে এমন কোনো শুভই বোধ হয় নেই যার মধ্যে অশুভের ছায়াপাতও হ'তে পারে না। অন্ততঃ ষষ্ঠীচরণের অক্লান্ত সেবাটা রোগীর স্বাস্থ্যের ও শরণের মানসিক উন্নতির পক্ষে যতই শুভ হোক না কেন তার ফলে অমরের মনোজগতে যে একটা অনির্দ্দেশ্য বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য দেখা দিল সেটা মান্‌তেই হবে; এবং এ আন্দোলনটি ঠিক্‌ অবিমিশ্র শুভ ছিল না। ব্যাপারটা এই:—

ষষ্ঠীচরণের সেবার মধ্যে একান্ত ভাবে মগ্ন থাকার ফলে শরণের সতর্ক পরিচর্য্যার আকস্মিক অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অমরের বেপরোয়া মনটি আবিষ্কার ক'রে বস্‌ল যে তার জীবনে একটা নতুন বস্তুর আমদানী হ'য়েছে যার নাম অসুবিধে। শরণের আসার আগে রমেন্দ্র মাঝে মাঝে জ্ঞানদাকে হেসে বল্‌তেন "বৌদি, ঐতিহাসিক বলেন যে ওয়াশিংটন তাঁর শৈশবে নাকি মাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল ভয় মানে কি। কিন্তু তাঁকে যদি এ-কথা জানানো যেত যে অমরুটা ছেলেবেলায় তার মাকে খুব সম্ভবতঃ জিজ্ঞাসা ক'রেছিল বিশৃঙ্খলার অসুবিধে মানে কি তাহ'লে তিনি বোধহয় ওয়াশিংটনের প্রশ্নের ওরিজিন্যালিটি নিয়ে অতটা হৈ-চৈ করতেন না।"

কথাটা সত্য। মুখে বলা দূরে থাকুক অমরের মনেও কখনো অসুবিধের কথা উদয় হয় নি এ কথা বোধ হয় বলা চলে। শত রুক্ষতার বেবন্দোবস্তেও তার মনটা থাকৃত ঠিক্‌ তেমনি নির্লিপ্ত যেমন থাকে গোলাপের পাপড়ি—জলের সংস্পর্শে।

কিন্তু শরণের পরিচর্য্যায় পরশ কিছুদিন পাওয়ার ফলে তার সুখের ধারণায় যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল।

তার হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল যে ঘরে পরিচ্ছন্নতার অভাব হ'লে মনেও কোথায় যেন একটা মালিন্য জমে ওঠে; অনুভব কর্‌ল যে বন্ধু-বান্ধব এলে হাতের কাছে পানটান না-পাওয়াটা একটা সত্য অস্বস্তি সৃষ্টি করে; আবিষ্কার কর্‌ল যে বোতাম-হারা যার্টে ভূষিত হ'য়ে আড্ডা মেরে বেড়ানোটাও কেন যেন আর আগেকার মতন ঠিক্‌ তেমন স্বচ্ছন্দগতি হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না।...

শরণের সেবা-সতর্ক উপস্থিতি বিরল হ'য়ে ওঠার ফলে সে একটা জিনিষ ধীরে ধীরে লক্ষ্য করতে বাধ্য হ'ল। সেটা এই যে তার মনের মধ্যে যেন শরণের বিরুদ্ধে একটা অনুযোগের ভাব ধীরে ধীরে জ'মে উঠ্‌ছে—তার শত যুক্তি ও চেষ্টা সত্ত্বেও। সে মনের কোণে অবশ্য ভারি একটা কুণ্ঠা ও এমন কি লজ্জা বোধ করতে লাগ্‌ল যে বাড়ীতে একটা ছেলের অসুখ, অথচ সে নিজের তুচ্ছ সুবিধে-অসুবিধের দরুণ ক্ষুণ্ণ বোধ করছে। অবশ্য সে মুখে কিছু বল্‌ত না। কিন্তু ক্ষোভকে প্রকাশ-না-করা এক—ও সেটাকে নিবারণ-করতে-পারা আর।

তাই বিশ্লেষণ ক'রে কারণ-নির্দ্দেশ করতে না পারলেও তার মনের মধ্যে একটা বিচিত্র ক্ষোভ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল: তার কেমন-যেন মনে হ'তে লাগ্‌ল যে বাড়ীতে তার কোনও সত্য আশ্রয়ই নেই, যেন সে অনাহূতের মতন শুধু জোর ক'রে খানিকটা স্থান জুড়ে ব'সে আছে।

জীবনে বড়দা ও মেজবৌদির কাছে সে কখনোই আমল পায় নি। অথচ এ-জন্যে তার মনে কখনো কোনো ক্ষোভের বাষ্প জমাট হ'য়ে উঠতে পারে নি, কেন না মেজদার ও বড় বৌদির স্নেহ তার মনের অনেকটা ফাঁকা স্থান অজ্ঞাতে ভ'রে রাখ্‌ত। কিন্তু কিছুদিন ধ'রে শরণের সেবা-পরিবেষণের পর পরিবেষকের আকস্মিক অন্তর্ধানে তার মনে

হ'তে লাগল যেন সে তার বড়বৌদি বা মেজদার কাছেও ঠিক্ তেমন আবশ্যক নয় যেমন আবশ্যক—সামান্য চাকর শরণের কাছে। সে মাঝে মাঝে ভাব্‌ত যে কেনই বা সে এ-সিদ্ধান্ত ক'রে বস্‌তে চায় যে স্নেহের একমাত্র প্রকাশ ও সার্থকতা—পরিচর্য্যায়। সুগৃহিণী বলতে যা বোঝায় তা ত জ্ঞানদা কোনো কালেই ছিলেন না; তার মেজদার স্নেহটাও ত' বরাবর স্বাস্থ্যের মতনই অজ্ঞাতে বিরাজ করত—অর্থাৎ তৃপ্তি দিত বটে, কিন্তু নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করতে কখনো ব্যস্ত হ'ত না। অমর তাঁদের উভয়ের স্নেহকেই তার অবচেতন মন দিয়ে গ্রহণ ক'রে এসেছিল। ফলে তার আর যাই লাভ হোক্ বা নাই হোক্, তার জীবনের বাইরের ব্যবস্থার পর্য্যাপ্তির দিকে যে কিছু ত্রুটি রয়েছে সেটা কখনো অনুভব কর্‌বার অবকাশ পায় নি। কিন্তু শরণের সুষ্ঠু শৃঙ্খলার ও সতর্ক পরিচর্য্যার আস্বাদ পাওয়ার পর থেকে বাইরের বিশৃঙ্খলতার বাস্তবতাটি তার কাছে যেমন রূঢ় ঠেক্‌লো, স্বাচ্ছন্দ্যের সৌষমটিও তেমনি বড় হয়ে উঠ্‌ল। সে শরণের অভাবের দরুণ ক্রমে নিজেরই মনের মধ্যে এক বিচারকর্ত্তা খাড়া ক'রে বস্‌ল। এ-বিচারকর্ত্তার কাছে সে নিজের অকথিত অভিযোগগুলি পেশ ক'রে মাঝে মাঝে সংসারের দরদের কার্পণ্যের বিরুদ্ধে এক-তরফা ডিক্রিজারি ক'রে নিয়ে কেমন যেন একটা সস্তা তৃপ্তি পেত। পরে মনের সহজ অবস্থায় এ বিচার করতে-যাওয়ার জন্যে সে একটা গ্লানি বোধ কর্‌ত বটে, কিন্তু তা-সত্ত্বেও ছোট-খাট দৈনন্দিন অসুবিধের মধ্যে যে বাড়ীর অব্যবস্থার জন্যে মনের মধ্যে একটা রূঢ় রায় না-দিয়েও থাকৃতে পার্‌ত না!

(১০)

সাতাশ দিনের দিন ষষ্ঠীচরণ পথ্য কর্‌ল। জ্ঞানদার মুখে হাসি দেখা দিল। রমেন্দ্র শরণকে চারজোড়া ধুতি ও একটা ভাল কম্বল কিনে দিলেন। এমন-কি চামেলীও স্বীকার করল যে 'হ্যাঁ আর কিছু পারুক বা না পারুক শরণ সেবাটা করতে শিখেছিল।'...

(১১)

শরণ আবার অমরের ঘরের সৌকর্য্য-সাধনে মন দিল।... কিন্তু তখন অমরের মনে কোথায় যেন শরণের প্রতি কি-একটা অনির্দ্দেশ্য বিরুদ্ধ ভাব জেগে উঠেছে; যেন একটা নিহিত অনুযোগের ভাব, যেন শরণের ওপর যে তার কোনো দাবী দাওয়াই নেই এটা তাকে জানিয়ে-দেওয়া দরকার—এই রকম একটা অভিমান। শরণ অমরের ভাব-বৈলক্ষণ্য মনে অনুভব করে, অথচ প্রতীকার খুঁজে পায় না। কোথায় একটা কি আড়াল এসে গেছে—অথচ তা স্পর্শের অনধিগম্য!..

(১২)

ষষ্ঠীচরণের জ্বরের মধ্যে অমরের একটি রেশমী চাদর ও সখের রূপোর ঘড়ি হারিয়ে যায়। শরণের আস্‌বার আগে তার জিনিষপত্র এমন প্রায়ই হারাত। শরণের আসার পর থেকে এ রকম সব তছরূপ একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—শরণ তার জিনিষপত্র এম্‌নি যখের মতন আগ্‌লাত! সে কোনো বন্ধুর বাড়ীতে চাদর বা ডিবে ফেলে এলে, কিম্বা তার ইয়ার-বক্সি কেউ তার ছাতা বা ছড়ি নিয়ে গেলে শরণের মনে যেন আর শান্তি থাকৃত না। সে ক্রমাগত তার উদাসীন প্রভুটিকে মনে করিয়ে দিত যে তার অমুক-অমুক জিনিষ স্বস্থানভ্রষ্ট হ'য়ে অমুক-অমুক অস্থানে ক্লিষ্ট হ'য়ে বিরাজমান। রজক-প্রবর কোনো পিরাণ বা কিছু বাকী রাখ্‌লে তাগাদা দিয়ে দিয়ে হৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার না ক'রে যেন তার ঘুম হ'ত না। এমন কি, তার আলমারির চাবি অমর যেখানে সেখানে ফেলে রাখ্‌লেও সে বারবার তাকে জানিয়ে দিত এরূপ ব্যবহারে চাবির চাবিত্বের অমর্য্যাদাই হ'য়ে থাকে। অমর তার স্নেহ-সতর্কতার এতটা বাড়াবাড়িতে অনেক সময়ে সত্যিই একটু হাঁফিয়ে উঠ্‌ত, কারণ ছেলেবেলা থেকে জিনিষপত্র হারিয়ে-হারিয়ে হারানোতে সে অনেকটা অভ্যস্তই হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু তবু ক্রমে ক্রমে শরণের এতটা দরদে সে ধীরে ধীরে আর্দ্র হ'য়ে উঠ্‌ছিল—নিজের অজ্ঞাতসারে। না-চাইতে পাওয়ার জন্যে প্রথম-প্রথম অনেক সময়ে মানুষ কৃতজ্ঞতার চেয়ে কুণ্ঠাই বোধ করে—বেশি। কিন্তু ক্রমে সে-দান তার সহজ গৌরবেই হৃদয়ের গোপন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, কেন না এই-ই দানের ধর্ম্ম।

ষষ্ঠীচরণের জ্বরের সময়ে তার ঘড়ি ও চাদর হারানোর সঙ্গে সঙ্গে সে শরণের সেবার এ গৌরবটির প্রতি যেন আরও সচেতন হ'য়ে উঠ্‌ল। অথচ—আশ্চর্য্য—শরণ থাকলে যে এটা ঘট্‌ত না এ কথা মনে ক'রে তার মনে শরণের বিরুদ্ধে

একটা অনুযোগের ভাবও কোথা থেকে মাথা নাড়া দিয়ে উঠ্‌ল।

(১৩)

শরণ ফিরে এসে দেখ্‌ল যে তার সঙ্গে অমরের পূর্ব্ব-সম্বন্ধের মধ্যে কোথায় যেন কি-একটা ইস্ক্রুপ নড়-চড় হ'য়ে গেছে—যার ফলে অমরের সঙ্গে তার যোগটা একটু আল্‌গা হ'য়ে পড়েছে। অথচ তাদের মধ্যেকার সহজ হৃদ্যতার সৌরভটুকু যে সম্পূর্ণ উঠে গেছে তা-ও নয়। তালাও ছিল সেই, চাবিও ছিল সেই ; কেবল একদিন তালাশুদ্ধ চাবিটা প'ড়ে-যাওয়ার পর থেকে তালাটা চাবি দিয়ে খুল্‌তে গেলেই ছুটোয় খচ্‌ খচ্‌ ক'রে উঠ্‌ত। তালা ভাব্‌ত দোষটা চাবির, চাবি ভাব্‌ত—তালার।

(১৪)

শরণের সন্দেহ হ'ল। সে একদিন অমরকে বল্‌ল যে মেজবৌমার বয়াটে ভাই পানুবাবু সম্প্রতি একটু বেশি ঘন ঘন বোনকে দেখ্‌তে আস্‌তেন, ছুএকদিন সে তাঁকে অমরের বৈঠকখানায় ঢুক্‌তে দেখেছে। অমর একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে মুখ তুলে তার দিকে শুধু তাকিয়ে রইল। শরণ নতমুখে নখ খুঁট্‌তে খুঁট্‌তে বল্‌ল, পানুবাবু মাস তিনেক আগে পাড়ার তারিণীবাবুর মেয়ে মালতীর হার চুরি করার অপরাধে গলাধাক্কা খেয়েছিলেন। অমর বুঝ্‌ল, কিন্তু একটু রূঢ়স্বরে ব'লে বস্‌ল : "থাম্‌ থাম্‌, নিজে অসাবধান আবার পরকে দোষ দেওয়া হয়।" শরণ মৃদুস্বরে কি-একটা উত্তর দিতে যেতেই অমর বল্‌ল : "চাকর চাকরের মতন থাক্‌।" ব'লেই সে পাড়ার থিয়েটার-পার্টিতে প্রফুল্লের মহলায় যোগ দিতে গেল।

(১৫)

সেদিন মহলা তার ভাল লাগল না। সে নদীর ধারে বেড়াতে চ'লে গেল। কেন এমন কথা বল্‌ল সে ?···

ওদিকে অমর হন্‌ হন্‌ ক'রে বেরিয়ে গেলে শরণ একটু চুপ ক'রে বাইরের ম্লানায়মান আকাশের একটি ছোট্ট মেঘের শেষ রশ্মিটুকুর দিকে খানিক চেয়ে রইল। একবার নিজের মনে বল্‌ল : "চাকর।" তারপর একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাসকে আধপথে চেপে সে নিজের কাজে মন দিল।

(১৬)

সুনন্দা পাশের উঠোনের চৌবাচ্চায় মোহিতের সঙ্গে কাগজের নৌকা-ভাসানো নিয়ে খেল্‌ছিল। হঠাৎ সে শরণদার গল্প শুনে তাকে ডাকৃতে অমরের ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে চৌকাঠ অবধি পৌঁছেই অমরের ও শরণের গম্ভীর মুখ দেখে ফিরে এল। শরণকে তার নৌকা-তৈরি করার ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করার ইচ্ছে তার অন্তর্হিত হ'ল। শরণদার গম্ভীর-মুখকে সে ভারি ভয় পেত।

ফিরে আস্‌ছে এমন সময় শরণের শেষ কথা কয়টা তার কানে গেল। তার বকুলফুল মালতীর হার ! তার কাছে পানু-মামা গলাধাক্কা খেয়েছে ? ভারি মজার কথা ত ! দাঁড়াও ! ··

সেদিন পানুবাবু সন্ধ্যায় এসে সুনন্দাকে কোলে বসাতেই সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল : "আচ্ছা পানুমামা, শরণদা যে বল্‌ছিল যে বকুলফুল তোমাকে হারচুরি করার জন্যে গলাধাক্কা দিয়েছিল ? কিন্তু সে তোমার গলার নাগাল পেল কেমন ক'রে বল না।"

চামেলী রোজ রোজ হাবা মেয়েটার বেফাঁস কথায় তিতিবিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। এক চড় বসিয়ে দিয়ে বল্‌লেন : "লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, যেমন চেহারা তেম্‌নি বুদ্ধি। যা মুখে আসে তাই বলিস্‌।"

হাবা মেয়ে তার বুদ্ধির ত্রুটি সম্বন্ধে সওয়াল জবাব না ক'রে স্রেফ্‌ সপ্তমে তান ধরল। পানুবাবু "কাল আস্‌ব মিলি," ব'লে ত্রস্তপদে প্রস্থান করলেন। পথে শরণের সঙ্গে দেখা। শরণ তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি তার দিকে অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে হন্‌ হন্‌ ক'রে বেরিয়ে গেলেন। শরণ দেখ্‌ল তিনি বিড় বিড় ক'রে কি বক্‌তে বক্‌তে চ'লেছেন।

গেটের কাছে গিয়ে গেট খুল্‌তেই পানুবাবু ঠিক্‌ অমরের সাম্‌নে প'ড়ে গেলেন। তিনি কেমন-যেন একটু চম্‌কে গিয়ে কোনো কথা না ব'লে ত্বরিতপদে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন।

অমর তাঁর দিকে খানিকক্ষণ অনমনস্ক ভাবে চেয়ে রইল। খানিক পরে হঠাৎ মাথা নেড়ে শুধু বল্‌ল : "নাঃ।"

(১৭)

পরদিন শরণ বাড়ীর বাইরের মাঠে তার ছোট্ট চালাঘরে শুতে যাবার সময় কি-একটা দরকারে তার টিনের তোরঙ্গটি

খুল্‌তে গিয়ে ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। চাবিটা তালাতে ঢোকাতে ভারি কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল ও জোর ক'রে ঢোকাবার পরও তালাটা খুল্‌ল না। তার তালা কে খুল্‌তে গিয়ে নষ্ট ক'রে দিয়েছে? সামান্য চালায় একটা টিনের তোরঙ্গ। চোরের কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ ছিল না?

খানিকক্ষণ জোর-জার ক'রে ঠিক করল পরদিন একটা চাবিওয়ালা ডেকে যা-হয় ব্যবস্থা করবে। ভেবে সারাদিনের খাটুনির পর শুতে-না-শুতে ঘুমিয়ে পড়ল।

(১৮)

পরদিন ভোরবেলা তার ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠ্‌তে সচরাচর একটু দেরি করত, কিন্তু সেদিন তার ঘুম হ'ল না। সে তাড়াতাড়ি ছুট্‌ল একটা চাবিওয়ালার খোঁজে। তার মনের মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কার কম্প জমে উঠেছিল।...অথচ সে ভাব্‌ছিল—কেন এ আশঙ্কা—বড় জোর তার দু একখানা কাপড় চাদর চোরে নিয়ে গেছে।... কিন্তু তবু তার মনটার মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তির মেঘ দেখা দিয়েছিল।

চাবিওয়ালা নিয়ে সবে ঘরে ঢুকেছে এমন সময়ে অমর ঘরে ঢুক্‌ল।—"এ কি! ছোটদাদামণি! আপনি!"

অমর যেন অপরাধীর মতন মুখ নীচু ক'রে একপাশে দাঁড়ালেন। পানুবাবু দারোয়ানকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। শরণ বিস্ময়ে চোখ মুছল। স্বপ্ন দেখ্‌ছে নাকি?

পানুবাবু দরোয়ানকে বল্‌লেন: "ভাঙো তোরঙ্গ।"

শরণ হতবুদ্ধির মতন তাকাল—অমরের দিকে। এ কী ব্যাপার!..

চাবিওয়ালা বলল: "ভাঙ্‌নেকো দরকার নহি, হম্‌ খোল দেতে হেঁ!"

পানুবাবু চ'টে উঠ্‌লেন: "তুম্‌ কোন্‌ হ্যায়?"

এবার শরণ কথা কইল, বল্‌ল: "আমার তালাটা কাল চোরে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। চাবিটাতে খুলছে না। তাই এই চাবিওয়ালাকে—"

পানুবাবু একটু থতমত খেয়ে বল্‌লেন: "মিথ্যে কথা। ব্যাটা নিজে চোর—"

অমর হঠাৎ বাধা দিয়ে চাবিওয়ালাকে বল্‌ল: "দেখো ত তালাঠো, কোই দুসরা কুঞ্জি সে খুলা খা-ইয়া নাহি।"

চাবিওয়ালা তালাটা একটু পরীক্ষা ক'রে বল্‌ল, কেউ তার ওপর জোর ক'রেছিল নিশ্চয়ই, কেন না ভিতরের একটা দাঁত বেঁকে গেছে।

পানুবাবু গর্জ্জে ব'লে উঠলেন "ঝুট—চোরকো থাকে-দাকে কাম নাহি—"

(রাগলে তাঁর বেহারী হিন্দী আরও অপরূপ হ'য়ে উঠত!)

অমর তাঁকে হাতের একটা ভঙ্গীতে থামিয়ে চাবিওয়ালাকে বল্‌ল: "খুলো ত সহি।"...

শরণের তোড়ঙ্গের মধ্যে অমরের রেশমী চাদর পাওয়া গেল।

পানুবাবু বাইরে অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে উঠলেন, অথচ তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা উল্লাস বিচ্ছুরিত হ'য়ে পড়ল; বললেন: "রূপোর ঘড়িটা কোথায় রেখেছিস্‌ বল? দরোয়ান পুলিশ ফুলিশ ডাকো ত জলদি করকে—ব্যাটাকো হম্‌ শ্রীঘরমে পাঠায়কে তব ছোড়েগা। ব্যাটা বদমায়েশকা সেরা—"

অমর দরোয়ানকে বারণ ক'রে দৃঢ় স্বরে বলল: "না।" ব'লেই ঘর থেকে ধীরপদবিক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

শরণ বিহ্বলের মতন খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল রেশমী উড়ানিটার দিকে। হঠাৎ মাথায় একটা গুরুতর আঘাত লাগ্‌লে মানুষ অনেক সময় বলতে পারে না কোথায় তার লেগেছে।...

হঠাৎ পানুবাবুর কোঁচার খুঁটের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। সে হাতনেড়ে পাগলের মতন চীৎকার ক'রে ডাক্‌ল: "ছোটদাদামণি—"

অমর ফিরল।

শরণ কিছু না ব'লে পানুবাবুর পরণের ধুতির কোঁচার খুঁটটা খপ-ক'রে তুলে ধ'রে অমরের নাকের কাছে ধরল। বল্‌ল: "দেখুন এই ঢেরা চিহ্ন—এ আমাদের ধোপার চিহ্ন নয়।" ব'লেই রেশমী চাদরটার ওপরের দিকের কোণ্‌টা তার সামনে ধরল। সেই একই ঢেরা-সই। একই ধোপা দুটো কেচেছে। ব'লে বল্‌ল: "চলুন এই ধোপার খোঁজে, সহজেই খুঁজে বার করা যাবে—সে বলবে কে রেশমী চাদরটা কাচতে দিয়েছিল। আমি না পানুবাবু।"

পানুবাবু প্রথমটা হতভম্ব হ'য়ে চুপ ক'রে গেলেন। পরে হঠাৎ তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতন টান-মেরে শরণের হাত থেকে

উড়ানিটা কেড়ে নিয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন: "ব্যাটা তোকে আমি আজ মেরেই ফেল্‌ব।"

অমর গম্ভীর স্বরে বল্‌ল: "দরোয়ান—বাবুকো নিকাল দেও।"

(১৯)

সেদিন থেকে চামেলীর সঙ্গে অমরের কথা বন্ধ হ'য়ে গেল।

অমর নতমুখে একটা দশটাকার নোট শরণের হাতে গুঁজে দিতে যেতেই শরণ বল্‌ল: "ছোটদাদামণি—এ টাকা দিয়ে চরণকে একটা কিছু খেলনা কিনে দেবেন। আমি এ নিয়ে কি করব?" ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে পরে শুধু বল্‌ল: "কেবল আপনার আলমারির চাবি আপনি ফেরত নিন দাদামণি। আর—" বলে মুখ নীচু ক'রে বল্‌ল: "আর আপনার মনিব্যাগটা এখন থেকে বড়মার জিম্মাতেই দেবেন।"

(২০)

সেদিন থেকে শরণ অমরের ঘরের কাজগুলি মুখ বুজে ক'রে যায়!…তার জিনিষপত্রের তদারক আর করে না।…

তার স্নেহ-সতর্কতার বাড়াবাড়ি থেকে অমর নিষ্কৃতি পেল। কিন্তু কোথায় একটা বেদনা জেগে উঠল যে!…

অথচ শরণের কাছে দোষ স্বীকার করাও যে অসম্ভব! চাকর যে!…

(২১)

মনিবের পদ-মর্য্যাদা অমর বজায় রাখ্‌ল। কিন্তু মনের মধ্যে কোনও সম্ভ্রমের তৃপ্তি-সঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল না!…

পানুবাবু সেদিন যখন শরণকেই চোর প্রমাণ করবার জন্যে তাকে শরণের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন—তখন সে তার অবিশ্বাস সত্ত্বেও কেন গেল এ-কথা ভাবতেও সে যেন লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যায় যে! শরণ কি ভাব্‌ল? সমস্ত সংসারে মাত্র একটা লোক তার বিশ্বস্ত হৃদয়ের নিবিড় শ্রদ্ধাভক্তির ডালি নিরন্তর তার পায়ের কাছে ধর্‌ত—তার অহেতুক অনুরাগের তাগিদে। এ অনুরাগের সে খুব মর্য্যাদাই রাখ্‌ল!…কিন্তু তবু শরণের কাছে মাফ চায় সে কেমন ক'রে!…সামান্য একটা চাকরের কাছে? ছিঃ!…

অথচ কয়েকদিন রোজ রাত্রে একটা অনুতাপ নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌ত; সে ঘুরে ফিরে নিজেকে জিজ্ঞাসা কর্‌ত যে অকারণে এমনতর একটা ক্ষোভ তার মনের মধ্যে উপচিত হ'য়ে উঠল কি ক'রে, যাতে ক'রে শরণের মতন বিশ্বস্ত অনুচরের সম্বন্ধেও এমন অপবাদে সে কান দিতে পার্‌ল? বাস্তবিক কি জন্যে এ ক্ষোভ? তাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার। শরণ তার একার চাকর না, তার মাইনেও খায় না। সে তার যেটুকু সেবা করে, ধরতে গেলে তার সেটা ঠিক্ করার কথা নয়। সে করে শুধু তার বিশ্বস্ত হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত দান-উচ্ছলতা থেকে। তবে? তবে, যে-পরিচর্য্যার ওপর তার কোনো দাবী-দাওয়াই নেই, যে-সেবা বস্তুতঃ তার একটা উপরি-লাভ মাত্র, এক কথায়—যে শুশ্রূষার জন্যে তার উচিত শুধু কৃতজ্ঞ-থাকা—সে দেখা-শোনার দানকে সে প্রাপ্য ব'লে ভেবে বস্‌তে গেল কোন্ বিড়ম্বনায়? শুধু প্রাপ্য ব'লে ভাব্‌লেও বা কথা ছিল—কারণ মানুষের স্বভাব অনেক সময় প'ড়ে-পাওয়া জিনিষকে অর্জ্জিত সম্পত্তি ভেবে ভুল করে থাকে দেখা যায় বটে—কিন্তু যেখানে পাওয়ার স্বত্বই কায়েম হয় নি সেখানে দানের সম্ভ্রম সম্বন্ধেও সে চেতনা হারিয়ে বস্‌ল কী অন্ধতায়?—বিশেষতঃ যখন বাড়ীতে চরণের কঠিন অসুখের জন্যেই এ দানের কার্পণ্য ঘটেছিল? সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল রিক্ততার মধ্যেই কি তাহ'লে মানুষ বেশি আত্মস্থ থাকে?..

তার মনে পড়্‌ল শরণের বিশ্বস্ততার কথা। শুধু আল্‌মারির চাবি ও মনিব্যাগের রক্ষণাবেক্ষণই ত নয়—কতদিন তার বালিশের নীচে সে ভুলে কত টাকাই না ফেলে রাখ্‌ত। রাতে সে বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী থেকে ফির্‌তে-না-ফির্‌তে শরণ সে-টাকা তার হাতে দিত। সেই-শরণের সম্বন্ধে সামান্য একটা ঘড়ি ও চাদর চুরির অপবাদ! আর সে অপবাদে বিশ্বাস কর্‌ল কি না সে—বিশেষতঃ যখন অপবাদদাতা—স্বয়ং পানুবাবু! শরণকে দেখ্‌লে সে তার দিকে আর সোজা তাকাতে পার্‌ত না।…

আর শুধু বিশ্বস্ততাই ত নয়! দরদ যে! কী দরদের সঙ্গেই না সে তার খুঁটিনাটি কাজগুলি করবার ভার স্বেচ্ছায় বহন কর্‌ত! তার আজকাল হঠাৎ মনে পড়তে লাগল শরণ তার অনুপস্থিতিতে তার ঘরে ছেলেপিলেদের আস্‌তে দিতে কি আপত্তিই না কর্‌ত—পাছে তার ঘর তারা একটুও অপরিষ্কার করে! এখন সে শুধু তার কাজটুকু করে,

শরণ মাথা নীচু ক'রে নির্দ্দিষ্ট থামের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দুটো জলে উঠ্‌ল। অমরেরও ভারি রাগ হ'ল। সে বল্‌ল: "বড়বৌদি, কেন আর ধ'রে রাখ ওকে? ছাড়িয়ে দাও আপদ যাক্।"

জ্ঞানদা বল্‌লেন: "থাক্ থাক্ ও কথা এখন। ছাড়িয়ে যদি দিতেই হয় তবে সেটা ত খুবই সহজ, তা নিয়ে অত রাগ টাগ করার দরকার কি!"

খাওয়া চল্‌তে লাগ্‌ল। ··

হঠাৎ যোগেন্দ্র নাড়ু মুখে দিয়েই মুখ থেকে ফেলে দিয়ে রেগে উঠে বল্‌লেন: "বড় বৌ— নাড়ু ক'রেছে কে?"

জ্ঞানদা বল্‌লেন: "কেন?"

—"আগে বল কে ক'রেছে?"

চামেলী বল্‌ল: "শরণ।"

যোগেন্দ্র ক্ষিপ্তের মতন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন: "শরণ—damned idiot—"

শরণ থামের পাশ থেকে সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

যোগেন্দ্র বল্‌লেন: "নারকোলের নাড়ু নুন দিয়ে তৈরী করতে হয় এ কথা তোকে কে শেখালো? স্যুয়ার —"

জ্ঞানদা বল্‌লেন: "সে কি? নুন!

অমর মুখে দিয়েই বল্‌ল: "উঃ, নুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। বউদি আজই ওকে ছাড়িয়ে দাও, দোহাই তোমার—এ রকম লক্ষ্মীছাড়ার মতন যার কাজ—"

চামেলী ঝন্ ঝন্ ক'রে ব'লে উঠ্‌ল: "দিদি, বলিনি আমি? তা তুমি বল্‌বে কেবল, যে চাকর ছেলের সামান—চাকর আশ্রিতের মতন—আরও কত কি—"

যোগেন্দ্র রুক্ষস্বরে ব'লে বস্‌লেন: "চাকর Fiddle-stick—"চাকর কুকুর—"

শরণ থামের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌ল: "বড়বাবু গাল দেবেন না ব'লে দিচ্ছি—"

চামেলী আরো কাংস্যপাত্রের মতন বেজে উঠে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্‌ল: "দরোয়ান—বের ক'রে দেত লক্ষ্মীছাড়া নেশাখোর মাতাল ব্যাটাকে—"

শরণের মাথা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠ্‌ল। সে ব'লে উঠ্‌ল: "বৌমা, মুখ সাম্‌লে কথা কইবেন, নেশাখোর বল্‌বার আপনি কে? নেশা করি কি আপনার বাপের টাকায়?"

যোগেন্দ্র ক্ষিপ্তবৎ লাফিয়ে উঠ্‌লেন; অমর ও রমেন্দ্র তাঁকে ধরতে যাবার আগেই তিনি "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা" ব'লেই তার রগের ওপর এক বিরাট চড় মারলেন। শরণ ঘুরে পড়ল।

জ্ঞানদা "ওগো কি করলে গো" ব'লে কেঁদে ছুটে এলেন। শরণের কপাল মারবেল পাথরের উপর দমাস ক'রে প'ড়ে ফেটে গেল। তার কপাল ও নাক দিয়ে গল গল ক'রে রক্ত বেরুতে লাগ্‌ল।

চামেলীও ভয় পেয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

রমেন্দ্র ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন। অমর দরোয়ান ও মাতুর সাহায্যে শরণকে তার বৈঠকখানা ঘরে একটা ক্যাম্প খাটে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। যোগেন্দ্র ভয় পেয়ে না-খেয়েই সোজা ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে কল্‌কাতা চম্পট দিলেন।

জ্ঞানদা অজ্ঞান শরণের মাথায় পটি বেঁধে বরফ দিতে লাগ্‌লেন। মাতু হাওয়া করতে লাগ্‌ল। অমর আইস্-ব্যাগটার মধ্যে বরফ বদলে দিতে লাগ্‌ল।

(৩৪)

ডাক্তার এসে সব শুনে বল্‌লেন: "ব্রেনের concussion হ'য়েছে—কিন্তু সম্ভবতঃ নেশা ছাড়া worry'ও এর আছে। কাজেই blood-pressure খুব বেশি হ'য়ে প'ড়েছে—খুব সাবধান। একটুতেই blood-vessel ছিঁড়ে যেতে পারে, তা হ'লে মৃত্যু অবধারিত।—বিশেষতঃ যদি আবার ভাঙ কি মদ কি কোনও intoxicant খেয়ে বসে।"

উপস্থিত শুধু মাথায় বরফ ও হাওয়া ব্যবস্থা ক'রে তিনি চ'লে গেলেন। জ্ঞান হ'লে একটা ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

জ্ঞানদা ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লেন: "আহা—গরীবের বাছাকে আমরাই মেরে ফেল্‌লাম রে। চরণকে ও যমের দোর থেকে টেনে এনেছিল কি না—"

ষষ্ঠীচরণও "শরণদা শরণদা" ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল।

চামেলী তাকে "চুপ চুপ শরণদার কাছে চেঁচাস্ নি, আয়, শরণদা ভাল হ'য়ে যাবে রে ভাল হ'য়ে যাবে—ভয় নেই" ব'লে তাকে টেনে এনে তার হাতে আমসত্ব গুঁজে দিল।

ষষ্ঠীচরণ আমসত্ব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক কোনে একটা মাদুরের ওপর বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে রইল।

সুনন্দা বল্‌ল: "ওমা—চরণদা—আমসত্ত্ব খেলে না? ও চরণদা—শোনো না—মা—চরণদা শুন্‌ছে না—"

ষষ্ঠীচরণ—"যা যা দিক্ করিস্ নি' ব'লে সুনন্দাকে ঠেলে দিল। সে মেঝের ওপর দম্ ক'রে প'ড়ে কেঁদে উঠল। "বেশ হ'য়েছে" ব'লে তাকে টেনে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চামেলী বল্‌ল: "থাক্ চুপ ক'রে শুয়ে পোড়ারমুখী—সারাটা দিন কেবল শরণদা আর চরণদা আর হৈ হৈ হৈ—" ব'লে বেরিয়ে গেল শরণকে দেখ্‌তে।

মোহিত "চরণদা—দেখ্‌বে এসো শরণদা তার চালা ঘরে নেই—ছোট্‌কার বৈঠকখানায় শুয়ে" ব'লে চরণদাকে শুয়ে থাকৃতে দেখেই বল্‌ল: "এ কী—চরণদা শুয়ে কেন?—চৌবাচ্চায় নৌকো ছাড়বে না?"

ষষ্ঠীচরণ বালিশ থেকে মুখ না তুলেই বল্‌ল: "না—তুই যা—"

মোহিত চরণদাকে "ওঠো চরণদা—দেখ সে—" ব'লেই তার পাশের মালিকহারা আমসত্ত্বটি দেখে আর বাক্যব্যয় না ক'রে সেটি তুলে নিয়েই মুখে পুরে দিয়ে চোরের মতন বেরিয়ে গেল।

(৩৫)

পরদিন শরণের জ্বর বিকারে পরিণত হ'ল। অমর সারা রাত তার বিছানার কাছে জেগে রইল, আর শরণ সারা রাত বক্‌ল।

দুদিন পরে বিকার কেটে গেল—কিন্তু জ্বর ছাড়ল না। শরণ একটু ঘুমিয়ে পড়ল।

অমর ডাক্তারকে ডেকে আন্‌ল।

ডাক্তার বল্‌লেন: "খুব সাবধান হওয়া দরকার—যদিও deliriumটা যে কেটে গেছে এটা একটা ভাল লক্ষণ। Concussionএর খারাপ effectটাও কেটে গেছে। কিন্তু খুব সাবধান। মাথায় রক্ত কোনোমতে না চড়ে। ও সিদ্ধিটিদ্ধি যেন আর না ছোঁয়। Least excitement may be fatal. এই ওষুধটা তিন ঘণ্টা অন্তর—"

জ্ঞানদা শুনে চোখ মুছে বল্‌লেন: "মা দুর্গা, হতভাগাটাকে ভালয় ভালয় সারিয়ে তোলো মা। নইলে আমরাই ওর হত্যের কারণ হব মা।"

রমেন্দ্র অমর ও চামেলী পাশে ছিল। চামেলী বল্‌ল: "দিদি, সেরে উঠুক সে ভাল। কিন্তু কথায় কথায় আমাদের নিমিত্তের ভাগী কর কেন বল ত? বট্‌ঠাকুর ওকে মেরেছিলেন কি সাধে? তাঁকে যে অপমানটা করল ও চাকর হ'য়ে তার কি? আর আমাকে বাপ তুলে—"

জ্ঞানদা আঁচল থেকে মুখ তুলে বল্‌লেন: "মেজ বৌ, তোর প্রাণটা কি পাষাণ দিয়ে গড়া রে? মানুষটা বাঁচে কি না ঠিক্ নেই, আর তুই সেই তুচ্ছ মুখ-ফস্‌কে কথাটাকেই বড় ক'রে দেখ্‌লি?"

রমেন্দ্র জ্ঞানদাকে ধ'রে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। বল্‌লেন: "থাক্ থাক্ বউদি ওর সঙ্গে তর্ক ক'রে ফল কি বল? এতদিনেও কি তুমি বোঝো নি যে বিধাতা যে-মনকে ছোট ক'রে গ'ড়ে পাঠান সে-মনকে মানুষ হাজার টানলেও বড় করতে পারে না?"

চামেলী চোখে আঁচল দিল।

ঘরের মধ্যে রইল কেবল অমর।

সে বল্‌ল: "মেজ বৌদি, কেঁদ না। আমি ওর হ'য়ে তোমার কাছে মাফ চাচ্ছি।"

চামেলীর অশ্রুর বন্যা আরও ফুলে উঠল।

অমর বল্‌ল: "ও বড় দুঃখী বৌদি। আপনার বল্‌তে কেউ নেই ওর। এখানে একটু স্নেহ পেয়েছিল ব'লেই হঠাৎ এ ভুলটা ক'রে ব'সেছিল যে পরও আপন হয়।" ব'লেই আত্মসংবরণ ক'রে বল্‌ল: "এর আগে ও আসামের চা-বাগানে কুলি ছিল। পাঁচ পাঁচটা বছর সেখানে নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'রে সেখানকার সাহেবকে মেরে পালিয়ে আসে।"

চামেলী চম্‌কে মুখ তুলে বল্‌ল: "সে কি? কেন?"

অমর বল্‌ল: "ওর স্ত্রীও সেখানে কাজ করত। সাহেব তার গর্ভাবস্থায় তাকে লাথি মেরে মেরে ফেলে।"

চামেলী মুখ নীচু ক'রে রইল।

অমর আবার বল্‌ল: "তার পর ও দুর্ভিক্ষ ও মড়কের দেশে অনেক ঘুরে, অনেক কষ্ট স'য়ে শেষটায় অনেক ঘুরে ঘুরে এদেশে আসে।"

চামেলী বল্‌ল: "এখানে এল কেন?"

অমর বল্‌ল: "ভেবেছিল বাপ পিতামহের ভিটের বৈমাত্র ভাই একটু মাথা গুঁজবার যায়গা দিতেও পারে ওকে।"

—"দিল না ?"

—"না।"

—"তার পর।"

—"তার পর আর কি ? ও পৈতৃক ভিটেমাটি ভাইকে ছেড়ে দিয়ে চাকরী করতে এসেছিল আমাদের এখানে। ভাইয়ের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করতে ওর লজ্জা কর্‌ল—ছোটলোক কি না।"

চামেলী কথা কইল না।

অমর বল্‌ল : "এখানে আমার ও মেজদার ও—বিশেষ ক'রে বড় বৌদির কাছে ও প্রথম এমন ব্যবহার পায় যাতে ওর মনে হয় যে ওকে বিধাতা পশু ক'রে গড়েন নি—মানুষ ক'রেই তৈরি ক'রেছিলেন।"

ব'লে আবার একটু থেমেই বল্‌ল : "সংসার এ কথা ওকে ভুল্‌তেই শিখিয়েছিল।"

চামেলী চোখ মুছে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা কর্‌ল : "কেমন ক'রে জান্‌লে তুমি এত কথা ?"

—"ওরই মুখে। কয়দিনের বিকারের প্রলাপে।"

চামেলীর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল : "আহা !"

অমর প্রীত হ'য়ে গাঢ় স্বরে বল্‌ল : "ওর দিক থেকেও কথাটা একটু ভেবে দেখা যেতে পারে বৌদি।" ব'লে একটু থেমে মুখ নীচু ক'রে বল্‌ল : "অন্ততঃ গত কয়দিন ওর মাথার কাছে ব'সে ওর প্রলাপের মধ্যে দিয়ে ওর দুঃখের কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে হচ্ছিল যে আমরা সেদিন ওর অপরাধটাই দেখ্‌লাম, অপরাধীকে দেখি নি। যদি দেখ্‌তাম, তা হ'লে হয়ত এত সহজে এ মস্ত সত্যটা ভুলে গিয়ে ব'সে থাক্‌তাম না যে ও-ও মানুষ।"

চামেলী কি বল্‌তে গিয়ে থেমে গেল।

অমর আবার বল্‌তে লাগ্‌ল : "তোমার দোষ দিচ্ছি মনে কোরো না বৌদি। সংসারে সর্ব্বদা শত রকম দাবীদাওয়া নিয়ে ঘর করতে হ'লে মানুষের শান্ত হ'য়ে ভাব্‌বার সময় প্রায়ই থাকে না। থাকে না ব'লেই আমরা পরের আচরণটা শুধু নিজের দিক্ দিয়েই বিচার করতে যাই। অথচ···"

ব'লে একটু মৃদু সুরে বল্‌ল : "অথচ মনে হয় মেজ বৌদি··· যে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যবহারটাও যদি ওম্‌নি মাঝে মাঝে পরের দিক্ দিয়ে ভেবে দেখ্‌তে যেতাম।···"

খানিকক্ষণ দুজনের কেউই কথা কইল না।

অমর বল্‌ল : "কিন্তু জীবনকে রূঢ়ভাবে বিচার করতে গেলেই কি পরকে ঠিক্ বোঝা যায় বৌদি ?"

চামেলী তবুও কিছু বল্‌ল না।

অমর খানিকক্ষণ তার উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল। তার পরে হঠাৎ বল্‌ল : "এ কয়দিন আমার কি কথাটা খুব বেশি ক'রে মনে হচ্ছিল জান বৌদি ?"

চামেলী বল্‌ল : "কি ?"

—"আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে-দেওয়ার কথা- সেই ষোল বছরের সময়—যার ফলে আমি আজীবন মূর্খ ও বকাটে হ'য়ে রইলাম।"

চামেলী জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে চাইল, কোনো কথা কইল না।

অমর বল্‌তে লাগ্‌ল : "স্কুলে আমি মন্দ ছেলে ছিলাম না বৌদি—যদিও ডানপিটে বরাবরই ছিলাম। তবু ক্লাসে ফার্ষ্ট সেকেণ্ডই হ'তাম, নীচে প'ড়ে থাক্‌তাম না।

"হয়ত পরে পড়াশুনোয় ভাল ক'রে যাকে বলে মানুষ হ'তে পারতাম—যদি সুযোগ পেতাম। কিন্তু আমার ভিতরে ভাল-হবার সম্ভাবনাটা কতখানি ছিল সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ও ধৈর্য্য আর যারই থাকুক আমাদের হেড মাষ্টারের যে ছিল না এটা নিশ্চিত।

"তাই আমাকে তারা স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিল অত্যন্ত সহজে—আমার একটা দিনের—কয়েক মিনিটের—না তাও নয়—কয়েক সেকেণ্ডের—অপরাধে।"

ব'লে অমর একটু ম্লান হেসে বল্‌ল : "সে কথা তোমরা সকলেই জান, অন্ততঃ শুনেছ। অপরাধটা সামান্যও নয়। আমাদের দীনু মাষ্টারের হাত কাম্‌ড়ে দেওয়াটা সহজ পাপ নয়—বিশেষতঃ যখন সে পাপটা আমচুরির অপরাধের কাঁধে চ'ড়ে আরও মস্ত হ'য়ে উঠেছিল।"

চামেলী বল্‌ল : "তুমি চুরি ক'রেছিলে ? একথা ত শুনি নি এর আগে। কেন করতে গেলে ?"

অমর বল্‌ল : "সমাজের আইন কানুনে সেটা চুরি হ'লেও আজ অবধি আমি কোনোমতেই সমাজের সঙ্গে সায় দিতে পারি নি যে সেটা ঠিক চুরিই হ'য়েছিল।"

—"মানে ?"

অমর বল্‌ল : "তখন আমার বয়স পোনর। আমি সবে

ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছি। ও-সময়ে মানুষ একটু একগুঁয়ে হয়—অবাধ্যও হয়। কিন্তু এ একগুঁয়েমি ও অবাধ্যতা অভিভাবকদের ও স্কুলমাষ্টারের কাছে যতই অপরাধের হোক্ না কেন—পনর বছরের ছেলের কাছে ত ঠিক্ পাপ মনে হয় না, ঐখানেই যে যত গোল।"

—"তবু চুরি ত চুরি?"

অমর বল্‌ল: "কে জানে! সব সময়েই কি তাই? অন্ততঃ সেদিনের আম-চুরিটার কি অন্য একটা দিক্‌ও ছিল না?"

চামেলী বল্‌ল: "কি হ'য়েছিল?"

অমর বল্‌ল: "তাহ'লে খুলে বলি শোনো। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আজ অবধি কখনো কারুর সঙ্গে আলোচনা করি নি। তোমাকে আজ কেন বল্‌ছি তা-ও জানি না।"

ব'লে একটু থেমে বল্‌ল:

"বোধ হয় মনটা খারাপ আছে ব'লে।"

ব'লে কি-একটা বল্‌তে গিয়ে থেমে গিয়ে বল্‌ল: "আক্ষেপ থাক্—ব্যাপারটাই বলি শোনো—তারচেয়ে।"

ব'লে সামনের একটা তক্তাপোষে চামেলীর পাশে অমর বস্‌ল। তারপর বল্‌তে লাগ্‌ল:

"আমাদের গাঁয়ে একটা কুমু ব'লে চোদ্দ পনের বছরের খোঁড়া মেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াত।

"তার প্রতি প্রথম থেকেই আমার কেমন-যেন একটা মায়া প'ড়ে যায়। সে আমাকে তার গ্রাম্য জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা মাঝে মাঝে বল্‌ত।

"তার বাপ ছিল একটা মাতাল ও মা ছিল রুগ্ন। সে-ই ভিক্ষে ক'রে মা-কে খাওয়াত ও বাপ প্রতিদানে তাকে প্রায়ই মদ খেয়ে এসে মারধর করত।

"বুঝতেই পারছ যে ভিক্ষে যদি কম হ'ত তাহ'লে মারও খেত সে বেশি।

"আমি তাকে মাঝে মাঝেই আমার জলখাবারের পয়সা থেকে বাঁচিয়ে এক আধটা পয়সা দিতাম।

"সেদিন আমার হাতে পয়সা ছিল না। তাকে বল্‌লাম তার পরদিন যদি সে আসে··

"সে কেঁদে বল্‌ল: 'আজ বাবা সকাল থেকে মদের নেশায় চুর হ'য়ে আছে। শুধু হাতে ফিরে গেলে বড্ড মারবে, তাছাড়া মার অসুখও আজ বড় বেড়েছে।' ব'লে বল্‌ল: "যদি ঐ সামনের আম গাছ থেকে অন্ততঃ দুটো পাকা আমও—"

"আমি বল্‌লাম: "সর্ব্বনাশ, তাহ'লে কি আর রক্ষে আছে! ও যে সাক্ষাৎ কৃতান্ত দীনুমাষ্টারের বাগান! স্কুলে তাঁর দাপটে আমরা সর্ব্বদা তটস্থ হ'য়ে থাক্‌তাম।

"সে বল্‌ল: 'বাবু—দীনু মাষ্টারের অবস্থা ভাল; তাঁর বাগানে এবার আমও হ'য়েছে অঢেল। দুটো আম খেয়ে যদি আজ আমরা বাঁচি তবে ক্ষতি তাঁর কতটুকু?'

"ব'লে দুহাতে মুখ ঢেকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌ল: 'বাবু—ক্ষিদে কি জিনিষ তোমরা ত জান না—তার ওপর তিন চারটে আম যদি আজ আমি নিয়ে যেতে পারি হয় ত বাবা আজ না মারতেও পারে—কালও বড্ড মেরেছে—পীঠে বড় ব্যথা—আজ মারলে আর বাঁচ্‌ব না'—কান্নায় তার পরের কথাগুলো আর বোঝা গেল না।

"আমি একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে টপ্ ক'রে পাঁচিল টপ্‌কে দীনু মাষ্টারের বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লাম ও দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা গাছের ডালে উঠে কঞ্চিটার ডগা বেঁকিয়ে আঁকশির মতন ক'রে পট্ পট্ ক'রে গোটা চারেক আম পেড়ে ফেল্‌লাম। পেড়ে সবে তাকে তিনটি ছুঁড়ে দিয়েছি এমন সময় হঠাৎ পা ফস্কে প'ড়ে গেলাম। ভারি একটা শব্দ হ'ল ও দীনুমাষ্টার 'কেরে কেরে' ক'রে ছুটে এলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর একটা বিশালবপু মালি। আমি বিদ্যুদ্বেগে পাঁচিল টপ্‌কে পালাতে যাব এমন সময়ে মালিটা এসে আমার ডান পা চেপে ধরল। কুমু অবশ্য তক্ষণি পালাল।

"দীনুমাষ্টার আমাকে যা মুখে আসে তাই ব'লে গাল দিচ্ছেন এমন সময়ে আমি হঠাৎ আর একবার পালাবার চেষ্টা করলাম। মালিটা ছুটে এসে আবার আমায় জাপ্টে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে দীনুমাষ্টার আমার সেই কঞ্চিটা কেড়ে নিয়ে সপাসপ্ ক'রে আমার হাতে পিঠে গালে মারতে লাগ্‌লেন। আমার গাল কেটে রক্ত পড়তে লাগ্‌ল। আমি যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে তাঁর হাতের কব্জি কামড়ে খানিকটা মাংস তুলে নিলাম। তিনি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। মালিটা আমায় থানায় নিয়ে গেল।

"থানায় আমাকে কয়েক ঘা বেত দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, কিন্তু তাতে দীনুমাষ্টারের হাতটা বিষিয়ে-ওঠা থেকে

ঠেকানো গেল না। স্কুলের হেডমাষ্টার বিশেষ ক'রে তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্যে আমাকে দিল তাড়িয়ে।"

ব'লে অমর ধীরে ধীরে থেমে গেল।

খানিকক্ষণ পরে চামেলীর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল: "সেই থেকে আমি বয়াটে ছেলে, বৌদি।"

চামেলীর চোখ্‌ ছল ছল ক'রে উঠ্‌ল।

অমর বল্‌তে লাগ্‌ল: "অথচ যদি সমাজের বিচারের আলো আমার জীবনের ইতিহাসটার মাত্র খানিকটার ওপর না প'ড়ে সবটুকুর ওপর পড়ত তাহ'লে হয়ত আমার অপরাধটার ইতিহাস ঠিক্ এতখানি কালো হ'য়ে উঠ্‌ত না।"

ব'লে একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বল্‌ল: "কিন্তু এ আক্ষেপ যে বৃথা—তা জানি বৌদি। সমাজ চায় সোয়াস্তি—সুবিচার নয়। তাই যেটুকু সুবিচার না হ'লে সোয়াস্তি একদম অসম্ভব হ'য়ে ওঠে সেইটুকুর ব্যবস্থাই সে করতে পারে। তার বাড়া সূক্ষ্ম সুবিচারের জন্যে তার মাথা-ঘামানোর না থাকে সময়, না থাকে প্রবৃত্তি। এটা মূর্খ হ'লেও আমি জানি ও মানি। তাই সমাজকে ঠিক্ যে দোষ দিচ্ছি তা নয়;—আমি বয়াটে, একগুঁয়ে ছেলে, সমাজকে বিচার করবার অধিকারই বা আমার কোথায়?—আমি কেবল এ কথাটা বল্‌লাম তোমায় আজ এই জন্যে যে হয়ত তুমি জীবনের এ-রকম অসঙ্গতির দুঃখ যে কতটা সেটা বুঝে আজকের দিনে শরণকে ক্ষমা করতেও পার।"

চামেলী বল্‌ল: "ঠাকুরপো—আমি বুঝি যে—"

অমর বল্‌ল: "আজ এ-কথা তুমি বুঝবে কি না জানি না বৌদি, কিন্তু পরে যদি কখনো তোমাকে কোনো বড় অবিচারের ব্যথা গোপনে বহন করতে হয় তখন হয়ত আমার জীবনের এ কথাগুলো তোমার মনে পড়লেও পড়তে পারে। হয়ত তখন তুমি বুঝবে যে যা লোকচক্ষুর গোচর তাই দিয়ে আমাদের পরস্পরকে বিচার করাটা কত বড় ভুল।"

ব'লে একটু থেমে যেন আপন মনেই বলতে লাগ্‌ল: "কে জানে—আমরা অন্তর্যামীকে কল্পনা করতে চাই ঠিক এই জন্যেই কি না। কে, জানে—মানুষ যদি আমাদের অন্তরের ঠিক্ পরিচয়টুকু পেত তাহ'লে একটা অপ্রত্যক্ষ শক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ কল্পনা করবার আমাদের এত মাথা-ব্যথা হ'ত কি না!"

ব'লে আবার একটু থেমে অমর খানিকক্ষণ চামেলীর চোখের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইল। চামেলী কুণ্ঠিত হ'য়ে চোখ নীচু করল। কি-একটা বল্‌তে গেল, কিন্তু আবার থেমে গেল।

অমর বল্‌ল: "বৌদি, কদিন মাঝে মাঝে শরণের বিছানার কাছে গিয়ে একটু আধটু ব'সে থাক্‌তাম। জ্বরের ঘোরে তার নানারকম প্রলাপের মধ্যে দিয়ে তার জীবনের গোপন ব্যথাগুলি শুন্‌তে শুন্‌তে আমার বারবার মনে হয়েছে যে চাকরের ও মনিবের মধ্যে আসলে হয়ত কোনো দুস্তর ব্যবধান নেই। তার হৃদয়টাও হাসি অশ্রু আনন্দ বেদনার ঢেউয়ে হয়ত আমাদের মতনই কেঁপে ওঠে।"

চামেলী কোমলকণ্ঠে বল্‌ল: "এ কথা কে না মান্‌বে ঠাকুরপো? তবে—"

অমর বল্‌ল: "বৌদি—শরণ এখানে একটা বড় আশ্রয় পেয়েছিল। সে নেশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল, সাধুতায় বড় ত সে ছিলই বরাবর—তার ওপর সেও যে মানুষ এটা আমরা স্বীকার করতে আরম্ভ করার ফলে সে তার কুলি-জীবনের নিগ্রহের পর যেন একটা ভরসা পাচ্ছিল;—এমন সময়ে আমরা তাকে সন্দেহ ক'রে ছোট ক'রে দিলাম। সে আবার সত্যিই ছোট হ'য়ে গেল। অথচ…'

ব'লে আবার অমর একটু থেমে গেল। তারপর বল্‌ল: "অথচ…বড়দা, আমি—ও মাফ কোরো বৌদি,—তুমি—এই তিনজনে যদি তার মধ্যে বড় জিনিষটার দাবী করতাম তাহ'লে…তাহ'লে…হয়ত আজ তার এ দশা হ'ত না। আমরা তাকে শুধু সে ছোট ছোট এই কথা ব'লেই তেম্‌নি ক'রে ছোট ক'রে দিলাম যেমন ক'রে বয়াটে বয়াটে ব'লে ব'লে আমাকে বয়াটে ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল।"

চামেলীর দুই চোখে দুই বিন্দু অশ্রু টল টল ক'রে উঠ্‌ল। সে জলভরা চোখে পূর্ণদৃষ্টিতে অমরের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বল্‌ল: "ঠাকুরপো—আমাকে ক্ষমা কোরো, যদি পার। আমি মানুষটা খারাপ ছিলাম না—এত কঠিনও ছিলাম না। কেবল—কেবল…এমন ক'রে বোঝায় নি কেউ আমায় কখনো।"

এমন সময়ে মাতু এসে বল্‌ল: "ছোট-দাদামণি, শরণ কি রকম অস্থির অস্থির করছে।"

(৩৬)

অমর ব্যস্ত হ'য়ে বৈঠকখানা-ঘরে গেল। চামেলী গেল—পেছন পেছন।

শরণ ভারি ছটফট্ করছিল। তার নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। সে বল্ল: "মেজবৌমা, একবার বড়মাকে—আমার আর—বেশি দেরি—"

চামেলী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শরণ কাতর দৃষ্টিতে একবার অমরের দিকে তাকিয়ে বল্ল: "দাদামণি—আমি আবার ভাঙ খেয়েছি—আর পারলাম না—"

অমর ত্রস্তস্বরে বল্ল: "সে কি রে! ভাঙ্ দিল কে তোকে?"

শরণ টেনে টেনে বল্ল: "আমার টিনের তোরঙ্গে ছিল—আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম—"

—"তোকে ডাক্তার না ব'লেছে যে ভাঙের কাছ দিয়ে না যেতে। নইলে যে বাঁচ্‌বি না রে—"

শরণ ম্লান হেসে বল্ল: "না বাঁচ্‌লে ক্ষতি কি দাদামণি? আমার জন্যে একফোঁটা চোখের-জল ফেলবার কে আছে বলুন—এ সংসারে। তাছাড়া সেদিন আমি অপরাধটা ত কম করি নি—মেজবৌমাকে বাপ তুলে—" ব'লেই থেমে গেল। সাম্‌নে জ্ঞানদা পাশে চামেলী।

জ্ঞানদা বল্লেন: "শরণ—কি সব পাগলামি করছিস্? তোর সেদিনকার অপরাধের জন্যে শাস্তি ত তোর কম হয় নি বাবা।"

শরণ তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি তাঁর দৃষ্টির ওপর রেখে বল্ল: "কিন্তু আমি যে ছোটলোক বড় মা।"

চামেলী বল্ল: "থাম থাম শরণ। তোকে কি বড়-মা সেই চোখে দেখেন যে তাঁকে ও-কথা বল্‌ছিস!"

শরণ বল্ল: "না বড়-মা—তোমার কথা শরণ ম'রেও ভুলবে না। কিন্তু—"

জ্ঞানদা তাড়া দিয়ে বল্লেন: "ফের পাগলামি। ডাক্তার ত ব'লেছেন ভয় নেই তোর। এখন কথা বলিস্ নি—"

শরণ ম্লান হেসে বল্ল: "না বড়-মা—কথা একটু বলতে দাও আজ। আমি বুঝছি আমার আর বেশি দেরি নেই—আমি এইমাত্র ভাঙ খেয়েছি আবার—যন্ত্রণায়—"

জ্ঞানদা অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠে বল্লেন: "এ বুদ্ধি আবার তোকে কে দিল রে হতভাগা—কোথায় বেঁচে উঠ্‌বি তা না—"

শরণ বল্ল: "বেঁচে উঠেই বা কি হ'ত মা। আমি তোমাদের সংসারে ত শুধু অশান্তিরই কারণ হ'য়েছি—"

জ্ঞানদা বল্লেন: "থাম্‌বি তুই—না এমনি আজে-বাজে বকবি? ঘুমো দেখি একটু এখন—অত না ব'কে। ডাক্তার বারণ ক'রেছেন বেশি কথা বলতে!" ব'লেই তার কপালে হাত দিয়ে বল্লেন: "উঃ, কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে ছোট ঠাকুরপো। ডাক্তার ডাক শীগ্‌গির—মোটর নিয়ে যাও তুমি নিজে—"

(৩৭)

ডাক্তার যখন এলেন তখন শরণ প্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। মাথার কাছে চামেলী নিজে বরফ দিচ্ছিল।

ডাক্তার বল্লেন: "আবার নেশা ক'রেছে না বকাবকি ক'রেছে?"

অমর বল্ল: "ভাং খেয়েছে শুন্‌ছি—"

ডাক্তার মুখ অন্ধকার ক'রে বল্লেন: "ও—তাই! তাই ত বলি—কাল সন্ধ্যাবেলায় দেখে গেলাম—তখনও এমন serious turn নেয় নি—আর আজ সকালবেলাই মাথায় এত রক্ত পড়ল কি ক'রে?"

জ্ঞানদা বল্লেন: "ডাক্তার বাবু—বাঁচ্‌বে ত?"

ডাক্তার গম্ভীর মুখে ঘাড় নেড়ে বল্লেন: "বলা যায় না। মাথায় রক্তের flow এত বেশি হয়েছে যে শীঘ্র না নেমে গেলে যে কোনো মুহূর্তে অল্প excitementএ blood-vessel ছিঁড়ে যেতে পারে। এখন খুব বরফ দিন—যদি ঘুমোয় ত ভাল। নইলে—এই ওষুধটা দেবেন আধঘণ্টা পরে। দেখ্‌বেন যেন কোনও excitement না হয়। মনে আছে ত ব'লেছি যে the least excitement may be fatal. তর্ক, কান্নাকাটি—এমন কি হঠাৎ বমি করা বা উঠে বস্‌তে যাওয়াও risky।"

ডাক্তার চ'লে গেলে জ্ঞানদা বিবর্ণ মুখে অমরের দিকে তাকিয়ে বল্লেন: "ভাঙ দিল কে ওকে ঠাকুরপো?"

হঠাৎ শরণ কি-একটা কথা বল্ল বিড় বিড় ক'রে।

অমর তার মুখের কাছে কান নিয়ে যেতেই শরণ চেষ্টা

ক'রে একটু জড়তা কাটিয়ে বল্‌ল: "দাদাবাবু—আমি বাঁচব না—আর—মেজবৌমাকে বল্‌বেন—আমার মাফ করতে।"

চামেলী বল্‌ল: "বাঁচবি বই কি—ঘুমো।"

শরণ বল্‌ল: "না মেজবৌমা—আমি বুঝতে পারছি—দাদাবাবু—উঃ—আমার বোধ হয় আর বেশি দেরি নেই—নিশ্বেস কেমন যেন আটকে আসছে। আমি—বাঁচব না—"

অমর বল্‌ল: "বাঁচবি বই কি—এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দিকিন অত না ব'কে।"

শরণ জ্ঞানদার দিকে তার মৃত্যুচ্ছায়াম্লান চোখ দুটি স্থাপন ক'রে বল্‌ল: "আর বেঁচেই বা কি হবে বড়-মা? সেরে উঠ্‌লেও আপনারা ত আমাকে আর রাখতেন না। বড়বাবু এবার—আমাকে—নিশ্চয় ছাড়িয়ে দিতেন।"

জ্ঞানদা বল্‌লেন: ওরে—না—রে না। দেবেন না ছাড়িয়ে কতবার ব'লেছি—তবু তুই এম্‌নি পাগলামি করবি?"

শরণ আরও অস্ফুট স্বরে বল্‌ল: "না বড়-মা—আমি জানি দেবেন। আর কেনই বা রাখ্‌বেন আপনারা! যে কাজ করে না, নেশা করে—মুখের উপর জবাব করে—কেবল অশান্তি আনে—"

ব'লে অমরের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল: "কিন্তু দাদাবাবু, আমি চিরদিন এমন ছিলাম না। আমি লেখাপড়াও একটু শিখেছিলাম। যদি আমার স্ত্রী সায়েবের লাথিতে মারা না যেত—উঃ—মা গো—"

জ্ঞানদা কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে শরণ আবার বল্‌ল: "তবে এই ভেবে আমায় মাফ করবেন বড়-মা—মেজমা—যে যন্ত্রণা যখন বড় বেশি হয় তখন মানুষ একটু ভুলতে চায়" ব'লে অমরের মুখের ওপর তার জলভরা চোখ দুটি রেখে বল্‌ল: "ছোটজাতের মনেও দুঃখু আছে ছোট-দাদামণি—চোর বল্‌লে সে-ও কষ্ট পায়—এ-কথা বিশ্বাস করবেন—"

চামেলীর চোখ পড়্‌ল অমরের ওপর। সে শরণের দৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের একটা ঝাউগাছের দিকে তাকিয়ে তার মর্ম্মরধ্বনি যেন কান পেতে শুন্‌ছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত এমনি নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল। তারপর হঠাৎ অমর চোখ ফেরাতেই তার সঙ্গে চামেলীর দৃষ্টি মিলিত হ'ল। চামেলী দেখ্‌ল তার চোখের কোনে দুফোঁটা জল ফুটে উঠেছে। অমর মুখ ফিরিয়ে নিল।

শরণ আবার থেমে থেমে বল্‌তে লাগল: "ছোটজাতও—"

জ্ঞানদা বাধা দিতে যেতেই সে বল্‌ল: "আমায় বল্‌তে দিন বড়-মা—নইলে কথাগুলো আর বলার সময় হবে না। কি বল্‌ছিলাম?—হ্যাঁ—ছোটজাতও স্নেহের কাঙাল হ'তে পারে বড়-মা। সত্যি দাদামণি। এ-কথা অবিশ্বাস করবেন না যে সে-ও মাঝে মাঝে মনে করতে চায় যে সে মানুষ। ভুল সে করে বটে—কিন্তু প্রাণও সে দিতে পারে—"

জ্ঞানদা গাঢ়স্বরে বল্‌লেন: "হয়েছে রে হ'য়েছে। এ সব আমরা বিলক্ষণ জানি—কিন্তু ডাক্তার ব'লেছে তোকে শান্ত হ'য়ে থাকতে, নইলে হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে" ব'লেই থেমে গেলেন।

শরণ বল্‌ল: "মারা যাব?—তা ত যাবই বড়-মা—আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমি বাঁচব না। আর বাঁচ্‌বই বা কিসের জন্যে? যখন সেরে উঠ্‌লে আপনারা তাড়িয়ে দেবেনই—তখন আমি যাব কোথায় বড়-মা—আমার যে কেউ নেই—" ব'লেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা বালিশের নীচে ঢলে পড়্‌ল।

(৩৮)

সেদিন রাত্রে অমর যখন বিছানায় শুতে গেল তখন রাত প্রায় দুটো! সে স্বপ্ন দেখ্‌ল যেন শরণ তাকে বল্‌ছে: "কেন মন খারাপ করছেন দাদামণি? আপনার লোক ত নয়, একটা চাকর মাত্র। ভালই হ'ল—তার জন্যে আর আপনার লোকের সঙ্গে আপনার আর কখনো ঝগড়া হবে না—"

হঠাৎ সে জেগে উঠল। দূরে তখন একটা বাঁশিতে গজলের সুরে তার একটা পরিচিত গজল সুর লুটিয়ে বেড়াচ্ছিল:—

"মিট্ গয়া যব মিট্‌নেওয়ালা ফির পয়গাম আয়া তো কেয়া"—[সব দাবী যখন মিটে গেছে তখন যার সকল দাবী-দাওয়া চুকেছে তার চিঠি এলেই বা কি-?]
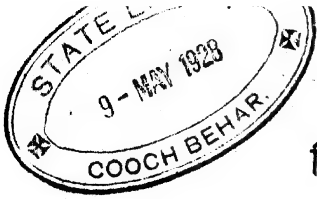
দ্বিচক্রে ক্যালকাটা হুইলার্স

শ্রীমণীন্দ্র মুস্তাফী

১২ই অক্টোবর—

বেলা ৯-৩০ মিনিটে আমরা চাঁইবাসা হতে বিদায় নিয়ে "টাটার কারখানা" দেখবার জন্তে "টাটানগরের" দিকে রওনা হলুম। চাঁইবাসা থেকে টাটানগর ৩৮ মাইল। "মেন্" রাস্তা ছেড়ে রেখে বাঁদিকের রাস্তা ধরলুম। সুন্দর রাস্তা; চারিদিকে ধানের ক্ষেত,—ধানের শিষগুলি বাতাসে হেলে দুলে তালে তালে নাচছে। জংলী রাখালের ছেলেরা গরুবাছুরের পাল নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝখান দিয়ে উঁচুনীচু রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে; মাঝে মাঝে বড় বড় পাহাড়গুলো বোঁ বোঁ পেছুন দিকে ছুটে চলেছে। ছোট ছোট কত গ্রাম যে পার হয়ে চললুম—তার লেখাযোখা নেই। এইরূপে সোঁ সোঁ করে চলেছি—এমন সময় Bugleএ alarm বেজে উঠ্‌ল। সকলেই ধুপধাপ্ করে নেমে পড়্‌লুম। নেমে দেখি, "খড়কাই" অর্থাৎ "খরকায়া" নদী শান্তভাবে বয়ে যাচ্ছে। এই ভীষণ বন্যায় নদীর পুল ভাঙ্গা; আশে পাশে অনেক গ্রাম ভেসে গেছে—জলের অনেক জায়গায় বালির চড়া পড়ে গেছে। নদীর ওপর Causeway তৈরী করা রয়েছে। আমরা কোন রকমে হেঁটে সাইকেল নিয়ে নদী পার হলুম। পথে এক জায়গায় পাখী শিকার হোল—একটা গাছতলায় কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে পাখীর মাংস পুড়িয়ে "রোষ্ট" করে খাওয়া গেল। চা'ও তৈরী করা গেল।

ক্রমে ক্রমে টাটানগরের দিকে এগুতে লাগলুম। কিছুদূর আস্‌তেই সুবিখ্যাত কারখানার ধোঁয়া ও দু'একটী চোঙা দেখা গেল। মনে বড় আনন্দ হোল; বুঝলুম যে এবার আমরা পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বিখ্যাত কারখানার নিকটস্থ হচ্ছি। অবশেষে বেলা ৩-১৫ মিনিটে টাটানগরে (৪৩৮ মাইল) এসে উপস্থিত হলুম। এখানে Burma minesএ আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমাপদ নন্দী মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর কথামত উঠ্‌লুম। এই সুবৃহৎ "কলের সহর" দেখ্‌বার জন্তে এখানে দু'রাত্তির কাটান হোল। এখানে অনেকের কাছে আমরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম; কিন্তু কপাল-গুণে ভাল করে উপভোগ কর্‌তে পারি নি। কারণ হঠাৎ টেলিগ্রামে আমাদের Bugler ও Photographer মণীর ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ পাওয়াতে বেচারাকে এই টাটানগর থেকে আমাদের ছেড়ে কোলকাতায় ফিরে যেতে হোলো। যা' হোক বিশেষ দুঃখিত মনে মণীকে বিদায় দিলুম। মণী গুই কোলকাতায় ফিরে যাওয়াতে আমাকে Buglerএর পদ ও Reporter জহর দত্তকে Photographerএর পদ দেওয়া হোল। আজকে আবার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মুস্তাফী "ইঞ্জিনীয়ার্" মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল; কোন রকমে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আস্‌লুম।

১৩ই অক্টোবর—

আজ খুব সকালেই টাটার কারখানা দেখ্‌তে বের হলুম —কিছু কিছু দেখা হোল। একদিনে সমস্ত কারখানার কিছুই দেখা যায় না। নিখুঁত ভাবে দেখ্‌তে অন্ততঃ দিন পনের থাকতে হয়; তথাপি একদিনেই এই কারখানার কিছু Idea পাওয়া গেল।

এই কারখানার প্রধান উদ্দেশ্য, পাথর Dolomite (manganese) থেকে লোহা বের করে ইস্পাতের (Steel) জিনিস তৈরী করা; যথা—রেলের লাইন, লোহার শিক, বরগা, কড়ি, চাদর ইত্যাদি। প্রথমে লোহার পাথর (Iron Ore) ও কোক্ কয়লা Blast Furnaceএ এনে গলিয়ে লোহা (Cast Iron) বের করে; সেগুলি Duplex Steel plant কিংবা Open Hearthএ এনে বড় বড় উন্থনে (Furnace) গলিয়ে ইস্পাতে পরিণত করা হয়। পরে ইস্পাতগুলিকে ছাঁচে ফেলে বড় বড় থান (Ingot) তৈরী করে পুড়িয়ে লাল করে Blooming millএ এনে চেপে (Rolling) মাপ মত লম্বা করা হয়। এখন তা'দের Rail millএ লাইন তৈরী করবার জন্তে পাঠান হয়; Morgan millএ নানারকম আকার অনুযায়ী কেটে ফেলে Sheet millএ চাদর ও Merchant Millএ

১৪ই অক্টোবর—

বিকেল ঠিক চারটের সময় নন্দীবাবুর নিকট বিদায় নিয়ে টাটানগর ছাড়লুম। আমাদের পৌছে দিতে অনেক লোক "বাইসিকেল" করে প্রায় টাটা থেকে ১২ মাইল পর্য্যন্ত এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে "সুবিখ্যাত জাম্‌শেদপুর সোপ্ ওয়ার্কসের" মালিক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ছিলেন। তিনি দয়া করে আমাদের যথেষ্ট সাবান উপহার দিয়েছিলেন। বাস্তবিক দেশীয় সাবানের মধ্যে "জামশেদপুর সোপ ওয়ার্কসে"র সাবান যে এত ভাল হবে, তা' আমাদের ধারণাই ছিল না। যা'-হোক তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে, এগুতে লাগলুম। একে একে সকলকে বিদায় দিয়ে আবার সেই পুরোন মেঠো রাস্তা ধরে, ছোট খাটো থাড়াই ও উৎরাই পেরিয়ে যখন আবার পুল-ভাঙ্গা খড়কাই নদীতে এসে পৌছলুম, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। সুতরাং গাড়ীর আলো গুলি জ্বেলে ফেললুম। কাপ্তেনের আলোর তেজ বেশী বলে, তাকে আগে আগে যেতে দেওয়া হ'ল। খুব সাবধানে, কাছাকাছি হয়ে, চারিদিকে "টর্চ" ফেল্‌তে ফেল্‌তে চলেছি, হঠাৎ ধপাস্ করে আওয়াজ হোল। চেয়ে দেখি কর্পোর‍্যাল অজিত একটা বড় পাথরে ধাক্কা লেগে সাইকেল থেকে পড়ে সটাং শুয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে আমরা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে নজর করতেই দেখি,—সাদা ফেণার মত তার মুখ দিয়ে কি বেরুচ্ছে; দেখে বড়ই ভয় হোল। গাড়ীগুলো তখুনিই রাস্তার ওপর শুইয়ে রেখে, অজিতের চিকিৎসার জন্যে জলের বোতল ও ওষুধের থলি হাতে কাছে যাবামাত্র—আমরা বড় বোকা বনে' গেলুম। তার মুখে ভালো করে আলো ফেল্‌তেই দেখি যে, ফেণার মত তার মুখ দিয়ে যা' বেরুচ্ছিল, তা' আর কিছুই নয়—অজিতবাবু নিশ্চিন্ত মনে একটুকরো পাঁউরুটী চিবুচ্ছেন ও মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছেন। যা'হোক আমরা তার সাম্‌নে না হেসে একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "কি হে, কোথাও লেগেছে না কি?" সে জবাব দিলে, "আমি পড়ে গেছি বটে, কিন্তু রাস্তায় বালি থাকায় বিশেষ কিছু লাগে নি; তবে বুক পকেটে এই পাঁউরুটীর টুক্‌রোটা থাকায়, হঠাৎ পড়ে যাওয়াতে তা' অদ্ভুতভাবে ছিট্‌কে
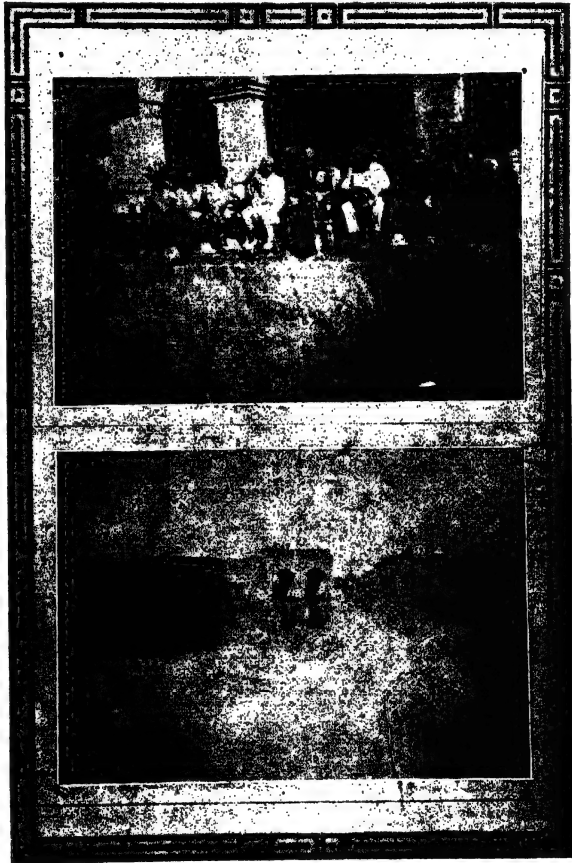
কিয়নঝড় মহা-রাজা, ভ্রাতা কুমার সাহেব ও ষ্টেট সুপারি-টেণ্ডেণ্ট পি, দে মহাশয়ের সহিত "কলিকাতা হুইলার্স"

কিয়নঝড়রাজ্যের ন্যায় ভাঙ্গাপুল

মুখের ভেতর ঢুকে যায়। সুতরাং কি করি—একটু চিবুচ্ছি।"

এই ভাবে প্রায় রাত আট্টায় আমরা আবার চাঁইবাসায় এসে হাজির হলুম। কথা ছিল, আশুবাবুর বাড়ীতে সে

কিয়ন্‌ঝড়—মহারাজা বলভদ্র ভঞ্জদেও

রাঁচীর রাস্তা
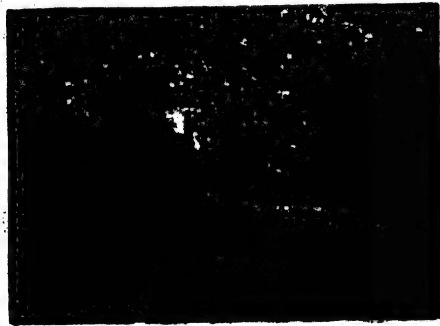
কিয়ন্‌ঝড় রাজ্যে ঘাটগাঁও জঙ্গল

রাত্তির কাটাব। একে নতুন জায়গা, তাতে আবার রাস্তায় আলো নেই বল্‌লেই চলে। দূরে মিট্‌ মিট্‌ করে "মিউনিসি-প্যালিটীর" কেরোসিনের আলো জল্‌ছে। অন্ধকারে রাস্তা দেখা ভার। আশুবাবুর বাড়ী খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে হয়রাণ হয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পথভোলা পথিকের মত ঘোরা-ঘুরির পর, একটী লোক দয়া করে আমাদের তার বাড়ীতে guide করে নিয়ে গেলেন। আজও আশুবাবুর বাড়ীতে রাত কাটান হো'ল।

১৫ই অক্টোবর—সকাল ৮—১৫ মিনিটে চাঁইবাসা ছেড়ে এবার "কিয়ন্‌ঝড়" করদ রাজ্যের অভিমুখে রওনা হলুম। পথ মন্দ নয়। বারো মাইল আস্‌তেই আবার জঙ্গল সুরু হোল—কিন্তু রাস্তা ভালো—সোঁ সোঁ করে ন' মাইল বনভূমি পেরিয়ে গেলুম। মাঝে একটী ছোট জংলীদের গ্রাম—নাম, "হাট গমোরীয়া।" এখানে প্রত্যেক সপ্তাহে হাট বসে, সেজন্যে গ্রামটীর একটু নাম আছে। নিকটেই Gamaria Inspection Bunglow; দোকানে কিছু জলযোগ করে' এখানে আশ্রয় নিলুম। রোদের তেজ একটু কম্‌লে, আবার যাত্রা সুরু। ক্রমে ক্রমে রোদ পড়ে গেল। বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমাদের "দৌড়"ও বেশ একটু জোর রকমের হচ্ছিল। দূরে কত জংলী তাদের প্রিয় সঙ্গী কাঠের লম্বা লম্বা বাঁশী ও মাদল বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে। বাতাসে তাদের সেই প্রাণ মাতানো বাঁশীর সুর ভেসে এসে আমাদেরও এই শ্রান্ত দেহকে মাতিয়ে তুল্‌ছে। এইভাবে ক্রমশঃ বৈতরণী নদীর ধারে "জয়ন্তীগড়" গ্রামে উপস্থিত হলুম। বৈতরণীর ওপার থেকে 'কিয়ন্‌ঝড়' রাজ্য আরম্ভ হোল। এপারে সিংভূম জেলার শেষ সীমা। জয়ন্তী-গড়ে অনেক লোকের বাস। দেশীয় লোক ছাড়া সুদূর মাড়োয়ারবাসীও যথেষ্ট; কারণ, বলা নিষ্প্রয়োজন, যে
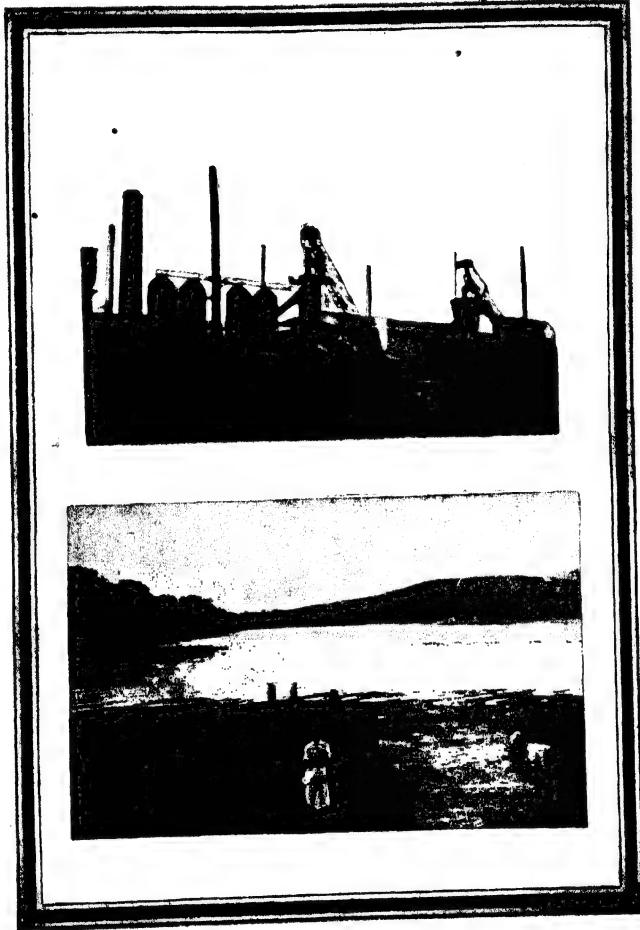
টাটার—ব্লাষ্ট ফার্নেস্‌

টাটা—সুবর্ণরেখা ও খড়কাই-নদীর সঙ্গম স্থান

জয়ন্তীগড় একটী ব্যবসা বাণিজ্যের আখড়া। এখানে বৈতরণীর তীরে মাটির তৈরী গড় আছে; শুনলুম, পুরাকালে পোরাহাটের রাজবংশীয়গণ এই গড় তৈরী করান। এখন এই গড়ের অবস্থা অতি শোচনীয়।

পোরাহাটের রাজার গড় দেখা সাঙ্গ করে কোন রকমে হেঁটে হেঁটে বৈতরণীর তীরে হাজির হলুম। এবারকার প্রচণ্ড বন্যায় জয়ন্তীগড়ের অনেক কিছু নষ্ট করে দিয়েছে; প্রায় 'তিনশ' লোকের ঘর বাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই। শস্যের অবস্থাও তদ্রূপ। বহু লোক অনাহারে অতি কষ্টে কাল কাটাচ্ছে। কত লোক যে ভেসে গেছে তার ঠিকানা নেই; তাদের আত্মীয়-স্বজন আজও এসে বৈতরণীর তীরে আছড়ে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে ভাস্‌ছে। এই নিদারুণ দৃশ্য দেখে আমাদের পথের সম্বল যা ছিল তা' থেকে কিছু সাহায্য করায়, তারা দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌লে। নদীর পুলের কতকাংশ একেবারে ভেঙ্গে যাওয়াতে, অতি কষ্টে নতুন তৈরী রাস্তা (Diversion) দিয়ে "সশরীরে" বৈতরণী পার হয়ে কিয়ন্‌ঝড় রাজ্যের মহকুমা "চাম্পুয়ায়" (৫১ মাইল) এসে শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কোতয়াল মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিলুম। এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। চাম্পুয়ার অবস্থাও খুব ভাল নয়—বন্যায় শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ দে S. D. O. মহাশয়ের বাংলা একে বারে ভেসে গেছে। তিনি নিরুপায় হয়ে "মোটারে" পালিয়ে কিয়ন্‌ঝড় সহরে আসেন। এখানে বড় বড় বাঘ ও হাতী বন্যার ভীষণ স্রোতে ভেসে যেতে দেখা গেছে। সে রাত্তির প্রদ্যুম্নবাবুর বাসায় কাটিয়ে দিলুম।

:৬ই অক্টোবর—

চাম্পুয়া থেকে রওনা হতে একটু দেরী হয়ে গেল। গত রাত্তিরে ঘুমটা একটু বেশী রকমের হয়ে পড়েছিল। সকালবেলা ৮টার সময় সকলে প্রস্তুত হয়ে যাত্রা কর্‌লুম। রাস্তায় ছোটখাটো জঙ্গল পেরুতে হয়েছিল; উঁচু নীচু ত আছেই। যা'হোক, সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুধারে নানা রকম দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি, হঠাৎ "অসময়ের" বাঁশীর আওয়াজ কানে এল। কি হোল আবার! দেখি, কাপ্তেন মহাশয় গাড়ী চালান বন্ধ করে একটী গাছের তলায় নির্ব্বিকারভাবে বসে আছেন; আর, গাড়ীটাকে গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে রেখে মনের দুঃখে গান ধরেছেন,—

"Jingle bells, jingle bells.
Jingle all the way ;
Oh ! what fun it is to write
In a one horse-open
—sleigh "

হঠাৎ বাঁশী দেবার কারণ জিজ্ঞেস করাতে, তিনি বল্লেন, "গাড়ী চলছে না—"ফ্রী হুইল" ভেঙ্গে গেছে।" সে কি!

টাটানগর—বিষ্টুপুর বাজার

প্রথমে তাঁর কথা মোটেই বিশ্বাস হোল না। Mechanic রাধু কাছে গিয়ে দেখে যখন বল্লে, সত্যই "ফ্রী" একেবারে ভেঙ্গে গেছে, তখন Mechanicএর কথা শুনে আমরা যেন অমাবস্যার রাত্তিরে প্রেতমূর্ত্তি দর্শন কর্‌লুম। বাস্তবিক এমন বিপদেও মানুষে পড়ে। কোন উপায় নেই—কাছে কোন সহর নেই যে Free wheel কেনা হবে। তাতে আবার Triumph গাড়ীর Free যেখানে সেখানে মেলা ভার। প্রায় ৬৯ মাইলের মধ্যে কোন Stationএর সম্বন্ধ নেই যে ট্রেনে করে কোন সহরে গিয়ে Free wheelএর চেষ্টা দেখব। Free সাইকেলের প্রধান অঙ্গ। কি করি, উপায় নেই দেখে, বাধ্য হয়ে কাপ্তেন দেবেন মুস্তাফীকে তার নিজের "অচল" সাইকেলে কোনরকমে বসিয়ে দিয়ে পালা করে ঠেলতে ঠেলতে চলা গেল; কিন্তু অধিক পরিশ্রমের

দরুণ ক্ষিদেয় পেট জ্বলতে লাগল। তা'তে আবার সকালে ভাল করে খাওয়া হয় নি। পথে এক জায়গায় দেখি, হাট বসেছে। জায়গাটী ছোট গ্রাম—নাম, "পলাশপোড়া"। কিছু ফলমূল ও খাবার কেনবার জন্যে সেখানে দাঁড়ালুম। হাটে ঢোকবামাত্র হাটের লোকেরা হাট ফেলে দৌড় দেবার মতলব করলে। বোধ হয় আমাদের মত বিদেশী লোক দেখে তাদের ভয় হয়েছিল। আমরা ত অবাক! কোন রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তা'দের কাছ থেকে অনেক কষ্টে কিছু খাবার কিনে খাওয়া হোল। এখানে পয়সা দিয়ে জিনিষ কেনার চেয়ে কোন জিনিষ দিয়ে জিনিষ কেনার রীতিই বেশী। কিছুক্ষণ পরে বিশ্রাম করে আবার কাপ্তেনকে "চলি চলি পা পা" করিয়ে, নিয়ে চল্লুম। পথে বন্যায় ভাঙ্গা অনেক পুল পেরুলুম—সব জায়গায়ই Diversion ছিল।

এইরূপে অনেক কষ্টে ২২ মাইল কাপ্তেনকে ঠেলে এনে কিয়ন্‌ঝড় রাজধানীতে উপস্থিত হলুম। এখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। আজ রাতটা এখানে কাটাব ঠিক করে Bugleএ Retreat বাজাতেই, রাজধানীর বহু লোক আমাদের দেখবার জন্যে এসে পড়ল। পাশের একটী বাংলো থেকে তিনজন ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কে ও কোথা থেকে আসছেন?" আমরা আমাদের পরিচয় দিলুম। "সাইকেল টুরিষ্ট", কোলকাতা থেকে সমানে সাইকেল করে আস্‌ছি জেনে, বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। আর কোন কথাবার্ত্তা না বলে, তাড়াতাড়ি আমাদের গাড়ীগুলোকে তাঁরা নিজেরাই ধরাধরি করে নিজেদের বাড়ীতে রেখে এসে, প্রকাণ্ড একটী Charabancএ Start দিয়ে বল্লেন, "মহাশয়, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন—দয়া করে এই গাড়ীতে উঠে বসুন, আপনাদের সহরটী দেখিয়ে আনি।" আমরা তাঁদের ব্যবহারে খুব চমৎকৃত হয়ে, তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করাতে জানা গেল যে, তাঁরা এই রাজ্যের "সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট" Mr. H. W. Price, I. C. S. এর পুত্র। তাঁদের মধ্যে মেজো ভাই Mr.

টাটানগর-এল্ টাউন্ থেকে সুবৃহৎ কারখানার দৃশ্য

Morris Price আমাদের Charabancএ তুলিয়ে নিজেই drive করে 'কিয়ণঝড়' সহর দেখাতে নিয়ে চল্লেন।

কিয়ন্‌ঝড় একটী সুন্দর পাহাড়ী সহর। রাজ্যের পরিসর প্রায় ৩০৯৬ বর্গ মাইল। উঁচুনীচু সুন্দর চওড়া রাস্তাগুলি সহরে ছড়িয়ে রয়েছে। চারিদিকে পাহাড়গুলি পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে থেকে, সহরটীকে গড়বন্দী করে রেখেছে। বাড়ীগুলি সবই বাংলো। রাজসরকারে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা ছাড়া এ সহরে বেশীর ভাগই জংলী ও উড়িয়া। লোক-সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। কিয়ন্‌ঝড় বহু পুরোন করদ রাজ্য (Feudatory State)। এখানকার বর্ত্তমান রাজা (Chief) বলভদ্র ভঞ্জদেও নাবালক বলে' State Superintendent রাজকার্য্য দেখেন। শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ দে S. D. O. মহাশয় এখন এখানকার Acting Superintendent। শুনলুম, শীঘ্রই রাজা বাহাদুর সাবালকত্ব পাবেন। এঁর পিতা স্বর্গীয় রাজা গোপীনাথ নারায়ণ ভঞ্জদেও অতিশয় কড়া ও নিপুণ রাজা ছিলেন। এই রাজ্যের বাৎসরিক আয় প্রায় দশ লক্ষ টাকা এবং রক্ষিত বনজঙ্গলাদি থেকে তিন লক্ষ টাকা। এখানকার জগন্নাথ-দেবের মন্দির ও দরবার হল দেখ্‌বার জিনিষ। রাজা বলভদ্রের পুরোন প্রাসাদ সহর থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে পাহাড় কেটে তৈরী। সে প্রাসাদ একটী অন্ধকারময় দুর্গ বিশেষ। সেই জন্যে সেই সেকেলে প্রাসাদে বাস করা অসুবিধে বলে রাজাবাহাদুরের নতুন রাজবাটী নির্ম্মিত হচ্ছে।

এখানে বাঙ্গালী আছে জেনে, তাদের সহিত আলাপ কর-বার ইচ্ছে প্রকাশ করাতে Mr. Morris Price রাজ্যের কোতয়াল (Police Officer) শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। কোতয়াল মহাশয় যথেষ্ট খাতির যত্ন কর্‌লেন। সেখানে শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ দে মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয় হোল। তাঁরা আমাদের রাজা বাহাদুরের কাছে নিয়ে গেলেন। রাজা বলভদ্র অতি সুন্দর লোক। তিনি আমাদের ভ্রমণের গল্প শুনে বড়ই খুসী হলেন এবং ভারতের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী জাতিরই এই অদ্ভুত রকমের ভ্রমণ-স্পৃহা আছে বলে খুব প্রশংসা কর্‌লেন। তিনি একজন "পাকা" খেলোয়াড়। কোলকাতার মোহনবাগানের খবর জিজ্ঞেস কর্‌লেন। তাঁর এ ব্যবহারে বুঝ্‌লুম, তিনি অতি মিশুক লোক।

যা'হোক আজ রাত্তির দরবার হলে আমাদের শোবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। আমাদের জন্যে ছয়টী সুন্দর খাটে বিছানা পাতা হয়েছিল, ও একটী বেয়ারা দেওয়া হয়েছিল, যদি কোন কাজকর্ম্মের দরকার হয়! সত্যি—এতদিনের এই দারুণ পরিশ্রমের পর এই রকম নরম গদি-আঁটা বিছানা পেয়ে আজ রাত্তিরটা যে কি আরামে কাটান গেল, তা বলাই বাহুল্য। দরবার হলে গিয়ে দেখি, আমাদের ছয় জনের বাইসিকেল, আমাদের আস্‌বার অনেক আগেই, Mr. Price পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দূরের গান

শ্রীপ্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ

এ কোন্ গান এল—
মোর কাণে—;
এ কোন্ গান শুনি—
মোর ধ্যানে ;
আজ চামেলী বনের সজল হাওয়া
কোন্ গুণীর গানে ছাওয়া
দেয় দোলা প্রাণে—।
সন্ধ্যাতারা যখন জাগে—
সুর মোর হিয়ায় লাগে—
বিনা ভাষার তানে॥

ওগো অজান্ দেশের গুণী—
কী বিরহ ব্যথার বাণী—
গাও—যে তুমি মরমপরশী—।
ঘুমের ঘোরে স্বপন মাঝে—
সেই গানেরি কথা বাজে—
তায় প্রাণ যে মোর উদাসী॥

খেলার পুতুল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৬)

—এখন কেমন আছো ন' ঠাকুরপো ?

—যেমনই থাকি না ! সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

এই কথা ব'লে হরিমোহন চোখ বুজিয়ে রোগ শয্যায় পড়ে রইল। মাথার শিয়রে তার সারদাময়ী ব'সে একটি হাতপাখা নিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস ক'রতে ক'রতে তন্দ্রাবেশে কেবলই ঢুলে ঢুলে পড়ছিলেন। সুহাসের গলা পেয়ে তিনি সচকিত হ'য়ে উঠে ব'ললেন—বড্ড ছট্‌ফট্‌ ক'রছে বৌমা ! কেবলই তোমাকে খুঁজছে ! একটু কাছে এসে বোসো বাছা, ছোঁড়াটাকে একটু ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করো। কেন যে ম'রতে গয়ায় নেমেছিলুম ! কী যে রোগে ধ'রলো বাছাকে কে জানে ? আজ প্রায় সতেরো দিন হ'তে চ'ললো এখনও একটুও তো নরম পড়লো না ? কী হবে বৌমা ?

সারদাময়ীর হাত থেকে পাখাখানি চেয়ে নিয়ে সুহাস হরিমোহনের রোগশয্যায় উঠে বসলো এবং হরিমোহনের কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব'ললে—ভয় নেই বড় মাসীমা একুশ দিনের দিন জ্বরটা নিশ্চয়ই বিচ্ছেদ হবে। আপনি যান এইবার শুয়ে পড়ুন গিয়ে, রাত অনেক হ'য়েছে।

সুহাসের শীতল ও কোমল হাতখানি নিজের জ্বরতপ্ত ললাটের উপর আগ্রহে চেপে ধরে হরিমোহন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললে—আঃ ! কি ঠাণ্ডা, কি নরম হাত তোমার !—এতক্ষণে বুঝি আমাকে দেখতে আসবার ফুরসুৎ হ'লো রাঙাবৌদি ?

জবা ফুলের মতো লাল দুটি চোখে অভিমান ভ'রে নিয়ে রোগার্ত্ত হরিমোহন সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সারদাময়ী বললেন—ওকি কথা বাবা হরিধন, বৌমা'তো দিন রাতই তোমার সেবা করছে ! এই একটু আগে তোমায় ওষুধ খাইয়ে গেছে ! ওকে কি একটিবার খেতেও ছাড়বিনি তুই ?

হরিমোহন ছোট ছেলের মতো আব্দারের সুরে জিজ্ঞাসা করলে—কি খেলে বৌদি ?

সারদাময়ী আক্ষেপের সুরে বললেন—পোড়াকপাল আমার ! ও কি এ বেলা কিছু খায় রে ! জোর কোরে এক পলা দুধ আর একটু মিষ্টির গুঁড়ো মুখে দেওয়াই, নইলে বাঁচবে কেন ? ঐ কচি বাচ্ছা কী খাটুনীটাই না সারাদিন খাটছে ! বিশেষ তোর এই অসুখের কটা দিন তো ও একেবারে দিনকে রাত ক'রেছে —রাতকে দিন করেছে !—

সারদাময়ীর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে সুহাস বললে—বড়-মাসিমা, আপনি যদি রুগীকে এত বকান্ তাহ'লে কিন্তু ন'ঠাকুরপোর সেরে উঠতে তিন মাস লেগে যাবে—

—না—বাছা, না, আর আমি ওকে বকাবো না—এই আমি চল্লুম, ব'লতে ব'লতে অপ্রতিভ হ'য়ে সারদাময়ী উঠে চল্লেন। যেতে যেতে আবার ফিরে এসে ব'ললেন—আজ নোতুন বৌমার শরীরটা ভাল নয়, পোয়াতী মানুষ, রোজ রোজ রাত জাগা তার পক্ষে বড় খারাপ। সেইজন্যে তাকে আজ এ ঘরে আসতে মানা করে দিয়েছি। আমি গিয়ে এখনি মঙ্গলাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে এসে ঘরের মেঝেয় পাটি-খানা বিছিয়ে শুয়ে থাকুক্। শেষ রাত্রে তাকে ডেকে দিয়ে তুমি একটু গড়িয়ে নিও বৌমা ! নইলে এমন করে রাতের পর রাত তুমি একলা পেরে উঠবে কেন ? শেষ কি একটা ব্যায়রামে পড়বে ? তুমি বিছানা নিলেই তো গেছি ! আমার সংসার তাহ'লে আর এক দণ্ডও চলবে না !

সুহাসের ইচ্ছা হল একবার বলে যে—'সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো, আপনার বোন্‌টিকে পাঠিয়ে দেওয়া মানে আমার এখানে তিষ্ঠানো দায় করে তোলা !'—কিন্তু, লজ্জায় সে কিছু ব'লতে পারলে না। ভাবলে সারারাত একলা এই রুগী নিয়ে আমার এ ঘরে থাকায় হয়ত এঁদের আপত্তি আছে !

হরিমোহন ব'ললে—মা তোমার বোনটি বড় অপয়া! ঘরে ঢুকলেই আমার অসুখ বেড়ে যায়! তাঁকে তুমি পাঠিয়োনা। আমি বৌদিকে সারারাত জাগিয়ে রাখবো না, আমার ঘুম এলেই বৌদিকে ঘুমুতে দেবো।

সুহাস একটু সাহস পেয়ে বললে—হ্যাঁ, আমি তো সারারাত কোনও দিনই জেগে থাকিনি বড় মাসীমা। ন'ঠাকুরপো চোখ বুজুলেই আমিও শুয়ে পড়ি। আপনি আর মাসীমাকে কষ্ট দেবেন না। সারাদিন খেটেখুটে তিনি একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়েছেন, তাঁকে আর বিরক্ত করবার দরকার নেই। তা'ছাড়া এই পাশের ঘরেই তো কালো ঠাকুরপো আর বিজলী রয়েছে; দরকার হ'লেই তাদের কাউকে ডাকবো।

সারদাময়ী নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে গেলেন। সুহাস ঘড়ীটা খুলে থার্মোমিটারটা বার করে ঝাঁকুনী দিতে সুরু ক'রলে দেখে, হরিমোহন বিরক্ত হ'য়ে বললে—আঃ! ওই তোমার বড় দোষ রাঙাবৌদি, তুমি একেবারে হাঁসপাতালের নার্সের উপর যাও দেখছি! একেবারে ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড ধ'রে তোমার কাজ। অনবরত আর থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার দেখবার দরকার নেই, আমি আজ বেশ ভাল আছি!

সুহাস স্নিগ্ধ হেসে বললে—এই সময়েই তো রুগীর একটু বেশী তদ্বির করা দরকার ভাই! এই সারবার মুখে আলগা দিলেই ব্যায়রাম প্রায় relapse করে,—ব'লতে ব'লতে সুহাস হরিমোহনের জামার বোতাম খুলে ডান হাতটি তুলে ধরে'—তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে নিয়ে থার্মোমিটারটি বসিয়ে হাতখানি নামিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তার উপর নিজের হাত দিয়ে চেপে ধরে বললে—বেশ তো দেখা যাকনা, জ্বর যদি না থাকে তা হ'লে তোমায় আর ঐ তেতো মিক্শ্চারটা খেতে হবে না, শুধু কষা পাউডারটা এক পুরিয়া দেবো!

—ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে আমার পেটটা তুমি একেবারে B. C. P. W. ক'রে তুলেছো! আচ্ছা, আমাকে বাঁচাবার জন্যে এত ঘটা ক'রে চিকিৎসা করাবার কি দরকার ছিল শুনি! না হয় মরেই যেতুম, তাতে কার কি ক্ষতি ছিল বলো?—

চুপ করো! ছিঃ, ওসব কথা বলতে নেই! বলতে বলতে ঘড়ীর কাঁটাটি মিনিটের ঘর পার হ'য়ে যেতেই সুহাস থার্মোমিটারটি টেনে নিয়ে—আলোর কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখে যেন আপন মনেই বলে উঠলো—'Ninety nine'এর জ্বর যে এখনো মিটছে না! তার পর হরিমোহনের জামার বোতামগুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে বললে—তোমাকে দেখছি এখনও দিনকতক মিক্শ্চার খেতে হবে!

থার্মোমিটার ও ঘড়ীটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে ওষুধ খাবার 'মেজার গ্লাসটি' ধুয়ে নিয়ে তাতে এক দাগ ওষুধ ঢেলে, দুটি আঙুর ও চারটি বেদানার দানা একখানি ছোট্ ডিশে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে বললে—নাও, হাঁ করো দেখি, লক্ষ্মী ছেলের মতো, ঢক্ করে ওষুধটা খেয়ে ফেলো! দুষ্টুমী কোরোনা।

চোখ-কাণ বুজিয়ে ওষুধটা খেয়ে নিয়ে হরিমোহন তার রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখে একটু ম্লান হেসে বললে—তুমি বুঝি এই অশান্ত বালককে শিষ্ট করবার জন্যেই এ বাড়ীতে পদার্পণ করেছো?

ওষুধের গ্লাশটি ধুয়ে মিক্শ্চারের শিশির পাশে উপুড় ক'রে রেখে সুহাস তক্তার নীচে থেকে ছিলিম্‌চিটা টেনে বার ক'রে হরিমোহনের মুখের কাছে ধর'লে, আঙুর ও বেদানার ছিবড়ে ফেল্‌বার জন্য।

হরিমোহন বলতে লাগল—এমন সেবা ক'রতে শিখলে কি ক'রে বৌদি?

ছিলিমচিটাকে একেবারে ঘরের বাইরে বার ক'রে দিয়ে এসে হাতটা ধুতে ধুতে সুহাস বল'লে—যদি বিয়ে ক'রতে ন' ঠাকুরপো তাহ'লে দেখ্‌তে ন' বৌ এসে এর চারগুণ সেবা করতো, বৌদির সেবার চেয়ে সে ঢের মিষ্টি লাগতো!

তাই নাকি? "অধিক মিষ্ট খাইলে পেটের পীড়া হয়!" আমরা পাঠশালের বইয়ে পড়েছি!—এই বলে হরিমোহন দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে পাশ ফিরে শুলো!

সুহাস রোগীর শুশ্রূষার একখানি খাতা করেছিল, তাইতে—সময়, টেম্পারেচার, ওষুধ খাওয়ানো—এবং রোগীর এসময় কি রকম মেজাজ, ইত্যাদি লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে সে আবার হরিমোহনের রোগশয্যার উপরে উঠে এলো, এবং এপাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে হরিমোহনের মুখটি একবার দেখে নিলে যে সে ঘুমিয়েছে কিনা!

বড় বড় দুই চোখ মেলে সে তখন দেয়ালের দিকে নির্নিমেষে চেয়েছিল! চোখের কোল তার জলে ভরা!—

—ন'ঠাকুরপো, লক্ষ্মীছেলে এইবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা ক'রো ভাই! রাত কত হয়েছে' জানো?

—কত?

— এগারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট!

—মোটে! তাহ'লে সারা রাতটাই এখনও পড়ে রয়েছে বলো?

—তার মানে?

—আহা, চম্‌কে উঠছো কেন? তার মানে সারারাত তোমায় কষ্ট দেবোনা, তুমি ঘুমিও। আমি কি ক'রে কাটাবো তাই ভাবছি!

—ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও, শোনো বলি, ঠিক এগারোটার সময় তোমায় হর্লিক্‌স্ ক'রে দেবো, খেয়ে নিয়ে ঘুমোতে হবে। সারারাত যদি বকো, তাহ'লে আমি কিন্তু উঠে গিয়ে মাসীমাকে পাঠিয়ে দেবো।

—তোমার সঙ্গে কথা কইলে আমি বেশ ভালো থাকি। ঘুমোতে মোটে ইচ্ছে করে না!

—ওসব বেয়াড়া ইচ্ছে হ'লে তো চলবেনা ভাই, না ঘুমোলে কি কখনও রোগ সারে? আমি তোমার সঙ্গে এই কুড়ি মিনিট গল্প ক'রবো, তারপর তোমার একটি কথারও কিন্তু জবাব দেবোনা। সেরেসুরে ওঠো, তারপর তোমার একটি বিয়ে দেবো, তখন বৌ'য়ের সঙ্গে সারারাত গল্প কোরো।

ক্ষণকাল হরিমোহন যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়লো। সুহাস নিঃশব্দে তার মাথার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। হঠাৎ হরিমোহন ডাকলে—

—রাঙা বৌদি?

—কি?

—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো,—সত্যি ব'লবে?

—কেন বল'বোনা?

—বীরুদা'কে তোমার কি বেশ মনে আছে?

স্বর্গগত স্বামীর নাম শুনে সুহাসের বুকটা হঠাৎ যেন একবার কেঁপে উঠলো! একটু ইতস্ততঃ ক'রে সে বললে—'মনে আছে' একথা বলতে পারি ঠাকুরপো, কিন্তু, সেটা 'বেশ' কিনা জানিনা। মাত্র দিনকতকের জন্য তোমার দাদার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছিল বইত' নয়,—সে আজ হ'য়েও গেল প্রায় দশ বছর! সেই যে বিয়ের দিন আষ্টেক পরেই তিনি কানপুর চলে গেলেন তাঁর কাজে,—যাবার সময় মাকে আর আমাকে বলে গেলেন, এবার সেখানে গিয়ে একটা ব্যবস্থা ক'রে ৺পূজার ছুটির মধ্যেই এসে আমাদের নিয়ে যাবেন। কিন্তু সে কথা রাখবার জন্যে তাঁকে তো আর ফিরে আসতে হ'লোনা! পুজোর আগেই অকস্মাৎ সে বজ্রাঘাতের—

ব'লতে ব'লতে সুহাস হঠাৎ থেমে গেল। অনেকক্ষণ সে আর একটি কথাও কইলেনা। চুপটি করে পাথরের মত নিশ্চল হ'য়ে বসে রইল।

গভীর সহানুভূতির সঙ্গে হরিমোহন সুহাসের ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ধীরে ধীরে তার উপর নিজের শীর্ণ কর বুলিয়ে দিতে লাগল।

বহুক্ষণ এমনি নিঃশব্দে কেটে যাবার পর সুহাস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বপ্নোত্থিতের মতো বললে—কিসে যে কি হ'লো আজও আমি তা স্পষ্ট কিছু জানিনি। শুধু চারিদিক থেকে শুনতে লাগলুম যে আমার মত এক অলক্ষণা অপয়া মেয়েকে বিবাহ করার ফলেই তাঁর নাকি এই অকালে বিদেশে বিভুঁয়ে অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে! কেউ কেউ আমাকে রাক্ষুসী ডাইনী প্রভৃতি আখ্যাও দিলেন, এবং শাশুড়ীর কাছে এসে বিশেষ করে অনুরোধ ক'রে গেলেন যে যদি তিনি নিজের কল্যাণ চান, তাহ'লে আমাকে যেন আর এক দণ্ডও বাড়ীতে না রাখেন!

অপরাধীর মতো নতমুখে একদিন শাশুড়ীকে গিয়ে বললুম—মা, আমার পাপেই আপনার এই সর্ব্বনাশ হ'লো! আমাকে আপনি ত্যাগ করুন!

শাশুড়ী আমাকে দু'হাতে তাঁর বুকের ভিতর জড়িয়ে ধ'রে সস্নেহে আদর ক'রে বললেন—আমারই কপাল-দোষে তাকে আমি হারিয়েছি, তোমার এতে অপরাধ কি মা?—কিন্তু সে যে তোমাকে দিয়ে গেছে আমার কাছে, বিশ্বাস করে।—আমি তো প্রাণ থাকতে তার এ গচ্ছিত রেখে যাওয়া জিনিসের অনাদর ক'রতে পারবোনা! লোকে যে-যা ব'লে বলুক,—ওতে কাণ দিওনা বউমা! তোমার যে কত বড় সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, সে তুমিও আজ বুঝতে পারবেনা মা! আমার এ পুত্রশোক তোমার দুর্ভাগ্যের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর!

এইটুকু শুধু ব'লেই তাঁর দুই চোখের দরবিগলিত

অজস্র ধারায় তিনি আমাকে অভিষিক্ত ক'রে দিলেন।

মা'র একটি কথা যেন আজও আমার কাণে বাজছে! —'তোকে নিয়ে যে আমি তার অভাব ভুলে থাকতে চাই সুহাস!'—এই জন্যেই তারপর এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমি তাঁকে কখন একলা ফেলে রেখে কোথাও এক পা' ন'ড়তে পারিনি!

মৃত্যুর আগে তাঁর একমাত্র দুর্ভাবনা হ'য়ে উঠেছিলুম আমি! আমার কী হবে—কে আমাকে দেখবে—কার কাছে তিনি আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে চোখ বুজতে পারবেন—এই হ'য়ে উঠেছিল তাঁর দিনরাত্রির দুঃস্বপ্ন! বড়মাসীমা যেদিন তাঁকে দেখতে গেলেন তিনি যেন অকূলে কূল পেলেন! আমাকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে মার মুখে সেদিন শেষ বিদায়ের যে ম্লান করুণ হাসিটি ফুটে উঠেছিল সে আমি জীবনে কখনও ভুলবোনা!

পাশের ঘরের ঘড়ীতে ঢং ঢং ক'রে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। সুহাস ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বললে-তোমার হর্লিক্‌স্ খাবার সময় হ'ল ঠাকুরপো!

স্পিরিটের ষ্টোভটা জেলে তার উপর একটা হাতলওলা এ্যালুমিনিয়মের বাটী চড়িয়ে তাতে জল ঢালতে ঢালতে সুহাস জিজ্ঞাসা করলে—কতকটা তৈরি করবো ন-ঠাকুর পো? বেশ ক্ষিধে আছে তো? একটু বেশী করেই তৈরি করি—কি বলো?

হরিমোহন ব'ললে—মোটেই আমার ক্ষিধে নেই, রাঙা বৌদি! তুমি আর ও কষ্ট ক'রে না করলেও পারো। আমার আজ আর যেন কিছু খেতে ইচ্ছে করছেনা।

—না ভাই, সে কি হয়! কিছু না খেলে যে আরও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে! আচ্ছা, অল্প করেই করে দিচ্ছি! পেট ফেঁপে নেই তো?—ব'লেই সুহাস উঠে এসে একবার হরিমোহনের পেটটি পরীক্ষা করে দেখে বললে—নাঃ পেট তো ফেঁপে নেই! তবে খাবেনা কেন?—

হর্লিক্‌স্ খেতে খেতে হরিমোহন বললে—তোমার প্রাণপাত সেবার গুণেই এযাত্রা আমি রক্ষে পেলুম রাঙা বৌদি—যতদিন বাঁচবো—তুমি যাতে কখনও এতটুকু কষ্ট না পাও এই হবে আমার জীবনের লক্ষ্য!

ঈষৎ হেসে সুহাস বললে—ফস্ ক'রে যাকে তাকে ও রকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলোনা ন-ঠাকুরপো! আজ তোমার জীবনের কোনও বন্ধন নেই, পিছনে চাইবার কেউ নেই, তাই ভাব্‌ছ এমনিই বুঝি যাবে! তা হয়না ভাই! যখন বিয়ে থা' করে সংসারী হবে, লক্ষ্মীর প্রতিমা বউ আসবে, সোনার চাঁদ সব ছেলে মেয়ে পাবে, তখন কি আর এ আপদ বালাইয়ের কথা মনে থাক্‌বে?

—যাও, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইবো না।

—কেন, সত্যি কথা' শুনে রাগ হ'লো বুঝি?

—সত্যি কথা? ওই তোমার সত্যি কথা? বেশ জানো তুমি যে, ওর চেয়ে বড় মিথ্যে আর কিছু হ'তে পারেনা, তবু আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে তুমি অমনি ক'রে সব বলো!

—তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ ন-ঠাকুরপো! সংসারে মানুষের সম্বন্ধে তোমার এখনও কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি! তুমি জানোনা মানুষের মন নিয়ত পরিবর্ত্তন চায়! সে শাশ্বত-ভিখারী! আজ সে যা চায়—কাল যদি তা পায়—তাহ'লে সেইদিনই সে আবার নূতনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে ওঠে! চাওয়ার তার আর শেষ নেই! এই যে নিঃসঙ্গ জীবন তুমি আজ যাপন ক'রছো একে কি চিরদিন ব'য়ে বেড়াতে পারবে মনে করেছো? এমন একদিন আসবে যেদিন একটি প্রিয়তম সঙ্গীর জন্যে—একটি মনের মানুষের জন্যে সমস্ত মন তোমার হাহাকার ক'রে মরবে!

—আর আমি যদি বলি.—আমি আমার মানসীর দেখা পেয়েছি—তারই ধ্যানে জীবনটা কাটিয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছি!

—ধ্যান ক'রে যে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় এটা—স্বীকার করি, ঠাকুরপো, কিন্তু সে কি রকম জানো?—জীবন্মৃত হ'য়ে!—দুর্ভিক্ষের দিনে যেমন করে মানুষ অনাহারে দিন কাটায়! কিন্তু সত্যি বেঁচে থাকবার সাধ হ'লে কিছুতে আর সেটি পারা যায় না! ধ্যান করে জীবন কাটানো শুনতে বেশ, কিন্তু কাজে অত সহজ নয়, প্রচুর মূলধন থাকা চাই বুঝলে?

—কেন, তোমরা কি ক'রে পারো?—সারা জীবনটাত' স্বর্গগত স্বামীর স্মৃতি ধ্যান করেই কাটিয়ে দাও!

—পাগল হয়েছো ন'ঠাকুরপো? সে কারা পারে? অল্প জনকতক ভাগ্যবতী; সার্থক-প্রেমের অক্ষয়-স্মৃতি যাদের

অন্তরে অনির্ব্বাণ অরণির মত চিরপ্রদীপ্ত থাকে—তাদের মনের কোণে হয়ত' নিরাশার প্রগাঢ় অন্ধকার কোনওদিন জমে ওঠ্‌বার সুযোগ পায় না! কিন্তু, যাদের মনের মন্দিরে আজও প্রেমের আরতি-প্রদীপ জ্বলেনি, দিনের পর দিন যাদের মর্ম্মগুহায় কেবল হতাশের নিবিড় অন্ধকারই পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছে—তারা যে একান্ত নিঃসম্বল! সে পাষাণ-সদৃশ-ঘন-তমসার দুর্জ্জয় ভারে তারা নিষ্পেষিত হ'য়ে নিঃশব্দে মরে যায়, তোমরা পুরুষের দল তাদের অসংখ্য নিষেধের নাগপাশে এমন করে বেঁধে রেখে দিয়েছো যে তারা তাদের জন্ম ও জীবনটাকে সার্থক ক'রে তোলবার আর দ্বিতীয়বার কোনও সুযোগ পায় না!—

—তারা বিদ্রোহ করলেইত' পারে!

—সাহস কোথায়? তোমরা যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছো! যদি কেউ কখনও বিদ্রোহ করবার দুঃসাহস করে, অমনি তাকে তোমরা ব্যভিচারিণী বলে তার ললাটে কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দূর করে দাও—বিশ্বের ঘৃণিতা করে! অথচ এই ব্যভিচারের পথে তোমরাই যে তাদের ঠেলে নিয়ে যাও—বিচার করতে বসে এ কথাটা কিন্তু তোমাদের কারুর মনে থাকেনা—এই আশ্চর্য্য! যে সমাজে—বিগতযৌবন ভ্রাতা—এমন কি বৃদ্ধ পিতা পর্য্যন্ত বিপত্নীক হবার তিন মাস পরে আবার একটি বিবাহ ক'রে আসতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না—সেইখানে তোমাদের প্রতিদিনের ভোগ বিলাসের ডালাগুলি সাজিয়ে দেবার ভার তাদেরই উপর চাপিয়ে দিয়ে তোমরা চাও বিধবা তরুণীদের ব্রহ্মচারিণী করে রাখতে! সংসারের যে দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে—যে পারিবারিক যৌন আবেষ্টনের মধ্যে—এই বাল-ব্রহ্মচারিণীদের কঠোর বৈধব্য ব্রতপালন করতে হয়—সে কতবড় একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড বলো তো? কী মূল্য দিয়ে যে আজও এ দেশের মেয়েদের দেবীর আসন দখল ক'রে ব'সে থাকতে হয় তা যদি বুঝতে পারতে—বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় ও সহানুভূতিতে তোমাদের মাথা নত হ'য়ে পড়তো! আর নিজেদের অমানুষিক অন্যায়ের গ্লানিতে নিজেরাই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হ'তে!

হরিমোহন হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠলো—যদি কখন বিবাহ করি তো আমি বিধবা বিবাহ ক'রবো!

কথাটা শুনে সুহাস মুখ টিপে একটু হেসে বললে—সাধু! সাধু! এ অতি উত্তম প্রস্তাব! আশীর্ব্বাদ করি তোমার এ সুমতি অচলা হোক্!

হরিমোহন মহাউৎসাহিত হ'য়ে বললে—তাহ'লে তোমারও মত আছে?

—নিশ্চয়! সুহাস সজোরে ঘাড় নেড়ে বললে—আমার কোনও আপত্তি নেই! আমি যদি পুরুষ হ'য়ে জন্মাতে পারতুম তাহ'লে এদেশে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের আমিই হতুম দেখতে একজন প্রধান পাণ্ডা! তবে, কাজটা আমি শুধু মেয়েমানুষ হয়ে এসেছি বলেই যে পারিনি তা মনে কোরোনা—যদি তোমাদের দাদাটি না ফাঁকি দিয়ে পালাতেন, তাহ'লে আমিই হতুম দেখতে আজ এদের সভানেত্রী! নিজে বিধবা হয়েই ত সব মাটি হ'য়েছে! এখন বিধবাদের সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে গেলেই সাধারণে মনে করবেন নিশ্চয় আমার নিজের কোনও দুরভিসন্ধি আছে! তোমরা এমন উল্টো বোঝো যে ভাব্‌বে—আমিই হয়ত আবার বিবাহ ক'রতে ইচ্ছুক!

হরিমোহন বললে—তাতে দোষ কি? তোমার মতো বয়সের ইংরেজ মেয়েরা ত' সব কুমারী থাকে!

সুহাস গম্ভীর ভাবে বললে—হুঁ! সহসা তোমার বিধবা-বিবাহ করবার প্রস্তাব শুনেই আমার ভয় হ'য়েছিল যে এইবার তুমি বোধ হয় এই বৌদিদিটিকেই পছন্দ ক'রে ফেলে তার গলাতেই মালা দিতে চাইবে!

হরিমোহন লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠে বললে—কেন, সেটা তো আর অসম্ভব কিছু ব্যাপার হ'তো না! তাতে আর এত ভয়টাইবা কিসের? বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করবার প্রথা তো বাংলাদেশের পাশের মুল্লুকেই রয়েছে!

—তা'হলে আমাদেরও কিন্তু ওই পাশের মুল্লুকে গিয়েই বসবাস করতে হবে ঠাকুরপো! এদেশে আর আমাদের ঠাঁই হবে না! আমি এক-গা হলুদ মেখে একখানা কট্‌কী সাড়ী পরবো'খন, আর তুমি হাঁটুর ওপর কাপড় গুটিয়ে পুঁটলী ক'রে—ট্যাঁকে একটা বেটুয়া গুঁজবে—কেমন?

—যাও, তোমার সবেতেই ঠাট্টা!

সুহাস একটু বিস্ময়ের ভান ক'রে ব'ললে—ও! এটা ঠাট্টা নয় বুঝি? তুমি কি seriously ব'লছো?

—জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা নিয়ে এরকম হাল্‌কা হাসি ঠাট্টা করা চলে না—বুঝেছো?

—না, তা চলে না নিশ্চয়ই ! আচ্ছা, রোসো রোসো—তবে ভেবে দেখি—ভাল কথা—তুমি যে ব'লছিলে তুমি তোমার 'মনের মানুষে'র সন্ধান পেয়েছ—সে তবে কে ?

একটু ইতস্ততঃ ক'রে হরিমোহন বল্লে—সে তো তুমিই !

দুই চোখ বিস্ময়ের ভানে বিস্ফারিত ক'রে এবং গালে একটি হাত রেখে সুহাস বল্লে—ও—ও ! তাই না কি ? ছিছি ! আমি কি বোকা মেয়ে ! এতক্ষণ সেটা একটুও বুঝতে পারি নি ! তাহ'লে তুমি আমারই ধ্যান ক'রে সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাইছিলে বলো ?

হরিমোহন এবার অত্যন্ত সলজ্জ ভাবে ব'ললে—হুঁ !

সুহাস উঠে একটুক্‌রো ফর্সা ন্যাকড়া ওডিকোলনে ভিজিয়ে হরিমোহনের কপালে জলপটির মতো লাগিয়ে দিয়ে ব'ললে—তাহ'লে আজকের রাতটুকুও তুমি একটু ধ্যান ক'রতে ক'রতেই ঘুমিয়ে পড়ো দেখি ন'ঠাকুরপো ! তোমার মাথাটা একটু বেশী দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে দেখছি ! আমি চল্লুম ভাই শুতে। ভয় নেই, গিয়েই—মাসীমাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি এখুনি—

বলতে বলতে সুহাস ঘরের আলোটা একটু কমিয়ে দিয়ে দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলো।

হরিমোহন দারুণ লজ্জায়, রাগে অভিমানে এবং কতকটা নিস্ফল আক্রোশে কপালের জলপটিটা খুলে ছুঁড়ে ঘরের মেঝেয় ফেলে দিয়ে মাথার বালিশে মুখটি গুঁজে শুলো !

(ক্রমশঃ)

প্রচ্ছদপট-পরিচয়

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এবারে যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার প্রতিকৃতি "ভারতবর্ষে"র প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত করিয়া "ভারতবর্ষ" ধন্য হইল, তাঁহার নাম বঙ্গবিশ্রুত। বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতা 'ভারত সঙ্গীত' ও 'বৃত্রসংহারে'র জাতীয় মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের সহিত পরিচিত। শতাব্দীর একচতুর্থাংশ অনন্ত কাল সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে চলিল, ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গবাণীর এই বরপুত্র আমাদের জাতির মধ্যে এক মহাবাণী প্রচার করিয়া সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অবদান চিরকাল

"যতনে রাখিবে বন্ধ মনের মন্দিরে।"

সন ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ (ইং ১৭ই এপ্রিল ১৮৩৮) হেমচন্দ্র হুগলী জেলার অন্তর্গত গুনিটা রাজবল্লভ-হাটে মাতামহাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৈলাসচন্দ্র উচ্চ বংশসমুদ্ভূত হইলেও দরিদ্র ছিলেন। উত্তর-পাড়ার একটি সামান্য বাটীর অংশ ব্যতীত তাঁহার আর কোনও সম্পত্তি ছিল না। হেমচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্দ্রও ধনী ছিলেন না। কিন্তু হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী ব্যতীত তাঁহার আর কোনও সন্তান না থাকায়, তিনি জামাতাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র তাঁহার জনক-জননীর জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তাঁহার তিন সহোদর পূর্ণচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্রের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা বারাণসীতে প্রভূত যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং ঈশানচন্দ্র সুকবি রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে হেমচন্দ্র গুনিটা গ্রামে সামান্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজচন্দ্র তাঁহাকে খিদিরপুরস্থ ভবনে লইয়া আসেন এবং স্থানীয় পাঠশালায় প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এখানে সামান্য বাঙ্গালা শুভঙ্করী শিক্ষা করিয়া হেমচন্দ্র যখন কৈশোরে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার মাতামহ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হওয়ায়, হেমচন্দ্র-জননী আনন্দময়ী প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর শরণাপন্ন হন এবং হেমচন্দ্রের জন্য একটি সামান্য ১৫।২০ টাকার চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। প্রসন্নকুমার এই

অনুরোধ পালন না করিয়া স্বয়ং হেমচন্দ্রকে উচ্চশিক্ষিত করিবার ভার লইলেন। তিনি তাঁহার অবসরকালে হেমচন্দ্রকে স্বয়ং শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন এবং হেমচন্দ্রের অপূর্ব্ব অধ্যবসায় ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হিন্দু কলেজে সিনিয়র স্কুল বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। এখানে তিনি সহপাঠী ও শিক্ষকগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সাটক্লিফ সাহেব হেমচন্দ্রের দারিদ্র্যের কথা অবগত হইয়া স্বয়ং তাঁহার বেতন দিতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পান এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২৫৲ বৃত্তি পান।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসর প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হইলে হেমচন্দ্র উক্ত পরীক্ষা প্রদান করেন এবং সসম্মানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ছাত্রাবস্থায় হিন্দুকলেজে কেশবচন্দ্র একটি তর্ক সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সভায় হেমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি এরূপ মনোহর হইয়াছিল যে রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র সৈন্যসংক্রান্ত হিসাব বিভাগে (Military Auditor General's Office) ৩৫৲ বেতনে একটি কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন। এই স্থানে স্বনামধন্য হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহকারীরূপে তিনি কিয়ৎকাল কার্য্য করেন।

সাংসারিক দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য অল্প বয়সেই হেমচন্দ্র চাকরী গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিদ্যানুরাগ কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি কেরাণীর কার্য্য করিতে করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ পরীক্ষা গৃহীত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু এই দুইজন মাত্র ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কেহই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় দশ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হন; তন্মধ্যে তিন জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

পঠদ্দশাতেই হেমচন্দ্র ভবানীপুরনিবাসী কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতমা দুহিতা কামিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কামিনীদেবী অতিশয় সুন্দরী, সরলা, ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন।

বি-এ উপাধি লাভের পর হেমচন্দ্র কেরাণীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ৬০৲ বেতনে কলিকাতা ট্রেণিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের এবং রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রগণের গৃহ-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। রমাপ্রসাদ রায় তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ব্যবহারাজীব। তিনি হেমচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং বোধ হয় তাঁহারই উপদেশে হেমচন্দ্র ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসুক হন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন, কিন্তু অবসরের অল্পতা বশতঃ পাঠে তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি বি-এল্ উপাধি লাভের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন এবং এল্-এল্ উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুসারে তিনি বি-এল্ উপাধি লাভ করেন।

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেমচন্দ্র অল্প কালের জন্য মুন্সেফী করিয়াছিলেন; কিন্তু এ কার্য্য তাঁহার মনঃপুত হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ্চ তিনি হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং ওকালতী আরম্ভ করেন। হেমচন্দ্র ধনী ছিলেন না এবং মুন্সেফী পরিত্যাগ করায় তাঁহার আর্থিক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই সময়ে তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি কাজ প্রাপ্ত হন। আইন গ্রন্থের এক ইংরাজ প্রকাশক Norton's Law of Evidence বঙ্গ ভাষায় অনূদিত করিবার জন্য উদ্যোগী হন এবং হেমচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র বোধে যথোচিত পারিশ্রমিক দিয়া এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং চাকরী পরিত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্রকে একেবারে আয়শূন্য হইতে হয় নাই।

হেমচন্দ্র বাল্যকাল হইতে বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে কবিতাদি রচনা করিতেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র কোনও কারণে আত্মহত্যা করিলে হেমচন্দ্রের কাব্যের উৎস উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হয়। তরুণ

বয়সের রচনা হইলেও ইহার স্থানে স্থানে বহু সদ্ভাবপূর্ণ উক্তি আছে এবং তৎকালে উহা সুধিগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিল। উহা কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

এই সময়ে হেমচন্দ্র কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত পরিচিত হন; এবং যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়া মাইকেল যথোচিত সমাদর লাভ করেন নাই, তখন হেমচন্দ্রই মেঘনাদবধ কাব্যের সুলিখিত ভূমিকায় কবির প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বীরবাহু কাব্য' প্রকাশিত হয়। উহাতে স্থানে স্থানে কবির গভীর স্বদেশ-প্রেমের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি আছে, যথা,—

"মাগো ওমা জন্মভূমি! আরো কতকাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবন দল, বল আর কতকাল, নির্দ্দয়
নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে॥
কতই ঘুমাবে মাগো, জাগো গো মা জাগো জাগো,
কেঁদে সারা হয় দেখ কন্যা পুত্র সকলে।
ধূলায় ধূসর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়, একবার
কোলে কর, ডাকে গো মা মা বলে॥
কাহার জননী হয়ে, কারে আছ কোলে লয়ে,
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ।
কারে দুগ্ধ কর দান, ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়ে গৃহমাঝে কালসর্প পুষিছ।"

এই সময়ে হেমচন্দ্র দ্রুতগতি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাসিক আয় প্রায় দুই সহস্র টাকা হইয়াছিল। লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই সস্নেহ দৃষ্টি তিনি লাভ করিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র সেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট অবলম্বনে 'নলিনীবসন্ত' নাটক প্রকাশিত করেন।

ইহার কিছুকাল পরে হেমচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ ঘটে। তিনি পিতৃশোকে কাতর হইয়া নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করেন এবং গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। কেশবচন্দ্র তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। হেমচন্দ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ তাঁহার নিকট কুসংস্কার বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। তিনি হেমচন্দ্রকে 'কুসংস্কারপূর্ণ' হিন্দু আচারাদি পালন করতঃ বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে দেখিয়া প্রকাশ্যভাবে অসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন। প্রত্যুত্তরে হেমচন্দ্র Brahmo Theism in India নামক একটি ইংরাজী প্রস্তাব প্রকাশিত করেন। উহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতবাদ ও উপদেশাবলী পরীক্ষা করিয়া, কি জন্য শিক্ষিত ভারতবাসী ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবে না, তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেন। প্রস্তাবটী যেরূপ সুযুক্তিপূর্ণ সেইরূপ সংযত ভাষায় লিখিত। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় খণ্ড কবিতার আদর্শে হেমচন্দ্র কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত 'অবোধবন্ধু' ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' অনেকগুলি প্রথমশ্রেণীর কবিতা প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাকার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে "ভারত-বিলাপ" ও "ভারত সঙ্গীত" বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই কবিতাগুলি সংগৃহীত করিয়া হেমচন্দ্রের বন্ধু ও ভূদেববাবুর জামাতা (বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ভ্রাতা) রমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিতাবলী প্রথম ভাগ' প্রকাশিত করেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রের প্রবর্ত্তন করিলে হেমচন্দ্র তাঁহার সহযোগিতা করেন; এবং বহু মনোহর প্রবন্ধ ও ও কবিতা দ্বারা উক্ত পত্রকে অলঙ্কৃত করেন। মধুসূদনের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে হেমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যে অপার্থিব কবিতা প্রকাশ করেন, তাহার নিম্নে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন

"কিন্তু 'বঙ্গকবি-সিংহাসন' শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ-সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র! মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বাণ অক্ষয় হউক। বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবি-শূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।"

এই সময়ে কি সাহিত্য-জগতে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি স্বজাতি সমাজে হেমচন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি। "বারের উজ্জ্বল রবি, বঙ্গদর্শনের কবি" হেমচন্দ্র তখন সহস্র সহস্র হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা। কমলা ও বীণাপাণি উভয়েই তাঁহাকে স্নেহধারায় সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রকে কয়েকবার হাইকোর্টের বিচারপতি করিবার কথা উঠিল। তখন হেমচন্দ্র "হপ্তায় হাজার দিত ব্যাঙ্কের খাতায়।"

কিন্তু হেমচন্দ্র বাণীর প্রসাদ লাভের জন্য কমলা-প্রদত্ত 'মণিময় ধুলারাশি' উপেক্ষা করিলেন। মক্কেল ফিরাইয়া দিয়া রুদ্ধ কক্ষে বসিয়া তিনি বঙ্গভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বৃত্রসংহার রচনায় নিযুক্ত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে যে মহাকবি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বৃত্রসংহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া হেমচন্দ্র সেই সিংহাসনের গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে যুবরাজের (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) আগমন উপলক্ষে হেমচন্দ্র দেশবিশ্রুত 'ভারত-ভিক্ষা' রচনা করেন। উহা সর্ব্বতোভাবে 'ভারতসঙ্গীতে'র কবির উপযুক্ত হইয়াছিল। রহস্য-কবিতা রচনাতেও হেমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং এই সময়ে রচিত 'বাজি মাৎ' তাঁহাকে রহস্য রচনাপটু কবিগণের মধ্যে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের অভিনব কাব্যগ্রন্থ 'আশাকানন' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন পুনরুজ্জীবিত হইলে হেমচন্দ্র নূতন সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রকেও রচনা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। এই বৎসরের শেষভাগেই 'বৃত্রসংহারে'র শেষার্দ্ধ প্রকাশিত হয়। বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচকগণের মতে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নির্দ্দোষ মহাকাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র 'কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশিত করিয়া তাঁহার সুযশঃ বর্দ্ধিত করেন। এই বৎসরেই তিনি দান্তের জগদ্বিখ্যাত 'ডিভাইনা কমেডিয়া' অবলম্বনে "ছায়াময়ী" প্রণয়ন করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব 'দশমহাবিদ্যা' কাব্য প্রণয়ন করেন। মানবের জীবন-সমস্যার আলোচনায় দশমহাবিদ্যার কবির কৃতিত্ব অসাধারণ। যদুনাথ বাবুর মতে বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ মহান সঙ্গীত পূর্ব্বে কেহ রচনা করেন নাই।

ইলবার্ট বিলের আন্দোলন এবং অন্যান্য সাময়িক ঘটনা উপলক্ষে হেমচন্দ্র অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়া রহস্য-রচনায় তাঁহার ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "নবজীবন" এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশে পরিচালিত 'প্রচারে' হেমচন্দ্র কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট'এর অনুবাদ প্রকাশ করেন।

বৃদ্ধ বয়সে হেমচন্দ্র অন্ধ হইয়াছিলেন। এইজন্য বাধ্য হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী উকীলের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্ধাবস্থাতেও তিনি বাণী-সেবা পরিত্যাগ করেন নাই। তাহার শেষ গ্রন্থ 'চিত্ত-বিকাশ' অন্ধাবস্থাতেই রচিত হয়।

হেমচন্দ্র উদার, পরোপকারী ও দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। এইজন্য জীবনে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও বার্দ্ধক্যে অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য-দশায় পতিত হন। চিত্ত-বিকাশে এই দারিদ্র্যের উল্লেখ দেখিয়া বঙ্গবাসী কবির দুঃখমোচনার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেক্রেটারী অব ষ্টেটও বাঙ্গালার এই পরম কবিকে সাহিত্যসেবার জন্য বিশেষ পেন্সন দিয়াছিলেন।

১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ কবি স্বর্গারোহণ করিলে বঙ্গদেশের নানা স্থানে স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সাহিত্য পরিষদে কবির একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি এবং হাইকোর্ট উকীল লাইব্রেরীতে তাঁহার একটি সুন্দর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে হেমচন্দ্রের কাব্যের বিশেষত্বের পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, কোনও পূর্ব্ব-গরিমাদৃপ্ত আত্মবিস্মৃত জাতিকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে হইলে হেমচন্দ্রের ন্যায় জাতীয় কবিরই প্রয়োজন। আমরা আজ তাঁহার স্মৃতিপূজা উপলক্ষে দেশবাসীকে তাঁহার কাব্যগুলির পুনরালোচনা করিতে অনুরোধ করি।

পরিচয়

শ্রীআশালতা দেবী

মধ্যাহ্ন কালে অর্দ্ধেক রৌদ্র এবং ছায়ার তলে বসিয়া সমী দূর-বিস্তৃত বালুকা-চরের দিকে চাহিয়া ছিল।

শীত-মধ্যাহ্নের একটি ব্যাপ্ত এবং নিবিড় আলস্য তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। পাশে গুটিকতক বহি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। দীপ্তি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া নির্নিমেষ চক্ষে সম্মুখের কম্পিত বৃক্ষ-পত্রের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। কিছুকাল পরে সে কহিল, তোমার বন্ধুর লেখার মাঝে একটি জিনিষ আমাকে স্পর্শ করেচে।

সমী উৎসুক ভাবে তাহার প্রতি চাহিল।

দীপ্তি কহিল, বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল, রোঁম্যা রোঁলা, প্রভৃতি বিদেশের শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের এবং প্রতিভার পরিচয়-সাধন তিনি ভারী মনোজ্ঞভাবে করেচেন।

সমী তৎক্ষণাৎ কহিল—কিন্তু তার সৃষ্টির মাঝে কেবল এই অংশটাই তোমাকে আকর্ষণ করেচে শুনে আনন্দ হবার কথাও আমার নয়। পরিচয় প্রদান? কেন এ ছাড়া স্বাধীন সৃষ্টির দিকে দেবার তার কিছু কি ছিল না?

দীপ্তি কহিল, সে নিয়ে আজ আমি কোন কথা বলতে চাই নে; কারণ, আমার মনে হয়, তার এখনও সময় হয় নি। অথচ তোমার কথার প্রতিবাদ না করেও থাকতে পারচি নে। তুমি কি ভাব শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া নিরতিশয় সহজ কাজ? বারট্র্যাণ্ড রাসেলের লেখা পড়ে তাঁকে জানতে পারি। তাঁর জীবন সম্বন্ধে খবর শোনা যেতে পারে; কিন্তু এ ছাড়া আরও কোন দিক দিয়ে তাঁকে জানবার উপায় কি নেই?

সমী কহিল, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সংস্পর্শের সুযোগ যদি না ঘটে, তবে এ ছাড়া আর কি উপায়ই বা আছে?

দীপ্তি কহিল, নিকট সান্নিধ্যের আনন্দ আমাদের পাবার পথ নেই। অত্যন্ত ছোটখাট ব্যবহারের ভিতর দিয়ে—একটি বিশেষ ধরণ, হাস্যালাপ, এ সমস্তর মাঝে যে পরিচয় ধরা পড়ে, সে পাবার কোন উপায় নাই। অথচ এদিক থেকেও জানবার একটা আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমানে রয়েচে। সেই কামনার পরিতৃপ্তি তিনি অনেকটা করেছেন। কেবল মুখের কথা আমাদের উদ্দীপ্ত করে না; সে শুধু খবর দেয়। আন্তরিক অনুভব মানুষকে উদ্বেলিত করতে পারে। উচ্চ হৃদয় এবং সুগভীর প্রতিভার প্রতি তোমার বন্ধুর একান্ত আসক্তি তাঁর লেখার মাঝে, উন্মুক্ত করে প্রকাশের প্রচেষ্টায় সর্ব্ব স্থানে আবেগ সঞ্চার করেচে। একটি অনুরাগ-দীপ্ত চিত্তের আলোক-সম্পাতে সে পরিচয়ের অনেক নিভৃত অংশ আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে, যা কেবলই চিন্তার আদান-প্রদানের দ্বারা সম্ভব হোত না বলেই আমার বিশ্বাস। এবং যে বস্তুটি আমাদের সুতীব্রভাবে বিদ্ধ করে, সে শুধু অপরিচিত প্রতিভার সহিত পরিচয়ের আনন্দ নয়; সে সৌম্য, প্রশান্ত, গভীর হৃদয়-সৌন্দর্য্যের প্রতি সৌন্দর্য্য-পিপাসী মনের আত্ম-নিবেদন। একজনের হৃদয়-সম্পদ আর একজনকে বিচলিত করেচে, আবিষ্ট করেচে, এই কথাটাই অনুক্ষণ—সব চেয়ে বড় হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

সমী কহিল, মনোজগতে স্নিগ্ধপরিণতি, সুমহান প্রতিভা—এর সৌন্দর্য্যে সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালে মুগ্ধ হয়; এ আর অভূতপূর্ব্ব ঘটনা হোল কি? একান্ত স্বাভাবিক, সাধারণ, প্রাঞ্জল, এমন কি এই নিয়ে এই শীতার্ত্ত দিনের রৌদ্ররঞ্জিত মধ্যাহ্নকালের রম্য অবকাশ কালটুকু বাক্যবিন্যাস করে যাপন করার অবধি কোন প্রয়োজন ছিল না। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই যে তারা স্থূলের ভিতর সূক্ষ্ম এবং সহজ কথার মাঝে নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনায়াসে বার করতে পারে। পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার উপর তোমরা একটি ভাবের আবরণ বিস্তার কর। তার দ্বারা যদিচ সৌকুমার্য্যের সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সোজা বস্তুকে নিরর্থক জটিল করে তোলা হয়।

দীপ্তি বারম্বার মাথা নাড়িয়া কহিল, না—না। আমরা মিথ্যা মোহজাল প্রসারিত করি না; কিন্তু স্বাভাবিক ক্ষমতার বলে সাধারণ বস্তুর মাঝখান হইতে তাহার বিশেষত্ব এবং অশোভনের ভিতর হইতেও তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যটুকু গ্রহণ করিতে পারি। তোমার বন্ধুর, পরিচয়-প্রদানের

মাদুরা ও রামেশ্বরম্
(৭)

মাদুরায় যখন পৌঁছুলুম তখন সন্ধ্যে হোয়ে গিয়েছে। ষ্টেশনের সামনেই লম্বা লম্বা দুটো সরকারী চোলট্রী আছে। সেখানে বলে দিলে জায়গা নেই, পাশের চোলট্রীতে যাওয়া গেল। সেখানে একতলায় মাত্র একটি ঘর খালি ছিল। তাড়াতাড়ি সে ঘরখানা দখল কোরে অন্যত্র ঘরের সন্ধানে ছুটলুম; কিন্তু সর্ব্বত্রই লোকে লোকারণ্য, কোথাও স্থান নেই। গাইড সঙ্গেই ছিল; সে বল্লে যে Y. M. C. A. গিয়ে খোঁজ করলে ভাল ঘর পাওয়া যেতে পারে। ছুট্লুম সেখানে, কি করি! ঘর চাই, যে ঘর পাওয়া গিয়েছে সেখানে বাস করা অসম্ভব। ঝট্কায় চড়ে Y. M. C. A. গিয়ে হাজির হওয়া গেল। বাড়ী অন্ধকার! কেউ কোথাও নেই। ম্যানেজার, সেক্রেটারী তো দূরের কথা একটা চাকর-বাকরেরও দর্শন নেই। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বোধ হয় দশবার ওঠা-নামা করলুম কিন্তু কারুকেই দেখতে পাওয়া গেল না। হতাশ হোয়ে নীচে নামছি, এমন সময় একটি হ্যাটকোটধারী লোককে ওপরে উঠতে দেখে তাঁকে ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কোথা থেকে আসচেন? আমরা বল্লুম—বাংলা দেশ থেকে।

তিনি বল্লেন—আমিও তো বাংলা দেশ থেকে আস্‌চি।

তিরুমল নায়কের প্রাসাদের একাংশ

এর পরে বাংলায় কথা সুরু হোলো। লোকটি বল্লেন—অনেক ঘর খালি আছে। কিন্তু সে সব ক্রীশ্চানদের দেওয়া হয়। আপনারা নীচে Lecture Hall এ খোঁজ করুন, ম্যানেজার সেখানে আছেন।
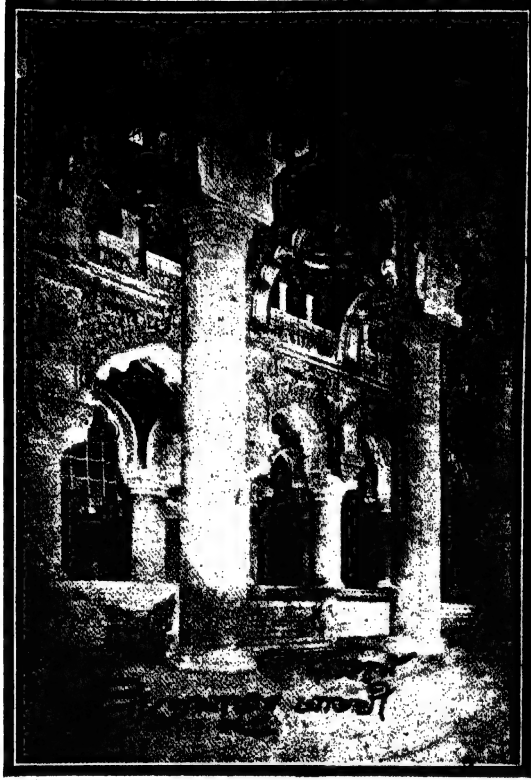
ভাল ঘর পেলে এক রাত্রের জন্য ক্রীশ্চান হোতে আমাদের কোনোই আপত্তি ছিল না। তাড়াতাড়ি লেক্‌চার হলে যাওয়া গেল। সেখানে তখন বক্তৃতা হচ্ছিল। একটি দাড়ি-গোঁফওয়ালা মোটা লোক, আকণ্ঠ ইংরেজী পোষাকে ঢাকা—তামিল ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। লোকটী কথা বলার চেয়ে হাস্‌চেনই বেশী। শ্রোতৃবৃন্দের মুখ কিন্তু গম্ভীর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শোনা গেল। তামিল ভাষায় বেশ বক্তৃতা হয়। দ ড় ড ও প্রভৃতি থাকায় সে ভাষায় 'জোর বক্তৃতা' যাকে বলে তা বেশ দেওয়া যায়।

এইখানে দু-চার জনকে জিজ্ঞাসা করা গেল; কিন্তু কেউ কিছু বল্‌তে পারলে না। অবশেষে আমরা আন্দাজ করে দু-তিন জন লোককে ম্যানেজার বলে ধরলুম; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের মধ্যে কেউই ম্যানেজার নয়। শেষকালে বিরক্ত হোয়ে ফিরে এলুম।

চোলট্রীতে ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে মন্দির দেখতে বেরিয়ে পড়া গেল। দক্ষিণের অন্যান্য তীর্থস্থানের সঙ্গে

মাদুরার এতটু তফাৎ আছে। এখানে দেবী মীনাক্ষীরই জয়-জয়কার। সুন্দরেশ্বর শিব আছেন কিন্তু তিনি দেবীর আওতায় পড়ে গিয়েছেন।

মীনাক্ষীদেবীর মন্দির ষ্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে। মন্দিরের সম্মুখেই একটি বাজার। বিরাট গোপুরমের নীচে বিশাল ফটক। ওপরে Sri Minakshi Temple এই কয়েকটী কথা বিদ্যুতালোকে সমুজ্জ্বল। দক্ষিণের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখেছি, দোকানপাট ইত্যাদির সাইনবোর্ডে দেশী মাদুরার মন্দিরের মাথায় এই ইংরেজী বিজ্ঞাপন দেখে একেবারে দমে গেলুম।

মন্দিরের মধ্যে ঢোকা গেল। মরি মরি! এত দিনে মন্দিরের এ রূপ তো চোখে পড়ে-নি। তোরণে, খিলানে নানা আকারের দীপাধারে এক সঙ্গে সহস্র-সহস্র প্রদীপ জ্বলছে। চারিদিক আলোয় আলো। সঙ্কীর্ণ লম্বা গলিপথগুলি যেন স্বপ্নপুরীর রাস্তা, আলো আঁধারের অপূর্ব্ব সমাবেশ। লোকজন নরনারীতে মন্দির পরিপূর্ণ। প্রত-

মাদুরার টেম্পাকুলম ও তন্মধ্যস্থ মন্দির
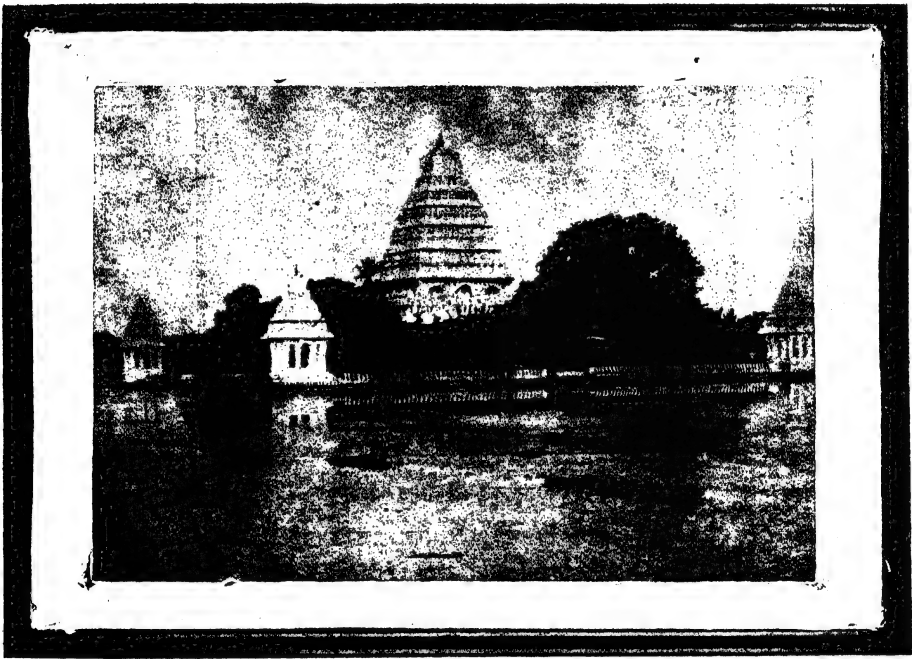
ভাষাই ব্যবহার করা হয়। তারা জানে যে, তাদের দোকানে ইংরেজ অথবা ফরাসীরা মাল কিন্‌তে আসবে না, কাজেই মিছিমিছি ইংরেজী অক্ষর দিয়ে দোকান সাজাবার কোন সার্থকতা নেই। এ বিষয়ে তারা বাঙালীদের চাইতে ঢের উন্নত। কলকাতার দেশী পাড়ার গলির মধ্যে যে মনোহারী দোকান তার গায়েও ইংরেজী সাইন বোর্ড দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণের এই চাল দেখে মনটা বেশ খুশী হোয়ে উঠেছিল; কিন্তু

লোকজন কিন্তু সে তুলনায় চেঁচামেচি নেই বল্লেই হয়। এক ধারে দাঁড়িয়ে দেখতে-দেখতে মনে হয়, যেন দক্ষিণের নরনারীদের পার্ব্বত্য নদীর মতন অনাড়ম্বর জীবনধারা এইখানে এসে শতধা উৎসারিত হয়েছে। গৃহমন্দির তাদের শান্ত, সংযত ও সরল। তাদের জীবনের যত আড়ম্বর, আনন্দের যত উদ্দাম ও অসংযম সব যেন তারা এই দেব-মন্দিরে নিঃশেষে নিবেদন করেছে।

মাদুরার এই মীনাক্ষী মন্দিরের মতন দক্ষিণের অন্য কোনো মন্দিরে এত জনসমাগম দেখি-নি। এর কারণ এখানকার লোক সংখ্যা অন্যান্য শহরের চেয়ে ঢের বেশী এবং মন্দিরটীও শহরের ঠিক মাঝামাঝি। প্রায় সকলেই একবার
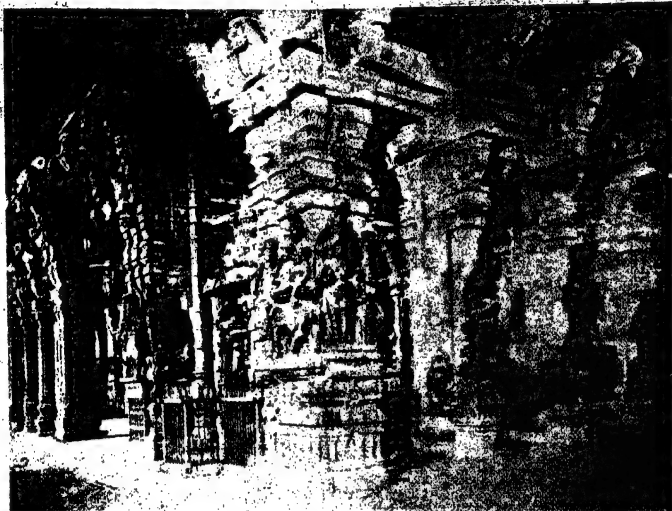
মাদুরা মীনাক্ষী মন্দিরের একাংশ
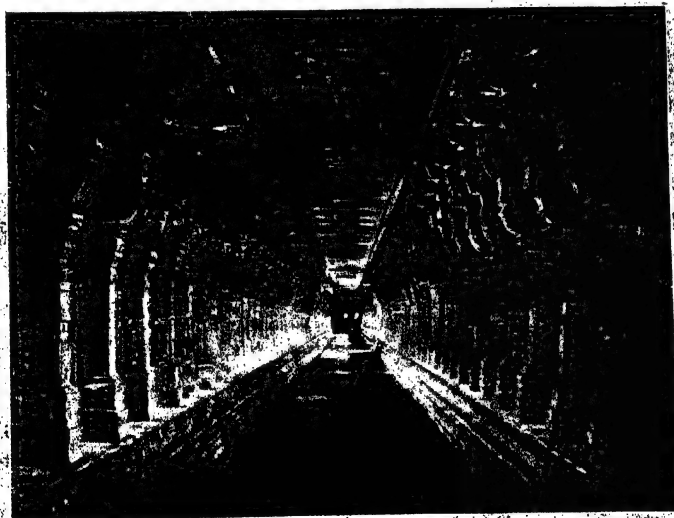
রামেশ্বর মন্দিরের বাহিরের পরিক্রমা

সকালে এবং একবার রাত্রে নিয়মিত-ভাবে দেব-দেবী দর্শন করে।

মাদুরার মন্দির পাথরের মূর্ত্তির জন্য বিখ্যাত। রাত্রিবেলা সেগুলিকে কাজ-সারা গোছের দেখে মীনাক্ষী দেবীকে দর্শন কোরে রাত্রি এগারোটা নাগাদ চৌলট্রিতে ফিরে এসে উঠোনে বিছানা কোরে মশা তাড়িয়ে-তাড়িয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া গেল।

মুসলমান শাসনের আমলে যথারীতি মাদুরাকেও অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। মাদুরার চতুর্দ্দিক প্রাচীরে ঘেরা ছিল। সেই প্রাচীরের স্থানে-স্থানে চোদ্দটা ছোট কেল্লার মতন ছিল। প্রত্যেক কেল্লায় একজন সামরিক কর্ম্মচারী ও কিছু সৈন্য থাকত। মুসলমানেরা এই প্রাচীরটিকে ধ্বংস কোরে ফেলে। এই সঙ্গে মীনাক্ষীদেবী ও সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দিরও তারা ধ্বংস কোরে দেয়। বর্ত্তমানের মন্দির নাকি তার অনেক পরে তৈরী হয়েছে।

১৩৭২ খৃষ্টাব্দ বা ঐ রকম কোনো সময়ে কাম্পানা উদৈয়ার নামে একজন হিন্দু সেনাপতি মাদুরা থেকে মুসলমান শাসনের উচ্ছেদ করেন। এই উদৈয়ার বংশ ১০৪৪ খৃষ্টাব্দ অবধি এখানে রাজত্ব করেছিলেন। এর পরে কিছুকাল নায়কেরা রাজ-প্রতিনিধিরূপে মাদুরা শাসন করেন। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ কোরে কিছুকাল মাদুরা পরে-পরে চার জন পাণ্ড্য বংশীয় রাজাদের অধীনে শাসিত হয়। এই পাণ্ড্য রাজারা নায়ক রাজাদের দ্বারাই শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই পাণ্ড্য রাজারাই এখনকার মন্দিরের চারটি গোপুরম্ তৈরী কোরে দিয়েছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে মাদুরার শাসনভার আবার বিজয়নগরের হাতে গিয়ে পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিশ্বনাথ নায়ক নামে এক ব্যক্তি বিজয়নগরের প্রতিনিধিস্বরূপ মাদুরা শাসন করতে এসে সেখানে আবার নায়ক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বনাথ অতীব ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। তাঁর আমলে মাদুরার অনেক উন্নতি হয়। বিশ্বনাথ এবং তাঁর মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা আর্য্য নায়গ মুদালীর নামে এখানে অনেক অদ্ভুত গল্পের প্রচলন আছে। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পরেও আর্য্য নায়গ অনেকদিন জীবিত ছিলেন এবং পরে-পরে তিনটী রাজার রাজত্বকালে তিনি একাধারে সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করেন। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের সম্মুখে রাজা তিরুমল নায়কের চৌলট্রি নামে বড় হল ঘরে বিশ্বনাথের একটি ঘোড়ায়-চড়া প্রতিমূর্ত্তি আছে। এখনো বছরের মধ্যে একদিন এই মূর্ত্তিটীর গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান দেখান হয়। মাদুরার মন্দিরের মধ্যে সহস্র স্তম্ভওয়ালা যে ঘর আছে তা এই বিশ্বনাথেরই কীর্ত্তি।

মাদুরার শেষ বড় রাজা হচ্ছেন তিরুমল নায়ক। তাঁর আমলে মীনাক্ষী মন্দিরের অনেক সংস্কার হয়েছে। মন্দির পরিক্রমার মধ্যে তিরুমলের বড় পাথরের প্রতিমূর্ত্তি আছে।

সকালবেলা উঠে আমরা তিরুমল নায়কের প্রাসাদ দেখতে গেলুম। প্রাসাদ চৌলট্রি থেকে মাইল দেড়েক দূরে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে এই প্রাসাদ তৈরি। তিন চার শো বছরের পুরাতন প্রাসাদ; কিন্তু দেখলে মনে হয় অতি আধুনিক। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দক্ষিণের মন্দিরগুলির মধ্যে শিল্পের যে বৈশিষ্ট্য আছে সেখানকার বাড়ীর তেমনি কিছুই নেই। প্রাসাদের দরবার ঘরে এখন জজের আদালত বসে। কিন্তু বিচারের সেই পুরোনো ধারাটী এখনো পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে কি না বলতে পারি না। অন্যান্য ঘরেও সরকারী দপ্তর করা হয়েছে। তিরুমলের শয়নকক্ষটী দেখবার মতন। এই ঘরের ঠিক মাঝখানে ছাতে দুটো-দুটো কোরে চারটে ফুটো আছে। শোনা গেল যে, ছাত থেকে চারটী শিকল ঝুলানো থাকত। এই শিকলে রাজার শোবার খাট দুলত। দক্ষিণ দিকের গর্ত্ত দুটির মাঝখানে একটি বড় গর্ত্ত। শোনা গেল যে, একবার এক চোর ছাদে ঐ গর্ত্ত কোরে খাটের শিকল ধরে রাজার ঘরে নেমে অনেক মূল্যবান জহরৎ চুরি কোরে সরে পড়ে। রাজা তিরুমল নায়ক চোরের এই বাহাদুরী দেখে ঘোষণা কোরে দিলেন যে, যে ব্যক্তি এই কাজ করেছে সে এসে যদি তার দোষ স্বীকার করে তা হোলে তাকে ক্ষমা তো করা হবেই; পরন্তু পুরুষানুক্রমে ভোগ করবার জন্য সম্পত্তিও দেওয়া হবে। ঘোষণা শুনে চোর এসে জহরৎ ফিরিয়ে দিলে, রাজা তাকে সম্পত্তিও দিলেন; কিন্তু সে সম্পত্তি আর তার ভোগে লাগল না। কারণ রাজার হুকুমে তখুনি তার মাথা কেটে ফেলা হোলো।

শহরের উত্তর প্রান্তে একটি বাড়ী আছে। সেখানে তিরুমলের আমলে বন্য জন্তুদের সঙ্গে মানুষের লড়াই হোতো। তিরুমলের দরবারে বসে জজের আদালত; আর সরকার এই

বাড়ীটা থাকতে দিয়েছেন স্থানীয় কালেক্টরকে—বেড়ে ব্যবস্থা।

ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে শহরের দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড টেম্পাকুলম্। এত বড় টেম্পাকুলম্ দক্ষিণের অন্য কোথাও দেখিনি। পুষ্করিণীর চারপাশ পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বাঁধান। মাঝখানে একটি ছোট দ্বীপের মতন। সেখানে একটি ছোট মন্দির ও তার চারপাশে একটুখানি বাগান। আমরা নৌকা কোরে এই দ্বীপে গেলুম। জানুয়ারী মাসে এখানে বড় রকমের একটি উৎসব হয়। সে সময় টেম্পাকুলমের চারপাশের সিঁড়িগুলি প্রদীপ দিয়ে সাজান হয়। মীনাক্ষী দেবী ও সুন্দরেশ্বর শিব সে সময় কিছুকাল এই দ্বীপের মন্দিরে এসে বাস করেন। টেম্পাকুলম দেখে আবার আমরা মন্দিরের পথে চল্লুম। দু-পাশে ধান ক্ষেত; তার মাঝ দিয়ে উঁচু-নীচু রাস্তা। এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের ঝট্‌কা চল্‌তে লাগ্‌ল। কিছুদূর যাবার পর গাইড এক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে একটা প্রকাণ্ড বট গাছ দেখালে। গাছটা এখানকার একটা দ্রষ্টব্য জিনিষ। সেটা খুব বড় গাছ সন্দেহ নেই; কিন্তু শিবপুরের বাগানের বটগাছ এর চেয়ে অনেক বড়।

মাদুরায় জরির কাজ করা সুতোর শাড়ী, চাদর, রুমাল, প্রভৃতির খুব নামডাক আছে। কাপড়চোপড় দেখবার উদ্দেশ্যে তাঁতি-পাড়ায় যাওয়া গেল। এখানকার জরিদার সুতোর শাড়ী বেনারসের রেশমী শাড়ীকেও হার মানায়। দর খুব বেশী বলে মনে হোলো না। কলকাতায় মাদ্রাজী শাড়ী বলে যে সব শাড়ী বিক্রি হয় তার দাম এখানে কলকাতার চাইতে অনেক কম। এখানকার ব্যবসাদারদের মধ্যে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করা গেল যে, তারা দর দস্তুর বিশেষ করে না। আগ্রা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে গাড়োয়ান থেকে আরম্ভ কোরে দোকানদার পর্য্যন্ত যেমন বিদেশীদের ঠকিয়ে কিছু নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হোয়ে থাকে এখানে তা নয়। আগ্রায় একবার সতরঞ্চি কেনায় কথা মনে আছে। একই দোকান থেকে একই রকমের সতরঞ্চি পাঁচ, চার ও সাড়ে তিন টাকায় কেনা হয়েছিল। দিল্লী অথবা লাহোরেও এই ব্যবস্থা। জুতো একজোড়া দু-টাকা থেকে আরম্ভ কোরে দশ টাকা পর্য্যন্ত—যার কাছে যেমন আদায় করতে পারা যায় তাই আদায় করে। এমন কি নাপিত দাড়ি কামাবে—তাও তারা লোক বুঝে দর হাঁকে।

মীনাক্ষী মন্দিরের গণেশ মূর্ত্তি

দক্ষিণের এই তাঁতিদের কাছে দরদস্তুর নেই। আমরা

অনেক টাকার কাপড় কিনেছিলুম; কিন্তু দুটো টাকা কমাতে বলা গেল, কিছুতেই তারা কমালে না। শেষকালে রেগে মাল রেখে বেরিয়ে আসা গেল, তবুও না। আধঘণ্টা বাজারে এদিক-ওদিক দর দেখে আবার সেইখানেই গিয়ে কিন্‌তে হোলো।

বাজারে সওদা কোরে প্রায় এগারোটার সময় মন্দিরে যাওয়া গেল। দিনের বেলায় মন্দিরের আর এক মূর্ত্তি।
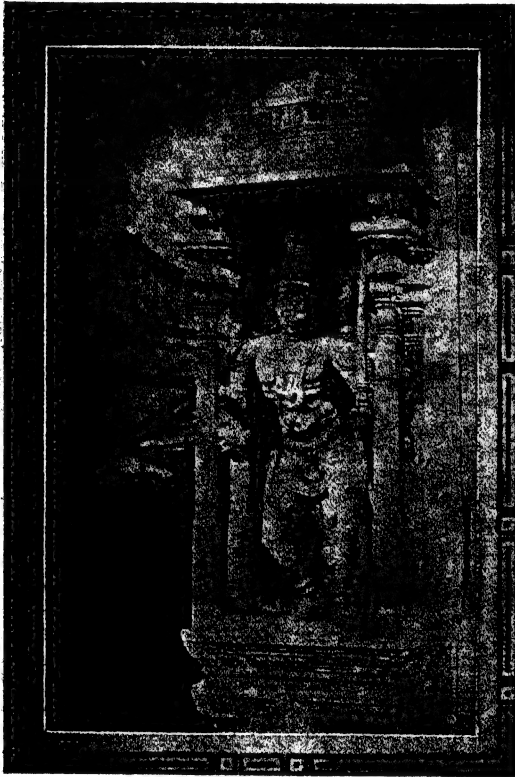
তিরুমল নায়কের চৌলট্রির একটি স্তম্ভ

তখনো লোকের অন্ত নেই। মন্দিরে কিছুক্ষণ থাকলে মনে হয় যে, দেশশুদ্ধ লোক যদি দিনরাত্রি এইখানেই ঘোরাফেরা করে তা হোলে কাজকর্ম্ম করে কখন! মীনাক্ষী মন্দিরের মধ্যে অনেক বড়-বড় পাথরের মূর্ত্তি আছে। অধিকাংশ মূর্ত্তিই মহাদেবের নানা রকমের লীলা। একই মন্দিরের মধ্যে একাধারে এত ভাল ও মন্দ (অশ্লীল নয়) মূর্ত্তির সমাবেশ যে দেখলে অবাক হোয়ে যেতে হয়। মহাদেবের মুখে আসিরীয় দাড়ি ও ঝাড়ুদারের মতন গোঁপ লাগিয়ে অনেক সুন্দর মূর্ত্তিকে মাটী করা হয়েছে। কোনো-কোনো সুন্দর মূর্ত্তির মুখে রূপোর চোখ বসিয়ে একেবারে তাকে বীভৎস কোরে তোলা হয়েছে। তালজ্ঞানের অভাব হোলে কত সুন্দর শিল্প সৃষ্টি কত বীভৎস হোয়ে উঠতে পারে তার কিছু-কিছু নমুনা এই মীনাক্ষী মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়।

মন্দির পরিক্রমার মধ্যে একটি গণেশের মূর্ত্তি আছে। এই নৃত্যপর গণেশের মূর্ত্তিটী চমৎকার। ভুবনেশ্বরের গণেশমূর্ত্তির সঙ্গে এখানকার গণেশের তুলনা করা চলে। মীনাক্ষী দেবী অর্থাৎ যাঁর নামে এত বড় মন্দির তাঁর মূর্ত্তিটী কিছুই নয়। হাতখানেক উঁচু একটি নারীমূর্ত্তি। এই ঠাকুর ঘরের ওপরে কাঞ্জিভরম্ প্রভৃতি মন্দিরের মতন ছোট্ট একটু বিমান। এখানেও দুটি তিনটী ঘোর অন্ধকার ঘরের মধ্যে দিয়ে ঠাকুর ঘরে পৌঁছতে হয়। ঠাকুর ঘরের সম্মুখেই এক জায়গায় দেখলুম কতকগুলি সুন্দরী মেয়ে শুয়ে-শুয়ে গল্পগুজব করচে। কাল রাতেও এদের এখানে এইভাবে শুয়ে থাকতে দেখেছিলুম। গাইডকে জিজ্ঞাসা করলুম—এরা কারা?

সে বল্লে—এই সব মেয়েদের ভূতে পেয়েছে। এই কার্ত্তিক মাসটা ভোর এরা সকাল থেকে বেলা একটা আর তিনটে থেকে রাত্রি বারোটা অবধি এইখানে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবে।

ব্যাপারটা ভাল কোরে বুঝতে পারলুম না। মনে হোলো মাদুরায় ভূতের উপদ্রব তো বড় কম নয়। ভূতের ওপরে কিন্তু রাগ না হোয়ে সহানুভূতিই হোলো। তবু যা হোক্ ভূতের দৌলতে এটুকু জানতে পারা গেল যে, দক্ষিণের মেয়ে মাত্রেই কুৎসিত নয়। সেখানকার লোকদের ভয়ে ভূতের পছন্দের তারিফও মনে মনে করতে হোলো।

দুপুরবেলা মন্দির পরিক্রমায় জোড়া-জোড়া বর্ণহীন শ্বেত নরনারীকে ঘুরতে দেখে ফটকে Sri Minaskhi Temple লেখার সার্থকতা বুঝতে পারা গেল। শুনলুম যে, এই পর্য্যন্ত অন্ত্যজ-জাতিরা আসতে পারে। এর পরেও খানিকটা

অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর লোকদের যাবার অধিকার আছে; কিন্তু দেবীগৃহের দরজা অবধি একমাত্র ব্রাহ্মণেরই যাবার অধিকার আছে।

অন্যান্য মন্দিরের মতন এখানেও সহস্র স্তম্ভের ঘর আছে। এখানকার এই ঘরটীর অবস্থা অন্যান্য মন্দিরের সহস্র স্তম্ভের ঘরের চেয়ে ঢের ভাল। এই ঘরের মধ্যেও অনেক ভাল মূর্ত্তি আছে। মীনাক্ষী মন্দিরের চৌহদ্দীর মধ্যেই সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দির।

মন্দিরের সামনে রাস্তার ওপারে একটি বড় হল ঘর। এটীর নাম তিরুমল নায়কের চৌলট্রি। এটী এখন কাপড়ের বাজারে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের মধ্যেও রীতিমত বাজার আছে। যারা মন্দির তৈরি করেছিল তারা অকাতরে পয়সা খরচ কোরে গিয়েচে; আর এখন যারা মন্দির ভোগ করচে তারা তাদের চেয়ে অকাতরে মন্দিরের ঘর ভাড়া দিয়ে পয়সা রোজগার করচে।

মাদুরায় সুন্দর সুন্দর পিতল কাঁসার বাসন পাওয়া যায়। মন্দির দেখা শেষ কোরে কিছু বাসন-পত্র কিনে একটার পর চৌলট্রিতে ফিরে আসা গেল।

এখানে আমিষ হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল স্নান কোরে সেই হোটেলে যাওয়া গেল। হোটেলটী নিরামিষ হোটেলের মতন পরিষ্কার নয়। মোটা ভাত, মাংসও ভয়ানক ঝাল! যা হোক কোনো রকমে তাই গলাধঃকরণ কোরে চৌলট্রিতে ফিরে এসে চারটের গাড়ীতে রামেশ্বরম্ যাত্রা করা গেল।

গাড়ী ছিল খালি, শুয়ে পড়া গেল। একে রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, তার ওপরে আজ সেই ভোর থেকে আরম্ভ কোরে বেলা দুটো অবধি ঘোরার জন্য দেহ ছিল ক্লান্ত। তাই শুতে না শুতেই ঘুম।

ঘুম যখন ভাঙ্‌ল তখন সন্ধ্যে হোতে আর বিলম্ব নাই। গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি চারিদিক ফাঁকা। দেখেই মনে হোলো যে, সমুদ্রের কাছে এসে পড়েচি। মধ্যে মধ্যে বাব্‌লার বন। এখানকার এই বাব্‌লা গাছগুলো বড় মজার দেখ্‌তে। গাছগুলোর গুঁড়ি থেকে আরম্ভ কোরে অনেক উঁচু পর্য্যন্ত ডালপালা কিছুই নেই, মাথার দিকটা ঠিক খোলা ছাতার মতন গোলভাবে বিস্তৃত। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে দিনের আলো নিভে এল। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ কি দ্বিতীয়া.

রামেশ্বরমের একটি রাস্তা

ঠিক মনে নেই, সন্ধ্যা হোতে না হোতে আকাশে চাঁদ দেখা দিল। ট্রেনখানা সেই চন্দ্রালোকিত বালুভূমির মধ্যে দিয়ে ছুটে চল্‌ল। ক্রমে গাছপালা বিরল হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। মাঝে-মাঝে, দূরে ও কাছে এক একটা নারকোল গাছ। সমুদ্রের আওয়াজ—শাঁ শাঁ শাঁ—। এর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মনের মধ্যে স্বতঃই কেমন একটা ঔদাস্য জাগে। আমার মন তখন কল্পনার রথে চড়ে সুদূর অতীতে চলে গিয়েছে। মনে জাগছিল মহাকবি বাল্মীকির কথা, তাঁর মানসপুত্রী অভিমানিনী সীতার কথা। মনে জাগ্‌ছিল আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যাঁরা এখানে এসেছিলেন তাঁদের মনে তখন কি ভাবের উদয় হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়্‌ল ছেলেবেলায় প্রথম যখন রামায়ণের সঙ্গে পরিচয় হয় সেই দিনগুলির কথা—।

ট্রেন অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্রের শব্দ বাড়তে লাগ্‌ল। চারিদিক থমথমে নিস্তব্ধ, যেন কী একটা ভীষণ সর্ব্বনাশের প্রতীক্ষায় প্রকৃতি নিস্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রামেশ্বরম্ একটি ছোট্ট দ্বীপ। দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে পঁচিশ মাইল প্রস্থে আট মাইল; সব থেকে কম যেখানে সেখানে চার মাইল। সমুদ্রের একটা সরু খাঁড়ির ওপরে সেতু করা হয়েছে। আগে এই জায়গাটা নৌকো বা ষ্টিমারে পার হোতে হোতো। এই খাঁড়ির দেশীয় নাম হড়্‌বোড়ার খাঁড়ি। হড়বোড়া নামে এক দৈত্যের ছিল এখানে রাজত্ব। সীতা উদ্ধারের সময় এই দৈত্য রামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল। এই সেতুটী প্রায় দেড় মাইল লম্বা। সেতুটী পার হোয়েই রামেশ্বরম্ ষ্টেশন। ষ্টেশন একেবারে জনশূন্য। আমরা ছাড়া দুটি তিনটী মাত্র লোক নাম্‌ল। এ সময় কোনো উৎসব নাই, তাই যাত্রীও বেশী নাই।

ষ্টেশনের কাছেই একটি বড় বাগানঘেরা ধর্ম্মশালা আছে। মন্দির থেকে ধর্ম্মশালাটী দূরে বলে যাত্রীরা প্রায়ই এখানে থাকে না। বাজার ইত্যাদি সবই মন্দিরের কাছে। এ স্থানটায় লোকালয় নেই বল্লেই চলে। তবে এ জায়গাটী সমুদ্রের খুবই নিকটে বলে কয়েক ঘর মৎস্যজীবী আশে-পাশে বাস করে। ধর্ম্মশালার রক্ষক আমাদের দোতলার একটি ঘর খুলে দিলে। এমন সুন্দর ধর্ম্মশালা এ যাত্রায় আর মেলেনি। আমাদের যে পাণ্ডা জুটেছিল সে ব্যক্তির বাড়ী পাঞ্জাবে। ছেলেবেলা বাড়ী থেকে পালিয়ে রামেশ্বরমে এসে জুটেছিল; আর সেই থেকে আজ বিশ বছর সে এখানেই বাস কর্‌চে।

জিনিষপত্র ঘরে বন্ধ কোরে পাণ্ডার সঙ্গে আহার অম্বেষণে বেরুনো গেল। ঘুরতে-ঘুরতে মন্দিরের কাছে একটি খাবারের দোকানে গিয়ে ওঠা গেল। দোকানদার হিন্দুস্থানী, যে শ্রেণীর হিন্দুস্থানীরা কলকাতায় বাঙালী ময়রাদের অন্ন মারলে এরাও সেই শ্রেণীর। ভারতবর্ষে এত স্থান থাকতে—অধমতারণ বাংলা মুল্লুক থাক্‌তে, এই জনবিরল দ্বীপে এসে ব্যবসা ফাঁদবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তারা বল্লে যে, প্রথমে তারা কলকাতায় গিয়েই ব্যবসা ফেঁদেছিল; কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটীর অত্যাচারে সেখান থেকে পালিয়ে তারা কানপুরে যায়। কিন্তু সেখানেও সেই মিউনিসিপ্যালিটী। শেষকালে তারা ঘুরে-ঘুরে এমন একটি স্থান ঠিক করলে যেখানে মিউনিসিপ্যালিটী থাক্‌লেও তার অত্যাচার নাই। এখানে তাদের ব্যবসা বেশ জোর চলে। এই দশ বছরের মধ্যে তারা বিষয়-আশয় কোরে ফেলেছে। এইখানে কিছু পুরী ও মিষ্টান্ন আহার কোরে ধর্ম্মশালায় ফেরা গেল।

সুন্দর চন্দ্রালোকিত রাত্রি, পরিষ্কার নির্জ্জন রাস্তা, সমুদ্রের শাঁ শাঁ শব্দ, আর সেই সঙ্গে হু হু বাতাস। ঠিক হোলো এমন সুন্দর রাত্রিটা ঘুমিয়ে না কাটিয়ে বেড়ানো যাক। অনেকক্ষণ বেড়িয়ে ধর্ম্মশালার ছাতে গিয়ে বসা গেল। কিছুক্ষণ চুপ চাপ থাকার পর বন্ধুবর নরেন্দ্র দেব প্রস্তাব করলেন—এতদূর যখন আসা গিয়েছে, তখন সিংহলটা ঘুরে আসা যাক্।

আমার কিন্তু ঘুরতে আর ভাল লাগ্‌ছিল না। আমি বল্লুম—আর ভাল লাগ্‌চে না, এবার ফিরে চল। চারজন ছিলুম। আমার দলে একজন এল। নরেন্দ্রকে তখন লঙ্কায় টেনেচে। তার মুখে সেই এক কথা—এতদূর এসেছি আর একটুর জন্য কেন!

অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হোলো যে, কাল তাঁরা দু জনে লঙ্কায় যাবেন আর আমরা দু-জনে বাড়ী ফির্‌ব।

সকালে মন্দির দেখতে যাওয়া হোলো। আমাদের ধর্ম্মশালা থেকে মন্দির মাইলখানেক কি তার চেয়ে কিছু বেশী দূর হবে। শহরের মধ্যে একটি বড় রাস্তা। এই

রাস্তাটাই একেবারে মন্দিরের দরজা অবধি গিয়েছে। ছোট-খাটো আরও দু-চারটে রাস্তা আছে। কোঠা-বাড়ী চারটি, বাকী সমস্তই ফাঁকা, রাতদিন হু হু কোরে বাতাস বইছে। রামেশ্বরমকে একটা ভাল স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করতে পারা যায়। এখানকার অধিকাংশ লোকই বিদেশী, বেশীর ভাগ হিন্দুস্থানী। স্থানীয় লোক দুটি চারটি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু দক্ষিণের লোক অর্থাৎ এতদিন যাদের দেখ্‌ছিলুম—সে শ্রেণীর লোক বিরল।

রামেশ্বরমের মন্দির হচ্ছে শিবের মন্দির। রামচন্দ্র নাকি লঙ্কা আক্রমণ করবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এখানে শিবের পূজা করেছিলেন। বর্ত্তমান মন্দিরটী তৈরি করেছিলেন রামনাদের সেতুপতি রাজারা।

মন্দিরের গোপুরমগুলি খুব উঁচু। অন্যান্য জায়গার মন্দিরের মতন এখানে দেবদেবীর তেমন ভিড় নেই। এখানকার বাইরের পরিক্রমাটী একবার ঘুরলে নাকি দেড় মাইল পথ অতিক্রম করা হয়। এই পরিক্রমার দুদিকে সারি সারি পাথরের কাজ করা থাম। থামগুলির ওপরে চূণকাম কোরে তার কাজের দফা রফা কোরে দেওয়া হয়েছে। এত বড় মন্দির, এত বিপুল আয়োজন, কিন্তু দেবতা থাকেন সেই ছোট্ট একটি কুঠরীতে। দেবগৃহের সামনেই একটি প্রকাণ্ড বৃষমূর্ত্তি। এটীর আয়তন তাঞ্জোরের বিখ্যাত বৃষমূর্ত্তির চেয়ে বড় বলে মনে হোলো। কিন্তু এটি চূণ সুরকী দিয়ে তৈরি। এখানে পার্ব্বতী দেবীও আছেন। প্রতি শুক্রবারে সোণার পাল্কীতে চড়িয়ে পার্ব্বতীকে বড় পরিক্রমায় হাওয়া খাইয়ে আনা হয়।

রামেশ্বরমের শিব আমাদের কল্পনার দীনহীন ভস্ম-মাখা ভোলানাথ নন। এখানে তাঁর বিলাসিতার সীমা নেই। সমুদ্রের মধ্যে বাস কোরেও নিত্য তাঁর গঙ্গাস্নান চাই। তাঁর পার্থিব বিষয়ের আয় প্রায় লক্ষ টাকা, তা ছাড়া তাঁর গয়না ও সোণারূপোর আসবাব-পত্র যা আছে তা দেখলে বড়-বড় রাজারও চোখ ঠিক্‌রে যায়।

মন্দিরের মধ্যে শামুক ও শাখের অনেক দোকান আছে। সেখানে নানা আকারের সুন্দর-সুন্দর শাখ, শামুক ও ঝিনুক কিনতে পাওয়া যায়।

শিবের মন্দিরের কাছেই সমুদ্র. কিন্তু এখানকার সমুদ্রে না আছে ঢেউ না আছে গর্জ্জন। পাণ্ডারা বল্লে—রামচন্দ্র হাত ঠেকিয়ে দিয়ে এখানকার গর্জ্জন ও ঢেউ থামিয়ে দিয়েছেন।

শুনে মনে হোলো—হায় রামচন্দ্র! তুমি যদি পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রেই হাত ঠেকিয়ে তার গর্জ্জন ও ঢেউ থামিয়ে দিয়ে যেতে তো আজ কত সুবিধাই হোতো।

মন্দির ও শহরের চারদিক ঘুরে বেলা বারোটা নাগাদ ধর্ম্মশালায় ফিরে এসে তখুনি স্নান কোরে বেরিয়ে পড়া গেল। সাড়ে বারোটায় গাড়ী। রামেশ্বরমে আর অন্ন গ্রহণ করা হয়নি। মণ্ডপম্ ষ্টেশনে নরেন্দ্র ও অন্য বন্ধুটী নেমে গেলেন। সেখান থেকে তাঁদের ধনুস্কোটি যেতে হবে, সেখান থেকে জাহাজে চড়ে কলম্বো। আমাদের দক্ষিণ ভ্রমণ এবারের মতন এইখানেই ইতি হোলো।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রেন্ যশেডি উপস্থিত হইতেই একটি যুবক রেল-কর্ম্মচারী আমাদের অনুসন্ধান করিয়া নামাইয়া লইলেন। মেয়েদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিলেন,—গাড়ী এলেই আমি উপস্থিত হয়ে তুলে দেব', কুলি ডাকবার আবশ্যক নেই; ইত্যাদি।

কলিকাতা-যাত্রী গাড়ি ষ্টেসনে পৌঁছিলে, তিনি সযত্নে কামরা খালি ও পরিষ্কার করাইয়া—লগেজ্ সহ সকলকে তুলিয়া দিয়া, গার্ডকে বলিয়া কহিয়া গেলেন। দুধ, জল প্রভৃতি আবশ্যক আছে কিনা—বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ কয়েক দোনা পান গাড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

কবি-বন্ধুর সৌজন্যে মুগ্ধ হইলাম,—মনে মনে লজ্জিতও হইলাম ;—মনের অগোচর পাপ নাই ! দেখছি সাহিত্যের মত বর্ণচোরা জিনিস্ কমই আছে !

জয়হরির মনের অবস্থা আজ শোচনীয়। এ যেন—সে জয়হরি নয়, উদাসী অনাথ !

একটি বাঙালী ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া গাড়ি হইতে নামিলেন,—ট্রঙ্ক্, বেডিং প্রভৃতি নামে না ! কুলিরা পুরো এক টাকার কমে হাত লাগাইবে না। এদিকে বৈদ্যনাথের গাড়ি ছাড়িবার বড় বিলম্বও নাই।

বাবুটি কাতর ভাবে বলিলেন—বাবা, তীর্থে চলেছি, কাচ্চা-বাচ্চা সঙ্গে, কেনো কষ্ট দাও ! একটা ট্রঙ্ক্ একটা বিছানার বাণ্ডিল আর দু'একটা কুচো জিনিস বই তো নয় ! আমার কাছে খুচরো যা ভাঙ্গানো আছে সব দিচ্ছি, নাবিয়ে নিয়ে দেওঘরের গাড়িতে তুলে দাও। এই দেখ একটাকা সাড়ে ছ' আনা মাত্র আছে। সেখানে পৌঁছেও কুলিদের পাওনা, গাড়িভাড়া প্রভৃতি খরচ আছে,—টাকাটি তাই রইল ; এই সাড়ে ছ' আনা নিয়েই খুসী হও বাবা।"

একটা অতি কুদর্শন চেহারার লোক—"আরে ছোড় কে চলে আও" বলিয়া, কুলিদের লইয়া অগ্রসর হইতেই, জয়হরি দ্রুত গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বাবুটির জিনিস-পত্র নামাইয়া আনিল এবং "আর কিছু আছে কি" বলিয়া, ট্রঙ্কটি মাথায় লইয়া বেডিংটা তাহার উপর তুলিয়া দিতে বলিল।

ভদ্রসন্তান দেখিয়া বাবুটি বলিয়া উঠিলেন—"আহা আপনি কেন"—

"ওই বদ্‌মাইস্ বেটারা যা চাইবে তাই দিতে হবে নাকি ! নিন্—তুলে দিন, ও-সব ভদ্রতা রাখুন,—আমার কাজই এই—

"চট্ চলে আসুন, এ-গাড়ী এখুনি ছাড়বে ,—আমার অন্য কাজ আছে।"

জয়হরি অগ্রসর হইতেই কুলিরা মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"দিন,—আমরাই দিয়ে আসছি, তীর্থ করতে এসেছেন,—দিতে না পারেন, যা ইচ্ছে হয় দেবেন।"

"তবে দিয়ে দিন মশাই"—

জয়হরি সে কথায় কর্ণপাতও করিল না, কেবল ব[illegible]ল— "জাতটা বাবু হয়ে এদের পায়েও মান-ইজ্জৎ ধরে দি[illegible]।"

কর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিয়া গেল—"এখুনি [illegible]সছি !"

"আর কি এমন মানুষ দেখতে পাবো !"—একটি নিশ্বাস পড়িল।

আমার দিকে চাহিয়া বিষাদ-ঢাকা হাসির মধ্যে বিজেতার সুরে বলিলেন—"ভেবেছিলেন আমাকে ফেলে যাবেন !"

এই তাঁর শেষ কথা।

দেখা আর হইলনা। জয়হরি যখন দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল,—ট্রেন্ তখন ডিষ্টেণ্ট্ সিগ্‌নেল্ পার হইয়া গেল !

জয়হরি সেই দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষ একটা সশব্দ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"বড় অপরাধ হয়ে গেল !"

"কিচ্ছু হয়নি, ভালই হয়েছে। এখানে আর কাজ ছিল কি ! ও-কাজটা এর চেয়ে ঢের বড় ছিল।"

সে চুপ করিয়া ধীরে ধীরে ইষ্টেসনের একপ্রান্তে চলিয়া গেল,—লক্ষ্যহীন, উদাস !

আমারও মনটা কেমন হইয়া গেল ! গাড়ী আসিতে বিলম্ব আছে। সেই কর্ম্মচারী বাবুটির সহিত বাক্যালাপে সময় কাটাইবার জন্য ইষ্টেসনের দিকেই চলিলাম।

* * * *

ট্রেন্ পশ্চাৎ ফিরিতেই ইষ্টেসনের বাড়্তি-বাতিগুলি সযত্নে নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ তার বড় আবশ্যকও ছিলনা,—প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে জ্যোৎস্নার প্লাবন আসিয়াছে !

হঠাৎ একটা মৃদু সুমিষ্ট গন্ধ পাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে হইল। দেখি—একটি মহিলা, যুবতীই হইবেন বা যৌবনের প্রান্ত-সীমার ইতস্ততঃ অবস্থায় উপস্থিত হইলেও—অধিকার রক্ষায় যত্নবতী। নব-প্রচলিত প্রথায় পরিহিত সহজ সুন্দর বেশ-ভূষা ; অর্দ্ধ-বিমুক্ত অবগুণ্ঠন। প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের অনাবৃত অংশে পদচারণাপরায়ণা।

সৌষ্ঠব-শোভন শারীরিক গঠন দেখিয়া মনে হইল,—আমাদের মেয়েরা যখন এই মেকদারে দাঁড়াইবেন তখন ঘরে ঘরে স্বরাজ বিরাজ করিবে ;—স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য !

আচ্ছাদন মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। দেখি একটী বাঙ্গালী (ভদ্রলোকই হইবেন) দুই গণ্ডে দুই হাত ঠেকো দিয়া একটি বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসিয়া আছেন। এটা অবশ্য আমি দেখিলাম,—কিন্তু তিনি যে কোথায় আছেন তাহা তিনিই জানেন,—বোধকরি ত্রিভুবনের ত্রিসীমায় নয় !

প্রাণটা তো খারাপ ছিলই, আরো যেন সেই দিকেই

এগিয়ে পড়লো। চলিয়া যাইতেছিলাম,—ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল। কি জানি কেনো মন চাহিল—লোকটির সহিত কথা কহিতে! ল্যাম্পের আলোটা তাঁহার মুখের উপরই পড়িয়াছিল—

"এ কি! দয়াল না?"

চমকিয়া মাথা তুলিলেন,—"হাঁ ভাই,—কিন্তু আমি যে চিনতে পারছি না!"

"তাতে তো অপরাধ নেই,—বিশ-বচরের ওপর দেখা-সাক্ষাৎ নেই যে"—

"ওঃ—তুমি! আরে এসো এসো ভাই—একবার প্রাণটা জুড়ুই।"

উঠিয়াই বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন—দু'তিন মিনিট।

বোধ হইল—বুকটা তাঁর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল—কয়েকবার!

"আঃ—ছাড়তে আর ইচ্ছা হয় না ভাই! সে-দিন কি আর ফিরে আসে না...!"

শেষ কয়টি কথায় ও তাহা যেরূপ হতাশ-কাতর কণ্ঠে অন্তর হইতে বাহিরে আসিল, বুঝিলাম—গত কয়-বৎসরে দয়াল কত আঘাত কত বেদনাই না পাইয়াছে! তাহার রহস্যোজ্জ্বল বাক্যালাপ কি উপভোগ্যই ছিল! আজ এ কি পরিবর্ত্তন! বর্ত্তমানের উপর মানুষের ভবিষ্যতের নির্ভর কতটুকু!

বলিলাম,—"পলে পলে পরিবর্ত্তনই ত' জীবন, তার ভালো-মন্দের মানে নেই। ও-দুটোকেই আমাদের ভোগ করবার জিনিস বলে' মেনে নিয়ে চলতে হবে,—উপভোগের বলে যে নিতে পারে তারই জিত্। তা-ছাড়া তো বাঁচবার পথ পাইনা ভাই।—"

'যাক্,—এখানে? চলেছ কোথায়?—আছ কেমন—জিজ্ঞাসা করতে যেন সাহস পাচ্ছিনা ভাই!"

আমার মুখে একদৃষ্টে চেয়ে একটু সহজ হাসি টেনে বললে—

"দেখছি সেই পুরোনো প্রাণটা নিয়েই সমানে চালিয়ে আসছো,—আজো বেদনা বুঝতে বিলম্ব হয়না! এতদিনেও পাকলেনা!"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

—"চলেছি কোথায়?—কোথাও চলিনি ভাই—(এদিক ওদিক চাহিয়া)—যেখানে চালান্।"

"বউদি সঙ্গে আছেন নাকি! বাঃ বেশ হয়েছে,—কোথায়?"

"বউদি বটে,—তবে তোমার সে বৌদি নন্ ভাই।—বিশবছরে অনেক বিষই গিলেছি...!"

প্রাণটা দমিয়া গেল।

"তবে কি"—

"হ্যাঁ ভাই—তাই। বলছি সব। তুমি একটু নজর রেখো।"

"আমি দেখছি"। ট্রঙ্কটা নজরের সামনেই ছিল।

বলিল—"তুমি বাল্যবন্ধু—এ বলায় আমার শান্তি আছে! আজ দশবছর ভাই আমার এই দুর্দ্দশা। তোমার সে বৌদি—আমার আলোক নিবিয়ে পরলোক গমন করলেন। বছর খানেক সে কি অন্ধকার!—

"মাসিকে মনে পড়ে তো? তিনি দিনরাত শোনাতে সুরু করলেন,—'আমি বৃদ্ধা হয়েছি, পুজো-পাঠ ফেলে তোমার পণ্ডিতির ভাত আর ক'দিনইবা যোগাতে পারবো! বড় দেখে একটি বউ ঘরে আন,—দেখে আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুজি'।—

"শেষ তাই ঘটালেন! অষ্টাদশবর্ষীয়া সুশিক্ষিতা "বেত্রবতী" ঘরে এলেন! ছাত্রদের পিঠে বেতের চাষ চালিয়েছিলুম,—এখন ফললাভ করছি। অভিসম্পাৎ যাবে কোথা!

"বছরখানেক তাঁকে বুঝতে গেল, বাকি—যুঝতে যাচ্ছে। ষাট টাকায় এ সৌভাগ্য সামলানো সম্ভব নয়! চার-বছরেই অমরের হাতে বাস্তু বাঁধা পড়লো,—মাসি কাশী পালাবার প্রস্তাব করে শয্যা নিলেন। রেলে আর তাঁকে যেতে হলনা,—শূন্য পথেই যাত্রা করলেন।—

"তাঁর হাজার সাতেক সঞ্চিত ছিল। সর্ব্বাগ্রে বাড়ী উদ্ধারের শপথ করিয়ে,—আমাকেই তা দিয়ে গেলেন।—

"অমর কিন্তু সে প্রস্তাব কাণেই তোলেনা, বলে—'বন্ধু হয়ে,—না—না,—লোকে আমায় বলবে কি! তোমার স্বচ্ছল সময় হলে দিও। এখন বরং কিছু নাও,—ওপরে একখানা ঘর তোলো!'

"শেষ অনেক করে'—প্রায় কেলেঙ্কারি,—কড়া সুদে দেড়া দণ্ডে খালাস করেছি। দেখা হলে কথা কয়না।

—"তার পর বেত্রবতীর কুমার সম্ভবে তাঁর আবদার মত বাড়ীতে—সহরের ডাক্তার, লেডি ডাক্তার, মিড্-ওয়াইফ্ মায় নার্সের স্রোতস্বতী বইয়ে দিলে! আজকাল নাকি এটা অত্যাবশ্যক। এই সব উৎকট আড়ম্বরে—শেষ যা হয়ে থাকে তাই হল। সেই শোক আর তার ক্রোড়পত্ররূপে আমার একটা কৃত-কর্ম্মের তাড়স্ সামলাতে,—এই তীর্থযাত্রা বা দেশভ্রমণ; অর্থাৎ সাত হাজারের ব্যালান্সের শ্রাদ্ধ বা সদ্ব্যবহার!—

—"ভাবছি—ফিরে সামলাব কি করে। আর তো তেমন আশাপ্রদ মুমূর্ষু মাসি পিসি নেই! থাকবার মধ্যে সুহৃদ—অমর। আগে ভাবতুম লাইফ্ ইন্সিওর করে আর কাশী গিয়ে যে যত সত্বর মরতে পারে তার তত' বেশী লাভ। এখন ভাবছি—মরতে পারলেই লাভ।

—"ভরসা ছিল extensionএর expectation—(আশীর্ব্বাদের আমদানী,—দানো পেয়ে দক্ষিণে টানা)! সেদিন ইনিস্পেক্টর বললেন—"সে আর পাচ্ছনা পণ্ডিত,—সে চেষ্টা কোরনা। অবশ্য তোমার দ্বিতীয় দার-গ্রহণটা একটা বড় কারণ রয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা আর পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষা রাখেনা, সে আপনা আপনি ঘরে ঘরে বেড়ে চলেছে। সুগন্ধী তৈলের আর সুছন্দী ছেলেমেয়ের নামকরণ চিন্তায়—অভিধান, কাব্য, উপন্যাস সবই ওলটাতে হয়। তার ওপর মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন—higher standard বাংলার (অভিজাত সাহিত্যের) কাজ করে দেয়।

—"আরো বললেন,—'সেদিন গৃহস্থ ঘরের সাধারণ পাকপ্রণালী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দিয়ে মেয়েদের কাছে যা পেয়েছি, তাতে দৃঢ় প্রতীতি হয়েছে—এ ভাষার ভবিষ্যৎ আপনি গড়ে উঠছে। কত শতাব্দীর পচা বা প্রচলিত গ্রাম্য কথাগুলিকে এরা এমন মাধুর্য্য দান করেছে শুনলে অবাক্ হতে হয়,—রবিবাবুর উর্ব্বশী এখন তাঁর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে রন্ধনশালে হাঁড়ি ধরতে পারেন। দু' একটা মনে আছে—

মোচা,—কদলী পুষ্প,
পলতা-বেগুণ,—বল্লরি-বার্ত্তাকু,
শাক,—কিসলয়,
থোড়ের ঘণ্ট,—মৃণাল মন্থন,
পালমের শিষ,—পালম মঞ্জরি ইত্যাদি।

Splendid (অনির্ব্বচনীয়)—না? পণ্ডিত extensionএর (বাড়তির) আশা ছাড়ো।'

"তথাস্তু।"

শুনিতেছিলাম আর দয়ালের পূর্ব্বকার সহাস প্রকৃতি রহস্যপ্রিয়তা মনে পড়িয়া প্রাণটা উদাস হইয়া পড়িতেছিল। কাল—ধীরে ধীরে সবই হরণ করিয়াছে, দয়ালের খোলোসটা ফেলিয়া রাখিয়াছে মাত্র। মাঝে মাঝে কথার মধ্যে কেবল তাহাকে পাইতেছিলাম। দেখিতেছি—বাল্যের ও যৌবনের স্মৃতিই মানুষের শেষ বয়সের সম্বল,—তারই নাড়াচাড়ায় সে ক্ষণিক স্বস্তি পায়, অবশ্য—বিষাদ-মিশ্রিত। তাই দয়াল ক্ষণ-পূর্ব্বে বলিয়াছিল,—সে দিন কি আর ফেরেনা!

বলিলাম,—"কুমার সম্ভবের যে ঘটা বা ঘনঘটার কথা বললে, সেটা ভাই এ যুগে সমর্থন না করে উপায় নেই। এখন আঁতুড়ে ছেলেকেও ইন্জেক্সন (ফোঁড়ামৃত) দিতে হয়, কারণ সাবধানের মার নেই,—এটা infant mortalityর (শিশু সাবাড়ের) যুগ কিনা! তাতে মলেও সয়, ওটা দেওয়া থাকলে প্রসূতিরও দশের কাছে কথা কবার মুখ থাকে —"আর আমার দুঃখু নেই,—করতে তো কিছু বাকি রাখা হয়নি" ইত্যাদি তখন চলতে পারে।—

—"তাই বলছি, ও কাজটা সমর্থন করি, নচেৎ একটা কিছু ঘটলে (যদিও এ ক্ষেত্রে ঘটা রোখেনি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোখেও না)—ভদ্র সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে থাকতে ভাই। ছেলেপুলে তো যায়ই;—ঘটার তো কসুর করনি। নিজেরা তো বেঁচে গেছো!—

—"যাক্, এত বড় শোকটা সামলাতে বউদিকে একটু বেড়িয়ে আনাই উচিত।

—"তোমার ক্রোড়পত্রের কথাটা বুঝলুমনা কিন্তু"—

দয়াল বললে,—"দেখা যখন পেয়েছি—যতটা পারি খোলসা হই। শোনবার মতো বটে,—শোনো—

—"ডাক্তার প্রভৃতির চার দুগুণে আট হাত এড়িয়ে নিজে বেঁচে উঠলেন। ব্রাণ্ডি, বোভরিল্, প্যানোপেপটনে পণ্ডিতের ভিটেও ভরে উঠলো। ভাবলুম—শোকটা এখন তাজা, এই সময় গীতাটা চট্ ধরতে পারে। অতগুলি জড়োয়া জিনিসের হাত থেকে বেঁচেছেন—পুণর্জন্ম তো বটে।

জানই তো গীতাই আমাদের দুঃসময়ের সেরা টনিক। তার ত্যাগ-মাহাত্ম্যটা বেশ করে ব্যাখ্যা করে শেষ বললুম

"—এখন দেখছি ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়ে কি ঠকানই ঠকিয়েছেন! পশুপক্ষীর সে-বালাই নেই,—তারা আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছু চায়না। আমাদের ঝোঁক্ অতিরিক্তের দিকে, তাই অশান্তিও অতিরিক্ত!—ভগবান সব দিয়ে থুয়ে শেষ বললেন কিনা—ত্যাগেই সুখ! কি বিভ্রাট! চোখ দিয়েছেন—দেখতে। আমরা তাই করে আসছি, আবার অতিরিক্ত ভাবে করবার চেষ্টাও পাচ্ছি, তাই চশমা চাই, অবশ্য—সোনার।

—"দাতার কিন্তু মতলব দেখছি,—ও-করায় বাহাদুরি নেই, ও-সব বন্ধ করাতেই বাহাদুরি! তবে দেওয়া কেনো প্রভু! তার উত্তর—বুদ্ধি দিয়েছি যে!

—"শ্রীভগবানের বাক্য শুনতেই হয়। তাই মনুষ্য-জন্মে ত্যাগের চেয়ে বড় কিছুই নেই; সেইটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ করণীয়; ইত্যাদি।

—"একটা ফতুরি ফরমাজ ছিল—নবনী হারের আর বিজয়-বসন্ত চুড়ির। এই মানসিক বৈরাগ্যের সুযোগে সেই ফ্যাসাদটা ফিকে করে দেওয়াই আমার মতলব ছিল।

কাহিল শরীর, মাথা ঘুরছিল। Tinned butter (মাখন) দিয়ে নাইস বিস্কুট খেতে উঠে গেলেন। এটা লেডি ডাক্তারের পাঁতি (Prescription)।

বলিলাম—"ওরূপ কাহিল অবস্থায় ওটা দরকার বই কি।"

"হ্যাঁ—খুব। সে দিন সেই শ্রীমতীকে ডাক্‌তে গিয়ে দেখি—ব্লাউস গায়ে গামচা পরে মোড়ায় বসে—মুড়িগুড় খাচ্ছেন! বললেন—সত্ত্বর সঙ্গে সঙ্গে শক্তি দিতে গুড়ের মত ওস্তাদ আর নেই। বেশী খাটুনির পর তাই খাই।

যাক্। গ্রহ কিন্তু গলায় গলায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সন্ধ্যা হয় হয়, গীতার ভরসায় স্যাকরাকে নূতন প্যাটার্ণের পত্তনটা পোষ্টপোন করতে (থামা দিতে) বলে ফিরছি,—নিতি মালানী জোর করে একরাশ দো-রসা চিংড়ি গামছায় ঢেলে দিলে। বললে—"ঠাকুর আমি গরীব বেওয়া, ছেলের সাধ বড় ছিল, তা এবার তো সে আশা ঘুচেই গেছে। ভেবেছিলুম আপনার কাছে পড়িয়ে মানুষ করে নেবো। দশজনের তা সইলো না। হরি আছেন, তাঁর ইচ্ছে হলে কি না হয়! আশীর্ব্বাদ করুন, এর আর পয়সা দিতে হবেনা, আসছে বারে মনে রাখবেন।

"দো-রসা মাছ শাক দিয়ে ভালোবাসেন,—এ সৌভাগ্যটুকু আজো আছে ভাই!

"এই কথা ভাবতে ভাবতে মোড় ফিরতেই—শম্ভু পাল যেন মুকিয়েছিল! গামছায় মাছ দেখে বল্‌লে—"বেশ হয়েছে—তোফা হবে; আমারও কষ্ট সার্থক। দাঁড়ান—দু'ঝাড় ডেঙো নিয়ে যান।"

"শম্ভু যা হাজির করলে, দেখে বললুম,—একি ঝড়ে পড়ে গিয়েছিলো বাবা,—চেলিয়ে দিলে ভালো হত শম্ভু। ডেঙো তো বটে!"

"আজ্ঞে দেখবেন খেয়ে, একেবারে গুড় গুড়! পুষার বীজ।"

"তাহলে ও আর নষ্ট কোরনা বাবা! শিউলী ডেকে ওর গলায় ভাঁড় বাঁধিয়ে দাও—খেজুর-রস দেবে।"

শুনে আমার প্রাণটা hear—hear করে উঠলো। এ সেই আগেকার দয়াল।

শম্ভু খুব খুসী হল।

"খাড়া ভাবে দু'ধারে দু'বগলে চেপে দু'ঝাড় নিয়ে বাড়ী ঢুকতেই, "বাবা গো" বলে ছুটে গিয়ে ঘরে খিল দিলেন!

"ব্যাপার কি! আমি গো আমি। ভয় পেলে নাকি?"

দোর খুলে বললেন—"ভর সন্ধ্যেবেলা—আমি বলি ডাকিনিতে গাছ চেলে আনছে! উঃ এখনো বুক্ টিপ টিপ করছে!"

আমি তো থ! তার পর সে ঝোঁক্ সামলে বললেন—

"সোণার জিনিসের বেলাই বুঝি তোমার যতো ত্যাগের উপদেশ বেরয়, আর অতিরিক্তের ভয় আসে! আর এই বুলবুলির বাসা সমেৎ ডেঙোর দণ্ডকারণ্য গিল্‌তে হবে! এ ব্যবস্থা গীতার না চিতার!"

"মুখ বেঁকিয়ে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ!

"দুঃসময়টা ছাখো,—বুলবুলির বাসাটা কি ওঁরই চখে পড়তে হয়!—না শম্ভুর না দয়ালের!

"নিতি মালানিই তো তার আসছে বারের ছেলে পড়াবার দাদন দিয়ে—এই বিপদটা ঘটালে,—হারামজাদি! আবার শোম্ভো বেটার বদমাইসিটা ছাখো! পাজি পালের বাচ্ছা পুষার বীজ বুনে সুঁদরি বার করেছে! সন্ধ্যেবেলা তাই কিনা ব্রাহ্মণকে দিয়ে বওয়ালে,—সহ বুলবুলির বাসা! আবার প্রসিকিউটার কবি হেমবাবু কিনা—"হা শম্ভো আর যো

শম্ভো” করে ছোটলোককে বাড়িয়ে গেলেন! নিশ্চয়ই বেটার মকদ্দমায় বিলক্ষণ কিছু সেরেছিলেন।—

“এখন সামলাক্ দয়াল পণ্ডিত! বিবেচনাটা দেখলে ভাই।”

দয়ালকে নিজের elementএ (ধাতে) ফিরে পেয়ে হেসে বাঁচলুম। তবে সে হাসি পূর্ব্বের আনন্দ দিলেনা।

—“যাক্, তারপর থেকে সন্ধ্যে হলেই তাঁর গা ছম ছম করে,—গাছ-চালা ডাকিনি দেখেন, ও-বাড়ীতে থাকতে চাননা। গ্রামের সকলে বললে “—কোরছো কি,—গয়াটা করে এসো পণ্ডিত। মাসি তোমাকে বড় ভালোবাসতেন, বোধ হয়”—ইত্যাদি। ডাক্তারেরা রায় দিলেন,—কিছুদিন দেশ-বিদেশে নব নব দৃশ্য দেখে, এ কুদৃশ্যটা মাথা থেকে মুছে আনা দরকার।

“সেই ক্রোড়-পত্রের এই ঘোড়দৌড় ভাই! কেমন, শোনবার মতো নয়!”

বলিলাম,—“খুব—তখন হ’লে এতক্ষণ এন্‌কোর (ফিরে ভাই) বলতুম।—

—“আচ্ছা, তা হলে এখন গয়ায় চলেছ! Via বৈদ্যনাথ নাকি?”

“মাসির টাকা থাকতে থাকতে তাঁর কাজটা সারবারই তো সঙ্কল্প ছিল;—সে হবার নয় ভাই। তীর্থ নির্ব্বাচন ওঁর প্রোগ্রাম মতো হওয়াই নাকি বাঞ্ছনীয়—ইতি লেডি ডাক্তার শ্রীমতী শুক্তির উক্তি। এবং হয়েছেও তাই। শৃন্‌—

“পেঁড়ো সেরে বৈদ্যনাথে ভগ্নী সন্দর্শন সমাপ্ত, এখন ক্রমোচ্চ পুণ্য পথে—তাজমহল, কুতব মিনার, আলি মসজিদ ও পিণ্ডদাদন খাঁ এই চারি ক্রম সারবার সঙ্কল্প। চয়নিকার সেরা সংস্করণ না? পিণ্ডদাদন খাঁ-টা বোধ হয় আমার ওপর প্রবল প্রীতি বশতই বাচাই হয়েছে;—অন্ততঃ “দাদন” দিয়ে আসতে পারেন! আশার কথা নয়!

গাড়ী এসে গেল। দয়ালের কুলিও এসে তাড়া দিলে—“চলিয়ে”।

দয়াল চম্‌কে উঠলো—“ইস্, তাঁকে একবার দেখি। তুমি ভাই এইগুলো গাড়ীতে তোলাও।”

“ও হচ্ছে—তুমি যাও, তুমি যাও।”

দয়াল ছুটিল।

জয়হরি আসিয়া গিয়াছিল; কোনো কষ্টই হইলনা। বৌদির বিস্কুটের বাক্স, মাখমের টিন্, চায়ের সরঞ্জাম, ষ্টোভ, কুঁজো, ট্রঙ্ক, বেডিং সহ আমরা ইণ্টারে ঢুকিলাম।

জয়হরি দ্রুত নামিয়া পড়িল—“দিদি উঠলেন কি না দেখে আসি।”

কে দিদি!

আসছি।

অবাক বসিয়া দয়ালের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। সেকেণ্ড-বেল হইতেই—দুজনে আসিয়া উঠিল। বৌদি মেয়ে গাড়িতে।

গাড়ী ছাড়িল। (ক্রমশঃ)

পৌরাণিকী

শ্রীমৃণালিনী দেবী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩

মথুরার চারটী ফটক,—সর্ব্বপ্রথম হোলি দরোয়াজা। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে গোপিনীগণের সহিত হোলি খেলিয়াছিলেন। এখানে এখন হার্ডিঞ্জ গেট হইয়াছে ও একটী প্রকাণ্ড ঘড়ি বসান হইয়াছে। অতি সুন্দর পাথরের লতা-পাতায় ফটক ভূষিত। দ্বিতীয়টী ভরতপুর দরোয়াজা—ভরতপুরে রাস্তা গিয়াছে। তৃতীয়টী ডিগ্ দরোয়াজা—এই রাস্তা গোবর্দ্ধন হইয়া ডিগে গিয়াছে। ভরতপুরের প্রাচীন রাজাদের ঐ ডিগে সব কীর্ত্তি আছে। চতুর্থটী বৃন্দাবন দরোয়াজা। এই রাস্তা দিয়া বৃন্দাবনে যাওয়া যায়। ঐ বৃন্দাবন-দরোয়াজাতে গোকর্ণেশ্বর মহাদেব ও দুর্গাদেবী আছেন। গোবর্দ্ধনের রাস্তায় ভূতেশ্বর

মহাদেব ও দুর্গাদেবী আছেন। অদূরে পীঠস্থান মহাবিদ্যার মন্দির,—রক্তবর্ণা দেবা, সুন্দর উপবন, চারিধারে গড়খাই। এই স্থানে পূর্ব্বে বড় ডাকাতের ভয় ছিল। ভরতপুরের দরোয়াজাকে 'বাজারমণ্ডি' বলে; যব, গম, ছোলা, তিসি, সরিষা, জোয়ার, বাজরা সব বিক্রয় হইতেছে।

আমাদের বাড়ী ছিল হোলি-দরোয়াজার খুব কাছে। ইহারই অনতিদূরে কংসরাজা ধনুর্যজ্ঞ করিয়াছিলেন। রঙ্গেশ্বর মহাদেব কংসের স্থাপিত। মহাদেবের সুন্দর মুখ, চক্ষু ও প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। শক্তিও আছেন। গোকর্ণেশ্বরের মন্দিরের কাছে একটী রজকের শিরশ্ছেদন করা হয়। সেই দিনের স্মরণার্থ এখনও প্রতি বৎসর একটী মেলা হয়। কার্ত্তিকমাসের শুক্লা অষ্টমীতে এখানে গোচারণ হয়। বড় বড় চৌবেদের কিশোরও সুকুমারদর্শন ছেলেরা কৃষ্ণ-বলরাম সাজেন ও ঘোড়ায় চড়িয়া গোচারণে আসেন। এখানে সংখ্যাতীত গাভী জমা হয়। এই সব গো-বৎস ও গাভীর খুব ধূমধাম করিয়া পূজা হয় ও ভাল ভাল মিঠাই ইহাদিগকে খাওয়ান হয়। দশমীর দিন কংস বধ হয়। কাগজের একটী প্রকাণ্ড কংস তৈয়ার করা হয় ও যজ্ঞস্থলে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণ বলরাম ঘোড়ায় চড়িয়া আসেন ও তীরধনুক লইয়া মূর্ত্তিকে আঘাত করেন। তাঁহারা আঘাত করিবামাত্র পাঁচশত চৌবে যষ্টিপ্রহারে কংসমূর্ত্তি ধ্বংস করেন। সমবেত জনমণ্ডলী সেই ভগ্ন মূর্ত্তি হইতে কাগজের ছিন্নখণ্ড লইয়া কৃষ্ণবলরামকে বিশ্রাম-ঘাটে লইয়া যায় ও সেইখানে তাহাদিগকে সিংহাসনে বসাইয়া আরতি করে। রোজ রাত্রে বিশ্রাম ঘাটে আরতি হয়। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। ঘাটের মধ্যস্থলে একটী সাদা পাথরের দুই তিন হাত উচ্চ চারকোণা বেদী আছে। একজন খুব বলবান্ চৌবে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া গলায় ফুলের মালা পরিয়া দাঁড়ান। একটী শতশিখ প্রদীপ লইয়া একজন আসে ও প্রদীপটী জ্বালা হয়। চৌবে তখন এই প্রদীপটী লইয়া প্রায় দশ মিনিট কাল আরতি করেন। প্রদীপটী নামানো হইলে শত শত উপাসক ও উপাসিকা যমুনা-মাঈর এই আরতি-প্রদীপের উত্তাপ নেয়। আরতি শেষ হইলে কৃষ্ণ-বলরাম স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যান।

মথুরাতে এক মাস রামলীলা হয়। সহরে তিন সপ্তাহ ধরিয়া যাহা হয়, তাহাতে তত ঘটা হয়না বটে, কিন্তু দশ দিন যাবৎ সহরের বাহিরে সরস্বতীকুণ্ডের ও রামলীলার মাঠে যাহা হয়, তাহার ধূমধাম অতুলনীয়। কুম্ভকর্ণবধ, ইন্দ্রজিতবধ ও রাবণবধ হয়। রাবণবধের দিন খুব বাজি পোড়ানো হয়। একাদশীর দিন ভরতমিলন হয়। সহরের মধ্যস্থলে শত্রুঘ্ন ও ভরত দাঁড়াইয়া থাকেন, আর রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অরণ্যবাসের পর গৃহে ফিরিয়া আসেন। মথুরাবাসীরা মনে করে যে মথুরাই যেন অযোধ্যাধাম, আর কলিযুগের রামচন্দ্র যেন সত্যই ফিরিয়া আসিতেছেন। কত বাদ্য, কত আসাশোটা, কত হাতী-ঘোড়া-উট সাজানো! এই সময় সমস্ত সহর সজ্জিত করা হয় ও জনপদবাসীরা অতি সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করে। সহরটী যেন অমরাবতী বলিয়া ভ্রম হয়। মধ্যে মধ্যে লতা-পুষ্পে শোভিত সিংহাসন পাতা থাকে। চুড়িওয়ালা শেঠের দোকানে, শেঠসাহেবদের কুঠীতে, বিশ্রামঘাটে, ছাত্তা-বাজারে ও হোলিদরোয়াজাতে বাজনা বাজে, আরতি হয়, ভোগ ও হরির লুট হয়। তাহার পর দেওয়ালী। সমস্ত নগর আলোকমালায় সজ্জিত হয়। তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা জানি না। তৎপর দিন অন্নকোট। পর্ব্বতপ্রমাণ অন্ন মন্দিরের ভিতর সজ্জিত হয়। নানাপ্রকার তরকারি, মিষ্টান্ন, ফল, দধি, ক্ষীর, মিঠাই ও আচারও ঐরূপে সজ্জিত হয়। এই সব দ্রব্য উৎসর্গ হইলে প্রথমে মন্দিরের অধিকারীর বাড়ী প্রসাদ যায়। তৎপরে বন্ধু-আত্মীয়দের বাড়ী, বড় বড় কর্ম্ম-চারীদের বাড়ী। তৎপরে চাকর, কামদার, চেলাদার। তার পরে সাধারণ লোক ও সর্ব্বশেষে কাঙ্গালীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

মথুরায় দুর্গোৎসবে প্রতিমা গড়া হয় না। প্রতি মন্দিরে একটী করিয়া মাটীর এক হাত উচ্চ বেদী হয়। ঐ বেদী কখনো অষ্টদল, কখনো বা দ্বাদশদল হয়। বেদীর পরিমাণ আট-দশ হাত। তাহার ধারে কলসী রাখা হয়। বেদিটি নানা রঙ্গে চিত্রিত করা হয়। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণের নূতন নূতন লীলা চিত্র করা হয়, যথা—শ্রীকৃষ্ণের বকাসুরবধ, পুতনাবধ, কালিয়-দমন, বস্ত্রহরণ, গোচারণ, কালীকলঙ্কভঞ্জন, দানলীলা, রাসলীলা, কেশীবধ, কংসবধ ইত্যাদি। রাত্রি দশটার সময় সাজিপূজা হয় এবং প্রাতে ও রাত্রে সকলে দর্শন করে। চিত্র অতি সুন্দর হয়। যে পারে, সে মথুরা বৃন্দাবন চৌদ্দক্রোশ পরিক্রমা দেয়। তার নাম 'যুগল-পরিক্রমা'। যাহারা না পারে, তাহারা শুধু 'মথুরা-পরিক্রমা' দেয়। বিশ্রামঘাটে স্নান করিয়া যাত্রীরা দক্ষিণের

পথে বাহির হয় ও সমস্ত দেবতা দর্শন করে। সেগুলির নাম পিপুলেশ্বর, দাউজী, ধ্রুব ও পদ্মপলাশলোচন হরি, রঙ্গেশ্বর, জগন্নাথ, শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, পেতড়াকুণ্ড, বসুদেব ও দেবকীর মন্দির (শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান), ভুতেশ্বর, মহাবিদ্যা, চামুণ্ডাদেবী, সরস্বতীদেবী ও কুণ্ড। এইখানে মহামেলা বসে ও পরিক্রমা-যাত্রীরা জলযোগ করে। সরস্বতীদেবী দর্শন করিয়া যাত্রীরা গোকর্ণেশ্বরে যায়। সেথান হইতে কৃষ্ণগঙ্গায় যায়। ঐ ঘাটে দশহরার দিন যোগ হয় ও বহুলোক স্নান করে। সেখানে স্নান সমাপন করিয়া নৌকায় চড়িয়া যাত্রীরা ২৮ ঘাটের পরিক্রমা দিতে যায়! গৌঘাট, স্বামীঘাট, উসকুণ্ডাঘাট, ব্রহ্মাঘাট, পিতৃঘাট, ধ্রুবঘাট, দাউজীঘাট প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ। এক একটী ঘাটে ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন ফল হয়। তৎপরে ধ্রুবঘাটে বা বিশ্রামঘাটে নামিয়া সহরের দেবতা দেখিতে হয়,—কুব্জানাথ, দাউজি, গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, দ্বারকাধীশ ইত্যাদি। পরে যে যাহার গৃহে গমন করে ও ফলারি দ্রব্য খায়।

মথুরায় ভুতেশ্বর, শান্তনুকুন্ত প্রভৃতি নানা মেলা হয়। পল্লীগ্রাম হইতে, দেশদেশান্তর হইতে কত লোক মেলা দেখিতে আসে। গোবর্দ্ধন, গোকুল, মহাবনে, দাউজি, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা প্রভৃতি অনেক বড় বড় গ্রাম আছে। গোকুলে ও মহাবনে নন্দ-যশোদার মন্দির ও গোকুলনাথের মন্দির বিখ্যাত। মহাবনে বাল্যে শ্রীকৃষ্ণ অনেক লীলা করিয়াছিলেন, যথা, পুতনাবধ, শকটভঙ্গ, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, বকাসুর বধ, কালীয়দমন ও কেশী-অসুর বধ। সেকালে বোধ হয় মহাবন ও গোকুল এক ছিল; এখন তফাৎ হইয়াছে। মহাবন হইতে দাউজি যাইতে হয়। ঠাকুর খুব বৃহদাকার। এথানে যাত্রীরা কেবল মাখন ও মিশ্রীর ভোগ দেয়।

মথুরায় অনেক 'বন' আছে, যথা, সাতাশ বন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার জন্য বিখ্যাত, শ্রীবৃন্দাবন, মধুবন, তালবন, তমালবন, ভাণ্ডিরবন, নাটাবন, কোকিলাবন। বনসমূহের দৃশ্য অতি মনোরম। বহু বনযাত্রী কেহ পাল্কীতে, কেহ গোশকটে, কেহ পদব্রজে কেহ বা ডুলীতে যায়। খাবারের দোকান, মুদির দোকান, তেলির, বেনের, খেলনার, চুড়ির, কাপড়ের দোকান সব সঙ্গে সঙ্গে যায়। গোস্বামীর বন কার্ত্তিকমাসে বাহির হয় ও এক মাস ধরিয়া বেড়ানো হয়। তাহাতে প্রতিরাত্রে রাসধারীর যাত্রা কথা, পুরাণ ও ভাগবত পাঠ। এ বনের স্থিতিকাল এক পক্ষ। ইহাতে উৎসব-বাহুল না থাকিলেও সাধারণ যাত্রীরা এই বনে প্রায়ই যায়। অনেক পুলিশের কর্ম্মচারী ও পাহারাওলা সঙ্গে যায়। আমার পিসীমা একবার বনভ্রমণে গিয়াছিলেন; তিনি অবশ্য কমিশেরিয়েটের তাঁবু ও লোকলস্কর পাইয়াছিলেন।

খুব কিশোর বয়সে আমি একবার গোস্বামীবনে গিয়াছিলাম। গোবর্দ্ধনেও আমি পাঁচছয়বার বাবা ও মার সঙ্গে গিয়াছিলাম। মানস-সরোবর হইতে গিরিগোবর্দ্ধন উঠিয়াছে। এই গিরি সাতক্রোশ লম্বা, তবে তত উচ্চ নহে। মানস সরোবরে পর্ব্বতের উপর মন্দির আছে ও তিনক্রোশ দূরে গোপাল আছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কোনও ভক্ত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ স্থানে জ্যোতিপুরা গ্রাম। এখানে গোপালের খুব ভোগ হয়। অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। গোবর্দ্ধনে ভরতপুরের পূর্ব্বতন রাজাদের সমাধি হয়। তাই সেখানে অনেকগুলি ছত্রি আছে। মন্দিরের ন্যায় সেগুলিও শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। এইসব বিগ্রহহীন মন্দিরের বহির্গাত্রে নানা কারুকার্য্য ক্ষোদিত,—শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মালা প্রভৃতি। গোবর্দ্ধন হইতে কিছুদূরে রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড প্রভৃতি কুণ্ড আছে ও বিগ্রহও অনেক আছে। তন্মধ্যে গোবিন্দজী ও জগন্নাথজী সমধিক বিখ্যাত। রাধাকুণ্ডের জল শীতকালে প্রায়ই শুকাইয়া যায়। এই সময়ে ব্রজবাসীরা ইহার মাটী তুলিয়া রাখে। এই মৃত্তিকা অতি সুস্বাদু ও মোলায়েম। ইহারই নাম 'গোপীচন্দন'। তিলকসেবা ইহাতেই হয়। সমুদায় বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট ইহার অত্যন্ত সমাদর। এই 'গোপীচন্দন' নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু দূরদেশে যায়।

দিগও বেশ দেখিবার স্থান। এই স্থানটী মৃত্তিকা-প্রাচীরে বেষ্টিত। অনেকবার যুদ্ধ করিবার পর তবে ইংরাজেরা ইহা জয় করিতে পারিয়াছে। যত কামান ছোঁড়া হইত, সব মাটীর স্তূপে প্রোথিত হইয়া যাইত। ইহা ভরতপুরের রাজাদের গ্রীষ্মাবাস। তিন চারটী অতি সুন্দর প্রকাণ্ড দীঘি আছে; চারিদিকে গড়খাই করা। তাহার ধারে সব বড় বড় পাথরের বাড়ী; হাওয়ামহল, বারদোয়ারি, অন্দরমহল ও বহু সুন্দর উপবন। তন্মধ্যে একটী বাড়ীতে ৩৮০টী ফোয়ারা আছে; যখন সমস্ত উৎসগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন মেঘগর্জ্জনের মত শব্দ হইতে থাকে। বনযাত্রীরা যেদিন আসে, সেদিন